২য় বর্ষ
১ম সংখ্যা

সম্পাদিকা—কমলা দাশগুপ্তা

বৈশাখ
১৩৪৬

প্রতি সংখ্যা ।০ বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০ ষাণ্মাষিক সডাক ১৸০

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিবাব বৎসব বৈশাখ হতে আবম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বাব আনা। ঠিকানা পবিবর্ত্তন কবতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবাব সময় গ্রাহক নম্বব জানাবেন। যথোচিত সময়েব মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরেব বিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বব উল্লেখ কবে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য বচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষবে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার কবা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত বচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকাব মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲	কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲	হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।
„ সিকি পৃষ্ঠা—৬৲	
„ ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲	

আমাদেব যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনেব ব্লক নষ্ট হ'লে আমবা দাযী নই। কাজ শেষ হবাব পব যত সত্বব সম্ভব ব্লক ফেবৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজাব—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার বোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী

প্রসিদ্ধ স্বদেশী পোষাক ও বস্ত্র বিক্রেতা

বস্ত্র বিভাগ :—**১নং, ২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট** (মেন),

ফোন বি. বি. ৩৫৩

ব্রাঞ্চ :—**৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট**, (বস্ত্র ও পোষাক) **জগুবাবুরবাজার, ভবানীপুর**, (বস্ত্র ও পোষাক)

ফোন : পি কে ৩৭৮

আমাদের বিশেষত্ব :—

ষ্টক অফুরন্ত, দাম সবার চেয়ে কম

• সকল বকম অভিনব ডিজাইনেব সিল্ক ও সূতি কাপড, শাল, আলোযান, ব্যাগ, কম্বল ও মনোমুগ্ধকব ও তৃপ্তিপ্রদ প্রদর্শনী ভাণ্ডাব।

ভদ্র মহোদয়গণের একমাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আর্ট জুয়েলারি হোম

৫৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৫৬৩২

একমাত্র গিনিসোনার ও চাঁদিরূপার অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা

বিবাহ ও যে কোন বকম উপহাবেব গহনা ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে ডেলিভাবী দেই। তার জন্য বেশী মজুরী লওয়া হয় না। পুবাতন সোনাব বদলে নূতন গহনা তৈযাবী কবিযা দেই। আমাদেব তৈয়াবী অলঙ্কার ব্যবহাবান্তে • পান-মবা বাদ যায় না, গিনিসোনা পাওয়া যায়।

একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ক্যানভাসাব আবশ্যক। কিছু জমা দিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে দেখা কবিলে সকল বিষয় অবগত হইবেন।

বিনীত—

আর্ট জুয়েলারি হোম

দ্বিতীয় বর্ষ	বৈশাখ, ১৩৪৬	প্রথম সংখ্যা

ভস্মকীট

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আকাশ বাঁকিয়ে ধনুক করেছো দেখি
আলোর তীর তো বিঁধ্‌ছে এখানে তবু,
দুর্গম পথে মেকি পাথরের লোভে
ঘর ছেড়ে তুমি উধাও হ'য়েছো নাকি ?

মানুষ হ'য়েও মধুবিদ্যায় লোভ !
কালপুরুষেতে অবসর্পের চোখ।
স্বপ্নে কি দেখো তন্বী সুমধ্যমা ?
জান্‌তে যদি তীক্ষ্ণ সে দেহগুলি
হ'য়ে গেছে শুধু ব্রহ্মার কারখানা !

তোমার ভাগ্যে শল্য-শলাট্ শুধু
বিরাট্ বিশ্ব শল্লকী যেন, হায়।
বস্তু পৃথিবী, কত নদী, কত নদ—

বেত্তা তোমার বিত্ত পাবে না দিতে
সত্যি বল তো সত্তা তোমার কোথায় ?
মান-চিত্র তো রৌপ্য ফ্রেমেই বাঁধা।
কলির কেষ্টো নিরেট্ মিষ্টি হাসে
টেরাপ্লেনে চড়ে উধাও হয়েছে রাধা।

অতীত সমাধি চূর্ণ তো হয় দেখি
বেশ তো ছিলো! ঘাঁটাও কেনো যে তাকে
কঙ্কালে তার বিংশ-শতাব্দীর
আলো না লাগ্‌লে ক্ষতি ছিলো না তো মোটে।

দামাস্ক-জড়ানো মনীষা ঘুমোয় আজো।
দৈনিক তুমি এ্যাপ্লিকেশ্যান ভাঁজো।
(কিংবা বিকেলে খানিক শস্তা সাজো,
অকেজো শরীরে সিনেমায় যাও আজো।)

কি হবে, কি হবে বেত্তা তোমার আজ ?
তাস-দাবা নিয়ে মাঝ রাতো কেটে যায়।
গম্ভীর কালো আকাশেতে বাজ-পাখী
লাল ঠোঁট দিয়ে সৃষ্টিকে ঠোকরায়।

মাদামোয়াজেল লাফুজি

প্রিয়রঞ্জন সেন

কলিকাতায় প্রতি বৎসর শীতকালে শিক্ষা ও সম্মেলনের ব্যবস্থা আছে, সাহিত্য, ধর্ম্ম, চিত্রশিল্প, রাজনীতি প্রতি বৎসরই এসকল প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা হইয়া থাকে। কলিকাতাবাসীর সদা-নিদ্রিত চিত্ররসগ্রাহিতা একটু জাগ্রত হয়, এবং দুই তিনটি চিত্র প্রদর্শনীতে লোকের ভিড়ও বেশ দেখা যায়। আমার তো মনে হয়, প্রতি বড় শহরেই এ বিষয়ের পাকা বন্দোবস্ত, অর্থাৎ এক একটি চিত্রগৃহ বা আর্ট গেলারী থাকা উচিত। তাহাতে বহু যুগের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র সুবিন্যস্ত থাকিবে, দেখিয়া লোকে সুন্দরের উপাসনা করিতে শিখিবে। ইউরোপীয় সমাজের রাজনীতি আমরা কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সংসারের সদ্গুণের চেয়ে অসদ্গুণেরই বেশী অনুকরণ হয়,—ভাল জিনিষ অনেক কিছুই আমরা লই নাই, তাহাদের অন্যতম হইল এই আর্ট গেলারী বা চিত্রগৃহ। যদিও ভারতবর্ষের অধুনাতম সংস্কৃতির কেন্দ্র বলিয়া আমরা কলিকাতা শহরের গর্ব করিতে ছাড়ি না, তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কলিকাতায় সেরূপ কিছু নাই। বরোদায় রাজ সরকার হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উৎকৃষ্ট চিত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্দিষ্ট আছে, এবং সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকারও আছে। লখ্নৌ-এর 'তসবীর ঘর' আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য উন্মুক্ত। অবশ্য চিত্র ভবন আছে বলিয়া বরোদার ও লখ্নৌ-এর লোকেরা কলিকাতার লোকের চেয়ে অধিক রসগ্রাহী কি না সে প্রশ্ন এখানে আলোচনা করিব না, কিন্তু একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, সেরূপ চিত্রগৃহ এখানে থাকিলে কলিকাতার জনসাধারণের রসগ্রাহিতা আরও বাড়িতে পারিত।

যাহা হউক, কলিকাতায় শীতকালে যে দুই তিনটি চিত্র প্রদর্শনী কয়েক দিনের জন্য উন্মুক্ত হয়, তাহা মন্দের ভাল, আধুনিক চিত্রশিল্পীদের কৃতিত্বের পরিচয় তাহাতে পাইয়া থাকি। অতীতের না-ই হইল, বর্তমানের শিল্পীদের কিছু কিছু গুণপনা দেখিবার সুযোগ তো পাওয়া যায়। কখনও কখনও শিল্পপ্রেমী ধনী-ব্যক্তি, সাধারণের পরিতোষার্থে আপনার ভাণ্ডার হইতে বিখ্যাত চিত্র এরূপ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেন। সুতরাং এই সময়ে ভাল ভাল ছবি দেখার একটা সুযোগ মেলে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বারো বৎসর পূর্বে সরকারী চিত্রবিদ্যালয়ে এক প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হই। ইংরাজি ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাস। সেবারকার প্রদর্শনীতে বিশেষত্ব ছিল এই যে, মাত্র একজন শিল্পীর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছিল। জনৈক ফরাসী মহিলা ভারত ও তিব্বত ভ্রমণ করিয়া, যাহা তাহার ভাল লাগিয়াছে তাহা তুলির স্পর্শে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য চিত্র-কর্ম ইনি বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী গৃহে মহিলাটী উপস্থিত ছিলেন, তাঁর নাম শুনিলাম, লাফুজি। সুন্দর, সপ্রতিভ, হাসি হাসি মুখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসিক, কথা বলার সময় একটু জোর দিয়া বলা,—এ সকলই বুদ্ধির, সহানুভূতি ও অন্তরের শক্তির পরিচয় দিতেছিল। মনে হইল, শিল্পীর উপযুক্ত আকার বটে।

চিত্রগুলির দিকে তাকাইলাম। শিল্পী বাছিয়া বাছিয়া দুর্গম স্থানেই গিয়াছেন, বৃটীশ আদর্শে গঠিত আধুনিক ভারতীয় শহরের প্রতি তাঁহার তেমন অনুরাগ দেখিলাম না। চিত্রগুলির অর্দ্ধেকের উপর ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ হইতে লওয়া। পিয়ের লোটি যেমন ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষে ভারতের প্রাণ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, চিত্রগুলি দেখিয়া মনে হইল, ইহারও চেষ্টা সেই দিকে। বরোদা রাজ্য, কাশী-রামনগর, কুচ্‌বিহার, গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর

কর্পূরতলা, কাশ্মীররাজ্য (লাদাখ), সিকিম, উদয়পুর, মহীশূর—২৭৮টি ছবির মধ্য হইতে ১৫৩টি ছবি ইহাদের থেকে লওয়া। মহারাজা গাইকোয়াব, রামকুমার কাণ্ডে রাও, রাজকুমারী নির্মলা, লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ—লাফুজি এ সকলই আঁকিয়াছেন, কিন্তু বরোদার অন্য এমন কিছু দ্রষ্টব্য দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য কি লোকযাত্রাব কোনও পবিচয় পাওয়া যায়। কুচবিহারেও তেমনই, শিল্পীব তুলি বেশী দূব চলে নাই। কিন্তু রাজপুতনায় শিল্পী অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন,—মাবাঠা ও বাজপুত সৈনিক, প্রাসাদ ও মন্দির, নর্তকী ও শিশু ক্রোড়ে জননী, ফুলওয়ালী ও পূজক ব্রাহ্মণ, গায়ক ও রাজপরিবাব—ইহাদেব প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইতেছিল।

ছবিব সংখ্যা দেখিয়া বিচার কবিলে বলিতে হয়, তাঁহার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছিল তিব্বত, তাহাব পব ব্রহ্মদেশ, তাহাব পর উদয়পুব। লাফুজির নিকট তিব্বত ভাল লাগিবারই কথা, সে দেশেব সঙ্গে আমাদেব পরিচয় এত অল্প যে সব কথাই নূতন বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্ম দেশ দেখিতে সুন্দব, ভাবত হইতে যেন স্বতন্ত্র, মানুষের রীতি-নীতি, আচাব-ব্যবহাব, দৈহিক গঠন, কিছুই যেন আমাদের সঙ্গে মিলে না। উদয়পুব ভাবতবর্ষেব মধ্যে এত উচ্চস্থান পাইল কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে উত্তব পাইলাম,—"পৃথিবীব বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, ইউবোপের যে-সব স্থান সুন্দর ও দ্রষ্টব্য বলিয়া খ্যাত সে সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু চিতোর ও উদয়পুবেব মত সুন্দর স্থান আব দেখি নাই।"

লাফুজির নিকট কলিকাতা বা পুবী তেমন আমল পায় নাই। দার্জীলিং-এব কুলী, নেপালী গোয়ালিনী, লেপ্‌চা কুলী, সিকিমেব প্রাকৃতিক দৃশ্য, সিকিম হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, উদয়পুরের হাতী পোল ও চাঁদ পোল, সিংহলেব বনে পবিত্যক্ত বাসভূমি, অনুবাধাপুরের ধ্বংসস্তূপ, সিংহলেব কডুবিল্ল নদী, কলম্বো হইতে কাণ্ডীব পথে গ্রামগুলি, চীনা শিল্পী, লাসার কর্মচাবী, তিব্বতী লামা, রিক্কেনগণেব গুম্ফায় সন্ন্যাসিনী, তিব্বতী শিল্পী, গিয়ান্‌ৎসিব কুলী ও টুপি, বর্মী ও কাচীন পাহাড়ের মেয়ে—এই সকল তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল, কারণ ইহাদেব ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন।

চিত্র সম্বন্ধে সমঝদাব বলিয়া দাবী করিতে প্রস্তুত নহি। আমার যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই বলি। আমাদেব দেশে যে দ্রষ্টব্য বস্তু কত রহিয়াছে, সাধাবণ বলিয়া যাহা মনে কবি তাহাব মধ্যেও কত অসাধারণ বস্তু বহিয়াছে সে কথা মনে হইল। সাত সমুদ্র তেবনদী দূব হইতে এই শিল্পী আসিয়া আমাদেব দেশে যাহা দুর্গম, যাহা বড শহরের উপবে নহে, তাহা দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া খুসীও হইয়াছেন, খুসী না হইলে আঁকিবেন কেন? আর আমবা হাতেব কাছে ভাল জিনিস থাকা সত্ত্বেও দেখিয়া দেখিতে চাই না। কুলী ও পুরোহিত, বেপাবী ও সৈনিক, বাজকুমাব ও গাড়োয়ান—শিল্পীব নিকটে উভয়ই সমান অনুবাগের বস্তু—উভয়েবই বৈশিষ্ট্য বহিয়াছে এবং তাহা চোখে ধবা দেয়। তবে শিল্পীর সকল বস্তু দেখিবাব ও বুঝিবার যে সহজ ক্ষমতা ও দৃষ্টি, তাহা আমাদেব মত সাধাবণ লোকের নাই বলিয়া আক্ষেপ করারও হয়তো কোনও অর্থ নাই।

লাফুজিব ছবিগুলি দেখিয়া আব একটী কথা মনে হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশেব এবং বিভিন্ন শ্রেণীব নাবী-মূর্তি তিনি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহাব দৃষ্টি বিশেষ কবিয়া নারীচিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। পুরুষেব দৃষ্টিতে আমবা নাবীর পবিবেষ্টন দেখি, আমরা আমাদেব শক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারি না, কিন্তু নারী কবি বা নাবী শিল্পী যদি নিজস্ব দৃষ্টি লইয়া নারীকে দেখিতে না পাবেন, যেমন পুরুষ কবি বা পুরুষ শিল্পী পুরুষকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তাহা বলা বাহুল্য। লাফুজি নারী শিল্পী বলিয়া সৃষ্টিব যে সকল দিক তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছে আমাদের চোখে সেগুলি হয়তো ধরা পড়িত না। এক এক বিষয়ে দৃষ্টির, অনুভবের ও প্রকাশেব হয়ত ভেদ নাই, কিন্তু বহু ব্যাপাবেই আবার স্ত্রী ও পুরুষের দৃষ্টি, অনুভব ও প্রকাশভঙ্গী যে বিভিন্ন, তাহা অস্বীকার কবিবার উপায় নাই।

সম্প্রতি কোনও বন্ধু বিলাতী ও দেশী কাগজে প্রবন্ধ ও চিত্রাবলী দেখাইয়া জানাইলেন, দুইটী আমেরিকাবাসিনী এদেশে আসিয়া বিভিন্ন জাতীয় (type) নরনারীর মুখ প্ল্যাষ্টারের মূর্তি করিয়া ও চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহাদের দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানে রাখিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ এত বিশাল যে ইহাকে মহাদেশ নাম দিলেও চলিতে পারে, সেই ভারতের বিচিত্র বর্ণ নরনারী সকল দেশের জ্ঞানের ও পরিচয়ের উপযুক্ত বস্তু। কিন্তু প্রদীপের নিকটেই অন্ধকার, ভারতকে জানিবার ও জানাইবার ভার অন্যের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত। শিল্পীর দৃষ্টি স্বতন্ত্র নিশ্চয়, তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের মনে অনুরাগের অভাবও যে যথেষ্ট, তাহা কি অস্বীকার করিতে পারি?

শিল্পীর কথা দূরে থাক, সাধারণ বিদেশীর চোখেও আবার ধরা পড়ি বেশী। সংসারের অনেক ব্যাপারে আমাদের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শক্তি অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা আমাদের নিকট নিতান্তই নিরর্থক। কিন্তু যাহারা নূতন বা প্রথম দেখিতেছে তাহাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সংস্কার-মুক্ত। তাই বিদেশী হয়তো আমাদের চেয়ে আমাদের কথা জানে বেশী। ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচক ইংরেজের চেয়ে ফরাসী বা জার্মানী বা রুষদেশীয় বেশী, বাংলার সম্বন্ধেও হয়তো দূরের লোকই অনেক নূতন কথা বলিতে পারিবেন। এই দিক দিয়া আমাদের নিকট লাফুজির মত চিত্রশিল্পীর পরিশ্রমের দাম আছে—তাঁহাদের দৃষ্টি-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া আমরা নিজদের কথা আরও ভাল ভাবে বুঝিতে পারি।

কিছুদিন পূর্বে জনৈক বিদেশী পণ্ডিত আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একদিনকার বক্তৃতায় দেখাইলেন, সুদূর অতীতে প্রাচ্যের নরনারীর আকৃতি কেমনে দক্ষিণ ইউরোপের চিত্রশিল্পীদের বিষয়বস্তু জোগাইয়াছে। মধ্য-যুগে ইতালীর যে সকল চিত্রশিল্পী প্রভূতি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রাচ্যের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলিতে পারেন নাই। বাইরের প্রভাব দুরতিক্রমণীয়, একেবারে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারা সহজ বা স্বাভাবিক নহে,—তাই জাতিতে জাতিতে বিরোধের শতসূত্র বর্তমান থাকিলেও মিলনের পথে অনবরত আনাগোনা হইতেছে, একথা আমরা ভুলিতে পারি না। বিদেশীর উপর আমাদের প্রভাব, এবং আমাদের উপর বিদেশের প্রভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক রচনার প্রণালী

কালীপদ ঘোষ

ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার স্থান সর্ব্বোচ্চে মনে করিতে সকল বাঙ্গালীর আনন্দ হয়। বাংলাভাষার এই নেতৃত্ব অব্যাহত রাখিতে সকল বাঙ্গালী লেখকেরই অল্প-বিস্তর দায়িত্ব আছে। বর্ত্তমানে এই দায়িত্বের একটা বড় অংশ বহন করিতেছেন চিন্তাশীল বিপ্লবী লেখকরা—যাঁহারা দর্শন, অর্থবিদ্যা, রাজনীতি, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে নূতন নূতন ভাবধারার সহিত বাঙ্গালী পাঠকদের পরিচয় করাইতেছেন। উক্ত লেখকদের কাছে বৈজ্ঞানিক রচনার প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উত্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বপ্রথমে ইহা অবশ্য ধরিয়া লইতে হয় যে, যিনি যে বিষয়ে লিখিতেছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার পর্য্যাপ্ত জ্ঞান আছে, এবং তিনি অবিরত বহির্জগতের চিন্তাধারার গতির সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেছেন। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং সাময়িকী পত্রিকা পাওয়া দুষ্কর, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি পাইবার বাঁধা না থাকিলেও অর্থের অভাবে এবং ভাল পুস্তকাগারের অভাবে সেগুলি অধিক সংখ্যক লোকের হাতে পৌছিতে পারে না। এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিক লেখকদের অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া, অনেক সময়ে অপকৃষ্ট ও অপ্রচুর উপাদান হইতে, গুরুতর বিষয়ের সার সঙ্কলন ও সত্যতা উপলব্ধি করা দরকার হয়। যাঁহারা জাতিকে অভিনব চিন্তায় ও আদর্শে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছ থেকে ইহার কম আশা করা যায় না।

তারপর প্রশ্ন ওঠে, অভিজ্ঞ লেখকেরা কি ভাবে লিখিবেন,—সরল চলিত ভাষায়, না সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধু-ভাষায়? কি উপায়ে চিন্তাধারাগুলিকে বিদেশী ভাষার ও সমাজের ছাপ হইতে মুক্ত করিয়া ভারতের নিজস্ব করা যায়? পুস্তক বা প্রবন্ধাদির বক্তব্য বিষয়কে কি করিয়া লেখকের নিজস্ব করা যায়? বিজ্ঞান-সম্মত রচনার আবশ্যকীয় উপাদান কি? প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য উত্তরগুলি কিছু শেষকথা নয়; ঐগুলি বাংলা লেখকদের এবং পাঠকদের আলোচনার জন্য পরিবেশন করা হইল মাত্র।

ভাষা সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, সাধু ভাষাকে যতদূর সম্ভব চলিত ভাষায় সাজাইতে হইবে। সকল লেখাই শুদ্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু গভীর ও কঠিন চিন্তাগুলিকে সর্ব্বদা কথ্য-ভাষায় রূপ দেওয়া সহজ নয়, সঙ্গতও নয়। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক রচনায় অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ ও শব্দ-চয়ন করার দরকার হয়, তাহাদের সহিত কথ্য ভাষার সুন্দর মিল হইবে না। অন্যদিকে গুরুতর লেখাগুলি সুপাঠ্য এবং সুবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। সে-জন্য চলিত ভাষাকে সুমার্জ্জিত এবং শুদ্ধভাবে লেখাই প্রকৃষ্ট পথ। বর্ত্তমান লেখকের ভাষা এই আদর্শের অনুযায়ী না হইয়া থাকিলে ত্রুটী স্বীকার করা ছাড়া আর গতি নাই, ত্রুটী—লেখকের অপারগতা।

বিদেশী মনিষীদের চিন্তাধারা যে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের আবেষ্টনে প্রচারিত হয় তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য হইলেও, একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সেগুলিকে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের নিজস্ব করা সম্ভব এবং একান্ত আবশ্যক। বাংলা লেখা বাঙ্গালীর জন্য,—যাঁহাদের অনেকে বিদেশী ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কার ও মনোভাবের সহিত যথেষ্ট বা আদৌ পরিচিত নন তাঁহাদেয় জন্য, যাঁহাদের জ্ঞান, বিবেচনা ও কল্পনা-শক্তি স্বদেশীয় সীমায় আবদ্ধ তাঁহাদের জন্য,—ইহা প্রত্যেক রচনার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকা চাই। তাহা হইলে বাংলা রচনা

হইতে বিদেশী চিন্তার আভাষ দূর হইবে। অন্তত অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ভারতীয় সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও অর্থ-সমস্যার আলোচনায় চিন্তাগুলির রূপ দিলে তাহারা ভারতের নিজস্ব হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতের নিজস্ব রচনা হইতে বিদেশী হরফের ছাপা যতদূর সম্ভব দূর করা উচিত। অবশ্য বিদেশী শব্দের ব্যবহার করায় মূলগত দোষ কিছু নাই, কিন্তু অনেক বাংলা রচনায় অনাবশ্যক ইংরাজী শব্দ দেখিয়া নানারূপ সন্দেহ করিবার অবকাশ হয়।

এই যুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন ওঠে যে, বিদেশী চিন্তাধারাকে ভারতীয় লেখকদের নিজস্ব করিবার আর কি পৃথক সমস্যা ও সমাধান থাকিতে পারে? এইখানে আমাদের স্মরণ করা দরকার যে, চিন্তাধারাগুলির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহারা ব্যক্তির ও সমাজের সহিত জীবন্ত-ভাবে সংযুক্ত। বর্ত্তমানে সকল দেশেই ডায়ালেকৃটিক্যাল জড়বাদের প্রচার হওয়ায়, আমরা সর্ব্বদাই নীতি ও কার্য্যের সমন্বয়ের দাবী করিতেছি; যে আরামকেদারের পণ্ডিতেরা শুধু নীতি প্রচার করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সুপরিচিত গ্রন্থকার অথবা পদবীধারী দার্শনিক হউন, তাঁহাদের কথায় নবযুগের নরনারীর শ্রদ্ধা খুব কম। ভারতে ও বাংলায় যাঁহারা সমাজতন্ত্রীয় চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্য নিজেদের প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য্যক্ষেত্র বাঁছিয়া লইবেন। অর্থনীতির লেখকদের শুধু "ক্যাপিটলের" আলোচনায় নিযুক্ত রহিলে চলিবে না, তাঁহারা ভারতীয় অর্থনীতির এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সকল কিছুই জানিবেন এবং সেগুলির সহিত দৈনিক সংযোগ রাখিবেন। অনুধ্যান, অনুধাবন এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়া, শুধু অর্থনীতি নয়, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমালোচনা, সংবাদ-পত্র সেবা প্রভৃতি সকল জীবন্ত আন্দোলনের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা—শুধু তাঁহারাই—দিগ্-পারের চিন্তাসমূহ পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবেন, এবং তাঁহাদের কথা ও লেখাগুলি তাঁহাদের নিজস্ব ছাপ বহন করিবে।

বিজ্ঞান-সম্মত রচনা সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসারে হওয়া চাই। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার অনুসন্ধানকারীরা যে-রূপে সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, এবং সিদ্ধান্তগুলিকে সকল প্রমাণ ও যুক্তি সমাবেশ সহকারে জগতের সমালোচনা ও পর্য্যালোচনার জন্য প্রকাশ করেন, বৈজ্ঞানিক রচনার জন্য সেইরূপ শ্রম ও চিন্তা স্বীকার করা আবশ্যক। লেখকদের যুক্তি ও মন্তব্য পাঠকদের কবছে অকাট্য বলিয়া উপস্থিত করিতে হইলে, যে সকল ঘটনা, সংখ্যা, উক্তি তাঁহারা কাঁচামালরূপে ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি সাধারণকে জানাইতে হইবে। যে কোন এক-জনের মত, অপর যে কোন একজনের মতের সমতুল্য, কিন্তু যিনি প্রমাণাদি সহ মত প্রকাশ করেন তাঁহার উক্তিতে লোকের আস্থা হয় বেশী। একটা তুলনা দেওয়া যাক্: বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকার অহোরাত্র বলিতেছেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কোণের আড়ালেই সু-দিন অপেক্ষা করিতেছে, অর্থনৈতিক দুর্গ্রহের কোনও লক্ষণ নাই। কিন্তু তাঁহাদের উক্তির মূল্য কি? অতি সাধারণ বুদ্ধির লোকেও ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারে যে, যুদ্ধ-সামগ্রীর জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা সত্বেও বিলাতে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে, অর্থবিদ্যার ও ব্যবসায়ী মহলের পত্রিকাগুলির নির্ঘণ্ট ক্রমাগত বাণিজ্যসামগ্রীর আকার ও মূল্যের সংকোচ দেখাইতেছে, তাহাদের যুক্তি অখণ্ডনীয়। অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রণালী রাজনৈতিক ব্যাপারেও প্রয়োগ করা যায়। একটি কথা এখানে বলা দরকার: লেখকেরা যখন কোন সংখ্যা বা উক্তির উল্লেখ করেন, তখন কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন অবশ্যই জানাইবেন। এই নিয়মটি বৈজ্ঞানিক রচনার পক্ষে একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম মাত্র। ভারতীয় সম্পাদকেরা তাঁহাদের লেখকদের কাছ হইতে সর্ব্বদা ইহার দাবী করিবেন।

আর দুইটি মন্তব্যের সাথে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি হইবে। সকল বৈজ্ঞানিক লেখাতে যুক্তির ও অনুভূতির

পরিমিত ব্যবহার থাকা চাই। নিরস রচনা পড়িয়া অতি অল্প লোকের মনে কার্য্যকরী প্রেরণার বা আবেগের উদ্রেক হইবে। আবার আবেগ মত উত্তেজক রচনায় লোককে অল্পকালের জন্য মাতাইয়া তোলা সম্ভব হইলেও তাহার প্রভাব কখনও স্থায়ী হয় না। সবল লেখনী পাঠকদের মগজ ও হৃদয় দুইয়েরই খোরাক জোগাইবে।

নবযুগের সমাজতান্ত্রিক লেখকরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে তাঁহারা অনতিভবিষ্যতের বিজয়ীদলের পক্ষে সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরাজয় সূচক অভিমত প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। যদি তাঁহারা কোন সময়ে ক্ষণিক পরাজয় বা অবসাদের কথা লিখিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে অবিলম্বে ভাবী জয়ের নিশ্চয়তা ও পন্থার নির্দ্দেশ করিতে ভুলিবেন না। একটু চিন্তা করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, সমুদয় মার্কস্‌পন্থীরা এই-ভাবে লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন। পরাধীন ভারতের জনগণ, চীনের জর্জ্জরিত অধিবাসীবৃন্দ, আফ্রিকার কৃষ্ণ-কায়ের দল, ইয়োরোপ-আমেরিকার শ্রমজীবিগণ—সকলকে ভবিষ্যৎ তাহাদের বলিয়া জানাইবার এবং বিশ্বাস করাইবার ভার চিন্তাশীল লেখকদের হাতে। আজ যাঁহারা বাংলায় লিখিতেছেন তাঁহারা এই দায়ের কথা উপলব্ধি করিয়া লেখনী চালনা করিবেন—ইহাই বাঞ্ছনীয়।

পরজন্ম সত্য হ'লে—

বুদ্ধদেব বসু

পরজন্ম সত্য হ'লে
আমার অন্তত যেন এই হয়ঃ
বুদ্ধি যেন অল্পই থাকে, আর বিদ্যে এই পর্যন্ত
যাতে আড়াই মিনিটেই নাম সই করতে পারি।
ইদিকে হিসেবে পাকা,
নিজের লাভের হিসেবে বিশেষ ক'রে।

চৌরাস্তার মোড়ে
যেখানে ট্রামের বদলি
যেখানে ভোরথেকে লোকের আশা-যাওয়া
রাত দশটাতেও থামে না,
সেখানকার ফুট্‌পাতে
একটা কাগজের ষ্টল যেন হয় আমার,
একটা কাগজের ষ্টল আমার হয় যেন।
তা'হলে চটে ব'সে ব'সে সারাদিন টাকা বাজাতে
পারবো,
পাঁচশো সিকি, তিনশো আধুলি, আরআনি দু'যানি,
পয়সা তো অগুনতি
আমার চটের নিচে জমা আছে সব সময়।
তা'হলে তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তার চটি পদ্যের
বইখানা আমার কাছে দিতে এলে
গম্ভীরমুখে তাকে বলতে পারবোঃ 'ও রেখে কী হবে,
একখানাও বিক্রি হবে না।'
আর তখনকার শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
মাসিকপত্রগুলো ঘাঁটতে চায় যদি
তবে—আচ্ছা, দয়া ক'রে তাকে ঘাঁটতে দেবো—
বাধা দেবো না।

গাঁ-ছাড়া করার জের

শ্রীকালিপদ ঘোষমজুমদার

গল্প

হরনাথ বাবুর ছোট ডিস্‌পেনসেরীটা লোকে বোঝাই, কিন্তু কাহারও মুখে একটু টু শব্দও নাই, কেবল ডাক্তারবাবুর হাতের হুঁকার "গুড়-গুড়" শব্দটা ঘরময় নাচিয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া আছে—যে তিনি কি বলেন। হরনাথবাবু হুঁকা হইতে মুখটা একটু তুলিয়া লইয়া বলিলেন :

—"তা হলে রহমৎ কি বলো? খ্রণসালিসীতে তোমরা যাবে কি না তাই শুন্‌তে চাই—।"

রহমৎ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"বাবু, কি করি, আপনার কথাটা না রাখলেও চলবার নয় আবার ওদিকে দালাল মশায়ের কাছেও সময় অসময় যেতে হয়—তাই তো, কি বা করি।"

হরনাথ বাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন—"হ্যাঃ, ঠ্যাকা-বাধা। ঠ্যাকা বাধার জন্য কি আমার কাছে তোমাদের আস্‌তে হয় না?" রহমৎ বিনীত ভাবে উত্তর দিল—"আঁজ্ঞে তাও হয় বই কি—।" "তবে। যা বলি তাই শোনো। এই ভাখো, প্রায় দেড়শো টাকা, যদি মহেন দালাল নালিশ করে তবে তোমারও গরুবলদ তার ঘরে তো নেবেই—তোমার ভিটেয়ও ঘুঘু চড়াবে, বুঝলে?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরনাথবাবু আবার নিজে নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ব্যাটা সুবি। ব্যাটার বাড়ীতে তো বারো মাসের তেরো-পার্ব্বনের একটারও নামগন্ধ নেই, বল্‌লাম যে একবার সবাই মিলে বারোয়ারি দোল করা যাক্, তাতে ব্যাটা বল্‌লো কিনা—আমি এক পয়সাও দিতে পার্‌বো না। কথার আক্কেল ছাখ্। যে কাজই আমরা কর্‌তে যাবো ঐ ব্যাটাই হবে তার শত্তুর, মনে ভেবেছে বনে বুঝি আর বাঘ নেই। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি বাঘ আছে কি না। আমার নাম হরনাথ সরকার, দশ-বিশ গাঁয়ের লোক আমার ওষুধ খেয়ে বাঁচে, তাদেরকে দিয়ে আমি ওকে গাঁ-ছাড়া কর্‌বো।"

ফরাসের এক কোণে মাটিতে ফকির নামে বাইশ তেইশ বৎসরের এক মুসলমান যুবক বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হরনাথ বাবুর হুঁকার মাথা হইতে কল্‌কেটা নামাইয়া তাহার হাতে দিয়া হুঁকাটা এক পাশে রাখিয়া দিলেন। ফকির কল্‌কেতে প্রথম এক টান মারিয়াই বুঝিল—ডাক্তার বাবু সবটুকু তামাক পোড়াইয়া তবে কল্‌কেটা নামাইয়া দিয়াছেন।

কল্‌কেটা পুনরায় ঢালিয়া সাজিবার জন্য ফকির উঠিয়া বাহিরে বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। ঘড়ের ভিতর অনেকেই চুপি চুপি কথা বলাবলি করিতে লাগিল। হরনাথবাবু আবার বলিয়া উঠিলেন—"রহমৎ, মোবারক, আব্বাচ, তবে তোমরা সকলে ঠিকই খ্নাসালিসীতে যাবে, ক্যামন?"

ডাক্তারবাবুর কথায় কেহ হাঁ-না কোন জবাব দিল না, পূর্ব্বের মতই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ইহার ভিতর ফকির কল্‌কেটা নূতন করিয়া সাজাইয়া মুখ দিয়া ফু দিতে দিতে আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ফকির ভিতরে আসিয়া কল্‌কেটা আবার ডাক্তারবাবুর হাতেই দিল। ডাক্তারবাবু বামহাত দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া ডানহাত দিয়া কল্‌কেটা হুঁকার মাথায় বসাইলেন, তারপর ফকিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ফকরে ব্যাটা বাজি আছিস্ তো—?"

ফকির তাহার পূর্ব্বের জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"বাবু, দালাল মশায়ের খেয়েই মানুষ, তার খেয়ে কি করে তাকে ফাঁকি দেবো?"

হরনাথ বাবু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে

ব্যাটা তাকে ফাঁকি দিতে যাবি ক্যানো। ঋণসালিসীতে গেলে কি ফাঁকি দেওয়া হয়? তা—না—। ঋণ-সালিসীতে গেলে তোর টাকার কিস্তি হবে অনেক দিনের, তাতে তোরই হবে খুব সুবিধে। ধীরে ধীরে টাকা দিতে পারবি, একবারে আদায় করতে পারবে না, বুঝ্‌লি?"

ফকির বলিল—"আঁজ্ঞে কথাটা তাহলে দালাল মশায়কে একবার জিজ্ঞেস্ করা ভাল।"

—"তাকে আবার কি জিজ্ঞেস করবি? তুইতো আর একা নস্। রহমৎ, মোবারক এরা সবাই তো যাচ্চে।"

—"আজ্ঞে সবাই যদি একাজ করে তবে আমিও করবো, কিন্তু বাবু, আমরা চাষাভূষা মানুষ, সময়ে অসময়ে, বিপদে আপদে দালাল মশায়ের কাছে হাত পাততে হয়, শেষে যেন ভাতে না মরি কর্ত্তা।"

—"না রে না, ভাতে আবার মরবি কি। আর তুইতো একা ঋণসালিসীতে যাচ্চিস্‌নে, সবাই যাচ্চে। তুই ভাতে মরলে ওরা মর্‌বে না? ভাতেই যদি মরবে তবে ওরা কি একাজ কর্‌তে কেউ রাজি হতো?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরনাথ ডাক্তার আবার বলিতে লাগিলেন—"তোরা এতো ভয় পাচ্ছিস্ কেনো? মহেন দালাল এতে যদি কোন দিন তোদের এক পয়সা দিয়েও সাহায্য না করে, তবে আমার কাছে আসিস্, যা, হলো তো?"

শীঘ্রই মহেন দালাল শুনিতে পাইল যে তাহার সমস্ত খাতকেরা ঋণসালিসীতে যাইবে। কথাটা প্রথমে তাহার মোটেই বিশ্বাস হইল না, কিন্তু যখন জানিতে পারিল হরনাথ ডাক্তার তাহার উপর আক্রোশ বশতঃ তাহারই সমস্ত খাতকদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে—তখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না।

দালাল মহাশয়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ। দশ বারো বৎসর করিয়া সব কিস্তি! সব টাকাই বুঝি মারা গেল। সে আহার নিদ্রা একরকম ত্যাগ করিয়া খাতকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। খাতকেরা তাহাকে বাড়ী মুখে আসিতে দেখিয়া, কেহ অন্য বাড়ী গিয়া লুকাইল,কেহ বা ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়াই ছেলেপিলে দিয়া জানাইল—বাড়ী নাই। আবার চক্ষু লজ্জার খাতিরে অনেকেই তাহাকে মুখ দেখাইতে পারিল না। হঠাৎ যাহাদের সাথে দেখা হইল, তাহারা কোন কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিল না। দালাল মহাশয় সমস্ত সুদ রেহাই দিয়া শুধু আসল টাকা লইতে চাহিল, এমন কি অনেককে আসল টাকা হইতেও কিছু বাদ দিয়াও লইতে চাহিল, কিন্তু হাঁ-না কেহ কিছুই বলিল না।

পরদিন বৈকাল বেলা দালাল মহাশয় চাকরটাকে সাথে করিয়া পালানের তামাক গাছগুলির তত্ত্বাবধান করিবার সময় ফকিরকে বাড়ীর নীচের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে ফকির। তুইও নাকি ঋণসালিসীতে যাচ্ছিস্? তোর টাকার জন্য কি আমি কোনদিন তাগিদ করেচি? হাঁরে।"

ফকির আমতা আমতা করিতে লাগিল, দালাল মহাশয় আবার বলিল: "আমার কাছে কি তোর আর কোনদিনই ঠ্যাকা পড়বে না রে? মনে করে দ্যাখ্‌তো সক্কাল বেলা উঠেই তোকে আমার বাড়ীতে আসতে হয় কি না?

ফকির মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল: "আঁজ্ঞে তা তো হয় ই, তবে "

দালাল মহাশয় ফকিরকে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে,শুধু টাকা পয়সা দিয়া নহে, চাল ডাল ইত্যাদি যখন যাহা দরকার হয় তাহা দিয়াই। আজ সেই অকৃতজ্ঞ সামান্য কয়েকটী টাকার জন্য, কুচক্রীদের দলে যোগ দিয়াছে। দালাল মহাশয়ের মুখখানি ঘৃণায় বিকৃত হইয়া উঠিল, ফকিরের সাথে আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া নিজের কাজে মনযোগ দিল। ফকির ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পল্লীর অশিক্ষিত সরল কৃষকেরা হরনাথ ডাক্তারের কথায় মাতিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল ডাক্তারবাবুর পরামর্শ তাহাদের মঙ্গলজনকই হইবে, কিন্তু ইহার পরে ক্ষেত বুনোনের সময় যে অর্থের অভাবে বিপদে পড়িতে হইবে তাহা তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিল না। তাহারা

হরনাথ বাবুকেই একমাত্র হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া মনে করিল। এদিকে হরনাথ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন না যে কৃষকদিগকে মহেন দালালের বিরুদ্ধে যেভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন সে উত্তেজনার ফল একদিন তাঁহাকেও ভোগ করিতে হইতে পারে। তিনি মনে করিলেন, ইহারা চিরদিনই তাঁহার অধীনে থাকিবে এবং যাহা বলা যাইবে তাহাই করান যাইবে। নিজের হীন আক্রোশ চরিতার্থ করিবার মানসে ফলতঃ তিনি কৃষকদিগকে হিন্দুর সাথে বিবাদ করিতে সাহস জন্মাইয়া দিলেন। ইহাতে হিন্দু মুসলমানে বিবাদের অঙ্কুর রোপণ করা হইল।

* * * *

জমি বুনিবার সময় আসিল, কৃষকেরা মহেন দালালের দরকারটা এই সময় বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিল। বুনোনের সময় তাহারা পাট, ধান, তিল প্রভৃতির বীজ ক্রয় করিবার জন্য দালাল মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা ধার লয় এবং উক্ত ফসলাদি বিক্রয় করিয়া পুনরায় ধার শোধ করিয়া থাকে, কিন্তু এবার তাহারা টাকা পাইবে কোথায় তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া একদিন হরনাথ বাবুর নিকট পরামর্শ লইতে গেল।

হরনাথ বাবুর নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া রহমৎ, মোবারক প্রভৃতি মহেন দালালের নিকট টাকা ধার করিতে আসিল কিন্তু দালাল মহাশয় জবাব দিল যে তাহার নিকট আর টাকা ধার মিলিবে না,—হরনাথ ডাক্তারের ঘরেই তো তাহাদের জন্য টাকা মজুত রয়েছে।

মহেন দালালের উত্তর শুনিয়া রহমতেরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিল। এদিকে বছর শেষ হইয়া যায় অথচ, জমি বুনোনের কোন উপায় হইল না দেখিয়া টাকার জন্য একে একে সবাই হরনাথ বাবুকে উত্যক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু হরনাথ বাবু তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে দালাল মহাশয়ের বাড়ী যাইয়াই বার বার কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল কিন্তু দালাল মহাশয় অটল, তাহাদের কথার দিকে কর্ণপাতই করিল না। সোজা বলিয়া দিল—"তোমাদের পরামর্শ-দাতার নিকট যাও।"

দুইচারজন কৃষক যাহারা দালাল মহাশয়ের দিকেই ছিল, তাহারা কিছু কিছু ধার পাইল, কিন্তু যাহারা হরনাথ ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়াছিল তাহারা কোন সাহায্যই পাইল না, ফলে তাহাদের জমি এবারে পতিত থাকিবার উপক্রম হইল। তাহারা এবার হরনাথ বাবুর উপর চটিয়া উঠিতে লাগিলেন, কৃতকর্ম্মের ফল যে কি তাহাও কিছুটা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

হরনাথবাবু ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। প্রধান প্রধান দুইচারজনকে অন্ততঃ হাতে না রাখিলেই নয়, তাই এক কৌশল আঁটিলেন। রহমৎ এবং মোবারককে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি তো তোমাদিগকে টাকা দিতে নারাজ নই আর ধার শোধ যখন করবেই, তখন আমাকে টাকা দিতেই হবে, তবে একটা কথা, দলিলপত্তর রেখে টাকা ধার দেওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। কিছু গয়না-টয়না বন্ধক রেখে টাকা দেওয়াই আমি পছন্দ করি, আর এটা খাতকের পক্ষে সুবিধেও বটে, কারণ গয়নাটা বাঁধা থাকলে মাথায় ধার শোধ করবার একটু চাড় থাকে,—আর, তা'তে সুদ গুনে গুনে মরতে হয় না, বুঝলে?"

সরল কৃষকেরা ভালমন্দ কিছু বিবেচনা না করিয়া, যাহার ঘরে সোনারূপার যে গহনাই ছিল তাহা লইয়াই হরনাথ বাবুর বাড়ী আসিতে লাগিল। হরনাথ বাবু প্রত্যেক গহনা ওজন করিয়া উহার মূল্যের এক চতুর্থাংশ টাকা ধার দিতে লাগিলেন। কৃষকেরাও অভাবে পড়িয়া যাহা পাইল তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল—কেহ কোন আপত্তি করিল না। হরনাথ বাবু নিজের বাড়ীর সমস্ত গহনা সেঁকরার দোকানে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া, সেই টাকা দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে গহনা, এমন কি ঘটিবাটীও বন্ধক রাখিতে লাগিলেন।

* * * *

সমস্ত মাঠ ধু ধু করিতেছে। দেশে বৃষ্টি নাই। ক্ষেতে অজন্মার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, পল্লীবাসী কৃষকদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সকলে ভগবানের নিকট বৃষ্টি হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু ফল কিছু হইল না। ধীরে ধীরে ক্ষেতের ফসলগুলি প্রখর রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া মরিয়া যাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি হইতে লাগিল কিন্তু তাহার সাথে বর্ষাও আসিয়া পড়িল। সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায়, ধান, পাট প্রভৃতি কোন ফসলই বৃদ্ধি পাইতে পারিল না, সুতরাং অল্প দিনের ভিতরই বর্ষার জলে সমস্ত ফসল ডুবিয়া গেল এবং মাঠগুলি এক বিস্তৃত নদীর মত দেখা যাইতে লাগিল। কৃষকেরা বুঝিল, বর্ষার পর দেশে ভীষণভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিবে।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝিই বর্ষার জলে গ্রামের নালা ডোবা সব ভরিয়া গেল। মাঠের অবস্থা হইল অত্যন্ত খারাপ, নীচু জমিগুলির ফসল সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া গেল। ডাঙা জমিতে জল উঠিতে বিলম্ব হওয়ায় উহার ফসল ডুবিলনা বটে, কিন্তু অপরাপর বৎসরের অনুরূপে যথেষ্ট কম জন্মিল।

পাড়াগাঁয়ে প্রায় চার পাঁচ মাস বর্ষা, এই সময়ে পল্লীবাসী দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ কাহারও যদি নৌকা না থাকে তবে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। এই ভরা বর্ষায় মহেন দালালের ঘাটের ডিঙিখানা একদিন রাত্রে উধাও হইয়া গেল। ডিঙির খোঁজ করিতে করিতে আবার গোয়াল হইতে গরু দুইটাও চুরি হইয়া গেল। দালাল মহাশয় বুঝিতে পারিল যে তাহার বিপক্ষীয় দলের লোকই চক্রান্ত করিয়া সব করিতেছে।

থানায় এজাহার দেওয়া হইল। দারোগাবাবু এবং দুইএকজন কনষ্টবলের আগমন হইল, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া তুষ্ট করিয়াও কোন ফল হইল না। বর্ষা কাটিয়া গেল, তবু ডিঙি কি গরুর কোন খোঁজ মিলিল না। হরনাথ বাবু মুচ্‌কী হাসিয়া রহমতকে বলিলেন "দারোগা বাবু যে সম্পর্কে আমার মাস্‌তুত ভাই।"

বর্ষা কাটিয়া গেল, ডাঙ্গা জমিগুলিতে দুইচারটা ধান যাহা ছিল কৃষকেরা তাহা কাটিতে আরম্ভ করিল। মহেন দালালের যথেষ্ট আবাদী ক্ষেত ছিল। তাহার দুই-চারখানিতে যে ধান ছিল তাহাতেই তাহার বৎসর কাটিয়া যাইত, কিন্তু বাড়ীতে ধান আনিবার পূর্ব্বেই ক্ষেত হইতে প্রায় অর্দ্ধেক ধান চুরি হইয়া গেল। নীচু জমিগুলিতে মাসকলাই বোনা হইয়াছিল, তাহাও রাতারাতি গরু দিয়া কাহারা যেন খাওয়াইয়া এক রকম শেষ করিয়া ফেলিল। দালাল মহাশয় কেবল পর পর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। গ্রামের ভিতর একা, কেহই তাহাকে সাহায্য করে না, একা বিত্তশালী লোক হইয়াও সে নিঃসহায় হইয়া পড়িল। থানাতে এজাহার দিয়াও কোন ফল হয় না, দারোগাবাবু কেবল নিমন্ত্রণ খাইয়া সেলামী লইয়া চলিয়া যান। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও হরনাথ ডাক্তারের দলের লোক। নিজ গ্রামে কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভিতর তাহার কোন স্বজাতিও নাই যে তাহাকে সাহায্য করিবে। বাড়ীতে সে একা বৃদ্ধ মানুষ, তার স্ত্রী এবং এক বিধবা কন্যা। জমিজমার তদারক, টাকা পয়সা লগ্নি, এসব তাহাকে একাই করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় তাহার উপর যে অত্যাচার হইতে লাগিল তাহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। অত্যাচারের কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া গ্রামের উপর তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া যে কয় দিন বাঁচে সহরে যাইয়া বাস করাই শ্রেয়ঃ। আজ অত্যাচার হইতেছে বাইরে, কাল যে বাড়ীতেই হইবে না তাহাই বা কে জানে। সহরে গেলে হয় ত দুই চারজন আত্মীয় স্বজনও মিলিবে, নিজের ছেলে পিলে নাই, আর কাহার জন্যই বা জমিজমা আগ্‌লাইয়া পড়িয়া থাকা। টাকা? সেইত যাহা ছিল এক রকম নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া সকলে কিস্তি দিবে, তাহাও কেহ আট আনা, কেহ এক টাকা, কেহ বা বড় জোর দুই টাকা—উহা না পাইলেও তাহার কোন

ক্ষতি হইবে না। তারপর তাহার যদি আজ দুই চক্ষু বন্ধ হয়, তখন তাহার বৌ এবং মেয়ের কি হইবে? কে তাহাদিগকে দেখিবে? হয়ত তখন তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচারও হইতে পারে।

* * * *

রাত এগারটা। হরনাথ বাবুর ডিস্‌পেন্‌সারীতে জন পাঁচ ছয় লোক বসিয়া বিশেষ কোন পরামর্শ করিতেছে। তিন দিকে দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ, কেবল এক দিকের দরজার একখানা কবাট একটু ফাঁক। হরনাথ বাবু ঘরের মধ্যে পাইচারী করিতেছিলেন, ধীরে ধীরে দরজার নিকট আসিয়া কবাটখানা একটু ফাঁক করিয়া দেখিয়া আবার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন:

—"ছাখো যা বলি তাই করো। দালালের বাড়ী গিয়ে ধারে বীজ কিনতে চাও, যদি আপত্তি করে তবে কোনো কথা না শুনে সবাই মিলে ওর চিনার বীজের মোগড়াটা খুলে লুট করে নিয়ে যাবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমি বলচি, ছাখো না, তার ডিঙিখানা, গরু দুটো—কেমন? কি করতে পারলো? তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। যদি মামলাই করে আমি তোমাদের বিনা পয়সায় মামলা করিয়ে দেবো। তোমাদের বাঁচাতে যা কিছু করতে হয়,আমি তাই করবো, তোমাদের কোনো ভয় নেই।"

হরনাথ বাবুর কথায় প্রথম কেহ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন: "তোমরা এতো ভয় পাচ্চো কেনো? কয়েকটা কাজ তো করলেই, তবুও সাহস পাচ্ছো না?"

রহমৎ বলিল, "আঁজ্ঞে তাতো বটেই কিন্তু আমি নিজে এর ভেতর থাকতে পারবো না।" হরনাথ বাবু বলিলেন "আহা! তুমি নিজেই যে থাকবে তা কে বললো?

তুমি ওদের লাগিয়ে দেবে। তুমি তাদিগকে একটা কিছু বললে ওরা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর একাজ না করলে তোমাদের ক্ষেত পতিত থাকবে। বীজ পাবে কোথায়? তুমি একা না হয় বীজ কিনতে পারবে কিন্তু আর আর সকলে তো তা পারবে না, ক্যামন?"

রহমৎ বলিল—"আঁজ্ঞে তা তো বটেই—!"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল, হরনাথবাবু বলিলেন—"তাহলে তাই যাও। রাত ঢের হয়ে গেছে, আর বসে থেকে কি হবে?"

দিন দুপুরে মহেন দালালের তিনটী মোগড়ার বীজ লুট করিয়া লইয়া গেল। দালাল মহাশয় কোন বাধা দিতে পারিল না। আর একা বাধা দিয়াই বা এতগুলি লোক ঠেকাইবে কিরূপে? গ্রামে তাহার সাহায্য করিবার কেহই নাই। পাড়া-প্রতিবেশী দুইচার ঘর যে হিন্দু আছে তাহারাও হরনাথ বাবুর বশীভূত। কোন উপায় নাই, ঘরে বসিয়া দালাল মহাশয় দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে বলিতে লাগিল আর না, ঢের হইয়াছে! ইহার পরও যদি সে এই গ্রামে থাকে, তবে হয়ত উহারা একদিন তাহাকে মারিয়া ফেলিবে, তাহার চেয়ে শীঘ্রই বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া সহরে চলিয়া যাওয়া উচিত।

থানায় এজাহার দেওয়া হইল। দারোগা কনষ্টবল প্রভৃতি তদন্তে আসিল। দালাল মহাশয় লুণ্ঠনকারীদের যে কয়েকজনকে মনে পড়িল তাহাদের নাম আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিল।

পনের দিনের ভিতরই দালাল মহাশয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন লোকের নিকট জমি এবং বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এ গ্রামে আর থাকিবে না, সহরে যাইয়া বাড়ী করিয়া বসত করিবে।

নির্দ্ধারিত দিনে তিনখানা গরুর গাড়ী আসিয়া বাড়ীর নিম্ন কক্ষে দাঁড়াইল। জিনিষপত্তর পূর্ব্বেই গোছান হইয়াছিল, সুতরাং অল্প কিছুক্ষণের ভিতরই সেগুলি গাড়োয়ানেরা গাড়ীতে তুলিয়া ফেলিল। স্ত্রী এবং মেয়েকে এক গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া দালাল মহাশয় বাড়ীর ভিতর শেষ একবার ঘুরিয়া আসিয়া গাড়োয়ানদিগকে গাড়ী চালাইতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাহার দুই চক্ষে জল আসিল। বাপ-দাদার

ভিটা, জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, তাহাকে যাইতেই হইবে।

গাড়ী রওনা হইল, দালাল মহাশয় তাহার সাথে সাথে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া বাড়ীর দিকে তাকাইতে লাগিল। তিনখানা গাড়ী ক্যাঁ কোঁ করিতে করিতে গ্রাম ছাড়িয়া ধীরে ধীরে মাঠের ভিতর হালটে আসিয়া পড়িল। যতক্ষণ চক্ষের অন্তরাল না হইল দালাল মহাশয় ততক্ষণ পিছনের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বাড়ীখানা দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন একটা মোড় ঘুরিয়া বিলের ধারের পথ ধরিল, তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—যে অন্যায় অত্যাচার করিয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিল, ভগবান যেন তার বিচার করে।

সহরে আসিয়া যে কয়েক দিন মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইল, সে কয়েক দিন দালাল মহাশয়কে একটা বাসা ভাড়া করিয়াই থাকিতে হইল। মোকদ্দমাতে তাহার যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইল, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ওদিকে আসামী পক্ষে যথেষ্ট খরচ হইল এবং বাধ্য হইয়া হরনাথ বাবুকেই প্রায় সমস্ত টাকা ব্যয় করিতে হইল, কারণ তিনি নিজেই যুক্তি দিয়া উহাদিগকে দিয়া মহেন দালালের চিনার বীজ লুট করাইয়াছিলেন। এখন যদি তিনি উহাদিগকে না বাঁচান তবে হয়ত উহারা তাঁহার উপরেও অত্যাচার করিতে পারে। হরনাথ বাবু নিজে উহাদিগকে যে পথ দেখাইয়াছেন—তাহাতে উহারা তাঁহার নিজের জীবনই একদিন যে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে তাহা পূর্ব্বে তাঁহার ধারণাতেই আসে নাই। এখন সে সেই ভয়ে টাকা পয়সা দিয়া উহাদিগকে কয়েদ ভোগ হইতে বাঁচাইয়া আনিলেন, তবু সব দিকে কিছু কিছু জরিমানা দিতে হইল।

মাস তিনেক পরে, আবার যখন আবাদের সময় আসিল, হরনাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইলেন, কারণ বুঝিলেন যে সবাই টাকা ধার করিতে আবার আসিবে। মামলার সময় যে টাকাগুলি দিতে হইয়াছে তাহার জন্যই তাহার অনুতাপ হইতেছিল।

কৃষকেরা কয়েদ ভোগ হইতে বাঁচিয়াছিল বটে কিন্তু হরনাথ বাবুর যুক্তিতে যে কাজ করিয়া, যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল, তাহাতে অনেকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জমি বুনুনির সময় আসিল, কিন্তু হরনাথ বাবুর নিকট আর টাকা পয়সার সাহায্য পাইবে না জানিয়া তাহারা তাহাদের বন্ধকী গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া হরনাথ বাবুর টাকা শোধ দিয়া বাকি টাকা লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু হরনাথ বাবু উহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, হাওলাতি টাকা এবং মোকদ্দমার খরচের জন্য গহনা আয়বাদ গেছে। কিন্তু কৃষকেরা তাহা মানিতে চাহিল না। তাহারা গ্রামের ভিতর ইহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল, শেষটা হরনাথ বাবুর সাথে বিবাদ আরম্ভ হইল। তাহারা সভা করিয়া ঠিক করিল—কেহই হরনাথ ডাক্তারের কোন কাজ করিতে পারিবে না, এমন কি জমিও কেহ বর্গা চষিতে পারিবে না। এই নিয়মের যে অবাধ্য হইবে তাহাকে সমাজে ঠেকাইয়া রাখা হইবে।

করিম প্রামাণিকের বার তের বৎসরের ছেলে রহিম হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাকুরী করিত। সভার পরদিন করিম হরনাথ বাবুর বাড়ী যাইয়া ছেলেকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল। মাহিনা বাবদ কিছু বাকি ছিল বলিয়া দিন দুই পরে, করিম ছেলেকে টাকা চাহিয়া আনিবার জন্য হরনাথ বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

হরনাথবাবু স্নান শেষ করিয়াছেন—খাইতে যাইবেন, এমন সময় রহিম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। হরনাথ বাবু রহিমকে দেখিয়া বলিলেন—"কি? তুই যে আবার?"

রহিম উত্তর করিল—"বাবু আমার মাইনেটা।"

—"মাইনে। মাইনে কিসের? কাজতো ছেড়েই দিয়েছিস্।"

—"আজ্ঞে এ মাসের যে-ক'দিন খেটেছিলাম তার তো কিছু চাই!"

মুখ ভ্যাংচাইয়া হরনাথ বাবু বলিলেন। "আরে যাঃ যাঃ। ব্যাটাদের ভাতে মারতে হবে, ভেবেছিস্ কি?'

রহিম বলিল: "বাবু আমি ছেলে মানুষ, ওসব জানিনে, দয়া করে আমার পাওনাটা "

বাধা দিয়া হরনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঃ। ব্যাটা কিছু জানে না। ন্যাকামো করতে এসেছে এখানে।"

সাথে সাথে রহিমের গালে চটাং করিয়া এক চড় পড়িল।'

রহিম অবাক হইয়া গেল, হরনাথ বাবু তাহার ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন: "বেরো, বেরো বলচি। টাকা পয়সা কিছুই পাবিনে।"

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হরনাথ বাবু তাহার গালে আর একটা চড় মারিয়া বলিলেন: "বেরোলি নে? তবে রে হারামজাদা।"

পা হইতে এক পায়ের চটি তুলিয়া লইয়া রহিমকে প্রহার করিতে করিতে বাড়ীর নীচে নামাইয়া দিল।

করিম কেবলমাত্র মাঠ হইতে ফিরিয়াছে, মাঠের উত্তপ্ত রৌদ্রতাপ তাহার শরীরকে যে উত্তপ্ততর করিয়াছিল সেভাব এখনও যায় নাই। কাঁধ হইতে লাঙ্গল নামাইয়া বলদ দুইটা গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিয়া, করিম তামাক খাইবার জন্য কল্‌কেটা ঢালিয়া সাজাইতেছিল, এমন সময় রহিম চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

করিম বলিল: "কিরে কাঁদছিস্ কেন? টাকা পেলি?"

রহিম তাহার বাবাকে কোনো রকমে বলিল—সে টাকা তো পায়ই নাই, আরও মার খাইয়া আসিয়াছে।

করিমের মাথাটা রৌদ্রের তাপে চড়া হইয়া আসিয়াছিল—তাহার উপর ছেলের মার খাওয়ার কথা শুনিয়া আরও চাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল: "কে মেরেচে? কই, দেখি।"

রহিম পিঠ দেখাইল, চটিজুতার দাগ তখনও তাহার পিঠে ফুটিয়া রহিয়াছিল।

করিম কল্‌কেটা মাটিতে রাখিয়া বলিল: "চল্‌তো রহমৎ চাচার বাড়ী।" সে হাত ধরিয়া লইয়া রহমতের বাড়ী চলিয়া গেল।

রহমতকে দেখাইয়া পাড়ার আট দশ জন লোককে সাথে করিয়া করিম হরনাথ বাবুর বাড়ীর মুখে রওনা হইল।

হরনাথ বাবু মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া ডিস্‌পেন্‌সেরীতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় করিম উঠানের উপর আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বল্, কোন্ শালা তোকে মার্‌লো। ঘর থেকে টেনে বের কর শালাকে।"

করিমের কথা শুনিয়া হরনাথ বাবু ঘর হইতে রুখিয়া বাহির হইলেন, বলিলেন: "কি। আমার বাড়ীর ওপর এসে আমাকে যা-তা বলা। দেখাচ্চি ব্যাটা নেড়েকে!"

সম্মুখে একখানা ভাঙ্গা ইট পড়িয়াছিল, হরনাথ বাবু আগাইয়া যাইতেই করিম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সেই ইটখানা তুলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ইঁটখানা হরনাথ বাবুর গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু দরজা দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাচের আলমারীতে লাগিয়া চুরমার হইয়া গেল।

হরনাথ বাবু বেগতিক দেখিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন, কিন্তু উহারাও তাঁহার পিছনে পিছনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। হরনাথ বাবু পিছনের দরজা দিয়া ডিস্‌পেনসেরী হইতে দৌড়াইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিলেন। কিন্তু করিমের দল ডিস্‌পেন্‌সেরীর আলমারীর ঔষধপত্তর নষ্ট করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল বাড়ীর মেয়েছেলেরা যে যেদিকে পারিল পালাইয়া গেল। উন্মত্ত মুসলমানেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘর ঢুকিয়া, মনের মত হরনাথ বাবুকে প্রহার করিল, কিন্তু ইহাতেও তাহারা তৃপ্ত না হইয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া, টাকা পয়সা, গহনা প্রভৃতি লুট করিয়া বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

খবরটা সহরে মহেন দালালের কানে যাইয়া পৌছিতে দেরী হইল না।

অহিংসবাদ

মানবেন্দ্রনাথ রায়

রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংসনীতির প্রবর্তনকে কেবল যে গান্ধীজীর মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ জাহির করা হইয়া থাকে তাহা নহে, অধিকন্তু বলা হয় যে আধুনিক জগতের সমস্যাদির সমাধান কল্পে উহা ভারতের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বকীয় অবদান। কিন্তু মুক্ত-বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিতে গেলে, কোনো নীতির পিছনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আছে বা কোনো এক ধোঁয়াটে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ উহাতে রহিয়াছে বলিয়াই কেবল উহার বাহিরের চেহারা দেখিয়াই গ্রহণ করা চলে না। সেই বিশিষ্ট লোক যদি সৎ লোকও হন, তবুও সেই নীতি যে সৎ হইবে আগে হইতে এমন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। সকল নীতির ও প্রস্তাবের চরম পরীক্ষা হইল তাহাদের আভ্যন্তরীণ যুক্তি-সামঞ্জস্য। তাহাদের ভিতরকার কথা দিয়াই তাহাদিগকে বিচার করিতে হইবে, তাহাও শুধু ভাবের দিক দিয়া নহে, মানবজাতির কল্যাণ ও সামাজিক কার্যকারিতার দিক দিয়া। মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই যে নীতিতে সমাজের অনিষ্ট হয়, ভাবের দিক দিয়া তাহা যতই উঁচু হউক না কেন, তাহাতে মানুষের আধ্যাত্মিক বা পার্থিব কোনোরূপ মঙ্গলই হইতে পারে না।

যাহাদের নৈতিক বুদ্ধি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেমন ফ্যাসিবাদী "যুদ্ধং দেহি" ওয়ালারা, তাহারা ছাড়া কেহই হিংসার জন্যই হিংসা প্রয়োগ সমর্থন করে না। হিংসা হইল মনুষ্যজাতির অতীত বর্বরতার অপ্রীতিকর রেশ, কিন্তু হিংসাকে ঘৃণা করা এক কথা, আর মানবজাতির অধিকাংশ যখন হিংসার চাপে কাতরাইয়া মরিতেছে তখনও নির্বিচারে অহিংস থাকিতে হইবে, অহিংসাকে এমন এক ধর্মনীতি বা আধ্যাত্মবাদ করিয়া তোলা অন্য ব্যাপার। ভাবের দিক দিয়া প্রশংসনীয় হইলেও এইরূপ নীতিবাদ অধর্ম ও দুর্নীতি-মূলক, কারণ ইহাতে মুখে অহিংসা প্রচার করিলেও কাজে হিংসার প্রয়োগকে সমর্থন করা হইতেছে।

অহিংসাকে মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিবার ফলে কংগ্রেসকে স্বরাজলাভের জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনের অধিকার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহারই ফলে যে আদর্শের কথা আমরা মুখে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা আদর্শ মাত্র হইয়া আছে—তাহা কার্যত সিদ্ধ হইবার কোনো আশা নাই। কোনো লক্ষ্য লাভ করিতে হইলে যে সকল উপায় প্রয়োগের দরকার, খামখেয়ালী ভাবে যদি তাহাদের সীমানির্দেশ করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই লক্ষ্য আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে। কংগ্রেসের নেতৃ-বৃন্দকে দিয়া অনায়াসেই এই মারাত্মক স্বীকৃতি করাইয়া লওয়া যায়, যে, যদি কখনও দেখা যায় যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে, তবে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা পরিহার করিতে হইবে, কারণ তাহারা অহিংসারূপ মূলনীতিতে আবদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্বীকৃত হয় যে, তাঁহারা স্বাধীনতার আদর্শে আবদ্ধ নহেন। সেই আদর্শে তাঁহাদের আনুরক্তি অপর সত্তাধীন, তাহাতে তাঁহাদের উপর কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাই। যাঁহারা প্রধানতঃ পরিণামে ধর্মবিশ্বাসে নিহিত, এক অধ্যাত্মবাদের সহিত জড়িত, অবশ্য তাঁহাদের নিকট রাজনৈতিক প্রয়োজনের তেমন কোনো গুরুত্ব থাকিতে পারে না। অহিংসবাদের প্রতি নির্বিচার আনুরক্তিকে যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনাদির উপরে স্থান দিতে হয়, তবে চরম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অহিংসাবাদে আনুরক্তির অর্থই হইল, বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের হিংসাকে মানিয়া লওয়া।

কোন এক দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব যে

সুসংগঠিত হিংসার সুশৃঙ্খল প্রয়োগ মাত্র, ইহা যুক্তিদ্বারা না বুঝাইলেও চলে। তবুও বর্তমানে কয়েকটি কথা বলিলেই চলিবে। কোনো দেশের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যে আইনগত সত্তা সেই দেশকে যে বাহুবলে জয় করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা এই সত্য হইতে সম্ভূত, কিন্তু এই জয় করার ব্যাপারটা হিংসার কাজ। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের হিংসা আমাদের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা হইয়া আছে ইহা যখন বুঝিতে পারি, তখন বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব না-ও হইতে পারে। এই বুঝিয়া লক্ষ্য পরিহার করার অর্থ ইহাই স্বীকার করা যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে হিংসা প্রয়োগ করে,নীতির দিক দিয়া তাহা একটা পরাধীন জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার হইতেও অধিক ন্যায়সঙ্গত। সেই অধিকারের নৈতিকতাতে প্রকৃত বিশ্বাস যাহাদের আছে, তাহারা কখনও ইহা ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ তাহা ত্যাগ করিলে একটি নৈতিক কর্মনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং তাহা দুর্নীতিমূলক। যদি সত্য সত্যই তোমার অধিকারের নৈতিকতাতে আস্থা জন্মিয়া থাকে, তবে সেই আস্থার বলে বিদ্রোহের পবিত্র অধিকার বজায় রাখিতে তোমার কোনও নীতিগত দ্বিধা রাখা উচিত নহে। অহিংসাবাদের চাপে পড়িয়া কংগ্রেস তাহার অদ্ভুত ভাবধারার ফলাফল সুসমঞ্জভাবে চিন্তা করিতে অপারগ হইয়াছে।

সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে এই নীতিবাদের যে তাৎপর্য তাহা একেবারে সাংঘাতিক। একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে। এই নীতিবাদের প্রচারক কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাই ধরা যাউক। ১৯৩৪ সালের কোনো সময়ে আমেরিকার কোনো পত্রিকার পক্ষ হইতে মিঃ লোটওয়ালা নামক এক ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতি তাহার মনোভাব সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, যদি কখনও তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করিবার কোনো চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তিনি সর্বপ্রকার উপায়ে তাহাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্য দাঁড়াইবেন। রাজন্যদিগের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন, এবং প্রত্যক্ষতঃ হিংসাও সর্বপ্রকার উপায়ের অন্তর্গত। এই মতে দেখা যাইতেছে যে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতার যে অবিসংবাদিত নৈতিক দাবী এবং আইনসঙ্গত অধিকার রহিয়াছে তাহা বরং ত্যাগ করা উচিত, তবুও বিদ্রোহ করিবার যে অধিকারের পবিত্রতা ইতিহাসে বিঘোষিত এবং আধুনিক জগতের সকল বিশিষ্ট নীতিবাদী ও আইনজ্ঞগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, স্বাধীনতা-রূপ লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য সে অধিকার বজায় রাখিতে বাধ্য হইলেও তাহা করা কর্তব্য নহে। অথচ, বর্বরতার যে সকল কুশ্রী স্তম্ভ আজও রহিয়া গিয়াছে, ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খলের শক্ত সূত্র যে-সব, সে-সব রক্ষা করিবার জন্য বলপ্রয়োগে কোনো নৈতিক দোষ নাই।

তলাইয়া যাঁহারা দেখেন না তাঁহাদের নিকট এই বিশ্লেষণ যতটা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে,বাস্তবিক ইহা তাহা নহে। ইহা গান্ধীজীর নিজের বিবৃতি হইতেই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত মাত্র। তিনি যে সম্বন্ধে কথা বলেন, তাহা অবশ্য বুঝিয়াই বলেন: সরলতা ও অকপটতার জন্য তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি যাহা বলেন, সবই বিশ্বাস করিতে হইবে, তাঁহার সরলতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে প্রত্যক্ষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত কেহ যদি বাহির করে, তবে তাহাকেও বাড়াবাড়ির দোষ দেওয়া যায় না।

যাহা হউক, অন্য দিক হইতেও এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া একই সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। সত্য লইয়া একটু পরীক্ষা করা যাউক। রাজন্যবর্গের উপর কোনরূপ হিংসা-মূলক আক্রমণ গান্ধীজী অনুমোদন করিবেন না, তাঁহাদের পার্থিব স্বার্থের সহিত তাঁহার কোনোরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও, অহিংসা-রূপ আধ্যাত্মিক নীতির কথাই তিনি ভাবিতেছেন। রাজাদের সুখ সুবিধা রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—অহিংসনীতিই তাঁহার রক্ষণীয়—সেই

নীতি তাহার এত প্রিয় যে তাহা রক্ষা করিবার জন্য বল-প্রয়োগেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। সামন্ততান্ত্রিক বর্ববতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রকৃতই এক সেনাদল পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইবেন, এইরূপ অবিশ্বাস্য সম্ভাবনাব কথা আমরা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু তাহা করিলেও এমন একটা সত্য আমাদের সামনে রহিয়া যায়, যাহাতে অহিংস-বাদের সাংঘাতিকত্ব পূবাপুরি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

রাজাদের পক্ষ সমর্থনে সর্বাপেক্ষা আগ্রহশীল যাঁহাবা, তাঁহাদের পক্ষেও এমন প্রমাণ করা অত্যন্ত শক্ত যে, সমাজের এই আহ্লাদে পরগাছাগুলি এমন কাজ করিয়া থাকে যাহাতে তাহাদিগকে প্রজাদেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতাব স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে, দেশীয় বাজ্যগুলিতে যে শাসনতন্ত্র, তাহা শাসক ও শাসিতেব মধ্যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিব উপব প্রতি-ষ্ঠিত। কিন্তু এই শাসনতন্ত্র ভয় প্রদর্শনেব উপর দাঁড়াইয়া আছে—তাহাতে নিহিত বহিয়াছে বাস্তব অথবা সম্ভব্য হিংসা। অহিংসবাদে নির্বিচাবে আনুবক্তিতে মানুষকে এইরূপ হিংসাধিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রেব নিষ্ক্রিয়—এমন কি সক্রিয় সমর্থক করিয়া তোলে। এই মতে দেখা যায় যে একটা দুর্নীতিমূলক প্রথাব ন্যক্কাবজনক ধ্বংসাবশেষ সবাইয়া ফেলিবাব চেষ্টা কবাও নীতির দিক দিয়া অনুমোদনীয় নহে; যদি তাহাতে বলপ্রয়োগ করিতে হয়—তাহা বাধ্য হইয়াই কবিতে হইতে পাবে। যদিও সে বলপ্রয়োগ যে ইচ্ছা করিয়াই করিতে হইবে, এমন নহে। কারণ উক্ত প্রথাকে তুলিয়া দিতে গেলে উহা স্বতই আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে এবং উহার বাহক যাহাবা, তাহারা স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে-কোনো প্রকাব অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না। প্রকৃতপক্ষে, ঐ প্রথাকে বলপ্রয়োগ দ্বাবাই বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু কোটী কোটী লোককে স্থায়ী হিংসার ভুক্তভোগী করিয়া রাখা নীতির দিক দিয়া, সমর্থনীয় দেখা যায় না।

বাস্তবিক আমাদিগকে যে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে একটাকে বাছিয়া লইতে হইবে, এমন মোটেও নহে—বাছিতে হইবে হিংসাকেই দুই প্রকাবের মধ্যে—এক প্রকারের হিংসা যাহা যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য মানুষকে দাসত্বে পবিণত এবং তাহাদেব উপব জুলুম ও অত্যাচার করিবার জন্য চলিয়া আসিতেছে। আর হিংসা যাহা এই দাসগণকে মুক্ত করিবাব জন্য, মানুষের অধিকাব বজায় বাখিবার জন্য, স্বাধীনতাব পবিত্র ব্রত বক্ষাব নিমিত্ত এবং হিংসাবই অবসান কল্পে বাধ্য হইয়া প্রয়োগ কবিতে হইতে পাবে। প্রথমোক্ত প্রকাবেব অহিংসবাদ হিংসাকে বাছিয়া লওয়াই সূচিত বরে। বাহিবে অহিংসনীতি প্রচার কবিলেও ইহা হিংসা প্রয়োগই সমর্থন বরে।

অহিংসবাদে যাঁহাবা বিশ্বাস কবেন তাঁহাবা এই বলিয়া তর্ক কবেন যে, কোনো এক প্রচলিত প্রথা বলদ্বারা রক্ষিত হইলেও তাহাতেই সেই প্রথাব ফলে দুঃখভোগী যাহারা তাহাদেব দ্বাবা বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত হইয়া যায় না—এমন কি যদি তাহাবা অন্যভাবে মুক্ত হইতে না পাবে, তবেও না। এই ধবণেব মনোভাবকে যদি যতদূর সম্ভব দয়াব চোখেও দেখা যায়, তবুও ইহাকে পবাজয়েব মনোভাব ছাড়া কিছু বলা যায় না, এবং তাহা নিছক কাপুরুষতা হইতে কোনো দিক দিয়াই ভালো নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহা কাপুরুষতাব চেয়েও খাবাপ। জনগণেব দাসত্বকে স্থায়ী কবিয়া বাখাব উহা নীবব সমর্থন।

স্বাধীনতাব ব্রতেব প্রতি অবিচল আনুবক্তি এবং নৈতিক মূল সূত্রাদির সঙ্গে সঙ্গতি বাখিয়া বাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রামে বলপ্রয়োগ একেবাবেই নিষিদ্ধ কবা যাইত, যাঁহারা এরূপ নিষিদ্ধ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাবা যদি প্রমাণ কবিতে পারিতেন যে বলপ্রয়োগেব জরুবী প্রয়োজনও কখনও হইবে না। কিন্তু তাঁহাবা তাহা কবিতে পাবেন না, কারণ এই সংগ্রামে দুইটি পক্ষ বহিয়াছে এবং ক্ষমতা যে পক্ষের হাতে তাঁহারাই নির্দ্ধাবণ কবেন—সংগ্রামে কী অস্ত্র বাছিয়া লইতে হইবে। ক্ষমতা যে পক্ষের হাতে তাঁহাদের অস্তিত্বই যখন বলপ্রয়োগেব উপব নির্ভর করিতেছে, তখন সম্পূর্ণ অহিংসার পক্ষপাতীগণ কখনও

বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, তাঁহারা ক্ষমতাসম্পন্ন পক্ষকে বলপ্রয়োগ পরিহার করিতে প্রণোদিত করিতে পারিবেন, কাজেই তাঁহারা অকপটে এইরূপ গ্যারাণ্টিও দিতে পারেন না যে, বলপ্রয়োগ করিতে হয়, এমন জরুরী প্রয়োজন কখনও জাগিবে না। অতএব সঙ্কট যখন আসিবে সে মুহূর্তে তাঁহারা স্বাধীনতা ব্রতে অবিচল থাকা অপেক্ষা আত্মসমর্পণই বাছিয়া লইবেন। বাহির হইতে দেখিতে তাঁহাদের জীবন-দর্শনের নৈতিক উৎকর্ষ থাকিলেও তাহাতে জনগণের দাসত্বের নীরব সমর্থন প্রকাশ পায়—তাঁহারা এইরূপ দর্শন লইয়া পরীক্ষা করাতে তৃপ্তি পাইতে পারেন। কিন্তু বাস্তববাদী যে, সে এই মতবাদের যে সাংঘাতিক তাৎপর্য রহিয়াছে, তাহা না দেখিয়াই পারে না। সে দেখিবে যে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের পরীক্ষায় এই মতবাদ দাঁড়াইতে পারে না। অহিংসার প্রচারকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বলপ্রয়োগ পরিহার করিবার চেষ্টায় নিরত থাকুন, সকল সভ্য মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন। জনগণকে যাহারা শোষণ করে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করে, সেই সব হৃদয়হীন ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধনের মোহ তাহারা বজায় রাখুন। কিন্তু যদি তাঁহারা এইরূপ দাবী করেন যে, দাসত্বে পরিণত জনগণের সামনে যখন বলপ্রয়োগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিবে না, বিদ্রোহের পবিত্র অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করা এবং নিঃশেষে গোলামী মানিয়া লওয়া, দুটার মধ্যে একটাকে তাহাদের বাছিয়া লইতেই হইবে, তখনও তাহারা কিছুতেই বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না, তবে অহিংসার এই বাণীবাহকগণ নিজেদের উপর এই অভিযোগই ডাকিয়া আনিবেন যে, যে আদর্শ তাঁহারা মুখে প্রচার করেন, তাহার প্রতিই তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁহারা তাঁহাদের সকল আধ্যাত্মিক আদর্শ, নৈতিক মূলনীতি এবং মানবতার বুলি সত্ত্বেও কার্যত অত্যাচারী ও শোষকদের স্বার্থেরই সহায়তা করিবেন। কার্যত যাহারা কেবল ধনের সেবাই করিয়া থাকে, তাহারা ধর্মের সেবা করিতে পারে না। অহিংসবাদ একটি দুর্নীতিপূর্ণ খেলো জড়তাবাদমূলক প্রথা স্থায়ী করিবার জন্য হিংসাবলম্বন সমর্থন করে।

গান্ধীজীর সেক্রেটারী একদা সংবাদ পত্রে এক ক্রোধপূর্ণ বিবৃতি বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী যাহা কখনও বলেন নাই, সাংবাদিকেরা তাহাই তাঁহার মুখের কথা বলিয়া চালাইয়া দেয়। এই সতর্ক বাণী গ্রহণ করিয়া আমরা উপরে যে প্রতিবেদন উধৃত করিয়াছি, তাহার প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রাখিলাম—যদিও যখন তাহা প্রকাশিত হয়,তখন তাহার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। যাহা হউক, যদি ধরিয়াও লই যে, গান্ধীজী কখনও উক্ত কথা বলেন নাই, তবুও এই সত্য থাকিয়া যায় যে তাঁহার পরিপোষিত জীবন-দর্শনের প্রভাবে ও তাঁহার স্বকীয় পরিচালনায় কংগ্রেস ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের কার্য-কলাপে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে। এই নীতিতে নিহিত আছে, রাজন্যবর্গের বিশিষ্ট ক্ষমতা ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং তাহারই ফলে, সেই ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে-সব উপায় অবলম্বিত হয়, সে সবের অনুমোদন। যত রকম কু-যুক্তি ও সুবিধাবাদী তর্ক সম্ভব, তাহা দিয়া এই নীতি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে যাঁহারা এই নীতির জন্য দায়ী, তাঁহারা ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া, জানিয়া শুনিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ভুলাভাই দেশাই পরগাছারূপ রাজন্যবর্গের কেবল সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার সমূহ নহে, তাহাদের জাকজমক পূর্ণ সামাজিক সুখ সুবিধাদিও আইনের দিক দিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই সমর্থন কংগ্রেস নামঞ্জুর করে নাই।

এমন তর্ক করা চলিবে না যে কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যদের জনগণের জন্য যাহা অনুভব করে, তাহা কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, কারণ যাহা সব সময়েই করা যাইতে পারিত, যথা: কংগ্রেসের বহুল প্রচারিত সামাজিক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উহার রাজ-নৈতিক কর্মপ্রণালী তৈয়ার এবং সে প্রণালী কার্যে পরিণত

করিবার জন্য চেষ্টা করা—কংগ্রেস তাহাও করে নাই। যেহেতু রাজাদের বিশেষ অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া লওয়া কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতির অন্তর্ভুক্ত, অতএব যুক্তিসূত্রে ইহা স্বতই আসিয়া পড়ে যে, কংগ্রেস সে সব বিশেষাধিকার যখনই রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহা রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইবে,সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন এইরূপ রক্ষা করিবার পন্থার সঙ্গে স্বতই জড়িত। কোনো জিনিষকে তুমি হয় রক্ষা করিবে, নয়তো করিবে না। রক্ষা করিলে, তবে অবশ্য সর্বপ্রকার উপায়েই করিবে। কাজেই এমনও যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ গান্ধীজীর যে মন্তব্য উপরে উধৃত হইয়াছে, তাহা গান্ধীজী কখনও বলেন নাই—তবুও তিনি কংগ্রেসকে যে কার্যনীতি গ্রহণ করিতে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করিতে হইলে তাঁহাকে উক্ত মন্তব্যানুযায়ী মনোভাব গঠন করিতে হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী এই ঘোষণা করিয়া ছিলেন: "সর্বোপরি এই সত্য যে কংগ্রেস মূক, অর্ধোপবাসী লক্ষ লক্ষ জনগণের প্রতিনিধি—তা সে জনগণ ব্রিটিশ ভারতেরই হউক বা যাহাকে ভারতীয় ভারত বলা হইয়া থাকে, তাহারই হউক। অন্য যাহারই স্বার্থ কংগ্রেসের মতে রক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই এই সকল অসংখ্য মূক জনগণের স্বার্থের পরিপোষক হওয়া চাই।" এই কথাগুলিতে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাহার সকল অকপটতা সন্দেহের অতীত কিন্তু এখানেও কথা এই যে, ইহা অকপটতার প্রশ্ন নহে, যুক্তির প্রশ্ন। মানবতার পরিপোষক গান্ধীজীর যে প্রকারের মনোভাব, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ সমাধানের জন্য তিনি যে নীতিগত ও ধর্মগত পন্থা গ্রহণ করেন তাহা তাহার পরিপন্থী—এমন কি তাহাকে অকেজো করিয়া ফেলে। উপরে উধৃত বাক্য সমষ্টিতে যে প্রকারের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত রাজাদের স্বার্থ-রক্ষার্থে বিঘোষিত সঙ্কল্পের এবং কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ না করিবার নীতির সামঞ্জস্য কী করিয়া সম্ভব?

মূক জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে কংগ্রেসের প্রস্তুতি বাহির হইতে দেখিতে যতটা অবধারিত বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেরূপ নহে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উহা কল্পনার বিষয় মাত্র—আসলে সর্ত রহিয়াছে: যদি সত্যই প্রকৃত স্বার্থসংঘাত ঘটে। সত্য এই যে স্বার্থসংঘাত বাস্তবিকই আছে এবং সেই সংঘাতে ভারতীয় ভারতের রাজাদের এবং তাহাদেরই অনুরূপ যে সকল শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণী ব্রিটিশ ভারতে আছে, তাহাদেরই সব দিক দিয়া সুবিধা, কারণ প্রধানত তাহারা বলপ্রয়োগের উপরই নির্ভর করে। যদি সত্যই প্রকৃত স্বার্থসংঘাত ঘটে, এই সর্তের তাৎপর্য এই যে গান্ধীজীর মতে সেরূপ কোনো স্বার্থসংঘাত নাই এবং তাহা কখনও ঘটিবার কোনো কারণও নাই। এখন, আগে পরে এই সংঘাত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পারে তাহা করা যাইতে পারে কেবলমাত্র এক উপায়ে। তাহা হইল মূক জনসাধারণকে চিরকালই মূক থাকিতে প্রবুদ্ধ করা, তাহাদিগকে বলা, তাহাদের ভাগ্যে যাহা হইয়াছে তাহাই মানিয়া লইতে এবং এই যে মানিয়া লওয়া—যাহাতে তাহাদের শোষক ও অত্যাচারীরা যে সব অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে সব অটুট থাকিবার ব্যবস্থা হয়—তাহাকেই একমাত্র কার্যে পরিণত করা।

শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করা যাইতে পারে কেবল শোষিত জনসাধারণকে সামাজিক দাসত্ব ভগবানের বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়া। আধা-ধর্ম ও আধা-নীতিগত অহিংসবাদে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবধারা যদি গ্রহণ করা যায় যে, ভারসতীয় সমাজে প্রকৃতপক্ষে কোনো স্বার্থসংঘাত নাই এবং যে সমাজব্যবস্থা পাকা হইয়া রহিয়াছে, তাহার কাঠামোর অভ্যন্তরে সামাজিক মিল থাকা চাই-ই, তবে তাহা হইতে ইহা যুক্তি-অনুসারেই আসে যে, যদি কখনও কোনো সংঘাত ঘটে, তাহাকে প্রকৃত বলিয়া ধরা যাইবে না—মনে করিতে হইবে যে হিংসার যাহারা পক্ষপাতী সেই সব বিকৃত-চরিত্র লোকগুলি উহাকে কৃত্রিম উপায়ে মজাইয়া তুলিয়াছে। এরূপ বিশ্বাস করা হয় যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্নে-

সব ঐতিহ্যগত সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে, কেবল তাহাতেই সামাজিক সমন্বয় বজায় থাকে এবং জীবনের উচ্চতর আদর্শসমূহের প্রেরণা যোগায়, এবং এই সকল সম্বন্ধ যাহাতে রক্ষিত হয়, সে জন্য যে চিন্তাবেগে এই সকল সম্বন্ধের ব্যত্যয় ঘটে তাহার সর্বপ্রকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফল হইবে এই যে এই সমাজব্যবস্থার ফলে দুঃখ পাইতেছে যাহারা অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণ, যদি তাহারা কখনও বলপ্রয়োগে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করে, তবে সর্বপ্রকার উপায়ে সেই তথাকথিত পাকা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা হইবে। এবং তখন সারা দুনিয়া অহিংসনীতি রক্ষার জন্য হিংসাপ্রয়োগের অভিনব দৃশ্য দেখিবে, দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। অত্যাচারিতের মুক্তি যে সময়ে বলপ্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নহে, তখনও যাহারা একরোখা নৈতিক যুক্তিতে বলপ্রয়োগ নিবারিত করিতে চায়, তাহারা জনগণকে পিষিয়া রাখিবার জন্য নিজেরাই সর্বদা বলপ্রয়োগ করিতেছে, অথবা বলপ্রয়োগে সাহায্য করিতেছে। আমাদের গোড়া কংগ্রেসীরা অন্যরূপ ব্যবহার করিবেন, এরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ মোটেই নাই। তাহাদের ভাবধারা দিয়াই তাহাদের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইবে —সেই ভাবধারা এইরূপ যে, যে সমাজব্যবস্থা অধিকাংশ লোকের দুঃখভোগের মূল্যে সংখ্যাল্পের বিশেষাধিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে, তাহাকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া দেখাইবার জন্য বড় বড় নীতিকে এবং ধর্মের অনুশাসনকে টানিয়া আনে।

অহিংসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করিবার এই সংক্ষিপ্ত চেষ্টার পরিশেষে ঐ নীতিবাদের যিনি উদ্ভোক্তা তাঁহার সর্বশেষ উক্তির উল্লেখ করা সর্বোত্তম হইবে। "হিংসা কি ঢুকিতেছে?" শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকাতে লিখিতেছেন:

"মজুরদের সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কাজে যাইতে বাধা দেওয়া অবিমিশ্র হিংসা এবং এইরূপ পন্থা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কলের বা অন্যান্য কারখানার মালিকদের পক্ষে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হইবে এবং এইরূপ কাজে যে-সব কংগ্রেসী জড়িত তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য হইবে মালিকদিগকে পুলিশের সাহায্য দেওয়া। কংগ্রেসের লক্ষ্য ক্ষুধার্ত লক্ষ লক্ষ জনগণের জন্য পূর্ণ সুবিচার আদায় করা—কাজেই ধনিকতন্ত্রের প্রতি উহার কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস যতক্ষণ অহিংসাকেই তাহার মূলগত নীতিরূপে বজায় রাখিয়াছে, ততক্ষণ কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিতে পারে না—তাহা অপেক্ষাও অনেক কম পারে কোনো শ্রেণীর লোককে কোনোভাবে বা কোনো পরিমাণে অপমানিত বা জব্দ হইতে দিতে—অথবা কোনো কংগ্রেসীকে বা কতকজন কংগ্রেসীকে একত্র মিলিয়া আইনের প্রয়োগ নিজেদের হাতে লইতে দিতে।"

ইহার উপর কোনোরূপ মন্তব্যের প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। কোনো কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যখন কারখানাতে পিকেটিং করিতে রত, মজুরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য পুলিশ পাঠানো প্রয়োজন মনে করিবেন, তখন তাঁহারা যে অহিংসরূপ ভাবগত নীতিকে রক্ষা করিবার ছলে বলপ্রয়োগের আদেশ দিবেন, ইহা প্রত্যক্ষ। একদল লোককে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য পুলিশ পাঠাইবার অর্থই হইতেছে সর্বপ্রকার উপায়ে—দরকার হইলে, গুলি চালাইয়াও ছত্রভঙ্গ করিবার ক্ষমতা দেওয়া। আর কি সে উদ্দেশ্য যাহার জন্য অহিংসার সমর্থকগণ এতদূর যাইতে প্রস্তুত হইবেন? ধনিকেরা যাহাতে অপমানিত বা জব্দ না হন, কোনরূপ অসুবিধা যাহাতে তাহার না হয়, তাহারই জন্য। অতএব ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই যে, যাহারা ভগবানকে তুচ্ছ করিতে আসিয়া প্রার্থনা করিবার জন্যই থাকিয়া যায়, মন্ত্রিত্ব-পদাধিষ্ঠিত কংগ্রেসীগণ তাহাদের অনুরূপ ব্যবহার করিতেছেন। অহিংসবাদে তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদীদের আইন ও শৃঙ্খলার জবরদস্ত সমর্থকে পরিণত করিয়াছে।

যাহা ভাবা গিয়াছিল, অধিক দিন না যাইতেই তাহা ঘটিয়াছে। গান্ধীজী মন্ত্রিত্ব-পদাধিষ্ঠিত তাঁহার অনুবর্তীগণ দ্বারা বলপ্রয়োগ অনুমোদন করিবার কয়েক সপ্তাহ

পরেই, বোম্বাইয়ের রাজপথে মজুরদের উপর গুলি চালানো হয়। এই সকল মজুরেরা তাহাদের সহকর্মীদিগকে কোনো একটা প্রতিবাদ-কার্যে যোগ দিতে বলা ছাড়া অহিংসবাদের ব্যত্যয় কিছুই করে নাই। কিছুদিন যাবৎ গান্ধীজী কংগ্রেসের ভিতরে হিংসাপ্রবণতা বাড়িতেছে, এমন এক কাল্পনিক অনুমানের উপব বার বার শঙ্কাপূর্ণ বাণী প্রচার করিতেছেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের মজুরদের যে গুলি করিয়া মারা হইল, ঐ সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। অহিংসানীতির স্বরূপ এইরূপ শোচনীয়ভাবে প্রকাশ হইয়া যাইবার পর, উহার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আগাইয়া যাঁহারা যাইতে চাহেন, অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে। অভিজ্ঞতা হইতে যে শুভপ্রদ শিক্ষা লাভ করা যায়, কংগ্রেসও তাহা বর্জন কবিয়া চলিতে পাবে না।

লেনিনের স্মৃতি

এন, ক্রুপকায়া, অনুবাদক—সুধী প্রধান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব)

প্লেখানভ্ শীঘ্রই তাকে সন্দেহেব চোখে দেখতে লাগলেন—তিনি তাকে "ইস্ক্রা" সম্পাদকমণ্ডলীব যুবা-দলের সমর্থক লেনিনের ছাত্র হিসাবে ধরে নিলেন। ইলিচ্ একবার ট্রট্স্কিব একটা লেখা প্লেখানভ্‌কে পাঠিয়েছিলেন—প্লেখানভ্ উত্তরে লিখ্‌লেন: ""আমি তোমাব কলমের (ট্রট্স্কিব ছদ্মনাম) লেখা পছন্দ করি না।" উত্তরে ইলিচ্ লিখলেন: "ষ্টাইলটা অবশ্য অভ্যাস করলে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু লোকটা শিখতে পারবে এবং খুব কাজের হবে।" ১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাসে ইলিচ্ ট্রট্স্কিকে "ইস্ক্রার" সম্পাদকীয় বিভাগে গ্রহণ কবাব প্রস্তাব করে-ছিলেন। শীঘ্রই ট্রট্স্কি প্যারিসে চলে গেলন এবং সেখানে তিনি অত্যাশ্চর্য্যভাবে নাম করতে আরম্ভ করলেন।

এর পরে একজন নতুন আগন্তুক এ'ল নির্ব্বাসন থেকে—তার নাম একাটারিনা মিখাইলোভ্‌না আলেক্‌জান্দ্রভা। তিনি আগে সন্ত্রাসবাদী দলের ছিলেন—তাই তাঁব চরিত্রের ভিতর তার ছাপ বেশ পাওয়া যেত। আমাদের "ডিম্‌কা" প্রভৃতি কতক মেয়ের মত ভাবপ্রবণতা বা চাঞ্চল্য তাঁর চরিত্রে দেখা যেত না এবং বেশ আত্ম-সংযমী ছিলেন। এই সময় সে "ইস্ক্রা"দলে যোগ দিয়েছিল, তাই তার কথার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় ছিলনা। ইলিচ্ পুবাণো বিপ্লবী-দেব ও সন্ত্রাসবাদীদেব প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ কবতেন। তাই একাটারিনা পৌছলে ইলিচ্ তাঁর সাথে বিশেষ বিবেচনাব সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কবতেন। আমি তো তার সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলাম, কারণ আমি সমাজতন্ত্রবাদ পুরোপুবি গ্রহণ কবার আগে শ্রমিকদেব পাঠচক্র গড়ার কাজে ওদের কাছে যেতাম। সেই সময় ওদের অনাড়ম্বব জীবনযাত্রা, আমাকে ওদের দলে যোগ দেবাব জন্য একাটাবিনার ব্যগ্র আবেদন, আমার আজও মনে পড়ে। ইলিচ্‌কে এসব কথা আমি বলেছিলাম সে পৌছুবাব আগেই। সেই কাবণে আমরা আগ্রহের সঙ্গে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কবতাম—ইলিচ্‌ও এমনি ব্যাপারে বড় আনন্দ প্রকাশ করতেন। কোন লোকের মধ্যে যদি কিছু গুণ থাকে তো তার সে গুণের প্রতি সম্মান দেওয়া, আর তাকে ধরে থাকা ইলিচের স্বভাব ছিল। একাটারিনা লণ্ডন থেকে প্যারিস চলে গেলেন, কিন্তু "ইস্ক্রা"র খুব শক্ত সমর্থক হতে পারেন নি। দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে লেনিনের "অধিকার করা" নীতির বিরুদ্ধে বিরোধের যে জাল বোনা হ'য়েছিল—একাটারিনা

তা থেকে মুক্ত হতে পাবেন নি। এর পরে তিনি কেন্দ্রীয় সালিসী সমিতিতে যান এবং পবে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ কবেন।

আর যারা রাশিয়া থেকে লণ্ডনে আসে তাদের মধ্যে গোল্ডম্যান ও ডলিভো-ডোব্রভস্কির কথাও মনে পড়ে। গোল্ডম্যানকে আমি পিটার্সবার্গে থাকতে জানতাম—তিনি সেখানে আমাদের পুস্তিকা ছাপাবার কাজ কবতেন। এই লোকটাব মত পরিবর্ত্তন হ'ত বড় শীঘ্র, কিন্তু এই সময় তিনি "ইস্কার"ব সমর্থক ছিলেন। আর ডলিভো ছিলেন অদ্ভুত রকমেব নীবব প্রকৃতিব লোক—ঠিক যেন একটা ইঁদুরেব মত বসে থাকতেন। তিনি পিটার্সবার্গে ফিরে যান, কিন্তু পরে মাথা খাবাপ হয়ে যায়। একটু সেবে উঠে তিনি নিজেকে নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। সেই সময়ে গোপনে থাকা কষ্টকব ছিল—আর সকলে তা' সহ্যও কবতে পারতো না। সমস্ত শীতটা কংগ্রেসের আয়োজনে কেটে গেল। ১৯০২ সালেব নবেম্বর মাসে এই আয়োজনের জন্য একটা সংগঠন সমিতি তৈবী হ'ল। অনেক দল এই সমিতিতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। এই ধবণেব সমিতি না কবলে কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব হ'ত। পুলিশেব অত্যন্ত অত্যাচাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে কাজ কবার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তা'ছাডাও বাশিয়ার বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে বিদেশস্থ দলেব মতো একই ধরণের সংগঠনে আনা প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ সমস্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালানো ও কংগ্রেসেব আয়োজন করার ভার সম্পূর্ণ ইলিচের কাঁধে পডেছিল। পোট্রেসভ্ অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে পড়েন, লণ্ডনের হিম তাঁব ফুস্‌ফুস্ সহ্য কবতে পাবেনি—তাই তাঁব চিকিৎসা চল্‌ছিল। মার্টভ্ লণ্ডনের আবহাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে পডেছিল—তাই প্যারিসে গিয়ে সেখানে জড়িয়ে পডে। ডিউচ্, "শ্রমিক উন্নয়নকারী"দলের একজন পুরাতন সভ্য, তাঁর নির্ব্বাসনে আসবার কথা ছিল লণ্ডনে। ঐ দলের সকলেই তাঁকে সংগঠনকারী হিসাবে অত্যন্ত কাজেব বলে মনে করত। যাশুলিচ্ বলতেন: "ডিউচ্‌কে আগে আসতে দাও, তার থেকে কেউ রাশিয়ার খবরাখবর নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতো না।" প্লেখানভ্ ও এক্‌সেলরডের বড় আশা ছিল যে, সে এসে তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় বিভাগের সব কাজ গুছিয়ে নেবে। কিন্তু তিনি যখন এলেন তখন দেখা গেল, দীর্ঘকাল রাশিয়া থেকে দূরে থেকে, তাঁর শক্তির অপচয় হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বাখার কাজে তিনি একেবারে অযোগ্য প্রমাণিত হ'লেন। মানুষের সঙ্গলাভের জন্য তিনি আকুল হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশস্থ সমাজতান্ত্রিকদলে তিনি যোগ দিলেন এবং বিদেশস্থ রাশিয়ার উপনিবেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে তুলতে লাগলেন। ইনি শীঘ্রই প্যারিস চলে যান।

যাশুলিচ্ লণ্ডনেই পাকাপাকি ভাবে বাস কবতে লাগলেন। যদিও তিনি রাশিয়ার প্রত্যেকটা খবর আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন, কিন্তু সম্পর্ক গডে তোলার কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হ'তনা। সবই ইলিচের ঘাড়ে পডেছিল। চিঠিপত্র চালানোর কাজে তাঁর স্নায়ু অসুস্থ হ'য়ে পডেছিল। কোন চিঠিব হয়তো মাসের পর মাস অতীত হলেও উত্তর পাওয়া যেত না, মনে হ'ত সবই নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কোথাও হয়তো কি কাজ হচ্ছে—তার খববই মিলছে না। তার জন্য মূঢের মত অপেক্ষা কবা ইলিচেব চবিত্রের বিরুদ্ধ ছিল। তাঁর বাশিয়াতে লেখা প্রত্যেক চিঠিতে এই ধরণের জিনিষ বোঝাই থাকতো: "আমবা আবার অনুরোধ করছি, পরিষ্কার জানাচ্ছি যে, আপনারা আমাদের কাছে আরো অনেক কথা বেশী করে লিখবেন, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি জানাবেন, এবং দেরি না ক'বে পত্রপাঠ অন্ততঃ দু'এক লাইনে পত্রপ্রাপ্তি সংবাদ দেবেন।" তাড়াতাড়ি কাজ করার ব্যগ্র অনুরোধে তার চিঠি ভরা থাকতো। ইলিচ্ এই ধরণের চিঠি পেলে রাতের পর রাত ঘুমুতে পারতেন না যেন, তাদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন।

এই সব নিদ্রাহীন রাত্রি আমার স্মরণে গাঁথা রয়েছে। ইলিচ্ চাইতেন যে, ব্যক্তি-ভিত্তিক না হ'য়ে আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে একটা শক্ত, একীভূত দল গড়ে উঠুক, যেখানে সমস্ত ছোট ছোট উপদলগুলি এসে এক হয়ে

যাবে। তিনি চেয়েছিলেন যেন দলের মধ্যে কোন কৃত্রিম, বিশেষ প্রাদেশিক ব্যবধান না থাকে। এই কারণেই বাণ্ডদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কারণ তখনকার দিনে অধিকাংশ বাণ্ডদলের লোকেরা চাইতো তাদের দলকে স্বতন্ত্র রাখতে। ইলিচ্ তাদের প্রাদেশিক ব্যাপারে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য মানলেও বস্তুতঃ একটী দলের পদ্ধতিতে কাজ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাণ্ডরা তাদের স্বাতন্ত্র্য ছেড়ে দিতে চাইল না। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ ইহুদী শ্রমিকদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল, কারণ তারা একা সাফল্য লাভ করতে পারতো না। কেবল সমগ্র রাশিয়ার সর্ব্বহারা দলের সঙ্গে এক হ'লেই তাদের বিজয় সম্ভব হ'ত। কিন্তু বাণ্ডরা একথা বোঝেনি। এই জন্যই "ইস্ক্রা" সম্পাদকীয় বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালায়, এই আন্দোলনের প্রকৃত অর্থ ছিল একতা স্থাপন। সমস্ত সম্পাদকীয় বিভাগ এই ঝগড়ায় যোগ দিয়েছিল, কিন্তু বিপক্ষদল জানতো যে একতার সব চেয়ে বড় প্রচারী হচ্ছেন ইলিচ্।

শীঘ্রই "শ্রমিক উন্নয়নকারী দল" জেনেভাতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। এবারে একমাত্র ইলিচ্ই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হ'ল। সে সময় ইলিচ্ এত পরিশ্রম করেছিলেন যে তাঁর একপ্রকার স্নায়ু রোগ হ'ল—বুকের স্নায়ুর অগ্রভাগগুলি ফুলে উঠতে লাগলো। আমি একটা ডাক্তারী বই দেখে রোগটা নির্ণয় করলাম। টাকাটারয়েভ্ ছিল ডাক্তারীর চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, সেও আমার মতে মত দিলো। আমি ইলিচের গায়ে আইডিন মাখিয়ে দিলাম, কিন্তু এই আইডিনের ফলে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পেতে লাগলেন। ইংরেজ ডাক্তার ডাকার কথা আমরা ভাবতেও পারিনি, কারণ তার জন্য এক গিনি খরচ করতে হ'ত। ডাক্তার ডাকতে বেশী খরচ পড়তো বলে, ইংলণ্ডে শ্রমিকেরা নিজেরাই পরস্পরের চিকিৎসা করতো। জেনেভা যাওয়ার পথে ইলিচ্ অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেন, সেখানে পৌছে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রায় দু'সপ্তাহের জন্য শয্যাশ্রয় করেন। লণ্ডনে তিনি যত কাজ করেছিলেন তার মধ্যে একটীতে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি পান।—সে কাজটী হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ লেখা "গ্রামের চাষীদের প্রতি"। ১৯০২ সালে রাশিয়ার স্থানে স্থানে যে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়, তা দেখে ঘটনাটী সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখার তাগিদ ইলিচ্ বোধ করেন। এই প্রবন্ধে ইলিচ্ দেখান, শ্রমিকদলের কি উদ্দেশ্য এবং কেন গরীব চাষীরা তাদের সঙ্গে মিশবে। ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আমরা জেনেভাতে চলে যাই।

জেনেভা ১৯০৩ সাল। জেনেভাতে সহরের প্রান্তে শ্রমিক-পল্লী 'শিচেরণে' বাস করতে গেলাম। ছোট্ট একটী ঘর ভাড়া নিলাম। নিচে'ত একটা পাথরের মেঝেওয়ালা রান্নাঘর, আর উপরে তিনখানা ঘর। রান্না-ঘরে আমাদের লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কাজও চলতো। আসবাবপত্রের অভাব মেটানো হ'ল জিনিষ-পত্র চালান দেওয়ার প্যাকিং বাক্সের দ্বারা। ক্রাসিকভ্ এই বলে আমাদের ঠাট্টা করতো যে, আমাদের রান্নাঘরটা একটা চোরাই মাল আমদানীকারকদের আড্ডা। শীঘ্রই এমন হ'ল যে একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার যায়গাও পাওয়া যেত না। কারো সঙ্গে গোপনে কথাবার্ত্তা কইতে হ'লে হয় পার্কে, না হয় হ্রদের ধারে চলে যেতে হ'ত।

প্রতিনিধিরা আসতে সুরু করল। প্রথমে আসে ডিমেন-টিয়েভ্রা—ডিমেনটিয়েভের স্ত্রী ক্যাস্ট্যা তাঁর "বপ্পানী"র কাজে এমন বাহাদুরী দেখালেন যে, ইলিচ্ চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। ইলিচ্ বল্লেন: এই ঠিক লোক, বেশী কথা বলে না—অথচ কাজ করে যায়। এরপর আমাদের বিশেষ বন্ধু র‍্যাড্চেস্কো এ'ল। তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বল্লাম। একে একে সব প্রতিনিধিরা দিনের পর দিন আসতে লাগলো। ভবিষ্যত কার্য্যসূচী ও বাণ্ডদের সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে সুরু করলাম। মার্টভ আমাদের বাসার থেকে ক্রমাগত তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলো। ট্রট্স্কি পৌছুলো। তাঁকেও রাশিয়া থেকে আসতে সকলে অনুমতি দিয়েছিল। পিটার্সবার্গের নতুন আগন্তুক শট্‌ম্যানকে ট্রট্স্কির কাছে পাঠানো হ'ল—সব শিখবার জন্য।

প্রতিনিধিদেব কাছে আমাদের বলতে হয়েছিল দক্ষিণ প্রদেশের দলেব কথা, যাঁরা একটা জনপ্রিয় পত্রিকার আড়ালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখাব চেষ্টা করছিল। আমাদের বোঝাতে হয়েছিল, অবৈধভাবে কোন পত্রিকা জনগণের পত্রিকা হিসাবে চালানো সম্ভব নয় বা তাদের মধ্যে প্রচাব করাও সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ইলিচ্ ও মার্টভের যুক্তি ট্রট্স্কি সমর্থন কবেছিল—কিন্তু প্লেখানভ্ কবেননি। ল্যাণ্ডল্ট কাফেতে সমস্ত প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিল এবং এখানে প্লেখানভ্ ও ট্রট্স্কির মধ্যে একটা আলোচনা হয়। প্রতিনিধিবা যাঁরা দক্ষিণ প্রদেশের দলেব অবস্থা জানতেন, তাঁবা ট্রট্স্কিকেই সমর্থন কবলেন—প্লেখানভ্ তাতে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

"ইস্ক্রাব" সম্পাদকীয় বিভাগে নানারকমের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'ল। অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠলো। সম্পাদক বিভাগে দুটো দল হয়েছিল, তার একটীতে প্লেখানভ্, এক-সেলরভ্ ও যাসুলিচ্, এবং আব একটীতে লেনিন, পোট্রেসভ্ ও মার্টভ্। ইলিচ্ আবার প্রস্তাব করলেন যে, ট্রট্স্কিকে গ্রহণ কবা হোক। কিন্তু প্লেখানভেব দৃঢ় অস্বীকৃতিব জন্য এ প্রস্তাব উঠলো না। একদিন সম্পাদকীয় বিভাগের সভা থেকে ফিবে, ইলিচ্ অত্যন্ত রাগতঃ স্বরে বললেন: "আচ্ছা মজা হয়েছে। কারো কি সাহস নেই যে প্লেখানভেব বিরুদ্ধে কথা বলে? দেখ না ভেবাব কাণ্ড। প্লেখানভ্ ট্রট্স্কি সম্পর্কে যা' তা বলছেন আর ভেবা উত্তব করছে। জর্জ্জেব যেমন কাজ—শুধু চীৎকার করছে। আমি এসব সহ্য করতে পারি না।"

কংগ্রেসের কিছু আগে ক্রাসিকভ্কে কিছুকালের জন্য সম্পাদকীয় বিভাগে নেওয়া হ'ল। সাতজনের প্রয়োজন ওখানে সত্যিই ছিল। এক ইলিচ্ই ভাবতে লাগলেন—ত্রয়ীদেব কথা। ব্যাপারটা বড় দুঃখের তাই প্রতিনিধিদেব কিছুই বলা হয়নি। প্রথমে যে ভাবে "ইস্ক্রার" সম্পাদকীয় বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল এখন যে সে ভাবে থাকলে কাজ চলে না—একথা বলা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল।

কতগুলি সমিতি, প্রতিনিধি সংগঠন সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কবলো। কেউ বল্লে, সব কাজ তাড়াতাড়ি করা হয়—কেউ বল্লে, সব দেবীতে হয় আবার কেউ বল্লে, কিছুই হয় না—এমনি সব। কেউ অভিযোগ করতো যে, বড় বেশী আদেশেব সুর "ইস্ক্রা"ব মুখে। কিন্তু সাধারণের ধারণা ছিল যে, বাস্তবিক ভিবতে কোন গোলমাল নেই এবং কংগেসেব পব কাজ বেশ সহজভাবেই চলবে।

ইতিমধ্যে সব প্রতিনিধিবা এসে গেলেন—কেবল এলো না ক্লেয়ার ও কার্জ।

ক্রমঃ প্রকাশ্য

ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেনিন

নগেন দত্ত

যাঁরা বস্তুতন্ত্রের মূলনীতিগুলো অনুধাবন করেননি, তাঁরা এই ব্যবস্থাটা ঠিক এই মুহূর্ত্তে হয়ত বুঝতে পারবেন না। শ্রেণী-সংগ্রামের অধীনস্থ আদর্শের প্রচার, বিশেষ কোন আদর্শের প্রচার, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান—সেই বহুকালব্যাপী কৃষ্টি এবং প্রগতির শত্রু, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরী উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এই প্রতিবাদ মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে অনেক রকমারি প্রতিবাদেরই একটা মাত্র। এ থেকে মার্কস্‌বাদকে না বোঝার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিরোধ, যা কারুর কারুর একটু অসুবিধা ঘটাচ্ছে বা যাঁরা এই সম্বন্ধে প্রতিবাদ তুলছেন, তা জীবনেই ঘটে,—এ দ্বন্দ্বে ভরা, মৌখিক বা কাল্পনিক বিরোধ নয়।

ঔপপত্তিক নিরীশ্বরবাদী প্রচারকার্য্য, বিশেষ করে কোন একটা সর্ব্বহারা শ্রেণীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ধ্বংস করা এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কারণ, গতি ও কৃতকার্য্যতার মাঝে কোন দুর্ভেদ্য অচলায়তন গড়ে তোলা, মোটেই দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবাদ নয়। বরং প্রকৃত বিষয়ের,যা অবিমিশ্রভাবে জীবন্ত বাস্তবের সাথে গাঁথা, বিভেদসর্ব্বস্ব উগ্ররূপ মাত্র। আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কোন এক জিলার একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ বিভাগের শ্রমিকরা, আমরা ধরে নিলাম, প্রগতিপন্থী শ্রেণী-চেতনা-সম্পন্ন সোসাল ডেমোক্রাট। এরা নিরীশ্বরবাদী এবং অনুন্নত। এরা জিলার গ্রাম্যচাষীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। এই চাষীরা আবার ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, চার্চ্চে যায়। ধর্ম্মযাজকের প্রভাবে তারা পরিপুষ্ট। ধর্ম্মযাজক, আমরা ধরে নিলাম, খৃষ্টান-শ্রমিক ইয়ুনিয়ন গঠন করেছে। ধরা যাক, অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্যই সেই জিলায় একটা ধর্ম্মঘট হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে খাটী মার্কস্‌পন্থীর কাজ হবে ধর্ম্মঘটের আসল কৃতকার্য্যতার বিষয়, ধর্ম্মঘট-রত শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা নিরীশ্বরবাদী আর গোঁড়া খৃষ্টান এই দুটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত না হ'তে পারে।

নিরীশ্বরবাদী প্রচারকার্য্য এই সব পারিপার্শ্বিকে মারাত্মক। অনুন্নত শ্রমিকদের অতিমাত্রিক ভয়ের দিক থেকে নয়, যে তারা নির্ব্বাচনে একটি আসন হারাবে। প্রকৃত প্রগতিমুখী শ্রেণী-দ্বন্দ্বের দিক থেকে। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই খৃষ্টান শ্রমিক দলকে সোসাল ডেমোক্রাসির দিকে চালনা করবে, এবং তখনই নিরীশ্বরবাদী প্রচারকার্য্য নিছক প্রচারের চেয়ে শতগুণে কার্য্যকর হবে। যে আবহাওয়ার কথা এতক্ষণ বর্ণনা করা গেল নিরীশ্বরবাদী প্রচারকরা সেখানে ধর্ম্মযাজকের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করবে। এই ধর্ম্মযাজকরা চায় শ্রমিকদের মাঝে ভেদ বিবাদ, যেমন ধর্ম্মঘটী আর 'ব্ল্যাক লেগারস্' পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সৃষ্টি হ'বে নিরীশ্বরবাদী আর গোঁড়া খৃষ্টান। নৈরাজ্যবাদীদের এসব অবস্থায় ধর্ম্ম-বিরোধী অশান্ত আন্দোলন চালানর মানে ধর্ম্মযাজক আর বুর্জ্জুয়াদের সাহায্য করা। বস্তুতঃ নৈরাজ্যবাদীরা বুর্জ্জুয়াদের প্রকারান্তরে সাহায্যই করে থাকে।

কিন্তু একজন মার্কস্‌বাদী সব সময়ই বস্তুতন্ত্রবাদী—মানে ধর্ম্মের বিরোধী। তাও হতে হবে বস্তুতান্ত্রিকতার দিক থেকে, দ্বন্দ্ব মৌলিকতার দিক থেকে। তাঁর ধর্ম্ম-বিরোধী আন্দোলনটা কোন কালেই যেন বাস্তববর্জ্জিত বিশেষ কোন গুণের উপর নির্ভরশীল না হয়। যেন নির্ভেজাল কাল্পনিক নিরীশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বব্যবস্থায় প্রযোজ্য বাস্তবরাহী শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বহুকাল থেকে চলে আসছে, আর শ্রেণী-

দ্বন্দ্বই শিক্ষা দেবে গণসাধারণকে অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে বেশী।

একজন মার্কস্‌বাদীকে সব সময় যাবতীয় বাস্তববাহী পারিপার্শ্বিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে সুবিধাবাদ আর নৈরাজ্যবাদের সীমা-রেখা কোনটা। কেননা এই সীমা-রেখাটা আপেক্ষিক, আশু-অবনত, দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। সে যেন নৈরাজ্য-বাদীদের বাস্তববর্জ্জিত সগুণ, মৌখিক, ফাঁকা, 'বিপ্লবীবাদ' অথবা, ক্ষুদে বুর্জ্জোয়াদের অতিমাত্রিক 'সুবিধাবাদ' অথবা উদারনৈতিকদের বুদ্ধিবাদের ফাঁদে না পড়ে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে খাঁটী অভিযানে বিশেষ করে উদারনৈতিকরা মোটেই থাকতে রাজী নয়। এরা ভগবানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আসল দ্বন্দ্বটাকে এড়াবার চেষ্টা করে। এরা শ্রেণী-স্বার্থের আদর্শের দিক থেকে পরিচালিত নয়। কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণা, অন্যকে রুষ্ট করার ভয়ে, আর সেই ভারিক্কি উপদেশ "বাস কর এবং বাস করতে দাও" এই সব মনোবৃত্তির বশীভূত হয়েই যা কিছু করে। সোসাল ডেমোক্রাটদের মনোভাব সম্বন্ধে আর যে সব প্রশ্ন ওঠে, তা সবাই উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্থির করা হবে।

'এই কথাটা প্রায়ই শুনতে পাই যে, কোন ধর্ম্মযাজক সোসাল ডেমোক্রাট দলে ঠাই পেতে পারে কিনা? সাধারণত য়ুরোপের অন্যান্য সব সোসাল ডেমোক্রাট দলের কথা উল্লেখ করে সম্মতি-সূচক উত্তরই দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শ্রমিক আন্দোলনের পরে মার্কস-নীতির প্রয়োগ করার ফলেই এই প্রথার উদ্ভব হয়নি, পশ্চিম য়ুরোপে বিশেষ কতগুলো ঐতিহাসিক কারণের জন্যই এই প্রথা সৃষ্টি হয়েছে, অবশ্যি সে কারণগুলো রাশিয়ায় বর্ত্তমান নেই।

ফলতঃ কোন সম্মতি-সূচক উত্তর দেয়া ভুল নয়। আমরা একেবারেই জোর করে বলতে পারিনা যে, কোন অবস্থাতেই একজন ধর্ম্মযাজক সোসাল ডেমোক্রাট দলে ভর্ত্তি হতে পারবে না। পক্ষান্তরে পারবেই যে তাও নিশ্চয় করে বলতে পারিনা। কোন ধর্ম্মযাজক যদি আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার বিরোধী না হয়, যদি দলের কর্ম্মপন্থা সচেতনভাবে অনুসরণ করে, তবেই তাকে সোসাল ডেমোক্রাট দলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তা' ছাড়া আমাদের কার্য্যক্রমের উদ্দেশ্য, নীতি আর ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে, কোন বিশেষ অবস্থায়, যে বিরোধক্তি তা তার ওপরই বর্ত্তাবে, কোন রাজ-নৈতিক দল এমনভাবে কখনই পরীক্ষা করে প্রত্যেকটী সভ্য গ্রহণ করতে পারেনা যে, কোথায় সভ্যের মতবাদ আর দলের বিরোধ। অবশ্য য়ুরোপে এমনটা বড় দেখা যায় না। আর রাশিয়াতেও এর সম্ভবনা কম। পক্ষান্তরে যদি একজন ধর্ম্মযাজক সোসাল ডেমোক্রাট দলে এসে নিজেকে প্রধানত ধর্ম্ম-প্রচারে নিয়োজিত করে, তাহলে সে অবশ্য দল থেকে বিতাড়িত হবে। আমরা শুধু মাত্র শ্রমিকদের যারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী তাদের দলে ভর্ত্তি করবনা। তাদের আকর্ষণ করব যাতে তারা সোসাল ডেমোক্রাট দলে আসে। আমরা শ্রমিকদের কোন বিষয় ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধবাদী। আমরা তাদেরকে দলে আনার চেষ্টা করব, যাতে তারা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আন্দোলন চালায় তার সুযোগ দেব। আমরা দলের মধ্যে স্বাধীনমত ব্যক্ত করার সুযোগ দেই। কিন্তু বিশেষ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে গ্রুপ্‌ গঠন করার স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে। আমরা কখনই এমন কারুর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে বাধ্য নই যার মত দলের বেশীর ভাগ দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে।

আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দেখা যাক, আমরা সোসাল ডেমোক্রাট দলের কোন সভ্যকে নিন্দা করতে পারি কী যদি কেউ বলে যে 'সমাজতন্ত্র আমার ধর্ম্ম,' এবং এ প্রচারের অনুযায়ী যার মত? না, নিসন্দেহে এই সব প্রচারকার্য্য মার্কসবাদ-বহির্ভূত, ফলতঃ সমাজতন্ত্রবাদ থেকেও। কিন্তু এই মার্কস্‌বাদ থেকে বিচ্যুতির তাৎপর্য্য, এর গুরুত্ব, অবস্থা বিশেষে বিচিত্র। এ এক রকম বুঝায়, যখন কোন আন্দোলনকারী শ্রমিকদের বোঝাবার জন্য এবং নিজেকে বিশেষভাবে বুঝতে দেওয়ার জন্য তার শ্রোতার শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে "সমাজতন্ত্রই আমার ধর্ম্ম"

এই কথা প্রকাশ করে। আর যখন কোন লেখক (লুনাচারাস্কীর কোম্পানী যেমন) ঈশ্বর সমাজতন্ত্রবাদ সৃষ্টি করেছেন এই মত প্রচার করে তখন বোঝায় আলাদা কিছু। প্রথমোক্ত উদাহরণের ব্যক্তিকে নিন্দা করার মানে কোন আন্দোলনকারীর শিক্ষণীয় রীতির প্রয়োগ কৌশলের স্বাধীনতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ করা। শেষক্ত উদাহরণের ব্যক্তির বিরুদ্ধে দলের নিন্দাবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। 'সমাজতন্ত্রবাদ আমার ধর্ম্ম' এ একটা অবস্থান্তর ধর্ম্ম থেকে সমাজতন্ত্রবাদে। 'ঈশ্বর সমাজতন্ত্রবাদ রচনা করেছেন' এতে বোঝায় সমাজতন্ত্রবাদ অবস্থান্তর হয়ে ধর্ম্মে এসে পৌছেছে।

যা হোক আমরা বিচার করে দেখি কি কারণ, যার জন্য গোটা পশ্চিম দেশে "ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার" এই সূত্রের পশ্চাদানুসরণ করে সুবিধাবাদী-ব্যাখান ক্ষেপে উঠেছে। যদিও এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্বার্থের বলিদান দিয়ে সাময়িক সুবিধা সুযোগ খোঁজার মনোবৃত্তিটাই প্রভাব-বিস্তারকারী একটা বিশেষ কারণ।

সর্ব্বহারা দল রাষ্ট্রের কাছ থেকে এ ঘোষণা দাবী করে যে, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু তা' বলে এ কোন রকমেই মনে করা চলতে পারে না যে, তারা মানুষের এই নেশাগ্রস্তকারী ধর্ম্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে সিদ্ধান্ত করেছে। সুবিধাবাদীরা জুটে বাজে ব্যাখ্যা করে সবার মনে এই ধারণার সৃষ্টি করছে যে, সোসাল ডেমোক্রাটরা ধর্ম্মকে নিছক ব্যাক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করে। অধিকন্তু, সুবিধাবাদীদের সচার আচার বিকৃত ব্যাখ্যা বাদেও, আমাদের ডুমা-প্রশাখা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের ব্যক্ত করতে একেবারেই সক্ষম হয়নি। আজ যে য়ুরোপের সোসাল ডেমোক্রাটরা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন তা' কতগুলো বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ থেকে উদ্ভূত। এর কারণ দুটো। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অভিযান চালানো, সে বিপ্লবী বুর্জ্জোয়াদের ঐতিহাসিক করণীয় কার্য্য। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের সে ঐতিহাসিক করণীয় কার্য্য বিপ্লবের সময় এবং মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় অনেকটা পরিমাণে সাধিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদ জন্মাবার বহুপূর্ব্বে ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর উভয়েরই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধে বুর্জ্জোয়া আক্রমণ চালাবার একটা ঐতিহ্য আছে।

কিন্তু রাশিয়ার বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশেষ কারণের জন্য এই দায়িত্বটা—মানে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধে অভিযান চালানোটা, শ্রমিক দলের ওপরে ন্যাস্ত হয়েছে। ন্যারোডিস্কের ক্ষুদে বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক দল এ বিষয় বিশেষ কিছু এগোতে পারেনি। (যেমন ভেখির নবোঙ্কুরিত ব্ল্যাক হানড্রেড ক্যাডেট্‌ অথবা ক্যাডেট্‌ ব্ল্যাক হানড্রেড মনে করে)। য়ুরোপের তুলনায় খুব কমই এদের অগ্রসরতা।

পক্ষান্তরে নৈরাজ্যবাদীরা, যাঁদের সম্বন্ধে মার্কস্‌সন্থীরা বার বার দেখিয়েছেন যে, তারা বুর্জ্জোয়া দর্শন গ্রহণ করা সত্ত্বেও বুর্জ্জোয়াদের কি রকম উগ্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং সরাসরি নির্দ্দিষ্টভাবে বেশ কায়েদা করে বুর্জ্জোয়া ধর্ম্ম-বিরোধী অভিযানের ঐতিহ্যটাকে বুর্জ্জোয়া ব্যখ্যা দিয়েছে। নৈরাজ্যবাদীরা, লাটিনদেশের ব্লাঙ্কুইষ্টরা, জোহানমোষ্ট, ভাল মনে যে নাকি আবর ডুরিংএর শিষ্য ছিল—জার্ম্মানীর অন্যান্যরা, আশী দশকের অষ্ট্রিয়ার নৈরাজ্য-বাদীরা—এরা সবাই ধর্ম্ম-বিরোধী অভিযানে বিপ্লবী প্রবাদ-গুলো পরিপূর্ণ মাত্রায় বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সোসাল ডেমোক্রাটরা, পশ্চিমের এই সব ঘটার জন্য যে ঐতিহাসিক কারণগুলো প্রকট হয়েছে, সে সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন হ'বে না।

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমের জাতীয় বুর্জ্জোয়া বিপ্লব শেষ হবার পরে, ধর্ম্মের স্বাধীনতাও কম বেশী দান করার পরে, গণতান্ত্রিক ধর্ম্ম-বিরোধী অভিযানের প্রশ্নকে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র আর সমাজ-তন্ত্রের দ্বন্দ্বে হটে নেপথ্যে দাঁড়াতে হ'ল। আর এই দ্বন্দ্ব এতখানি গড়াল যে বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টগুলো জন-সাধারণের সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি মনকে ভ্রষ্ট করার জন্য ইচ্ছা করে ধর্ম্মযাজকদের বিরুদ্ধে এক উদারনৈতিক আন্দোলন চালাতে লাগল। এ হচ্ছে জার্ম্মানীর 'কালচার

ক্যাম্পেইং'ব' মোটামুটি সাবংশ এবং পশ্চিমী সোসাল ডেমোক্রাটদের ধর্ম্ম-বিরোধী বিপারিকান অভিযানের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মযাজক-বিরোধী আন্দোলন, যা নাকি শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ থেকে মনকে ভ্রষ্ট করেছিল।

যাই হোক সোসাল ডেমোক্রাটরা বুর্জ্জুয়া বা বিসমার্কীয়ান আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তাদের ধর্ম্ম বিরোধী অন্দোলনকে সমাজতন্ত্রবাদের অভিযানের এলাকাধীন করে রাখতে চায়। ন্যায় সঙ্গতভাবে তারা এই মতবাদ প্রচার করতে বাধ্য। রাশিয়ার অবস্থা অন্যরূপ, কাজেই তার ব্যবস্থাও আলাদা। এখানে সর্ব্বহারারা হচ্ছে বর্জ্জুয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারী জরাজীর্ণ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে,অথবা তাকে পুনরুজ্জীবিত বা অন্য নক্সায় ঢালাই করার কোন রকম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, এই সর্ব্বহারার দল চিন্তাশীলতার নেতৃত্ব করবে।

এঙ্গেল্‌সের সুবিধাবাদের ওপর টিপ্পনী অপেক্ষাকৃত মৃদু। কেননা এই জার্ম্মান সোসাল ডেমোক্রাট পার্টি, যারা শ্রমিকদলের দাবীর অনুকল্প একটি দাবীতে বলেছিল যে, রাষ্ট্র, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা করুক এবং পার্টি ঘোষণা করুক যে, ধর্ম্ম প্রত্যেক জার্ম্মাণ সোসাল ডেমোক্রাট দলের সভ্যদের ব্যক্তিগত হবে এবং তা' দল হিসাবেও ব্যক্তিগত বলে গণ্য হবে। এ বেশ পরিষ্কার যে, এই জার্ম্মাণ বিকৃত ব্যাখ্যার নজীরের সহয়তায় রাশিয়ায় যে সব সুবিধাবাদীরা মেতে উঠেছে, তারা ওদের চেয়েও শত গুণে নিন্দনীয়। *

* লেনিনের 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে" বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য অংশ মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি—লেখক।

ত্রিপুরী-রঙ্গমঞ্চে

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

[নির্জ্জন জায়গায় একটী তাঁবু, বাপুজীর জন্য তৈরী হইয়াছিল, তিনি আসিতে পারেন নাই বা আসেন নাই। বিষ্ণুদত্ত নগর হইতে একটু দূরে একপ্রান্তের এই তাঁবুটী খালিই পড়িয়া ছিল। শুধু একটী হৃষ্টপুষ্ট ছাগল একাকী তাঁবু পাহারা দিতেছে। সন্ধ্যা হইতেই লোকজন বড় বড় ও পুরু দামী গালীচা এবং তেমনি বড বড ও মোটা তাকিয়া দিয়া আসর সাজাইয়া রাখিয়াছে। ছাগলটা চাহিয়া চাহিয়া এদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল, ভাবে মনে হয় এ-সব সে মোটেই পছন্দ করিতেছিল না। তা'ছাড়া বাপুজী না হয় নাই আসিয়াছেন, কিন্তু তার নামে উচ্ছুগ্য-করা তাঁবুতে গান-বাজনা, খানাপিনা কবা—দুগ্ধবতী ছাগ মুখ রুষ্ট করিয়া ও বুজিয়া নিবাসক্তভাবে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আসর সাজাইয়া লোকগুলি চলিয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল। অদূরে বিষ্ণুদত্তনগরে ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি একে একে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে তাঁবুর শিওরের কাছে পাহাড়টির ছায়া দীর্ঘতর ও কালোতর হইয়া উঠিতে লাগিল। একাকী পাহাড়টা নর্ম্মদার জলে নিজের ছায়া ফেলিয়া তার দিকে ধ্যানমুগ্ধ তপস্বীর মত চাহিয়াই ছিল। চঞ্চল নর্ম্মদা জল লইয়া বহিয়া যাইতেছে, পাহাড়েব কালো ছায়াটাকে কোনমতেই ভাসাইয়া নিয়া যাইতে পারিতেছেনা, বা ছায়াটাকে জলে ধুইয়া-মুছিয়া লইতেও পারিতেছেনা, কিম্বা গলাইয়া নিজের সঙ্গে মিশাইয়াও নিতে পারিতেছে না।

লোকজন কেহ সেই নির্জ্জন স্থানে আসিতেছে না দেখিয়া ছাগ-মাতা উঠিয়া তাঁবুর ভিতরে গিয়া ঢুকিল। কয়েকটা তাকিয়া নাক দিয়া শুঁকিয়া স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিল, তারপর খুরের চিহ্ন, কয়েকটার উপর লাঞ্ছনার মত রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বস্থানে আসন নিল।

* * * * *

রাত্রি আরও একটু গভীর হইল। অন্ধকারে প্রধান অমাত্য শুক্ল শুভ্র গুম্ফ নিয়া সেনাপতি ছেদীলাল সহ জায়গাটা তদারক করিয়া গেলেন। দেখা গেল স্থানে স্থানে অন্ধকারে স্বদেশী পুলিশ পাহারায় মোতায়েন আছে। তাদের উপর কড়া আদেশ আছে, কাহাকেও এ পাড়ায় আসিতে না দেওয়া, এবং অসতর্ক পথিক পরে কৌতূহলী দর্শক যদি কেহ আসে তবে তাদের সাবধান করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া।

অন্ধকারে কে একজন তাঁবুর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।]

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখানে বসে কে?

—আজ্ঞে, আমি গোবিন্দ দাস।

—গোবিন্দ দাস? গোবিন্দবল্লভ, যত গোবিন্দের পাল্লায় পড়েছি। ওহে গোবিন্দ, অন্ধকারে চোরের মত ব'সে যে?

—আজ্ঞে, পাহারা দিচ্ছি। সর্দ্দারজীর হুকুম।

—বেশ করছ। সর্দ্দারজী ভালো দারোয়ান্‌ই পেয়েছে। আর সব গোবিন্দরা এসেছেন?

—আজ্ঞে?

—শেঠ্‌জী?

—আজ্ঞে?

—কি আজ্ঞে আজ্ঞে করছ। জিজ্ঞেস করছি, সব ঠিক আছে তো?

—আজ্ঞে কিসের?

—শেঠ্‌জী তুমি যে এত বড় গোবিন্দ, তা' আমি জানতাম না। খুলে না বল্লে কথা বুঝতে পাব না? জিজ্ঞেস করছি, সব ঠিক আছে তো?

—আজ্ঞে, তা' আছে বৈ কি।

দেবী ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

ভিতরে তখন গুপ্ত বৈঠক চলিতেছিল। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই পাশের তাকিয়াটাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দেরী হোল যে?

পাশে বয়স্থ কৃপালনী বব্‌ড্‌ করা মাথা ও রোগা দেহ লইয়া বসিয়া ছিল, কহিল,—দেখছেন না মোটা মানুষ; চলতে একটু সময় লাগবে বৈ কি!

মিসেস্ নাইডু পা দিয়া একটা তাকিয়া সরাইয়া লইয়া হাটু ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে বসিলেন, তারপর কৃপার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ফাজিল ছোক্‌রা, কথায় তো দেখি বাহার আছে। মোটা শরীর ও মোটা বুদ্ধি, এ-দুইয়ের মধ্যে কোনটা খারাপ তা' বলতে পার?

ওপাশ হইতে মৌলানা আজাদ কহিলেন,—আহা, চটো কেন? রসিকতা বোঝ না—খামাকা বাঙ্গালী হয়েছ।

মিসেস্ নাইডু কহিলেন,—সাবাস সাহেব, কিন্তু বাঙ্গলার বাইরে রসিকতা সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না,—যত সব 'শিবসি-যা-লিথ'—বুঝলে না? বলিয়া সকলের দিকে ইঙ্গিতে দেখাইবার জন্য চক্ষুটা ঘুরাইয়া লইলেন।

মৌলানা সাহেব কহিলেন,—যা বলেছ। আঃ, কি করছ, দেখে ছাই ঝাড, আমার জামাটা তো আর এ্যাস্-ট্রে নয়। বলিয়া পণ্ডিত জহরলালের বাঁ হাতটা ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। জহরলাল চোক বুজিয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া ছিলেন, চোক বুজিয়াই তেমনিভাবে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

তার পাশে বিরাট বপু নিয়া গোবিন্দবল্লভ বসিয়া আছেন, অস্থির হইয়া সর্দ্দারজী কহিলেন, উত্তর দিলেন না?

সর্দ্দার কহিলেন, কিসের?

—আপনাদের স্মৃতিশক্তি দেখ্‌ছি ভোঁতা হয়ে আস্‌ছে। জিজ্ঞেস করছিলাম এ নাটকের নায়ক কে হবে?

বয়স্য কৃপা কহিয়া উঠিলেন,—একি একটা প্রশ্ন হল? নায়ক তো বাপুজীই আছেন।

পন্থ চটিয়া কহিলেন,—সবটার মধ্যে তোমার কথা বলা চাই। সেদিন আহাম্মকের মত ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে বসলে যে, সুভাষ বাবুর সত্যই কি জ্বর হয়েছে? থার্মোমিটার দিয়েছিলেন তো? ভাগ্যিস কোন বাঙ্গালী কাছে ছিল না।

কৃপালনী কাঁপিল না, কহিল,—আমার দোষ কি। ভুলাভাই তো বলেছিলেন যে জ্বরটর কিছু না, সব ফাঁকি। বোম্বে থেকে ডাক্তার গিল্ডারকে আনবার মতলবও উনি করেছেন।

পন্থ উত্যক্ত হইয়া কহিলেন,—জ্বরটর সব যে ফাঁকি তাতো আমরাও জানি। কিন্তু তোমার মতো বল্‌তে গেছে কে শুনি? রাস্তায় একদিন মারধর খাবে আমি বলে রাখলাম। যাক্,—যা জিজ্ঞেস করছিলাম, তার উত্তর দেও। নায়ক কে হবে?

সর্দ্দার কহিলেন,—বাপুজী ছাড়া আমাদের আর নায়ক নেই।

—কিন্তু তিনি তো আসছেন না।

—তিনি আস্‌তে চাইলেও আমি আস্‌তে দেব না। এসে সব নষ্ট করে দিন্ আর কি।

মিসেস্ নাইডু কহিলেন,—তুমি আনতে চাইলেও আসবার পাত্তর তিনি নন্। তিনি জানেন যে, নোংরামী কাজ, চালবাজি মতলব এ-সব বিষয়ে তোমার কাছে তিনি শিশু। এসব বিষয়ে একমাত্র তোমারই অধিকার আছে, আর হাতযশও আছে।

পন্থ উত্যক্ত হইয়া কহিলেন,—আপনাদের কেন যে মানুষ আলোচনার সভায় ডাকে, আমি বুঝি না। কাজের কথায় কেউ যাবে না, বাজে কথার বেস্পতি।—বাপুজী আসছেন না, এখন আপনারা নায়ক ঠিক করে ফেলুন।

মৌলানা সাহেব কহিলেন,—জহর জন্ম থেকেই হিরো, হিরোর পার্ট ছাড়া অন্য কিছুতেই সে নাই। একমাত্র বাধা বাপুজী, তাকে সরাতে পারলেই রাস্তা পরিষ্কার। বাপুজীর তো হয়ে এসেছে, এই রাজকোটেই যেত, এই কয়টা দিন সবুর কর, প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ থেকে একেবারে হিজ্ ম্যাজিষ্টি।

পন্থ কহিলেন,—জহর তুমি কি বল?

জহরলাল চোক মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি সম্বন্ধে?

—ইদানীং তুমি বড় অমনোযোগী হয়ে উঠেছ। সমস্ত মন তোমার পড়ে আছে স্পেন-চেকোশ্লাভেকিয়া-চীন ইত্যাদিতে। দয়া করে একবার নিজের পাড়াটার দিকে একটু নজর দেও দেখি,—তাতে তোমার মহত্ত্বে ও উদারতায় কালি পড়বেনা। নিজের দেশকে বিদেশ মনে

করলে যদি মনোযোগ দিতে তোমার সুবিধা হয়—তাই না হয় কর।

জহর কহিলেন,—এ-দেশের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে, এখানে আমি পর দেশী। যাক্—কি জিজ্ঞেস করছ।

—জিজ্ঞেস করছি,—বাপুজী নায়ক, অথচ তিনি আসছেন না। তিনি নাই—তবু আছেন, কথাটা ব্যাটাদের কেমন করে বুঝানো যায়।

জহর জবাব দিলেন,—ও-সব আমার মাথায় খেলে না। যে নাই—সে আছে, এ-সব ভেলকী খেলানো আমার কর্ম্ম নয়। ভাই ভুলাকে বরং জিজ্ঞেস করতে পার, ওর আইনের মাথা, সত্য মিথ্যা ফরমাস মত তৈরী করতে পারে।

পন্থ চারিদিক চাহিয়া ভাই ভুলাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি গেলেন কোথায়?

কৃপালনী পর্দ্দা ঝুলানো একটা কক্ষের দিকে দেখাইয়া কহিলেন,—ঐ ঘরে।

সর্দ্দারজী কহিলেন, থাক্, ডেকে আর কাজ নেই। বেহুঁস হয়ে ঘুমাচ্ছে।

মিসেস্ নাইডু—সত্যই আপনার ধৈর্য্য ও সংযম প্রশংসনীয়। আপনি কেমন করে এতক্ষণ জেগে আছেন, তাই ভাবছি।

কৃপালনী কহিলেন,—উনি অ-তন্দ্র।

মিসেস্ নাইডু—মানে?

কৃপালনী—মানে উনি জন্ম-সজাগ, ঘুমের মধ্যেও এঁর জ্ঞান টন্‌টনে থাকে। এ-যুগের সব্যসাচী আর কি,—ঘুমে ও জাগরণে, উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞান সচল।

পন্থজী আবার উত্যক্ত হইয়া কহিলেন,—কাজের কথা কিছুতেই হবার যো নেই। বাপুজী যে কী চীজ্ নিয়ে কারবার করেন ভাব্‌ছি।

মিসেস নাইডু—খামোকা চট্‌ছ। বাপুজীও যেমন, এরাও জুটেছে তেমন। শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ আর কি। তুমি বরং বাপুজীর বিবেক-বলদকে জিজ্ঞেস কর।
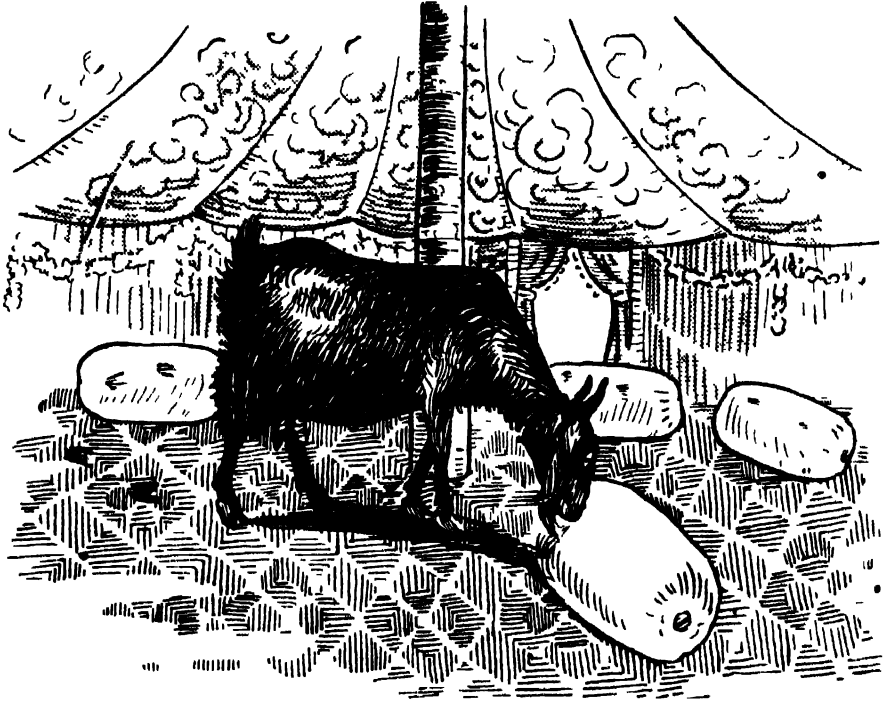
কৃপালনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—বিবেক-বলদ? সে আবার কে? কার কথা বলছেন?

এক প্রান্তে গোপাল রাজা চুপ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। জাগিয়া আছেন বা ঘুমাইতেছেন—বুঝিবার উপায় নাই, কারণ রঙ্গীন চশমার আড়ালে চোক-ঢাকা ছিল।

তিনি কহিলেন,—আমার কথা বলছেন। তোমাদের বাপুজী আমার কাছে তার বিবেক গচ্ছিত রেখেছেন কিনা—তাই আমার এ-নাম।

মৌলানা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাপুজীর বিবেক,

সেতো আর চাট্টিখানি বোঝা নয়। আচ্ছা, ও-জিনিষ বইতে আপনার কষ্ট হয় না?

—মোটেই না। কারণ আপনাদের বাপুজীর বিবেক এমনি সাত্ত্বিক যে তাতে পদার্থ ব'লে কিছুই নেই। এ শুধু তিনি জানেন, আর জানি আমি নিজে, কারণ আমাকে তা বইতে হয়।

মৌলানা সাহেব চমকিত হইয়া কহিলেন,—বলেন কি? বাপুজীর বিবেকে পদার্থ কিছুই নাই? খুলে বলুন, কথাটা বিশ্বেস করতে পাবলে যে বেঁচে যাই।

গোপাল রাজা কহিলেন,—সত্যিই নাই। বিশ্বাস না হয়, সর্দ্দারকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন।

সর্দ্দারের দিকে মৌলানা তাকাইতেই তিনি কহিলেন,—আমাকে কেন আর টানছেন। আমি অপ্রিয় সত্য বলতে অভ্যস্ত নই।

মিসেস্ নাইডু—তা জানি। অপ্রিয় কাজ করতেই আপনি ভালোবাসেন, এবং তাই শুধু করে থাকেন। রাজা, আপনিই বলুন।

গোপাল রাজা,—বেশ, আপনারা প্রসাদবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রসাদবাবু মুখ রুষ্ট করিয়া কহিলেন,—আমি গুরু নিন্দা করি না। বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথায় যাচ্ছেন? বসুন—যাবেন না।

—না, যাবেন না। বেঁচে থাকলে অনেক বসতে পারব, এখন আর নয়।

প্রসাদবাবু দ্রুতপায়ে বাহির হইয়া গেলেন।

মৌলানা সাহেব—রাজা বলুন তবে। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠ্‌ছি।

—দেখুন, এদিকে সুভাষবাবু তো হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছেন। বাপুজী ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন যে, দেশীয় রাজ্যে পাপ ঢুকেছে। পাপ খেদাবার জন্য ওঝা সেজে রাজকোটে যাত্রা করবেন, পথের মুখে এসে একটা ছোক্‌রা দাঁড়াল। বল্ল, ঢেনকানেল থেকে এসেছে, বাপুজী যদি একবার সেখানে যান। শুনে বাপুজী এমন অনাসক্তি-গীতা ঝাড়লেন যে, ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে গেল। ঢেনকানলে এগারোবার গুলি চালিয়েছে, হরিরলুট চলেছে, আর তুমি ব্যাটা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছ? পরে যদি ওরা গুলি না ছাড়ে, যদি ষড়যন্ত্র করে এসব উৎসব বন্ধ করে দেয়—তবে দেশের জন্য মরবার ফুরসৎ কি আর মিলবে? যাও—দৌড়ে যাও। পাপ আমাকে টেনেছে—আমি রাজকোটে যাচ্ছি।

—সর্দ্দারজী—আমি একথার গুহ্য তত্ত্ব জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছিলাম, উত্তরে জানিয়েছেন—inner voice.

—সে আবার কি?

—তা আপনারা বুঝবেন না। প্রত্যাদেশ যে কি, তা বাপুজীও বোঝেন না, তবে শুনতে পান।

—সত্যিই কি শুন্‌তে পান?

—পান বৈকি। তিনি নিজেকে বিশ্বাস করান যে, ঠিক শুনতে পেয়েছেন। আসলে বেহাইটী আমার আস্ত একটী ঘুঘু। চটবেন না যেন, বেহাই মানুষ, রসিকতা করতে পারি।

মৌলানা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—মহাপুরুষ চরিত্র যত শুনি ততই মুগ্ধ হই। চল জহর, দেখে আসি—ভুলা-ভাই আমাদের ভুলে গিয়ে কোন সুখে আছেন।

কৃপা কহিলেন,—একটু বসে গেলে আমরাও যেতে পারতাম।

সর্দ্দার কহিলেন,—কি ব্যস্ত হচ্ছ। দু-মিনিট স্থির থাক্‌তে পার না?

কৃপা দন্ত বাহির করিয়া লজ্জা প্রকাশ করিল মৌলানা জহরকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে কহিলেন,—দেবী, আসবেন তো আসুন।

মিসেস্ নাইডু হাঁটুতে ও হাতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, কৃপা সাহায্য করিতে যাইতেছিল, দেবী বিনীত স্বরে কহিলেন—থাক, থাক।

জহর ও মৌলানার পশ্চাতে দেবীও ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পন্থ চটিয়াছিলেন, কহিলেন—তুমি রইলে কোন আক্কেলে? যাও না।

সর্দ্দার—থাক্।

পন্থ—বল্লেন না, যে নাই—সে আছে, একথাটা কেমন করে পাশ হয়।

রাজা—খুব হয়। রবিবাবুর নাম শুনেছেন?

কৃপা—কোন্ রবিবাবু? ফাঁকি দিয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে যে? লোকটাকে আমি মোটেই দেখতে পারিনে, বাপুজী পেলেন না, আর উনি মেরে নিলেন।

দেখ, তোমার বাপুজীকে বাঙ্গালী জাতটা মোটেই কেষ্ট-বিষ্টু মনে করে না। আর করবেই বা কেন। ওদের রামমোহন—রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ-অরবিন্দ, কত লোক রয়েছে। তোমার বাপুজীর কাছে শেখবার ওদের কিছু নাই। তাছাড়া জান তো, বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও এদেশে সভ্যতা-কালচার ইত্যাদি আপদবালাই নাই। পৃথিবীতে তোমার বাপুজী ছাড়া রবীন্দ্রনাথও অতি-

রাজা—তুমি দেখতে না পার ক্ষতি নেই, কিন্তু কথাটা যেন আবার ঢোল পিটিয়ে বেড়িও না।

পন্থ—খামোকা বলছেন। কোন কথা বলতে নেই, দেখলেও বিশ্বেস করতে নেই, শুনলেও সায় দিতে নেই—এত বুদ্ধি ওর কাছে আপনি প্রত্যাশা করবেন না। ভাবে যে, যত বলতে পারবে, ততই লোকে বুদ্ধিমান বলবে। এদিকে তো দেখি আচার্য্য পদবী লেজের মত জুড়েছে, আর এটা জান না—'তাবচ্চশোভতে'। তারপর আপনি বলুন।

রাজা—তার আগে আচার্য্যকে একটা কথা বলে নেই পরিচিত ও সম্মানিত। এ-লোকটা যদি বাপুজীর কাজকর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন—তবে তাতে তোমার অবতারের তেমন সুবিধা হবে না,—বুঝলে? তাই—ওর সম্বন্ধে তোমার মনে যা থাক্, চেপে যেও। বুঝলেন পন্থজী, বাপুজীটিও কম ঘুঘু নন, গুরুদেব গুরুদেব বলে বুড়া কবিকে হাতে রেখেছেন।

পন্থ—কাজের কথা বলুন।

রাজা—বলছি। যা নাই—তা আছে, এইতো আপনার সমস্যা?

পন্থ—হুঁ।

রাজা—রবিবাবুর এক নাটকের নায়ক রাজা, সারা নাটকটা জুড়ে আছেন, কিন্তু কোথাও দেখা দেন নাই। বাপুজীও তাই—কংগ্রেস জুড়ে আছেন, কিন্তু দেখা দেন না। রবিবাবুরই কবিতাতে আছে—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।' বুঝলেন তো?

পন্থ—খুব বুঝেছি, আপনি রসিকতা করছেন। আপনিও যে এমনি রহস্য করবেন, এ জানলে আমি এখানে আসতাম না। আপনারা কেউ সিরীয়স নন্, কাজের কথা আপনাদের সঙ্গে চলে না। আজ আমি উঠি। ওদিকে বারানসীতে হাঙ্গামা দেখে এসেছি,—এখানে অনর্থক এতগুলি সময় নষ্ট করলাম। সর্দ্দারজী, আমি এই গাড়ীতেই যাচ্ছি।

সর্দ্দার—আপনিও যদি গরম হন, তবে আর আমার কিছু বলবার নাই। বারাণসী নিয়ে ভাবছেন,—এদিকে নিজেদের কথা ভাবলেন না। সুভাষবাবু যদি ঠেলা দেয়, তবে মন্ত্রী থাকাও চলবে না, বারাণসীর ভাবনাও আর ভাবতে পারবেন না—এটা ভেবে দেখেছেন কি? নিশ্চিন্ত না হয়ে আমরা ফিরব না—এ প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেন!

পন্থ—কিছুই আমি ভুলিনি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গগুণে কিছুই মনে রাখবার যো নেই। বেশ, বসলাম। আপনারাই আলোচনা করুন, আমি ওর মধ্যে নেই।

কৃপা—পন্থজী, আপনি যদি না চটেন তবে রাজাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করে নেই।

পন্থ—বাচাল, বালক ও পাগলের কথায় আমি চটি না, বড়জোর বিরক্তি বোধ করি।

কৃপা—বেশ, দয়া করে তবে খানিকক্ষণ একটু বিরক্তি বোধ করুন। আচ্ছা, রাজাজী- বাপুজীর 'আত্মজীবনী-খানা' দিয়ে নোবেল-প্রাইজ পাওয়া যায় কিনা, চেষ্টা করতে দোষ আছে কি? সাহেবেরা পর্য্যন্ত প্রশংসা করেছেন,—বাইবেলের মত ইংরেজী হয়েছে, এ-নাকি বলেছেন।

রাজা—তা' চেষ্টা করতে পার। তারচেয়ে পুলিশ-কোর্টের কেসগুলি দাখিল করে দেখাতে পার, তাতে 'কনফেশন' এমন পাবে যে বাপুজীর চেয়ে তা বেশী সরল স্বীকার বলে তুমি মানবে।

কৃপা—থাক্ দরকার নাই। আপনি যেন ওঁর কোন কাজই ভালো দেখেন না। আজ যে আপনার এত নাম, বুদ্ধির এত প্রশংসা, আর এই যে প্রধান অমাত্য হয়েছেন—এ কার জন্য, জানেন?

রাজা—জানি, তোমার বাপুজীর জন্য। তাঁকে মহাত্মা হ'তে সাহায্য আমি কম করিনি। অন্য কারুকে সাহায্য করলেও এ জিনিষ পেতাম। চাকরী করব—তার মাইনে পাব, এতে তোমার বাপুজীই মনিব হোন, আর সুভাষবাবুই মনিব হোন—আমার কিছু ক্ষতি হোতনা। তুমি জান না, কিন্তু তোমার বাপুজী জানেন—আমাদের এ-ব্যবসায় আমরা শপথ করে নেমেছি। বাপুজীকে মহাত্মা হতে আমরা যেমন সাহায্য করব, তিনিও তেমনি আমাদের ছোটখাটো কেউ-কেটা হতে সাহায্য করবেন। আমাদের ছাড়া তিনি অচল, তিনি ছাড়া আমরাও অচল। আচার্য্য, এ আমাদের লেনদেনের কারবার। ভিতরের খবর তুমি জান না। সর্দ্দারজীকে জিজ্ঞাসা কর,—তিনি কেমন করে বাপুজীর ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং হয়ে উঠছেন।

কৃপা—থাক্, শুনে কাজ নাই। তাছাড়া এসব কথা আমি বিশ্বাস করব না।

রাজা—বুদ্ধির এত জোর তোমার কাছে, আমি প্রত্যাশা করি না, যাতে বাপুজীকে একদলের লোক ভাবতে পারবে। যাক্, এখন কাজের কথায় আসা যাক্। আমি কয়েকটী কথা আগে পরিষ্কার করে নিতে চাই। জানেনই তো—সব জিনিষ বুঝে নেওয়া আমার স্বভাব। খারাপ কাজ পর্য্যন্ত জেনেশুনেই আমি করি। নিজের নিকট আমি আসল পাকা হিসাবটা বরাবর রাখি, বাইরের হিসাবটা বাইরেই পেশ করি।

সর্দ্দার—বেশ, জিজ্ঞেস করুন।

গোপাল রাজা—সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে আপনাদের নালিশ কি?

সর্দ্দার,—বাপুজী তার উপর ভয়ানক চটেছেন, তাকে তিনি চান না।

গোপাল রাজা—ও, এর পর তো আর কথাই থাকে না। বাপুজী চান না, এর পরেও সুভাষ বাবু বেঁচে আছেন

কোন লজ্জায়। তা' যাক্, বাপুজী তাকে পছন্দ করেন কি না—জানি না, কিন্তু আপনি যে তাকে চান না তাতে সন্দেহ নাই।

সর্দ্দার—কি যে বলেন। আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কি আসে যায়।

গোপাল রাজা—অনেক আসে যায়। আপনার চাওয়াই তো বাপুজীর চাওয়া। জীবন-মুক্ত পুরুষ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিজের কাছে আর রাখেননি, এগুলি এখন আপনাব জিম্মায় আছে। তা বেশ, বাপুজীই তাকে চান না, কিন্তু কেন চান না?

সর্দ্দাব—সুভাষবাবুর উপব বাপুজীব বিশ্বাস নাই।

গোপাল বাজা—বাপুজীব উপবও সুভাষবাবুব বিশ্বাস নাই। এ-বৈতবণী পাব হবাব তিনিই একমাত্র আদিম ও অকৃত্রিম তা' সুভাষবাবু যদি বিশ্বাস না করেন, তবে চটবার কি আছে?

সর্দ্দাব—তা' আপনি বাপুজীকেই জিজ্ঞেস করবেন।

গোপাল রাজা,—আচ্ছা। আপনি একটু চেষ্টা কবে দেখুন, সুভাষবাবুব দোষগুলির একটা লিষ্ট্ কবতে পাবেন কি না।

সর্দ্দার,—মিথ্যা দোষ আমি ধরি না। সত্য কথা বলতে আমি ডবাই না, পরিষ্কার মুখের উপব বলে দিয়েছি,—তাব election harmful to the intertest of the country.

গোপাল রাজা—ভালোই করেছেন, বল্লে মুখেব উপবেই বলবেন। harmful কেন? তাকে আপনাবা বাগাতে পারবেন না—এই তো?

সর্দ্দার—এ-ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া কষ্টকর।

গোপাল রাজা—বেশ, অন্য ভাবেই জিজ্ঞেস কবছি। আপনারা federation নিতে চান, অবশ্য কিছু অদলবদল করে—এটা ঠিক কি না?

সর্দ্দার—শেষে আপনি এ প্রশ্ন করবেন—এ আমি আশা করিনি।

গোপাল রাজা—কেন আশা করেন নি? আমি তো বলেছি যে, আগে আমি ব্যাপারটা আদি-অন্ত সব বুঝে নিতে চাই।

সর্দ্দার—আপনি নিজেই কি প্রথম এ পরামর্শ দেন নাই যে, ফেডারেশন আমাদের নেওয়া উচিৎ এবং যতটা অদল-বদল করে নিতে পাবি তা চেষ্টা করতে হবে? এজন্য বাপুজীকে খাটিয়ে নিতে হবে। বলুন, এ আপনি বলেন নি?

গোপাল রাজা—বলেছি। এখনও বলছি, আপনাদেব ফেডাবেশন নেওয়া উচিৎ—বাপুজী বেঁচে থাকতে থাকতে তা করা দরকাব। নইলে ক্ষমতা, সুযোগ জীবনে আব আপনাদেব হাতে আসবে না। একথা আজও আমি বলি। কেন বলি, তার কাবণও আমি দিয়েছি। কিন্তু আমি জানতে চেয়েছি যে, ফেডাবেশন নেওয়া ঠিক কবেছেন কি না? আমাব পবামর্শ আপনাবা অনুমোদন করেছেন কি না?

সর্দ্দাব—বাপুজী বাজী হয়েছেন।

গোপাল রাজা—ব্যস তবে ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ফেডারেশন গ্রহণে আপনাদের অন্তরায় কে?

সর্দ্দার—Socialist, Communist আর ঐ বাংলাব Revolutionary, এবা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে।

গোপাল বাজা—জহর বিরুদ্ধে যাবে?

সর্দ্দাব—না। বাপুজীব ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তার মনে উঠবে না।

গোপাল রাজা—তবে Socialist-দেব নিয়ে ভাববাব দরকার নাই। ভারতে Socialism প্রচারে যে সব চেয়ে বড় পাণ্ডা তাকে দিয়েই Socialismকে ঠাণ্ডা করতে হবে। এবার ত্রিপুবীতেই এই সমাজতন্ত্রবাদকে এমন যখম করতে হবে, যেন তা সামলাতে এক যুগ লাগে। এবং, সে জখম এই Indian Lenin জহরকে দিয়েই করতে হবে।

সর্দ্দার—আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

গোপাল রাজা—তবে বাপুজীর ছত্রছায়ায় থেকে যুক্ত ভাবতেব একচ্ছত্র নায়ক হতে পারেন—না? আচ্ছা, তারপর পেশোয়ারের ঐ লালকুর্ত্তা গুণ্ডার দল, ওদের নিয়ে ভাববার আছে কি? মানে খাঁনগফুর বাধা দেবে না তো?

সর্দ্দার—পাগল হয়েছেন? সীমান্তগান্ধী যাবে আসল গান্ধীর বিরুদ্ধে?

গোপাল রাজা—ব্যস। এরপরে থাকে Communist দল। এদের নিয়েও বোধ হয় ভাববার দরকার এখন পর্য্যন্ত হয়নি, কি বলেন?

সর্দ্দার—এরা পরে খুব ভোগাবে। যাক্, সে আমি পরে বুঝে নেব। 'ইহুদীতাড়ানোর সমস্ত কায়দা-কানুন আমি গোবেল্‌স ডাক্তারের কাছ থেকে আনিয়ে নিয়েছি। রাজা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—ভারত থেকে ওদের উচ্ছেদ করব করব করব।

গোপাল রাজা—সাধু সঙ্কল্প। এম, এন, রায়কে ভুলে যাবেন না। যাকেই রেহাই দেন—ওকে বাঁচতে দে'বেন না যেন। লোকটা ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ। দেখে নেবেন, একদিন ব্যাটা ক্ষমতা হাতে নেবেই নেবে। সতর্ক যদি না হোন, তবে অদৃষ্টে আপনাদের দুঃখ আছে। ওকে নিয়ে আপাততঃ ভাববার কারণ নেই। আচ্ছা, কৃষাণ-সভার দিক দিয়ে কোন ভয় আছে?

সর্দ্দার,—তেমন বর্ত্তব্য নয়, পরে কি হয় বলা যায় না, তবে সেদিকেও চোখ রেখেছি। হাঁ, স্বামী সহজানন্দকে শেষ করতে হবে। রাজেনবাবুর রক্ত-আমাশা তো আর খামাকা হয় নি।

রাজা—ভোগাবে দেখ্‌ছি।

সর্দ্দার—সে আমি দেখে নেব। আপনি শুধু ত্রিপুরীটা পার করে একবার ফেডারেশনের রাস্তায় আমাদের পৌঁছে দিন, তারপর আমি সব ব্যাটাকে দেখে নেব—কত ধানে কত চা'ল।

রাজা—আপনাদের সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। যাক্, তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। মনে রাখবেন—এবারকার এ-সুযোগ গেলে আর সুযোগ পাবেন না। Power, তা' যত ক্ষুদ্রই হোক—হাতছাড়া করতে নেই, চক্ষুলজ্জা, দ্বিধা ইত্যাদি করলেই মরবেন। যা জিজ্ঞেস করছিলাম,—সুভাষবাবু বলেন কি?

সর্দ্দার—কিচ্ছু বলেন না, হাবেভাবে বোঝা যেত যে, আমাদের পছন্দ করেন না। বাপুজীকে রাহুর মত আমরা নাকি গ্রাস করে রেখেছি।

রাজা—তা' ঠিকই বলেছেন। আর কি বলেন?

সর্দ্দার—বলেন, দেশের স্বাধীনতাই বড় কথা ও একমাত্র কথা। তার জন্য লড়াই করতে হবে—এমনি তা পাওয়া যাবে না।

রাজা—এও তো ঠিক কথা?

সর্দ্দার—কথায় কি আসে যায়। উনি ফাঁকি দিয়ে গতবার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, এবার সুযোগ পেয়ে নিজমূর্ত্তি ধরেছেন। ডাঃ ঘোষের কাছে আমরা সমস্তই জানতে পেরেছি। উনি ওর পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব করেছেন।

রাজা—বন্ধুদের বন্ধু বলেছেন—এ অতি অন্যায়। যাক্, ব্যাপারটা আমি বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বাপুজী ঠিকই ধরেছেন, সূঁচ হয়ে ঢুকেছে ফাল হয়ে বার হবেন, দেখে নেবেন। ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—নৌকা ডোবা অসম্ভব নয়। বেহাইয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার, ফোনে ডাকা যাবে তো?

সর্দ্দার—যাবে, কিন্তু কি জিজ্ঞেস করবেন?

রাজা—শুধু জানতে হবে যে, এই last chance, এ তিনি জানেন কি না। জানলে, সে অনুসারে তৈরী হতে রাজী কি না। পন্থজী, লড়াইয়ের পুরোভাগে আপনাকে থাকতে হবে। আমি পাশেই থাকব। হিজ-মাষ্টারস্-ভয়েস্ সত্য-মূর্ত্তিকে একটু তালিম দিয়ে রাখবেন। মনে রাখবেন, দেশের উপর সর্ব্বনাশ প্রলয় ইত্যাদি ঝুঁকে পড়েছে, একমাত্র বাপুজীর নামের জোরেই দেশ বাঁচতে পারে, এই মনোভাব নিয়ে কিন্তু লড়াই করতে হবে। এবারও আমরাই জিতব, কিন্তু ভবিষ্যতে—

বাহিরে একটা হৈ-হৈ শোনা গেল। ভিতরের কক্ষ হইতে হাপাইতে হাপাইতে মৌলানা, মিসেস্, জহর সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হামাগুড়ি দিতে দিতে ভুলাভাই আসিলেন। হৈ হৈ শব্দটা এদিকেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রসাদবাবু সবেগে প্রবেশ করিলেন।

প্রসাদ—সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

সকলে প্রশ্ন করিলেন,—কি, ব্যাপার কি ?

প্রসাদ—বাঙ্গালীরা বোমা নিয়া এদিকে আসছে। তারা আমাদের খুঁজছে।

সর্দ্দার—এখন উপায়।

পিছন হইতে কিসে সর্দ্দারকে একটা ঢুঁ মারিতে তিনি আঁৎকাইয়া ও চেঁচাইয়া উঠিলেন।

কৃপালিনী কহিল,—ছাগলাটাকে আবার কে ছেড়ে দিয়েছে ? —যা করবার ঠিক করুন। ওরা এসে পড়ল। পালাতে চান তো আসুন, পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ঢুকি।

বলিয়া কৃপালিনী পলায়নে উদ্যত হইল। আপনারা যাবেন তো আসুন। সর্দ্দার কহিলেন—আরে দাঁড়াও, আমি একটু স্থির হয়ে নেই।

কৃপালিনী কহিলেন—আর সময় কই ?

সকলেই যাইবার জন্য পিছনের দিকের দরজায় ভীড় করিলেন। প্রধান অমাত্য শুক্ল সেনাপতি ছেদীলাল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—ওকি। আপানারা ওখানে যে ?

সর্দ্দার—ওরা চলে গেছে ? এদিকে আসবে না তো ?

শুক্ল—কারা ? কাদের কথা বলছেন ?

মিসেস্ নাইডু—শুক্ল, গুম্ফই শুরু করেছ, বুদ্ধি পাকেনি তোমার। উনি ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারলে না ? তা, এত হৈ চৈ কিসের ?

শুক্ল—ও কিছু না, একদল বাঙ্গালী বাবু নর্ম্মদার পাড়ে হৈ হল্লা করে বেড়াচ্ছে। উঃ। গেছি, এটা আবার কি ?

সর্দ্দার, রাজা, মৌলানা, জহর সবাই চমকিয়া উঠিলেন। ছাগটা প্রধান অমাত্য শুক্লকে পিছন হইতে আসিয়া ঢুঁ মারিয়াছে।

২য় বর্ষ
১ম সংখ্যা

সমাজতন্ত্রবাদ

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

সমাজের দিকে যদি চেয়ে দেখ, তাহলে দেখ্‌তে পাবে যে, এখানে 'সবার অবস্থা সমান নয়। কারুর ধন-সম্পদ, সুখ সম্ভোগের সীমা নেই, কেউ বা দু'বেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থাও করতে পারে না। এশুধু কোন একটা বিশেষ দেশের কথা নয়, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই এই একই অবস্থা। অল্পসংখ্যক একদল লোক চিরকালই সংসারের সমস্ত সুখ-সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়, আর বাকী লোক সমস্তরকম সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

এর কারণ কি? সংসারের যারা পরিশ্রমী, তারাই কি সুখে আছে, আর খাওয়া-পরার যোগাড় করা যাদের পক্ষে দুষ্কর তারাই কি সব অলস ও অকর্মণ্য? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঠিক তার উল্‌টো। সংসারে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন করে তোলে যারা, তারা কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। যে ডাল ভাত ছাড়া তোমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, চাষীরা না থাকলে এসব আস্‌তো কোত্থেকে? যে জামা-কাপড় তুমি গায়ে দাও, যে জুতো পায়ে দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াও, সকাল বেলা যে খবরের কাগজখানির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা কর, চলাচলের জন্য রেল, ষ্টীমার, মোটর ও এরোপ্লেনের নির্ভর না করলে, তোমার চলে না—কত আর বলব, আধুনিক জীবনের অত্যাবশ্যক যা' কিছু সবই কল কারখানার মজুরদের সৃষ্টি। এই চাষী-মজুররাই সমাজের সবাকার বেঁচে থাক্‌বার উপায় করে দিচ্ছে, অথচ তারা নিজেরা দুর্দ্দশার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে, কোন মতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা,—তাও আজ তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এরা শুধু উৎপাদনই করবে ভোগ করবার অধিকার এদের নেই। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা কি করে সম্ভব হয় সে কথাটা ভেবে দেখা উচিত নয় কি? জমিদার, মহাজন, কারখানার মালিক—প্রভৃতি প্রথম দলের লোকদের নিজেদের হাতে কিছুই করতে হয় না। চাষী গায়ের রক্ত জল করে জমি চাষ করবে, শস্য উৎপাদন করবে, আর তার একটা মোটা অংশ খাজনা হিসাবে জমিদারের হাতে চলে যাবে। কৃষকের উৎপন্নের আর এক অংশ যাবে মহাজনের খপ্পরে। সব দিয়ে-থুয়ে যে খুঁদ-কুঁড়োটুকু বাকী থাকবে, চাষীর ভোগে আমারা শুধু সেইটুকুই দেই। চাষীদের মত মজুরেরাও তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পাবে না। তাদের পরিশ্রমের ফলে যা লভ্য হয়, তা'দিয়ে কারখানার মালিকেরাই পরিপুষ্ট হতে থাকে, আর মজুরেরা পায় কি?—যেটুক না হলে কোন মতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, শুধু সেইটুকুই। দুধ পেতে হলে গরুটাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, শুধু সেই কথা মনে করেই মালিকেরা মজুরদের দিকে দু'চার ছিল্‌কে রুটি ছুঁড়ে দেয়।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে এই অল্পসংখ্যক লোক সমাজের আর বাদবাকী লোকগুলোকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে আপনারা বড় হয়ে উঠছে। কৃষক মজুরদের রক্ত শোষণ করে এই জমীদার মহাজন-মালিকেরা দিন দিন পুষ্টিলাভ করছে। এই পরগাছা-শ্রেণীর জীবগুলি সমাজের পক্ষে ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সমস্ত কৃষক মজুরেরা যারা সংখ্যায় জমীদার, মহাজন, মালিকদের চাইতে বহুগুণে বেশী—তারা আপনাদের শ্রমজাত অন্ন পরের মুখে তুলে দিয়ে আপনারা উপোষ করে মরছে কেন? এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সখ করে কি আর কেউ এমনিধারা করে? এই কৃষক মজুরেরা কোন মূলধন, কাজ করার যন্ত্রপাতি বা কলকারখানার মালিক নয়। অথচ এই কলকারখানার যুগে শুধুহাতে কোন কাজ করা চলে

না। জমীর জন্যই হোক্, মূলধনের জন্যই হোক্ বা যন্ত্রপাতির জন্যই হোক্, এই সমস্ত ধনীদের কাছে তাদের ধন্না দিয়ে পড়তে হবেই। এরাও সুযোগ বুঝে আপনাদের খুসী মত চড়া ডাক হাঁকে, কৃষক মজুরেরা গত্যন্তর না দেখে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা এর চেয়েও বেশী ঘোবালো। এই ধনিক-সম্প্রদায় যে শুধু জমি বা কলকারখানার মালিক তাই নয়, সমস্ত রাষ্ট্র এদের মুঠোর ভিতরে। সমস্ত দেশের লোক ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্, বুঝে হোক্ বা না বুঝে হোক্, এই ধনিক-সম্প্রদায়ের হাতে তারা আপনাদের সপে দিয়েছে। কাজেই যে নাম দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালিত হোক্ না কেন, ধনিক-সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে তাবা চল্‌তে বাধ্য। বর্ত্তমানেব সমাজব্যবস্থা, বর্ত্তমানের আইন-কানুন সমস্তই ধনিক সম্প্রদায়েব স্বার্থ পুরণেব জন্য তৈবী। বর্ত্তমান ব্যবস্থাব ভিতরে কৃষক মজুরদেব আশা করবার মতো বিশেষ কিছু নেই। এই সমাজব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণেব কল্যাণ চায় না, শ্রমজীবীরা এখানে পদদলিত, একমাত্র ধনিক-সম্প্রদায় নিজেদের বিলাস ব্যসনেই ব্যস্ত। কাজেই কৃষক মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীবা সমস্ত রাষ্ট্রকে আপনাদেব হাতে এনে এমন এক নূতন সমাজেব পত্তন করতে পারে, যে সমাজের উদ্দেশ্য হবে শ্রমজীবীদেব স্বার্থ রক্ষা করে চলা, সমস্ত রকম অবিচার ও অত্যাচাবের হাত থেকে এদের মুক্তি দেওয়া, তবেই তাদেব এই দুঃখ ও লাঞ্ছনার সমাপ্তি ঘটবে—কৃষক মজুব তথা সমস্ত শ্রমজীবীদের বাঁচবাব আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

২

মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় দল বেঁধে বাস করত, তখন তার প্রয়োজন ছিল খুবই সামান্য। একটা জানোয়ার মারতে পারলেই একদল লোকের খাবার ভাবনা ভাবতে হোত না। বনে জন্তু জানোয়ারের অভাব ছিল না, কাজেই তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। দলবদ্ধ হয়ে তারা শিকার করত এবং শিকার পেলে দলের সবারই সমান অধিকার ও দায়িত্ববোধ ছিল। সে যুগে জটিল যন্ত্রপাতির কথা কল্পনা করা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। এক টুক্‌রো পাথর বা একগাছা লাঠি, যন্ত্রের মধ্যে শুধু এই ছিল। যে কোন লোকের পক্ষে এ উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। কাজেই "নিজস্ব সম্পত্তি" বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, মানুষে মানুষে কোন ভেদও তাই দেখা যেত না। মানব ইতিহাসেব এই সময়টিকে পরিপূর্ণ সাম্যের যুগ বলা যেতে পারে। কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল রইল না—লাঠি আর পাথরের টুক্‌রো নিয়ে মানুষের উন্নতি কামী মন তুষ্ট থাকতে পারে না। প্রকৃতির কাছ থেকে সে নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগলো এবং সাথে সাথে তার অভাব ও প্রয়োজন বোধও বেড়ে চল্‌ল। মানুষেব সংখ্যা যখন ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগলো, উপযুক্ত পরিমাণে শিকার সংগ্রহ করা তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ালো, কাজেই প্রয়োজনের চাপে পড়ে দেশে এলো পশু-পালন প্রথা। মানব ইতিহাসে এই একটি প্রকাণ্ড যুগ পরিবর্ত্তন। এত দিনেব সাম্যেব ব্যবস্থার ছিদ্রপথে এই বাব শনি এসে ঢুকলো। জমির অভাব তখনও হয়নি, কাজেই এটা আমার জমি, ওটা ওর জমি এই ভাব কারুর মনে তখনও প্রবেশ করতে পারেনি। এমন আর কিছু সম্পত্তি ছিল না—যা সঞ্চয় করে রাখা যায়। কিন্তু এইবার গৃহপালিত পশু, সম্পত্তি বলে গণ্য হ'তে লাগলো। যার কাছে যত পশু, সমাজে তার তত বেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি, গায়ের জোর যাদেব বেশী তারা অন্যের কাছ থেকে পশু ছিনিয়ে নিয়ে আসতে লাগলো। বর্ত্তমানে যে একদল লোক আর একদল লোককে শোষণ করে চলেছে, এইখানেই তার অঙ্কুর দেখতে পাই। সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা দিল তখন, একদল শোষক, আর একদল শোষিত, একদল অত্যাচারী, আর একদল অত্যাচারিত। নিজস্ব সম্পত্তির বৃদ্ধিই মানুষের মধ্যে বড় ছোট, উঁচু নীচু যত অসাম্য নিয়ে এল, এখানথেকেই শ্রেণী ভেদেব হয়েছে পত্তন।

মানুষের উন্নতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে কে? অভাব বা প্রয়োজনবোধ মানুষকে পিছন থেকে

তাড়া দেয়, ফলে মানুষ নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় যদি তুমি অস্থির হয়ে ওঠ, তবে তুমি চুপ করে বসে থাকতে পারবে না, যে উপায়েই হোক্, তুমি খাদ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেই। এই চেষ্টার ফলে নূতন নূতন উপায় ও উপকরণের আবিষ্কার হবে। এই প্রয়োজনবোধ ও নব আবিষ্কৃত উপকরণ বা যন্ত্রই সমাজকে এক রূপ থেকে আর এক রূপে টেনে নিয়ে চলেছে।

তখনকার দিনে মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত। ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রায়ই শান্তি বা সম্প্রীতির ভাব দেখা যেত না, প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধত এবং জয়ী দল পরাজিত দলের সর্ব্বস্ব লুটপাট করে নিত, শুধু গৃহপালিত পশু বা জিনিষপত্র কেড়ে নিয়েই যে তারা ক্ষান্ত থাকত, তা নয়। দলকে দল বন্দী করে নিয়ে আসত এবং আপনাদের কাজকর্ম্ম করবার জন্য—তাদের ক্রীতদাস করে রাখত। এইভাবে সমাজে দুটি নূতন ধরণের শ্রেণীর সৃষ্টি হল—প্রভু ও ক্রীতদাস। সমাজের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রভু-শ্রেণীর একচেটে, ক্রীতদাসরা তাদের আজ্ঞাবহ মাত্র, এদের ভালমন্দ, জীবন-মরণ সমস্তই ছিল প্রভুদের হাতে।

কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা চিরদিন বেঁচে রইল না। সামাজিক প্রয়োজনে প্রভু ও দাসের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটল। নানারকম অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন রকমের শ্রেণীভেদ দেখা দিল। গায়ের জোরে, কৌশলে, নানারকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যারা জমিগুলোকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, তাদেরই হাতে গড়া আইন, তাদের মালিকত্বকে ন্যায্য বলে ঘোষণা করল। আর বাদবাকী লোকগুলি, কঠিন জীবন-সংগ্রামে যারা হটে গেল, জমির মালিকদের কাছে হাত পাতা ছাড়া তাদের গত্যন্তর রইল না। কেউ বেগার খেটে, কেউ বা খাজনা দিয়ে জমীদারের পাওনা যোগাতে লাগল। এই ভাবেই হল—রাজা-প্রজার সৃষ্টি।

কিন্তু কৃষিকর্ম্মই মানুষের জীবিকা সংগ্রহের একমাত্র পথ নয়। কৃষির সাথে সাথে শিল্পও উন্নতি করে চলছে। আগেকার দিনের কারিগরেরা যায় যার ঘরে বসে ছোট ছোট হাতিয়ারের সাহায্যে শিল্পকার্য্য করত। এই ছোট ছোট হাতিয়ার গুলি চিরকাল একই অবস্থায় রইল না, ক্রমশঃই উন্নত ধরণের হয়ে উঠল। উপকরণের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে উৎপাদনের রীতিও বদলাতে বাধ্য। নানারকম গতি আবিষ্কারের ফলে সমস্ত শিল্প-জগতে এক বিপ্লব ঘটে গেল। এই কলকারখানার যুগে শিল্পোৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারিগরদের পক্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং কলকারখানা চালান সম্ভবপর নয়। যাদের হাতে মূলধন আছে, কেবলমাত্র তারাই এই সমস্ত কলকারখানা ব্যাপারে নামতে পারে। এই ভাবে শিল্পোৎপাদন ধনিক-সম্প্রদায়ের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। ছোট ছোট কারিগরেরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিক্‌তে না পেরে রণে ভঙ্গ দিল। কেউ কেউ কৃষিকর্ম্মে মন দিল, কেউ বা ধনিক-সম্প্রদায়ের পরিচালিত কারখানার মধ্যে মজুর হয়ে কাজে ঢুক্‌লো। সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে শিল্পোৎপাদন হুহু করে বেড়ে চলেছে। কারখানায় কারখানায় দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। ওদিকে কৃষকদের মধ্যে অনেকেরই জমির পরিমাণ এত সামান্য যে, কৃষিকর্ম্মের মধ্য দিয়ে জীবিকার সংস্থান করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের মধ্যে অনেকে কারখানায় ঢুক্‌তে বাধ্য হচ্ছে। কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের সংখ্যাও তত বেড়ে যাচ্ছে।

এই কারখানার মজুরদের প্রকৃত অবস্থা কি? সমাজের যা-কিছু প্রয়োজন সব তারাই যোগায়, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তারা পায় কি? মালিকদের সব সময়ই এই চেষ্টাই থাকে যে কি করে এদের কম মজুরী দিয়ে বেশী খাটিয়ে নেওয়া যায়। আজকালকার দিনে শিল্পোৎপাদন ব্যাপারে প্রধানতঃ চারটি জিনিষের প্রয়োজন হয়ে থাকে— জমিদারের জমি, ধনিকের মূলধন, শ্রমিকের শ্রম এবং উদ্যোগীদের সংগঠন। শ্রমিকদের হাতে জমি, বা মূলধন নেই। অথবা জমিদারের হাত থেকে জমি এবং বাজার থেকে যন্ত্রপাতি কিনে নিতে পারে বা কারখানা তৈরী

করতে পারে—এমন সম্বল তাদের নেই। চতুর্থ পক্ষ, উদ্যোগী বা পরিচালকেরা জমিদারের হাত থেকে জমি এবং ধনিকদের হাত থেকে মূলধন এবং শ্রমিকদের হাত থেকে শ্রম একত্রিত ও সুসংগঠিত করে শিল্পের উৎপাদন করে। তারপর শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফলে শিল্পোৎপাদন হলে, সম্পূর্ণ লভ্য থেকে জমিদার জমির বাবদ কিছু নেয়, ধনিক মূলধনেব বাবদ কিছু নেয়, উদ্যোগী সংগঠনের বাবদ নেয় কিছু। সব দিয়ে-থুয়ে যা খুদ-কুঁড়োটুকু থাকে শ্রমিকের অদৃষ্টে জোটে তাই। শ্রমিকদেব এমন ক্ষমতা বা সম্বল নেই যে স্বাধীন ভাবে নিজেবা কাজ করে। কাজেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে জেনেও তারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবতে পাবে না।

যারা পরকে খাটিয়ে নিজেরা বড হয়ে ওঠে, সেই শ্রেণী বুর্জ্জোয়া বলে পরিচিত এবং যে বিত্তহীন শ্রেণীব, মজুবী ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, তাবা প্রলিটেবিয়েট বা সর্ব্বহারা। এই বুর্জ্জোয়া ও প্রলিটেরিয়েট উভয়েব স্বার্থ পবস্পর-বিবোধী, বুর্জ্জোয়ার স্বার্থ প্রলিটেবিয়েটকে শোষণ করা, এবং প্রলিটেরিয়েটের স্বার্থ বুর্জ্জোয়াব শাসন থেকে আত্মরক্ষা কবা, আপনাব ন্যায্য দাবী ও অধিকার লাভের চেষ্টা কবা অর্থাৎ বুর্জ্জোয়ার মুনাফা একটু কমান।

বুর্জ্জোয়া ও প্রলিটেবিয়েট ছাড়া আর এক বকম লোক আছে যাদের স্বার্থ ঠিক একরকম নয়। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, ডাক্তার, চাকুবে প্রভৃতি পেটি-বুর্জ্জোয়াদেব ভিতরে। এদের মধ্যে একদলেব স্বার্থ বুর্জ্জোয়াদের সাথে অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এরা বুর্জ্জোয়াদের কর্ম্মচারী বা এজেন্ট, বুর্জ্জোয়ারা প্রলিটেবিয়েটদের শোষণ ব্যাপারে এদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে এবং বুর্জ্জোয়া ও প্রলিটেরিয়েটদের মধ্যে সংগ্রাম বাঁধলে এরা বুর্জ্জোয়াদের পক্ষই অবলম্বন করে থাকে। পেটি-বুর্জ্জোয়াদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নীচু শ্রেণীব, তাদের স্বার্থ প্রলিটেরিয়েটদের স্বার্থেরই কাছাকাছি। আর একদল নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত, কোন্ পক্ষে যোগ দেওয়া তাদেব পক্ষে সুবিধাজনক সে সম্বন্ধে তারা স্থির ধারণায় এসে পৌঁছতে পারে না।

শিল্পেব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জ্জোয়া ও প্রলিটেরিয়েট, এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর সংখ্যা কমতে থাকে। ফলে শ্রেণী-বিরোধ ক্রমশঃই সুস্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

আমরা আগেই দেখেছি শ্রেণীভেদ জিনিষটি সমাজে বহুদিন ধবেই চলে আস্‌ছে, তবে এক এক সময় এক এক রকম আকাব নিয়ে তা দেখা দিয়েছে। প্রবল শ্রেণী চিবকালই দুর্ব্বল শ্রেণীর উপরে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু দুর্ব্বলেরা তাই বলে চিবকাল এই অত্যাচাব ববদাস্ত করতে পাবে না। যতদিন পয্যন্ত একদল লোক আর একদল লোকের উপর শোষণ চালাতে থাকে, ততদিন সমাজে প্রকৃত শান্তি কিছুতেই স্থাপিত হতে পারে না। প্রকাশ্যে হোক্ বা লোকচক্ষুর আড়ালে হোক্, জ্ঞাতসারে হোক্ বা অজ্ঞাতসাবে হোক্, সুশৃঙ্খল ভাবে হোক্ বা বিশৃঙ্খলাব মধ্য দিয়ে হোক্, এই দু'দলেব মধ্যে ক্রমাগতঃ লড়াই চল্‌তে থাকে। এরই নাম শ্রেণী-সংগ্রাম।

ইতিহাসের সুরু থেকে শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছে, কিন্তু শ্রেণী-চেতনা তখনই প্রকাশ্য ও তীব্র মূর্ত্তি ধরে দেখা দেয়, উভয় পক্ষে যখন শ্রেণী-চেতনা জেগে ওঠে অর্থাৎ আমি কোন্ শ্রেণীর লোক, কি আমার স্বার্থ, আমার স্বার্থের সঙ্গে সমাজেব আব কার স্বার্থ মেলে এবং কতদূর পর্য্যন্ত মেলে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ভাবে একত্রিত হলে পরে বিরুদ্ধ স্বার্থ-সম্পন্ন শ্রেণীব সঙ্গে লড়াইয়ে সুবিধা হতে পারে—এই জ্ঞানটুকু পুরোপুবি থাকা চাই।

বুর্জ্জোয়া-শ্রেণী বিদ্যা ও বুদ্ধিতে মজুর চাষীদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। তাদের স্বার্থ কি এবং কি করে সেই স্বার্থ পূবণ কবা যায়, সে কথা তারা ভাল করেই জানে। রাষ্ট্র পরিচালনাব যন্ত্রটিকে আপনাদের হস্তগত করে নিয়ে, সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাকে তারা আপনাদের স্বার্থের অনুকূলে ঢালাই করে নিয়েছে। উৎপাদনের ব্যবস্থা, বণ্টনের ব্যবস্থা, বিনিময়ের ব্যবস্থা, আইন কানুন রচনা,—সব জায়গাতেই দেখা যায়—যে বুর্জ্জোয়ারা যাতে করে শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের উপরে ইচ্ছা মত শোষণ কার্য্য চালাতে পারে, তার যতদূর সম্ভব সুযোগ দেওয়া

আছে। অথচ শ্রমজীবীদের তরফ থেকে কথা বলবার কেউ নেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একেই বলে। এই ব্যবস্থার ফলে বুর্জ্জোয়ারা ক্রমশঃই লাভবান হয়ে উঠ্‌তে থাকে। কাজ কবে যারা খেটে খায় এবং সমাজের খাওয়া-পরার ভার যাদের হাতে, তাদের দুরাবস্থার আব সীমা থাকে না। কিন্তু যত বিদ্যা, যত বুদ্ধি থাক না কেন, বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের মরবার পথ নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছে। এছাড়া তাদের কিছু উপায়ও ছিল না। যে পথে তারা চলেছে এই ভাবেই তার পরিণতি ঘটতে বাধ্য।

বর্ত্তমান কলকারখানার যুগের আগে শ্রমিকেরা এত-গুলি লোক, এক সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে পারত না। বড়জোড় দু'চার দশজন লোক এক মালিকের অধীনে এক-সঙ্গে কাজ করত। কাজেই পরস্পব থেকে দূবে এবং ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন থাক্‌বাব ফলে তাদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা জাগেনি, অর্থাৎ সমস্ত শ্রমিকের যে একই স্বার্থ এবং আপনাদের স্বার্থ সাধনের জন্য সকলেব যে একত্রে মিলিত হওয়া দরকার, একথা তাবা তখনও বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। আলাদাভাবে নিজ স্বার্থ সম্বন্ধেই ভাবত এবং কোন এক-জন মজুবের পক্ষে ধনী ও শক্তিশালী মালিকের সঙ্গে মজুরি কিংবা অন্যান্য সুযোগসুবিধা নিয়ে দর কষাকষি করা নিষ্ফল মনে করত। গত এক শতাব্দীর ভিতবে নানারূপ যন্ত্রপাতি এবং বাষ্প (steam) ও ইলেক্‌ট্রিসিটি, এই দুই শক্তিব আবিষ্কাবেব ফলে উৎপাদনের পদ্ধতি দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড বড কার-খানার পত্তন হল এবং এই সমস্ত উন্নত ধবণেব যন্ত্রপাতিব ব্যবহারেব ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বহু পরিমাণ মাল উৎপন্ন হতে লাগ্‌ল। এতকাল শ্রমিকদের যেটুকু জোরও বা ছিল, এবার তাও গেল, যন্ত্র এবং যন্ত্রের মালিকেবাই হয়ে উঠ্‌ল সর্ব্বেসর্ব্বা, শ্রমিকেরা তো শুধু ভারবাহী পশু মাত্র,—একটু দানাপানি যুগিয়েই তাদের ঠাণ্ডা করে রাখা চলে। কিন্তু বড় বড কারখানার ভিতরে তো আর দু'চার জন মজুরকে দিয়ে চলে না, একই মালিকের অধীনে, একই কারখানার ভিতরে হাজার হাজার শ্রমিককে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। যারা এতদিন পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ছিল, উৎপাদনের পদ্ধতি বদলাবার ফলে তারা আজ একত্রিত হবার সুযোগ পেয়েছে। একসঙ্গে থাকা ও চলাফেরার ফলে, একসঙ্গে কাজ করবার ফলে, এটা তারা ভাল ভাবেই বুঝ্‌তে পেরেছে যে তাদের সবার স্বার্থ এক, একই প্রণালীতে তারা সবাই শোষিত ও উৎপীড়িত, একই বকমের অভাব ও অভিযোগ তাদের জীবনকে দুর্ব্বিহ করে তুলেছে। তারা যে সবাই একই দলের লোক এই শ্রেণী-চেতনা এতদিনে জেগে উঠল এবং তার ফলেই শ্রেণী-সংগ্রাম প্রকাশ্যভাবে দেখা দিল। শক্তিশালী মালিকেব বিরুদ্ধে কোন একজন মজুর একা কিছুই কবতে পারে না সে কথা সত্য, কিন্তু তারা সবাই যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, তাদেব দাবী-দাওয়া নিয়ে মালিকেব কাছে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে তাদের কথা তুচ্ছ করা অতটা সহজ হবে না। একতার মধ্যেই তাদের শক্তি—একথা আজ তারা বুঝ্‌তে পেরেছে। এতগুলি লোকের সমবেত দাবীর চাপে মালিক যদি না টলে, তাহলে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট কবে সবাই এক সঙ্গে কাজ বন্ধ করে দেয়। কারখানা বন্ধ থাকলে মালিকেব যথেষ্ট ক্ষতি হতে থাকে, কাজেই তাবা বাধ্য হয় শ্রমিকদের সঙ্গে রফা করতে। অবশ্য শ্রমিকদেব সংগঠন এখনও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেনি বলে, ধর্ম্মঘট অনেক জায়গায় মাঝপথে ভেঙ্গে যায়, কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকেবা এপর্য্যন্ত অনেক ন্যায্য অধিকার পেয়েছে এবং ক্রমশঃই যে তাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, যে সকল শ্রেণী এতদিন ধরে পরের ঘাড়ে চেপে বসে পরম সুখে আছে, এই রকম ভাবে ঘা দিয়েই তাদের শায়েস্তা করতে হবে, অনুনয়-বিনয় করে বা ভালমানুষির দোহাই দিয়ে সে-সব ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া যাবে না—একথা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার দিক থেকেই যে শুধু বুর্জ্জোয়া-দের বিপদ ঘনিয়ে আসছে তা নয়, বর্ত্তমান সমাজ

ব্যবস্থার ভিতরেই এমন একটা গরমিল রয়ে গিয়েছে যে, বুর্জোয়াদের আধিপত্য আর বেশী দিন টিঁকে থাকা সম্ভব হবে না। আজকাল কলকারখানার যুগে শিল্পের উৎপাদন এত দ্রুত হারে এগিয়ে চলেছে যে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা আর তার সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পারছে না। কথাটাকে আর একটু সহজ করে বলা যাক্‌। যন্ত্রের উন্নতির ফলে কারখানা থেকে আজকাল অল্প সময়ের ভিতরে এক সঙ্গে বহু পরিমাণ মাল তৈরী হয়ে বেরুচ্ছে। তৈরী তো হল, কিন্তু এ মাল কিন্‌বার মত লোক কোথায়? তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ মাল আমরা তৈরী করতে পেরেছি। বাজারের অবস্থা দেখ্‌লে তাই মনে হবে বটে, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে একথা সত্য নয়। সমাজের অধিকাংশ লোক চাষী-মজুর, সমাজব্যবস্থার চাপে ও চারিদিক্‌কার শোষণের ফলে তাদের প্রয়োজনীয় মাল কিন্‌বার মত সামর্থ্য থাকে না, এ সামর্থ্য যাদের আছে তাদের তুলনায় মজুত মালের পরিমাণ ঢের বেশী। তা'ছাড়া শিল্পের উৎপাদক তো আর একজন নয়, তাহলে সে না হয় বাজারের চাহিদার পরিমাণ হিসাব করে সেই অনুসারে মাল তৈরী করতে পারত। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগী, কারখানার মালিক সব সময়ই চেষ্টা করছে যে কি করে অল্প খরচায় বেশী মাল তৈরী করে, অন্যান্য প্রতিযোগিদের বাজার থেকে হটিয়ে দিতে পারবে। ফলে উৎপন্ন মালের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

আরও একটা কথা আছে যে, যে ধরণের যন্ত্রপাতি আজকাল কারখানায় ব্যবহার করা হয়, তাতে বেশী পরিমাণ মাল এক সঙ্গে তৈরী করাতে না পারলে লাভ থাকে না। এই দামী দামী যন্ত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব না খাটিয়ে, মাঝে মাঝে অলস ভাবে বসিয়ে রাখ্‌লে, তাদের নিয়ে পোষাণ দুঃসাধ্য। কাজেই এই মালগুলিকে কাটাতে হলে দেশের অধিকাংশ লোকদের অর্থাৎ চাষী-মজুরের কিনবার সামর্থ্য বাড়ানো দরকার। তাহলেই আধুনিক যন্ত্রগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উৎপন্ন মালও বাজারে মজুত পড়ে থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বাজারে পণ্য যখন ক্রমশঃই জমে উঠ্‌তে থাকে, তার অত্যধিক বৃদ্ধির দরুণ তাদের দামও ক্রমশঃই নেমে যায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল বেঁধে যায়। এই ভাবেই কয়েক বছর বাদে বাদে এক একটি বাণিজ্য-সঙ্কট এসে দেখা দেয়। প্রত্যেক দেশের সরকার নানারকম সাময়িক ব্যবস্থা করে এই সমস্যাকে চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা করেন বটে; কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়,—চাপা পড়া ফোঁড়ার মত দিন দিনই তা ফুলে উঠ্‌তে চায়। এই সঙ্কটগুলির গুরুত্ব ক্রমশঃই উঠ্‌ছে বেড়ে, এবং এমন ভয়াবহ মূর্ত্তি নিয়ে তা দেখা দিচ্ছে যে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। বুর্জোয়া-নেতারা এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তারই জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির অন্যান্য দেশগুলিকে করতল-গত করে নিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের এত চেষ্টা, কারণ তাতে দেশের মাল সেখানে স্বচ্ছন্দে কাটানো যাবে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান—অনেকেরই এরকম উপনিবেশ আছে। তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডই অবশ্য সব চেয়ে বেশী আপনার মুঠোর মধ্যে পূরে নিয়েছে। শিল্প-জগতে তার যে এত সমৃদ্ধি, তার কারণও তাই। আজকাল যেখানে যা কিছু যুদ্ধ-বিভ্রাট ঘট্‌ছে, তার অধিকাংশই এই উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি। যাদের উপনিবেশ আছে, তারা তার সূচ্যগ্রও ছাড়তে রাজী নয়, কারণ এই উপনিবেশগুলির উপরই তাদের জীবন-মরণ সমস্যা। যাদের উপনিবেশ কম আছে বা নেই তারা নূতন উপনিবেশ লাভের জন্য গর্জ্জে তর্জ্জে মরুছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে মহাসমরের সূচনা নানাদেশে প্রধূমিত হয়ে উঠেছে, এই মাল কাটানো চেষ্টার মধ্যেই তার বারুদ সঞ্চিত রয়েছে।

এজন্য সমস্ত দেশেই আজ সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। প্রজারা খেতে না পাক ক্ষতি নেই, রোগে ভুগে মরুক ক্ষতি নেই, অভাবের জ্বালায় পশুরও অধম

জীবনযাপন করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সমর-সম্ভার বাড়ানো চাই। অজ্ঞ কয়েকজন কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য যুদ্ধের আগুনে দেশকে দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সভ্যতা ধ্বংসের মুখে খাবি খাচ্ছে।

আমাদের উৎপাদনের পদ্ধতি সমাজব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে চলে গিয়েছে তাই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে উৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে আপনাকে মানানসই করে নিতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার মাঝখানে থাকবে, ততদিন এই বিরোধ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠ্‌বে। শেষে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বিদীর্ণ করে উৎপাদনের পদ্ধতি যখন তার উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে, তখন আসবে সামঞ্জস্য, আসবে শান্তি।

৩

পৃথিবীর একদল লোক চিরকাল যাবতীয় সুখ-সম্পদ ভোগ করবে, আর একদল লোক শুধু দুঃখ ও অভাবের মধ্য দিয়েই জীবন কাটায়, একদল খেটে খেটে হয়রান হয়ে মরে, আর একদল দিব্যি বসে বসে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। মানুষে মানুষে এই ভেদ কি করে দূর করা যায়, মানব-প্রেমিক যাঁরা তাঁরা বহুদিন ধরেই চিন্তা করে আস্‌ছেন। এঁরাই সমাজতন্ত্রবাদী, যাঁরা মানুষে মানুষে অসাম্যটুকুই শুধু লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তার ভিতরকার কারণটি ধরতে পারেননি। প্রকৃত কারণটি না ধরতে পারার জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ভুল পথে চালিত হয়েছিল। তাঁরা মানুষের চরিত্রকে শুধরে দিয়ে এক কল্পনার সত্যযুগ গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মূল কারণগুলিতে হাত না পড়লে সমাজব্যবস্থাকে বদলান যায় না। কাজেই তাঁদের আদর্শ আদর্শই থেকে গেল, তাকে কাজে পরিণত করবার কোন পথ পাওয়া গেল না। সেই জন্যই এঁরা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী বা Utopian Socialist নামে পরিচিত।

কার্ল মার্কসের হাতে পড়ে সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনা থেকে বিজ্ঞানে পরিণত হল। সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতরকার রহস্যটিকে তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। যে মূলনীতিটিকে অবলম্বন করে সমাজ এগিয়ে চলেছে, কার্ল মার্কস প্রথম তার আবিষ্কার করেন, তিনিই প্রথম দেখালেন যে সমাজব্যবস্থা ও মানুষে মানুষে সম্বন্ধ চিরকাল একই অবস্থায় বসে থাকে না, সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্ত্তন ঘটায় কে? যাদের সাহায্যে উৎপাদনের কাজ চলে, সেই উৎপাদন শক্তিগুলিকে তিনি সকলের মূল কারণ বলে ঘোষণা করলেন। সে কালে একখণ্ড লাঠি বা এক টুকরো পাথর উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ ছিল। তখনকার দিনে এই সুলভ উপকরণ-গুলিকে সকলেই সমভাবে ব্যবহার করতে পারত। কাজেই তখনও কোন সুবিধা-ভোগী কোন বিষয় একচেটে করে নিয়ে, সমাজের আর সবার উপরে আধিপত্য করতে পারত না। একদল লোক যখন উৎপাদন শক্তিগুলিকে একচেটে করে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভোগ করবে, অসাম্যের কথা তখনই ওঠে।

এককালে জমি ছিল অপর্য্যাপ্ত, সর্ব্বসাধারণ তাকে ভোগ করতে পারত, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ জমি যখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল, সমাজের এক শ্রেণী লোক তখন গায়ের জোরে ও বুদ্ধির জোরে তাকে আত্মসাৎ করে নিল। যেদিন থেকে সৃষ্টি হলো জমিদার ও প্রজা, সেদিন থেকে জমিদার-দল প্রজাদের শ্রমে পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

ছোট ছোট উপকরণ নিয়ে কারিগরেরা যার যার ঘরে বসে কাজ করছিল, এমন সময় এলো যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি। দরিদ্র কারিগরদের এমন সাধ্য নেই যে তারা এই দামী যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা কিনবে বা বড় বড় কারখানা তৈরী করাবে বা প্রয়োজন মত বহু পরিমাণ কাঁচা মাল একসঙ্গে খরিদ করবে। কাজেই ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, ধনী-মালিকদের কাছে তাদের দাসখৎ লিখে দিতে হল। এই সমস্ত উপকরণ নেই বলেই

তারা আপনাদের শ্রমজাত অর্থ আপনারা ভোগ করতে পারে না। ফলে খেটে মরবে যারা তাদের দুরাবস্থা, আর যারা কতগুলি সুযোগ ও সুবিধার জোরে পরকে দিয়ে খাটিয়ে নেবে, পৃথিবীতে সুখে থাকবে তারাই। শ্রমিক-শ্রেণীর যদি সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হয়, তা হলে সমাজের সমস্ত উপাদান শক্তিগুলিকে আপনাদের করায়ত্ত করে নিতে হবে। তার অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রগুলিকে শ্রমিকদের হাতে নিয়ে আসা, কারণ রাষ্ট্রশক্তিকে হাতে না আনতে পারলে সমাজের সমস্ত উৎপাদন শক্তিগুলিকে হাতে আনবার কথা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু কি করে রাষ্ট্রশক্তিকে শ্রমজীবীদের হাতে এনে দেওয়া যাবে? এতদিন ধরে রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের হাতে ছিল, বুর্জোয়াদের স্বার্থ সাধনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আজ কি করে কয়েকজন দরদী আদর্শবাদীর উপদেশে বা আবেদনে তাদের মন এতই বিগলিত হয়ে যাবে যে, শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে চেয়ে তারা আপনাদের স্বার্থ বিসর্জন দেবে? এরকম স্বর্গীয় কল্পনা করা শুধু কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষেই সম্ভব। সমাজের ইতিহাস যাঁরা ভালভাবে পড়েছেন, মানব চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান যাঁদের আছে, এরকম উদ্ভট কল্পনা তাঁরা কখনও করতে পারবে না।

বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভিতরে এমন দু'চারজন লোক পাওয়া যেতে পারে এবং পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা আপনাদের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের চেয়ে, সমাজের স্বার্থকে অনেক বড় করে দেখেন, এবং বুর্জোয়া ও প্রলিটেরিয়েটের সংগ্রামে তাঁরা নির্য্যাতিত প্রলিটেরিয়েটদের পক্ষ নিয়ে লড়েন। কিন্তু দু'চারজনের সম্বন্ধে যা' সত্য, শ্রেণী হিসাবে তা' সত্য নয়। শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ারা প্রলিটেরিয়েটদের সমর্থন করতে পারেন না, জ্ঞাত সারে হোক্ আর অজ্ঞাতসারে হোক্, আমাদের সবারই নিজ নিজ শ্রেণীর উপরে সূক্ষ্ম টান আছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম যখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাদের ভিতরকার শ্রেণী-বোধের আসল ব্যাপারটি তখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

কাজেই উপদেশে নয়, অনুনয়ে নয়,—চাই বিপ্লব, চাই সমাজের ভিতর আমূল ও বিরাট পরিবর্ত্তন, যা' এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে উল্টে দিতে পারে। এই বিপ্লব রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সম্ভব হতে পারে, রক্তপাত ছাড়াও হতে পারে। সেটা নির্ভর করে সময়, অবস্থা ও যুধ্যমান দু'পক্ষের বলাবলের উপর। বুর্জোয়ারা যদি শক্তিশালী হয়, এই বিপ্লবপ্রচেষ্টাকে বাধ দেবার মত ক্ষমতা যদি তাদের থাকে, তাহলে রক্তপাত ঘটবেই।

কিন্তু শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রলিটেরিয়ানরাই তো নয়। কৃষক আছে, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি ছোট ছোট কারিগর আছে, ছোট ছোট দোকানদার আছে, নিম্ন-মধ্যবিত্তও আছে। এরাও বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত। কিন্তু শোষক ও শোষিতদের মধ্যে যে মহা-সংগ্রাম, তাকে পরিচালনা করবার যোগ্যতা এদের নেই। তার কারণ এই সম্প্রদায়গুলি অনেকেরই, ছোট হোক্ কি বড় হোক্, কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে। জমি কিংবা অন্যান্য সম্পত্তির টান এদের মনকে অত্যন্ত ঘরমুখো করে রাখে, প্রকৃত বৈপ্লবিক চেতনা এদের কাছে কমই আশা করা যায়। কিন্তু সত্যিকার প্রলিটেরিয়েট যারা, আপনার বলতে প্রায় কিছুই তাদের থাকে না। কাজেই কোন কিছু হারাবার আশঙ্কা নেই, তাদের মনে দ্বিধা বা ইতস্ততের ভাব নেই। বিপ্লবী চিত্তের এটাই প্রধান লক্ষণ। তা' ছাড়া একই কারখানার ভিতরে, একই নিয়মের মধ্যে এতগুলি লোক এক সঙ্গে কাজ করবার ফলে, তাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সামগ্রিক ভাব এসে যায়। কিন্তু কৃষক প্রমুখ বিভিন্ন শ্রমজীবী-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করে বেঁচে আছে এবং পরস্পর থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে বলে, তাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও ঐক্যের আশা করা যায় না। মার্কস্ ও লেনিনের মতে, যারা প্রলিটেরিয়েট তারাই এই সংগ্রামে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবে এবং কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী-সম্প্রদায় তাদেরই পরিচালনায় এই লড়ায়ে যোগ দিবে।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বিপ্লবে আস্থা রাখেন না, তাঁরা বলেন যে এক সঙ্গে এত বড় পরিবর্ত্তন এলে সমাজ

তাকে ধরে রাখতে পারবে না, ফলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার পুরানো ব্যবস্থাই ফিরে আসবে। এরা তাই শান্তি-পূর্ণ উপায়ে আন্দোলন ও প্রচারকার্য্য চালিয়ে, একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানোকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

কিন্তু মার্কস্‌পন্থীরা মনে করেন যে, এই একটু একটু করে এগিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করলে পরে রাষ্ট্রশক্তিকে কখনই প্রলিটেরিয়ান্‌দের হাতে নিয়ে আসা যেতে পারে না। সামান্য দু'একটী সংস্কারের আশায় প্রলিটেরিয়েটদের বিপ্লবী শক্তি ক্রমশঃই ভোঁতা হয়ে আসতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে এরা বুর্জ্জোয়াদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

—আগামী বারে সমাপ্য

মন্দিরা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মন্দিরা বাজে মহাকাল-মন্দিরে,
তারি তালে তাল রেখে সাগর-নীরে
আনন্দে নাচে নীল তরঙ্গদল,—
দলে দলে কালো জলে ফুটিছে কমল,
কাব্য-মুকুল ফোটে কবির মনে,
ফাগুন-প্রভাতে পাখী গায় বনে বনে,
জীবন-মৃত্যু নাচে হাতে রেখে হাত,
দিবসের পিছু ফিরে তারা-ভরা রাত,
গগনে গগনে নেচে চলে শশি-রবি,
ঋতুতে ঋতুতে ফোটে নব নব ছবি
অরণ্যে, প্রান্তরে, জলদের গায়—
নদীগুলি মিশে যায় সাগর-সীমায়।
মহাকাল মন্দিরে মন্দিরা বাজে—
ঝঙ্কার শুনিতেছি হৃদয় মাঝে॥

বীভৎস!

দক্ষিণা বসু

(ছোট গল্প)

লাইট পোষ্টের কাছে নূতন একখানি 'বেবি অষ্টিন' গাড়ী দাঁড়িয়ে। আলোতে ঝিক্‌মিক্ করছে গাড়ীর কালো রং। সম্মুখে স্টার থিয়েটারের প্রকাণ্ড হল।...অদূরে একটা ডাষ্টবিন। তার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে নানা আবর্জ্জনার মধ্যে প্রচুর পরিত্যক্ত খাবার, অনেকগুলো ছেড়া কলাপাতা আর ভাঙ্গা মেটে গ্লাসের টুকরো। হয়ত পাশের বড় বাড়ীটায় বিয়ে বা সেরূপ কোন একটা অনুষ্ঠান হয়ে গিয়ে থাকবে। একটা কুকুর আর একটা কুকুরকে খানিক দূর ধাওয়া করে দিয়ে আসে। সে একাই আগলে থাকে ডাষ্টবিনের চারধার, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে খেতে থাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে।

একটা লোক এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। অতি রুক্ষ তার চেহারা। প্রায় নগ্ন, ধুলি-মলিন দেহ। হয়ত বা পাগল হবে। চোখে মুখে কেমন একটা নিঃসহায়তার চিহ্ন। অতি কাতর, রুগ্ন। ধীরপদে আরও এগিয়ে আসে লোকটা। খানিকক্ষণ উর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—কী জানি ভাবে। উপরে নীল আকাশ আর পায়ের তলায় পৃথিবীই যার সব তার আবার কিসের ভাবনা। তবু সে কি যেন ভাবে। ··

"ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ,"—একটা অস্ফুট ধ্বনি। লোকটার উদাস দৃষ্টি ধীরে ধীরে নেমে আসে। বড় বড় চোখে সেই নোংরা ছড়ান খাবারগুলোর দিকে সে একবার চেয়ে নেয়—আবার কি চিন্তা করে। ··

"হিঃ হিঃ হিঃ।"—হঠাৎ হেসে উঠে লোকটা। এদিকে কুকুরটা এক পাশের খাবার প্রায় শেষ করে আনে। ...দাঁড়াবারও ক্ষমতা আর নেই লোকটার। সে বসে পড়ে ডাষ্টবিনের একধারে। বাঁচবার মত কয়েকদিনের শক্তি সঞ্চয় করবে সে এখান থেকে, এই তার আকাঙ্ক্ষা।

ভীষণ তার ক্ষুধিত দৃষ্টি। দেখে মনে হয় নোংরা খাবারগুলো সম্ভব হয়ত সবটাই সে একেবারে খেয়ে ফেলে। কুকুরটাকে তার সহ্য হয় না। হাত দিয়ে সে তাড়া করে সেটাকে। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার শ্রম। কুকুটার তাকে উপেক্ষা করে—সে বোঝে, লোকটা দুর্ব্বল—অক্ষম—নিরুপায়। শেষে ভগবানের সৃষ্ট দুই জীব—মানুষ আর কুকুর—পাশাপাশি এক সঙ্গেই খেতে থাকে।

হাজার লোক যে যার মনে চলে যায় ফুটপাত ধরে। কারো বড় একটা চোখ পড়ে না এ দৃশ্যের দিকে। কেউ হয়ত চলার মুখেই বলে যায়ঃ আহা, লোকটার কি দুঃখ! ·আবার কেউ সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে : উঃ। কি সাংঘাতিক। বাস্, এপর্য্যন্তই। এর চেয়ে বেশী সমবেদনার পরিচয় আর পাওয়া যায় না।..

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসে। ধীরে ধীরে পথের লোক চলাচল আসে কমে। থিয়েটার হলের ভিতরে পড়ে গেছে বুঝি শেষ ড্রপ সিন্। সাথের পুরুষদের যেরূপ পোষাক হোক্ না কেন, মেয়ে ও বধূরা সব দলে দলে বেড়িয়ে আসে তাদের রূপ সজ্জার গৌরব নিয়ে। এ যেন সঙ্গিনীদের সাথে পোষাকের পাল্লা দেওয়া—থিয়েটার দেখার চাইতে, মনে হয় সেদিকেই যেন কারও কারও ঝোকটা বেশী। সে যাক্-গে। সবাই যে যার বাসার দিকে যাত্রা করে। থিয়েটারের সমালোচনা, বাসায় ঘুমিয়ে রেখে আসা ছেলে মেয়েদের কথা, এত রাত্তিরে যেয়ে খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা, এসব নানা বিষয়ই আলোচনা হয় এক একটি দলের মধ্যে। ক্ষুধার তাড়নায় ঐ ডাষ্টবিনের পাশে নোংরা পচা খাবারগুলো খেয়ে চলেছে যে লোকটা কারো চোখই পড়ে না সেদিকে। ...লোকটা কিন্তু একবার করে সবারই দিকে চেয়ে দেখে।

অবশেষে বেরিয়ে আসেন চুরুট টান্‌তে টান্‌তে এক বাঙ্গালী সাহেব। সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী। সামনের 'বেবি অষ্টিন' গাড়ীটায় উঠ্‌তে যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী ডেকে থামান তাঁকে। কুকুরের সাথে একটা মানুষকে খেতে দেখে মধ্য-বয়সী মহিলার মায়ের প্রাণ ব্যথিয়ে উঠে। লোকটাকে কিছু সাহায্য করতে বলেন তিনি সাহেবকে।

"নুইসেন্স। বীভৎস।।" —সাহেব উত্তর দেন। গাড়ীতে উঠে পড়েন তিনি। স্ত্রীও উঠেন তাঁব সঙ্গে সঙ্গে—আবাব অনুরোধ জানান। সাহেব তা' না রেখে পারেন না। পাতলুনেব পকেট থেকে একটা আধুলি তুলে ছুঁড়ে ফেলেন ঐ লোকটাব দিকে, একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করে। লোকটা অবাক হয়ে একটু তাকিয়ে থাকে, আধুলিটা কুড়িয়ে নেয়—আবার তক্ষুনি গাড়ীর দিকে আধুলিটা ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকাব করে বলে উঠে—"ম্যানেজার ফিরিয়ে নাও তোমার দান। বেশ আছি! আজ দেড় মাস প্রায় উপোষ করেই চলেছে, এ অবস্থা শুধু আমার নয়, আমাব মত আবো ৩৯ জন শ্রমিকের, যাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ তোমার কারখানা থেকে। তাদের অপবাধ—তারা চেয়েছিল তোমার কাছে সারা দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে,দুবেলা খেয়ে বাঁচবার মত দিনমজুরী"।

সাহেব তাব গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়। গাড়ী অদৃশ্য হযে যায়।

আলো

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ বি, এস্-সি।

প্রকৃতিব সন্তান মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অনেক বিষয়েই প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। তাহাব আহাবেব জন্য খাবার, পানীয়েব জন্য জল, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, শীত নিবারণের জন্য উত্তাপ এবং অন্ধকার দূব কবিবার জন্য সূর্য্যালোকের অতি সুবন্দোবস্তই প্রকৃতি কবিয়াছেন। প্রকৃতিব করুণার উপর নির্ভরশীল আদিম গুহাবাসী মানবের প্রধান কাজ ছিল—দিনের আলোকে নিজেব আহারের সংস্থান করা এবং রাত্রের অন্ধকারে নিদ্রা-দেবীর বন্দনা কবা—এতেই সে ছিল সম্পূর্ণ সুখী। মানব-বুদ্ধিব ক্রমবিকাশের ফলে সে বুঝিতে পারিল যে মানুষ কেবল পশুপক্ষীর মত আহার ও নিদ্রার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। পরস্পরের সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য করিবার মত কাজ তাহার অনেক আছে;—অথচ তাহার ইচ্ছা পূরণের পথে প্রধান বাধা রাত্রের অন্ধকাব। প্রকৃতি অতি শৃঙ্খলাপূর্ণ সুবন্দোবস্তই করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মানুষের কর্ম্মময় জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই অসুবিধা দূব কবিবার জন্য সে নানাভাবে চিন্তা করিল এবং পবিশেষে চিন্তাশীল মানবের অদম্য প্রচেষ্টাব ফলে কৃত্রিম আলোকের উদ্ভব এবং তাহার প্রচলন হইল—মানব প্রকৃতির গর্ব্বকে খর্ব্ব করিল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ দিবারাত্র আলস্যে সময়াতিপাত করেন নাই বলিয়াই আজ বিজ্ঞান-জগতে চরম উন্নতি এবং সভ্যজগতেব অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে

আদিমকালেব অসভ্য মানব প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করিত তাহার অন্ধকার গুহা। আরও শক্তিশালী আলোকের সন্ধান করিতে করিতে ক্রমে দেখা গেল যে, কয়লা হইতে উদ্ভূত গ্যাস (Coal gas) হইতে খুব উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চ্চারও অনেক উন্নতি হইল এবং বিদ্যুতের আবিষ্কার হওয়াতেই সভ্যজগতের সকল আকাঙ্ক্ষাই ক্রমে চরিতার্থ হইল। একটি সূক্ষ্ম তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রেরণ করিলে তাহা এত উত্তপ্ত হয় যে সেই তার হইতেই

আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। বিদ্যুতের এই ধর্ম্মকে কাজে লাগাইয়া সৃষ্টি করা হয় বৈদ্যুতিক আলোর—যাহার অভাবে আজ বড় বড় মহানগরী অচল হইয়া যাইবে।

আলোর কথা মনে হইতেই মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে—"আলো কি এবং তাহার উদ্ভব হয় কিরূপে?" এই প্রশ্নের মীমাংসা অতি চমৎকার। প্রত্যেকটি বস্তুকেই বর্ত্তমান মতানুসারে অতি সূক্ষ্মতম কণাতে বিভাগ করা যায়—ইহার নাম পরমাণু। পরমাণুর অভ্যন্তরে কতকগুলি ধনাত্মক কণা প্রোটন (Proton) বর্ত্তমান। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সম-সংখ্যার ধনাত্মক কণা ইলেকট্রন (Electron) প্রতিনিয়ত নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলি নিয়ত ঘুরিতেছে। বস্তুটীকে যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেক্‌ট্রন্ কণা হঠাৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিজ কক্ষপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কক্ষপথে ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতেই উৎপত্তি হয় আলোকের।

আলোর স্বরূপ লইয়া অনেকদিন যাবৎ মতদ্বৈধ চলিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাচীন দার্শনিক নিউটন সর্ব্বপ্রথম বলেন যে, একটী বস্তু উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণা (Light Corpuscles) ভয়ঙ্কর বেগে নির্গত হইতে থাকে। এইগুলি যখন আমাদের অক্ষিপটে আঘাত করে তখন আমাদের আলোক সম্বন্ধে অনুভূতি হয়। এই মতবাদ দ্বারা আলোকের বক্রগতি Deffraction এবং দুই পথগামী আলোকের সংমিশ্রণে অন্ধকার (Interference) প্রভৃতি ঘটনার সঠিক মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু তাহার মতে বায়ুর চেয়ে জল অথবা কাচের অভ্যন্তরে আলোকের গতিবেগ (Velocity) বেশী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ফুকোর (Fucoults) পরীক্ষা দ্বারা তাহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইল। নিউটনের পর, হিউগেন (Heughens) তাহার 'Wave theory of light' প্রকাশ করিলেন—তাঁহার মতে আলোক তরঙ্গ-ধর্ম্মী। এই মতবাদের মূলকথা এই যে উত্তপ্ত বস্তুটীর লম্ফ প্রদানের ফলে যে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহাই আমাদের অক্ষিপটে আঘাত করে বলিয়া আমরা বস্তুটীকে দেখিতে পাই। আলোকে অবস্থিত যে কোন বস্তুর উপর সূর্য্য অথবা অন্য কোন উৎপত্তিস্থল (Source) হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-তরঙ্গ সেই বস্তুটীর উপর প্রতিবিম্বিত (Reflected) হইয়া তাহার পর আমাদের অক্ষিপটে আঘাত করে এবং সেই জন্যই আমরা বস্তুটীকে দেখিতে পাই, কিন্তু আলোর উৎসটিকে সরাইয়া লইলে বস্তুটী অন্ধকারে মিলাইয়া যায়, যদিও তাহা সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে এই মতবাদ দ্বারাও কয়েকটী জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকগণ অনেকদিনের অনেক গবেষণার পর (Quantum) কোয়াণ্টাম্ মতবাদের উদ্ভব করিলেন। বর্ত্তমানে এই মতবাদের সাহায্যে সকল প্রশ্নেরই অতি সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে। একটী জলধারাকে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণায় ভাগ করা যায়, সেইরূপ একটী আলোকরশ্মিকেও বর্ত্তমানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "লাইট কোয়াণ্টা" (Light Quanta) অথবা 'ফোটন্' (Photon) নামক অংশে বিভক্ত করা সম্ভব, কিন্তু তাহাতে আলোকের তরঙ্গ-ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। আলোকের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের পরিমিত দৈর্ঘ্য আছে—ইহাকেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলা হয় (Wave length of light)। কাজেই আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক নিউটন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক হিউগেন উভয়ের মতবাদই সত্য, নয় তো উভয়ের মতবাদই সম্পূর্ণ ভুল। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একই আলোক এক সময় কণার গুণ প্রকাশ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই হয়তো তরঙ্গ-ধর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে—ইহার আচরণ কখন কিরূপ হইবে তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই।

এই কারণেই সুবিধার্থে সাধারণতঃ হিউগেন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত মতবাদ দ্বারাই কাজ করা হয়। আলোককে তরঙ্গ বলিলেই সব কথা শেষ হয় না। তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত বাহক (Medium), যেমন নদী-তরঙ্গের বাহক জল, শব্দ-তরঙ্গের বাহক বায়ু।

ইহার প্রকৃত সন্ধান বৈজ্ঞানিক করিতে পারেন নাই বলিয়াই চিন্তা করিয়াছেন "ইথার" (Ether) নামক একটা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন পদার্থের। তাহাদের মতে ইথার নামক পদার্থটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, জলে, স্থলে, সকল বস্তুতেই বিরাজিত। তাহাদের নানারূপ প্রশ্নের মিমাংসার জন্য এই অদৃশ্য অজ্ঞাত পদার্থটীর কতগুলি গুণাগুণ কল্পনা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে দেখা গেল সাধারণ সূর্য্যালোককে একটী স্পেক্ট্রাস্কোপ (Spectroscope) নামক যন্ত্রস্থিত কাচের ত্রিফলাব (Prism) ভিতর দিয়া পাঠাইলে তাহা হইতে রামধনুর ন্যায় সাতটী বর্ণের উদ্ভব হয়। ইহা হইতে বোঝা গেল যে, সাধারণ আলোক সাতটী বর্ণের সমষ্টি। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—যন্ত্র সাহায্যে এইরূপ নানাবর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে লাল আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য '০০০৭৬ মিলিমিটার, বেগুনে আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য '০০০৪ মিলিমিটার এবং হলুদ, সবুজ, নীল প্রভৃতি আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ইহাদের মধ্যবর্ত্তী। স্পেক্ট্রাস্কোপ (Spectroscope) দ্বারা আরও দেখা গেল যে, প্রত্যেকটী মৌলিক পদার্থ হইতেই সূর্য্যালোকের অনুরূপ কিন্তু পৃথক Spectrum পাওয়া যায়, যাহা আর কোন বস্তু হইতে প্রাপ্ত স্পেক্ট্রামের (Spectrum) সঙ্গে মিলে না—ইহারই সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহনক্ষত্র হইতে বিচ্ছুরিত আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের গঠন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

দৃশ্যমান আলোকের এই সাতটী বর্ণ ছাড়া সূর্যালোকের আবও অদৃশ্য আলোকবশ্মি বর্ত্তমান। ইহাদের বলা হয় 'আল্ট্রাভায়োলেট' (Ultraviolet) এবং 'ইন্‌ফ্রা রেড' (Infra red) রশ্মি। দৃশ্য আলোকের মধ্যে লাল্ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী, কিন্তু "ইন্‌ফ্রা রেড" রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেগুনে আলোক-তরঙ্গের চেয়েও কম বলিয়া তাহাকে সাধারণ চোখে দেখা যায় না। "আল্ট্রাভায়োলেট" রশ্মি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রধান সম্পদ, এবং ইহা সূর্য্যের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়, সেইজন্ত বর্ত্তমানে অনেক দেশেই সূর্য্য-স্নানের (Sun bath) প্রচলন হইয়াছে। অদৃশ্য 'ইন্‌-ফ্রা রেড্' রশ্মিও কম উপকারী নহে। ইহার সাহায্যে বর্ত্তমানে অন্ধকার গৃহে অথবা কুয়াসাচ্ছন্ন স্থানেও ফটো তোলা অতি সহজ কাজ। উপরন্তু এই রশ্মির সাহায্যে অনেক স্থানে চোর ধরিবার জন্য ফাঁদও পাতা হয়।

এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার আলোক রশ্মির কথা বর্ণিত হইল তাহার চেয়েও অত্যাশ্চার্য্য এবং অদ্ভুত রশ্মিরও আবিষ্কার হইয়াছে—ইহার নাম রঞ্জনরশ্মি অথবা X-rays. এক-দিন রঞ্জন সাহেব একটী কাল কাগজে ঢাকা কাচের নলের মধ্য দিয়া বিদ্যুত চালনা করিয়া নল মধ্যস্থিত বায়ু বাহির করিতে থাকেন। নলটী প্রায় বায়ু শূন্য হইলে হঠাৎ অন্ধকারে অবস্থিত একটী "বেরিয়াম প্লেটিনোসায়েনাইড" (Barium Platinocyanide) দ্বারা প্রস্তুত পর্দ্দা (Screen) আলোকমণ্ডিত হইয়া ওঠে। তাহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে নল হইতে কোন অদৃশ্য রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া পর্দ্দায় আঘাত কবাতেই তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই অদৃশ্য আলোকরশ্মির নাম X-rays অথবা রঞ্জন রশ্মি। ইহার কয়েকটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা মাংস অথবা পাতলা ধাতব পদার্থ অনায়াসে ভেদ কবিয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণীর হাড় এই আলোকের নিকট স্বচ্ছ নহে। উপরন্তু এই আলোক সম্পাতে ফটোগ্রাফিক প্লেট নষ্ট হইয়া যায়। এই অত্যাশ্চার্য্য গুণসম্পন্ন রশ্মিটিকে ডাক্তার-গণ সহজেই কাজে লাগাইয়াছেন—বর্ত্তমানে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে ফটো তুলিয়া আগে অবস্থা বোঝা হয়, তারপর হাড়টীকে যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপিয়া দেখিয়াছেন। এইরূপ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম, কাজেই সাধারণ আলোকে অস্বচ্ছ অনেক বস্তুই ইহার নিকট স্বচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লর্ড রাদার ফোর্ড (Lord Ruther Ford) এবং লেন্নান্ (Mec. Leunan) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আর একটী নূতন আলোকের সন্ধান পান। ইহার সবচেয়ে আশ্চর্য্য গুণ এই, যে-সকল বস্তু রঞ্জন আঘাতও

দুর্ভেদ্য তাহাদের অনেক বস্তুকেই এই রশ্মি অনায়াসেই ভেদ করিয়া যাইতে পারে। রঞ্জন রশ্মির নিকট একটি সাধারণ মুদ্রাই অস্বচ্ছ, কিন্তু এই নূতন রশ্মিটী কয়েক গজ প্রশস্ত সীসক অথবা অন্য যে কোন ধাতব পদার্থ অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এই অত্যাশ্চর্য্য এবং অজ্ঞাত-পূর্ব্ব রশ্মির নাম "কস্‌মিক রশ্মি" (Cosmic Rays)। পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোন স্থানে উৎপাদিত হইয়া এই রশ্মি অবিরত পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। অনন্তকাল হইতে কিন্তু আমরা এতদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অন্ধ ছিলাম বলিয়া ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

গত শতাব্দীর শেষভাগে দুইটি নিয়মের (Laws) প্রবর্ত্তন হয়, তাহাদের মূল কথা এই যে, বস্তু (Matter) এবং শক্তি অবিনশ্বর। আমরা শত চেষ্টাতেও ইহাদের ধ্বংস বা সৃষ্টি করিতে পারি না। তবে সুবিধানুযায়ী বস্তু এবং শক্তি উভয়কেই এক রূপ হইতে অন্য রূপে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। যদি একটী 'হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড' (Hydrogen Peroxide) পূর্ণ বোতল সূর্য্য রশ্মিতে রাখা যায়, তবে তাহা জল এবং 'অক্সিজেন' (Oxygen) নামক গ্যাসে বিভক্ত হইয়া যায়। কাজেই কিছুক্ষণ পরে বোতলের ছিপি খুলিলে আমরা দেখি যে অক্সিজেন বায়ুতে মিশিয়া গেল এবং বোতলে জল পড়িয়া রহিল। আধুনিক মতানুসারে অক্সিজেনের গুরুত্ব জলের ওজনের সঙ্গে যোগ করিলে দেখা যাইবে যে, যোগফল হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওজনের চেয়ে বেশী, কারণ জলে আলোক-রশ্মি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার ওজন গণনা হইতে বাদ দিয়াছি।

স্যার জে, জে, টমসন (Sir J J Thomson) প্রমাণ করেন যে, একটী বিদ্যুতপূর্ণ (Charged) পদার্থকে গতিশীল করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুরুত্বও পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিলেন যে, গতিশীল হইলে প্রত্যেকটী পদার্থেরই গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে, কারণ তাহারা প্রত্যেকেই বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন কণাদ্বারা গঠিত। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটী পদার্থের গুরুত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—স্থির গুরুত্ব (Rest mass) অর্থাৎ বস্তুটী স্থির থাকিলে তাহার যে গুরুত্ব হইবে এবং আর একটী পরিবর্ত্তনশীল অংশ যাহার উদ্ভব বস্তুটীর গতি হইতে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইন-ষ্টাইন (Einstine) তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান-জগতে অমর হইয়াছেন। তাঁহার মতে যে-কোন রূপ শক্তিরই নিজ নিজ গুরুত্ব আছে—যদি ইহা ঠিক না হয় তবে তাঁহার Theory of relativity ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাপ (Heat), শব্দ (Sound), আলো (Light) প্রভৃতির প্রত্যেকটী শক্তির বিভিন্ন বিকাশ—কাজেই আমরা দেখিতেছি যে আমাদের চিরপরিচিত আলোকেরও পরিমিত গুরুত্ব আছে। এক খণ্ড কয়লা পোড়াইলে যে ছাই এবং গ্যাস পাওয়া যায়, তাহাদের ওজনের যোগফল দ্বারা কখনই কয়লার ওজন পাওয়া যায় না। তাহার সঙ্গে উদ্ভূত তাপ এবং আলোক-শক্তির গুরুত্ব যোগ করা অতীব প্রয়োজন—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ম্যানোয়েল (Manwell) দেখান যে আলোকরশ্মির সাহায্যেও পরিমিত চাপের (Pressure) উদ্ভব হয়—এখন আমরা বুঝিতেছি যে আলোকরশ্মির পরিমিত ওজন আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। একটী সাধারণ কামানের গোলাকে যদি ৫০ কোটী ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়, তবে তাহা হইতে উদ্ভূত আলোক-রশ্মির প্রচণ্ড স্রোতে গোলকটীর ৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত যে-কোন বস্তুই তৃণের ন্যায় ভা[illegible] ইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্য হইতে প্রতি মিনিটে সামান্য ২৫০ কোটী টন ওজনের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে, যদিও ইহার অতি সামান্য অংশই আমাদের পৃথিবীর উপর পতিত হয়। কারণ বিশ্বের মহাশূন্যে যে বিন্দুবৎ পৃথিবী তাহাতে এর চেয়ে বেশী রশ্মি পতিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সূর্য্যের এই যে ক্ষয় হইতেছে তাহা পূরণের একমাত্র উপায় সূর্য্য-দেহে মিনিটে ২৫০ কোটী টন ওজনের বস্তুর সংযোগ করা। বাস্তবিক তাহাই ঘটিতেছে রহস্যময় বিশ্বের বুকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত অদৃশ্য ধূলিকণা, উল্কাপিণ্ড অহর্নিশ

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার ঠিকানা কে জানে? সূর্য্য হয়তো তাহার যাত্রা পথ হইতে এইরূপ অসংখ্য ধূলিকণা অথবা উল্কাপিণ্ড কুড়াইয়া লইয়া, নিজেকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। এইরূপ ক্ষয় পূরণের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া। পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের সূর্য্যের যদি ধ্বংসের পর আর একটী সূর্য্যের উদ্ভব হয় তবে তাহার ওজন বর্ত্তমান সূর্য্য হইতে অনেক গুণ বেশী হইবে। এখন প্রশ্ন হইল "সূর্য্যের যে অংশটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সূর্য্য-দেহে কোন্ রূপে সঞ্চিত ছিল?" আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে একটী বস্তুর স্থির গুরুত্ব (Rest mass) তাহার শক্তির দরুন উদ্ভূত গুরুত্বের চেয়ে অনেক গুণ বেশী, কাজেই এস্থলে খুবই সম্ভব যে আমাদের সূর্য্যের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটুকু তাহার স্থির গুরুত্বেই সন্নিবিষ্ট ছিল। অত্যধিক উত্তাপের সহায়তায় সূর্য্য-দেহস্থ পরমাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলেই উদ্ভব হয় আলোকরশ্মির—যাহা প্রতিনিয়ত সূর্য্য হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

দুইটী দ্রুতগামী প্রোটন এবং ইলেকট্রন কণার সংঘর্ষ হইলে তাহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয় একটী আলোক ছটার অর্থাৎ একটি "ফোটনের" (Photon), যাহার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুর গুরুত্ব অক্ষয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইলে আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংমিশ্রণে উদ্ভূত "ফোটনের" গুরুত্ব তাহাদের দুইটীর মোট ওজনের সমান হইবে। আমরা জানি যে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মোট ওজন একটী "হাইড্রোজেন" (Hydrogen) পরমাণুর সমান। কাজেই "ফোটনের" গুরুত্ব কত হইবে তাহা না বলিয়া দিলেও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। সূর্য্যের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাস্তবিক এইরূপ ফোটনের উদ্ভব হইয়া থাকে তবে তাহাদের সামান্য কিছু এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীর বুকে পতিত হইবে। বৈজ্ঞানিকের আশা সফল হইয়াছে—"ফোটনের" (Photon) প্রকৃত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্ব বর্ণিত "কস্‌মিক্ রশ্মিতে" (Cosmic radiations)।

প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংমিশ্রণের ফলেই যে আলোকরশ্মির উৎপত্তি, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রাদি সর্ব্বত্রই বস্তু (Matter) রূপান্তরিত হইয়া আলোকরশ্মিতে পরিণত হইতেছে এবং তাহাই অহর্নিশ নামিয়া আসিতেছে পৃথিবীর বুকে। বস্তুর অবিনশ্বরতার কোন সত্যতা বর্ত্তমানে নাই। বস্তুর (Mass) গুরুত্ব এবং শক্তির অবিনশ্বরতার যে নিয়ম ছিল (Laws of conservation of mass and energy), তাহার পরিবর্ত্তে একটী মাত্র নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে—বস্তুর এবং শক্তি-সমষ্টির অবিনশ্বরতা। বিশ্বের বুকে প্রতিনিয়ত যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে তাহাতে বস্তু এবং শক্তি-সমষ্টির কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং ভবিষ্যতে হইবেও না। কিন্তু তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। সেই জন্যই বস্তুর ধ্বংসের ফলেই সৃষ্ট হইতেছে সর্ব্বপ্রকার শক্তি—তাপ শক্তি, আলোক শক্তি। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মাঝে তাই চিরদিনই কঠিন বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া অসাড়, (Insubstantial) তাপ অথবা আলোকশক্তিতে পরিণত হইতেছে—"For ever the tangible changes into the intangibles (Jeans)" এইখানেই সৃষ্টির মাধুর্য্য।
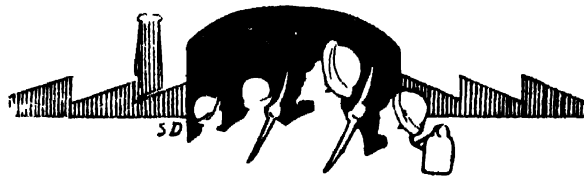
ভারতে রাজনীতির ক্রমবিকাশ

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ , পি-এইচ, ডি

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পূর্ব প্রবন্ধে আমি উল্লেখ করেছি যে ছেলের দলের অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সমিতির নেতা, পি, মিত্র ও অন্যান্য নেতাদের সহিত অবনিবনাও হওয়ার ফলে তিনি সমিতি হতে বিতাড়িত হন। এই বিষয়ে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে আমি পূর্ব প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি। কথাটা এই যে নেতার কাছে যতীনবাবুর বিপক্ষে নানা প্রকারের নালিশ উপস্থিত করা হয়। পরে যতীনবাবুর বন্ধুরা, তাঁর বিপক্ষে যে সব নালিশ করা হয়েছিল তার সত্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং শুনেছিলুম যে, আসল অভিযোগটা একেবারে ভুয়া। তবে একটা অভিযোগ দলের নানা লোকের কাছ থেকে অনেকদিন ধরে শুনেছিলুম। তা' হচ্ছে এই—সভ্য ও জনসাধারণকে শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেবার জন্য, সমিতি অপার সার্কুলার রোড (গড়পারের কাছে) আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ার প্রাঙ্গণের সংলগ্ন একটি বাড়ীও ভাড়া নেওয়া হয়, যতীনবাবু সপরিবারে মফঃস্বলস্থ কর্মীদের নিয়ে সেই বাড়ীতে থাকতেন। স্বভাবতঃ সেখানে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হতো, যতীনবাবুর বিপক্ষের অনেক অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল যে, তাঁর বাসায় খাইখরচা বাবদে খরচা বেশী হতো। এই সময় বলে রাখি—এই ঘটনার সাথে আমি বহিরঙ্গের লোক ছিলাম, যতীনবাবুর সহিত সমিতির ঝগড়ার ফলে এই আখড়া উঠে যাওয়ার পর, আমাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়, কাজেই এই সব বিষয়ে পুরাতন সভ্যদের নিকট থেকে যা' শুনেছি তা' ব্যক্ত করছি, এখন উপরোক্ত অভিযোগের একটি নমুনা দিচ্ছি। আমার কোন বাল্য-সহপাঠী, যিনি আমার অগ্রে দলভুক্ত হন এবং পরবর্তী যুগে তথাকথিত অনুশীলন দলের একজন নেতা হন, তিনিই আমাকে একদিন বললেন—"দেখলে ভাই, নেতাদের খেটে রোজগার করা টাকা, অনেক কষ্টে যোগাড় করা হয়েছিল তা' অমুকে খরচ করে নষ্ট করলে।" আর একজনের কাছ থেকে শুনলাম—"জলখাবারের জন্য হালুয়া তৈরী হতো, তাতে ঘি অপচয় করা হতো" ইত্যাদি। এই বন্ধুটি আমায় আর একটি গল্প বলেন। সার্কুলার রোডের আখড়া উঠে গেলে, কর্মীরা গ্রে ষ্ট্রীটের কাছে একটি বাড়ী করে, তথায় কতিপয় তরুণ কর্মী থাকতেন। আমার বন্ধুটিও একদিন ঐস্থানে গেছেন, সেই সময় সমিতির কোষাধ্যক্ষ মহাশয়, যিনি কলকাতার একটি বিখ্যাত ধনী গোষ্ঠির ছেলে, তিনি তথায় গিয়ে কর্মীদের সাথে কথপোকথন করছিলেন। এক কথায়, যৎকিঞ্চিৎ আমার বন্ধু যা শুনেছিলেন তা' এই—"তোমরা খাও ভাল করে খাও, এই কর্মে খেতে হয়, কিন্তু অপচয় করোনা।" ইহাতে বুঝা যায় অপচয় নামক একটি চার্জ যতীনবাবুর বিপক্ষে আনা হয়, এই চার্জের সত্যতা নির্ধারণ কে করবে? এই সময় থেকে এক ভাব আমার মনে গ্রথিত হয়ে থাকে। চিরন্তন প্রথানুসারে এদেশের লোক কাহাকেও এক পয়সা চাঁদা দিলে তার চারবার কান ধরে টানে। এদেশের লোক মনে করে, কিঞ্চিৎ চাঁদা দিয়েই লোকটিকে গোলাম করে রেখেছি। এই বিষয় কেহই চিন্তা করলেন না যারা বাড়ীর বাহির হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে এসেছে তাদের খাদ্যে তেল কি ঘি বেশী পড়ল এটা বড় কথা নয়, ভবিষ্যতের ইতিহাস থেকে এই সব লোকের প্রত্যেকের জীবনের গতি দেখে আজ এই কথা বিচার করবার সময় এসেছে যে, যাঁরা কিছু টাকা রোজগার করে কর্মীদের হাতে দিয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে তাঁদের এবং এই দানের স্থান কোথায়? আর এই কর্মীরা, যাঁরা পরে দেশের কর্মের জন্য নানাভাবে নিপীড়িত হয়েছেন এবং কেউ কেউ আন্দামানেও নির্বাসিত হয়েছিলেন, কেউ বা এখনও বিদেশে প্রবাসে বাস করছেন, তাঁদের কর্মেরও বা স্থান

কোথায়। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যে-বন্ধুটি আমাকে এই গল্পটি বলেছিলেন তিনি বিদেশে একটি বড় দেশের সৈন্য-শ্রেণীতে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেন। পরে যুদ্ধের সময় আহত হন, তিনি আজও বিদেশে প্রবাসে বাস করছেন।

যতীনবাবু দল থেকে বিতাড়িত হবার পর, বিখ্যাত লেখক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়, এবং তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে কলহের বিষয়ও অবগত করান। এই সংবাদ শুনে দেবব্রতবাবু ও আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে যাই। তাঁহার সঙ্গে নানা কথার মধ্য দিয়ে যতীন্দ্রবাবুর বিপক্ষে চার্জের কথা উঠে, তিনি বলেন যাঁকে কাজ করতে হয় তিনি হিসেবেব খুঁটিনাটি কি করে দিতে পারেন। সুরেন্দ্র বাড়ুয্যেব বিরুদ্ধেও এই কথা উঠেছিল, তারপব আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম তিনি ম্যাট্‌সিনিব জীবনচরিত সম্পূর্ণ করেননি কেন। ইহাতে তিনি বলেছিলেন—"ওহে, ম্যাটসিনিব জীবন অকৃতকার্য হয়েছিল, তাই বাংলার ছেলেকে জানতে দিতে চাই না। আদর্শ উচ্চ না হলে কর্মে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যতীনবাবুকে সঙ্গে করেও মিত্রমহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেন। এই সূত্র ধরেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাথে আমাদের দলের সংযোগ স্থাপন হয়। পুরাতন ভূদেব বাবু থেকে আরম্ভ করে যে-সব স্বদেশী ভাবোদ্দীপক লেখক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব লেখাই প্রাঞ্জল ছিল এবং আদর্শও পরিষ্কার ছিল। তাঁর লেখার ভিতর আমেরিকার সাধারণতন্ত্রীয় ভাবটা ফুটে উঠে। কিন্তু দুঃখের সহিত উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, বৃদ্ধকালে তিনি "কাক চরিত্র" প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপাবের অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ম ছাত্রমহলে বেশ ভাল ভাবে চলতে লাগল। স্বদেশী লেখকের পুস্তক সমূহে ও ম্যাট্‌সিনির জীবনীতে চিন্তার খোরাক ছিল। পণ্ডিত সখারাম গনেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের নিয়ে একটি পাঠচক্র পরিচালনা করতেন। এই পাঠচক্রে তিনি ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে আলোচনা করতেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের বিষয় আলোচনা করতেন। বোম্বায়ের শ্রমিকদের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, কাল নামক পত্রিকা থেকে তারা Socialistic idea পাচ্ছে। তিনি আমাদের অনুরোধ করতেন, Imperial Libraryতে গিয়ে Socialistic বই পড়বার জন্য। ইহার ফলে আমার সহকর্মী মধ্য-কলিকাতার ৺হরিশ্চন্দ্র শিকদার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ Mac-farlaneকে গিয়ে বলেন যে, তিনি Socialist পুস্তক পড়তে চান এবং তিনি যেন দেন। ইহাতে তিনি বলেন, "My dear boy don't read those bad books. I will give you better books to read." ইহার পর আমি যখন ঐ ধরণের পুস্তক পড়তে লাইব্রেরীতে যাই—তখন নিজেই Catalogue খুঁজে যা' পেলাম তা' পড়লুম। কিন্তু খুঁজে পেলাম H. H. Hyndmannএর "History of the Social Democratic Party of Great Britain" নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সে যাই হোক্, কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি, আজ যে-রাস্তায় চলেছি তার হাতে খড়ি সখারামবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি আমাদের পরামর্শ দিতেন লেখা অভ্যেস করবার জন্য। সখারাম গোঁড়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হলেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বিষয়ে অতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোক যে এক দেশবাসী এবং উভয়েই সম্প্রীতিতে বাস করবার উপযোগী তা তিনি আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। একবার (১৯০৪।১৯০৫) তৎকালীন 'মিহির' ও 'সুধাকর' নামক মুসলমান পত্রিকায় হিন্দুদের ভীষণ ভাবে গালিগালাজ করা হয়। তিনি আমাকে এই বিষয়ে লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁর উপদেশে উপদিষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে, একটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ও মুসলমানী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আমার প্রতিপাদ্য ছিল যে, ভারতীয় মুসলমানেরা 'ম্লেচ্ছ' বা 'যবন' নন্। তাঁরা ভারতীয় আর্যবংশসম্ভূত এবং হিন্দুর জ্ঞাতি, উভয়েরই এক সঙ্গে বাস করা বাঞ্ছনীয় ও সম্ভবপর ইত্যাদি।

কিন্তু তত্রাচ উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হিন্দুদের গালাগাল

করিতে ছাড়লে না। ঘটনাটি এই স্থলে উল্লেখ করলাম তৎকালীন হিন্দুদের মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি কত Conciliatory tone ছিল তা দেখাবার জন্য, এবং ইহাও আশ্চর্য যে আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের, হিন্দুদের প্রতি ধারণা আজ পর্যন্ত একই রয়েছে। স্বদেশীযুগের পূর্বেকার ও তৎপরবর্তী যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের বিষয় আজকালকার সাধারণের মধ্যে এক অদ্ভুত ধারণা আছে। একদলের ধারণা যে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা আজকাল-কার মাপকাঠির পরিমাণে অতি গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুর দল ছিলেন, আবার অন্যান্যের ধারণা যে তাঁরা আজকালকার কথায় যাকে 'দাদাবাদ' বলে তাই করতেন। কিন্তু উভয়ই মিথ্যা। স্বাধীনতা আন্দোলন-কারীদের মধ্যে ভবিষ্যতের আদর্শের জন্য বাঁধাবাঁধি একটা Programme ছিল না। ইহা সত্য যে কেহ কেহ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন এবং আমেরিকার মত Republican State স্থাপন প্রয়াসী ছিলেন। আবার এই আন্দোলনের আওতা থেকে কেউ বা Socialist সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। এই আন্দোলনে গোঁড়া হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের তর্ক উত্থাপিত হত না। ক্রমশঃ প্রকাশ্য

নববর্ষে

অমরগোপাল নন্দী

নির্ম্মম কালে তন্দ্রা-আড়ালে যায় যারা বনবাসে,
ছন্দিত পুনঃ কালের চক্রে ফিরে ফিরে তারা আসে।
বিদায় গোধূলি ক্ষণে
যে যায় রবির সনে,
প্রভাতের রাঙ্গা ইঙ্গিতে পাই সে মোর আপন জনে,
বিরহ ব্যাকুল মনে।

যুগ যুগ ধরে ধরে
যায় যে পিছনে সরে,
চঞ্চল-কাল রচিয়া বৃত্ত লয় তা বরণ করে,
নবীন যুগের ডোরে।
আজি এ বরষপ্রাতে
কি নিয়ে এসেছ হাতে ?
নির্জ্জনে একা যাহার লাগিয়া কেঁদেছি নিশুতি রাতে,
এনেছ কি তারে সাথে ?

তোমার বেদনা ম্লান
হয়েছে সাঙ্গ, তৃপ্ত কালের জোয়ার ভাঁটার গান—
বিস্মরণের বন্যার জলে তোমার অসম্মান,
হ'ল তাই অবসান।

সতর্ক-বাণী

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

(গল্প)

ভোর বেলা।

কুয়াসার আবরণ ছিঁড়ে নীল আকাশ বেরিয়ে আস্‌ছে ধীরে ধীরে।

একটি যুবক এগিয়ে চলেছে সামনের পাহাড়ের পথে। সারা বিশ্বের ছন্দের তালে যেন অন্তর তার নাচ্‌ছে। ভয় নাই। ভাবনা নাই। সমতল মাঠের বুক বেয়ে সে এগিয়ে চলেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অবিরাম চলতে চলতে একটা ঘন বনের কাছে পৌঁছুতেই ভেসে এল একটা রহস্যময় বাণী— নিকটে ও দূরে উঠল তার প্রতিধ্বনি : হে যুবক, এ অরণ্য তুমি অতিক্রম করো না, যদি করো, তুমি হবে হত্যাকারী।

যুবক বিস্মিত হল। চাইল চারদিকে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। নিশ্চয় কোন অশরীরীর বাণী। কিন্তু যুবকের সাহস অজানার কথায় সাড়া দিল না। পায়ের গতি থামিয়ে চলল এগিয়ে, অতি সতর্ক তার পদক্ষেপ। যে অজ্ঞাত শত্রু তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, তার সাথে দেখা হবার জন্য সে প্রস্তুত। কিন্তু কারো দেখা মিলল না। না শোনা গেল আর কোন সন্দেহপূর্ণ বাণী। বিনাবাধায় অরণ্য-ছায়া অতিক্রম করে যুবক বনের অপর প্রান্তে উপনীত হল। শেষ অরণ্যশাখার ছায়ায় বসে খানিক বিশ্রাম করল।

সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পর্বতের কোলে মিশেছে। তারি বুকে একটি উত্তুঙ্গ শিখর আকাশে উঠেছে সুস্পষ্ট রেখায়। ওই যুবকের গন্তব্যস্থান।

সেখানে থেকে উঠে দাঁড়াতেই আবার ভেসে এল সেই রহস্যময় বাণী—নিকটে ও দূরে উঠল তার প্রতিধ্বনি —এবার যেন অধিকতর আন্তরিকতায় ভরা : হে যুবক, এই প্রান্তর তুমি অতিক্রম করো না, যদি করো তোমা হতেই তোমার পিতৃভূমি ধ্বংস হবে।

এই অর্থহীন বাণীতে যুবকের মুখে হাসি এল। সে পা চালিয়ে দিল দ্রুতগতিতে।

সন্ধ্যার কুয়াসা নেমে এল প্রান্তরের বুকে। যুবক উপনীত হল পর্বত-প্রাচীরের পাদদেশে। যেমন পাহাড়ের গায়ে সে পদক্ষেপ করবে অমনি আবার সেই বাণী—রহস্যময়, ভীতিপ্রদ—নিকটে ও দূরে উঠল তার প্রতিধ্বনি : হে যুবক আর অগ্রসর হয়ো না, যদি হও, মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

যুবক উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। নিঃসংকোচ পদক্ষেপে ধীরে সে এগিয়ে চলল পথ বেয়ে। পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে আসছে। যুবকের বুকও ততই স্ফীত হচ্ছে গর্বে ও আনন্দে।

তারপর সে উপনীত হল পর্বতশিখরে। দিনের শেষ রশ্মি রেখায় তার শির উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

জয়গর্বিত কণ্ঠে সে বলে উঠল : হে অশরীরী দেবতা বা শয়তান, তোমার পরীক্ষায় আমি জয়ী হয়েছি। কোন হত্যায় আমার বিবেক ভারাক্রান্ত হয় নাই, নীচে আমার পিতৃভূমি ঘুমিয়ে আছে অক্ষত দেহে, আর আমি এখনো বেঁচে আছি। তুমি যেই হও তোমার চেয়েও আমি শক্তিশালী, তোমার কথায় বিশ্বাস না করে আমি ঠিকই করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চারদিক হতে উঠল বজ্রগম্ভীর ধ্বনি : হে যুবক, তুমি ভ্রান্ত।

এই অশনিসমান বাণীর প্রভাব যুবক খাড়া হয়ে সইতে পারল না। বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের এক পাশে গা এলিয়ে দিল। ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে সে

নিজেকে যেন বলল: 'নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আমি হত্যাকাণ্ড সাধন করে বসেছি।'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল: তোমার অসতর্ক পদক্ষেপে একটি পতঙ্গ দলিত হয়েছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে যুবক উত্তর দিল: ওঃ, এই কথা, তাহলে তো শত সহস্রবার আমি অপরাধী—জীবের অসতর্ক পদক্ষেপে আজ পর্যন্ত অসংখ্য জীবের মৃত্যু ঘটেছে এবং ঘটবে।

: এই দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই জন্যেই তোমাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম। জাগতিক কার্য-কারণের চিরন্তন শৃঙ্খলের মাঝে এই পতঙ্গটি কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করত তা কি তুমি জান?

মাথা নীচু করে যুবক জবাব দিল: আমি জানি না, জানা সম্ভবও নয়। তাই সবিনয়ে স্বীকার করছি, বহু সম্ভাবনার মধ্যে যে হত্যাকাণ্ডটি তুমি রোধ করতে চেয়েছিলে, বনপথের মাঝে আমি ঠিক সেইটি সাধন করেছি। কিন্তু প্রান্তরের পথে চলতে চলতে কেমন করে আমি পিতৃভূমির ধ্বংসসাধন করেছি, সে কথা জানতে আমি বড় কৌতূহল অনুভব করছি।

অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর এল: হে যুবক, যে রঙিন প্রজাপতিটি এক সময়ে তোমার পাশে উড়ে এসেছিল, তুমি দেখেছিলে?

: অনেক প্রজাপতিই তো চোখে পড়েছে।

: অনেক প্রজাপতি। হুঃ, তোমার নিশ্বাসে অনেক প্রজাপতিই ভেসে গিয়েছে অনেক দূরে। কিন্তু আমি যে প্রজাপতির কথা বলছি, তোমার নিশ্বাসে সেটি চলে গেছে পূর্বদিকে। রঙিন্ পাখা মেলে সে চলে যাবে দূরে দূরে, তারপর সোনার বেড়া ডিঙিয়ে সে ঢুকবে রাজোদ্যানে। সেই প্রজাপতির গর্ভে জন্ম নেবে একটি শোঁয়াপোকা। পরের বছর গ্রীষ্মকালের এক অপরাহ্নে সেই শোঁয়াপোকা রাণীর রাজহাঁসের মত সাদা গলার উপর উড়ে পড়বে। অকস্মাৎ রাণীর ঘুম যাবে ভেঙে। আকস্মিকতার আঘাতে রাণীর হৃৎপিণ্ড শুব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে, তার গর্ভস্থ সন্তানের হবে মৃত্যু। ফলে রাজার ভাই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে। তার পাপপূর্ণ নিষ্ঠুর শাসনে প্রজাগণ তীব্র নৈরাশ্যে উন্মাদ হয়ে উঠবে। রাজার জীবন হবে বিপন্ন। অবশেষে আত্মরক্ষার উন্মাদ প্রচেষ্টায় রাজ্যের বুকে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তোমার বড় আদরের পিতৃভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সে জন্যে দায়ী হবে একমাত্র তুমি,—তোমারি নিশ্বাসে রঙিন্ প্রজাপতি চলে গেছে পূর্বপথে প্রান্তর অতিক্রম করে, রাজোদ্যানের সোনার প্রাচীর গেছে পার হয়ে।

যুবক কথা বলল সংকোচসূচক কণ্ঠে: হে অদৃশ্যশক্তি, পৃথিবীর বুকে বয়ে চলেছে ঘটনার অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা, কত তুচ্ছ ব্যাপার হতে কত ভীষণ ঘটনা ঘটেছে, কত ভীষণ ঘটনা তুচ্ছতায় পরিসমাপ্ত হয়েছে, সুতরাং তোমার ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করি কেমন করে? আবার এতে বিশ্বাসই বা করব কেন? এই পর্বত শিখরে উঠলে আমার মৃত্যু হবে বলে যে ভয় তুমি দেখিয়েছ তা তো এখনো সত্য হয় নাই?

আবার বেজে উঠল সেই ভীষণ শব্দ: এই শিখরে যে উঠেছে, মানুষের সমাজে মিশতে হলে তাকে যে পিছন ফিরে আবার নামতে হবে পূর্বেকার পথবেয়েই, একথা কি তুমি ভেবে দেখেছ?

যুবক চমকে উঠল। মুহূর্তে তার মনে হল, এক্ষুনি সে নেমে যাবে পাহাড়ের বুকে বেয়ে, মিথ্যা প্রমাণিত করবে অদৃশ্য বাণীর বিপদ-সঙ্কেত। কিন্তু চারদিকে অন্ধকারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পথ বিপদ-সঙ্কুল। নির্বিঘ্নে পার হতে হলে দিনের আলোর বড় প্রয়োজন। যুবক সঙ্কীর্ণ শিখরে গা এলিয়ে দিল, শক্তিদায়িনী নিদ্রার আশায়।

যুবক শুয়ে আছে নিশ্চল দেহে। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম এল না। এক সময়ে ক্লান্ত চোখের পাতা খুলতেই তার হৃৎপিণ্ড ও শিরার ভিতর আতঙ্কের কাঁপন লাগল যেন। চোখের সামনে আবছা পাহাড়। জীবন-ভূমিতে ফেরবার একমাত্র পথ।

এ পথ অতিক্রম করতে পারব তো? কেমন একটা সন্দেহ যুবকের মনকে দোলা দিল। সন্দেহ তীব্র হতে

তীব্রতর হল। একটা অস্বস্তির বেদনা যুবককে কাতর করে তুলল।

: না:, এ কাপুরুষতা অসহ্য! বিপদসঙ্কুল পথকে আমি ভয় করি না। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা না করে যুবক রাতের অন্ধকারেই পাহাড়ের খাড়াপথ বেয়ে নীচে করে নামতে লাগল।

যুবকের পা কাঁপছে। বিঘ্নসঙ্কুল পথে অনিশ্চিত পদক্ষেপ। কিছুদূর নেমেই যুবক বুঝল, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির হাতে সে ধরা পড়েছে, অবিলম্বে ভাগ্যলিপি ফলবতী হবে। অসহায় ক্রোধে ও বেদনায় মহাশূন্যের বুকে সে চীৎকার করে উঠল: হে অদৃশ্য শক্তি, তিনবার তুমি আমাকে সতর্ক করেছ, তিনবার তোমাকে আমি অবিশ্বাস করেছি। তুমি আমার চেয়েও শক্তিশালী, তোমাকে প্রণতি জানাই। কিন্তু আমাকে ধ্বংস করার পূর্বে বলে দাও, তুমি কে?

আবার সেই বাণী—অতি নিকটে অথচ অতি দূরে: কোন নর-জীব আজো আমাকে জানতে পারে নাই। বহু নামে আমি পরিচিত: কুসংস্কারাচ্ছন্নরা আমাকে বলে নিয়তি, নির্বোধেরা বলে ভাগ্য, ধর্মাত্মারা বলে ঈশ্বর। যারা জ্ঞানী তাদের কাছে আমি সেই শক্তি যা ছিল সৃষ্টির আদিতে আর থাকবেও শাশ্বতকাল ধরে অক্ষয় অব্যয়।

অন্তরে মৃত্যুর তিক্ততা নিয়ে যুবক চেঁচিয়ে উঠল: তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি। সত্যই যদি তুমি সেই শক্তি যা ছিল সৃষ্টির আদিতে আর থাকবেও শাশ্বত কাল ধরে, তবে যা কিছু ঘটেছে সবি কি পূর্বনির্দিষ্ট? বনপথে যেতে যেতে আমি হব হত্যাকারী, প্রান্তর অতিক্রম করে পিতৃভূমির ধ্বংস ডেকে আনব, এই পাহাড়ে চড়ে মৃত্যুকে বরণ করব—তোমার সতর্ক-বাণী সত্বেও এসব আমি করব, এও কি পূর্বনির্দিষ্ট? যদি তাই হয়—তোমার সতর্ক-বাণী যদি কোন কাজেই না আসবে, তবে তিনবার তোমার সতর্ক-বাণী আমাকে শুনতে হল কেন? কেন? আর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার কাছেই বা এই দুর্বল প্রশ্ন আমাকে তুলতে হল কেন?

রহস্যময় অট্টহাসিতে আকাশের দূরতম কোণ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃঢ় কণ্ঠে এল প্রশ্নের উত্তর। যুবক তা শোনবার জন্যে কান পাতল।

অমনি পাহাড় কেঁপে উঠল—পৃথিবী সরে গেল তার পায়ের তলা থেকে। যুবক পড়ে নীচের খাদে—লক্ষ লক্ষ তলহীন গহ্বরের চেয়েও গভীরে। মহাকালের সমস্ত রাত সেখানে লুকিয়ে আছে, সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত ছিল এবং থাকবেও।*

*অষ্ট্রিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আর্থার স্নিটজ্‌লারের 'The Triple Warning" গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।—শ্রীমঃ

স্বাগতম্

শ্রীমতী বীণা দাস পূর্ণ সাত বৎসর কারাদণ্ড ভোগ ক'রে গত ২৯শে মার্চ্চ আবার ফিরে এসেছেন। জীবনের দাবীকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে ঘরছাড়া ছন্নছাড়া ক'রে একদিন বাইরে টেনে এনেছিল। তারপর দুর্য্যোগের তমিস্র নিশিতে দুর্দ্দম স্রোতে ভেসে যাওয়া এক নিরুদ্দিষ্ট জীবনের দুঃসাহস যাত্রা তিনি হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। আজ আবার তিনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। তাঁকে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-নিবেদন এবং সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

এই সঙ্গে মনে পড়ে শ্রীমতী শান্তি ঘোষ, শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী, শ্রীমতী কল্পনা দত্ত ও শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার আজও কারা প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ আছেন। তাঁরা কবে আসবেন বা মুক্তি পাবেন কি না, তাও আমাদের ধারণা নেই।

বন্দীমুক্তি সমস্যা

যখনই যে-কোনো দেশে নতুন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে—এটা নতুন শাসন সংস্কারের ফলে সরকার এবং বন্দীদের উভয় পক্ষের মনোভাব পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনার একটা প্রকাশ মাত্র। এদেশের শাসনব্যবস্থা স্বাভাবিক এবং সাধারণের বিপরীত। তাই নতুন শাসনতন্ত্র এল, কিন্তু সঙ্গে এলো না তার স্বাভাবিক পরিণতি—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। বাধ্য হয়ে আন্দামানের বন্দীগণ তাঁদের ন্যায্য অধিকার জানিয়ে প্রয়োপবেশন আরম্ভ করেন। উপবাসে অটল থেকে যখন তাঁরা সারা ভারতে দোলা দিয়ে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন জাগিয়ে আপন দাবী প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় সঙ্কল্প, তখন সরকার নিরুপায় হ'য়ে বাধ্য হলেন তাঁদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনতে। অন্য দিকে গান্ধীজী প্রমুখ নেতাগণ তাঁদের প্রয়োপবেশন ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন এই ভাবে আশ্বস্ত ক'রে যে, তাঁরা তাঁদের দাবী মেনে নিয়েছেন এবং এর জন্য যা করবার তাঁরাই করবেন।

সরকার ও গান্ধীজীর আলোচনার ফলাফল

গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে বহুদিন ধরে আলোচনা করে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে একবছরের জন্য আন্দোলন বন্ধ রাখতে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের নিহিত অর্থ এই যে, আন্দোলন বন্ধ রাখলে হয় তো কিছু সুফল পাওয়া যাবে, অন্যথায় বিপরীত ফল হবে। গান্ধীজী চিরদিনই good will এর প্রতি আস্থাবান। কিন্তু আমরা জানি আস্থা এক বস্তু—আর বাস্তব অন্য। তাই এই good willএ বিশ্বাস, কাজে আসে নাই।

বন্দীমুক্তি কমিটি

তারপর হঠাৎ দেখি সরকার একটা অতি চমৎকার ঘোষণা করলেন। তাতে বলা হয়েছে একটা কমিটি করা হবে, এবং তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি রাখবারও একটা প্রহসন আছে বটে, তবে কমিটি মুক্তি দেবার কথা বিবেচনা করে দেখবেন শুধু ব্যক্তিগত ভাবে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটী বন্দীর বিরুদ্ধে কি প্রকার অভিযোগ, তাই দেখে তাঁদের বর্ত্তমান মনোভাব থেকে এমন বুঝবার হেতু আছে কি না যে তাঁরা মুক্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন—সেই পরীক্ষা ক'রে নিয়ে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার—সম্মানহানিকরও বটে। এই কি তাঁরা চেয়েছিলেন? প্রয়োপবেশনের পণ কি তাঁদের এই ছিল? সকল বন্দীর একত্র মুক্তির ন্যায্য দাবীর এই পরিণতি।

কিন্তু সরকার কথা দিয়েছেন—তার মর্য্যাদা তো রাখতে হবে। তাই কিছুদিন পর পর দু' চারটী নামের একটা ক'রে তালিকা বড় বড় হরফে সরকার ঘোষণা করতে থাকেন—যেন করুণার পারাবার। অথচ জানা গিয়েছে

এ ভাবে মুক্ত বন্দীদের কারো দু' মাস কারো বা পাঁচ মাস মাত্র বাকী ছিল পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার। এরই নাম বন্দীমুক্তি—এ-শুধু ব্রিটিশ রাজত্বেই সম্ভব। কিছু দীর্ঘ মেয়াদ বাকী আছে, এমন যাঁদের ছাড়া হয়েছে, তাদের কেউ বা মৃত্যুর, কেউ বা উন্মাদখানার দ্বারে, যেমন চট্টগ্রামের সরোজবন্ধু গুহ।

নিষিদ্ধ বৎসর সমাপ্ত

১৩ই এপ্রিল গান্ধীজীর সেই নিষিদ্ধ এক বৎসর পূর্ণ হ'ল। দেশবাসী তাঁর কথার মর্য্যাদা রেখেছে—বিশেষ কোনো আন্দোলন এর মধ্যে দেখা যায় নাই—অথচ কোথায় সকল বন্দীদের মুক্তি? দেশের তরফ থেকে দাবী আদায় করবার সময় বহুদিন পূর্ব্বেই এসেছে, কিন্তু যে দ্বার এত দিন রুদ্ধ ছিল এখন তা মুক্ত। যারা গায়ের জোরে রাজ্য শাসন করে, তারা বিপক্ষের জোর বুঝে মুষ্টি শিথিল করে, তাই পুনরায় দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন ক'রে জানাতে হবে ন্যায্য দাবীর দৃঢ়তা। নইলে তাঁদের সকলের মুক্তি সুদূর পরাহত।

রাজকোট সমস্যা

বহু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে রাজকোট একটী। সারা ভারত ব্যাপী দেশীয় রাজ্য সমূহে আন্দোলন চলছে। সর্দ্দার প্যাটেল ও ঠাকুর সাহেবের মধ্যে একটা চুক্তি হয় যে, একটী রিফর্ম কমিটি গঠিত হবে শাসন-সংস্কারের খসড়া তৈরী করবার জন্য। তার মধ্যে সাত জন প্রতিনিধি সর্দ্দার প্যাটেলের সুপারিশ অনুসারে গৃহীত হবে। পরে ঠাকুর সাহেব এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ঠাকুর সাহেবকে শিক্ষা দিতে রাজকোটে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয়। পরে ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতির সত্য রক্ষার্থ গান্ধীজী প্রয়োপবেশন করলেন মৃত্যু পণ করে। এই ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের ওপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে গণ-আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেওয়া কি গণ-জাগরণের পরিপন্থী নয়? ব্যক্তি বিশেষের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বড়ই হউক, যত সুফলই আসুক—তাতে ক'রে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয় না—আত্মবিশ্বাস সুপ্ত হয়—আন্দোলনের অগ্রগতিতে বাধা পায়। আন্দোলনে নিদ্রিত গণশক্তি যেটুকু চঞ্চল ও সচেতন হয়ে ওঠে, তা এক অসাধারণ প্রতিভার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পুনরায় সুপ্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে জনসাধারণ যত ভুলই করুক, তাদের আন্দোলনে যত কম সফলতাই আসুক, তারা যদি আপন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর গণ-আন্দোলন চালায় তার মূল্য এবং প্রয়োজন অনেক বেশী—এই আত্মপ্রত্যয়ে গণ-আন্দোলনের একটা ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি যদি আপন অধিকার আদায়ের জন্য সুদৃঢ় হস্ত প্রসারণ করে, সে দাবী, সে দৃঢ়তা গ্রাহ্য না করে আর উপায় থাকে না।

যুক্ত রাষ্ট্রীয় কোর্ট

দক্ষিণ-পন্থীগণ কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের বিরোধী এবং তাকে বাধা দেবার জন্য সংগ্রাম চালাবেন। তারপর গান্ধীজী উপবাস আরম্ভ করলেন রাজকোট সমস্যা নিয়ে। অনেকেই মনে করলেন গান্ধীজী ক্ষুদ্র সমস্যার সূত্র ধরে সংগ্রাম আরম্ভ ক'রে পরে সেটা বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত করবেন—অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার এটা সূচনা মাত্র। সমগ্র ভারত রুদ্ধশ্বাসে তার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করে' রইল। এদিকে বড়লাটের প্রতিশ্রুতিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন—দিল্লীতে গোপন বৈঠক আরম্ভ হ'য়ে স্থির হ'ল যে, Federal Courtএর প্রধান বিচারপতি মরিস গায়ার রাজকোট সমস্যা সম্বন্ধে যে রায় দিবেন, তাই তিনি চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেবেন। এখানেই প্রশ্ন জাগে যে যদি যুক্তরাষ্ট্রই গ্রহণ করা না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যে Federal Court (যুক্তরাষ্ট্রীয় কোর্ট) প্রবর্ত্তন করা হয়েছে তা গান্ধীজী কি ক'রে মেনে নিলেন, এবং সেই কোর্টের বিচারপতির নির্দ্দেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী হলেন? এতে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, যুক্তরাষ্ট্র আসবার পূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কোর্টকে তিনি মেনে নিলেন—যা যুক্তরাষ্ট্রেরই একটা অঙ্গ এবং অংশ?

স্যার মরিস গায়ারের রায়

সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের চুক্তি ভঙ্গ সমস্যার মীমাংসার ভার মরিস গায়ারের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তিনি তাঁর রায় দিয়েছেন। রায় গান্ধীজীর পক্ষেই গিয়েছে। মরিস গায়ার রায়ে বলেছেন, চুক্তিতে যে শাসন-সংস্কার কমিটির সাতজন প্রতিনিধি সর্দ্দার প্যাটেলের সুপারিশ অনুসারে গ্রহণ করবার কথা আছে তাঁদের ঠাকুর সাহেব নিতে বাধ্য এবং তাঁদের একজনকেও অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা ঠাকুর সাহেবের নাই। কিন্তু স্যার মরিস গায়ার বা ঠাকুর সাহেব কোথাও একথা বলেন নাই যে, এই শাসন-সংস্কার কমিটি যে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করবেন, তা ঠাকুর সাহেব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। এখানেই মস্ত বড় একটা ফাঁক রয়েছে। প্রয়োজন মত এই ফাঁকের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা অসম্ভব নয়—তখন এই রায় দানের কোনো মূল্যই থাকবে না। শাসন-সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত বা সংস্কারই যদি ঠাকুর সাহেব মেনে নিতে বাধ্য না থাকেন, তবে সর্দ্দার প্যাটেলের মনোনীত সাত জন সদস্য তিনি গ্রহণ করুন বা অগ্রাহ্য করুন তাতে কিছু আসে যায় না। এখানে আসল কথা হচ্ছে এই যে গান্ধীজী যে সমস্যা নিয়ে উপবাস করেছেন বা বৈঠক চালিয়েছেন, তা রাজা-প্রজা বিরোধের আসল সমস্যা নিয়ে নয়, তার মূলে রয়েছে চুক্তি সম্বন্ধে interpretation এই interpretation গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন অর্থাৎ প্যাটেল মনোনীত সাতজন সদস্য গ্রহণ। কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে প্রজাদের সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের সমস্যার মীমাংসা। সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য হয় নাই, এভাবে হতেও পারে না। এমন কি শাসন-সংস্কার কমিটির সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণের বাধ্যবাধকতাও ঠাকুর সাহেবের নাই। প্রজারা তাহলে পেলো কি? কি পেয়ে তারা জয়োল্লাসে মেতে উঠ'বে? তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

যুদ্ধ যদি বাধে

কিছুদিন পূর্ব্বে এক মার্কিন সাংবাদিক গান্ধীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ইয়োরোপীয়ান যুদ্ধে ইংরাজ যদি জড়িত হয়ে পড়ে, তবে গান্ধীজী কংগ্রেসকে কি পন্থা গ্রহণ করতে উপদেশ দেবেন। উত্তরে গান্ধীজী বলেছেন, প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া শক্ত, "The question is a difficult one to answer" গান্ধীজীর এই উক্তির মর্ম্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধলে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থবল বা জনবল কিছু দ্বারাই ভারত সাহায্য করবে না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রশ্নটিকে "difficult one to answer" কেন বললেন তা তো বোঝা গেল না। তবে কি কংগ্রেসে সম্প্রতি নতুন কিছু এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দ্বিধা এসেছে?

আবার জওহরলালজী এরূপ একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, "It is we who will decide, not the British Govt, and our decision will depend not on promises but on definite action which will take us to our goal" অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের ন্যায় ইংরেজের কোন প্রতিশ্রুতিতে ভারত এবার ভুলবে না। লক্ষ্যে (goal) পৌঁছাবার জন্য ইংরেজ কি definite action নেবে, কাজে কি করবে তাই বুঝে ভারত কি করবে তা স্থির করবে। এই লক্ষ্যটাই বা কি? আর তখন নতুন ক'রে স্থিরই বা করবে কি? আমরা জানি কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতাই লক্ষ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনোরূপ সাহায্য না করাই decision এই সিদ্ধান্ত জানা সত্ত্বেও লক্ষ্য এবং decision সম্বন্ধে জওহরলালজী নতুন করে কি চাইছেন? এই লক্ষ্যটা কি তবে পূর্ণ স্বাধীনতা নয়? এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, ভারতের জন্য definite action কি নেবে তাই বুঝে, ভারত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে স্থির করবে?

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনোপ্রকার অংশ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ এই সহযোগিতা পাবার জন্য ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন, জওহরলালজী এই আশা

নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। আপনাদের ষোড়শোপচার ভোজন পর্ব্ব বজায় রেখে উচ্ছিষ্ট ছিঁটে ফোঁটা যেটুকু দেবে সেটা আর যাই হোক্—পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। তবে কি শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ভুলে গিয়ে এই ছিঁটে ফোঁটা গ্রহণই জওহরলালজীর লক্ষ্য? এবং তারই ওপর নির্ভর ক'রে ভারত decision করবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কি করবে।.

গান্ধীজী এবং জওহরলালজী দু'জনের উক্তিই আমাদের নিকট রহস্যময়।

রাষ্ট্রপতির পত্রোত্তরে গান্ধীজী

রাষ্ট্রপতি কয়েকদিন পূর্ব্বে গান্ধীজীকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে একখানি পত্র দিয়েছিলেন—তাতে তিনি গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবের অবৈধতা সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গান্ধীজী তৎসত্বেও জানান যে, যদিও এরূপ প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি আছে, কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য রাখবার জন্য সে আপত্তি তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এর পরে তিনি গান্ধীজীর নিকট প্রস্তাব করেন যে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হোক্। এই পত্রের উত্তরে গান্ধীজী রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি যদি পন্থের প্রস্তাব অবৈধই মনে করেন তবে তাঁর পথ পরিষ্কার আছে—নিজ ইচ্ছানুযায়ী সদস্য গ্রহণ করে তিনি অনায়াসে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন। তবে তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর মূলে পার্থক্য আছে সেজন্য সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্ভব নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলে সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি তিনি গঠন করবেন না—হয় সুভাষচন্দ্র আপন মনোমত সদস্য গ্রহণ করে কমিটি গঠন করবেন—অথবা যদি অধিকাংশ সদস্য তাঁর সমর্থক না হন তবে গান্ধীপন্থীগণ আপন ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন।

এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে গান্ধীজীর উক্তিতে আইনের দিক থেকে কোন ক্রটীই হয় নাই। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতির আপন ইচ্ছামত সদস্য নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে মূলগত পার্থক্য আছে বলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন না একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, কোথায় গেল গান্ধীজীর ঔদার্য্যের ঐশ্বর্য্য? রাষ্ট্রপতি আপন আপত্তি সত্বেও তাঁর সহযোগিতা কামনা ক'রে সম্মিলিত কর্ম্মপন্থা চেয়েছেন—আর গান্ধীজী তা দিতে অস্বীকার করেছেন। মূলগত পার্থক্যই যদি এর কারণ হয়—তবে সেই পার্থক্যটা কি? রাষ্ট্রপতি তো ভিন্ন কোনো কর্ম্মপন্থা ব্যক্ত করেন নাই। গান্ধীজীর নির্দ্দেশ মেনে নিতে এবং সহযোগিতা ক'রে সম্মিলিত সংগ্রামে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কি মূলগত পার্থক্য এই যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে? তবে কি গান্ধীজী যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের পক্ষপাতী? যতই দিন যায়, যতই তাঁর কার্য্যক্রম স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততই এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হয়ে উঠতে চায়।

অপর পক্ষে, সুভাষচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত বামপন্থী সকল দলই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁদের পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁর নির্দ্দেশেই অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্যক্রম চলবে। তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণেরই নির্দ্দেশ দেন, বাধা দেবার থাকবে কে? আর দক্ষিণপন্থায়, বামপন্থায় বিভেদেরই বা হেতু কোথায় রইল? সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে আজও যে বিবাদ কংগ্রেসে অবশিষ্ট রয়ে গেছে, সে বাঙ্গালীতে অবাঙ্গালীতে বিবাদ। এর পরিণাম অশুভ বলে আমাদের আশঙ্কা হয়।

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাসিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

মিত্র মুখার্জ্জী কোং

= সূচী =

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে

প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা বাৎসরিক বোনাস্	আজীবন বীমায়	১৬৲
	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মার্কসের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত

সুপ্রসন্ন মজুমদার

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিতর গতিশক্তির যে অর্থনীতিমূলক বিধিনিয়ম রয়েছে তারই উদ্ঘাটন করাই হচ্ছে মার্কসের অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণার চরম উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত কোন একটী সমাজের মধ্যে উৎপাদনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সম্বন্ধগুলি গড়ে ওঠে, তার অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করা দরকার সেই সম্বন্ধগুলির উদ্ভব, পরিণতি ও ধ্বংসের প্রতি মনোযোগ রেখে—এইটীই হচ্ছে মার্কসের অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রধান কথা। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, তাই পণ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ দিয়েই মার্কসের গবেষণা সুরু হয়েছে।

পণ্যদ্রব্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এমন কিছু, যা মানুষের অভাব পূরণ করে, প্রয়োজন মেটায়। দ্বিতীয়তঃ তার বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় বস্তুও মেলে। কোন বস্তুর উপযোগিতা অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের কার্যকারিতা তাকে উপযোগ-মূল্য (Use value) প্রদান করে। যে অনুপাতে এক প্রকারের কতকগুলি উপযোগ-মূল্যের বিনিময়ে আর এক প্রকারের কতকগুলি উপযোগ-মূল্য পাওয়া যায়, সেই অনুপাতকেই বলে Exchange value, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্য। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এমনি লক্ষ লক্ষ হাত অদলবদল ক'রে সমস্ত উপযোগ-মূল্য—প্রকৃতিতে তারা এত বিভিন্ন যে একটীর সঙ্গে আর একটীর কোন সাদৃশ্য নেই—পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয়ে চলেছে। এখন এই সমস্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এমন কি সাধারণ গুণ ও লক্ষণ আছে যার সাহায্যে সামাজিক সম্বন্ধের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলিত হচ্ছে এবং

তাদের বিনিময় ঘটছে ? তার প্রত্যেকটী বস্তু যে শ্রমসঞ্জাত ফল এইটীই হচ্ছে তাদের মধ্যে সাধারণ গুণ ও লক্ষণ।

দ্রব্য বিনিময়ের সময় মানুষ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের শ্রম বিনিময় করে। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সামাজিক সম্বন্ধের একটা পদ্ধতি, যার ভিতর শ্রম-বিভাগহেতু বিভিন্ন উৎপাদক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন করে, আর এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় ঘটে। সুতরাং এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে সাধারণ গুণ ও লক্ষণ উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট বিভাগের স্থুল শ্রম নয়, কোন বিশেষ প্রকারের শ্রমও নয়—তা হচ্ছে নির্বিশেষ শ্রম, অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে মানুষের সাধারণ শ্রম। কোন একটী সমাজের সমগ্র শ্রম-শক্তি—যা সেই সমাজের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য সমষ্টিকে ব্যক্ত করে—সেই সমাজস্থিত সকল মানুষের সর্বপ্রকার শ্রমশক্তির একটী অখণ্ড রূপ। বিনিময়ের লক্ষ লক্ষ তথ্য এই কথাটাই প্রমাণ করে। কাজেই প্রত্যেক নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্য সমাজের প্রয়োজনীয় সমগ্র শ্রমকালের একটী জ্ঞাত অংশকে মাত্র ব্যক্ত করে। তার মূল্যের পরিমাণ নিরূপিত হয় সমাজের প্রয়োজনীয় শ্রম-কালের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট উপযোগ-মূল্যের সেই দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজন হয় যে শ্রমকালের তারই পরিমাণ দিয়ে।

মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের বিনিময় করে তখন প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শ্রমেরই বিনিময় করে। তারা জানে না যে তারা শ্রমের বিনিময় করছে, কিন্তু তাই তারা করে। একজন প্রাচীন অর্থনীতিবিৎ ঠিকই বলেছেন যে, দ্রব্যের মূল্য দুইটী ব্যক্তির মধ্যে একটী সম্বন্ধ বিশেষ। তাঁর কথাটাকে সুসম্পূর্ণ করবার জন্য এইটুকু যোগ করে দিতে পারতেন যে, সে সম্বন্ধটা প্রচ্ছন্ন থাকে জড়বস্তুর আচ্ছাদনের তলায়। কোন একটী বিশেষ প্রকারের সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কিত সম্বন্ধের দিক থেকে যখন আমরা বিবেচনা করি তখনই আমরা বুঝতে পারি, মূল্য জিনিষটী আসলে কী। তা'ছাড়া, এই সামাজিক সম্বন্ধের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দেখা দেয় সমবেত ভাবে, পুঞ্জীভূত হয়ে, যার মধ্যে বিনিময়ের ব্যাপারগুলি পুনরাবর্তন করে লক্ষ লক্ষ বার।

মূল্য হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি জমাট-বাঁধা শ্রমকালের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র। উৎপন্ন দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত শ্রমের দুই রকম প্রকৃতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করার পর মার্কস্ মূল্য ও মুদ্রার আকার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান কাজ হ'ল মূল্যের মুদ্রা-রূপ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা, আর পরীক্ষা করা বিনিময়ের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পদ্ধতি—কোন একটী উৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অপর একটী দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের যে বিনিময় ঘটে সেই সব বিচ্ছিন্ন দৈবাৎ-ঘটিত বিনিময় থেকে সুরু ক'রে মূল্যের সার্বজনীন রূপ পর্যন্ত, যখন কোন একটী বিশেষ বস্তুর সঙ্গে কতকগুলি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বিনিময় ঘটে, যখন স্বর্ণই হয় সার্বজনীন equivalent, অর্থাৎ তুল্যার্থক বস্তু।

পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্রমপরিণতির অন্তিম ফল হওয়ার দরুণ মুদ্রা ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক প্রকৃতিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, বিনিময়ের বাজারে যে সমস্ত উৎপাদক পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তাদের সামাজিক বন্ধনকে আবৃত করে রাখে। মার্কস্ মুদ্রার function সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন। এখানে লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন যে, আপাতঃদৃষ্টিতে যা মনঃকল্পিত ও আনুমানিক সিদ্ধান্তপ্রসূত ব্যাখ্যা-প্রণালী বলে' মনে হয় প্রকৃত পক্ষে তা উৎপাদনের ও বিনিময়ের ক্রমপরিণতির ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যসমূহের বিপুল সঞ্চয়ন। মুদ্রার আবির্ভাবের পূর্বে পণ্যবিনিময়ের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতি অনুমান করে নিতে হয়। পণ্যদ্রব্যের বদলে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়, কোন বস্তুর মধ্যবর্তিতায় নানা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়, ঋণ পরিশোধের কার্যসাধক উপায় স্বরূপ কোন বস্তু, সঞ্চিত ধন, আন্তর্জাতিক ধন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা জ্ঞাপন করে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর।

উৎপাদনের ক্রমপরিণতির একটী নির্দিষ্ট স্তরে এসে ধন রূপান্তরিত হয় মূলধনে। পণ্যদ্রব্য হাতফিরি হবার সূত্র হচ্ছে পণ্যদ্রব্য—মুদ্রা—পণ্যদ্রব্য, অর্থাৎ একটী পণ্যদ্রব্য বিক্রী করা হয় আর একটী পণ্যদ্রব্য ক্রয় করবার জন্য। কিন্তু মূলধনের সাধারণ সূত্র হচ্ছেঃ মুদ্রা—পণ্যদ্রব্য—মুদ্রা, অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় তাকে বিক্রী ক'রে লাভ করবার জন্য, মুনাফা রাখবার জন্য। প্রচলিত মুদ্রার প্রাথমিক মূল্যের উপর এই যে অতিরিক্ত মুনাফা, মার্কস্ এর নাম দিয়েছেন Surplus value, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রার এই উদ্বৃত্ত-বর্ধন সকলের কাছেই সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্বৃত্ত-বর্ধনই ধনকে মূলধনে রূপান্তরিত করে—যা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদন-ঘটিত একটা বিশেষ সামাজিক সম্বন্ধ। পণ্যদ্রব্যের শুধু হাতফিরিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব হয় না, কারণ তাতে তুল্যার্থক বস্তুর (equivalents) বিনিময় ছাড়া আর কিছু ঘটে না। জিনিসের দাম বাড়লেও উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব হয় না, কারণ তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে শেষপর্যন্ত একটা সমতাপ্রাপ্তি ঘটে। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের বেলায় কি ঘটে তা নিয়ে এখানে আমাদের সম্পর্ক নয়, সমষ্টিগতভাবে সামাজিক গড়পড়তা মানুষের বেলায় কি ঘটে সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

উদ্বৃত্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য ধনের মালিকদের পক্ষে বিনিময়ের বাজারে এমন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া চাই, যার উপযোগ-মূল্যের (use value) ভিতরে নিহিত রয়েছে প্রাথমিক মূল্যের মূল উৎস, সন্ধান পাওয়া চাই এমন দ্রব্যের যার ব্যবহারের বাস্তব কার্যক্রমটাই আর এক দিক দিয়ে মূল্য সৃষ্টির কার্যক্রম। এমন দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে—তা হচ্ছে মানুষের শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তির ব্যবহারটাই মূল্য সৃষ্টি করে। ধনের মালিক শ্রমশক্তিকে ক্রয় করে তার নিজ মূল্যে। এ মূল্য অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্যের মতই নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে

প্রযোজনীয় শ্রমকাল দিযে, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয শ্রমিকের সপরিবারে জীবিকা-নির্বাহের ন্যূনতম খবচা দিযে।

ধনের মালিক শ্রমশক্তিকে ক্রয ক'রে তাকে খুশীমত ব্যবহার কববার অধিকার পেলেন, অর্থাৎ তাকে কাজে খাটাতে পারেন সমস্ত দিন—ধবা যাক্, দৈনিক আট ঘণ্টা। এদিকে চার ঘণ্টার মধ্যে (আবশ্যক শ্রমকাল) শ্রমিক যা প্রস্তুত কবে তাতে তার সপরিবারে জীবিকানির্বাহের খরচা উঠে যায , অবশিষ্ট চার ঘণ্টায (উদ্বৃত্ত শ্রমকাল) যে উদ্বৃত্ত দ্রব্য সে প্রস্তুত কবে তার জন্য ধনের মালিক তাকে কিছুই দেয না , এই অবশিষ্ট চাব ঘণ্টায স্৷ষ্ট করলো সে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং উৎপাদনের প্রণালীব দিক থেকে মূলধনেব ভুটী অংশকে পৃথক কবে দেখতে হবে। প্রথমতঃ, অচল মূলধন (constant capital) যা ব্যযিত হয কলকব্জা, হাতিয়ার, কাঁচামাল প্রভৃতি উৎপাদনসাধক বস্তুর (means of production) ক্রযেব জন্য, যার দামটাকে একসঙ্গে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে সঞ্চারিত করা হয উৎপন্ন দ্রব্যেব মধ্যে। দ্বিতীযত', সচল মূলধন (variable capital) যা ব্যয়িত হয শ্রমশক্তি ক্রযের জন্য। এই শেষোক্ত মূলধনের মূল্য অপরিবর্তনীয নয , তা বর্ধিত হয শ্রমশক্তিব কর্মধাবাব সঙ্গে, যে কর্মধাবা স্৷ষ্ট কবে উদ্বৃত্ত মূল্য।

মূলধন শ্রমশক্তিকে খাটিযে কি পবিমাণে তাকে শোষণ করে তা সম্যকরূপে বুঝতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যকে তুলনা করতে হবে সমগ্র মূলধনের সঙ্গে নয, শুধু তাব সচল অংশেব সঙ্গে, যা দিযে শ্রম-শক্তিকে ক্রয কবা হয। কাজেই, উপরোক্ত দৃষ্টান্তে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত হচ্ছে ৪ ৪, চার টাকার শ্রমশক্তি খরিদ ক'রে তাকে খাটিযে চার টাকা মুনাফা, অর্থাৎ শতকরা একশো টাকাই লাভ।

মূলধনের উদ্ভবেব জন্য তুইটী পূর্ব প্রযোজনীয বিষয আছে। প্রথমতঃ, যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সঞ্চয থাকা চাই নানা ব্যক্তিব হাতে, যারা এমন পবিস্থিতিব মধ্যে বাস করে যেখানে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনেব অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থা বর্তমান। দ্বিতীযতঃ, থাকা চাই স্বাধীন শ্রমজীবী। শ্রমিককে তুই অর্থে স্বাধীন হওযা চাই। তাব খুশীমত শ্রমশক্তি বিক্রয করবার পথে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকবে না। তাছাড়া, তার মুক্ত থাকা চাই ভূমির বন্ধন থেকে, সাধারণ ভাবে উৎপাদন সাধক বস্তুর (means of production) সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে। তাব হওযা চাই প্রভুহীন, অর্থাৎ কারও সঙ্গে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না . হওযা চাই প্রকৃত অর্থে শ্রমজীবী, অর্থাৎ শ্রমশক্তি বিক্রয করা ছাড়া আর কোন প্রকারে জীবিকানির্বাহের কোন উপায থাকবে না।

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্যোৎপাদনেব লক্ষ্য হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যকে আত্মসাৎ করা। তাই প্রত্যেক পুঁজিবাদীর সর্বক্ষণের স্বপ্ন—কেমন ক'বে যথাসম্ভব অধিক উদ্বৃত্ত মূল্য হস্তগত করা যায়। উদ্বৃত্ত মূল্যকে বর্ধিত করার মূলতঃ তুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ শ্রমকালকে বর্ধিত ক'রে—যাকে বলা যেতে পাবে অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য (absolute surplus value) ; আর দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক

শ্রমকালকে (যে সময়ের মধ্য শ্রমিকের উৎপন্ন দ্বারা তাব জীবিকানির্বাহের খরচা উঠে যায) কমিয়ে—যাকে বলা যেতে পারে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য (relative surplus value)

প্রথম উপাযটী অবলম্বন করার দিকে পুঁজিবাদীদেব প্রলোভন বেশী। কাবণ, তাতে কারখানায নতুন ক'রে কলকব্জা সাজ সরঞ্জামের কিছুই প্রযোজন হয না, কাজেই নতুন খরচাও কিছু নেই। শ্রমকালকে যে কয় ঘণ্টা বর্ধিত করা যায তাব সম্পূর্ণ উৎপাদনই উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করাব জন্য পুঁজিবাদীর মনে প্রলোভন যতই প্রবল হোক্, শ্রমকালকে বর্ধিত করারও একটা সীমা আছে, অনির্দিষ্টভাবে যত খুশী তা বর্ধিত কবা যায না। পুঁজিবাদীর যত ক্ষমতাই থাক্, দিনকে সে চব্বিশ ঘণ্টাব চেয়ে বেশী দীর্ঘ কবতে পাবে না। তার মধ্যেও নির্দিষ্ট কযেক ঘণ্টা শ্রমিকেব ভোজন, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতিব জন্য ছেড়ে দিতে হয—শ্রমিকের প্রতি দযাদাক্ষিণ্য প্রকাশ করবার জন্য নয, পুঁজিবাদীব নিজেবই স্বার্থেব জন্য। কাবণ, শ্রমিকেব ভোজন, বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রযোজন তাকে কর্মক্ষম বাখবাব জন্য, দৈনন্দিন কর্মেব ভিতব দিয়ে তার যে শক্তিক্ষয হয তা পবিপূবণেব জন্য—যাতে সে দিনেব পর দিন পুঁজিবাদীব জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পাবে।

শ্রমকালকে বর্ধিত করা ছাড়া শ্রমেব intensity বাড়িযেও উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি করা যায। এর জন্য কাবখানার মালিক নতুন নতুন লোক নিযুক্ত কবে শ্রমিকের উপর তদাবক কববার জন্য, সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি বাখবার জন্য, যাতে শ্রমকালেব মধ্যে এক মুহূর্তও শ্রমিকেব দৃষ্টি ও মন অন্যদিকে না যায়। একটু অন্যমনস্ক হলেই নানা ধরণেব শাস্তিমূলক জবিমানা ক'বে তাকে সাযেস্তা কবা হয। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জাও এমন যে, শ্রমিক এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হলেই কলকব্জা বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা, এমন কি তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে। কাজেই শ্রমকালেব মধ্যে শ্রমিকের নিমেষেব জন্যও বিশ্রাম ঘটে ওঠে না। তাই এতে শ্রমিকেব শক্তিক্ষয হয অধিক পবিমাণে, এমন কি তার পরমাযুও ক্ষযপ্রাপ্ত হয়।

নির্দিষ্ট সীমার বাইরে শ্রমকালকে বর্ধিত কবাব বিরুদ্ধে এবং অমানুষিকভাবে শ্রমেব intensity বাড়িযে তোলাব বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিকেব আপত্তি ও বিরোধ তীব্র হতে তীব্রতব হয়ে ওঠার সঙ্গে পুঁজিবাদীরা উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য এ পথ ছেড়ে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

এই আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির জন্য পুঁজিবাদীরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা বুঝতে গেলে প্রথমতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকের সপরিবারে জীবিকা-নির্বাহের ন্যূনতম খরচা দিয়ে। এই ন্যূনতম খরচা শ্রমিক যত কম সময়ে উৎপন্ন করতে পারে ততই পুঁজিবাদীর লাভ, কারণ উদ্বৃত্ত সময় দিয়ে সে পুঁজিবাদীর জন্য উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করে। এর জন্য

চাই শ্রমিকের জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়া, এবং তা হতে পারে যদি সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্য কম শ্রমশক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। কম শ্রমশক্তি ব্যয়ে সেই বস্তু উৎপন্ন করতে হলে, শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তা হতে পারে নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উন্নত প্রণালীতে কলকব্জার সন্নিবেশ ও পরিচালন, কারখানা ঘরে অপেক্ষাকৃত অধিক আলো-হাওয়ার বন্দোবস্ত প্রভৃতির দ্বারা। এইভাবে উন্নত প্রণালীতে কলকারখানার ব্যবস্থা পরিচালনা প্রবর্তন হবার পর, শ্রমিক সেই একই সময়ে একই রকম শ্রমশক্তি ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু তার শ্রমের মূল্য হিসাবে যা প্রাপ্য তা সমানই থাকে। অবশিষ্ট উৎপাদন উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে পুঁজিবাদীর পকেটেই যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদনের টেক্‌নিকের উন্নতিবিধান করবার জন্য পুঁজিবাদীর এই যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তা উন্নতির প্রতি অনুরাগ বশতঃ নয়, তা নিছক উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত লুব্ধতা বশতঃ। তাই কলকারখানার এত উন্নতি এবং উৎপাদন শিল্পের এত উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকেরা যে তিমিরে সেই তিমিরে, তাদের দুঃখদুর্দশা ঘুচবার কোন আশা এই ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে নেই—এতে শুধু পুঁজিবাদীরাই ব্যক্তিগতভাবে অধিকতর বিত্তবান হচ্ছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার আর্থিক উন্নতি

জগন্নাথ মজুমদার

সোভিয়েট অর্থনীতির সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুসৃত আর্থিক ব্যবস্থার সনাতনী নিয়মগুলী থেকে এর ব্যতিক্রম অনেকখানি। ধনতন্ত্রের অর্থনীতির পত্তন হয়েছিল সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালের ফলিত নীতিগুলিকে একটি বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া হ'ল। এই রূপের স্রষ্টা হলেন অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি তৎকালীন মনস্বীরা। ফিউডালিজমের পুরানো ও পচা সমাজব্যবস্থা তখন প্রায় গলে খসে পড়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় নব্য ধনতন্ত্রের গতিশীল-চক্র নিত্য নূতন সম্ভাবনার পথে ঘুরতে লাগল। ফিজিওক্রাসী ও মার্কেন্টাইল পন্থী অর্থনীতির বুলিগুলি অকেজো হয়ে পড়তে লাগল। রাষ্ট্রশক্তির অবাধ হস্তক্ষেপ নিরুদ্ধ করবার জন্য তার চারিদিকে গণ্ডী টেনে দেওয়া হ'ল। ঠিক হ'ল নাগরিকদের ধন-প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকলে সেটা ব্যষ্টির উপর অত্যাচার বলেই গণ্য হবে। কারণ সর্ব্ববিষয়ে ব্যষ্টির অবাধ স্বাধীনতা প্রদানেই রাষ্ট্রের স্বার্থকতা, তার অস্তিত্বের আর কোনও নজীর নেই। ধনোৎপাদন ব্যাপারে রাষ্ট্রকে একান্ত নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় সাক্ষী-গোপালের মত খাড়া করে রাখার বন্দোবস্ত করা হ'ল। আর এই নিরপেক্ষতার সুবিধা নিয়েই পুঁজিজীবীরা তাদের পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়েই চলল এবং ব্যষ্টি স্বাধীনতার নামে শোষণ চালাতে লাগল। কিন্তু ধনতন্ত্রের তখন বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা, নিত্য নূতন উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার এর উৎপাদিকা শক্তিকে শতগুণ বাড়িয়ে চলেছিল, সুতরাং এর contradictionগুলি তখন অঙ্কুরিত হলেও মহীরুহে পরিণত হয়নি। ধনতন্ত্রের অন্তঃর্নিহিত বিরোধ লোকচক্ষুর অগোচরে যে বেড়ে চলেছিল এ তথ্য সেই যুগের একজন মনীষীর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর নাম কার্লমার্ক্স। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন যে, ধনতন্ত্রের অন্তঃনিবদ্ধ বিরোধ ক্রমে বেড়ে উঠে এর চলার পথে অচলায়তনের সৃষ্টি করবে। কি জৈব পদার্থ, কি সামাজিক ব্যবস্থা সব কিছুরই গতি থেমে যাওয়া মৃত্যুরই রূপান্তর। ধনতন্ত্রের ঘনায়মান বিরোধ এর মৃত্যু-কবর খুঁড়ে দেবে। আর তার জায়গায় আবার যে গতিশীল নয়া সমাজব্যবস্থার পত্তন হবে, তার নাম সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্র। কার্লমার্ক্স-এর ভবিষ্যদ্বাণী সব ধনতান্ত্রিক দেশেই আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। রাষ্ট্র ব্যক্তির হাতে সর্ব্ব-ক্ষমতা সমর্পণ করে নিরপেক্ষনীতির হালে আর পানি পাচ্ছে না। তাই বুর্জোয়া অর্থনীতির পবিত্র বুলিগুলির কতক পরিবর্ত্তন, কতক পরিবর্জ্জন দ্বারা এক অদ্ভুত সমন্বয়-অর্থনীতি প্রচলন করে ধনতন্ত্র কোনও রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। রোগ তার মারাত্মক, দাওয়াই প্রয়োগে মাত্র কয়েকদিন টিকে যেতে পারে। কিন্তু তার নিজের কবর সে আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছে।

ধনতন্ত্রের আওতায় উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেছে সত্যি, কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য এ রাখতে পারেনি। মানুষের অধীনে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি অজস্র উৎপাদন করবার জন্য, সে শক্তির পূর্ণ নিয়োগ করলে লোকের সুখসমৃদ্ধির আর অন্ত থাকে না। কিন্তু ধনতন্ত্রের আইন অনুসারে সেটা পাবা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাইতে দেখা যায়, দেশে দেশে মানুষ অকেজো হয়ে বসে আছে, যন্ত্রকে নিশ্চল রাখা হচ্ছে, উৎপাদিত সামগ্রী নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে জিনিষের দাম বৃদ্ধিকল্পে, যার ফলে ধনিকদের মুনাফার

পরিমাণ বাড়বে। সব কিছুরই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা। সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে মুনাফা অর্থনীতি। রূপকথার সেই ট্যান্টালাসের মত মানুষের সামনে রয়েছে অজস্র ভোগের সামগ্রী, কিন্তু ক্ষুধিত মানব তা' স্পর্শ করতে পারছে না, এ অর্থনীতির এমনি মহিমা।

রাশিয়াতে যে সোভিয়েট অর্থনীতির পত্তন করা হয়েছে, তা'দ্বারা যদিও পুরোপুরি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হয়নি, তাহ্লেও ধনোৎপাদনের মূল সূত্রটি সেখানে বদলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ধনোৎপাদন করা হয় মুষ্টিমেয় ধনিকের মুনাফা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নয়, সমস্ত সমাজ-জীবনের প্রয়োজনের তাগিদ থেকে। এই সমষ্টিগত প্রয়োজন মিটাতে হ'লে ধনোৎপাদন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই রাষ্ট্রশক্তি ধনোৎপাদন ও তার বণ্টন এই দুটি জিনিষেরই ভার নিয়েছে। অবশ্য রাশিয়াতে আজ যে অবস্থা চলেছে সেটাকে ঠিক কমিউনিজম্ বলা চলে না। প্রাগ-সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে রাতারাতি বদলে দেওয়া যায় না। War Communism এর সময় একটা উৎকট চেষ্টা চলিতেছিল বটে কিন্তু সেটা সফল হয়নি। তাই লেনিন এমন অগ্রসর নীতি প্রচলন করলেন তাঁর "New Economic Policy" দ্বারা। জমিতে কৃষকদের ভূম্যাধিকার স্বীকার করা হোল এবং দেশের মধ্যে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক-আর্থিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের লক্ষ্য হয়ে থাকল। শ্রমিকদের বেতন প্রথাও বজায় রাখা হ'ল সুতরাং জিনিষপত্তরের দরও সাব্যস্ত কর্ত্তে হ'ল। স্বয়ং কার্ল-মার্ক্স তাঁর "Critique on the gotha programme"এ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের সমাবর্ত্তন পথে অনুরূপ ব্যবস্থারই বিধান দিয়ে গেছেন। "From each according to his capacities to each according to his needs." যতদিন পর্য্যন্ত সমাজ কমিউনিজমের পূর্ণাবস্থায় না পৌছাচ্ছে, ততদিন বেতন প্রথা বজায় রাখতে হবে ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও নির্দ্ধারণ কর্ত্তে হবে। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু হয়ত জিজ্ঞেস করবেন যে, এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন উৎপাদনের অধিকারী তখন ধনিকদের মত সেও শ্রমিকদের 'surplus value' আত্মসাৎ করে কিনা। এর উত্তর, শ্রমিকরা তাদের উৎপাদনের সবটাই বেতন রূপে ফিরে পায় না বটে এবং রাষ্ট্র তাদের শ্রমলব্ধ উৎপন্ন-মূল্য সবটাই তাদের প্রত্যার্পণ করে না সত্য, কিন্তু এটাকে 'surplus value' আত্মসাৎ করাও আখ্যা দেওয়া চলে না। কারণ রাষ্ট্র সেখানে শ্রমিকদের নিজেদেরই। রাষ্ট্রকে consumption goods এবং capital goods এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। বর্ত্তমানে ভোগের মাত্রা কমিয়ে বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশকে আরও বেশী শিল্পপ্রধান কোরে তুলে, ভবিষ্যতের উৎপাদন বাড়াবার ভার রাষ্ট্রের উপরে। সুতরাং ভোগটাকে যতদূর সম্ভব খাটো ক'রে দেশের ভবিষ্যৎ সত্তার বাড়িয়ে তোলার বন্দোবস্ত করতে হবে। আরও একটা ব্যাপারে সোভিয়েট্ রাষ্ট্রে জীবনধারণের মাপকাঠি খাটো কর্ত্তে হয়। সেটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত থাকা। তাই অনেক বৈদেশিক প্রচারক সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার নিন্দা করে বলেন যে,সেখানে standard of living অতি নিম্ন স্তরের। জারের আমলের রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে কিন্তু ভোগের মাপকাঠির বহু উন্নতি হয়েছে বলতে হবে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভোগের পরিমাণ আরও বেশী বাড়ান যায়নি। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি ধনশালী দেশগুলিতে হয়ত এই standardটি আরও উঁচুদরের। কিন্তু ২০।২২ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া অর্থ-নৈতিক জগতে যে উন্নতি সাধন করেছে তা সত্যিই অভাবনীয়। আর এ-সবের জন্য দায়ী রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। একটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশ মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যে একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হতে পারে তা রাশিয়ার

থেকে বোঝা যায়। বিগত কয়েক বৎসর ধরে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলি যখন বেকার-সমস্যা ও নানারূপ বিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে অবনতির পথে নেমে যাচ্ছিল, তখন একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী, তার উন্নতি অব্যাহত রাখতে পেরেছিল, এবং দুনিয়ার মধ্যে এই একমাত্র দেশ, যেখানে বেকার-সমস্যার বালাই নেই। কিছুদিন হ'ল ষ্টালিন কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে গত ৫ বছরের উন্নতির একটা বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় ১৯৩৩ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের National Divident এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৮ শত ৫০ কোটি রুবল। পাঁচ বছরে এর পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে, ১৯৩৮ সালে সংখ্যাটা হয়েছে, ১০ হাজার ৫ শত কোটি রুবল। রাশিয়াতে যে শুধু শিল্প-জগতে যুগান্তর এসেছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রেও বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেখানকার Gigant অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় কৃষিক্ষেত্রগুলিও রাষ্ট্রের খাস-দখলে, এ ছাড়া রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। ১৯৩৩ সালে এই যৌথ চাষ-আবাদের আয় ছিল, ৫ হাজার ৬ শত ৬১ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল, ১৯৩৮ সালে সেই আয় দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১ শত ৮০ কোটি ১০ লক্ষ রুবল।

রাশিয়ার ধনদৌলতের এই দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ সেখানে মানুষের, যন্ত্রের ও প্রকৃতির উৎপাদনশক্তিকে অকেজো ক'রে ফেলে রাখা হয় না। রাষ্ট্র তাদের সবগুলিকেই যোগ্য স্থানে ব্যবহার ক'রে দেশের উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র সেই উৎপন্ন সামগ্রী বণ্টন ও ব্যবহার কর্ম্মে সমগ্র জনসাধারণের হিতার্থে। এই হচ্ছে সোভিয়েট অর্থ-নীতির উন্নতির কষ্টিপাথর।

---

*তা'হলে আমাদের করণীয় কি ?

অনুবাদক—**প্রমথনাথ চৌধুরী**

(গল্প)

পল্লি-জীবন অতিবাহিত করে' যখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মস্কো সহরে বাস করতে এলাম, তখন নাগরিক দারিদ্র্যের অভিনব দৃশ্য আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। গ্রাম্য-দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা আমার পূর্ব্ব হ'তেই ছিল। কিন্তু নাগরিক দারিদ্র্য তখন আমার পক্ষে একান্তই নূতন ও বুদ্ধির অনধিগম্য বিষয় ছিল। মস্কো সহরের রাস্তায় বা'র হলেই একজন না একজন ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হবেই। আর এই ধরণের ভিক্ষুকদের সঙ্গে গ্রাম্য-ভিক্ষুকদের কোন সাদৃশ্যও পাওয়া যাবে না। এরা গ্রাম্য-ভিক্ষুকদের মত থলে কাঁধে করে' খৃষ্টের নামে ভিক্ষা করে না। এদের হাতে থলে থাকে না, এবং এরা যাজ্ঞাও করে না। এদের সঙ্গে যখন দেখা হয়, এরা সাধারণতঃ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে এবং তোমার দৃষ্টির ভাব বুঝে কোন সময় কিছু চায়, কোন সময় বা কিছুই চায় না। ভদ্রলোকের অন্তর্ভুক্ত এমন একজন ভিক্ষুককে আমি জানি। বৃদ্ধটি প্রতি পদক্ষেপে দেহটাকে নুইয়ে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ায়। তোমার সঙ্গে দেখা হলেই সে একপায়ে দাঁড়িয়ে দেহটাকে এমনভাবে নত করবে যে, তোমার মনে হবে যেন সে তোমাকে নমস্কার করছে। তুমিও যদি দাঁড়িয়ে পড, তাহলে সে টুপিটাকে খুলে নিয়ে আর একবার নমস্কার করে'ই তোমার কাছে কিছু চেয়ে বসবে। কিন্তু তুমি যদি না

* Leo Tolstoy এর—"What then must we do" গ্রন্থের অনুবাদ।

দাঁড়াও, তাহলে যেন ঐ বকমই তাব চলবার ধরণ—এই ভাব দেখিয়ে সে অপর পায়ের উপর ভর দিয়ে পূর্ব্বের মত নমস্কারের ভঙ্গীতে বাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলবে। এই লোকটি হচ্ছে মস্কোব শিক্ষিত ভিক্ষুকদের একটি নমুনা-স্বরূপ। কেন যে সোজাসুজি তাবা কিছু যাজ্ঞা করে না, তা আমি প্রথমে জানতাম না। পবে সেটা জেনেছিলাম। কিন্তু তবুও তাদের প্রকৃত অবস্থাটা আমি তখন সম্যক্ বুঝতে পারতাম না।

একদিন আকানাশেভেব শাখা পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, এক পুলিশ-কর্ম্মচাবী একান্ত জীর্ণ ও মলিন-বেশধারী একজন শোথ-বোগগ্রস্ত কৃষককে একখানা খোলা গাড়ীব মধ্যে জোর করে' তুলছে। তাকে জিজ্ঞেস কবলাম—অপরাধটা কি? জবাব দিল "ভিক্ষে কবাব অপরাধী"। ভিক্ষে কবা কি নিষিদ্ধ? জবাব পেলাম "তাইতো মনে হচ্ছে"।

তারপব ঐ কৃষককে নিয়ে গাড়ীখানা চলতে লাগলো। আমিও আব একখানা গাড়ীতে চড়ে' ওদের পিছু নিলাম। আমার জানতে ইচ্ছা হলো—ভিক্ষা কবা আইনতঃ নিষিদ্ধ কি না এবং কি ভাবেই বা এই ভিক্ষাব অপরাধকে দমন কবা হয়। আমি আদৌ বুঝে উঠ্‌তে পাবলাম না যে,একজন একজনেব কাছে কিছু যাজ্ঞা কববে, এই রকম একটা ব্যাপার কেমন করে' নিষিদ্ধ হ'তে পাবে। তা'ছাড়া, যে মস্কোর বাস্তায় ভিক্ষুকেব ছড়াছড়ি সেই মস্কো সহবে ভিক্ষা আইনতঃ নিষিদ্ধ, একথাটা আমি বিশ্বাস কবতেই পাবলাম না। যে পুলিশ-থানায় ঐ ভিক্ষুককে নিয়ে গিয়ে হাজিব করা হলো—আমিও সেইখানে ঢুক্‌লাম। সেখানে একজন তলোয়ার ও পিস্তল-সজ্জিত হয়ে টেবিলেব সামনে বসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস কবলাম, লোকটাকে কি জন্য ধবে' আনা হলো? পিস্তল ও তলোযার সজ্জিত লোকটি রক্তচক্ষু করে' আমাব পানে তাকিয়ে বললো—"তা জানবার আপনার কি দবকার?" যা হোক্ কিছু একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত মনে কবেই হয়তো—পরক্ষণেই সে বললো—"এদের ধরে' আনাই সরকাবের হুকুম। কাজেই ধরে' আনা হয়েছে।" তারপর বাইরে চলে আসতেই দেখলাম প্রবেশ-কক্ষের জানালার চৌকাঠের উপর বসে পূর্ব্বের পুলিশ-কর্ম্মচারীটি মনোযোগ সহকারে একটা নোট বই দেখছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা, সত্যই কি খৃষ্টের নামে ভিক্ষে করাটা আইনতঃ নিষিদ্ধ? পুলিশ-কর্ম্মচারীটি আমার পানে তাকিয়ে ভ্রুকুটি না কবে বরং কতকটা ঝিমানোব ভঙ্গীতে বললো,"সবকারের হুকুম ; কাজেই এটা দবকাব।" এইটুকু বলেই সে আবাব নোট বই দেখতে লাগলো। আমি তখন গাড়ীবারান্দায় গাড়োয়ানের কাছে চলে এলাম।

গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করলো—"কি হলো মশায়? ওবা তাকে আটক কবে' বাখলো বুঝি? দেখলাম গাড়োযানটাও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহান্বিত।

আমি বল্‌লাম, হ্যাঁ। তখন গাড়োয়ানটা বিবক্তিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলো।

তা'কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের এই মস্কো সহবে খৃষ্টের নামে ভিক্ষা কবতেও মানা—এব মানে কি?

গাড়োযান বললো—"কে জানে মশায়।"

বল্লাম, এ কেমন কবে হয়। গবীব-দুঃখীবাই হলো যিশুখৃষ্টেব প্রিয়পাত্র। আব তাদেবই এবা ধবে' নিয়ে যাচ্ছে?

"আজকাল আইনই ঐ। ভিক্ষে কবা মানা।"

এর পব আমি প্রায়ই লক্ষ্য কবেছি—পুলিশ-কর্ম্মচাবীবা এই ভিক্ষুকদের থানায় নিয়ে গিয়ে, যুসুপভ্ কাবখানায় চালান কবে' দিচ্ছে। একদিন দেখলাম মায়ানিস্কিব পথে একদল ভিক্ষুক চলেছে। সংখ্যায় তাবা প্রায় জনা ত্রিশ হবে। তাদেব আগে পাছে রয়েছে একজন করে' পুলিশ-কর্ম্মচাবী। জিজ্ঞেস করলাম—কি কবেছে ওরা? উত্তব পেলাম—"ভিক্ষে"।

দেখা গেল মস্কোব সমস্ত ভিক্ষুকের পক্ষেই (বাস্তায় বা'ব হলেই যাদের দেখা যায়, যাবা প্রত্যেক উপাসনাব সময়েই প্রত্যেক গির্জ্জাব বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যাদের প্রত্যেক শবানুগমন উৎসবেই হাজির থাকতে দেখা যায়) ভিক্ষাকরা আইনত নিষিদ্ধ।

কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারতাম না যে, কাউকে ধবে'

আটক রাখা হয় এবং কাউকে বা কিছুই করা হয় না কেন্। তাহ'লে হয় আইনী, আর বে-আইনী দুই শ্রেণীর ভিক্ষুক আছে, কিম্বা হয়তো ভিক্ষুকের সংখ্যা এতই বেশী যে, সকলকে ধরা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না, কিম্বা হয়তো কতকগুলোকে ধরতে না ধরতে, আর কতকগুলো বা'র হ'য়ে পড়ে।

সকল শ্রেণীর ভিক্ষুকই মস্কোয় দেখা যায়। এক শ্রেণীর ভিক্ষুক আছে, যাদের ভিক্ষা করাই একমাত্র পেশা। আবার অন্য এক শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখা যায়, যারা কোন না কোন কারণে মস্কো সহরে এসে পড়েছে এবং তারা প্রকৃতই সর্ব্বহারা।

ঐ শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে অনেক কৃষকজাতীয় সবল ও নিরীহ স্ত্রী-পুরুষ দেখতে পাওয়া যায়। তারা কৃষকের বেশেই থাকে। আমি প্রায়ই তাদের দেখতে পাই। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো সহরে এসে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর হাসপাতাল হ'তে বার হয়ে এসে, না ছিল তাদের জীবিকার অবলম্বন, না ছিল তাদের মস্কো ছেড়ে অন্যত্র চলে' যাবার পাথেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মদ খেতেও অভ্যাস করেছিল। আবার কারো কারো হয়তো অসুখবিসুখ কিছুই ছিল না, কিন্তু ঘরে আগুন লাগায় হঠাৎ তারা একেবারে সর্ব্বহারা হ'য়ে পড়েছে। কেউবা নেহাৎ জরা ও বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, কেউ কেউ সন্তান-ভারাক্রান্তা স্ত্রীলোক। কেউ কেউ আবার বেশ সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম। এই সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম লোকগুলোই বিশেষ করে' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ মস্কোয় এসে হ'তেই, ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপর উঠে আমি দুজন কৃষকের সঙ্গে (যারা স্প্যারো পাহাড়ে করাত দিয়ে কাঠ কাটতো) প্রত্যহই কাজ করতাম। রাস্তায় যে সকল সবল, সুস্থ ভিক্ষুক দেখতাম তারা এই দুজন কৃষকের মতই কার্য্যক্ষম। এই দুজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল পিটার। সে পূর্ব্বে সৈনিকের কাজ করতো। অপরটির নাম ছিল সিমেন। সে ছিল ভ্লাডিমির প্রদেশের একজন কৃষক। তারা যখন প্রথম মস্কোয় আসে তখন তাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কাঁধের উপর জীর্ণ বস্ত্র, আর দেহের উপর দুটো করে' মজবুত হাত। ঐ হাতের শক্তিতে কঠিন পরিশ্রম করে' তারা দৈনিক ৪০।৫০ কোপেক উপার্জ্জন করতো এবং তা হ'তেই কিছু কিছু সঞ্চয় করে' পিটার তা দিয়ে কিনে ফেললো ভেড়ার চামড়ার একটি কোট, আর সিমেন তার সঞ্চয়কে পাথেয় করে' তার নিজের গ্রামে ফিরে গেল। এদের দুজনের সঙ্গে আমার বেশ নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই—ঐ ধরণে। সুস্থ সবল লোক রাস্তায় বা'র হ'লে তারা বিশেষ করে' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

তা হ'লে, কেনই বা কেউ করে কাজ, আর কেউ করে ভিক্ষা ?

ঐ ধরণের কৃষককে ভিক্ষা করতে দেখলেই তাকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন করে' তার এমন অবস্থা হলো। একদিন এক সবল কৃষকের সঙ্গে দেখা হলো। তার দাড়ির চুলে তখন অল্পঅল্প পাক ধরেছিল। সে তখন ভিক্ষা করছিল। তার নিবাস ও পরিচয় জানতে চাইলে, সে আমাকে জানালো যে, সে কলুগা হ'তে কাজের সন্ধানে সহরে এসেছিল। প্রথম এসেই জ্বালানী কাঠ কাটবার কাজ পেয়েছিল। সে আর তার এক সঙ্গী একজায়গায় সমস্ত জ্বালানী কাঠ কাটা শেষ ক'রে, অন্য জায়গায় কাজ পাবার অনেক চেষ্টা করে'ও আর কাজ জোগাড় করতে পারলো না। তখন তার সঙ্গীটি তাকে ত্যাগ করে' চলে গেল। তারপর সে ক্রমাগত ১৫।১৬ দিন ধরে' কাজের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে তার যা কিছু সঞ্চয় ছিল সমস্তই শেষ করে' ফেলেছে। এখন একটা করাত কিম্বা কুড়ুল কেনবারও সঙ্গতি নেই।

ঐ কথা শুনে আমি তাকে একটা করাত কেনবার অর্থ দিয়ে কাজের সন্ধান দিলাম, (আমি ইতিপূর্ব্বে ঐ লোকটিকে সহকর্ম্মীরূপে গ্রহণ করবার জন্য পিটার ও সিমেনকে অনুরোধ করে' রেখেছিলাম)।

আমি বল্লাম তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যেয়ো। যথেষ্ট কাজ পাবে সেখানে।

"নিশ্চয়ই যাবো। ভিক্ষে করতে কি কেউ চায় মশায়। কাজ করতে আমি খুবই পারি।"

সে শপথ করে' বলেছিল, কাজে সে নিশ্চয়ই যাবে। আমারও ধারণা হ'লো যে, লোকটা আন্তরিকভাবেই বলেছে এবং তার কাজ করবারই মতলব রয়েছে।

পরদিন পিটার ও সিমেনের কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেই লোকটি তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কিনা। জানলাম—আসে নি।

এই ভাবে আরও অনেকে আমাকে প্রতারিত করেছিল। এমন কত ভিক্ষুক আমার কাছ হ'তে বাড়ী ফিরে যাবার রেলভাড়া চেয়ে নিয়েছে, কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও তাদের সঙ্গে আবার রাস্তায় দেখা হয়েছে। এমন কত লোককে আমি চিনতাম এবং তারাও আমাকে চিনতো। কখন কখনও তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে আবার সেই একই কাহিনী শুনিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতো। কেউ কেউ আবার আমাকে চিনতে পেরে পালিয়ে যেতো। এই ভাবে ক্রমশঃ জানলাম এই শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই প্রতারক। কিন্তু এই সব প্রতারকদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হতো। এরা সবাই অর্দ্ধ-নগ্ন, নিঃস্ব ও ভগ্নস্বাস্থ্য জীব। সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এদের কথাই পড়া যায়। এদের মধ্যে কেউবা প্রাণ ত্যাগ করে শীতে ও অনাহারে, আবার কেউবা আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

* * *

মস্কোবাসীদের কাছে এইসব দুঃস্থ ও অধঃপতিতদের কথা উত্থাপন করলেই তারা বলতে'—"যা দেখেছো, তা দেখাই নয়। খিতরভ্ বাজারে গিয়ে সেখানকার 'দরিদ্র-নিবাস'টা একবার দেখে এসো। সেখানে গেলেই খাঁটি 'কণক কোম্পানীর' সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে।"

একজন রসিক লোক মন্তব্য প্রকাশ করলেন "এখন আর 'কণক কোম্পানী' নয়, একেবারে 'স্বর্ণ-পল্টন'—সংখ্যার ইয়ত্তাই করা যায় না।"

রসিক ভদ্রলোকটি ঠিকই বলেছিলেন। বরং 'কোম্পানী' কিম্বা 'পল্টন' না বলে,—যারা সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার, তাদের একটা "বিরাট সৈন্যবাহিনী"—বল্লেই বোধ হয় ঠিক কথা বলা হতো। সহরের এই দারিদ্র্যের কথা উত্থাপন করে, সহরের বনেদী বাসিন্দারা সকল সময়েই বেশ একরকমের আনন্দ উপভোগ করতো। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন দেখতাম—লণ্ডনবাসীরা সেখানকার দারিদ্র্যের কথা উত্থাপন করে বেশ একটা গর্ব্ব অনুভব করে' বলতো, "এখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে দেখুন।"

এই সব দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী শুনে তা' নিজের চোখে দেখবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছে হতো। কতবার খিতরভ্ বাজারে যাবার জন্য রওনাও হয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই কেমন যেন একটা অস্বস্তি ও কুণ্ঠা এসে আমাকে বাধা দিতো। আমার ভিতর হতে কে যেন একজন বলে' উঠতো "যে দুঃখ কষ্ট তুমি দূর করতে পারবে না, তা দেখতেই বা তুমি যাবে কেন?" ভিতর হ'তেই আর একজন বলতো "যখন যাবতীয় নাগরিক-প্রলোভন ও বিলাসিতার সঙ্গে তোমার পরিচয় রয়েছে তখন এই সব দুঃখকষ্টের সঙ্গেও তোমাকে পরিচিত হ'তে হবে।" আমিও তাই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক ঝ'ড়ো তুষার বৃষ্টির দিনে বিকেলের দিকে আন্দাজ ৪টার সময় দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার কেন্দ্রস্থল খিতরভ্ বাজারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। যাবার পথে সাল্যানকা ষ্ট্রীটে যেতেই এদের ভিড় দেখতে পেলাম। দেখলাম এরা সকলেই বিচিত্র ও অদ্ভুত রকমের পোষাক পরে' চলেছে। কারো পোষাক কারো নিজের গায়ের মাপে নয়। জুতো গুলো আরও অদ্ভুত। সকলেরই কেমন একরকম রোগা রোগা মরচেধরা গায়ের রং। তাদের প্রত্যেকেরই চোখে মুখে যেন চারিদিকের পরিবেষ্টনের প্রতি একটা নির্ব্বিকার ভাব। একটা লোক এক অতি অদ্ভুত ও আজগুবী রকমের পোষাক পরে' আমার পাশ দিয়ে অকুণ্ঠিতভাবে চলে গেল। লোকে যে তাকে দেখে কিছু ভাবতে বা মনে করতে পারে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রও চিন্তা নেই। এরা সকলেই তখন একই দিকে চলেছে। কোন্ দিকে যেতে হবে (রাস্তা আমার জানা ছিল না)

সে বিষয়ে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে, আমি তাদের সঙ্গ নিয়ে শেষে খিতরভ্ বাজারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে গিয়ে ঐ নমুনার অজস্র স্ত্রীলোক দেখতে পেলাম—তারা পুরুষদের মতই অদ্ভুত রকমের জুতো-জামা প্রভৃতি পরে' আছে, অথচ পোষাকের কিম্ভূতকিমাকারত্বের জন্য তাদের কোনই কুণ্ঠাবোধ নেই। বৃদ্ধা ও যুবতী এক সঙ্গে দল বেঁধে বসে কোন কোন জায়গায় জিনিষ পত্র কেনা বেচা করছে। কোথাও বা হাসির তুফান তুলে গাল-গল্প করছে, আবার কোথাও বা ঝগড়া ঝাটি করছে। তখন বাজারের ভিড় অনেক কমে' এসেছে। বোঝা গেল সে দিনকার মত বাজার বন্ধ হ'তে চলেছে এবং অধিকাংশ লোকই কেউ বা বাজারের ভিতর দিয়ে, কেউ বা বাজারের পাশ দিয়ে পাহাড়ের উঁচু রাস্তা ধরে চলেছে একই দিকে। যতই এগিয়ে যাই ততই দেখি ঐ শ্রেণীর লোকের জনতা বেড়েই চলেছে এবং সকলেরই গন্তব্য পথ এক। বাজার পার হয়ে রাস্তা ধরে যেতে যেতে দুটি স্ত্রীলোকের পিছু নিলাম। একজন ছিল বৃদ্ধা, অপর জন যুবতী। উভয়েরই পরিচ্ছদ শতছিন্ন ও মলিন। তারা কোন এক বিষয়ে গল্প করতে করতে চলেছে।

দেখলাম, তারা তাদের প্রসঙ্গের মাঝে মাঝে প্রায়ই একান্ত অপ্রাসঙ্গিক অশ্লীল কথা ব্যবহার করছে। তারা যে কেউ মাতাল ছিল তাও নয়। আমার খুবই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল যে, তাদের একান্ত কাছে কাছে বা আগে পাছে যে সব পুরুষ যাচ্ছিল তারা তাদের ঐ সব অশ্লীল কথোপকথনকে মোটেই গ্রাহ্য করছিল না। বেশ বোঝা গেল—এখানকার লোকগুলো ঐ রকমের কথাবার্ত্তাতেই অভ্যস্ত। যাবার পথে রাস্তার বাঁ দিকে কয়েকটি ভাড়াটিয়া বিশ্রাম ভবন ছিল। কেউ কেউ সেখানে গিয়ে ঢুকলো। বাকী দল আরও এগিয়ে চল্লো। ক্রমশঃ চড়াইএর দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আমরা রাস্তার এক কোণে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। দলের অধিকাংশ লোকই ঐ বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। দেখলাম, দেওয়ালের ধারে ধারে বাঁধানো জায়গার উপর এবং রাস্তার মধ্যে বরফের উপর ঐ শ্রেণীর লোক অনেকেই বসে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা' ছাড়া ফটকের ডান দিকে স্ত্রীলোকের দল, আর বাঁ দিকে পুরুষের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মেয়ে পুরুষ উভয় দলের (সংখ্যায় তারা শত শত হবে) মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের সারির শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। ঐ বাড়ীটির নাম "ল্যাপিন দাতব্য রাত্রি-নিবাস।" ঐ সমস্ত স্ত্রী পুরুষ প্রবেশ লাভের জন্য অপেক্ষা করছিল। পাচটা বাজলে ফটক খোলে এবং তখন এদের ভিতরে যেতে দেওয়া হয়। আমি যাদের সঙ্গ নিয়েছিলাম তাদের প্রায় সকলেই এই-খানে এসে হাজির হয়েছিল।

যেখানে পুরুষের সার শেষ হয়েছে, আমি সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাছের লোকগুলো আমার পানে তাকাতে লাগলো এবং আমিও তাদের দৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হ'লাম। তাদের জীর্ণ পরিচ্ছদ বিচিত্র রকমের হলেও আমার প্রতি তাদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী অবিকল এক-রকম। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে যেন একই প্রশ্ন, "ভিন্ন জগতের লোক হয়ে তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালে কেন ? কে তুমি ? তুমি কি কোন আত্মতৃপ্ত ধনাধিপতি ? নিজের অলস জীবনের একঘেয়েমী দূর করবার জন্য আমাদের দুর্দ্দশা উপভোগ করে আমাদের প্রাণের বেদনা বাড়াতে এসেছো ? কিম্বা তুমি কোন দুর্ল্লভ সদাশয় ব্যক্তি আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করতে এসেছো ?" এই প্রশ্নই যেন প্রত্যেকের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল। আমার পানে তাকিয়ে আমার সঙ্গে চোখো-চোখী হওয়া মাত্রই তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কারো কারো সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা আমার হচ্ছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয়েই উঠলো না। অবশেষে আমাদের উভয় পক্ষের নিস্তব্ধতার অবসরে দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা, পরস্পর পরস্পরের ক্রমশঃই আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম। যদিও আমাদের উভয় পক্ষের জীবনযাপন প্রণালী আমাদের মধ্যে পর্ব্বত প্রমাণ ব্যবধান সৃজন ক'রে রেখেছিল, তবুও যেন কয়েকবারের দৃষ্টি-বিনিময়ের ফলে আমরা পরস্পর কিয়ৎপরিমাণে

ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমার সবচেয়ে কাছে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল তার মুখখানা ফুলো ফুলো, দাড়ির চুলগুলো লাল্‌চে, আর জামা-জুতো একেবারে শতছিন্ন। তখন কন্‌কনে শীত। ঠাণ্ডার পরিমাপ আন্দাজ ১৪।১৫ ফ্যারেনহিট্‌। তিন চার বার তার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হওয়ার পর আমি নিজেকে তার এমন এক আত্মীয় বলে অনুভব করলাম যে, তার সঙ্গে কথা কইতে ইতস্ততঃ বোধ করা দূরে থাকুক, এর পর চুপ করে' থাকার লজ্জাই আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়লো। সে কোথা হতে এসেছে জিজ্ঞেস করা মাত্রই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে আরও দু'একটি কথা কইতে লাগলো। তাই দেখে আরও কয়েকজন আমার কাছে এগিয়ে এলো। সে যা বললো তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, কিছু গম কেনবার ও খাজনা দেবার সঙ্গতি লাভের আশায় সে এখানে কাজের চেষ্টায় এসেছিল। বললো, "কোন কাজই জুটলো না। সৈনিকের দল সহরের সমস্ত কাজই হাত করে' নিয়েছে। কাজের চেষ্টায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভগবান জানেন—আজ দু'দিন ধরে' কিছুই খেতে পাইনি।" ক্ষুণ্ণ হাসি হেসে একটু ভয়ে ভয়ে সে এই কথাগুলি বললো। একজন বৃদ্ধ সৈনিক তখন গরম পানীয় ফেরী করে বেড়াচ্ছিল—আমাদের কাছেই এসে সে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে ডেকে ঐ লোকটিকে এক গ্লাস পানীয় ঢেলে দিতে বললাম। তখন ঐ কৃষকটি গ্লাসটা হাতে নিয়ে পানীয়ের সমস্ত উত্তাপটুকুর সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টায় পান করবার পূর্ব্বে হাত দুটোকে গ্লাসের উত্তাপে তাতিয়ে নিতে নিতে আমাকে তার অতীত জীবনের কাহিনী (এদের জীবনের কাহিনী সকলেরই প্রায় একরকম) বলতে লাগলো। কাহিনীটি এই :—সে সহরে এসে সামান্য কিছু কাজ পেয়েছিল, কিন্তু তাও আর রইলো না। তারপর সে সামান্য যা কিছু সঞ্চয় করেছিল সে তা' সবই, আর সেই সঙ্গে তার পাস পোর্টটিও (যাতায়াতের অনুমতি পত্র) এই "রাত্রি-নিবাসেই" চুরি হয়ে গেল। দিনের বেলায় চায়ের দোকানে বসে সে নিজের দেহটাকে একটু গরম করে নেয়, আর দু'এক টুকরো রুটি কেউ যদি তাকে দয়া করে দেয় তাই খেয়ে সে দিন কাটায়। কিন্তু কখন কখন তারা তাকে তাড়িয়েও দেয়। সে এখন এই "ল্যাপিন দাতব্য-নিবাসে"ই রাত্রি কাটাচ্ছে। সে এখন কেবল একটা পুলিশের খানাতল্লাসীর প্রতিক্ষায় আছে। ভাগ্যক্রমে একটা খানাতল্লাসী হ'লেই, তার কাছে পাসপোর্ট না থাকার জন্য তারা তাকে ধ'রে নিয়ে তার নিজের গাঁয়ে চালান্‌ করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে। সে বললো—"শুনেছি নাকি আস্‌ছে বৃহস্পতি বারেই একটা খানাতল্লাসী হবে।" (কারাগার ও ধরপাকড় এদের পক্ষে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতই)

ঐসব কথা যখন সে বল্‌ছিল, তখন ভিড়ের মধ্য হ'তে দুতিন জন তার কথা সমর্থন ক'রে আমাকে জানালো যে, তারাও প্রায় ঠিক ঐ রকম দুর্দ্দশার মধ্যে পড়েছে। ঠিক ঐ সময়ে একজন বিবর্ণ, দীর্ঘনাসা ও শীর্ণ যুবক (তাঁর কাঁধের উপর কামিজটার অনেকটা অংশ ছেড়া) ভীড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এলো। দেখলাম, দারুণ শীতে সে থর থর করে কাঁপছে। এদের কথা শুনে একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে সে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলো। ফেরীওয়ালাকে বলে তাকেও কিছু গরম পানীয় দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সেও গ্লাসের উত্তাপে তার হাত দুটোকে গরম করতে করতে আমাকে কিছু বলবার উপক্রম করছে, এমন সময় একজন কৃষ্ণকায় বিপুল দেহ ও দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট কৃষক তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার সামনে এসে কিছু পানীয় চাইলো। তারপর এলো সূচালো দাড়ি-বিশিষ্ট একজন দীর্ঘকায় মাতাল। তারপর এলো একজন রোগা বেঁটে লোক। মুখটা তার ফুলোফুলো, চোখ দুটো সজল। শীতে তার পা দুটো এমন কাঁপছিল যে হাতের কাঁপুনীতে গ্লাশ হ'তে চা ছল্‌কে তার নিজের গায়েই পড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, অন্য দু'পাচজন তাকে গালাগালি করতে লাগলো। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এক করুণ ও কষ্টসাধ্য হাসি হেসে কাঁপতে থাকা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর রইলো না। তার পর এলো শতছিন্ন পরিচ্ছদে একজন বিকলাঙ্গ

লোক। তারপর এলো একজন লোক—যাকে দেখে অতীতের এক অফিসার বলে মনে হ'লো। তারপর এলো একজন ধর্ম্মযাজক গোছের লোক। তারপর এলো নাসিকা বর্জ্জিত এক অদ্ভুত চেহারার লোক। এমনি করে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফেরিওয়ালার পানীয়ের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হ'য়ে গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, শীতার্ত্ত এবং সকলেই একান্ত দয়া প্রার্থী ও অনুগত অবস্থায় আমাকে ঘিরে ধরে গরম পানীয় চাইতে লাগলো। এর পর, একজন আমার কাছে এসে কিছু পয়সা চাইলো। তাকে কিছু দিতেই আর একজন এসে হাজির। তারপর আর একজন। ক্রমে চারদিকের ভিড় যেন আমায় চেপে ধরলো। ফলে একটা বিষম বিশৃঙ্খলার ও ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হ'লো। তখন পাশের একটা ঘরথেকে একজন দারোয়ান চীৎকার করে তাদের ফটকের সম্মুখ হ'তে সরে যাবার হুকুম করতেই, তারা নেহাৎ অনুগতভাবে হুকুম মান্য করে চলে গেল। এদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে এই ধাক্কাধাক্কির চাপ হ'তে উদ্ধার করবার জন্যও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে জনতা দেওয়ালের ধারে ধারে বাঁধানো জায়গার উপর এতক্ষণ ধরে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তা' চারদিক হ'তে ক্রমশঃ আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রত্যেকেই আমার কাছে করুণ ভাবে ভিক্ষা চাইতে লাগলো। প্রত্যেকের মুখখানা যেন পূর্ব্ববর্ত্তি ভিক্ষুকের চেয়ে করুণ, ক্লান্ত ও দৈন্য-কবলিত। আমার কাছে তখন মাত্র কুড়ি রুবেল (আন্দাজ ত্রিশ টাকা) ছিল। সমস্তই বিলিয়ে দিয়ে শেষে আমি ঐ ভীড়ের সঙ্গে 'রাত্রি-নিবাসে' প্রবেশ করলাম। দেখলাম বাড়ীখানি প্রকাণ্ড এবং চারভাগে বিভক্ত। উপরের তলাগুলো পুরুষদের জন্য এবং নীচের তলাগুলো স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

প্রথমে স্ত্রীলোকদের একটা বড় ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম—তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর কামরার মত ঘরটির দেওয়ালের গায়ে নীচে উপরে দুটো করে' তাক্ (Bunk) রয়েছে। মলিন ও শতছিন্ন পরিচ্ছদ্ পরিহিতা বিচিত্র ধরণের বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও যুবতী দলে দলে ঘরের ভিতরে ঢুকে নীচের ও উপরের তাকে আপন আপন জায়গা দখল করতে লাগলো। বয়ঃজ্যেষ্ঠাদের মধ্যে কেউ কেউ এই 'দাতব্য নিবাসের' প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। আবার কেউ কেউবা হাসির রোল তুলে বাক্ বিতণ্ডা করতে লেগে গেল। এর পর আমি উপর তলায় চলে গেলাম। সেখানেও তখন পুরুষদের দল নিজের নিজের জায়গা দখল করতে আরম্ভ করেছে। যাদের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে অর্থ ভিক্ষা দিয়েছিলাম, একটা ঘরের ভিতর তাদেরই একজনকে দেখতে পেয়ে ভীষণ লজ্জায় আমি তার কাছ হ'তে দূরে সরে' গেলাম। মনে হ'লো আমি যেন কোন দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী। তৎক্ষণাৎ 'রাত্রি-নিবাস' ত্যাগ করে বাড়ী ফিরে গেলাম। সেখানে কার্পেট আচ্ছাদিত সিঁড়ি বেয়ে নিজের কার্পেট আচ্ছাদিত কক্ষের মধ্যে উপস্থিত হয়ে পশু-লোম-শোভিত মূল্যবান কোটটি খুলে রেখে আমি শুভ্র গলাবন্ধ ও শুভ্র দস্তানা-শোভিত আমার দু'জন বাবুর্চ্চির দ্বারা পরিবেশিত পঞ্চমবারের সুস্বাদু আহার্য্য উপভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, একদিন প্যারী নগরীতে হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে সংঘটিত গিলটিনের (এক প্রকার হত্যা-যন্ত্র) সাহায্যে একজনের শিরচ্ছেদন দেখেছিলাম। আমি জানতাম—লোকটা এক ভীষণ অপরাধে অপরাধী। ঐ শিরচ্ছেদনের ঘটনাকে সমর্থন করে' সংবাদ পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছিল তাও আমি পড়েছিলাম। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ঐ লোকটি যে নিছক একটা নির্ম্মমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বশেই ঐ জঘন্য অপরাধ করেছিল তাও আমি জানতাম। কিন্তু তবুও দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তার মাথাটা যখন বাক্সের মধ্যে পড়ে গেল আমি তখন আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করে' উঠলাম। কেবল মাত্র মন দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে নয়, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তখনই আমি অনুভব করলাম যে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সমস্ত যুক্তিতর্কই নির্ম্মম ও জঘন্য। বিশ্ব-জগতের একতাবদ্ধ সমগ্র মানবের দ্বারা ঐ মৃত্যুদণ্ডের

বিধানটি গঠিত হ'লেও এবং যে কোনও সুন্দর নাম দিয়ে ঐ মৃত্যুদণ্ডকে শোভন কববাব চেষ্টা কবা হ'লেও হত্যা চিবদিনই হত্যা। অথচ, এই হত্যা আমাব চোখের সামনে সংঘটিত হ'য়ে গেল, আর আমি আমার উপস্থিতি ও নিবাপত্তিব দ্বাবা ঐ হত্যাজনিত অপবাধেব অংশ-ভাগী হ'লাম।

ঠিক সেই ভাবেই, এখানেও সহস্র সহস্র শীতার্ত্ত ও অনশনক্লিষ্ট অধঃপতিতদেব দেখে আমি শুধু আমাব মন দিয়ে নয়, অন্তব দিয়ে নয়, আমাব সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে বুঝতে পাবলাম যে, মস্কো সহরের ঐ অগণিত লাঞ্ছিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্তদেব সম্মুখে আমি ও আমাব মত হাজাব হাজাব লোক খাদ্য-প্রাচুর্য্যের দ্বাবা এবং গৃহসজ্জাব ও বিলাসিতাব অভিনব আড়ম্বরেব দ্বাবা (জগতেব পণ্ডিত-মণ্ডলীব এই সমস্ত আড়ম্বরেব প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যত অনুকূল মতই প্রকাশ করুণ না কেন) একবাব নয়, দুবাব নয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা জঘন্য, দণ্ডনীয় অপবাধ করে' চলেছি। আমি যে আমার বিলাসিতাব দ্বারা শুধু এই অপবাধ অনুমোদন কবছি তাই নয়, অপবাধেব অংশ-ভাগীও হচ্ছি।

উক্ত দুইবকমের অনুভূতির মধ্যে আমি কেবল এইটুকু মাত্র পার্থক্য দেখতে পাই যে, প্রথম ব্যাপারটিতে আমাব পক্ষ হ'তে বাধা দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হবে, এবং আমার শত প্রতিবাদও তাদের হত্যা হ'তে নিবস্ত কবতে পাববে না, একথা জেনেও আমি বড় জোড় একটা চীৎকাব করে' গিলটিনেব চারিপাশের লোকদেব জানিয়ে দিতে পাবতাম যে তারা অত্যান্ত অন্যায় করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার যে কেবল গরম পানীয় দেবাব কিম্বা তুচ্ছ কয়েকটি রুবেল দেবার সামার্থ্য ছিল তাই নয়, আমি আমাব গায়েব গরম কোটটি এবং আমার যা কিছু পার্থিব সম্পদ আছে সমস্তই তাদেব দিতে পারতাম। তা আমি দিইনি এবং সেই জন্যই আমি তখনই অনুভব করছিলাম, এখনও অনুভব করছি এবং চিরকালই অনুভব কববো যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাব প্রয়োজনের অতিবিক্ত আহার্য্য থাকবে এবং আব একজনেব গ্রাসাচ্ছাদনেবও কোন সংস্থান থাকবে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অহবহঃ এক অতি জঘন্য দণ্ডনীয় অপবাধেব অংশভাগী হ'তে থাকবো।

সমাজতন্ত্রবাদ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর
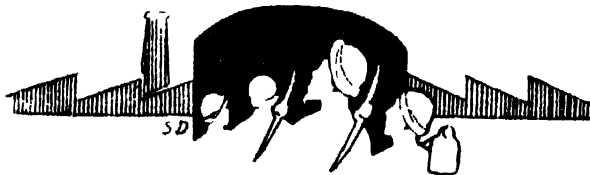
সত্যেন্দ্রনাথ সেন

সংস্কারের সাহায্যে সমাজকে যাঁরা একটু একটু করে এগিয়ে নিতে চান, তাঁদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কোন স্থির লক্ষ্যে গিয়ে এঁরা পৌছতে পারেন না। হালছাড়া নৌকার মত সময়ের বাতাসে একবার এদিকে একবার ওদিকে চল্‌তে চল্‌তে কোথায় গিয়ে পড়েন, তা নিজেদেরই ঠিক থাকে না। আর বুর্জ্জোয়ারাও আগে থেকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পেয়ে আপনাদের ঘাটি ভালমতো আগ্‌লে বসে থাকতে পারে। শ্রমজীবীদের এই দ্বিধাগ্রস্ত যৎসামান্য চেষ্টাকে গলাটিপে মেরে ফেলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তা' ছাড়া এও প্রায়ই দেখা যায় যে, এরাই শ্রমজীবীদের বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরে তাদের মন ভুলিয়ে রাখতে চায়, এবং ছোট ছোট সংস্কার দিয়ে তাদের নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলে। বড় কোন সমস্যার কাছাকাছি এলে, সমস্ত আন্দোলনটাকে নিয়ে একদিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। শত্রু মিত্র মিলে এমন জগাখিচুরী ভাব হয়ে থাকে যে,কে আপন আর কে পর, এ চৈতন্যটুকুও কারু থাকে না। বিপ্লবের অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখে শত্রু মিত্রের প্রকৃত পরীক্ষা হয়, বিপ্লবের সম্মুখে ভাঁওতা চলে না, রফা ও আপোষের জোড়াতালি দিয়ে সমস্ত আন্দোলনকে পিছিয়ে দেওয়া যায় না।

একটু একটু করে এগিয়ে চল্‌তে চায় যারা, পদে পদে তাদের পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে। সমস্ত শক্তিকে যদি একই সঙ্গে আপনাদের হাতে না নিয়ে আসতে পারা যায়, তা হ'লে প্রতি ছিদ্র দিয়ে শনি এসে ঢুকবে। সংস্কার-কামীরা শুধু ডালপালাগুলোকে ছেঁটেছুঁটে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে, কিন্তু মূলের দিকে পৌছিবার ক্ষমতা তাদের নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আনা দূরে থাক, তার পথে তারা প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায় মাত্র।

এগুলি শুধুই কথার কথা নয়। ইংল্যাণ্ড ও রাশ্যার (রাশিয়া) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে পাশাপাশি তুলনা করে দেখলেই একথার সত্যতা বুঝতে পারা যায়। কার্ল মার্কস্ যে পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন, রাশ্যার চির নির্য্যাতিত শ্রমিক ও চাষীরা সেই পথেই মুক্তিলাভ করেছে। কার্লমার্কস যে যুগান্তকারী মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন, লেলিন তাকে প্রথমতঃ কাজে পরিণত করেন। তাঁহার নেতৃত্বে রাশ্যার শ্রমিক ও চাষীরা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে রাজ্যের যা কিছু ধনসম্পদ সমস্তই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। সকলকেই সেখানে খেটে খেতে হয়। কাজেই সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। অত্যধিক উৎপাদনের জন্য সেখানে বাণিজ্য-সঙ্কট দেখা দেয় না। গুদামে মাল মজুত আছে, অথচ দেশের লোক না খেয়ে মরছে, এমন অদ্ভুত ব্যাপার সেখানে ঘটে না। সমাজতন্ত্রবাদীদের পূর্ণ আদর্শ যা, এখনও তারা অবশ্য সেখানে পৌছিতে পারে নি, কিন্তু ক্রমেই দৃঢ়পদে সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। মার্কসের জ্ঞান ও লেনিনের কর্ম্মশক্তির অপূর্ব্ব সম্মেলনের ফলে যে মহা-বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবীরা আজ তারই ফলে হয়েছে অনুপ্রাণিত। নির্য্যাতিত, শোষিত, ও উৎপীড়িতের দল আজ সেই কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করে রক্তপতাকা হাতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আর ইংল্যাণ্ড? যাকে সমাজতন্ত্রবাদের মাতৃভূমি বললে অত্যুক্তি হয় না, সেই ইংল্যাণ্ড আজ কোথায়? ইংল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীরা চিরকাল বিপ্লবকে ভয় করেই এসেছে, সংস্কারের মোহ তাদের চলার শক্তিকে খর্ব্ব করে দিয়েছে। বুর্জ্জোয়ার অনুচরেরাও তাই সুযোগ বুঝে

দলে দলে শ্রমিকদেব সঙ্গে মিশে গেছে এবং শ্রমিকদের পার্টি আজ তাদের ইঙ্গিতেই চল্‌ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা দূরে থাক, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকেরা আজ সংস্কারের চোবা গর্ত্তে আটকে পড়ে আছে।

লোকে বলে, মানুষ জাতি ক্রমশঃই সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে—কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি? সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চল্‌ছে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, মানুষের প্রাণের আজ আর এতটুকু মূল্য নেই। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাবে আজ এখানে, কাল সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। দেশকে দেশ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন প্রতিক্ষণেই বিপন্ন। আতঙ্ক ও বিভীষিকার ছায়া সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর নাম সভ্যতা? এরই নাম প্রগতি?

মহাযুদ্ধেব শেষে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলি যখন পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য একত্রিত হয়ে জাতি সঙ্ঘ (League of Nations) গঠন করল, তখন অত্যন্ত আশাবাদী যারা তারা মনে করেছিল, সত্য সত্যই বুঝি পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এলো, বুঝি বা এতদিনে মানুষ তার চলবার খাঁটি পথ খুঁজে পেল। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যাদেব গভীব, উপরের এই চাকচিক্য দেখেই তারা ভোলে নি। তারা সেদিন বলেছিল যে যতই জাতি সঙ্ঘ স্থাপন হোক্ না কেন, যুদ্ধের মূল কারণগুলি কিন্তু ঠিকই রয়ে গেল। মূল কারণগুলির উচ্ছেদ না হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমতে পারে না, জাতি সঙ্ঘেরসভ্যদেব শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকতা ছিল যতটুকু, ভণ্ডামী ছিল তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী। কিন্তু সভ্যদের যদি সত্য সত্যই আন্তরিকতা থাকেও, তবুও তারা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে যুদ্ধকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে না কেন—সেকথা বুঝতে হলে, যুদ্ধ হয় কেন, এই কথাটি আমাদের ভালমতে ভেবে দেখা দরকার। আগেই বলেছি যে, আজকালকার রাজ্যগুলি অল্প কয়েকজন ধনী লোকের মুঠোর মধ্যে। জনসাধারণকে বঞ্চিত করে আপনাদের স্বার্থ সাধন করাই তাদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা যতদিন চালু থাকবে, ততদিন এদেব প্রভুত্ব থাকবে অটুট এবং সুবিধাভোগী জনকয়েকের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের বলিদান চলবে অবাধে।

এই ধনিকসম্প্রদায়, অর্থাৎ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ কি? তারা চায় সস্তাদরে কাঁচামাল কিনে, সস্তা মজুরী দিয়ে জিনিষ তৈয়ারী করিয়ে তা'থেকে মোটা হারে মুনাফা করা, কিন্তু শিল্পপ্রধান দেশ-গুলিতে যে পরিমাণ মাল তৈয়ারী হয়, প্রতিযোগিতার চাপে সেগুলিকে কাটানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কাজেই নিজের দেশে এই মাল কাটাতে না পেরে, কারখানার মালিকরা তাদের মাল কাটাতে চায় দেশ বিদেশে, সেই সমস্ত দেশে, যেখানে শিল্পের উন্নতি হয় নি, যারা এবিষয়ে এখনও পিছিয়ে পড়ে আছে। এই দেশগুলিতে কে বেশী মাল কাটাতে পারবে তা'নিয়ে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে ধনিকসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। সবাই চেষ্টা করে শ্রমিকদের যদ্দূর সম্ভব কম বেতন দিয়ে—সস্তায় মাল চালান দিতে। কিন্তু এই সমস্ত অনুন্নত দেশের বাজারেও সুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতা। পরস্পর প্রতিযোগিতার ফলে এই সব বাজারেও মাল কাটানো কঠিন হয়ে ওঠে। তাই তারা সবাই চায় এই দেশগুলিকে আপনাদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসে তার বাজারকে সম্পূর্ণভাবে একচেটে করে নিতে। যেমন আমাদের দেশ ইংরেজদের হাতে থাকবার ফলে ইংরেজ-মালিক ও বণিকের দল এখানে মাল কাটবার খুবই সুবিধা পেয়ে গেছে। ভারতবর্ষের বাজারে যে শুধু ইংরেজরাই মাল চালান দেয় তাতো নয়; জার্ম্মাণী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি অনেকেই এদেশের বাজারে তাদের মাল কাটাতে চায়। এই সমস্ত প্রতিযোগীদের রপ্তানি মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়ে ইংরাজ-সরকার তাদের মাল চালাবার পথ বন্ধ করে দিতে চায়। এইভাবে তাদের মাথা ঢোকাবার পথ বন্ধ করে দিয়ে ইংরেজ-মালিক ও বণিক আপনাদের সুবিধা করে নিচ্ছে। তাছাড়া এদেশটা তাদের হাতে থাকবার ফলে তাদের দেশের

বণিক্‌সম্প্রদায় এদেশে কলকারখানা বসাবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে, অন্যান্য দেশগুলির পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখতে পাবে পাটকল, চায়ের বাগান, খনি, ষ্টীমার কোম্পানী, ইলেকট্রিক কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-মালিকেরা দিন দিনই এদেশের টাকায় ফেঁপে উঠছে। অন্যান্য দেশের বণিকসম্প্রদায় এদেশে এতটা সুবিধা কিছুতেই করে উঠতে পারবে না।

যে সমস্ত দেশে শিল্পের উন্নতি হয় নি, তারা কাঁচামালগুলিকে নিজেরা কাজে লাগাতে না পেরে সেগুলিকে দেশ বিদেশে রপ্তানি করে এবং তার পরিবর্ত্তে সে-সব দেশ থেকে তৈয়ারী মাল আমদানী করে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির এই কাঁচামাল ছাড়া কিছুতেই চল্‌তে পারে না। কি করে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়, সেদিকে তাদের সব সময় লক্ষ্য থাকে। সেজন্যও কতকগুলি অনুন্নত দেশকে নিজের হাতে নিয়ে আসা দরকার। শিল্পপ্রধান দেশগুলি তাই কি করে ঐ দেশগুলিকে অধিকার করে বসা যায়, তারই জন্য ওৎপেতে ব'সে থাকে। পরের দেশকে আপনাদের মুঠোর মধ্যে এনে তার ধনসম্পদ শোষণ করাই সাম্রাজ্যবাদীর অভিপ্রায়। কাঁচামাল কিনবার ও তৈয়েরী মাল বিক্রী করবার জন্য বাজারে লাগে কাড়াকাড়ি, আজকালকার যুদ্ধের কারণও তাই।

গত মহাযুদ্ধের কারণও ছিল তাই। মহাযুদ্ধের ফলাফল দেখে সে কথা বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। যুদ্ধের পর ভার্সাইতে যে সন্ধি হয়, তার ফলে জার্ম্মাণীর হাতে যতগুলি এই রকমের উপনিবেশ ছিল, সেগুলি তার কাছ-থেকে কেড়ে নিয়ে জয়ী মিত্র-রাজ্যগুলি (ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালী,জাপান) আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নেয়। কিন্তু এর অধিকাংশ ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীর ভাগেই গিয়েছে, ইটালী যা' আশা করেছিল তার প্রায় কিছুই পায়নি। তাই ইটালী আজ আরো কিছু আদায় করবার জন্য এবং জার্ম্মাণী তার হাতে উপনিবেশগুলি ফিরে পাবার জন্য গর্জ্জে গর্জ্জে মরছে। নূতন বাজার হস্তগত করবার জন্য ইতালী বর্ব্বর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন আবিসিনিয়াকে আপনার পদানত করে নিয়েছে, এরই জন্য আজ চীন-জাপান যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি দেখতে পাচ্ছি এবং একই কারণে ভাবী মহাযুদ্ধের কালোছায়া সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

একথা মনে রাখা দরকার যে এই যুদ্ধে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কিছুই স্বার্থ নেই, অল্প কয়েকজন মালিক ও ব্যবসায়ীর মুনাফার হার আরো বাড়াবার জন্য গরীবদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। যারা যুদ্ধ করে মরছে তারাও জানে না—কিসের জন্য এই যুদ্ধ। মালিকদের পক্ষে থেকে দেশ-প্রেমের প্রচার চালানো হয়, দেশের কল্যাণের মিথ্যা ধোকা দিয়ে তারা দেশবাসীকে উত্তেজিত করে তোলে। ফলে জনকয়েক ধনীর স্বার্থ রক্ষার জন্য দু'দলের গরীব প্রজারা পরস্পর হানাহানি করে মরে, যা'দের জন্য লড়াই, তাদের গায়ে আঁচরটুকুও লাগে না।

ধনিকসম্প্রদায়ের এই হিংস্র ষড়যন্ত্র হতে আত্মরক্ষা করতে হ'লে দুনিয়ার সমস্ত গরীবদের আজ একত্রিত হয়ে দাঁড়ানো দরকার, তাদের বুঝতে হবে, যে চাষ করে, মজুরী করে সারাদিন কাটায়, যে দেশেই বাড়ী হোক্ না কেন—তাদের দুর্দ্দশা প্রায় একই রকমের। সমস্ত দেশেই সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি তাদের শোষণ করেই আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিচ্ছে। পৃথিবীর এই শোষিত ও উৎপীড়িত দল যদি আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পারে, দেশ ও জাতির মিথ্যার ব্যবধান ভুলে গিয়ে একসঙ্গে দাঁড়াতে না পারে, তা' হ'লে ওই শক্তিশালী বণিকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় তাদের নেই।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির চাষী ও মজুরদের আন্দোলন ক্রমেই বেড়েই যাচ্ছে। তারা এখন সমাজের নূতন ব্যবস্থা করতে চায়, যেখানে অধিকাংশ লোক খেটে খেটে মরবে, আর অল্প কয়কজন তাদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে আপনারা বড় হয়ে উঠবে, এমন অত্যাচার চলতে পারবে না। আন্দোলনের গুরুত্ব দেখে পৃথিবীর ধনিক-শ্রেণী আজ চমকিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চাষী মজুরদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ধনিকদের আধিপত্য যখন টলটলায়মান হয়ে ওঠে, তখন সামরিক শক্তিকে হাতে

নিয়ে তারা শেষ মরণ-কামড় দেয়। ইতালী ও জার্ম্মাণীর আজ সেই দশা। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধা দেবার জন্য সেখানকার ধনিক-শ্রেণী ও তাদের অনুচরদল রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি আপনাদের একছত্র অধিকারে এনে ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একের পর এক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দেশ তাদের বেয়নেটের ভয়ে চুপ করে আছে, এতটুকু প্রতিবাদ করবার মত ভরসা কেউ পায় না। এই নীতি অবলম্বন করে চলেছে যারা—তাদের নাম ফ্যাসিস্ত। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে গ্রাস করবার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছে। নিজের দেশ ও পরের দেশের চাষী মজুরদের শোষণ করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অপর পক্ষে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাশিয়ার এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমস্ত চাষীদের ও শ্রমিকদের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করছে, এবং নিখিল-বিশ্বের নির্য্যাতিত শ্রমিক ও চাষীদের সম্মিলিত হবার জন্য এই যে মহা আহ্বান, তাতে তারা সাড়া না দিয়ে পারছে না। ফ্যাসিস্ত শাসকদল তাই দুরু দুরু বুকে আপনাদের দিন গুণছে। মরিয়া হয়ে তাই তারা আজ সবাই একযোগে শ্রমিক ও চাষীদের আন্দোলনকে গলাটিপে মেরে ফেলতে চাইছে, অদূর ভবিষ্যতে এর একটা শক্তি পরীক্ষাও হবে। আর চীন জাপানের যুদ্ধে, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে আমরা তারই সূচনা দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের নিজেদের দেশের দিকে একবার চোখ ফিরাও। এখানকার অবস্থা কি? ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বড় তফাৎ হচ্ছে এই যে, আমরা শিল্পের উৎপাদনের দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছি। আমাদের দেশ হচ্ছে প্রধানতঃ কৃষকের দেশ। এখানকার শতকরা ৭৫ জন লোকই কৃষিকার্য্য ক'রে সংসার চালায়। কৃষকদের সংখ্যা যদি এত বেশী হয়ে যায়, তবে দেশের অবস্থা ভাল বলা চলে না। তার কারণ, জমীর একটা বাঁধা-ধরা সীমা আছে; কৃষকদের সংখ্যা যদি ক্রমাগত বেড়ে চল্‌তে থাকে তা' হ'লে ভাগাভাগি করে তাদের প্রত্যেকের হাতে যে পরিমাণ জমি আসে, তা দিয়ে সংসার চালানো তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠে।

আজকালকার দিনে নূতন সভ্যতার প্রভাবে আমাদের অভাব ও প্রয়োজন বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। এটা কিন্তু কোন দোষের কথা নয়, কারণ এই প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের সমাজ ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌ছে। এককালে আমাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছিল, কিন্তু আজকের দিনে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে চলা অসম্ভব। সমস্ত সমাজটাকে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান, এরকম অদ্ভুত ধারণা যে কারু কারু নেই তা নয়, তাঁরা বলবেন যে,বর্ত্তমানে সমাজে এই যে অভাব ও অশান্তি তার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের এই বিলাসী সভ্যতা। আমাদের চাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলেই নাকি আমাদের এই দুর্দ্দশা, তাই আমরা যদি সুখ ও শান্তি চাই, তবে সেই সঙ্গে ফিরে যেতে হবে ডাল-ভাত, ধুতি-চাদর ও গরুর গাড়ীর যুগে। মানুষের ইতিহাসে যাদের পরিচয় আছে তারাই জানেন যে দিনের পর দিন মানুষের এই চাওয়ার ও পাওয়ার পরিমাণ যদি বেড়ে না চলত, তবে মানুষ কখনই পশুদের চেয়ে এতটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারত না।

মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা, সমাজের ভিতরকার অশান্তি ও অভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে কেন? আমাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বলে নয়, সমাজে কতক গুলি শোষণ ভাবাপন্ন লোক, বাকী লোকগুলির পরিশ্রমের ধন আপনারা আত্মসাৎ করে নেয় বলে, সমাজের যা সম্পদ তার যথাযোগ্য বণ্টন হচ্ছে না বলে।

দেশের অধিকাংশ লোক যদি কৃষিকেই একমাত্র অবলম্বন বলে আকড়ে ধরে, তাহলে এই উন্নতির যুগে সমাজের প্রয়োজন কিছুতেই মিটতে পারে না। আমাদের দেশে আগে এত বেশী লোক কৃষি নিয়ে আটকে পড়ে থাকতো না। আগেকার মত বড় বড় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি তখন ছিল না বটে; কিন্তু কুটির-শিল্প তখন যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। কুটির-শিল্প বলতে আমরা সেই শিল্পকে বুঝি, যা' নিজের ঘরে বসে নিজের টুকিটাকি যন্ত্রের সাহায্যে

নিজেই গড়ে তোলা যায়। প্রত্যেক দেশেই কলকারখানার উন্নতির আগে কুটির-শিল্পের যুগ গিয়েছে। আমাদের দেশেও তা ছিলো, আমাদের দেশের কুটির-শিল্প বা কাপড়-চোপড়ের কাজ, কাঁসার কাজ, পিতলের কাজ, সোনা রূপার কাজ, হাতীর দাতের কাজ, শঙ্খের কাজ, ঝিনুকের কাজ, মিনার কাজ, রেশমের কাজ, কাঠের কাজ এরূপ নানারকম শিল্পের কাজ করে দেশের প্রয়োজন মিটাত এবং দেশের লোকদের একটা প্রধান অংশ কৃষিকাজ না করেও আপনাদের জীবিকাসংগ্রহ করতে পারত। এককালে ভারতবর্ষ সূক্ষ্ম বস্ত্র-শিল্পের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেছিলো। সেই সমস্ত নিপুণ শিল্পীরা আজ গেল কোথায়? এই সমস্ত কুটির শিল্পীদের অতি সামান্য একটি অংশ তাঁতী, যুগী, কামার, কুমার, স্বর্ণকার ইত্যাদির মধ্যে এখনও তো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই লোপ পেয়ে গিয়েছে।

তারা লোপ পেয়ে গেল কেন? তার কারণ হচ্ছে এই যে আজকালকার দিনে যে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের প্রতিযোগিতায় এই কুটির-শিল্পগুলি কোনমতেই টিকে থাকতে পারে না। কলকারখানার চলতি হলে অনেক মাল অল্প সময়ের ভিতরে তৈরী করতে পারা যায়, কাজে কাজেই তাতে খরচা পড়ে অনেক কম। ইংল্যাণ্ড, জাপান জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশগুলি তাই অনেক সস্তায় আমাদের দেশে মাল রপ্তানী করছে। আমাদের দেশেও কলকারখানার চলন সুরু হয়েছে। আমাদের দেশের কুটির শিল্পীরা এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এমনভাবে বেশী দিন টক্কর দেওয়া চলে না, কাজে কাজেই একে একে তাদের পাত্তাড়ি গুটাতে হ'ল। সেই সমস্ত শিল্পীরা আজ গেল কোথায়? জীবিকা সংগ্রহের আর কোন পথ না পেয়ে, তাদের অবশেষে অগতির গতি কৃষিকর্ম্ম বা ক্ষেত মজুরের কাজে যোগ দিতে হয়েছে। একেইতো জমি বংশানুক্রমে এমনভাবে ভাগ হতে থাকে যে, প্রত্যেক চাষীর হাতে সে পরিমাণ জমি পড়ে, তা তার জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার উপরে এই কর্ম্মচ্যুত শিল্পীদলও ক্রমে এই জমিকেই ভরকরে বসলো। কাজেই চাষীদের অবস্থা যে কিরূপ শঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল তা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

তোমরা হয়তো বলতে পার,—কেন, আমাদের কি কলকারখানা নেই? জাম্‌সেদ্‌পুরের টাটার কারখানা, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের কাপড়ের মিল, বাংলাদেশের পাটকল, রেলওয়ে ও জাহাজে বহুসংখ্যক শ্রমিক তো কাজ পাচ্ছে, জমী ছাড়া বহু চাষী, কর্ম্মচ্যুত বহু শিল্পী আজকাল এই সমস্ত কলকারখানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। একথা অবশ্য ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা কত সামান্য।

কিন্তু শিল্পপ্রধান দেশসমূহে মজুরদের অবস্থা কি? আপনাদের গায়ের রক্ত জল করে তারা সমাজের সমস্ত রকম প্রয়োজন মিটাচ্ছে বটে, কিন্তু লাভটা যাচ্ছে সবই কারখানার মালিকদের হাতে। কেন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এর প্রতিবিধান কি, কি করে এই স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানো যেতে পারে সেকথা নিয়েও আলোচনা হয়ে গিয়েছে। মার্কস্ দেখিয়েছেন যে শ্রমিকদের সঙ্গে শুধু দর কষা-কষি করে বা আপোষ রফা করে এই অবিচারের প্রতিকার করা চলে না। প্রতিকার করতে হলে বিপ্লবের সাহায্যে সমস্ত সমাজের ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে হবে এবং এই বিপ্লবকে চালনা করবে শ্রমিক বা প্রলিটেরিয়েট্। রাষ্ট্রচালনার ক্ষমতা আজ সমস্ত কারখানার মালিক বা বুর্জ্জোয়াদের হাতে, এই ক্ষমতা প্রলিটেরিয়েটদের হাতে নিয়ে আস্‌তে হবে, তাতেই ঘুচবে তাদের দুর্গতি।

কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যাটা ঠিক এরকম নয়, তার দুটো কারণ, প্রথমতঃ ভারতবর্ষ বিদেশীর অধীন, দ্বিতীয়তঃ এদেশ এখনও শিল্প প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। স্বাধীন দেশে সে-দেশী বুর্জ্জোয়ারা অর্থাৎ কারখানার মালিকেরা দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে। আর আমাদের দেশী মালিকেরা সমস্ত কারখানার মালিক নয়, পাটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম, খনির কাজ, চা বাগানের কাজ, এই সমস্ত বড়

বড় শিল্পগুলি সবই প্রায় বিলাতী সাহেবদের হাতে। কাজেই দেশী ও বিদেশী দুই রকম বুর্জোয়াই এদেশে শোষণ চালায়।

একথা সবাই জানে যে—ইংরাজেরা এদেশে এসেছিল শুধু ব্যবসা-বাণিজেব সুবিধাব জন্য এবং এই লাভের আশাতেই তারা আমাদের বুকে চেপে বসে আছে। দেশী কারখানাগুলি উন্নতি লাভ করুক, বিলেতী কারখানার মালিকেরা একথা কখনই পছন্দ করতে পারে না। কারণ দেশী কারখানাগুলি যদি দেশের মধ্যে সস্তা দরে ভাল জিনিষ চালাতে পারে, তাহলে মালিকেরা দাঁড়ায় কোথা? আজ ইংল্যাণ্ডের যে এত সমৃদ্ধি, তা'তো আমাদের দেশে মাল বিক্রী করতে পারবার ফলেই। এমন সুন্দর বাজারটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায়, সেজন্য তারা জীবনপণ করে লড়বে। তাই দেশী কারখানার মালিকেরা যাতে কোন মতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তাদের হচ্ছে সেই চেষ্টা। কাজেই বিদেশীর অধীনতা পাশ থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে না পারি, আমাদের নিজেদের সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আমাদের দেশীয় শিল্পের প্রয়োজন অনুরূপ উন্নতি অসম্ভব। দেশীয় শিল্প যে বিদেশী সরকারের চাপে পড়ে বিস্তার লাভ করতে পারছে না, দেশীয় কারখানার মালিকেরা আজ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে, তাই তাদের মধ্যে অনেকে আজ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছে।

ভেবে দেখ, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থা কি। দুচারজন বড় বড় চাকুরী করে বা ব্যবসা বাণিজ্য করে সুখে আছে বটে, কিন্তু এদের অধিকাংশই আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় এসে ঠেকছে। চাকুরিই এদের প্রধান উপজীবিকা, কিন্তু সেই চাকুরি পাচ্ছে ক'জন? প্রতি দিনই ঘরে ঘরে বেকারের সমস্যা বেড়ে চলেছে, বি, এ, এম্, এ, পাশ করে বসে বসে যে যার ঘরের অন্ন ধ্বংশ করে চলেছে। কিন্তু উপায় কি? এর জন্য দায়ী কে? মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের কাছে এই প্রশ্ন তাই আজ এতবড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু গলদ নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য পরিশ্রম করতে থেকেও যুবকেরা আজ কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। পরিবার পালনে অক্ষম হয়ে কেউ কেউ বা আত্মহত্যার আশ্রয় নিচ্ছে। ঘরে ঘরেই অশান্তি, ঘরে ঘরেই দুর্গতি। এর প্রতিবিধান কি?

কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আবার বলছি। দিন-রাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যে শস্য তারা ফলায়, তারই উপরে আমাদের সকলের জীবন। অথচ তাদের ঘরে আজ দুমুঠো ভাত নেই, পরবার কাপড় নেই, রোগে চিকিৎসা নেই। আছে কি? আছে শুধু জমীদার ও মহাজনের লাঞ্ছনা, আছে একরাশ ঋণের বোঝা। বাংলা দেশের সমস্ত কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ · টাকা। আর তাদের বছরের মোট আয় ·· টাকা। ঋণ শোধ করবার কথা দূরে থাক, আজ কি খাবে সেই চিন্তাতেই তারা অস্থির। সমস্ত বছরের পরিশ্রমের ফলে যেটুকু তাদের হাতে আসে, তার অধিকাংশই যায় জমীদার ও মহাজনের খপ্পরে।

এই জমীদারদল সমাজের কোন কাজেই আসে না। প্রয়োজনহীন পরগাছার মত এরা সমাজের ভার বৃদ্ধি করছে মাত্র। এই সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকবার কোনই অধিকার নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস যারা পড়েছে তারাই জানে যে এরা বৃটিশ রাজ্যের হাতের মুষ্টি, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এবং আপনাদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্য বিদেশী শাসক এদের খাড়া করে তুলেছে। এরাও তাই সব সময় জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে এতটুকু না চেয়ে ইংরেজ প্রভুদের হুকুম তামিল করে চলে। এরাই ভারতে বৃটিশ রাজত্বের মস্তবড় অবলম্বন। জমীর মালিকী সত্ব আজ জমীদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে চাষীদের হাতে এনে দিতে হবে। কারণ জমী চাষ করে যে, জমীর সত্যিকার মালিক তো সেই।

ভারতের শ্রমিকদেরও দুঃখের অবধি নেই। দেশী ও বিদেশী দুই রকমের মালিকরাই এদের উপর যথেষ্ট শোষণ চালাচ্ছে। মার্কস্ বলেছেন যে যুগ-সঞ্চিত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই প্রলিটেরিয়েট্রাই বিপ্লবের জয়-ধ্বজা উড়াবে। শোষিত ভারতের বুকে বিপ্লব আনবে যারা

তারা আজ কোথায়?—কারখানায়, খনি-গর্ভে, চা বাগানে এরা আজ ধুকে মরছে। কিন্তু ভারতের প্রলিটেরিয়েট্‌দের যা সংখ্যা বা যা তাদের শক্তি, তাতে বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের পক্ষে একলা বিপ্লবের সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কাজেই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক প্রভৃতি বিভিন্ন বিপ্লবী শক্তিগুলিকে আজ একই পতাকা তলে এসে সমবেত হতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে বিদেশীর হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা চাই। রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা হাতে না এলে সমাজব্যবস্থাকে উল্‌টানো সম্ভবপর নয়। কাজেই স্বাধীনতাকামী যতগুলি শক্তি আছে, শ্রমিক ও চাষীরা তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক যারা, শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য।

—শেষ—

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত

কুমারী বিনীতা সেনগুপ্তা

জাগরে তোরা,
ধরায় যত অনাথ মানব
ক্ষুধায় কাতর বন্দীরা সব
সুপ্তি ভেঙ্গে ওঠ।

জীর্ণ প্রাণের ভাঙরে আগল
অম্বরতলে নাচ্‌বে পাগল
ন্যায়পরতার কলস্বরে
বাঁধ্‌রে তোরা মঠ।

অতীত কালের স্রোতে
কে তোরে আর বাঁধ্‌বে রে বল্‌
জীবন চলার পথে?

সেই অন্ধ অন্তঃপুরে
ফেলবে না কেউ ছুঁড়ে
রইবি বাহির দুয়ার 'পরে
পরাণখানি ভরে।

বিশ্ব আবার নতুন ভিটির ক্রোড়ে
জনম নেবে কেড়ে,
হারিয়ে ফেলা সব কিছু
তোরাই পাবি, এর পিছু
জয়পতাকা শিরে।

শিশিরের মত ফেলে দে ঝেড়ে
কঠিন শৃঙ্খলেরে,
ছিলি যখন ঘুমের কোলে
ঘির্‌লো তারা কতই ছলে
তোদের চারিধারে।

তবে রে বন্ধু যেথায় থাকিস
আয়রে ত্বরা,
আবার তোরা মিলন তরে।

মানবজাতি লভিবে খ্যাতি
আন্তর্জাতিক সেনানী পরে,
বিজয়-শঙ্খ উঠিবে ধ্বনিয়া
মুক্তির লাগি শেষ সমরে।

নোংরা পা

দেবাংশু সেনগুপ্ত

(গল্প)

রোব্‌বার দিন বেলা প্রায় চারটে বাজে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ছায়া ঢাকা বারান্দাটাতে পা দিতেই প্রণব একটা বাধা পেলো।

"আপনিই প্রণব বাবু?"

প্রখর আলোর থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে প্রায় কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিলো না, তাই অনিশ্চিতের স্বরে জবাব দিলো—"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"একটু বিশেষ দরকার ছিলো"।

ততক্ষণ চোখটা বেশ পরিষ্কার হোয়ে এসেছে। প্রণব দেখলো তার সামনে শতছিন্ন ময়লা কাপড় পরা আধ-বয়সী একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

"আসুন এদিকে"। সাইকেলটাকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রেখে দুজনে গিয়ে পেছন দিককার সিঁড়িটাতে বোস্‌লো।

ভদ্রলোক আরম্ভ কোরলেন। তখনকার দিনের এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি গ্যাঞ্জেস্ হোসিয়ারী মিল নামে একটা মিলে প্রায় চৌদ্দবছর ধোরে কাজ কোর্চ্ছেন। মিলটা গেঞ্জীর কল। আজ প্রায় বছর কুড়ি যাবৎ উচ্চ হারে লভ্যাংশ বিতরণ করা সত্ত্বেও কর্ম্মচারীদের মাইনের হার নিতান্তই শোচনীয়। ইতিমধ্যে জাপানী প্রতিযোগিতার ফল-স্বরূপ মিলের অবস্থা কিছুদিন হোল একটু খারাপ হোয়ে পড়েছে। প্রথম ত মিল-মালিকরা সব কর্ম্মচারীদের মাইনে কমিয়ে দিয়েই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন সেই কমানো মাইনেও তারা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখবেন বোলে নোটীশ দিয়েছেন। মাইনে বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও যারা কাজ কোরে যাবে, মিলের অবস্থা একটু ফিরলেই তাদেরকে বকেয়া মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, যারা চলে যাবে, ইতিমধ্যে একমাসের বাকী-পড়া মাইনে তারা পাবেই না। গরীব মানুষরা, যারা নাকি দিন আনে দিন খায় তাদের এক মাসের টাকাও না পেলে যে কি দুর্দ্দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়। মজুরেরা নিজেরা এ বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা কোরেও কোন পথ ঠিক কোরতে পারেনি, খিদিরপুর ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের কাছে তার নাম শুনে গ্যাঞ্জেস্ মিলের সমস্ত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ভদ্রলোক এই বিষয়েই প্রণবকে জানাতে এসেচেন। গ্যাঞ্জেস্ মিলের শ্রমিকরা নাকি আরও শুনেছে যে প্রণবের সাহায্যে আরও অনেক কলের মজুররা নিজেদের পাওনা আদায় করে নিতে সক্ষম হোয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যদি প্রণব একটু দয়া করে সাহায্য করে, ইত্যাদি।

প্রণব বেশ আগ্রহের সঙ্গেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং অত কোন কথার বোধহয় দরকারই ছিল না। দুঃখের কথা শুনতে শুনতে মন তার বেদনা-ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেছিল, তাই সেদিন রাত্রেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অল্প কথাতেই তাকে বিদায় কোরলো। পাঁচটা বোধহয় বাজে, কিছুক্ষণ আগে লাইব্রেরী বন্ধ হবার সঙ্কেত-ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল, ভেতরে গিয়ে দেখে তখন দরজা বন্ধ করা হচ্ছে, কিন্তু পড়ার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আশাভঙ্গ-জনিত বিষণ্ণতার লক্ষণ তার মুখে কিছু দেখা গেল না। যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সে পথ দিয়ে বেরিয়েই বড় রাস্তায় পড়ে হ্যারিসন রোডের দিকে রওনা হোল।

প্রণবের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। অখ্যাত-অজ্ঞাত নিতান্ত গরীব ঘরের আর দশ জন ছেলেদের মতো সেও একজন। পূর্ব্ব-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে তার বাড়ী। অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষায় ভালো করতে পারলো না, কারণ অতি আবশ্যকীয় ক'খানা বই-ই সে যোগার করতে পারে নি। যার কাছেই হাত পাততো, দেখতো গরীব লোককে

সাহায্য কোরতে সকলেরই উৎসাহের অভাব। স্কুলে ফ্রি-সিপ পেয়ে অতি কষ্টে ম্যাট্রিকের ফী জোগার কোরে পরীক্ষায় পাশ করে এলো কোলকাতায়। আশা, যদি ছোট-খাট একটা চাকরি বাকরী কিছু জুটে যায়।

বাবার চিঠি নিয়ে প্রথমে এসে যাদের বাড়ী উঠেছিল তাদের ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন অতিষ্ঠ হোয়ে পড়লো যে, তাকে পথেই বেরিয়ে পড়তে হোল শেষ পর্যান্ত। ইতিমধ্যে তারই সমান অবস্থার কয়েকটী বন্ধু জুটেছিল যথাক্রমে। একজন তাকে দিল আশ্রয়, অপর জন সামান্য মাইনেতে খিদিরপুর ডকের কুলী-সর্দ্দারের একটা চাকরী পাইয়ে দিল। প্রথম বন্ধুটী হ্যারিসন রোডের ওপর একটী মনোহারী জিনিষের দোকানে কাজ করতো, সে দোকানের মালিককে না জানিয়ে আলমারীগুলির পেছনেই তার জন্য একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিল। রাস্তার কলে চান করে আর পাইস-হোটেলে খেয়ে কোন রকমে দিন কাটছিলো। বাবা চিররুগ্ন, আসবার সময় তিনি হৃদয়াবেগ গোপন রেখে ওর সাফল্য কামনা কোরে শুধু নিরব আশীর্ব্বাদই জানিয়েছিলেন। মা তার চোখের জলের সঙ্গে তাঁর শেষ সম্বল সামান্য একটী গয়না বিক্রী কোরে নগদ কয়েকটী টাকা হাতে দিয়ে দিলেন। সেই টাকারই উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে অনেক পুরোনো একটা সাইকেল কিনে সে যথারীতি "অফিস" সুরু করলো।

এখানেই সে প্রথম শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসে। সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দারিদ্র্যের দুঃখ বুঝতে শিখেছিল, সুতরাং অন্যান্য কুলী-সর্দ্দারের মতো গরীব কুলীদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে অভ্যস্ত হোতে পারলো না, বরং এরকম কোন অবিচার দেখলে তার মুখ থেকে স্বতঃই প্রতিবাদের ভাষা বেরিয়ে আসতো। ক্রমশঃ শ্রমিকরা তাকে হিতৈষী বলে বুঝ্‌তে পারলো এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথাও তারই কাছে জানাতে লাগলো। কখন যে এদেরই কাজে সে নিজকে ভুললো সে নিজেও তা জানলো না, মোট ফল স্বরূপ একদিন সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে চাকরিটী হারালো।

ইতিমধ্যে বাইরের অনেক বিষয়ে তার চোখ খুলেছিল। এ চাকরি যাবার পরে সে অর্ডার সাপ্লাইং ব্যবসা ধরলো এবং স্বাধীন হওয়ায় এসব আন্দোলন পরিচালনা করা তার পক্ষে আরও সোজা হোল। অনেকের অনেক রকম উচ্চাকাঙ্খা থাকে, প্রণবের উচ্চাকাঙ্খা ছিল পড়বার, বিশেষতঃ কলেজে পড়বার; কিন্তু বাড়ীতে টাকা পাঠিয়ে এতবড় ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। ম্যাট্রিকে তেমন কিছুতো আর ভাল করতে পারেনি অথচ তেমন কারুর সঙ্গে চেনাশুনাও নেই যে "ফ্রি শিপ" জোগার করবে, এদিকে টুশানিও জোটে না। দিনে কলেজে যাওয়া ছেলেদের গতিবিধি সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতো, রাত্রে স্বপ্নে দেখতো যে কলেজে পড়ছে, যখনি সময় পেত ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতো, মনকে বোঝাতো যে শুধু একটা ডিগ্রীর মোহ ত? কিন্তু মন মানতো না।

তার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানতো যে প্রণবকে রবিবার দিন দুপুর বেলা ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। গ্যাঞ্জেস্ মিলের ভদ্রলোকও সে খোঁজ পেয়েই এসেছিলেন।

অল্পদিন যাবৎ কোলকাতায় এলেও গ্যাঞ্জেস্ মিল কিন্তু ওর অজানা নয়। ও এসেই যে জ্ঞাতি কাকার বাড়ীতে উঠেছিল তিনিই তার ম্যানেজার। প্রণব পৃথিবীটাকে ঠিক তখনও চিনে উঠতে পারেনি। উৎসাহের আবেগে ওর নিজের প্রতি যে অত্যাচার হোয়েছিল সে কথা ভুললো। সরল মনে ভাবলো যে চরম পন্থা অবলম্বন কোরবার আগে একবার ম্যানেজার মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে দেখলে হয়। দেখি তিনি কি বলেন। তেমন ভাবে বলতে পারলে কাজ হবে না কি?

হরিহর বাবুর স্ত্রী এবং মেয়ে বাইরের ঘরেই ছিলেন। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় প্রণব গিয়ে উপস্থিত হোল। হরিহর বাবুর স্ত্রীর মুখে স্পষ্টতঃ অসন্তোষের ছায়াপাত হওয়া সত্ত্বেও সে দমলো না, মনে মনে ভাবলো নিজের জন্যে ত আর আসিনি।

কাকা কোথায়, এই প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে

এলো যে তিনি বিশ্রামে ব্যস্ত আছেন, যা বলবার তা তাঁকেই বলা যেতে পাবে।

প্রণব অত্যন্ত বিনীত ভাবে জানালো যে বিষয়টা তাব নিজের নয় মিল-সংক্রান্ত কোন ব্যাপাব।

মিল কথাটা শোনা মাত্রেই কাকীমা যেন জলে উঠ্‌লেন। মিল-মজুব নামধাবী কতকগুলি ঘৃণিত জীব যে তাদেব পাওনা টাকা চাওয়াব মতো গুরুতর অন্যায় আবদার কোবে হরিহব বাবুব অশান্তি সৃষ্টি কোবেছে তা তিনি স্বয়ং স্বামীব মুখ থেকে শুনেছিলেন, আবও জানি কোত্থেকে শুনেছিলেন যে, প্রণব আজকাল সব জায়গাতেই মজুবদের ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা কবে।

"ও। এসব গণ্ডগোলের গোড়াতেও তুমিই বয়েছ, তাই ভাবি, এসব অসভ্যগুলিব মাথায় বুদ্ধি জোগায় কে? তা আর হবে না, যেমন ইতর নোংরা নিজে তেমন ইতব নোংবা লোকেব সঙ্গেই তো মিশবে। দেখেছিস্ লীলা। দেখেছিস্ কি নোংবা গতব, কি নোংবা জামা-কাপড়, দেখ্ একবার পা দু'খানা—এই নোংরা পা নিয়ে ভদ্রলোকের বাসায় আসতে একটু লজ্জাও হোল না?"

লীলা তার মায়ের ব্যবহারে বিশেষ লজ্জিত হচ্ছিলো, সে মাথা ওঠাল না। প্রণবের অপরাধ যে স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন জুতো কিনবার ক্ষমতা তার নেই, সুতরাং বাস্তায় বেশী ঘুবাঘুরি কোরলেই পা নোংবা হওয়া স্বাভাবিক, কাপড চোপডও যে খুব ময়লা ছিল তা ঠিক নয়। ধোপ-দুবস্ত কাপড়ের অভাবে নিজের হাতে কাঁচা কাপডই সে পড়তো। এ বাড়ীতে থাকবাব সময় এ ধরণের কথা হাজাব বারও সে শুনেছে, আজ সে তাব শ্রমিকদের হোয়ে বোলতে এসেছিল, কেন জানিনা "নোংরামীর" অভিযোগ আজকে তাকে মর্ম্মবিদ্ধ কবলো। সে আবার নতুন কোরে বুঝলো যে গরীবের অসমর্থতা বড়লোকেব চোখে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সমান চালে চলবার ক্ষমতা না থাকলে ঘনিষ্ট আত্মীয়তাও নেহাৎ অর্থহীন হোয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ সে আত্মীয়তার দাবী নিয়ে আসেনি, এসেছে সে যা কর্ত্তব্য মনে করে তারই তাগিদ নিয়ে, সুতরাং এত কটুক্তির পরও অটল রইলো।

প্রণবকে নেহাৎ নাছোড়বান্দা দেখে কাকীমা উঠে ভেতরদিকে গেলেন। লীলা এতক্ষণ পরে মুখ উঠিয়ে প্রণবকে বসতে বললো। লীলা এম, এ পড়ে, প্রণবের থেকে বছোর পাঁচ ছয়ের বড়ো। লীলার ভাইবোন আর কিছু ছিল না, মনটাও ছিল তার বাপ মায়ের তুলনায় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। কোলকাতায় প্রথম এসে প্রণব সহানুভূতি যা কিছু তা লীলার কাছ থেকেই পেত, যে কদিন ও' এ বাড়ীতে ছিলো সে কদিনের ভেতরই দুজনেব মধ্যে একটা স্নেহ-মমতাব বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তার মায়েব ব্যবহাবের ফল স্বরূপ ঘরের আবহাওয়াটা লীলার কাছে রীতিমত তিক্ত মনে হচ্ছিল, তাই সে প্রণবের সঙ্গে আব কিছু কথাই বলতে পারলো না। প্রণব লীলার মনের এই ভাব ঠিক না-বুঝতে পেরে তার কথা না বলার জন্য দুঃখিত হোল।

ইতিমধ্যে চাকর এসে জানাল যে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। প্রণব জিজ্ঞেস কোরলো যে, সে অন্য আব কোন সময় আসতে পারে, চাকর আবাব ঘুবে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে অন্য আব কোন সময়ও দেখা হবে না। প্রণব মনে মনে ভাবলো "বোধ হয় নোংবা তার জন্য।"

লীলাব দিকে চেয়ে দেখে সে তখনও তেমনি অন্য মনস্ক ভাবেই বসে আছে, প্রণব বাইরে বেরোবার সময় মনে মনে ভাবলো, তবে কি লীলাদিও আজকাল আমাকে ঘৃণা কবে?

কিন্তু এসব কথা চিন্তা কবার সময় তখন নয়, সে সোজা মিল বস্তীর দিকে রওনা হোল।

প্রণবের প্রথম দরকার দুপুর বেলার সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা। নামটা আগেই জেনে নিয়েছিলো। দেখলো যে মতিবাবু মিল অঞ্চলে বিশেষ পরিচিতই। একটা লাইট-পোষ্টের কাছে খোলার ঘরের দাওয়ায় তাঁর দেখা মিললো। আরও কয়েকজন নেতা-শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিলো। যথারীতিতে পরিচিত হওয়ার পর অবিলম্বে পরামর্শ সভা বোসলো। মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী থেকে আরম্ভ কোরে কী উদ্দেশ্য নিয়ে

সে একবার হরিহর বাবুর সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছিল এবং তার ফলাফলই বা কি হ'ল সে-সব কথা সে বিশদ-ভাবেই সেই সভাতে বিবৃত কোরলো। বড়লোকেরা হয় বোঝে টাকার জোর, না হয় বোঝে গায়ের জোর, কিন্তু মজুরদের এর দুটোর একটাও প্রয়োগ করবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং একটা তৃতীয় পন্থা ধরতে হবে। বড়-লোকদের টাকার জন্য বড় মমতা। যখন এই গ্যাঞ্জেস্ মিলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নিজেদের মধ্যে গত যুদ্ধের সময় উচ্চহারে লভ্যাংশ বণ্টন কোরে নিয়েছে তখন তারা এই শ্রমিকদের কি সুযোগ সুবিধেটা দিয়েছিলো ?

পুরানো যারা শ্রমিক ছিল তারা সমস্বরে জানালো যে কিছুই দেয়নি।

কিন্তু আজকে যখন জাপানী প্রতিযোগিতায় মাত্র কয়েকমাস যাবৎ লোকসান হচ্ছে, তখন এরা ভুলে গেছে যে সেই মহাযুদ্ধের সময়কার মোটা মুনাফার কথা, ভুলেছে যে সেই লাভের একটু উচ্ছিষ্ট কণিকাও এই শ্রমিকদের তারা দেয়নি, আজ তারা নিজেদের লাভের কড়ি বজায় রাখবার জন্য অসহায়, অশিক্ষিত শ্রমিকদের ওপরেই চালিয়েছে জুলুম, এটা ঠিক কোন্ হিসেব অনুসারে করা হচ্ছে তা জানবার অধিকার নিশ্চয়ই এই শ্রমিকদের আছে।

এই ধনিকদলের পোষা অর্থনীতিবিদ্‌রাই বলে থাকেন যে ধনীরা যখন তাদের মূলধন খাটায়, তার লভ্যাংশ যেমন তাদের প্রাপ্য, লোকসান হ'লে সেটাও তাদের হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা কি দেখতে পাই ? লোকসানের বেলা সেটা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শুধু লাভের সময়ই তারা এগিয়ে আসে না কি ?

আগে একবার বলেছি যে বড়লোকদের টাকার ওপর বড় মমতা, সামান্য কিছুদিনের জন্য সামান্য টাকা লোকসান হওয়ার ভয়ে শ্রমিকদেরকে তাদের দৈনন্দিন আহার থেকে বঞ্চিত কোরতেও তারা কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু আমরা যদি একমন আর একপ্রাণ হোয়ে আজকে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যে এই বঞ্চনা কোরবার প্রয়াসে তারা নিজেরাই বঞ্চিত হচ্ছে বলে বুঝতে পারে, তা'হলেই আবার আমাদের পূর্ব্বাবস্থা অন্ততঃ ফিরে আসবে। অত্যন্ত স্পষ্ট আর পরিষ্কার ভাষাতে এই কথাগুলিই সমবেত সকলকে বুঝিয়ে দিল এবং ঠিক হোল যে রাত সাড়ে বারোটার মধ্যে সকল শ্রমিককে ডেকে তারপরই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন।

হ্যাজাক্ লণ্ঠন যোগাড় করে রাত বারটার সময় মস্ত এক সভার অধিবেশন হোল। সকলেরই রুটী নিয়ে টান পড়েছে সুতরাং কেউ গড-হাজির আছে বোলে মনে হোল না। চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত আর গভীর হতাশার চাহনি, ওদের দুঃখ প্রণব অন্তরের সঙ্গে বুঝছিলো। ওর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে কেউ মনেই কোরতে পারলো না যে সে এই মিলের বাইরের কেউ অথবা এই বঞ্চিতদেরই একজন নয়। পরামর্শ সভায় সে যা বলেছিলো তাই সে বললো আরও বিশদ ভাবে, সরল ভাবে এবং আরও জোরালো ভাষায়, সাধারণ মজুরদের বোঝাবার জন্য। মালিকদের ক্ষমতা টাকার ক্ষমতা, মজুদের তা নেই, কিন্তু মজুর ছাড়া তাদের মিল চলতে পারে না। মজুরদের ভেতর একতার অভাব, তাই কিছু করবে মনে কোরলেও কোরতে পারে না।

মজুরদের প্রথম কাজ হবে একতাবদ্ধ হওয়া, এবং এই একতা আনতে হ'লে দরকার ইউনিয়ন সংগঠনের। ট্রেড্ ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রণব তাদের বুঝিয়ে দিলো। প্রণব ষ্ট্রাইক সম্বন্ধেও আলোচনা করলো, সে আবার বললো যে মালিকরা তাদের লাভের লোভেই মাইনে সম্বন্ধে গণ্ডগোল বাধায়, কিন্তু যখন দেখে যে ধর্ম্মঘটের ফলে উল্টো লোকসান হ'তে আরম্ভ করে তখনই তাদের চেতনা হয়। এই লাভ লোকসান খতিয়েই মজুরদের অভিযোগে তারা কর্ণপাত করে, দয়াপরবশ হোয়ে নয়।

চারদিকে রব উঠলো অবিলম্বে ষ্ট্রাইক করো। কেউ কেউ আবার ষ্ট্রাইকের ফলাফল সম্বন্ধে ভীত হোল। শেষে ঠিক হোল যে ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী কোরে নিয়ে মালিকদের ইউনিয়নের তরফ থেকে একখানা শেষ চিঠি দেওয়া হোক্, এবং এর ফলাফল দেখে তবে ষ্ট্রাইক।

শেষ চিঠির ফলাফল যে কি হবে প্রণব আগেই তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু চরমপন্থা অবলম্বন কোরবার আগে অন্য সব উপায়গুলি পবখ করা দরকার, নয়ত ষ্ট্রাইক সফল না হোলে দোষটা পড়বে প্রণবের ওপর।

ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রি ইত্যাদি হোতে তিন দিন আরও সময় লাগলো। তাবপর তাদের দাবীদাওয়া জানিয়ে শেষ চিঠি একখানা পিয়ন-বইয়ে কোরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল স্বয়ং ম্যানেজাবের কাছে। ইউনিয়ন গঠিত হোয়েছে শুনে ম্যানেজার মহাশয় পূর্ব্ব থেকেই যারপরনাই বিবক্ত হয়েছিলেন। চিঠি পাঠানোর ধৃষ্টতায় ক্রোধান্ধ হোয়ে চিঠি না রেখেই পত্রবাহক ছেলেটিকে তিনি একবকম গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিলেন।

তখন আব উপায়ন্তব নাই, ষ্ট্রাইক সুরু হোল। হরিহব বাবু ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে ধর্ম্মঘটের গতি-বিধি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, ভাবলেন যে নিজেদেব মুর্খতা ওরা খুব শিগ্‌গীব বুঝবে, ততদিন নিজেরা না হয় একটু ছুটী ভোগ কবি। প্রণববা কিন্তু বেশী দিনেব জন্যই প্রস্তুত ছিলো। সাতদিনেও যখন ষ্ট্রাইক ভাঙ্গলো না, মিল-মালিকরা তখন চিন্তিত হোলেন। হবিহব বাবু ষ্ট্রাইক কোরবার কুফল বুঝিয়ে লম্বা এক নোটীশ জারী কোরলেন, প্রণবকে বিভীষিকাবাদী দলের লোক বলে প্রচার কোবে ধর্ম্মঘটকাবীদের পুলিশেব ভয় দেখাতে লাগলেন। ধর্ম্মঘটিবা কিন্তু এতে দমলো না, তাবা জানালো যে প্রণব খুব খারাপ বকমের লোক হোলেও তাদের কিছুমাত্র এসে যায় না, শুধু তাদেব প্রাপ্যটা চুকিয়ে দিলেই আবাব তাবা কাজে যোগ দেবে, নচেৎ নয়।

এমনি কোরে কাটলো আরও সাতটী দিন। প্রবল আক্রোশেব বশবর্ত্তী হোয়ে হরিহব বাবু সব মজুরকেই একসঙ্গে বরখাস্ত কোরলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর কাছে একটীও শ্রমিক ক্ষমা প্রার্থনা কোরতে এলো না। এবার তিনি অন্য পন্থা ধরলেন।

লেবার কন্ট্রাক্টার দিয়ে দূরের এক মিল-অঞ্চল থেকে নতুন শ্রমিক এনে কাজে নিযুক্ত কোরতে সুরু কোরলেন। একদিকে প্রবল জেদ, অপরদিকে নিদারুণ দুর্দ্দশা আর মরিয়া হওয়া ভাব, তৃতীয় সপ্তাহের পরে এ দুয়ের সংঘর্ষে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হোল।

নতুন কোরে যারা কাজে যোগ দেবে তাদেরকে বকেয়া মাইনে না দিলেও চলতি মাসে মাইনে ঠিক দেওয়া হবে বলে একটা বিজ্ঞপ্তী দেওয়াতে গরীব শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে বিচলিত হোল, এদিকে অন্য কোন জায়গা থেকে শ্রমিক এসে যাতে কাজে যোগ না দেয় তার জন্য পিকেটীং দরকার। অবিলম্বে পিকেটিং কোরবার জন্য প্রণব স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী গঠন করলো।

পিকেটিংয়ে আশাপ্রদ ফল হওয়াতে হরিহর বাবু এর প্রতিহিংসা নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলেন। প্রণবই মজুরদেব সব আশাভরসা মনে কোরে তাঁর সমস্ত রাগটা পড়লো প্রণবেরই ওপর, তাকে শায়েস্তা কোরবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হোল।

গ্যাঞ্জেস্ মিলটি উল্টাডাঙ্গাব একটা নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। সেদিন সমস্ত দিনই লরী বোঝাই হোয়ে দলে দলে নতুন শ্রমিক আসচে। হরিহর বাবুর বোধহয় ঝোঁক চেপেছিল যে, বাত হোক আব যাই হোক তিনি যেমন করে পাবেন মিল চালাবেনই চালাবেন, সুতবাং সন্ধ্যের অন্ধকারের পরও প্রণব ও তার ভলাণ্টিয়ার দলকে পিকেটিং কোবতে হোয়েছিল। নতুন শ্রমিকদের মিলে ঢুকবাব নানারকম প্রয়াস ও প্রণবদের অনুনয় বিনয়ের সাহায্যে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া, অন্যান্য দিনেব মত আজকেও এসব বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলেছিল। হঠাৎ যে কোনদিক দিয়ে কি হোয়ে গেল তা সকলে বুঝবার আগেই প্রণব ও তাদেব দলের অধিকাংশই অপর-পক্ষের অবিবাম লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হোল। যাবা মেবেছিলো নিশ্চয়ই তারা প্রণবকে নেতা বলে চিনতো, সে সবচেয়ে গুরুতর রকম আহত হোল। প্রণব পড়ে যাবার পরেই সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই গুণ্ডার দল যে কোথায় উধাও হোল কেউ তা জানলো না। খবরটা দেখতে দেখ্‌তে সমস্ত মিল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াতে চার-দিকে একটা প্রবল উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মতিবাবু সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কোরে প্রথমে

প্রণবের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ কোরলেন। মতিবাবুও নিজে আহত হোয়েছিলেন, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়।

ডাক্তার এসে প্রণবকে দেখলো মতিবাবুর বাড়ীতে। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা ক'রে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে উপদেশ দিলেন। প্রাণের আশা নেই বুঝতে পেরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে পুলিশেও খবর দিয়ে দিলেন।

প্রণব আর বাঁচবে না এ কথা হরিহর বাবুর কানেও যথাসময়ে পৌঁছুল। তিনি অনুতপ্ত হোয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি, বোধহয় একেবারে খুন করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। পুলিশী তদারকের কথা শুনে অন্যান্য কাপুরুষের ন্যায় তিনিও অত্যন্ত ভীত হোলেন। ষ্ট্রাইক আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাঁর স্ত্রীও প্রণবের মুণ্ডপাত না কোরে কোনদিন অন্ন-গ্রহণ কোরতেন না, এ সংবাদের পর অবশ্য তিনি থামলেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা যে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে পরামর্শ কোরে লীলাকে পাঠালেন অনুনয় বিনয় কোরে মতিবাবুর বাড়ী থেকে প্রণবকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্য, কারণ মৃত্যুকালীন জবানবন্দীটা নিজেদের অনুকূলে হওয়া দরকার।

লীলার মন সত্যিই কাঁদছিল কিন্তু প্রণব তার নোংরা পা'র কথা ভুলতে পারেনি। তাই সে এলো না। সে তার লীলাদির কাছে প্রতিশ্রুত হোল যে ধর্ম্মঘটকারীদের দাবী মেনে নিলেই সে সকলকে সর্ব্বান্তকরণে ক্ষমা কোরবে, ব্যক্তিগত অভিযোগ তার কিছু নেই।

কখন যে সে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিল প্রণব তা টের পায়নি। জ্ঞান হোয়ে দেখে যে সে হাসপাতালে। সাদা পোষাক পরা বৃদ্ধ এক সাহেব ডাক্তার তার সম্বন্ধেই যেন কি আলোচনা কোরছেন, প্রণব লক্ষ্য কোরলো সাহেবের বুকে টক্‌টকে লাল একটা গোলাপ ফুল। নার্স এসে তার উত্তাপ নিলেন। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের সু-অভিজ্ঞা বৃদ্ধা নার্স, বয়স এবং সজাগ কর্ম্মব্যস্ততার নিদর্শনস্বরূপ মুখে অসংখ্য রেখাপাত হোয়েছে, প্রণব তাঁর আন্তরিক দয়ায় চমকৃত হোল, মুগ্ধ হোল। মনে পড়লো তার মায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে বাবা আর অন্য সকলের কথা। তাঁরা সকলে বড় আশা করেছিলেন, প্রণব মানুষ হোয়ে তাঁদের সব দুঃখ দূর কোরবে, মনে মনে সকলের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা কোরে নিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

নার্স আর চাপরাশীদের ফাঁকি দিয়ে মতিবাবু কি রকম কোরে যেন অসময়েই হাসপাতালের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। গভীর আনন্দের সঙ্গে তিনি জানালেন যে মালিকেরা তাদের সমস্ত দাবীই মেনে নিয়েছে। জবাব দিতে গিয়ে প্রণব দেখে যে তার বাকশক্তি ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে, নিজের আনন্দ জানাবার জন্য মতিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু একটু হাসতে পারলো।

তখন শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না, তারা মনে কোরতো যে এসব স্বদেশী শিল্প ধ্বংস কোরবার জন্য দুষ্ট লোকের কারসাজী; সুতরাং প্রণবের এই মৃত্যুতে কোনরকম হৈ চৈ হোল না। সামান্য মিল-শ্রমিকরা যখন তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেল তখন কারো মনে বিশেষ কোন কৌতূহল জাগার কথা নয়, কিন্তু কেউ যদি একটু লক্ষ্য করতো তো দেখতে পেত যে প্রণবের মুখে তখন একটী স্মিত হাসির রেখা।

প্রণব কি শেষ পর্য্যন্ত তার নোংরা পায়ের দুঃখ ভুলেছিল?

মার্কসীয় বস্তুবাদ

রাখালচন্দ্র দাস

মার্কস ছিলেন বস্তুবাদী। তিনি জড়বাদী ছিলেন না কোনদিন। অথচ অনেকেই বস্তুবাদী মার্কসকে জড়বাদী বলে গাল দেন। এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হ'তে পারে না। মার্কস বরং জড়বাদ দর্শনের চির-বিরোধিতাই করেছেন। মার্কসের মতে এ দুনিয়ার কিছুই জড় বা অচল নয়। সাধারণ চোখে অজীব পদার্থের গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায় না বলে অজীব পদার্থকে জড় বলে মনে করে নেয়। সজীব পদার্থের সক্রিয় অবস্থা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। ফলে এই ক্রিয়াশীলতা যে পদার্থের গুণে নয় এ সিদ্ধান্ত তারা সহজেই করে বসে। তখন এক অপার্থিব শক্তিকে নিয়ে এসে, পদার্থের পরিচালক হিসাবে বসিয়ে তাকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলে পূজা করে। মার্কস বলেন, অজীব ও সজীব পদার্থের ভিতরে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। অজীব থেকেই সজীবের উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং জীবনের পরিচয়ে বিস্ময় প্রকাশের কোনই কারণ নেই। জীবন পদার্থের একটা বিশেষ ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রত্যেক পদার্থই ক্রিয়াশীল। অজীব পদার্থে যে জড়ত্বের আরোপ করি তা আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে একটী অতি ক্ষুদ্র ধূলি-কণার শক্তিও আমাদের বিস্ময় উৎপাদনের কারণ হ'তে পারে।

পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গতিশীল কণার সমষ্টিই বিশ্বজগৎ। এই গতিশীলতার ফলেই বিশ্বজগতে এত বিভিন্ন রূপ, রস ও গন্ধের সমাবেশ। কিছুই স্থির বা স্থায়ী নয়। ফুল ফোটে ফুল ঝরে যায়, আবার নূতন করে কুঁড়ি ধরে, কিন্তু শেষে একদিন সমস্ত পুষ্পবৃন্তই শুকিয়ে যায়। এই শুষ্ক পুষ্পবৃন্ত সেদিন আর সজীব নয়, কতগুলি অজীব পদার্থ-কণাসমষ্টি। এই অজীব পদার্থ-কণা সমষ্টি আবার নব ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রতে থাকে। এই যে পরিবর্ত্তন ইহাই হ'ল বিশ্বের গতিশীলতার পরিচয়। বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু ছুটে চলেছে আবহমানকাল থেকে এবং এরই ফলে নদী বয়ে যায়, আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ জমে, বর্ষণ হয়, এরই ফলে বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন জীবদেহের উৎপত্তি, এরই ফলে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে পশুথেকেও উন্নততর জীবন নিয়ে মানবের আবির্ভাব।

কিন্তু বিশ্ব রহস্যের আবরণেই ছিল আবৃত। অসহায় মানুষ সেখানে প্রবেশ-পথ না পেয়ে কল্পনার সাহায্যে বিশ্ব সম্বন্ধে উদ্ভট সব গল্প রচনা করে তুললো। এই সব অবাস্তর কাল্পনিক বর্ণনাই জনসাধারণ বাস্তব সত্য বলে মেনে নিল। হেগেলই প্রথম এ-রহস্যের আবরণ অনেকটা উন্মোচন করেন। হেগেলের চোখেই সর্ব্বপ্রথম বিশ্বের ডায়েলেক্টিক চেহারা ধরা পড়ে যায়। দুই প্রতিকূল শক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়েই বিশ্বের অগ্রগতির—তার বৈচিত্র্যময় রূপের উদ্ভব। বিশ্বকে একটা সদাপরিবর্ত্তনময় প্রবাহ বলাই সঙ্গত। আমরা যা কিছু দেখছি, এই পরিবর্ত্তনময় বিশাল বিশ্ব-প্রবাহেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যে দুই প্রতিকূল শক্তির সংঘাতের ফলে বিশ্বের সব কিছুর পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, হেগেল তার নাম দিয়েছেন, থিসিজ্ ও এন্টি-থিসিজ্। হেগেলের মতে এই দুই শক্তির প্রতিকূলতায় সিন্‌থিসিজ্ বা পরিবর্ত্তিত অবস্থার উদ্ভব হয়। এই সিন্‌থিসিজ্ বা পরিবর্ত্তিত অবস্থা তখন আবার এক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন এই সিন্‌থিসিজ্ই আবার থিসিজ্‌রূপে এর এন্টি-থিসিজ্ বা প্রতিকূলশক্তির সংঘাত ক'রে নূতন সিন্‌থিসিজ্ বা পরিবর্ত্তিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মেই বিশ্বের পরিবর্ত্তন-প্রবাহ ঘটে চলেছে অনাদিকাল থেকে। বিশ্বের এই বিশেষ ভঙ্গীতে চলাই হ'ল বিশ্বের ডায়েলেক্টিক গতিশীলতা। এই ডায়েলেক্টিক গতিশীলতা পদার্থের বিশেষত্ব। মানুষের

জীবন থেকে যেমন অক্সিজেন পৃথক ক'রে দেওয়া চলে না, পদার্থ থেকে তার ডায়েলেক্টিক গতিশীলতা তেমন আলাদা করা চলে না। কিন্তু হেগেল বিশ্বের এই রহস্যাবরণ কিছুটা উন্মোচন করে নিজেই সেই রহস্যজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ধরতে না পেরে হেগেল এমন দিশেহারা হ'য়ে যান যে, ভাববাদের কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে তখন আর বাস্তবে পৌছার তাঁর সাধ্য থাকে না। হেগেলের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবই হেগেলের এভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ।

মনের স্বাধীন সত্তার ভিত্তিতেই ভাববাদ দর্শনে উৎপত্তির সম্ভব হয়েছিল। পার্থিব জগতের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলেই ভাববাদ দর্শনের ফাঁকি প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেহের অংশ বিশেষের বহিঃপ্রকাশ হ'ল মন। পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে যেমন বর্ণ ও গন্ধযুক্ত হয়, তেমন দেহের রূপান্তরেই এর মন নামক বর্ণের উদ্ভব হয়েছে। মনের যে পৃথক ও স্বাধীন সত্তা নেই বিজ্ঞান একথা বহুভাবেই সপ্রমাণ করেছে। এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই কার্ল মার্কস হেগেলের ডায়েলেক্টিক-বাদের পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে দিতে সমর্থ হন। মার্কসের হাতেই হেগেলের ডায়েলেক্টিকবাদ নবজীবন সঞ্চারে সতেজ ও স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে।

মার্কসের পূর্ব্বে বস্তুবাদীরা পদার্থের ডায়েলেক্টিক গতি স্বীকার করত না। এরা ছিল জড়বাদী। মার্কস একদিকে যেমন হেগেলের বিরোধিতা করেছেন আর একদিকে নিজে বস্তুবাদী হ'য়েও জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মার্কস এখানে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেখিয়েছেন। তিনি বস্তুবাদকে হেগেলের ডায়েলেক্টিক গতির সাথে যোগ করে দিয়ে বস্তুবাদকে জড়বাদের অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন। যেখানে দর্শন ছিল শুধু কাল্পনিক জগতের সন্ধানী, সেখানে দর্শনকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাস্তবতার প্রবাহ পথে। পরিবর্ত্তনের সাহায্য নিয়ে দর্শন তাই ছুটে চলেছে সেই প্রবাহ পথে জগতের সকল রহস্যের দ্বারগুলি উদ্ঘাটন করে দিতে। কিন্তু স্থিতিশীলতা পাহাড়ের মত তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শনকে তাই নিজ হাতেই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। দর্শন আজ শুধু সন্ধানী নয়, এই বিশ্ব-প্রবাহের পরিবর্ত্তন আনয়নেরও একান্ত প্রয়াসী।

ডায়েলেক্টিক বস্তুবাদ চিরন্তন সত্য ব'লে কিছু স্বীকার করে না। এই পরিবর্ত্তনময় জগতে কিছুই চিরন্তন হ'তে পারে না। এই মুহূর্ত্তেই আমি যে জিনিষ দেখছি, পর-মুহূর্ত্তের সে জিনিষ ঠিক সে জিনিষ নয়। বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু যেখানে গতিশীল ও পরিবর্ত্তনময় সেখানে বিশ্বের কোন কিছুর অপরিবর্ত্তনীয় রূপ সম্ভব হ'তে পারে না। কি অজীব পদার্থ, কি সজীব পদার্থ দুই-ই এক নিয়মে বাঁধা, পুরাতন ধ্বংস হচ্ছে, নূতন গড়ে উঠছে। সজীব পদার্থে এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ আমরা বেশ লক্ষ্য করতে পারি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের ধারাকে কি কেহ অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু মৃত্যুতে এসেই এই পরিবর্তনের ধারা শেষ হয়ে গেল না। মৃত্যুই তো একটা পরিবর্ত্তন। সজীব পদার্থের পুনরায় অজীব পদার্থে রূপান্তরই হ'ল মৃত্যু। আবার জন্মও মৃত্যুরই মত একটা পরিবর্ত্তনের ধারা। এই ধারা বেয়েই জীব-জগৎ এমন বিচিত্র রূপে ফুটে উঠছে। পদার্থের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলেই একদিন প্রথম জীবন-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এবং সেই নবসৃষ্ট জীবন প্রবাহকেই জীবতত্ত্ববিদ্‌রা এমিবা নামে অভিহিত কর্চ্ছে। ঐ এমিবা থেকেই ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতের উদ্ভব হয়েছে। ল্যামার্ক ও ড্যারউইন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথম জীবজগতের এই ক্রমবিবর্ত্তন নির্ণয় করতে সক্ষম হন্। ড্যারউইন্ সাহেব যে দিন মানুষকে বানরের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ বলে ঘোষণা করলেন, সেদিন চারিদিক থেকে ড্যারউইন্ সাহেবের উপরে অজস্র নিন্দাবাদ বর্ষণ হয়েছিল, কিন্তু আজ ড্যারউইনের এই মত আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে।

কিন্তু মানুষে এসে ক্রমবিবর্ত্তন নূতন ধারা নিয়েছে। মানুষে রূপান্তর হওয়ার পথে জীবদেহে মনের উদ্ভব হয়। এ সময় থেকেই ক্রমবিবর্ত্তন নূতন পথ নিয়ে একদিকে মনের ক্রমবিকাশ সাধন করে তুললো, আর একদিকে সৃষ্টি ক'রলো

জটীল সমস্যাপূর্ণ মানব-সমাজ। কিন্তু মন ও সমাজ যে দুই পৃথকধারায় গড়ে উঠছে তা নয়। এ'দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে যেমন গড়ে উঠেছে সমাজ-জীবন তেমনই সাধিত হচ্ছে মনের ক্রমবিকাশ। মনের যে কিছুমাত্র স্বাধীন সত্তা নেই একথা পূর্ব্বেই বলেছি। দেহের অংশ বিশেষের বহিপ্রকাশকেই আমরা মন বলে জানি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দেহের অংশ বিশেষই হ'ল মন। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়, দেহে মনের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা যে এমন উন্নত অবস্থায় এসে পৌছেছে এও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলেই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া স্থির ও অচল জিনিষ নয়। বাস্তবজগতের পরিবর্ত্তনময় প্রবাহ হ'ল প্রতি সজীব পদার্থের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় মানুষে এসে রূপান্তরিত হ'ল—কিন্তু অনড় হ'ল না। এবং এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও ক্রমবিকাশ সুরু হ'ল।

এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই মার্কস সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করেন। ডায়েলেক্‌টিক বস্তুবাদের আলোতে সমাজ-জীবনের প্রকৃত চেহারা মার্কসের নিকট পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। ডায়েলেক্‌টিক ভাবাপন্ন মার্কস ধর্ম্ম ও নীতিবাদ প্রভৃতি শাশ্বত ও সনাতন জিনিষগুলিরও ঐতিহাসিক ধারা নির্ণয়ে সমর্থ হন্। তিনি দেখান যে ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনের তাগিদেই ধর্ম্ম ও নীতিবাদের উৎপত্তি হয় সমাজে। কিন্তু ব্যবহারিক জগত তার সেই প্রয়োজনের তাগিদ সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছে। কারণ বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে সমাজ এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌছেছে, যেখানে ধর্ম্ম ও নীতিবাদ এ দুই-ই তার কাছে অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে। আরও প্রয়োজন আজ বিজ্ঞানের প্রসারতার। ধর্ম্ম ও নীতিবাদ, এ দুই-ই এই প্রসারতার পথের মস্ত বড় অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতিবাদের আশ্রয়ে বহুদিন কাটিয়ে মানুষ এমন আত্মনির্ভরহীন ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তার আশঙ্কা, যে এদের বাদ দিয়ে সমাজ-জীবন বুঝি অচল ও পঙ্গু হ'য়ে পড়বে। অথচ ব্যবহারিক জগতে এরা ধর্ম্ম ও নীতিবাদকে উপেক্ষা ক'রে বিজ্ঞানেরই শরণাপন্ন হচ্ছে।

ও গান্ধীজী

শৈলেশ চন্দ্র চাকী

ব্যক্তিত্বের মহিমা কীর্ত্তন করা এদেশের চিরাচরিত প্রথা। এ মহিমা কীর্ত্তন সুরু হয় সেই প্রথম অবতারের যুগ থেকে। অবশ্য একথা অনেকেই বল্‌বেন যে ব্যক্তিত্বের মহিমা কীর্ত্তন সমস্ত দেশেই আছে, কিন্তু বোধ করি এবিষয়ে এদেশের মত কোন দেশই এতটা অগ্রসর হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারি যে এদেশে সাধু সেজে, পীর সেজে দেশের এবং সমাজের উপর আধিপত্য করা যত সহজ এত সহজ আর কোন দেশেই নয়। আজিকার দিনে পৃথিবীব্যাপী যে মতের অনৈক্য, যে চুলচেরা বিচার তার মাঝখানে সমগ্র দেশবাসীর মনের উপর একাধিপত্য করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমাদের দেশে এই একাধিপত্য করা পূর্ব্বের মত আছে বরং আরও সহজ সাধ্য হয়েছে। পূর্ব্বে এটা শুধু ধর্ম্মরাজ্যে নিবদ্ধ ছিল, যেমন শুনা যায় অনেক ক্ষেত্রেই রাজাকে প্রজার মতামতের উপর নির্ভর করতে হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বল্‌তে পারি যে রাম শুধু মাত্র একটী প্রজার কথায় সীতাকে বনবাস দিলেন। এ ঘটনা যদি মিথ্যাও হয় তবুও এটা সত্যি যে, তখনকার আদর্শ-রাজার একটা পরিকল্পনা আমরা এই মহাকাব্যের মধ্য-দিয়ে পাই এবং তা' থেকে তখনকার রাজনীতি কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু আজ এই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' নীতি রাজনীতিক্ষেত্রেও হানা দিয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ আমরা, তাই বিশ্বাস করি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে দেশবাসীর সক্রিয়মান সম্মিলিত বুদ্ধি-শক্তির উপর। যে বিশ্বাসের ফলে গণতন্ত্রের সৃষ্টি এবং তার পর যখন আমরা দেখলাম অর্থ মানুষের স্বাধীন সত্তা এবং সক্রিয়মান বুদ্ধি-শক্তিকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, তখন অর্থের কবল থেকে মানুষের স্বাধীন সত্তাকে বাঁচাবার জন্য সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হ'ল। উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারি যে, ধনীরা অর্থের সাহায্যে দেশের অধিকাংশ লোককে তাদের হাতের মুঠোর ভেতরে আনলো, এবং তাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের ক্ষমতা একেবারে লোপ করে দিল, যা রাশিয়া ছাড়া সমস্ত দেশেই হয়েছে, মাত্রায় কোন দেশ বা বেশী, কোন দেশ বা কম, কিন্তু সমাজতন্ত্রে এটা সম্ভব হয়নি, তার প্রমাণ রাশিয়া। তা হ'লেই দেখ্‌তে পাচ্ছি কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব না হয় সেইটাই বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য মানুষের লক্ষ্য। যে অবুঝ তাকে অন্ততঃ বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু আর একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের চাপে তার ব্যক্তিত্বকে চাপা দিয়ে শেষ করা আদৌ বিধেয় নয়।

এই থেকে মনে হয়—আমাদের দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন থাক্‌লেও স্বাধীনতা বিরোধী-নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসই তার সাক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব সমগ্র দেশবাসীর ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করেছে। এখন কথা হচ্ছে এই, অনেকে মনে করবেন যে তিনি শুধু ত্যাগেই এযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ নন্—বুদ্ধিতেও বটে, সুতরাং তাঁর নীতি অনুসরনীয়, কার্য্যতঃও একদল তাই করেছেন এবং কংগ্রেসও তাই মেনে নিয়েছে। যে যুক্তিতে মহাত্মাকে সমর্থন করা হয়েছে সেটা শুধু তাঁর এতদিনের একনায়কত্ব এবং এতদিনের ত্যাগ, তা ছাড়া তাঁর নীতিকে কোন স্থানে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝ্‌বার চেষ্টা করা হয়নি। এই যুক্তি দেখিয়ে বড় জোর দেশের চক্ষে তাঁকে বড় করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর নীতির ভুলভ্রান্তি বিচার করা যায় না। এবার দেখা যাক্, তাঁর এবং বিপরীত পক্ষের নীতি বিশ্লেষণে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল। মহাত্মা বল্‌ছেন, প্রবর্ত্তিত যুক্তরাজ্য আপাততঃ মেনে নেওয়া উচিত, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করবার সময় এখনও হয়নি। তা'হলে তিনি প্রকারান্তরে বল্‌তে চান যে, এমন সময় আস্‌বে যখন আমাদের সংগ্রাম কর্‌বার ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং আমাদের সংগ্রাম সফলকাম হবে, অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতটুকু সুযোগ-সুবিধা দেবে যাতে ক'রে আমরা শক্তি সঞ্চয় দ্বারা সংগ্রাম ক'রে আমাদের অধিকার আমরা পেতে পারি। এই সুযোগ-সুবিধা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের দেয় তা'হলে দুটো কারণে দেবে, হয় নির্ব্বুদ্ধিতা ক'রে আর না হয় দয়া ক'রে।

বৃটিশ নির্ব্বোধ বা কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ এবকম ভাব্‌বার স্পর্দ্ধা পৃথিবীর কোন জাতের আছে কি-না জানি না। যারা শুধু কূটনীতির জোরে এত বড় সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছে তাদের নির্ব্বোধ ভাব্‌বার মত নির্ব্বুদ্ধিতা কারও আছে কি-না সন্দেহ। তাই যদি তিনি বলেন যে, দয়া ক'রে ইংরেজ আমাদের স্বায়ত্তশাসন দেবে, তা হ'লে বল্‌তে হয় যেমন ক'রে তারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে দয়া ক'রে জার্ম্মানীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের সুবিধা ক'রে দিয়েছে, যেমন ক'রে তারা দয়া ক'রে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে একটা মীমাংসা ক'রে দিয়েছে, যেমন ক'রে অত্যাচারী নবাব সিরাজদ্দৌলার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আমাদের দেশকে আজ এ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় এনেছে, যেমন ক'রে গত মহাসমরের পর দয়া ক'রে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে, এবং স্বরাজ দিয়ে আস্‌ছে—ঠিক তেমনি ক'রে দয়া করবে। এর পর যদি মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, দেশের লোক এখন ক্লান্ত এবং অসমর্থ, তখন বল্‌তে হয়, সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতিরূপে নির্ব্বাচিত করার মধ্য দিয়ে তাদের ক্লান্তি, সংগ্রামে অসমর্থতা এবং অনিচ্ছা প্রকাশ পায়নি। প্রকাশ পেয়েছে সংগ্রামে তাদের উৎসাহ ও উদ্যম, এবং খবরের কাগজই এর জলন্ত প্রমাণ দেয়। এর পরেও যদি মহাত্মা বলেন, যখন এমন সময় আসবে যে আমাদের প্রভুরা ইউরোপীয় তাণ্ডবলীলায় বিপর্য্যস্ত অবস্থায় থাক্‌বে তখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লেই চলবে, তার উত্তর এই যে এখন থেকেই তার আয়োজন করতে হবে। তার কারণ প্রথমতঃ আমাদের প্রস্তুত হ'তে সময় লাগবে এবং বিপর্য্যয়ের সময় অতীত হ'য়ে গেলে আমাদের সমস্ত আশাভরসা চ'লে যাবে। যে কথা সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, সেই কথাই এখানে উল্লেখ করলাম। দ্বিতীয়তঃ বিপর্য্যয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে এবং হঠাৎ যে কোন্ দিন বিপর্য্যয় পূর্ণমাত্রায় দেখা দেবে—তা আমরা জানি না। এর পরেও যাঁরা মহাত্মাকে সমর্থন করবেন, তাঁরা এই নীতিই সমর্থন করবেন যে, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী এতদিন ধ'রে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ক'রে আসছেন এবং যেহেতু তিনি এতদিন ধরে নেতৃত্ব ক'রে আসছেন, সেই হেতু তাঁরা দেশকে ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু মহাত্মাকে পারেন না, তাঁরা দেশের মঙ্গলটাও বাদ দিতে পারেন, কিন্তু গান্ধীর নীতির একচুল পরিবর্ত্তন তাদের আদৌ সম্ভবপর নয়। এই থেকে দাঁড়ায় এই যে তাদের মতে এক মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের পাদমূলে সমগ্র দেশবাসী আত্মাহুতি দিক তা ভাল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়। আমরা দেখে সত্যি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, জওহরলালের মত মনীষীও ব্যক্তিত্বের স্তাবকতায় এমনই মজে গেলেন যে, ভুলে গেলেন তাঁর সেদিনকার ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করা দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা। এ থেকেই বল্‌তে হয় যে এক শ্রেণীর মহামানব আছেন যাঁরা মানুষকে একটা জটিল চিন্তাক্ষেত্রের সম্মুখীন ক'রে দিয়ে, তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলে তার ক্রমবিকাশ লাভের সহায়তা করেন। আর এক শ্রেণীর মহামানব আছেন যাঁরা মানুষকে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে র'খেন, এবং মহাত্মা গান্ধী এই শ্রেণীর। তিনি দেশবাসীর বুদ্ধির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, কিন্তু অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছেন তাদের হৃদয়ের উপর। মানুষ মানুষের বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তখন, যখন একজন তাঁর বিরাট বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দেন; যা ক'রেছেন বুদ্ধ, শঙ্কর, সক্রেটিস্, প্লেটো, নিউটন, প্রভৃতি মহামানবগণ। আর হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় তখন,

যখন একজন তাঁর বিরাট ত্যাগ, তাঁর বিশ্বপ্রেম, বিরাট মহানুভবতা দেখিয়ে মানব-হৃদয়ের উচ্ছাস সৃষ্টি করেন। তাই মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা হবার পথের পাথেয় ক'রে নিলেন তাঁর আফ্রিকার অপূর্ব্ব ত্যাগ, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, অপূর্ব্ব প্রেম এবং অপূর্ব্ব সত্যবাদিতায়। বাস্তবিক গান্ধী বলতে শুধু তাঁর ত্যাগ-নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম ভীরুতার কথাই মনে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে আসে একটা প্রবল হৃদয়াবেগ। তাই তাঁর ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা না থাকলে তিনি প্রায় নিঃসম্বল হ'য়ে পড়তেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই ত্যাগ তাঁর রাজনীতির একটা অঙ্গ বিশেষ। অস্পৃশ্যদের সঙ্গে যুক্ত নির্ব্বাচন কিম্বা পৃথক নির্ব্বাচন হবে এই নিয়ে ডাক্তার আম্বেদকারের সঙ্গে হ'ল তাঁর বিরোধ. আর অমনি তিনি করলেন অনশন ব্রত অবলম্বন, এর পরিণামে তাঁরই জয় হ'ল। রাজকোটের ব্যাপারেও ঠিক তাই করলেন, কিন্তু এখানে বিশেষ কোন সুবিধা করতে পরলেন কি-না আমরা বুঝতে পারছি না, (অবশ্য এর পরে বোঝ্‌বার একটা অবকাশ ও সুযোগ আসলেও আসতে পারে) কিন্তু এরই প্রতিক্রিয়ার ফলেই তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসে জয়ী হ'লেন তা' বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। তিনি দেশবাসীকে বেশ নাচিয়ে নিলেন, দেশবাসী একবাক্যে তাঁরই বিপক্ষে দাঁড়ালো, আবার তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। কত বড় প্রভাব তিনি এই ত্যাগের বলে মানুষের মনের উপর বিস্তার ক'রেছেন তা দেখলে চমৎকৃত হ'তে হয়।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় দেশবাসী শুধু তাঁর কথায় নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হ'য়েও প্রবল উত্তেজনা দমন ক'রে সত্যাগ্রহ ক'রেছিল। আবার এত অত্যাচার সহ্য ক'রেও শুধু তাঁরই কথায় সমস্ত ভুলে গিয়ে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট মেনে নিয়ে সত্যাগ্রহ থেকে বিরত হ'ল দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। এক একটা আন্দোলন এক একটা প্রবাহের মত। যখন তার গতি মন্দীভূত হ'য়ে আসে তখন তাকে প্রবলভাবে চাপ দিতে হয়, যা'তে সেটা আবার পূর্ণ গতিতে চল্‌তে আরম্ভ করে, কিন্তু মহাত্মা তা' না ক'রে তাকে একেবারে থামিয়ে দিলেন। এমন ক'রে তিনি মানুষের উচ্ছাস ও উত্তেজনাকে নিয়ে অত্যন্ত অবলীলাক্রমে খেলা ক'রে আস্‌ছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মের গোঁড়ামি সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, দেশ থেকেও বড় তাঁর সত্য। আমরা জিজ্ঞেস করি, এ সত্যটা তাঁর কিসের ? অর্থাৎ কোন জিনিষটাকে অবলম্বন ক'রে, কোন জিনিষটাকে আশ্রয় ক'রে তাঁর এই সত্য দাঁড়িয়ে আছে ? সত্য তো আর শূন্যে ঝুল্‌তে পারে না—তার একটা অবলম্বন চাই-ই। যদি তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতাই তাঁর সত্যের অবলম্বন, তা'হলে সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভই তাঁর সত্যের চরম সার্থকতা এবং স্বাধীনতাকে বাদ দিলে তাঁর সত্যকেও বাদ দেওয়া হ'ল। মানুষ যখন যে সত্যটাকে তাঁর মনপ্রাণ সমস্ত কিছু দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে চায় তখন সে আর সমস্ত সত্যের কথা ভুলে যায়, সে সত্যটা প্রত্যক্ষ করার পর অন্য সত্যের কথা ভাবতে পারে। এর পর যদি মহাত্মা বলেন যে তিনি তাঁর রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে একটা সদ্ভাব এবং সার্ব্বভৌম সামঞ্জস্য বজায় রেখে দুইয়েরই চরম সার্থকতা লাভ করবেন। কিন্তু এ আশা শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণের মতই অমূলক। জগতে চলেছে একটা প্রবল অন্যায়ের,অসামঞ্জস্যের এবং দ্বন্দ্বের স্রোত, যার গতিতে কত ন্যায়ের, কত সামঞ্জস্যের ও কত মিলনের বার্ত্তা বহন ক'রে চ'লেছে তার ইয়ত্তা নাই। এতদিন ধ'রে ধীরে ধীরে যে বিরাট অধর্ম্মের শৈল-শ্রেণী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হ'তে পারবে না। যেখানে মানুষ মানুষকে আরামে শোষণ ক'রে আসছে এবং শোষণ করার পরম সুবিধা খুঁজছে, সেখানে শোষণকারীদের ধর্ম্মের দোহাই দেওয়াও যা—চোর ডাকাতদের ধর্ম্মের কাহিনী শোনানও তাই। যা হোক, যদি মহাত্মা বলেন দেশের স্বাধীনতা তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য, তা হ'লে আমরা বলবো দেশের স্বাধীনতা মানুষের গৌণ উদ্দেশ্য হবার পক্ষে অযোগ্য। বস্তুতঃ তাঁর আধ্যাত্মিকতা দেশের স্বাধীনতা লাভের উপযোগী রাজনীতিকে নিষ্ক্রীয় এবং শিথিল ক'রে দিয়েছে।

দেশবাসীও আজ একথা বুঝেছে যে, মহাত্মা গান্ধী অনেকটা পরিমাণেই ধর্ম্ম-সংস্কারক ব'নে গিয়েছেন এবং তাঁর অহিংস-নীতি রাজনীতি না হ'য়ে ধর্ম্মনীতি হ'য়ে দাড়িয়েছে। দেশবাসীর খানিকটা অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে তাদের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করার পরে, গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা হ'তে উদ্ভূত তাদের হৃদয়াবেগের মাঝখানে তাদের এত সুদূর সঙ্কল্পকে কোথায় হারিয়ে ফেললে তার কোন ঠিকানা নাই। এখানে তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত কৌশলে মধ্যযুগের স্বেচ্ছাচারিতা বজায় এবং বর্ত্তমান যুগের হিট্‌লারের মত প্রকারান্তরে প্রমাণ করলেন যে,তাঁর মতই কংগ্রেসের মত, তা ছাড়া কংগ্রেসের আলাদা কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে প্রভাব দেশবাসীর হৃদয়ে বিস্তার ক'রে ছিলেন তা আজ অনেকটা মন্দীভূত হ'য়ে এসেছে। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে তাঁর উচ্চাসন স্থাপিত হ'য়েছে মানুষের হৃদয়ের একটা প্রবল উচ্ছাসের উপর, এই উচ্ছাসের সাময়িক শক্তি অতি প্রবল তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর স্থায়ীত্ব অতি কম। সুতরাং তিনি যত সহজে মহাত্মা প্রতিপন্ন হয়েছেন ঠিক ততো সহজে তাঁর আসন নীচু হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু যে মানুষ মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে মানুষের কাছে নিজেকে মহামানব প্রতিপন্ন ক'রেছেন, তার মহামানব হ'তে যথেষ্ট সময় লেগেছে, কিন্তু তাঁর মহামানবতার আয়ু অনেক বেশী, তার কারণ মানুষের ভেতরে সহসা বিচার বুদ্ধি আসে না, কিন্তু যখন আসে তখন সেটা সহজে যায় না।

বন্দী

তারাপদ ঘোষ

১

এমনি করেই যাবে গো দিন, এমনি করেই যাবে,
সবাই যখন দিচ্ছে ফেলে, মরণ টেনে লবে।
দিনের আলো ছোঁয়না মোরে
নিতুই থাকি অন্ধকারে
বন্দীশালার অন্তরালেই দিনগুলি মোর যাবে॥

২

সম্মুখে মোর বহ্নি-শিখা কৃপাণ ঝোলে মাথে,
কণ্টকে মোর গা ঢাকা আজ লৌহ শিকল হাতে।
আমার ব্যথার অশ্রুজলে,
বন্ধকারার পাষাণ গলে,
দুষ্‌মন সব দেখছে শুধু মরণ আমার যা'তে॥

৩

মারবে যদি মার আমায় গৌণ তবে কিসে?
অন্ধকারেই মরি যেন, পাইনে যেন দিশে।
দিনে দিনে হয়েছি হীন,
রাখ্‌বে হেথা আর কতদিন?
একেবারেই মার এবার, মের না আর বিষে

ভারতের আদিম অধিবাসী

জ্যোৎস্নাকান্ত বসু

ইদানীং নানা কাগজে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাই। প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এই আদিম অধিবাসীরা যেন একটি অদ্ভুত জীব এবং নানা উৎকট রীতি-নীতিই কেবল তাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহার কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই মনে হয় লেখকের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাব। যে-সব ক্ষেত্রে তাঁরা আদিম অধিবাসীদের খুব কাছাকাছি বসবাস ক'রেছেন, সে-সব ক্ষেত্রেও তাঁরা কেবলমাত্র সেই আচার-ব্যবহারগুলিই লক্ষ্য করেছেন যা আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগে। তাদের অনুসন্ধিৎসু মন এইসব অধিবাসীদের তাদের মতই মানুষ বলে ভাবতে পারেনি এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে যে এই সমস্ত লোকও একদিন তাদেরই মত সুসভ্য জাতিতে পরিণত হ'তে পারে একথাও তাঁদের নিকট বিশ্বাসের অযোগ্য ব'লে মনে হয়েছে।

আজ আমি সামান্য একজন নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে আদিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে কিছু লিখতে চাই। আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার খুব বেশীদিনের নয়, কিন্তু এই অল্পদিনেই আমি তাদের সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করেছি তারই কিছু আমি আজ আপনাদের নিকট জানাতে চাই।

১৯৩১সালে আমি প্রথম এই সমস্ত অধিবাসীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আসামে যাই এবং তারপর কয়েক বৎসর যাবৎ আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি এবং এই সমস্ত অধিবাসীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি।

আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ অদ্ভুত ধারণা আছে তারই একটি উদাহরণ স্বরূপ আমি আসাম প্রবাসী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের অভিমত আলোচনা করছি।

১৯৩৫ সালে আমি ও আমার একজন সহকর্মী আসামের নাগাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য রওনা হই। পথে গৌহাটিতে ট্রেণে একজন স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। তিনি আমাদের নাগা অভিযান বার্তা শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন এবং না যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করেন। কারণ অনুসন্ধানে জান্‌লাম যে, নাগারা অত্যন্ত হিংস্র জাতি এবং তারা মানুষ খায়, সে-জন্য সেখানে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তাঁর নিকট এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে স্থানীয় অনেকেরই নাগাদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা। আমরা তাকে আশ্বাস দিলাম যে ইতিপূর্বে কয়েকবার নাগাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে এবং তাঁদের এই সমস্ত ধারণা যে অমূলক তাও বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে এইরকম ধারণা কি ভাবে জন্মায়? ইহার জন্য মূলত দায়ী কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিব্রাজক বা লেখক, যাদের দৃষ্টি খুব সঙ্কীর্ণ এবং বিষয়-বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান খুবই অগভীর। তাদের উদ্দেশ্য কেবল কতকগুলি অদ্ভুত রীতিনীতির প্রচলন দেখিয়ে তাঁদের বিবরণীর মূল্য বাড়ানো। কিন্তু এর ফল গড়ায় অনেকদূর পর্য্যন্ত। যাঁরা এই সমস্ত বিবরণী পাঠ করেন তাঁদের মনে এই সমস্ত অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় এবং তারা এদেরকে খুবই হীন ব'লে মনে করেন। এর ফল হয় এই যে, আদিম অধিবাসীরা তাদের শিক্ষিত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার কোন সুযোগই পায় না বরং ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কোন কোনও জাত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং মিশনারীদের আওতায় হিন্দু-বিদ্বেষী হ'য়ে গড়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক লেখক বা পরিব্রাজকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, একটি জাতির সম্বন্ধে খুব সতর্কভাবে আলোচনা করা এবং আমাদের নিকট অদ্ভুত সেই সমস্ত রীতিনীতিগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের আসল ভিত্তি বোঝা ও সাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া, কারণ কোন একটি বিশেষ প্রথা তার পরিবেশের মধ্য থেকে তুলে এনে দেখলে তাকে ঠিক মত বোঝা যায় না বরং খুবই অদ্ভুত লাগে, কিন্তু সেই প্রথাটিই যখন নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে দেখা যায় তখন তার মূল উদ্দেশ্যটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় এবং সেটিকে আমাদের আর অদ্ভুত লাগে না। উদাহরণ স্বরূপ গারোদের শাশুড়ী-জামাই বিবাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা ক'রছি।

গারোরা মাতৃকুল-জাতি অর্থাৎ তাদের বংশপরিচয় মায়ের দিক দিয়েই হ'য়ে থাকে, যেমন আমাদের সমাজে আমাদের পরিচয় হয় বাপের দিক দিয়ে। গারোদের মেয়েরাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী এবং তাদের অমতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না, এইজন্য গারো-সমাজে মেয়েদের একটি বিশেষ স্থান আছে। তারা বিবাহের পর তাদের স্বামীর সঙ্গে তাদের নিজেদের গ্রামেই বাস করে এবং এই সমস্ত জামাইকে গ্রামের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে দেওয়া হয় এবং সংসার প্রতিপালনের জন্য জমি দেওয়া হয়। এই সমস্ত জমি চাষবাস দ্বারা জামাইরা তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করে এবং তাদের নিজেদের পরিবারে আর ফিরে যায় না। এই সব জামাইদের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে—একদলের নাম নক্রোম এবং অপরটীর নাম ছাওয়ারী। নক্রোমের একটু বিশেষত্ব আছে, কারণ সে ঘরজামাই হ'য়ে শ্বশুর ও শাশুড়ীর সঙ্গে একই গৃহে বাস করে এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। যে-সব স্থানে নক্রোমের শ্বশুর গ্রামের মোড়ল থাকে সে-সব স্থানে শ্বশুরের মৃত্যুর পর নক্রোম তার গদি অধিকার করে, যদিও সে অন্য গ্রামের লোক তথাপি কোনরূপ গণ্ডগোলের সূত্রপাত তাতে হয় না। অপরদল জামাইদের ছাওয়ারী বলা হয় এবং তারা সাধারণের মতই গ্রামে বাস করে।

নক্রোমের শ্বশুরের মৃত্যুর পরে প্রত্যেক নক্রোমকে তার শাশুড়ীকে বিবাহ করতে হয়। এই শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যে বিবাহ নিয়ে গারোদের সম্বন্ধে খুব আলোচনা করা হয় এবং সমতলবাসী হিন্দুরা গারোদের এই বিষয় নিয়ে খুব ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এবং তাদের অযথা অনেক রকম কুৎসিৎ বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। কিন্তু এই বিবাহের একটি সামাজিক গোষ্ঠীগত ভিত্তি আছে এবং যদি আমরা সম্যক্‌ভাবে বিষয়টির আলোচনা ক'রে দেখি তা'হলে তাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ভুল ধারণা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হ'তে পারে। আমি পূর্বেই বলেছি গারোদের সম্পত্তি মাতা থেকে কন্যায় বর্তায়, সেইজন্য মাতা বর্তমানে কন্যা কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'তে পারে না। সাধারণতঃ নক্রোম কন্যা মাতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, এই জন্য অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় নক্রোম কন্যার ভাল বিবাহ হ'য়ে থাকে।

নক্রোম জামাইর স্বার্থরক্ষার জন্য গারো-সমাজে একটি নিয়মের প্রবর্তন আছে যে, শ্বশুরের মৃত্যুর পর প্রত্যেক শাশুড়ীকে তার নক্রোম জামাইকে বিবাহ ক'রতে হবে। এই বিবাহ যদিও সাধারণ গারো বিবাহের মত অনুষ্ঠিত হয় না তা'হলেও এই বিবাহকে গারো-সমাজ প্রকৃত বিবাহ বলেই গণ্য করে। সাধারণতঃ এই বিবাহগুলি বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সময় সম্পন্ন করা হয়। যদিও জামাইয়ের সঙ্গে প্রকৃত বিবাহ হয় কিন্তু প্রায় কোনস্থানেই তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করে না বরং অনেকস্থলেই শাশুড়ী তার কন্যার সাহায্য-কারিণী হিসাবে একই গৃহে বাস করেন। তা'ছাড়া অনেক স্থলেই দেখা যায় যে ছোট কন্যাকেই নক্রোমের জন্য রাখা হয়। এইজন্য নক্রোম জামাই ও শাশুড়ীর মধ্যে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকে যাহাদ্বারা সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস একেবারেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হ'তে পারে যে এই বিবাহ কেন হয়? এই সমস্ত

বিবাহের মূল কারণ সম্পত্তিগত। নক্‌রোমের শাশুড়ী সম্পত্তির মালিক সেই জন্য শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার অপর বিবাহে কোন আপত্তির কারণ নাই, কেন না গারো-সমাজে বিধবা বিবাহের খুব প্রচলন আছে এবং সে যদি কোন লোককে বিবাহ ক'রতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বা বিবাহ করে, তা'হলে নক্‌রোমের বাড়ী কিংবা সম্পত্তি কোন কিছুরই দখল থাকে না, সে শাশুড়ীর এই বিবাহ করার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষতিপূরণ পায়। এই কারণে গারো-সমাজে শাশুড়ীর সহিত জামাইর বিবাহ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। এই বিবাহ যে নাম মাত্র হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিবাহের পর শাশুড়ীর সহিত কোনরূপ অবনিবনা হ'লেও তিনি নক্‌রোম জামাইকে তার সম্পত্তির অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারেন না।

এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে এই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং এই বিবাহ সাধারণ বিবাহ ব'লতে যা বুঝা যায় তার চেয়ে অনেক তফাৎ, এসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। আমার এই উদাহরণ দেখিয়ে বলার উদ্দেশ্য এই যে যাঁরাই আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখ্‌তে চান, তাঁদের সব সময়েই খুব সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ অনেক সময়ে তাঁদের অসাবধানতায় এই সমস্ত আদিম অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়, কেন না সাধারণ মানুষ এই সমস্ত অদ্ভুত আচার-বিচার থেকে তাদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণায় উপনীত হন এবং তাঁদেরকে আমাদের সমাজ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখেন। ফলে এই সমস্ত জাতি বিদেশী মিশনারীদের অনুগ্রহে আমাদের সম্বন্ধে শত্রু মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে। অদূর-ভবিষ্যতে তারা আমাদের দেশেই একটি ভিন্ন জাতি হ'য়ে আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ বিভেদের সৃষ্টি হবে। অনেক জায়গাতেই আমি দেখেছি যে, এই সমস্ত আদিম অধি-বাসীরা তাদের নিকটতম হিন্দুদের আশ্রয়ে থাক্‌তে চায় কিন্তু হিন্দুদের জাত্যাভিমান তাদেরকে তাদের সমাজের ছোট জাত হিসাবে গ্রহণ করতেও রাজি হয় না এবং অনেক স্থানেই এই সমস্ত আদিম অধিবাসীদের অস্পৃশ্য ব'লে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে দাঁড়ায় এই তারা ক্রমশঃ হিন্দু-বিদ্বেষী হ'য়ে আমাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে যারা চিন্তা করেন তাঁরা এ-বিষয়ে খোঁজ রাখেন কি-না জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এ-বিষয়ে যদি কোন প্রতিকার না হয় তা'হলে হয়ত ভবিষ্যতে এইসব অধিবাসীরা দেশের একটি বড় সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। আসামে এ সমস্যা এখনই গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং অন্যান্য প্রদেশেও ক্রমশঃই খারাপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। এ-সমস্তেরই মূলে আমাদের আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং তাদেরকে শিক্ষা এবং সংস্কার দ্বারা গড়ে তোলবার চেষ্টার অভাব। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উচিত আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা এবং কিরূপে তাদের শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা গড়ে তোলা যায় তার জন্য যত্নবান হওয়া, কিন্তু এ-জন্য কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন না এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এ সব বিষয়ে পয়সা খরচ করাকে বাজে খরচ বলেই মনে করেন। এই মনোভাব যদি না বদলায় তা'হলে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের দেশেরই একটি প্রকাণ্ড সমষ্টিকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবো এবং একটি নূতনদলের সৃষ্টি হবে, যারা প্রতিপদেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রবে এবং দেশের স্বাধীনতার পথে আর একটি অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

লেনিনের-স্মৃতি

এন, ক্রুপস্‌কায়া, অনুবাদক—সুধী প্রধান

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

দ্বিতীয় কংগ্রেস; জুলাই আগষ্ট (১৯০৩)

প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছিল সম্মেলন ব্রাসেল্‌স্‌ সহরে হবে এবং প্রথম অধিবেশন ওখানেই হয়েছিল। এই সময় প্লেখানভ্‌দলের কোল্টসভ্‌ নামে একজন পুরানো লোক ওখানে থাকতো এবং সে-ই সব কিছু ব্যবস্থা করার ভার নিলো। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হয় নি। কথা ছিল প্রতিনিধিরা কোল্টসভের সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু প্রায় চারজন রুশ দেশীয় লোক তার কাছে যাবার পর, বাড়ীর কর্ত্তৃ বল্লে যে এই ধরণের লোকের আসা-যাওয়া সে পছন্দ করে না এবং আর একটী লোকও যদি আসে তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ী ছাড়তে হবে। সুতরাং কোল্টসভের স্ত্রী সারাদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিনিধিদের ধরতে লাগলেন ও "কক্‌ ড্য অর"(সোনার মোরগ) হোটেলে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। হোটেলটি ছিল একটী সমাজতান্ত্রিকের। দলে দলে প্রতিনিধিদের আগমন ও তাদের হৈ চৈ'তে হোটেল ভরে গেল। গুসেভ্‌ রোজ সন্ধ্যা বেলায় হাতে একটা কগ্‌ন্যাগ্‌ মদের গ্লাস ধরে এমনি চীৎকার করে গান ধরতো যে, জানলার নীচে ভিড় জমে যেতো। ইলিচ্‌ গুসেভের গান শুনতে ভালবাসতেন—বিশেষ করে এই গানটা :

"আমরা বিয়ে করেছিলাম গীর্জ্জার বাইরে।"

শেষ মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের গোপন স্থান বদলাতে হ'ল। গোপনতার জন্য বেলজিয়মের দল ঠিক করেছিল অধিবেশনটা একটা ময়দার বড় গুদামে হওয়া ভাল হবে। কিন্তু সেখানে আমাদের উপস্থিতিতে ইঁদুরেরাও যেমন ব্যতিব্যস্ত হ'ল—পুলিশও তেমনি অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো। চারিদিকে রটে গেল যে রুশ বিপ্লবীরা একটা রহস্যময় কাজের জন্য সমবেত হচ্ছে।

৪৩ জন প্রতিনিধি এসেছিল সম্পূর্ণ ভোট দেবার অধিকার নিয়ে, এবং ১৪ জন এসেছিল শুধু আলোচনায় যোগ দেবার অধিকার নিয়ে। আজকের দিনের পার্টি কংগ্রেসে যেখানে হাজার হাজার লোক যোগ দেয়—তার সঙ্গে এই কংগ্রেসের তুলনাই হয় না। কিন্তু তখনকার দিনে—এটাই বড় বলে মনে হয়েছিল। কারণ প্রথম কংগ্রেসে মাত্র আটজন লোক হয়। পাঁচ বছরে কাজের যে উন্নতি হয়েছে তা বেশ বোঝা গিয়েছিল। আসল কথা ছিল যে, যে-সব সংগঠন থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিল—সে-সব সংগঠন আর গল্পের বস্তু ছিল না—সত্যি সত্যিই এরা গড়ে উঠেছিল—শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এবং তখন চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছিল।

ইলিচ্‌ এই কংগ্রেসগুলির জন্য অক্লান্ত ভাবে খেটেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পার্টি কংগ্রেসগুলিকে অত্যধিক মূল্যবান বলে মনে স্থান দিতেন। পার্টি কংগ্রেসগুলিকেই তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতেন। বলতেন, কংগ্রেসের আলোচনায় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে। কিছু গোপন করলে চলবে না—সব খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। তাই কংগ্রেসগুলির জন্য ইলিচ্‌ প্রস্তুত হ'তেন—তাঁর বক্তৃতাগুলি চিন্তা করে সযত্নে তৈরী করতেন। আজকের ছেলেরা—যারা জানে না বছরের পর বছর কি ভাবে অপেক্ষা করতে হ'ত, এক সঙ্গে বসে দলের নীতি, সমস্যা ও কর্ম্ম-কৌশল ঠিক করতে পারার সুযোগ একটী বে-আইনী কংগ্রেসের পক্ষে কত অসুবিধা ছিল—তারা বোধকরি বুঝতে পারতো না কেন ইলিচের এই আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা পার্টি কংগ্রেসের জন্য।

ঠিক ইলিচের মত প্লেখানভ্‌ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনিই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। ময়দার গুদামের বড় জানালাটা উঁচু মঞ্চের সাহায্যে রক্ত-বর্ণ আবরণে সাজানো হয়েছিল। প্রত্যেকেই উত্তেজনা বোধ করছিলেন। প্লেখানভের সুগভীর বক্তৃতা অবিমিশ্র কারুণ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। এছাড়া আর কি হতে পারে? মনে হ'ল—দীর্ঘ দিনের নির্ব্বাসন তার কাছে সুদূর অতীতে মুছে গেছে। রুশ সোশ্যাল-ডেমক্রাটিকদলের কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত—শুধু তাই নয়—তিনি তার উদ্বোধন করছেন।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় কংগ্রেসকেই প্রথম বলা যায়। এখানেই দলের নীতিগত সমস্যা আলোচিত হয়েছিল—দলের আদর্শের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম কংগ্রেসে কেবল দলের নাম ও গঠন সম্পর্কে ইস্তাহার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগে পর্য্যন্ত দলের কোনও কর্ম্মসূচী ছিল না। "ইস্ক্রা"র সম্পাদকমণ্ডলী এই কর্ম্মসূচী তৈয়ারি করেন ও বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রত্যেকটা বাক্য, প্রত্যেকটি বিন্যাস সতর্কভাবে ওজন ক'রে—যথার্থ ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। কর্ম্মসূচী নিয়ে গরম তর্কাতর্কি চলে এবং এনিয়ে মিউনিক, সুইচ্‌ শাখা ও ইস্ক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে মাসের পর মাস চিঠি পত্র চলতে থাকে। অনেক কর্ম্মতৎপর ব্যক্তি ভেবেছিলেন এসব তর্কাতর্কি কেবল আরাম কেদারার সম্পর্কিত—কোথায় একটা কম হ'ল কি বেশী হ'ল তা নিয়ে কর্ম্মসূচীর কিছু এসে যায় না।

লিয়ঁ টলষ্টয় কোথায় একটা কথা বলেছিলেন, হঠাৎ তাই ইলিচ্‌ ও আমার মনে পড়লো। কথাটা এই: 'একবার বেড়াতে বেড়াতে তিনি দেখেছিলেন, দূরে একটি লোক অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে হাত নাড়ছে—। তিনি ভেবেছিলেন লোকটি মাতাল। কিন্তু নিকটে এসে দেখলেন লোকটি পাথরে ছুরি শান দিচ্ছে।' মতবাদমূলক আলোচনায় এই কথা ঠিক খাটে। দূর থেকে শুনলে মনে হয় না যে এ সব ঝগড়ায় কোন পদার্থ আছে—কিন্তু একবার গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। কার্য্যসূচীর ব্যাপারেও তাই হয়েছিল। জেনেভাতে প্রতিনিধি পৌঁছুলে অন্য সব কিছুর চাইতে বেশী ক'রে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্যসূচী আলোচনা করা হয়—তাই কংগ্রেসে অন্য বিষয়ের থেকে এই জিনিষটা সহজে গৃহীত হয়।

বাণ্ডদের সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা আলোচিত হয়েছিল, সেটাও কংগ্রেসের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। প্রথম কংগ্রেসে ঠিক হয় যে, যদিও ওরা স্বাধীন ভাবে কাজ করবে তবুও ওদেরকে দলের শাখা বলে গ্রহণ করা হবে। প্রথম কংগ্রেসের পর যে পাঁচবছর কেটেছিল—তার ভিতরে দল একীভূত হয়নি এবং বাণ্ডরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বর্ত্তমানে ওরা সেই স্বাতন্ত্র্যকে বলবৎ ক'রে নামমাত্র দলের সঙ্গে সংযোগ রাখার চেষ্টা করছিল। এর অন্তর্নিহিত কথা হ'চ্ছে এই যে, যেহেতু এই দলে ইহুদী প্রদেশগুলির কারিগর-সম্প্রদায়ের মনোভাব,—যে মনোভাব কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামেই জোর দিতে চায়,—প্রতিফলিত হয়েছিল, সে হেতু এরা "ইস্ক্রা" দলের পরিবর্ত্তে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের আন্দোলনকারীদের প্রতি বেশী সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। প্রশ্ন ছিল: এমন একটা দল হওয়া উচিত যার পতাকাতলে রাশিয়ার সর্ব্বজাতীয় শ্রমিকেরা মিলিত হবে, না রাশিয়ার সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন জাতি-ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রমিকদল হবে? দলের ভিতর আন্তর্জাতিক একতার সমস্যা নিয়ে এই প্রশ্ন। শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিক একতার বাণী নিয়ে "ইস্ক্রা" দাঁড়িয়েছিল—জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও রাশিয়ার বিভিন্ন শ্রমিকদলের ভিতর কেবল বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগের নীতিতে বাণ্ডরা দাঁড়িয়েছিল। বাণ্ডদের এই সমস্যা উপস্থিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশদ ভাবে আলোচনা হয়েছিল ও "ইস্ক্রা"র মতানুযায়ী প্রচুর ভোটে গৃহীত হয়েছিল।

পরে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনেকের কাছে দ্বিতীয় কংগ্রেসে আনীত নীতিগত সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ গুরুত্ব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। ঐসব আলোচনায় ইলিচ্‌ বোধ করছিলেন যে তিনি বিশেষ ক'রে প্লেখানভের অতি কাছে রয়েছেন। যে বক্তৃতায় প্লেখানভ্‌ বলেছিলেন যে,

"গণতন্ত্রের মূলনীতি বিপ্লবের পরিপুষ্টিরই চরম আইন এবং সাধারণ ভোটাধিকারও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে," তখন ইলিচ্ গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৪ বছর পরে কনষ্টিটিউট্যুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী ভাঙ্গার সমস্যা বলশেভিকদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। ইলিচ্ তখন এই কথা স্মরণ করেছিলেন। প্লেখানভের আর একটা বক্তৃতাও ইলিচের মনঃপূত হয়েছিল—যেটাতে প্লেখানভ্ বলেছিলেন: "লোকশিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য্য সর্ব্বহারাদের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার পত্র।"

"রাব্ চেই দেলো"র গোঁড়া ভক্ত একিমভ্ যে প্লেখানভ্ ও ইলিচের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল, তাতে উত্তর দিতে উঠে প্লেখানভ্ রহস্য করে বলেন:"নেপোলিয়ানের খেয়াল ছিল তাঁর মার্শালদেরকে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করানো। মার্শালরা যদিও তাদের পত্নীকে ভাল বাসতো তবুও কয়েকজনকে এই খেয়াল মানতে হয়েছিল। কমরেড্ একিমভ্ এ বিষয়ে ঠিক নেপোলিয়ানের মত ব্যবহার করছেন—তিনি লেনিনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি নেপোলিয়ানের মার্শালদের থেকে বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক—আমি লেনিনকে ছেড়ে যাব না এবং আমি আশা করি লেনিনও সেরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন না।" ইলিচ্ মৃদু হেসে মাথা নেড়ে তাঁর কথার সমর্থন জানালেন।

আলোচ্য বিষয়ের প্রথমটি (কংগ্রেসের গঠন) আলোচনা করতে গিয়ে "সংগ্রাম দলে"র (Struggle Group—Ryazanov, Nevrosov ও Gurevich প্রভৃতি) বোর্বাকে নিতে গিয়ে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। সংগঠন সমিতি চেয়েছিল তাদের নিজেদের মত কংগ্রেসে প্রচার করতে। তাই সমস্যাটা শুধু বোর্বাদল নিয়ে নয়—সংগঠন সমিতি চেয়েছিল তাদেরই শৃঙ্খলাধীনে (কংগ্রেস ছাড়াও) সমস্ত সভ্যকে বেঁধে রাখতে। সংগঠন-সমিতি একটা গ্রুপের মত হ'তে চেয়েছিল এবং সেই হিসাবে পূর্ব্বথেকে কংগ্রেসে কি ভাবে একসঙ্গে ভোট দেবে ও একসঙ্গে কাজ করবে ঠিক ক'রে রেখেছিল। এই ভাবে কংগ্রেসের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব একটী গ্রুপের কর্ত্তৃত্বের কাছে ছোট করা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে ইলিচ্ ঘৃণায় আগুনের মত জ্বলে উঠেছিলেন। প্যাভ্লোভিচ্ (ক্রাসিকভ্) যখন এই নীতির বিরুদ্ধে বলতে দাঁড়ান, তখন তিনি কেবল ইলিচের সমর্থন পাননি—মার্টভ্ ও অন্যান্য অনেকে সমর্থন করেছিল। যদিও কংগ্রেসে সংগঠন সমিতিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল তবুও এ ঘটনাটা উল্লেখ যোগ্য, কারণ এই ব্যাপার ভবিষ্যতের অনেক গোলযোগের পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ। কিন্তু যখন দলের কর্ম্মসূচী ও বাণ্ডদের নেওয়া সম্পর্কে জরুরী আলোচনা সুরু হ'ল তখন এ ব্যাপারও তলিয়ে গেল। বাণ্ড ও "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলী সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে সংগঠন সমিতি ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা একত্রে কাজ করলো। "দক্ষিণ-শ্রমিক"দের প্রতিনিধি ও সংগঠন সমিতির সভ্য (গারভ্ লেভিন্) বাণ্ডদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্লেখানভ্ বিশ্রামের সময় লেভিন্‌কে প্রশংসা করে বল্লেন যে, তাঁর বক্তৃতা "প্রত্যেক বাড়ীর ছাদ থেকে ঘোষণা করা উচিত।"

কংগ্রেসের গোড়ার দিকটায় ট্রট্স্কি অত্যন্ত সুচারুরূপে বক্তৃতা করেন। তখন সকলেই তাঁকে ঠাউরে ছিল যে, তিনি লেনিনের উৎসাহী সমর্থক এবং কে যেন তাঁর নাম-করণ করে "লেনিনের মুগুর।" বাস্তবিক লেনিন নিজেও সে সময় ভাবতে পারেননি যে ট্রট্স্কি দোদুল্য চিত্ত হবেন। বাণ্ডরা হার মেনেছিল। এটা দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, জাতীয় বৈশিষ্ট যেন কিছুতেই দলের সংহতি নষ্ট না করে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একতাকে বাধা না দেয়।

এই সময় আমাদের লণ্ডনে সরে যেতে হয়, কারণ ব্রাসেলসের পুলিশ, প্রতিনিধিদিগকে বিরক্ত করতে থাকে, এমন কি জেমেলিচকা ও আর কাকে যেন নির্ব্বাসিত করে। তাই আমরা সবাই ওখান থেকে চলে যেতে শুরু করি। লণ্ডনে এর ব্যবস্থা করার ব্যাপারে টাক্‌টারিয়েভ্‌রা সর্ব্বরকমে সাহায্য করে। লণ্ডনের পুলিশেরা কোন রকম বাধার সৃষ্টি করেনি।

বাণ্ডদের নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। তার পরে কর্ম্মসূচীর আলোচনা একটা কমিশনের হাতে দিয়ে আমরা

আলোচনার চতুর্থ অংশে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সমিতির মুখপত্রের লাইন নির্ণয় করার আলোচনায় পৌছলাম। এক "রাব্ চিও দেলো"র দল ছাড়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে "ইস্ক্রাই সমর্থিত হ'ল। "ইস্ক্রা" অত্যন্ত বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হ'ল। এমন কি সংগঠন সমিতির একজন সদস্য পপোভ্ বল্লে: "এখানে, এই কংগ্রেসে যে একতাবদ্ধ দল দেখছি তা' বিশেষ করে "ইস্ক্রার" চেষ্টায় হয়েছে। একিমভ্ রাগতঃস্বরে উত্তর দিল: "আমরা যদি "ইস্ক্রার" সম্পাদকীয় বিভাগকে সমর্থন না করি—তা'হলে তার অর্থ হবে যে, আমরা নাম চিনি।" তার উত্তরে ট্রট্স্কি বল্লেন: "কমরেড্ একিমভ্, আমরা নামের সমর্থন করি না, কিন্তু এমন একটা পতাকা চাই যার চারিপাশে দল প্রকৃত গড়ে উঠবে।" এটা কংগ্রেসের দশম অধিবেশন—সর্ব্বসমেত ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ

রাশিয়ার একটি মহিলা বৈমানিক

সবিতারাণী দেবী

রাশিয়ায় Dnepropetrovsk প্রদেশের উকরেনিয়ান (Ukrainian) গ্রামের একটি মেয়ে সেনা বিভাগের আজ একজন প্রধান বিমান চালক। বিমান চালনায় অনেক কৃতিত্ব দেখিয়ে সে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছে এবং মহিলা বৈমানিক হিসাবে তার নাম আজ সর্বত্র সুপরিচিত। সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনে যারা বড় হয়, নিজের চেষ্টা ও একাগ্রতার সাহায্যে কেমন ক'রে তারা দশের মাঝে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে পারে এই মেয়েটীর জীবন-কাহিনী তার একটা বিশেষ উদাহরণ।

দরিদ্র কৃষক কন্যা সে, তার শৈশব, তার হাসি-খেলা, তার আশা-আনন্দের দিনগুলি কাটিয়েছে চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ তার মেলেনি বেশী দিন। গ্রাম্য স্কুলে অল্প কিছু শিখে অভাব-অভিযোগময় সংসারটীকে প্রতিপালন করবার ভারও ছিল তার উপর। ১৯১৪ সালে ১৭ বছর বয়সে সে কমিউনিষ্ট লীগে যোগদান করে এবং ১৯২৭ সালে তার পরিবারবর্গ যখন Collective Farm-এর সঙ্গে মিলিত হ'ল—বাইরের কাজে মন দেবার অবসরও তার এল তখন।

অল্পদিন পরেই Collective Farm-এ কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মেয়েটি সেই সময় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে poultry breeding শিক্ষার অনুমতি নিয়ে ছ'মাসের জন্য কিভে (kiev) চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েই সে বুঝতে পারলো অন্যান্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ে আছে। তার এ ত্রুটি সংশোধনের জন্য সে উঠেপড়ে লাগলো। ছ'মাসের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সে পাশ ক'রে বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাডিয়ানেস্থ জেলায় poultry section-এ organiser-এর পদ প্রাপ্ত হয়ে সেখানে চলে যায়।

মেয়েটির ভিতরে যদি কোনো তেজ বা শক্তি না থাকতো তাহলে ঐ organiser-এর পদে নিযুক্ত হয়েই সে হয়তো পরম আনন্দে দিন কাটাতো, কিন্তু সে তা নয়, তাই সামান্য একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই তার জীবনের ধারা বদলে গেল।

গ্রীষ্মকালে একদিন সমস্ত গ্রামটিকে সচকিত ক'রে দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে সশব্দে দু'খানা aeroplane উড়ে' গেল।

হৈ-চৈ ক'রে উৎসুক যারা ছুটে গেল এই aeroplane দু'টিকে দেখবার জন্য, এই মেয়েটিও তাদের মধ্যে একজন। রহস্যময় বিমানপোত দুটি! ততোধিক রহস্যময় তার চালকগুলি! তারপর যখন বিমানপোত থেকে বালকের শিরোস্ত্রান পরিহিতা একটি মেয়ে নামলো, ঐ মেয়েটীর

আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। মেয়েরাও যে বৈমানিক হতে পারে এ চিন্তা তার মনে ইতিপূর্বে আর কোনদিন আসেনি। কাজেই এই মেয়েটিকে বৈমানিক কল্পনা ক'রে তার যেমন আনন্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরও বিমান চালনা শেখবার ইচ্ছা মনে জাগলো। সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে সে তার পরিচিত একটি ছেলেকে সমস্ত খুলে এক চিঠি দিলো। ছেলেটি তার জবাবে তাকে সেভাষ্টিপোলে যেতে লিখলো।

মেয়েটি সেভাষ্টিপোলে গিয়ে সেখানকার স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে "I would defend my country no less than any man" এই কথা বলে' এমন ভাবে অনুরোধ জানালো যে তিনি তার সে অনুরোধ এড়ানো কঠিন মনে কোরলেন। একটু হেসে medical examination এর suggestion দিলেন। Medical examination-এ সে উপযুক্ততা প্রমাণ করলো।

মেয়েটীর আকাঙ্ক্ষা ছিল সে শিক্ষিতা বৈমানিক হবে এবং দেশকে রক্ষার কাজে পুরুষদের মতই সাহায্য কোরবে—তাই সে প্রাণপণ পরিশ্রম আরম্ভ করলো। পরিশ্রমের পুরস্কার পেতেও তার দেরী লাগলো না।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে বিমান চালনা করবার আদেশ প্রাপ্ত হ'ল। বিমান চালনা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী না হ'লে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে এতে দক্ষতার পরিচয় দেওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু মেয়েটি এতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিল।

১৯৩২ সালের শেষাশেষি সে ঐ স্কুল থেকে পাশ ক'রে মিলিটারী পাইলটের কাজ শিখ্‌তে যায়। সেখানেও অল্পদিন পরেই Commander-এর পদ প্রাপ্ত হয়।

মেয়েটির আকাঙ্ক্ষার ঐখানেই পরিসমাপ্তি হয়নি। সর্বদা সে ব্যাকুল ছিল কি কোরে আরও বড় হবে, কি কোরে দেশকে আরও সাহায্য কোরবে। তাই একদিন তার commander-এর কাছে Distance Flight-এর আজ্ঞা প্রার্থনা ক'রে বসলো। তিনি একটু ভেবে প্রথমে তাকে Attitude Flight-এর জন্য তৈরী হ'তে বল্লেন।

১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে commander তাকে ডেকে একদিন বিমানপোতখানির ceilling পরীক্ষা করবার জন্য Attitude Flight দেখাতে বোল্লেন। বেনডোর নামে একজন চালকের সঙ্গে ৩০০০০ ফিট্ উঁচুতে উড়ে গিয়ে নয় মিনিট সেখানে অবস্থান করে। ফিরে আস্‌তে commander তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন, পৃথিবীতে যে কোন মহিলা বৈমানিকের চেয়ে সে বেশী উঁচুতে উঠতে পেরেছে। মেয়েটীর স্বামী একজন দক্ষ বৈমানিক, কিন্তু সে তার স্বামীকেও হার মানিয়েছিল।

১৯৩৭ সালের মে মাসে সে তার crew ভেরা লোমাকোন এবং ম্যারিনা র‍্যাস্‌কোভা নামে আরেকটি মেয়ে Non-stop Distance Flight-এ আন্তর্জাতিক মহিলাদের মধ্যে একটি record স্থাপন করে। ১৯৩৮ সালের ২রা জুলাই ওদের crew সেভাষ্টিপোল থেকে আচেলের্‌ল্ পর্যন্ত Non-stop Flight-এ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে government এর কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। লোমাকো এবং ঐ মেয়েটী ক্যাপ্‌টেনের পদে নিযুক্তা হয়। ন্যাভিগেটের র‍্যাসকোভা লেফ্‌টেনেন্টের পদে উন্নিত হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত এই মেয়েটির কাহিনী—হয়তো কিছুই না। "Where there is will there is way" এই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা তো বহু পূর্বেই বড় বড় লোকেরা সপ্রমাণ কোরে দিয়েছেন। তবু আমাদের কাছে খানিকটা আশ্চর্য লাগে বই কি। দরিদ্র কৃষকের মেয়ে সে, ছোটবেলায় কোনদিন বৈমানিক হবার কল্পনা স্বপ্নেও জাগেনি, তার চিন্তা, তার কল্পনা ঐ এক টুকরো জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তার বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারতো না। সে আজ অত বড় বৈমানিক। এতে তার কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার পক্ষে এই কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া সহজ হোয়েছে শুধু সে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার মেয়ে বলেই। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মেয়ে হ'লেও কতখানি সুযোগ সে পেতো বলা যায় না, কারণ রাশিয়ার মত equal oppertunity সবাই পায় না। আমাদের ভারবর্ষের কথা তো স্বতন্ত্র। পুরুষদেরই যে দেশে নিজের দেশকে রক্ষা করবার বিদ্যা জানা নেই, সে দেশের মেয়েরা "I could defend my country no less than any man" এই কথা বোলে বিদেশী কর্তৃপক্ষের কাছে বিমান চালনা কোরবার অনুমতি পাবে—এতো ভাবাই যায় না।

বৃন্দাবনে গান্ধী

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

মনটা তেমন ভালো ছিল না, ছত্রপতির ওখানে গিয়া হাজির হইলাম। মনের অশান্তি দূর করিবার শক্তি ছত্রপতির ছিল তা নয়—ছত্রপতির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া মনকে সুস্থ করিবার কৌশল আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম—এ-বিষয়ে ছত্রপতি নিমিত্ত মাত্র।

আগে মন খারাপ হইলেই গীতা পড়িতাম, কিন্তু কিছুদিন যাইতেই গীতার ফলদানক্ষমতা ফুরাইয়া গেল—মা-ফলেষু কদাচন কি-না। এর পরে মন ভালো না থাকিলে চিড়িয়াখানায় যাইতাম—এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেই মন সহজ শান্ত হইয়া আসিত। নানানরকম পশুপাখী দেখিয়া পৃথিবী সম্বন্ধে সিরিয়স্-ভাব আর থাকিত না, দুঃখ-পাওয়া খামোকা মাত্র—এ বোধ লইয়াই ফিরিতাম। দুনিয়াটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে সুখ শান্তি চাওয়ার কোন অর্থই হয় না, মস্ত একটা তামাসার ক্ষেত্র এই সংসার—এবম্প্রকার তত্ত্বজ্ঞানে ফুস্ফুস্ বোঝাই করিয়া হাল্‌কা হইয়া আবার সমাজ ও সংসারে যোগ দিতাম। অবশেষে একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, চিড়িয়াখানার কাজটা ছত্রপতি একাই চালাইয়া দিতে পারে, গোটা চিড়িয়াখানা পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করিয়া ভ্রমণের আবশ্যকতা মোটেই হয় না।

মোটকথা, সমাজ ও সংসার-জীবনের যে ছবি ও অর্থ নিত্য ত্রিশদিন মনে দাগ কাটিয়া বসাইয়া দিতে থাকিত, তাহা যে মিথ্যা অর্থহীন—ছত্রপতির সান্নিধ্যে দু'মিনিটেই তাহা আমার উপলব্ধি করিবার সুবিধা হইত। ছত্রপতি ছিল দরজা, যে-পথ দিয়া খাঁচা হইতে ছুটি নিয়া বাহির হওয়া যাইত। জীবনে থাকিয়া জীবনের এলাকার বাহিরে সরিয়া বিশ্রাম করিবার সুযোগ এই ছত্রপতিই আমাকে দিত। জীবনকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা অবশ্য ছত্রপতি করিত না, কিন্তু দু-দণ্ড সেখানে থাকার পর আমিই দেখিতে পাইতাম যে, জীবন স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয় নয়, আসলে তা স্বপ্নই।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, স্বপ্ন দেখিবার জন্য তাই ছত্রপতির কাছে হাজির হইলাম।

আশাকরি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই ধরিতে পারিয়া থাকিবেন যে, কোনটা real কোনটা un-real—এ জ্ঞান আমাদের ছত্রপতির ছিল না। ভিতর বাহির বলিয়া কোন ব্যবধান ছত্রপতির নজরে পড়িত না। জল-খাওয়ার ইচ্ছাটাকে জলপানের সমানই সে বোধ করিত এবং তেমনি মূল্য দিত।

এই জন্যই নিজের রুম হইতে বাহির না হইয়াও পৃথিবীর যাবতীয় বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সে সমর্থ হইত। ভবিষ্যতের বিষয়ে বলিতে পারি না, কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের এমন লোক ও স্থান ছিল না ও নাই যার সঙ্গে ও যেখানে সাক্ষাৎ করিতে ও উপস্থিত হইতে সে অপারগ ছিল। স্থান-কালের বাধা সাধারণ মানুষের মত ছত্রপতির যাতায়াতের পথে কোনদিন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তার এই রুমে থাকিয়াই সে পাঁচহাজার বছর আগেকার মিশরে বেড়াইয়া আসিয়াছে, চীনে টহল দিয়াছে, গ্রীস ও রোমে ঘুরিয়াছে, ব্রহ্মবর্ত্ত, আর্য্যবর্ত্ত সমস্তই তার দেখা। কুরুক্ষেত্রেরও সে সাক্ষী, আঠারো দিন ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুরু-পাণ্ডবের লড়াই দেখিয়াছে। ছত্রপতিকে সংক্ষেপে অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত কিছুর ভোক্তা ও দ্রষ্টা বলা যায়,—কিন্তু কর্ত্তা সে কোনদিন ছিল না, আজও নাই।

ছত্রপতি জানালার ধারে ইজি-চেয়ারে শুইয়া পত্রিকা পড়িতেছিল, আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল—এস।

চেয়ার টানিয়া মুখোমুখী বসিলাম।

চাকরকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিল, মাকে বলিয়া কিছু খাবারও যেন নিয়া আসে—এ আদেশও চাকরকে দেওয়া হইল—কারণ খালি চা ছত্রপতি মোটেই পছন্দ করেনা। ছত্রপতি সত্যই বন্ধুবৎসল—আর সে অর্থবানও ছিল।

চুরুট নাও, বলিয়া বাক্সটা ঠেলিয়া দিল।

কহিলাম,—সিগ্রেট নেই? আছে? তবে তাই দাও।

সিগ্রেটের টিনটা আগাইয়া দিল।

এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন আছ?

তেমন ভালো না। এই গরমে ট্রেণ-জার্নি করা বড্ড কষ্টদায়ক।

—কোথাও গিয়েছিলে না-কি?

উত্তর দিল—হুঁ।

—কোথায়?

—নব-বৃন্দাবনে।

—নব-বৃন্দাবন? সে কোথায়?

—বিহারে, যেখানে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বৈঠক হয়ে গেল।

জানিতাম যে, ছত্রপতি এ-বাসা হইতে বছরখানেকের মধ্যে একদিনও বাহির হয় নাই।

তবু জিজ্ঞাসা করিলাম,—বৈঠকে উপস্থিত ছিলে?

—না।

—তবে গিয়েছিলে কেন?

—গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে।

—দেখা হোল?

মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, দেখা হইয়াছে।

উৎসুক হইয়া-ওঠা দরকার বোধ করিলাম।

কহিলাম,—ব্যাপারটা খুলে বল তো?

—বলছি। চা-টা সেরে নাও।

চা ও খাবার সারিয়া নিলাম।

দুটা পান মুখে দিয়া মস্ত একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া প্রস্তুত হইলাম। ছত্রপতি তার বৃন্দাবন যাত্রার কাহিনী কহিয়া চলিল।

জানই তো দেশ সম্বন্ধে আমার কোন ঔৎসুক্য নেই—অন্ততঃ তোমাদের মত উদ্বেগ নেই। তোমরা যারা কর্ম্মী তারা বিশেষ দেশে ও তেমনি বিশেষ কালে বসবাস করে থাক—অর্থাৎ তোমাদের ভুগোল ও ইতিহাস দুই-ই সীমাবদ্ধ ও খণ্ড। যদি রাগ না কর তবে বলব যে, তোমরা সকলেই ক্ষুদ্র সময়ের কূপের মণ্ডূক-মাত্র। তোমরা ক্ষণজীবী ও তেমনি ক্ষণ-দৃষ্টি। কত অধীন জাতিকে স্বাধীন হোতে আমি দেখেছি, আবার তেমনি কত স্বাধীন জাতিকে অধীন হোতেও দেখলাম। কত নূতন সভ্যতাকে আসতে দেখেছি, আবার কত পুরাণো সভ্যতাকে বিদায় দিতে দেখলাম। হাসছ কেন? ওঃ—ভুষণ্ডী কাকের কথা মনে পড়েছে বুঝি? হাঁ—ওর সঙ্গে আমার তুলনা করতে পার। সত্যই আমি অমিতায়ু। থাক্—যা বলছিলাম।

তোমাদের দেশ স্বাধীন হোক বা না-হোক তাতে আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। পৃথিবীতে তো কতই স্বাধীন দেশ আছে, তোমরা স্বাধীন হোয়ে শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করবে বইতো নয়। সংখ্যার জন্য আমার লোভ নেই—তোমাদের একটাকে টিপে দেখলে দেশশুদ্ধ ভাতের খবর পাওয়া যায়। যদি নূতন কিছু দেখাতে পার—তবে হাঁ, তখন চোক মেলে মনোযোগ দিয়েই দেখব।

এতদিন পরে তোমাদের দিকে আমার একটু নজর পড়েছে, স্বীকার পাই। ও পাড়ায়, মানে ইউরোপে আয়োজন প্রায় গুছিয়ে এনেছে, উৎসব সুরু হোতে তেমন দেরী নেই। শিবকে, তোমাদের মঙ্গলের দেবতাকে তোমরা নটরাজ নাম দিয়েছ, অথচ তিনি রুদ্র, তিনি ভাঙ্গনের দেবতা। এতে তোমাদের কতকটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছ। সত্যিকার মঙ্গল তিনিই করেন, যিনি ধ্বংস করতে মমতা বোধ করেন না। নটরাজ তো ও-পাড়ার আসরে নামবার জন্য পায়ে নূপুর বাঁধছেন। এমন সময়ে কানে এল কাছেই কোথায় যেন কার পায়ে রিণিকি-ঝিনি নূপুর অতি আস্তে বাজ্‌ছে। চোক তুলে দেখলাম, ও-পা যে অতি চেনা। তোমরা দেখতে পাওনা, কারণ আগেই বলেছি—তোমরা ক্ষণ-দৃষ্টি। যোগমগ্ন ধূর্জ্জটী ধ্যানাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাজ-গোজ সুরু হয়েছে। এরপরে এ-দেশের আকাশেই ডমরু ড্রিমি-

দ্রিমি বাজবে, বিষাণে ফুৎকার উঠবে, এবং তোমাদের মঙ্গলের দেবতা শিব নটরাজ সাজে তাতা-থৈ তাতা-থৈ নাচন সুরু করবেন। দেবতাদের মধ্যে এই মহাকালকেই আমি যা একটু মান্য করি। তিনি যখন জেগেছেন, তখন ভীষণ কিছু, নূতন কিছু আশা আমরা করতে পারি।

কিন্তু ভৈরবের সমাধি-আসন কেন টলে উঠ্‌ল—তা' এখন পর্য্যন্ত ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি। জানইতো আমার দৃষ্টি সুদূরতম অতীত পর্য্যন্ত দেখতে পারে, সমস্ত বর্ত্তমান আমার দৃষ্টির সীমায় আসতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয় আমি অন্ধ-অভিশপ্ত। মহাকালের যে-দুই-ভাগ প্রকাশিত হয়েছে—তাই দেখার শক্তি নিয়ে আমি এসেছি। তাঁর যে-অংশ অপ্রকাশ রয়েছে—সে-দিকে দৃষ্টি আমার চলে না। কেন যে মহাকাল এখানে চঞ্চল হয়ে উঠলেন—তা' আমি বুঝতে অক্ষম। শুধু প্রত্যাশা নিয়ে সময় গুণছি—তিনি কী বেশে আসবেন।

কিন্তু তোমাদের দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভরসা পাচ্ছি না, কারণ তাঁর আসার লক্ষণ তো কিছু দেখছিনে, আয়োজনও কোথাও কিছু হচ্ছে বলে তো আমার মনে হয় না। কি জানি,—কোন্ রকমের নূতন নাট্য নিয়ে নটরাজ নামবেন। নূপুরের আওয়াজ যখন শুনেছি, তখন আর অবিশ্বাস করি কেমন করে।

তিনি আসার আগে আসরটা এই অবসরে একটু ঘুরে দেখবার ইচ্ছে হোল। দেখলাম এক কোণায় কংগ্রেস জটলা করছে। খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন থেকে সুরু করে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ পর্য্যন্ত দেখলাম। বাংলায় তোমরা খুব ক্ষেপে গেছ—তাও টের পেলাম।

হতেও পারে, সুভাষবাবুই বোধ হয় সে-ভৈরবের অনুচর। কিন্তু রাগ কোর না—সুভাষবাবুর অঙ্গে মহাকালের কোন সঙ্কেত-চিহ্ন বর্ম্ম বা কবচ, তরবারি বা ত্রিশূল কিছু দেখতে পেলাম না। তিনি চিহ্নিত লোক নন।

মহাকাল যাঁকে পাঠান তিনি ছদ্মবেশে আসেন, তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে না। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি আছে তাঁরা ধরতে পারেন। আমার সে দৃষ্টি আছে। সুভাষ বাবু তাঁর কাছ থেকে আসেননি। তোমাদের ঐ গান্ধীর মধ্যে চিহ্ন আছে, তিনি প্রেরিত অনুচর। আমি ভেবেছিলাম, তাঁর কাজ সারা হোয়ে গেছে, মরেণনি বলে বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন বলেই আসরেও আছেন।

ইচ্ছা হোল ভালো করে দেখে আসবার যে, মহাকালের এবারকার খেলার সাথী এ গান্ধী কি-না। কিম্বা অন্য কোন অভিনেতাকে সে নটগুরু পাঠিয়েছেন বা পাঠাবেন।

সোদপুরে ভিড়ের মধ্যে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল না। তা'ছাড়া সতীশ দাশগুপ্তকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেন? তার কোন কেন নাই যা তোমাদের বুঝানো চলে। সতীশবাবু পরধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন—তিনি যা নিয়েছেন তা তার স্বধর্ম্ম নয়। পরধর্ম্মের ভয়াবহ পথেই তিনি চলেছেন। ধর্ম্মচ্যুতি, স্বভাবচ্যুতি—এ আত্মহত্যার পথে সতীশবাবু চলেছেন তাঁকে দেখতে না পারার এও একটা কারণ।

গান্ধী বৃন্দাবনে গেলেন, ভাবলাম, ওয়ার্দ্ধার চেয়ে এখানেই দেখা করা ভালো। এতে পথের পরিশ্রম ও কষ্ট কম। আর বৃন্দাবন নামটাও বেশ—ওয়ার্দ্ধার চেয়ে অনেক ভালো।

পথের বিবরণ না শুনলে। ভোরবেলা বৃন্দাবনে নামলাম। গান্ধীজী কোথায় আছেন, এ আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হোল না। ইংরাজীতে আছে—"The straw shows which way the wind blows" লোক কাতারে কাতারে চলেছে—যেন তীর্থযাত্রী তারা। তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম, ভোরের প্রার্থনা সেরে গান্ধীজী নিজের কুটীরে গেছেন, হাজার চার-পাঁচক লোক জায়গাটায় জমা হয়ে আছে।

গান্ধীজীর কুটির একটা আম বাগানের ভিতর। 'ভলান্টিয়ার' পাহারা দিচ্ছে। লোকজনদের যেতে দেয় না। ভাবছি কি ভাবে দেখা করি। কার্ড পাঠিয়ে দিলে যে ডেকে দেখা করবেন তা মনে হয় না। গান্ধীজীকে আমি চিনি। যাক্, জানইতো বিপদে পড়লে বুদ্ধি খোলে।

আর শাস্ত্রে আছে—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"। বলবানের পথ কেউ কোনদিন আটকাতে পারে না।

ভারি একটা মোটরে এক ভদ্রলোক এসে নামলেন। নাম শুনলাম অনুগ্রহ বাবু—কংগ্রেসী মন্ত্রী। ভাগ্য অনুগ্রহ করেছে—সুযোগ ছাড়লে পস্তাতে হবে। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ারদের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে গান্ধী দুর্গে প্রবেশ করলাম। আমার চেহারা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি যে, আমাকে দেখে লোক সম্ভ্রম বা বিস্ময়ে প্রকাশ করে থাকে। চেহারা ভালো বা জমকালো হবার অনেক সুবিধা আছে। তোমাদের ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যে নেতা হতে পারেছেন না, তার প্রধান কারণ তাঁর ঐ রূপ।

গান্ধীজী যে কামরায় আছেন সেখানে দরজায় দেখলাম রাজেন বাবু—ভুলাভাই—বল্লভভাই আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কইছেন। ওদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম গান্ধীজী একাই আছেন।

এই মহেন্দ্র-সুযোগ, 'যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী' বলে ঢুকে পড়লাম এবং দরজাটা বন্ধ করে তারপর ভিতরের দিকে নজর দিলাম।

দেখলাম মহাত্মা তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ব'সে কি বলে যাচ্ছেন, আর মহাদেব তা' নোট বইয়ে টুকে নিচ্ছে। আমাকে দেখে একজনের বলা ও অন্য জনের লেখা থেমে গেল। মহাদেব একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল—আমি বাঙ্গালী কি-না তাই।

মহাদেব জানতে চাইল—আমি কে ও কেন দরজা বন্ধ করেছি। বাপুজীকে এ-ভাবে disturb করবার কোন 'রাইট' আমার নাই।

উত্তর দিলাম না। সোজা গিয়ে মহাত্মার পায়ের ধূলা মাথায় নিলাম।

বাপুজী বল্লেন—বস।

বসলাম। গান্ধীজী কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ভাবলাম সম্মোহনবিদ্যা খাটাচ্ছেন কিম্বা চোখে আমার পরিচয় পড়ে নিচ্ছেন। তারপর একটু হেসে মহাদেবকে বল্লেন—আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। শেষ হোলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। আর বলে দিও যতক্ষণ আমি এর সঙ্গে কথা বলব ততক্ষণ যেন কেউ ঘরে না ঢোকে। এর জন্য কিছু ফল ও খাবার পাঠিয়ে দিও। চা খাও তো? এককাপ চাও পাঠিয়ে দিও ত'বে।

মহাদেব বাধ্য ভৃত্যের মত কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাপুজী জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে কোনদিন আমি দেখিনি, তোমাকে চিনিনে—তবুও তোমাকে বসতে বল্লাম কেন জান?

—না—জানি না, অন্যের মনের খবর আন্দাজ করবার বদ-অভ্যাস আমার নেই।

—তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। তোমার চোখেমুখে পাগলের চিহ্ন আছে। পাগল-শিশু এদের জন্য আমার বিশেষ মায়া আছে।

—আমাকে পাগল মনে করলেন?

পাগল মানে inspired man, বাঁচিতে থাকবার জাতের পাগল নয়।

—ও তাই বলুন। যা ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।

—তা কি জন্য এসেছ তাই বল এখন। আমার সময় কম, একটু সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা কোরো।

বল্লাম—আচ্ছা। প্রথম কথা—আপনি দেশে স্বাধীনতা চান।

—চাই। কিন্তু দেশ যে অর্থে চায় সে-ভাবে নয়।

—বুঝিয়ে বলুন।

—বলছি। আমার সে বিখ্যাত বাক্যটী মনে আছে আশা করি।

—না, কারণ আপনার সব কথাই বিখ্যাত। কোনটীকে এখন ইঙ্গিত করছেন ধরতে পারছিনে।

বাপুজী হেসে ফেল্লেন,—সেই কথাটী—I can sacrifice the Independence of India for the sake of my truth. মনে পড়ছে?

—পড়েছে।

স্বাধীনতা আমার কাছে মুখ্য জিনিষ নয়। সত্যের জন্যই আমি স্বাধীনতা চাই।

আরও একটু পরিস্কার করে বলুন। আমার আত্ম-জীবনীকে বলেছি Experiment with truth—সত্যের প্রয়োগ। ভগবানকে পাওয়াই বড় কথা ও একমাত্র কথা। ভগবানকে পাওয়ার জন্যই দেশের স্বাধীনতাকেও আমি খাটিয়ে নিচ্ছি।

এদেশের লোক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?

—কোথাও পাই নি। আমিই দেশশুদ্ধ লোককে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত করে তুলছি—নিজের গরজেই। অবশ্য তাদের মঙ্গলও আমি চাই।

—মঙ্গলের কথা পরে হবে। দেশ চায় স্বাধীন হোতে, দারিদ্র্য দূর করতে।

—আর আপনি কি-না পরামর্শ দিলেন, জোলাপ নেও, মানে চিত্তশুদ্ধি কর।

—নালিশটা তোমার ঠিক। কিন্তু উপায় নেই। মানুষের জীবন থেকে ঈশ্বর—soul বাদ পড়েছে, তাই তার এত দুঃখ ও দারিদ্র্য। এখানে I can help them—এ বিশ্বাসে আমি অন্ধ ও বধির। অন্যের পথ দেখাবার ও অন্যের কথা শুন্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত আমার নেই। তুমি হয়তো বুঝবে—আমি নির্দ্দিষ্ট mission নিয়ে এসেছি। আমাকে দিয়ে যে কাজ করাবার তাই করিয়ে নিয়ে ছাড়ছেন। আমার উপর আমার আর দখল নাই। তোমাদের যুক্তি-তর্ক ইত্যাদিতে আমাকে আঘাত করতে পার, কিন্তু আমাকে চালিত বা বিচলিত করতে পারবে না—কারণ আমার হাইল আমার হাতে নেই। আমি আমার নেতা বা চালক নয়। আমি ঈশ্বরের হাতের অস্ত্র। তিনি মর্ত্তে তাঁর রাজত্বের পথ তৈরী করতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

—বুঝলাম। এখন আপনার সত্যের সংজ্ঞা বলুন।

আমার সত্যের সংজ্ঞা নেই—তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি পণ্ডিত লোক নয়।

—আপনার সম্বন্ধে সে নালিশ কেউ কোন দিন করে নি। আপনার সত্য কি ভগবানের তুল্যার্থ?

—হাঁ। তবে আমার সত্যকে জীবনে চিনবার উপায় আছে। যেখানে হিংসা—সেখানে সত্য নেই, থাকলেও তা বিকৃত। বিকৃত-সত্য মিথ্যারই নামান্তর। যেখানে প্রেম সেখানেই সত্য প্রকাশিত। জান বোধ হয়, বুদ্ধদেব ছাগশিশুর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই সত্যদ্রষ্টা—তাই অন্তর-বাহির প্রেমে পূর্ণ।

বুদ্ধদেবের কথা থাক। আপনার কাছে অহিংসাই হোল সত্যের মাপকাঠি?

—হাঁ।

—আপনার সত্য-অহিংসা ইত্যাদি কি পাতঞ্জল দর্শন থেকে নেওয়া? মানে—অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ স্তরের জিনিষ কিনা? আপনার আশ্রমের নিয়মাবলীর মধ্যে সত্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ ইত্যাদি যমের প্রায় সব কয়টাই পড়েছে।

—তা পড়তে পারে। কিন্তু সত্য সেখানে যে অর্থে গৃহীত সে অর্থে আমি সত্যকে গ্রহণ করিনি।

—সত্য-অহিংসা ইত্যাদিকে আপনি ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় বলে মনে করেন?

—হাঁ, এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির ফল বলেও মনে করি।

—বড় মুস্কিলে ফেল্লেন দেখছি। সত্য-অহিংসার কথা তবে থাক। আপনি বিপ্লবে বিশ্বেস করেন?

—করি। কিন্তু সে বিপ্লব অন্তরের বিপ্লব। আমার গীতা ভাষ্য পড়েছ?

—না, দরকার বোধ করিনি।

—সেখানে কুরুক্ষেত্রকে আমি বাহিরের ঘটনা বলে স্বীকার পাইনি,—মানুষের মনে যে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সুর-অসুর, সত্য-মিথ্যার লড়াই নিত্য চলেছে,—কুরুক্ষেত্র বলতে আমি সেই আন্তর সংঘর্ষকেই বুঝেছি।

—মোটকথা, বাইরের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আপনি মোটেই উদ্‌গ্রীব নন্।

—না, কারণ মানুষ যদি ভিতরে বদল হয়, নিজের সত্য-স্বরূপে স্থিত হয়,—তবে বাহিরের ব্যবস্থা ও অবস্থা

দুই-ই সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন লাভ করে থাকে।

—এ আপনার বিশ্বাস না অভিজ্ঞতা ?

—দুই-ই

—বেশ। বিপ্লবের যে পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়, সে পরিচয় আপনি স্বীকার পান না। এখন জবাব দিন,—ইংরেজের সঙ্গে connection, সম্বন্ধ ছিন্ন করতে আপনি রাজি কি না ?

—না, British-connection এর প্রয়োজনীয়তা বোধ আমার এখনও নষ্ট হয়নি।

—কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—পার। ইতিহাস খুঁজে দেখ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মত দ্বিতীয়টী কোথাও পাবে না। একে আমি সত্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই। মানুষের সভ্যতা—এত ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে পশুর স্তরেই রয়ে গেছে। ভারতের message আছে এ-দুর্দ্দিনে সভ্যতার কাছে, তা' আমি এই ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে দিতে চাই।

—কি সে message ?

—অহিংসা, প্রেম। মানুষ economic man, social man, political manএ হোল মানুষের বাহ্যিক মুখোস মাত্র। আসল মানুষ অমৃতের সন্তান, সে-অমৃত প্রতি মানুষের অন্তরে আছে—এ সত্য আমি বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্কট দিনে দিতে চাই।

—আপনার তলে তলে এত মতলব।

—হাঁ। আমি Non-Violenceএ বিশ্বাসী। এই জন্যই আমার Non-Violence এ তোমাদের প্রচলিত বিপ্লবের রং নেই। আমার পন্থা শত্রুর হৃদয় জয় করা, মানে তার পরিবর্ত্তন সাধন করা। এই জন্যেই compromise আমার নীতির পরিণতি।

—একথা আপনি খুলে বলেন নি কেন ?

—বলেছি। কিন্তু দেশ আগে খেয়াল করেনি। আজ সুভাষ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এ-কথাটা সামনে এসে পড়েছে। সুভাষ কথায় কথায় বিপ্লবের কথা বলে। তার নীতি Violence অনিবার্য্য হয়ে পড়বে, অবশ্য আমি জানিনে সুভাষের কোন নীতি আদৌ আছে কিনা। কিন্তু নানাভাবে বিপ্লবের পথে ইংরেজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার কথাই আমি বুঝেছি। এই জন্যই সুভাষের জয়কে আমি নিজের পরাজয়, মানে সত্য ও অহিংসার পরাজয় বলে ঘোষণা করেছি।

—হিংসা-অহিংসা, সত্য-মিথ্যা এ-নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকুন কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু দেশ স্বাধীনতা চায়—তা' তার পাওয়া চাই-ই।

—আমি তাতে বাধা দোবনা। কিন্তু আমার পথে আমাকে চলতেই হবে।

—মানে ?

—নটগুরুর যে আদেশ নিয়ে এসেছি, তা পালন করে যেতে হবে আমাকে। তিনি যখন বুঝবেন, আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, বিশ্বাস কোরো—এক মিনিট অনর্থক বিলম্ব এ-পৃথিবীতে আমি কোরব না। কিন্তু আমার প্রয়োজন শেষ হয়নি—নটরাজ আমাকে আরও খাটিয়ে নেবেন। কতবার ছুটি চেয়েছি, কিন্তু মঞ্জুর হয়নি।

—নটরাজের কথা বল্লেন, কিন্তু আপনি তো তার চেলা নন্।

—কে বল্লে ? আমি তারই শিষ্য, পূজারী। এর পরে তিনি নিজেই ঠিক সময়ে ঘোড়া ও তরবারি নিয়ে আসবেন। সে মহৎ সৌভাগ্য ও দৈবশক্তি আমাদের জন্য নয়। আমরা অহিংসার নিশ্চিন্ত পথের পথিক কেবল। তিনি আসবেন লোকক্ষয়কারী মহাকাল রূপে। কিন্তু তোমরা যে তাঁর অকাল-বোধন করতে চাও। তাতে ক্ষতিই করবে কেবল। আর মনে রেখ যে, সুভাষ সে মহাকাল সন্ন্যাসীর শিষ্য নয়। সে অধিকারী পুরুষ নয়।

গান্ধীজী একটু থেমে বল্লেন, আমার খুব জরুরী কাজ আছে। তুমি আর একদিন আসতে পারবে না ?

—পারব। দেখুন আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই, শুনবেন ?

—শুনব, কিন্তু রাখতে পারব কি-না জানি-না।

—আপনি পারবেন। যেদিন আপনি আশ্রম ভেঙ্গে

দিলেন; সেদিন থেকে আপনার 'পর বিশ্বেস আমার দৃঢ় হোয়েছে।

কথাটা কি শুনি?

—কৃষ্ণ নিজে যাবার আগে যদুবংশ ধ্বংস কোবে গিয়েছিলেন, আপনাকে তাই করতে হবে।

—বুঝিয়ে বল।

—আপনাকেও এই বল্লভ-রাজেন্দ্র-রাজা রুপা ইত্যাদিকে শেষ করে দিয়ে যেতে হবে। এ-উচ্ছিষ্ট আপনি রেখে যাবেন না। মহাকালেব রাস্তায় এরা আবর্জ্জনা হয়ে পথ আটকাবে। পরগাছার মত টিকে থাকবে। এদের আপনি শেষ কবে দিয়ে যান। সেই হবে আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ দান এ দেশকে ও জাতিকে।

আমি এইখানে ছত্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এ-মিনতির উত্তবে মহাত্মা গান্ধী কি বল্লেন?

ছত্রপতি কহিল,—তিনি কোন কথা বল্লেন না, শুধু আমাব মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আমার এ-পরামর্শ রাখা কি সম্ভবপর মনে করেন না? উত্তরে শুধু একটুখানি মৃদু হাসি হাসলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কহিলাম—আজ তবে আসি।

ছত্রপতি কহিল,—ও ভালো কথা, তোমাকে মা একবাব দেখা করে যেতে বলেছেন। মিনু চায় ইংরেজীতে অনার্স নিতে, মা বলেন সংস্কৃতে, বাবা বলেন ইকনমিক্সে, আমি বলি ফিলজফিতে। এ-বিষয়ে তোমাকেই বোধহয় জজ্ হয়ে রায় দিতে হবে।

বলিয়া ছত্রপতি এমন ধবণের হাসি হাসিল যে, আমার মোটেই ভালো লাগিল না। ছত্রপতি একটা আস্ত শয়তান —বোঝে সব।

কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগে গণতন্ত্রের পরাজয়

এবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। বহুবৎসর পর্য্যন্ত মনোনীত সভাপতিগণ ও কংগ্রেস স্বয়ং এই গর্ব্ব পোষণ করতেন যে কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—এখানে পরাধীন রুদ্ধকণ্ঠ জনগণ মনে করত আপন বেদনা, আপন বক্তব্য ব্যক্ত করবার একটা স্রোতমুখ বুঝি আশার সঞ্চার করে। কিন্তু আজকের দিনে গণতন্ত্রের যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন বেশী, গণমত আপন ভাষা প্রকাশ করতে যখন পথ ক'রে নিতে গেল,—দেখে এলো কী প্রচণ্ড ভণ্ডামির প্রাচুর্য্য। গণতন্ত্রের পরাজয় যখন চোখের সামনে দেখতে পেল, প্রমাণ হয়ে গেল কংগ্রেসে গণতন্ত্র কোনোদিনই নাই,—গান্ধীজী সেখানে একচ্ছত্র সম্রাট। গান্ধীজীর ইঙ্গিতে, গান্ধীজীর অঙ্গুলি-হেলনে কংগ্রেস পরিচালিত। তাই টিকলো না জনমতের নির্ব্বাচন, ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাদের ইচ্ছা—তাই নির্ব্বাচিত সভাপতি বাধ্য হ'লেন পদত্যাগ করতে। হ'ল গণতন্ত্রের পরাজয়।

সভাপতির পদত্যাগ

নীতিগত বিভেদ আছে ব'লে গান্ধীজী সভাপতির ইচ্ছানুযায়ী দুইটী মাত্র সিট দিয়েও সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে রাজী হলেন না। আবার তাঁর নিজের মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলে সভাপতির উপর জোর ক'রে তা' চাপিয়ে দেওয়া হয়। অতএব সুভাষচন্দ্রকে কোনোরূপ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে সাহায্য করতে তিনি অক্ষম, একথা ব'লে যখন রাষ্ট্রপতিকে আপন মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ক'রে কাজ করতে বললেন, তখন দেখা গেল পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে গান্ধীজীই অক্ষম। ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে অক্ষম হ'লে রাষ্ট্রপতির আপন ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার পূর্ণ অধিকার আছে—গান্ধীজী একথা ঠিকই বলেছিলেন। কংগ্রেসের এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আপন মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ক'রে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে জনমতের অর্পিত বিশ্বাস রক্ষা ক'রে কংগ্রেসে গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করতে পারতেন—কিন্তু তা তিনি করলেন না,—ফলে পদত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন পন্থা আর তাঁর রইলো না।

পদত্যাগের পরিণাম

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলেন। তার একটা প্রধান ফল দাঁড়ালো, বাংলা দেশে প্রাদেশিকতা বেড়ে গেল। মনোভাব এই যে বাঙ্গালী ব'লে সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই অবিচার করা হ'ল। রাজেন্দ্র প্রসাদকে রাষ্ট্রপতি করাতে এই বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হ'ল, কারণ বিহারে বাঙ্গালীদের প্রতি অবিচারের জন্য রাজেন্দ্র প্রসাদকেই অনেকে দায়ী মনে করেন। মিউনিসিপ্যাল বিল ও রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এই দুই কারণে বাংলায় প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ অত্যন্ত বেশী দেখা দিল। বাংলার পক্ষে এটা একটা দুর্লক্ষণ। এর পরিণাম শোচনীয়।

পদত্যাগের ফলে আরো একটা দিক ভাব্‌বার আছে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন নাই, তার কারণ তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর নীতিগত বিভেদ। ফেডারেশনের বিরোধিতা করা ছাড়া সুভাষচন্দ্রের অন্য কোনো নূতন কর্ম্মপন্থা আমরা পাই নাই—অতএব এই ফেডারেশনই হয়তো মূলনীতিগত পার্থক্য ব'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি। একথা আরো সুস্পষ্ট হয় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে বিলাতী কাগজগুলির হর্ষোল্লাসে। গান্ধীজীর জয়ে তাদের মনে আশা জেগেছে যে,'এবার যুদ্ধ বাঁধলে গান্ধীজী দর কষাকষি করবেন। সুভাষ বাবুকে দিয়ে হয়তো কোন সুবিধা হ'ত না। গান্ধীজীর এই মনোভাব খুব অস্পষ্ট নয় তা আমরা আগেও বলেছি। মার্কিন সাংবাদিক যখন জিজ্ঞেস করলেন, ইংলণ্ড যুদ্ধে

নামলে ভারতকে গান্ধীজী কি করতে উপদেশ দেবেন। তার উত্তরে তিনি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবটীর তো উল্লেখ করলেন না যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত লোকক্ষয় বা অর্থক্ষয় ক'রে কোনো সাহায্যই করবে না। ববং তিনি বলেছেন "The question is a difficult one to answer" কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব থাকা সত্বেও প্রশ্নটীব জবাব দেওয়া শক্ত কেন, তা বোঝা দায়। সন্দেহ হয়, তাঁর এই মনোভাব বৃটিশ ধুবন্ধবগণ জানেন বলে'ই দর কষাকষির প্রস্তাবনা আনতে পেরেছেন। ফেডাবেশন যে একটু অদলবদল ক'রে দিলেই গৃহীত হবে তা কি আমরা এই সব থেকেও না ভেবে থাকতে পারি?

শ্রীযুক্তা নাইডুর সভা পরিচালন কার্য্যে অবৈধতা

বাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রেব পদত্যাগের পর পববর্ত্তী বাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন যে ভাবে সংঘটিত হয়েছে, কংগ্রেসেব ইতিহাসে এমন বিবিবহির্ভূত কাজ ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে সব একটার পব একটা ঘটে যেতে লাগলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সমস্তই প্রস্তুত ছিল। একটীব পর একটী শুধু বঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ক'বে কাজ সেরে নিতে পারলে হয়। যে কর্ম্মতৎপরতা, যে ত্রস্ততা প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা নাইডু দেখিয়েছিলেন তাতে বিস্মিত হ'তে হয়। সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ ক'রেছিলেন কিন্তু তা' গৃহীত হয় নাই—এমন সময় বাবু বাজেন্দ্র প্রসাদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে একজন প্রস্তাব করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন এসে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সভায় বিতর্ক উঠল যে পদত্যাগ গৃহীত না হ'লে নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'তে পারে না। প্রেসিডেণ্ট নাইডু ব'লে দিলেন পদত্যাগ গৃহীত না হ'লেও এসে যায় না কিছুই। তারপর কি ভাবে নতুন সভাপতি নির্ব্বাচিত হবেন তা নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা বাধলো। শ্রীমতী নাইডু A. I. C. C. র মেম্বারদের ভোট নিয়ে নতুন সভাপতি নির্ব্বাচন করতে চাইলেন, অন্যদল দাবী করলেন সমস্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মহাশয়া অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কাজ সেরে নিলেন। তিনি তাঁদের মত অগ্রাহ্য ক'রে A. I. C. Cর মেম্বাবদেব ভোটেই তৎক্ষণাৎ নতুন সভাপতি নির্ব্বাচন করলেন,—এবং ঘোষণা করলেন যে কোনো আলোচনা বা সংশোধন প্রস্তাব তিনি আনতে দেবেন না। তাতে যদি লোকে বলে, "Stupid Sarojini Naidu has given us a wrong ruling. I don't care" আবাব বললেন "If necessary, I shall be unconstitutional' Unconstitutional (বিধিবহির্ভূত) কাজ সেবে নেবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত প্রেসিডেণ্টই হয়েছিলেন।

বিপ্লব বিরোধী সঙ্ঘ

ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকে এইটিই আশঙ্কাব কথা। গান্ধী-পন্থীবা আজ স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে আপোষবফাব পক্ষপাতী। আপোষবফাব বাস্তা না ধবে', ভাবতেব জাতীয় আন্দোলন যদি বিপ্লবেব বাস্তায় চলে, তা হ'লে ভারতীয় ন্যস্তস্বার্থ-শালীদেব (Vested interests) স্বার্থে হাতে পড়বে—গান্ধী-পন্থীবা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। তাই দেশের মূলধনী ক্রোবপতিদেব সাহায্যে তাঁবা গড়ে' তুলেছেন গান্ধী সেবা সঙ্ঘ। গোডাতে সঙ্কল্প ছিল সেবাব দ্বাবাই জনগণকে বশীভূত, কৃতজ্ঞ বেখে বিপ্লব থেকে দূবে বাখবাব। কিন্তু বাজনীতিব ক্ষেত্র থেকে দূরে থেকে আজ আর জনগণকে হাতে বাখা চলে না, রেখেও লাভ নেই। তাই বাজনীতিতে নামবাব এই সঙ্কল্প। এখানে আশঙ্কাব কথা এই যে, সেদিন কংগ্রেসেব যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হ'ল, তার অধিকাংশ সভ্য গান্ধী সেবা সঙ্ঘেব লোক। এই বিপ্লববিবোধী, গণ-স্বার্থবিবোধী সঙ্ঘের প্রেবণায়ও পবিচালনায় কংগ্রেস আজ কোন্ রাস্তায় চলবে? আবও আশঙ্কার কথা, আজকেব ভাবতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধতায় এই সঙ্ঘেব সঙ্গে অন্য কোন দলের তুলনা চলে না এবং এতগুলি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট থাকার দরুণ এই সঙ্ঘের অর্থের, শক্তির, প্রতিষ্ঠার অপ্রতুল নেই।

গান্ধীজীর দ্বিতীয় পরাজয়

রাজকোট সমস্যার সমাধান হ'ল না। গান্ধীজী "শূন্যহস্তে, ভগ্নদেহে, নিরাশ চিত্তে" বাজকোট থেকে ফিরে

এসেছেন। যে বিবৃতি তিনি দিয়েছেন তাতে বলেছেন রাজকোটে তাঁর সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল হয়েছে। এত দিন তিনি বার্দ্ধক্য উপলব্ধি করেননি, কিন্তু এই আঘাতে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। রাজকোটে বুঝি সমস্ত আশাই জলাঞ্জলি দিতে হ'ল। এবার অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হ'ল ইত্যাদি।

গান্ধীজীর এই বিবৃতি এবং অভিজ্ঞতার কাহিনীতে আমরা বিস্মিত হই নাই। রাজকোট সমস্যার সমাধানে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা আমরা সমর্থন করি না। এই সমস্যা এভাবে সমাধান হ'তে পারে না এবং হয়ও নি।

গান্ধীজী আসল সমস্যার সমাধানে রত হন নি, তিনি উপবাস করেছিলেন ঠাকুর সাহেবকে শিক্ষা দিতে—তাঁর চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার শিক্ষা দিতে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার শিক্ষা দেওয়া তো আসল কথা নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে রাজায় প্রজায় বিরোধ। এই রাজা প্রজা বিরোধ সমস্যা এবং ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে সর্দ্দার প্যাটেলের চুক্তির interpretation এক জিনিষ নয়। এই চুক্তির interpretation নিয়ে গান্ধীজী উপবাস করলেন, কিন্তু বহুদূরে পড়ে রইল প্রজাদের আসল সমস্যা, তা নিয়ে তো গান্ধীজী আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন না বরং আন্দোলন বন্ধ রাখতে উপদেশ দিলেন। যেখানে প্রয়োজন ছিল সমস্ত রাজ্যব্যাপী প্রবল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে প্রজাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলা—যে আন্দোলনের ফলে শাসনতন্ত্র টলে' উঠে' জনগণের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করবে, তাদের আত্ম-বিশ্বাস জাগবে, দৃঢ়পদে তারা অগ্রসর হবে, তাদের জাগরণের, তাদের অগ্রগতির সেই একমাত্র পথ দেশব্যাপী গণ আন্দোলন গান্ধীজী বন্ধ রেখে ঠাকুর সাহেবের একটা সর্ত্ত রক্ষার জন্য আমরণ উপবাসের পণ ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে যে ভুল করেছিলেন তার ফলে প্রজারা পেল না কিছুই—সমাধান হ'ল না কোনো সমস্যারই।

স্যার মরিস গায়ার গান্ধীজীর পক্ষেই রায় দিলেন। তাঁরা জানেন, ফেডারেশন আগত প্রায়—এখন গান্ধীজীর সঙ্গে কিছু ভদ্রতা করা প্রয়োজন। তাই হয়তো প্রয়োজন মাফিক্ কিঞ্চিৎ শান্তিবারি সিঞ্চিত হয়েছিল। ওদিকে আবার সার্ব্বভৌম শক্তি এবং রেসিডেন্টের গুপ্ত-হাতের কূট নীতির প্যাঁচ তো আছেই, প্রয়োজন হ'লে তারও সদ্ব্যবহার চলতে পারবে। কে জানে তারই ফলে এই ভায়াথ ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সূচনা কিনা, যার ফলে গান্ধীজীর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল। এবং শেষপর্য্যন্ত গান্ধীজীকে মুসলমান ও ভায়াতদের প্রতি "বিশ্বাসঘাতক" এই অভিযোগ শুনতে হ'ল। যে সাতজন প্রতিনিধি গান্ধীজীর মনোনীত করার কথা ছিল তাদের মধ্যে মুসলমান দুইজন ও ভায়া একজন। তাঁরা হঠাৎ বলে বসলেন, তাঁরা সাতজনে মিলে একযোগে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন না। গান্ধীজী তাঁদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন—তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর তিনি তাঁদের বাদ দিয়ে ঐ স্থলে অন্য তিনজন সদস্য নিয়ে সাত জনের নাম পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছয় জন রাজকোটের প্রজা কিনা সে সম্বন্ধে প্রমাণ দাবী করা হ'ল। জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। গান্ধীজী এই উদ্বেগ অবসানের আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন এবং কমিটির সদস্য মনোনয়নের অধিকার ত্যাগ ক'রে অন্য প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটী এই যে ঠাকুর সাহেবই এই কমিটির সমস্ত সদস্য মনোনয়ন করবেন এবং ২৬শে ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কমিটি তার রিপোর্ট পরিষদে দাখিল করবেন। যদি পরিষদ দেখতে পান যে রিপোর্ট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হয় নাই, তবে সেই রিপোর্ট ও তাঁদের আপত্তি প্রধান বিচারপতির নিকট চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হবে।

গান্ধীজী এই প্রস্তাব দরবার বীরাওয়ালা ঠাকুর সাহেবকে পাঠিয়ে দেন—ঠাকুর সাহেব এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে দিয়েছেন।

গান্ধীজী শ্রীবীরাওয়ালার হৃদয় পরিবর্ত্তন করাতে বহু চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনাও শেষ হ'ল না—সমস্যারও সমাধান হ'ল না। প্রজাগণ

বীরাওয়ালার নিকট হ'তে মুক্তি চায়।
তাদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে মুক্তি না চেয়ে তাঁর হৃদয় পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করতে। এবং তারপরে তিনি "ভগ্নপ্রাণে" ফিরে এসেছেন এই ব'লে যে "তিনি পরাজিত"।

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করলে স্বাধীনতা আসবে, গান্ধীজীর এই নীতি আমরা স্বীকার করি না। কোনো কালে কোনো দেশে বিজিত, শোষিত, অত্যাচারিত জনগণ, লুব্ধ ক্ষমতাধারী শোষকবর্গের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করতে পারে নাই, পারে না। পুঁজীবাদী সমাজে এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই উভয়ের শত্রু। একের শোষণে অপরের জীবনধারণ। সমাজব্যবস্থায় এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীর উচ্ছেদসাধন যতদিন না সম্ভব হয়, ততদিন "হৃদয়ের পরিবর্ত্তন" বাক্যটী এক অবাস্তব উপহাস মাত্র।

মুক্ত বন্দিনীগণ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিতা শ্রীমতী শান্তি ঘোষ, শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী, শ্রীমতী কল্পনা দত্ত ও শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার সকলেই আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন—তাঁদের সকলকেই আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে বন্দীরা আজও কারাগারের অন্ধকারে শৃঙ্খলিত রইলেন তাঁদের কথাই বারে বারে মনে হয়।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

সম্প্রতি বিহারে বৃন্দাবন নামক স্থানে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বাৎসরিক কনফারেন্স হ'য়ে গেল। রাজনৈতিক কাজ পূর্ব্বে এই সঙ্ঘের কর্ম্মতালিকা ভুক্ত ছিল না, কুটীর-শিল্পের দ্বারা জাতির সেবাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সমিতি থাকা সত্ত্বেও গান্ধী সেবা সঙ্ঘ গঠন কেন করা হ'ল এবং দেশের ক্রোরপতি কলের মালিকরাই বা এই সঙ্ঘ গঠনে সাহায্য করে কেন, এ নিয়ে অনেকের মনে অনেক কথাই উঠেছে। আজ কিন্তু এই সঙ্ঘ একটা স্পষ্টাস্পষ্টি রাজনৈতিক মূর্ত্তি গ্রহণ করছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনে এই সঙ্ঘের অনেক সভ্য শ্রীপট্টভি সীতারামিয়াকে ভোট না দেওয়ায় সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আদেশ দেন যে, সঙ্ঘের কোন সভ্য অপর কোন সভ্যের নির্দ্দেশ বা ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবেন না। বৃন্দাবন কনফারেন্স স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে সেবা সঙ্ঘ রাজনৈতিক কাজও করবে, এবং অপরাপর বিষয়ের ভেতর কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কেও বৃন্দাবনে আলোচনা হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধক বিল পাশ হয়ে গেল। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ মন্ত্রিত্বকালে যে আইন করেছিলেন, তার দুইটি দিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে কতকটা স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা কলিকাতাবাসী পেয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ, যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই আইনের সুযোগে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং ১৯২৩ সাল থেকে এপর্য্যন্ত এখানে কংগ্রেসের প্রাধান্য অল্প-বিস্তর ছিল। আমাদের বিদেশী শাসকদের এটা গোড়া থেকেই অসহ্য হয়। এবং আইনটি সংশোধন করা উচিত, এই ধরণের ইঙ্গিত বিদেশী ও সরকারী প্রভুদের কাছ থেকে অনেকবার এসেছে—বিশেষ ক'রে স্বর্গীয় দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির পর থেকে। সাম্রাজ্যবাদী নিজে কিন্তু আইন পরিবর্ত্তন ক'রে জনগণের অসন্তুষ্টিভাজন হ'তে চায় নাই। আজ যখন একটি একান্ত বশম্বদ মন্ত্রীমণ্ডলী জুটেছে, তখন সরকার তার মারফত আপন মতলব হাসিল করিয়ে নিল। যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা তুলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা যেমন সৃষ্টি করা হ'ল, অমনি জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আন্দোলন বিরোধীদের ভিড় করবার সুযোগ জুটলো। মুসলমান বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোট বাড়ে, আমরা তার বিরোধী নই, বরং এতে তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষাই আরও দ্রুত অগ্রসর হবে বলে' মনে করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে মুসলমানের স্বার্থেরও সুযোগ বাড়বে না, অনুন্নত সমাজেরও নয়, সুযোগ বাড়বে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর। এই কথাটিই আমরা হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে আমাদের দেশবাসীকে বলতে চাই। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজে কোন্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ কতটুকু বৃদ্ধি পেল, কতটুকু হানি হ'ল, সেইটিই বড় কথা নয় বা সেইটিই একমাত্র দ্রষ্টব্য নয়। এই মন্ত্রীমণ্ডলী স্বার্থ সংরক্ষণ করছে বিদেশী রাষ্ট্রের এবং দেশীয় বিদেশীয় ধনিকের। সেই হিসাবে এর কার্য্য-কলাপের বিচার হওয়া উচিত রাজনীতির দিক থেকে। সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে এর সমালোচনার ফলে আজ জাত বিভ্রান্ত হচ্ছে, জাতের অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে।

ফ্যাসিষ্ট দস্যুর প্রাধান্য

গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা অতি দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইউরোপের বুকের ওপর নাজী ও ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত গতি, চীনের

বুকের ওপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডবলীলা সমানভাবেই চলেছে। সুদীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ফ্রাঙ্কো ইটালী ও জার্ম্মাণীর সাহায্যে স্পেনের গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত ক'রে সেখানে তার ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। জার্ম্মাণী চেকোশ্লোভাকিয়া ও মেমেল গ্রাস করেছে, ইটালী আলবেনিয়া অধিকার করেছে। ইউরোপের ছোটখাট রাজ্যগুলো সশঙ্ক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে—এবার কার পালা? জার্ম্মাণী পোলাণ্ডকে শাসাচ্ছে, ভালোয় ভালোয় যেন 'ডান্‌জিগ' ফিরিয়ে দেয়, নইলে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ইটালী ফ্রান্সকে শাসাচ্ছে, আফ্রিকায় ফ্রান্সের কোন কোন উপনিবেশ তার চাই-ই। জার্ম্মাণী এংলো-জার্ম্মাণ নৌ-সন্ধি নাকচ করে দিয়েছে এবং গ্রেট ব্রিটেনকে জানিয়ে দিয়েছে উপনিবেশ তার চাই-ইচাই।

এই নাজী-ফ্যাসিষ্ট দস্যুতার মুখে ইউরোপের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স যেরূপ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দিচ্ছে, তাতে আজ তারা সমগ্র পৃথিবীর ধিক্কার অর্জ্জন করেছে।

ইংরেজের মতলব কি ?

শান্তি, গণতন্ত্রের নিরাপত্তা ইত্যাদি বড় বড় বুলির দোহাই এই দুই গণতন্ত্রের মুখে লেগেই আছে। অথচ এদের গত কয়েক বৎসরের রাষ্ট্রনীতিই শান্তি ও গণতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশী বিপন্ন করেছে। বস্তুত কয়েক বৎসরের, বিশেষ ক'রে গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে নাজী ও ফ্যাসিষ্ট অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার আন্তরিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা এই দুই দেশের গভর্ণমেণ্টের কোন দিনই ছিল না। পরন্তু হিট্‌লার ও মুসোলিনীকে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে উৎসাহই দিয়ে এসেছে। হিট্‌লার ও মুসোলিনীর পররাজ্য আক্রমণের ষড়যন্ত্র তাদের নিকট কোনদিনই অজ্ঞাত ছিল না। জার্ম্মাণীর অষ্ট্রিয়া আক্রমণ, সুদেতন অঞ্চল অধিকার করার সঙ্কল্প বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই জানত। হিট্‌লার মেমেল অধিকার করার একমাস পূর্ব্বে চেম্বারলেনকে নোটিশ দিয়েছিল। মার্চ্চ মাসের প্রথম দিকে প্রেগে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল, এবং ইউরোপের নানা দেশের সংবাদপত্রেও প্রকাশ হয়েছিল যে, জার্ম্মাণী ১৫ই মার্চ্চ চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করতে যাচ্ছে। অথচ সেই ১৫ই মার্চ্চ তারিখে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনী যখন প্রেগ অধিকার কর্চ্ছে, তখনও চেম্বারলেন তার দেশের লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে হিট্‌লার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করবে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

বিলাতের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান ও নেশন' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ যে, যে সময় জার্ম্মাণ বাহিনী প্রেগ অধিকার করছে সে সময় "Federation of British Industries Misson" ডুসেলডর্ফে জার্ম্মাণীর সঙ্গে একটা সাময়িক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন করেছে, এই চুক্তির প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্ম্মাণী যাতে যুদ্ধসম্ভার আমদানী করবার টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা।

ইটালী আলবেনিয়া অধিকার করবার পর প্রকাশ পায় যে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ইটালীর অভিপ্রায়ের কথা শুধু যে পূর্ব্বাহ্ণেই জানত তা নয়, এতে তাদের পুরোপুরি সম্মতিও ছিল। স্পেনে নিরপেক্ষতা নীতির মুখোস পরে' গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স কি ভাবে স্পেনীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে ইতিহাস আজ সুবিদিত।

কোঠারী অয়েল মিল্‌সের উদ্বোধন

২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতায় ১১৩ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে কোঠারী অয়েল মিলের উদ্বোধন হয়েছে। কর্পোরেটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ ডি, এন, বসু চৌধুরী মহাশয় এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

বন্দেমাতরম্ গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শোভাচাঁদ কোঠারী, হাঁপচাঁদ কোঠারী এবং সুমেরমল কোঠারী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জলপান ও ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

সভাপতি কোম্পানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী মনোরম বক্তৃতা করেন, বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর সাহায্য ভিন্ন যে কোন ব্যবসাই সম্ভব নয়, ইহা জানিয়াই এই কোম্পানী বাঙ্গলার সমবেত সহযোগিতায় বাঙ্গালার ভিতরে ব্যবসা বৃত্তিকে সংক্রামক করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিন্ময়কুমার চ্যাটার্জ্জি সুন্দর বক্তৃতার দ্বারা সকলকে অভিভূত করেন। তেলের কারবারে ভেজালের জন্যই বেরীবেরী, উদরাময় প্রভৃতি সংক্রামক ব্যারাম, কাজেই এই কোম্পানী ভেজালের দিনে বিশুদ্ধ তেল দিয়া বাঙ্গালীর তেলে-জলের শরীরকে যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যবান ক'রতে সহায়তা করে তা'হলে সেটাই পরম লাভ।

পরে মিঃ এ, সি, সেন, জিতেন লাহিড়ী ও নির্ম্মল বসু, প্রভৃতি কোঠারী কোম্পানীর এই বাঙ্গালী প্রীতিতে তাদের ধন্যবাদ দেন, পরে বিরাট ভোজের পর সভা ভঙ্গ হয়।

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

= সূচী =

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—মন্দিরা
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

আর্ট জুয়েলারি হোম

৫৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৫৬৩২

একমাত্র গিনিসোনার ও চাঁদিরূপার অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা

বিবাহ ও যে কোন রকম উপহারের গহনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারী দেই। তার জন্য বেশী মজুরী লওয়া হয় না। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা তৈয়ারী করিয়া দেই। আমাদের তৈয়ারী অলঙ্কার ব্যবহারান্তে পান-মরা বাদ যায় না, গিনিসোনা পাওয়া যায়।

একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ক্যানভাসার আবশ্যক। কিছু জমা দিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে দেখা করিলে সকল বিষয় অবগত হইবেন।

বিনীত—
আর্ট জুয়েলারি হোম

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট

ফোন : কলিঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩

কলিকাতা শাখা	মফঃস্বল শাখা
শ্যামবাজার	বেনারস্
৮০।৮১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	গোধুলিয়া বেনারস্
সাউথ ক্যালকাটা	সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২১১, রসা রোড	দিনাজপুর ও নৈহাটী

সুদের হার

কারেণ্ট একাউণ্ট		১½%
সেভিংস ব্যাঙ্ক		৩%

চেক্ দ্বারা টাকা তোলা যায় ও হোম সেভিং বক্সের সুবিধা আছে।

স্থায়ী আমানত	১ বৎসরের জন্য	৫%
	২ বৎসরের ,,	৫½%
	৩ বৎসরের ,,	৬%

আমাদের ক্যাস্ সার্টিফিকেট কিনিয়া লাভবান হউন ও প্রভিডেণ্ট ডিপোজিটের নিয়মাবলীর জন্য আবেদন করুন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীঅমিয়বালা দেবীর

ফিমেলা

বাধক, প্রদর, ঋতুদোষ, সূতিকা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগের অব্যর্থ

দৈব ঔষধ

সংবাদ দিলে বিনা ব্যয়ে মহিলা প্রতিনিধি পাঠান হয়

প্রাপ্তিস্থান :

হেড অফিস	কলিকাতা অফিস
দিনাজপুর	৬৩, হ্যারিসন রোড

বালামৃত

শিশুদিগের শক্তি-বর্দ্ধক মিষ্টঔষধ

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—বাঙ্গলার গৌরব স্তম্ভ—

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোং লিঃ

প্রভিডেণ্ট বীমা জগতের বৃহত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানী

সুদক্ষ একচুয়ারী কর্ত্তৃক অনুমোদিত

মোট তহবিল—**আঠার লক্ষ টাকার উপর**

মোট দাবী প্রদত্ত—**সাত লক্ষ টাকার উপর**

লগ্নি টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে আছে

এজেণ্ট ও বীমাকারীগণের আশাতীত সুযোগ

হেড অফিস :—

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

সর্ব্ববিধ বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

নিউ ইণ্ডিয়ায় বীমা করিয়া নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত হউন।

অধিকৃত মূলধন ...	৬,০০,০০,০০০ টাকা
গৃহীত মূলধন ...	৩,৫৬,০৫,২৭৫ টাকা
আদায়ী মূলধন ...	৭১,২১,০৫৫ টাকা
মোট তহবিল	২,২৮,০৭,৬০২ টাকা

—দাবী মিটান হইয়াছে—

৭,৮৬,০০,০০০ টাকার অধিক

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী, লিঃ

হেড অফিস :
বোম্বাই

কলিকাতা শাখা :
৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

= সূচী =

INSIST ON
ROHTAS FAN
NEW FANS → Ceiling and Table "A.C. & D.C."

— ৬০ % বাঁচে —

ভারতীয় মূলধনে
ভারতীয়গণ দ্বারা পরিচালিত

স্বদেশী
বৈদ্যুতিক পাখা

ব্যবহার করিয়া দেশের ধন-সম্পদ
বাড়াইয়া তুলুন।
কম খরচ, দাম সস্তা, খুব টেকসই
ও সম্পূর্ণ স্বদেশী।

এক ইউনিটে ৩০ ঘণ্টা হইতে ৬০ ঘণ্টা চলে

প্রস্তুতকারক
দি
ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্ লিঃ
২৫, সাউথ রোড, এণ্টালী
কলিকাতা।

নিউ থিয়েটার্সের অপূর্ব্ব সুন্দর বাণীচিত্র
'সাথী'র মনোমুগ্ধকর গানগুলি
শ্রীমতী কানন দেবী

J.N.G. 5310
- তোমারে হারাতে পারি না 'সাথী'
- সোনার হরিণ আয় রে আয় 'সাথী'

J.N.G. 5319
- রাখাল রাজা রে.. 'সাথী'
- পায়ে চলার পথের কথা 'সাথী'

J.N.G. 5353
- ঘর যে আমায় ডাক দিয়েছে 'সাথী'
- প্রেম ভিখারী প্রেমের যোগী 'সাথী'

নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ডে শুনুন
মূল্য ২৷৷০ প্রত্যেকখানি

মেগাফোন :: কলিকাতা

জীবন বীমার
আদর্শ
দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স
লিঃ
৩ নং হেয়ার স্ট্রীট
ফোন – কলিকাতা ৩০১৯

ফাউণ্টেন্ পেনের শ্রেষ্ঠ কালি
"কাজল-কালি"
শ্রেষ্ঠতায় আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, জননায়ক সুভাষচন্দ্র, বৈজ্ঞানিক ডাঃ এইচ্ সেন, সাংবাদিক রামানন্দ প্রভৃতি সকলেরই
— একমত —
KAJAL-KALI

দ্বিতীয় বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৪৬	তৃতীয় সংখ্যা

নাহি ভয়

ছায়া দেবী

ঝঞ্ঝা ভীষণ দীর্ঘ গহন দুর্যোগ ঘন রাতি,
চন্দ্রতপন নিদ্রানিলীন স্তব্ধ স্তিমিত বাতি।
হুঙ্কার রবে বজ্র নামিছে হানিছে অট্ট হাস,
ঝন ঝঙ্কারে গর্জন জাগে দৈত্য ফেলিছে শ্বাস,
দুর্জয় ঘোর ভৈরব রবে রুদ্র জেগেছে আজ,
ভীম-তাণ্ডব পৃথ্বী মথিছে নাহিত শঙ্কা লাজ,
নির্মম ক্রুর কঠিন হিংসা-সর্প উঠিছে দুলি,
বিষে জর্জর বিশ্ব ভুবন ধর্ম গিয়াছে ভুলি।
হীন বর্বর ঈর্ষা নাগিনী দীর্ণ করিছে ধরা,
দুর্বার লোভে খড়্গ নাচিছে হানিয়া শোণিত ধারা
কলুষ দ্বন্দ্ব ঘৃণা বিদ্বেষে মরণ করিছে গ্রাস,
জীর্ণ মানবে, ভীম খর্পরে নাচিছে সর্বনাশ।
শঙ্কা গহন বিঘ্ন ভীষণ প্রলয় এলোরে আজ,
পিশাচ, দৈত্য, প্রেত ও রক্ষ পরেছে যুদ্ধ সাজ।
মত্ত আবেগে হিংসার বিষে ভায়েরে ভুলিছে ভাই
চণ্ড রোষণ, গ্লানি অপমান ভরেছে সকল ঠাঁই।

মর্দিত করি শত শত হিয়া ক্রন্দন ওঠে জাগি,
দুর্দিন ঘোরে জাগ্রত হও দেবতা মোদের লাগি।
নির্মম ক'রে দগ্ধ করিয়া ক্লিন্ন পাপের ফাঁস,
রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া ঘুচাও সবার ত্রাস,
পদতলে তব মর্দিত করো, চূর্ণিত করো ভয়,
বাজাও শঙ্খ মন্দ্রিত নাদে গম্ভীব বরাভয়।
এক হাত হ'তে ধ্বংস নামুক, বন্ধ করুক নাশ,
আর হাতে তব অমৃত ধার, মিটাও সবার আশ।
জাতিতে জাতিতে দেশ হ'তে দেশে ব্যক্তি জীবন ভবি
পঙ্কিল হীন ঘৃণা বিদ্বেষে নিমেষে লও গো হবি।
শুনাও তোমার অমৃত বাণী পান্থ, লভিবে জয,
মানব তীর্থে নাহি রহে পাপ, গ্লানি অপমান ভয।
শুদ্ধ দীপ্ত তপোবন হ'তে গম্ভীব বাজে বাণী
মুক্ত বহিও অন্তর লোকে পরাজয নাহি জানি।
নির্মল হৃদে শুভ্র আলোকে বিদ্বেষ হবে লীন
নব সাধনায নব প্রেরণায আসিছে পুণ্য দিন।
প্রেম-করুণায, ধীব বিশ্বাসে নির্ভীক পদে আজ
যাত্রী তোমাব পথ হবে সুরু দুর্গম পথ মাঝ।
কেটে যাবে রাতি, প্রলয বিঘ্ন, ঘুচিবে অন্ধকাব,
পান্থ, তোমাব দিন এলো ঐ দীর্ঘ তপস্যার।
নিষ্ঠায, তেজে কর্মে ও জ্ঞানে চূর্ণিত কবি ভয
পথে এসো নামি, ওই শোন ধ্বনি—যাত্রী তোমাব জয

মার্কসীয় বস্তুবাদ

রাখাল চন্দ্র দাস

(২)

ঘটনাবলীর এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কেহ লক্ষ্য করতে পারে না, ধর্ম্ম বিশ্বাসী ও নীতিবাদীরা কতকগুলি ঘটনাকে তাদের ঐতিহাসিক ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে চিরন্তন সত্য বলে আঁকড়িয়ে থাকৃতে চায়। কিন্তু তাদের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাদের সেই চিরন্তন সত্যও যে বদলে যায় তারা তা জানৃতেও পারে না বা জানবার চেষ্টাও করে না, পরিবর্ত্তিত সত্যই তখন আবার তাদের কাছে চিরন্তন হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কসের ডায়েলেকৃটিক বস্তুবাদে চিরন্তন সত্যের কোন স্থান নেই, ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীতিবাদ সম্পূর্ণ অর্থহীন। মার্কস ডায়েলেকৃটিক সমাজকে ডায়েলেকৃটিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন। প্রতি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন ডায়েলেকৃটিক বিচারবুদ্ধি নিয়া—বাস্তবতার ডায়েলেকৃটিক কষ্টিপাথরে। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা ভাল বলে মনে হচ্ছে ডায়েলেকৃটিক বিচারবুদ্ধি নিয়া দেখ্লে হয়ত তাই অন্যায় বলে প্রতিপন্ন হবে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মাপকাঠিতে কোন ঘটনার ভাল-মন্দ স্থির করাই হল সেই ঘটনার ডায়েলেকৃটিক বিচার। যেখানে এই ডায়েলেকৃটিক বিচারের অভাব সেখানে ভুল অবশ্যম্ভাবী। চুরি করা মহাপাপ, আমরা এই নীতিবাক্য শুনে আস্‌ছি, কিন্তু চোখের সাম্‌নে স্ত্রী-পুত্রকে অনাহারে মৃতপ্রায় দেখে কোন ব্যক্তি যদি অনন্যোপায় হয়ে অপরের পকেটে হাত দেয়, তাহলে সে চোর আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে। কিন্তু অপর পক্ষে যদি কোন সম্পত্তিশালী লোক একমাত্র লালসার বসে দরিদ্র অপরের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে, তাহলে সে লোক আমাদের ঘৃণারই উদ্রেক করে—এ দুয়েরই কাজ এক, কিন্তু এ দুয়ের কাজের—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এজন্য দুই-ই আমাদের দু'রকম মনোভাবের সৃষ্টি করে তোলে, কিন্তু নীতিবাদীর চোখে দুই-ই সমান অপরাধী, সমান পাপী।

ডায়েলেকৃটিক বস্তুবাদী মার্কসের নিকটই সমাজ-জীবনের সত্যিকারের চেহারা সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে। ধর্ম্মান্ধ নীতিবাদীরা তাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বড়াই নিয়েও সমাজবিবর্ত্তনের কারণ ও ধারা নির্ণয় করতে সক্ষম হন নাই। জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসও এদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির নাগালের বাইরেই ছিল চিরদিন। কিন্তু ডারুউইন সাহেব এদের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করে দিয়ে জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তন লোকচক্ষুর সাম্‌নে প্রকাশ করে দেখান। এবং ডারুউইনের আবিষ্কৃত এই ক্রমবিবর্ত্তনের সূত্র ধরেই মার্কস্ তার ডায়েলেকৃটিক বস্তুবাদের আলোক সাহায্যে সমাজবিবর্ত্তনের কারণ ও ধারা এমন সঠিক নির্ণয় করেন। মার্কস বলেন, মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। অর্থ-নৈতিক শ্রেণীবিভাগ ও তাদের সংগ্রাম, এ হল মানব সমাজের অগ্রগতির সব ধাপ। সুরু থেকে এই সব ধাপ বেয়ে বেয়েই মানব সমাজ বর্ত্তমানে এসে পৌছেছে। মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনধারাই একদিন মানুষে মানুষে এই শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করে তোলে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আসে শ্রেণী-সংগ্রাম।

ডায়েলেকৃটিক বস্তুবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই ইতিহাসের সকল রহস্যের দ্বার-গুলি মার্কসের কাছে এত সহজেই উন্মুক্ত হয়ে যায়। তিনি তার গবেষণামূলক বিশ্লেষণের ফলে দেখতে পান যে সমাজ ইতিহাস মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনেরই ইতিহাস। আদিম মানুষের কর্ম্মময় জীবন ছিল একমাত্র অর্থ নৈতিক

প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক জীবন থেকেই ধীরে ধীরে একদিন সমাজ গড়ে ওঠে বহুমুখী প্রয়োজনের ধারা নিয়ে। সভ্য মানুষের জীবন তাই শুধু খাওয়া-পরার প্রচেষ্টাতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। তার কর্ম্মময় জীবনে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতিও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। এই সব বিভিন্ন প্রয়োজন স্রোতের আলোড়নে পড়ে সভ্য মানুষ জীবনের মূল আশ্রয়কেই হারিয়ে ফেলেছে। তাই দিক্ ভ্রান্ত পথিকের মত মানুষ কেবল ছুটে বেড়াচ্ছে কখনও এদিক কখনও ওদিক। এদের সভ্যতাভিমান এদের এমন অন্ধ করে রেখেছে যে এরা জানে না যে, এদের সভ্য ও উন্নত বলে গর্ব্ব করার যা কিছু, সবই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উৎস থেকেই জন্মলাভ করছে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ক্রোড়েই লালিত ও পুষ্ট হচ্ছে, কোন প্রয়োজনেই মানুষ জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না যদি না অর্থনৈতিক ভিত্তির আশ্রয় সে লাভ করতে পারে।

মার্কস্ বলেন—শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের যত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সব সমাজদেহের বাইরের কাঠামো। কিন্তু যে ভিত্তির উপর সমাজদেহ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে হল তার অর্থনৈতিক কাঠামো, এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথেই শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সমাজের বাইরের কাঠামোও রূপান্তরিত হয়ে যায়। মানুষের স্থিতিশীল মন সমাজবিবর্ত্তনের কারণ লক্ষ্য করতে পারছেনা বলেই সমাজের বাইরের কাঠামোকেই একমাত্র সত্য ও সনাতন মনে করে আঁকড়িয়ে থাকতে চায়। কিন্তু সমাজবিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক ধারার সাথে যারা সুপরিচিত তারা জানে সমাজের এই বাইরের কাঠামো একদিন অবর্ত্তমান ছিল। এবং প্রথম উদ্ভবের দিন থেকে আড়ম্বর করে বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই এ বর্ত্তমান রূপে এসে পৌচেছে। আধ্যাত্মবাদীরা এ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করছে মানুষের মনে। তারা কল্পনা করে নিয়েছে, মনের ইচ্ছা শক্তিই সকল প্রকার জাগতিক বিবর্ত্তনের মূল। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিই সমাজ গড়ছে, সমাজ ভাঙছে ও আবার নূতন করে সমাজ গড়ে তুলছে। ব্যক্তিত্বকে তাই এরা এত বড় করে দেখছে যে এরা মনে করে অসীম প্রভাবসম্পন্ন ইচ্ছা শক্তিই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে। ব্যক্তিই ওদের কাছে স্রষ্টা ও পূজার্হ, সমষ্টিকে ওরা করে ঘৃণা ও অবহেলা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে আসে একদল বস্তুতান্ত্রিক এরা ছিল জড়বাদী, এদের জড়বাদ দর্শন সমাজবিবর্ত্তনের যা কারণ নির্দ্দেশ করল তাতে বিজ্ঞানের অকাল মৃত্যু ঘটবারই সম্ভাবনা দাঁড়াল। আধ্যাত্মবাদকে অ-প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে অভিযান নিয়ে বেরিয়ে নিজেরাই শেষে আধ্যাত্মবাদের রহস্য জালে জড়িয়ে পড়ল। সমাজ-বিবর্ত্তনে মানুষের মন, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার যে স্থান রয়েছে সে কথা এরা আদৌ স্বীকার করল না। ফলে অদৃষ্টবাদের শূন্য মার্গে এরা এদের বিরোধী আধ্যাত্মবাদের সাথেই গিয়ে হাত মিলালো। মার্কসকে এই জন্যই সমাজ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নিয়া এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সহিতই সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। মার্কস্ ছিলেন ডায়েলেকটিক বস্তুবাদী, তিনি ইতিহাসকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি প্রবাহই মনে করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মনের শক্তি-সত্তাকে কোথায়ও অস্বীকার করে নাই। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও তার মন এ দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই সমাজবিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু মার্কস্ মনকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বলে কোথায়ও স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখিয়েছেন দৈহিক বিবর্ত্তনের ফলে যেমন মনের উদ্ভব হয়েছে, তেমন দেহের প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই মনের ক্রমবিকাশও সাধিত হয়েছে। যখন অর্থনৈতিক ধারার পরিবর্ত্তন সমাজের আবহাওয়াকে বদলিয়ে দেয় তখন পুরাতন মন নূতন আবহাওয়ায় নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গড়ে ওঠে। এই পরিবর্ত্তিত নূতন মন তখন নূতন ইচ্ছা নিয়া, নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তোলার সাহায্য করে।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথেই নূতন আবহাওয়ায় সকলেরই চিন্তধারা যে একই সাথে একই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় তা নয়। এ যদি হ'ত তা হলে সমাজের এত বিভিন্ন মতের বিরোধ সমস্যার মীমাংসার প্রশ্ন আদৌ থাকৃত না। পূর্ব্বেই বলেছি অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই একদিন সমাজ-জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনের উদ্ভব হয় এবং এই সব বিভিন্ন প্রয়োজনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে এবং এরই ফলে বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন ইচ্ছার সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু এই সব বিভিন্ন মতবাদ ছাপিয়েও সমাজে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবল মতবাদ বর্ত্তমানে সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। এ দুটো মতবাদই সমাজের তৎকালীন অর্থনৈতিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। যখন পুরাতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মতবাদের পাশাপাশি পরিবর্ত্তিত নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নূতন মতবাদ গড়ে ওঠতে থাকে—তখন নূতন ও পুরাতনে বাধে সংঘর্ষ। সংঘর্ষে পুরাতন ধীরে ধীরে নূতনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। কারণ পুরাতন মতবাদ যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা তখন শিথিল ও ধ্বংসের পথে চলেছে। তাই শক্তির উৎসমুখ শুকিয়ে গিয়ে পুরাতন মতবাদকে আপনিই দুর্ব্বল হয়ে পড়তে হয়। যখন কেউ প্রশ্ন তোলেন, সমাজে এত বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মতবাদের কোনটাকেই বা ঠিক বলে নির্ণয় করা চলে, তখন নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে-মতবাদ পরিবর্ত্তিত নূতন অর্থনৈতিক জীবনধারাকে পুরোপুরি আবাহন করে নিচ্ছে, সেই মতবাদই সত্য ও গ্রহণীয়।

মতবাদ যত বিভিন্ন রকমেরই হোক্, এদের সবগুলিকে দুই বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক প্রগতিশীল বিপ্লব প্রয়াসী, অপর প্রতিক্রিয়াশীল পুরাতন পন্থী। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদ শ্রেণী-সমাজের শ্রেণীগত জীবনকেই প্রকাশ করছে। সমাজের সুরু হতেই তার এই শ্রেণীগত জীবনেরও সুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলেই এই শ্রেণী বিভাগ জন্মলাভ করেছে এবং সেই থেকে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পথ করেই অর্থনৈতিক জীবনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই সমগ্র সমাজ অবস্থিত রয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক জীবন গোটা সমাজের স্বার্থকে সংরক্ষণ করছে না, শ্রেণী বিশেষের স্বার্থকেই শুধু অগ্রসর করে নিচ্ছে। সমাজ নিয়ন্ত্রণে শ্রেণীরই হল একমাত্র কর্ত্তৃত্ব এবং শ্রেণী-স্বার্থ হল এর পিছনের প্রেরণা।

সাম্প্রদায়িকতা ও কর্তব্য

সুশীল গুহ

সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক মোগলাই সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে খাসদরবারের কাজ ছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় ও প্রাদেশিক কাজগুলো বিশেষ কোরে ধর্মের মুখ চেয়ে বিতরণ করা হোয়েছিল।

বৃটিশের আগমনে মোগল সাম্রাজ্য যদিও তার প্রতাপ হারিয়ে ফেললো, তবু বণিক-ধর্মী বৃটিশসাম্রাজ্যবাদ জমিদারী প্রথা আর সামন্ততান্ত্রিক আইনকানুনগুলো তার নিজের প্রয়োজনেই বহাল রাখতে বাধ্য হোয়েছিল।

এধারে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে মুসলমান সৈন্যগণ তাদের স্বাভাবিক রণপ্রিয়তার পরিচয় দেয়ার দরুণ বৃটিশের ভেদনীতি কার্যকরী রূপে দেখা দিলো। বিদ্রোহের পরই বৃটিশের কঠোর দমননীতি মুসলমানদের উপর আক্রমণশীল হোয়ে উঠলো। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে যখন মুসলমানরা বিশেষভাবে দমননীতির কবলিত, তখন হিন্দুদের একটা দল উচ্চ-মধ্য শ্রেণী থেকে আসে এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতার দরুণ তারা ইংরেজী শিক্ষা (যা গ্রহন করার মূলে স্বচ্ছলতার একান্তই প্রয়োজন) গ্রহণ কোরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসবিত চাকুরীগুলি গ্রহণ কোরতে লাগলো। এ চাকুরী গ্রহণ ব্যাপারটা যদিও একই শ্রেণীর ভেতরকার বিশ্বাসঘাতকতা তবু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। কারণ এটা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীসুলভ সুবিধাবাদ থেকে ঘটেছিল।

অপরদিকে মুসলমান অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী মোগল ঐতিহ্যের দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হোয়েছিল যে তারা ইংরেজী ও ইংরেজের উপর অতি মাত্রায় বীতশ্রদ্ধ ছিল। তারপর তাদের তাঁবেদার উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণী, শ্রেণীসুলভ সুবিধাবাদের দরুণ অভিজাত জমিদার শ্রেণী ও শোষিত কৃষক-প্রজাদের মাঝে শোষক-যন্ত্র হিসেবে কাজ কোরতেই ব্যস্ত রইলো। এতে কোরে এদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা আর নিজেদেরকে বিদেশাগত এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী যা অন্ততঃ হিন্দুদের থেকে পৃথক--এ ভাব বদ্ধমূল হোলো।

এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত শোষিত মুসলমান কৃষক-প্রজা জনসাধারণ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। এরপর আমরা ক্রমেই লক্ষ্য কোরবো যে কি কোরে নিছক শ্রেণী-সুবিধাবাদ ও সংঘর্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হোলো।

মুসলমান জনসাধারণ তাদের শোষক শ্রেণী থেকে হিন্দু বিদ্বেষ আর শিক্ষায় অশ্রদ্ধা,এ দুটি জিনিষ বহুশতাব্দীর নির্বিঘ্নে শোষিত হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ পেল। এতে বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়ার কাজ হোয়ে রইলো। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিশেষের সুবিধার লড়াইতেই একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হোয়েছে। কিন্তু এর বিচিত্রতা এইখানে যে, যে স্থানে শ্রেণী হিসেবে লড়াই হবার কথা নয় সে স্থানে কি কোরে একই শ্রেণীর মাঝে লড়াই হোতে পারলো।

এর একমাত্র কারণ, একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষার দিক থেকে অগ্রগামিতা ও ধর্মের পুনরুত্থানের স্বপ্ন এবং অপর সম্প্রদায়ের শিক্ষায় বিরূপতা ও নিজেদেরকে ভারতের মাঝে বিদেশী ধর্মের প্রেরিত ধর্মাধিকারী বলে জাহির। যদি শুধু শিক্ষার গোলোযোগই হোতো তবে সে গোলযোগ অন্ততঃ সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধরতে পারতো না। শুধু মাত্র আচরিত ধর্মের তীব্র মদের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণীগুলির মারফৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বৃহৎ হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র জনসাধারনকে সাম্প্রদায়িকতায় মাতাল কোরে রাখতে পেরেছে। এদিকে হিন্দুদের অভিজাত ও উচ্চমধ্য শ্রেণী সিভিলিয়ন-তন্ত্রের দৌলতে তাদের অবস্থা

কিছুটা স্বচ্ছল কোরে তুললো, যদিও নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর অবস্থার সে রকম হের-ফের হয়নি। আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সুরুতেই হিন্দু-মুসলমানদের জমিদারী বিশেষ বিপন্ন হোয়ে উঠলো। এর দরুণ যেখানে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক শোষক-শোষিত সম্পর্ক হিসেবে প্রকট হওয়া স্বাভাবিক, সেখানে ধর্মের সুবিধা নিয়ে শ্রেণী-সংঘর্ষ রূপান্তরিত হোলো সাম্প্রদায়িকতায়। এ ব্যাপার ঘটলো ব্যাপক ক্ষেত্রে এবং এর তীব্রতা প্রথম দিকে তেমন বেশী ছিল না, কিন্তু এর ঠিক আগের কতকগুলি ব্যাপারে জিনিষটা রূপ পরিগ্রহ কোরলো। আগেই বোলেছি চাকুরী ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে লড়াই সুরু হোয়ে গিয়েছিল। এই লড়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাকুরী ভাগবাটোয়ারা-নীতির কলকৌশলের দরুণ অবশ্যম্ভাবী রূপে সম্প্রদায়গত লড়াইয়ে পরিণত হোলো। এই লড়াই শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। এরাই স্বার্থ-সিদ্ধির চরম মুহূর্তে দরিদ্র জনসাধারণকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার কোরতে সুরু কোরলো। হিন্দুরা মনে করেন, মুসলমানরাই বেশী অত্যাচারী অপর পক্ষে মুসলমানরাও ঐ কথাই মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে যেখানে যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদেরকেই বেশী অত্যাচারী হোতে দেখা গেছে।

সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের এই অবিশ্বাসের দরুণ কয়েকটি অনিষ্টতা তাদের ভয়াবহ রূপে হাজির হোয়েছে। প্রথমতঃ এই যে ঝগড়া যার মূল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক হওয়ার দরুণ শ্রেণী-সংগ্রাম পুষ্টিলাভ করা উচিত ছিল এবং সম্পূর্ণরূপেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা, তা আচরিত ধর্মের সিঁড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে সাম্প্রদায়িকতার চোরা বালিতে আটকে গেল। এর আসল রূপটা কেউই দেখতে পেলো না। এখানেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃতিত্ব। কংগ্রেসে মুসলমান জন-সাধারণের যোগ না দেয়ার মূলেও এই জিনিষ। হিন্দুরাই উদ্যোগী হোয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোরেছিল—ফলে এতে হিন্দুয়ানীর ছাপ থাকতে বাধ্য। কিন্তু যখন মুসলমানদের এতে যোগ দেয়ার সময় হোলো তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসে হিন্দুত্বের প্রভাবের কথা প্রচার কোরলো। কিন্তু এই প্রচারের দরুণ মুসলমান জনসাধারণ নেহাৎ হিন্দুরা সংশ্লিষ্ট বোলেই; এমন একটা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল না যেটাতে জমিদার, মিল-মালিক আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে তাদের বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে। কেবলমাত্র এরই ফলে দেখছি বাংলাতে কংগ্রেসের অপ্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ, এ ঝগড়া মিটাবার চেষ্টাও এক কিম্ভূত উপায়ে সমাধানের চেষ্টা হোচ্ছে। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগই এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু এদের প্রচেষ্টা দেশের এতো স্বার্থহানিকর যে একে কিছুতেই বরদাস্ত কোরতে পারা যায় না। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে অপরের মালিক বলে গণ্য করে এবং সেই দৃষ্টি নিয়ে অপরকে এমন অধিকার দিতে রাজি হয়, যাতে কোরে নিজ সম্প্রদায়ের মালিকানা স্বত্বের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়। কিন্তু এটা সোজা কথা যে, সম্প্রদায়ের তরফ থেকে কখনো সাম্প্রদায়িক কলহের মিমাংসা কেউ কোরতে পারে না, যতক্ষণ না সে এমন একটি দৃষ্টি নেবে যা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। কাজেই হিন্দু-মুসলিম ধর্মসম্প্রদায় কস্মিণে। ধর্মের ভিত্তিতে অন্য ধর্মীর স্বার্থ দেখতে পারে না। বর্তমানে দুটো প্রতিষ্ঠানই নিজেদেরকে ভারতের স্বাধীনতা-কামী বোলে ঘোষণা কোরেছে। এটা আরো হাস্যোদ্দীপক। কারণ যখন দুই সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তি ছাড়া দেশ স্বাধীন হবে না, তখন অনৈক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠন কোরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে তাড়ানোর কল্পনা নির্বুদ্ধিতার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রমাণও কিছু পাওয়া গেছে। মুসলিম লীগ তাদের সম্প্রদায়ের ক্ষতির সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছে আর হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের আসন বেশী থাকার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কোরেছে।

বর্তমানে আবার উভয় সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বোলতে আরম্ভ কোরেছেন যে, তাদের সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়াই দেশে স্বাধীনতা আনবে। কিন্তু যারা ভারতের সমাজে পরস্পরবিমুখী শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব আর

আগামী বিপ্লবকে বিশ্বাস করে তারা একথা মেনে নিতে পারে না। কারণ যে-কোনো সমাজ, তা হিন্দুই হোক্ আর মুসলিমই হোক্ তার ভেতরে যখন এক বিরাট শোষিতের শ্রেণী রয়েছে তখন বিপ্লবের সময় তাকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করার মানেই হোচ্ছে,তাকে ইচ্ছে কোরে সাম্রাজ্যবাদীর দিকে ঠেলে দিয়ে (তাকে স্বপক্ষে আনা যেতো) সাম্রাজ্যবাদীর শক্তি বাড়ানোকে সাহায্য করা। জেনে শুনে আর কোন্ বিপ্লবী এ মারাত্মক ভুল কোরতে চান। তবে আশার কথা যে, যাঁরা এ ধরণের কথা বলেন তাঁরা নিজেদেরকে বিপ্লবী বোলে দাবী করেন না। কাজেই আজ এ সিদ্ধান্ত অসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায় যে আচরিত ধর্মের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যাবে না এবং আচরিত ধর্ম বাস্তবক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সহায়। সুতরাং আজ আমাদের জন-সাধারণকে এমন একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে চালনা কোরতে হবে, যার দরুণ জনসাধারণ নিজেদেরকে পরস্পর শত্রু না ভেবে সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীর শত্রু ভাবতে পারে। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গী কী ? বিনা দ্বিধায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সে হোচ্ছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। এ হোচ্ছে এমন একটা সাধারণ ভূমি যার ওপর সকল সম্প্রদায়ই অসঙ্কোচে পরস্পর হাত মেলাতে পারে। তার কারণ ভারতের জনসাধারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রেণীগতভাবে কতগুলি মুষ্টিমেয় শ্রেণী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা শোষিত। যে হেতু এখানে ধর্মের প্রশ্রয় নেই, সেই হেতু সাম্প্রদায়িক শত্রুতার প্রেরণা শ্রেণী-শত্রুতায় পরিণত হোয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একই সময়ে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও শ্রেণীহীন সমাজের জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত কোরবে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটাকে অসাম্প্রদায়িক কোরে তোলার সুযোগ আছে। সেইজন্য একেই সংঘবদ্ধ কোরে সম্পূর্ণ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত কোরতে হবে এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি কোরতে হবে। এই জনসাধারণকে তাদের স্থানীয় অর্থনৈতিক দাবীর জন্য সংঘবদ্ধ করাই হবে কর্মীগণের বর্তমান কর্তব্য। সাম্প্রদায়ীক প্রতিষ্ঠান-গুলি আর ব্যাপারগুলিতে ভ্রূক্ষেপহীন অবজ্ঞা দ্বারা অসমর্থ কোরে ধ্বংস কোরতে হবে। কিন্তু কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতাকে নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারায় বিশ্লেষণ কোরে একে ত্যাগ করার মনোবৃত্তি গ্রহণ করাবার দায়ীত্ব সম্পূর্ণ তাঁদের হাতে রোয়েছে। কিন্তু তাঁরা যেন পাঁক থেকে আরো বেশী পাঁক না তোলেন।

সব শেষে এটুকু পরিষ্কার হোলো যে কংগ্রেসকে শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়ে, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করাই হোচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার চরম পন্থা। কিন্তু এর জন্য সবার আগে কর্মীগণের নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন করার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই জন্য যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ধর্মের ভেতর দিয়ে ফ্যাসিজম্ আত্মপ্রকাশ কোরবে—এ নিশ্চিত। সর্ব ভারতে গান্ধীপন্থী আর বাংলাদেশে বিশেষ কোরে কতকগুলি দলের ভাবধারা এ ব্যাপারেরই নিশানা দেয়। কাজেই এমতাবস্থায় এখন থেকেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ভিত্তিতে দলগুলিকে পুনর্গঠণ করা সবার আগেকার কাজ। কারণ এদিকে লক্ষ্য না রেখে গতানুগতিক ধারায় আন্দোলন কোরলে খানিকটা রাজনৈতিক উত্তাপই সৃষ্টি হবে, আলো পাওয়া যাবে না। এবং আগামী বিপ্লবের পর আমরা দেখবো যে আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্যই পণ্ড হোয়েছে। এ যদি না চাই তবে আমাদেরকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হোতে হবে এবং তা আজই।

ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ

ডাঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, পি এচ, ডি,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর অনেকের কাছ থেকে একথা শুনেছি এবং আজও শুনি যে বাংলার বৈপ্লবিক অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনটি নাকি একটি প্রতি ক্রিয়াশীল হিন্দু আন্দোলন মাত্র ছিল। এই বিষয় প্রশ্ন কর্তারা আন্দামান হইতে প্রত্যাগত বৈপ্লবিকদের লেখা থেকে নজির দেখান। ইহারা নাকি ধর্ম ও রাজনীতির জগাখিচুড়ির একটা আন্দোলন করেছিলেন এবং যোগী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু পুরুষ ধরে বেড়াতেন। কিন্তু বাস্তব পক্ষে দুএকজনের একটা tendencyকে সমস্ত আন্দোলনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না এবং ব্যক্তিগত মতও সমস্ত আন্দোলনের মত নয়। এই যে ভারত ব্যাপী একটা আন্দোলন হয়েছিল তন্মধ্যে নানা লোকের নানা প্রকার মত থাকার জন্যও ইহাকে একটা ধর্মগত আন্দোলন বা একটা বর্ণগত আন্দোলন বলা চলে না। Valentine Chirol তার "Indian Unrest" নামক পুস্তকে বলেছেন যে এই আন্দোলনটি পুণা চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের রাজক্ষমতা পুনরুদ্ধার করবার একটি ফন্দি মাত্র ছিল, আর ইহা হিন্দু উচ্চ জাতিসমূহের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিদ্বয়ের পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রেরা জানেন যে একথা সর্বৈব মিথ্যা। আবার সেদিন বেলুড় মঠের কোন এক স্বামীর দ্বারা 'শক্তি পূজা' বিষয়ে লিখিত এক পুস্তকে পড়লুম যে বাংলায় এক বৈপ্লবিক দল "মহামান্য সম্রাটের বিপক্ষে লোকের মন বিগড়াইবার জন্য শক্তিপূজার নামে নিজেদের প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন।" গ্রন্থকার সাধারণকে এদের থেকে সতর্ক হবার জন্য সাবধান করেছেন। গ্রন্থকার কোন্ সম্প্রদায়কে এই কথা লক্ষ্য করে বলেছেন তা বুঝলাম না। ইহা নিশ্চয় বৈপ্লবিক সম্প্রদায় নয়—এই সব ধারণার বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষে আমি যতদিন এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলুম, ততদিন এই আন্দোলনকে কোন ধর্মভাব বিশিষ্ট বলে পরিচিত করা যেতে পারতো না। তবে সভ্যদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী বলে তাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ হিন্দু মনোভাব জাগ্রত থাকত। জাতীয় কংগ্রেস যেমন হিন্দু প্রতিষ্ঠানও নয় এবং হিন্দু ধর্মও প্রচার করে না, তদ্রূপ এই যে নিখিল ভারত আন্দোলন গড়ে উঠতেছিল তা হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের বাহন স্বরূপ ছিল না।

ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সভ্য ছিল এবং এমনকি কোন কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও এই গুপ্ত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। তবে এই কথা আজ মনে হয় যে, সেই সময় হিন্দু মুসলমানে তত সৌহৃদ্য ছিল না যাহা আজ দৃষ্ট হয়। তখন হিন্দু-মুসলমান কর্মী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একযোগে কাজ করতে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এবং একথাও সত্য যে জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান কর্মীর বিশেষ অভাব তখন ছিল।

এক্ষণে, যাঁরা "যোগী-সিদ্ধপুরুষ" আবিষ্কার করে ভারত উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন বলে দাবী করেন, তাঁদের কথাটা কতদূর গ্রহণীয় তাহা বিচার করা যাক। বাংলার বৈপ্লবিক দলের নেতা প্রমথ নাথ মিত্র মহাশয়—চট্টগ্রামের পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কখনও ধর্মের কথা শুনিনি। বরং অসংকোচে

তাঁর গুরুর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন। যুবক কর্মীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জনকতেক লোক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন। দেবব্রত বসু ব্রাহ্ম সমাজ থেকেই এসেছিলেন, যদিচ শেষ কালে তিনি 'স্বামী' হয়ে সনাতনী-হিন্দু হন। তবে দুই এক জন লোক ছিলেন যাঁরা জ্ঞানানন্দ স্বামীর হিন্দুধর্ম মহামণ্ডলের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকতেন, আবার উত্তর বঙ্গের একজন প্রবীণ লোক ৺শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ব্রাহ্ম সমাজ প্রসূত এবং ইংলণ্ডে বাল্যকাল থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেকে Liberal হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। কথাটা এই—কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে সমিতি হস্তক্ষেপ করত না। তবে এই কথা বলতে বাধ্য যে পৃথিবীর সর্ব দেশের ন্যায় ভারতের বুর্জোয়া নেশন্যালিষ্ট বা বিপ্লবীরা ধর্মকে নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করত। এবং আজ পর্যন্তও ইহাই চলছে। একবার আমাদের একটি খৃষ্টান বন্ধুকে যখন শিবাজি উৎসব উপলক্ষে তিলক সম্বর্ধনার জন্য নিমন্ত্রণ করতে যাই—তখন তিনি বলেছিলেন "আমি খৃষ্টান, আমি হিন্দুধর্ম মানি না, তবে আমাদের দেশের লোকেরা এত Fanatic যে তাদের ক্ষেপাবার জন্য যদি 'ভবানীপূজা' প্রভৃতি ধর্মের ক্ষ্যাপান প্রয়োগ করা যায় তবে আমার কোন আপত্তি নাই।' আমার বোধহয় যে সব বুর্জোয়া Nationalist যাঁরা ধর্মের কথা কন তাঁরা রাজনীতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে এই চক্ষেই দেখে থাকেন। বরোদা হতে আমদানি করা 'ভবানী মন্দির' Scheme এর পশ্চাতে এই মনস্তত্ত্বই ছিল অর্থাৎ একটা মন্দির স্থাপনা করে একদল রাজনৈতিক সাধুদ্বারা (অবশ্য যারা কালে পাণ্ডারূপে পরিণত হবে) পরিচালনা করা এবং যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তুলে ভারতের বৈপ্লবিক কার্য করা, আর সেই সঙ্গে যাত্রীদের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রচার করা প্রভৃতি কর্মের পশ্চাতে ধর্মদ্বারা Nationalist কর্ম সম্পাদন করারই ফন্দি ছিল। আবার এই পরিকল্পনাটিও সমিতির সকলের মন গ্রহণ করতে পারেনি এবং বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও অসমর্থ হয়। শুনেছি, একবার ৺হেমচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কলিকাতার জনকয়েক বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় লোককে আহ্বান করে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়। তখন ৺অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিশিষ্ট ভাবে ইহার প্রতিকূলাচরণ করেন। তবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকারের একটি মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে এই পরিকল্পনা সমর্থন করেন। ইনিই নাকি এই পরিকল্পনাকে সমূর্ত করবার জন্য যে সব Trusties নিযুক্ত হন, তার অন্যতমছিলেন। কিন্তু দেবব্রত বসুর নিকট শুনেছি যে তাকে ইনিই বলেছিলেন যে এই পরিকল্পনাটি সফলতা লাভ করবার বিষয়ে তিনি ঘোর সন্দিহান আছেন এবং এই কর্মে এক পয়সা চাঁদা দিয়াও সাহায্য করেন নাই। ফলে এই পরিকল্পনাটি মাস কয়েকের জন্য জনকতেক লোকের মধ্যে আলোচিত হয়, তার পরে কিছু দিনের মধ্যে চিরতরের জন্য সমাধি প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে "লেলে আবিষ্কার" কথার বিচার করা যাক। ১৯০৭—১৯০৮ সালে আমি যখন পুলিশদ্বারা Sedition case-এ অভিযুক্ত হই এবং যুগান্তর আফিস পুলিশ সার্চ করে, তারপর থেকে দেখলাম যে আমাদের দলের দুই একজন কর্মীর আর দর্শন পাওয়া যেতেছেনা। পরে ৺নলিনী মুস্তাফী (ইনি ৺দেবব্রত বসুর মামাত ভগ্নিপতি ছিলেন।) মহাশয় যখন অরবিন্দ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন—অমুক গেল কোথায়, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে ইনি বরোদায় গিয়েছেন। এখন শুনছি যে, ভারতের স্বাধীনতা কল্পে "সিদ্ধপুরুষের" সাহায্য গ্রহণের জন্য পশ্চিম ভারতে গিয়ে—লেলেকে জোটাইয়া—বাংলায় লেলিয়ে দেবার আয়োজন তখন হতেছিল। ইহাতে ভারত কতদূর স্বাধীন হয়েছে তাহা ঐতিহাসিকগণই বিচার করবেন। এখনও যুগান্তরের পুরাতন কর্মীদের মধ্যে দুএকজন যারা জীবিত আছেন, তাঁদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি হয়! দুঃখের সহিত বলতে বাধ্য হলাম যে, এই গোঁজেলি ব্যাপারটি অরবিন্দের তাঁবেদার

দু'একজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সহিত এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক ছিল না। লোকমুখে শুনেছিলুম বিভীয়বার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করবার পূর্বে অরবিন্দ ও তাঁর বরোদাস্থিত কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুরা কোন এক সাধুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। হ'তে পারে তাঁর ভ্রাতা ও দু'এক জন তার তাঁবেদার এইভাবে ভাবাক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ইহা সত্য নয় যে যুগান্তরের পরিচালকেরা সকলেই এই মতাক্রান্ত ছিল এবং ইহাও সত্য নয় যে নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি অথবা বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী সকলেই এই ভাবাক্রান্ত ছিলেন। দু'এক জনের খেয়ালকে একটা আন্দোলনের মত অথবা কর্মপদ্ধতি অথবা ধারা বলে প্রচার করাকে ইতিহাসে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে "যুগান্তর" সংবাদপত্রের জনকতক কর্মী নিয়েই বাঙ্গলার বৈপ্লবিক সমিতি পর্যবসিত হয় নাই এবং তখন "যুগান্তর পার্টি", "অনুশীলন পার্টি" প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টিও হয় নাই।

বৈপ্লবিক কর্ম তখন গুপ্ত ছিল বলে, তাহার নামে অনেক কথাই প্রচারিত হয়। আমি যতদিন যুগান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম, সেই সময়ের ভিতরে যাদের কখনও যুগান্তর সংশ্লিষ্ট কোন কর্মের মধ্যে দেখি নাই বা সেই আফিসে দেখি নাই, তাঁরা আজ যুগান্তরের লোক বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং যুগান্তর অফিসে কে কি কর্ম করতেন তারও ফিরিস্তি (বিবৃতি) প্রদান করছেন। আজ বাংলার বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন লোকমহলে যুগান্তরের নামের একটা মাহাত্ম্য সৃষ্ট হয়েছে এবং (যুগান্তরের) কর্মীরা বৈপ্লবিক আভিজাত্যবর্গীয় বলে পরিগণিত হন। এই জন্যই নানাপ্রকারের লোক যুগান্তরের সঙ্গে সম্পর্ক টানে এবং নিজেদের যুগান্তরের অন্তরঙ্গ বলে জাহির করেন। এই কারণবশতঃ যুগান্তর সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা আছে। ১৯৩১ সালে উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন কালে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমায় সম্বোধন করে বললেন—"অমুক বাবু, আপনি আমায় চেনেন না। আমি আপনাকে চিনি। আমি এবং অমুক উভয়ে যুগান্তর কাগজ start করি।" আমিও নির্বাক হয়ে তার কথা কয়টি শুনলাম। তিনি তাঁর যে সহযোগিটীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তিনি আমাদের অফিসের একটি তরুণ কর্মী ছিলেন এবং বোধ হয় ১৮।১৯ বছর বয়স তার ছিল। তিনি আজও জীবিত আছেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করেন। এই গল্পটির বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই, পাঠকবর্গ তার বিচার করবেন। আবার ইহাও শুনেছি, পুলিশ যখন যুগান্তর অফিস search করতে আসে, তখন Editor কে খুঁজে না পেয়ে আমার লম্বা দাড়ি দেখে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায়, ইহাই নাকি যুগান্তরের সহিত আমার সম্পর্ক। যখন যুগান্তর পরিচালনার জন্য কানাই ধরের লেনে নেতৃবর্গ ও কর্মীদের meetingএ ৺অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন "কে সম্পাদক রূপে নাম দিতে প্রস্তুত?" তখন কাহারও মুখ দিয়ে কথা বের হয় নাই। তখন আমিই সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলুম এবং তদনুযায়ী পুলিশে Declaration দিয়েছিলুম। পুলিশ কি এতই নির্বোধ যে যাকে তাকে ধরে নিয়ে গেল। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই বাইবেলের সেই কথাটি মনে হয়, যখন Pontius Plate যিশুখৃষ্টকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"সত্য কি?" (What is truth?) জগতে আজ পর্যন্ত কথাটি ধ্বনিত হতেছে—সত্যটা কি? এই কথাগুলি এইস্থলে উল্লিখিত হল যেহেতু যুগান্তরের কর্তৃপক্ষীয় লোক বলে বাঙ্গলায় অনেককেই পরিচয় প্রদান করতে শুনেছি এবং অনেকেই নিজেদের মত বা খেয়ালকে যুগান্তরের তথা বাঙ্গলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মত ও কর্ম বলে প্রচার করে থাকেন।

বিশ্বাসঘাতকের কবলে স্পেন

শ্রীস্নেহলতা সেন

সমগ্র স্পেনে আজ ফ্যাসিজ্‌ম সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সুদীর্ঘ আড়াই বছর ব্যাপী গণতান্ত্রিকদলের কঠোর সংগ্রাম, অসংখ্য জীবন দান, আপ্রাণ চেষ্টা—সবই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদেশী ফ্যাসিষ্ট শক্তিদের সাহায্যেও যা' ক'রে উঠতে পারেনি, স্পেনের জনকয়েক তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেতাদের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে, ইংরেজ ও ফ্রান্সের ভণ্ড গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের চক্রান্তে তা' সম্ভব হয়েছে। নেগ্রিন ও স্পেনের প্রকৃত গণতান্ত্রিক নেতাগণ স্পেন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'য়েছেন। ফ্যাসিষ্ট রাক্ষস আজ স্পেনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তথাকথিত নিরপেক্ষ গভর্ণমেণ্ট স্পেনের গণতান্ত্রিকদলের জনকয়েক সামরিক নেতাদের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন। তারই ফলে গণতান্ত্রিকদলের সামরিক নেতা ক্যাসাডো জনসাধারণের নামে এক নতুন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করলেন। গণতান্ত্রিক দলের এতদিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, যুদ্ধের অবসান ঘটানই হ'ল এই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। এই নতুন গভর্ণমেণ্টের সভাপতি হ'লেন জেনারেল মিয়াজা। একদিন যিনি ফ্রাঙ্কোর আক্রমণ থেকে মাদ্রিদ রক্ষা করেছিলেন, পরিশেষে তিনিই হ'লেন এই বিশ্বাসঘাতক গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার। এই নতুন গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টির মূলে যে ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের হাত ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীলদলের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ হ'ল যে, ক্যাসাডো ও বেষ্টেইরোর নতুন গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টির খবর লণ্ডন অধিবাসীরা আগে থেকেই জানতো। মাদ্রিদে ইংরেজ রাজদূত ক্যাসাডোকে নতুন গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে সাহায্য করেছিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টও এই ষড়যন্ত্রের সব খবরই রাখত এবং এর সঙ্গে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিল। স্পেনীও গণতন্ত্রের সভাপতি আজানার পদত্যাগও এই ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ। ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টই আজানাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। আজানার পদত্যাগ পত্রেই ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকদলের যুদ্ধের অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজানা তাঁর পদত্যাগ পত্রে প্রথম প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী জানালেন। ক্যাসাডোর গভর্ণমেণ্ট আজানার পদত্যাগে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'ল তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল। তারা ঘোষণা করে দিল যে নেগ্রিনের গভর্ণমেণ্টে আর আইনত কোন অধিকার নেই। তারা এই যুক্তি দেখাল যে, আজানার পদত্যাগের সঙ্গে নেগ্রিনের গভর্ণমেণ্টের আইনগত ভিত্তি লোপ পেয়েছে, ইংরেজ ও ফরাসী কাগজগুলিও এই যুক্তি সমর্থন করল। কিন্তু ক্যাসাডোর গভর্ণমেণ্টের আইনগত ভিত্তি যে কোথায় এ প্রশ্ন নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামালো না। ক্যাসাডোর গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ ও ফরাসী ধনিকগণেরই ইচ্ছামত কাজ করছিল ব'লে তাদের বেলায় আর আইনের প্রশ্ন উঠলো না। এমনি ক'রেই ক্যাসাডো ও মিয়াজা স্পেনীও গণতন্ত্রের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার ক'রে দিল। কিন্তু মিয়াজা বা ক্যাসাডো কারুরই জনসাধারণের নামে স্পেনকে বলি দেবার অধিকার ছিল না। স্পেনের ইতিহাসে মিয়াজা ও ক্যাসাডোর গণতান্ত্রিকদলের নামে ফ্রাঙ্কোর কাছে আত্মসমর্পণ এক লজ্জাকর কাহিনী। এতদিন পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কো ও তার বিদেশী ফ্যাসিষ্ট মিত্রগণ স্পেন থেকে বলশেভিজ্‌ম্ দূর করবার ধূয়া তুলে যুদ্ধ করছিল। ক্যাসাডো গভর্ণমেণ্ট ফ্রাঙ্কোর কাছে প্রকাশ্যভাবে সামরিক পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, গণতান্ত্রিকদলের মধ্যে যারা

সব চেয়ে বেশী ত্যাগের ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, সেই কম্যুনিষ্টদের প্রথম বলিদান করল। ক্যাসাডোর গভর্ণমেণ্টই প্রথমেই ঘোষণা করল যে তারা স্পেনকে কম্যুনিষ্ট অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে, অতএব ফ্রাঙ্কোর তাদের সঙ্গে সন্ধিতে আপত্তির কিছুই নেই। তারা আরও বল্ল যে কম্যুনিষ্ট বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে বৈদেশিক প্রভাব বিলুপ্ত হ'য়েছে। অতএব সম্প্রতি ওদের নিজের মধ্যে মিটমাট করা এখন মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হ'ল এর চেয়ে মিথ্যা উক্তি আর হতে পারে না। কারণ ক্যাসাডো গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টির মূলে ছিল ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রভাব। তাদের প্রত্যেক উক্তিই ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের শেখানো বুলি। একদিন এই মিয়াজা-ক্যাসাডোই কম্যুনিষ্টদলে যোগ দিয়েছিল যখন কম্যুনিষ্টরাই ছিল গণতান্ত্রিকদলের সব চেয়ে বড় সহায়। কিন্তু পরিশেষে তারাই ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য কম্যুনিষ্টদের অফিস অধিকার করল ও বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতাদের বন্দী করল। কম্যুনিষ্ট নেতাদের বন্দী করার ও কম্যুনিষ্টদলের ওপর ক্যাসাডো গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের খবর যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন বহুস্থানে গণতান্ত্রিক সৈন্যদল এই দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহে মাদ্রিদের শ্রমিকরাও যোগদান করল।

ক্যাসাডো-মিয়াজার গভর্ণমেণ্ট নৃশংস অত্যাচারের সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করল ও কম্যুনিষ্ট অফিসারদের গুলী করে মারল। যারাই এই ঘৃণিত আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেল, তাদেরই এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের গুলীর আঘাতে প্রাণ দিতে হ'ল। সমগ্র স্পেনই আজ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদলের করতলগত। স্পেনের বিপ্লব আজ ভণ্ড নেতাদের জন্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েছে। নেগ্রিন ও তার মন্ত্রীগণ আজ পলাতক। স্পেনে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে কিন্তু শান্তি আসেনি।

'Spain Betrayed' by Ellen Roy হইতে অনুবাদ।

প্রত্যাবর্তন

।দাস
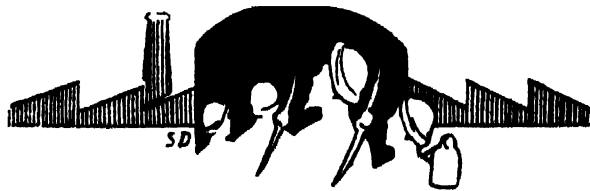
বাইরে আসতেই সকলের সবপ্রথম দৃষ্টি এসে পড়ছে আমাদের জীবনের জমাখরচের খাতার উপর। কতখানি আমাদের নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া হয়ে ফিরেছি কিনা, কিম্বা আজও একটু কিছু আমাদের মধ্যে বাকী রয়ে গিয়েছে—দীর্ঘ অভিনব জীবনের ভিতর হ'তে নূতন কোনও সম্পদ সঞ্চয় ক'রে আনতে পেরেছি কিনা— সকলেই সব চেয়ে আগে সেইটাই ভালো ক'রে জেনে শুনে নিতে চাইছে।—আমাদের জীবনের হিসাবের খাতা audit ক'রে নেবার সম্পূর্ণ অধিকার দেশের যে আছে সে তো আমরাও জানি। কিন্তু আমরা আজ যা চাইছি সে শুধু একটুখানি সময়। হিসাব-নিকাশের ব্যাপার একদিনের মধ্যে শেষ ক'রে দিতে আমাদের অনিচ্ছা। "সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুদিন করিয়াছি বাস"।—তারই নিষ্ঠুর অনতিক্রম্য ছাপ আমরা আজও সবটুকু মুছে ফেলতে পারিনি, তারই প্রতিক্রিয়ায়—সেই সুদীর্ঘ দিনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের দেহমনের যে গঠন এতদিনে রূপলাভ করেছে—আমরা যে জানি তার মধ্যে আজও রয়ে গিয়েছে অনেকখানি অবাস্তব, অলীক-ক্ষণিক। রয়ে গিয়েছে অনেক উচ্ছ্বাসের আতিশয্য যা ধীরে ধীরে সমতালাভ করবে, অনেক ধূলি মলিন আবিলতা যা ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ হ'য়ে আসবে। দেশের কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু, পরীক্ষক দৃষ্টির সামনে নিজেদের সব কিছু উদ্ঘাটিত ক'রে দেবার আগে আমরা চাইছি একটু অবসর—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে ঋজু ক'রে নিতে হ'বে আমাদের বন্ধন-পঙ্গু দেহযষ্টি। দেহমনের আনাচে-কানাচে পড়ে গিয়েছে যে অব্যবহারের মরিচা, সেখানে নিয়ে আসতে হ'বে পরিচ্ছন্নতা আর তীক্ষ্ণতা।— নির্জনতার অন্ধকারে চিন্তা আর কল্পনার খনি থেকে তুলে এনেছি যে সোনার স্বপ্নগুলি, দেশের ঔৎসুক্য-চঞ্চল প্রসারিত হাতে সে দেবার আগে তাদের নিতে চাই একবার বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে।—"কিন্তু সময় যে নেই!"—সময় যে নেই সে কি আমরাও বুঝি না? চারিদিকে আসন্ন ঝড়ের সূচনা।—ঘনীভূত অন্ধকার—বিভ্রান্ত পথহারা পথিকের ভীত আর্তকোলাহল—এরি মাঝে আবার আমরা ফিরে এসেছি। তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোণার সময় এ তো নয়, উত্তাল তরঙ্গের সমস্ত প্রচণ্ডতা আজ বুক পেতে নিতে হ'বে। ভেবেছিলাম আমরা বুঝি বড় ক্লান্ত, অবসন্ন, আমাদের বুঝি দরকার একটু বিশ্রাম একটু-খানি স্নেহশীতল স্নিগ্ধ নীড়। কিন্তু বাইরের সংগ্রাম-সঙ্কুল জীবনের অজস্র প্রয়োজনের অসংখ্য দাবী আমাদের সেই শান্তি-লিপ্সাকে ভৎস না করে—বিদ্রূপ করে—লজ্জা দেয়।—ভেবেছিলাম দীর্ঘ দিনের বঞ্চিত জীবনের শতছিদ্রময় জীর্ণ শূন্য পাত্র আমাদের বাইরে এসে আবার তিলে তিলে, পলে পলে পূর্ণ ক'রে তুলতে হ'বে। কিন্তু বাইরের দিকে চেয়ে দেখি সেখানে শূন্যতার গহ্বর, অভাবের বুভুক্ষা লক্ষ জিহ্বা প্রসারিত ক'রে অহরহ আর্তনাদ ক'রে ফিরছে, "মৈ ভূখা হুঁ"। সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে আমাদের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার অতি তুচ্ছ অতৃপ্তি কোথায় কোনখানে তলিয়ে যায়—স্থান পায় না।—তবু খাঁচার দরজা খুলে দিলে পাখী যে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দিতে পারে না—অনভ্যাসের সেই নিষ্ঠুর কাঁটা আমাদের পায়েও যে আজ বিঁধে রয়েছে, তাও তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না—এগিয়ে চলার আগে সেগুলি বেছে যে আমাদের ফেলতেই হ'বে।—তাই শান্তি নয়—বিশ্রাম নয়, চাইছি শুধু একটু সময়। দেশের বিরাট দেহ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখে দিয়েছে—বহুদিন, বহুমাস, বহুবৎসর। আজ আবার তার কাছে ফিরে এসেছি। যদি হ'য়ে গিয়ে থাকি অক্ষম, অপদার্থ, অকর্মণ্য তবে দূষিত-বিষাক্ত অঙ্গের মতই সমাজ দেহ থেকে আমাদের

জীবনগুলিকে দূরে ফেলে দিতে হ'বে। আর যদি আজও থাকে আমাদের মধ্যে প্রাণের একটুখানিও স্ফুরণ তাহ'লে তারই জোরে আবার জড়িয়ে পড়ব, দেশের সঙ্গে এক হ'য়ে যাব—অস্থিতে মজ্জায় রক্তপ্রবাহের অবিরত সঞ্চালনে।—"সময়"ই সেটা ঠিক ক'রে দেবে—সে বিচারের ভার শুধু সেই নিতে পারে। কিন্তু খাঁচার পাখীর উপমা যেমন সত্যি, ঝরণার মুখ থেকে পাথরের চাপা তুলে নিলে তার সেই দুর্দম কল্লোলময় গতিস্রোতের উচ্ছলিত প্রবাহের কাহিনী সেও তো সমানই সত্যি। তাই ভাবি আজ বহুদিনের বন্ধনের পর, বিচ্ছেদের পর, মুক্তির আলোয় স্বাধীন গতিবিধির আনন্দে, প্রিয়-পরিজনের সংস্পর্শে আমাদের জীবনগুলিকে কেন্দ্র ক'রে যে ছোট খাট সুখ দু'খের বুদবুদ, যে "হাসি কান্না" "হীরা পান্না" যে বিস্ময় বেদনার রোমাঞ্চ আজ ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল্ ক'রে উঠ্‌ছে, যদি ভাষার মধ্যে তাদের ফুটিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে, সে ইচ্ছা কি একান্তই স্বাভাবিক নয়? তত্ত্ব নয়, তথ্য নয়, শুধু আমাদের বন্দী-জীবনের একটুখানি আভাস—সেখানে দুঃখের মধ্যে যা নিয়ে আমরা হেসেছি—সেখানে সত্যের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বারে বারে আমাদের হয়েছিল—জীবনের, জগতের যে নগ্ন মোহ-মুক্ত সব আবরণহীন মূর্ত্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পেয়েছি, তারই দু'একটি কাহিনী, দু'একখানি ছবি যদি আজ উপহার দিই, কেউ কি হাতে তুলে নেবে না? আমাদের কিন্তু যে দিতে ভালো লাগ্‌বে। "একক" জীবন অনেক দিন তো যাপন করেছি, আজ ইচ্ছা করে সবার সঙ্গে নানান ভাবে নিজেদের জড়িয়ে দিতে। ইচ্ছা করে আমাদের আজকের অকারণ কলহাস্য দিয়ে মুখরিত ক'রে তুলতে চারিদিকের বিষণ্ণ আবহাওয়া, আমাদের সদ্যমুক্ত প্রাণ-প্রবাহ দিয়ে নিয়ে আসতে চারিদিকের মন্থর গতিস্রোতে একটুখানি চাঞ্চল্য। এতদিন পরে সবই যে আমাদের নূতন লাগছে, সামান্য জিনিষকেও যে অসামান্যতার রং-এ রাঙ্গিয়ে নিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কত পরিচিত মুখ খুঁজে পাচ্ছিনা, কত চেনা জিনিষ অচেনা মনে হ'চ্ছে—তারই বিস্ময়োক্তি, তারই আনন্দ-কলরব আজ রাজপথের সমস্ত কোলাহলকে চাপিয়ে উঠুক, পথচারী পথিকের কানে বেজে উঠুক আমাদের এলোমেলো কথা, প্রলাপ, অকারণ হাসির টুকরো—অজানিত বিষাদের কারুণ্য। ওরই মধ্য দিয়ে তারা বুঝে নিক আমাদের মনের অবস্থা—অনুভব ক'রে নিক আমাদের উত্তেজনা আর উদ্বেগ,—আর তাদের সেই স্বল্প সহানুভূতি—স্বল্পতম মৃদুহাসি হোক্ আমাদের সঙ্গে দেশবাসীর প্রথম যোগসূত্র।—মিলবার প্রথমতম সোপান।

ক্রমশঃ

সৈনিক

দেবাংশু সেনগুপ্ত

(গল্প)

Private Smith যখন সামান্য চুরির অপরাধেই তৃতীয় বার জেলের দরজায় পা দিল তখন সামান্য কয়েদী ওয়ার্ডার থেকে স্বয়ং জেলর পর্য্যন্ত বিশেষ বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

বাস্তবিক পক্ষে সে যখন সৈনিকোচিত দৃঢ় এবং লম্বা পদক্ষেপে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের মতই নিশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াতো, তখন তার ছয় ফিট লম্বা দেহের উপরাংশে স্থাপিত নির্দোষ এবং সরল মুখখানার দিকে চেয়ে তাকে সামান্য ছিঁচকে চোর বলে ভাবা একান্তই অসম্ভব ছিল। সমস্ত জেলের মধ্যে তার মতো বাধ্য আর নরম স্বভাবের কয়েদী আর একটীও ছিল না। তার এই রকম সুন্দর আচরণের জন্যই গত দুবার সে নির্দ্দিষ্ট দণ্ডভোগের আগেই মুক্তি পেয়েছিল।

বৃদ্ধ জেলর মানব চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। জেলের আবহাওয়ার সঙ্গে স্মিথের এই চরিত্রগত অসামঞ্জস্য তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কোরতেন। স্মিথের মানসিক ধারা ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তিনি উত্তরোত্তর কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন। একদিন তিনি স্মিথকে তার নিজের বিশেষ কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

স্মিথ এসে দাঁড়াল। মুখে কিংবা হাবভাবে অপরাধী সুলভ কোনরকম ভয় কিংবা দ্বিধার চিহ্ন নেই। সৈনিকদের বিলাসিতার অঙ্গ স্বরূপ বক্ষে আর বাহুতে কতগুলি উল্কী-রেখা।

যদিও জেলের বইতে তার অপরাধ ইত্যাদি সব কিছুই লেখা ছিল, জেলর আরেকবার জিজ্ঞেস কোরলেন "কি দোষ কোরে জেলে এসেছো ?"

"আজ্ঞে চুরি।"

জেলর এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আশা কোরেছিলেন না, তিনি ভেবেছিলেন যে অন্যান্য শতকরা নিরেনব্বইজন কয়েদীদের মত সেও বলবে যে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। সনাক্ত করণের ভুলে, বিচার বিভ্রাটে, পুলিশের আক্রোশ বশতঃ অথবা শত্রুদের চক্রান্তেই সে জেলে এসেছে বলে কোন রকম একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসবে। স্মিথের ক্ষেত্রে তিনি হয়ত এরকম সাফাই বরদাস্ত কোরতেও রাজী ছিলেন, কিন্তু এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির জন্য তার ওপর জেলারের শ্রদ্ধা বাড়লো ছাড়া কমলো না। তিনি একটা চেয়ার আনিয়ে তাকে বসতে দিয়ে সম্মানিত কোরলেন।

"কি চুরি কোরেছিলে ?"

"একটা ঘড়ি।"

"এর আগের বার ?"

"একটা সার্ট।"

"তার আগের বার ?"

"এক বাক্স চুরুট।"

প্রত্যেকটা চুরির ইতিহাসও তিনি শুনলেন এবং তাতে কোনরকম কৌশলের নিতান্ত অভাবও লক্ষ্য কোরলেন।

"দেখ একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, তোমরা সৈন্যরা যা রোজগার করো তা দিয়ে সামান্য একটা ঘড়ি, সার্ট অথবা একবাক্স চুরুট কেনা মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কেমন ?"

"না, মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।"

"তবে চুরি করতে যাও কেন ?"

স্মিথ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জেলরের মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছিল যে একটী বিজাতীয় হতভাগ্য চোরের সম্বন্ধে জানবার জন্য জেলরের মত একজন লোকের প্রকৃত আগ্রহ হওয়া সম্ভব কিনা।

"স্বভাব" এই কথা বললেই সে সকল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারতো, কিন্তু জেলরের আন্তরিকতা তাকে যেন কোথায় স্পর্শ কোরেছিল, বললো—"সে তো অনেক কথা, আপনি কি সত্যিই শুনতে চান?"

"আমার বাস্তবিকই বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে, যতক্ষণই সময় লাগুক আমার অনুরোধ তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধুভাবে আমার কাছে সব কথা খুলে বল।"

স্মিথের চোখে একটা স্বপ্নাতুর ভাব ফুটে উঠলো, বললো "আচ্ছা শুনুন তবে।"

স্কটল্যাণ্ডের এলাকায় এবং ইংলণ্ডের সীমানার একটা নিতান্ত অখ্যাত পল্লীগ্রামে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন অতি সাধারণ অবস্থার একজন চাষী গৃহস্থ। বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর সংসার যখন এসে আমার ঘাড়ে পড়লো, আমার পোষ্য সংখ্যা ছিল তিনজন, খুব বুড়ী একজন আমার পিসী, আমার মা, আর আমার বউ। বাবা বেঁচে থাকতে কোনদিন টের পাইনি যে আমাদের বাজারে এত ধার ছিল, বাবা তাদের কেমন কোরে দাবিয়ে রেখেছিলেন জানি না, বাবা মারা যাবার ঠিক পরেই তারা একযোগে এসে জুলুম চালাতে লাগলো। এইসব মহাজন আর সরকারী আইন-আদালতের দৌলতে সর্ব্বহারায় পরিণত হোতে বিশেষ দেরী হোল না।

স্বাস্থ্য আমার বরাবরই বিশেষ রকম একটু ভাল। পরের জমিতে লাঙ্গল ঠেলার দিন-মজুরী কোরেও সংসার চলছিল কোন রকমে, এমন সময় আমার বউ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একটা বিশেষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হোয়ে পড়লো। গরীবের ঘরে কঠিন রোগ হওয়া যে কি নিদারুণ দুর্ঘটনা, ভাষায় আমি তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। স্পষ্ট বুঝলাম যে, হয় আমাকে যেমন কোরে হোক্ ওষুধ কেনবার টাকা জোগার করতে হবে, নয়তো ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছি এরকম একটা আত্ম-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দেখতে হবে।

এক পয়সার সম্পত্তিও আমার তখন অবশিষ্ট নেই, সুতরাং টাকাও আমাকে কেউ ধার দিলে না। কোত্থেকে এবং কি কোরলে পর টাকা পাওয়া যাবে?—গ্রামের সরাইখানায় এক চতুর্থাংশ পাইট চোলাই মদ কিনে (তার কম আর কিনতে পাওয়া যায় না) খেতে খেতে শুধু এই কথাই ভাবছিলাম।

নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলাম, তাই এতক্ষণ দেখতে পাই নি। ঠিক আমারই মুখোমুখি বসে সুন্দর সুবেশ-ধারী একজন ভদ্রলোক প্রচুর ভোজ্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার কোরছিলেন। গ্রামের কোন সরাইখানাতে এরকম কোন পোষাক পরা "ভদ্রলোকের" আমদানি হওয়া যে একটু অস্বাভাবিক, এ বিষয়টা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ভদ্রলোক আমাকেই দেখছেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে। আমাকে এত ভাল করে দেখবার কি থাকতে পারে? শতছিন্ন জামা-কাপড়ের ভেতর দিয়ে দারিদ্র্য অতি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, মনে মনে একটু লজ্জিতই হচ্ছিলাম।

কিন্তু তিনি আমারই পাশে এসে বসলেন এবং কেমন কোরে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে ফেললেন। সেই ভদ্রলোকের চেহারা এবং হাবভাবে এমন একটা কিছু ছিল, যার প্রভাবে আমি আত্মবিস্মৃত হোয়ে পড়েছিলাম। তিনি যখন সরাইখানার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্য কিনে আমাকে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন, আমি একটুও আপত্তি করতে পারলাম না। কথায় কথায় তিনি আমায় জিজ্ঞেস্ কোরলেন যে, আমার সকল সময়ের এই বিমর্ষতা আর হতাশভাবের কারণ কি, এত উৎকৃষ্ট মদ খেয়েও আমি প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারছিনা কেন?

প্রথম যখন আমি আমার সমূহ বিপদের কথা অকপট চিত্তে খুলে বললাম, তিনি যে বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখালেন বলে মনে হোল না। আমারও তাঁর সম্বন্ধে ক্রমশঃই বিশেষ কৌতূহল জেগেছিল, তিনি কি করেন, এই গ্রামেই বা এসেছেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে, দু'হাতে ছড়াবার জন্য এত টাকাই বা পান কোত্থেকে, এই সব কথা। তাঁকে জিজ্ঞেস্ করতে তিনি বললেন যে, তিনি যে ঐশ্বর্য্যের মালিক আমিও ইচ্ছে করলেই সেই ঐশ্বর্য্যের মালিক হোতে পারি। তাঁর কথায় আমি বিশেষ একটু বিস্মিত হোলাম, জিজ্ঞেস্ করলাম—"কি রকম?"

"তুমি নিশ্চয়ই কাপুরুষ নও ?"

"নিশ্চয়ই না, স্কচ্ সীমান্তের লোকেরা কেউ কাপুরুষ হয় না।"

তখন তিনি আত্মপরিচয় দিলেন, বল্লেন তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একজন সামরিক কর্ম্মচারী, সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামগুলিতে একটা মোটামুটি সফর দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাকে দেখে তিনি বিশেষ গুণমুগ্ধ হোয়ে পড়েছেন এবং তিনি একটু দয়া করলেই আমাকে সৈন্য দলে ভর্ত্তি কোরে নিয়ে আমার সকল দুঃখ দূর কোরে দিতে পারেন।

পরে জেনেছিলাম যে এরকম ধরণের সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে Recruitment officer বলে। সহরের কসাইখানার জন্য ফরিয়ারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেই কাজ করে, এরাও ঠিক সেই কাজই করেন এবং এর জন্য বিশেষ ভাবে পুরস্কৃতও হন। থাক সে কথা, তিনি আমাকে চিন্তা করবার জন্য বিশেষ সময় দিলেন না, আমার স্ত্রীর নাম কোরে আমাকে আগাম কিছু টাকা দিয়ে একেবারে বাধ্যবাধকতার আওতায় নিয়ে ফেল্লেন।

মোটামুটি একটা স্বস্তির ভাব নিয়ে মা-বৌয়ের হাতে যখন টাকা ক'টা তুলে দিলাম তখন তারাও কম বিস্মিত হয়নি। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী চুরি প্রভৃতি অসৎ কাজকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সৈন্য দলে ভর্ত্তি হওয়ার কথা মুখ খুলে শেষ পর্য্যন্ত আর বলতে পারলাম না। টাকা অসদুপায়ে অর্জ্জিত নয় এই কথায় আশ্বস্ত কোরে কোন রকম বিদায় বাণী না জানিয়েই জীবন-মরণের অনিশ্চিত পথের যাত্রী হোতে হোল। আমার স্ত্রীকে তার ওরকম অবস্থায় ফেলে গোপনে পালিয়ে যাওয়ার জন্য, সে বিশেষ ভীত ও দুঃখিত হোয়েছিল। সেই সরাইখানায় আলাপ হওয়া ভদ্রলোক আমায় বিশেষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে ছুটী নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবো, আমার বাড়ীর সকলকেও সেই কথা চিঠিতে জানিয়ে সান্ত্বনা দিলাম।

আগে বলেছি যে স্কচ্ সীমান্তে আমার বাড়ী। বহু যুগ-যুগান্তর কাল থেকে এই সীমান্তের আশেপাশে ইংলণ্ড আর স্কট্ল্যাণ্ডের অনবরত যুদ্ধ চলেছে। চারপাশে আর মাঠেঘাটে সেই সব যুদ্ধেরই ইতিহাস রয়েছে জড়িয়ে। লাঙ্গল ধরে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হোলেও, এই সব গাথা আর ইতিবৃত্তের আওতাতেই আমি মানুষ সুতরাং পূর্ব্ব শিক্ষা-সম্পন্ন '2159 Borderers Regiment' নামক পদাতিক সৈন্যদলের সৈন্য হোতে বিশেষ দেরী হোল না। এদিকে যদিও উপযুক্ত চিকিৎসার দৌলতে আমার স্ত্রীর অসুখ সেরে গিয়েছিল, সেই বারই প্রথম কিনা তাই প্রসবের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হোচ্ছিল, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে ততই সে ভীত হোয়ে পড়ছিল। প্রত্যেক চিঠিতেই ভীত মনের জিজ্ঞাসা "তুমি কবে আসবে ?"

বাড়ীতে একটীও সমর্থ লোক নেই, দুশ্চিন্তা আমারও কম নয়, কিন্তু উপায় নেই, হাজার হাজার সৈন্যের সঙ্গে পা' মিলিয়ে নীরবে মার্চ্চ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্র। অদূরে অবস্থিত একদল জার্ম্মাণ সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ কোরবার জন্য Storm Lancers নামক একদল বল্লমধারী অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছত্রভঙ্গ করার কাজে যদিও বল্লমধারী সৈন্যদলই সবচেয়ে পটু কিন্তু বন্দুক না থাকাতে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা বিশেষ কঠিন। সুতরাং 2159 Borderers Regimentএর ওপর আদেশ এল তা'দিগকে গার্ড করে নিয়ে যাবার জন্য।

গভীর রাতের অন্ধকার, আমার প্রথম যুদ্ধ-যাত্রার জন্য উদ্যোগের সঙ্গে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় বাড়ীর চিঠি এল ; মা আর পিসিমা লেখাপড়া জানে না, স্ত্রীই লিখেছে নিশ্চই, কি লিখেছে সে ? লাউড স্পীকারের মারফৎ কঠিন কণ্ঠের আদেশ এল, "যে যার জায়গায় চলো, যে যার জায়গায় চলো" সুতরাং চিঠিখানাকে না-খোলা অবস্থাতেই পকেটে রাখতে হোল।

হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অশ্বারোহী সৈন্যদলকে গার্ড করবার জন্য পদাতিক সৈন্যদল সমান তালে কেমন করে চলবে ? সৈন্যদলের কাউকে তো আর মানুষ বলে গণ্য করা হয় না, আমরা যদি মানুষ হোতাম তা'হলে হয়ত পারতাম না।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর পাশে একজন কোরে পদাতিক। ডান-হাতে গুলিভরা রাইফেল, বাঁ-হাতে প্রাণপণে ঘোড়ার জিনটাকে আঁকড়ে ধরে আছি, বাঁ-পাটা অশ্বারোহীর পায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে একসঙ্গে রেকাবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ডান-পাটা মাঝে মাঝে মাটীতে ফেলে উদ্দাম গতিতে চলেছি ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে।

বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ভাবতে পারেন আমার ভয় কোরছিল কিনা। মোটেই না। মনে হচ্ছিল সে যেন একটা পরম মহোৎসবের রাত্রি। মহোৎসবের রাতই বটে। আমাদের Storm Lancersদের হাতে ছত্রভঙ্গ হবার অপেক্ষা না রেখে জার্ম্মাণ সৈন্যদল পাল্টা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসচে। পিছনে সারি সারি কামান শ্রেণী, তাদের অগ্রগতিকে বাধামুক্ত কোরবার জন্য (Technical Language : Cover) অবিশ্রান্ত অনল আর গোলা উদ্গিরণ করছে। হাউইট্জার কামানের ধমকানি, আট ইঞ্চি ক্ষেত্রি-কামানের রেলের বাঁশীর মত শীস্ দেওয়া শব্দ, মেসিন গানের কড়-কড-কড বজ্র ধ্বনি, সব মিলে এমন উন্মাদনাকর একটা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি কোরছে—যার আর কোন তুলনাই দেওয়া যায় না।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিষ হচ্ছে আলো। আকাশে যেন কারা হাজার হাজার মশাল বাজি খেলচে। কাতারে কাতারে লাল গোলা আকাশের বুক ভেদ কোরে বিদ্যুতের মতো ছুটে আসছে, কেবল আলো আর আলো, লাল আলো।

আকাশ থেকে জেপলীনের সার্চ্চলাইট পড়েছে, এবার আবার সাদা আলো। আকাশ থেকে একটা বিরাট বোমা পড়ে অতলস্পর্শী একটা কূঁয়ার মত গর্ত্ত হয়ে গেল। অগ্রগামী এম্বুলেন্স-বাহিনী, নার্স-বাহিনী আর কুলী-বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হোল—"পালাও, পালাও, পেছনে হঠো"—কিন্তু কেউ নড়ে না, আকাশের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রঙ্গের খেলা দেখ্চে। চোখে তাদের আলোর নেশা লেগেছিল বোধ হয়, কিন্তু পিঠে চাবুক পড়তে কুলী-বাহিনী কতকগুলি উন্মত্ত জানোয়ারের মত পিছন দিকে ছুটতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্স আর নার্স-বাহিনী। জার্ম্মাণ সৈন্যদল আর একশো হাত দূরেও আছে কি-না সন্দেহ। উপর থেকে আবার সার্চ্চ-লাইট পড়লো, কী উজ্জ্বল সাদা আলোক। ঘাসের ফাঁকে একটা স্ঁচ্ পড়লেও বোধ হয় দেখা যেতো। আবার বোমা পড়লো—খুব নিকটেই। ধূলায় লুটান দেহগুলির দিকে চেয়ে মনে শঙ্কা জাগালো, তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে ফেলার ইচ্ছা হোল।

জিনের নীচেকার বেল্টের মধ্যে কনুই ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থাতেই চিঠিখানা খুলে ফেললাম। লেখা আছে, আমার একটী ছেলে হয়েছে—দেখতে নাকি খুবই সুন্দর। তার নিজের শরীরও ভাল আছে, সঙ্গে সঙ্গে কাতর অনুরোধ, একবার ছুটী নিয়ে এসে ছেলেকে দেখে যাও। চিঠিখানা হাতেই ছিল, মনে মনে ভাবছিলাম অবোধ পল্লীবালা, সৈন্য জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ও অনুশাসনের খবর তো আর সে রাখে না : সমস্ত শব্দ কোলাহল ভেদ কোরে লাউড স্পীকারের আদেশ এল "চার্জ্জ, চার্জ্জ", সঙ্গে সঙ্গে একজন তাজা মানুষের বুকের ভেতর বন্দুকের সঙ্গীন চেপে ধরলাম প্রাণপণে, তারপর আরেক জনের, আবার আরেকজনের ..

হ্যাঁ, সেই যুদ্ধে আমরাই জিতেছিলাম। চিঠিখানা দেখি হাত থেকে খসে পড়েনি, আরেকবার পড়তে গিয়ে দেখি সব রক্তমাখা, কিছুই পড়া যায় না। সমস্ত মনের ভিতরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক ভাবে দুলে উঠলো। আমার এমন এই আনন্দের দিনে একি করলাম। শিক্ষিত দেশ-প্রেমিকেরা বুঝিয়েছেন যে যুদ্ধে মানুষ মারলে "পূণ্য" হয়, কিন্তু নিজকে সে কথা ঠিক ঠিক বোঝাতে পারলাম না, মূর্খ চাষা বলেই হয়তো।

যুদ্ধ চলতে থাকে। বৃদ্ধা পিসীমা মারা গেছেন, বাড়ী থেকে কেবল ফিরে যাবার অনুরোধ আসে, দাঁতে দাঁত চেপে সহস্র সহস্র সৈন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে থাকি।

অনেক সময় হতাশ হোয়ে পড়েছি, এ যুদ্ধ বুঝি আর শেষ হবে না, সেও থামলো, কিন্তু আমাদের চলার বিরাম নেই। মহাযুদ্ধে নাকি আমাদের সৈন্যদল অশেষ বীরত্ব

দেখিয়েছিল, হোয়াইট হল আর ওয়ার অফিসের আরাম কেদারায় বসা দেশপ্রেমিকরা আমাদের এই বীরত্বে বিশেষ মুগ্ধ হোয়েছিলেন, তাই আমাদিগকে দেশে ফিরিয়ে না নিয়ে তুর্কীর রণাঙ্গণে প্রেরণ করলেন।

তুর্কীর সেই দুরন্ত প্রাণঘাতী শীত। কালো পোষাক পরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে একা পাহারা দিচ্ছি। টুপী আর পোষাক বেয়ে অনবরত বরফ পড়ছে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ার মতো, আড়ষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পকেট থেকে ভ্যাসেলীন্ বের করে মুখে মাখ্‌ছি বার বার, কিন্তু পকেটের চিঠিখানার কথা ভুলতে পারছি না, "মা মারা গেছেন, আমি আর একা থাকতে পারছি না, যেমন করে পারো দেশে ফিরে এসো।"

অভিশপ্ত সৈন্যদল। তুর্কী-যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসবার হুকুম হোল, সাম্রাজ্য রক্ষার পূণ্যটা তো কাউকে না কাউকে সঞ্চয় করতেই হবে, যত বাছা সৈন্যদল হয় ততই ভাল। সুয়েজখাল দিয়ে জাহাজ চলার সময় আমরা সকলে উত্তর-পশ্চিম আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, কিন্তু কামানের ধোঁয়া আর মানুষের রক্তে স্মৃতি-শক্তি অনেকটা ঝাপ্‌সা হয়ে আসচে, স্নেহ মমতার বন্ধনও অনেকটা আল্‌গা হোয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে আসার পর থেকে চিঠিও আসে না, ফিরে যাবার অনুরোধও আসে না। এই অসহ্য নীরবতা আমাকে অনিশ্চিত আশঙ্কায় অধীর করে তুলতে লাগলো। আমার একমাত্র চিন্তা হোল কি করে মুক্তি পাওয়া যায়।

কি করে মুক্তি পাওয়া যায়? দিন রাত কেবল উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলাম। সামরিক নিয়ম কানুনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘাটতে লাগলাম, একদিন আবিষ্কার করলাম, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ সমস্ত দাগী চোরদের উপযুক্ত দণ্ডভোগের পর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

তিনবার চুরি করেছে এমন লোককেই দাগী চোর বলে গণ্য করা হবে।

এখন বোধ হয় বুঝেছেন যে দাগী চোরের কলঙ্ক আমি মাথায় নিয়েছি কিসের তাড়নায়। এর আগের তু'বার ক্ষণিকের তুর্ব্বলতা মনে করে ওরা আমায় ক্ষমা করেছিল কিন্তু এবার আমাকে নির্ম্মমভাবে অপমান করে জীবন-পণ-করা যুদ্ধের মেডেলগুলি পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। মানুষ খুন করে যে পুরস্কার আমি পেয়েছিলাম সেগুলির মোহ যদিও আমার নেই, এই মেডেলগুলি দেখ্‌বার জন্যও আমার স্ত্রী বড় উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। মূর্খ গ্রাম্য রমণী কিনা, প্রতিবেশীদের কাছে এগুলি দেখিয়ে বোধ হয় একটু আত্ম-প্রসাদ অনুভব করতো। ও যদি এখনও বেঁচে থাকে, এই মেডেলগুলির কথা জিজ্ঞেস করলে আমি কি জবাব দেবো? তা ছাড়া চুরি করাকে সে এমনভাবে ঘৃণা করে

জেলের কম্বল মাথায় দিয়ে প্রাইভেট স্মিথ সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখছিল।

সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে ক্লান্ত চরণে দাঁড়িয়ে সে যেন জঙ্গলে আর আগাছায় ঢাকা অতি জীর্ণ একটা বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ছে। দরজাটাকে সামান্য একটু ফাঁক করে অর্দ্ধ পরিচিতা ছিন্ন বসনা এক রমণী কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো "কে তুমি, কি চাই?"

"আমি একজন সৈনিক, দশ বৎসর আগে তোমাকে না বলে তোমার এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

রমণী তার আপাদ মস্তক খুব ভাল করে দেখে নিল— "সৈনিক, তোমার সেই বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ মেডেলগুলি কই?'

স্মিথ মাটীর দিকে চেয়ে জবাব দিল— "যারা দিয়েছিল, তারাই কেড়ে নিয়েছে।"

"কেন?'

গলা দিয়ে কেন জানি না আওয়াজ বের হচ্ছিল না, অতিকষ্টে বললো—"চুরি করেছিলাম তাই।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণীর দারিদ্র-ক্লিষ্ট মুখখানার প্রত্যেকটী মাংসপেশী ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে অতি বীভৎস রূপ ধারণ করলো। স্মিথ পরক্ষণেই দেখলো যে দরজাটা তার মুখের ওপরেই বন্ধ হোয়ে গেছে।

সে প্রাণপণে চীৎকার কোরে জিজ্ঞেস্ করলো "আমার ছেলে কই?"

আর্ত্তকণ্ঠে জবাব এলো "নির্ম্মম পিতার জন্য সে বসে নেই, সে মরে গেছে।'

আবার সে স্বপ্ন দেখলো।

আবার সে ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে ফিরে গেছে, তাজা মানুষের বুকের ভেতর বেয়নেট ঢুকিয়ে দিতে এবার আর একটুও অনুকম্পা হচ্ছে না।

হাজারীবাগের কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অনেকদিন হইতে একবার হাজারীবাগ বেড়াইতে যাইব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কতদিন চলিয়া গেল তাহা আর হইল না। এইবার ৺পূজার সময়ে হাজারীবাগ গিয়াছিলাম—তাহার একটু সুযোগও ঘটিয়াছিল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু হাজারীবাগ সেণ্ট কলম্বস কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয় আমাকে এবার হাজারীবাগ যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেখানে তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি ৺পূজার ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই সপরিবারে হাজারীবাগ চলিয়া গিয়াছিলেন। আমিও পূজার ভিতর হাজারীবাগ রওনা হইব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম।

৺বিজয়া দশমীর দিন কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র যখন ঢাকঢোল এবং বাঁশির সুরে সুরে জগন্মাতার বিসর্জ্জনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল আমিও সেই সময়ে হাজারীবাগের উদ্দেশে কলিকাতা ছাড়িলাম।

হাজারীবাগ রোড দিন দিনই স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। অনেকে এখানে বাড়ী করিয়াছেন। যাঁহারা বাড়ী করেন নাই অথচ জমি কিনিয়া রাখিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। পূর্ব্বে এখানকার জমির নামমাত্র মূল্য ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের অতিরিক্ত আগ্রহের দরুণ মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইতেছে, তবে এখনও ১০০৲ টাকায় এক একর জমি পাওয়া যায়। অনেকে বলেন হাজারীবাগ হইতেও হাজারীবাগ রোডের জল ভাল, জানি না সত্য কিনা।

হাজারীবাগ রোড হইতে হাজারীবাগের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। 'লাল মোটর কোম্পানী' এই পথের মালিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের গাড়ীগুলি ভাল, তবে ভাড়ার দিক দিয়া দেখিলাম বেশ একটু গোল আছে। আমাকে সম্মুখের আসনের ভাড়া বেশী এই কথা বুঝাইয়া আমার নিকট হইতে ৩৲ টাকা আদায় করিয়াছিল। পরে জানিলাম আমি ঠকিয়াছি এবং ফিরিবার সময়ে আমি ১৷৹ দেড় টাকাতে আসিয়াছিলাম, অথচ সেই সম্মুখের আসনেই জায়গা মিলিয়াছিল। এই সব বিষয়ে কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের বাস অতি প্রত্যূষে হাজারীবাগ রোড ছাড়িল। তখনও চারিদিকে অন্ধকার ছিল আলো প্রকাশ পায় নাই। পথটি বড়ই সুন্দর। দুই দিকে বন জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, বিস্তৃত অসমতল মাঠ, আর দক্ষিণে ও বামে ছোটবড় নির্ঝর-ধারা শিলারাশির বুকের উপর দিয়া ঝর ঝর্ শব্দ করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যের প্রফুল্ল কিরণ যখন হাজারীবাগের বনে বনে ও পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় উজ্জ্বল স্বর্ণধারা ছড়াইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাসখানি হাজারীবাগ কলেজের পাশ দিয়া চলিয়া আসিয়া মোটর ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

রাঁচী রোডের পাশে খড়্গবাবুর বাড়ী। অতি সুন্দর নির্জ্জন স্থান। চারিদিকে খোলা মাঠ, ঢেউএর মত উঁচু নীচু পথঘাট অ-সমতল ভাবে দূর দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। আশেপাশে, নিকটে ও দূরে, ছোটবড় পাহাড়গুলি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মেঘ শিশুদের চপল লীলা চঞ্চল-গতি দেখিতেছে। আকাশ গাঢ় নীল—আর নীচে চারিদিকে যেন কে সবুজ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। তখনও শীত তেমন প্রচণ্ড ভাবে পড়ে নাই—কলিকাতায় গ্রীষ্মের দরুণ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। এখানে আসিয়া বেশ শীত পাইয়া শরীরের ক্লান্তি যেন দূর হইয়া গেল।

হাজারীবাগ নামের ইতিহাসটী বড় সুন্দর। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে একটী বিস্তৃত আমের বাগান ছিল।

সেই বাগানে হাজার আমগাছ ছিল। 'হাজার' আম গাছের যে বাগান তাহাই 'হাজারীবাগ' নাম ধারণ করিল। এখনও 'হাজারী' গ্রামটী আছে—প্রাচীন দুই চারিটী আমগাছও আছে। এই ভাবে 'হাজারীবাগ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এখানকার অধিবাসীদের মতে হাজারীবাগ হইতেছে ছোট নাগপুরের বাগান। তাহাদের কাছে পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহা হইলে হাজারীবাগই হইতেছে সেই স্বর্গ। হাজারীবাগ সহরে প্রবেশ করিবার পথেই দূর হইতে ছোট একটি পাহাড়ের উপর একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়—এইজন্য ঐ পাহাড়ের নাম হইয়াছে 'টাওয়ার হিল' (Tower Hill)। আসলে ঐ পাহাড়ের নাম 'শিলোয়ার পাহাড়'। হাজারীবাগ সহরের চারিদিকেই পাহাড় আছে। কিন্তু সেগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে দূরে দূরে অবস্থিত এবং কোনটী তেমন উঁচুও নয়। সে সকলের মধ্যে 'শীতাগড়' পাহাড়টী হইতেছে সকলের চেয়ে উঁচু। এই পাহাড়ের নীচে একটি চায়ের বাগান আছে। ইহা ছাড়া 'কুন্‌পুরি' নামে যে পাহাড়টী আছে স্থানীয় লোকেরা তাহার নাম দিয়াছেন 'জিব্রালটার' কেন না, এই পাহাড়ের সহিত নাকি 'জিব্রালটার' পাহাড়ের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সব পাহাড়গুলি দূরে দূরে থাকিয়া যেন হাজারীবাগ সহরের প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। আমি হাজারীবাগের অতি কাছে আসিয়াও এমন কি সহরে ঢুকিয়াও প্রথমে কখন যে সহরে প্রবেশ করিলাম তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এমনই ভাবে চারিদিক শ্যামল তরুশ্রেণী দ্বারা হাজারীবাগ সহরটি পরিবেষ্টিত।

স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট ছিলেন, সে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা, তখন তিনি হাজারীবাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি এই স্থানে দার্জ্জিলিংএর পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাসের জন্য হ্রদের ধারে যে 'সার্কেট হাউস' নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই 'সার্কেট হাউসটি' এখনও আছে। লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হাজারীবাগ পরিদর্শন করেন।

ছোটনাগপুরের প্রত্যেক স্থানেই একটা বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য সহজে দর্শকের চোখে পড়ে। অ-সমতল ভূমি আর তাহার গায়ে গায়ে সবুজ তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়, চারিদিকে মুক্ত প্রকৃতি আপনাকে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া এক দিব্য শোভায় শোভিত করে। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে নানা ফুল তাহাদের বর্ণ বিকাশ করে—সিবগুঞ্জা, নাগকেশর প্রভৃতি ফুল যেন হাসিতে থাকে। এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীর প্রাঙ্গনে শালগাছ, নিমগাছ, করঞ্জা এবং তেঁতুলগাছ দেখিতে না পাওয়া যায়।

আমি একবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া হাজারীবাগ আসিয়াছিলাম। হাজারীবাগ হইতে প্রায় বিয়াল্লিশ মাইল দূরে 'ইটাখুরি' নামে একটা গ্রাম আছে। শুনিয়াছিলাম সেই গ্রামে একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক পুরাতন দেবমূর্ত্তি এবং ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বিমলা চরণ লাহার নিকট 'ইটাখুরির' কথা শুনিয়াছিলাম। তাহার পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র লাহা মৎসম্পাদিত 'কৈশোরক' পত্রে হাজারীবাগের কথা লিখিতে যাইয়া ইটাখুরির কথাও লিখিয়াছিল। তাহা পড়িয়া ইটাখুরি দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র ছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাসিংহ ঘোষ মহাশয় একেবারে খাঁটী দার্শনিক। তাঁহার সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। তিনি যখন এখানে অধ্যাপনা করিতেন তখন কলেজ ও বাড়ী আর গ্রন্থশালার সহিতই কেবলমাত্র তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গঙ্গাবাবু ইটাখুরির কথা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার 'দর্শন' যে অন্তরের দর্শন, বাহিরের দর্শন নহে। কাজেই প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান তিনি রাখিবেন কেন? তিনি তাঁহার বন্ধু সেণ্ট্ জনস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। এইবার চারুবাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি আমার ইটাখুরি যাত্রার কথা বলিব।

আজকালকার দিনে চারুবাবুর মত লোক বড় একটা

দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-কেহ হাজারীবাগে হাওয়া খাইতে আসেন তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। রোগীর সেবা, বাড়ী ঠিক করিয়া দেওয়া, ডাক্তারকে খবর দেওয়া এমন কি বাজার করিয়া দিতেও এই সদাশয় ভদ্রলোকটী কখনও পশ্চাৎপদ হন না। তিনি যে কিরূপ দয়ালু প্রকৃতির এবং কোমল প্রাণ লোক সে বিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি।

একবার শীতের রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে বাহির হইতে কে যেন খড়্গবাবুর সদর দরজায় ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে কি একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে খড়্গবাবুর বাড়ীতে উপাসনা হইতেছিল। সেজন্য প্রথমটায় কেহই বাহিরের দিকে বড় একটা কান রাখেন নাই। উপাসনার পর এত রাত্রিতে দরজায় আঘাত শুনিয়া বাড়ীর দরজা খুলিলে দেখা গেল আঘাতকারী চারুবাবু তাঁহার গায়ের আলোয়ানের ভিতর হইতে একটী পাঁঠার বাচ্চা বাহির করিয়া কহিলেন "আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম এই পাঁঠার বাচ্চাটী আপনাদের বাড়ীর একটু দূরে মাঠের ভিতর পড়িয়া শীতে কাঁপিতেছে। যদি ইহাকে না আনিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাত্রিকালে নেকড়ে বাঘ ইহাকে খাইয়া ফেলিত। আজ রাত্রিতে এইটাকে আপনার বাড়ীতে রাখুন, কাল যাহার পাঁঠা তাহার সন্ধান করিয়া উহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।" এটী গল্প নহে, সত্য ঘটনা। এখনও বুদ্ধদেবের দেশে এমন মানুষের অভাব নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চারুবাবু সাদাসিদা ভাল মানুষ। তিনি আমার 'ইটাখুরি' যাইবার কথা শুনিয়া মহা উৎসাহের সহিত আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং কি ভাবে কোন্ পথে গেলে অসুবিধা হইবে না তাহার সমুদয় সু-ব্যবস্থা করিলেন। এমন কি, তাঁহার পুত্রকেও আমার সঙ্গে দিলেন।

৮ই অক্টোবর বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের সময়ে যাইবার মোটর গাড়ীতে আমি ও শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র চৌধুরী 'ইটাখুরি' রওনা হইলাম। হাজারীবাগ হইতে 'চৌপারণ' পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়াছে সেই পথটী অতি চমৎকার দুই দিকে ঘন বন-শ্রেণী—অতি দূরে কোন্ নীলাভ গিরি-শ্রেণীর পদপ্রান্তে যাইয়া যে মিশিয়াছে তাহা কে বলিবে? এই পথের পাশে অনেকটা বনই রামনগর ষ্টেটের 'Reserved Forest' এই বনে রামনগর ষ্টেটের অনুমতি ব্যতীত কেহ শিকার করিতে পারে না। আমরা বেলা দুইটার সময়ে 'চৌপারণ' আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে রামনগর ষ্টেটের একটী ছোট তহসিল কাছারি আছে। তহসিলদার শ্রীযুক্ত রামকিশোর প্রসাদ আমাদের
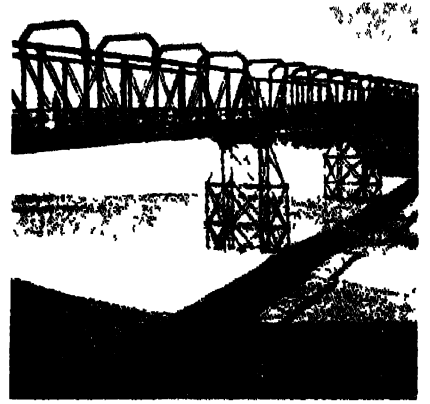
ইটাখোরির পথে—বরাবর পোল।

বিশ্রামের জন্য একটী ঘর ছাড়িয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে 'চাত্রা' অভিমুখী একখানি 'বাসে' চড়িয়া রাত্রি প্রায় ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ইটাখুরি আসিয়া পৌঁছিলাম।

সেদিন ছিল 'কোজাগরী পূর্ণিমা' কিন্তু চন্দ্রের উজ্জ্বল রূপ তেমন একটা দেখিতে পাইতেছিলাম না। আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছিল। দূরে দূরে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল—মনে হইতেছিল এই বুঝি বৃষ্টি হয়। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা জানিতে পারি নাই। পরের দিন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে সেই সময়েই আমরা ইটাখুরির দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমরা এখানে আসিবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ইটাখুরির 'ডাকবাঙ্গলা' বা 'ডাকঘর'এর কথা। এক

কথায় থাকিবার পক্ষে কোনও রূপ অসুবিধা নাই। কিন্তু যখন প্রকৃত ইটাখুবি গ্রামে পৌছিলাম তখন এই অতি ক্ষুদ্র পল্লীব ডাকঘরেব অপরূপ মূর্ত্তি অর্থাৎ গোয়ালেব মত একটী ক্ষুদ্র ঘরে অবস্থিত ডাকখানা দেখিলাম। যে পথটী ধরিয়া আমরা ইটাখুবির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে চলিলাম সেই পথটী এমন ধূলিপূর্ণ যে পথ চলা কঠিন। একটী নদীর বাঁকে খোলা মাঠেব মধ্য দিয়া আমবা ইটাখুবিব সেই নিভৃত ধ্বংসাবশেষেব কাছে আসিয়া পৌছিলাম। পথের অনেকটা দূরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাঁহারা যাইবেন তাঁহাদেব পক্ষে বেলা-শেষে যাওয়া সঙ্গত নহে।

প্রথমে মূল মন্দিরটীর কথা বলি, যেখানে একদিন হয় তো আকাশ স্পর্শী সুন্দব মন্দির ছিল, আজ সেই মন্দিরেব নিম্ন স্তবেব ভিত্তির উপরে খানিকটা জায়গায় একটী খোলার চালা তুলিয়া গ্রামবাসীরা বিরাট ৺তারা মূর্ত্তিটীকে বক্ষা কবিতেছে। আমরা দেখিলাম মূর্ত্তিটী বস্ত্র দ্বারা আবৃত। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম মূর্ত্তিটী সূর্য্যের হইবে,
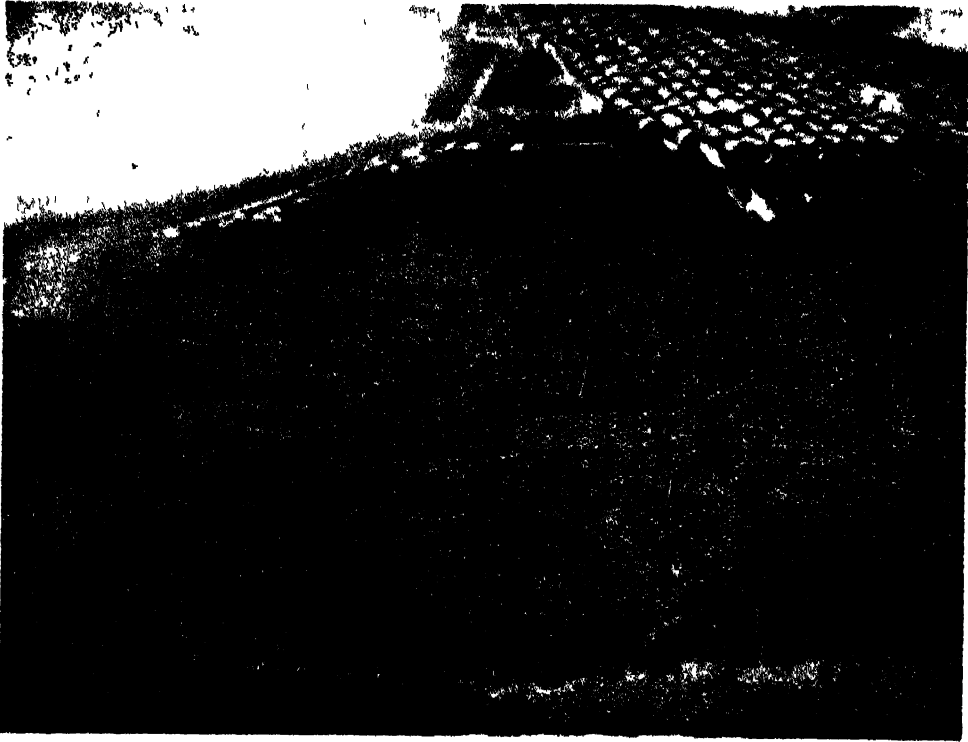
মন্দিরের উপরে খোলার ঘর

এইরূপ নির্জ্জন স্থানে বনজঙ্গলের ভিতরে কে জানে সে কোন্ যুগে এখানকার মন্দিরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক সময়ে যে মন্দিরগুলির চারিদিক দিয়া প্রাচীর ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান বহিয়াছে। কয়েকটী স্তূপ পড়িয়া আছে। স্তূপের উপর গাছ জন্মিয়াছে—পূর্ব্বে এইস্থানে কেহ বড একটা আসিতেন না, তখন ইহা অতি গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল আর বন্য-জন্তুর ভয়ও বড় কম ছিল না। এখনও 'চাতরা' যাইবার কিন্তু মূর্ত্তিটী দেখিয়া আমার কিরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহা নিশ্চয়ই স্ত্রী-মূর্ত্তি হইবে। আমাব সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। মূর্ত্তিটী দেবী তারার মূর্ত্তি—সুন্দর কষ্টি-পাথরে নির্ম্মিত, নাকের দিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চালিব চারিদিকে খোদিত লিপি রহিয়াছে এবং পাদপীঠের দুই দিকেও খোদিত লিপি দেখিলাম। আমি উহার ছাপ লইলাম—এই বিষয়ে রাজকিশোর সিংহ মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটীর পরিচয় ও

খোদিত লিপির বিবরণ Epigraphia Indica-এর ১৯৩৪-'৩৫ সালের চিত্র সহ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার ফটোগ্রাফ্ লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইটাখোরির তারা মূর্ত্তিটীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ইহা গুর্জর প্রতিহার নৃপতি মহেন্দ্র পালের সমকালীন।

খোলার চালে এই ঘরের ভিতর দেওয়ালের গায়ে অনেক ছোট ছোট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। সে সকলের অনেকের পাদপীঠে 'যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভবঃ' ইত্যাদি সাধারণ বৌদ্ধ-মন্ত্র খোদিত আছে। আর ভিতরে ও বাহিরে গণেশ, ধ্যানী-বুদ্ধ, বিষ্ণু, সূর্য্য, উমা-মহেশ্বর এবং বহুবিধ ভগ্ন মূর্ত্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে। মন্দিরটী যে ইট-পাথরে

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ প্রস্তর স্তম্ভ

গড়া ছিল তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায়। পাথরের সোপান-শ্রেণী গুটীকয়েক বাহিরে

ইটখোরির পুরাতন প্রস্তর তোরণ

আছে। আর মন্দিরে প্রবেশের দরজার দুই দিকে প্রস্তর স্তম্ভ ও খিলান এখনও দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইটাখুরির একজন দারোগা মন্দিরের পাশে ছোট একটী স্তূপ খনন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক কিছু মূর্ত্তি, আমলক, প্রস্তরের বিবিধ কারুকার্য্য, পদ্মস্তম্ভের ভগ্নাংশ, বহুবিধ প্রস্তর ফলক এবং তৎসহ অনেকগুলি হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অনেকে এখান হইতে ঐসকল মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মাটীর উপরিভাগে অ-ভগ্ন একটী মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম না।

আমরা ঐ স্থান হইতে অল্প কিছু দূরে একটী জঙ্গলের মধ্যে শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। বিরাট নন্দী অর্থাৎ বৃষ মূর্ত্তি বাহিরে পড়িয়া আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত এই বৃষ মূর্ত্তিটীর অর্দ্ধেকটা মাটির ভিতরে প্রোথিত রহিয়াছে। বাহিরে যাহা দেখিতে পাইলাম তাহা অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত, শিবের মন্দিরের

একদিকে সামান্য একটু প্রাচীরের চিহ্ন মাত্র আছে। কে জানে কেমন করিয়া মন্দিরটী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের মেজের উপর বিরাট শিবলিঙ্গ পড়িয়া রহিয়াছে—এই লিঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, ইহার গায়ে চারিদিক ঘিরিয়া সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ খোদিত রহিয়াছে। এইজন্য গ্রামের লোকেরা এই শিবলিঙ্গটির নাম দিয়াছেন 'ঊনকোটী শিব'। আমরা এই নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া এই ভগ্ন মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, এক সময়ে যে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা এমন করিয়া ভক্তি ব্যাকুল হৃদয়ে মন্দির গড়িয়াছিলেন,

পলাশবনে ঘেরা ভোটিভ স্তূপ

দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দেবাদিদেবের বন্দনা গানে সন্ধ্যারতি, পবিত্র সুরভি ধূপধূনার সহিত আপনার মনকেও পুণ্য সৌরভে সুরভিত মনে করিতেন—আজ তাঁহারা কোথায়? পলাশগাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, শালগাছ সারি সারি প্রহরীর মত এখান হইতে বনের দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহাছাড়া এমন কেহ নাই যে, এই মন্দিরের দেবতাকে দেখিতে পায়।

আমাদের সঙ্গে দুই একজন গ্রামের লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তহশিলদার মহাশয়ও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। ইহাতে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিবার পক্ষেও সুবিধা হইয়াছিল। যে বিরাট স্তূপটী বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে, তাহার পাশ দিয়া খানিকটা দূর অবধি পূর্ব্বদিকে বহিয়া পলাশবনে ঘেরা একটি মুক্তস্থানে আমরা শিবলিঙ্গেরই মত একটী বিরাট ভোটিভ (Votive) স্তূপ দেখিতে পাইলাম। এই স্তূপটীর গায়ে সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ইহার আশে পাশে অন্য কোনও মূর্ত্তি বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম না,—কাজেই অনুমান হয়, হয়তো কেহ মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহা পাইয়াছে।

আমরা চারিদিক বেশ ভাল ভাবে দেখিয়া শুনিয়া আবার কাছারির দিকে ফিরিয়া চলিলাম। গ্রামের লোকেরা অধিকাংশই মূর্খ—তাহারা এখানকার প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানে না। মন্দিরটী কে, কবে তৈরী করিয়াছিলেন সে সংবাদ যেমন তাহাদের অজ্ঞাত তেমনি তাহারা ৺তারা মূর্ত্তিটীকে মহারাণী বা কেহ কেহ সূর্য্য মূর্ত্তি বলিয়া দুই একটী ফুল এবং জল দেয় এবং এখান হইতে কেহ কোন মূর্ত্তি লইতে চাহিলে তাহাদিগকে নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা জানায়। কিন্তু কে তাহাদের কথা শুনিবে!

আমরা কাছারির দিকে ফিরিবার পথে প্রায় পাঁচ ছয় হাত খাড়া একটী প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলাম। তাহার উপর দিকে গোলাকার সূর্য্যের মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং নানারূপ অদ্ভুত চিহ্ন রহিয়াছে। এই পাথরটী কিভাবে এখানে প্রোথিত রহিয়াছে সে কথাও কেহ বলিতে পারিল না।

সেদিন আমরা যখন কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রুটী ও ভিণ্ডির তরকারীর সঙ্গে সঙ্গে দুই পেয়ালা চা খাইয়া আবার চৌপারণের বাসে চড়িয়া হাজারীবাগের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। পথে চৌপারণে গাড়ী বদলাইতে হইল। সেই অবসরে বেশ একটু বিশ্রাম করিয়া নেওয়া গেল। হাজারীবাগে যখন পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আবার হাজারীবাগে ফিরিয়া আসিলাম। ইটাখোরির উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তিটী অতি প্রাচীন। এই মূর্ত্তিটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট আশুতোষ মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে।

এইবার হাজারীবাগে এবং তাহার আশে পাশে যাহা কিছু দেখিবার আছে তাহাদের বিষয় দুই একটী কথা বলিতেছি। রাঁচির ন্যায় হাজারীবাগও দুই হাজার ফিট উঁচু একটি মালভূমির উপরে অবস্থিত। হাজারীবাগের খুব প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে স্থানীয় রেকর্ড আপিসে পুরাতন কাগজ পত্র বিনষ্ট হওয়ায় এই স্থানের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। দেশীয় লোকেরাও কিছুই জানে না—যাহা কিছু জানা যায় তাহা কিংবদন্তীমূলক, কাজেই তাহার ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে তাহা বলা কঠিন। এখানে নানা জাতীয় আদিম অধিবাসীর বাস। তাহাদের মধ্যে ভর, ভূমিজি, বীরহর, চেরো, ঝোরাগন্দ, কোল, মুণ্ডা, নাট, ওঁরাই, পাহাড়িয়া, রানতিয়া, সাঁওতাল এই কয়টী প্রধান। এখানকার সাঁওতালদের পল্লীতে দুর্গাপুজা হইতেও দেখা যায়।

হাজারীবাগের নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটী প্রস্রবণ আছে। তাহাদের মধ্যে হাজারীবাগ হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী সূর্য্যমূর্ত্তিটী প্রধান। উহার মধ্য সর্ব্বদাই উষ্ণ বারি রাশি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

উমা-মহেশ্বর

হাজারীবাগ সহরের কেনারী পাহাড়, রিয়ামেটরী স্কুল, সেন্ট্ জনস্ কলেজ প্রভৃতি দেখিবার মত।

অনেক উচ্চপদস্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী এখানে প্রাসাদতুল্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। হাজারীবাগ স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর এবং এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম বলিয়া এখানে অনেকেই পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন।

আলোর কোয়াণ্টাম থিওরী

(Quantum Theory)

সতীভূষণ সেন

বিজ্ঞানের বই খুলিলে প্রথমেই চোখে পড়ে লাইনের পর লাইন আঁক, সঙ্গীন-কাঁধে সিপাহীর মত বিজ্ঞানের তহবিল পাহারা দিতেছে। কাছে যাইবার উপায় নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা নিজেদের দাম বাড়াইবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। জিনিষটাকে কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য না করিলে যেন পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয় না।

কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? বিজ্ঞানের পথ দুর্গম করিবার জন্যই কি আঁকের প্রচুর ব্যবহার করা হয়?

সঙ্গীত শাস্ত্রকে দুর্ব্বোধ্য করিবার জন্যই কি স্বরলিপির সৃষ্টি? আপনার স্বরলিপির খাতা খুলিয়া যদি আমরা প্রশ্ন করি "এসব বাঁকাচোরা দাগ না আঁকিয়া, সোজা বাংলায় এই 'গৎ'টি লিখিলে কি ক্ষতি ছিল?" আপনি হয়তো সামান্য একটু হাসিবেন, ভাবটা এই, 'গৎ'-এর ভাষাই স্বরলিপি, এই সোজা কথাটা যে জানে না তাহাকে আর কি বুঝাইব?

বিজ্ঞানের ভাষাই আঁক। বাংলা বা ইংরাজী সাহিত্যে বিজ্ঞানের সব কথা প্রকাশ করা যায় না। এক লাইনে বা একটি সূত্রে (Formula) যত কথা লেখা থাকে তাহার সমস্ত ভাব পাতার পর পাতা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াও প্রকাশ করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা দিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বরূপ বুঝান যায় না, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চোখে-দেখা, কানে-শুনা জিনিষের তুলনা দিয়া অ-দেখা, আ-শোনা জিনিষের স্বরূপ বুঝান যায় না। এই দুঃসাধ্য চেষ্টায় যে কত ক্ষতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের গবেষণা যে কত পিছাইয়া পড়িয়াছে, আলোর থিওরীগুলি তাহার প্রমাণ।

আলোর যে জিনিষ প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা ছায়া। এ-ঘর হইতে কথা বলিলে ও-ঘরে বসিয়া তাহা শুনা যায়, কিন্তু এ-ঘরের আলো ও-ঘরে যাইতে পারে না। অথচ শব্দের যেখানে প্রবেশ নিষেধ সেই Vacuum বা শূন্যের ভিতরেও আলো অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকে। পরীক্ষা অতি সহজ, একটি এলার্ম-বাজা ঘড়ি কাচের জার দিয়া ঢাকিয়া দিলে তাহার শব্দ বিশেষ কমে না। কিন্তু তাহার পরে পাম্প দিয়া সেই জারের হাওয়া আনিয়া ক্রমশঃ শূন্য করিতে থাকিলে, দেখা যায় শব্দও ক্রমশঃ কমিতেছে। এবং অবশেষে যখন জারটী একেবারে বায়ুহীন হইয়া পড়ে, তখন স্প্রিংয়ের (Spring) হাতুরী ঘণ্টার উপরে যতই আঘাত করুক না কেন, শব্দ আর শোনা যাইবে না। অর্থাৎ তখন সেই অবস্থায় শূন্য (Vacuum) দিয়া আলো আসিতেছে, নহিলে ঘড়িটী দেখাই যাইত না, কিন্তু শব্দ আসিতে পারে না নতুবা শব্দ শোনা যাইত।

নিউটন বলিলেন—"শব্দ বায়ু-তরঙ্গ, বায়ু না থাকিলে শব্দও থাকে না। আলোর সহিত বায়ুর কোনও সম্পর্ক নাই। এবং আলো তরঙ্গ নহে, কারণ আলো তরঙ্গ হইলে তাহার ছায়া পড়িত না।" আমার মনে হয়, আলো কতকগুলি সূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি, যাহা বাতি হইতে বাহির হইয়া সরল রেখায় ছুটিতে থাকে। কণিকাগুলি চোখে পড়িলে আমরা বাতিটিকে দেখিতে পাই এবং কণিকাগুলি অন্য জিনিষে পড়িয়া ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যখন চোখে পড়ে তখনই আমরা সেই জিনিষটী দেখিতে পাই। আলো-কণিকার স্বরূপ সম্বন্ধে নিউটন পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সামান্য যে আভাষ দিয়াছিলেন তাহাই মাজিয়া-ঘষিয়া তাঁহার শিষ্য সেবকেরা "কর্পাসকুলার থিওরী" (Corpuscular Theory) নামে চালাইয়াছেন।

"শব্দে ছায়া পড়ে না"—কিছুদিন পরে দেখা গেল কথাটী সত্য নহে। পর্ব্বতের একপাশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিলে অন্য পাশ হইতে কিছুই শোনা যায় না। কিন্তু সমতল ভূমিতে বহুদূর হইতেও শোনা যায়। পরীক্ষায় আরও দেখা গেল, শব্দও আলোর মতই প্রতিবিম্বিত হয়। তা ছাড়া, আলো যেমন আতসী কাচের (Lens) সাহায্যে এক জায়গায় ফোকাস্ (Focus) করা যায়, শব্দ-তরঙ্গও তেমনি "কারবন-ডাই-অক্সাইড্"—লেন্সের সাহায্যে ফোকাস্ করা যায়।

এমন সময় 'ইয়াং' বলিলেন, "বাতি হইতে আলোর কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে ইহাই যদি সত্য হইবে, তবে দুইটী বাতি হইতে যে আলোর কণিকা বাহির হয়, পরস্পর ধাকাধাক্কি করে না কেন? একের কণিকা অন্যের কণিকার মধ্য দিয়া বেমালুম পার হইয়া যায় কি করিয়া? অতএব কণিকার থিওরী ঠিক নহে, আলো শব্দের মতই তরঙ্গ, তবে আলোর তরঙ্গ এত সূক্ষ্ম যে, অতি সূক্ষ্ম বাধা না হইলে আলো তাহা পার হইতে পারে না। শব্দের ছায়া পড়িতে পাহাড়ের দরকার, কিন্তু আলোর ছায়া পড়িতে চুলই যথেষ্ট।"

এই লইয়া বৈজ্ঞানিকদের ভিতর তর্ক-যুদ্ধ লাগিয়া গেল। শেষে উভয় পক্ষের পণ্ডিতেরা যে যার বিজ্ঞানাগারে ফিরিয়া, কষিয়া পরীক্ষা সুরু করিলেন। বিপক্ষের যুক্তি উড়াইয়া দিবার জন্য, বহুকাল বহু গবেষণা চলিল। অবশেষে সকলেই মাথা নাড়িয়া বলিলেন হাঁ, আলো যদি তরঙ্গ হয় তবে তাহার সব খেলারই ব্যাখ্যা হয় বটে। সেই হইতেই বিজ্ঞানের পাতায় আলোর তরঙ্গের প্রবেশ, আঁকের ভাষায় আলোর তরঙ্গের সূত্র (Formula) লেখা হইল, এবং সেই সূত্র একটু-আধটু সংশোধন করিয়া শেষে যে অবস্থায় আসিল, তাহাতে আলোর পরিচিত খেলাগুলি সব তো ব্যাখ্যা হইলই উপরন্তু ভবিষ্যৎ-বাণী করা সম্ভব হইল যে, কোন্ অবস্থায় পড়িলে আলো কিরূপ খেলা খেলিবে।

আলো যখন তরঙ্গ, তখন তাহা শব্দের তরঙ্গ, নদীর তরঙ্গ বা আমাদের মশারী টানাইবার পরে একদিকে টোকা দিলে অন্য দিকে যেমন কাঁপুনি অনুভব করা যায়, তেমনি কোন তরঙ্গ হইবে। আলোর তরঙ্গের জন্যও বায়বীয়, তরল বা কঠিন কোন মিডিয়াম (Medium) প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল আলো তরল, কঠিন ও বায়বীয় প্রত্যেক প্রকারেই কোন কোন বস্তুতে সমান ভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এমন কি যেখানে কোন জিনিষই নাই একেবারে শূন্য, সেখানেও যে ইহার অবাধ গতি—তাহা আমরা কাচের জার পাম্প করিয়া দেখিয়াছি। অথচ তরঙ্গের জন্য কোন মিডিয়াম দরকার। তখন ঈথার (Ether) নামে একটী নূতন মিডিয়ামের অস্তিত্ব অনুমান করা হইল, যাহা সর্ব্বত্র বিরাজমান।

ঈথারের গুণাবলী বা Properties অনেকটা এই ধরণের। তিনি সূক্ষ্মতম গ্যাসের চেয়েও সূক্ষ্ম, অথচ ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। সাধারণ অবস্থায় ইহার কোন ওজন নাই, অথচ ইলেক্ট্রন (Electron) থাকিলে ইনি শীশার চেয়েও ভারী।

এই সব অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী গুণাবলী অনুমান ও স্বীকার করিয়া লওয়া সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহাতে ঈথারের রাজত্বের কোনও অসুবিধা হইল না। রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালী নাটকের রাজার মত তিনি শেষ পর্য্যন্ত অদৃশ্যই রহিয়া গেলেন, সকলেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল ও তাঁহার অদ্ভুত গুণাবলীতে স্তম্ভিত হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর শেষে 'মাইকেলসন-মরলি' (Michelson-morley) এক বিস্ময়কর পরীক্ষা দ্বারা সমস্ত সংশয় দূর করিলেন। পরীক্ষাটা অনেকটা এই ধরণের:—মনে করুন নদীতে খুব স্রোত। স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা চালাইয়া যাইতে যেরূপ কষ্ট, এপার হইতে ওপারে যাওয়া তাহার চেয়ে অনেক সহজ। স্রোতের প্রতিকূলে বা অনুকূলে একশত হাত যাইতে যে সময় লাগিবে এবং এপার হইতে ওপারে একশত হাত যাইতে যে সময় লাগিবে এই দুইটী সময় জানা থাকিলে, নদীর স্রোতের বেগ, আঁক কষিয়া বাহির করা যায়। এমন কি নদীর জল যদি আমরা অন্ধকারে নাও দেখিতে পাই

তবুও স্রোতের অনুকূলে এবং এপার-ওপার নৌকা চালাইয়া বলিয়া দিতে পারি জলের গতিবেগ কত।

ঈথার সর্ব্বত্র বিরাজমান। পৃথিবী ঈথারের মধ্য দিয়াই ঘুরিতেছে ও ছুটিয়া চলিতেছে। পৃথিবীকে স্থির ধরিলে আমাদের বলিতে হইবে ঈথার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে ও ছুটিয়া চলিতেছে। ঈথারকে না দেখিতে পাইলেও গতিবেগ কিংবা স্থির ঈথারে পৃথিবীর গতিবেগ বাহির করিতে আমাদের অসুবিধা হইবে না। একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার উত্তর দিকে কিছু দূরে ও পূর্ব্বদিকে সমান দূরে দুখানি আয়না এমন ভাবে বসান হইল যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইয়া আলো আবার সেই পথেই ফিরিয়া আসে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, অতএব ঈথার-তরঙ্গ প্রদীপ হইতে বাহির হইয়া আয়না পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে আসিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটীও খানিকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবে। অথচ উত্তরদিকে পৃথিবীর কোনও গতি না থাকায় সে-দিকের ঈথার-তরঙ্গকে যাইবার সময় যতটা পথ অতিক্রম করিতে হইবে, ফিরিয়া আসিবার সময়ও ততটা পথই আসিতে হইবে—একটুও কম হইবে না। অতএব পূর্ব্বদিকের ঈথার-তরঙ্গ আগে আলোর কাছে ফিরিবে এবং উত্তর দিকের ঈথার-তরঙ্গ ফিরিবে কিছুক্ষণ পরে, কিন্তু তবিৎ-সাগরে অতিশয় sensitive যন্ত্র ব্যবহার করিয়াও দুই সময়ের কোনও পার্থক্য ধরা গেল না। তাঁহাদের পরে অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং আরও বেশী sensitive যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সময়ের অতি সামান্য পার্থক্যও পাওয়া যায় নাই। তখন আবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল ঈথার নাই।

ইহার 'পরেও যদি কেহ 'আলো'কে ঈথার-তরঙ্গ বলিয়া চালাইতে চাহেন, আমি জানি, আমাদের কোনও কোনও বন্ধু তৈয়ারী চায়ের পেয়ালা ফেলিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। তথাপি আমরা ঈথার-তরঙ্গকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। ঈথার বলিয়া কোনও জিনিষ নাই তাহা বুঝিতেছি এবং আলো যে তরঙ্গ নহে তাহাও সত্য, কিন্তু তবু একটু রহিয়াছে। নিউটন যে-কণিকাসমষ্টি বা করপাস্কুলার থিওরীর (Corpuscular Theory) আভাষ দিয়াছিলেন তাহাই একটু অদল বদল করিয়া প্ল্যাঙ্ক (Plank) আজকাল নূতন কোয়াণ্টাম থিওরী (Quantum Theory) প্রচার করিতেছেন এবং বিদ্বান সমাজে ইহারই আজকাল আদর। কিন্তু এই নূতন কোয়াণ্টাম থিওরীই যে আলোর সব রহস্য ভেদ করিতে পারিবে তাহারই বা কি বিশ্বাস?

এখন এই নূতন কোয়াণ্টাম থিওরীকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। একটু কাগজ লইয়া যদি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতে থাকি, ছোট হইতে হইতে এক সময় আসিবে যখন তাহা ছিঁড়িলে আর কগজ থাকিবে না। 'হাইড্রোজন্' 'কারবন' প্রভৃতি কয়েকটী এটম (Atom) হইয়া পড়িবে। সেই একটী 'এটম' কে আরও ভাগ করিলে দেখিব কতকগুলি 'আয়ন' কে (Ion) কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ইলেকট্রন (Electron) ঘুরিতেছে। অনেকটা সৌরজগতের মত, 'কারবন' ও 'হাইড্রোজেনের' যা তফাৎ তাহা ঐ 'আয়ন' ও 'ইলেকট্রনে'র সংখ্যা ও ঘুরিবার পদ্ধতির তফাৎ মাত্র। হয়ত দেখা যাইবে তামার 'এটমে' কয়েকটী 'ইলেকট্রন' যোগ বা বিয়োগ করিলে তাহা সোনা হইয়া যায়। বলাবাহুল্য কাজটী বিশেষ সোজা নহে এবং প্রধান অসুবিধা এই যে 'এটম' এত ছোট যে সব চেয়ে জোরালো অণুবিক্ষণেও তাহা দেখা যায় না।

যাই হোক, সেই যে 'ইলেকট্রন', তাহাকে আর কাটিয়া টুকরা করা যায় না। এনার্জ্জি বা শক্তির ক্ষুদ্রতম কণিকা যাহাকে আর টুকরা করা যায় না, তাহার নাম রাখা হইয়াছে কোয়াণ্টাম (Quantum), বহুবচনে কোয়েণ্টা (Quanta)। একটী 'ইলেকট্রন'কে এক কোয়াণ্টাম এনার্জ্জি বা শক্তি দিলে তাহা একধাপ চাঙ্গা হইয়া উঠে। সেইরূপ 'ইলেকট্রন' হইতে এক কোয়াণ্টাম এনার্জ্জি কাড়িয়া লইলে তাহা একধাপ দমিয়া যায়।

কোন বস্তুর এটমের মধ্যকার 'ইলেকট্রন' যদি এক ধাপ দমিয়া যায়, সেই বস্তু হইতে এক কোয়াণ্টাম আলো বাহির হইবে। এবং ইলেকট্রনগুলি যদি ধাপের পর ধাপ দমিয়া

যাইতে থাকে তবে সেই বস্তু হইতে সেই তত ধাপ কোয়া-ণ্টাম আলো বাহির হইবে। বস্তুতঃ এনার্জি বা শক্তি এক কোয়াণ্টামের কম বাহির হইতে পারে না। এক, দুই, তিন বা বহু পূর্ণসংখ্যক কোয়েণ্টা শক্তি বাহির হইতে হইবে। এক কোয়াণ্টামের পরিমাণও স্থিরকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আঁক ও সূত্রে গেলে পাওয়া যাইবে। ইহাই কোয়াণ্টাম থিওরী। ইহাই একমাত্র ও অবিসম্বাদী সত্য কিনা তাহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই আলোর রংএর খেলার একটা সহজ-সরল চিত্র মনে আঁকিয়া রাখিতে হইলে ঈথার তরঙ্গের থিওরীর তুলনা হয় না। কোয়াণ্টাম থিওরী মতেও রংএর ব্যাখ্যা হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে মনে একটা ছবি আঁকিয়া রাখা যায় না।

তরঙ্গ থিওরী বলেন, শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর (Wave Length) যেমন সঙ্গীতের 'সা' 'রে' 'গা' 'মা' প্রভৃতি সপ্তস্বরের পার্থক্য নির্ভর করে, আলো তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া ও কমিয়াই তেমনি লাল, কমলা, হলদে, সবুজ প্রভৃতি সাতটা রং সৃষ্টি করে। কোয়াণ্টাম থিওরী বলিবেন, এক রং-এর আলোর সহিত অন্য রংএর আলোর তফাৎ মাত্র এক কোয়াণ্টাম এনার্জি। তাহার বেশী বুঝিতে হইলেই আসিবে ঐ আঁক।

তবে আলোর ওজন আছে, যাহা তরঙ্গ-থিওরীতে কোনও উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। দূরের আলো যখন সূর্য্যের পাশ দিয়া পৃথিবীতে আসে, তখন তাহার কণিকা-গুলি সূর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সোজা পথ হইতে বেশ খানিকটা বাঁকিয়া যায়। আইনষ্টাইন পূর্ব্বেই আঁক কষিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন কতটুকু বাঁকে। এবং তাহার পর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঠিকই তাই। ঠিক ততটুকুই বাঁকে বটে।

আলো বাস্তবিকই কি জিনিষ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। কারণ আলোর প্রকৃত স্বরূপ উপমা দিয়া ও সাহিত্য করিয়া প্রকাশ করা যায় না। আলোর কতকগুলি খেলা বুঝিতে তরঙ্গের উপমা কার্য্যকরি। আবার কতকগুলি খেলা বুঝিতে 'শক্তি-কণিকা' উপমা দরকার। আলো কি, তাহা একমাত্র আঁকের ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব। সেই আঁক দেখিয়া ভয় পাইলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ। শুধু আলো কেন, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু কঠিন কঠিন আঁকের আইন মানিয়া চলে। এ যুগের বিশ্বকর্ম্মা গণিতের একজন বড় পাণ্ডা। তাহার কাজকর্ম্ম বুঝিতে হইলে গণিত শিখিতেই হইবে। নতুবা "নাশংসে বিজয়ায়"।

হে বিধাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কবন্ধের অন্ধকার এই রাত্রে, হে বিধাতা, করিয়াছো দান
জনগণ, সরীসৃপ, অগণন যক্ষাবীজ, ক্ষয়ময় যৌবন উদ্ধত।
ভবিষ্যৎ কুষ্ঠি শুধু সময়ের কুষ্ঠরোগে ভরা
আমাদের ঘিরে আজ, হে বিধাতা, অজস্র এ দান।

সুচতুর নিষঙ্গীর পঞ্চবাণ মহাবেগবান
জঠরের জ্বালা ভুলে দলে দলে কবি-নবীনেরা
কথার ফানুষ শুধু,
তাদের কথায় নেশা,
হে বিধাতা।

যেখানে জয়ের নেশা গন্ধকের ঘ্রাণ ঘিরে আছে
আশ্রমের নিরালায় অজ আজ ঘাস খেয়ে ঘোরে :
মিলের চিম্‌নির বমি মিলনের বাঁশী কি বাজায়?
দ্বাপরের বৃন্দাবন কলিযুগে কিছু সরিয়াছে।

হে বিধাতা। শ্বাস-যন্ত্র রুদ্ধ করে উর্দ্ধনেত্র দিয়ে
বর্ত্তমান পার হয়ে ভবিষ্যৎ কতখানি দেখো?
ল্যয়েডের চেক্ ট্যাঁকে, কানে কানে মহামন্ত্র দাও।

অপার মহিমা তব, হে বিধাতা, কবি নমস্কার।
অতীত তো অন্ধকার, বর্ত্তমানো কবন্ধ ছায়ায় :
গণ্ডাগণ্ডা গুণ্ডাপাণ্ডা আশ্রম সীমায়
সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মাবীজ, হাবাতের দল।

———

লেনিনের স্মৃতি

এন, ক্রুপ্‌সকায়া—অনুবাদক, সুধীপ্রধান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রমে কংগ্রেসের উপর মেঘ জমে উঠতে লাগলো। কেন্দ্রীয় সমিতির ত্রয়ী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে আমরা এসে পড়লাম। কেন্দ্রীয় সমিতির জন্য মূলগত প্রাণশক্তি এখনও মিলছিল না। প্রার্থীদের মধ্যে গ্লেবভ্‌ই (নসকভ্‌) একমাত্র অবিসম্বাদিত হয়েছিলেন কারণ, অপরিশ্রান্ত সংগঠনকারী হিসাবে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ক্লেয়ার (Krzhizhanovsky) যদি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতেন তো তিনিও বিনা বাধায় দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু তাঁরও লেন্‌গ্‌নিকের ব্যাপারে প্রতিভূ দাঁড় করিয়ে, বিশ্বাসের উপর ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হ'ল—ফলে জিনিষটা ভাল হয়নি। তা'ছাড়া, কংগ্রেসে অনেক বেশী "সেনাপতি"রা উপস্থিত ছিলেন—যাঁরা কেন্দ্রীয় সমিতির পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে "জ্যাক" (ষ্টেন আলেকজান্দ্রোভা), "ফোমিন" (ক্রোকমল), "ষ্টার্ণ" (কষ্ট্যা), "পপোভ্‌" (রোজানভ্‌) এবং "এগরভ" (লেভিন) ছিলেন। কেন্দ্রীয় সমিতির ত্রয়ীদের মাত্র দুটী আসন খালি হওয়ায় এত প্রার্থী। এ ছাড়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে কেবল দলের কর্ম্মী হিসেবেই জানতো না—পরস্পরের ব্যক্তিগত জীবনও জানা ছিল। ফলে ব্যক্তিগত ভাল লাগা ও না-লাগার একটা বিশ্রী জাল তৈরী হ'ল। ভোটের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই আবহাওয়া তীব্র হয়ে উঠলো। "বিদেশস্থ কেন্দ্র আদেশ করতে চাইছে, নির্দ্দেশ করতে চাইছে" প্রভৃতি অপবাদ যা' বাণ্ডরা ও রাব্‌চি দেলোরা প্রচার করছিল—প্রথম দিকে সেগুলিকে সমবেত ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে তার ফল ফলতে লাগল। কেন্দ্রে যারা দোদুল্যচিত্ত ছিল—হয়তো অজানিত-ভাবেই ছিল—তাদের উপর ওদের প্রভাব পড়েছিল। কা'র আদেশের জন্য এত ভয়? অবশ্য মার্টভ, যাশুলিচ, ষ্টারোভার এবং এক্‌সেলরডের জন্য নিশ্চয়ই নয়। লেনিন ও প্লেখানভের আদেশের ভয় তা'রা করছিল। কিন্তু তা'রা জানতো রাশিয়ার ব্যাপারেও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্লেখানভের থেকে লেনিনই হবেন নির্দ্ধারণ কর্ত্তা, কারণ প্লেখানভ্‌ প্রকৃত কাজ কর্ম্ম থেকে দূরে রয়েছেন।

কংগ্রেস "ইস্ক্রা"র নীতিই গ্রহণ করলো, কিন্তু তারপরেও সম্পাদকমণ্ডলীর নির্ব্বাচনের কাজ বাকী ছিল। ইলিচ্‌ প্রস্তাব করলেন যে, তিনজন নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। প্রস্তাব করার আগেই তিনি মার্টভ্‌ ও পোট্রেসভ্‌কে এবিষয় বলেছিলেন। তাই প্রতিনিধিরা আসতেই মার্টভ্‌ তাদের বোঝাতে লাগলো যে, তিনজন সম্পাদক নিয়ে মণ্ডলী করলে সেটা বেশ কার্য্যকরী হবে। যখন ইলিচ্‌ প্লেখানভ্‌কে সম্পাদকমণ্ডলী সম্পর্কিত প্রস্তাবের কাগজটা দিলেন, তখন তিনি কিছু না বলে সেটা পকেটস্থ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটি কি হচ্ছে, কিন্তু তিনি রাজী হলেন। যতক্ষণ দল আছে ততক্ষণ প্রকৃত কাজের দরকারও অবশ্য আছে।

"ইস্ক্রার" অন্য সকলের থেকে মার্টভ্‌ই বেশী ক'রে সংগঠন সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিশেছিলেন। তাই তারা শীঘ্রই তাকে বোঝালো যে সম্পাদক-ত্রয়ী তার বিরুদ্ধে যাবে এবং যদি সে এর ভিতর ঢোকে তাহলে যাশুলিচ্‌, পোট্রোসভ্‌ও এক্‌সেলরডকে ছেড়ে নীচে নামিয়ে দেবে। এক্‌সেলরড্‌ ও যাশুলিচ্‌ এই নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।

এই রকম অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে আইন-কানুন সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রথম প্যারাটীর বাদানুবাদ বিশেষ তীব্র হয়ে উঠলো। এই সমস্যাটীতে লেনিন ও মার্টভের

মতভেদজনক রাজনীতি ও সংগঠনমূলক নীতিগত ভিত্তি ছিল। আগেও এদের মতভেদ হয়েছে, কিন্তু সে-দিনের সঙ্গে আজকের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আগে সেগুলি হ'তো ছোট গণ্ডীর মধ্যে—তাই শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যেত। কিন্তু এবারে কংগ্রেসের মত একটা বড় জায়গাতে এমন হ'ল—যেখানে ইস্ক্রার বিরুদ্ধে বা লেনিন ও প্লেখানভের বিরুদ্ধে যার এতটুকুও বাদ-বিসম্বাদ ছিল—তারা এই জিনিষটাকে বাড়িয়ে একটা বড় সমস্যায় পরিণত করাতে চেষ্টা ক'রতে লাগলো। "কিভাবে আরম্ভ করতে হবে" ও "কি করতে হবে" (What to start with and what is to be done) বইদুটো লেখার জন্য লেনিনকে আক্রমণ করা হ'ল এবং তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতার অভিলাষী ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত হ'তে লাগলেন। কংগ্রেসে লেনিন অত্যন্ত তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করলেন। "এক কদম এগিয়ে দু'-কদম পিছু হটা" নামক পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন: "কংগ্রেসে একটী মধ্যপন্থী প্রতিনিধির সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা' মনে না ক'রে পারি না। তিনি আমার কাছে অভিযোগ করেন: কংগ্রেসের আবহাওয়া অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। এই সব মারামারি কাটাকাটি, একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের আন্দোলন, তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং এই সব অ-কমরেড সুলভ ব্যবহার। অতির দুঃখের বিষয়। আমি উত্তরে বল্লাম: কি সুন্দর আমাদের কংগ্রেস—খোলাখুলি যুদ্ধের সুযোগ, মতামত প্রকাশ, যার যেদিকে ঝোঁক তা' প্রকাশ করা, উপদলগুলি চিহ্নিত হওয়া—হাত তোলা ও একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মানে, একটা অবস্থা পার হয়ে আসা—এগিয়ে চলা। ঠিক এই জিনিষই আমি চাই, এই তো জীবন। ক্লান্তিকর, সমাপ্তিহীন পণ্ডিতি তর্ক, যার শেষ সমস্যা সমাধান হয় না বরং বকতে বকতে যা নিয়ে ক্লান্ত হতে হয়, তার সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য আছে। আমার বন্ধুটী এই উত্তর শুনে আমার মুখের দিকে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন এবং কাঁধ দুটো একবার নাড়লেন। আমরা ভিন্ন ভাষায় কথা কয়েছি।" এই উদ্ধৃত অংশটি ইলিচ্‌কে সম্যকরূপে প্রকাশ করেছে।

কংগ্রেসের গোড়া থেকেই ইলিচের স্নায়ুগুলি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিল। ব্রুসেল্‌সে যে বেলজিয়ম স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে আমরা থাকতাম সেখানে ইলিচের অগ্নি-মান্দ্যের জন্য তিনি প্রাতঃরাশে ভাল মূল্যের তরকারি ও ডাচ্ পনীর খেতে পারতেন না বলে, স্ত্রীলোকটি চটে যেত। লণ্ডনে তাঁর এমনি অবস্থা হ'ল যে, একেবারেই ঘুমুতে পারতেন না এবং অত্যন্ত অস্থির হয়েছিলেন।

বিচ্ছেদ কেউ আশা করেনি। ট্রট্‌স্কির সঙ্গে আমার একটি আলোচনার কথা মনে পড়ে। আলোচনার ক্ষেত্রে ইলিচ্ তীব্র ভাষায় কথা কইলেও, সভাপতি হিসাবে তিনি চূড়ান্ত রকমের নিরপেক্ষ থাকতেন ও কোন বিরোধীকে সামান্যও অবিচার করতেন না। কিন্তু প্লেখানভ্ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সভাপতি হ'লে রসিকতায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতেন এবং বিরুদ্ধপক্ষকে বিরক্ত করতে ভাল বাসতেন। প্লেখানভ্ এই ধরণের একটি ঠাট্টা করার পর যথা: "জানতাম ঘোড়ায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন দেখছি গাধাও কথা বলছে"। ট্রট্‌স্কি আমাকে বল্লেন: ইলিচ্‌কে সভাপতি হ'তে বল, তা না হ'লে প্লেখানভ্ একটা বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসবেন। অবশ্য সমস্যাটা শুধু সভাপতিত্বের ব্যাপার নিয়ে আবদ্ধ ছিল না।

যদিও বাণ্ডের সঙ্গে দলের সম্পর্ক, "ইস্ক্রা" মনোভাবকে "পতাকা" বলে মেনে নেওয়া ও কার্য্যধারার সমস্যা সম্পর্কে অধিকাংশ প্রতিনিধিদের মধ্যে পার্থক্য ছিল না—তবুও অধিবেশনের মাঝামাঝি একটা ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এবং শেষের দিকে সেটি গভীরতর হ'ল। সত্যি কথা বলতে গেলে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এমন কিছু হয়নি, যারা সংযুক্তভাবে কাজে বাধা সৃষ্টি করবে বা কাজ অসম্ভব ক'রে তুলবে। এগুলি তখনও গোপন ছিল—বা বলা যেতে পারে যে, সম্ভাবনার কারণ হিসাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এবারে কংগ্রেস পরিষ্কার দুই ভাগে বিভক্ত হ'ল। অনেকের ধারণা হ'ল যে, প্লেখানভের অযৌক্তিকতা, লেনিনের তীব্রতা ও উচ্চাভিলাশ, প্যাভলোভিচের হুল ফোটানি ও যাশুলিচ এবং একসেলডের প্রতি অন্যায়

ব্যবহার—এই সবের কারণ। যে সব প্রতিনিধিদের এই ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা "নিপীড়িত"দের সমর্থন করলেন, কিন্তু যারা এই ভাবে ব্যক্তিত্বের দিকেই শুধু তাকিয়েছে তারা আলোচনার সমস্তটাই ভুল বুঝেছে। ট্রট্স্কিই জিনিষ ধরতে পারেনি। আসল কথা এই যে, যে সমস্ত কমরেড্রা লেলিনের চারপাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা নীতির দিকটায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সর্ব্বপ্রকারে সেগুলিকে পালন করার আগ্রহে সমস্ত কাজের ভিতর সেগুলিকে চালাবার চেষ্টায়। অন্য দলের ছিল ভাসা দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতিকে গোঁজামিল দেওয়া ও ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় তাদের ঝোঁক ছিল।

নির্ব্বাচনের সময় ঝগড়াটা অত্যন্ত প্রখর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভোটাভুটির আগের দু'একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। একসেলরডের মনে হ'ল, ব্যমানের নৈতিক বুদ্ধির অভাব ঘটেছে—তাই তিনি তাকে গালি-গালাজ করতে লাগলেন এবং নির্ব্বাসনের সময় যে সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল তারই উল্লেখ ক'রতে লাগলেন। ব্যমান চুপ ক'রে রইলেন এবং তাঁর চোখ জলে ভরে এল। আর একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। ডিউচ্ রাগতঃস্বরে গ্লেবভ্কে (নস্কভ) কি বলছিলেন, তাতে সে মাথা তুলে উজ্জ্বল চোখে ও তীব্র ভাষায় উত্তর করলে: দেখ, মুখ বুজে থাক বল্‌ছি, বুড়ো হতচ্ছাড়া কোথাকার।

কংগ্রেস শেষ হ'ল। গ্লেবভ্, ক্লেয়ার এবং কুর্জ কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্ব্বাচিত হ'ল। ৪৪টি চরম ভোটের মধ্যে কুড়িটি নিষ্ক্রিয় রইল। প্লেখানভ্, লেলিন ও মার্টভ্ কেন্দ্রীয় মুখপত্রে নিযুক্ত হ'লেন—কিন্তু মার্টভ্ সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিতে অস্বীকৃত হ'লেন। বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

কংগ্রেসে নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয়

(মানবেন্দ্রনাথ রায়)

অনুবাদক—সবিতা রাণী দেবী

আমরা সবাই নূতনত্ব পছন্দ করি। কিন্তু নূতন কিছু গ্রহণ করবার বেলাতেই আমাদের যত সব সঙ্কোচ, যত দ্বিধা উপস্থিত হয়। এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি কংগ্রেসের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলতার জন্য অনেকটা দায়ী। গত কয়েক বৎসর ধরেই কংগ্রেসে বর্ত্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছিল। এই অসন্তোষের ফলেই এত বড় একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হোয়েছে। অনেকেই বর্ত্তমান নেতৃত্বের গলদ অনুভব করেন, কিন্তু তাদের বদ্ধমূল ধারণা নেতৃত্বের পরিবর্ত্তন কোনমতেই সম্ভব নয়। এখানেই জিজ্ঞাস্য, কেন সম্ভব নয়? যদি নূতন নেতৃত্বের প্রয়োজন থাকে তা'হলে তা নিশ্চয়ই সম্ভব, এবং আজ যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে অচিরেই তা সহজে সম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্ন হ'তে পারে—নূতন নেতৃত্ব চাওয়া কি অন্যায়? আমার মতে এর মধ্যে কোনো অন্যায়ই নেই, অচেতন পদার্থ—যার কোনো পরিবর্ত্তনই নেই—তা দিয়ে তো কোনো সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় না। মানব সচেতন এবং তার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। সেই মানব দ্বারাই যখন সঙ্ঘ পরিচালিত, তখন মানুষের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। কাজেই এই সঙ্ঘের যিনি পরিচালক, যিনি নেতা তারও পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু নেতার পরিবর্ত্তনের মানে হয় না যে, আজ যিনি নেতৃত্ব কোরছেন কাল আর তিনি নেতৃত্ব করবেন না। একই ব্যক্তি বহুদিন নেতৃত্ব করতে পারেন, কিন্তু সঙ্ঘের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তাঁর মত ও পন্থার পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে। পুরাতন নেতৃত্বের অবসান ও নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয়—

এই কথাগুলির মানে এই নয় যে, এক ব্যক্তির নেতৃত্বের অবসান ও আরেক ব্যক্তির অভ্যুত্থান। কালে যিনি নেতৃত্ব করেছেন, আজও তিনি নেতৃত্ব কোরতে পারেন এবং ভবিষ্যতেও নেতৃত্ব করার ক্ষমতা রাখতে পারেন, শুধু দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁকে তাঁর মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি বদলাতে হবে। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পঁচিশ তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এখনও তেমনিই আছি। কিন্তু পঁচিশ তিরিশ বৎসর আগে বিপ্লব সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, আজ আর তা' নেই। মতেরও অনেক পরিবর্তন হোয়েছে। নেতাদেরও তেমনি স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। কালের গতির সঙ্গে যিনি তাল রেখে চলতে না পারবেন, নেতৃত্ব করবার স্পৃহা তাঁর থাকা উচিত নয়। নেতৃত্বের আসন থেকে তাঁকে অপসারিত ক'রে, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিকেই নেতৃত্বের স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

নেতৃত্বের পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে নেতৃত্ব কাকে বলে এবং তার কাজ কি, এই কথাটা আমাদের বিশদভাবে বোঝা দরকার। নেতাদের কাজে জনসাধারণের সুপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলে তাকে বাস্তবরূপ প্রদান করা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা আন্দোলন সৃষ্টি করেন নেতারা। তাদের মতে সৃষ্টি কখনও স্রষ্টার চেয়ে বড় হ'তে পারে না। এই জন্যই তারা নূতন নেতৃত্বের কল্পনা ক'রতে অক্ষম। তারা ভাবতে পারে না যে, আন্দোলনের স্রোত অনেক সময়ে নেতাদের ছাপিয়ে যায়, আন্দোলনের প্রথম নেতারা বাতিল হয়ে যান—আর জনসাধারণের ভিতর থেকেই নূতন নেতার উত্থান হয়।

আমাদের দেশের জনসাধারণের ধারণা যে কংগ্রেসের যে আন্দোলন চলছে, মহাত্মা গান্ধী তার স্রষ্টা। এই আন্দোলনে মহাত্মার দান যে অসীম, তা আমি একবারও অস্বীকার করি না, কিন্তু একথা না ব'লেও পারি না যে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং তাদের এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী তাদের নেতৃত্বের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। এই আন্দোলন গান্ধীজীর সৃষ্টি নয়—একথা বললে তাঁকে হীন করা হবে না, বরঞ্চ তাঁর ভক্তবৃন্দেরা—যারা তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে, বিনা যুক্তিতে, তাঁর বাণী, তাঁর আদেশ বেদবাক্য ব'লে মেনে নেয়, তাদের চেয়ে তাঁর অভ্যুত্থানের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে যারা তাঁকে মানুষ বলেই মনে করে এবং মানুষ হিসাবে তিনিও ভুল-চুক ক'রতে পারেন একথা স্বীকার করে, তারাই তাঁকে বেশী সম্মান করে।

গান্ধীজী কেমন ক'রে প্রথমে নেতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। ১৯০৯ সাল থেকে তিনি অন্যান্য দেশে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। ভারতে তখন কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনও সুরু হয়েছিল, অথচ কেন তিনি ১৯১৯ সালের পূর্বে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি? ১৯১৪ সাল থেকে তিনি ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী ভাবে বাস ক'রতে আরম্ভ করেন, তা সত্ত্বেও কেন তিনি ১৯১৫ সাল থেকে আন্দোলন পরিচানা ক'রতে পারেন নি?

জিনিষটা তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ১৯১৯ সালের পূর্বে ভারতে গণ-আন্দোলন সে-রকম পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তখন জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের অধীনে কিম্বা গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কর্মপন্থা ভিন্ন ছিল। ১৯১৯ সালে সর্বত্র একটা অসন্তোষের আগুন দেখা যায়। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ১৯১৯ সালেই বা অসন্তোষের আগুন হঠাৎ দেখা দেবার কারণ কি? তার জবাবে বলবো—এই অসন্তোষের আগুন হঠাৎ দেখা দেয়নি। বহুদিন ধরেই এর কারণ জমা হচ্ছিল এবং ক্রমেই তা বেড়ে চললেও খুব প্রবল আকারে দেখা দেয়নি। রাজনৈতিক কারণে উৎপীড়িত কয়েকটি মধ্য-বিত্তের মধ্যেই এই অসন্তুষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের অধিকাংশ লোকই তখন পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল কারণ, রাজনীতি নিয়ে তারা মাথা ঘামাতেন না। তারপর যখন অর্থনীতির দিক দিয়েও তাদের উপর শোষণ আরম্ভ হ'ল, তখন সকলেই ক্ষুণ্ন হ'ল। বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময়

এই শোষণের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিল,এবং ভারতের সহস্র সহস্র লোককে যুদ্ধে পাঠানো হয়। ১৯১৮ সালে তাদের অনেকেই যুদ্ধ থেকে ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল বিদেশের অভিজ্ঞতা। নূতন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেদের অবস্থা তলিয়ে বুঝতে শিখলো। আর এই শিক্ষাই তাদের অসন্তোষের মাত্রা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে তুললো, তারই বহিঃপ্রকাশ হ'ল ১৯১৯ সালে।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব চম্পারণ কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কে। চম্পারণে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন গান্ধীজীর আগমনের আগে থেকেই ধূমায়িত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সে আগুন যখন প্রবল আকারে জ্বলে উঠলো, গান্ধীজী তখনই সেখানে উপস্থিত হ'লেন। চম্পারণের কৃষকদের মতন দেশের সর্বত্রই কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ জমা হচ্ছিল, ১৯২০ সাল থেকে ১৯২১ সালে নানা স্থানে এই রকম অনেক আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেল। স্বাধীনতার যুদ্ধে জনসাধারণের এই জাগরণ এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করলো, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই সময়ে গণ-আন্দোলনে পরিণত হ'ল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বেও আমাদের দেশে আন্দোলন ছিল এবং তার নেতাও ছিলেন। প্রভেদ এই যে, সে আন্দোলন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের গায়ে সে আন্দোলনের ঢেউ লাগেনি। তারপরে যখন এই আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, পুরাণো আন্দোলনের নেতারা কর্তব্য স্থির ক'রতে পারলেন না। কারণ এই রকম আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁদের পূর্বে কখনও ছিল না। তাঁরা এই গণ-আন্দোলনকেও বিশেষ সু-নজরে দেখলেন না। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই নব জাগরণের পরিণাম তিনি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে একটা স্বাধীন ভারতের আদর্শ তুলে ধরলেন। এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য, অসহযোগ আন্দোলন সুরু কোরতে আদেশ দিলেন। এইরূপে তিনি নেতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাদের সাম্রাজ্যচ্যুত করবার প্রচেষ্টাতে তাঁর উচিৎ ছিল, একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্দেশ করা। কিন্তু তিনি আদেশ দিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে অসহযোগ নীতি অবলম্বন ক'রতে। কেন গান্ধীজী এই নীতি অবলম্বন কোরতে ব'ললেন? অন্য কোন পন্থা ছিল না কি? দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তিনি এই পন্থা-নির্ধারণ ক'রেছিলেন, কিন্তু সেখানে অকৃতকার্য হ'য়েও কি তার চৈতন্যের উদ্রেক হয়নি? অবশ্য ভারতবর্ষেও কেন তিনি এই নীতি অবলম্বন ক'রেছিলেন তার কারণ আছে।

বহুদিন ধ'রে নিষ্পেষণের ফলে ভারতবাসীরা আত্ম-বিশ্বাস হারিয়েছিল। আজও তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব অনেকটাই রয়ে গেছে। তারই পরিণাম স্বরূপ আজও শতকরা ৯৯ জনের বিশ্বাস, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন অসম্ভব। ভারতবাসী তাদের নিজের জোরে স্বাধীনতা লাভ কোরতে পারে এ বিশ্বাসও তাদের নেই। দেশ-ভক্তি তাদের নেই বলেই যে তারা একথা বলে তা নয়, শুধু আত্ম প্রত্যয়ের অভাবেই তারা এই রকম মনে করে। বিশেষ ক'রে ১৯২০ সালে, তাদের আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই ছিল না। কাজেই তখন কোনো কঠিন পন্থা অবলম্বন ক'রলে আমরা সফল হ'তে পারতাম না। ১৯১৫ সালের ঘটনা থেকে আমরা সেই অভিজ্ঞতাই শিক্ষা করেছি।

১৯১৫ সালে আমরা একটা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হ'তে পারিনি। অকৃতকার্যতার কারণ এখনও সঠিক নির্ণয় ক'রতে পারি না তবে এটুকু বোলতে পারি যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী ক'রতে পারিনি। যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হ'লেও লোকের অভাবে আমাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারতো না ব'লেই মনে হয়।

তার পরে প্রচেষ্টা চললেও কেউ সফল হ'তে পারেনি এবং এই বিফলতাই তখনকার জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম ও সংগ্রামে জয় অসম্ভব, এই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে তুলেছিল।

ঠিক এই রকম অবস্থায় শত্রু পক্ষকে সামনাসামনি আক্রমণ না ক'রে তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রে তাদের জয় করবার পরিকল্পনা গান্ধীজী সকলের সামনে আনলেন। সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে তা' গ্রাহ্য করলো। ১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত জনসাধারণ একটা ভীতিজনক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছিল। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সামনাসামনি কিছু করবার মানেই ছিল, কারাগৃহ, ফাঁসীর মঞ্চ ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড বরণ ক'রে নেওয়া। তাতে খুব অল্প লোকই রাজী ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, জনসাধারণ প্রকাশ্যে আন্দোলন সুরু কোরেছে। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হোক্" এই বাণী উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রে সহস্র সহস্র লোক শোভাযাত্রা ক'রে কারাগৃহ বরণ ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু পূর্বের মতন কঠোর শাস্তি হোত না বলেই কারাগৃহের ভয় তাদের বিচলিত ক'রতে পারতো না। গান্ধীজীর এই নূতন অসহযোগ-নীতি অবলম্বনের ফলে এমন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল, যার দ্বারা জনসাধারণ তাদের অসন্তোষ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সহজে প্রকাশ কোরতে সক্ষম হ'ল, অথচ বিশেষ কোনো বিপদের সম্মুখীন্‌ও হ'তে হোত না। তখনকার জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এই রকম একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়াই আবশ্যক ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯১৯ সালের পূর্বেও ভারতে আন্দোলন ছিল, কিন্তু গান্ধীজী সেই আন্দোলনকে এমন এক প্রশংসনীয় রূপ দিলেন, যা সময়ের উপযোগী হ'য়েছিল। সেই থেকেই তাঁর নেতৃত্ব সংস্থাপিত হোল।

কিন্তু ১৯২১ সাল থেকেই তাঁর নেতৃত্বের গলদ বোঝা গেল, অবশ্য দু'একজন ব্যতীত সমস্ত জনসাধারণের তখন তাঁর উপরে অগাধ বিশ্বাস, তাদের নিয়েই তিনি সেই আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চালালেন।

প্রায় সেই সময়েই নূতন নেতৃত্বের প্রয়োজন হ'য়েছিল, এই প্রয়োজনীয়তা বোলবার জন্য তাঁর ঘোষণাগুলি স্মরণ করবো। ১৯১৯ সালে তিনি যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন তখন যে কথাগুলি বোলেছিলেন, ঠিক সেই কথাগুলিই প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করবার সময়েও বোলেছেন। আবার ঠিক সেই কথাগুলিই ভাষার একটু বদল ক'রে ডাণ্ডি যাত্রার পূর্বেও বোলেছেন। দ্বিতীয় বার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার পূর্বেও সেই কথাগুলি বোলেছেন, আবার বন্ধ করবার পূর্বেও সেই কথাগুলিই আবৃত্তি ক'রে গেছেন। পুনরায় সেই একই ঘোষণা ক'রে তিনি কংগ্রেসকে উপদেশ দিয়েছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্যভার গ্রহণ ক'রতে (Office Acceptance) এবং এই সম্পর্কে "The forces of evil are raising their heads, and therefore I must act" তাঁর এই বাণী খুব সুস্পষ্ট। কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্যভার গ্রহণ না করলে, একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়াতো। অথচ গান্ধীজী তা' চান্‌নি। কাজেই গান্ধীজীর নেতৃত্ব দেশের বৈপ্লবিক মনোভাবের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পারলো না।

গান্ধীজী অবশ্য এইরকম আন্দোলনই চালাতে লাগলেন। কিন্তু শোষিত, নিষ্পেষিত জনগণের তরফ থেকে অন্যরকম আন্দোলন চালানো প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। তখন তাঁর প্রয়োজন ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করা, অথচ তিনি সে-রকম কোনো আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন না। সময়ের উপযোগী আন্দোলন চালাতে সক্ষম হলেন না, ফলে দাঁড়ালো একটা বিপর্যয়। সেই ১৯২১ সাল থেকে দেশ এই রকম বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্য দিয়েই চলেছে। আন্দোলন যতবার পূর্ণরূপে পরিণতি লাভ করতে গিয়েছে, নেতারা তখনই তা থামিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেশ এক ধাপ এগিয়ে, তার ২০ ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ দেশের জনসাধারণের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি সে-রকম উগ্র ছিল না এবং বিপদের সম্মুখীন হবার মত তাদের সাহসও ছিল না। নেতারাও সেইজন্য তাদের

দমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক জ্ঞান জনসাধারণের খুব কম ছিল। তারা অজ্ঞ ছিল বলেই গান্ধীজীর উপর অতখানি বিশ্বাস স্থাপন কোরতে পেরেছিল। গান্ধীজীকে তারা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে না দেখে ধর্মগুরু বলে মেনে নিয়ে, বিনা যুক্তিতে আদেশ পালন ক'রে চলেছিল। গান্ধীজী নিজে যদি বৈপ্লবিক মনোভাব সম্পন্ন হ'তেন, তা'হলে বহু পূর্বেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হোত। কারণ বীর পূজারীর দেশে গান্ধীজীর বাক্যকে তারা বেদবাক্য ব'লে মেনে নিয়ে তাঁর আদেশানুযায়ী কোন কাজ করতেই দ্বিধা করতো না, কিন্তু গান্ধীজী তাদের আর অধিক অগ্রসর হ'তে দিলেন না। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর দ্বারা জনসাধারণকে দিয়ে তখন যা করানো সম্ভব হোয়েছিল, আর কেউই তা করতে পারতো না। সেই জন্যই আমি বল্‌ছি, জনসধারণের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার দরুণই এতটা সম্ভব হোয়েছিল। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেশের পক্ষে এটা ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। জমিদারদের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত কৃষকবৃন্দ জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো মনস্থ করেছিল। গান্ধীজী তাদের বোঝালেন, "জমিদার মা বাপ, তাদের উপর কোনরকম রোষ পোষণ না ক'রে, তারা যদি সাধারণভাবে জীবন যাপন ক'রে চলে, অত্যাচারী জমিদারদের হৃদয়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।" অজ্ঞ কৃষকবৃন্দ গান্ধীজীর আদেশ শিরোধার্য ক'রে নিলো। প্রজা-আন্দোলন বন্ধ রইলো।

এর থেকেই বোঝা যায়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিণীতির জন্য এমন একজন জননায়কের প্রয়োজন, জনসাধারণ যাঁকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না ক'রে তাঁর আদেশানুযায়ী কাজ ক'রে যাবে। এইরকম জননায়কের উত্থান হবে জনসাধারণের ভিতর থেকেই। জনসাধারণের কাছে বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়ে যিনি তাদের সমস্ত জিনিষ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে শেখাবেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। ভিতরের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এই সবকে দূর ক'রে দিয়ে, জনসাধারণ যখন অন্তর দিয়ে সমস্ত জিনিষ উপলব্ধি ক'রে কাজ আরম্ভ করে, তখন সেই কাজের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এইরকম একজন নেতার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেক দিন থেকেই অনুভব করছি। এই নূতন নেতৃত্ব-সংস্থাপনের চেষ্টাও যে আজ নূতন নয়, তার পরিচয় রাজনীতিক্ষেত্রে C. R. Dass-এর আবির্ভাব থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু কেন যে সেই চেষ্টা এখন পর্যন্ত ফল লাভ করতে পারেনি সে আলোচনা এখানে করবো না। আমি শুধু বলবো, গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাম-পন্থীদের কাছ থেকে প্রথমে আসেনি। নরম-পন্থীরাই সর্বপ্রথম তাঁর মতবাদে অনাস্থা স্থাপন ক'রেছিল এবং সেই থেকে মধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁর মতবাদে আস্থা হারিয়েছিল, তবুও গান্ধীজীর মতবাদের বিরুদ্ধে কিছুই ক'রতে পারেনি। সোজা কথায় তার মতবাদই মেনে নিয়েছিল।

এটা যদিও সবাই স্বীকার ক'রে না, কিন্তু এইটাই আদৎ সত্য যে গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, সে নীতি ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হোয়েছেন। গান্ধীবাদের যেটা হ'ল ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ, সেই আইন অমান্য আন্দোলনই তিনি থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেই বোলেছেন দেশ এখনও আইন অমান্য আন্দোলন চালাবার উপযুক্ত হয়নি, এই আইন অমান্য-রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে তিনি যা বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই এর উপযুক্ত নয়। এই আইন অমান্য অন্দোলন চালাবার উপযুক্ততা লাভ সম্বন্ধে গান্ধীজী যে আশা পোষণ ক'রেন, কোন যুক্তিবাদী লোক তা বিশ্বাস ক'রবে না। দেশের যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোক শুধু বাক্যে নয়, কার্যেও অহিংস থাকতে সক্ষম না হ'বে ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম আন্দোলন চলতে পারে না—এই তাঁর মত। এইরকম একটা কাল্পনিক অসম্ভব চিন্তার উপরে কেউই আস্থা রাখতে পারে না। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রইলো। অথচ দেশ কোন্ পন্থা অবলম্বন ক'রবে? বাধ্য হ'য়ে তাকে বহুদিন পরিত্যক্ত নিয়মতান্ত্রিকতার (constitutionalism) পন্থা অবলম্বন ক'রতে হোল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসও আজ ঐরূপ বিপরীতগামী নীতির অন্তর্ভুক্ত।

এর মূল কারণ অনুসন্ধান কোরতে গেলেই গান্ধী-বাদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ দরকার। গান্ধীবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, অহিংস নীতি অবলম্বন করা। এর ব্যতিক্রম কোথাও হ'বে না। তা' চায়নাতেই হোক্, স্পেনেই হোক্, আর সেই কলেজ পড়া মেয়েটীর ব্যবহারেই হোক্—সবত্রই তিনি অহিংস নীতি খাটাতে চান্। এমন কি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও তিনি এই নীতি অবলম্বন কোরতে বলেন। আমি তাঁর আদর্শের সমালোচনা করতে চাই না।

আমার মতে মানুষ যতক্ষণ না আদর্শ অনুযায়ী কাজ কোরতে পারে, ততক্ষণ পযন্ত আদর্শের মূল্য খুবই কম। গান্ধীজী আদর্শবাদী, কিন্তু তাঁর আদর্শের মূল ব্যাখ্যা দেখাতে নারাজ। হয় তাঁর নীতি, তাঁর মতবাদ গ্রহণ কর, না হয় পরিত্যাগ কর। একবার তাঁর মতবাদ অনুযায়ী কাজ করা হ'লেই সব হ'য়ে গেল ব'লে মনে করেন।

আগামী বারে সমাপ্য

নবীন এশিয়ার প্রথম বিদ্রোহ

(ভারত ও চীন)

শঙ্কর

১৫শ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বা ১৬শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপ বিশ্বজএর নামে এবং ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তার এই জয়যাত্রা প্রায় অপ্রতিহত ভাবেই চলছিল। সমগ্র আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপ সমূহ, ভারতবর্ষ, আফ্রিকার অনেক অংশ, ইউরোপের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনতায় এল, ইহা ভিন্ন তুরস্ক, আরব, মিশর, মরোক্কো, পারশ্য, কাবুল, চীন ও জাপানও অনেকটা ইউরোপের অধীন হ'য়ে পড়ল। প্রায় কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য বাধা না পেয়ে, ইউরোপ তার অদ্ভুত জয়যাত্রা সম্পন্ন করছিল। কোথাও বণিকের বেশে, কোথাও বা নিষ্ঠুর জলদস্যু হিসাবে এরা গিয়েছে এবং দেশের পর দেশ জয় করেছে।

হঠাৎ একদিন এসিয়া তার সম্বিত ফিরে পেল। সে বুঝতে পারল কোন ধ্বংসের পথে সে চলেছে। তখন সে মরিয়া হয়ে বিদ্রেহেয় পথে ছু'টল। এই বিদ্রোহের রূপ চীনে ও ভারতে বিভিন্ন রকমে ফুটে উঠল। এই বিদ্রোহের মূলে স্বাধীনতা ও জাতীয়তা বোধ কতখানি ছিল বলা কঠিন—তবে জাতির দুর্গতিকে রোধ করবার একটা চেষ্টা এতে ছিল। সে হিসাবে এর মধ্যেও জাতীয়তা যতই অ-পরিস্ফুট রূপে হ'ক্ না কেন—ছিল। ধর্ম্ম, লৌকিক আচার, সভ্যতা বা সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলবার ভয়ও অনেকখানি ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল আর্থিক অভাব। বিদেশী বণিক বা শাসনকর্ত্তারা যে ভাবে অর্থ লুণ্ঠন করেছিল, তার প্রতিক্রিয়া জনসাধারণকে এসে স্পর্শ করল।

কিন্তু ইউরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার প্রথম বিদ্রোহের আশু কারণ হ'ল তার ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা। যখন ইউরোপ একে একে বিশ্বের এক একটি দেশ জয় করতে লাগল, তখন এশিয়ার জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধনে ও তার পরকালের চিন্তায় বিভোর ছিল। এবং তার ধর্ম্মসাধন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার খাদ্যে ও স্পর্শে একটা কিছু বাতিক বা খেয়াল মানুষের চাই। ইউরোপ যখন বিশ্বজয়ের খেয়াল নিয়ে মেতেছিল, এশিয়ার তখন ধর্ম্মাচরণ হ'ল খেয়াল। কোন বিশেষ খাদ্য খেলে ধর্ম্ম যাবে, কোন

বিশেষ ভাষায় কথা বললে ধর্ম্ম যাবে, কোন বিশেষ আচার-নিয়ম পালন করলে ধর্ম্ম যাবে, কোন বিশেষ পোষাক পরলে ধর্ম্ম যাবে—এই তখন হ'য়ে দাঁড়াল এশিয়ার খেয়াল বা মনের বিলাস। অনেকেই হয়ত মনে করবেন এই ব্যাধি কেবল হিন্দুদেরই ছিল, তা' নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, তুর্কী, পারসীক, ভারতীয়, চীনা—সবধর্ম্ম ও জাতির মধ্যেই তখন এই ব্যাধি ছিল।

এসিয়ার তথা সমস্ত প্রাচ্যের একটা মহা দুর্গতি ও অপমানের কারণ হ'ল Capitulation বা Extra territorial প্রথা। এই প্রথার সূত্রপাত হ'ল ইসলামের মধ্যে ঐ মনোভাবের বিলাস ছিল বলে। তুরস্কে যখন ভিনিসীয় বণিকগণ প্রথম বাণিজ্য করতে যায় তখন তুরস্কের ইসলামীয় সমাজের মনে ধারণা ছিল, এই সব বিধর্মী বর্ব্বরদের সঙ্গে সংস্রব এড়িয়ে চলাই ভাল এবং নিজেদের সমাজে বা রাষ্ট্রের অঙ্গ ব'লে এদের স্বীকার করা চলে না। নগরের প্রান্তে তাদের স্থান হ'ল—ইসলামীয় সমাজের আইন-কানুন ব্যবস্থার সুযোগ তাদের দেওয়া হবে না—কাফেররা কাফেরদের আইন কানুন মেনেই চলবে। তাদের সংস্পর্শ এড়াবার জন্য তাদের বলা হ'ল—তোমরা তোমাদের মতই এই কোণে থাকবে ও চলবে, ইসলামীয় আইন-কানুন তোমাদের উপর খাটানো হবে না। Capitulation-এর সূত্রপাত ইউরোপের বাহুবলে নয়, এর সূত্রপাত এসিয়ার মনে কাফেরের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার অহঙ্কার থেকে। এর ফলে তুরস্কে Capitulation ও Millet প্রথা গজিয়ে উঠল—কাফের ধূর্ত্ত খৃষ্টানগণ শাপে বর পেয়ে গেল।

চীনও ঠিক এমনি মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা নিজেরা হল "Son of Heaven"—(স্বর্গের সন্তান) আর ইউরোপীয় বিদেশীরা হ'ল Devil,,তাদের গায়ে গন্ধ, ছুঁলে পাপ,—সংস্পর্শ ও লেন-দেন এড়িয়ে চলাই কর্ত্তব্য। সেখানেও ব্যবস্থা প্রায় একই হ'ল—নগরের প্রান্তে তোমাদের মতো ব্যবস্থা ক'রে তোমরা থাক। ভারতে হিন্দুদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল না—কাজেই তাদের এই মনোবৃত্তির পরিচয় দেবার সুযোগ তারা পায়নি।

এশিয়া বাহুবলে তখন ইউরোপের কাছে হীন, কারণ ইউরোপ তখন উন্নত ধরণের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করতে সুরু করেছে। এশিয়া তখন সেই পর্য্যায়ে তেমন পটু হয়নি। তারপর মনের দিকেও এশিয়ার মন নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়েছিল—আর ইউরোপের মন ছিল বন্ধন-মুক্ত—আচার-ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম—কোন বন্ধনই তার মনে প্রবল হতে পারেনি। এমনি অবস্থায় এশিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে—তার গু শ হ' —তার ইহকালের আশাও যেমন গিয়েছে পরকালের আশ্রয়ও তেমনি যেতে বসেছে। এই আতঙ্ক থেকেই তার আত্মচেতনা ফিরে আসতে লাগল, এশিয়া ও ইউরোপের সংঘর্ষের আর এক অধ্যায় সুরু হ'ল।

চীনের রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে প্রথম এই চেতনা ফিরে এল এবং তার প্রকাশ পেল আফিং-যুদ্ধে। কিন্তু এই প্রথম সংঘর্ষ—জনমন থেকে জন্ম নেয়নি, এর জন্ম হয়েছিল রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে। চীনের মহাপুরুষ লিন-ৎসে-শু (Lin-Tse-Tsu) সেই হিসাবে আজ সমস্ত এসিয়ার নমস্য। নবীন এসিয়ার অন্তর-বাণীকে তিনিই প্রথমে রূপ দেন,—চীনের এই প্রতিরোধে। একেও আমরা ইউরোপের বিরুদ্ধে নবীন এসিয়ার প্রথম বিদ্রোহ বলব না, কারণ এই বাধা জনসাধারণের কাছ থেকে আসেনি, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের তরফ থেকে এমনি প্রতিরোধ প্রায় সব দেশেই অল্প-বিস্তর হয়েছে। কাজেই সেই হিসাবে একে নবীনের প্রথম আঘাত না বলে, পুরাতনের শেষ চেষ্টা বললেও চলে। কিন্তু এটা ঠিক পুরাতনের পর্য্যায়ও নয়। একে এসিয়ার নব প্রভাতের প্রদোষ বলা চলে—পুরাতন তখনও পুরা মরে যায়নি—নবীন তখনও পূর্ণভাবে ফোটেনি।

নবীন এসিয়ার প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হল ভারতে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই তখন দেখল, তারা ইহকাল হারিয়ে পরকালও হারাতে বসেছে। তখনও তাহাদের নিকট দেশ বা জাতীয়তা বা স্বাধীনতা বড় হয়ে দেখা দেয়নি—তাদের নিকট ছিল ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের বাহ্য আচার। প্রতিরোধ-স্পৃহার কারণ দেখতে গেলে চীনের আফিং-যুদ্ধ ভারতের সিপাহী-যুদ্ধের চেয়ে অনেক আধুনিক

বলে মনে হবে, বাস্তবিকই চীনের প্রতিরোধের পিছনে যে মনোবৃত্তি ছিল তা' বহু পরিমাণে বিজ্ঞান-বুদ্ধি সম্মত (Rationalistic) ইহা সম্ভব হ'য়েছিল এইজন্য যে চীনের যে মন ঐ সংঘর্ষে ফুটে উঠেছিলে, সেটা সমষ্টি (mass mind) নয়, সেটা শিক্ষিত অভিজাত ব্যষ্টি-মন এবং ভারতের এই বিদ্রোহে যে মনের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা বিশেষভাবেই সমষ্টি-মন। ভারতের এই বিদ্রোহের জনমনের পিছনে গেলে আমরা যে অভিজাত ব্যষ্টি-মনের পরিচয় পাই, সেটা ঠিক এই জনমতের মত অ-বিজ্ঞান বুদ্ধি চালিত নয়।

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ নানাসাহেব তাঁর সঙ্গী ও সহচর তান্তিয়া এবং তেজস্বিনী মহারাণী লক্ষ্মীবাই যে প্রেরণা ও আদর্শে নিজেদের আত্মাহুতি দিয়েছেন,তার মধ্যে কেবল ধার্মিকতা ও ধর্মের আচারই ছিলনা বরং ইহা প্রায় ছিল না বল্লেও চলে। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিদ্রোহের নায়ক ও নেতা ছিলেন নানা ও তান্তিয়ার। জনমনের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়মান হচ্ছিল এঁরা তাতে কিছু ইন্ধন জুগিয়েছেন। জনমনের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব এঁরা নিয়েছিলেন, কিন্তু জনমনের সঙ্গে এঁদের চিন্তার ধারার মিল বিশেষ ছিল না। এঁদের মনোবৃত্তিকে পুরোপুরি জাতীয়তামূলক (Nationalistic) বলা গেলেও সেটা যে অনেকটা বিচারাত্মক (Rationalistic) ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এঁরা মনে করতেন একটা শক্তিশালী বিধর্মী জাতি, এই জাতির বাহিরের সুখ, অন্তরের শান্তি হরণ করছে, এরা আততায়ী, এদের দেশ থেকে উচ্ছেদ না করলে ভারতের ভারতীয়তা, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব সব লোপ পাবে।

এই বিদ্রোহ যে কেবল সৈন্যদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তা' নয়, জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিদ্রোহকে ঠিক ঠিক জন-সাধারণের বিদ্রোহ বলা চলে। এত বড় একটা বিদ্রোহের সময় ভারতের এতগুলি অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজন্যবর্গের মধ্যে একজনও বিদ্রোহের সঙ্গে যোগ দেয়নি। বরং এরা প্রায় সবাই ইংরাজকে সাহায্য করেছে। নিজাম, রামপুর, নেপাল রাজ্যের সাহায্য ইংরেজ লেখকগণ আজও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করে, তখনও ইংরাজ সেনানীদের কথা ছিল—"If Nizam is gone, every thing is gone" —নিজাম গেলে সবই গেল। ঝাঁসীর রাজ্যচ্যুতা মহারাণী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহে যোগ দেন এবং ইহাতে প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীর নামমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহের নাম নিয়ে বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছে—তাঁর এই অকৃত পাপের জন্য তাঁকে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করা হ'ল এবং তাঁর এক পুত্র ও পৌত্রকে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে মহারাণী লক্ষ্মীবাই হত হন, তান্তিয়া তোপী এই যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেন। দুই বছর পরে তিনি ধৃত হয়ে ফাঁসী-কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন। অনেক ইংরাজ লেখকও তাঁকে জগতের একজন বিখ্যাত গরিলাযুদ্ধ বিশারদ সেনানী বলে স্বীকার করেন। নানাসাহেব শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়েননি। কোথায় কি ভাবে তাঁর জীবন শেষ হয়েছে, তা' জানা যায়নি।

উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে—জনসাধারণ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, তা' ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছেন। ১৮৫৭ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী দমদমের বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একদল সৈন্য প্রথমে আদেশ অমান্য করে। উপলক্ষ ছিল চর্ব্বি-মিশ্রিত টোটা দাঁত দিয়ে কেটে ব্যবহার করা নিয়ে। হিন্দু ও মুসলমান সব সিপাহীদের ধর্ম্মবোধে এটা বাধত এই টোটা হ'ল সর্ব্বশেষ উপলক্ষ। ২৯শে মার্চ্চ বারাকপুরে পল্টনের মাঠেনামক এক ব্রাহ্মণ সিপাহী এক গোরা সেনানীকে কেটে ফেলে—সমস্ত সিপাহীবাহিনী নীরবে এই দৃশ্য দেখল, কেউ হত্যাকারীকে ধরবার চেষ্টা করলনা। কেবল এক মুসলমান সিপাহী এগিয়ে তাকে ধরতে যায়। এই থেকে নানা পল্টনে অল্প বিস্তর অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর বিদ্রোহ ঠিক আরম্ভ হল ১০ই মে মিরাটে।

এই বিদ্রোহের পিছনে যে সমস্ত দেশবাসীর যোগ ও সহানুভূতি ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। ইংরেজ

লেখকগণ বলেন যে, বিদ্রোহের পূর্ব্বে বিদ্রোহীরা সমস্ত উত্তর ভারতময় গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এক প্রকার চাপাটি বা রুটি বিতরণ ক'রে এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সমস্ত সৈন্যাবাসে এক প্রকার ফুল হাতে হাতে চালান ক'রে, এক অজ্ঞাত সাঙ্কেতিক ভাষায় বিদ্রোহের ব্যবস্থা করেছে। জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন ইহা সম্ভব নয়। একটী আদর্শের ও সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে সমস্ত দেশময় তখন বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিল। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার জনমনের ইহাই প্রথম বিদ্রোহ।

টিপু সুলতানের পর ভারতে ইংরাজরা বোধহয় সব চেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিল সর্ব্বশেষ পেশোওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর কাছ থেকে। সমস্ত মহারাষ্ট্র সংঘকে এবং মধ্যভারতের ছত্রভঙ্গ মুসলমান শক্তিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। তাই ইংরাজ লেখকগণ তাদের ভাষার বাছা বাছা গাল সব এখনও তার প্রতি প্রয়োগ করে—Perfidious, perjured, vicious, coward, insidious, treacherous, intrigue, defection প্রভৃতি বিশেষণ একখানা সাধারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে চয়ন করা গেছে। তাঁর অপরাধ "Conspired incessantly to defeat the plans of the Governor-general"—বড়লাটের সব (মহৎ) উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবার জন্য সদাই ষড়যন্ত্র করত। বড়লাট তখন ছিল লর্ড হেষ্টিংস—তাঁর উদ্দেশ্য যে কি ছিল তা' সবাই জানেন।

সেই বাজীরাওয়ের হাতের তৈরী নানাসাহেব এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিলেন। এই শিক্ষায় ও আবহাওয়ায় যিনি মানুষ হয়েছেন, তাঁর মনে যে কোনই রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিলনা, কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নাই ছিল, এই কথা স্বীকার করা কঠিন।

জনসাধারণের মনে ছিল সভ্যতার সংঘর্ষের আতঙ্ক। হিন্দু ও মুসলমান—উভয়ের মধ্যে অনেক কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু এই বিদেশী, বিধর্ম্মী জাতির নিকট বিধিও কিছু নেই, নিষেধও কিছু নেই। খাদ্য, আচার, বিচার নিত্যকার ছোটখাটো প্রথা ও রীতি, শুচিতাবোধ কোন বিষয়ে কোন বন্ধন এদের নেই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সংস্কারে ও ধারণায় এমন বন্ধন মুক্ত যে সে হল শয়তান—পাপ ও অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। তার উপর এসে জুটল আর্থিক দৈন্য। ভারতবাসী কোনদিন অসচ্ছলতা বোধ করেনি—একদিকে দুর্ভিক্ষ অপর দিকে কুটির-শিল্পের ধ্বংস এবং অযোধ্যা, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্য ইংরাজরা দখল করাতে, ঐসব রাজ্যের বহু কর্ম্মচারী পদচ্যুত হয়ে বেকার হ'ল। এর উপর আবার সুরু হল মহামারী, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধিতে অগণিত লোক মরতে লাগল।

এই সব মিলে নবীন ভারতে তথা এশিয়ার জনগণের তরফ থেকে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। যাঁরা বিদ্রোহের তারিখ ঠিক করেছিলেন তাঁদের রাজনীতি জ্ঞানের প্রশংসা করতেই হবে। ১৮৫৬ অব্দে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ইংরাজের অনেক শক্তিক্ষয় হয়েছে, ১৮৫৭ অব্দে ভারতের পূর্ব্বে চীন ও পশ্চিমে পারস্যের সঙ্গে ইংরাজের তখন গোলমাল চলছিল। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দিক থেকে তাঁদের সময় নির্ব্বাচন নির্ভুল হয়েছিল, বলতে হবে।

পারস্যের সঙ্গে গোলমাল বেশী দূর গড়াল না—কিন্তু চীনের সঙ্গে গোলমাল ইংরাজরা তখনকার মত স্থগিত রাখতে বাধ্য হল। ১৮৫৪ অব্দের ৩১ শে মার্চ্চ,কোমোডোর পেরির নৌ-বাহিনী ও কামানের নিকট জাপান তার রুদ্ধ দ্বার খুলতে বাধ্য হল—এশিয়ার প্রাচ্যতম দেশও পাশ্চাত্যের নিকট উন্মুক্ত হ'ল। প্রকারান্তরে জাপানও পাশ্চাত্যের প্রভাব স্বীকার করল—Extra territorial rights তার কাঁধে চাপল। চীন তখনও নানাভাবে বিপন্ন। এই দশকের প্রথম দিকেই টেইপিং বিদ্রোহ চীনে সুরু হয়েছে। তার উপর ট্রায়েড (Triad) ও মুসলমানদের বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। যতই ভুল-ভ্রান্তি থাক না কেন, চীনের তদ্‌কালীন দুর্গতির বিরুদ্ধে চীনের জনমনের এই প্রথম বিদ্রোহ। নানকিং, সাংহাই প্রভৃতি বড় বড় নগর বিদ্রোহীদের দখলে গেল। এই বিপদের সময় চীনা সরকার বিদেশীদের হাতে শুল্ক আদায়ের ভার দিল—চীনের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। এই সময়ও

আফিং আমদানী নিয়ে গোলমাল চলতেছিল—যুদ্ধ বেধেও বাধলনা ভারতের সিপাহী যুদ্ধের জন্য। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করবার পর, ইংরাজ ও ফরাসী ন্যায়, নীতি ও সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করে চীনের কাছ থেকে নূতন অধিকার আদায় করল (১৮৬০)—আফিং আমদানী আইন সঙ্গত বলে চীন স্বীকার করতে বাধ্য হল।

চীনা সরকারকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু করে যখন ক্ষতিপূরণের দাবী, সন্ধি-সর্ত্ত ও চালবাজির ফলে তাকে হাতের মুঠার মধ্যে আনতে পারল, তখন ইংরাজ ও ফরাসী তার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে তাকে সাহায্য করতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই রাজী হল। ইহার আগে এরা প্রকারান্তরে বিদ্রোহীদের বরং সাহায্য করছিল এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের ও ইহার গতিবিধির প্রতিকূলে অনেক কিছু এরা করেছে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একদল সরকারী সৈন্য সাংহাইর নিকট যখন ছাউনি ফেলেছে তখন সাংহাইর সমস্ত বৈদেশিক দূতগণ সৈন্য ও অস্ত্রাদি নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। চীনা সেনাপতি বুঝলেন, এই বিদেশী মুষ্টিমেয় বাহিনীর পেছনে আছে ইউরোপ ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তি—কাজেই যুদ্ধ না করে তিনি সেখান থেকে সরে যান। তখন সাংহাই ট্রায়েড ও বিদ্রোহীদের হাতে এবং তাদের সঙ্গে বিদেশীদের খুবই খাতির চলছিল।

কিন্তু চীনা সরকার যখন পরাজিত হয়ে কায়ত: তাদের হাতের পুতুল হল, তখন ইংরাজ সেনাপতি গর্ডন (Gordon) বিদ্রোহ দমনে সরকারের সাহায্যে গেল। ইংরাজ ও ফরাসীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমিত হ'ল (১৮৬৪)। ১৮৫৪—১৮৬৪ পর্য্যন্ত এই দশ বছরে ধনে, জনে, মানে সব বিষয়েই চীনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই বিদ্রোহে যে কতলোক মরেছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া মুস্কিল—কেউ কেউ দুই কোটির উপরও বলেন। এই বিদ্রোহে চীনের আর্থিক ক্ষতি নির্ণয় করাও কঠিন। কত বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তার হিসাব নেই। বিদ্রোহ দমনেও বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে। তার ফলে তার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল। ইংরাজ ও ফরাসীর সঙ্গে যুদ্ধেও বহু লোক ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং তার উপর ক্ষতিপূরণও প্রচুর দিতে হয়েছে। শুল্ক আদায়ের ভার বৈদেশিকদের হাতে দেওয়াতে আর্থিক ক্ষতি ও স্বাধিকার লোপ হওয়া ছাড়াও রাষ্ট্র সম্ভ্রম হানিও হয়েছে। ১৮৬০ অব্দের পিকিং সন্ধির ফলে বিদেশীদের যে সব অধিকার সে দিতে বাধ্য হল, তাতেও তার রাষ্ট্রীয় সম্ভ্রম ও স্বাধিকারের হানি হ'ল।

পারস্যের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র অভিযানেও ইংরাজের সুবিধা হয়েছিল—ইংলণ্ডের রণসজ্জা দেখেই পারস্য হিরাট (Herat) ছেড়ে ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বস্তত অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণিত হল। সিপাহীদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ভেঙ্গে গেল। জমিদারের দু'চার জনের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তাও চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা করা হল। বিহারের কুমারসিংহের কথা অনেক কা জায়গীরদারগণ স্মরণ রেখেছে। জনসাধারণের মনকে দুরস্ত করার ব্যবস্থাও সুচারুরূপেই হয়েছিল। রাস্তার পাশে, গাছে, ঘাটে—এখানে সেখানে ফাঁসীর ছড়াছড়ি, জল-সমাধি, গৃহদাহ প্রভৃতি দেখে জনসাধারণও যে শিক্ষা পেল তার প্রভাব এখনও কাটেনি।

চতুর ইংরাজ বুঝল কেবল অত্যাচার করেই বিদ্রোহ থামানো যায় না। শাসনসংস্কার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকাও দরকার। বিদ্রোহের মূলে ছিল ধর্ম্ম-নাশের ভয়, সে ভয় তাদের দূর করবার ব্যবস্থা ইংরাজ করল। এই বিদ্রোহের মূলে অন্ততঃ কিছুটা জাতীয়ত্ব-বোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা ছিল বলেই ইংরাজ প্রবর্ত্তিত অত্যাচার বা শাসন সংস্কার কোনটাতেই বিদ্রোহের ভাব একেবারে মরে গেল না। এই বিদ্রোহের পর বহুলোক আত্মগোপন করে রইল। সাধু, সন্ন্যাসী ফকিরের বেশে তা'রা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াত—এবং তাদের অন্তরের গোপনতম কক্ষের গুপ্ত শ্বাসের ছোঁয়াচ বহুলোকের মনে রেখে গেছে। ভারতের বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাবাদী বিপ্লবীদলের সঙ্গে এই সব ফেরারী বিদ্রোহীদের এক অন্তরের যোগ ছিল।

যে স্ফুলিঙ্গ তখনকার মত প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত হ'তে লাগল, পুরাতন শতাব্দী শেষ হবার পূর্ব্বেই তার সংস্পর্শে নূতন নূতন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নূতন শতাব্দীর প্রভাতে, নূতন আশার চঞ্চল বায়ুতে সে সব স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে জ্বলে উঠতে লাগল।

“মন্দিরা” —আষাঢ় ১৩৪৬
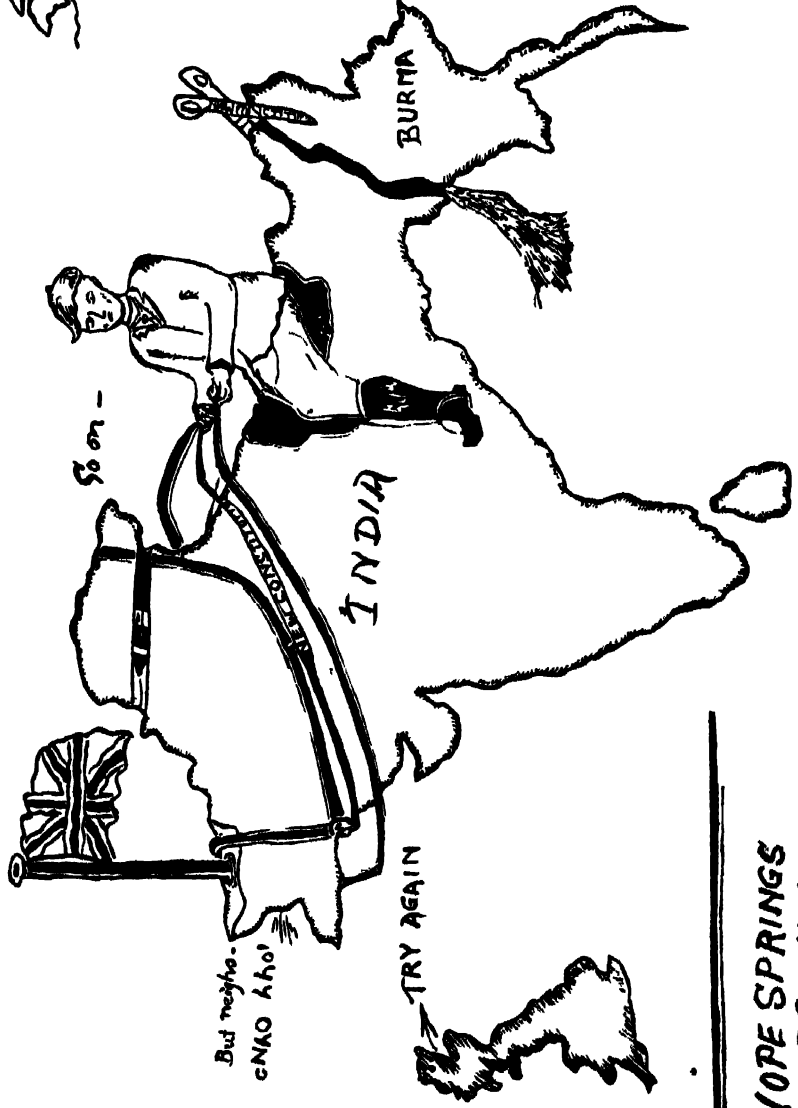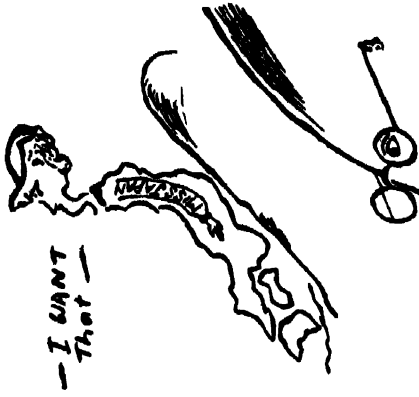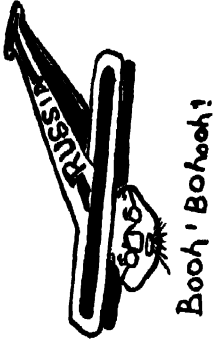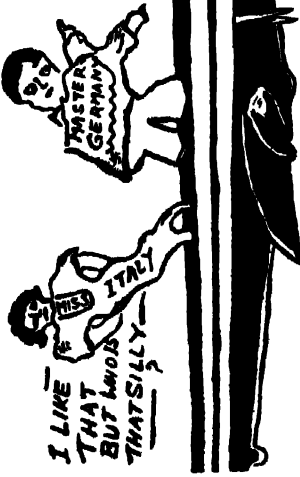
HOPE SPRINGS ETERNAL :

কে মোরে ঠেলিছে—

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

এক নদীতে কেউ দুবার ডুব দেয় না—এক গ্রীক পণ্ডিত নাকি বলিয়াছেন। একবার ডুব দিবার পর সেই নদীতেই আর একবার ডুব দিতে মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না, এ নিশ্চয় তিনি বুঝাইতে চান নাই। দোষটা তিনি মানুষের কাঁধে দেন নাই, কারণ নদীতে হাজার ডুবদিয়াও তৃপ্তি মানে না—এমন স্বভাবই বরং মানুষের। নদীর গঠন ও প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি অদ্ভুত বন্দোবস্ত আছে, যাতে এক নদীতে একটির বেশী ডুবদিবার হুকুম নাই—আর নাই সে হুকুম লঙ্ঘন করার কোন ফাঁক বা কৌশল। কারণ একটি ডুব সারিয়া উঠিতে না-উঠিতেই সে নদী তার জল লইয়া সরিয়া পড়ে, পিছনের নদী সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। নদী উপর হইতে যতই কেন-না সেই একই নদী বলিয়া আত্মপরিচয় দিক—তার সমস্ত অস্তিত্ব আসলে একটা ধারাবাহিকতা মাত্র, চলমান জল ধারায় নিত্য পরিবর্ত্তনের সে একটা জীবন্ত ছবি শুধু।

যাহা আছে তাহা থাকিতেছে না, যাহা নাই তাহা আসিতেছে,—কোথায় যেন একটা গূঢ় ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছে। তাই সকল কিছুই নিজের কাছ হইতে নিজে সরিয়া যাইতেছে। সমস্ত ব্যাপার ও কাণ্ডকারখানা দেখিয়া গ্রীক পণ্ডিত থ' খাইয়া গিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন—এখানে এক নদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না। অর্থাৎ—এই সৃষ্টি যদি কোন ধাতুতে তৈরী হইয়া থাকে, তবে সে ধাতুর নাম পরিবর্ত্তন।

মোট কথা—আমরা এমন এক জায়গায় আসিয়াছি, যেখানে নিত্য পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব কিছুতে, এবং আমরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই পরিবর্ত্তনে ভাসিতে বাধ্য হইতেছি। যাহারা শিশু ছিলাম বদলাইতে বদলাইতে বালক হইয়াছি, যাহারা বালক ছিলাম যুবায় আসিয়া বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়াছি, যুবা ছিলাম পাকিয়া প্রৌঢ় হইয়াছি এবং আমরা যাহারা প্রৌঢ় ছিলাম বুড়া হইয়া আগাইয়া আগাইয়া মৃত্যুকে ছুঁইয়া মহাপ্রস্থান করিতেছি। আমরা কার কি ক্ষতি করিয়াছিলাম যে, জিজ্ঞাসা করিল না, মতামত কিছু নিল না, ঠেলিয়া আসরে নামাইয়া দিল? কিম্বা কোন্ ঠাট্টার সম্পর্ক কার সাথে রহিয়াছে যে, এমন একটা তামাসা আমাদিগকে নিয়া করিয়া যাইতেছে? ভাবিয়া তো কিছু বোঝা যায় না, বরং মাঝখান হইতে ভাবনাটাই আরও বাড়িয়া যায়, ঠাট্টা তামসার রসটা যেন আরও ততই জমাট বাঁধে।

গ্রীক পণ্ডিত তো শেষটা বলিয়া বসিলেন,—এক নদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে রহস্যটা কি তিনি ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন, তাই "বুড়ী ছুঁইয়াছির" বদলে বলিলেন—"এক নদীতে কেউ দু'বার ডুব দেয় না।" আলিবাবা "সিসেম ফাঁক" বলিয়া দরজা খোলাইয়া লইয়াছিল। তেমন কোন গুপ্ত কিছু আছে কি-না যাতে এই পরিবর্ত্তনের ফাঁক বাহির করা যায় এবং সেই ফাঁক দিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িয়া খানিকটা হাঁফ ছাড়িয়া আসা যায়। অবস্থাটা সত্যই আরামপ্রদ নয়। রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত?" যদিও উপমাটা তেমন সম্মানজনক নয়, তবুও অবস্থাটা বেশ বুঝাইতে পারিয়াছেন। উপমা ছাড়িয়া সংস্কৃত ভাষায় এই কথাই বলা হইয়াছে—"কস্মৈ দেবায়" অর্থাৎ ব্যাপার কি।

শিশু শিক্ষাতেই সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, নদী আর কালগতি উভয় সমান। নিষেধ শোনে না, বারণ মানে না—কাঁদাকাটি অথবা অনুনয় বিনয়ের ধার ধারে না—কাল নামক এমনই এক বস্তুর কবলে আমরা নিপতিত আছি। কিন্তু আমরা সজাগ থাকি না, চেতনা আমাদের সতর্ক থাকে না, তাই

জীবনের ছোটবড় ঘটনার মার খাইয়া আমরা ছটফট্ করি, ক্ষুব্ধ হই এবং বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে দোষ দেই, শাপান্ত করিয়া ছাড়ি। স্কুলের শিক্ষা পরিণামে কাজে লাগাইতে পারি না, জীবনের পাঠশালায় অতএব গুরু-মহাশয় আচ্ছা শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়েন।

মার খাইলেই সেই একই প্রশ্ন আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি—"চিরদিন পিছে অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?" অর্থাৎ—বাবে, আমার কি দোষ। কিন্তু শুনিয়া সত্যই অবাক হইতে হয়, সমস্ত দোষ নাকি আমাদেরই—"দেখিলাম থামি, সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।"

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল—এতে আপত্তি করিতে আমরা চাই না, চাহিলেও যে কেহ শুনিবে এখানকার তেমন ব্যবস্থাও নয়। কিন্তু সত্যই কি পশ্চাতের 'আমির' ঠেলায় সম্মুখের 'আমি' তৈরী হয়? প্রথম কথা—থামিয়া যে দেখিয়া লইব, ধাক্কাটা কে দেয়, সে সুবিধা নাই, কারণ এখানে থামা যায় না, এক নদীতে কেহ দু'বার ডুব দেয় না, তাছাড়া—চলাটাকে যে থামিয়া দেখিব সে রকম কোন উপায়ও নাই। ধরিয়া নিলাম, পশ্চাতের 'আমির' ঠেলায় সম্মুখের 'আমি' হয়। এতেও সমস্যা বিষমই থাকিয়া যায়। পশ্চাতের 'আমি' খামোকা কেন সম্মুখের আমাকে ঠেলে? এমনও তো সন্দেহ করা যাইতে পারে যে ব্যাপারটা ঠিক উল্টা? সম্মুখটাই ঠেলার চোটে অহরহ পশ্চাতে যায়—পশ্চাৎটা কখনও সম্মুখে আসে না—একি হইতে পারে না? এ-কথা নয় নাই তুলিলাম। গতিটা অতীত হইতে সম্মুখের দিকেই হউক, কিম্বা ভবিষ্যৎ হইতে পশ্চাতের দিকেই হউক—তা' নিয়া ভাবিত নাই বা হইলাম। আসল কথা—পশ্চাতের সঙ্গে এই যে সম্মুখের যোগ, এ-জন্য পিছনের 'আমি' বা সম্মুখের 'আমি' এ দুয়ের কাহাকেও দায়ী করা সঙ্গত কি? পিছনে থাকিতে পারি না ঠেলিয়া সামনে আনে, বর্ত্তমানেও দুদণ্ড দাঁড়াইয়া জিরাইয়া লইতে পারি না, ধাক্কা খাইয়া বর্ত্তমানটাকে পিছনে ফেলিয়া সম্মুখের ভবিষ্যতের খানিক-টা কেই বর্ত্তমান করিয়া লইতে হয়,—রেহাই দেয় না, বিশ্রাম দেয় না এমনই তাগাদা। বুঝিতে পারিনা বলিয়াই তো বার বার প্রশ্ন করিতে হয়—কে মোরে ঠেলিছে? শুধু এইটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি যে, বড় বিষম কবলে পতিত হইয়াছি। গ্রীক পণ্ডিত খালি বলেন, এক নদীতে কেহ দু'বার ডুব দেয় না। বাল্যশিক্ষা খুলিয়া পুরাণো পাঠটা আবার ঝালাইয়া নিতে হয়—নদী আর কালগতি উভয় সমান।

এই ঠেলিয়া নেওয়াকে বুঝিতে গেলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটা ভাগ পাওয়া যায়। বিভাগটা বর্ত্তমানের উপর দাঁড়াইয়াই করিতে হয়, কারণ বর্ত্তমান ছাড়া বাকী দু'টীর কেহই কখনও উপস্থিত থাকে না। অতীতের পরিচয় যে, সে একদা বর্ত্তমান ছিল, এবং ভবিষ্যতের পরিচয়, সেও একদা বর্ত্তমান হইবে। এই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্যে আসল যোগটা কিসের? এই বিভাগ কি মিথ্যা ও কাল্পনিক? একটানা একক বর্ত্তমানই কি সত্য? কিম্বা বর্ত্তমানও মিথ্যা—এ শুধু বুঝিবার জন্য বুদ্ধির আপন সৃষ্টি?

আবার অন্য রকম বিভাগও প্রচলিত আছে—আদিতেও অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত মাঝখানে কেবল একটা ব্যক্ত। যেন অসীম অব্যক্তের মাঝখানে একটী ব্যক্ত দ্বীপ। সমুদ্রের সঙ্গে দ্বীপের যে সম্বন্ধ অব্যক্তের সঙ্গে ব্যক্তের সম্বন্ধ ঠিক তা' নয়। সীমার সঙ্গে অসীমের সম্পর্কও এ-নয়। এ হইল 'আছে' 'নাই' এবং 'থাকিবে'—এদের পরস্পরের মধ্যের সম্পর্ক। এখন জিজ্ঞাস্য—সে সম্পর্কটা কি? এরা কি ও কেন এবং এদের গোড়ার ব্যাপারটাই বা কি?

এই সবশুদ্ধকে যদি কাল বলা যায় এবং সে যদি অসীম হয়, তবে কি এই বুঝিতে হইবে যে, একে বুঝা যায় না? বুদ্ধির স্বভাবই বুঝিতে চাওয়া। সেই বুদ্ধি যদি বলে 'বুঝা নাহি যায়' তবে বলিতে হয়, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"। বুদ্ধি বুঝিতে বুঝিতেই অগ্রসর হয়। কিন্তু অসীমকে বুঝিয়া শেষ করিতে সে পারে না, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং বলে—বুঝা যায় না। সমস্ত খণ্ড খণ্ড বোঝার শেষ ফল তবে দাঁড়াইল না-বোঝা। সমস্ত সীমার সমষ্টি

অসীম নয়—এই পর্য্যন্তই বুদ্ধি বুঝিতে পারে আ-প্রাণ চেষ্টার ফলে।

অসীম কি নয়—তা নয় বোঝা গেল। কিন্তু অসীম কি—সে প্রশ্নের জবাব বাকী থাকিয়া যায়। বুদ্ধিকে হাজার খোঁচাইলেও এর উত্তর আদায় হয় না। বুদ্ধি বোবা হইয়াই থাকে।

পশ্চাতের 'আমি' দিয়া সম্মুখের 'আমিকে' এবং সম্মুখের 'আমিকে' দিয়া আবার ভবিষ্যের 'আমিকে' বুঝাইয়া গোঁজামিল দিয়া লইয়া গেলে জীবন-পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছে ধরা পড়িয়া যাইতে হয় এবং মার খাইতে হয়। বুদ্ধির সীমা আছে—অসীমের সীমা নাই, এ কথায় তিনি কান দেন না, আর তার দয়ার শরীরও নয়। বেশী কথা তিনি বলেন না, বলিতে পারেনও না, মান্ধাতার আমল হইতে সেই এক কথাই বলেন,—একই প্রশ্ন সকল ছাত্রকে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন—"কে মোরে ঠেলিছে।" ইচ্ছা করে বলি,—কে জানে মশায় কে ঠেলিছে। ঠেলাই সামলাইতে পারি না, তা' জানিই বা কখন, উত্তরই বা দেই কখন। জানেন তো উত্তরটা বলুন, ল্যাঠা চুকুক।

গুরু মহাশয় উত্তর দেন না, অথচ প্রশ্নও বন্ধ করেন না—সমান জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়াছেন—"কে মোরে ঠেলিছে ?"

মানুষের ভাগ্যাকাশে মাঝে মাঝে মাভৈঃ আশ্বাস শোনা যায—"শৃন্বন্তু বিশ্বে—।"

যে যত জানিয়াছে, সে তত ভরসা ও আশ্বাস আনিয়াছে। এ-দেশে প্রাণ আজ অত্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতায় জোর ঠেলা লাগিয়াছে, "অমোঘ নিষ্ঠুর বলে" কে একে ঠেলিছে আসন্ন পরিবর্ত্তনের দিকে। যে যত জানিয়াছে, যে যত নির্ভীক হইয়াছে, তারই শুধু এ-দিনে অধিকার অর্জ্জিত হইয়াছে সবাইকে ডাকিয়া বলিবার—"শৃন্বন্তু বিশ্বে—।" তারই কণ্ঠে মাভৈঃশঙ্খ, নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতার সেই সত্যিকার সেনাপতি।

একদিকে আমরা অগণিত—"কে মোরে ঠেলিছে ?" অন্যদিকে একক সে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে—।" এই এক ও বহু মিলিয়া সৃষ্টির শোভাযাত্রা চলিয়াছে।—কিন্তু কেন ও কোথায় ?

প্রতিশোধ

দাক্ষিণা বসু
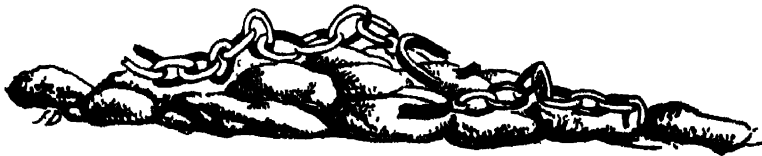
(গল্প)

চাষের বলদ জোড়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইসমাইলেব কৃষি কাজ আর চলিতেছেনা, এই কথা কানে আসিবা মাত্রই গ্রামের জমিদার লোক মারফৎ ইসমাইলকে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইসমাইল সকালের নাস্তাটা খাইয়া জমিদাবেব দান ও নিজের তহবিলে যাহা কিছু ছিল তাহা কুড়াইয়া কাচাইয়া নূতন এক জোড়া বলদ কিনিতে মুন্সীব হাটে চলিয়া গেল। মুন্সীর হাট তাহাদেব গ্রাম হইতে তেব চৌদ্দ মাইল দূব হইবে। কাজেই জুবেদাকে সে বলিয়া যাইতে ভুল করিল না যে, তাহার বাড়ী ফিবিতে অনেক রাত্রি হইবে, এমন কি আজ সে না-ও ফিবিতে পারে। জমিদার অত্যাচাবী হইলেও তাহাদেব উপব যে যথেষ্ট সদয় এই কথা ভাবিয়া পথ চলিতে চলিতে ইসমাইলেব হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভবিয়া উঠিল।

হরিপুব একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রামেব নাম যাহাই হউক না কেন অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান চাষী, সকলেই দবিদ্র। গাঁয়ের কেবল একটি মাত্র পবিবার অবস্থাপন্ন। তাহারাই এই অঞ্চলের জমিদার। মাসখানেক পূর্ব্বে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ছোটখাটো বকমেব একটা সরকারী খেতাব পাইয়া জমিদার তাহাব প্রজাদেব বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু দান খয়রাতও কবিয়া ছিলেন। সেদিন ইসমাইলের প্রতি তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যেব পরিমাণটা যে কিঞ্চিৎ মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল তাহা কাহারও চোখ এড়াইয়া যায় নাই। আর ইহা লইয়া ইসমাইল ও তাহার নব বিবাহিতা স্ত্রী জুবেদা সম্বন্ধে গ্রামের বৃদ্ধদের মধ্যে যে কোন কথা কাটাকাটি হয় নাই, মেয়ে ও বধুরা যে কোন কানাঘুষা করে নাই কিংবা পাড়ার মুখপোড়া ছেলেরা যে কোন রকম টিট্‌কারী না দিয়াই ক্ষান্ত ছিল, তাহা নহে। এ ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক তাহার সবই হইয়াছে তবে সবল প্রাণ ইসমাইল আর তাহার অপবিণত বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রী জুবেদা ইহাব বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পাবে নাই।

যাহাই হউক, অতিকষ্টে এই ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের সংসাব চলে। চাষবাস কবিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে কোন বকমে বৎসরের খোবাকেব ব্যবস্থাটা হইলেও অন্যান্য খরচ তাহাতে সংকুলান হয় না। গতবৎসর জুবেদা তাহাব পিতৃগৃহ হইতে একটি স-বৎস গাভী লইয়া আসিয়াছিল। এই গাইয়েব দুধ বিক্রয় করিয়া, শাক শব্জী বেচিয়া এইরূপ নানাভাবে গত একবৎসর ধবিয়া জুবেদাই সংসারেব বাকী খরচটা চালাইয়া আসিতেছে।

মাস চারি হইল জমিদাব বাড়ীতে জুবেদার নিকট হইতে দুধ রোজ কবা হইয়াছে। ইসমাইল সকাল না হইতেই লাঙ্গল ও বলদ লইয়া মাঠে চলিয়া যায়। ঘরে অন্য পুরুষলোক আর কেহই নাই। কাজেই প্রত্যহ বেলা ৮ টাব মধ্যে জুবেদা নিজেই যাইয়া জমিদার বাড়ীতে বোজেব দুধ দিয়া আসে। জমিদাব বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে যে যার কাজ কবিয়া যাইতেছে, কে কার খোঁজ রাখে? এইভাবে কিছুদিন কাটে। ইহার মধ্যে একদিন জমিদারেব চোখ পড়িয়া যায় জুবেদার উপর, জমিদারের বুকের বক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি এখন আব তাহাকে প্রত্যহ একবার না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। জুবেদাব সহিত একটু আলাপ করিবাব জন্য, তাহাকে কাছে পাইবাব জন্য দিন দিন জমিদারের ব্যাকুলতা যেন বাড়িয়া যাইতেছে। এখন জুবেদাকে দেখিলেই তাহার বুকের ভিতর এমন মোচর খাইয়া উঠে যে তিনি আব উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারেন না। আত্মসম্মানের দিকে চাহিয়া জমিদার এ কয়দিন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখিয়া-

ছিলেন, কিন্তু আজ আর যেন তাহা সম্ভব নয়। আজই জুবেদাকে পাইতে হইবে। ইসমাইল তাঁহার নিকট হইতে টাকা পাইয়া বলদ কিনিতে মুন্সীর হাটে গিয়াছে। এই সুযোগ।

জমিদার তাঁহার একজন বিশ্বস্ত লোক মারফৎ জুবেদাকে মাসের দুধ রোজের টাকাটা অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন যে তাহাদের অভাবের কথা শুনিয়াই তিনি এই টাকা মাস কাবার না হইতেই পাঠাইয়া দিলেন এবং কি করিয়া তাহাদের অভাব দূর করা যায় তাহার আলোচনা করিবার জন্য তিনি গোপনে ইসমাইল ও জুবেদার সহিত আজ রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিবেন। এই কথা শুনিয়া জুবেদার প্রথমে মনে হইল যেন তাহার পায়ের নীচ হইতে পৃথিবীটা সহসা সরিয়া গিয়াছে। জমিদারের সহিত তাহার কোন দিন আলাপ হয় নাই, আলাপ করিবার মত সাহসই বা তাহার কোথা হইতে আসিবে। কিন্তু তথাপি গত কয়দিন যাবত সে যেন জমিদারের হাবভাবের মধ্যে একটা অসদুদ্দেশ্যের ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আজ জমিদারের এই অহেতুক ও আকস্মিক করুণা সেই সন্দেহকে সত্য বলিয়া তাহার মনে বদ্ধমূল করিল। প্রথমটায় জুবেদা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সে অত্যন্ত সাহস ও জোর করিয়া একটি মাত্র কথা বলিল—"আবত কেউ বাড়ী নেই।"

জমিদার প্রেরিত লোকটি উত্তর দিল "ইসমাইল, সে'ত এল বলে। প্রথম রাত্রিতেই নিশ্চয় ফিরবে।" জুবেদা চুপ করিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসে। জমিদারের অন্তরে বহিয়া যাইতে লাগিল আনন্দ হিল্লোল, আর জুবেদার প্রাণে জ্বলিয়া উঠিল দুর্বার ক্রোধের বহ্নিশিখা। জুবেদার মনে হইল এই বহ্নিশিখায় সে ছারখার করিয়া দিয়া যায় সমগ্র জমিদারী।

শীতের রাত্রি। দশটা না বাজিতেই যে যার ঘরের আগল বন্ধ করিয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়ে। এদিকে জুবেদা কঠোর সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছে, সে দুইহাতে অসীম শক্তি ও দুর্জ্জয় সাহস কুড়াইয়া লইয়াছে। জুবেদা আত্মরক্ষাও করিবে, অপমানের প্রতিশোধও লইবে। সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। এই নীরবতার মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল ইসমাইলের কুটীরখানিতে। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা সমগ্র জমিদারীকে গ্রাস করিতে যেন সমুদ্যত। জুবেদা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিল, পরক্ষণেই তাহার অতি আদরের গাভীটিকে লইয়া সে পথে নামিয়া আসিল। গভীর আঁধার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে জুবেদার দুই চোখ বাহিয়া কয়ফোঁটা অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িল।

প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া যায়। বাড়ীর যাহা কিছু ছিল এতক্ষণে সব ছাই হইয়া গিয়াছে। জমিদার হয়ত ইহার মধ্যে আসিয়া থাকিবেন, এখন তিনি কি করিতেছেন এবং পরেই বা কি করিবেন?—জুবেদা এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিল। সামনের বট গাছটার পাশ দিয়া যে খালটা চলিয়া গিয়াছে তাহারই অপর পার্শ্বে সুরাজ নগর গ্রাম। ছোটবেলা সে এই গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় বহুবার আসিয়াছে। কাজেই এই পথ তাহার মোটেই অপরিচিত নয়। এতদূর হাঁটিয়া জুবেদার পরিশ্রম হইয়াছে। বটগাছের নীচে যাইয়া সে তাই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে বসিল। সহসা দূর হইতে একটা কণ্ঠস্বর বাতাসের সাথে ভাসিয়া আসিল। ভয়-ভাঙ্গান গান গাহিতে গাহিতে কে যেন অগ্রসর হইতেছে। গানের সুর যতই স্পষ্ট হইতে লাগিল জুবেদার সংশয় ততই কাটিয়া গেল। ইসমাইলই এই পথে আসিতেছে। দেখা হইলে স্বামীকে সে কি বলিবে, কিভাবে সে এই লজ্জার কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিবে—বটগাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া জুবেদা এতক্ষণ কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। ইতিমধ্যে ইসমাইল দুইটি পুষ্ট বলদ সহ কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। একাকী নির্জ্জন পথে সহসা এত রাত্রিতে মানুষের আওয়াজ পাইয়া ইসমাইল একটু ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

—কে? উত্তর হইল—আমি জুবেদা।

ইসমাইল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল।

—এখানে এত রাত্রিতে ?

—বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।

—কি ভাবে লাগিল ?

—আমি লাগাইয়াছি।

—কেন ?

জমিদারের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার কুৎসিৎ প্রস্তাবের প্রতিবাদে। ঐ গ্রামে আর ফিরিয়া যাইব না ঠিক করিয়াছি।

এখন আর ইসমাইলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে অত্যাচারী জমিদার কিসের জন্য কিছুকাল যাবত তাহাদের উপর এত দয়া দেখাইয়া আসিতেছেন। খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে পুনরায় জুবেদাকে জিজ্ঞাসা করিল।

—কোথায় যাইবে ?

—অন্য যে কোন গ্রামে।

—কিন্তু যেখানে যাইবে সেখানেই তো জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে।

ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ?

—আছে, আমরা সর্ব্বহারা, দরিদ্র, অর্থের লালসা দিয়া জমীদার আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করিতেও দ্বিধাহীন। এ অন্যায়ের বিলোপ সাধন করিতে হইলে ইহার জন্য সমস্ত কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চাই আমরা এই জমীদারী ব্যবস্থারও ধ্বংস করতে।

—আমরা তাহাই করিব।

ইসমাইল ও জুবেদার মধ্যে ইহা লইয়া আরও খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ইহার পর সম্মুখের পথ ধরিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। কোথায় গেল তাহাদের পরিচিত কেহই জানিতে পারিল না।
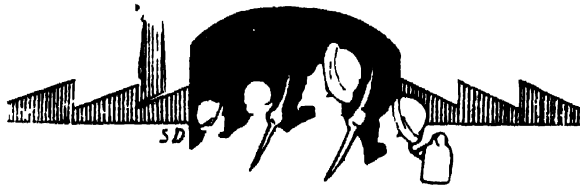
আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদক—রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের গল্প নিয়ে সম্পাদক যে গল্প সঞ্চয়ন প্রকাশ করেছেন তা সত্যি প্রশংসাযোগ্য।

বাংলার সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পরে 'কল্লোল' 'কালি কলমে' যে বিদ্রোহের সুর প্রকাশ পেয়েছিল, এ গল্প সঞ্চয়ের অধিকাংশ গল্প সেই বিদ্রোহী লেখকদের সৃষ্টি। এক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর কথা ছেড়ে দিলে এ গল্প সঞ্চয়ের পরশুরাম বা কেদারনাথের লেখা এ যুগেরই, কাজেই সম্পাদক তাঁদের আধুনিকদের দলে টেনে এনে বিশেষ কোন অবিচার করেন নি, কেননা আমরা এখানে লেখার কালনির্ণয়ের দিক দিয়েই আধুনিকতার বিচার করতে চাই। সম্পাদকের সাথে আমাদের মতানৈক্য আছে, তিনি যাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক হিসাবে স্থান দিয়েছেন তাঁদের বাদেও আর দু'চারজন লেখক আছেন, যাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত ছিল। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার বাংলা সাহিত্যে এমন কোন গল্প সঞ্চয়ন আছে, যার মধ্যে নিজেদের স্থান পাওয়ার দাবী করতে পারে না। অবশ্য লেখক বলেছেন, পরে অন্য খণ্ডে অন্যান্য গল্প সংগ্রহ করার ইচ্ছা রহিল। আমরা আশাকরি এর পরবর্ত্তী খণ্ডে এঁদের গল্প ঠাই পাবে। সম্পাদক যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা কার্য্য করেছেন। তারপর গল্পের বিষয় সমলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তারাশঙ্করের কথা মনে পড়ে, তিনি সত্যিই রুদ্র রসের অবতারণা করেছেন। সমুদ্র-মন্থন গল্পে তাঁর যে attitued ফুটে উঠেছে, তা খুব concious attitued নয়। তাঁর এই unconcious attituedই গল্পের বৈশিষ্ট্য। দুভিক্ষের করাল মূর্ত্তি আঁকতে এ যুগের লেখকদের কাছে খানিকটা concious attitued আশা করা যেতে পারে, কেননা এর কার্য্যকারণটা বেশীর ভাগ মানুষের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির অভিশাপ প্রথম আসে, মানুষ তার শক্তি বলে সেই অভিশাপকে দূরে ঠেলে রাখে। কিন্তু তারাশঙ্কর এই প্রকৃতির অভিশাপকে অভিশাপ বলেই মেনে নিয়ে মানুষের নিঃসহায়তার ছবি এঁকেছেন। কেদারনাথের গল্পটা একটু long drawn বলে মনে হয়। আর অন্যান্য সবার লেখা বেশ ভালই লাগল।

শ্রেণী-সংগ্রাম—শ্রীঅমূল্য অধিকারী।

শ্রেণী সংগ্রাম বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে একটা সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। লেখক এই শ্রেণী-সংগ্রামে প্রকৃতি, গতি এবং মূল ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। লেখকের ভাষা সরল, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নেই, বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করে বলেছেন।—বইখানিতে ছাপার ভুল অসংখ্য, পড়তে বসে মনে হয় অত্যন্ত অমনোযোগিতার সহিত বইখানির মুদ্রন কার্য্য সমাধা হয়েছে, আমারা এই বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

সাপ আর মেয়ে—বিশ্বনাথ চৌধুরী

দাম—এক টাকা চার আনা। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরী ও অন্যান্য সম্রান্ত পুস্তকালয়।

'সাপ আর মেয়ে' বইখানি হাতে এলো—দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বইখানা তুলে নিলাম, কিন্তু সত্যি ভাবতে আশ্চয্য লাগে, কয়েক পাতা পড়তেই বইখানা ছাড়তে পারলাম না, ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি (ইংরাজিতে যাকে বলে Smart Style) বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। বইখানা আমার ভাল লেগেছে। মনস্তত্ব বিশ্লেষণে, বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্ত্তায় সূক্ষ্ম রসবোধের অনেক পরিচয় এতে পেয়েছি। মনীষা, সুরমা, অরুণ, প্রশান্ত, বিশ্বনাথ বাবুর শিল্পী-মনের অপরূপ সৃষ্টি।

তিনি যেন বর্ত্তমান যুগের ছেলে মেয়েদের মনের কথা সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতার ইতিহাস অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। বিশ্বনাথ বাবুর লেখায় মুন্সিয়ানা আছে—ভবিষ্যতে আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশাকরি। পি, সি, এল'এর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় যথেষ্ট রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় পেয়েছি। ছাপা বাঁধাই ভালই হয়েছে।

বন্দী-মুক্তি কমিটীর কংগ্রেস সদস্তের পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত বন্দী-মুক্তি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে গভর্ণমেণ্ট যে নীতি এবং রীতিতে বন্দীদের দু'একজন ক'রে ধীরে ধীরে মুক্তি দিচ্ছেন, তাঁরা তার বিরোধী। কিন্তু যখন এঁরা সদস্য হয়েছিলেন তখনো তো একথাটা তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন। মন্ত্রীগণ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, বন্দীদের জেলের মেয়াদ কত, কোন ধারায় অভিযুক্ত, স্বাস্থ্য কেমন এবং তাঁদের বর্ত্তমান মনোভাব পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝে তাঁদের প্রত্যেকের case আলাদা আলাদা ক'রে বিচার ক'রে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কিনা—তা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। এই কথা জেনেশুনেই তো তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁরা গভর্ণমেণ্টের এই কমিটীতে সদস্য থাকতে রাজী হয়েছিলেন। যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ এবং গভর্ণমেণ্টের হৃদয় পরিবর্ত্তনের আশা—এই সমস্ত কারণে গান্ধীজী বন্দী-মুক্তি আন্দোলনও বন্ধ ক'রে দিলেন। এবং এই মনোভাব থাকার দরুণই সভ্য-রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি অনুসারে সকল বন্দীর একত্র মুক্তির দাবী কংগ্রেস করে নাই। অথচ গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বন্দীদের বারংবার মুক্তির আশা দিয়েছেন। কংগ্রেসের এই দ্বিধাগ্রস্ত, দৃঢ়তাহীন নীতি অনুসরণের ফলে বহু বন্দী আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিরাশার অন্ধকারে দিন গুণছেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্যে আশাভঙ্গের বেদনার মধ্যে জীবনটাকে তিলে তিলে ক্ষইয়ে দিচ্ছেন। এঁরা দুজন তো কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। এখন দেশব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে বন্দীদের মুক্তির পথ সুগম ক'রে তুলবার জন্য নেতৃবৃন্দের এবং সমগ্র দেশবাসীর যে কর্ত্তব্য রয়েছে তা যেন তাঁরা বিস্মৃত না হ'ন।

বন্দিনী রাণী গুইদালো

সকল রাজনৈতিক বন্দিনী মুক্তি পেলেও নাগাদের রাণী গুইদালো আজও একা নির্জ্জন কারাবাসে দিন কাটাচ্ছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্ট কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা বালা দেব গুইদালোর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি ফিরে এসে আসাম প্রদেশের জেল বিভাগের মন্ত্রীর নিকট গুইদালোর মুক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী বলেন যে আসামের রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য যখন তাঁরা ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন তখন সে সঙ্গে রাণী গুইদালোর নামও দিয়েছেলেন। কিন্তু গুইদালোর বাসস্থান আসাম প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের বাইরে এবং তিনি ভারত সরকারের অধীন। কাজেই তার মুক্তি বিষয়ে আসাম গভর্ণমেণ্টের কোনো হাত নাই। এখন যদি কংগ্রেস থেকে ভারত সরকারের কাছে বন্দিনী গুইদালোর মুক্তির জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং তারা এই দায়িত্ব নেন, তবে তিনি মুক্তি পেতে পারেন। এমন পৃথক ভাবে না দেখে যদি কংগ্রেস এটা একটা সর্ব্ব ভারতীয় সমস্যা ক'রে আন্দোলন করতেন, তবে আজ ভারতের নানাস্থানে এত বন্দী সমস্যা থাকতো না, —সমস্ত বন্দী ও বন্দিনীদের মুক্তি পেতে এভাবে এমন বিলম্ব হ'ত না।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট—

ডিগবয়ের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত ক'রে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয় নাই। কংগ্রেসের তরফ থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতেও তিনি বলেছেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট যে ধরণের রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে জন-সাধারণের আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে হাইকোর্টের কোনো জজের দ্বারা স্থানীয়

সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণের তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস কোয়ালিসন দলের সদস্য শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, একটী নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের উপর তদন্তের ভার দেওয়া উচিত। এটা সুখের বিষয় যে, আসাম গভর্ণমেণ্ট গুলিচালান সম্পর্কে এইরূপ নিরপেক্ষ টাইবুন্যাল গঠন ক'রে তদন্ত করবার সিদ্ধান্ত করেছেন, অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ধর্ম্মঘটের মিটমাটের জন্য পরে যে চেষ্টা হয় সে সম্পর্কে আবার তাঁদের ধনতান্ত্রিক প্রীতি ফুটে উঠেছে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ ও আসামের প্রধান মন্ত্রী মালিকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান। মালিকরা বলে, তারা যে ক'হাজার নতুন কুলি নিয়েছে, তাদের তাড়াতে পারে না। তাদের এই সিদ্ধান্তই মেনে নিয়ে মজুর-স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মজুর ও কলের মালিকদের কল্যাণের জন্য আজ দুই মাসের উপর যে ধর্ম্মঘটীরা অকথ্য কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করছে, তাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়ায় কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের স্বরূপই স্পষ্ট হ'যে উঠেছে। দেশবাসী আজ এদের জন্য মর্ম্মাহত। ধর্ম্ম-ঘটকারী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, সেই আবেদন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

মৌলবী ওবেদুল্লা সিন্ধির অভিভাষণ

মৌলবী ওবেদুল্লা সিন্ধি তাঁর অভিভাষণে একটা কথা ঠিকই বলেছেন। ধর্ম্মকে রাজনীতির অঙ্গ থেকে বাদ দিতে হবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম্ম প্রবেশ করবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নাই। পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁরা ধর্ম্ম সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছেন রাজ-নীতিকে। ইওরোপীয় সমাজ সংস্কার হয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে—তাই সেখানে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তুর্কীজাতির মতো ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রকে আমরা যদি পৃথক ক'রে না দেখতে পারি তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনো সাফল্যই আমরা আশা করতে পারব না।

ফরোয়ার্ড ব্লক

সভাপতিত্বের পদত্যাগ ক'রে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন ক'রতে উদ্যোগী হয়েছেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের মিলনক্ষেত্র রূপে এর প্রতিষ্ঠার সাফল্য নির্ভর করে ব্লকের কার্য্যক্রমের উপর। সুভাষ বাবু বলেছেন যে, তিনি বর্ত্তমান কংগ্রেসের constitution, creed, policy এবং programme মেনে নিয়েছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতিও তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে, এবং কংগ্রেস অনুসৃত গান্ধী-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসের High Command এর তিনি বিরোধী। যেখানে গান্ধী জীর নেতৃত্ব তিনি মেনে নিচ্ছেন এবং গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের creed, policy ও programmeও তিনি গ্রহণ করেছেন, সেখানে এই High Command এর বিরুদ্ধতা কোনো মূলনীতির পার্থক্য থেকে নয়—শুধু ব্যক্তিগত কারণে। কেন না, এই High Command যে মূলনীতিতে বিশ্বাসী, সুভাষ বাবু নিজেও সেই নীতিতে আস্থা রাখেন।

সুভাষ চন্দ্র বলেছেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান authority র মনোভাব হচ্ছে সংস্কারপন্থী। কিন্তু তাঁর ব্লকের মনোভাব হবে বিপ্লবী। যেখানে policy, creed এবং programmeএ অনৈক্য নেই, সেখানে মনোভাব বিপ্লবী বা সংস্কারপন্থী সে প্রশ্নের মূল্য কি? বিপ্লবী মনোভাব থাকলে বিপ্লবী ভাবধারা অনুযায়ী বিপ্লবী কার্য্যক্রম হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু সুভাষ বাবু এ পর্য্যন্ত কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বিপ্লবী কর্ম্মধারা দেশের সামনে ধরেননি। শুধু জোরালো কথায় বাহ্যতঃ একটা পার্থক্যের আভাষ দিয়ে ব্যক্তিগত কারণে পৃথক দল গঠন করলে দেশের রাজ নৈতিক আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গান্ধীবাদের স্বাভাবিক পরিণতি নিয়মতান্ত্রিকতা (constitutionalism) এবং সংস্কারপন্থী মনোভাব (reformism) কে বাধা দিতে হ'লে দেশবাসী তাঁর কাছ থেকে এমন একটী সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা প্রত্যাশা করে, যা দিয়ে প্রকৃত একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধ শক্তি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, সেই কর্ম্মসূচী নিয়মতান্ত্রিকতা বিরো'

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী, তা দেশীয় রাজ্যের সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটাবে, পূর্ণ স্বাধীনতা তার লক্ষ্য এবং তা' সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষ রফাহীন সংগ্রাম চালিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে।

ভাবপ্রবণ অস্পষ্ট কথা ছেড়ে দিয়ে, তিনি যদি স্পষ্ট ক'রে তাঁর কর্ম্মতালিকা প্রকাশ করেন এবং তা' কার্য্যে পরিণত করবার পন্থা নির্দ্দেশ করেন, তবেই তিনি সত্যি-কারের বিপ্লবী মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমর্থন আশা করতে পারেন। সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট এই দুই পার্টির দুইজন নেতা শ্রীযুক্ত পি. সি যোশী ও শ্রীযুক্ত জয় প্রকাশ নারায়ণও এই কথাই বলেছেন। তাঁদের মত এই যে, দল খাড়া ক'রে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে দলাদলির ঝগড়া করা উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। উদ্দেশ্য, সংগ্রামমূলক কর্ম্মতালিকা নিয়ে বামপন্থীদের এগিয়ে চলতে হবে, তারই ফল সংগ্রামবিমুখ নয় এমন দলগুলির মিলন সাধিত হবে। এধরণের মিলন ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য নয়। আর, তা না হ'লে এই ব্লক সমর্থনযোগ্যও নয়।

সুভাষ-গান্ধী পত্রাবলী

সুভাষ-গান্ধী পত্র বিনিময় প্রকাশিত হ'যে উভয়ের মনোভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সুভাষ চন্দ্র গান্ধীজীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করাতে বহু চেষ্টা করেছেন। অনুনয় ক'রে জানিয়েছেন যে গান্ধীজীর মতবাদ ও নির্দ্দেশ তিনি মেনে নেবেন, এমন কি সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্য তিনি জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণ ক'রে একতা রক্ষা করবার জন্য আত্মবিলোপ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ ক'রে সুভাষ-চন্দ্রের উপরে জোর ক'রে আপন মত চাপিয়ে দিতে গান্ধীজী চাইলেন না—বরং সুভাষচন্দ্রকে আপন মনোমত সদস্য নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে বার বার উপদেশ দিয়েছেন এবং গান্ধীজী তাতে সাহায্য বা সহযোগিতা কিছুই করতে পারবেন না জানিয়েছেন। এখানে হৃদয় পরিবর্ত্তনের চেষ্টার কোনো মূল্যই তো গান্ধীজী নিজেই দিতে পারলেন না।

তারপর সুভাষচন্দ্র যখন দেশকে সংগ্রামে নামাবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন, তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছেন যে চারিদিকে তিনি হিংসার গন্ধ পাচ্ছেন—দেশ অহিংসভাবে প্রস্তুত নয়, গণশক্তি তাঁর পশ্চাতে নাই। আমরা প্রশ্ন করি, দেশ কেন আজ প্রস্তুত নয়? তারজন্য কি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নিয়মতান্ত্রিকতা, সংস্কার-কামী মনোভাব নয়? এই মনোভাবের আধিক্য বশতঃই দেশ আজ সংগ্রামবিমুখ।

কোথায় সেই ১৯২১ ও ১৯৩০ সনের কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রেরণা? সেই উদ্দীপনা, সেই আন্দোলনের স্পৃহা কা'রা হারাবার পথে নিয়ে গিয়েছে? যখনই আন্দোলনের ফলে কোনো সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে—অন্য ধাপে এগিয়ে যাবার সময় হয়েছে, তখনই গান্ধীজী হিংসার গন্ধ পেয়ে আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন—আন্দোলনের অগ্রগতি বাধা পেয়েছে।

এমনি ক'রে আজ নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে কংগ্রেস ঝুঁকে পড়েছে—গান্ধীজী হিংসার অজুহাতে যে আন্দোলন এমনি ক'রে বার বার প্রতিহত করেছেন এবং সংস্কার ও নিয়ম-তান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এইটাই গান্ধীবাদের স্বাভাবিক পরিণতি। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী পুরাতন নেতৃত্ব আজ দেশকে আর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসরের পন্থা নির্দ্দেশ করতে এবং তদনুযায়ী সুস্পষ্ট কর্ম্মতালিকা দেশের সামনে ধ'রতে পারছেন না। তাই আজ কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

রাজকোটে স্যার মরিস গায়ারের রায় প্রত্যাখ্যান

গান্ধীজী রাজকোট সম্বন্ধে স্যার মরিস গায়ারের রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দেশ তাঁর অনশনের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে গেছে। অবশেষে গান্ধীজী স্বীকার করেছেন যে, রাজকোট সমস্যার সমাধানে তিনি ভুল উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তবে তাঁর ভুল সম্বন্ধে তিনি আরও ভুল করেছেন। তাঁর অনশনের মধ্যে নাকি তিনি হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কারণ ঠাকুর সাহেবকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করবার জন্য অনশনের ফলে

সার্ব্বভৌম শক্তির হস্তক্ষেপ দাবী ক'রে, বীরবলের ও ঠাকুর সাহেবের উপর মরিস গায়ারের রায় জোর ক'রে চাপিয়ে দিয়ে-হিংসাকে ডেকে আনা হয়েছে। শ্রীবীরবলের হৃদয় পরিবর্ত্তন তো তাতে হয়ই নাই বরং "এটা হিংসা ও বল প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়" এই গান্ধীজীর মন্তব্য। এই অন্যায় এবং ভুল আজ বুঝতে পেরে গান্ধীজী বড়লাট থেকে আরম্ভ ক'রে বীরবল, ঠাকুরসাহেব ভায়াত ও মুসলমান সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। করেননি শুধু রাজকোটের প্রজাদের কাছে,—যাঁদের জীবন-পণ-করা আন্দোলন, যাঁদের কর্ম্মস্রোত বন্ধ ক'রে দেবার দায়িত্ব নিয়ে আপন অনশনের দ্বারা তাঁদের দাবী মেটাবার আশা দিয়েছিলেন, এবং আজ যাঁদের নিরাশ ক'রে তাঁদের শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তার দয়া ও ঔদার্য্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, যদি প্রজারা তাঁকে অহিংস সংগ্রামের সেনাপতি ব'লে মনে করেন, তবে তাঁর খেয়াল তাঁদের নীরবে সহ্য করতে হবে।

অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের সেনাপতি ও বিশেষজ্ঞ নিজেই যদি এমন ক'রে ভুল করতে থাকেন, তবে আন্দোলনের দায়িত্ব, জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে, তাঁর ভুলের খেয়ালে চলতে গিয়ে কিসের সাহসে, কার ওপর বিশ্বাস ক'রে জাতি অগ্রসর হবে? ভুল এবং পরাজয় যার ফল, সেখানে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এই ভুল, এই ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে জাতিকে নিয়ে খেলা করা বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করার দিন আর নেই।

গান্ধীজীর বিবৃতির পরে রাজকোট

স্যার মরিস গায়ারের রায় প্রত্যাখ্যানের ফলে রাজকোট দরবারে উৎসব এবং আনন্দের ঢেউ উঠেছে। এটা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ গান্ধীজীর পরাজয়ে বীরবলের শাসনতন্ত্রের কূটনীতির জয়। আরও মজার কথা এই যে, দেশের অবস্থা গান্ধীজীর মত সহ পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে গেছে এবং তাতে তিনি নিজে যোগ দিচ্ছেন। বিবৃতিতে পরাজয় ঘোষণার পরদিন যখন রাজকোট দরবার বসেছে, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই সহ গান্ধীজী সে-স্থানে গেলেন। ঠাকুরসাহেব তাঁর দক্ষিণে গান্ধীজী ও বামে বীরবলকে নিয়ে জয়োল্লাসে দরবার করলেন। ঠাকুরসাহেব গান্ধীজীর এই বিবৃতি, এই পরাজয়কে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বললেন যে গান্ধীজীর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও এ কি প্রহসন।

রাজকোটের শাসন-সংস্কার।

শ্রীবীরবল নাকি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা উদার শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করবেন। শাসন-সংস্কার কমিটী গঠন করা হ'য়ে গেছে—একমাসের মধ্যেই তার শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রকাশিত হবে। কিন্তু উদার শাসন-সংস্কার আনবার আগেই তাঁর উদারতার নমুনা কিছু পাওয়া গেছে। এই শাসন-সংস্কার কমিটিতে অনেক প্রতিনিধিই আছেন—নেই শুধু দেশীয় প্রজা-পরিষদের প্রতিনিধি। যাঁরা আন্দোলনকারী—যাঁদের জন্য এই শাসন-সংস্কার—তাদেরই কোনো প্রতিনিধি নেই।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সম্বন্ধে গান্ধীজী

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সম্বন্ধে গান্ধীজী যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। গান্ধীজীর বর্ত্তমান মনোভাব এবং কার্য্যের ধারা অনুসারে এটা স্বাভাবিক। আন্দোলন বন্ধ করা, দাবী কমানো, আপোষ আলোচনা চালানো ইত্যাদি উপদেশ এবং এই মনোভাবের সুর তো আগে থেকেই চলছিল—তবে এটা পেছিয়ে দেবার আরেকটা ধাপ মাত্র।

আজ জনসাধারণ জানে এবং বোঝে যে গান্ধীজী আর আন্দোলন চালাবেন না। তাঁর কল্পনা মত সর্ত্তে রাজী হ'য়েও অতীতে বহুবার তিনি আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন—এবারও যেই দেখেছেন আন্দোলন তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে আরও নতুন কিছু পেতে চায়, তখনই তিনি চারিদিকে হিংসার আভাস পেলেন এবং দেশ প্রস্তুত নয় এই ব'লে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ ক'রে আত্ম-সমর্পনের উপদেশ দিলেন।

কিন্তু এমনি ক'রে আন্দোলন বন্ধ ক'রে রাখা যায় না।

—যেমন ক'রেই হোক্, যে-ভাবেই হোক্ পথ সে ক'রে নেবেই।

জওহরলালের উক্তি

বর্ত্তমান ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম বিচার করা উক্তি আমাদের আশা ও নিরাশা দুইয়েরই সঞ্চার করে। তাঁর নৈরাশ্য, তাঁর সংশয় জাতিকেও দুর্ব্বল বিভ্রান্ত ক'রে তুলবে। রাজকোটের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে গান্ধীজীর আদর্শ মেনে বর্ত্তমান অবস্থায় কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। কংগ্রেসের কাজ করার তিনটা পন্থা রয়েছে। প্রথমতঃ চিন্তাহীন ভাবে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধতা করা তৃতীয়তঃ কর্ম্মহীন হ'য়ে থাকা। এই তিনটীর একটীও করা উচিত নয়। তিনি বলেছেন, চিন্তাহীন ভাবে গ্রহণ করলে জাতির মনে জড়তা আসে, বিরুদ্ধতা করলে ভেদ বৃদ্ধি পেয়ে কংগ্রেস আবার কর্ম্মহীন থাকলে সমস্তই পণ্ড হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে বুঝেছেন কর্ম্মহীন থাকা বা চিন্তাহীন ভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি নিজে আজ তাঁর সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত কর্ম্মক্ষমতা নিয়ে আলোকবর্ত্তিকা হাতে ক'রে এগিয়ে চলুন,—জাতি পিছনে আছে—প্রয়োজন শুধু নতুন পন্থা, নতুন নেতৃত্ব, যা আনবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, যা' জড়তা ভেঙ্গে ফেলবে, যা' নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারের ক্লিষ্ট মোহ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবে তার লক্ষ্যের দিকে। দ্বিধাগ্রস্ত জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে, নূতন নেতৃত্বের এই একান্ত প্রয়োজনে জওহরলালজী নেমে আসুন তার 'call of action' এ সাড়া দিয়ে।

সাবমেরিণ 'থেটিস'

গত ১লা জুন লিভারপুলের নিকট সাবমেরিন 'থেটিস' তার সামনের ফুটো ঘরে জল ঢুকে যাওয়াতে জলের নীচে ডুবে আটকে গিয়েছিল। সাবমেরিনটীর ভিতরে ১০১ জন নাবিক ছিলেন। চার জন কোনো রকমে বাইরে এসে ভেসে উঠে প্রাণে বেঁচেছিলেন—কিন্তু দরজা পুনরায় বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, বাকী ৯৭ জন নাবিক সাবমেরিনের অবশিষ্ট বাতাস ফুরিয়ে যাওয়াতে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ এবং সাবমেরিন গিয়ে চেষ্টা ক'রেও 'থেটিসে' বাতাস পৌঁছে দিতে পারলো না। তাই সেই ৯৭ জন নাবিকের শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল।

ইংরাজ ও রাশিয়ার মিতালি

ইউরোপে রাজনৈতিক হাওয়া দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। জার্ম্মাণীর দৃষ্টি পড়েছে পোলাণ্ডের উপর—অর্থাৎ পোলাণ্ডকে চাপ দিয়ে ডানজিগ দখলে আনা। ইংরাজ বিপদ দেখে ফ্রান্সকে দোসর নিয়ে পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াকে ভবিষ্যতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু বৃটেন জানে যে, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার এমন স্থানে অবস্থিতি যে সোজাসুজি কিছু করার উপায় তাদের নেই। অগত্যা চাইছে সে রাশিয়ার সহযোগিতা—কারণ কেবল রাশিয়ার পক্ষেই তা সহজ এবং সম্ভব। রাজনীতিতে অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই—নইলে বৃটেন চায় রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট করতে। যে রাশিয়ার সাম্যবাদকে সে যমের মতো ভয় করে, অস্পৃশ্যের মতো ঘৃণা করে, কিন্তু উপায় কি? আজকের ইওরোপীয় সমস্যা মতবাদের সমস্যা—এখানে ইংরাজ ও জার্ম্মাণীর মতবাদ এক, আকাঙ্ক্ষা এক, উদ্দেশ্য এক। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ইটালি সকলেই সাম্রাজ্যবাদী—তাদের সকলের শত্রু রাশিয়ার সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদকে চারিদিক থেকে ঘেরাও ক'রে উচ্ছেদ করা সকলেরই কাম্য। তাই তো বৃটেনের নিরপেক্ষতা নীতি—যার ফলে ঘটল আবিসিনিয়ার পতন, স্পেনের পরাজয় এবং যে বিশ্বাসভঙ্গের পরিণামে মিউনিক-চুক্তিও চেকো-শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা লোপ।

কিন্তু ইংলণ্ড দেখছে যতই সে ছেড়ে দিচ্ছে, তার ঢিলেমির এবং দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে জার্ম্মাণীর লোভ আর তৃপ্ত হচ্ছে না—'balance of pawer'ও থাকছে

না এবং তারই জের চলবে তার নিজের ওপর দিয়েও। তাই এই ইঙ্গো-ফরাসী-সোভিয়েট প্যাক্টের অবতারণা।

ইঙ্গো-ফরাসী-সোভিয়েট-প্যাক্ট

এই প্যাক্টে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে প্রস্তাব করেছে যে পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীস আক্রান্ত হ'লে তারা একত্র হ'য়ে প্রতিরোধ করবে। এই প্রস্তাবে রাশিয়া রাজী হ'তে পারেনি। সে বলেছে, শত্রু দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হ'লে এই তিন শক্তি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত থাকতে হবে। পোলাণ্ডের মত রাশিয়ার প্রতিবেশী বলটিক রাজ্যগুলি আক্রান্ত হ'লে তা রক্ষার জন্য এই তিন শক্তিকে প্রতিশ্রুত থাকতে হবে। তাহ'লে রাশিয়াও পোলাণ্ড এবং রুমানিয়াকে সাহায্য করতে স্বীকৃত থাকবে। নইলে শুধু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'লে জার্ম্মাণী দ্বারা পোলাণ্ড আক্রান্ত হ'লে রাশিয়া যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে, কিন্তু ওদিকে সে নিজে আক্রান্ত হ'লে, বা তার প্রতিবেশী আক্রান্ত হ'লে তার নিজের নিরাপত্তার কোনো প্রতিশ্রুতিই থাকবে না। অতএব এরূপে অন্যকে বাঁচাবার জন্য নিজে আগুনে ঝাঁপ দেবার নীতি সে গ্রহণ করবে না, তাই রাশিয়া এই সংশোধিত প্রস্তাব ইংলণ্ডকে পাঠিয়েছে। এই প্রস্তাব নাকি খুব মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা ক'রে নতুন ইঙ্গো-সোভিয়েট প্যাক্টের খস্‌ড়া করা হয়েছে এবং যতটা সম্ভব গ্রহণ করার কথা হয়েছে। কিন্তু এই নতুন প্যাক্ট সম্বন্ধে মঃ মলোটভ্ বলেছেন যে, এটা এত বেশী সর্ত্তবেষ্টিত যে কার্য্যকালে এটা ভূয়ো প্রতিপন্নও হ'তে পারে। কাজেই ভবিষ্যতে এই প্যাক্টের পরিণতি কি হ'তে পাবে—কিছুই এখনো বলা যায় না।

ভ্রমসংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলো' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। সংশোধিত উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল।

৫১ পৃঃ ১০ম পংক্তি। 'ধনাত্মক' স্থলে 'ঋণাত্মক' হইবে।

৫১ পৃঃ ৩৪ পংক্তি। 'বস্তুটীর লম্ফ প্রদানের' স্থলে 'বস্তুটী হইতে ইলেক্ট্রন কণার লম্ফ প্রদানের' হইবে।

৫২ পৃঃ ৩০ পংক্তি। "কিন্তু 'ইন্‌ফ্রা রেড' রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেগুনে" স্থলে "কিন্তু 'ইন্‌ফ্রা রেড' রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য তার চেয়েও বেশী বলিয়া তাহা অদৃশ্য এবং 'আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তরঙ্গের' দৈর্ঘ্য বেগুনে" হইবে।

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

= সূচী =

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
,, সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
,, ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি-স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের গহনা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গহনা প্রস্তুত করিয়া ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী আরও কমান হইয়াছে
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইন সম্বলিত বি ৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয়।
ফোন বড়বাজার ১৭৩১
১২৪.১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়
টেলিগ্রাম ব্রিলিয়ান্টস্

দ্বিতীয় বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৫৬	চতুর্থ সংখ্যা

প্রতীক্ষা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকাব স্পঞ্জ্-বুকে উষাব সে গোলাপী আঙুল
জীবনেব ছাযা ঢেলে কাল দেখা দেবে।
নির্জ্জন সমুদ্রে জাগে দিনেব প্রার্থনা :
পৃথিবীব মাঠের আকাশে
কাশেব মেঘেব বুকে
ফবিঙেব আনাগোনা -
জীবনে সবুজ।

বর্শাব মুখের মত প্রতীক্ষায কম্পমান কুমাবী যৌবং
দিনেব প্রার্থনা নিযে সমুদ্রেবা জাগে :
সমুদ্রের আকাশেতে
পাখীব কাশেবা
তুষারেব টুক্‌বো হযে গলে গেল বুঝি।
কালকের ধাবমান দিনে
কাজের আগুন জ্বালা।
মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত আকাশে করুণ সে চাঁদ।

আর একটি দিন।
এ বিবাট্ অন্ধকাবে অদৃশ্য ভ্রূণেব মত
        অনাগত
আব একটি দিন।

তবু আজ স্বপ্ন আসে
ডুবন্ত যবিঙ্ যেন ঃ জীবনে সবুজ।
এ' অন্ধকাব নখে ছিঁড়ে দিনেব গকড
কাল দেখা দেবে।
কালকেব ধাবমান দিনে
স্পঞ্জ-বুক স্বপ্নেব কুমাবী মেয়েবা সব মধ্যাহ্নেব চাঁদ।
বক্তে শুধু ঝক্ঝকে ধাব ঃ প্রতীক্ষায কম্পমান
                    বর্শাব মুখেব মত।

কংগ্রেসে নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয়

মানবেন্দ্রনাথ রায়

অনুবাদক—সবিতারাণী দেবী

পূর্বানুবৃত্তি

গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতবাদকে এমন ভাবে মেনে নেওয়া হোয়েছে যে তাতে নূতন কোন মতবাদ গ্রহণ করা কষ্টকর। অনেকেই বিনা যুক্তিতে তাঁর আদর্শের নীতিগত কোন রকম বিশ্লেষণ না ক'রেই এমন ভাবে তাঁর নীতিকে অনুকরণ কোরতে চেয়েছে যে, গান্ধীজীর নেতৃত্ব ছাড়া অন্য নেতার কথা ভাবতেই পারে না। তারা আত্ম-বিশ্বাসহীন। তারা মনে করে বিপ্লবের দ্বারা যখন ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা যাবে না, তখন অহিংস উপায়ই আমাদের একমাত্র পথ। অহিংস নীতি অবলম্বন ক'রে নিয়মতান্ত্রিকতার দ্বারা আমরা দেশ স্বাধীন করবো, এই তাদের ধারণা। বেশ তাই হোক্। তা'হলে কেন আমরা মিষ্টার জিন্না বা তেজবাহাদুর সাপ্রুকেই দোষারোপ করি? এটা হ'ল নিছক আত্ম-প্রবঞ্চনা বা শঠতা। গান্ধীবাদের মূলগত নীতির মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের আভাস পাওয়া যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা তিনি ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক প্রবর্তিত কয়েকটি আইন অমান্য করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তাতে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি একটুকুনও টলেনি। গান্ধীজী তা' টলাতে চান্‌ও নি। এর পরিণামে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিকদের মতানুযায়ী নির্ধারিত হোয়েছে—আজও হচ্ছে। তাঁদের মতে বিদেশী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে হবে এবং সেই চাপও এমন ভাবে দিতে হ'বে যার মধ্যে কোন রকম হিংসাত্মক ভাব প্রকাশ না পায়। তাদের সঙ্গে এমন ভাবে চলতে হ'বে, যাতে তাদের আপনা থেকেই হৃদয়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়ায়, স্বাধীনতা দেওয়া ব্যাপারেও তারা স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে উৎসুক হ'য়ে পড়ে। সেইটাই হ'ল আসল নিয়মতান্ত্রিকতা বা constitutiona-lism. উদার পন্থীরাও ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে স্বাধীনতা লাভ কোরতে চায়, তবে গান্ধীজীর সঙ্গে তাদের প্রভেদ এই যে, গান্ধীজী তাদের অন্তরের কোমল বৃত্তিতে আঘাত দিয়ে যা পেতে চান, উদার পন্থীরা যুক্তি দেখিয়ে তাই লাভ কোরতে চায়। তাদের যুক্তি হ'ল তারা নিজেরাই যখন গণতন্ত্রী, তখন ভারতের গণ-মতকেই বা অগ্রাহ্য করা হবে কেন? গান্ধীজীর মতে ইংরেজরা হৃদয়ের সৎ-বৃত্তির প্ররোচনায় ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। এমন কি হিটলার-মুসোলিনীর অত্যাচারও হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা বন্ধ হবে। তাদের হৃদয় বেশী কঠিন বলেই তাদের হৃদয় পরিবর্তন করবার জন্য উৎপীড়ন সহ্য করবার বেশী ক্ষমতা থাকা দরকার। জোর করলেই মিটমাটের সম্ভাবনা অধিক, সে ধারণা ভুল। তবে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের উপরে এমন ভাবে চাপ দিতে হবে যে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। অথচ গান্ধীবাদের অহিংস-নীতি অবলম্বনকারীদের দ্বারা সে-রকম চাপ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, কাজেই এটা অনুনয় বিনয়ের দ্বারা করতে হবে। যখনই জনসাধারণ উত্তেজিত হ'য়ে অনুনয় বিনয় ছাড়া অন্য কিছু করতে গেছে, গান্ধীজীর অমনি টনক নড়েছে—ঐ বুঝি হিংসানীতি প্রকাশ পেল। অমনি তিনি তা' থামিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণরূপে অহিংস ভাবাপন্ন থাকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায়—তাঁর এই মতবাদ রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন কোন লোকের কথা দূরে থাক, কোন যুক্তিবাদীই গ্রহণ করতে পারে না।

দু'বার আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপার থেকে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, স্বাধীনতার যুদ্ধে এ অস্ত্র প্রয়োগ চলবে না, তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রেখে পূর্ব পরিত্যক্ত সেই নিয়মতান্ত্রিকতার পন্থা অবলম্বন

কোরেছেন। পূর্বে গান্ধীজী জনসাধারণের মনে অনেকখানি প্রভাবই বিস্তার ক'রে গেছেন, কিন্তু আজ সেদিন বিগত। পুনরায় তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে ইচ্ছুক হ'লে পূর্বের ন্যায় অকৃতকার্যতা অবশ্যম্ভাবী। তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলতে গেলে আমাদের তো সমূহ ক্ষতি।

যদিও আজ গান্ধীজীর নেতৃত্ব বলতে বল্লভ ভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই, রাজাগোপাল আচারী এবং তাঁদের অনুচরবৃন্দের নেতৃত্বই বুঝায়। তাদের যুক্ত নেতৃত্বের দ্বারাই আজ দেশ পরিচালিত। তাঁরাই কংগ্রেসে সর্বেসর্বা। তাঁদের ইচ্ছার কাছে অপরের ইচ্ছার কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু এ রকম নেতৃত্বে আমরা সন্তুষ্ট নই। যে রকম নেতৃত্বের প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি, এঁদের দ্বারা তা পূর্ণ হয় না। কারণ এঁরা সাম্রাজ্যবিরোধী নন্—বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী। ভারতে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ব্যাপারে এদের সাম্রাজ্যবাদিতার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা পেয়েছি।

মন্ত্রীবর্গ ব্রিটীশ গভর্ণরের অধীনে থেকে তাঁকে মন্ত্রণা দেবে—তারা গভর্ণরের মন্ত্রী অর্থাৎ পরামর্শদাতা। আবার গভর্ণররা ব্রিটীশরাজের প্রতিনিধি। অথচ এই মন্ত্রীত্বের ভিতর দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁরা আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর কংগ্রেস নেতারা এই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ব্যাপারে সম্মত হ'য়ে তাদের এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি লোপের চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। তাঁদের আদেশানুযায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রীবর্গ আজ গর্বের সঙ্গে রাজ্য শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি পরিত্যক্ত হোয়েছে। এখন তো দেখতে পাচ্ছি ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতাই চলেছে। তার কারণ গান্ধীজী নিজে বৈপ্লবিক মতানুবলম্বী নন্, কোনো বৈপ্লবিক মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তিও তাঁর স্থান দখল করতে পারেনি, পরিণামে এই হোয়েছে যে, কংগ্রেস এমন কতকগুলি লোকের অধীনে রোয়েছে যারা সাম্রাজ্যবাদী।

বর্তমান পরিস্থিতিকে তলিয়ে বুঝতে গেলেই মনে হয় যে, প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে গান্ধীদলের পার্লামেন্টারী নেতৃত্বের পরিবর্তে নূতন নেতা নির্বাচন করা। এইটাই আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীরই একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। অথচ একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী কখনও প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী হ'তে পারে না। এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের গান্ধীবাদী বলে প্রচার ক'রে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করে, কিন্তু আসলে তারা কংগ্রেস কর্মীও নয়, গান্ধীবাদীও নয়। হৃদয়ের পরিবর্তনবাদ ও অহিংস নীতি ভীরুতাও অ-বৈপ্লবিক মনোভাবের নামান্তর মাত্র।

তথাপি অনেক বৈপ্লবিকের ধারণা গান্ধীজীর নেতৃত্ব ব্যতীত আমাদের সংগ্রাম চালানো অসম্ভব। তাদের এ ধারণার কারণও তাদের আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। গত বিশ বৎসর ধ'রে সংগ্রাম ক'রে আমরা শত্রুপক্ষকে হয়তো খানিকটা বিচলিত করতে পেরেছি। কিন্তু তবুতো বিচলিত করলেই হবে না, তাদের সাম্রাজ্যচ্যুত করতে হবে। কিন্তু সেইখানেই আমাদের যত ভয়। গান্ধীজীর নায়কত্বে তা করা সম্ভব নয়। আমাদের উপর নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্তন ক'রে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট বার বার তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং আমরা তা' নিতে অস্বীকার করেছি, তা সত্ত্বে আজ কংগ্রেস সেই শাসন-প্রণালীই মেনে নিয়েছে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, গান্ধীজীর পরিবর্তে কা'কে নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ প্রশ্ন অবাস্তব, কারণ গত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারেই তাদের চৈতন্যের উদ্রেক হওয়া উচিৎ ছিল। সুভাষ বাবুর স্বপক্ষে যারা ভোট দিয়েছিল তারা শুধু সুভাষ বাবুর উপরে প্রীতি বসেই তাঁকে ভোট দেয়নি। তারা গান্ধীজীর মনোনীত প্রণালীকে পরাজিত করবার জন্য তাঁকে ভোট দিয়েছিল, অথচ দুইবৎসর পূর্বে এমনি সাধারণ নির্বাচনের সময়ও জনসাধারণ শুধু গান্ধীজীর স্বপক্ষেই ভোট দেয়নি, ব্যালট বাক্সে গান্ধীজীকে অবতার জ্ঞানে চাল, পয়সা প্রভৃতি রেখে এসেছিল। আর আজ সেই গান্ধীজীরই মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচনে পরাজিত করবার জন্য তারা ব্যাকুল। জনসাধারণও যে

আজ নূতন নেতার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি অনুভব কোরছে, এই ব্যাপারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু কেমন ক'রে এই নেতৃত্বের পরিবর্তন সম্ভব? এই নেতৃত্বের পরিবর্তন ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় হ'ল একটা সুনির্দিষ্ট পন্থায় সংগ্রাম সুরু ক'রে জনসাধারণের মনে আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি করা। গান্ধীজীর পরিবর্তে যিনি নেতৃত্ব করবার ভার গ্রহণ করবেন তিনি বৈপ্লবিক মতবাদ-সম্পন্ন হবেন, গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের কোন সামঞ্জস্য থাকবে না। আজ সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে য অসন্তোষ, যে বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তার বাস্তবরূপ দিতে হবে। জনসাধারণ সুভাষ বাবুর দিকে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু তারা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। তামিলনাদের প্রতিনিধিবৃন্দ পট্টভীর উপর আক্রোশ বশতঃ সুভাষ বাবুকে ভোট দিয়েছিল। আরও অনেক জায়গাতেই এইরকম হয়েছিল। এর মূলে রয়েছে বর্তমান কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গলদের প্রতি একটা বিরক্তিজনক মনোভাব ও বর্তমান নায়কদের প্রতি অসন্তোষ। যদিও রাজনৈতিক শিক্ষা ব'লে তাদের কিছুই নেই, তথাপি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত কারবারাই বেশী কাযকরী। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা জেনেছে যে তাদের নিজস্ব মত ব'লতে কিছুই নেই। নিজেদের মত ব্যক্ত করবার অধিকারও তাদের নেই—তারা শুধু আদেশ পালন ক'রবে মাত্র। কিন্তু আজ আর তারা এ রীতি মানতে রাজী নয়, তাই তারা প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছুক। অবশ্য তারা এও জানে যে, এই প্রচলিত রীতির মধ্যে একটা নিগূঢ় দার্শনিক চিন্তাধারা বিরাজ কোরছে। যতদিন আমরা সেই দার্শনিক চিন্তাধারার উপর আস্থা রাখব, ততদিন আমরা যতই অসন্তুষ্ট হই না কেন, এ রীতির পরিবর্তন কোরতে সক্ষম হবো না।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব এতদিন ধরে চ'লে আসছে বলেই, আর কারুর নেতৃত্ব করা সম্ভব নয়, এ-চিন্তা আমাদের দূর করতে হবে। গান্ধীজী নিজেই তার আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হননি। এই রকম অবস্থায় আমাদের কর্তব্য স্থির করা উচিৎ। গান্ধীজীকে যদি এই সময় নেতার আসন থেকে সরানো না হয়, আমি নিশ্চয় ক'রে বোলতে পারি, ১৯৪১ সালের মধ্যে কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে শাসন-কার্য পরিচালনা করবে। সুভাষ বাবুর এই সম্পর্কে গান্ধী-দলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কাহিনী আমরা জানি। সত্যই তিনি কোন অভিযোগ করেছিলেন কিনা বল্‌তে পারি না, তবে আমি নিজে কোনো অভিযোগ করছি না। আমি শুধু গান্ধীদলের রাজনৈতিক মতবাদ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তাদের নেতৃত্বে জনসাধারণ কখনও বিপ্লব সূচক মনোভাব প্রকাশ কোরতে সাহসী হবে না। আইন অমান্য আন্দোলনও পুনরায় সুরু করবে না, তবে কি করবে এইটাই জিজ্ঞাস্য।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে বিচক্ষণ আইনজ্ঞদের নিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করে। ঐ কমিটি নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো সম্ভব কি-না সেইটা পর্যালোচনা করা। কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিল যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমরা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনে বাধা দিতে পারবো না, কারণ বর্তমানে আমরা যে রাজনৈতিক মতবাদের অধীনে আমাদের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করছি, তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ দূরে থাক্, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনও আটকাতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হবে। আর তা'হলেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও পরাজয় সুনিশ্চিত। কংগ্রেস বার বার প্রস্তাব পাশ ক'রে বলেছে, ভাবতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের মানেই হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, তথাপি দুই বৎসরের মধ্যেই তা' সমাধা হবে। কিন্তু আমরা তাতে বাধা দিতে পারবো না, যদি না বর্তমান নেতার পরিবর্তন হয়। কারণ বর্তমান নেতাদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই একমাত্র কাম্য নয়। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তায় তাঁদের মন আচ্ছন্ন। তাই, যদি আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন কোরতে চাই তা'হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

একথা ভুললে চলবে না যে নূতন নেতার উত্থান হবে জনসাধারণের ভিতর থেকেই। জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আর এই জনসাধারণের মুখপাত্রস্বরূপ যারা আসছে, তারাই এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ কোরবে। এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও যখন এইরূপ গণ-মতের প্রাধান্য স্থাপিত হবে, তখনই বৈপ্লবিক শক্তির আধারস্বরূপ কংগ্রেস কার্যপন্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তারা তখন জনমতের উপর নির্ভর ক'রে কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান নেতাদের চিন্তাধারা অন্যরূপ। তারা ভাবেন, আন্দোলন তাঁদেরই সৃষ্টি। অতএব জনসাধারণ তাঁদের হাতের পুতুল মাত্র, কাজেই তাঁরা যা ভাবেন, যা করেন তারাও তাই করতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ নির্বাচন কালীন ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাক্। সাধারণ নির্বাচনের সময় জনসাধারণের কাছে অনেক রকম আশ্বাস বাণী দেওয়া হয়, যদিও এটা আশা করা যায় না যে, সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলিই পূর্ণ হবে, তবে একটাও হয় না বলেই দুঃখ। আমার মতে প্রথমতঃ যে প্রতিজ্ঞাগুলি পূরণ হবে, তাতে সর্বপ্রথমে নেতারা জনসাধারণের নিকট গিয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা কোরবেন—তারা কি চায়? তারা যে জিনিষ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে বোধ করবে, সেইটাই আগে পূরণ করা হবে।

গত কংগ্রেসে ঠিক হয়েছিল জনসাধারণের মঙ্গলার্থে সর্বপ্রথমে prohibition-ই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি বেশ জানি, প্রায় শতকরা ৮০ জন কংগ্রেস কর্মীরাই ভাল ক'রে জানতো যে জনসাধারণ সর্বপ্রথমে prohibition চায় না। এই prohibition-এর দ্বারাই তাদের উন্নতি হবে এ তারা বিশ্বাস করে না। অথচ disciplinary action-এর ভয়ে কোন কংগ্রেস কর্মীই নেতাদের মতের বিরুদ্ধে একটি কথা বোলতে সাহস ক'রেনি।

এর থেকে বোঝা যায় তাদের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা নেই। অথচ এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের জন্যই আমরা কি ব্যস্ত! তাই বলি, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকা উচিত। বর্তমান কংগ্রেস কি ভাবে পরিচালিত হয় তা' আমরা জানি। এবং প্রত্যেক নেতা, কি ছোট, কি বড়, সকলেই স্ব স্ব মত প্রধান। কংগ্রেসের গঠনপ্রণালীই এইভাবে নির্মিত। অপর পক্ষে যতক্ষণ না বিরুদ্ধবাদীরা দলে ভারী হ'তে পারে ততক্ষণ এই নিয়মের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। অথচ নূতন নেতৃত্বের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতেও যখন সকলে নারাজ, তখন কংগ্রেসের বাইরে একটা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আমাদের কার্যের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে যদি আমরা নীরবে কাজ ক'রে যাই, তাহলে পরাজয়ের সম্ভাবনা খুব কম। হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের উচ্চ স্তরে পৌছাতে পারবো না, কিন্তু পিছিয়েও থাকবো না। নাম, যশ, ক্ষমতার জন্য তো আমরা করবো না, আন্তরিকভাবে আমরা জনসাধারণের উন্নতির জন্য কাজ ক'রে যাবো। এবং জনসাধারণ যদি বুঝতে পারে যে আমরা প্রকৃতই তাদের হিতসাধনে উদ্যোগী, তাহলে তাদের বিশ্বাস ও আস্থার জোরেই আমরা জয়ী হ'তে পারবো। একবার যদি আমরা কংগ্রেসের নিম্নতর স্থানেও প্রভাব বিস্তার করতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে। দলে ভারী না হ'য়েও আমরা অনেক কাজ করতে পারি।

কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থাটা দেখা যাক্। পন্থ-প্রস্তাব নিয়ে অনেক হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়েছে আর মনুর বিধানের ন্যায় সেই প্রস্তাবটাকেই মেনে নেওয়া হ'ল। অথচ প্রতিনিধিবৃন্দের মতটাই একমাত্র মত নয়—কংগ্রেস সদস্যদের অভিমতটাই আদৃত গ্রহণীয়। যদি কোনো প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিজনক মনে হয়, তাহ'লে তারাই এ নিয়ে আলোচনা করতে পারে, এর পরিবর্তনের দাবী জানাতে পারে। আমরা চাই কংগ্রেসের ভিতরে প্রাথমিক কমিটিগুলি নিজেদের মত প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা করবার দাবী করবে। যদিও বর্তমান অবস্থায় এরূপ করা সময় সাপেক্ষ, তথাপি আশা করি, শীঘ্রই আমরা এরূপ অবস্থা

সৃষ্টি করতে পারবো। তখন এই কমিটির সদস্যেরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকবে এবং যখনই তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে তখন জোর ক'রে আদায় করবার মত মনের জোরও তারা রাখবে। যদি তখনও নেতৃত্ব সচেতন না হয় তবে আপনিই তা লুপ্ত হ'য়ে যাবে, এবং তার মধ্য থেকেই তখন নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব হবে।

এমন দেশে বিপ্লব আনবার পূর্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিপ্লব আনা দরকার। কারণ যতক্ষণ না একটা প্রতিষ্ঠান বৈপ্লবিক মতবাদসম্পন্ন লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব চালানো সহজ সাধ্য নয়। নূতন নেতৃত্বের প্রবর্তন করতে গেলেই দরকার পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নূতন নেতৃত্ব সংস্থাপন সম্ভব নয়। জনসাধারণ যেদিন কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধমনোভাব প্রকাশ করতে সাহসী হবে, দেশের ভবিষ্যত মঙ্গলের সম্ভাবনাও সেদিন সহজ হ'য়ে দাঁড়াবে। সত্যকথা স্পষ্ট ক'রে বলার দিন আজ সমাগত। আনুগত্য আর বশ্যতা দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়, একথাও অনেকে বুঝতে পেরেছে। একতা সম্বন্ধে আমাদের যে ভুল ধারণা আছে সে ভুল ধারণাও আজ দূর ক'রতে হবে। একতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যতক্ষণ না কোনো বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সব একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত একতার কোনো অর্থই হয় না। বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিয়ে যেদিন আমরা একত্র হ'তে পারবো এবং একজন প্রকৃত বৈপ্লবিকের নেতৃত্বে কাজ আরম্ভ করতে পারবো, সেদিন আমাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, শুধু ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্য বা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ আমরা নূতন নেতার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করছি না। জনসাধারণ বর্তমান নেতাদের বিরুদ্ধে যে বিরক্তিজনক মনোভাব পোষণ করে, তারই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তারা নূতন নেতার নেতৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী। বিগত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারেই তারা তাদের বিরক্তিজনক মনোভাব অনেকটা ব্যক্ত কোরেছে—বৈপ্লবিক শক্তি সেখানে কার্যকরী। কংগ্রেসের ভিতরে যে-কেউ যতবার বিপ্লব আনবার চেষ্টা কোরেছে, বর্তমান নেতৃবৃন্দ তাকে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু এই বাধাবাধিতে পশ্চাদপদ হ'লে চলবে না। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যার সাহায্যে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা সমস্ত রকম নিরুৎসাহকে জয় ক'রে চলবো।

৪০ লক্ষ কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৩৯ লক্ষ লোকই আজ শোষিত, নিষ্পেষিত, তাদের জন্যই আমরা সংগ্রাম শুরু করেছি। আমরা তাদের স্মৃতি কোনোদিনই বিস্মৃত হবে না। তারা আমাদের বুঝতে পারবে। তারা প্রিন্স ও ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চায় না। তাদের জন্য প্রয়োজন বিপ্লব, এবং এইটাই যিনি তাদের কাছে বোঝাতে সমর্থ হবেন, তিনিই প্রকৃত জন-নায়ক। যেহেতু কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, তখন জনসাধারণের নেতৃত্বে এটা পরিচালিত হবে। তাঁরাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে সময়ের উপযোগী বিপ্লবের পথে পরিচালনা করবেন।

এটা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। তাই ব'লে এমন কিছু কঠিন কাজও নয়, যাতে আমাদের নিরাশবাদী হ'তে হবে। একমাত্র দৃঢ়বিশ্বাস ও একান্ত চেষ্টার দ্বারাই আমরা এটা সহজে করতে পারবো। নিজেদের উপর আত্ম-বিশ্বাসও স্থাপন করা দরকার। গান্ধীজী একমাত্র দেবতার অংশ বিশেষ এবং তাঁকে ছাড়া আমাদের এক পা'ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এ ধারণা দূর ক'রতে হবে। যুগ-যুগান্তরের দাসসুলভ মনোভাব থেকেই আমরা এমন ভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের অধীনতা মেনে নিয়েছি। গান্ধীবাদীরাও আমাদের নিজেদের কোনো চিন্তা-শক্তির বিকাশ হবার সুযোগ না দিয়েই তাঁর উপরে সব বিষয় একান্তভাবে নির্ভর করতে শিখিয়ে এসেছে। আমাদের চিন্তাশক্তি, আমাদের বুদ্ধির বিকাশ সবই যেন আমরা গান্ধীজীর কাছে বাঁধা দিয়েছি। তিনি আমাদের মঙ্গল চিন্তা করছেন, অতএব তিনি যা আদেশ করেন

আমরা তাই পালন করব এ মনোভাব নিয়ে থাকলে আর চলবে না। একথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ, তিনি যতই মহৎ হোন্ না কেন, তিনি মানুষই,— এবং মানুষ মাত্রই ভুল-চুকের অধীন। কাজেই নূতন নেতৃত্ব এক ব্যক্তির দ্বারা হবে না। Collective Leadership-ই গণ-আন্দোলনে সাফল্য আনবে এবং কেবল তখনই এটা প্রতিনিধিমূলক হবে—এতে গণ আন্দোলনও সাড়া দেবে। যতক্ষণ আত্মবিশ্বাস আছে, ততক্ষণ মানুষ যে কোনো মুহূর্তে নেতৃত্ব পরিচালনা করবার ভার গ্রহণ করবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। তবে তার সঙ্গে এটাও দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতের জনসাধারণ নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করবার শক্তি রাখে।

প্রত্যাবর্তন

বীণা দাস।

পূর্বানুবৃত্তি

সাতবছর পরে কলকাতা

"খোকন্, চল্ ছয় আনার টিকিট নিয়ে একদিন সারা কলকাতা বেড়িয়ে আসি।" "বাবা, Eden garden-এ Band বাজা কবে থেকে বন্ধ হ'ল?" "বৌদি, কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানগুলি তো আর চেনা-ই যায় না দেখ্‌ছি।" "কল্পনা, আমাদের সময় রাস্তায় মেয়েদের এত বেশী চলাচল ছিল না—না ভাই?"

"ছোট্‌দি, দেখো, Talki-তে গিয়ে অবাক্ হ'য়ে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিও না যেন।"—"চৌরঙ্গীতে নূতন ধরণের Traffic control তুমি দেখে যাওনি, না?" "হ্যাঁ advertisement-এর জাক-জমক আজকাল বেড়ে গিয়েছে!"

—কিন্তু এই ধরণের উদ্যম বেশীদিন আমাদের রইলো না। প্রথম প্রথম কলকাতা আমাদের চোখেও ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল বৈকী। এত ঐশ্বর্য, এত আলো, এত জনতা, চোখ যে ঝলসে যাচ্ছে। কিছুটা হয়তো অনেক দিন এসব দেখিনি ব'লে, কিন্তু শুধু তাই-ই নয়, কলকাতার সাজসজ্জা ইতিমধ্যে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে সত্যিই। হয়তো বেশীর ভাগই ঝুটো, কিন্তু তবু তার অলঙ্কারের এত প্রাচুর্য, এত উজ্জ্বল্য আগে যে ছিল না সেটাও ঠিক। আগে একটি মাত্র Whiteaway Laid Law ছিল, আজকাল তো সব রাস্তার বড় বড় দোকানকেই আমার Whiteaway ব'লে ভুল হচ্ছে!—বিচিত্র ধরণের সাজানো দোকানগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি, আর মনে হয় যেন সহর জোড়া Exhibition এর মেলা বসেছে। রাস্তায় যারা চলাচল করে তাদের ভিতরও অনেকখানি পরিবর্তন বারে বারে চোখে এসে লাগছে। কলকাতায় কি আজকাল গরীব আর মধ্যবিত্তের চেয়ে বড়লোকের বসবাস বেশী?

জিনিষপত্র সস্তা হয়েছে? রুচির উন্নতি হয়েছে, কিন্তু দেখতে কি খুব ভাল লাগে? হাতে রং, মুখে রং, চোখে কাজল, সাড়ীতে বাহার—দেখে দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কথায় "এরা বিলাতী দোকানে সাজানো পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়।" মনটা দমে যায়। এর মধ্যে বন্ধুরা আবার জানিয়ে দেয়—আজকালকার ছেলেদের Firpo-র রুটী না হ'লে খাওয়া হয় না,—আরও বলে, "জানো আজকালকার স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের প্রধান আলোচ্য বিষয় শুধু Cinema আর—।" অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবছিলাম,—কেন এমন হ'ল? এ-লক্ষণ

কিসের? নিরবচ্ছিন্ন ভালো তো নয়ই; নিরবচ্ছিন্ন মন্দ ব'লে সরাসরি একে তিরস্কৃত ক'রে দেওয়াও কি ঠিক হবে? দারিদ্র্য আর অভাব আর নৈরাশ্য—এই তো আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের জীবনের একমাত্র সম্বল, ভবিষ্যতের একমাত্র প্রাপ্য। ওরাই সবাই মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাদের কিশোর-কোরকগুলি অকালে শুকিয়ে তুলতে চায়, তাদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে চায়, তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিষ্পেষিত ক'রে দেয়। হয়তো আমাদের দেশের যৌবন আজ এই নিষ্ঠুর ভাগ্যকে মেনে নিতে—তার কাছে নির্বিবাদে আত্ম-সমর্পণ করতে চাইছে না। তাই অট্টহাস্যে তাকে অস্বীকার ক'রে যাচ্ছে—তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে যতটা পারে, যতক্ষণ পারে, তাকে ভুলে থাকতে চাইছে। ভাগ্যের সঙ্গে যুঝবার শ্রেয় পথ এটা নয়, তবু ভাগ্যের কাছে মাথা নত করবার চেয়ে হয়তো ভালো। এতে তারা হারিয়ে ফেলছে চরিত্রের গভীরতা, নষ্ট ক'রে ফেলছে জীবনের গাম্ভীর্য আর গৌরব। কিন্তু তবু বাঁচিয়ে রাখছে প্রাণের স্পন্দনকে। আর ওই সজীবতাটুকু যদি অক্ষত থাকে তা'হলে হয়তো আবার কোনও দিন মহত্তর অভিযানে যাবার আগে ওদের কাছে সাড়া পাওয়া যেতে পারে—সাময়িক অবসাদ কেটে গেলে, দারিদ্র্যের আর দেশের সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের কথা ওরা আবার ভাবতে চাইবে, তার দায়িত্ব হাতে তুলে নিতেও দ্বিধা করবে না।—"ছোটদি, ওই দেখো লালঝাণ্ডা! এও তুমি চেখে যাওনি?"—চমকে ফিরে তাকালাম। না দেখে যাইনি সত্যি, আর ঠিক ওই রকমই কিছু এই সময়টিতে দেখাও আমার দরকার হ'য়ে পড়েছিল। কলকাতায় এসে অবধি পাঁচছয়তলা বাড়ী, আর Rolls Royce গাড়ী, সাহেবদের চৌরঙ্গীর ঐশ্বর্য আর মাড়োয়াড়ীর বড়বাজারের কোলাহল—ছেলেদের হাল্কা ধরণের হাস্যপরিহাস আর মেয়েদের বিলাসিতার আড়ম্বর—এতক্ষণ তো এই-ই শুধু চোখে পড়ছিল। কিন্তু লালঝাণ্ডা?—না, এ আমি দেখিনি। তবু সমস্ত অন্তর দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত প্রগাঢ়তা দিয়ে, আকাঙ্ক্ষার সমস্ত উত্তাপ দিয়ে তাকে আমার প্রথম সম্ভাষণ—প্রথম সম্বর্দ্ধনা নিবেদন ক'রে দিলাম। নৈরাশ্যের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকখানি আশার আলো সেদিন সে আমাকে এনে দিয়েছিল,—অবসাদের সংশয়ের অন্ধকারের মাঝে তার ওই রক্তাক্ষরের লিপিতে অনেক কিছু সেদিন আমি প'ড়ে নিয়েছিলাম—কিন্তু কলকাতায় বেশীদিন আর ভালো লাগছিল না। ইচ্ছা করছিল কোথাও কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে আসতে—বেরিয়ে পড়তে। সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে, যখন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে ভাল লাগতো না, বিদেশ থেকে ফিরে কলকাতার station-এ এসে দাঁড়াতে পারলেই ঘরে ফেরার আনন্দ অনুভব করতাম। এর প্রতি অলি-গলি, প্রতিটি দোকান, প্রতিটি বিজ্ঞাপন ছিল আমার পরিচিত, মুখস্থ। শৈশবে এরই ধুলো-বালিতে খেলা ক'রে দিন কেটেছে—কৈশোরের,যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন, নবীন আশা দিয়ে এই মহানগরীর বুকের উপরই অনেক সৌধ রচনা করেছি। ভেবেছিলাম এখনও বুঝি সেইসব হারানো দিনের সোনালী আভা এখানকার আকাশের গায়ে মাখা আছে, এখানে এলেই বুঝি আবার ফিরে পাব আমার হারানো অতীতকে। কিন্তু কলকাতা তো প্রথমটা আমায় সরাসরি না চেনারই ভান করলো। পরিচয় দিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়ালাম তখনও তার সংশয় কাটে না। হয়তো সে আমায় এমন খাপছাড়া ভাবে, এমন একা দেখে ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করে "কোথায় গেল তোমার আগেকার দিনের সব সাথীরা?"—কোথায় গেল—আমিও কি তা' জানি? আমিও তাদের খুঁজে ফিরছি। কলকাতায় যদি ফিরে এলাম তবে তার সঙ্গে অতীতের সব কিছুকে, অতীতের সকলকেই ঠিক তেমনি ভাবেই মন ফিরে পেতে চাইছে। এখন বুঝতে পারছি কলকাতার আকর্ষণ শুধু কলকাতার মধ্যেই ছিল না, এখন বুঝলাম ভালো সেদিন শুধু কলকাতাকেই বাসিনি।—তবু প্রথম কিছুদিন হট্টগোলের মধ্যে কেটে গেল মন্দ নয়। ভোরবেলায় রাস্তায় রাস্তায় শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানো, রোজ সকালবেলায় "দৈনিক" খবরের কাগজ পড়তে পাওয়ার বিলাসিতা, যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, যতগুলি

ইচ্ছা বই বেছে নিয়ে পড়তে সুরু ক'রে দেওয়ার স্বাধীনতা, গড়ের মাঠে দল বেঁধে বসে ভালমুট খাওয়ার আনন্দ—সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে বন্ধ না হ'য়ে খোলা পার্কে বসে বসে অনেক রাত অবধি গল্প করার নূতনত্ব, এসবই আমাদের মনে হ'চ্ছিল—"উ কি মজা।" না পেয়ে পেয়ে সব জিনিষেরই দাম আমাদের কাছে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, আর কিছু না হোক্, অকারণে, অল্প কারণে খুশী হওয়ার বিদ্যায় আমরা পারদর্শী হ'য়ে ফিরেছি।—তবু অতীতের যে-সব দিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গিয়েছে, তারই বিষাদ আমাদের মনকে থেকে থেকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে চায়, বর্তমানের সঙ্গে আমাদের সহজ সম্বন্ধ, স্বাভাবিক যোগ আজ কোনওখানে কোনও-দিক দিয়েই নেই, তারই সচেতনা আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলছে, আর তার উপর রয়েছে ভবিষ্যতের পথ ঠিক ক'রে নেবার দায়িত্ব। ঠিক এই রকম অবস্থায় ইচ্ছা করছিল—কি ইচ্ছা করছিল কেমন ক'রে তাকে ভাষা দেব? কেমন ক'রে বোঝাব মনের সেই অনির্দিষ্ট আকুতি? যাঁরা কিছু না বল্লেও আমাদের মনগুলি কিছুটা বুঝে নিতে পারেন তাঁরা অনেকে অনেক কিছু বল্লেন। কেউ বল্লেন, "ভালো ক'রে কোনও একটা বিষয় ধরে পড়াশুনো করো কিছুদিন। তাইতেই মনের ধৈর্য ফিরে পাবে।" কারুর মতে আমাদের এখন কিছুদিন সকলের সঙ্গে বেশী ক'রে মেলামেশা করা দরকার, কারণ বহুদিন আমরা বড় একা একা থেকেছি। এ-সবই ঠিক। অনেক দিনের অবরুদ্ধ জীবনের পর একটা বড় কিছুর আশ্রয়, একটা বৃহৎ উদার মুক্ত পরিবেশের পটভূমিকা, একটা উত্তপ্ত নিবিড় ঘনিষ্ট পরিমণ্ডল—এইগুলিই আমাদের দরকার হয়েছিল। বইয়ের মধ্যে, বন্ধুদের সাহচর্যে, মানুষের সংস্পর্শে সে-সব কিছুটা খুঁজেও পেতাম হয়তো। আর ও-গুলির কোনোটারই অ-প্রতুলতা কলকাতায় যে নেই তাও জানি। কলকাতায় কত পাঠাগার, কত বন্ধু, কত সমিতি, কত সভা, কত জনতা, সকলেই আমাদের ডাকছে, সকলেই সাহায্য করতে চাইছে—অবারিত দ্বারের আতিথ্যপূর্ণ সহৃদয় আমন্ত্রণ—না তার অভাব আমাদের হয়নি। কিন্তু তবু কলকাতায় আর নয়। কলকাতায় সব জিনিষই বড় বেশী স্মৃতির কাঁটা বেঁধা রয়েছে, চলতে ফিরতে বড় লাগে। কলকাতা বড্ড বেশী পরিচিত, তাই একটুতেই ওর সবকিছু ফুরিয়ে যায়, পুরাণো হ'য়ে যায়, ক্লান্তি নিয়ে আসে। কলকাতা নটীর মত নূপুর পায়ে দিয়ে ছদ্মবেশ প'রে, বিলাসের সজ্জায় আপাদমস্তক আবৃত করে, যারা নবাগত, যারা দূরাগত তাদের মন হয়তো ভোলাতে পারে কিন্তু আমরা যারা তার অনেক দিনের বন্ধু, যারা তার অন্তরের অন্তঃপুরের অনেক খবর রাখি, আমাদের সঙ্গে যখন ওরি ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে চোখাচোখি হ'য়ে যায়, আমরা দেখতে পাই তার বুকভরা কান্না, তার অপরিসীম দৈন্য, তার অহরহ পরের মন যুগিয়ে চলার গ্লানি।—তা'ছাড়া আরও একটা কথা মনে হয়, কলকাতা কি বিশেষ ক'রে শুধু কাজের লোকদেরই জায়গা নয়, সকলেই এখানে ব্যস্ত সকলেই ব্যগ্র, সকলেই উৎসাহ-চঞ্চল। কলকাতা কারুর বসে থাকা পছন্দ করে না। যাদের পথ ঠিক নেই তাদের এখানে পথ হারাবার সম্ভাবনাই বেশী। যাদের যাবার যায়গা নির্দিষ্ট নেই, কলকাতা তাদের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোলক ধাঁধাঁ। সেই জন্যই যতদিন পর্যন্ত নিজেকে সকল দিক দিয়েই বেকারের শ্রেণীভুক্ত ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না—যতদিন না যেখানে খুশী, যে-দিকে খুশী অকারণে ঘুরে বেড়ানো আমার বন্ধ হ'চ্ছে—ততদিন অন্ততঃ কলকাতার রাস্তার ভিড় থেকে সরে দাঁড়ানোই বোধহয় উচিত হবে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারছি "অভিনয়ে"র দর্শক হ'য়ে ব'সে থাকতে আমি পারবো না। "অভিনয়ে"র অংশ যদি না নিতে পারি, নাট্যালয় থেকে ফিরে যেতেই আমি চাইব।

পলাতকা

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

কি একটা যোগ ছিল। দশাশ্বমেধ-ঘাটে ভয়ানক ভিড়। স্নানটা সারিয়া আমিও ঘাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছি। কোন প্রকারে গা মুছিয়া ভিজা-কাপড়েই বাসার দিকে রওনা হইলাম। কিন্তু সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠিতে না-উঠিতেই দৃষ্টি পড়িল একখানা মুখের দিকে। চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। হয়তো এর চেয়ে সুশ্রী চেহারা বহু দেখিয়াছি। কিন্তু, এমন মিষ্টি মুখের ভাব বড় একটা নজরে আসে না।

সে তরুণী। সমস্ত দেহে তার যৌবন উচ্ছলিত। অপূর্ব্বতার সীমা নাই। খুঁটিয়া দেখিতে গেলে অনেক খুঁতই বাহির হইবে, জানি। কিন্তু উহার চেহারার আভাসে ও ছন্দে যাহা ছিল তাহা চোখে বিস্ময় আনে, কল্পনায় দীপ-শিখা জ্বালিয়া দেয়।

আমি মুহূর্ত্তেই তরুণীর বিশিষ্ট-রূপচ্ছটার পরিচয় পাইলাম। মুহূর্ত্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম। পেছনে তাকাইবার সাহস-ও হইল না।

বাসায় আসিয়া নিজের কাজকর্ম্ম সব-ই সারিলাম। কিন্তু, মনের তলেতলে অন্যমনস্কতা, অপরিচিতার বারে-বারে আভাস-আবির্ভাব।

সামান্য একটা কাজের জন্য কাশী আসিয়াছিলাম। রাত্রির গাড়িতেই কলিকাতা ফিরিব। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার মন্দিরে গেলাম বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে। দর্শন সাঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিলাম, পথে চলিতে চলিতে মনটা যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিতেছিল। কী যেন আশা করিয়া চারিদিকে তাকাইতেছিলাম। হঠাৎ নিজেকে গোপনে প্রশ্ন করিয়া আবার লজ্জিত হইয়া উঠিলাম—আশ্চর্য্য, ভোরে-দেখা সে-মুখখানি কি ভুলিবার জো নাই?..

সেকেণ্ড-ক্লাসের একটা কামরা একেবারে খালি পাইয়া মনটা নাচিয়া উঠিল। ভাবিলাম, একটু ঘুমান যাইবে। প্ল্যাটফরমের দিকের জানলাগুলি বন্ধ করিয়া দিলাম। অভিপ্রায়, আর কেহ যেন আমার কামরায় না-ঢোকে।

বিছানাটা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। আকাশ-পাতাল কতো-কি ভাবিতেছি। তিন-চারিটা চুরুট হাতে-ই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। হয়তো দু একবার উহাতে টান দিয়াছিলাম। এতো কি ভাবিতেছি? হঠাৎ খতাইয়া দেখি—নাঃ, সেই দশাশ্বমেধ-ঘাট। স্নানোত্থিতা নারী—প্রভাতে দেখা সেই নারী। তারপর রাজ্যির যতো অসম্ভব।

ছিঃ, পাগল হইলাম নাকি?—মন হইতে সব ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া নতুন একটা চুরুট ধরাইয়া লইলাম, এবং পকেট হইতে একখানা দৈনিকপত্র বাহির করিয়া উহার অবোধ্য-পংক্তির মাঝে অর্থ খুঁজিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন সময় গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল। তৎসঙ্গেই আমার কামরার দরজাটায় সজোরে একটা ধাক্কা আসিল। জ্বালাতন আর কি! এমন নিশ্চিন্ত-নির্জ্জনতাটুকু বুঝি-বা এবার নষ্ট হইল।

কবাটটা খুলিয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ বুদ্ধিহারা হইলাম। একে সেই তরুণী—দশাশ্বমেধঘাটে যার আচমকা-আভাসে আমি সংবিৎ-হারার মতো। কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু, তরুণী প্রগল্‌ভা। আমাকে বলিল—কোথায় যাচ্ছেন? আমি কি উত্তর দিয়াছিলাম মনে নাই। হয়তো বলিয়াছিলাম—কলকাতা। সে আর কিছু বলিল-না। তার সঙ্গের লোকজন এ-কামরায় সমস্ত জিনিসপত্র চট্‌পট্‌ তুলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

শেষ-ঘণ্টা বাজিল। ট্রেন দুলিয়া উঠিল। তারপর শুরু হইল তাব অভ্যগ্র-গতি। আমি আর তখন আমাতে নাই। সাবা জীবন নারীকে নরকের দ্বাব বলিয়া না-জানিলেও একটু দুবেই তাদেবকে আসন দিয়াছি। ভক্তি করিয়াছি। 'দেবী' বলিয়াছি। সমান অধিকার যাহাতে তারা পায় তাহার জন্য দু-চার কলম লিখিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজেব বাস্তব-জীবনেও ও-সব মতবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছি কি?

যা'হোক সেই আমি-ই কিনা গভীব নিশীথে এক চঞ্চলা-তরুণীর সঙ্গে একাকী এক কামবায় বিরাজমান। আর এ তেমন নারী, যে মুহূর্ত্তের আবির্ভাবে খুব শক্ত-মানুষের মনের ভারকেন্দ্রটিকে ও নডাইয়া দেয়, সারাদিন-মান তাব জের টানিয়া টানিয়া বিপর্য্যস্ত হইতে হয়।

সংস্কার ও যুক্তির মাঝখানে পড়িয়া আমি বিব্রত হইয়া উঠিলাম। ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি তাহা নির্ণয় করার মত সুস্থ-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিত-লজ্জায় বসিয়া রহিলাম। তবে, নেহাৎ মন্দ-ও লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, মজ্জার তলায় তলায় কেমন যেন খুশীর স্পর্শ, নেশার আবেশ।

সহসা তরুণী বলিল—অত অসহজ হয়ে উঠেচেন কেন? আজ প্রাতে গঙ্গার ঘাটে আপনাব সঙ্গে-ই দেখা হয়েছিল-না?

উত্তব কথায় আসিল না। মাথাটা নাড়িয়া সায় দিলাম। তরুণী কহিল, কৈ তখন তো আপনাকে লাজুক মনে হয়নি?—বলিয়া-ই ওষ্ঠ-প্রান্তে একটু দুষ্টু হাসি বিলাইয়া সে চুপ করিল।

আমাব অবস্থা তখন আরো সঙ্গিন। মনে মনে যথেষ্ট রাগ হইল। শক্ত উত্তর দিবাব সংকল্প করিতেই পিছাইয়া গেলাম। ভয় ছিল, পাছে-বা অভদ্রতা হইয়া যায়!

যাক্, বিপদ কিছুটা কাটিয়া গেল। শুয়ে পড়ুন-না, বলিয়া তরুণী আপন বিছানাটা টানিয়া লইল, এবং অনায়াসে একখানা পাতলা সবুজবঙা চাদর গায়ে-মাথায় ঢাকা দিয়া নিজে-ও শুইয়া পড়িল।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় ভাবিতেছিলাম, অমন নার্ভাস হইয়া গেলাম কেন? সহস্র-যুদ্ধবিজয়ী পার্থের এ কী হইল!

রাত্রি প্রায় তিনটা হইবে। গাড়ি একটা মাঝারি ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। আমি বিছানা হইতে উঠিয়া জানলাটা তুলিয়া বাহিরে তাকাইতে-ই দেখি সারা প্লাট্‌ফর্ম ভবিয়া গিয়াছে পুলিশ ও সশস্ত্র সার্জ্জেণ্ট-এর ভিড়ে। ওদের কমাণ্ডেণ্ট বলিয়া-ই মনে হইল একটা সাহেবকে। একটা লোক তাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আমাব কামরা দেখাইয়া দিতেই মুহূর্ত্তে কামরাটা ঘেরাও করিয়া ফেলা হইল এবং কয়েকটা সার্জ্জেণ্ট সহ কমাণ্ডেণ্ট ভিতরে ঢুকিবাব জন্য অগ্রসর হইল।

আমার সকল জড়তা তখন কাটিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক-সাহসে মন তখন অচঞ্চল। সঙ্গের এক-তাড়া-কাগজ-সমেত য়্যাটাচিটা অনায়াসে তরুণীর পাশে ঠেলিয়া দিয়া দরজাব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—You are Bagchi, No?

—Yes, Please.

—Government's information--You are carrying Poison-gas, Bombs and Pistols—

—And not a Dread-nought?

একটু হাসিয়া সাহেব বলিল—May be, I shall search after that too.

ভিতরে ঢুকিয়া উহারা আমার সমস্ত জিনিসপত্র তচ্‌নচ করিয়া ফেলিল। পুরা উৎসাহে তালাসী লইয়াও কিছুই মিলিল-না।

তখন সাহেব তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল—আপ্‌কা বাকস্‌ ভি দেখনা চাহিয়ে।

তরুণী উত্তর দিল—পরওয়ানা দেখলাও।

—পরওয়ানা হায় নেই। লেকেন জেয়াদা তকলিফ আপকো হাম নেহি দেয়েঙে।

—তুম্ মেরী চিজ্ পর হাত লাগ্‌ওয়াওগে তো হাম্ তুম্‌হারী জিন্দগী বরবাৎ কর্ দেউঙ্গী। আচ্ছা খেল্ মিল গিয়া!

সাহেব-ও যেন ভড়কাইয়া গেল। ওয়ারেণ্ট ছাড়া তরুণীর বাক্স সার্চ করা আইন-বিরুদ্ধ। অধিকন্তু, মেয়েটিকে দেখিতে বাঙালীর মত হইলেও তাহার কথা হইতে সাহেব বুঝিয়া ফেলিল-যে সে হিন্দুস্থানী নিশ্চয়-ই। সাহেবের এমন কোন সংবাদ-ও ছিল-না যাহাতে একটি বাঙ্গালী যুবককে এক হিন্দুস্থানী-নারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারে।

পুলিশ বাহিনী কামরা ছাড়িয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল। ভীত আরোহীর দল চৈতন্য ফিরিয়া পাইল।

গাড়ি আবার ছাড়িয়া দিল। এবার সহজ হইয়া উঠিলাম। একটু ঘটা করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে যাইতেছি, এমন সময় বাধা দিয়া তরুণী কহিল, ও থাক্, আপনার ধন্যবাদ পাবার আশায় আর বিপদ ঘাড়ে করিনি।

আমি থতমত খাইয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম—কোথায় যাচ্ছেন? ছোট্টস্বরে উত্তর আসিল—কাছে-ই। এরপর কী জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া তরুণী কহিল—আচ্ছা, আমার পরিচয় পেলে কি সত্য আপনি খুশী হবেন?

—নিশ্চয়-ই। খুব জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম।

এক টুক্‌রো মৃদু-হাসি উহার অধরে ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু করুণতায় তাহা স্তব্ধ! কান্নার দুয়ারে আসিয়া সে স্থবির।

বেদনা পাইলাম। বলিলাম—দিন না পরিচয়?

সে বলিতে লাগিল—থাকি আমি বক্তিয়ারপুর। কোলকাতায় আমার একখানা বাড়ি আছে। এখন আমি পরের ষ্টেশনেই নেবে যাব। কাজ আছে। কোলকাতার ঠিকানা দিচ্ছি। যদি ইচ্ছে হয়, দেখা কোরবেন। হপ্তা-খানেক পরই যাবো আমি সেখানে। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার শুরু করিল—আপনার কিন্তু আমি সব-ই জানি। আপনার কিছু লেখা-ও পড়েছি।...এরপর নিজের মনে মনে-ই কী প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া সে আবার বলিল—আচ্ছা, যা লেখেন তা সত্যি কি বিশ্বাস করেন?—এই যে সমাজ-সংস্কার, নারী-প্রগতি ইত্যাদি?

এমন একান্ত করিয়া প্রশ্ন করিলে উত্তর দেওয়া মুস্কিল। একটু থেমে থেমে বলিলাম—তা', বিশ্বাস না কোরলে কি আর লিখি?

হুঁ, বলিয়া তরুণী বাহিরের চলমান-জগতের পানে বহুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। বুঝিতে পারিলাম-না, অন্তরের কী কথার সঙ্গে তার বুঝাপড়া হইতেছে।

মোটে ভোর হইয়াছে। গাড়ি আসিয়া পরের ষ্টেশনে লাগিতে-ই সে নামিয়া গেল। যাইবার সময় জানাইল সে ছোট্ট একটি নমস্কার। এবার শান্ত, উচ্ছলতাশূন্য তার মুখ। ঝড়ের পূর্ব্বেকার স্তব্ধ, ধীর সমুদ্রের ক্ষুদ্রতম এ-রূপায়ণ।

প্ল্যাটফরমের উপর নামিয়া আবার সে আমার মুখের দিকে তাকাইল। কহিল—খুবই অবোধ্য হয়ে রইলুম আপনার কাছে, ক্ষমা কোরবেন। দেখা হবে তো নিশ্চয়?

নিশ্চয়—উত্তর দিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তরুণী তখন ট্যাক্‌সি আরোহিণী হইয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মন আমার চিন্তার জালে বিজড়িত হইয়া যাইতেছিল। কলিকাতা আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত লুতাতন্তু-বিজড়িত সে-মন কেবল ঘুরপাক-ই খাইতেছিল চিন্তার বন্ধনে-বন্ধনে।

কলিকাতা আসিতেই বিশেষ জরুরী কাজে দেশে চলিয়া গেলাম, ফিরিলাম প্রায় দু-তিন মাস পর। দুর্ভাগ্য-ক্রমে তরুণী-প্রদত্ত ঠিকানাটা-ও হারাইয়া ফেলিয়াছি। অধিকন্তু, নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কাশী-পথের ঘটনাটি একরকম ভুলিতে-ই বসিয়াছিলাম।

প্রায় সাত-আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন কি একটা প্রয়োজনীয় কাজে শর্টকাট্ করিবার জন্য কলিকাতার কুৎসিৎ এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ নারী-কণ্ঠে যেন শুনিলাম—এই তো, এদিকে আসুন...

আমি কোনো দিকে না-চাহিয়া দ্রুতবেগে সুমুখে অগ্রসর হইতে যাইব, এমন সময় আমার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক আসিল। এবার আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, দশাশ্বমেধ-ঘাটের সেই অপূর্ব্ব তন্বী। কাশী ষ্টেশানের সেই প্রগল্‌ভা-তরুণী। গভীর নিশীথের সেই অভয়দাত্রী-কল্যাণী। বিদায়কালের সেই উদাসিনী-অশ্রুমতী।

একটু স্মিত-হাসি বিলাইয়া তরুণী কহিল—আসুন।

আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—এখানে যে? মানে কি?—

—ভিতরে আসুন? সব বলচি।

আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিল। শুধু ভাবিতে লাগিলাম—কেন এ-পথে আসিয়াছিলাম? কেন উহার সঙ্গে দেখা হইল? বক্ষে আমার একদা যে নারী চঞ্চলতা আনিয়াছিল, ভাবনায় যে আগুন ধরাইয়াছিল, পৌরুষে যে বিস্ময় ঘটাইয়াছিল, কাব্য-জিজ্ঞাসায় যে গভীরতার স্পর্শ দিয়াছিল তাকে কিনা আজ এই কুশ্রী পল্লির জঘন্য আবহে দেখিলাম।

গলাটা কাঁপিয়া গেল। আবার একই প্রশ্ন করিলাম—এখানে? আপনি?

তরুণী সহজ করিয়া-ই কহিল—আমি যে এদের-ই। তবে, আমার লজ্জা করার কিছু নেই। কারণ, উদ্ধার পাবার মন্ত্র জেনেছি। আপনাকে তার প্রণামী দেবো আজ—আসুন আমার গৃহে।

আমি উহার কোন কথা-ই বুঝিতে পারিলাম না। বাক্‌হীন হইয়া রহিলাম।

তরুণী কহিয়া চলিল—কুৎসিৎ এই পল্লি। কুৎসিৎ এই নরনারী। এদের মাঝে আলোক-সম্পাত কোরবার ক্ষমতা আমার নেই, ইচ্ছা আমার আছে। আপনাদের লেখা পড়েছি। দেবতা জেগেচে আপনাদের বুকে। পথের অন্ধকারে হোঁচট্ খেয়ে মরছি আমরা। আমাকে আলোক-বাহিনীর মর্য্যাদা দিন। আমি এই অন্ধ-পল্লির গৃহে গৃহে মানুষের মতো বেঁচে-থাকবার সন্ধান দিয়ে যাবো।

আমি নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পর আপন মনেই যেন কহিলাম—আপনি এ-খানে।

তরুণী হাসিল। কহিল—শুধু এখানেই নয়, আমি আপনার সম্পর্কিতা।

আমি চাহিয়াই রহিলাম। বলে কি? সম্পর্কিতা? সে বলিল—মনে পড়ে আপনাদের পাড়ার আদিত্য বাবুর কথা? তাঁর একটি মেয়েকে ছোট বয়সে ছেলেধরায় নিয়ে যায়, আজো খোঁজ হয়নি? আমি-ই সে-রাণু। পনর বছর পূর্ব্বেকার দশ বৎসরের রাণু কি কোরে পঁচিশ বৎসরে পা দিয়ে এই কুৎসিৎ পল্লির পথে আপনার সঙ্গে আজ এমন কোরে কথা কইতে পারলো তা ভেবে আপনি বিহ্বল-বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু তাতে রাণুর সম্পর্ককে সত্যের কাছে অস্বীকার করা চলে না।

আমি নিজেকে একটু সম্বরণ করিয়া কহিলাম—আজকে আমি বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েচি। আমাকে মাপ করুন। এখন থাক্। আর একদিন আসতে চেষ্টা কোরবো।

তরুণী কাতর-দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিল। পরক্ষণেই বক্ষে তার মর্য্যাদার হল্কা লাগিল যেন। দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—তাই নাকি?

ক্ষণমাত্র দেরী না করিয়া উদ্ধত-গর্ব্বে পাশের গলির মস্ত বাড়িটার সে ঢুকিয়া পড়িল। আমি চাহিয়া রহিলাম। তার গতিভঙ্গি হঠাৎ আমার চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিল সে-নিশীথের সেই ছবিখানি, পুলিশ সাহেবের সঙ্গে অভিনব দৃঢ়তায় দীপ্তিময়ী নারীর কথা-কওয়াকওয়ি।

মিনিট দশেক কাটিয়া গেল। দেহটাকে একটা নাড়া দিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। যে-কাজের উদ্দেশে চলিয়াছিলাম তাহা সে যাত্রা মুলতুবী-ই রহিল।

লক্ষ চিন্তা ও যুক্তির সঙ্গে লড়াই করিয়া দুইদিন পর তরুণীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু শূন্য তার অট্টালিকা! শূন্য তার অবস্থিতি। খোঁজ নিলাম,

খোঁজ কেহ দিতে পারিল না। এইটুকু জানিতে পারিলাম যে, বাড়িটার সত্ব নাকি সে চিরতরে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে কোন্ এক অজানিত ব্যক্তিকে।

মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল সংস্কারকে জয়ী হইতে দিয়া মস্ত ভুল করিয়াছি—আমি স্বীকার করিয়া লইলাম।

আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন একখানা রেজিষ্টারী চিঠি আসিল স্থানীয় এক উকিলের কাছ হইতে। চিঠি খুলিয়া দেখি, শিলমোহর করা এক দলিল—বাণু তার সমগ্র সম্পত্তি আমার নামে লিখিয়া দিয়াছে। উদ্দেশ্য, কুৎসিততম পল্লির অন্ধকারে এক টুকরা আলোক-রশ্মিও যাহাতে পৌঁছাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের পথ সুমুখে দেখিতে পাইলাম। সশ্রদ্ধায় তুলিয়া রাখিলাম দলিলখানা।

ইহার পর পৃথিবীর দিগদিগন্তে খোঁজ লইয়াছি। বাণুকে খুঁজিয়া পাই নাই। তাহার ইচ্ছানুরূপ কাজের জন্য ট্রাষ্ট্ করিয়াছি, কাজও অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সে-কাজের খোঁজ লইতে বাণু ফিরিয়া আসে নাই।

তবু আমার খোঁজ লওয়া শেষ হয় নাই। আজ বিশ বছর পরেও নানা কাজের ব্যস্ততা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বহুবার আমি দেশবিদেশে ঘুরিয়া মরি—অন্তস্থলের সকল কামনা দিয়া বাণুকে খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু খোঁজ দিবে-না বলিয়া-ই সে-'পলাতকা', তার সন্ধান কি করিয়া পাইব, বল?

আলবেনিয়া ও উৎকণ্ঠিত ইস্‌লাম

তারাপদ বসু

ইটালী, আলবেনিয়া দখলের সময় আলবেনিয়ার প্রতি যে নির্ম্মম, নির্লজ্জ আচরণের অভিনয় করেছে, তাতে সমগ্র মুসলমানজগৎ আজ বিক্ষুব্ধ। সমস্ত ইউরোপের মধ্যে আলবেনিয়া—ঐ একটিমাত্র ক্ষুদ্ররাজ্য মুসলমানদের অধীনে ছিল। তাও আজ ইটালীর হাতে চলে যাওয়ায়, সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হোয়েছে, যার ফলে, নিকটবর্ত্তী ও মধ্যবর্ত্তী প্রাচ্য দেশস্থিত মুসলমান সম্প্রদায়গুলি এক যোগে ইটালীর এই বর্ব্বরোচিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, তাকে 'বয়কট' ক'রবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছে। গ্রেট্ ব্রিটেনের মুসলিম্ সোসাইটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ও প্যারিসে অবস্থিত আরব-সঙ্ঘগুলি, আলবেনিয়ার প্রতি ইটালীর এই অতর্কিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা ক'রে তাকে বয়কট ক'রবার প্রস্তাব পাশ কোরেছে। সিরিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেমিল মারডম (Jemil Mardam) ইটালীর এই আক্রমণকে পাশবিক অত্যাচার ব'লে মনে করেন। বাংলার স্বরাষ্ট্র-সচিব নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকেও এর প্রতিবাদ গিয়েছে। জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমানও বোলেছেন, মুসোলিনী যেন ভবিষ্যতে আর নিজেকে 'মুসলমান ধর্ম্মের রক্ষক' ব'লে ভণ্ডামী না করেন। ইজিপ্টে এর প্রতিক্রিয়াই উল্লেখযোগ্য, কারণ ইজিপ্টের মেহেমেদ আলী (Mehemed Ali) স্বয়ং আলবেনিয়ার বংশসম্ভূত।

গত কয়েক বৎসর ধরেই ইটালী মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু আলবেনিয়ার ব্যাপারেই তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই লিবিয়া ও ইথিয়োপিয়ার শাসন ব্যাপারে ইটালী যে রকম কঠোর নীতি অবলম্বন ক'রেছিল

তার থেকেই তার প্রচার কার্য্যের যথার্থ মর্ম্ম কারুর বুঝ্‌তে বাকী ছিল না। তবুও তার তরফ থেকে প্রচারকার্য্যের ত্রুটি হয়নি। সেই জন্যই ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে টালরাউকে (Talrouk) মুসোলিনী বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। তারই কিছুদিন পরে, তিনি নিজেকে 'মুসলমান ধর্ম্মের রক্ষক' ব'লে প্রচার করবার জন্য একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেই অনুষ্ঠানে মুসলমানদের কাছে ফ্যাসিষ্ট নীতির বিশ্লেষণ ক'রে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলেন যে, ফ্যাসিষ্ট ইটালীর উদ্দেশ্য হ'ল লিবিয়াতে ন্যায়, শান্তি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা এবং সমগ্র মুসলমান জগতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া।

মুসোলিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যে দুইটী প্রবল পাশ্চাত্য রাজশক্তি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার কোরেছে, তাদের এই ক্ষমতা বিস্তারে বাধা দেওয়া। সেইজন্য বেতারে পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্যে বেশ ভাল রকমেই প্রচারকার্য্য চালিয়েছিলেন। ভারতবাসীদের কাছে তাদের মুক্তিদাতা ব'লে জাহির করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিরিয়া ও মরক্কোর মত এখানেও তাকে নিরাশ হ'তে হয়েছিল। ভারতবাসী তাঁর সেই আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হ'য়ে তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারেনি। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে লিবিয়ার শাসন ব্যাপারেই ইটালীর স্বরূপ উদ্ঘাটন হ'য়েছিল,তাই ইজিপ্টের Wafd-el-masri নামে একটি দৈনিক থেকে আমরা জানতে পারি ইটালী কোন্ নীতি অবলম্বন ক'রেছে। পত্রিকাটি বলেছে—ইটালীতে যারা উপনিবেশ স্থাপন ক'রে আছে তাদের কাছ থেকে বলপূর্ব্বক জমি বে-দখল ক'রে নেওয়া হোয়েছে। লিবিয়াতে আরবদের জন্য বন্দীশিবির স্থাপন ক'রে, লিবিয়াবাসীদের ইথিয়োপিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য জোর করা হয়। আরবদের প্রতি ইটালীর নৃশংস ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবদের হোটেলে ঢোকবার অনুমতি নেই। তারা কোনো বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পায় না। ইটালীয়নদের কাছে ত্রিপোলিটান সৈন্যদের ইউগাস থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের কোনো মূল্যই নেই। উপরন্তু তাদের নেতা Omar Moukhter কে বিমান পোত থেকে ফেলে দিতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁর দেহ যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়েছে, অট্টহাস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যু তারা উপভোগ ক'রেছে। আর এই সব করাই হ'ল সভ্য ইটালীর নীতি।

ইটালীর সংবাদপত্রসমূহ এই ঘটনাগুলির প্রতিবাদ ক'রেনি। এদিকে আলবেনিয়ার প্রতি ইটালীর এই রকম নৃশংস অত্যাচারের পর, ইজিপ্ট-লিবিয়া সীমান্তে ফ্যাসিষ্ট শক্তির সৈন্যসমাবেশ দেখে ইজিপ্টবাসী আজ বিশেষ শঙ্কিত

নিউইয়র্কের Stock Exchange মার্কেটকেই এই যুদ্ধ-ভীতির জের সবচেয়ে বেশী পোহাতে হ'য়েছে। যদি০ বেচা-কেনা একেবারে বন্ধ হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসের নিকট থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে, প্রায় বছর খানেক কিম্বা তারও বেশীদিন ধ'রে প্রধান প্রধান Stock-গুলির মূল্য খুব কমে গিয়েছিল।

ট্রিবিউন পত্রিকা একটি গল্প তুলে দিয়ে জানিয়েছেন যে, আলবেনিয়ার রাজ-কর্ম্মচারী মহলে প্রচার যে রাজা Zog পালাবার সময় প্রায় ১৬,০০০ পাউণ্ড দামের সোনা নিয়ে গেছেন। মস্কোর সরকারী পত্রিকা 'Izvestia' এই অভিমত পোষণ করে যে ইটালী ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক যুগোশ্লাভিয়া ও ইংলণ্ডের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন ক'রতে চায়। কাজেই আক্রমণকারীদের দমিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন সমস্ত শক্তিগুলির মধ্যে একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা।

আলবেনিয়ার ব্যাপারেই মুস্‌লিম্‌জগতে ইটালীর সম্ভ্রম অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গেল। ইটালী যে ভাবে সেই ছোট্ট অরক্ষিত রাজ্যটিকে আক্রমণ ক'রেছিল এবং তার জন্য আলবেনিয়ার রাজা-রাণীকে যে ভাবে পালাতে হোয়েছে, যে ভাবে সে Durazzor এবং Valonar উপরে বোমা বর্ষন ক'রেছে, যে ভাবে রাজা Zog-কে অপমানিত ক'রে আলবেনিয়াতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ক্রীশ্চানদের সাহায্যে শাসন-কার্য্য চালিয়ে আলবেনিয়াবাসীদের ক্রীড়নক বানিয়ে রেখেছে, তাতে ইটালীয়ানদের এখনও যারা "মুসলমান ধর্ম্মের রক্ষক" ব'লে মনে করে, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, Protection-এর নাম দিয়ে দুর্ব্বল জাতিকে পদ-দলিত করাই হ'ল সভ্য ইটালীর নীতি।

কবি পুশ্‌কিনের প্রতি

টুর্গেনিভ্—**বিমল বসু**

[রুস-সাহিত্যে যাঁরা যুগান্তর এনেছিলেন তাঁদের ভিতর কবি পুশকিন একজন। তাঁর মতো রুশ সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ পূর্বে বা পরে কেউ করেন নি। ইনি আধুনিক সাহিত্যিক ভাষার স্রষ্টা ক'রেছিলেন। এর জন্ম হ'লো ১৭৯৯, আর মহাপ্রয়াণ গ্রহণ ক'রেছিলেন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সের ভিতর অসামান্য প্রতিভায় রুশ সাহিত্যকে সমস্ত দিক দিয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তাঁর দেশ-স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখা, তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমস্ত সাহিত্য রচনার ভিতর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় রাশিয়ার জনসাধারণ তাদের জাতীয় কবিকে দেয়নি সম্মান ও শ্রদ্ধা—অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণায় তারা মুখ ফিরিয়েছিল। টুর্গেনিভ্ রাশিয়ার জাতীয় কবি পুশকিনের অবমাননা দেখে তাঁর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রেছিলেন—তা হ'লো এই : "Poems in prose"-এর অনুসরণে]

হে আমাদের জাতীয় কবি।
তুমি বলেছিলে, বার বার বলেছিলে—
মূর্খের মূঢ় বিচার তোমাদের মানতে হবে,
—এই চরম সত্যের বাণী কবিতার ছন্দে
তুমি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে।
—কিন্তু আমরা সে-কথা শুনি নি।
কিন্তু মূর্খের মূঢ় বিচার আর জনতার কটূক্তির কথা
কে না জানে।
দেহ যে আঘাত পায়, সে-আঘাত
অন্তরে গিয়ে অকরুণ হয়ে বাজে,
অন্তর তাই বেদনায় নীল হয়ে ওঠে।
একটী মানুষ, যে-দেশের জনসাধারণের মুখ চেয়ে
নিজেকে দিয়েছে আহুতি নানাভাবে, নানারূপে।
তারই কাছ থেকে তারাই সরে গেছে
ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছে—
দূর হয়ে যাও তুমি,
আমাদের কোন প্রয়োজনে আসবে না,
না তুমি, কিম্বা তোমার কাজ।
আমাদের দেশকে কলঙ্কিত করেছ তুমি
আমরা চিনি না তোমাকে
তুমিও চেনোনা আমাদের!
তুমি ভণ্ড
তুমি প্রতারক
তুমি আমাদের শত্রু,
দূর হ'য়ে যাও তুমি—
তোমাকে আমরা চাই না।
যে-লোক নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি,
করেনি কোন প্রতিবাদ,
ন্যায় বিচারের আশায় তাকায়নি
কারুর মুখের পানে।
নীরবে সে কাজ করে গেছে
তাদের মুখের দিকে চেয়ে
যারা তাকে কটূক্তি ক'রেছে, ক'রেছে অসম্মান!
নামে কি প্রয়োজন?
সেই পথিক-বন্ধু নামহীন হ'য়েও
বুভুক্ষা থেকে রক্ষা ক'রেছিল এদের।
আমরা যা দিতে চাই তাই যেন এদের কাম্য হয়।
হে কবি,
তুমি যাদের ভালবাস্‌তে
তারাই তোমায় ঘৃণা ক'রেছে
গরল উদ্গার ক'রেছে সেই মুখে,
যে-মুখ তোমার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন ছিল

এই ঘৃণা, অপমান, কটূক্তি
সব সহ্য করা যায়
আমরা যা চাই, তাই যেন এরা হয়।

"আমায় আঘাত ক'রছো করো,
কিন্তু আমার কথা শোনো"
—এ-কথাই স্পার্টানদের শুনিয়েছিলে।

এথেন্সের নেতৃবর্গ।

—আমরা সে কথাই বলি।

তুমিও বার বার সে-কথা বলেছিলে
কিন্তু এরা শোনে নি।

তুমি বলেছিলে—
"আমায় আঘাত ক'রছো করো,
কিন্তু পেটপুরে যেন খেতে পাও
আর,
মানুষের মতো বাঁচ্‌বার চেষ্টা ক'রো"
হে আমাদের জাতীয় কবি,
তোমায় নমস্কার।

ইউরোপীয় পরিস্থিতি

নির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত

১৯১৯ সালে ভার্সাইতে বিজিত জার্ম্মানীর উপর যে ক্রুদ্ধ আক্রমণ জয়ী-শক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারই প্রবল প্রতিক্রিয়া আজ জার্ম্মানীকে ইউরোপে মৃতপ্রায় গণতন্ত্রের উপর তার বিজয় অভিযান অবাধে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম ক'রেছে। ১৯১৯ সালে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হবার পরেই সমস্ত শক্তিবর্গের ফ্রান্সে এক সম্মেলন হয়। উদ্দেশ্য ছিল জগতের লুপ্ত-প্রায় শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে ধনিক-শ্রেণীর আওতায় গঠিত তখনকার তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভিতরে শান্তি সম্বন্ধে কোনও রকম উচ্চতর আদর্শবাদ গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। জনসাধারণের মনে ধনিকদিগের প্রচার ফলে এক অতি সঙ্কীর্ণ ধরণের জাতীয়তাবাদ বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছিল, যার মূল ভিত্তিই হ'ল অপর রাষ্ট্রগুলিকে যথাসম্ভব ফাঁকি দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এদিকে দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে সমস্ত দেশগুলিই রণ-ক্লান্ত ও শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও কদর্য্যতা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই অত্যন্ত সচেতন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রতে হ'লে যে বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে জাতিগত বিরোধের কারণটাকেই সমূলে তুলে ফেলা দরকার, সে সম্বন্ধে কোন সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় হয়নি। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধের কারণ যে, ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত এবং সমাজের শ্রেণীগত বিরোধের বিলোপ ছাড়া কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় বিরোধ এড়ান যায় না—এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে জনসাধারণের চোখ খুলে দেওয়া হয়নি। কাজেই ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার জনসাধারণ যুদ্ধের সমস্ত কদর্য্যতা ও বীভৎসতার জন্য নির্ব্বিবাদে একমাত্র জার্ম্মানীকেই দায়ী সাব্যস্ত ক'রলো। জার্ম্মানী সম্বন্ধে জনমত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠলো। স্বভাবতই সন্ধির নামে জার্ম্মানীকে একটা কঠোর শাস্তি দেবার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে দেখা দিল। এ-অবস্থা আর যাই হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ধির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। বাস্তবিক পক্ষে ঘটলও ঠিক তাই। সম্মেলনে বিজিত-শক্তি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার, প্রধান লক্ষ্য রইলো জার্ম্মানীর সামরিক শক্তিকে এরূপ ভাবে

খর্ব্ব করা, যাতে সে আর কখনও তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস না করে, যুদ্ধে জয়ীর পুরস্কার হিসাবে জার্ম্মানীর অধীনস্থ প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা ক'রে নেওয়া এবং যুদ্ধের খরচ হিসাবে জার্ম্মানীর নিকট আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করা। এই অনুসারে ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত হ'ল যে, জার্ম্মানীর সৈন্যদলে ১০,০০০,০০-এর বেশী সৈন্য থাকবে না, তার আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিত রণপোতের সংখ্যা অনেক কমাতে হবে এবং জার্ম্মান-বাহিনীর অন্তর্গত কোন বিমান-বাহিনী থাকবে না। দ্বিতীয় কথা, আলাস্কা প্রদেশ ফ্রান্সকে, সার প্রদেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে, ড্যানজিগ ও পোলিশ করিডর সহ ১৭,০০০ বর্গ মাইল পোল্যাণ্ডকে এবং বাণিজ্যগত সুবিধা মিত্র-শক্তিগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। এই ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মানীকে সর্ব্বসমেত ২৬,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ জায়গা ও ৬০,০০০,০০ অধিবাসীকে পরের হাতে তুলে দিতে হ'য়েছে। এই ভাবে জয়ী শক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষ সন্ধির নামে তাদের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতে প্রয়াস পায়। ভার্সাই সম্মেলনে মিলিত মিত্র-শক্তিবর্গ দ্বারা যে হিংসার বীজ ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে উপ্ত হয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিহিংসার বিষবৃক্ষ পল্লবিত হ'য়ে ইউরোপের রাষ্ট্র-গগনে তমসাচ্ছন্ন ও বিভীষিকাময় ক'রে তুলেছে। সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শান্তি-প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হ'য়ে রইল।

এদিকে জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তখন অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ ক'রেছে। জার্ম্মানীর রাষ্ট্রতন্ত্রের অবসানের পর যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ ক'রলে। সভাপতি এলবার্ট উইমারের প্রধানতম কর্ত্তব্য হ'ল যুদ্ধ এবং অন্তর্বিপ্লবে দেশের মধ্যে যে অরাজকতা ও অশান্তি দেখা দিয়েছে তা দূর করা এবং সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কাজ করা। মার্শাল ভন্ হিণ্ডেনবার্গের অধীনস্থ প্রত্যাগত সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। লক্ষ লক্ষ লোক যারা ১৯১৪ সালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, তারা ঘরে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করলে; কিন্তু তাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোকের কাজ যোগান সম্ভব হ'লো না। জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্য তখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে। দীর্ঘ দিন ব্যাপী অবরোধের ফলে খাদ্যাভাব অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ ক'রেছে। সদ্য প্রত্যাগত নিষ্ঠুরতার তালিম দেয়া সৈন্যদল খাদ্যাভাবে, কর্ম্মাভাবে ক্ষীপ্তপ্রায় হ'য়ে অবাধে লুণ্ঠন, হত্যা লীলা, ধ্বংস-লীলা চালাতে লাগলো। দেশের অরাজকতা চরম সীমায় এসে পৌছল। উইমার গভর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ হ'লো এ-অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধের সময় যুদ্ধোপকরণ কেনবার জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হওয়ায় দেশে বিনিময় মুদ্রার অভাব দেখা দিলো। এই অভাব মেটাতে গভর্ণমেণ্টকে কৃত্রিম উপায়ে বিনিময় মুদ্রা বাড়াতে হ'লো। যুদ্ধ শেষ হবার পরও সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জয়ী শক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অধিকতর স্বর্ণের প্রয়োজন হ'লো। গভর্ণমেণ্টকে আরও কাগজের নোট বাজারে চালিয়ে স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ ক'রে বিদেশের হাতে তুলে দিতে হ'লো। ফল দাঁড়াল এই যে, কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত টাকার আধিক্যে টাকার মূল্য কমতে লাগল। পরন্তু দেশের অরাজকতা ও গভর্ণ-মেণ্টের আর্থিক অবনতি স্বভাবতই জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে দিল যে, নোটের বিনিময়ে উপযুক্ত স্বর্ণ গভর্ণমেণ্ট কোনও দিনই দিতে পারবে না। এইরূপে জার্ম্মানীর মুদ্রা-বিনিময় বাজার একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়ে পণ্য-বিনিময় আরম্ভ হ'ল। বাস্তবিকপক্ষে জার্ম্মানীতে ১৯২৩ সালে ৫ শিলিং-এর বিনিময় ২,৫০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক পাওয়া যেত। কাজেই জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার খুব সহজসাধ্য ছিল না।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর ইতিহাস লুপ্তপ্রায় জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯২৪ সাল থেকে জার্ম্মানীর নবযুগের সূচনা হয়। ১৯২৪ সালে জেনারেল ডয়েজ-এর সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জার্ম্মানীকে তাহার মুদ্রা-বিনিময় বাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ ধার দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এই কমিটির

পরামর্শ অনুযায়ী ফ্রান্স Rhur প্রদেশ থেকে তার সৈন্যদল অপসারিত করে। ফলে জার্ম্মানীর মুদ্রার বিনিময় মূল্য বেড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ১৯২৫ সালে এলবার্ট উইমারের মৃত্যুতে ভন্ হিণ্ডেনবার্গ সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন। তার খ্যাতি জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে অশান্তি দূর করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই বছরই বর্ত্তমান জার্ম্মানীর সাত কোটী অধিবাসীর নায়ক ও ইউরোপের ভাগ্য-নিয়ন্তা এড্লভ্ হিট্লারের অভ্যুত্থান সূচিত হয়।

১৯২০ সালে একটি ক্ষুদ্র দলের নায়ক হিসাবে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিট্লারের প্রথম প্রবেশ। ১৯২৩ সালে এঁরই নেতৃত্বে মিউনিক-বিদ্রোহ ঘোষিত ও অবশেষে পরাজিত হোয়েছিল। এই বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়। এই সময়ই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'My Struggle' রচনা করেন। ১৯২৫ সালে তিনি "জার্ম্মানদিগের জন্যই জার্ম্মানী" এই নীতিতে তার ভাঙ্গা দল পুনর্গঠিত করেন। এবং রিচ্ষ্ট্যাগে ৩২টী আসন দখল করেন। ১৯৩০ সালে এই দল ১০৭টী আসনের অধিকারী হয় এবং ১৯৩২ সালে হিট্লারের মতানুবলম্বী লোকের প্রভাব এত বেড়ে যায় যে, তিনি সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রবল পরক্রান্ত ভন্ হিণ্ডেন-বার্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। হিট্লার এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে শতকরা ৩৭টী ভোট পেয়ে পরাজিত হন। তাঁহার নেতৃত্বে নাজী পার্টি তখন রিচ্ষ্ট্যাগে ২৩০টী আসন দখল ক'রেছে। আইনসভার বৃহত্তম দলের নায়ক হিসাবে তিনি জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার (প্রধান মন্ত্রী) নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালে রিচ্ষ্ট্যাগ পার্লামেণ্ট গৃহ ভস্মীভূত হয়। হিট্লার এঁর জন্য নির্ব্বিবাদে বিরোধীদলগুলিকে দায়ী করলেন, ও এই সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদী দলনে অগ্রসর হোলেন। বহু জনপ্রিয় নেতাকে এই ব্যাপারে বিনা বিচারে নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ড গ্রহণ করতে হ'লো। এইরূপে হিট্লারের জয়যাত্রার পথ সুগম হয়। হিট্লারের সমর্থনে তখন আইন সভায় ২৮৮টী হস্ত একযোগে উত্তোলিত হয়। এর পর ১৯৩৫ সালে হিণ্ডেন-বার্গের মৃত্যুতে হিট্লার Chancellor পদের সঙ্গে সঙ্গে সভাপতির পদও গ্রহণ করেন। এবং জার্ম্মানীর একচ্ছত্র নায়ক হ'য়ে দাঁড়ালেন। এই বিপুল ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বে-আইনী ব'লে ঘোষণা কোরলেন। আইন ক'রে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হ'লো। হিট্লার বা নাজী দলের সমালোচনা মাত্রই বিদ্রোহ ব'লে বিবেচিত হোতে নাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধন ক'রে দরিদ্র জনসাধারণকে ভুলিয়ে তাদের সমর্থন আদায় কোরলেন। এই ভাবে হিট্লার দেশের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার কোরলেন।

ঘটনা বিশ্লেষণ কোরলে হিট্লারের সাফল্যের দুটী প্রধান কারণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভার্সাই সন্ধির ফলে জনসাধারণ জার্ম্মানীকে বঞ্চিত ব'লে মনে কোরতে থাকে। অন্যান্য শক্তিবর্গ জার্ম্মানীকে ধ্বংস করবার জন্য চক্রান্ত ক'রে জার্ম্মানীর কাছ থেকে অনেক অন্যায় সুবিধাও আদায় কোরেছে ব'লে জনসাধারণের মনে প্রবল জাতীয়তা বোধ জাগরিত হয়। এই জন্যই জার্ম্মানদের জন্য জর্ম্মানী নীতিতে গঠিত নাজিদল এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ তমসা-রজনীর অবসান সূচিত ক'রে জার্ম্মান রাষ্ট্র-গগনে প্রভাতের আলোক-রশ্মির আভাস স্বরূপ হিট্লারের আগমন জনগণ একান্ত-ভাবে বাঞ্ছিত ব'লে মনে কো'রলে। হিট্লারের আসন জনগণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লো।

নাজী দলের পঁচিশ দফা সম্বলিত কর্ম্মসূচীতে মোটামুটী দুটী ভাগ দেখা যায়। প্রথম ভাগ, স্বরাষ্ট্র সম্পর্কিত। যথা, সমস্ত বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন ক'রে, সমগ্র জার্ম্মানীকে এক দলের অধীন করা। উইমার গণতন্ত্র ধ্বংস ক'রে জার্ম্মানীকে এক-নায়কাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। কৃষক ও মজুরদের কিছু সুবিধা দেবার জন্য ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার সাধন করা। দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে বর্ত্তমান জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রনীতি গঠিত হ'য়েছে। এদিক দিয়ে হিট্লারের পরিকল্পনা এক অখণ্ড প্যান-জার্ম্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা; যার ছত্র-

ছায়াতলে বাস কোরবে সম্পূর্ণরূপে বিদেশের প্রভাব-বর্জ্জিত এক অখণ্ড জার্ম্মান জাতি। অভিলাষ পূরণের প্রথম অধ্যায় রূপে হিট্‌লারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হ'লো সামরিক বিধি ও উপনিবেশ সম্পর্কিত ভার্সাই সন্ধির ধারাগুলি পরিবর্ত্তিত করা। সামরিক বিধিনিষেধগুলি হিট্‌লার শক্তি-বর্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোরেই অমান্য কোরতে আরম্ভ কোরলেন। ১৯৩৫ সালে জার্ম্মান বিমান-বাহিনীর অস্তিত্ব ঘোষিত হ'লো—জার্ম্মানদের সৈন্যদলে যোগ দেবার আইন (Conscription) তৈরী হ'লো এবং রাইনল্যাণ্ডে পুনরায় সৈন্য সজ্জিত হ'লো। ১৯৩৮ সালে অষ্ট্রিয়া অধিকার ও রিচ্‌ষ্ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত কোরে হিটলারের বিজয় অভিযান সুরু হ'লো, সেই বছরই জেকোশ্লোভাকিয়া নাজী অধিকারে আসে। ১৯৩৯ সালে মেমেলে নাজী বিজয় পতাকা উড্ডীন হ'লো। লক্ষ্য কোরবার বিষয় যে, যে সব শক্তিবর্গ ১৯১৯ সালে জার্ম্মানীর উপর তাদের ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কোরতে তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরবার ষড়যন্ত্র কোরেছিল, সেই সেই শক্তিবর্গই আজ প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর জার্ম্মানীর আক্রমণ নির্ব্বিবাদে পরিপাক কোরে জার্ম্মানীকে তুষ্ট করার নীতি অবলম্বন কোরেছে। জার্ম্মানীর লুব্ধ ও অপ্রতিহত দৃষ্টি এবার বল্কান রাষ্ট্রগুলির উপর নিবদ্ধ হোয়েছে এবং তারই উপক্রমণিকা স্বরূপ Danzig ও Polish Corridor দাবী আরম্ভ কোরেছে।

এদিকে রাশিয়ার বলশেভিকদের সাফল্য ইউরোপের অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মনে এক বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছে। কাজেই জার্ম্মানী ও ইটালীর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মনোবৃত্তিকে সকলে পরোক্ষভাবে সাহায্যই কোরে এসেছে। কিন্তু এই নীতি ইউরোপের গণতন্ত্রের আদর্শকে সমাধিস্থ কোরতে সাহায্য কোরেছে। এতদিন পরে বৃটেন ও ফ্রান্স এ-বিষয় একটু সচেতন হ'য়েছে।

কিন্তু ক্ষুদ্র জেদের বশবর্ত্তী হ'য়ে বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হোতে যদি বিফলকাম হয় ও সম্মিলিত শক্তি নিয়ে জার্ম্মান-ইটালীর সম্মুখীন হোতে অসমর্থ হয়, তবে জার্ম্মান-ইটালীর রাজ্যলিপ্সার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হোয়ে ইউরোপের 'গণতন্ত্র' ঐতিহাসিক অতীতে পর্য্যবসিত হবে।

জীবনে জেগেছিল মধু-মাস

দেবাংশু সেনগুপ্ত

(বড়ো গল্প)

রাত থাকতে গিয়ে ষ্টেশনে হাজির হোতে হবে এই চিন্তায় লোপেজের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সাধারণতঃ তার ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হোতো। মামা প্রিম্ অনেকবার কোরে বোলে দিয়েছেন, ষ্টেশনে অবশ্য অবশ্য যেতে, ঠিক সময় যদি ঘুম না-ভাঙ্গে, এই চিন্তাটা লোপেজের মনে ক্রমেই প্রবল হোয়ে উঠছিল।

মামা প্রিম্ ছিলেন স্থানীয় স্পেন গভর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিসের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে জোভেলার ছিল অলস, অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন। পড়াশুনা শেষ কোরে অনেকদিন যাবং বাড়ীতেই ছিল, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কোরতে বোললে শুধু এখানে সেখানে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতো পরিশ্রান্ত হবার ভান ক'রে। মেয়ে ইসাবেলা মাদ্রিদে থেকে পড়তো, সম্প্রতি সে বাড়ী এসেছিল। ইসাবেলা ছিল ভীষণ বদ্ মেজাজী, রুক্ষ-ভাষী এবং একগুঁয়ে। তার যখন যা খুশী হোত তা' ক'রতোই। প্রিম্ ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন আশ্চর্য্য রকমের ভাল লোক। লোপেজ তাদের বহু দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, কিন্তু যখন তাঁরা লোপেজের বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পারলেন, তখনই প্রিম্ নিজে গিয়ে ভাগ্নেকে নিয়ে এসে কিছু দিনের চেষ্টায় ছোটখাট একটা হোটেলের ম্যানেজারী যোগার ক'রে দিলেন। ভাষায় বলতে গেলে লোপেজ দেখতে তেমন সুন্দর ছিল না, কিন্তু তার চমৎকার স্বাস্থ্য ও সুন্দর কথা-বার্ত্তার জন্য লোকে খুব তাড়াতাড়ি তার প্রতি আকৃষ্ট হোতো। এদিকে সে লেখাপড়ায় যেমন ভাল ফল দেখিয়ে ছিল, কাজ-কর্ম্মেও ঠিক ছিল তেমনি চতুর। প্রিম্ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, স্নেহ তাঁর অপাত্রে পড়েনি, নিজের ছেলের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র উচ্চ ধারণা না থাকাতে লোপেজকে তিনি ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতে লাগলেন।

কিন্তু লোপেজ সম্বন্ধে একটা বিষয় তার মামা কোন দিনই জানতেন না। জানলে তিনি তাকে ঠিক কি রকম চোখে আবার দেখতে সুরু কোরতেন নিশ্চয় কোরে কিছু বলা যায় না। প্রিমের সাম্যবাদ ভীতি বড় প্রবল ছিল, কিন্তু লোপেজ বয়সে তরুণ হোলেও সাম্যবাদীদের মধ্যে সে ছিল একজন নেতৃ-স্থানীয়। দিন-রাতের মধ্যে যতটুকু সময় সে পেতো—গণ-জাগরণের চেষ্টায় সে ব্যাপৃত থাকতো, অবসর বিনোদনের অপর কোন পন্থা তার জানা ছিল না।

এই সব কারণে এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জন্য বাড়ীতে এবং বাইরে সর্ব্বত্রই সকলে লোপেজকে খুব ভালবাসতো এবং বিশ্বাস কোরতো। প্রিম্ জানতেন, আর যাকেই তিনি ষ্টেশনে যাবার ভার দেন, হয় সে ঘুম থেকে অতো সকালে উঠতে পারবে না, নয় তো ভুলেই যাবে—এ রকম সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে, কিন্তু লোপেজকে কাজের ভার দেওয়া মানে নিশ্চিন্ত হওয়া। অনেক রাতে যখন লোপেজের ঘুম এলো তখন এক সকালে ওঠা ছাড়া তার মনে আর কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর ওপর সে একটা ভাল ধারণা নিয়েই চোখ বুজলো।

ভয়ে ভয়ে সে যখন চোখ খুলে দেখলো, তখনও খানিকটা রাত আছে। ঘড়িটা তাড়াতাড়ি হাতে বেঁধে নিয়ে, ওভার কোটটা চাপিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটে চললো। সেভিল ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের এক প্রান্তে লোপেজ পা'

দিয়েছে অমনি অপর প্রান্ত দিয়ে ট্রেনখানি এসে ঢুকলো। মনে মনে সে ভাবছিলো, "ভাগ্যিস্ দেরী হ'য়ে যায় নি।" ট্রেণ থেকে লোক নাব্‌ছে, লোপেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলো। একটী বৃদ্ধের সঙ্গে দুটি তরুণী, নিশ্চয়ই এরা। লোপেজ সটান এগিয়ে গেল, 'আপনারা কি ডন্‌জুয়ান প্রিমের বাড়ী যাবেন ?"

বৃদ্ধ যেন অকূলে কূল পেলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না ?"

"ডন প্রিম্ আমার মামা, একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে, আমি একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে আস্‌চি চট্ ক'রে।"

গাড়ীতে লোপেজ বোসলো বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধই কথা আরম্ভ কোরলেন—"তোমাদের এখানকার মেলা আরম্ভ হোতে আর তো মাত্র সাত দিন বাকী, কেমন ?" লোপেজ বুঝলো যে তা হোলে এরা সেভিলের বিখ্যাত মেলা দেখতেই এসেছে এখানে। সে বাড়ীর কোনও খবর রাখতে কখনও চেষ্টা কোরতো না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতো না কখনও। সকলের কথাবার্ত্তার মারফৎ যতটুকু বুঝতে পারতো তাতেই বেশ সন্তুষ্ট থাকতো।

বৃদ্ধ আবার আরম্ভ কোরলেন—"আমার এই মেয়ে দুটী কোন দিন সহর দেখেনি, এই মেলাটা উপলক্ষ্য ক'রেই নিয়ে এলাম, তারপর তোমার মামা ওদের মেসোও আছেন এখানে।" লোপেজ মেয়ে দুটিকে এবার একটু ভাল ক'রে দেখলো, তারা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এবং খুব নির্লিপ্ত ভাবেই বসেছিল। লোপেজ একটু কৌতুক অনুভব ক'রে মনে মনে বললো, যতই না কেন গম্ভীর হ'য়ে বিজ্ঞতার ভান করো, তোমরা যে গ্রাম থেকে আসছো আর কিছুই জান না এবং বোঝ না, তা তোমাদের একবার মাত্র দেখলেই বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক কোরে ফেললো যে, এই মেয়ে দুটীর গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে কি আছে তা তাকে জানতেই হবে।

বড় মেয়েটীর নাম ইউজিন, ছোটটীর নাম ম্যারিয়া। প্রথম কয়েকদিন তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হোয়েছিলো। ইসাবেলা এতো বড় সহরে থাকে—তায় অহঙ্কারী। ইউজিন আর ম্যারিয়াকে দেখে প্রথম থেকেই নাক সিঁটকোতে সুরু করলো। সে নিজেতো তাদের সঙ্গে মিশতোই না, এমন কি লোপেজ আর জোভেলারের ওপরেও সে কড়া আদেশ জারী কোরলো, ওদের সঙ্গে তারা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবে না। জোভেলার এ-সব বিষয়ে অনেকটা তার বোনেরই পুরুষ-সংস্করণ ছিল, সুতরাং তাকে নিয়ে ইসাবেলার কোন অসুবিধেয় পড়তে হোল না। লোপেজ কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলো। একে তো সে সাম্যবাদী মানুষ, ধোপা, মুচি, শ্রমিক সকলেই তার কমরেড্। কেবল মাত্র গ্রাম্যতার অপরাধে ইউজিন আর ম্যারিয়াকে সে তো দূরে রাখতে পারবেই না, তার ওপর আবার তাদের দেখা মাত্রই সে তাদের মনের ভেতরটা জানবার জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা কোরে ব'সে আছে।

তরুণ-তরুণীদের মনের পক্ষে ১৮৯৭ সালের মাদ্রিদের আবহাওয়া ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, তারপর ইসাবেলাও কোন দিন ভাল মেয়ে ব'লে পরিচিত হ'তে ব্যাগ্র ছিল না। অনাবিল আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিলে কেউ সোসাইটি-লেডী খেতাব পেতে পারতো না। ইসাবেলা ছিল এমনি একজন সোসাইটী-লেডী। লোপেজ প্রথম দৃষ্টিতেই ইসাবেলার সুনজরে পড়ে গেল, এবং ইসাবেলা তাকে গভীর ভাবে ভালবাসতে সুরু কোরলো। তার গায়ে পড়া ব্যবহারে লোপেজ যারপরনাই বিরক্তি অনুভব ক'রতো, সদাশয় মামার মনে কষ্ট দেবার আশঙ্কায় সে মুখে কিছু বোলতো না।

ইসাবেলা শুধু হুকুম জারী ক'রেই নিশ্চিন্ত ছিল না। লোপেজকে ইউজিন কিংবা ম্যারিয়ার সঙ্গে কথা বোলতে, এমন কি তাদের সঙ্গে তাকে একঘরে দেখলেও ইসাবেলার এমনই চক্ষু-শূল হোত, লোপেজকে ওদের কাছ থেকে যতক্ষণ না দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো ততক্ষণ তার শান্তি ছিল না। অবশেষে মেলা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই ইসাবেলাকে মাদ্রিদের কলেজ হোষ্টেলে ফিরে যেতে হোল। ইউজিনও তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল তার বিয়ের সব ঠিকঠাক হচ্ছে এই খবর পেয়ে। ঘটনা-চক্রে শুধু ম্যারিয়াই রইলো সেভিলে।

এবার লোপেজের সঙ্গে ম্যারিয়ার ভাল ক'রে আলাপ হোল। একদিন সকালবেলা লোপেজ তার মামার বৈঠকখানায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, ম্যারিয়া তার হাতের বোনা নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চুপচাপ ব'সে ছিল, হঠাৎ ব'লে উঠলো "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ডন মোরেট্ কি বোলেছেন, দেখি, দেখি, ও-টাও তো পাতাটা।" নিজের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে লোপেজের বেশ একটু গর্ব্ব ছিল, ম্যারিয়াও এত দূরের লেখা পড়তে পারে দেখে সে বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হোল,—"এত দূরের লেখা তুমি পড়তে পার নাকি ?"

"হ্যাঁ, আরও অনেক দূরের লেখাও পারি।"

লোপেজ চেয়ার সরিয়ে নিয়ে আরও কিছুটা দূরে গিয়ে ব'সে বললো—"পড়তো এখন।"

"স্পেনের অস্ত্র-শক্তির অভাব, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্বন্ধে স্পেনের সম্পূর্ণ অসমর্থতা, ডন মোরেটের ভোটে পরাজয়, যুদ্ধ ঘোষণা"

লোপেজ ম্যারিয়ার চোখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলো। অতি সুন্দর, ভাসা ভাসা সবল দুটী চোখ। ম্যারিয়াকে লোপেজের অত্যন্ত ভাল লাগতে আরম্ভ কোরলো, ওদের আলাপ আর বন্ধুত্বের এখন আর কেউ বাধা ছিল না। ইসাবেলার ব্যবহারে লোপেজ এবং ম্যারিয়া উভয়েই বেশী রকম অসন্তুষ্ট ছিল। একজন ইসাবেলার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য কোরলে, অপরজন তা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কোরতো। এই বিষয়টা ভিত্তি ক'রেই প্রথম তাদের বন্ধুত্ব ক্রমে পাকা হ'য়ে উঠলো।

ম্যারিয়ার বাবা ইতিমধ্যে ঠিক ক'রেছিল যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছুদিন তাকে খরচ দিয়ে সেভিলে রাখবেন। ম্যারিয়া সেভিলে থাকার ব্যাপার নিয়ে বিশদভাবে লোপেজের সঙ্গে পরামর্শ কোরলো। ঠিক হোল যে ম্যারিয়া দ্বিতীয়বার আর ইসাবেলার চক্ষু-শূল হোয়ে মাসীর বাসায় উঠবে না, কোন মেয়েদের মেস কিংবা হোটেলে টাকা দিয়ে থাকবে, এবং আরও ঠিক হ'লো যে লোপেজই সে-সমস্ত ম্যারিয়াকে বন্দোবস্ত কোরে দেবে।

ম্যারিয়া চিরকাল গ্রামে থাকলেও বুদ্ধিহীনা সে মোটেই ছিল না। ইসাবেলার গায়ে পড়া ভাবটা যে লোপেজ অত্যন্ত অপছন্দ কোরতো ম্যারিয়া তা বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরেছিল, তাই সে মনে মনে প্রথম থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, লোপেজের সঙ্গে সে খুব সংযত ভাবে ব্যবহার কোরবে। তার গ্রামে ফিরে যাবার দিন লোপেজ যখন তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে গিয়েছিল, তাদের বন্ধুত্বটা কায়েমী কোরে রাখবার জন্যও বটে এবং এ-সব কথা চিন্তা কোরেও বটে, লোপেজের সঙ্গে সে একেবারে ভাইবোন সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেললো।

গ্রামে ফিরেই ম্যারিয়া তার পৌঁছ সংবাদ দিয়ে লোপেজকে একখানা চিঠি দিলো, সঙ্গে জবাব দেবার জন্য একখানা ডাক টিকিট। টিকিট পেয়ে সে বেশ একটু আমোদ অনুভব কোরলো। মনে মনে ভাবলো, ম্যারিয়া আমাকে মনে কোরেছে কি ? চিঠির জবাব দেবার গরজ তারও কম ছিল না, জবাব সে খুব তাড়াতাড়িই দিলো।

ফেরৎ ডাকে ম্যারিয়া এবং তার বাবা দুজনেই ইউজিনের বিয়েতে লোপেজকেও বিশেষ ক'রে নেমতন্ন ক'রে পাঠালেন।

সুতরাং প্রিম-পরিবারের সঙ্গে লোপেজও গেল ইউজিনের বিয়ের নেমতন্ন খেতে ছোট্ট সেই গ্রামে। সেখানে কয়েকটা দিন তার অতি চমৎকার ভাবে কেটে গেলো। ম্যারিয়াদের মুখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সকলেরই লোপেজের প্রতি একটা খুব ভাল ধারণা হ'য়েছিল। সেখানে তার আদর-যত্নের সীমা রইলো না। এত আদর যত্নে সে অভ্যস্ত ছিল না, মনে মনে প্রথমটা খুশী হোলেও শেষটা প্রায় অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলো। পাড়ার একটি মেয়ে, লোপেজের চেয়ে কিছু বড়ো হবে বয়সে, তার সঙ্গে বিশেষ কোরে আলাপ কোরেছিল। সে একদিন সকলের সামনেই কথায় কথায় বোললো—"দেখো লোপেজ, ম্যারিয়া সাধারণতঃ বেশী কথাবার্ত্তা বলে না, কিন্তু তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই সে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হোয়ে ওঠে। তাই ব'লে আবার মনে কোরো না যেন, ম্যারিয়া তোমাকে যারপরনাই ভালবাসে। তোমাকে দিয়ে ম্যারিয়ার অনেক উপকার হবার সম্ভবনা র'য়েছে

কিনা, তাই তোমার প্রতি সে অতো ভালবাসা দেখায়। যাকে দিয়ে যখন ও উপকার পায় তাকেই ও-রকম দেখানো ওর অভ্যেস। আমি তো ম্যারিয়াকে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখছি, আমি তোমাকে ব'লে দিলাম, তুমি দেখে নিও, আরেকজন উপকারী পেলেই ও তোমাকে ভুলবে।"

ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়েলিস্‌ম্‌, সাম্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে লোপেজের গভীর জ্ঞান ছিল সে কথা সত্যি, কিন্তু সংসার ও মানব-চরিত সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং এত অল্প পরিচিত একটী মেয়ে হঠাৎ গায়ে পড়ে তার একান্ত বন্ধু বোলে পরিচিতা ম্যারিয়ার সম্বন্ধে এ-রকম একটা কঠিন মন্তব্য কেন করতে গেল, অনেক চিন্তা ক'রেও তা ওর মাথায় ঢুকলো না। সে বরং একটু কৌতুকই অনুভব কোরলো। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে একবার ম্যারিয়ার আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ কোরে সকলের সামনেই ঘোষণা কোরলো যে, সে কোন বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন দেখিতে পাচ্ছে না। তারপর সে নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনেই সেভিলে ফিরে এলো।

আর কিছুদিন পরে ম্যারিয়াও এলো সেভিলে। একজন বৃদ্ধ বিধবার বোর্ডিং স্কুলে সে ভর্ত্তি হোল। সমস্ত বন্দোবস্ত লোপেজই কোরে দিল। অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে খুব বেশী মাত্রাতেই সচেতন ছিল, প্রতি সপ্তাহে সে দু'দিন গিয়ে ম্যারিয়াকে দেখে আসতো, কি তার প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞেস কোরতো, আর ম্যারিয়ার নানারকম কাল্পনিক বিপদের চিন্তা কোরে সব সময়তেই সে বেশ একটু উদ্বিগ্ন থাকতো। সেই বন্ধুহীন ও অচেনা জায়গায় ম্যারিয়ারও লোপেজই ছিল একমাত্র আশ্রয়-স্থল। লোপেজ না কোরে দিলে কোন কাজই তার পছন্দমত হোত না। সামান্য কিছু কোন কথা থেকে আরম্ভ কোরে গুরুতর কিছু পরামর্শ ব্যাপারে লোপেজরই ডাক পড়তো। এমনি কোরে কাটলো পুরো তিনটি বছোর।

পূরো তিনটি বছোর পরে লোপেজ তার অভ্যাসমত একদিন ম্যারিয়ার বোর্ডিংয়ে গিয়েছে। ম্যারিয়া সেদিন খুব উত্তেজিত এবং বিষাদগ্রস্ত। লোপেজ নিজের কোন দুঃখ-কষ্টকে নির্ব্বিকার চিত্তে বরণ কোরবার মতো মনের জোর রাখতো, কিন্তু অপরের সামান্য কষ্ট দেখলেও বিচলিত না হ'য়ে পারতো না। বিশেষ কোরে ম্যারিয়ার কোন বিপদ আপদে তার স্থির থাকার কথা নয়। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে এবং মিষ্টি কোরে সে ম্যারিয়ার অশান্তির কারণ জানতে চাইলো। উত্তরে ম্যারিয়া তার বাবার হাতের লেখা একখানা চিঠি দিলো লোপেজকে পড়তে। গ্রাম্য হাতের খুব ছোট্ট ছোট্ট লেখা। চিঠিখানা পড়ে লোপেজ মোটমাট যা জানতে পারলো তা হচ্ছে এই, ম্যারিয়ার বাবার সমস্ত আয়-ই জমীর ফসলের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জমীতে এক রকম পোকা দেখা যাওয়ায় হঠাৎ ফসলের ভয়ানক ক্ষতি হোয়েছে, রাণী ক্রিশ্চিনিয়াও কোনরকম খাজনা মাপ কোরবেন না। সুতরাং ম্যারিয়ার সেভিলে থাকার খরচ তিনি আর চালাতে পারবেন না। অথচ তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও তাঁর যে খুব ইচ্ছে তা নয়। ম্যারিয়ার নিজের কি ইচ্ছে তাই তিনি জানতে চেয়েছেন। সহরের একটা বিশেষ মোহ আছে, সেটা তরুণ মনকে বড় আকর্ষণ করে, স্বাভাবিক নিয়মে ম্যারিয়াকেও তা কোরেছিল। তাই গ্রামে ফিরে যাবার কথা সে ভাবতেও পারলো না, কিন্তু সেভিলে থাকতে হ'লে কি উপায় কোরে থাকা যেতে পারে ম্যারিয়া সে সম্বন্ধে লোপেজের কাছে পরামর্শ চাইলো।

লোপেজ যদি তখন ম্যারিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কোরতে পারতো তা হ'লেই বোধ হয় সব দিক দিয়ে ভাল হোত, কিন্তু তাতে বাধা ছিল অনেক। ব্রি লোপেজ মনে মনে হিসেব কোরলো, প্রথম বাধা—ইসাবেলার বাবার ইচ্ছে লোপেজ শেষ পর্য্যন্ত ইসাবেলাকেই বিয়ে করে, মুখে ঠিক স্পষ্ট কোরে না-বোললেও লোপেজ তা বুঝতে পেরেছিল এবং এই বিয়ে না কোরলে অকৃতজ্ঞতা হবে। সুতরাং লোপেজের পক্ষে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথা, ম্যারিয়ার বাবা ম্যারিয়ার মতো সুন্দরী মেয়েকে সহরের শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে আরও অনেক বড় কিছু যে আশা কোরেছিলেন লোপেজ তা যানতো, সুতরাং বিয়েতে যদি সম্মতি না-পাওয়া যায় তাদের বন্ধুত্বেও বিঘ্ন

ঘটতে পারে। লোপেজ কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা মনে কোরছিল অন্য একটা কারণকে। প্রথম থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতান, শুধু পাতান নয় তাদের সম্বন্ধ আর ব্যবহারও ছিল ঠিক সেই-রকমই। কোন চিঠিতে ম্যারিয়া হয়তো লিখেছে: "আমার নিজের কোন ভাই নেই, তুমি ঠিক আমার নিজের ভাইয়ের মতো, আমি তোমাকে একটুও অন্যরকম চোখে দেখি না", অথবা "তুমি আমার ঠিক নিজের দাদার মতো, আমার যদি নিজের দাদাও থাকতো সেও ঠিক তোমার মতোই আমার এত উপকার কোরতো কি-না সন্দেহ।" এই সব চিঠিগুলিও লোপেজের কাছে ছিল খুবই প্রিয়, কারও উপকার কোরে প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা কোরতে সে অভ্যস্ত ছিল না। প্রশংসা না-চাইলেও অযাচিত এই প্রশংসাতে সে খুবই আনন্দ পেতো। এই চিঠিগুলি জমিয়ে রেখে বার বার খুলে খুলে সে পড়তো।

লেখাপড়া খুব বেশী না-জানলেও ম্যারিয়া সেলাইর কাজ খুব ভাল জানতো। দু'জনে অনেক পরামর্শ কোরে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোল যে ম্যারিয়া কোন বড়লোকের বাড়ীতে সেলাই শিখিয়ে জীবিকা উপার্জ্জন কোরতে চেষ্টা কোরবে। লোপেজ বোললো "দেখ ম্যারিয়া এখানে যে একটা সেলাইয়ের স্কুল আছে সে খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখ, সেখানে প্রায়ই কোন-না কোন শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি থাকে। চেষ্টা কোরলে একটা চাকরী পাওয়াও তেমন কঠিন হবে না। তবে একটা কথা, রোজই যে চাকরী খালি হয় তারও একটা বিশেষ কারণ আছে, স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর প্রতিপত্তিই সর্ব্বাধিক এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা যে-কোন ভদ্র ঘরের মেয়ের পক্ষেই বিশেষ দুরূহ। যারা নিজের সম্মান রাখতে চায় তারা অবিলম্বেই চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শুধু টিকে থাকে তারাই যারা নিজেরাই বিশেষ খারাপ, নয়তো একেবারে অসহায় এবং নিরুপায়, তবে মাইনে খুব বেশী, পঁয়ত্রিশ টাকা।"

ম্যারিয়া নিজের থেকেই বোললো "না, অমন জায়গায় কাজ কোরতে আমি চাই না, মাইনে অল্প হোলেও কোন ভাল জায়গায় তুমি চেষ্টা ক'রো।"

তার এই কথায় ম্যারিয়ার সম্বন্ধে লোপেজের মনে আরও ভাল একটা ধারণা হোল। লোপেজ ভাবলো, ম্যারিয়া তা-হ'লে টাকাটাই জীবনের সকল বস্তুর ওপরে স্থান দেয় না।

ম্যারিয়ার জন্য লোপেজের চাকরীর চেষ্টা করা মানে অবশ্য বড় বড় লোকের বাড়ীর খোঁজ কোরে সোজা কড়া নেড়ে গিয়ে হাজির হওয়া। গোটা কয়েক বাড়ীর পরে সত্যিই এক জায়গায় হদিস্ মিললো। দাঁত উঁচু বুড়ো এক ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একেবারে রুখে এলেন—"কি চাই আপনার?"

"শুনলাম যে আপনার বাড়ীতে একজন সেলাই শেখাবার শিক্ষয়িত্রী দরকার" লোপেজ যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে উত্তর কোরলো।

"হ্যাঁ, তা একজন দরকার ঠিকই, কিন্তু আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

লোপেজের অবশ্য বাধ্য হোয়েই এ প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে হোল।

"কতো মাইনে দেবেন?"

"কুড়ি পেসেটা"

ম্যারিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই চাকরিতেই বহাল হোল। কিন্তু দেখা গেল টাকা পয়সা সম্বন্ধে সেই ভদ্রলোকের হাতটা ঠিক তার দাঁতগুলির মতোই অতটা দরাজ নয়, হঠাৎ ম্যারিয়ার নিরুপায় অবস্থা বুঝে পনের পেসেটার এক পেসেটাও বেশী দিতে রাজী হোলেন না। উপায়ন্তর নেই, ম্যারিয়াকে তাতেই স্বীকৃত হোতে হোল।

ধীরে ধীরে আরও একটী বছর গেল গড়িয়ে।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ কোরে লোপেজ আর ম্যারিয়ার বন্ধুত্বটা আরও প্রগাঢ় হওয়া ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না ওদের জীবনে—এই এক বছরের মধ্যে। তারপর ম্যারিয়া একবার কিছুদিনের ছুটী নিয়ে তাদের দেশের বাড়ীতে গেল। ফিরে এসে লোপেজকে বোললো, "দেখো, বাবা এতদিন যা অল্প মাত্র

কিছু সাহায্য কোরতেন, অবস্থার গতিকে এবার বোধ হয় তাও বন্ধ কোরে দিতে বাধ্য হবেন, এবার এর থেকে কিছু বেশী টাকা না-রোজগার কোরতে পারলে নয় ই।" সেলাইয়ের স্কুল সম্বন্ধে লোপেজের বিশেষ বিতৃষ্ণা থাকাতে সেখানে ছাড়া আর প্রায় তার সমস্ত জানা জায়গাতেই আপ্রাণ চেষ্টা কোরলো, কিন্তু মাইনের হার তখন কোমেছে বই বাড়েনি, কাজেই কিছু সুবিধে হোল না।

একদিন লোপেজ ম্যারিয়ার বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখে যে তাদেরই সমান বয়সী একজন যুবক চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে বসে মেয়েলী ঢংয়ে হাত-পা নেড়ে চুপি চুপি ম্যারিয়াকে কি বোঝাচ্ছে। লোপেজ প্রথমটা একটু বিশেষ অবাকই হোয়েছিল, কারণ এই সহরে ম্যারিয়ার আর কেউ পরিচিত আছে ব'লে সে জানতো না। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ম্যারিয়া লোপেজের সঙ্গে সেই যুবকটীর পরিচয় কোরে দিলো না, সে চলে গেলে ম্যারিয়া লোপেজকে বোললো—"এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ক্যাম্পোগ, সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য, সম্প্রতি জেল থেকে খালাস পেয়েছেন, আমাদের আত্মীয় এবং গ্রামের লোক।" সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে লোপেজের কোনদিনই বিশেষ ভাল ধারণা ছিল না। সে জানতো এ-সব লোকেরা যদিও স্পেনীয় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কোরতে চায়, এরা যদিও বা নিজেদের ধর্ম্মমূলক রাজত্ব স্থাপন কোরতেও পারে, তাতে স্পেনের অত্যাচারিত কৃষক আর শ্রমিকের দুঃখ কিছুমাত্র লাঘব হবে না, এরা শুধু নিজের স্বার্থ হাসিল কোরতেই তৎপর থাকবে। ক্যাম্পোগের মধ্যে আরেকজন সাধারণতন্ত্রীর নমুনা দেখে স্পেনের আর সমস্ত সাধারণতন্ত্রবাদীদের সম্বন্ধে লোপেজের আরও খারাপ ছাড়া ভাল ধারণা হ'লো না। কিন্তু ক্যাম্পোগ হচ্ছে ম্যারিয়ার বিশেষ আত্মীয় এবং বন্ধু, এমন কি ম্যারিয়ার পক্ষে তাদের দল-ভুক্ত লোক হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং তার কাছে এ-সব কথা বোলে কিছু লাভ নেই।

কয়েকদিন পরে ম্যারিয়া একদিন লোপেজকে বোললো: "জান লোপেজ, ক্যাম্পোগ বোলেছে যে সে যেমন কোরে পারে সেলাইয়ের স্কুলে আমায় একটা চাকরি ঠিক ক'রে দেবে"। তার কথা শেষ হতে না-হতেই ক্যাম্পোগ এসে ঘরে ঢুকলো, হাতে একখানা চিঠি—মুখে বিনয়-গর্ব্বের হাসি। হস্ত-পদ আস্ফালন আর নিজের এবং দলের কীর্ত্তি কীর্ত্তন কোরে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা কোরে সে যা বোললো, তার সার মর্ম্ম হোচ্ছে এই, অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া বড় দুষ্কর হোয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ এত বেশী টাকার চাকরির। পরিচালক মণ্ডলীর বিশিষ্ট কোন সদস্যের অনুগ্রহ-প্রাপ্তা কোন মেয়ে ছাড়া আজকাল আর কেউ-ই চাকরি পায় না। ম্যারিয়ারও কোন আশা ছিল না, বস্তুতঃ একজন সদস্যের সুপারিশ করা একটী মেয়ের নামে নিয়োগ-পত্র পর্য্যন্ত লেখা হোয়ে গিয়েছিল, এমন সময় ক্যাম্পোগ গিয়ে হাজির, সঙ্গে ছিলেন সেই স্কুলেরই একজন কর্ম্মচারী, ক্যাম্পোগের দলের লোক। তিনিই নানান্ রকম ফিকির-ফন্দি কোরে সেই নাম কেটে, খাতায় আর নিয়োগ-পত্রে ম্যারিয়ার নামটা বসিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাইতেই ম্যারিয়ার এই চাকরিটা হোয়েছে। (আগামীবারে সমাপ্য)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ

জগন্নাথ মজুমদার

বহুযুগ আগে মহামতি এরিষ্টটল্ বলেছিলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃ রাজনৈতিক জীব। কবে সেই আদিম যুগে মানুষ ধরা-পৃষ্ঠে আপন অস্তিত্বের বার্ত্তা নিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তখনও সে একা নয়। পৃথিবীতে প্রাণিজগতের উত্থান-পতনের যে মিছিল চ'লেছে সে মিছিলে মানুষের যে প্রথম আবির্ভাব তখনও সে স-যূথ। তবে মানুষের এই আদি যূথের স্বরূপ ছিল কি, সেটা পণ্ডিতদের গবেষণার বস্তু। স্যার হেন্‌রী মেইন্ ছিলেন মানুষের এইসব পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ব'লে-গেছেন যে মানুষের দলবদ্ধ মনোবৃত্তির প্রথম স্ফুরণ হয় পরিবারে। এক একটি পরিবারের পরিচালক ও শাসক ছিল সেই পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ। রোমীয় ভাষায় তাকে 'Pater-familia' বলা হোত। আর এই ধরণের যে-সমাজ তখন গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজকে আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে "Patriarchal" সমাজ ব'লে। বাইবেলে উল্লিখিত যে প্রাচীন সমাজের পরিচয় আমরা পাই তা কতকটা এই ধরণের সমাজ। কিন্তু মেইনের এই সিদ্ধান্ত সকলেই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গ্রহণ কর্ত্তে পারেনি। মেইন্ তাঁর সিদ্ধান্তের খোরাক যোগাড় করেছিলেন প্রাচীন রোমীয় সামাজিক জীবনের প্রণালী থেকে। ম্যাক্‌লেনান্, মর্গ্যান্ এড্‌ওয়ার্ড জেন্‌কস্ প্রভৃতি মনীষী-গণ মেইনের সিদ্ধান্তের গলদ্ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে "Partriarchal Family" কেবল রোমীয় সমাজেই দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক্, হিব্রু অথবা জার্ম্মান সমাজে এর অস্তিত্বের কোনই চিহ্ন পাওয়া যায় না। আর এই ধরণের সমাজকে মানুষের আদি সমাজ বলা চলে না। মানুষের প্রাথমিক সমাজ অঙ্কুরিত হয়েছিল যে-অবস্থা থেকে তাকে "Matriarchal" সমাজ বলা যেতে পারে। এই সমাজে সামাজিক বন্ধনের কেন্দ্র ছিল স্ত্রীলোক, পুরুষ নয়। পুরুষ-কেন্দ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম আরও পরবর্ত্তী যুগে, মানুষ তখন সভ্যতার আরও উচ্চতর স্তরে উঠেছে। "Matriarchal" সমাজের প্রতিচ্ছবি আমরা উচ্চতর পশুদিগের মধ্যেও দেখতে পাই। সে-যুগে পরিবার বা ফ্যামিলির সৃষ্টি হয়নি। কারণ বিবাহ ব'লতে আমরা যা বুঝি সেটা তখনকার যুগে ছিল অজ্ঞাত। মানুষের সেই আদিম দলকে জেন্‌কস্ এর ভাষায় "Totem Group" ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে।

পুরুষ-কেন্দ্রিক অথবা স্ত্রীলোক-কেন্দ্রিক সমাজের আদিরূপ যাই হোক না কেন, তখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সবে মাত্র অঙ্কুরিত হচ্ছে। তবে রাষ্ট্র নামে আলাদা কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি তখনও হয়নি। পুরুষ-কেন্দ্রিক সমাজের "Patriarch' ছিল পরিবারের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। পুরাতন রোমীয় আইন-কানুন অনুসন্ধান কর্লে দেখা যায়, "Patriarch" পরিবারের অন্তঃর্ভুক্ত কাউকে প্রাণদণ্ডের পর্য্যন্ত বিধান দিতে পারতেন। উড্রো উইলসন তাই এঁদের "Absolute Father Sovereign" নামে অভিহিত ক'রেছেন। মেইনের মতে পরিবারের কলেবর বৃদ্ধি হ'য়ে সেটা ক্রমে পরিণত হ'য়েছে গোষ্ঠিতে অথবা Gens বা House-এ। এ-রূপ কয়েকটি গোষ্ঠি মিলিত হ'য়ে হ'য়েছে সম্প্রদায় অথবা Tribe, আদিকালে এই সম্প্রদায়গুলি ছিল যাযাবরের মত ইতস্ততঃ সতত সঞ্চরমান,—যেমন ছিল পুরাকালের Frank সম্প্রদায়, জার্ম্মান সম্প্রদায়। এদের যাযাবরত্বের ফলে এদের মধ্যে বহু সংমিশ্রণ ঘটল। তার পর কৃষি-কর্ম্মের আকর্ষণ তাদেরকে কোন বিশিষ্ট জায়গার মাটির সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছিল। স্থায়ু-রাষ্ট্র বা Territorial State-এর জন্ম হ'ল তখন থেকেই। তার পূর্ব্বেকার অবস্থাকে যাযাবার-রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশের এই নব-সম্পর্ক স্থাপনের পর রাষ্ট্রের স্বরূপও গেল বদলে। রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'লেন সে দেশের রাজা। সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়গণ হ'লেন তার সামন্ত।

Patriarch-গণ ক্রমে ক্রমে পরিবারবর্গের ওপর শাসন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। সে সব ক্ষমতা রাজার হাতে চ'লে গেল। মানুষ পারিবারিক কঠোর শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ ক'রলো। তখন থেকে সমাজের unit হ'লো ব্যক্তি, পরিবার নয়। মানুষের সামাজিক জীবনের এই গতিকে একজন বহু-দর্শী লেখক অভিহিত করেছেন—"The progress of the society has been from status to contract" তবে সেই সময়েও ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কর্ত্তে পারেনি। পারিবারিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেলেও রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতা তাকে আষ্টে-পিষ্টে অক্টোপাশের বন্ধনে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। বন্দী-মানুষের খাঁচার পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সমন্বয় হ'য়ে বৃহদাকার রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তন হ'ল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির এই সংহতির প্রচেষ্টাকে Progress towards nation states বলা হ'য়েছে। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস এই সংহতি প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। মধ্যযুগের সেই ভাঙ্গাগড়ার যুগে রাষ্ট্রের মধ্যে পুরোহিত প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হ'তে লাগলো। শেষে তার ফল এমনি দাঁড়াল যে ধর্ম্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেল। অর্থাৎ রাষ্ট্র হ'ল Rationalised এর পরের পর্য্যায় আলোচনা ক'রলে দেখা যায়, যে মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র সমাজের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। বৈশ্য-শক্তি তখন রাষ্ট্রের মধ্যে মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। বৈশ্য-শক্তিকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখবার জন্য সামন্ততন্ত্র নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচারের অস্ত্রও প্রয়োগ কর্ত্তে লাগলো। কিন্তু সে-টা তখন ইতিহাসের গতি, তাই 'নাহি মরে উপেক্ষায়, আঘাতে না টলে'। ফরাসী বিপ্লব এই বৈশ্য-শক্তির অভ্যুত্থানের সূচনা। অবশ্য তার আগে ১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডের Glorious Revolution-এ জনসাধারণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কাছে রাজাকে নতি স্বীকার করতে দেখা গিয়েছিল। এই সময় বৈশ্য-শক্তি জনসাধারণের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন কর্ত্তে চায়, অপরপক্ষে রাজা ও তাঁর অনুচর সামন্তবর্গ তাঁদের পূর্ব্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট। স্বার্থের এই লড়াইয়ের সময় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অভিনব মতবাদের জন্ম হ'লো। এই মতবাদের নাম দেওয়া হ'লো Social Contract থিয়োরী। ইংলণ্ডের হব্‌স্‌ ও লক্‌ এবং ফরাসী দেশের রুশো এই মতবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁদের মতে সমাজের জন্ম হ'য়েছে ব্যক্তির পারস্পরিক এবং সমবেত চুক্তি হ'তে। এই চুক্তি হবার আগে মানুষ ছিল এক-প্রকারের অ-সামাজিক জীব। এই প্রাগ্‌-সামাজিক অবস্থাকে তাঁরা অভিহিত ক'রেছেন State of nature ব'লে। কিন্তু এই অবস্থাটা প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল তা নিয়ে হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো একমত নন্‌। হব্‌স্‌ ছিলেন ইংলণ্ডের তৎকালীন ষ্টুয়ার্ট নবপতিগণের স্বেচ্ছা-চারিতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এই থিওরীকে তিনি প্রয়োগ কর্লেন রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে। লক্‌ ছিলেন মধ্যপন্থার পূজারী। তিনিও এই থিওরীর সহায়তায় ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রচার কর্লেন। আর রুশো ছিলেন তখনকার যুগে জনজাগরণের মুখর প্রতিনিধি। এই মতবাদের পরিপাটি ব্যাখ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যের ভাস্বর-দীপ্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি Social contract থিওরীকে নিয়োগ ক'রলেন জনসাধারণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা কল্পে। এর থেকেই বোঝা যায় মতবাদ জিনিষটা অত্যন্ত তরল পদার্থ। যে পাত্রে একে ঢালা যাবে সেই পাত্রের রূপই পরিগ্রহ ক'রবে, সুতরাং জিনিষটা ভগবানের মতই অপরূপ। Organic Theory of the stateএ-ও আমরা মতবাদের এই অরূপত্বের সন্ধান পাই।

এই নতুন Social contract থিওরী লোকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করুল, দেশে বিপ্লব এনে দিল, কিন্তু ইতিহাসে এর বিশেষ কোন নজির মিল্‌ল না। মানুষ একটা অ-সামাজিক অবস্থা থেকে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করে সু-সম্বদ্ধ সমাজ গড়ে ফেল্‌ল, এটা কবির কল্পনা হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে বাস্তব সত্যের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। বাইবেলের

গল্পে অবশ্য শোনা যায় যে বয়োঃজ্যেষ্ঠ ইস্‌রায়েলগণ ডেভিড্‌কে রাজতক্তে বসিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা Government contract-এর নজির হতে পারে, Social contract-এর নয়। ডারউইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে, মানুষের আদি বিবর্ত্তনের সময় থেকেই সে স-যূথ, একক জীবনযাত্রার সময় ও সুযোগ তার কখনও হয়নি। বেন্থাম, বার্ক, ব্লুণ্টস্‌লি, পোলক, লাড উইগ প্রভৃতি লেখকগণ তাদের বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ শরজালে Social contract থিওরীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অভাব থাকলেও থিওরী-টি গণ-জাগরণের কাজে তখনকার যুগে খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। এর সার্থকতা এই জন্যই।

ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এই সময়টিকে গণতন্ত্রের যুগ বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রকে সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের আওতা থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে গণতান্ত্রের নামে বৈশ্য প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। গণ-সাধারণের ভোটাধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা, আইনের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বুলির সৃষ্টি হ'ল বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলে দেখা যেত যে এই আপাত সুখকর বাকচাতুরীর পশ্চাতে রয়েছে ধনীর সীমাহীন ক্ষমতা-বিলাস। রাষ্ট্র তখন ক্রীতদাস। আইন-আদালত সবই সেই financier classএর অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হচ্ছে। সাম্যের মুখোসটা নেহাৎ বাজে। কিন্তু গতিশীল সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা একঘেয়ে রাস্তায় চিরকাল চলতে পারে না। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উৎপাদন প্রণালীর অনুচর।

কোন বিশিষ্ট উৎপাদন প্রণালীর উন্নতির গতি ব্যাহত হলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সেই উৎপাদন প্রণালীর উপাসকদেরও পতন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। আজ ধনতন্ত্রের অবস্থাও এই রকম। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর অন্তঃনিহিত শক্তি এসেছে ফুরিয়ে। এর বিরুদ্ধে শক্তি হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই দেশে দেশে গণতন্ত্রেরও পতন আরম্ভ হয়েছে। তার জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্রের হয়েছে পত্তন। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনীতি ধনতান্ত্রিকদের বাঁচবার একটি অভিনব কৌশল। এর সাফল্য সাময়িক হ'তে পারে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্বিরোধের সমাধানের কোন ইঙ্গিত এতে নেই। সুতরাং সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। ফ্যাসিষ্টরা সমস্যাকে ধামা চাপা দিতে যাচ্ছে। তাদের দর্শনের সবটাই পররাষ্ট্রনীতি। আর এই পর-রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পর-রাষ্ট্র লুণ্ঠন: Cole যার আখ্যা দিয়েছেন, Political Brigandage ব'লে। ফ্যাসিষ্টদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈদেশিক যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা দেশের প্রকৃত সমস্যাকে আচ্ছন্ন রাখা। কিন্তু সব ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই যদি এই নীতি বরণ ক'রে নেয় তবে জগতে বিশ্ব-শান্তি ব'লে আর কিছু থাকবে না। ফ্যাসিষ্ট পন্থীরা পরস্পর হানাহানি ক'রে দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেলে ধনতন্ত্র দাঁড়াবে কোথা সে-ভাবনা ভাববার সময় তাদের নেই। যে রাজনীতি মানুষের প্রাণের মূল্য বোঝে না, চিরন্তন সত্যের সঙ্গে যার বিরোধ, তার কৃতকার্য্যতা যে কতদূর স্থায়ী হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, ধনতন্ত্র-জর্জ্জরিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিণতি কি হবে? প্রশ্নটি বেশ একটু জটিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিণতি সম্বন্ধে কোন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। কারণ, এদের গতিপথে অনেক অভূতপূর্ব্ব অদৃশ্য শক্তি এসে গণনা ব্যর্থ ক'রে দেয়। কিন্তু তা হ'লেও কোন সমাজের তৎকালীন যুগের শ্রেণী-স্বার্থ ও তাদের পারস্পরিক বিরোধের দিকে লক্ষ্য রাখলে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের আভাস একটা পাওয়া যায়। সমাজের গতিকে এই শ্রেণী-বিরোধের কষ্টিপাথরে খতিয়ে দেখেছেন মার্কস্‌ পন্থীরা। এতদিন পর্য্যন্ত সনাতনীদের শিক্ষানুযায়ী রাষ্ট্রকে দেখা হ'ত শ্রেণী-সামঞ্জস্যের প্রতীক ব'লে। রাষ্ট্রকে একটা পবিত্র ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করা হ'ত। তাইতে রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা আইন-আদালত সমস্তকেই পবিত্রতামণ্ডিত ক'রে রাখা হ'য়েছিল। যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে ক'রে সকলে তাঁর আদেশ নত-মস্তকে

পালন ক'রত। রাজতন্ত্রের পতনের পর রাজার দেবত্ব আরোপ করা হ'লো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। "Divine might of kings" দেখা দিল অন্য একরূপে। হেগেলের ডায়ালেকটিক্ এবং বার্কের যুক্তি সবই এই "Divine Right"এর রূপান্তর মাত্র। রাষ্ট্রকে শ্রেণী-সামঞ্জস্যের প্রতীক ব'লে ভাববার প্রবণতা এত বেশী যে, Lasky-র মত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকও রাষ্ট্রকে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ ও পরস্পর বিবদমান স্বার্থের মধ্যস্থ হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু লেনিন তাঁর "State and Revolution" গ্রন্থে ব'লেছেন —"The state is the product and the manifestation of the irreconcilability of class antagonism The state arises when, where and to the extent that the class antagonisms cannot be objectively reconciled. And, conversely the existence of the state proves that the class antagonisms are irreconcilable" ফ্রেড্রিক এঙ্গেল্স্‌ও সেই সুদূর ১৮৯৪ সালে রাষ্ট্রের অনুরূপ ভাষ্য ক'রে গেছেন তার "Origin of the Family", "Private Property and the State" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। তিনি ব'লেছেন—"The State is therefore by no means a power imposed on society from outside, just as little is it" "The reality of the moral idea," "The image and reality of reason," as Hegel asserted তাঁরও মতে রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হ'য়েছে সমাজের আপোষ-বিহীন শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে। রাষ্ট্র সেখানে দৃশ্যতঃ একটি মধ্যস্থের ভূমিকায় থাকলেও শ্রেণী-শাসন কর্ত্তৃত্বের অধিকারী তাদের স্বার্থেরই রক্ষক হিসাবে কাজ করে। এ সম্বন্ধে মার্কস কি বলেন তাও দেখা যাক্। মার্কস্ ব'লেছেন—"The State is an organ of class domination, an organ of oppression of one class by another, its aim is the creation of 'order' which legalises and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes" বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই 'order'কে শ্রেণী স্বার্থের সমন্বয় ব'লে মনে করেন, সুতরাং তাদের মতে রাষ্ট্র শ্রেণী-স্বার্থ যুক্ত। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়, রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করলেই তা দেখা যাবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ অভ্রান্ত সত্য কথা। যাঁরা বলেন, সমাজে বিপরীত স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকবে অথচ তাদের দ্বন্দ্ব থাকবে না—কারণ রাষ্ট্র সেই সনাতন দ্বন্দ্বকে পরিণত ক'রে তুলবে মিলনে, হয় তাঁরা নিজেরাই বিভ্রান্ত, না হয় কথার ফাঁকিতে প্রকৃত সমস্যাকে লোক-চক্ষুর অগোচরে রাখতে চান। ধনতন্ত্রের ফলে শ্রমিকদের শক্তি দিন দিন বেড়ে যাবে—ধনিকদের সংখ্যাও কমতে থাকবে। তারপর শ্রমিকেরা যখন সংঘবদ্ধ হ'তে শিখবে ও নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠবে, তখন তাদের দুর্ব্বার শক্তিকে আর প্রতিহত ক'রে রাখা যাবে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা শ্রমিক-শ্রেণী অধিকার ক'রে নিয়ে "Dictatorship of the Proletariat" স্থাপন ক'রবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার সহায়তায় তারা সমাজকে ক'রে তুলবে শ্রেণীহীন। সমাজ যখন শ্রেণীহীন হ'য়ে উঠবে তখন ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব থাকবে না। সমাজ যখন এই অবস্থায় এসে পৌঁছাবে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনও থাকবে না। আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভের কথা শুনে এসেছি। রাষ্ট্রেরও সাধনার শেষ মার্গ হচ্ছে নির্ব্বাণ। এঙ্গেল্স্ এই অবস্থাকে বলেছেন—"Withering way of the State" রাষ্ট্রের অসীম কর্ত্তৃত্বের মধ্যে থেকে, রাষ্ট্রহীন অবস্থাকে আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন সামাজিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে তার যে গতি নির্দ্ধারণ ক'রেছে, তা খুবই সত্যি ও সম্ভব ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে অবস্থা এখনও আমাদের কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে আছে, বাস্তবের সঙ্গে এখনও তার কোনও সম্পর্ক ঘটে ওঠেনি।

সৃষ্টির কথা

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বি, এস্-সি

জ্ঞানোন্মেষের পর হইতে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে উন্নতিশীল মানব যখন শস্য-শ্যামলা মেদিনীর বুকে মহানন্দে খেলিয়া বেড়ায় তখন রূপসী ধরণী এবং নক্ষত্র-খচিত মনোরম আকাশের অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ মানবের মনের মাঝে একটী প্রশ্ন জাগে—"এই যে চির-রহস্যাবৃত সীমাহীন বিশ্ব, ইহার জন্ম কোথায়, কখন কাহার অনাদি কর-স্পর্শে সম্ভব হইয়াছিল?" বৈজ্ঞানিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে যে-জ্ঞানালোকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের তিমিরাবৃত দুর্গম পথেও অনেকদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছি। মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ তাহার স্বল্প বুদ্ধি এবং অতি ক্ষুদ্র বিচার-শক্তির সাহায্যে পৃথিবীকে একটী বর্ত্তমান মহাদেশের চেয়ে বড় কল্পনা করিতে পারিত না—আজ আমরা পৃথিবীর বিস্তার সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে পৃথিবী তো দূরের কথা, আমাদের বিশাল সৌর জগতটাই সমগ্র বিশ্বের এক অতি নগণ্য অংশ অধিকার করিয়া আছে। এই মহাবিশ্বের বিস্তার যে কতদূর, তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমানেও অসম্ভব—তবে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, আমাদের প্রসারিত দৃষ্টির অন্তরালে হয়তো আরও অনেক সৌরজগৎ রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের কোন জ্ঞান নাই।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিক তাঁহার প্রসারিত দৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবীর প্রতিবেশী অনেক গ্রহ-উপগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং তাহাদের এক একটীর বিশাল আয়তন এবং পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। বিশ্বের এক একটী অধিবাসীর দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সাধারণ মাপকাঠিতে আর চলে না—এ-ক্ষেত্রে দূরত্বের মাপকাঠি হইল 'আলোক বৎসর' (Light year)। আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয় অর্থাৎ বৎসরে আলোক-রশ্মি ৫,৫০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে পারে। নক্ষত্র জগতে Alpha Centauri নামক তারকাটী পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত। তথাপি পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব এত বেশী যে, ঐ তারকাটী আজ নিবিয়া গেলে আমরা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কিছুই জানিতে পারিব না। কিন্তু এটী তো আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী—এই নক্ষত্র জগতে এমন নক্ষত্রও আছে যাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে ১৪ কোটী 'আলোক বৎসর' অর্থাৎ বর্ত্তমানে তারকাটীর যে আলোক-রশ্মি আমরা দূরবীক্ষণের সহায়তায় দেখিতেছি তাহা ১৪ কোটী বৎসর পূর্ব্বে নক্ষত্রটী হইতে তাহার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।

এ-হেন প্রহেলিকাময় বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানিতে কৌতূহল সবারই হয়। সেই কৌতূহল নিবারণার্থে বৈজ্ঞানিকগণ কালক্রমে অনেক তত্ত্বই আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, নক্ষত্র জগতে নানারূপ নীহারিকা এতদিন আত্ম-গোপন করিয়াছিল, আজ তাহা ধরা দিয়াছে বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নিকট। তাঁহাদের ধারণা যে এই সকল কুণ্ডলীপাকান বিরাটকায় নীহারিকারাজি হইতেই কালক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে সূর্য্য, পৃথিবী এবং তাহার প্রতিবেশী অপরাপর গ্রহাদির। বাইবেলের কথা সত্য হইলে আমাদের স্বীকার করিতে হয়, এই সৃষ্টি-কার্য্য হইয়াছিল মাত্র সাতদিনে—কিন্তু এইখানেই মতবিরোধ বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মতাত্ত্বিকগণের। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কোটী বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এই অভিনব সৃষ্টি, তাই আজ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্গণের নিকট

বৈজ্ঞানিকগণ সবাই নাস্তিক। তাঁহারা নাস্তিক হউন আর যাই হউন, আমাদের আপাততঃ মানিয়া লইতে হইতেছে, এইরূপ সৃষ্টি-কার্য্য মাত্র সাত দিনে সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর পৃথিবী একটী পৃথক গ্রহরূপে আপন কক্ষ-পথে ঘুরিতে থাকে বিপুল বেগে আর পৃথিবীর সেই ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত বাষ্প-গোলক ক্রমশঃ ঘনীভূত ও শীতল হইতে আরম্ভ করে।

সুদূর অতীতে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত, গলিত ধাতু ও পাহাড়-পর্ব্বতপূর্ণ পৃথিবীর তরল গোলক হইতে সূর্য্যের বিপুল আকর্ষণের ফলে, একটী অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রে পরিণত হয়। যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবী সামান্য শীতল হইলে তাহার উপর একটী কঠিন আচ্ছাদন পড়িয়া যায়, কিন্তু তখন হইতেই প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতের সহায়তায় পৃথিবীর বাহিরের সেই আবরণটুকু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ধরিত্রী তাহার অন্তরের জ্বালা প্রশমিত করিয়া লয়। কালক্রমে মেদিনীর বুকের জ্বালা কিয়দংশ প্রশমিত হইল। তখনও তাহা এত অশান্ত ও উত্তপ্ত ছিল যে তাহাতে বারি-বিন্দুর অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না।

আরও কয়েক যুগ পরে পৃথিবী আরও শীতল হইলে, আরম্ভ হইল প্রথম বৃষ্টিপাত, কিন্তু তাহা পৃথিবীর বুকে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই পুনরায় বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুতে ফিরিয়া গেল। এইরূপ বারিপাতের পর আকণ্ঠ জলপান করিয়াও পৃথিবীর তৃষ্ণা দূর হইল না—ধরিত্রী তৃপ্ত হইল তখনই, যখন অবিশ্রাম জলধারায় তাহার সম্পূর্ণ সত্তাই ডুবিয়া গেল অতল জলে। কিন্তু ইতিমধ্যে শীতল হইয়া পৃথিবী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অসমান অর্থাৎ স্থানে স্থানে উঁচু নীচু হইয়া যায় এবং সেই উঁচু অংশগুলিই দিগন্তব্যাপী সমুদ্রে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় এক একটা মহাদেশ রূপে।

তখনও পৃথিবীর বাহিরের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক পৃথিবীতে পৌঁছাইতে পারে নাই বলিয়া, দিন রাত্রি বা ঋতু কোনটীরই অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছিল মরুভূমি—একদিকে দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র, অন্যদিকে ধূসর বালিরাশি আর সীমাহীন পাহাড়-পর্ব্বত। জলে-স্থলে কোথাও জীবজন্তু, সবুজ ঘন-বন, এমনকি একটী তৃণেরও অস্তিত্ব ছিল না সেই সুদূর অতীতে। তারপর কত শত বৎসর চলিয়া যাইবার পর ক্রমে বাহিরের কুয়াশা পাতলা হইয়া যায়। সূর্য্য তাহার সপ্রতিভ দৃষ্টি ফিরাইল পৃথিবীর প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে, আর সেই শুভক্ষণে ধরিত্রীর দিকে দিকে জাগিয়া উঠিল প্রাণের স্পন্দন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন এই, "অতীতে অসাড় প্রাণহীন জড়-জগতে কি করিয়া প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছিল?" বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জীবদেহে জীবনীশক্তির আধার Protoplasm. এই জীবন্ত পদার্থটী Carbon, Hydrogen, Oxygen প্রভৃতি উপাদানে গঠিত। ইহাদের প্রত্যেকটী জল, বায়ু ও মৃত্তিকারূপ অসাড় প্রাণহীন জড়পদার্থেই বর্ত্তমান, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শত চেষ্টা করিয়াও প্রাণবন্ত Protoplasm তৈরী করিতে সফল হন্ নাই। যদিও প্রকৃতির যাদু-মন্ত্রে বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে অহরহ প্রাণবন্ত Protoplasm হইতেই নূতন করিয়া জীবন্ত Protoplasm-এর সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে Protoplasm-এর উদ্ভব হইল কিরূপে তাহার সন্ধান কে বলিয়া দিবে?

হয়তো অনুকূল অবস্থাতে পৃথিবীস্থিত অসাড় প্রাণহীন পদার্থেই হঠাৎ একদিন প্রাণের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে কালক্রমে সৃষ্টি হয় এই চির-রহস্যময় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিজগতের। জড়-জগতে যে কি করিয়া প্রাণের সাড়া জাগিতে পারে তাহার প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান বৈজ্ঞানিক দিতে না পারিলেও তাহারা এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, জলভাগে অর্থাৎ মহাসমুদ্রেই জীব তাহার জীবনের প্রথম যাত্রা সুরু করে।

বিশাল পাহাড়-পর্ব্বত এবং আরও নানাপ্রকার মৃত্তিকা-স্তরই হইল অতীতের ইতিহাস। তাহার এক

একটী স্তবে অতীতের ইতিহাস পরিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে—এক মাত্র অসুবিধা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সে লিপি পাঠ করা। কাজেই সাধারণের কাছে তাহা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। এক যুগ ধরিয়া যে সকল মৃত্তিকা-স্তর জমা হয় তাহাই পরবর্ত্তী যুগে কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়—এই সকল প্রস্তরের স্তর অনুসন্ধান করিয়া এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরীভূত জীবের কঙ্কাল দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ সেই যুগের জীবের জীবন রহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মহাসমুদ্রে যে-জীবের জন্ম হইয়াছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই, কাজেই মনে হয়, তাহাদের দেহে কোনরূপ কঙ্কাল ছিল না। তাহার পরের প্রস্তরের স্তরে অতি ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। এই যুগের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছপালারও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের কল্পিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত ইহাই প্রথম জীব—কাজেই এই যুগের প্রস্তরকে বলা হয় Protozoic (or First Life) rocks ইহার পরবর্ত্তীকালের স্তরকে বলা হয় Palaeozoic (or Ancient Life) rocks Palaeozoic যুগের জীব কীট-পতঙ্গ, নানাপ্রকার মৎস্য, কাঁকড়া, জলজ আগাছা। সামুদ্রিক বৃশ্চিকগুলি এক একটা আট ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত—কাজেই মনে হয় ইহারাই সে-সময়ে সবচেয়ে উন্নত প্রাণী ছিল। প্রায় দশ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বুকে এই জাতীয় জীব জীবন যাপন করিলেও তাহাদের প্রত্যেকের আধিপত্য ছিল জলে—যদি কোন হতভাগ্য জীব সমুদ্র-তরঙ্গে স্থলভাগে নিক্ষিপ্ত হইত মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার জীব-লীলা সাঙ্গ হইত।

আজিকার দিনেও পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই, যাহা জল ছাড়া জীবন ধারণ করিতে পারে। বর্ত্তমানে গাছপালা এবং অপরাপর সকল জীবই নিজ দেহে জল সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং প্রয়োজনানুসারে তাহা ব্যয় করিয়া জীবন ধারণ করে। কাজেই তাহারা অনায়াসেই স্থলভাগে চলিয়া বেড়াইতে এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। কেবল সঞ্চিত জলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইলে পুনরায় জল পাইলেই হইল। আদিম যুগে প্রাণীগণ অতীব প্রয়োজনীয় জল নিজ দেহে সঞ্চিত রাখিতে পারিত না বলিয়াই স্থলভাগে এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার বহিরাবরণ কঠিন ছিল বলিয়া তাহারা নিজ নিজ দেহে সামান্য জল সঞ্চিত রাখিতে পারিত এবং সমুদ্র-তরঙ্গে তটদেশে নিক্ষিপ্ত হইলেও পুনরায় স্রোতে সমুদ্রে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। সেই হইতে সৃষ্টির ইতিহাসে এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের কুয়াশার ক্ষীণ আবরণটুকুও ঘুচিয়া যাওয়ায় পৃথিবীর উপর সূর্য্য-রশ্মি পড়িতে থাকে অজস্র ধারায় এবং যে-সকল উদ্ভিদ্ সমুদ্রের তলদেশে গভীর তমসায় জীবন যাপন করিতেছিল, তাহারা সূর্য্য রশ্মির অপূর্ব্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া এবং প্রচুর মাত্রায় সূর্য্য রশ্মির সহায়তা পাইবার আশায় তাহাদের পুরাতন আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্থলভাগে নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিল। এইরূপে আদিম যুগের গাছপালা ক্রমশঃ স্থলভাগে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তারপর অতি অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত জলা জায়গা পুষ্পবিহীন গাছ-পালায় পরিপূর্ণ হইয়া মহারণ্যে পরিণত হইল। সেই যুগের Fern জাতীয় গাছগুলিই ছিল এবং একটা একশত ফুট উঁচু এবং তাহাদের কাণ্ডও বর্ত্তমানের সাধারণ গাছের কাণ্ডের চেয়ে কোন প্রকারেই ছোট ছিল না। তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার, তাই বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করেন, ভয়ঙ্কর আলোড়নের ফলে এই যুগের মহারণ্য স্থানে স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী যুগে তাহাই রূপান্তরিত হইয়া কয়লায় পরিণতি লাভ করে।

স্থলভাগে পুষ্পবিহীন উদ্ভিদের বিস্তার হইলেও শম্বুক, বৃশ্চিক, নানারূপ সরীসৃপ প্রভৃতি যে-সকল সচল প্রাণীর অস্তিত্ব সে-যুগে পাওয়া যায় তাহাদের সবার জীবন জলে

...গেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পরের Mesozoic (Mid ...) যুগে জন্মায় যত ভয়াবহ অতিকায় সরীসৃপ। ...তের অতিকায় Broutosaurus, Tyranosaurus, Stegosaurus প্রভৃতি ছিল জল-স্থলের একচ্ছত্র ...পতি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত শক্রতা করিয়াই ...কপাত করিতে ভালবাসিত। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ... এই, অতীতের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কবিশিষ্ট এই অতিকায়গুলি ... হঠাৎ একযোগে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ... তাহাদের একটীরও সন্ধান আর মিলে নাই। Mesozoic যুগের শেষভাগে কেবলমাত্র কচ্ছপ, কুম্ভীর ... গিরগিটি জাতীয় প্রাণীগুলিই বাঁচিয়া ছিল, ... তাহাদের প্রত্যেকটী বর্ত্তমানের প্রাণীদের চেয়ে ...নেক গুণ বড় ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে থাকে এবং গরম-প্রিয় অতিকায় প্রাণীগুলি শীতের অত্যধিক প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া একযোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী Cainozoic যুগে পৃথিবী যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় ...হইতে বর্ত্তমানে বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ... ধীরে ধীরে ঘাস, লতা, পাতা এবং আমাদের চির-...চিত নানারূপ পুষ্পিত বৃক্ষের জন্ম হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব ...পায়ীদল আত্মপ্রকাশ করায় সৃষ্টিকার্য্য অনেকাংশে সম্পূর্ণ ...। এই যুগের শূকর, গণ্ডার, হাতী, ঘোড়া, উট, হরিণ, বানর প্রভৃতি যে সকল জীবের আবির্ভাব হয় তাহারা ...ই বর্ত্তমান জগতের প্রাণীদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ। Darwin ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, Cainozoic যুগের বানর ...তীয় একপ্রকার প্রাণী হইতেই বর্ত্তমান মানবের উৎপত্তি। কথাটী হয়তো অনেকেরই ক্রোধের কারণ ... পারে, কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে অবিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই।

আদিমযুগের বানরাকৃতি মানব ছিল ভীরু ও কাপুরুষ, ...জেই তাহারা অন্যান্য হিংস্র জীব-জন্তুর সংস্রব এড়াইয়া ... গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। তারপর অনেকদিন ... তাহাদের অবয়ব এবং মস্তিষ্কের প্রভূত উন্নতি হয় ... পরিশেষে একদিন তাহারাই প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অতীতের সর্ব্বপ্রথম মানবের নাম Neanderthal মানব। যদিও কালক্রমে তাহারা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আকৃতিতে তাহারাই ছিল আমাদের অনুরূপ এবং তখনকার জীবজগতে তাহারাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। চকমকিদ্বারা আগুন জ্বালিতে শিখিয়া, পাথরের তৈরী নানারূপ অস্ত্র এবং চর্ম্ম-বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের খাওয়ার কোনরূপ বিচার ছিল না, যখন যাহা পাইত পরম তৃপ্তিতে, এমন কি মৃত জীব-জন্তুর পূতিগন্ধময় গলিত মাংস ভক্ষণ করিতেও তাহারা তিলমাত্র ঘৃণা বোধ করিত না। তাহারাই সর্ব্বপ্রথম এক একটী পরিবার একত্রিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকিতে আরম্ভ করে। তাহাদের পুত্র-সন্তান বড় হইলেই পরিবারের কর্ত্তা তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিত এবং সেও বিতাড়িত হইয়া নিজের জীবনের একটী উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিয়া নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা করিত। আদিম গুহাবাসী মানবের একমাত্র চিন্তা ছিল দিনের আলোকে আহারের সংস্থান করা এবং রাত্রের অন্ধকারে নিদ্রা-দেবীর বন্দনা করা—এতেই তাহারা ছিল সম্পূর্ণ সুখী।

Neanderthal নর যে যুগে বাস করিত তাহার নাম Early Palaeolithic (or Old Stone) Age প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা অথবা এসিয়াতে Homo Sapiens নামক একপ্রকার মানবের আবির্ভাব হয়, এবং কালক্রমে Neanderthal মানব সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। Homo Sapiens নামক মানবগণই বর্ত্তমান সভ্য মানব-জাতির প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষ। ইহাদের বুদ্ধি ছিল অনেক উন্নত। ইহারা আগুন এবং নানাপ্রকার হস্ত-নির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইত। তাহাদের আবাসস্থল গুহা-গাত্রে নানাপ্রকার মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং পাথর, হাতীর দাঁত প্রভৃতি খোদাই করিয়াও তাহাদের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে। তখনও তাহারা ছিল অসভ্য, কারণ তাহারা বেশীর ভাগই থাকিত উলঙ্গ এবং কৃষি-বিদ্যায় ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহারা বাসন-পত্র প্রস্তুত করিতে কিম্বা তাহার ব্যবহার

জানিত না, কাজেই তাহারা বেশীর ভাগই কাঁচা অথবা পোড়ান মাংস এবং ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিত।

এই জাতীয় মানব প্রায় পঁচিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বসবাস করিবার পর, যে-সভ্য মানবজাতির উদ্ভব হয় তাহাদের নাম Neolithic নর। প্রথম প্রথম তাহারা চামড়ার পোষাক পরিত, কিন্তু পরে তাহারাই নানারূপ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাই পরিধান করিতে আরম্ভ করে। তাহারা তীর-ধনুক তৈরী করিয়া তদ্বারা শত্রুর বিনাশ এবং আহারের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে এবং তাহারাই সর্ব্বপ্রথম আহার্য্য রন্ধন করিতে শিক্ষা করে। কালক্রমে প্রয়োজনের তাড়নায় তাহারা নানারূপ জীবজন্তু বশ করিয়া তাহাদের সহায়তায় অনেক দুরূহ কার্য্য অল্পায়াসে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। তামা, ব্রোঞ্জ, টিন, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি অনেক ধাতুর ব্যবহারও তখন হইতে আরম্ভ হয়। তারপর তাহারা তাহাদের গুহা-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে গড়িয়া ওঠে ছোট ছোট রাজ্য এবং মানুষ মানুষের অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনায় আরম্ভ করে যুদ্ধ-বিগ্রহ।

আজ সুসভ্য ও সমাজবদ্ধ মানবজাতি স্বীয় প্রতিভার শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভৃত উন্নতি করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে জলে, স্থলে, এমন কি আকাশমার্গে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আজ যে, শ্রমিক সামান্য রুটীর জন্য ধনিকের বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, চাষী জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কালো-আদমি শ্বেত প্রভুর পায়ের তলায় মাথা বিকাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এক কালে ইহাদেরই অসভ্য পূর্ব্বপুরুষ ছিল স্বাধীনতা প্রিয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত। তখন লড়াই এবং প্রভুত্ব-লিপ্সা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।
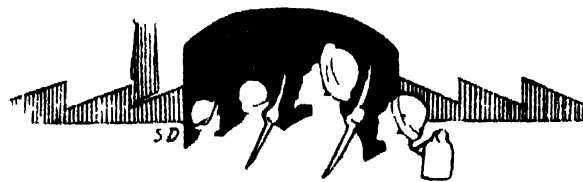
লেনিনের স্মৃতি

এন্. ক্রুপস্‌কায়া, অনুবাদক—সুধী প্রধান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি—

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর—১৯০৩—১৯০৪

কংগ্রেসের পর জেনেভাতে ফিরতেই আরম্ভ হ'ল অতীতের সমালোচনা। অন্যান্য সহরের রুশ-উপনিবেশ-গুলির নির্ব্বাসিতেরাই সব থেকে বেশী গোলমাল সুরু ক'রলে। বিদেশস্থ রুশ-সমাজতান্ত্রিক লীগের সভ্যেরা এসে প্রশ্ন করতো কংগ্রেসে কি হয়েছে? কি-নিয়ে এত গোলমাল? কেন তোমরা বিচ্ছেদ কামনা ক'রলে? প্লেখানভ্ এই সব প্রশ্নের ঝামেলায় অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে একদিন বলেছিলেন: "একজন এসেছিল এবং সে আমাকে প্রশ্ন করতে করতে বার বার বলছিল: তাহ'লে আমি বুরিডানভের মত একটা গাধা।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বিশেষ ক'রে বুরিডানভের কথাই বলছ কেন ?

রাশিয়া থেকেও লোকজন আসতে লাগলো। ঘটনাক্রমে পিটার্সবার্গ থেকে ইরেম এসে হাজির হ'ল। এক বছর আগে এর নামেই পিটার্সবার্গ সংগঠনের কাজে ইলিচ্ পত্র লিখতেন। সে অবিলম্বে মেন্‌শেভিকদের দলে ভিড়ে গেল এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমাদের সাক্ষাতে সে নাটকীয় ভঙ্গীতে ইলিচের দিকে ফিরে চীৎকার ক'রে উঠল "আমিই ইরেম"—তার পর মেনশেভিক্‌রাই যে ঠিক, সেই বিষয়ে সে একটা রীতিমত বক্তৃতা শুরু ক'রে দিল। আমার মনে পড়ে কিভ্-কমিটির একজন সভ্যও বার বার জানতে চেয়েছিল যে, এমন কি প্রকৃত অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'ল, যাতে ক'রে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠলো। আমি অবাক্ হ'য়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি কখনও ভিত্তির সঙ্গে ইমারতের এমন আদিম ব্যাখ্যা শুনিনি—এমনটা যে হ'তে পারে এ আমি কখনও ধারণাও করিনি। যে সব লোক আমাদের চাঁদা দিয়ে বা আলাপ আলোচনার জন্য ঘর দিয়ে ও অন্য প্রকারে সাহায্য ক'রতো, তারা মেনশেভিকদের প্রভাবে সে-সব বন্ধ করলো। আমার মনে পড়ে, আমার এক পুরানো বন্ধু—তার মায়ের সঙ্গে বোন্‌কে দেখতে এসে জেনেভায় ছিল। ছোট বেলায় তার সঙ্গে এমন মজার খেলা খেলেছি যে, সে এসেছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এখন সে বয়স্কা এবং সম্পূর্ণ অন্য রকমের হয়েছিল। আমাদের আলোচনায় তাদের পরিবার কি ভাবে সমাজতান্ত্রিক দলকে সব সময়ে সাহায্য করতো, একথা উঠতেই সে বল্লে: "আমরা আর আমাদের ঘর তোমাদের দেখাসাক্ষাতের জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। বলশেভিক্ ও মেন্‌শেভিকদের এই ভাঙ্গা-চোরার ব্যাপার আমরা পছন্দ করি না। এই সব ব্যক্তিগত ঝগড়া আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।" কিন্তু আমার ও ইলিচের কথা বলতে গেলে—আমাদের ভাবটা ছিল এই: এই সব তথাকথিত বন্ধুরা যারা কোন দলে যোগদান করে না এবং যারা ভাবে যে তাদের ক'টা টাকার সাহায্য বা দু'একবার ঘর ব্যবহার করতে দেওয়ার ফলে সর্ব্বহারা দলের মাথা কিনে নিয়েছেন—তারা গোল্লায় যাক্।

ইলিচ্ অবিলম্বে রাশিয়াতে ক্লেয়ার ও কার্জকে সব ব্যাপার লিখে জানালেন। রাশিয়াতে তারা অনেক হৈচৈ করলে, কিন্তু দরকারী উপদেশ কেউ দিতে পারলে না। যেমন, তারা প্রস্তাব ক'রে পাঠালো যে মার্টভ্‌কে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে ক'রে সে কোন গোপন অগম্য যায়গা থেকে সাধারণের বোধগম্য পুস্তিকা লিখতে পারে। কার্জকে বিদেশে পাঠানো ঠিক হয়েছিল।

কংগ্রেসের পর যখন প্লেখভ্ পুরানো সম্পাদকীয় বিভাগের লোকদের পূর্ণ-গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন, তখন ইলিচ্ আপত্তি করেননি, বিচ্ছেদ না-করে বরং পুরানো পথে হেঁচ্ড়ে চলা ভাল—এই ভেবে। কিন্তু মেনশেভিক্‌রা আপত্তি করে। জেনেভাতে ইলিচ্ মার্টভের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করেন। তিনি পোট্রেসভকে লেখেন যে, বস্তুতঃ বিচ্ছেদ ঘটবার প্রকৃত কারণ নেই। "মাসির" (কালমাইকোভার) কাছেও এ-সম্পর্কে লেখেন। কোন যে আর উপায় নেই এ ধারণা ইলিচের ছিল না। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে গুঁড়ো ক'রে দেওয়া, রাশিয়ার কাজে ব্যাঘাত করা এবং নব গঠিত দলের কার্যকারিতা নষ্ট করায়—ইলিচের কাছে মত্ততার সমতুল্য মনে হয়েছিল। এমন সময়ও এসেছে যখন ইলিচ্ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন—বিচ্ছেদ অনিবার্য। একবার ক্লেয়ারকে চিঠি লিখতে বসে তিনি লেখেন যে, ক্লেয়ার ভাল ক'রে জিনিষটা বোঝেনি। এটা বোঝা উচিত যে, পুরানো সম্পর্ক আমূল পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে—মার্টভের সঙ্গে পুরানো বন্ধুত্বের অবসান হয়েছে। অতএব পুরানো বন্ধুত্ব ভুলে যেতে—সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। এ-চিঠিটা কিন্তু লেখা শেষ হয়নি, পাঠানোও হয়নি। কারণ মার্টভের সঙ্গে বিচ্ছেদ করা ইলিচের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। পিটার্সবার্গে, পুরানো ইস্ক্রা চালানোর সময়ে একত্রে কাজ ত্ন'জনে নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছিল। সেই সব দিনে অত্যন্ত স্পর্শালু মার্টভ্ ইলিচের ধারণাকে যেমন ধরতে পারতেন, তেমনি চমৎকার প্রতিভার সঙ্গে সেগুলি ফোটাবার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইলিচ্ তীব্র ভাবে মেনশেভিক্‌দের বিরুদ্ধে লড়েন কিন্তু এই সময় একবারও মার্টভ্ যদি সামান্য পরিমাণে নির্ভুল পথ অবলম্বন করতেন তা'হলে ইলিচের পুরানো প্রীতি জেগে উঠ্‌তো। এই ব্যাপার ঘটেছিল ১৯১০ সালে—যখন প্যারিতে ইলিচ্ ও মার্টভ্ এক সঙ্গে "সোশ্যাল ডেমোক্রাট্" সম্পাদনার কাজ করতেন। অফিস থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে প্রায়ই উৎফুল্ল স্বরে বলতেন যে, মার্টভ্ নির্ভুল পথে চলেছে বা ড্যানের বিরুদ্ধতা ক'রছে। পরে রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে ফিরে, মার্টভের ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের কাজকর্ম্মে ইলিচ্ কত খুশী হয়েছিলেন। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তাতে বলশেভিক্‌দের সুবিধা হয়েছিল—এর কারণ এই হচ্ছে এই যে, মার্টভ্ যথোপযুক্ত কাজ করছে—বিপ্লবীর যে-ভাবে কাজ করা উচিত সেই ভাবে কাজ করছে।

ইলিচ্ যখন গুরুতরভাবে পীড়িত সেই সময় আমাকে করুণ কণ্ঠে জানিয়েছিলেন: "শুনলাম মার্টভ্‌ও নাকি মরণাপন্ন ....।"

কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রতিনিধি (বলশেভিক) কাজের জন্য রাশিয়াতে ফিরলেন। মেনশেভিক্‌রা গেল না, বরং তারা ড্যানের সঙ্গে যোগ দিল। বিদেশে তাদের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। জেনেভাতে যে-সব বলশেভিক্‌রা ছিল তারা মাঝে মাঝে মিলতে লাগলো। এই সব সভাতে প্লেখানভ্ সেই পূর্ব্বেকার মত ঝগড়াটে ভাব নিতেন এবং সকলের সঙ্গে কৌতুক করতেন।

শেষে কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য কাজ (ভ্যাসিলিয়েভ্) এলেন। জেনেভাতে পরস্পরের নিন্দায় যে বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তিনি অত্যন্ত দমে গেলেন। এক গাদা কাজের স্তূপে, যথা—গোলমালের মীমাংসা, রাশিয়াতে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা প্রভৃতিতে তিনি একেবারে চাপা পড়ে গেলেন।

নির্ব্বাসিতদের মধ্যে মেনশেভিক্‌রা কিছু সাফল্য লাভ ক'রেছিল—তাই বলশেভিক্‌দের বিরুদ্ধে লড়বে ব'লে স্থির করলো। লেনিন রাশিয়ার বিদেশস্থ সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন—তাই মেনশেভিক্‌রা তাঁর রিপোর্ট শোনার জন্য উক্ত দলের একটা সভা ডাকলো। এই সময়ে ঐ দলের ব্যবস্থাপক সমিতিতে আমি, লিট্‌ভিনভ্ ও ডিউচ্ ছিলেন। ডিউচের ইচ্ছা ছিল সভা করা, কিন্তু আমি ও লিট্‌ভিনভ্ এই জন্যে বিরুদ্ধে গেলাম যে আমরা বেশ জানতাম যে, যা অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে তাতে ওখানে বিশ্রী কেলেঙ্কারী হবে। তখন ডিউচের মনে পড়লো যে এই সমিতিতে বার্লিনের ভেচেস্লভ ও প্যারীর লেটেইসেন আছেন। বস্তুতঃ এঁরা বহুদিন

রেবত প্রত্যক্ষ ভাবে সমিতির কাজ করেননি কিন্তু পদত্যাগও করেননি। তাদের ভোট চাওয়াতে তারা সভা ডাকার প্রস্তাবে ভোট দিলেন।

এই সভায় যেতে সাইকেলে ক'রে যাবার সময় ইলিচ্ এতই চিন্তামগ্ন হয়েছিলেন যে, এক ট্রামের পিছনে ধাক্কা খেয়ে প্রায় চোখটা উপড়ে ফেলেছিলেন আর কি। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিষ্প্রভ মুখে সভাতে হাজির হ'লেন। দারুণ আক্রোশে মেনশেভিকরা তাঁকে সমালোচনা ক'রতে লাগলো। একটা উন্মত্ত দৃশ্য আমার মনে পড়ে—ভ্যান্ কাকমল ও অন্যান্য সকলে ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর দৃষ্টিতে প্রবল বেগে টেবিলে ঘুষি মারছে। এই সভাতে মেনশেভিকরা বলশেভিক্‌দের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তা' ছাড়া, সেখানে তাদের "দলপতিদের" সংখ্যা বেশী ছিল। মেনশেভিকরা সভাতে এমন একটা আইন পাশ করিয়ে নিলো—যাতে ক'রে লীগটাকে নিজের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে স্বতন্ত্র হ'য়েও মেনশেভিকরা নিজস্ব কাগজ চালাতে পারে। এর পর কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে কার্জ (ভ্যাসিলিয়েভ্) এই আইন উঠিয়ে নেবার দাবী জানালেন, কিন্তু সে দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি লীগকে (রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বৈদেশিক শাখা) ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল বলে ঘোষণা করলেন। মেনসোভিক্‌দের এই কোলেঙ্কারী প্লেখানভ্ সহ্য করতে না পেরে বললেন: "আমি আমার নিজের দিকে গুলি ছুঁড়তে পারি না"।

বলশেভিক্‌দের সভাতে প্লেখানভ্ বল্লেন যে, আমাদের মিটমাট করা উচিত। তিনি বল্লেন—"এমন সময়ও আসে যখন স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রও মিটমাট করতে রাজী হ'তে হয়"। পরোক্ষভাবে লিজা ক্রনিয়ানজ্ ঝঙ্কার দিলেন—"তাহ'লে তুল্‌তে হবে।" প্লেখানভের দৃষ্টি তার প্রতি আগুনের হল্‌কার মত জলে উঠলো।

দলের ভিতর শান্তি রাখতে প্লেখানভ্ পুরানো সম্পাদকীয় বিভাগকে পূর্ণ-নিয়োগ ক'রতে সিদ্ধান্ত করলেন। ইলিচ্ সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং বল্লেন যে, তিনি সহযোগিতা ক'রতে পারবেন না এবং তার পদত্যাগের কথা যদি ইস্ক্রাতে ছাপানো না হয় তা'হলেও তিনি আপত্তি করবেন না। প্লেখানভ্ যদি শান্তি আনতে পারেন আনুন, তিনি তার পথে বাধা হবেন না। অথচ, ঠিক এই ব্যাপারের কিছু আগে তিনি কাল্‌মাই কোভাকে লিখেছিলেন—"কাজ ছেড়ে দেওয়ার মত অন্ধপথে চলা আর কিছু নেই"। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে পদত্যাগ ক'রে তিনি এই অন্ধপথে যাত্রা সুরু করছেন—এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বিরোধীদল আরও চেয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সমিতির মন্ত্রণা সভার দু'টী আসন এবং লীগের সভার সিদ্ধান্তকে স্বীকার ক'রে নেওয়া। ঠিক হ'ল, দু'জন বিরোধীদিগের লোককে কেন্দ্রীয় সমিতিতে নেওয়া হবে। একজনকে মন্ত্রণা সভায় নেওয়া হবে এবং লীগকে পুনর্গঠন করা হবে, কিন্তু শান্তি হ'ল না। প্লেখানভের আপোষ মনোভাব বিরোধীদের সাহস বাড়িয়ে দিল। প্লেখানভ চাইলেন যে, আর একটী কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য, রু (গ্যালপারিন) মন্ত্রণা সভা থেকে চলে এলে একজন মেনশোভিক্‌কে জায়গা ছেড়ে দেবে। এই নতুন সুবিধা দিতে ইলিচ্ অনেক চিন্তা ক'রেছিলেন। আমার মনে পড়ে সে-দিন জেনেভার বিক্ষুব্ধ হ্রদের ধারে ইলিচ্, রু ও আমি—তিনজনে মিলে সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। রু ইলিচ্‌কে অনেক ক'রে রাজী করালো—শেষে ইলিচ্ প্লেখানভ্‌কে গিয়ে সম্মতি দিলেন।

মানভূম জেলা ছাত্র সম্মেলনীর পুরুলিয়া অধিবেশনের উদ্বোধন বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অংশ

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জ্জি

ছাত্রদের সম্পর্কে কোনও কথা বলতে গেলে আগেই মনে পড়ে সেই শিক্ষানীতির কথা যা আবহ সঙ্গীতের মত শিক্ষাবিভাগের অন্তরালে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদেশের লোক প্রাচ্য প্রথায় শিক্ষা পাবে না প্রতীচ্য প্রথায় শিক্ষা পাবে এই নিয়ে বেশ বাদ-বিতণ্ডা চলেছিল। প্রতীচ্য শিক্ষার ধারা যাতে এদেশে প্রবর্ত্তিত না হয় তাই নিয়ে দেশী-বিদেশী বহুলোক উঠে-পড়ে লেগেছিল। জন কোম্পানী ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি না ক'রে এদেশে শাসন ও শোষণ চালাবার পক্ষপাতী ছিল। অবশেষে লর্ড ম্যাকলে তাঁর এক আত্মীয়কে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে রাজী করতে পাঠান। তিনি যে-যুক্তির অবতারণা ক'রে কার্য্য উদ্ধার ক'রে আসেন তা হ'চ্ছে এই—"ভারতের অন্তর্নিহিত ভাব হ'চ্ছে বিদেশী শাসন দূর ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা। পাঠান এল, কিছুদিন রাজত্ব ক'রল। তাদের গরিমা চূর্ণ ক'রে ভারত আবার স্বাধীনতার স্রোত ফেরাল। মোগল এল, সে-ও কিছুকাল রাজত্ব করল। পরে তাকেও বিধ্বস্ত ক'রে ভারত স্বাধীনতা আনল। এখন আমরা (ব্রিটিশরা) এসেছি। আমাদেরও একদিন ঐ দুরাবস্থা আসবে। সুতরাং আমাদের স্থায়িত্ব কায়েমী করতে হ'লে এমন একদল ভারতবাসী সৃষ্টি করা দরকার যাদের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকবে—যাদের স্থায়িত্ব আমাদের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করবে। তারা সংস্কারে সন্তুষ্ট থাকবে, বিপ্লব চাইবে না।"—এখন দেখুন, এই দূর-দৃষ্টি নিয়ে চলায় ইংরেজ-শাসন এ-দেশে কতটা সাফল্য লাভ করেছে। আজকার রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনে যে দলাদলি চ'লেছে তার পেছনে এর ছাপ ধরা পড়ছে। তবু অবস্থা ফেরাবার আহ্বান দেশের অন্তরাত্মা থেকে এসে পড়ল।

—সে আজ অনেক দিনের কথা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্য লোকের দরকার হ'য়ে পড়েছিল। দরকারটা অবশ্য ঠিক কারও ব্যক্তিগত ধরণের ছিল না। এ জমানী সম্পত্তি রক্ষা করতে হ'বে, সার্ব্বজনীন সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে, অথচ সাবালক সমর্থ-জনেরা সুযোগ-সুবিধা ও সময়ের অভাবের তাড়নায় অপারগ ও বিক্ষোভ ভূমিকা নিলেন। সুতরাং যাদের নিজেদের রাগরাগ ঢাকবার কিছু নেই, যারা বাড়ীর খায়, বেপরোয়া থাকে, তাদের ডাক পড়ল, এই রকমের সব সুবিধা প্রাপ্ত all found হতচ্ছাড়ারা এগিয়ে পড়ল। কথায় বলে, 'সৈন্য বাহিনী পেটে হাঁটে।' কাঁচা-মাথা দেবার ব্যবসা তাদেরই হয়, যাদের শুধু পেটের কেন, কোন ভাবনাই ভাবতে হয় না। জীবনের অ-সামরিক বিভাগে এই ভূমিকা হ'চ্ছে তরুণ ও ছাত্রদের। বাপ-মায়েরটা খায়, পরের ভাবনা ভাবে, পরের কাজ করে, পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। সত্যি এমনটা হয় কেন?—প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে বলেই জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পেশা তাদের পেয়ে বসে। প্রাণের প্রাচুর্য্যটাই আসল। এই সময়েই তো তাকে সংকল্প করতে হবে যে, মানসো কুহেলিকাময় যবনিকা ঠেলে ওপারের বাস্তব সঞ্চয় তার কাজ। মাথা তার গগনস্পর্শী, কিন্তু পা' সে রাখবে এই ধূলো-মাটীর পৃথিবীর উপর। কল্পনা ও বাস্তবের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ যোগ নিয়ে সে চলবে পথে এগিয়ে। পাগলপারা হ'য়ে সে ছুটবে, দুনিয়ার যা-কিছু সম্পদ যা-কিছু সৃষ্টি-নীতি কুড়িয়ে আনবে তার ঝোলাতে—দেশকে ও দশকে দেবে বলে। এমন আপন-ভোলা না-হ'লে সংসারের ভাঙ্গা গড়ার খেলায় নির্ব্বিকার ভাবে নিজেকে এতদূর এগিয়ে নিতে পারত না। দেশের, দশের, সমাজের কল্যাণে

সদা উদ্ব্যুক্ত, উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা-যুদ্ধের অগ্রদূত, মুক্তি-বন্যা বইয়ে দেবার সাধনার ভগীরথ, সর্ব্ব-শুদ্ধ প্রচেষ্টার দধিচী-কল্প তাপস ছাত্রেরা দলে দলে আপন আপন খেলা খেলে যাচ্ছে। কিন্তু ছাত্র-জীবনটা স্থায়ী থাকছে। ছাত্র-সম্পর্কিত আন্দোলনের রূপ পরিবর্ত্তনশীল—ছাত্র-জীবনের সার অবিকৃত থেকে যায়। ১৯০৫ সালে যারা ছাত্র ছিল আজ তারা আর নেই। ১৯২১ সালে যারা ছাত্র ছিল আজ তারাও নেই। ১৯৩০ সালে যারা ছাত্র ছিল আজ হয়তো তাদের অনেকেই ছাত্র নেই। তাই ব'লে ছাত্রের আসনটা শূন্য হ'য়ে যায়নি, ছাত্রের সমস্যা কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে উঠছে, চিরন্তন পথ-যাত্রী ছাত্রকেও তার ভার তেমনি সম্পূর্ণ এগিয়ে এসে নিতে হবে।

আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। তবু মোটামুটি এগুলি মুখ্য যথা:—রাজনৈতিক, সামাজিক, সমাজ নৈতিক,রাজনৈতিক হিন্দু-মোস্লেম সম্পর্কিত এবং স্বাদেশিক বৈদেশিক বিষয়। আমরা পরাধীন বললে পরাধীনতার স্বরূপটুকু যথেষ্ট পরিস্ফুট হয় না। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্যক মিল পাওয়া যায় না। আমাদের পরাধীনতার অন্ত নেই। শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনায় এতখানি অগ্রসর আমাদের যে একটা প্রাচীন দেশ, এতখানি পরাধীন একরূপে মূর্চ্ছাহত, এমন আর একটা দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সুতরাং এখানে পৌরাণিক উপখ্যানের মত একটা মস্ত কিছু গজ-কচ্ছপের লড়াই লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলেছে। ভারতের মস্ত অভিমান হচ্ছে যে যখন জগৎ অন্ধকারে ডুবেছিল তখন জ্ঞানের আলো এখান থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সংস্কৃতির বন্যা এখান থেকে বয়েছিল, সভ্যতার আরোহণ—যার অপর নাম প্রকৃতির উপর মানুষের জয় স্থাপন—এখান থেকে সুরু হয়েছিল। এতখানি অতীতকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলা সোজা নয়। সেই জন্য অন্তঃসলিলা বস্তুর মত বাহিরের সংঘর্ষ ছাড়া মনোজগতে জেতা ও বিজেতার মধ্যে একটা কৃষ্টি বা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব চলেছে। মিশর, বেবিলিন, রোম, গ্রীশ, মেক্সিকো ও পেরুর পুরাতন সভ্যতা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ভারতের তাতো নষ্ট হয় নাই। বরং ভারত এখনও তার ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দূত দেশ-বিদেশে পাঠাচ্ছে এবং সেখান থেকে মান পাচ্ছে। পরাধীন জাতি এই দুর্দ্দিনেও বিশ্বকে শিষ্যত্বের পর্য্যায়ে কোনও একটু জায়গায় পাচ্ছে—শুধু নিচ্ছে না—দিচ্ছেও কিছু। এই তুষ্টির কারণটাকে বড় বিত্ত বলে আঁকড়ে ধরেছে। এত করে যে সমস্যার সম্মুখীন ছাত্র-বন্ধুরা হ'তে যাচ্ছেন তার গুরুত্ব ও জটিলত্ব বাড়ছে খুবই। তবু এই বিশিষ্ট ঘটনাটিকে অস্বীকার করবার জো নেই। আর একটা দিক বিবেচনার বিষয় না করে চলা যাবে না। ভারতের সভ্যতার গতি ছিল গ্রাম থেকে সহরের দিকে। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ও অপড়া বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান ছিল সহরের বাইরে। পাশ্চাত্য সভ্যতা—যা আজ আমাদের পেয়ে বসেছে—তার গতিপথ হচ্ছে সহর থেকে গ্রামের দিকে। এটা আজ সামান্য কথা, তবু আলোচনার বিষয়। আলোচ্য হয়না যদি আজও আমাদের দেশে শতকরা ৯০জন গ্রামবাসী না হ'ত। জাতটা গ্রামে বাস করে। জাতের জীবনরূপ বৃক্ষটি শিকড় দিয়ে রস টানবে কিম্বা পাতা দিয়ে রস টানবে অথবা বিজ্ঞানের সাহায্যে রস টানবে কৌশলটি একদম উল্টে দেওয়া যাবে—এই বিষয়টা শুধু পরিহাস রসিকের এলাকাভুক্ত করে ছেড়ে দিলেও চলবে না। মানুষে মানুষে এক হ'লেও তফাৎ আছে বিস্তর। ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, আব-হাওয়া, ক্রমবিকাশের বিভিন্ন রূপে অবস্থিতি, বিভেদ সৃষ্টি করে। তাছাড়া শিক্ষা সভ্যতা, সাধনা, সংস্কৃতির যে বিভেদ ঘটায় তাও তুচ্ছতাচ্ছল্য করার জিনিষ নয়, যে যেমন ব্যক্তিগত অভিমান সহজে মরে না, তেমনি জাতীয় অভিমানও সহজে যাবার নয়। এই জাতীয় অভিমান যায় না বলে এর যায়গায় আন্তর্জ্জাতীয় অভিমানকে প্রতিষ্ঠা দেবার ব্যবস্থা বহু মনীষী করেছেন। এই যে fanci frozen boundary ভাঙ্গার প্রচেষ্টা কল্পনা-বিজৃম্ভিত বেড়া দিয়ে ঘেরা জাতীয় সীমারেখা উড়িয়ে দেবার প্রয়াস প্রশংসানীয় হ'লেও কার্য্যকরী হয়নি। ষ্টালিন, তার রুশ দেশের বেড়াটুকু যে উল্লঙ্ঘন করবে ঘুঁষিতে তার নাক চেপ্টা করে দেবেন—বারে বারে বলেছেন।

অপরে তো বলেই থাকেন যে তাদের বেড়ার দিকে নজর দিলে মেরে থেবড়ে দিয়ে দেয়ালে ছবি করে এঁটে রাখবেন। এই দুটো সর্ব্ব ব্যাধিহর দাওয়াই আমাদের দেশে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পর্য্যন্ত যা ফল হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্য। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে যেমন স্বাদেশিকতা বেড়েছে তার সঙ্গে হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও অভ্যুত্থানের দিকটাও কম বাড়ে নাই। ১৯২০-২১ সালের খেলাফৎ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে ইসলামিক অভ্যুদয় ও অভ্যুত্থানের দিকটাও বহু বৃদ্ধিলাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতার এবটা বড় রকম পরিপন্থী হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। বহু মাথাওয়ালা লোক এটা ভেবেছেন ও ভাবছেন, উপরোক্ত দুটো ঔষধ চলা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্রুতগতিতে বহুগুণ বেড়ে চলেছে। অনেক আগে থেকে, ধীরগতিতে হলেও ১৯০৫ থেকে দ্রুতগতিতে জাতীয়তার প্রলেপ চলেছে। ১৯২২ থেকে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রচলন চলছে। যাদের দিক দিয়ে বিচার করলে বড় গলা করে বলার মতন কিছু দেখা যায় না, বিষময় দিকটা বরং অনেক বিরাটত্ব লাভ করেছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারে আজকাল হিন্দুমোস্লেম দাঙ্গা হয়, যা আগে হ'তনা। পর মত অসহিষ্ণুতা হিমালয়কেও দাবিয়ে রাখার মত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আজ চিন্তার দৈন্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? আমরা বলতে আরম্ভ করেছি হিন্দুস্থানে দুটো স্বতন্ত্র জাতি বাস করে- একটা হিন্দু অপরটা মুসলমান। কিন্তু হিন্দুস্থানের বাইরে কেউ এ ধারণা পোষণ করেনা। তারা জানে ভারতীয়েরা একটা জাতি—Indian nation।

শুধু এই নয় যতগুলি সমস্যার ফিরিস্তি বা লিষ্টি আমরা সামনে ধরেছি—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক শিক্ষানৈতিক, হিন্দু-মোস্লেম সাম্পর্কিক, স্বাদেশিক ও বৈদেশিক—যেখানে আমাদের মানুষ বলে গণ্য করছেনা—এর কোনটারই পূরাদস্তর সমাধান হ'বেনা যে পর্য্যন্ত না আমরা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করি—যে পর্য্যন্ত না সম্যক স্বাতন্ত্র্য আমাদের আয়ত্তীকৃত হয়। এই পৃথিবীতে একমাত্র আসল বস্তু হ'চ্ছে স্বাধীনতা। সেটা থাকলে আর সব পরিস্থিতি সহজ ও সোজা হয়ে যায়। স্বাধীন না হ'লে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়না—জাতীয় অর্থ নৈতিক দুঃখ দূর করার কল্পনা কার্য্যকরী হয়না, সব মানুষকে সমান করে ফেলার মনোবাঞ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়না বিদেশে নিজের ইজ্জৎ বজায় রেখে বাস করা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের যে আজ কুকুর, বেড়ালের অধম করে ফেলা হ'চ্ছে তার প্রতিকার হয়না কেন? কারণ আমরা স্বাধীন নই। চীনদেশে সাংহাই নগরে বিদেশী অধিকৃত একটি পার্ক বা জনসাধারণের বেড়াবার স্থানে একটা সাইন বোর্ড দেওয়া ছিল "Dogs and the Chinese are not allowed here" (কুকুর ও চীনদেশীয় লোকের স্থান এখানে নাই)। নিজবাসভূমিতে পরবাসীর দুঃখ আছেই। ব্যাপারটা হ'চ্ছে এইরকম—ইংরাজ ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিন, ইতালী, রুশ বা জাপানী জানে যে তার ইজ্জৎ বজায় রাখার জন্য তার পিছনে আছে তার জাত—তার দেশ। আমাদের পিছনে আছে কে?

শুধু নারায়ণের মাথায় ভার চাপিয়ে বসে থাকলে ত হ'বে না। পরস্পরে বিরোধী, বিদ্বেষী ও সংঘর্ষী দলগুলি নিজের জিতের জন্য তাঁর কাছে আর্জ্জি পেশ ক্রমাগত করছে। কোন্ ভক্তকে তিনি চটাবেন? সকলকেই আশ্বাস দিতে হয়। আর কলিকালের অজুহাতে দেবতার নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে থাকাই দরকার হয়ে পড়ে। সে নিদ্রা করে ভাঙ্গবে মানুষ জানে না। সুতরাং সমস্যা সমাধানের আশুভার উপস্থিত নিজেদের হাতেই নিতে হয়। আমরা এমন স্বাধীনতা আনব যাতে শুধু রাজনৈতিক মুক্তি থাকবে না—আরও থাকবে সেই সামাজিক ব্যবস্থা যাতে করে প্রত্যেকে নিজ জীবনটুকু ফুটিয়ে তোলার সমান সুবিধা পায়। অর্থনৈতিক দাসত্বের নিগড়ে একে অপরকে বেঁধে রাখবে না। এক কথায় সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমচেতনার মধ্যে সকলের মন ও দেহ বেড়ে ওঠবার পথ পাবে! এবার শেষ কথা বলে বিদায় নেই।

"আজ কালের দিনে ছাত্র বলি কাকে? যে ছাত্র দেশের ও দশের মাথা রক্ষা করার সম্বন্ধ নিয়ে জীবন-যাত্রা সুরু করেছে, যত উদ্বেগ, যত বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিতে দৃঢ়সঙ্কল্প—যার পরিচয় দিতে বলতে হয়।"

ঝড় তুফানের সঙ্গী মোরা মোদের যে এই পরিচয়
ক্ষণে আছি, ক্ষণে হাসি, ক্ষণেকেতে পাই লয়।
তুলছি যখন উচ্চহাসি, বাজতে পারে বিদায় বাঁশী
মোদের দেবী সর্ব্বব্যাপী—এমনি হঠাৎ টেনে লয়।"

তাকে আমি চিনি। তাকে আমি আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। ভারত আমাদের দেশ হ'লেও আজও আমাদের স্বদেশ হয় নাই, তাকে স্বদেশ করার ভার আপনাদের। আজ দেশ শতধা-বিচ্ছিন্ন, মনে মনে অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ। দলাদলিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রাধান্যের মোহে ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি দিতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে না। শতধা-বিচ্ছিন্ন চীন দেশের নূতন দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থা-ভিমুখে আমরা ছুটে চলেছি। এর থেকে দেশকে বাঁচাতে হ'লে বিশুদ্ধ আত্ম-দান, সুনির্ম্মল আত্মাহুতির ডাক শুনে যেন আপনারা জয়যাত্রা সুরু করেন—এই আমার আন্তরিক কামনা।

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সমস্যা আজও সমাধান হয়নি। নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হবার ফলে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীগণ তাঁদের সকলের একত্র মুক্তির ন্যায্য দাবী আদায়ের অন্য কোন পন্থা মুক্ত নেই দেখে অনশন করে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অসহায় মূক বন্দীদের মুক্তির দাবীকে দেশ স্বীকার করে নিল—জনগণ চঞ্চল হয়ে উঠল,—সেদিন ভারতের সর্ব্বত্র যে চাঞ্চল্য, যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, গভর্ণমেণ্ট তার চাপ অস্বীকার করতে পারেননি—আন্দামান থেকে বন্দীদের ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন তারই ফলে। এদিকে গান্ধীজীও বন্দীদের অনশন ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন এই বলে যে, দেশ তাঁদের মুক্তির দাবী মেনে নিয়েছে এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি আন্দোলন দিলেন বন্ধ ক'রে। এদিকে সরকারের সঙ্গে তাঁদের মুক্তির আন্দোলনও গেল ব্যর্থ হ'য়ে। ফলে আজও বহু বন্দী কারাগারের অন্ধ-কূপে রয়েছেন। দেশে আন্দোলন নেই বলে নিরাশ হয়ে গত ৭ই জুলাই থেকে পুনরায় অনশন আরম্ভ করেছেন। মুক্তি দেবার দায়িত্ব নিয়ে যে আন্দোলন গান্ধীজী নিজ হাতে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন আজ সে দায়িত্বের মর্য্যাদা যখন সে-পথে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না, তখন অন্য পন্থা কি আছে? যে আন্দোলন তিনি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন সে আন্দোলন আজ তারা নিজে থেকে আরম্ভ ক'রে দিলে মুক্তির অন্য পন্থা পাওয়া যাবে। আন্দোলনের যে হাওয়া একদিন বয়েছিল, তাদের মুক্তির পথ সুগম ক'রে তুলবার জন্য সে বাতাস পুনরায় বইয়ে দেবার দায়িত্ব আজ তাঁরই—এবং তিনিই শুধু পারেন। বন্ধ করতে যিনি পেরেছিলেন দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করবার ক্ষমতাও তাঁরই আছে। দেশ তাঁর কাছ থেকে এই দাবী করেছে—এ দাবী করবার অধিকার ও তার আছে। ক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ বন্দীরা আজ যদি জিজ্ঞেস করেন তাঁদের অনশন, দেশের আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়ে মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, সে মুক্তি তাঁদের কোথায়? কী তিনি এনেছেন তাঁদের জন্য? গান্ধীজী এর কী উত্তর দেবেন? উত্তর আছে শুধু তাঁর নিজ হাতে, পুনরায় সেই আন্দোলন সৃষ্টি করে তোলা—যে আন্দোলন বিচলিত জনগণ সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে তুলে সরকারকে বাধ্য করে আদায় করবে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের ন্যায্য দাবী, আনবে তাদের সকলের মুক্তি।

গঠনতন্ত্র সাব কমিটি

এবারে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বোম্বাইতে হয়েছে। তাতে যে কয়টা সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার মধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধন করার একটি প্রস্তাব প্রধান। কংগ্রেসের মধ্যে বাজে সদস্য গ্রহণ ইত্যাদি বহু গলদ এবং ক্রুটী আছে। সেগুলি কিরূপ সংশোধন করা যায় সেটা একটা গুরুতর সমস্যা। গঠনতন্ত্র সাব-কমিটিতে প্রস্তাব করা হ'ল যে, কোনো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সদস্যকে অথবা কংগ্রেস থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী কর্ম্মী বা দলকে কংগ্রেসের সদস্য পদ থেকে বিচ্যুত করবার অধিকার কার্য্যকরী সমিতির হাতে থাকবে। এই নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডা হয়—পণ্ডিত জওহরলাল এবং আচার্য্য নরেন্দ্র দেব এই প্রস্তাবের তীব্র বিরুদ্ধতা করেন। ফলে সামনাসামনি এবং এখনি গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা এনে ফেলতে গান্ধীজী ইতস্ততঃ করলেন। তাই ঠিক হ'ল আগামী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এই গুরুতর বিষয়টির সমাধান হবে।

কংগ্রেসের মধ্যে যত ক্রুটী প্রবেশ করেছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাজে সদস্য গ্রহণ করা। উপরি উক্ত যে

প্রস্তাব কংগ্রেসে এসেছে সেটা যে এই গলদ দূর করতে সমর্থ পাববে সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

সাঁতারা রাজনৈতিক কনফারেন্সে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায় এ-বিষয়ে যে প্রস্তাব করেছেন তা স্পষ্ট ও সুবিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে কিছুদিন অন্তর অন্তরই সভা আহ্বান করা উচিত। যদি দেখা যায় কতগুলি সভাতে অনবরত কেউ অনুপস্থিত থাকছে তখন অনায়াসে বোঝা যাবে যে সে ব্যক্তি সদস্য, তার শারীরিক অস্তিত্বেরই অভাব। তখন তার নাম কেটে দিয়ে কংগ্রেসকে সংশোধন করা খুবই সহজ। তাছাড়া এরূপ ঘন ঘন সভা করার ফলে প্রাথমিক সদস্যগণ অর্থাৎ জনসাধারণ কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় ও অধিক রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হয়। এদিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী সমন্বয় কমিটি

ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে বামপন্থীদলগুলিকে সংঘবদ্ধ করবার যে কথা হয়েছিল তা কাজে পরিণত হয় নাই। বহু আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে, যে-সব বামপন্থী দলেরা সংঘবদ্ধ হয় নাই তাদের ফরওয়ার্ড ব্লক সংঘবদ্ধ করবে এবং এটা একটা বামপন্থী দলে পরিণত হবে। এক দলে পরিণত হবার বীজ পূর্ব্বেই এর মধ্যে নিহিত ছিল, যখন সুভাষবাবু সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী ইত্যাদি দলের নেতাদের অনুরোধ করলেন তাদের সদস্যদের ফরওয়ার্ড ব্লকে ব্যক্তিগতভাবে যোগদানের অনুমতি দেবার জন্য।

যাহোক, ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে একটী বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত বামপন্থী দলের প্রতিনিধিরাই আছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল, র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস লীগ, সাম্যবাদীদল ও কিষাণ সভা সকলেই নিজেদের পৃথক পৃথক সত্তা বজায় রেখে এতে যোগ দিয়েছেন। এই কমিটিতে সমস্ত দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটী কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে সকলে একত্র হয়ে কাজ করা যেখানে সম্ভব হবে শুধু সেখানেই এই কমিটি কার্য্যকরী হবে—যেমন বন্দীমুক্তি সমস্যা ইত্যাদি। কিন্তু আসল কার্য্যনীতি ও ধারা যেখানে বিভিন্ন হবে সেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভব হবে না। তবুও সকল বামপন্থী দলের প্রতিনিধি নিয়ে এই সমন্বয় কমিটি যতটা সম্ভব একত্র হয়ে কাজ করবার প্রচেষ্টা শুভ লক্ষণ।

র‍্যাডিকেল কংগ্রেস-সেবী সংঘ

পুণাতে র‍্যাডিকেল কংগ্রেস-সেবী সংঘের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন তা একদিকে যেমন সুযুক্তি সম্ভূত, অন্যদিকে তেমনি বর্ত্তমান অস্পষ্ট অপরিষ্কার রাজনৈতিক আবহাওয়ার কুয়াশা ভেদ করে সময়োপযোগী স্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ পথ নির্দ্দেশ করেছে।

বর্ত্তমান কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের নীতি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ। শ্রীযুক্ত রায় বলেন, স্বাধীনতা কখনো শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে আসে না, আসতে পারে না। এই কথাগুলি গান্ধীজীর পরিকল্পিত অহিংস নীতির সহিত জড়িত। সকল দেশে সকলকালে স্বাধীনতা এসেছে বিপ্লবের পথে।

বর্ত্তমানে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংস্কারকামী ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যেটুকু সংস্কারই আসুক না কেন—তা স্বাধীনতা নয়। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের জন্য বর্ত্তমানে প্রয়োজন নতুন নেতৃত্বের—প্রয়োজন বৈপ্লবিক নেতৃত্বের।

এই নতুন নেতৃত্ব কিছু হঠাৎ হয়ে উঠবে না অথবা অতীতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হবে না, পুরাতন আন্দোলন, পুরাতন কর্ম্মধারা থেকেই হবে এর উদ্ভব, এর জাগরণ, এর গতি সৃষ্টি, প্রয়োজনে শুধু নতুন একটা স্রোত খুঁজে পথ বের করে নিল।

তাই স্বাধীনতা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তা হ'লে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারকামী মনোভাবের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এই নতুন নেতৃত্ব উদ্ভূত হ'তেই হবে পুরাতনের

বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে। এই নতুন বৈপ্লবিক নেতৃত্বই শুধু এখন দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়ে আনতে পারবে স্বাধীনতা।

এই নেতৃত্ব গড়ে উঠবে জনসাধারণের আন্দোলনের ভিতর থেকেই। তাই প্রয়োজন হয়েছে জনসাধারণকে অধিকতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ক'রে তাদের কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে আনা। এ কাজ করা যায় যদি কংগ্রেস কর্মীগণ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদের নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় না রেখে সর্বদা তাদের সংস্পর্শে এসে কংগ্রেসকে তাদের আপন করিয়ে নিয়ে সচেতন সক্রিয় ক'রে তুলতে পারেন তখন তারাই হবে প্রকৃত কর্মী—তাদের সেই গণ-আন্দোলনই আনবে রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

হায়দ্রাবাদ জেলে অত্যাচার

গত ৫ই জুন মহাশয় কৃষ্ণ প্রায় আটশত সত্যাগ্রাহী সহ গ্রেপ্তার হয়ে ঔরঙ্গবাদ জেলে নীত হন। জেলে খাদ্য ও পানীয়ের অত্যন্ত অভাব হয়েছিল। তিন দিন ধরে এরূপ খাদ্য ও জলের অভাব সহ্য করার পর স্বভাবতঃই সত্যাগ্রহীরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন, এবং তাঁরা তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় আহারের জন্য চীৎকার করতে থাকেন। তখন জেলার হঠাৎ চারশত পুলিস সহ ভিতরে এসে লাঠি ও ব্যাটনদ্বারা বন্দীদের প্রহার করতে আরম্ভ করেন। ফলে প্রায় একশত বন্দী আহত হ'ন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

গত ১০ই জুলাই কমন্স সভায় লেঃ কর্ণেল মুইর হেড্‌কে মিঃ গ্রীণফেল এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতে অনুরোধ করেন। তার উত্তরে কর্ণেল মুইর-হেড বলেন যে, এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তের কোনো কারণ ঘটেছে ব'লে তিনি মনে করেন না। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, অত্যাচারের বেদনা, অসহায়ের যাতনা, এমনি করেই অধীন জাতিকে চঞ্চল করে তোলে। রুদ্ধদ্বার বন্দীদের জেলের মধ্যে নির্ম্মমভাবে প্রহার বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে নতুন নয়। হিজলীর গুলির কথা দেশ ভোলে নাই। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত বাংলার জেলগুলিতে কি ঘটেছে, তাও অনেকের মনে আছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু দিনে বাংলাদেশ সেই বীরকে স্মরণ করে পূজার্ঘ্য দিয়েছে, তাঁর নির্ম্মল চরিত্রের, তাঁর স্বাধীন চিত্তের, তাঁর বীরত্বের যে অপলাপ ইংরাজের ইতিহাসে লেখা আছে, সে যে কত বড় মিথ্যা সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা কলঙ্ক তাঁর ওপর আরোপ ক'রে যে কাহিনী লেখা হয়েছে সে কথা শুধু ইতিহাসে রেখেই ইংরাজ নিরস্ত হয়নি, লর্ড কার্জন তা মূর্ত্তিতে গ্রথিত ক'রে প্রস্তরাকারে রেখে চিরন্তন করে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রস্তর নির্ম্মিত হলওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙ্গে ফেলে ইতিহাস থেকে এই কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে এই স্বাধীনতার সহিদকে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি যে-দিন বাংলা দিতে পারবে, সেদিন হবে এই বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত, এই লাঞ্ছিত বীরের প্রকৃত পূজা।

নিষেধাজ্ঞা জারী

রোটকে সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যাবার পথে আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রে পাঞ্জাবের গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব পাঞ্জাবে প্রবেশ করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও দিল্লীতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরূপ সম্মেলন তো ভারতের বহু জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে—কোথাও তার সভাপতির প্রতি এমন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে গান্ধীজীর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন কি আদেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করাও হ'তে পারে। গান্ধীজী সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কুর কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হবার কি কারণ থাকতে পারে তা বুদ্ধির অতীত। বিশেষতঃ যে-ক্ষেত্রে গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আন্দোলন বন্ধ রাখতে

এককারের সঙ্গে আপোষ করতে এবং দাবী কমিয়ে ফেলতে পর্যন্ত উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রজাসাধারণও তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করে নিয়েছেন।

ইংলণ্ডে বোমার উপদ্রব

ইংলণ্ডে যেখানে সেখানে বোমার উপদ্রব দেখা দিয়েছে। আয়ার্লণ্ড, গুপ্তভাবে বহুপ্রকারেই ইংলণ্ডকে জব্দ করে চাপ দেবার চেষ্টা করে এসেছে। কাজেই গোপনে এভাবে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তোলা তার আজকের নূতন পন্থা নয়। উত্তর আয়ার্লণ্ড আলষ্টার এখনো ডি ভেলেরার স্বাধীন দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ডের সহিত যুক্ত হয় নাই। তাই সেই আন্দোলনেরই এটা একটা বাহিরের প্রকাশ মাত্র। সারা জগতে স্বাধীনতার সাড়া পড়ে গেছে। দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ড স্বাধীন হয়ে গেল, উত্তর আয়ার্লাণ্ডেও তার ঢেউ জেগেছে—তাই এই আন্দোলন।

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া

ইঙ্গ-ফরাসী সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদনে কেন যে এত বিলম্ব হচ্ছে তা বোঝা খুব কঠিন নয়। ইংল্যাণ্ড নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য পোলাণ্ডকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কার্য্যকরী করবার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট করা সে প্রয়োজন বোধ করেছিল। ইচ্ছা ছিল জার্ম্মাণীর সঙ্গে পোলাণ্ডের যুদ্ধ বাধলে রাশিয়াকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজে নেপথ্যে থেকে দেখবে রাশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধের পরিণতি সাম্যবাদের সহিত ফ্যাসিষ্ট মতবাদের যুদ্ধের ফল। এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী মতবাদের যুদ্ধই অবশ্যম্ভাবী ইওরোপীয় যুদ্ধ। রাশিয়া ইংলণ্ডের মনোভাব অগোচরে বুঝে নিয়ে তাকে জানিয়েছে যে, এই ইঙ্গ-ফরাসী সোভিয়েট প্যাক্ট সম্ভব হবে যদি বিশ্ব-শান্তির জন্য তারা সকলেই এই তিনশক্তির মধ্যে যে কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আক্রান্ত হ'লে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে চুক্তি আবদ্ধ থাকে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যে মন্থর গতিতে এই আলোচনা অগ্রসর হচ্ছে এবং যে ভাবে ইংল্যাণ্ড চলছে তাতে এই প্যাক্টের পরিণতি কি হবে কিছুই বলা যায় না।

ডানজিগ সমস্যা—

এদিকে জার্ম্মাণী চুপ করে বসে নেই। তার কূটনীতি স্বভাব আপন পন্থায় পথ পরিষ্কার করে ফেলেছে, ডানজিগে তোড়জোড় পড়ে গেছে। ইওরোপের অবস্থা তাই সঙ্গীন দেখে সবাই আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন। জার্ম্মাণী এতগুলি রাজ্য যে নীতিতে আপন জঠরে পূরণ করেছে ডানজিগেও সেই নীতিই অবলম্বন করেছে। হঠাৎ আক্রমণ করে যুদ্ধ করার নীতি সে নেয়নি। সর্ব্বত্রই যেমন দেখা গেছে ডানজিগেও তেমনি ধীরে ধীরে পোলিশ প্রভাব অচল করে দিয়ে তাকে নাৎসী প্রভাবদ্বারা তাকে গ্রাস করবার উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। বহুদিন যাবৎই জাতীয় সমাজতন্ত্রী নাৎসীদল কর্ত্তৃক ডানজিগে এই ভাবে কাজ চলে আসছে। পূর্ব্ব প্রুশিয়া থেকে গভীর নিশিথে বহু অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী এরা ডানজিগে আমদানী করেছে—যদিও ডানজিগে পুলিস ছাড়া অন্য কোন সৈন্য রাখবারও নিয়ম নাই। এই ভাবে নাৎসী ভ্রমণকারীদল তাদের সমর সম্ভার এবং যুদ্ধ আয়োজন পূর্ণ ভাবেই প্রস্তুত করে রেখেছে। ডানজিগ constitution-এর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ডানজিগ যুবকদের জার্ম্মাণীতে গিয়ে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে ডানজিগে রক্ষী-সৈন্য হিসাবে ফিরিয়ে এনে রাখা হয়েছে। ভিসচুলা নদীর মুখে ঘাঁটি বসিয়ে কামান সজ্জিত ক'রে রাখা হয়েছে। পোলিশ কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম-চ্যুতি হচ্ছে। সৈন্য বোঝাই লরী রাস্তায় পরিক্রমণ করছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ পোলিশ প্রভাব মুক্ত করবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির আয়োজন চলছে। অন্তর্বিপ্লব আগতপ্রায়। জার্ম্মাণী চায় নাৎসীপ্রভাবে অন্তর্বিপ্লব এনে ফেলে ডানজিগকে পোলিস অধিকার হতে মুক্ত করে জার্ম্মাণীর অধীনে নিয়ে আসা। তাই এই অন্তর্বিপ্লবের আনুসঙ্গিক কার্য্যাবলী। পোলদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে, তাদের বাণিজ্যের অধিকার অমান্য না ক'রে সর্ব্বপ্রকারে তাদের দুর্ব্বল ও হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত অবস্থাই তারা এমন করে তুলছে যেন ডানজিগ ফ্রি সিটিতে পোলিশ কর্ত্তৃত্ব কেউ আর চাইছে না।

এদিকে পোলাণ্ডের সমুদ্রে যাবার এবং বাণিজ্য করবার এই একটি মাত্র রাস্তা সেও ত্যাগ করবে না —তারা বলেছে ডানজিগে তাদের অধিকার একবিন্দুও ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না ফ্রি সিটির constitution অনুসারে পোলাণ্ডের অধিকার আছে যে ডানজিগ কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনো গোলযোগ শান্ত করতে অক্ষম হয়। তবে পোলাণ্ড প্রথমে তার পুলিশসহ ডানজিগ পুলিসবাহিনীকে সাহায্য করবে তারপর আসবে পোলাণ্ডের সৈন্যদল। ডানজিগে তাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, তাদের অধিকারের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যদি পোলাণ্ড চুপ করে থাকে তবে তাদের অধিকার তারা হারাবে এবং সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। আবার যদি পোলাণ্ড আপন অধিকার বজায় রাখবার জন্য এই গোলযোগে হস্তক্ষেপ করে তবে নাৎসী জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল তাদের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবে। এই কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করবার যে, পোলাণ্ড ডানজিগকে অধীন করবার চেষ্টায় যুদ্ধ করছে। ওদিকে নিজেরা এই যুদ্ধের প্রত্যাশায়ই পূর্ব্ব হতে অস্ত্র-সজ্জায় প্রস্তুত হয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ ডানজিগে সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্ম্মানদের স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে হিটলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। ডানজিগের বর্ত্তমান এই অবস্থায় সমগ্র জগৎ উৎক[illegible] হয়ে রয়েছে।

ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স কি করবে? জোর গলা[illegible] এখনো ইংল্যাণ্ড বলছে পোলাণ্ডকে রক্ষা করবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছে তা তারা নিশ্চয়ই রক্ষা করবে। অর্থাৎ জার্ম্মাণী যদি পোলাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে বা তা[illegible] অধিকার আক্রমণ করে তবে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স পোলাণ্ডকে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জার্ম্মাণী যদি এর কূট-নীতির প্যাঁচে ফেলে তখন এরা কি করবে? ডানজিগে অশান্তি নিবারণার্থ পোলাণ্ড আপন সৈন্যসম্ভারের দমন করতে আরম্ভ করলে পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিতে পারে। তাতে যে রক্তপাত ঘটবার সম্ভাবনা,—তাকে জার্ম্মাণী যদি বলে ডানজিগ অধিকারে[illegible] পোলাণ্ডের এই আক্রমণ—ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স কি করবে? পোলাণ্ড আক্রান্ত হলে ইংল্যাণ্ড সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,—কিন্তু পোলাণ্ড আক্রমণ করলে সে কি করবে তা তো বলে নাই। হিট্‌লারের এই কূট চালে প[illegible] ইংল্যাণ্ড ঘেমে উঠেছে।

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার হইতে শ্রীপরিমল বিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'তারকা'র ইঙ্গিত

ছায়া-ছবির জগতে শ্রীমতী কানন দেবীর মত সর্বজনপ্রিয় 'তারকা' কমই আছেন। শ্রীমতী কানন দেবী বলেন: "কোনো ছবিতে কাজ করতে করতে যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই এক পেয়ালা চা খেয়ে নি।" হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী জোন্ ক্রফোর্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে কানন দেবীর মিল আছে। ক্রফোর্ডও এক পেয়ালা চা খেতে খেতে রিহার্স্যাল দেন। কানন দেবী বা জোন্ ক্রফোর্ড আপনি যাঁরই ভক্ত হন্ না কেন, জানবেন যে সে-'তারকা'র দীপ্তি জোগাচ্ছে চা-ই।

'তারকা'রা চায় ভারতীয় চা

[ইণ্ডি]য়ান্ টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত — IK 13[illegible]

বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া 'মন্দিরা'র নাম উল্লেখ করিবেন।

বাঙ্গালীর অর্থে ও স্বার্থে

প্রতিষ্ঠিত

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

ঢাকা

৪ সহস্রাধিক বাঙ্গালী শিল্পী ও শ্রমিক
পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে।

দ্বিতীয় মিলের কাপড় ও সার্টিং
বাজারে বাহির হইয়াছে।

ট্রপিক্যাল

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

ট্রপিক্যাল বিল্ডিংস্—নিউ দিল্লী

চেয়ারম্যান

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুবিধাজনক এজেন্সী সর্ত্তের জন্য আবেদন করুন।

শাখা অফিস:—

পি ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—**বি, এন, বসু**

পাটনা অফিস:—

কৃষ্ণা ম্যানসনস্, ফ্রেজার রোড।

ঢাকা অফিস:—

২০নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

"LEE" 'লি'

বাজারে প্রচলিত সকল রকম মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে "লী" ডবল ডিমাই মেশিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে ছবি, ফর্ম্মা, জব ও সংবাদপত্র সকল রকম কাজই অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

মূল্য বেশী নয়—অথচ সুবিধা অনেক।

একমাত্র এজেণ্ট:—

প্রিণ্টিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেশিনারী লিঃ

পিঃ ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ২৩১২

বিজ্ঞাপন দাতাদের পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া 'মন্দিরা'র নাম উল্লেখ করিবেন।

= সূচী =

লোটাস সেণ্টেড

নারিকেল তৈল

যে তৈল লঘু, স্বভাবত অল্পগন্ধ, যাহা সহজে বিকৃত হয় না, তাহাই কেশচর্যায় প্রশস্ত। বিশুদ্ধ নাবিকেল তৈলের এই ত্রিবিধ গুণ আছে। কেশ তৈলে গন্ধযোগ আবশ্যক, কিন্তু সুগন্ধ মাত্রই নিবাপদ নয়, অতিগন্ধও কেশক্ষয়কব।

নিত্য কেশ-প্রসাধনে বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত লোটাস সেণ্টেড নাবিকেল তৈল সর্বোত্তম। ইহাব উপাদান বিশুদ্ধ, গন্ধবস্তু নিরাপদ, গন্ধমাত্রা পবিমিত অথচ মনোবম। পবিমাণে প্রচুব এবং আধাবেব অনথক আড়ম্বব নাই, সেজন্য মূল্য অল্প। সুরুচিসম্পন্ন নব-নাবী মাত্রেই এই স্নিগ্ধ গন্ধাধিবাসিত তৈল ব্যবহাবে তৃপ্ত হইবেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা বোম্বাই

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৮-১৯৩৯)

৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

—ব্রাঞ্চ—

বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ নাগপুর, পাটনা, ঢাকা

চল্‌তি বীমা (১৯৩৭-৩৮)		১৪	কোটি	৬০ লক্ষের	উপর
মোট সংস্থান	„	২	„	৯৭ লক্ষের	„
বীমা তহবীল	„	২	„	৬৭ লক্ষের	„
মোট আয়	„			৭৯ লক্ষের	„
দাবী শোধ	„	১	„	৬০ লক্ষের	„

—এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস—কলিকাতা

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে

প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা	আজীবন বীমায়	১৬৲
বাৎসরিক বোনাস্	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া 'মন্দিরা'র নাম উল্লেখ করিবেন।

এগারোটা বাজে

নিরিবিলি বসে' এক পেয়ালা চা খাবার এ-ই সময়। সমস্ত সকাল গেছে সংসারের অবিশ্রান্ত খাটুনি—এখন এক পেয়ালা চা খেয়ে শরীর মন তাজা করে' নিন্। সাম্‌নে পড়ে আছে সারাটা দিন—মুখর বিকেল আর সুন্দর সন্ধ্যা। এক পেয়ালা চা নিয়ে আরামে বসে' এই দীর্ঘ দিনটাকে আপনি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন, তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা

সব জায়গায় সব সময় চলে

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্‌সপ্যান্‌সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 119

ঝরণা

শিল্পী—নন্দলাল বসু

দ্বিতীয় বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৬ | পঞ্চম সংখ্যা

কারাগার

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

দেখ ওই সমুচ্চ প্রাচীর—
চিরস্থির
নিতান্ত নিরীহ শান্ত অদূরে দাঁড়ায়ে,—
সবার মাঝারে থাকি', আপনাকে একান্তে সরায়ে।
কাহারো ধারে না ধার—
কারো সাথে নাহি তার ভালো মন্দ কোনো ব্যবহার।
শুধালে কথা না কয়—
সেও না শুধায় কারে কারো পরিচয়।
ওরি কুক্ষি-কূপে স্তব্ধ—চির রুদ্ধ কাল—
তাই হোথা পুঞ্জীভূত বিশ্বের জঞ্জাল।
জগতের তলে তলে জমে যত বিষ-বাষ্প
দিনে দিনে তিলে তিলে,
সব মিলে,
এইখানে ধরেছে বিরাট রূপ—
অন্তর্দাহ অনির্বাণ, অন্তহীন চির-অন্ধকূপ।

জগতেব যত ক্রূর, মূঢ অন্ধকাব,
ভযাবহ পাপ আব বুদ্ধিব বিকার,
দুষ্কৃতি বিকটতম, বিশ্বেব বিকৃতা
নিষ্করুণ নিপীডন, সেবা বর্ববতা—
হেথায পেয়েছে ঠাঁই,
বিশ্ব জোডা ব্যর্থতাই,
অন্তহীন ব্যথা আব অর্থহীন ক্লেশ,
প্রাচীব বেষ্টিত পুবী,
সত্য বটে বাহাদুবী
সুসভ্য মানুষী-কীর্ত্তি--সভ্যতাব পবিপূর্ণ শ্রেষ।

নাসিক জেল ২. ৩৫.

ইউরোপীয় পরিস্থিতি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত

গত দু'বছবেব মধ্যে ইউবোপে পব পব কতকগুলি সঙ্কট দেখা দিযেছে যাব ফলে আব একটা বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হ'যেছে। প্রতিবাবেই সমস্ত অনুধাবন ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'বে দিযে ইযোবোপীয বাষ্ট্রগুলি অত্যাশ্চর্য্যভাবে যুদ্ধ এডিযে গিযেছে। ইটালী জার্ম্মানীব সম্প্রসাবণ নীতি এবং বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি অপব সাম্রাজ্যবাদী বাষ্ট্রগুলিব অবিচলিত ঔদাসীন্য অনেকেবই মন সন্দেহাকুল কবে' তুলেছে যে সাম্রাজ্যবাদী বাষ্ট্রগুলিব মধ্যে পবস্পব সহযোগিতা হযতো সম্ভব—শক্তিমান বাষ্ট্রগুলিব প্রতিযোগিতা এবং এক দেশেব ধনিক-শ্রেণী অপব দেশেব ধনিক-শ্রেণীকে বিধ্বস্ত ও পঙ্গু কবে দেবাব আগ্রহেই যে নিজেদেব আত্মনাশী যুদ্ধে টেনে নিযে যাবে--এই মতবাদ হয তো বা ভিত্তিহীন। বাস্তবিক পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান সমাজতন্ত্রবাদেব প্রসাব-ভীত ধনিক-শ্রেণীব অনুগ্রহপুষ্ট তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতিকগণ—যাদেব একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদেব অভ্রান্ত বৈপ্লবিক বিশ্বাস থেকে শোষিত জনসাধাবণকে চ্যুত কবে ভ্রান্ত পথে পবিচালিত কবা,—স্পষ্টই বল্‌তে শুরু কবে'ছে যে বর্ত্তমান ইউবোপেব বাষ্ট্রনীতি প্রমাণ কবছে যে সমাজতন্ত্রবাদীবা যুদ্ধেব অপবিহার্য্যতা সম্বন্ধে যা বলেন তা সত্য নয। সাম্রাজ্যবাদী বাষ্ট্রগুলিব পবস্পব সহযোগিতার দ্বাবা যুদ্ধ এডিযে যাওযা একান্ত অসম্ভব নয। জার্ম্মানীব বাজ্যলিপ্সাব লালসা-বহ্নিতে পূর্ব্ব ইউবোপেব ক্ষুদ্রবাষ্ট্রগুলিকে আহুতি দিযেই ইংবাজ ও ফবাসী সাম্রাজ্যবাদীবা নিজ স্বার্থ ষোল আনা বজায বাখতে সক্ষম

হবে! আপাতদৃষ্টিতে তা সম্ভব বলে মনে হ'লেও এ ভাবে যুদ্ধ যে কিছুতেই চিরদিনের জন্য এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তা সমাজতন্ত্রবাদীদের মতানুযায়ী যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। সমাজতন্ত্রবাদীরা যুদ্ধের কারণ যা নির্দ্দেশ করেছেন তা সংক্ষেপে এই :—শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সব দেশে সমান গতিতে অগ্রসর হয় না। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়েছে যে, যে সমস্ত অনুন্নত দেশে শিল্প-বিপ্লব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের রপ্তানি করা মূলধনে বহু-পরবর্ত্তী সময়ে আরম্ভ হয়েছে, সে সব দেশে শিল্প-বাণিজ্য অনেক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা অপেক্ষাকৃত পুরানো দেশগুলিকে ছাপিয়ে চলে গিয়েছে। এই ভাবে কোন দেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শক্তিশালী জাতিগুলির সমকক্ষতা দাবী করতে আরম্ভ করে, যাদের কিছুদিন আগেও হয়তো বিশ্ব-দরবারে আসন সু-প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী জাতিগুলি তো তার আগেই নিজেদের শক্তির অনুপাতে পৃথিবী ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। অথচ আবির্ভূত হয়েছে কতকগুলি নূতন শক্তি, যাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত বিশাল পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্য নূতন বাজার দরকার হয়ে পড়েছে—ধনিকদের সঞ্চিত বিপুল অর্থ, শোষণ করবার জন্য নূতন দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজেই আগেকার ভাগবাঁটোয়ারা বাতিল করে' পৃথিবী পুনর্বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আগেকার সমস্ত সন্ধি সর্ত্তই বাতিল হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা ভয়াবহ মূর্ত্তি নিয়ে নূতন করে দেখা দেয়।

ভার্সাই সন্ধির সময় পৃথিবী ভাগবাঁটোয়ারায় যে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হয়েছে, জার্ম্মানী তাদের মধ্যে অন্যতম। পরাজিত জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি তখন এমন প্রবল ছিল না, যা নিয়ে নিজ স্বার্থের অনুকূলে কিছু দাবীও করতে পারে। আর শক্তির ধমকি যে জাতি না দিতে পারে তাকে পৃথিবী শোষণের অংশ দেবে সাম্রাজ্যবাদের ধর্ম্মই তা নয়। কিন্তু গত বিশ বৎসরে জার্ম্মানীর অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয়েছে, শিল্প-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে সে এখন বিশ্বের দরবারে পৃথিবী শোষণের আংশিক অধিকার দাবী করছে। বিজিত, স্তিমিতপ্রায় জাতির কাছ থেকে যে সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, পুনরুত্থানের পরও সে-অবস্থায় সে সন্তুষ্ট থাকবে কেন? সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়রূপে সে একে একে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও মেমেল দখল করেছে। স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং বল্কান রাষ্ট্রগুলির উপর প্রাধান্য স্থাপন করবার প্রয়াস পেয়েছে। অথচ ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মানীকে প্রতিহত করবার চেষ্টা তো করেই নি, পরন্তু পরোক্ষভাবে সাহায্য করেই এসেছে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের এই অ-সাম্রাজ্যবাদিক মনোভাবের কারণ কি?

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, নানাবিধ শক্তিশালী মারণ-যন্ত্র ও অতি আধুনিক অস্ত্রোপকরণ আবিষ্কার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার, সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে

একটা নূতন আলোকপাত করেছে। ক্রমবর্দ্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সম্পর্ক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে এমনই এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে গ্রথিত করেছে যে, যে-কোন ক্ষুদ্র যুদ্ধেরই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমবায়োজনের ফলে বিমান-বাহিনী ও বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র ধরাপৃষ্ঠ হ'তে লুপ্ত হ'তে দেখা গিয়েছে। নিজ স্বার্থ-সচেতন ধনিক-শ্রেণী তাদের প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলিকে যে আগের মত অতি সহজে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেবে না, একথা বেশ বোঝা যায়, এবং জার্ম্মানীর রাজ্যলিপ্সা যদি পূর্ব্ব ইউরোপের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'ত তবে তো অনতিকালের মধ্যে এক পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের হাত থেকে মানব-সমাজ পরিত্রাণ পেতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মানীর রাজ্যবিস্তারের সূচনা হিসাবেই যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি রাইখের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা বর্ত্তমান জার্ম্মানীর অনুসৃত নীতি একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

ফ্যাসিষ্ট নীতি জার্ম্মানীকে অস্ত্রসম্ভার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে প্ররোচিত করেছে। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিজয় অভিযানের পক্ষে রণসম্ভার বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানীর বেকার সমস্যা দূর করে' শ্রমিকদের ফ্যাসিষ্ট নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান করে' তোলবার জন্য বহু সংখ্যক শ্রমিককে অস্ত্রকারখানায় নিয়োজিত ক'রতে হ'য়েছে। এই রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানাগুলি বর্ত্তমান জার্ম্মানীর আর্থিক নীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। রণসম্ভার বাড়ানোর নীতি কার্য্যকরী ক'রতে হ'লে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচা মাল দরকার। আর এই কাঁচা মালের জন্যই দরকার নূতন নূতন রাজ্য জয়ের অভিযান। অষ্ট্রিয়া বিজয় জার্ম্মানীকে কিছু পরিমাণে লৌহ সরবরাহ ক'রেছে সত্য, কিন্তু নিকেল, দস্তা, তামা ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতুর সমস্যা এক তিলও লাঘব করতে পারেনি, পক্ষান্তরে শস্য ও খাদ্যসম্ভারের জন্য অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর চেয়েও বেশী পরমুখাপেক্ষী। তা ছাড়া যে সমস্ত রপ্তানি-শিল্প খাদ্যসম্ভার ও ধাতুর উপর নির্ভরশীল সেগুলির জন্যও তার পক্ষে অন্য দেশের সাহায্য অপরিহার্য্য। কাজেই অষ্ট্রিয়া জয় অর্থনীতির দিক থেকে জার্ম্মানীর কাছে মোটেই লাভজনক হয়নি। অষ্ট্রিয়া বিজয় দরকার ছিল রাজনীতি এবং রণনীতির দিক থেকে, চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের প্রাথমিক সোপান হিসাবে। সুদেতন রাজ্য-খণ্ডও এদিক দিয়ে জার্ম্মানীকে উপকৃত করতে পারেনি। পরন্তু সুদেতনের শিল্প-কারখানাগুলি জার্ম্মানের কাঁচামালের অভাবকে তীব্রতর করে তুলেছে। সুদেতনও দরকার হয়েছিল জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি বাড়াবার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মানীর ১৯৩৮ সালের অভিযান সবগুলিই এই শ্রেণীর। রণসম্ভার শিল্পের দিক থেকে আংশিক ভাবে লাভজনক বিজয় হ'ল জার্ম্মানীর বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া অধিকার। এখানকার অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত অস্ত্র-কারখানা জার্ম্মানীর পক্ষে

লাভজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু উপযুক্ত পবিমাণে কাঁচামালের অভাব এখানেও সমভাবে বিবাজিত।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহুলোক এই ধবণের একটা ধাবণা পোষণ করেন যে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানী পূর্ব্ব ইউবোপেব বল্কান বাজ্যগুলি নিয়ে বিব্রত থাকায় পশ্চিম ইউবোপের শান্তি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু বল্কান বাজ্যগুলি জার্ম্মানীকে কত কাঁচামাল সববরাহ করতে পাবে? ১৯৩৭ সালে জার্ম্মানীব আমদানী ও বল্কান বপ্তানিব উপর দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপাবটী পরিষ্কাব হবে। প্রতি ১,০০০ টনে—

কাঁচামাল	বল্কান বাজ্য হইতে বপ্তানি	জার্ম্মানীব আমদানি
লৌহ	—	৯,৮০০
তাম্র	—	৩৩০
সীসা	২০	১৫৫
দস্তা	—	৬২
নিকেল	১	৭
টিন	—	১৮
বক্সাইট	৫৮০	১৪০০
খনিজ তৈল	৮,০০০	৫০০০
তুলা	—	৪০০
উল	—	১৬০
ববাব	—	১৩০

উপবোক্ত তুলনামূলক বাশিগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে অস্ত্র-শিল্পের জন্য বল্কান বাজ্যগুলি একমাত্র বক্সাইট ও খনিজ তৈল ছাড়া আর কোন জিনিষেই জার্ম্মানীর বিশেষ সাহায্য করতে পারে না। খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপারে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হ'লেও জার্ম্মান পুরবাষ্ট্রনীতি ও বণসম্ভাবনীতির জন্য প্রযোজনীয় কাঁচামালেব অভাব বল্কান বাজ্যগুলি কোনমতেই মোচন করতে পারে না। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় মোটেই অযৌক্তিক হবে না যে, বল্কান রাষ্ট্রগুলিই জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদেব বিজয় অভিযানের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র। পরবর্ত্তী অধিকতর লাভজনক রাজ্য-জয়ের জন্য কেবলমাত্র সামবিক কৌশল হিসাবেই বল্কান রাজ্যগুলি একান্ত প্রযোজন। বাস্তবিক পক্ষে চোকোশ্লোভাকিযা এবং অষ্ট্রীযা বিজয় জার্ম্মানীর রাজ্য-জযেব প্রয়োজনীযতা কমান তো দূরের কথা বরং অনেক পরিমাণেই বাড়িয়ে তুলেছে। কাজেই ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর

অস্ত্র-শিল্পের কারখানাগুলি বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অধিকতর মূল্যবান রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করা। ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্ত অথবা প্রাচ্যের ইংরাজ উপনিবেশগুলির যে কোনও একটা সমগ্র বল্কান রাষ্ট্রগুলির চেয়েও জার্ম্মানীর কাছে বেশী মূল্যবান।

পূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর মতে রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা প্রথম প্রয়োজনীয় বিবেচিত হ'লেও বর্ত্তমানে সে তার মত পরিবর্ত্তন করেছে। সোভিয়েট রাশিয়াই একমাত্র শক্তি যা ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ নীতির বিরোধিতা করতে কৃতসঙ্কল্প। আর সোভিয়েট রাশিয়া সামরিক শক্তিতে বর্ত্তমানে যে-কোন দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই ফ্রান্স ও বৃটেনই ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যবাদের প্রথম লাভজনক শিকার হবে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ফ্রান্স ও বৃটেন পূর্ব্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মান রাজ্যলিপ্সার বেদীতে বলি দিয়ে তুষ্ট করার নীতি অবলম্বন করলেও অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মান স্বার্থের সাথে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং অনতিকাল মধ্যেই পৃথিবী আবার এক বীভৎস হত্যালীলার শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। আর এ হত্যালীলার তীব্রতা হবে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলির চেয়ে অনেক গুণে বেশী।

বর্ত্তমানে একটিমাত্র উপায় আছে যা অবলম্বন করলে এখনও এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হিট্‌লারের অগ্রসর নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে হয়তো হিট্‌লারকে বাধ্য হয়েও অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও তার কর্ম্মসূচী বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ ফ্যাসিষ্ট বিরোধীশক্তিগুলি সংহত হয়ে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালিয়ে বর্ত্তমান শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করে ফেলতে পারে। জার্ম্মান জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছে ফ্রান্স ও বৃটেনের অনুসৃত হিট্‌লারকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবার নীতি। এ নীতির পরিবর্ত্তন জার্ম্মান-ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদের শক্তিশালী করবে—আর তার ফল হবে এই যে হিট্‌লার জার্ম্মানীকে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করতে পারবে না।

শেষ-বিচার

শ্রীহেমন্ত তরফদার

জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জি—জাষ্টিস প্রাণতোষ চ্যাটার্জ্জি বিকাল বেলা যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে মোটরে এসে ব'সলেন তখন তাঁর মনে যে ভাবের সঞ্চার হোলো তা' অন্য মানুষকে ঠিক ঠিক বোঝান যায়, এমন সাধ্য কোন ভাষারই নেই। এ-সব ক্ষেত্রে প্রচলিত দস্তুর হু'চারটা ভাল ভাল উপমা প্রয়োগ ক'রে জিনিষটার একটা কাঠামো দাঁড় করান, কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে উপমা হ'চ্ছে উপমা এবং তা সত্য নয়। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে উপমা,—তা' সে যতই রসাল হোক না কেন,—আসল সত্যের যে ধার ঘেঁসেও যায় না,—এই কথাটা মনে ক'রে জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জির সুপক্ক গোঁফের নীচে একটু হাসির আভাষ দেখা গেল। বাস্তবিক মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সে একক, তার বিশেষ বিশেষ অনুভূতি একান্তভাবে তারই গোপন প্রাণের সামগ্রী, তাই ওরা, ওই রাস্তার লোকেরা যতই চেষ্টা করুক আর মুখের দিকে চেয়ে থাকুক তাঁর শরীরে, তাঁর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত শীর্ণ অস্থিপঞ্জরের মধ্য দিয়ে যে একটা অপরিমিত খুশীর প্রবাহ ব'য়ে যাচ্ছে, সে ওরা কিছুতেই ধারণা ক'রতে পারবে না। তবে লক্ষ্য ক'রলে দেখা যেত যে প্রাত্যহিক অভ্যাসমত আজ তিনি মোটারের ষ্টার্টের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্ত আরামে চোখ হু'টি বুজে, পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পিছনে হেলে পড়লেন না। না, আজ তিনি ক্লান্ত হ'ন নি। সোজা হ'য়েই বেশ ব'সে থাকা চ'লছে। মনে হয়েছিল আজ তিনি খুবই ক্লান্ত বোধ ক'রবেন, কিন্তু কই সে রকম কিছু হচ্ছে না! ররং শিরদাঁড়ায় একটা অননুভূত উৎসাহ, একটা অভিনব উত্তেজনায় চোখ হু'টা প্রখর হয়ে উঠেছে। পথের উপরে, পথের হু'ধারে জনস্রোত, অট্টালিকা, যান-বাহনের স্রোত কেটে কেটে মোটার চলেছে বিপুল বেগে, এই বস্তুপুঞ্জ, দৈনন্দিন জীবনের পথে অতি অভ্যস্ত এই পৃথিবী, অতি পরিচয়ের সাদা রৌদ্রে, বৈচিত্রহারা বর্ণহীন, এই পৃথিবী হঠাৎ যেন অপরাহ্ণের ম্লান গোধূলির গোলাপী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো। এখন চল্‌তে চল্‌তে পথের হু'ধারে যে জিনিষটির দিকে চোখ পড়ে, তাকেই মনে হয় কি যেন একটা নিগূঢ় অর্থে ভরা, প্রচ্ছন্ন প্রাণের যোগে অন্তরের আত্মীয়। দীর্ঘ জীবনের কর্ম্মক্লান্তির অবসানে অবসর গ্রহণের এই দিনটির পরম রমণীয়তার কথা বহুবার বহুভাবে মনে এসেছে। মনে এসেছে একটা শান্তির ছবি, একটা স্বস্তির ছবি।—গ্রীষ্মের প্রকাণ্ড দিনের নিষ্ঠুর দাহের অবসানে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্নানের মত শান্তি, কলিকাতার কোলাহলের ক্ষমতাহীন পরিধি পার হ'য়ে দেওঘরের নন্দন পাহাড়ের চূড়ায় বসে বসে নানা জাতীয় নাম-না-জানা পাখীর অশ্রান্ত কল-কাকলী শোনার মত স্বস্তি। সেই দিন আজ এসেছে, সেই লোভনীয় দিনটি যার নিমন্ত্রণলিপি বহু আশঙ্কায়, বহু আশ্বাসে ভরা ছিল। এসেছে সেই দিন, যৌবনের অশান্ত কর্ম্মস্রোত ক্ষুব্ধ তটভূমি থেকে যাকে দেখা গিয়েছিল পশ্চিম দিগন্তে অস্তমেঘের কিনারায় সোনালী আলোর

স্তিমিত রেখার হাতছানির মত। সেই দিনটি। কিন্তু একটা মজা দেখো, যে যাই বলুক না কেন—কল্পনা আর উপলব্ধির মধ্যে—অনেক তফাৎ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই। নইলে কে আর জানতো বলো, এমন হবে? মানুষ যখন তার কর্ম্মক্ষেত্রের সব দায়িত্বভার নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে, যখন তাকে আর জজিয়তি করতে হবে না, পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনের দিকে একাগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে থাকবার যখন আর প্রয়োজন নেই, তখন ত' সে অনায়াসেই জীবনের চঞ্চল কোলাহলের হাট থেকে খ'সে যেতে পারে, ভেসে যেতে পারে! তার ব্যস্ততা নেই, তার বন্ধন নেই! রৌদ্র-দীপ্ত-নীলাকাশের নীচে শরতের লঘু মেঘের মত অলস ডানা বিস্তার ক'রে সে যদি এখন আস্তে আস্তে দিগন্তে মিলিয়ে যায় তবে কে তাকে আটকায়? কিন্তু সে কি তা' চায়—? নিবিড় নিশ্ছিদ্র কাজের চাপে দায়িত্বের ভারে শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসৃত যখন, তখন তুমি ভাবতে পারতে নীল আকাশ, নিরালা অবসর, নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবন। কিন্তু এখন, এখন তারা কোথায়? হাইকোর্ট থেকে বালীগঞ্জের মনোহরপুকুর রোড কতটুকু পথ? মোটারে গেলে কতটুকু সময়ই বা লাগে? কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই দেখ মন তোমার কোথায় এসে স্থিতি লাভ ক'রল? হালকা হ'য়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই দেখা গেল পঞ্চান্ন বছর বয়সে জীবনের সীমান্ত পারে এসে যখন তুমি দাঁড়িয়েছ, তোমার সামনে একটা নতুন দৃষ্টি-কোণ খুলে গেছে! অস্ত বেলার আকাশের রঙীন আলোয় চারিদিক রঞ্জিত হ'য়ে গেছে, সেই আলোয় তোমার ক্লান্ত বৈরাগ্য কোথায় মুখ লুকিয়ে রইল? এখন পথের দু'পাশে যত মানুষ যায় তাদের সবার সম্বন্ধেই মনের দুরন্ত আগ্রহ। এতদিন চেনা পরিচয় হয়নি, সে সময়ই বা ছিল কোথায়? এখন ওই যারা এমপ্রেসে ছবি দেখতে ঢুক্‌লো,—জগুবাবুর বাজার থেকে যারা সওদা নিয়ে কালীঘাট রোড দিয়ে ঘরে ফির্‌ছে, ট্রাম-ডিপোয় ওই যারা গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, ওদের—আচ্ছা গাড়ী থামিয়ে ওদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে নিলে হয় না?...গাড়ী যখন আর একটু এগিয়ে মোড় ঘুরল, জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জির মুখে আবার একটু হাসি দেখা দিল। আশ্চর্য্য! মানুষের মন! ঠিক্ এই জিনিষটার কথা এম্‌নি করে আগে কখনো মনে আসেনি। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। একজন ফরাসী লেখক—হ্যাঁ মপাঁসা বলেছেন—পঞ্চান্ন বছর বয়সেই মানুষ সত্যি সত্যি জীবনকে ভোগ ক'রতে আরম্ভ ক'রে। তখন কথাটা বুঝতে পারা যায়নি। মনে হোতো একটা আজগুবি কথা খুব উঁচু দরের। বাস্তবিক পঞ্চান্ন বছরের আগে মনুষের সময় র'য়েছে কোথায় যে, সে জীবনকে ভোগ করবে? ভোগের জন্য সময় চাই—চাই মনের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রতে পঞ্চান্ন বছর দিতে হ'য়েছে, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি নেই। আজ ফিরে পাওয়া গেল। জীবনকে ফিরে পাওয়া গেল। তোমার জীবন শুধু অন্যের কাজে দেবে—এ একটা মহাভুল। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নাতী-নাতনী তাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করেছো, প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছো, ভাল কথা। কিন্তু তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার পরই যে সংসারে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তা' নয়। বেঁচে থাকবার একটা অর্থ নিজের কাছে আছে, শুধু নিজের কাছে, এই

কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল। কাজের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে অর্থ নিঃশেষিত হয়নি। আছে? আছে—এর পরও আছে। এরপরও আছে! Browning-এর মত বলো, Oh joy of living! হাঁ living শুধু বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে আছি! এইটা অনুভব করা! ··আশ্চর্য্য! এমন সাদা সত্য কথাটা একঘণ্টা আগেও মনে হয়নি! আশ্চর্য্য। জীবনে যা' ঘটতে যাচ্ছে, তার কিছুই মানুষ আগে জানতে পারে না।

মিসেস্ চ্যাটার্জি বাইরে একেবারে বাগানের লন পর্য্যন্ত এসেছিলেন। দেখা গেল এই বিশেষ দিনটার বিশেষত্বের দোলা তাঁর প্রাণেও লেগেছে। কাছে এসে একটু হেসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্লেন,—'একটা উলু দেব নাকি গো'? জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি উত্তর দিলেন, 'দিলে তো হোত'ই কিন্তু সে সব কি আর তোমাদের আসে?'

'আসে গো আসে, দরকার হ'লেই। চ'লো ঘরে বস্‌বে চ'ল,'

হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলেন। ততক্ষণে বাড়ীর ছেলেমেয়ে যে যেখানে ছিল সবাই ভীড় ক'রে এসেছে। যেমন রোজ আসে। তবু আজ সব কিছুই অন্য দিনের চেয়ে স্বতন্ত্র। স্ত্রীর এই হাত ধরে এনে বসান পর্য্যন্ত। জিনিষটা মন্দ নয়। অতি প্রিয় পরিজনদের এই ব্যবহার এ যেন নব জীবনের পথে তাঁর অভিনব প্রত্যুৎগমন।

জলখাবারের থালাটা সাম্‌নে ধ'রে দিয়ে মিসেস্ চ্যাটার্জি কাছে বস্‌লেন। জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'তারপর আজই সব চুকিয়ে দিয়ে এলে ত? আর যেতে হবে না?"

জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি—"না আজই শেষ, ভার নেমে গেছে।" "যাক্ বাঁচলাম"—তাঁর বুকের ম'ধ্যে থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি মুখ তুলে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন, আহা বেচারী! ওর ওই নিঃশ্বাসটির মধ্যে অনেক কিছু লুকান আছে। অনেক অভিযোগ, অনেক অভিমান। জীবনের খরস্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন কোথা দিয়ে কেটে গেল। তার আসা যাওয়ার হদিস্ কে রেখেছে? সময়ে অসময়ে নিভৃতে ব'সে দু'দণ্ড আলাপ করবার অবসরও এই দীর্ঘ জীবনে বেশী মেলেনি। তারপর, কালের হস্তাবলেপনে আজ দু'জনেরই মাথার চুল সাদা।

জাষ্টিস্ প্রাণতোষ চ্যাটার্জি, আজ সকলের পরিচিত, শুধু কলিকাতায় নয়, সমস্ত বাংলাদেশের লোক তাঁকে জানে ও সম্মান ক'রে। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। সামান্য অবস্থা থেকে বহু সংগ্রাম ক'রে—এই নাম, যশ, অর্থ অর্জ্জন করতে হ'য়েছে। জীবনের দ্বার-পথের সেই কঠোর সংগ্রামের ক্লান্তি ও ক্লেশ তার সমস্ত ইতিহাস নিয়ে প্রচ্ছন্ন র'য়েছে ওর সাদা চুলে, ওর কপালের, গালের প্রত্যেকটি রেখার অন্তরালে। আহা বেচারী।

মিসেস্ চ্যাটার্জি হেসে ব'ল্লেন,' "ওকি অমন ক'রে চেয়ে র'য়েছ কেন মুখের দিকে?—খাবে না?"

জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি—"হ্যাঁ—খাচ্ছি" হাতের আপেল টুক্‌রাটি মুখে পুরলেন। পরে ব'ল্‌লেন, "তোমার গোছান গাছান সব হোলো ?

স্ত্রী ব'ল্‌লেন—"হ্যাঁ, হ'চ্ছে কিন্তু তুমি কি কালই বেরুতে চাও নাকি ?"

'হ্যাঁ—কালই, আর দেরী নয়।"

"বড় তাড়াতাড়ি হ'ল না ?"

"না—তাড়াতাড়ি আবার কোথায় হ'চ্ছে ? দিন ত' অনেক আগেই ঠিক করা আছে।"

"তা'ত আছে। কিন্তু বল্‌ছ অনেকদিনের মত বেরুবে। অতদিন বাড়ী-ঘর ছেড়ে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হ'লে তার যোগাড়-যন্ত্র ক'রতে সময় লাগে।"

"বেশ সময় ত' দেওয়াই গেল। কাল রাত্তির আটটার পর ডেরাডুন এক্সপ্রেস্। চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় আছে। এর মধ্যে একটা রাজ্য ওলট-পালট হ'য়ে যেতে পারে।

"তা'পারে, কিন্তু তোমার সে সব কাজ শেষ করেছ ?" "হ্যাঁ—সে কাল রাত্রেই। ব্যাঙ্কে যা' আছে দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে সমান ভাগ ক'রে চেক্ কেটে রেখেছি। এখন হাতে হাতে দিয়ে দিলেই মিটে যায়। দেওঘরের বাড়ীটা হরেন্দ্রের, আর তোমার জন্য রইল ক'লকাতার এই বাড়ী, আর যা' তোমার নিজের আছে।

"আচ্ছা। আচ্ছা—আমার ভাবনায় ত' আর তোমার ঘুম হয় না—। ওসব কথা থাক। আর এত তাড়াতাড়ি সব ভাগ বাটোয়ারা করবার কি দরকারটা ছিল, কিছুত বুঝিনে বাপু।

"ওঃ ভয়ানক দরকার ছিল, জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি বল্‌লেন—ভয়ানক দরকার ছিল বিনু, এরপর বিষয় আশয়ের কোন হাঙ্গামায় আর থাক্‌তে চাইনে। তাই সব এককালীন চুকিয়ে দিলুম।

"থাক্‌বে কি নিয়ে ? গরু তাড়াবে নাকি ?"

না' তার দরকার হ'বে না। থাক্‌ব ? থাক্‌ব এরপর বিনোদিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "থাক্‌ব এরপর শুধু তুমি আর আমি।"

বিনোদিনী লজ্জা পেয়ে একটু হেসে ব'ল্‌লেন, "ইস্ ভারি যে কবিত্ব দেখি।"

"হবে না ? কবিত্ব এর আগে কোনদিন ত' আমরা করিনি, ক'রেছি কি ?"

"তাই বুঝি এখন বনে যাওয়ার সময় করতে হবে ? বনে যাওয়া ? বনে যাওয়া ও কাকে বল্‌ছে ? মেয়ে মানুষ কিনা, সোজা পথ ছেড়ে একটু বাঁকা পথে গেলেই আর জিনিষটা ওরা বুঝ্‌তে পারে না।"

খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। আবার সেই ইজিচেয়ারে গিয়ে বস্‌লেন। হাতলের ওপর ব'স্‌লেন বিনোদিনী। বসে ওঁর মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙু্‌ল নাড়তে লাগ্‌লেন। জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি ব'ললেন, "তুমি ভুল ক'রছ বিনু, আমরা বনে যাচ্ছিনা। কলকাতা থেকে যাচ্ছি শ্রীনগর, শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী। সমস্ত ভারতবর্ষ ঢুঁড়ব। তারপর এলুম ফিরে আবার এইখানে। তখন দেখে

নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করব। জীবনেব বং দেব বদ্‌লে। আমি বুড়ো হই নি। আজ চাক্‌বি শেষ করাব সঙ্গে সঙ্গে আমি তারুণ্য ফিরে পেযেছি। এবাব জীবনকে আমি ভোগ করব।"

বিনোদিনী অবিশ্বাসের সুবে কিন্তু স্নেহার্দ্র মৃদু কণ্ঠে ব'ল্‌লেন,—"ভোগ করবেন—না আরো কিছু করবেন।"

তুমি দেখো। কিন্তু আপাততঃ আমাকে এখন একটু বেরুতে হবে। একটা জামা বার ক'রে দাও।

ওমা এখুনি আবাব বেবোবে কোথায?

ভবানীপুব ক্লাবে। ওবা এখনই এসে প'ডল ব'লে। সম্মানেব সঙ্গে কাজ ক'বে পেন্সন নিযেছি। দীর্ঘকালেব জন্য বিদেশে যাচ্ছি। তাই ভাল ক'বে একটা অভিনন্দন দেওযাব জন্যে ওবা ব্যস্ত হযে উঠেছে।

কিন্তু খুকী, হবেন ওদেব তাব ক'বলেনা? এত আগে কি দবকাব? চিঠিত কালই দিযেছি। খুকীকে কাল সকালে তাব কবতে হবে, তাবপর পাটনা থেকে লক্ষ্ণৌ এব গাডী যেদিন ধবব সেই দিন হবেনকে তাব কবলেই হবে, জামাটা দাও ওরা এসে পডেছে গাডীব শব্দ শোনা যাচ্ছে।

"তোমাব ফিরতে কি রাত হবে?"

"খুব বেশী বাত হবে না বোধ হয।"

সন্ধ্যাব সময ক্লাবে অভিনন্দন সভায যাঁবা সমবেত হ'যেছেন, তাঁবা সকলেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। জজ, ব্যাবিষ্টাব, উকিল, এটর্নি। এব মধ্যে জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জি আজ সকলেব মনোযোগের পাত্র। নিজেব প্রশংসা শোনাব উপলক্ষ্য তাঁব বহুবাব হ'যেছে কিন্তু তবুও ও সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ তিনি আজও কিছুতেই কাটিযে উঠ্‌তে পাবেননি। সভায চা আব চুরুটেব বন্যা ব'যে চলেছে, তাব সঙ্গে নানা মুখেব বক্তৃতা, বক্তৃতাব ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ভাব প্রাযশঃই এক। কিন্তু তাই ব'লে মাথা নীচু ক'বে বসে থাকবাবই বা কি হ'যেছে? প্রশংসা বন্ধুজনেব কাছ থেকে আস্‌ছে বটে, তাই ব'লে এ সব মিথ্যাও নয। সত্যই জ্ঞানত তিনি কর্ত্তব্যেব ত্রুটি কোথাও কবেননি, এ কথা বন্ধুদের সঙ্গে গলা মিশিযে তিনিও আজ নিঃসংশযে ব'ল্‌তে পাবেন।

জাষ্টিস্ দাশগুপ্ত লম্বা বক্তৃতাব শেষে আঙুল দিযে দেখিযে ব'ললেন—"আমবা শুধু সহকর্ম্মী নই, আমরা বন্ধু হ'লেও প্রশংসাচ্ছলেও ওঁব সম্বন্ধে আমি অতিশযোক্তি ক'বতে পাবি, এমন ভাষার জোর আমাব নেই। আমি শুধু এইটুকু ব'লেই শেষ ক'বতে চাই যে আমাব এই দীর্ঘ কর্ম্ম জীবনে ওঁব মত নিস্কলঙ্ক চবিত্র, উদাব হৃদয, ন্যাযেব নিবপেক্ষ সেবক আর দ্বিতীযটী দেখি নি। হাইকোর্টেব বিচারাসনে এঁব চাইতে যোগ্যতব ব্যক্তি কেউ ব'সেছেন আমাব জানা নেই।" ··দেখা গেল অন্য অন্য বক্তা বন্ধুদেব মতও কিছু স্বতন্ত্র নয। .আঃ একেই ব'লে বন্ধুত্বের অত্যাচার। মাথা নীচু ক'রে থেকেও বেহাই নাই। বাববার রুমাল দিযে কপালের ঘাম মুছ্‌তে হ'চ্ছে। কিন্তু এরা তবু শেষ করেনা, শেষে ব্যারিষ্টাব মিঃ দত্ত রেহাই দিলেন, এক তরফা প্রশংসাব পর

তিনি কাজের কথা পাড়লেন। ব'ললেন, জাষ্টিস্ চ্যাটার্জিকে এবার আমরা দেশের কাজে নিযুক্ত দেখ্‌তে চাই।

নিশ্চযই। এর চেয়ে ভালকথা আর কি হ'তে পারে? বাস্তবিকই মনে মনে তিনি এতক্ষণ এমনি একটা প্রস্তাবের প্রতীক্ষাই ক'রছিলেন। আজ পর্য্যন্ত যখন তিনি দিনের পর দিন নিজের কাজে, নিজের পরিবারের কাজে নিশ্চল হ'য়ে ব'সে ছিলেন, তখন চারিপাশে আর সবাই ত্যাগ করেছে, দুঃখ সয়েছে দেশের জন্য। দেশের মানুষের জন্য সেই সব মানুষ, জনতার তরঙ্গ, যাদের অস্তিত্ব আজ বোধ করি সর্ব্বপ্রথম তিনি একান্ত ক'রে অনুভব করলেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাঁদের হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য কতবার তাঁর হৃদয়ের তটপ্রান্ত ছুঁয়ে গেল।.. এই সন্ধ্যার বন্ধুজনের প্রগলভ স্তুতির মধ্যে দিয়ে একটি সত্য নিঃসংশয়ে অনুভব করা গেল যে কর্ম্মজীবনের যত অধ্যবসায় সে ব্যর্থ হয়নি। oh joy। কর্ম্মজীবন। কর্ম্ম ব্যর্থ হয়নি। শুষ্ক কর্ত্তব্যের স্তূপের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে থাকা এরও রস আছে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। আরও আছে, আরো আছে।· তোমরা হেসো না, পঞ্চান্ন বছরের এই egotism, জীবনের ব্যাপকত্বের জন্য এই বিশ্বজাগ্রত ক্ষুধিত কাঙালপনা, একে দেখে হেসোনা। দ্বার খুলে দাও। তোমার বিচারক জীবনের অতি সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে ওই যেখানে বহু নরনারীর মিলন মেলায় বহু মানুষের জীবন দুঃখ সুখে তরঙ্গায়িত হচ্ছে, ওদের হৃদয় স্পন্দন তোমার প্রাণে এসে দোলা দিক্। আর একলা ঘরে ব'সে থাকবার প্রয়োজন নেই, নিরপেক্ষ বিচারক হওয়ার কঠিন সাধনায় নিজেকে সব দিক্ থেকে বঞ্চিত করবার দিন শেষ হোলো। এখন তুমি খবরের কাগজটা অন্ততঃ অনায়াসে পড়তে পার, সামাজিক জীবন সংক্ষিপ্ত করে আমার কোন প্রয়োজন নেই, মানুষের সঙ্গে অবাধে নির্ব্বিচারে মিশতে পার, নিরপেক্ষতা যদি নষ্ট হয় তাতে কোন দোষ হবে না। এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়, অবাধে, নিঃসঙ্কোচ ঝাঁপিয়ে পড়, জীবনের হাটে, জনতার কোলাহলে অক্টোপাসের মত শতদিক থেকে শত-পাকে জীবন তোমাকে বেষ্টিত ক'রে ধরুক। oh joy, the joy of living!
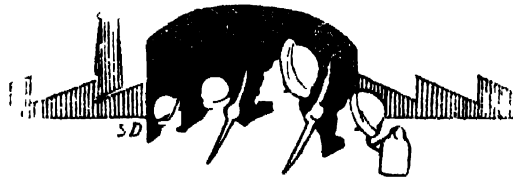
যুদ্ধ চায় কারা

শ্রীশৈলেশচন্দ্র চাকী

মানব সভ্যতার প্রথম অনেক কয়েক পৃষ্ঠা উল্‌টালে দেখা যাবে যে মানুষ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই যুদ্ধ ক'রেছে একটা গৌরব লাভের জন্য, একটা কৃতিত্ব দেখানোর জন্য, অর্থাৎ যুদ্ধ যা কতকটা তাদের কাছে বিলাসেরই মত ছিল। সেকালে খুব কম ক্ষেত্রেই শিশু, নারী এবং অক্ষম-বৃদ্ধ যুদ্ধ-যজ্ঞের বলি হ'য়েছে। সেখানে সেখানে কোলাকুলি ক'রে একজন সেয়ানা অপর একজন সেয়ানাকে ধরাশায়ী ক'রেছে। গ্রীক্ সম্রাট্ আলেকজেন্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন যে তিনি একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এদেশে এসেছিলেন এমন প্রমাণ আমরা পাই না, বরং ভারতবাসীর কাছে তাঁর নিজের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা কর্‌তেই এসেছিলেন, রাজা পুরুর প্রতি তাঁর ব্যবহারই তার সাক্ষ্য। যে দেশের রাজা সবার চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী ব'লে নিজেকে স্পর্দ্ধার সহিত জাহির কর্‌তে পার্‌বে তার গৌরব হবে সবার চেয়ে বেশী. এই জন্যই এক একজন রাজা দিগ্বিজয় ক'রে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ক'রেছিলেন। তখনকার দিনে বুদ্ধি-শক্তিকে বিভিন্নমুখে পরিচালিত করবার সুযোগ-সুবিধা আজকালকার মত এত ছিল না। তাই দৈহিক শক্তি এবং অস্ত্রচালনার মধ্যে একটা উৎকর্ষ সাধনের উগ্র কামনাই প্রাচীনকালের এত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ। কিন্তু আজ মানুষ বুদ্ধিটাকে সবচেয়ে বড় ব'লে মনে ক'রেছে, তাই সেটাকে বিভিন্নমুখে চালিত ক'রে একটা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করবার প্রয়াস পেয়েছে ব'লে এবং এক একটা যুদ্ধে পৃথিবী একটা ধ্বংসের লীলাক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তার প্রতিক্রিয়ার ফল বহু বৎসর ধ'রে মানুষকে ভোগ কর্‌তে হয় বলেই কত মানুষ আজ যুদ্ধ কর্‌তে নারাজ! ইউরোপীয় মহাসমর থেকে মানুষ এটা প্রথম বুঝলো। এই যুদ্ধের পর ফরাসী প্রায় পুরুষ বিহীন হ'য়ে পড়্‌ল, বেলজিয়াম্ একটা বিভীষিকাময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। আমেরিকা টাকা ধার দিয়েই চোর ধরা পড়্‌ল এবং জার্ম্মানী নিঃস্ব হ'য়ে মিত্র-শক্তির পর্ব্বত প্রমাণ দাবীর বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বিমর্ষমুখে দেশে ফিরল এবং এর পর থেকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ উইলসন্ বিশ্বের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটা স্থায়ী যুদ্ধ-বিরতি সভা গঠন কর্‌লেন। সে সভার কাজ হবে পৃথিবীর যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে যেমন ক'রে হোক যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করা। কিন্তু এতো সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধের আশঙ্কা করি কেন?

ভূমিকম্পের যতগুলি সঙ্গত কারণ আছে তার মধ্যে একটা এই যে, পৃথিবীর তলদেশে একদিকে ক্রমশঃ বস্তু জম্‌তে থাকে আর অপরদিকটা ক্রমশঃ খালি হ'তে থাকে, তারপর এমন সময় আসে যখন একদিকের পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) ঠিক থাকে না; তখন একটা স্থায়ী ভারকেন্দ্র পাবার জন্য সেই বস্তু-স্তূপ ভেঙ্গে প'ড়ে, দ্রুতগতিতে এসে খালি দিকটা আবার পূরণ ক'রে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। সামঞ্জস্য লাভের জন্য এই দ্রুতগতিই পৃথিবীর বুকের উপর

ধ্বংসলীলার স্রষ্টা। বস্তুর প্রকৃতি হ'ল একটা সামঞ্জস্য লাভ করা এবং সেটা যেদিক দিয়েই হোক্ তা'তে কিছু আসে যায় না। বস্তুর সামঞ্জস্য লাভের সহায়তা না ক'রে তার অসামঞ্জস্যকে সবলে দাবিয়ে রাখা মানবের দুঃসাধ্য। মানুষ বস্তুকে দিয়েই বস্তুকে আপন বশে আনে, তার সহজগতি লাভের সহায়তা ক'রে। একবস্তু বাষ্প, তার সহজগতি রক্ষার জন্য অপরবস্তু রেলগাড়ীর বিরাট বপু নিয়ে দ্রুতগতিতে দৌড়ায়। মানুষ এই বাষ্প ও রেলগাড়ীর মধ্যে একটা মিলনের যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছে বলেই নিজের খুশীমত তাদের খাটাচ্ছে যাঁরা বলেন মানুষ বস্তুর প্রকৃতিকে শাসন ক'রছে, তাঁরা ভুল বলেন, মানুষ তার গতি অন্য বস্তুর সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত করে মাত্র। আর যেখানে সেই গতি নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার মত অন্য বস্তু খুঁজে না পায় সেখানে তাকে চুপ ক'রে সায় দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোন উপায় নাই। যেমন, ভূমিকম্প ও ঝড়ের ক্ষেত্রে মানুষ এমন কোন বস্তু এখনও খুঁজে পায়নি যাদের দিয়ে তাদের সহজগতিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দেবে। মানুষের সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। রাষ্ট্রই জনসমাজের গতি সুনিয়ন্ত্রিত কর্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্র যখন জনসমাজের প্রকৃতিগত সহজগতিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তা প্রতিহত কর্‌তে চায়, তখন একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। ইংলণ্ডের রাজা জনকে জনসাধারণ ম্যাগ্‌না কার্টা স্বাক্ষরিত ক'রতে বাধ্য ক'রেছিল এবং তিনি তা স্বাক্ষরিত ক'রেছিলেন বলেই বিপ্লবের হাত থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজা পঞ্চদশ লুই, রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ বিদ্রোহের সময় রাজা জার্, জনসাধারণের দাবীগুলোর প্রতি কর্ণপাত না ক'রে তাদের দমন কর্‌তে চেয়েছিলেন ব'লেই এইরকম পরিণতি হ'ল। রাষ্ট্র যখন মানুষকে দিয়ে মানুষের সামঞ্জস্য রক্ষার সহজগতিকে দাবিয়ে রাখবার মত মানুষ খুঁজে না পায়, তখনই বিপ্লব আসে। আজ বিংশ শতাব্দীতে জগতের সমস্ত জনসমাজের পরস্পরের মধ্যে একটা জটিল সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই রাষ্ট্রের এবং জনসমাজের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য বিশেষ ভাবে কতকগুলি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, সমস্ত জগতে সেটা পরিব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

যোগ্যতার তারতম্যের মূল্য নির্ণয় হ'তেই এ অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি। জনসাধারণ যেদিন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিচালনার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে অর্পন কর্‌লো, সেদিন তারা ভেবেছিল পরিচালকগণ তাদের মান বজায় রেখে নিজেদের যোগ্যতার মূল্যটুকু নিয়ে খুশী হ'বে। কিন্তু যেদিন তাদের বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ্যতার দাবী জানিয়ে যোগ্যতার আসন কায়েম ক'রে নিলে, সেইদিন আজকার এ বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হ'ল। তার কারণ যেদিন থেকে তারা তাদের কায়েমী আসন লাভ ক'রল সেইদিন থেকে তারা জনসাধারণের মঙ্গলা-মঙ্গলের দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জনসাধারণকে 'শোষণ' কর্‌তে সুরু ক'রল, অর্থাৎ নিজেদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং মাত্রাতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ছলে বলে কৌশলে জনসাধারণের বিষয় সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে লাগল। এমনি ক'রে একদল হ'ল বিরাট সম্পত্তির মালিক, রাষ্ট্র এদের কাছে কোন শ্রমের দাবী তো ক'রলই না উপরন্তু তাদের সমস্ত অন্যায়

আবদার মেনে নিতে লাগ্‌ল। আর একদল এই বিরাট সম্পত্তিওয়ালাদের ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের মসী-জীবী কর্ম্মচারী হ'যে দাঁড়াল। আর তৃতীয় দল, যাদের মধ্যে দেশের অধিকাংশ লোকই রইল, তা'রা কঠোর পরিশ্রম ক'রে দেশের ফসল উৎপাদন ক'রতে লাগল। এই হ'ল যন্ত্র-শিল্পের পূর্ব্বেকার ইতিহাস, যন্ত্র-শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সামন্তদিগের পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাতের ফলেই মিল ও ফ্যাক্টরীওয়ালাদের আবির্ভাব হ'ল। বহু চাষের জমি মিল ও ফ্যাক্টরীর জন্য ব্যবহৃত হ'তে লাগল, এবং চাষীদের মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রমিক ব'নে গেল। এমনি ক'রে অনেক বড় বড় নূতন সহর ও নগরের সৃষ্টি হ'ল। আমরা জানি বিনিময়ের বস্তুর পরিমাণের সঙ্গে অর্থের পরিমাণের একটা সামঞ্জস্য থাকবেই, অর্থাৎ অর্থের যে পরিমাণ কেনবার ক্ষমতা, ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদিত বস্তু বাজারে থাকা চাই। যদি বস্তুর পরিমাণ অর্থের কেনবার ক্ষমতার পরিমাণের থেকে বেশী হয়, তাহ'লে বেশীর ভাগ বস্তুর সহিত অর্থের বিনিময় করা ঘ'টে উঠ'বে না, সুতরাং হয় সেটাকে ফেলে দিতে হবে আর না হয় বস্তুর দাম কমিয়ে দিয়ে অর্থের কেনবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। আবার, যদি বিনিময়ের বস্তুর পরিমাণ অর্থের কেন্‌বার ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তা হ'লে বেশীর ভাগ অর্থকে হয় অকেজো ক'রে রাখতে হ'বে আর না হয় বস্তুর দাম বাড়িয়ে দিয়ে অর্থের কেনবার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে হবে। অর্থের নিজস্ব কোনই মূল্য নাই, যতটুকু মূল্য রয়েছে তার ঐ বিনিময়ের ক্ষমতার মধ্যে, সুতরাং নিজের খুশীমত টাকশাল থেকে টাকা আমদানি, আর্থিক সমস্যার কোন সমাধান হ'তে পারে না। আমরা এটাও জানি যে শ্রম থেকে আসে উৎপাদিত বস্তু, এবং উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় আসে অর্থ, সুতরাং শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণ এবং অর্থের বিনিময়ে শক্তির পরিমাণ একই হওয়া দরকার, যেহেতু তাদের প্রত্যেকটী অপরটীর পরিবর্ত্তিত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং তাদের পরিমাণগত মূল্য (Quantitative value) সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে এক হতেই হ'বে। তাহ'লে এবার আমরা বুঝতে পারছি যে, উদ্বৃত্ত মূল্য বা surplus valueর অর্থ আর কিছুই নয়, শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেওয়া বা তাদের শ্রমের মূল্য, উৎপাদিত বস্তুর বাজার দরের অনুপাতে কমিয়ে দেওয়ার যে অর্থ ঠিক সেই অর্থ। পুঁজিদার বা Capitalist যে মূল্যে উৎপাদিত কাঁচা মাল বা raw materials কৃষকদের নিকট থেকে কিনে নিল এবং শ্রমিকদের শ্রমের যে পরিমাণ মূল্য দিল, তার অনুপাতে অনেক অনেক বেশী মূল্যে কারখানার উৎপাদিত মাল বা manufactured goods বাজারে চালু ক'রে দিল, সুতরাং কৃষক ও মজুরদের সেগুলো কেনবার ক্ষমতা অসম্ভব কমে গেল। যন্ত্র-শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফ'লে খুব কম শ্রমিক দিয়ে, খুব বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হ'ল, এতে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে বেকার হ'যে প'ড়ল, অথবা খুব অসম্ভব কম পারিশ্রমিকে কাজ ক'রতে বাধ্য হ'ল। এখন অনেকে বলতে পারেন যে, যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির ফ'লে অনেক কারখানা হ'ল, সুতরাং অনেক শ্রমিকের বেকার-সমস্যার সমাধান হ'ল, কিন্তু বেশীর ভাগ কারখানার উৎপাদিত পণ্যের জন্য পুঁজিদারদের মধ্যে, কার জিনিষ বাজারে বেশী কাট্‌তি হয় এই নিয়ে স্বার্থ-

সংঘাতের ফলে আর একদল বড দরের পুঁজিদারের উদ্ভব হ'ল। তারা অনেক বেশী টাকা খাটিযে পূর্ব্বেব অনুপাতে অনেক কম খবচায অনেক বেশী উৎপাদন কবতে সমর্থ হ'ল; এবং তারপব তারা বাজাব একচেটিযা কববাব জন্য সেই উৎপাদিত বস্তুব পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্য ধার্য্য ক'বল; এর ফলে পূর্ব্বতন পুঁজিদারদেব আব এঁটে উঠবার উপায় বইল না সুতরাং তারা লাল বাতি জ্বালাতে বাধ্য হ'ল। কাজে কাজেই তাদেব অধীনস্থ কর্ম্মচাবীরা এবং মজুববা বেকাব হ'যে প'ড়ল। এমনি ক'বে আজ এ অচল অনড অবস্থায এসে পডল, যাব ফলে জিনিষেব মূল্য অত্যন্ত অল্প হওয়া সত্ত্বেও কেন্‌বার লোক খুব কমই বইল, বেকাব-সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হ'যে দেখা দিল। প্রত্যেক দেশ এ অচল অনড অবস্থা থেকে রক্ষা পাবাব্ জন্য বিভিন্ন দেশে মাল চালান দিতে লাগল, বিশেষতঃ, যে সমস্ত দেশে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি হযনি, শুধু তাই নয়, তারা সে সমস্ত দেশে কারখানা স্থাপিত ক'রে স্থানীয় পুঁজিদাবদেব একেবারে দাবিযে দিতে লাগল। আমাদেব দেশে যেমন বাটা কোম্পানি তাব একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। যে সমস্ত রাষ্ট্রেব উপনিবেশ আছে তাবা সেখানে তাদেব প্রচুর মাল সববরাহ ক'বে অপেক্ষাকৃত সস্তা দবে সেগুলিকে বাজারে কাটিতি কবিযে, বাজাব একচেটিযা ক'রে ফেলল। কিন্তু, আজকাব এ আন্তর্জাতিক ব্যবসাব দিনে পুঁজিদারদেব কোন মতেই নিশ্চিন্ত হ'বার উপায নাই, তাব কাবণ সেই উপনিবেশগুলিতেও বিভিন্ন দেশেব পুঁজিদাবদেব মধ্যে জোব প্রতিযোগিতা চলতে লাগল, তাব ফলেই উপনিবেশওয়ালাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই বাজার থেকে বিষণ্ণবদনে বিদায় নিতে হ'ল। আমাদের দেশ থেকেই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতে পাবা যায। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানকার সমস্ত বাজাব জাপানী মালে বোঝাই হ'যে গিযেছিল এবং সে ক্ষেত্রে ইংবেজেব পাত্তা পাওযা গেল না, তাব কাবণ জাপানী মাল সবাব চেযে সস্তা, অথচ তাব পূর্ব্বে আমাদেব প্রভুরাই এখানকার প্রায একচ্ছত্র পুঁজিদাব ছিলেন। আজ বাজারেব ষ্টেসনারী জিনিষের মধ্যে বৃটেনেব খুব কম জিনিষই কাটতি হয। এই হ'ল আজকাব এ পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অচল-অনড অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এই অবস্থাই আগামী মহাযুদ্ধেব কাবণ হ'যে উঠবে।

গত মহাসমবেব পবে ভার্সাই সন্ধি অনুযাযী জার্ম্মানী আফ্রিকার উপনিবেশগুলি তো হারালোই উপবন্তু বৃহত্তর জার্ম্মানী ক্ষুদ্রতব হ'যে উঠল। তার কাবণ, মিত্র-শক্তিরা বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ ও ফরাসী জার্ম্মানীব অদ্ভুত সামবিক প্রতিভা দেখে তাব উন্নতিব পথ চিবতবে রুদ্ধ ক'বে দেবার জন্য তাকে চবম আর্থিক দুর্দ্দশাব মধ্যে এনে ফেলল। সিংহেব নাকে দড়ি পরাতে হ'লে তার মরণোন্মুখ অবস্থাই একমাত্র সময, কিন্তু দুঃখেব বিষয এই যে, সে মরণেব মুখ থেকে ফিবে এসেই পূর্ব্ব শক্তি ফিরে পেতে না পেতেই নাকের দড়ি ছিঁড়ে দিগ্বিজযের অভিযান সুরু ক'রল। তাই সিংহকে নাকে দড়ি পরিযে কিছুতেই বাখা গেল না। জার্ম্মানী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, হিট্‌লারেব নেতৃত্বাধীনে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হিনডেন্‌বার্গের বিরুদ্ধাচাবণ কবে, ১৩৫ কোটী গোল্ডমার্ক ঋণের কিছুটা অংশ দিয়েই আব দিতে অস্বীকার ক'রল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এতে আপত্তি করায় জার্ম্মানী তাকে ত্যাগ করল। পুঁজি-দাবদেব প্রচেষ্টায় যন্ত্র-শিল্পের উন্নতির ফলে আর্থিক অচল-অনড অবস্থা আনার প্রতিবিধানকল্পে

হিট্‌লারের সাম্রাজ্যলাভের দুরূহ অভিযান এবং এই অভিযানের পথে যদি যুদ্ধ আসে তবে তাকেও বরণ ক'রে নিতে হ'বে, এই হল তাঁর দৃঢ়সঙ্কল্প। অনেকেই ভাবেন যে, যদি হিট্‌লার চেকো-শ্লোভাকিয়া অধিকার ক'রতে সমর্থ না হ'তেন তবে আর্থিক অচল-অনড় অবস্থা আসার দরুন জার্ম্মানীতে একটা অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হ'যে পড়ত, এই জন্যই গত অক্টোবর মাসে হিট্‌লার যুদ্ধ ক'রতে উদ্যত হ'যেছিলেন। মেমেল পুনরায় অধিকার করার পর হিট্‌লার ভাবছেন এখন কোন্ দিকে আবার হুম্‌কি দেওয়া যায়, যদিও অ্যাঙ্গলো-ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট্‌ প্যাক্‌টের কথাবার্ত্তা হিট্‌লারকে অনেকটা দমিয়ে দিয়েছে।

ইতালী গত মহাসমরের পর শুধু হাতে ফিরল। শুধু শুধু এ ভাবে রক্ত দেওয়ার অর্থ হয় না। লোকে বলে, "লাভে লোহা বয়, বিনা লাভে তুলাও বয় না" সুতরাং ইতালী রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে কিছু আশা ক'রেছিল, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতালীর মূক-বেদনা বুঝেও বুঝল না, তাই ইতালীর বর্ত্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তা সিনর্‌ মুসোলিনী হিট্‌লারের কাছ থেকে আশা ভরসা পেয়ে, তাঁকেও আশা ভরসা দিয়ে আবিসিনিয়া অধিকার ক'রে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। হিট্‌লারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মুসোলিনী শুধু হুম্‌কি দিয়ে আলবানিয়া অধিকার কর্‌লেন। হিট্‌লার ও মুসোলিনী দু'জনেই একই পথের পথিক, তাই হিট্‌লার একদিন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন যে, তাঁর সত্যিকারের বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে ইতালী।

যখন ব্রিটেন দেখল যে জাপানীরা এসে এখানকার বাজার প্রায় একচেটিয়া কর্‌তে বসেছে, তখন তার নিজের শিল্পের সমূহ ক্ষতি হ'বার আশঙ্কা ক'রে জাপানী মালের উপর শুল্ক বৃদ্ধি কর্‌তে লাগল। জাপান অনন্যোপায় হ'যে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পেল, তার পাশেই রয়েছে বিংশ শতাব্দীর এ জাগরণের দিনেও নিদ্রায় কাতর বিশালকায় চীন। তাই ঝোপ্‌ বুঝে কোপ বসাল, এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘকে তৃণজ্ঞান ক'রে একবার ভ্রূকুটির হাসি হেসে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল। জাপানের, সমৃদ্ধশালী ও শক্তিমান জাতি হওয়ার পক্ষে চীন-সাম্রাজ্য একান্ত প্রয়োজন, তাই সে এখন যুদ্ধে রত। জার্ম্মানী, ইতালী এবং জাপান এরা তিনজনেই সাম্রাজ্য প্রসারের প্রয়াসে প্রয়াসী। তাই এক রাষ্ট্রসঙ্ঘকে পরিত্যাগ ক'রে একটা মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, এবং একেই বলে—রোম-বার্লিন-টোকিও এক্‌সিস্‌ (Rome-Berlin-Tokyo Axis)। প্রেসিডেণ্ট্‌ উইল্‌সনের সৌভাগ্য যে তিনি আজ অনেকদিন গত হ'যেছেন, নতুবা তাঁকে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মৃত্যুতে অসহায় শিশুর মত শোক প্রকাশ ক'রতে হ'ত।

ব্রিটেনের সবার চেয়ে বেশী উপনিবেশ, তাই সেগুলিকে রক্ষা করবার প্রয়াসে হিট্‌লারের বিশ্বগ্রাসী যজ্ঞে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আহুতি দিল, কিন্তু তা'তে যজ্ঞের আগুন গগনচুম্বী হ'যে উঠল দেখে সে ফরাসীকে নিয়ে তার পরম শত্রু রাশিয়ার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে বাধ্য হ'ল। রাশিয়া তার শত্রু, কারণ সে চায়-ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে, অথচ ব্রিটেন ধনতন্ত্রের এমন বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রেছে যে তার মধ্যে কত মহা মহা রথীকে ফেলে সায়েস্তা করে নিয়ে এসেছে। সে মহা মহা

রথীদের মধ্যে একজন হ'ল পরলোকগত মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। সাম্রাজ্যবাদ বিদূরিত না হলে ধনতন্ত্রের অবসান হতে পারে না। সে হিসাবে সাম্রাজ্যবাদই আজ হ'ল প্রকৃত সমাজতন্ত্রের সব চেয়ে বড় বিরোধী। শুধু তা' নয়,—বিশ্বসভ্যতার যে অধ্যায় এখন সুরু হওয়া উচিত, তারও অন্তরায় হ'ল সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদ আজ নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে ফুটে উঠছে। আবিসিনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশ যে স্বাধীনতা হারাল, তার মূলে এই সাম্রাজ্যবাদের দ্বিবিধ রূপ। ইটালী ও জার্ম্মানী সাম্রাজ্যলোলুপ হ'যে ঐ সব দেশ আক্রমণ করেছে ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্য হারাবার ভয়ে ওদের বাধা দিতে সাহস পায়নি।

কিন্তু হিট্‌লার অবস্থা ক্রমেই এমন সঙ্গীন করে তুলছে যে, এখন যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। আজ চেম্বারলেন-চালিত ইংল্যাণ্ড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু যদি ৩।৪ বছর আগে সে এই দৃঢ়তা দেখাত ত'বে ইউরোপের ও বিশ্বমানবের এই আতঙ্ক ভোগ করতে হ'ত না। এতদিন ইংল্যাণ্ড চেষ্টা করেছে হিট্‌লার ও মুসোলিনীকে কোন উপায়ে তুষ্ট রাখতে—এই policy of appeasementএর ফলে সে এদের বহু অন্যায় বরদাস্ত ক'রে গিয়েছে, অথবা নিজের পূর্ব্ব-পন্থার অনুসরণে এদের বাধা দিবার মত সৎসাহস তার ছিল না। তাই সে হিট্‌লার-মুসোলিনীকে তুষ্ট, প্রীত রাখবার চেষ্টাই বরাবর করেছে। এর শেষ পরিণতি হ'ল মিউনিক চুক্তি।

ফরাসী, ইংরেজের হস্ত-পুত্তলিকা বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধুমাত্র ইংরেজের কথায় তার পরম শত্রু জার্ম্মানীর সহিত একমত হ'যে মিউনিক চুক্তিকে তার মেনে নিতে হ'ল, যার ফলে দালাদিয়েব গভর্ণমেণ্ট টল-টলায়মান হ'যে উঠেছিল। ফরাসী গত মহাসমরের আতঙ্কে এখন আতঙ্কিত, তাই যেমন করে হোক্, বৃটেনের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করাই তার উদ্দেশ্য।

রাশিয়াকে নিতান্ত নিরুপায় হ'যে বৃটেনের সহিত চুক্তির কথা তুলতে হ'ল, তার কারণ পাছে সবাই একত্রিত হ'যে তার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে, রাশিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার ইচ্ছাটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই জগতের পক্ষে মঙ্গল।

আমেরিকার Film Industry এবং ব্যবসার বাজার বেশ গরম আছে, যুদ্ধ বাধলে বিশেষ ক্ষতি হ'তে পারে—তাই সে যুদ্ধ চায় না।

আজ ইউরোপে একদিকে যুদ্ধ চায় হিটলার ও মুসোলিনী ও অপর দিকে যুদ্ধ চায়, অষ্ট্রিয়া, আলবিনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আবিসিনিয়া প্রভৃতি হৃত-স্বাধীনতা দেশগুলি।
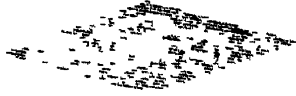
কালো বেড়াল

শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়

মস্ত কাল বেড়াল।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত কাউকে পেলে জেনে নিই, আমাদের বাঙ্গালী জাতের সঙ্গে কোন জ্ঞাতি সম্বন্ধ ওদের কোন কালে ছিল কিনা: মাছভাত না হ'লে এদেরও রোচেনা, ওদেরও ভাবী পছন্দ এটা।

জেলখানায় এখানে কিন্তু রাজবীর রুটি, খোসাসুদ্ধ ডাল অথবা মুলো-পালংএর পাতা সেদ্ধ ছাড়া, দুটি মাছ-ভাত যা, তা' আমাদের এখানেই। তাই হাওয়া পরিবর্ত্তনে ও ডিহিরী বা সিমলায় না গিয়ে মাঝে মাঝে আসে এখানে।

বিকেল থেকেই চেষ্টা চলছে আমাদের উঠোনে ঢুকবার। আর চারদিকে অভিযান সুরু হয়েছে চাকর-ঠাকুর-সিপাই-শান্ত্রী ইট পাথর সবাই মিলে। ইট-পাথরের মতই বর্ম্ম সঞ্জীবিত কিনা এখানে প্রাণ সব।

ইটের পরে ইট চ'লে, পাথরের পরে পাথর। ও বৃথা ম্যাও ম্যাও বাক্য খরচ না করে' দেয়াল থেকে দেয়াল, ছাত থেকে ছাত লাফিয়ে ফেরে। যখন দেখে রথিবৃন্দ প্রায় ঘিরে এনেছে, কোন্ এক ফাঁক দিয়ে কেটে পড়ে। বিজিতের মুখে বিজয়ীর উৎকট্ট কলহাস্য জানিয়ে যায়, নিঝুমের নাড়ীতে জীবনের স্পন্দন থেমে যায়নি।

সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে তালা বন্ধ। ঝরড ঝর করে' তালা পরীক্ষা করে' সিপাই শান্ত্রীরা ঘরে চলে যায়। তারা দেখে যায় আমরা নিরাপদ।

বই খুলে বসেছি বেড়ালটা এসে বীর দর্পে একবার সব ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে যায়—যেন বলে যায়: সুবোদ বোঝা গেছে।

দিনের বেলায় মেঠাই তৈরী হয়েছে, সব খাওয়া হয়নি। পিঁপড়ের ভয়ে মস্ত একটা পাত্রে জল রেখে তার ভেতর হাঁড়িতে বেড়ালের ভয়ে নানা কৌশল ক'রে ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে।

বইয়ের পাতা খুলি: থিয়ে (Thiers) তখন জান এবং রাজত্ব নিয়ে প্যারি থেকে যঃ পলায়তি করে' ভের্সাইতে (Versailles) নতুন রাজধানী ফেঁদেছেন। প্যারিস সেণ্ট্রাল কমিটির হাতে। কমিটির একজন সভ্য উঠে বলছেন, রাজা বনেছি তো মাইনে বাড়বেনা কেন? এডোয়ার্ড মরো গর্জ্জে উঠেছেন, "তেরো আনা নয় পাইতে যদি আমাদের চিরকাল চলে থাকে তো আজো চলবে। লজ্জা করেনা—"

ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্

মরোর গর্জ্জন থেমে যায়। দুয়োরের ধারে গিয়ে একবার চীৎকার করি হ্যাই, হ্যাই, দূর, দূর।

ঢুক্, ঢুক্ একটু বন্ধ হয়। চেয়ারে ফিরে আসি। একটু বাদেই ও টের পায় ও 'দূর' 'দূর' নেহাৎ ফুক মন্তর। আবার ঢুক্, ঢুক্।

দূর যাকগে—পড়াশুনা করা যাক্।

সাধনায় কুর্ম্মের মতো ইন্দ্রিয়াদিকে ভেতরে টেনে নিয়ে আসতে হয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়! কোন দিকে কান দেব না।

ঢুক্, ঢুক্, ঢুক্, ঢুক্, ঢুক্, ঢুক্।

মরোর চোখ জ্বলছে, মুখ খোলাই রয়েছে, তা' থেকে কোনো বাক্য ফুটছেনা।

কুর্ম্মের হাত, পা, শুঁড় সব উদ্ধত, উৎক্ষিপ্ত।

বিজলির আলো পড়ে চোখের সামনে দেয়ালের খানিকটা —আশপাশের থেকে অনেকখানি— উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বই বন্ধ করে সেই দিকে চোখ মেলে বসি।

বহুক্ষণের প্রয়াসে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে একবার বাইরে আসে। সব ঘরগুলোর সামনে দিয়ে আর একবার পর্য্যবেক্ষণ করে যায়।

নজর রাখি জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে। ফিরবার বেলায় গবাদের ফাঁক দিয়ে সবটা দিই ছিটিয়ে। ও একটা লাফ্ মেরে নিজের পথে চলে যায়। আমার এমন প্রাণপন আক্রোশেও ওর গায়ে একটা ফোঁটাও লাগে কিনা সন্দেহ।

সজোরে একবার ঢুক্ ঢুক্। এইরে, হাঁড়িটা বুঝি ওলটায়। চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই মুহূর্ত্তের ওর চোখের মুখের থাবার, সমস্ত শরীরের হিংস্রতা।

মানুষের ভাষা ছাড়াও আওয়াজগুলোর যেন একটা অর্থ আছে : মশাটা কানের কাছে প্রথম যখন এসে বোঁ করে' ওঠে, ও যেন বলে, পেয়েছি গো পেয়েছি।

ব্যর্থ ক্রোধে যখন মনে মনে বলি, 'এতো করে' কাল খাব বলে' জমিয়ে রেখেছি কি তোর জন্যে ?—

চোখ মুখের আর নখের হিংস্রতা ওর যেন ঢুক্, ঢুক্, শব্দে জবাব দেয় : ক্ষুধায় বলে এখন আমার পেট করে চো, চো, আর তুমি রেখেছ কালকের জন্য জমিয়ে।

চটেমটে বলি, তোর ক্ষুধা তো আমার কি ? মানুষের জগত থেকে সংক্রামক হয়ে ওর জগতেও আজ হয়তো জেনারসিটির এথিক্সের চেয়ে rightএর এথিক্স্ বড় হয়ে উঠছে। আজকের দিনের উঠন্ত মানুষের যেমন একমাত্র কাম্য হয়ে উঠছে মানুষকে তার হিউম্যান ডিগ্নিটিতে প্রতিষ্ঠিত করা, কে জানে, ওর ফেলাইন জগতেও সেই চাঞ্চল্যের ঢেউ লেগেছে কিনা। কমলাকান্তের বেড়ালের মেও, মেও করতে আত্মসম্মানে বাধতো না। আজ কিন্তু তার বদলে প্রাণপন একটা ঢুক্ ঢুক্।

ও হয়ত জবাবে বলে : এখন তো আমি খেয়ে যাই, তোমার কি, তা' সকালে দেখে নিও।

অসহ্য হয়ে ওঠে, হাঁক্ দিই : সিপাই, সিপাই।

ঢুক্, ঢুক্ একটু থামে, আবার যেমনি কে তেমনি। বহু চীৎকার ঘণ্টাধ্বনীর পরে সিপাই তো এলো চাবি নিয়ে। পদশব্দে সব নিঃশব্দ হয়ে যায়। সিপাই আলো টিপে দিয়ে চারিদিকে ঘুরে ফিরে এসে বলে : বিল্লি ভাগ গিয়া বাবুজি।

মনে মনে বলি, তুই ব্যাটা এত বড়ো ইংরেজরাজের সেপাই, তোর দাপটে বিল্লি ভাগ না গিয়ে পারে ?

মরো বেচারীকে আর হা করিয়ে রাখতে মায়া হয়, শোবার আয়োজন করতে করতে ওদিকে আবার সুরু।

এখন একেবারে মরিয়া রকমের। আবার একটা চ্যাচামেচি জুড়ে দিয়ে ফলস্বরূপ 'ভাগ গিয়া' রূপ সান্ত্বনাবাণী শোনার চেয়ে ঘুমের এবং মেঠাইয়ের আশা ত্যাগ করে শুয়ে পড়ি।

প্রথম আশাটা পূরোই করি বটে, কিন্তু শেষটার সম্বন্ধে মনের তলায় যেন তকটু তলানি পড়তে থাকে : এতক্ষণে যখন পারেনি কিছু করতে, এর পরেও হয়ত পারবেনা।

এমনি একটা অশ্বস্তি যখন জমে উঠে, শব্দটা কান সওয়া হয়ে ঘুম এসে পড়তে দেরী লাগেনা।

কোন সময় একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন কানে আসে : ঘট ঘট ঝনাৎ।

ভোরে ঘর খুলে দিতে প্রথম বস্তুই গিয়ে দেখি, হাঁড়ির তলায় রসের একটি বিন্দুও লেগে নেই।

প্রত্যাবর্তন

পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীবীণা দাস

(পর্যটন)

বেড়াতে তো যাবই—কিন্তু কোথায় যাব ? সেইটা ঠিক করতে গিয়েই মুস্কিল পড়ে যেতে হয়। যে দেশেরই নাম হয় সেখানেই যেতে লোভ হয়, বেছে নেওয়া বড় কষ্ট। Globe-trotter হ'য়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া যায় না ? সেই তো আমার সত্যিকারের ইচ্ছা। আচ্ছা, পৃথিবী না হয় বড্ড বেশী বড়। কিন্তু ভারতবর্ষ ? তারও যে আমি কিছুই দেখিনি। বইয়ের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে পরিচয়, লোকের মুখে গল্প শুনে তাকে চিনতে চেয়েছি। কল্পনার মধ্য দিয়ে তাকে কাছে পাবার সুখ অনুভব করেছি।—মনে পড়ছে জেলে থাকতে শান্তি বারেবারে আমায় লোভ দেখাত ইউরোপে যাবার—"বীণাদি, সত্যি করে বলতো ইয়োরোপে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় কিনা ? স্বাধীন দেশগুলি শুধু চোখ দিয়ে একবার দেখে এলেও যে আমাদের অনেক লাভ—সেটা বুঝতে পার না ?" বুঝতে তো পারি, তবু স্বীকার করতাম ইয়োরোপের আকর্ষণ আমার কাছে খুব প্রবল হয়ে কোনও দিনই ওঠে না। আমাকে ডাকে ভারতবর্ষের নদী, গিরি, প্রান্তর, উপত্যকা, অরণ্য—তার বিভিন্ন প্রদেশ, তার বিচিত্র নর নারী। কখনও পদ্মার ধারে নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, পদ্মার চরের উপর আস্তানা পেতেছি সেখানকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে ভাব করে নিয়ে—কখনও পুরাণো দিল্লীর ভাঙ্গা প্রাসাদের পাথরের উপর কান পেতে শুনছি "ক্ষুধিত পাষাণের" আর্তনাদ—কখনও তাজমহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার কত শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্না, কত ভোর বেলার অরুণ—আবার কোনদিন বদরিকাশ্রমের দুর্গম পথে চলেছে—একা ঊর্দ্ধমুখী বন্ধনহীন Frontier-এর দুর্দ্ধর্ষ উপজাতির আতিথ্যও নিতে ইচ্ছা করে। আবার ভালো লাগে ভাবতে বাংলার "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়"—না, শুধু তাই নয়—বাংলার ব্যাধিক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, প্রাণহীন গ্রামগুলির মধ্যে আমরা স্থান করে নিয়েছি, তারা দিচ্ছে আমাদের তাদের সহৃদয়তা আর সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার আনন্দ, আর আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি বাইরের বৃহত্তর জগতের আলো, আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠার বেদনা—স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার দুঃখ।

এখানে আমার দেশ ভ্রমণের কাল্পনিক চিত্র কতটুকু মনোহারি করে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম জানি না, কিন্তু সেদিন কারাগারের অন্ধকার রুদ্ধ-ঘরে বসে বসে স্বপ্নের ঘোরে কথার পর কথা সাজিয়ে একটির পর একটি যে ছবি আমি এঁকে চলেছিলাম, তাতে নিজেও আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়ে-ছিলাম,—আর শান্তিও আমার কাছে মেনে নিয়েছিল পরাভব। সেদিন ইয়োরোপের হার হয়েছিল ভারতবর্ষের কাছে, হার হয়েছিল বিদেশের আকর্ষণের স্বদেশের আমন্ত্রণের কাছে।

কথা হ'ল প্রথম যাব পাঞ্জাব। কিছুদিন সবাইকে তাই ব'লে বেড়াতে লাগলাম, নিজেও নিজেকে তাই বলতে লাগলাম: পাঞ্জাব—গুরুগোবিন্দ সিংহের পাঞ্জাব, জালিয়ানওয়ালাবাগের পাঞ্জাব—ভকৎসিং-এর পাঞ্জাব। কিন্তু বাড়ীর লোক ভয় পেয়ে গেলেন সেখানকার প্রচণ্ড গরমের কথা ভেবে। পুরীতে অনায়াসে বাড়ী নিয়ে সবাই মিলে গিয়ে থাকা যায়, আর আমার সমুদ্র-প্রীতি বাড়ীতে সর্বজনবিদিত—একেবারে প্রবাদের মত। কিন্তু সেই আমিই এবার বেঁকে বসলাম,—সমুদ্র তো দেখেছি, যা দেখিনি তাই দেখব। পরিচিত একজন যাচ্ছেন বাংলার কোনও জেলায়, সেখানে আছে নদী, আছে গাছে গাছে অপর্যাপ্ত আম, আছে মাঠে-ঘাটে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। কিন্তু সেও বাবার আপত্তি "এতদিন পরে এসেই এখনই একা একা কোথায় যাবি? দু'জনে বার চেয়ে কিছুদিন Waltair ঘুরে আসি, সেখানে তোর পাহাড় আর সমুদ্র দুই দেখা হ'বে—কিম্বা চল, যাই গোপালপুর—সেখানের দৃশ্য পুরীর চেয়েও মনোরম, আর থাকবারও বড় সুবিধা।"—এইরকম নানাধরণের আলোচনার মধ্যে হঠাৎ এল মেজদির চিঠি "মুসৌরীতে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি, তোমরাও এস।" আপত্তি করবার কিছুই নেই—বেড়ানোর এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কি হতে পারে? সকলেই সমস্বরে মত দিলেন, আমিও। কিন্তু হিমালয়কে আমি ভয় করি। ওকে দেখিনি ওর বিরাট স্বরূপ, ওর উদার মহিমা, ওর আশ্চর্য সৌন্দর্য ঠিক ধারণাও করে উঠতে পারি না। তবু আমার স্বপ্নে ও দেখা দেয় আমার ধ্যানে ওর না-দেখা মূর্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। কত দুর্বল মুহূর্তে ভেবেছি ওই হিমালয়ের প্রশস্ত বুকে রয়েছে আমার জন্য স্থির অটল আলয়, কত চঞ্চল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনুভব করেছি, আমার উপর সেই যোগীরাজের অচঞ্চল দৃষ্টির গম্ভীর অভিনিবেশ। তাই তাকে আমি ভয় করি। আমি ভয় করি ওর নির্লিপ্ততাকে, ভয় করি ওর বিপুল ঔদাসীন্য ভয় করি ওর নির্ভীক সর্বজয়ী শান্তি। হিমালয়ের ওই শান্তির মন্ত্র শুনে শুনেই তো ভারতবর্ষের আজ এই অবস্থা, এই পরিণতি। হিমালয়ের ওই সন্ন্যাসের দীক্ষাই যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ওর ওই শান্ত নীরবতার মধ্যেই যে রয়েছে সমস্ত প্রশ্নের সর্বশেষ উত্তর—সে ধারণা ভুল—মস্ত বড় ভুল। ভারতবর্ষ একদিন ওই ভুলের মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছিলো, আজও তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল না, আজও সেই বন্ধনের জাল ছিঁড়ে ফেলা গেল না। আমিও তো সেই ভারতবর্ষেরই মেয়ে। বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত অক্ষমতা নিয়েই আমি জন্মেছি। আর আমার সেই সমস্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিমালয় আমাকে ভোলাতে চায়, প্রলুব্ধ করতে চায়, তার হিম-শীতল প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমার পরিশ্রান্ত উত্তপ্ত দেহ প্রাণপণে জড়িয়ে ধরতে চায়। আমি তার কাছে যাব, অনেকখানি শ্রদ্ধা নিয়ে আর অনেকখানি বিদ্রোহ নিয়ে। আমি তাকে গিয়ে বলব, "তোমার অভ্রভেদী চূড়া অনেক উঁচুতে উঠেছে জানি, কিন্তু সত্যের পাদপীঠ আরও বহু, বহু উর্দ্ধে। তোমার নির্মম, নিষ্কাম তপস্যার কঠোর সৌন্দর্য—বিশ্বে হয়তো তার তুলনা নেই, কিন্তু তবু সেখানে আছে অসম্পূর্ণতা, আছে এক-দেশদর্শিতা, আছে মিথ্যা অহঙ্কার।

"হিমালয়, মাথা নত কর, চেয়ে দেখ তোমার কোলের কাছে, তোমার পায়ের নীচে—কত দুঃখ,

কত অভাব, কত কদর্যতা। নূতন করে আর একবার সৃষ্টির রহস্য তোমার ভাবতে হবে, জীবনের প্রশ্নগুলির নূতনতর উত্তর তোমায় দিতে হ'বে—তোমার দর্শনে, তোমার মীমাংসায় কোথায় কি ফাঁক রয়ে গিয়েছে তাদের, সংশোধন তোমাকেই আবার করতে হ'বে। নূতন বুদ্ধের তুমি জন্ম দাও, নূতন শঙ্করাচার্যের তুমি সৃষ্টি কর।"—পাথরের বুকে নাকি দাগ কাটা যায় না? হিমালয়ের ধ্যান নাকি কেউ ভাঙ্গাতে পারে না? সত্যি কি তাই? দেখা যাক্।

ঠাকুরদার মজলিস

শ্রীহেমেন রায়

জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন রকম বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিপ্ত প্রায় বালক, কিশোর ও যুবক নাতিরা আসিয়া বৃদ্ধ পিতামহকে ঘিরিয়া ধরিল, অভিযোগ সকলেরই আছে, তবে অভিযোগ প্রকার-ভেদ, তাহাদের ব্যর্থ প্রয়াসের মূল তাহারা ঠাওরাইয়া লইয়াছিল ঠাকুরদাদাকে। নাতিদের মধ্যে যাহারা কিছুদিন স্কুল কলেজের ছায়া মাড়াইয়া বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছে,তাহাদের অভিযোগ হইল যে, পিতামহ যদি বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে সকল ল্যাঠাই চুকিয়া যাইত। পিতাঠাকুর মহাশয়ের তাহা হইলে পাপ-পৃথিবীতে আবির্ভাব হইত না, আর পিতাঠাকুর না আসিলে সকলেই বাঞ্ছারাম নিধি হইয়া থাকিত অর্থাৎ পিতামহ ও পিতামহীর মনের মাঝে ইচ্ছা হইয়া লুকাইয়া থাকিত মাত্র। এ সব্দ-নশে পড়া, পরীক্ষা, পাশ,ফেল,চাকুরীর ধান্দা ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফেরার ঝক্কি কাহাকেও পোহাইতে হইত না। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান সময়কার যুবক বলিল "দাদামণি, তুমি যে শুধু সকল অনর্থের মূল তা নয়, তুমি একজন পয়লানম্বর ধাপ্পাবাজ, আমায় কোলে পিঠে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কতবার বলিয়াছ যে বিবাহ দিয়া আমার এমন খেলুড়ী আনিবে যে, সে আমাকে আকাশ হইতে চাঁদ ধরিয়া দিবে, হাত বাড়াইয়া সিঙ্গাপুরের আনারস আনিয়া খাওয়াইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম যে তাহার সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিয়া লইব। তোমাদের সহায়তা বাদ দিয়া গাড়ী, বাড়ী, ঘড়ি, ছড়ি, জুড়ি সবই করিয়া লইব, ময় এরোপ্লেন পর্য্যন্ত, কিন্তু কৈ তার কি হইল? সব মিছার স্বপন। Understanding that a vacancy has occured—তোমার প্রতিশ্রুতি বোঝার মতই সর্ব্ব হৃদয় দিয়া কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বুঝিয়া 'সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিনু তোমার কাছে,' এখন কি করা যায় বল? মটরু অল্পদিন হইল বি, এ পাশ করিয়া চাকরির উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছে।

পল্টু বলিল "দাদু, আমি যখন খদ্দরের টুপী মাথায় দিয়া নুনের আইনভঙ্গ করিতে যাইবার উদ্যোগ করি, তখন তুমি বলিয়া বসিলে—নুন চুরি কিরে, Sweet relation? মনে মনে তুমি আমার শকার প্রত্যয় করিয়াছিলে। মুখে ইংরাজী আপ্যায়ন করিলে কি হয়? তোমার মনের কথা তখন চাপা দিলেও আমি এখন ধরিয়া ফেলিয়াছি। আর বলিয়াছিলে 'নুন চুরি বুঝি না, ননী চুরি বরং বুঝি।'

যখন আমি বলি ইহাতে খুব নাম বাহিব হইবে, তুমি জবাব দিযাছিলে—ম্নুন চোব বড় হয না-বে – ননী-চোবা চিবদিন বড হইয়া আছে। আবও বলিযাছিলে –আমবা সিপাহী বিদ্রোহের আমলেব লোক, লোহাব আইন ভাঙ্গাব চেষ্টা দেখিযাছি, নোনা-আইনভঙ্গ আমাদেব মনে ধবে না। এখন দেখিতেছি তুমি আমায শুধু গালি দাও নাই, অপমানও কবিযাছ।

ঠাকুবদা বিনকুর দিকে চাহিলেন। বিনকুব বযস কৈশোব ও যৌবনেব সন্ধি-স্থল। সে অভিযোগ দায়েব কবিতে গিযা গাহিযা উঠিল—'উঠল মেতে বক্ত পাগল প্রাণ!' ঠাকুবদা স্নুবে অভিযোগ কবিতে নিষেধ করিযা স্ববে ব্যক্ত কবিতে বলিলেন। অভিযোগ ভবা একখানি ছোট্ট খাতা পকেট হইতে বাহিব কবিযা বিনকু পডিতে লাগিল—অক্ষবেখা হ'তে দ্বাবপাব—যতদূব দৃষ্টিবেখা যায তাব শেষ-প্রান্তে পৌঁছিযা আমাদেব দেশেব দ্বাবদেশেব ওপাবে গিযা সবিযা দাঁডাও ইংবাজ, ছয ঘণ্টাব নোটিশ দিতেছি। নচেৎ তোমাকে জ্বলন্ত টিপান্বিতা উষাব পেলব কোলে লালিত ও লুক্কাযিত অরুণিমা মাখা ভাবতীয প্রভাতেব কোকিল কাকলী শুনাইব। বুলবুল, দোযেল, শ্যামাব ঝাঁপিতে পুবিযা দেশান্তবে চালান দিব। সাগব দোলায দোল দিযা দিযা তালে তালে তমাল তালী সদৃশ শোভমানা নীলা বেলাভূমিতে সজোবে ডালাসমেত নিক্ষেপ কবিযা ছাড়িযা দিযা আসিব।

ঠাকুবদা স্মিতহাস্যে বলিলেন –"এবাবে আমাব সহিষ্ণুতা সার্থক হ'ল, ছেডে দাও আব যাই কব ভাই—ঐ সজোবে কথাটায বুকে তবু একটু জোব বোধ ক'বলাম"। ঠাকুবদা, বোঝা যাইতেছে একটু-খানি গদ্য ঢঙ্গেব লোক, ভাষাও ব্যবহাব কবেন সেই মত। বলিলেন—"তুই যে এত কড়্কড়্ কবছিস্, বল দেখি আমার বিরুদ্ধে তোব বলাব কি আছে ?

বিনকু উত্তব কবিল—বলাব আছে অনেক। তুমি নূতন বিযেব কনেব মত আমাব এই ভাব-গুলিকে উকি মাবিতে দিতে নাবাজ। আমাব কালি, কলম, কাগজ কাডিযা লও এবং আলো নিভাইযা সকাল সকাল শুইতে বল, তুমি না জন্মাইলে আজ কি কবিযা বাধা দিতে বল তো ? এরূপ উত্তম যুক্তি শুনিযা ঠাকুবদা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, হাঁ তাতো বটেই, কিন্তু বল্‌ত ঐ লেখা তোব না আব কাব ? বিনকু বলিল, ঠাকুবমা বলেন ঠিক: 'লবেব বাণ সইতে পাবি, কুশের বাণে জ্ব'লে মবি'। 'মাষ্টাব মহাশযেব বেত সইতে পাবি, কিন্তু তোমাব খোঁচা আব সইতে পারি না। এই পর্য্যন্ত কহিযা, তাব পব ভাবাবেগে বলিযা ফেলিল—'এখন থাকিতে হইলে এ-রূপে ডুবিযা আমাব মবণে কি আছে বাধা ?' ঠাকুবদা থামাইযা দিযা বলিলেন—ভেসে থাক ভাই ভেসে থাক, ডোবাব পালা তো আমাব।

বিনকু অভিমান ভরে বলিল—কত ধবাধরি সত্ত্বেও আমায় আদর্শ-লিপি তুমি কোনদিনও লিখে দাও নাই। যোগ্যতমেব জযক্ষেত্র ক্লাশ-রূপ কুরুক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বাধাঘাত হইতে আমায বক্ষা করবার মত কিছু কব নাই।

ঠাকুবদা একটু মুচ্‌কি হাসিযা উত্তর করিলেন—এটা একটা ভারী সময়, আবও দুর্দ্দশা ছিল। কচি খোকার ক্লাশের বন্ধুরা তো গোঁফ দাড়িওলা, যেন এক একটি সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা বা দক্ষ

প্রজাপতি। এদের ভিতর দিয়ে আমরা কাটিয়ে এসেছি। এবার ছোটদের পালা, তাহারা পক্ষীরাজ ঘোড়া, তালপাতার খাঁড়া, সোনার ভোমরা-ভোমরী, রাক্ষসীর প্রাণ হাতে পাইয়া তুমুল বিক্ষোভ শুরু করিয়া দিল। কেবল ছয় বছরের বাবু সোনা, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব আজও করতলগত করিতে না পারায় ঠাকুরদার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল, কোনো কথাই বলিল না।

অতঃপর ঠাকুরদা নিজপক্ষ সমর্থনে মনোনিবেশ করিলেন। বলিলেন, তোমাদের সমাধান করা সমস্যা নিয়া তোমরা বিব্রত, আমি অ-সমাধান করা সমস্যার কথা তোমাদের শোনাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা কত কিছু করিয়া দিলেন না বলিয়া তোমরা রাগ করিতেছ, উহা খুব উচ্চাঙ্গের সাধনা। নিজেদের হাত-পা ব্যবহার না করিয়া, নিকম্মা হইয়া পরের প্রত্যাশায় থাকা—খাঁটি রাজযোগ। একটা গল্প বলি শোন।

একটা পুকুরে অনেক মাছ ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় কতকগুলি লোক পুকুর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে বলাবলি করিতেছিল যে, একদিন জাল ফেলিতে হইবে। সেই রাত্রে মাছেরা এক বিরাট মৎস্য-সভার আয়োজন করিয়া এই মন্তব্য পাশ করিল যে, বিধাতার সৃষ্ট সকল জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতেছে মানুষ। তাহারা জলে বাস করিতে পারে না। জলে থাকিতে গেলে ডুবিয়া মরিয়া যায়। তাহাদের এ-হেন মরণস্থলে বাস করিয়াও আমরা তাহাদের নিষ্ঠুরতা এড়াইতে পারিলাম না। তাহারা বিধাতার নিকট এই মর্ম্মে নালিশ করিল। বিধাতা বলিলেন, আচ্ছা সুবিচার করিব।

অল্প পরে গরু, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুরা আসিয়া বিধাতাকে বলিল আমরাও জন্তু, মানুষও জন্তু, তবে এত বড়াই করে কেন? উহাদের অত্যাচারে গতায়ু হইয়া পড়িতেছি। প্রভু, রক্ষা কর। বিধাতা সহানুভূতি দেখাইয়া উপায় করিবেন জানাইলেন।

ফকির কর্ম্মকারের মা নিদ্রা হইতে উঠিয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া বলিল—বিধাতা, আমার পুত্র-বধূকে ঢিট্ করিয়া দাও, বেটি নিত্য নূতন গহনার আব্দার করে। বাছা আমার খাটিয়া খাটিয়া মরার দাখিল হইল যে। বিধাতা বলিলেন, আচ্ছা।

একটু বাদে ফকিরের স্ত্রী বলিল,—ঠাকুর, এই দজ্জাল বুড়িটাকে ডাকিয়া লও। আমার বড় খোয়ার করে। আমার স্বামীটিকে তো বশ করিয়া রাখিয়াছে। বিধাতা বলিলেন, দেখিতেছি।

পাটকলের কুলি মঙ্গরু বলিল—কলের সঙ্গে নিজেও পিষাই হইয়া যাইতেছি। আমাদের রক্ত জল করিয়া ধনীরা পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে। উহাদের ধ্বংস কর। বিধাতা আশ্বাস দিলেন।

টম্‌কিন সাহেব বলিল—আজকাল ছোটলোকের বড় বাড় হইয়াছে। কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, দুধে হাত না পড়িলেও জলের অংশ হইতে লোকসান কিছু হইতেছে। বেটাদের দুরস্ত করিয়া দাও। এবার হইতে নিয়মিত ভাবে প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যাইব। বিধাতা হাসিয়া বলিলেন—বেশ।

আল্লা বাখিযা কৃষক আর্জি পেশ কবিল—জমিদাবকে উচ্ছেদ কব, খাজনা-ভাবে জর্জ্জবি আমাব জমিব সীমানা প্রকাণ্ড করিযা দাও। আব মহাজনদেব নির্ব্বংশ কব, উহাদের সুদেব সু দিতে দিতে, দুঃখ-দৈন্য ও ঋণ ছাডা ঘবে অপর কিছু থাকে না। বিধাতা ভবসা দিলেন সুবিচা কবিবেন।

জমিদাব সভাব এক প্রতিনিধি আসিযা উপস্থিত। তাহাব আবেদন হইতেছে -ভগব বক্ষা কব, বক্ষা কব। এ দেশেব মাটিব গুণে লোকে শিব গডিতে গিযা বানব গডিযা ফেলে ইউ পি প্রদেশে তিন তিন জন বিশিষ্ট সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী নেতা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয হিন্দু-মোসলেম মিলনার্থে জনসাধাবণকে সমাজ-সাম্যবাদেব দোহাই দিযা কংগ্রেসে টানাব চেষ্ট যত কবিতেছে, সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাহাঙ্গামা ততই বাডিতেছে। তাব উপব কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেস সবকাবরা নূতন নূতন আইন প্রণযণ কবিযা প্রজাদেব যাহা নহে, ততটা স্বত্ব ও স্বামিত্ব বাডাইয আমাদের শেষ কবিযা আনিল। গভর্ণমেণ্টকে খাজনা যাহা দিবাব তাহা দিব অথচ কাযদা ম খাজনা প্রজাদেব নিকট হইতে আদায কবিতে পাবিব না। এরূপ বান্ধিযা মাবাব চাইতে একেবাবে মাবিযা ফেলা ভাল। ন্যায বিচাব চাই। ভগবানেব তবফ হইতে উত্তব আসিল-তাহাই হইবে।

হনুমান বক্স বাগেডী বলিল—বর্ত্তমানকালে ঋণ-মোচন সালিশী আইনে আমার যত দলিল ও দস্তাবেজ বৃথা হইযা যাইতেছে। আমি তো আসল ফিবিযা চাহিতেছি না, খাতকবা সুদে সুদ, তস্য সুদ কেন দিবে না? ভগবান সুবিচাব কব। এবাব বৈশাখ, অগ্রহাযণ ও মাঘ মাসে তোমা নাম কীর্ত্তন কবাইব।

সখাওত খাঁ কাবুলী বলিল—দাব্-উল্-ইস্‌লাম আফগানিস্থান ছাডিযা দাব্-উল্-হাবব হিন্দুস্থানে আসিলাম, যাহাতে শবিযতের নিষেধ বাঁচাইয়া বিনা গুণাগাবিতে সুদ খাইতে পাবি। এখানেও বাধা? এবে-দীন-কাট্টা কাফেবদের হাত হইতে খোদাবন্দ কবিম—বাঁচাও। বাগেডী ধর্ম্মে যাহাই হউক, এইখানে তাহাব সহিত আমি যোগ দিতেছি। কর্জ্জদাবদিগেব সমর্থকগণকে নেস্ত ও নাবুদ কব। ভগবান সম্মিলিত অবেদেনেব উত্তবে বলিলেন—যথাকর্ত্তব্য কবিব।

একজন নব্য লেখক প্রার্থনা কবিল—'খঞ্জনী' সম্পাদিকার মাথায ভাবী উষ্ণা চডিযা গিযাছে। আমি কবিতাব পবে কবিতা, গানেব পব গান, বচনাব পব রচনা পাঠাইতেছি, তিনি কোনোটাই ছাপিতেছেন না। সব নাকচ কবিযা দিতেছেন। অথচ লেখাগুলি আমার নিজেব কাছে খুব ভাল লাগে। তাঁহাব মাথা ঠাণ্ডা কবিয়া সু-বুদ্ধি দাও ভগবান। ভগবান এ বিষযে বিবেচনা কবিবেন বলিযা আশ্বস্তি দিলেন।

ক্ষণমাত্র যাইতে না যাইতে 'খঞ্জনী' সম্পাদিকা প্রাপ্ত যত লেখা, কবিতা ও রচনার মোড়ক খুলিতে খুলিতে হাতে ব্যথা ধবিযা যাওযায় এক হাতে অপর হাত টিপিতে টিপিতে বলিলেন - আমি ভগবান মানি না। তবে যদি অন্য কোনো অব্যক্ত শক্তি থাকে যা সকলের আডালে কাজ কবে,

তাকে বলি এই মন্দ কবি যশঃপ্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিউক, যত বাজে লেখা কাগজের গাদিতে অফিস ভরিয়া গিয়াছে। ছান্নাবাম ঝাড়ু দিয়া হাঁপাইয়া গেল, তবু ঘর আর সাফ হয় না। ভগবান নির্লজ্জের মত বলিয়া বসিলেন -তথাস্তু। মনে মনে বলিলেন মানুষগুলাকে সৃষ্টি করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছি।

এমন সময় একজন স্বদেশী হাঙ্গামার লোক আসিয়া নিবেদন করিল—ভগবান, যদি ভারত কখনও স্বাধীন হয়, আমাদের দ্বারা যেন হয়। নচেৎ তোমার ভারত উৎসন্ন যাউক। আমাদের প্রত্যেককে এক একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া দাও। প্রত্যেকের পঞ্চতন্ত্র যন্ত্ররূপ প্রতিষ্ঠান যেন থাকে—যুব-সমিতি, ছাত্র-মণ্ডলী, মহিলা-সঙ্ঘ, কৃষাণ-সভা ও শ্রমিকদল। ভগবান বলিলেন—ইহাতে অন্যথা হইবে না। ভারতবাসীদের আত্মকলহ ও দলাদলিতে পটুতা দেখিয়া মনে মনে তিনি বলিলেন—আমার প্রথম অবতারে মাছেরা ঠিক চিনিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভারতের মানুষ আমার সৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য বটে। কি ভাগ্যে যম জবা মানুষ নিয়া কারবার করে! জ্যান্ত মানুষের পাল্লায় পড়িলে বাপের নাম ভুলিয়া যাইত সন্দেহ নাই। যথার্থই ভারত আমার কীর্ত্তি-কল্পতরু।

অতঃপর মহাদেবের মারফৎ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হইতে কিঞ্চিৎ খাঁটী সরিষার তৈল সংগ্রহ করিয়া নাসারন্ধ্রে দিয়া নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাসিকা-ধ্বনি পৃথিবীর যাবতীয় ধ্বনিতে আজও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মা ভৈঃ।

বিশ্বসভ্যতায় ফরাসী বিপ্লবের দান

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম-এ

ফরাসী বিপ্লব অতি শোচনীয় ও মারাত্মক ব্যাপার বলিয়া অনেকে মনে করেন কিন্তু ইতিহাসে কোন ঘটনার মূল্য বিবেচনা করা অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য ঘটনা পরম্পরার জটিলতা ভেদ করিয়া ইতিহাসকে একটা সাধারণ নিয়ম বা সূত্র বাহির করিতে হয়। এক একটি যুগের এক একটি ধারা আছে। ইহাই তাহার যুগধর্ম্ম। ইতিহাস লেখক সেই ধারা আবিষ্কার করিবেন। ইহার ফলে বিশ্বসভ্যতার গতি বুঝিতে পারা যায়, কোন্ ঘটনা বা কোন্ ব্যক্তি সেই ধারার সাহায্য করিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে, ইহাও দেখা প্রয়োজন। ইতিহাস দ্বন্দ্বের কাহিনী কিন্তু বিবিধ ঘটনার সমাবেশ ও স্রোতের মধ্য দিয়া প্রতি যুগের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করে। যুগধর্ম্মের ভিতর দিয়াই মনুষ্য সভ্যতার প্রগতি-স্রোত প্রবাহিত হয়। ইতিহাস জনসাধারণের ক্রীড়া-ভূমি, মহামানব বা অতিমানবের লীলা স্থান নহে। প্রত্যেক মানুষের চিত্তে

ইতিহাস যুগধর্ম্ম

যুগধর্ম্মে প্রগতি-স্রোতের প্রকাশ

যুগধর্ম্মের প্রভাব অল্পবিস্তর প্রকাশিত হয়। তবে যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ কেবলমাত্র যুগধর্ম্মী নন; যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াই তাঁহাদের মহত্ত্ব।

বিশৃঙ্খলতা ও আকস্মিক ঘটনা পৃথিবীকে শাসন করে না। আপত প্রতীয়মান বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা বর্ত্তমান থাকে। ঐতিহাসিকের চক্ষে একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অতীত, বর্ত্তমানের সঙ্গে ওতঃপ্রোত, অতীত-বর্ত্তমানের আলোকে ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ, সুতরাং ফরাসী বিপ্লব আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহাতে কার্য্য-করণের সম্বন্ধ আছে। অষ্টাদশ শতকে যে উদার মতবাদ প্রচারিত হয়, তাহারই আক্রমণে ইয়োরোপের যুগ যুগ সঞ্চিত রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক আবর্জ্জনা অপসারিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে মানুষের মনে মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, আমেরিকার উপনিবেশগুলি, গ্রীস, ইতালী, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাজ্যগুলি পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র---সাম্য ও স্বাধীনতা —বাস্তবের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তথাপি ইহা বিশ্বের অসংখ্য মানুষের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছিল। বিবর্ত্তনের বেগ সকল সময় সমান নয়। তাহার ছন্দ কখনও দ্রুত আবার কখনও বা মৃদুমন্দ। সমন্বয় ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে পারে। পরিবর্ত্তনের ধারা সকল সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলে না চলিলেও বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করা চলে না।

ফরাসী বিপ্লব আকস্মিক ঘটনা নয়।

মানুষের মনে সাম্য ও স্বাধীনতার স্থায়ী আসন গ্রহণ।

ইতিহাসের ধারা বা পরিবর্ত্তনের নিয়ম বিবেচনা করিতে হইলে হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিক প্রণিধান যোগ্য। বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক হেগেলের মতে জগতের কোন কিছুই স্থিতিসার নয়। সমস্ত বিশ্বসংসার ক্রমাগতই রূপান্তরিত হইতেছে। ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ ধারা আছে। প্রথমে একটি আইডিয়া বা তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রূপ গ্রহণ করে। তারপর তার বিরোধী আইডিয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় প্রথম আইডিয়ার নাম থিসিস্‌বাদ, দ্বিতীয় আইডিয়া অ্যান্টিথিসিস্ বা বিরোধী-তত্ত্ব বা প্রতিবাদ। থিসিস্ ও অ্যান্টিথিসিসের সঙ্ঘাতের ফলে সিন্‌থিসিস্ বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। পরবর্ত্তী যুগে আবার এই সমন্বয় থিসিসের স্থান গ্রহণ করে। ইহা হইতে আবার নূতন সঙ্ঘাত ও নূতন সামঞ্জস্যের উদয় হয়। এইভাবে জগতের ইতিহাস প্রতিপর্য্যায়ে আদর্শ (হেগেলের মতে পরমাত্মা) ক্রমে ক্রমে স্বপ্রকাশ হইয়া নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করে। আদর্শের এই লীলা বিশ্বের বিবর্ত্তনের মধ্যে প্রতিনিয়তই চলিতেছে। ইহাই হেগেলীয় রহস্যের গূঢ় রহস্য। কিন্তু হেগেলীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের এই তত্ত্বকে মার্ক্স তাঁহার সাম্যবাদের মূল উৎস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইতিহাসের ধারায় হেগেলীয় ডায়লেটিক প্রযোজ্য

হেগেলীয় মতবাদের আলোকে আমরা বিশ্ব-ইতিহাসের প্রগতিধারা নির্দ্ধারণ করিতে কতকটা সমর্থ হই। প্রাক্-বিপ্লব যুগের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আইডিয়া থিসিস্। তাহার বিরুদ্ধতা

অ্যান্টিথিসিস্। এই দুইয়ের সঙ্ঘাতে বা বিপ্লব হইতে সাম্যের যে নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই সিন্‌থিসিস্ বা সমবায়। পরবর্ত্তী যুগে সাম্যনীতি থিসিসরূপে গৃহীত হইয়া আবার নূতন সঙ্ঘাত ও নূতন সমবায়ের উদয় হইতেছে।

বিপ্লবের যুগে জাতির কর্ম্মৈষণা প্রবল হয়। মানুষ পূর্ব্ব সুধীগণের উচ্চ চিন্তা ও উদার মতবাদের সুফল লাভ করে, সংগঠন ও সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

রাজনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা

যে উদার মতবাদ প্রচারের ফলে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল এবং যে বিপ্লবের বিপুল পুচ্ছাঘাতে যুগ যুগ সঞ্চিত অত্যাচার ও কুসংস্কার চিরতরে দূর হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে রাজনীতিক সাম্যের আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। যখন রাজা ও অভিজাত মোসাহেব, পুরোহিত ও দণ্ডদাতা, ভূ-স্বামী ও গোমস্তা, প্রভু ও ক্ষমতাপ্রয়াসী প্রভৃতি প্রাচীন সমাজের প্রতিভূগণ বিপ্লবের প্রচণ্ড অগ্নিতে পুড়িয়া গেল, তখন পুরাতন প্রথা ও অন্যায় আইনের পৃষ্ঠ অধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণ এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইল। ইহার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না। ফ্রান্সের

চিন্তাজগতে নবযুগের সাধনা।

রাজারা ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মধ্যযুগীয় মনোভাবের উপরে উঠিতে পারে নাই। যাহারা তলায় ছিল তাহারা আরও তলাইয়া গিয়াছিল এবং যাহারা উপরে ছিল তাহারা তলার লোকের শোষণ করিয়াই নিজেদের স্থান কায়েম রাখিতে চেষ্টিত ছিল। জাতি সাধারণকে চিরকালই অন্ধকারে রাখিয়া দেওয়া হইত। যদি কোনদিন কোন নূতন চিন্তার উপাসক রাষ্ট্র বা সমাজের নির্য্যাতীত ব্যক্তিগণের হীন অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া জ্ঞান বিস্তারে ব্রতী হইতেন, সমাজের তথাকথিত মঙ্গলকামিগণ তাঁহাদের উপর উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে চেষ্টা করিত। ফ্রান্সের এই যুগের বিপ্লবীগণের মধ্যে অনেকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু রাষ্ট্রচালন সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা অল্প ছিল। তাহারা স্বাধীনতার স্বপ্নলোকচারী ছিল। অতীতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নূতনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হইয়াছিল। অতীতের ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু যাহারা প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া, অতীতের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া নূতন পরিস্থির রচনা করে, তাহাদের পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য কোন স্থায়ীকল্যাণকর ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সহজ নয়। নূতন বেষ্টনীর মধ্যে যে সকল সমস্যা লইয়া তাহারা মস্তক আলোড়ন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে সম্পত্তি, অর্থনীতি ও অন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রধান। প্রাচীনকাল হইতে মানুষ এই সমস্যাত্রয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে কিন্তু ইহাদের জটিলতায় তাহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়াছে। কি ভাবে ইহারা তাহার জীবনকে সহজ, সুন্দর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারে, চিন্তা জগতে ইহা তাহার নবযুগের সাধনা।

প্রাণধারণ করিতে মানুষ চিরকালই প্রাণান্ত হইয়াছে। বাঁচিবার জন্যই মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। কি উপায় বহিঃপ্রকৃতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, ইহাই তাহার

সম্পত্তি ও তাহার রূপ।

প্রধান সমস্যা ছিল, এই সমস্যা নিরাকরণের তাগিদেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি খাদ্যসংগ্রহের জন্য কোন একটি বস্তু উদ্ভাবন করিল এবং

তখনই ভাল ভাবে বাঁচিবার ও জাতিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। সেই আবিষ্কারককে ভিত্তি করিয়া সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিল।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ ভেবলেন বলেন, বর্ব্বর অবস্থায় নারী ছিল দাসী এবং পুরুষ ছিল সেই সম্পত্তির ভোক্তা ও রক্ষক। সেই যুগে শিকার ছিল খাদ্য সংগ্রহের একমাত্র উপায়। তখনকার শিকারী সমাজের আচার ব্যবহার—মানুষের সহিত মানুষের, স্ত্রীর সহিত পুরুষের সম্বন্ধ, সম্পত্তিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শিকার প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এদিকে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত গ্রাম পত্তন ও বসবাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ চলিতেছিল। পশুচারণ যুগে মানুষ দেখিল যে পশুর সাহায্যে অল্প খরচে খাদ্য সংগ্রহ করা চলে।

বর্ব্বর অবস্থায় পুরুষ ও নারী

শিকার

পশুচারণ

পশুকে বশে আনিবার জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত চাষ করা সম্ভব হইল। সুতরাং খাদ্য সরবরাহের সুনিশ্চিত উপায় নির্দ্ধারণের সহিত পুরুষ কর্ত্তা হইয়া উঠিল। এবং সম্পত্তি বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। কৃষিপ্রধান জাতির একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়া ধনশালী হইয়া উঠিল। অন্য একটি শ্রেণী বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যদ্বারা অর্থ বৃদ্ধি করিতে লাগিল, সমাজ জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সহিত দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুদ্রার প্রচলন হইল। বেশী পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার হইতে লাগিল। স্বীয় পরিশ্রমে ধন উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব মূর্ত্তিলাভ করে। মানুষের কল্পনা, শিল্পবুদ্ধি ও সৃজনি শক্তি স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু ক্রমে সম্পত্তি জিনিষটা সঞ্চিত ও সংহত হইল, লাভ ও লোভের বস্তু হইয়া উঠিল। তখন সম্পত্তি অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার উপায়ে পর্য্যবসিত হইল। সমাজে দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইল। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হইল, তাহারা অবসরভোগী অভিজাত সম্প্রদায় এবং সমাজের অধিকাংশ লোক যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিতে লাগিল, তাহারা সাধারণ শ্রজীবির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেল। এই সময় ধর্ম্ম আপনার সম্মোহনী মন্ত্রের প্রভাবে অবস্থা বৈষম্যের রূঢ়তা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। আবার ভোগী অভিজাত শ্রেণী সাধারণ মানুষকে শোষণ করিয়া যে সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত হইল। ইউরোপের মধ্যযুগে স্বার্থের প্রভাব ধনীর সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিয়াছিল। কারু কার্য্যময় হিন্দু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধের বিরাট চৈত্য ও সঙ্ঘরাম, মিশরের বিশাল পিরামিড, মুসলমান যুগে তাজের অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল অসংখ্য দারিদ্রের অর্থশোষণের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। সাধারণ মানুষ এই বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের সমৃদ্ধি হইতে দূরে অবস্থান করিত। ইহা ধনীগণের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক এবং সুস্থ ও সবল সমাজের পরিচয় নয়।

কৃষিকর্ম্ম।

ভূ-সম্পত্তি।

ব্যবসা-বাণিজ্য।

সম্পত্তি সঞ্চয়।

অভিজাত ও শ্রমজীবি।

ধর্ম্ম অবস্থা বৈষম্যের রূঢ়তার আচ্ছাদক।

"দুঃখ আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে।" ইহা রাশিয়ায় সম্ভব হইয়াছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের সাহায্যে। ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকিলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। "রাশিয়ায় ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুরে। দৈন্যের কুশ্রীতা নেই—আছে আকিঞ্চনতা।" ব্যষ্টি সম্পত্তির এইরূপ ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা একদিনেই মানবের চক্ষে ধরা পড়ে নাই। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের লুই রাজারা দেশে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য দরিদ্র প্রজাদের অর্থ শোষণ করিতেছিলেন এবং আরাম বিলাসী অভিজাতবর্গের অত্যাচারী প্রকৃতি নগ্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। ব্যষ্টি সম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিতেই ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা, যখন জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আপনার বলিতে শূন্যতা ব্যতীত সেদিন কিছু ছিল না, তাহাদের জঠর জ্বালা নিবারণের কিছুমাত্র উপায় ছিল না, তখন সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শবাদ শূন্যগর্ভ বাক্‌চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। এইজন্য এই আদর্শের উপাসক জেকোবিন বিপ্লবীগণ সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য দেশের সমস্ত সম্পত্তিকে বিভক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে এই সহজ উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ ঘুচিয়া যাইবে, কিন্তু দেশের ধনসম্পত্তি এত বেশী নয় যে তাহা সমভাগে বণ্টন করিয়া দিলে তাহাতে আপামর জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে।

সামাজিক সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা।

ক্রমশঃ

চা পানের অভ্যাস

কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে যত লোকে চা পান করত আজ তার চেয়ে ঢের বেশী লোকে চা পান করে। চায়ের চাহিদা যে-ভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের জনসাধারণ চা পানের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশী ক'রে উপলব্ধি করছে। বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের মাদক নিবারণের কর্ম্মপদ্ধতিতে চা অনেক সাহায্য করবে। চা-প্রচার সমিতির প্রচেষ্টা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মাদক নিবারণের ক্ষেত্রে চা প্রচার ক'রে এই কঠিন সমস্যাটিকে অনেক সহজ ক'রে দিচ্ছেন।

এ দেশে এখন চা পানের অভ্যাস একরকম স্থায়ী হয়ে গেছে। সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত চা আজ সমাদৃত। সামাজিক সম্মেলনে, বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়নে চা একরকম অপরিহার্য্য। গরম গরম চা পরিবেশন না করলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার আনন্দ-উৎসবের যেন অঙ্গহানি হয়ে যায়।

আজ সর্ব্বত্র ইহা স্বীকৃত হচ্ছে যে চা একটি নির্দ্দোষ পানীয়। পরিশ্রান্তের পর গরম গরম এক পেয়ালা চা পান করলে শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর ক'রে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলে এবং নূতন উদ্যমে কাজ করবার শক্তি ও উৎসাহ যোগায়। আবহাওয়ার তীব্রতার ফলে যে শারীরিক কষ্ট অনিবার্য্য তাও সহ্য করবার শক্তি যোগায় একমাত্র গরম চা।

জীবনে জেগেছিল মধুমাস

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

(বড গল্প)

এই ঘটনায় লোপেজ রীতিমত বিস্ময়, আতঙ্কিত এবং দুঃখিত হোল। এর আগে স্বপ্নেও সে বুঝতে পারেনি যে ম্যারিয়া মুখে অস্বীকার কোরলেও মনে মনে এই চাকরিটির জন্যই এত লালায়িত ছিল। প্রথম মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হোলেও পরে সে বুঝতে পারলো কেন ম্যারিয়া এই চাকরিটির কথা তার কাছে না ব'লে ক্যাম্পোজের কাছেই বলতে গেল, এই চাকরিটি সম্বন্ধে লোপেজের অভিমত ম্যারিয়া খুব ভালভাবেই জানতো, তাই তাকে সে কিছু বলেনি।

ম্যারিয়ার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে লোপেজ এইভাবে কিছুটা হতাশ হোলেও—বিশেষভাবে দুঃখিত হোল অন্য একটা কারণে। নিয়োগ-পত্র ইত্যাদিতে যার নাম কেটে ম্যারিয়ার নাম বসান হোয়েছে, লোপেজ তার কথা বিশেষভাবে জানতো। সে একজন দুঃস্থা বিধবা, তার একমাত্র পুত্র রাজনৈতিক অপরাধে জেল খাটছে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে তার দিন কাটে। অনেকের হাতে-পায়ে ধ'রে বহু কষ্টে সে এই চাকরিটি যোগাড করতে পেরেছিলো। ম্যারিয়ার যত কষ্টই হোয়ে থাক, একেবারে এ রকম শোচনীয় অবস্থা তার নয়। তারই অতি পরিচিত একজনের চাকরির জন্য এই দুঃস্থাকে বঞ্চনা করা হোয়েছে, এই কথা ভেবে লোপেজ আরও মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যথিত হোল।

অথচ এই বঞ্চনা-প্রবঞ্চনার বিলোপ করাই তার সাম্যবাদের সাধনা, লোপেজ বেশী দিন স্থির থাকতে পারলো না, একদিন এই নিয়ে ম্যারিয়ার সঙ্গে রীতিমত ঝগডাই কোরলো। ম্যারিয়া স্পষ্ট জানালো যে এ সব বড় কথা সে বোঝে না, তার যাতে লাভ হ'বে সে তাই কোরবে, তা' ছাড়া সাম্য-বাদীরা ধর্ম্ম মানে না সুতরাং তাদের আদর্শের সঙ্গে ম্যারিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

এ ঝগডা যদিও দু'একদিনের মধ্যেই মিটে গেল, এর পর থেকেই লোপেজের প্রতি ম্যারিয়ার ব্যবহার কেমন যেন অন্য রকম হোয়ে যেতে লাগলো। ম্যারিয়া আর লোপেজের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশে না, যা কিছু তার পরামর্শ সে ক্যাম্পোজের সঙ্গেই করে। লোপেজ আর ক্যাম্পোজ দু'জনে এক জায়গায় থাকলে লোপেজকে কতকটা অবহেলা কোরে ক্যাম্পোজকেই কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে খুশী রাখতে চেষ্টা করে। এমন অনেকদিন হোয়েছে লোপেজ চুপচাপ বসে থেকে থেকে কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে তা' সে জানতেও পারেনি। লোপেজ মনে মনে ভাবতো, এ অবহেলাটা বোধহয় তার মনেরই ভুল হবে। তাদের এতদিনের বন্ধুত্ব এত সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে এটা সে কল্পনাতেও আনতে পারছিল না।

শেষে একদিন মনে হোল তার ভুল ভেঙ্গেছে। একদিন ক্যাম্পোজ আর ম্যারিয়া চাপা উত্তেজনার স্বরে কি যেন আলাপ কোরছিল, এমন সময় একেবারে অতর্কিত ভাবে লোপেজ ঘরে

ভেতব ঢুকে পড়েছে। ম্যাবিযা শুধু একবার তাব দিকে তাকিযে ক্যাম্পোজকে ইসারায ডেকে অন্য একটা ঘরেব মধ্যে চলে গেল। লোপেজ শুধু স্তব্ধ হোযে দাঁড়িযে বইলো, এবার আব সন্দেহেব কান অবকাশ নেই। তবে কি সেই অল্প-পবিচিতা পল্লীবালাব অযাচিত ভবিষ্যৎ বাণীই ঠিক। লোপেজ তার নিজেব মনকে বোঝাতে চাইলো, আমি ম্যাবিযাব জন্য যা কোবেছি সে তো শুধু কর্ত্তব্য বোধেই কোবেছি, প্রতিদানের প্রত্যাশায যখন কিছু কবিনি তখন আব দুঃখ কি?"

কিন্তু আসলে তা নয। লোপেজ যদিও ম্যাবিযাব জন্য যা কিছু কোরতো নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই কোরতো, ম্যাবিযাকে ব্যক্তিগতভাবে সে বড বেশী ভালবেসে ফেলেছিলো। এ ভালবাসা তাব একদিনে হযনি, দিনেব পব দিনে বছবেব পব বছবে এ ভালবাসা তাব পবিণতি লাভ কোবেছে তিল তিল কোবে তাব নিজেরও কিছুটা অজ্ঞাতসাবে। এ ভালবাসা তাব জীবনেব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িযে গিযেছিলো, এ বকম রূঢভাবে আহত হবাব আগে পর্য্যন্ত, এ ভালবাসা যে কত গভীব তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

ম্যাবিযাব এই ইচ্ছাকৃত অবহেলায লোপেজ মর্ম্মান্তিকভাবে দুঃখিত হোযেছিলো। কিন্তু একথা সে নিশ্চিতভাবে জানতো, অনুবোধ উপবোধ, কিংবা ঝগড়া কোবে ভালবাসা ফেবৎ পাওযা যায না। সে ঠিক কোবলো ম্যাবিযাব কাছ থেকে সে বহু দূরে চলে যাবে, ম্যাবিযাকে তাব ভুলতে হবে, তা না হোলে জীবনে তাব শান্তি আসবে না। স্পেনেব উত্তব উপকূলে বিলবাও নামে একটী বন্দব আছে, সেই বন্দবে একটী চাকবি খালি হোযেছে জেনে লোপেজ তাব প্রার্থী হোল। ঘটনাচক্রে নিযোগপত্রও এলো ঠিকই। মামাব অনুমতি নিযে হোটেলেব চাকবীও সে ছেড়ে দিল।

কাল ভোবে তাব গাড়ী চডতে হবে। জিনিসপত্র সব গুছিযে ঠিক্‌ঠাক্‌ কোবে সে ভাবাক্রান্ত মনে ম্যাবিযাব সঙ্গে একবাব শেষ দেখা কোবতে চললো। সেইদিনকাব ঘটনাব পব আব সে ওদিকে যাযনি, সকল বকম অপমানেব জন্য তাব প্রস্তুত হোযে থাকতে হোল, কিন্তু তবুও ম্যাবিযাকে আবেকবাব দেখার আকঙ্ক্ষাও সে দমন কোবতে পাবলো না।

ক্যাম্পোজ সেদিন হাজিব ছিল না। যথাসম্ভব আনন্দের ভাব কোবে ম্যাবিযাকে সে এই "সুসংবাদ" দিল, ম্যাবিযাও এই সুসংবাদ শুনে তাকে অভিনন্দিত কোবলো, কিন্তু পবে গম্ভীব হোযে বোললো—"বিলবাও! সেতো এখান থেকে অনেক দূব, মাইনে বেশী হোতে পারে, কিন্তু এতদূবে যাচ্ছ কেন?"

"এমনি, সেভিল জাযগাটা আমাব আব ভাল লাগছে না।"

সন্ধ্যের সময বাড়ী ফিরে এসে দেখে তাব নামে একখানা চিঠি, ম্যাবিযা লিখেছে: "লোপেজ, তুমি আমায ভুল বুঝেছ, অবিলম্বে আমাব সঙ্গে তুমি আবেকবাব এসে দেখা কবো।" নতুন আশায বুক বেঁধে আবার সে ম্যারিযার কাছে ফিবে চললো। ম্যারিয়া তার জন্য দরজায অপেক্ষা কোবছিল। তারা দুজনে আগেকাব মতো বেড়াতে বেড়াতে সহরের একপ্রান্তে একটা

বিলের ধারে একটা কাটা-গাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো। এতক্ষণ দুজনে তারা কেউ কোন কথা বলেনি। দুজনেই বিচলিত, ম্যারিযার ভাষাও ছিল অসংলগ্ন, ম্যাবিযা লোপেজের কাঁধের ওপব মাথা বাখলো—"তুমি যেওনা লোপেজ, তুমি চলে গেলে আমাব বড কষ্ট হবে। তাছাড়া আমাব কেন যেন মনে হোচ্ছে যে আমাবই কাবণে তুমি সেভিল ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তুমি আমায় ভুল বুঝো না লোপেজ!"

লোপেজ নেহাৎ ছেলেমানষী অভিযোগেব সুবে বোললো, "তবে তুমি ক্যাম্পোজকে খাতির কোরতে গিযে আমায অমন অবহেলা কর কেন?"

উত্তবে ম্যাবিযা যদি স্পষ্ট কোবে বোলতে পাবতো—"সে আমাব স্বার্থের খাতিরে এবং তোমাকে নিতান্ত আপনাব ভেবে", তাহলেই বোধহয বেশী ভাল হোত। কিন্তু সে তা বোলতে পাবলো না।

—"কই, তোমায আমি অবহেলা তো কিছু কবি না. ও আমাব ছেলেবেলা থেকেই আমাকে খুব স্নেহ কবে, অল্পদিনেব জন্য সে সেভিলে এসেছে, আদব যত্নেব কিছু যদি ত্রুটী হয,—তাতে বিশেষ কিছু মনে কোরতে পাবে তাই। তা'ছাড়া তোমাকে আডাল কোবে আমবা যে সব কথা বলি, সেগুলি আমাদের গুপ্তসাধাবণতন্ত্রী দলেব নিতান্ত গোপনীয কথা ছাডা আব কিছু নয।"

লোপেজ এবাব দৃঢভাবে বোললো, "এসব কোন অজুহাত আমি শুনতে প্রস্তুত নই, আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বটা বজায বাখতে যদি তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছে থেকে থাকে, তবে কোন সময়েই কোন অজুহাতেই শুধু ক্যাম্পোজকে খুশী বাখবাব জন্য আমাকে তাচ্ছিল্য কোবতে পাববে না।"

—"তোমাব চেযে কেউ কখনও আমাব বেশী আপন হোতে পাবে লোপেজ, একথা কি তুমি সত্যি বিশ্বেস কোবতে পাব?"

সেদিন শীত ছিল খুব অল্প। আকাশ ছিলো আলোয আলোময, চাবিদিকের পাতলা কুযাশা সমস্ত পৃথিবীটাব ওপবে একটা বহস্যময মাযাজালেব সৃষ্টি কোরেছিল। সর্ব্বোপবি ম্যাবিযার স্ববে ছিলো একটা হৃদয-স্পর্শকাবী আর্দ্রতা, এমন একটা আর্দ্রতা যা নাকি লোপেজকে তার বক্তব্যের আন্তরিকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে একেবাবে নিঃসন্দেহ কোবে দিল। লোপেজ অনেকটা অপ্রস্তুত হোযেই যেন এই অপ্রীতিকব প্রসঙ্গটা বদলে ফেললো।

"ম্যারিযা, তোমাব বযস এখন জানি কতো?"

"বাইশ, তোমাব?"

"চব্বিশ"

ঠিক এই সময লোপেজ আব ম্যাবিযাব মধ্যে পাতানো সম্পর্কে বাধাটা একেবাবে দূর হোযে গেল। স্থিব হোল যে কেউ আব অনুমতি দিক আব না দিক, ম্যারিয়া আব কযেকদিনের মধ্যেই একবার তাদেব গ্রামে গিযে তার বাপ-মাব সঙ্গে দেখা কোবে এসে লোপেজকে বিযে কোববে।

ক্যাম্পোজের সম্বন্ধে লোপেজের ধারণা কি ছিলো তা আগেই বোলেছি, লোপেজ সম্বন্ধে ক্যাম্পোজের মনোভাব ছিল ঠিক তারই প্রতিচ্ছায়া। মুখে অনেক বড বড় কথা আওড়ালেও সাম্যবাদ কিংবা অন্য কোন 'বাদ' সম্বন্ধেই তার কোন ধারণা ছিল না। লোপেজ তাদের দলের লোক নয়, লোপেজের প্রতি তার প্রবল বিদ্বেষের কারণ ছিল শুধু এই-ই। যখন সে জানল যে ম্যারিয়া লোপেজকে বিয়ে কোরতে যাচ্ছে তখন তার অসন্তুষ্টি বাড়লো ছাড়া কমলো না। কিন্তু লোপেজের মজুর দলে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, তাই সে তাকে সামনা সামনি না ঘাঁটিয়ে কৌশল অবলম্বন কোরলো। প্রথম সে একবার গ্রামে গেল, সেখানে গিয়ে লোপেজ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে যতরকম হীন প্রচার করা যায় ম্যারিয়ার কাছে তা কোরলো। তারপর সেভিলে ফিরে এসে ইসাবেলার ভাই জোভেলারকে হাত কোরে প্রচার কোরলো যে, লোপেজের সঙ্গে ইসাবেলারই বিয়ে হবে, লোপেজ ম্যারিয়াকে বিয়ে কোরবার প্রতিজ্ঞা শীগ্‌গিরই বাতিল কোরে দেবে। তারপর লোপেজের কাছে গিয়ে বললো যে সে সাম্যবাদী হোতে চায়।

লোপেজ তখন ম্যারিয়াকে পাবার আশার আনন্দে বিভোর, সমস্ত পৃথিবীটাকেই সে তখন ক্ষমা কোরতে পারে। তার মনে প্রবল আশা হোল যে ক্যাম্পোজকে সে নিজের মত অনুযায়ী গড়ে তুলবে।

কিন্তু ক্যাম্পোজের ধূর্ত্ততার তুলনায় লোপেজ ছিলো নিতান্ত শিশু। এখন সে যা যা কোরছিলো সবই তার চক্রান্ত সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমে সে ম্যারিয়াকে জানালো যে লোপেজের সঙ্গে এখন তার খুব ভাব হোয়েছে। কিছুদিন পরে জোভেলারের মারফৎ লোপেজ আর ইসাবেলার 'বিয়ের' সংবাদটা অতি সুকৌশলে ম্যারিয়ার কানে ওঠালো। ম্যারিয়া এ-সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ক্যাম্পোজের কাছে চিঠি লিখলো।

উত্তরে ক্যাম্পোজ লিখলো যে, এ-সংবাদ সে আগেই জানতো তবে ম্যারিয়া মনক্ষুণ্ন হবে জেনে তাকে কিছু লেখেনি। যা'হোক ম্যারিয়ার চিঠি পাবার পর ম্যারিয়ার হোয়ে অনুরোধ কোরবার জন্য লোপেজের কাছে সে গিয়েছিলো, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এজন্য লোপেজের হাতে তাকে ভয়ানকভাবে অপমানিতই হোতে হোয়েছে।

এ উত্তর ম্যারিয়া সহজে বিশ্বাস কোরে উঠতে পারছিলো না, কিন্তু তার ধারণা যে লোপেজ আর ক্যাম্পোজ তাদের পুরাণো বিদ্বেষ ভুলে গিয়েছে, কাজেই ক্যাম্পোজ নিশ্চয়ই ঠিক কথাই লিখেছে। সে আরও ভাবলো আহা, ক্যাম্পোজ শুধু আমার জন্যই লোপেজের হাতে অপমানিত হোয়েছে। ক্যাম্পোজকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একখানা চিঠি দিল। মন তখন তার অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং লোপেজের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠেছে, তাই সে লিখলো,—"লোপেজের মতো বিশ্বাস-ঘাতকের তুলনা পাওয়া যায় না, তার মত দুষ্প্রবৃত্তির লোক আর আমি একটীও দেখিনি, তুমি কিছু মনে কোর না।"

ক্যাম্পোজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল, সে চিঠির এই অংশটুকুই লোপেজকে পড়তে দিল।

লোপেজ পড়লো, ম্যারিযার হাতের পরিষ্কার লেখা,—"লোপেজের মতো বিশ্বাসঘাতকের তুলনা পাওয়া যায় না, তার মতো দুষ্প্রবৃত্তির লোক আর আমি একটীও দেখিনি।"

কথাগুলির ঠিক ঠিক যে মানে কি, কতক্ষণ পর্য্যন্ত লোপেজের তা বোধগম্যই হোল না. মনের ভাব তার কি হয় তাই দেখবার জন্য লোপেজ দেখলো, ক্যাম্পোজ তার মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। সে বুঝলো যে সে যদি কাতরতার ভাব দেখায় ক্যাম্পোজ তাতে পৈশাচিক আনন্দ অনুভব কোরবে, তাই নিজের দৃঢ়তা বজায় রেখে সংক্ষেপে বললো "বয়ে গেছে" এবং ক্যাম্পোজকে বিদায় কোরে দিল।

তারপর কথাগুলির অর্থ এবং তার ফলাফল আস্তে আস্তে লোপেজের মনে পরিষ্কার হোয়ে উঠলো। ম্যারিযাকে বিয়ে করার ব্যাপার নিয়ে সে তার একান্ত স্নেহ-প্রবণ মামার মনে কষ্ট দিয়ে আলদা বাড়ীতে উঠে এসেছে ঃ ম্যারিযার কাছে আশা পেয়ে সে তার বিলবাওয়ের চাকরীতে যায়নি, অথচ তার পুরাণো হোটেলের চাকরীটিও গেছে। অবশ্য ম্যারিযাকে পেলে এসব সে অতি সহজেই ভুলতে পারতো। এই একটু আগেও, ম্যারিযাকে পেলে সে কি পরিমাণ সুখী হোতে পারবে, তারই একটা দিবা-স্বপ্ন রচনা কোরেছে. কিন্তু সে সকল আশাই এখন তার নিজের হাতে ধূলিসাৎ কোরতে হোল। লোপেজ এবার নিজের মনে নিঃসন্দেহ হোল যে ম্যারিযা এতদিন তার প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছে সে শুধু তার স্বার্থেরই খাতিরে। তার ভালবাসা অপাত্রে পড়ার ক্ষোভে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল। সে তার মনে মনে বুঝলো, পৌত্তলিকরা যেমন মাটীর পুতুলে দেবীত্ব আরোপ কোরে পূজো করে, সেও তেমনি ম্যারিযাকে সাধারণের চেয়ে কিছু উন্নত মনে কোরেই ভালবেসেছিল , কিন্তু সামান্য রক্তমাংস আর স্বার্থের মানুষ ছাড়া ম্যারিযা আর কিছুই নয়।

কাজকর্ম্ম কম, চাকরী-বাক্‌রী নেই, সমস্ত দিনটা সে সেভিলের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো মনের শান্তির জন্য, কিন্তু শান্তি কোথাও নেই। গত চার বছরে ম্যারিযাকে নিয়ে ঘোরেনি সহরে এমন কোন জাযগা নেই, সকল জাযগাতেই ম্যারিযার স্মৃতি বিজড়িত। বিকেলবেলা খেয়াল শূণ্য অবস্থায় সেই বিলটা, যার ধারে বসে ম্যারিযা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো যে, ম্যারিযার মনে লোপেজের আসনই সকলকার ওপরে, সেখানে সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হোল। জাযগাটা আর চেনা যায না, গাছের গুঁড়িটা নেই, অন্য গাছগুলিও কারা কেটে নিয়ে গেছে। লোপেজ গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবলো, পৃথিবীটা এরকম ভাবেই বদলায বটে, আজকের চেনা জিনিষ কালকে শুধু স্মৃতির বিভ্রম বলে মনে হয।

লোপেজের মনে অসহ্য জ্বালা, সামনে প্রাণ-জুড়ানো-স্নিগ্ধতার আভাষভরা গভীর কালো জল, সে যেন প্রায় প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ নিয়ম বশতঃই ওপরের পাড় থেকে নেমে নীচের দিকে চললো। হঠাৎ শীতল জলের স্পর্শ পায়ে লাগতেই তার মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ চেতনা ফিরে এলো—লোপেজ বুঝলো যে সে আত্ম-হত্যা কোরতে যাচ্ছে। পা তখনও জলে, লোপেজ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, কেউ তাকে দেখ ছে কিনা। পাশেই

গ্রামের পথ, সেই পথ দিয়ে দিনের কাজ শেষ কোরে ঘরে ফিরে চলেছে একদল শ্রমিক। উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগের স্পেনের শ্রমিক, রাজার অত্যাচারে নিপীড়িত, কুব্জদেহ, অশিক্ষিত কর্ম্মক্লান্ত মানব-পশু। তাদের চোখে-মুখে আর চলন-ভঙ্গীতে শুধু সমস্ত জীবনের বেদনার আভাষ। তারা চলে গেলে পরও অনেকক্ষণ সে জলে দাঁড়িয়ে রইলো, এই শ্রমিক-পথিকের দল কি বাস্তব না তার পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনা? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো যে, যে জীবন সে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছে, সে জীবন তার নিজের নয়, এই সর্ব্বহারাবাদের কল্যাণেই বহুকাল পূর্ব্বেই সেটা উৎসর্গ কোরে রেখেছে।

তাই জীবনে তার কোনরকম সাধ না থাকা সত্ত্বেও লোপেজ সেবার মরতে পারলো না।

মরা সেবারকার মতো হোল না, কিন্তু সেভিলে থাকাও তার পক্ষে আর অসম্ভব, এখানকার প্রতিটি রাস্তাঘাট, প্রতিটী ছোটখাট ঘটনা ম্যারিয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত কোরে তোলে। অনেক কষ্টে একটা চাকরী পাওয়া গেল সুদূর সেই বার্সিলোনাতে। মাইনে অনেক কম, তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ, কিন্তু যে কোন উপায়ে হোক তাকে সেভিল ছাড়তে হবেই।

সেভিল সেই ছোট্ট ষ্টেশন, যেখানে সে ম্যারিয়াকে প্রথম পেয়েছিলো এবং যেখানে সে আবার তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে গেল। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার মনে কেমন জানি একটা বিভ্রম জাগছিলো, কেউ বুঝি তাকে আহ্বান লিপি পাঠাবে, "তুমি যেও না লোপেজ, আমায় তুমি ভুল বুঝো না!"

বার্সিলোনায় গিয়ে লোপেজ কথঞ্চিৎ শান্তি পেল। নতুন দেশ, নতুন কর্ম্মক্ষেত্র। শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশী, অথচ কোনরকমের আন্দোলন নেই। লোপেজের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ, আবার সে নতুন করে জীবন আরম্ভ কোরবে ঠিক কোরলো।

অবশ্য তার প্রধান কাজই হোল রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্যবাদের প্রচার আর শ্রমিক সংগঠন, যে সমাজ-ব্যবস্থার ফলে মানুষ অর্থের পদতলে দয়া, মায়া, প্রেম আর সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়, স্পেনের সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাম্যবাদের, যেখানে মানুষ শুধু মানুষ রূপেই জীবন ধারণ কোরতে পারবে—অর্থের কৃতদাসরূপে নয়।

এদিকে ক্যাম্পোজদের দলও যে একেবারে নিঃশ্চেষ্ট ছিল তা নয়, তারাও শুধু ধর্ম্মের নামে দেশশুদ্ধ লোককে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। আর ওদিকে লোপেজের নেতৃত্বে বার্সিলোনা আর চারদিকের অঞ্চলে শ্রমিক শক্তি ক্রমশই দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। রাণী ক্রিষ্টিনা এই দুই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সাগাষ্টা নামে একজন নামকরা বর্ব্বরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কোরতে আহ্বান কোরলেন। এই সাগাষ্টার অত্যাচারে বার্সিলোনা আর সারাগোসার চারপাশে লোপেজের নেতৃত্বে প্রথম ব্যাপক ধর্ম্মঘট দেখা দেয়। অত্যাচার আরও বাড়লো, শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট রূপান্তরিত হোল সশস্ত্র বিদ্রোহে। ১৯০১ সালে জেনারেল ওয়েলার তার সমগ্র সেনা-বাহিনী নিয়ে শ্রমিকদলকে

প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ কোবলো, লোপেজরা পরাজিত হোল, এবং লোপেজ নিজে আহত অবস্থায় বন্দী হোল। ১৯০৯ সালে সে কাবামুক্ত হোযেই আবাব আবম্ভ কোরলো বিপ্লব, বার্সিলোনাব বাজপথে বক্তের নদী বযে যেতে লাগলো। গর্ভমেণ্টেব সৈন্য এবং বিপ্লবীদের মৃতদেহ একসঙ্গে গডাগডি খেতে লাগলো। বিপ্লব ক্রমশঃ ছডিযে পডছে, সমস্ত স্পেন দেশেই কঠোব সামরিক আইন জারি কবা হোল।

এবাব আব গর্ভমেণ্ট লোপেজকে ধবতে পাবলো না। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বিপ্লবী লেখক সেনব ফেবার ছিলেন লোপজেব বিশিষ্ট বন্ধু, শুধু আক্রোশ বশতঃই গভর্ণমেণ্ট তাকে গুলি কোরে মারলো।

১৯১১ সালে আবাব লোপেজেব নেতৃত্বে সমগ্র স্পেনে ব্যাপক ভাবে রেলওযে ধর্ম্মঘট হোল। মন্ত্রী ক্যানালাজেস্ সামবিক আইনেব ২২১ ধাবা প্রযোগে প্রত্যেক সমর্থ প্রাপ্ত-বযস্ক ব্যক্তিকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি কোবে এই অশান্তিকে দমন কোবতে চেযেছিলেন, কিন্তু ১৯১২ সালে লোপেজ তাকে গুলির আঘাতে হত্যা কবায তার কর্ম্মসূচী কার্য্যে পবিণত হোতে পাবলো না।

তাবপব সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিযে বছবগুলি কেটে যেতে লাগলো, ঠিক এক একটা দিনের মতো।

তাদেব অক্লান্ত চেষ্টায অবশেষে রাজতন্ত্র ধ্বংস হোযে গণতন্ত্র স্থাপিত হোল।

তাব বার্দ্ধক্য ঘনিযে আস্‌চে, স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পডেছে, "পপুলাব ফ্রণ্ট" গভর্ণমেণ্ট স্থাপনেব পব, লোপেজ নিশ্চিন্ত মনে রাজনীতি থেকে অবসব গ্রহণ কোবলো।

অবসর গ্রহণ কোরবাব পব সুখেই তাব দিন কাটছিলো। তাব অতীত ছিল গৌববময, স্পেনেব গণতন্ত্র ও শ্রমিক-কৃষকেব বাজত্বেব জন্য আজীবন সে যুদ্ধ কোরেছে, তার ভগ্ন-শরীর আব অসংখ্য নিপীডনের ক্ষত এখন তার একবকম গর্ব্বের বিষযই হোযে দাঁডিযেছে। কত দেশান্তব থেকে লোক আস্‌তো শুধু তার সঙ্গে দেখা করতে, তার মুখেব কথা শুনতে।

কিন্তু "পপুলার ফ্রণ্ট" গভর্ণমেণ্ট সুচাকভাবে পবিচালনা কোরবার পথে শীঘ্রই কযেকটি অন্তবায দেখা দিলো। অন্তরাযগুলিব মধ্যে দুটাই সর্ব্বপ্রধান। "পপুলার ফ্রণ্টেব" গঠন কর্ত্তারা মনে কোবেছিলেন যে, সমস্ত বামপন্থীবা একত্রিত হোলে সাম্যবাদের শক্তি আরও বেডে যাবে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, মিলনের চেযে মতান্তবই ক্রমশঃ বেশী হ'তে থেকে গণতন্ত্রেরই ক্ষতি হোচ্ছে।

দ্বিতীযতঃ এই অন্তর্ব্বিবোধের সুযোগ নিযে, আগে যাবা নাকি সাধারণতন্ত্রী নামে পরিচিত ছিল, সেই সব গণতন্ত্র বিরোধীবাই ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। সমস্ত বামপন্থীরা যখন গৃহ বিবাদেই বল ক্ষয কোবতে ব্যস্ত, এই সব গণতন্ত্র বিরোধীরা তখন সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অতি সুকৌশলে ভুল ধারণার বীজ বপন কোরতে ব্যাপৃত। প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ কোরলেও এই সমস্ত বিপদের কথা লোপেজের কানে পৌছে তাকে চিন্তিত কোরে তুললো।

দু'একবার সে এই সব বিপক্ষ প্রচারের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেল। তার পূর্ব্ব পরিচিত সেভিলের আশে-পাশের থেকে কয়েকদল শ্রমিক এসেছিলো লোপেজের সঙ্গে দেখা কোরতে। তারা কেউ জিজ্ঞেস কোরলো, "আপনাদের সাম্যবাদের মত নাকি দেশের চাষা-মজুরদের দরিদ্র আর অর্দ্ধভুক্ত কোরে রাখা? চাষা আর মজুরদের কথা ভুলে গিয়ে এখন নাকি আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি কোরতেই ব্যস্ত হোয়েছেন, নয়ত গভর্ণমেন্টের বেশীর ভাগ পদগুলিই তারা পায় কেন? আপনারা নাকি আমাদের সকল গীর্জ্জাগুলিই বাজেয়াপ্ত কোরবেন। কারো কাছে পবিত্র ক্রুশ পাওয়া গেলে আপনারা নাকি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোরবেন।"

এই সকল কথা শুনে লোপেজ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হোল, দেখলো যে চক্রান্তকারীদের অপকৌশলে তার আজীবনের সাধনা প্রায় বিফল হোতে চলেছে। সে নিজে যতটা পারলো তাদের ভুল সে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কোরলো। শেষে তাদের সে জিজ্ঞাসা কোরলো, "এ সব চমকপ্রদ খবর আপনারা পান কোত্থেকে?"

"ভেতরের খবর যাঁরা জানেন তাঁরাই বলেন, তা না হোলে কি আর আমরা বিশ্বাস করি? সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সাম্যবাদীদের উচ্ছৃঙ্খলতায় দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছেই আমরা এ সব কথা শুনি।"

"তাঁদের দু'একজনের তোমরা নাম বোলতে পার?"

"দলের যিনি নেতা তাঁর নাম ক্যাম্পোজ"

ক্যাম্পোজ! সঙ্গে সঙ্গে লোপেজের মনের নিভৃত কন্দরের মাঝখানে ভেসে উঠলো, বহুদিনকার হারানো একখানা মুখ। ক্যাম্পোজের চাতুরী শেষ পর্য্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু তা এত পরে, যে তখন আর তার কোন প্রতিবিধান নেই। লোপেজ দেখলো যে তার আর ম্যারিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য যে কৌশল ক্যাম্পোজ অবলম্বন কোরেছিল, অজ্ঞ জনসাধারণকে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য ক্যাম্পোজের দলেরা ঠিক সেই একই পন্থা গ্রহণ কোরেছে। সেই বেশী টাকার লোভ আর ধর্ম্ম ভয় দেখানো, সেই গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব আর মিথ্যা প্রচার—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে।

সেই শ্রমিক আর কৃষকদলের কাছে সে জানিয়ে দিলো এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবিধান সে যেমন কোরে পারে কোরবে। কিন্তু কথাটাকে কার্য্যে পরিণত কোরতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধের স্বভাবতঃই কয়েকদিন দেরী হোয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্যাম্পোজের কানে উঠলো, লোপেজের সংকল্পের কথা। ক্যাম্পোজ চিন্তিত হোল।

একদিন সকাল বেলা লোপেজ তার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো। এমন সময় হুড়-মুড় কোরে ঢুকে পড়লো একদল সৈনিক। তাদের নেতা সামরিক কায়দায় তাকে অভিবাদন জানালো—

"মহামান্য ডন্ লোপেজ, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু সেভিলে যেতে হবে, এক্ষুণি।"

"কেন, তা তোমরা কিছু জান ?"

"না, ফ্রাঙ্কোর আদেশ।"

লোপেজ ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে একসঙ্গে কিছুকাল স্পেনিস মরক্কোতে ছিলো, সুতরাং সে তাকে বেশ ভাল রকমই চিনতো, কিন্তু লোপেজ তার স্বরূপ জানতো না। মনে মনে ভাবলো, হয়তো কোন গুরুতর রাজকার্য্যেই তাকে ডেকে পাঠান হোয়েছে। সেভিলে গিয়ে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে দিলো। লোপেজের সৈন্য সঙ্গীদের নায়ক সামরিক কর্তৃপক্ষের অফিসে ঢুকে গেল। লোপেজ একটু অবাক হোল, কারণ ইদানীং এরকম অভ্যর্থনায় সে অভ্যস্ত ছিল না, কারণ যেখানে "মাননীয় ভন লোপেজ" উপস্থিত হোত সেখানেই একটা সাড়া পড়ে যেত, সাদর অভ্যর্থনা হোত।

সেখান থেকে তারা একটা বন্ধ মোটর গাড়ীতে রওনা হোল। সঙ্গীরা যখন বোললো নামুন, মোটরের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লোপেজ অল্প একটু শিউরে উঠলো, এ-যে সেভিলের সেই সুবিখ্যাত জেলখানা। ভেতর থেকে জেলের দারোগা বেড়িয়ে এলেন—"অনরেবল ভন্ লোপেজ, কয়েক দিনের জন্য আপনি আমার অতিথি।"

"কেন? অপরাধ ?"

"জানি না, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর আদেশ"

"আমি জেনারেলের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

কিন্তু তার এ কথার কেউ জবাব দিল না, তার কুঠরীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। বিচারের ফলাফলের জন্য লোপেজ একটুও চিন্তিত ছিল না। কারাবাসও তার পক্ষে নতুন নয়। গণতন্ত্রী সরকারের অধীনে আবার তার কিসের বিচার ? অপরাধই বা কি, কারাই বা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে ? এসব জানবার জন্যই তার একটা প্রবল কৌতূহল জাগছিলো।

পরদিন অপরাহ্নে লোপেজ বিচারালয়ে নীত হোল। অতি সংক্ষিপ্ত বিচার। প্রথম তাকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা পড়ে শোনান হোল। "মাননীয় ভন্ লোপেজ, আপনি আপনার উন্মার্গগামী মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা দ্বারা দেশ ও দেশবাসীর ক্ষতি সাধন করবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।" লোপেজের তখনও এইটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ছিলো যে, এখানে এসব অভিযোগের প্রতিবাদ কোরতে যাওয়া মানে, এইসব হৃদয়হীন নর-পশুর উপহাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ দণ্ড তো আগেই ঠিক হোয়ে আছে, বিচারটা শুধু প্রহসন মাত্র!

লোপেজের বহু পূর্ব্বের পরিচিত দু'জন শ্রমিক সাক্ষ্য দিল। তারা বললো, লোপেজ তাদের কাছে পুঁজিবাদ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে ধনিক ও ধর্ম্মযাজকদের হত্যা কোরবার প্রবোচনা দিত।

তারপর এলো ক্যাম্পোজ। এবার এই প্রহসনটা লোপেজের কাছে একেবারে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হোয়ে গেল। ক্যাম্পোজ যা বোললো, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই: লোপেজের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়, তার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে তার জন্য সে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত। কিন্তু একথা সে হলপ কোরে বোলতে পারে, তার এই সুদীর্ঘ জীবনে লোপেজ নিজের স্বার্থ সিদ্ধি এবং জনগণের অহিত

সাধন ছাড়া আর কিছুর জন্য চেষ্টা করেনি। ক্যাম্পোজের মতে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হোলেও স্পেনের হিতার্থে লোপেজকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করাই উচিত।

তারপর এলো ম্যারিয়া। লোপেজ বোধ হয় সেই মুহূর্ত্তে তাকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখবে বলে আশা কোরছিলো। মিষ্টি জিনিষ খারাপ হোয়ে গেলে যেমন অনেক তেতো জিনিষের চেয়েও অতিমাত্রায় বিস্বাদ হোয়ে দাঁড়ায়, লোপেজের প্রতি ম্যারিয়ার প্রেমও তেমনি বিজাতীয় ঘৃণায় পরিণত হোয়েছিল যার তুলনাও হয় না। ম্যারিয়া বোললো, লোপেজ যে একজন প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক এবং দুঃপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোক তা সে তার ছেলেবেলা থেকেই জানে।

রায়দানকারী জজ্‌ও ক্যাম্পোজের সঙ্গে আশ্চর্য্যরকম ভাবে একমত হোয়ে ঠিক কোরলেন যে, লোপেজকে বাঁচতে দেওয়া দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত অমঙ্গলজনক হবে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন কারাকক্ষে বসে লোপেজ তার জীবন ইতিহাসের পাতাগুলি একটা একটা কোরে উল্টে যাচ্ছিলো। ম্যারিয়াকে সে হারিয়েছিলো সে কথা সত্যি, কিন্তু তার স্মৃতি সে একদিনের জন্যও সম্পূর্ণ ভাবে ভুলতে পারেনি। ম্যারিয়ার একখানা ফটো এবং তার কয়েকখানা বাছা বাছা চিঠি এই সুদীর্ঘ সময়ের কোন অবস্থাতেই সে তার কাছছাড়া করেনি। ম্যারিয়ার কথার প্রতিবাদ স্বরূপে আজকে এগুলিকে সে জগতের সমক্ষে হাজির কোরতে পারতো, কিন্তু প্রথম কথা, এ-তো প্রহসন। সত্যিকারের বিচার তো আর নয়, তাছাড়া এই দয়া-মায়া, বিচারহীন পৃথীবীতে তার বেঁচে থাকার আর মোহ কি? বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য লোপেজ যদি মরেই পৃথিবীরই বা এমন কি ক্ষতি হবে। যে চক্রান্তের জালে পড়ে লোপেজ ম্যারিয়াকে হারিয়েছিলো, অবসান ঘটেছিলো তার জীবনের রঙীন মধু-মাসের, স্পেনীয় রাষ্ট্রজগতে শ্রমিক-কৃষকের ভাগ্যাকাশে যে মধু-মাস জেগেছে, লোপেজের মৃত্যুর পর একই কৌশলে এবং একই হস্তে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, লোপেজ তা বুঝতে পারছিলো। কখন মৃত্যু এসে তার দুঃখময় জীবনের ওপর শান্তি-হস্ত বুলিয়ে দেবে তারই অধীর প্রতিক্ষায় সে অপেক্ষা কোরছিল, কিন্তু এই জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই যদি সে আরেকবার প্রথম থেকে জীবন আরম্ভ কোরতো, অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যুদ্ধ কোরতে, একজন অবোধ পল্লী-বালার অবৈতনিক অভিভাবক হ'তে, অথবা গরীবের জন্য জীবনপণ কোরে যুদ্ধ করতে পৃথিবীর এই ঘোর অবিচার স্মরণ কোরেও সে কোনদিন পিছ পা' হোত না, কারণ লোপেজ তার জীবনে যা কিছু কোরেছিলো ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে করেনি, কর্ত্তব্য বোধেই কোরেছিলো।

সেইদিন গভীর রাত্রে লোপেজকে হত্যা কোরবার জন্য যখন বাইরে এনে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল, আকাশে তখন আলো ছিল না। লোপেজ ভাবছিলো তখন সেই একদিনের কথা, যেদিন লোপেজের বয়স ছিল চব্বিশ, ম্যারিয়ার বয়স বাইশ আর আকাশ ছিলো আলোয় আলোময়, যেদিন লোপেজের কাঁধে একান্ত নির্ভর ভাবে মাথা রেখে ম্যারিয়া তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো—"তোমার চেয়েও আর কেউ কোনদিন আমার বেশী আপন হোতে পারে—একথা কি তুমি বিশ্বাস করো!"

বন্দী-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

বন্দী-শিবিরে ববীন্দ্রনাথ—শুনিযা চমক লাগিতে পাবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশেব লোক, বাংলাদেশে বিপ্লবীরা বাস কবে,—বাশিযায যেমন কম্যুনিষ্ট এবং ইটালীতে যেমন ফ্যাশিস্ত। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তো কোন দলেব লোক নন,—তিনি ববাবব দল ও দলাদলিব বাইরে। এমন কি কোন দেশ ও কালেব একচেটিযা সম্পত্তি তিনি নন্।

এই লোকটী বন্দী-শিবিবে কেন? কি জানি বাঁশিতে বোধ হয সাপ জাগানো গান বাজাইযা থাকিবেন, যাতে দলে দলে ঘুম-ভাঙ্গা সাপ ফণা নাচাইযা বাংলাব গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিযাছে। যাবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাবা ভাবিবেন,—বোধ হয কোন নিকট আত্মীয বা স্নেহেব জন জেলে আছে তাই দেখা করিতে গিযা থাকিবেন, যেমন গান্ধীজীব উপবাস ভাঙ্গাব সময জেলে গিযা প্রার্থনা-গান শুনাইযাছিলেন—'জীবন যখন শুকাযে যাবে অমৃত ধাবায এস।' এও বোধ হয় তাই,—স্নেহেব টান, তাই অস্থানেও তাঁকে যাইতে হইযাছে।

বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই, চিন্তিত হইবারও হেতু নাই। হিট্লার আইনষ্টাইনকে দেশ-ছাড়া করিযাছেন, ফ্রযেড্কেও খেদাইযাছেন, লজ্জা বা ভয কোনটাই তাব নাই,—তাই পাবিযাছেন। এ-বিষযে ইংবেজ হিট্লারেব সমকক্ষ নয, লজ্জা না থাক্ ভয তাব আছে। কাজেই ববীন্দ্রনাথকে বন্দী-শিবিরে বাস কবিতে আহ্বান কবে নাই। ববীন্দ্রনাথ কিছু আব আবদ্ধ হন নাই।

কথাটাব সোজা অর্থ এই যে, আমবা শুধু স্থানেই বাস কবি না, কালেও বাস করি অর্থাৎ অপরের মনে। যাঁবা জ্ঞানী, গুণী বা কর্ম্মী—তাঁবা তাই তাঁদেব দেশেব সর্ব্বত্রই বাস করেন, যদিও শবীবটা নিযা বিশেষস্থানে থাকেন। ববীন্দ্রনাথ তাই আমাদেবও সঙ্গী ছিলেন বন্দী-শালাতে। পাশেব বন্ধুর কাজকর্ম্ম যেমন আমাদের উপবও ভালোমন্দ ফলাফল আনিত, রবীন্দ্রনাথেব কাজ ও কাব্যও তেমনি আমাদের বন্দী-শালাতে আন্দোলন তুলিত। খেলায যে লোক চার্জ্জ করিতে গিযা অন্যেব কাঁধে ঘোড-সোযার হইযা বসিত, কিম্বা থিযেটাবে সেনাপতিব পাট করিতে গিযা উত্তেজনায গোঁফ খসিয়া গেলেও যে অভিনেতা একহাতে ওষ্ঠ চাপিযা রাখিযা সমান এ্যাক্‌টিং করিযা যাইত, তাদেব নিযা আমবা যত আলোচনা করিতাম তার চেযে কম আলোচনা আমরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে করিতাম না। বরং বেশীই কবিতাম, কারণ অভিনেতা বা খেলোযাড বন্ধুর কীর্ত্তি কয়েক আসরের আলাপেই রসশূন্য হইয়া আসিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার শেষ ছিল না। আর একটী মাত্র লোক ছিলেন যাঁর সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা ধাবাবাহিকভাবে চলিত—তিনি গান্ধীজী।

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। এক ইংরেজী পত্রিকায খবর বাহির হইল যে, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদেব নিয়া একখানি বই লিখিয়াছেন, বইয়ের নাম "চার-অধ্যায়"। বইয়েব জন্য আমরা উন্মুখ

হইয়া উঠিলাম। বইযের ছিটেফোঁটা সমালোচনাও পড়িলাম, তাতে আগ্রহটা বাড়াইতে পারিল না, কারণ আমাদের আগ্রহ যে অবস্থায় উপনীত হইযাছিল, তারপরে আব বৃদ্ধির অবসর ছিল না। বইয়ের জন্য অর্ডার গেল, কিন্তু একটা আশঙ্কাও আমাদের মনে রহিয়া গেল।

আশঙ্কাটা অবশেষে ফলিয়া গেল। বই গেটে আসিয়া বন্ধ হইল, ভিতরে আসিবার ছাড়-পত্র তাব মিলিল না। অবশেষে অধ্যবসাযের জয় হইল, বুঝাইয়া সুঝাইয়া লেখা-লেখিব পর বইগুলিকে ভিতবে আসিবাব অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষ দিলেন। এক একজন এক নিঃশ্বাসে বই শেষ করিলাম—চাহিদা যে বেশী। সংখ্যায আমরা পাঁচশ (দেউলী ক্যাম্পে)—কিন্তু পুস্তকেব সংখ্যা ছিল বোধহয় খান-দশেক। সময সংক্ষেপ করিবাব জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠক হইত একজন। শ্রোতা জন ছয় সাত তাকে ঘিবিযা বসিযা বই শেষ কবিত।

বই পড়িয়া কেহ ভালো বলিল, কেহ মন্দ বলিল—যেমন সচবাচর বিখ্যাত লিখকদের বই সম্বন্ধে হইযা থাকে। কেহ কেহ কহিল, দুর্ব্বল রচনা, যাঁব হাতে "গোবা", "ঘরে বাইবে" তাঁব হাত এখানে নাই। এও স্বাভাবিক—পূর্ব্বেব লেখার চেয়ে পবেব লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কোন যুক্তি নাই। কিন্তু ভাল-মন্দেব এই বিচাবই সবটুকু ছিল না। অন্য আবও একটা মন ছিল—সেটা উত্তেজিত মন।

আজও পরিষ্কাব মনে আছে বলিযা যাহা স্মবণ কবিতেছি—তাহা এই উত্তেজিত মনের একদিনেব প্রকাশ। সাহিত্যে আমাদেব রুচি আছে, তা' আস্বাদনও করিযা থাকি,—কিন্তু আমাদের আসল পবিচয বাজনৈতিক।

'চাব অধ্যায' পড়িযা এই বাজনৈতিক কর্ম্মীর মন বিচলিত ও উত্তেজিত হইযা উঠিযাছিল। এ বই ববীন্দ্রনাথের লেখা উচিৎ হয নাই, যাদেব বিষয জানেন না তাদেব সম্বন্ধে কেন লিখিতে গেলেন? তিনি আমাদেব উপর অবিচাব কবিযাছেন। নিতান্ত যে শান্তভাবে কথা কহিযাছে, সেও উত্তেজনা এড়াইতে পারে নাই, বলিযাছে—এণ্ডার্সনেব ভয হইতে ববীন্দ্রনাথও মুক্ত হন নাই, তার direct বা indirect ফরমাসে তিনি খাটিযাছেন, তাঁর কাছে এ আমরা আশা করি নাই। বলা বাহুল্য আলোচনা উত্তেজনায পবিণত হইযা মতান্তবে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মনান্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল,—যদিও বেশী দিন সে ভাব ছিল না।

এক ভদ্রলোকের কথা সেদিনের চীৎকাব ও হট্টগোলেব মধ্যে ভালো লাগিযাছিল। তার স্বরও যেমন শান্ত, বক্তব্যের ভঙ্গীও তেমন সংযত ছিল। তিনি বলিযাছিলেন,—এভাবে বিচার চলে না। প্রশ্নের যেমন ধর্ম্ম আছে, বিচারেরও তেমনি নীতি আছে। সাহিত্যেব দিক দিয়া এর বিচার হইতেছে না, হইতেছে রাজনীতির দিক দিযা। বিপ্লবীদের এ বইতে উপকার বা অপকার করিয়াছে—এই রাজনৈতিক প্রয়োজনেব দিক দিযা বুঝিতেও যে দূর-দৃষ্টির দরকার—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন। প্রয়োজনের পরমায়ু বেশী না, আজ যা প্রয়োজন কাল তা-ই ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের মত পরিত্যক্ত হয়। বুদ্ধি শান্ত হইতে সময় লাগে, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না

করিলে বিচার অসম্ভব। এ ভাবে আলোচনায় লেখকেব উপর যেমন অবিচার হয়, নিজের উপরও তেমনি অবিচার করা হয়। আব কিছু না হউক অন্ততঃ এটুকু ভাবা উচিৎ যে, এঁর মত মনীষী আঘাত করিয়া বিপ্লবীদের ভাবনা ও চিন্তাকে সরল করার সুযোগ দিয়াছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ ছিল না। দেউলী ক্যাম্পে তিনি আসার পর তাঁকে চিনি। 'চার অধ্যায়ের' আলোচনা আমাব মনে রেখাপাত করিযাছিল। সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হইযাছে, কমবেশী temper সবাই হারাইযাছে, কিন্তু সে দলের মধ্যে একা এই লোকটিই মাথা ঠাণ্ডা বাখিযাছে। অনাযাসে তিনি আমাব মনোযোগ আকর্ষণ করিযা লইতে পারিয়াছিলেন। ঠিক কবিলাম, অবসরমত এব সঙ্গে ভালো কবিযা আলাপ করিব। কে যে কোথায় কি পরিচয় নিযা আমাদের মধ্যে রহিযাছে, বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

একদিন বিকালে 'কমন-রুমে' বসিযা পত্রিকা পড়িতেছিলাম, ঘবে আর কেহ ছিল না, সবাই খেলার মাঠে গিযাছিল। এখান হইতেই মাঠেব হৈ-হৈ বাঁশি ইত্যাদি শুনিতে পাইতেছিলাম। শুধু একজন হিন্দুস্থানী কযেদী একটা বেঞ্চির উপর উপুর হইযা একখানা 'Illustrated Weekly' খুলিযা লইযা ছবি দেখিতেছিল। তস্‌বিবে সে মুগ্ধ হইয়াই ছিল। ঘাড তুলিলেই সম্মুখের খোলা দরজা ও জানালাব পথে দূবের পাহাডটা চোখে পডিত। এমন সময ভদ্রলোক ঘবে ঢুকিলেন।

পাশে আসিযা বসিযা একখানা বিদেশী কাগজ টানিযা লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খেলতে যাননি যে?" নিজে খেলিতে পাবেন না, কিন্তু খেলাব বিষয়ে আগ্রহ আছে, খবরা-খবরও বাখেন। এই সময়ে আমাকে লাইব্রেবীতে দেখিযা একটু অবাক্ হইযাছেন। কহিলাম—"শরীরটা তত ভালো না তাই আর যাইনি।"

কথায কথায এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠিযা পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার নিজের মত কি?"

—"সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাব নিজের মত যে, এতবড লেখক পৃথিবীতে খুব বেশী আসেনি। আমার পডাশুনা বেশী না, বিদ্যাও কম, আমার নিজের কথাই বল্‌তে পারি যে, এত বড প্রতিভাবান মনেব সংস্পর্শে আমি আসিনি।"

—"আচ্ছা রাজনীতির দিক দিযে যদি বিচাব করেন, তবে তাঁর স্থান কোথায় হবে?" উত্তর করিলেন,—"জানেনই তো তিনি বাজনৈতিক নেতা নন্। আন্দোলনের জন্য যে মানুষ দরকার তা তিনি নন্। রাজনীতি আজ প্রায় আমাদের পুরা মনের মনোযোগ আবদ্ধ করে রেখেছে—এ সত্য। কিন্তু বাংলার যে মন আজ দেখ্‌তে পাচ্ছেন, তা বিশেষ করে দুটী মানুষেব মানস রসে পুষ্ট—একজন বিবেকানন্দ, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। জাতির স্রষ্টা হিসাবেও তিনি অমর।"

একটু থামিয়া পরে তিনি কহিলেন,—"ববীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কত বহুমুখী, একটু চিন্তা করিলেই বুঝ্‌তে পারবেন। এ প্রতিভার তুলনা নাই।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রবীন্দ্রনাথকে অনেকে দার্শনিক বলেন, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

এবার তিনি একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন, "এমন একজন সত্যিকার কবি আমাকে দেখান যনি দার্শনিক নন্। রবীন্দ্রনাথের কবি পরিচয়ের গভীরে তাঁর সত্যতর পরিচয় রয়েছে, আমি তাকে দার্শনিক বলি না, কারণ দার্শনিক হবার জন্য মনীষাই যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু মনীষী নন্, তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি। জীবন সম্বন্ধে তাঁর সত্যদৃষ্টি আছে, তাই প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক কালের সত্য অন্বেষুর কাছে তাঁর মর্য্যাদা থাকবে। ভারতের যদি কোন বিশেষ mission থাকে, তবে তা জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একজন অধিকারী পুরুষ।"

আমি কহিলাম,—"ভারতের mission আছে—একথা আপনি নিজে বিশ্বাস করেন ?"

—"করি।"

—"সে mission কি ?"

—"উপনিষদের সত্যপ্রচারে, মানুষের সত্য অর্থ মানুষের কাছে জানানো।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে সত্য কি ?"

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মুস্কিলে ফেল্‌লেন। আমার মনে হয়, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটীতেই বোধহয় এদেশের কথাটী সবচেয়ে পরিষ্কার পাওয়া যায়। এই বহুতে এক ব্যক্ত হয়েছেন, সমস্ততে তিনিই কর্ম্ম-কর্ত্তা ;—তিনি ভোগ করেন, তাই তিনি ত্যাগ করেন। ভোগের এর চেয়ে চরম পথ আর নাই,—মাগৃধঃ—লোভ কোর না, এ কার ধন ?"

—"গান্ধীজীও বলেন, "Many of us believe, and I am one of them, that through our civilisation we have a message to deliver to the world." কিন্তু তিনি তো ভোগের কথা বলেন না।"

—"গান্ধীজী সত্যদ্রষ্টা, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি। কিন্তু গান্ধীজীর মানসিক গঠন ascetic, তাই morality-র দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপনিষদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দুজনের একটু তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো জানেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। গান্ধীজী বর্ত্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেননি, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সত্য আংশিকতা দোষ পেয়েছে। Morality-র সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার কোন মিল করতে না পেরে গান্ধী এ সভ্যতাকে অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি, তাঁর মধ্যে একটা synthesis আছে। মানুষের 'বুদ্ধি যে বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধির সে দানকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি, পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সভ্যতা অসম্পূর্ণ, এবং এইখানেই ভারতের বিশেষ missionএর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অরবিন্দের মেলে। অরবিন্দ বোধহয় এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আরও অগ্রসর।"

—"আচ্ছা, আপনি বল্লেন যে রবীন্দ্রনাথের সত্যোপলব্ধি আছে। যে অর্থে আমরা এটা এদেশে বুঝে থাকি, সেই দিক দিয়ে এ কথার কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি ?"

তিনি বলিলেন,—"পারি। সত্য যাঁরা জানেন তাঁদের কথা-কাজ-কর্ম্ম ইত্যাদি নষ্ট করলেও তা' ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একটু খুঁজলেই তাঁর সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন। আমি এক সাধককে জানি, 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং অরবিন্দের 'Lights on Yoga' যত পড়তেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও ততো পড়তেন। চার অধ্যায়ের তালিকায় এ তিনটীই স্থান পেয়েছিল। গীতা ও গীতাঞ্জলি তিনি পাশাপাশি রাখতেন, প্রয়োজন মত কখনও এটা পড়তেন কখন ওটা পড়তেন। সাধক মানুষ, যাঁর লেখায় পাথেয় পেতেন সে লেখার লেখক এদিক দিয়ে নিশ্চয় দীন-দরিদ্র বা আনাড়ী নয়—বুঝ্‌তেই পারেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এ পথের সন্ধানীরা বলেন—ঐ তাঁর first revelation, অরবিন্দের ভাষায় opening, উপনিষদের ভাষায় আত্মদর্শন বা আবরণ উন্মোচন। এর মানে কি জানেন,— 'আমি জেনেছি তাঁহারে, মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে'।—বলতে পারেন যে, এজন্য রবীন্দ্রনাথ সাধনা করেছেন কিনা? সাধনা আগে হয় না, পরে হয়। সত্যের প্রকাশ যে কোন কারণে সহসা জীবনে দেখা দেয়, তারপরে সাধনা চলে। এ সত্য-বোধকে স্থায়ী করতে—জীবনকে সে ছন্দে বেঁধে নিতে। লক্ষ্য নিশ্চয় করেছেন যে, মহাত্মাজী নিজের জীবনকে বলেন an experiment with truth মহাত্মাজীর যা truth, রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্ষেত্রে তাহাই জীবন-দেবতা। জানি না, এ আপনার নজরে পড়েছে কিনা। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবির মত বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন না, নিজের অনুভূতির বিচিত্র গান গেয়ে যান, পরে তার একটা নাম দেন। কেন? সমস্ত গান কবিতাই ঐ একের মধ্যেই বিধৃত বলে।"

এরপরে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তা একটু বেসুরো শুনাইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"রবীন্দ্রনাথকে বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিক বলা হয়, এ মতবাদ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

ভদ্রলোকের মুখের চেহারা যেন একটু serious হইল, চোয়ালের দৃঢ়তায় ও কপালের রেখায় তা ধরা পড়িল, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র।

শান্ত সুরে জবাব দিলেন,—"ওটা গালি। আপনারা কখনও বলেন না বুর্জ্জোয়া scientist অথচ বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিক বলতে আপনাদের দ্বিধা হয় না। Science-এর জাত বা শ্রেণী নাই, এ মানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বেলায়ই আপনাদের বুদ্ধি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, গোড়ামী দেখা দেয়। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তা আপনারা অনায়াসে সাহিত্যেও টেনে আনেন, কবিতাটী বোধহয় জানেন—

কমলবনে কে পশিল হীরার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল আ-মরি, আ-মরি!"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সাহিত্য অর্থে আপনি কি বোঝেন তবে?"

"এক কথায় বুঝানো কষ্টকর। তা ছাড়া, সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ সব ক্ষেত্রেই কঠিন ব্যাপার, এমন কি

একপ্রকার অসম্ভবও বলতে পারেন। বিজ্ঞান যদি সত্যসন্ধানী হয়, সাহিত্যকে তবে বলা যায়—রসসন্ধানী। মানুষের প্রাণ ধারণ করতে হয়, এদিকের প্রয়োজন নিয়ে সমাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মিলে সভ্যতার একটা দিক গড়ে উঠেছে। মানুষ বাঁচে, প্রাণ ধারণ করে—এতেই কি মানুষ পর্য্যাপ্ত, না মানুষের আর কিছু আছে?"

আর কিছু যে আছে, সে বিশ্বাস আমার আছে,—কিন্তু তা যে কি, সঠিক জানি না। তাই ভাবিতেছিলাম।

ভদ্রলোক কহিলেন,—"এত ভাববার কি আছে? প্রাণধারণই যদি সব হয়, তবে জীবজগতে গাছপালা, পশুপাখী এদের চেয়ে আমরা বেশী কিছু হতে নিশ্চয় পারিনে। অথচ আমরা এদের চেয়ে আরও খানিকটা বেশী—এ বোধ আমাদের সবারই আছে। মানুষ প্রাণ-সর্ব্বস্ব নয়, তার উদ্বৃত্ত আরও একটা দিক আছে। সে-দিকেই তার সত্যসন্ধান, রস-অন্বেষণ, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণবোধ ইত্যাদি প্রচেষ্টার উৎস। সাহিত্য সেদিককার মানুষেরই বিশেষ এক জাতীয় সাধনা।"

উভয়েই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম।—তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিজের মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পায় নাই কিম্বা করে নাই, তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়—এই আমার ধারণা। 'চার অধ্যায়' নিয়ে সেদিন আপনারা উত্তেজিত হয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি জন্মদিনে যে 'প্রত্যভিনন্দন' বক্সাক্যাম্পের বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন, তা' আর একবার দেখে নেবেন। তখন বুঝ্‌তে পারবেন, আপনাদের মধ্যে মানুষের কোন্ পরিচয়কে তিনি দেখ্‌তে পেয়েছেন ও সম্মান দিয়েছেন। ..

এগুলোকে আপনারা ভয় করেন না, আপনারা বিপ্লবী, আপনাদেরই একজনের কথা বলি যাকে সবাই সম্মান করে থাকেন নেতা বলে। জীবনে, ব্যক্তিগত বা রাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, যখন ভয়ানক সময় উপস্থিত হয়, বিশ্বাসের জোর কমে যায়, বুদ্ধিতে পথ পরিষ্কার আর ধরা দিতে চায় না,—তখন তিনি যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করতেন, শুনলে সত্য বলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। শক্তি সংগ্রহ করতেন গান গেয়ে, অথচ তিনি গান জানেন না। এই রকম দিনে অনেকবার যে আমি নিজেই তাকে গুণ্‌গুণ্ করে আবৃত্তি করতে শুনেছি—

'তোমার আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।'

বিপ্লবের নেতাকে শক্তিরসে যিনি পুষ্ট করতে পারেন তাঁর মর্য্যাদা সম্বন্ধে আপনাদের আরও একটু সচেতন হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমরা নিজেরা সাধক নয়, প্রেমিকও নয়, আমরা সত্য-অন্বেষুও নয়—তাই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্য বুঝ্‌তে আমরা স্বভাবতঃই অক্ষম।"

ভদ্রলোকের সুর প্রায় আবেগের পর্দ্দা ছুঁইয়াছিল। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তিনি ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছেন, বুঝিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিলেন, এই রাজপুতনায় এসে কার কথা আপনার প্রথম মনে হয়েছিল?

—"রাণা প্রতাপসিংহের।"

"রাণাপ্রতাপের আগে এবং পরে কত লোক রাজপুতনায় জন্মেছে, কিন্তু ঐ লোকটাই এ দেশের মানসিক প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিনিধি হয়ে জীবিত আছেন। বাংলার ও ভারতের আজিকার সমস্যা আজ বা কাল একদিন মীমাংসা হবে। তখন এই রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের সেদিনকার দেশবাসীর আসতে হবে,—দেশের ঐশ্বর্য্যের ও বাণীর সন্ধান নিতে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ বুঝতে পারেনি, কিন্তু সৌভাগ্যের দিনে জাতির মহৎ ও সত্য প্রয়োজন যখন দেখা দিবে, তখনই রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী বুঝতে পারবে। এ প্রতিভার পরমায়ু যে কত অমিতায়ু তা বুঝতে একটু দৃষ্টি থাকা চাই।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। আমিও চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। আমার কেন যেন মনে হইল এ লোকটির মধ্যে একটি সাধক আছে। নতুবা এত শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ অপরের সম্বন্ধে,—কেমন করিয়া সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সশ্রদ্ধ নম্রভাব, যাতে প্রায় তিনি ভাবপ্রবণ হইয়া উ ছিলেন,—একি শুধু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই? রবীন্দ্রনাথের কি এক মহৎ ও সত্য-পরিচয় বোধ হয় তিনি জানিতে পারিয়া থাকিবেন—কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথ কে—?

বিদেশী কাগজে ভদ্রলোক নিবিষ্ট হইলেন। অদূরে বেঞ্চিতে হিন্দুস্থানী কয়েদী এ অভিনেত্রীর ছবিতে মুগ্ধ হইয়া আছে। ক্যাম্পের তারের বেড়ার ওধারে এক কোণায় বন্দুক কাঁ সিপাহী পাহারা দিতেছে। দূরে বালির পাহাড়ের মাথায় বিকালের আলো পড়িয়াছে। চোখে উপর এবং নির্জ্জীব ছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। মন ভাবিতেছিল,—এ দেশেই রাণা প্রতাপ ছিলেন, তিনি কি কোন দিন এ পথে ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়াছিলেন? রাণা প্রতাপ, রবীন্দ্রনাথ নাম দুটা মা জড়াইয়া যাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথকে অতীতে রাখিয়া দেখিলে কি এইরকম রাণা প্রতাপের মত মনের সামনে মূর্ত্তি নিয়া দেখা দিবেন? ভদ্রলোক কত বলিলেন, দেশের ঐশ্বর্য্য ও বাণীর সন্ধা নিতে দেশবাসীকে তাঁর কাছে যাইতে হইবে। কিন্তু তখন তো রবীন্দ্রনাথ থাকিবেন না, আজ যেম রাণা প্রতাপ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—এই সংখ্যার পৃষ্ঠায় হেমন্তবাবুর লেখা "শেষ বিচার" শীর্ষক বড় গল্পটি একবারে স সঙ্কলন না হওয়ায়, বাকী অংশ আগামী বারে সমাপ্ত হবে।

ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ

পূর্বানুবৃত্তি
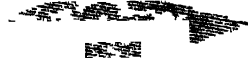
ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি এচ্, ডি

আজকালকার কালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সংখ্যাগুলি দুষ্প্রাপ্য। অধুনাকালের তরুণদের নিকট তাহাতে কি লেখা থাকত তাহা অজ্ঞাত। কাজেই তাহাদের নিকট এই পত্রিকার চিন্তাধারা ও আদর্শ অপরিজ্ঞাত, সেই জন্যই আধুনিক কালের বৈপ্লবিক মনোভাবপূর্ণ তরুণদের নিকট 'যুগান্তরের' লেখা 'অবাঙ্ মানসগোচর' হয়ে কিম্ভূত ধারণার সৃষ্টি করে। অবশ্য ইহা বাংলার 'ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাতের যুগ' (storm and stressed period) আরম্ভ হওয়ার মুখেই প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য যুগান্তরের ভাষা বাংলা সাহিত্যের Blood and thunder-এর যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাধারণতঃ যুগান্তরের ভাষায় উচ্চ সাহিত্যিক ঢঙ (style) ছিল না। কোন একজন মাননীয় প্রবীণ ব্যক্তি বলেছিলেন "লেখা দেখে মনে হয় ছেলেরা ইংরেজী লেখা সবে মাত্র শেষ করে বাংলা লিখতে শুরু করেছে", অর্থাৎ ইহা ইংরেজী ধরণের বাংলা। যদিচ লেখার মধ্যে সুপরিচিত সাহিত্যিকদের লেখার ঢঙ পাওয়া যেতো না, তত্রাচ যুগান্তরের লেখার style-এর মধ্যে কোন প্রকারের inferiority complex ও জাতীয় হীনতার পরিচয় পাওয়া যেতো না, তখন জাতীয়তাবাদের নব-উন্মেষে দেশ নূতন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। এই "যুগান্তরের দল" বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্চস্তর হতে সাধারণতঃ আগত। কাজেই তাঁরা এই নূতন স্বপ্নের প্রতীক হয়ে Militant Nationalism প্রচার করেছে। যখন মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে Defeatist mentality র মনোস্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যখন উনবিংশ শতাব্দার বড় বড় বাংলা সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে এই মনোস্তত্বের ফল স্বরূপ কেবল কান্নার রোলই শ্রবণ করা যেত, যখন আনন্দমঠ ছাড়া কোথাও কোন Constructive Programme পাওয়া যেত না, তখন যুগান্তর একটা নূতন কর্মপদ্ধতির প্রেরণা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। ইহাতে Defeatist mentality-র চিহ্ন মাত্রই ছিল না। বাংলার এই স্বদেশীযুগের প্রারম্ভেই রবীবাবু গাইলেন "আবেদন ও নিবেদনের থালা বহে বহে নত শির।" আবার রবীবাবু গাইলেন "তোমারও যে দৈন্য মাতা কেন তাহা ভুলি।" তখন যুগান্তর দেশকে বলল, অতীতের দৈন্য ও ক্রন্দনের রোল ছেড়ে দিয়ে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ কর। ইহাই যুগান্তরের ছিল বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষা লেখার মধ্যে যুগান্তরের এই বাণী বাংলা সাহিত্যের "Blood and thunder" যুগের একটি অধ্যায়।

এখন ধরা যাক্, লেখার Style কি রকম ছিল। প্রথমেই বলা হয়েছে ইহা ইংরাজী-পড়া কাঁচা লেখকদের লেখা ছিল। কিন্তু ইহাতে ভাবের প্রাচুর্য ছিল (Emotion) এবং এই পত্রিকার

পরিচালকগণ নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করতেন। সেই জন্যই এই পত্রিকাকে T radical বলেই গণ্য করতেন। সন্ধ্যা পত্রিকার (৺ব্রহ্মবান্ধব দ্বারা সম্পাদিত) ভাষার Style আজ পর্যন্ত অতুলনীয় হয়ে আছে। কিন্তু তার প্রতিপাদ্য ছিল Destructive criticism (ধ্বংসকারী সমালোচনা ইহা সাধারণতঃ সুন্দরবাবু প্রমুখ Modern নেতাদের কর্মের ও গবর্ণমেণ্টের কার্যের সমালোচনাতে ব্যাপৃত থাকত। অনেকেই যুগান্তরকে চরমপন্থীয় বলে মনে করতেন এবং অনেক স্বদেশীওয়ালাও যুগান্তরকে সেই চক্ষে দেখতেন। তজ্জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে তাহা প্রত্যাখ্যান করতেন। 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' জাতীয়তাবাদের দুই মেরুর ন্যায় অবস্থিত ছিল। এই জন্য ইহার মধ্যভাগে আর একটা ভাবধারার স্থান আছে বলে ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় তাঁর 'দৈনিক নবশক্তি' কাগজ প্রকাশ করেন। অবশ্য এই তিন পত্রিকাই Militant Nationalism প্রচার করেন। শুনেছি আমার জেলের পর যুগান্তর দলের কর্মীরাই এই পত্রিকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। আমার জেলের পর দেশে এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, যাহাতে এই তিন পত্রিকাই এক ভাবধারা প্রচার করে। ইহার জন্যই গবর্ণমেণ্টের এক কুঠারাঘাতেই ইহারা এক সঙ্গেই পতিত হয়।

পূর্বেই বলেছি যুগান্তর Militant Nationalism preach করত। কিন্তু তা' বলে কেহ যেন না মনে করেন, ইহা হাল ফ্যাসানের ফ্যাসিজম্ প্রচার করত। বাংলার এই রাজনীতিক সন্ধিক্ষণে কারও ভাবধারা সম্যকরূপে বিবর্তিত বা পরিপুষ্ট হয় নাই। ভবিষ্যতের Programme যে কি হবে সেই চিন্তা কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সমালোচনাতেই সকলে ব্যস্ত থাকত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কি, ভারতে কি প্রকারে কার্যকরী হতেছে সেই বিষয়ে কারও কোন অনুসন্ধান ছিল না। সুন্দরবাবু Gladstone ঢঙ-এর বক্তৃতায় দেশকে সম্মোহিত করে রাখত। বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন তরুণদের চিন্তার খোরাক যোগাত বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দ মঠ' আর যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডি। এইস্থলে কেবল ৺অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সোস্যালিজম্ মতবাদ পান্থবাদস্বরূপ ছিল। তাঁর কাছে কেহ গেলে তিনি Socialism-এর ব্যাখ্যা করতেন। কোথাও কোন Strike হলে তাঁকে লোকে নিয়ে যেত এবং তার পরিচালনার জন্য তিনি নিজেকে নিযোজিত করতেন। এইক্ষণে কথা, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুগান্তরের স্থান কোথায় ছিল। পূর্বে উক্ত হয়েছে যে আমরা ৺সখারাম গনেশ দেউস্করের পাঠ-চক্রের ছাত্র ছিলাম। কাজেই Socialism-এর কথা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। 'যুগান্তরের' দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি Capitalist-বাদের বিপক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। কিন্তু তাহার ভাবও অতি প্রাচীন ছিল। চৈতন্য লাইব্রেরী হতে আনীত Henry George-এর "Progress and Property" নামক পুস্তক পাঠ করে তার চিন্তাধারা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হয়, এই প্রবন্ধে ইহাই লেখা হয় যে Capitalist পদ্ধতি মানবকে গোলাম করে খর্ব করে। আর এই Capitalist-বাদই ভারতের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করেছে এবং Handy craft নামক Home industry-র কর্মপদ্ধতি মানবকে Capitalist-বাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে।

আজ এই প্রবন্ধের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু তখন আর কোন Socialism-এর পুস্তক হাতের কাছে পাওয়া যায় নাই। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে পত্রিকার Tone এক সুরে বাঁধা রাখবার জন্য কোন Capitalist-এর বিজ্ঞাপন বা কোন Capitalist প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কোন লেখা প্রকাশিত হ'ত না। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন এই মতটা দলের মত ছিল। ৺বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় যখন তাঁর বরিশালের অভিভাষণে বলেন যে, গান্ধীজি যাহা বলছেন তার সবই বাংলায় এককালে বলা হয়েছে, তা অতি সত্য।

১৯০৭ সালে E I Ry. strike হয়। strikers-দের প্রথম অধিবেশন হয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর ছাদের উপর। এই মিটিং-এ সভাপতিত্ব ক'রেন ব্যারিষ্টার অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। আমি Reporter রূপে তথায় উপস্থিত থেকে সভার কার্যের বিবরণী গ্রহণ করে সন্ধ্যা কাগজে প্রকাশিত করি। পরে strike যখন জোর চলছিল তখন হঠাৎ শুনলাম, কেশব নামক আমাদের দলের একটি যুবক একজন Strike-breaker কেরাণী বাবুর চক্ষে Sulpheuric Acid ঢেলে দিয়েছেন বলে পুলিশদ্বারা ধৃত হন। তার আড়াই বছরের জেল হয়। যদি যুগান্তরের উপর ক্রমাগত রাজ-রোষ পতিত না হতো এবং আলিপুরের বোমার মোকর্দমা (Bomb Case) অনুষ্ঠিত না হত তাহলে এই দলের কর্মীরা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে যোগদান করতেন।

ইহার বহু পূর্ব হতেই মফঃস্বলে কোন কোন স্থলের কর্মীরা কৃষকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সফলতা লাভ হয়নি।

এই কথা সত্য যে স্বদেশী যুগে ও তৎপরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা গণ-শ্রেণী সমূহকে নিজেদের সঙ্গে নীতে পারেন নাই। চাষীদের কাছে বললে তারা জমিদারের অত্যাচারের কথাই বলত। তাদের চক্ষের সম্মুখে আছে জমিদার আর সরকার বাহাদুর, তাদের বাক্য মনের অগোচর। তৎপর বাংলার চাষী প্রধানতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তারা হিন্দু জমিদার ও ও মহাজনদের দ্বারা উৎপীড়িত। এক সময়ে মধ্যবাংলায় নীলকর সাহেবের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একতা বদ্ধ হয়ে, সেই প্রথা তিরোধান করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশী-যুগে সেই রকম একত্বভাব সম্ভবপর হয় নাই। কারণ উভয়ে এক শত্রু দেখতে পায় নাই। তাদের কাছে 'আনন্দমঠ' বা ম্যাট্‌সীনি'র গল্প এবং স্বদেশী কাপড় ও নুন-চিনি ব্যবহার করার বক্তৃতা বড় হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তবে, দেশে একদল স্বদেশীওয়ালা লোক আছেন, তাঁরা দেশের বিষয় ভাবেন একথা সকলেই হৃদঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার ভাব মুসলমান সমাজেই বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইজন্য স্বদেশীভাব শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যেই বিস্তার লাভ করে। আর অর্থনীতিক কারণ বশতঃ হিন্দু গণ-শ্রেণী সমূহের মধ্যে স্বদেশী কাপড় ইত্যাদির ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত হতে পারে নাই। তখনকার কংগ্রেসী Resolution যে স্বদেশী দ্রব্যসমূহ "Even at a sacrifice"(ত্যাগস্বীকার করেও) ব্যবহার করতে হবে তাহাও সাধারণে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। কেবল জনকতেক স্বদেশ প্রেমিক লোকের কাছেই স্বদেশী প্রচার সফলতা লাভ করেছিল।

এই স্বদেশী প্রচারের মূলে কি আদর্শ ছিল ? বাংলার কংগ্রেসী নেতাদের নিকট, ইহা প্রথমে 'বয়কট' নামক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, তারা ভেবেছিলেন এই গোটা কতক দ্রব্য যাহা সর্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং যাহা ইংলণ্ড হতে আসে তাহার ব্যবহার ছেড়ে দিলে ইংরেজ-রাজ যারা আসলে হচ্ছে বণিক-রাজ, তারা নতশির হয়ে বাংলার সহিত আপোষ করবে এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হবে। এই বয়কট অস্ত্র নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন পায় নাই। এলাহাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশন কালে এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হয়, বয়কটকে নিখিল ভারতীয় করা সম্ভবপর হয় নাই। কেবল আমেরিকা হতে সদ্য-প্রত্যাগত ৺লাজপত রায় বাংলার কার্যকে সমর্থন করে গরম গরম বক্তৃতা দেয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁর এই বক্তৃতা বাংলার কোন কাগজে বের হয় নাই, বাংলার এই Storm and stressed period-এর দুঃখের কালে নিঃ ভাঃ বাংলাকে সাহায্য দান করে নাই। ইহা অনেকের মনে শেল সম বিদ্ধ হয়েছিল। আবার অন্যদিকে বোম্বাইয়ের স্বদেশী কাপড়ের মিলওয়ালারা বাংলার বয়কটের সুবিধা গ্রহণ করে বিশেষ লাভবান হতে লাগলেন। কিন্তু দর কমাবার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। এইস্থলে বক্তব্য যে তৎকালে ম্যাঞ্চেষ্টারের একখানা ধুতি-কাপড়ের মূল্য ১৲ ছিল। কাজেই স্বদেশী কাপড় সর্বসাধারণের পরিধান করা অসম্ভব ছিল। এই জন্যই ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় সম্পূর্ণ ভাবে বয়কট করা অসম্ভব হয়। কাজেই বাংলার নেতাদের উপরোক্ত মন্তব্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। বয়কট আন্দোলনকে বেশীরভাগ কংগ্রেসী নেতারা ভয়ের চক্ষে দেখত বলে সর্বপ্রকারের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় নেতাদের মন্তব্য ছিল এই—সব জিনিসই স্বদেশে প্রস্তুত করে তার ব্যবহার কর। এমন কি এইজন্য স্বদেশী দিয়াশালাই, কলমের স্বদেশী নিব, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হতে থাকে, কিন্তু এইসব দ্রব্য ভালভাবে প্রস্তুত না হওয়ায় সাধারণের ব্যবহারে আসে নাই। এই স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জাপান প্রভৃতি বিদেশে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প-শিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে এই প্রচেষ্টা আরো বল প্রাপ্ত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পাদি বিষয়ে বাংলাকে স্বাধীন করা, এইজন্য দলে দলে স্বদেশ প্রেমিক যুবক বিদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে বাঙ্গালী মূলধনীদের কোন সাহায্য না পাওয়ায় নিজেদের শিক্ষাকে কার্যকরী করতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে ২।১ জনের চেষ্টায় নিজেদের ব্যবসায়ে যৎকিঞ্চিৎ সফল কাম হয়েছেন। কাজেই বাংলাকে শিল্প-বাণিজ্যে স্বরাজ করানোর স্বপ্ন এখনও সফল কাম হয় নাই।

এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রণালী নিয়ে বাক-বিতণ্ডা হতো। কেহ কেহ বলতেন যদি ইংরেজের দ্রব্যকেই বয়কট করাই উপস্থিত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অন্য দেশ হতে সেই মাল আমদানি করা প্রয়োজন, যেমন তৎকালে চীনারা আমেরিকার দ্রব্য বয়কট করে ইংরেজী দ্রব্য কিনতে ছিল। ঠিক এই সময় অরবিন্দ বাবু স্বদেশী আন্দোলনকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দেবার জন্য যুগান্তরে একটি সুদীর্ঘ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি জার্মাণ Nationalist

Frederick list-এর অর্থনীতির ব্যাখ্যা করে সেই পদ্ধতিকে এই দেশে গ্রহণ করবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করেন। তাঁর ইহাতে শেষ কথা ছিল, এই পদ্ধতিকে দেশে কার্যকরী করে "সোনার শিকল কাটো"! এক্ষণে কথা হচ্ছে "Frederick list" কে? ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যখন জার্মাণ জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে একদিকে ফ্রান্স অন্যদিকে রুশের শিকারের বস্তু হয়েছিল এবং অভ্যন্তরে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার কামড়া-কামড়ি দ্বারা জর্জ্জরিত হচ্ছিল, সেই সময়ে Frederick list' নামে একজন জার্মাণ অর্থনীতি বিশারদ জার্মাণ জাতীর সংগঠন উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তা বাদের আমদানি করেন। তার মত এই ছিল যে, জার্মানদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে বিদেশের সাথে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে জার্মনীর মধ্যে স্বীয় দেশজাত মাল-মসলা নিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করতে হবে।

জার্মেনীর এই স্বদেশী আন্দোলনের "Protection" স্বরূপ তিনি স্বদেশ প্রেমের বেড়া বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দবাবুর প্রবন্ধের ইহাই ছিল প্রতিপাদ্য। স্বদেশীওয়ালারা সাধারণ ভাবে যাহা বলছিলেন অরবিন্দবাবু তাহাই দার্শনিক ভাবে বলেছেন, কিন্তু List-এর নাম যেমন কোন অর্থনীতি বিজ্ঞানের পুস্তকে পাওয়া যায় না এবং জার্মানীও যেমন তার শিল্প-বানিজ্যকে অন্য পদ্ধতি দ্বারা গড়ে বড় করে তোলে, তদ্রূপ বাংলা তথা ভারতও এরূপ প্রকারের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নিজের শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলছে না, এই কথা এইখানে লিখিত হল, যেহেতু আমাদের জাতীয়তা-বাদ কতকটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে গড়ে তোলবার চেষ্টা তখন থেকেই হতেছিল।

এক্ষণে কথা এই, স্বাধীনতা কামীদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনে কি আদর্শ ছিল। আমি অন্যত্র বলেছি আমরা নেতাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা পাই নাই, স্বামী রামদাসের ধর্ম-রাষ্ট্র সংগঠনের কথা মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতুম। এই প্রদেশে কাহারও কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। তবে একজন যুবক নেতা বলেছিলেন যে, আমেরিকার ফেডারেল রিপাব্লিক ও জার্মেনীর ফেডারেল মনার্কির মাঝামাঝি একটা রাষ্ট্র ভবিষ্যতে স্বাধীন ভাবতে গড়ে উঠবে। কংগ্রেসী নেতাদের এই বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল বলে মনে হয় না। স্বদেশী যুগে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজি মহাশয় যখন তাঁর অভিভাষণে 'স্বরাজ আমাদের কাম্য' (Swaraj is our brith right) বললেন, তখন আমরা তাঁর স্বরাজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হই নাই। মহারাষ্ট্রীয় সংবাদপত্রে আমরা 'স্বরাজ' ও 'স্বাতন্ত্র্য' এই দুটি কথা ব্যবহৃত হতে দেখতাম; নৌরজির ব্যাখ্যা তাহা হতে স্বতন্ত্র হয়। যুগান্তরে আমরা ইহার প্রতিবাদ করে বলেছিলুম, 'ভারতের অতি বৃদ্ধ নেতার স্বরাজের কি এই ব্যাখ্যা'। এক কথায় ইহাই বললে যথেষ্ট হবে যে তখনকার রাজনীতিক আদর্শ বড় ধোঁয়াটে ছিল। আমরা সকলেই অন্ধকারে হাতড়াতাম। তবে ইহা স্বীকার করতে হবে যে, আজকালকার মতন রাজনীতিকে Misticism-এর স্তরে আনা হয়নি। তখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ও অতিরিন্দ্রিয়তার ধোঁয়া গ্যাস ছেড়ে আদর্শকে এত ধোঁয়াটে করা হয় নাই।

এখন বিচার্য যে স্বাধীনতা বা স্বরাজের আদর্শের মাপকাঠি কি ছিল? পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, কংগ্রেস প্রথমে ইংরাজের নিকট কতকগুলি Priviledges ভিক্ষা করত, পরে স্বদেশীযুগে যখন কংগ্রেসের মধ্যে Extremist Party বা গরম-দল (এই কথাটি ৺বিপিন বাবুর সৃষ্টি) উদ্ভূত হল, তখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বেরোমিটারে উত্তাপের গতি আরো উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন Self Govt বা Autonomy আমাদের জাতীয় কাম্য—ইহাই প্রকাশ্যে বলা হত।

১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় 'নরম দল' (Moderate) ও 'গরম দলের' (Leftist) বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন গরম-দল নিজেদের আদর্শকে জাহির করবার জন্য এক স্বতন্ত্র Conference আহ্বান করেন, তখন গরম-দল যেমন Congress-এর দ্বারা স্থাপিত Exhibition boycot করলেন (কারণ ইহাতে বিলাতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছিল) তেমন তাঁরা তাদের স্বতন্ত্র মত জাহির করবার জন্য একটি Conference আহ্বান করেন। ইহাতে তিলক প্রমুখ নিখিল ভারতীয় গরম-দলের নেতারা যোগদান করেন। এই Conference-এ Autonomy আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে গৃহীত হয়। এই বিষয়ে তখনকার নেতাদের কি মনোস্তত্ব ছিল তাহা নিম্নের বিবৃত গল্প দ্বারা বোঝা যাবে. Conference-এর অধিবেশনের আগে একদিন সন্ধ্যা বেলায় ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, শ্রীহট্টের ৺কামিনী কুমার চন্দ প্রভৃতি নেতারা বসে Resolution-এর খসড়া লিখছিলেন। 'Autonomy আমাদের কাম্য' এই Resolutionটি তাঁদের খসড়ায় লেখেন। আমি আপত্তি জানিয়ে বিপিন বাবুকে বললাম যে, Autonomy ইহা একটি অতি নরম কথা। ইহার পরিবর্তে Independence আমাদের কাম্য, এই কথাটা লিখিত হউকনা কেন। তাহাতে বিপিনবাবু, চন্দ মহাশয়কে ডেকে বললেন: "কামিনী বাবু, ছেলেরা এই কথায় আপত্তি করছে," তার পরেই বললেন: "বাপরে এই কথা বড় গরম কথা। ইহার বদলে আবার Indepenedene কথা," কামিনীবাবুও বিপিনবাবুর সহিত একমত হলেন। ইহার বহু বৎসর পরে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 'মোকাম্মেল আজাদি বা পূর্ণ স্বাধীনতা বা Complete Independence ভারতের কাম্য'—এই আদর্শে Resolution গৃহীত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, Congress-এর রাজনীতির ব্যারোমিটার কত ধীরে ধীরে উত্থিত হয়। জাতীয় নেতাদের যখন এই অবস্থা, তখন বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সভ্যদের নিকট "স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য" এই বাণী কানে কানে প্রচারিত হতে থাকে। অবশ্য স্বাধীনতার স্বরূপ কি তাহা কারুর ধারণার মধ্যে ছিল না।

কংগ্রেস যখন বৎসরে—একবার তিনদিন ধরে বসে গলাবাজি করে বলতে শুরু করল যে, স্বরাজ বা Autonomy বা Self Government ভারতের রাজনীতিক আদর্শ, এবং তার পরেই আবার এক বৎসরের জন্য কুম্ভকর্ণের নিদ্রা প্রাপ্ত হতে লাগল, তখন জনসাধারণকে রাজনীতিক চেতনা প্রাপ্ত করবার ভার বৈপ্লবিকদের হস্তেই স্বভাবতঃই ন্যস্ত হয়। ইহারই ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাষায় চরমপন্থীয় সম্বাদপত্র বাহির হতে লাগল, তরুণদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিতও হয়, বঙ্গের কতকগুলি চরমপন্থীয় কাগজ রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়; বিদেশে ভারতীয়

ছাত্রেরাও কিছু কিছু চরমপন্থীয় আন্দোলন করেন। লণ্ডনে ৺শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতীয় 'হোমরুল পার্টি' সংস্থাপিত করেন, তিনি ইহার সভাপতি হন, আলমামুন সুরাবর্দি মহাশয় ইহার সহকারী সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত মদনজীকে এই সমিতির ভারতীয় এজেণ্টরূপে নিযুক্ত করা হয় (মদনজী, ইনি পরে বর্মা কংগ্রেস কমিটী সংগঠন করেন) কিন্তু ভারতে তৎকালে এই হোমরুল সোসাইটির শাখা স্থাপিত হতে শুনি নাই। আবার রাউলপিণ্ডিতে লালা পিণ্ডিদাস প্রভৃতি কতকগুলি যুবক রাজরোষে দণ্ডিত হন, তাঁদের উপর অভিযোগ ছিল যে আমেরিকা হতে প্রেরিত উর্দু ভাষায় লিখিত রাজদ্রোহ-মূলক ইস্তাহার বিলি করেন। এই জন্য তারা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় আবার লালা লাজপত রায়, সর্দার অজিৎ সিং (ভগৎসিংহের কাকা) এবং অপর একজন রেঙ্গুনে Deported হন। আবার এই যুগের পরে পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক নেতা সোফি অম্বাপ্রসাদ, মুক্তিপ্রাপ্ত অজিৎ সিং, হৃষীকেশ লাট্টা আরও জনকতক যুবক বাধ্য হয়ে পারস্যে পলায়ন করেন। এই ঝঞ্ঝাবাতের সময় 'যুগান্তর' ও তৎপর 'সন্ধ্যার' উপর রাজরোষ পতিত হতে থাকে। এই সময় যুগান্তরই একমাত্র কাগজ যটা "স্বাধীনতা আমাদের কাম্য" বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করত।

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হতেছে, এই স্বরাজ বা স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধীনতা আনয়নের পন্থা ছিল কী? Congress-এর Moderate নেতাদের বক্তৃতা-মঞ্চে বড় গলায় লেক্‌চার করা এবং রাজদরবারে Memorandum পেশ করা ছিল নির্দিষ্ট পন্থা আর গরম দলের নেতাদের উপরোক্ত শেষটি বাদ দিয়ে তথৈবচ অর্থাৎ তাদের লেকচার করতে শোনা যেত। তারা কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠ Moderate-দের বিপক্ষে নিজেদের মতকে জনসমাজে ব্যক্ত করতে ব্যস্ত ছিল। আবার এই গরম-দলের কেহ কেহ অতি অদ্ভুত মতও পোষণ করতেন। উপরে তার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হয়েছে। এই গরম দলও যে এক ভাবাপন্ন ছিল না তাহা নিম্নের দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হবে। পশ্চিম বঙ্গের মফঃস্বলের কোন গরম দলের নেতার সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা কল্পে যে Constructive programme-এর প্রয়োজন তাহা বুঝাবার সময় আমাকে বললেন যে, "ব্রাহ্মণের ছেলেরা কেন ব্যায়াম করবে? কায়স্থের ছেলেরাই তা করবে। হিন্দুরা কেন বিলাত যাবে? মুসলমানেরা বিলাত যাবে। ইংরাজের রেল-রোড বয়কট কর (Frederick List-এর মতের উৎকট্ পরিণাম) বর্ণাশ্রম ধর্মই একমাত্র ভারতকে স্বাধীন করবে।" এই প্রকারের নানা উদ্ভট মত কোন কোন গরমপন্থীয় নেতার মস্তিষ্কে নিহিত ছিল, বলা বাহুল্য এই ভদ্রলোকটি এখনও নিজের মতে সুদৃঢ় আছেন, এবং এখন 'ব্রাহ্মণ সভা' করছেন। এই সব দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আগেকার চরমপন্থী ও স্বাধীনতাকামী কর্মীরা কেন আজ 'ব্রাহ্মণ সভা', 'হিন্দুসভা' 'বর্ণাশ্রম', 'স্বরাজ সঙ্ঘ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও অনেকস্থলে জাতীয়তাবিরোধী সঙ্ঘের সহিত সনাক্ত হয়েছেন। এক্ষণে বাকি রইলেন কেবল গুপ্ত সমিতির বৈপ্লবিক কর্মীরা। অনেক স্থলে তারাই গরম দল সৃষ্টি করেন এবং কোন কোন স্থলে কোন কোন জনপ্রিয় চরমপন্থীয় নেতার পশ্চাতে থেকে তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠন কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা গরম দলকে আবরণ

স্বরূপ ব্যবহার করে কংগ্রেসে একটী বামপন্থীদল গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। বোম্বাইয়েব ৺তিলক ও তাঁর সহকর্মীদেব নিযে এবং বাংলায অরবিন্দবাবুকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীবা এই সংগঠন কম করেছিলেন। অবশ্য বা লায এই সঙ্গে বিপিনবাবু, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয ছিলেন। দাশ মহাশয এই সময বৈপ্লবিক সমিতি থেকে সরে যান এবং বিপিনবাবুব আজ্ঞাধীন হযে Bloodless revolution-এর কথা বলতে থাকেন। কংগ্রেসেব এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত হয। এই সময থেকে গবম-দল কংগ্রেস হতে বিতাড়িত হয, পরে ১৯১৬ খৃঃ Lucknow-তে আবাব কংগ্রেসে সর্বদল সম্মিলিত হয।

এইস্থলে একটী কথা প্রণিধানেব বস্তু, তথাকথিত গরমদল কেন জমাট অবস্থা প্রাপ্ত হয নাই? কেন ইহাব নেতাবা গান্ধী আন্দোলনেব সময, সেই আন্দোলনেব তেজে বিক্ষিপ্ত হযে নানা প্রকাব সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয নেন? আমার অনুমান হয যে ফিবোজ শা মেটা, সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি Moderate-দেব মতের সহিত অনেক গোঁড়া হিন্দুর খাপ খেত না। মডাবেটগণ বাজনীতি ক্ষেত্রে নবম পন্থীয হলেও জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইংবেজী বুর্জোযা-শ্রেণীর প্রতিচ্ছবি। কংগ্রেসকে, গোঁড়াবা বিদেশ হতে আমদানি বস্তু ভারতীয সনাতন ভাবধাবাব সহিত চলতে পারে না—এই বলে উপহাস করতেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা 'কংগ্রেসকে' কংগোবস বলে উপহাস কবত। কাজেই যখন বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হল তখন নানা প্রকাবে সনাতনবাদীয লোকেরা তাদের মধ্যে আশ্রয লাভ করে। ইহাবাই ইহাব উপর ভেসে গরম-দলে প্রকট হন। উপাধ্যায ব্রহ্মবান্ধব বলতেন, 'সন্ধ্যা' পত্রিকাও তাই লিখতেন,—ইংবেজী সর্বপ্রকাব রুচিব উপব ঘৃণা জন্মাইযা দাও। আমাব বোধহয় এই সব লোকদেব বাজনীতিব চবমপন্থা নূতন ভাবত সংগঠনেব দিকে গন্তব্য ছিল না বব মহাভারতেব ধর্মবাজ্য সংস্থাপন বা বার্ণাশ্রম সম্বলিত বাষ্ট্র স্থাপনেব দিকে অকৃষ্ট হন। ভাবতীয বুর্জোযাদের নবমপন্থীয আদর্শেব বিপক্ষে ইহারা প্রাচীন সনাতনবাদীয আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কবতে চাইতেন বলে ইহারা চরমপন্থীয হন। ইহাদেব চরম পন্থা একটী আপেক্ষিক বস্তু মাত্র। কাজেই যখন ১৯২০ সালে হিন্দু-মুসলমানে মিলে একটী প্রবল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করলেন তখন ইহারা বিক্ষিপ্ত হযে পড়েন। কিন্তু এই প্রকাব লোকেব সংখ্যা কমই ছিল বলে অনুমান হয, আশ্চর্যের কথা এই যে ভাবতের বাজনীতিক পট যেমন দ্রুতপদে পরিবর্তিত হতেছে, তেমনি আদর্শ অধিকতর পরিষ্কাব না হয়ে আজো ঘোলাটে হযে আছে। তাই ১৯২০ সালে যাঁবা চরমপন্থীয বলে গণ্য হলেন, তাঁদের নেতারা 'রাম-বাজত্ব' সংস্থাপনেব সুখ-স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বুর্জোযা-শ্রেণীর এক অংশ আজো ইহাঁদের হাততালি দিতেছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ভঙ্গ

রাজনৈতিক বন্দীগণ ২৯ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করেছেন। উৎকণ্ঠিত দেশবাসী এই অমূল্য প্রাণগুলির জন্য রুদ্ধশ্বাসে দিন গুণছিল। দীর্ঘদিন অনশনের ফলে কতজনের স্বাস্থ্য যে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তা আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। তবু প্রাণহানি যে ঘটেনি এটুকুই সান্ত্বনা এবং প্রবোধ।

স্যার নাজিমুদ্দীন প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সুরেন ঘোষ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সকলকেই এই কথাটাই ক্রমাগত জানিয়েছেন যে, অনশনের ১৫ দিনের মধ্যে বন্দী-মুক্তি কমিটির কাজ শেষ করা হবে, এবং তারপর দু'মাসের মধ্যে অবশিষ্ট বন্দীদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত শেষ করবেন। কিন্তু তিনি এমন কথা কারো কাছেই বলেননি যে দু'মাসের মধ্যে সকল বন্দীকেই মুক্তি দেবেন। ২৯ দিন অনশনের পর সুভাষবাবু বন্দীদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অনশন স্থগিত রাখলে দু'মাসের মধ্যে যদি গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বন্দীদের মুক্তি না দেন তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস তাঁদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করবেন। এই প্রতিশ্রুতির বলেই তিনি তাঁদের অনশন স্থগিত রাখতে রাজী করাতে সমর্থ হলেন। অনশনের প্রথম দিকেই তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন ভঙ্গ করাতে পারতেন। তাহ'লে আর বন্দীগণের এই অনর্থক দীর্ঘদিন ধরে অনশনের ক্লেশ ভোগ করতে হ'ত না, এবং সুদীর্ঘকাল অনশনের ফলে তাঁদের চিরতরে স্বাস্থ্যহানি ঘটবার বিপত্তির মধ্যেও যেতে হত না।

যাইহোক্, ২৯ দিন অনশনের পরে সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতির ফলে বন্দীগণ দু'মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখলেন। আমরা আশাকরি গভর্ণমেণ্ট এই দু'মাসের মধ্যে সকল বন্দীকে মুক্তি দিবেন। আশাকরি গান্ধী ও কংগ্রেস এঁদের মুক্তির জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন।

অনশন সম্পর্কে গান্ধীজী

গান্ধীজীকে যখন রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনের সময় দেশব্যাপী আন্দোলন চালাবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলা হ'ল, তিনি উত্তর দিলেন: বন্দীদের অনশন অসঙ্গত এবং তাঁদের অনশন ভঙ্গ করতে বলা হোক। গান্ধীজীর এই উক্তি অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশোভন। গান্ধীজী নিজে কি চরমপন্থা হিসাবে অনশন অবলম্বন করেন নাই, এবং এই অনশনই কি তাঁরও মুক্তি আনে নাই ? বন্দী অবস্থায় তিনি 'হরিজনে' প্রবন্ধ লিখবার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন জেলের মধ্যে, মুক্ত হবার পূর্ব্বে জেল কর্তৃপক্ষ কখনই কাগজ চালাবার বা কাগজে প্রবন্ধ লিখবার স্বাধীনতা বন্দীকে দিতে পারেন না। অতএব

গান্ধীজী অনশন করলেন 'হরিজনে' প্রবন্ধ লিখবার অধিকারের জন্য, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার লাভের জন্য, সেই অনশন আনল তাঁর মুক্তি।

ঠিক এই যুক্তিই কি এই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? তাঁরা চান দেশ-সেবার অধিকার—স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেবার অধিকার, জেল কর্তৃপক্ষ তা দিতে পারেন না। তাই বন্দী-জীবনের নিরুপায় অবস্থায় অন্য কোনো পন্থা না থাকায় এই চরমপন্থা গান্ধীজীর ন্যায় তাঁদেরও গ্রহণ করতে হয়েছে। আজ যদি গান্ধীজী মনে করেন বন্দীদের অনশন অন্যায় এবং অসঙ্গত তবে তাঁর নিজের পূর্ব্বকৃত অনশনও কি অসঙ্গত হয় নাই? গান্ধীজীর পূর্ব্ব জীবনের অনেক কাজই বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন—অনশন সম্পর্কেও কি তিনি তবে "নতুন আলোক" পেয়েছেন?

অনশন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

বোম্বাইয়ের গত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বন্দীদের অনশন সম্পর্কে গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী হুবহু তাঁর মতই মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় অভিমত এই যে মুক্তি অর্জ্জনের জন্য রাজনৈতিক বা যে কোনো বন্দীই হোন অনশন করা কারো কর্ত্তব্য হবে না। ওয়ার্কিং কমিটি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে অনশন অবলম্বন দ্বারা যদি বন্দীগণ মুক্তি অর্জ্জন করতে পারে তা'হলে সুশৃঙ্খল ভাবে গভর্ণমেণ্টের কাজ করা অসম্ভব হবে। তা'হলে কি আমরা মনে করব যে গভর্ণমেণ্টের কাজ যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই বন্দীদের কর্ত্তব্য? সুশৃঙ্খল ভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনার সুযোগ দেবার জন্যই কি বন্দীগণ জেলে গেছেন? মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবার সময় গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেসের নেতারা স্পষ্ট করে নিঃসংশয়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করছেন বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে কায়েম করতে নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নয়—গ্রহণ করছেন বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্যের যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেছে এমন কথা আজও কংগ্রেসের কোনো প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়নি। তাই সুশৃঙ্খলভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনার প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির এই একান্ত আগ্রহ দেখে দেশবাসী আজ বিস্ময়ে অভিভূত। রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ বন্দীগণের নতুন শাসন-সংস্কারের আমলে মুক্তি পাওয়াই ছিল সঙ্গত ও নীতিসম্মত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আজও তাঁদের মুক্তি দিলেন না। এখন তাঁদেরই কাছ থেকে ওয়ার্কিং কমিটি আশা করেন এবং দাবী করেন সুশৃঙ্খলভাবে এই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করবার সহযোগিতা। এই সহযোগিতা করবার জন্যই কি তাঁরা বন্দী-জীবনের কঠোর সাধনা গ্রহণ করেছিলেন? এর জন্যই কি কংগ্রেস তিন তিনবার আইন অমান্য আন্দোলন করেছিল? কংগ্রেস জাতির স্বাধীনতা কামী তাই তার পক্ষে আজ এই যুক্তি দেখানো নিতান্তই অশোভন। তার উপর কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে নির্ম্মম মনোবৃত্তি রয়েছে, তাও নিতান্ত পরিতাপের। জেলের আবেষ্টনে নিঃসহায় লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার পীড়া, মানুষকে এমনি ক্ষিপ্ত করে তোলে যে, সে দিনের পর দিন উপবাসকে শ্রেয় ব'লে মনে করে—অনশনের পীড়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দিনের উপবাস

--কেহ হেলায় বরণ ক'রে নেয় না। চায় স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, যে শাসনতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টাকেও তো তারা অস্বীকার করতে পারেন না। তাই তাদের কাছ থেকে এই ভুয়া শাসন-সংস্কারের, গণস্বার্থ বিরোধী গভর্ণমেণ্টের শাসন-কার্য্য পরিচালনায় সহযোগিতা দাবী করা উপহাসের মতো শোনায়।

বোম্বাইয়ে মদ্যবর্জ্জন

এই সঙ্গে মনে পড়ে বোম্বাইয়ে সুরা বর্জ্জন কাহিনী। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হবার সময় কংগ্রেস এই কথাই দেশবাসীকে জানিয়েছিল যে, ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে শাসনতন্ত্রকে অচল করে তুলবে। কিন্তু মন্ত্রীত্বের মস্‌নদে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শাসনতন্ত্রকে কায়েম করতে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই আজ কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ উদ্যত। গভর্ণমেণ্টকে অচল করে' তুলবার যতগুলি সুযোগ তারা পেয়েছিলেন তাঁর একটাও গ্রহণ তো করেনই নাই বরং কিরূপে গভর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খল ভাবে চলবে তারই হিতোপদেশ বর্ষণে তাঁরা পঞ্চমুখ। অন্যদিকে হিতোপদেশের অমৃতবাণী অনুসারে তাঁরা দেখিয়ে চলেছেন হিংসা করা মহাপাপ, পরোপকার মহৎ ধর্ম্ম, সুরাপায়ীকে অধঃপতন হ'তে উদ্ধার করার অর্থ পরাধীন জাতিকে ত্রাণ করা। এমনি আরও বহু কর্ণশীতল করা মধুর বচন তাঁরা শোনাচ্ছেন। শুধু বচনে নয় কর্ম্মেও তার প্রকাশের অভাব নেই। এমন কি এতবড় একটা বিশ্বহিতকর কর্ম্মে যদি গুলি চালনাও প্রয়োজন হয়, সেটুকুও করবার মতো অহিংস নৈতিক সাহস তাদের আছে। তাই আজ সমস্ত শক্তি দিয়ে সুরু হয়েছে সুরাবর্জ্জনের শুভকর্ম্ম—সাঙ্গ হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাধনা—বহুদূরে সরে গেছে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন, মুক্তির দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামের সাধনা বিলীন হয়ে আছে কল্পলোকে। আজ তাঁরা রাজনৈতিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে আনতে চান সমাজ-সংস্কারের কিঞ্চিৎ কল্যাণ। কিন্তু এই শুভ সংস্কারের মোহে দেশবাসীকে বেশীদিন ভোলানো যাবে না, রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

কংগ্রেসী প্রদেশে পুলিশের জুলুম

কংগ্রেসী মন্ত্রী-শাসিত প্রদেশেও পুলিশের অত্যাচার কম হয় না। কুমিল্লার Stevens হত্যা সম্পর্কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতা শ্রীমতী শান্তি ঘোষ কিছুদিন পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি পুরীতে গিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। সংবাদ গেল ৩০শে জুলাই Viceroy পুরী যাবেন, অতএব শ্রীমতী শান্তি ঘোষকে ২৯শে জুলাইর মধ্যে পুরী পরিত্যাগ করতে, সরকারী আদেশ দেওয়া হ'ল পুলিশের মারফত এবং শাসানো হ'ল যে আদেশ অমান্য করলে তাঁকে আটক রাখা হবে। মুক্ত নাগরিককে আটকের হুমকী দেখানো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। এই প্রদেশে নাকি কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব। লোকের মনে ধারণা ক'রে দেওয়া হয়েছে "স্বরাজ মিল্ গিয়া" বর্ত্তমান কংগ্রেসী স্বরাজের এই নমুনা।

এ, আই, সি, সি'র প্রস্তাব দ্বয়

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দুটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রথমটীতে বলা হয়েছে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ গ্রহণ না করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে কেউ করতে পারবে না। দ্বিতীয়টীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের শাসনতন্ত্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব Parliamentary Sub-committee-র নির্দ্দেশানুসারে চলবে এবং মন্ত্রীত্ব বা শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কোনো সমালোচনা কংগ্রেসের লোকেরা জনগণের নিকট করতে পারবেন না।

কংগ্রেস এই দুইটী গণতন্ত্র বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করাতে এই প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস আর গণ-প্রতিষ্ঠান নয় এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ করবার প্রয়াসও কংগ্রেস চায় না। এই প্রস্তাবের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে কংগ্রেসের ভিতর যে বৈপ্লবিক শক্তি আছে তার স্ফুরণে বাধা জন্মানো। জনগণ যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে কোনোদিন বিপ্লব ঘনিয়ে তুলতে না পারে সেইজন্য বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরে বিনাশ করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু তাই নয়, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে তাকে কায়েম করবার সর্ব্ববিধ চেষ্টার ত্রুটী নেই—এর পরিণতি বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা। এই আত্মঘাতী নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা এবং বিনাশ করা কর্ত্তব্য। প্রতিকারের দুটী পথ আছে। প্রথমতঃ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এই প্রস্তাবের বিরোধী আছেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে প্রস্তাবের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে আগামী কোন অধিবেশনে প্রস্তাবদ্বয়কে বাতিল করে দিতে পারেন। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে কোনো কার্য্যকরী সমিতির সদস্যপদে অথবা কর্ম্মকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত না থেকে প্রাথমিক কংগ্রেস সভ্যগণের মধ্যে প্রচার কার্য্যের দ্বারা এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে তুলতে পারেন অথবা বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণীর ভিতর থেকে অধিক সংখ্যক কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ করে কংগ্রেসে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে এই বিপ্লববিরোধী প্রস্তাবগুলিকে নাকচ করে দিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র ও ৯ই জুলাইয়ের বিক্ষোভ প্রদর্শন

সুভাষচন্দ্র এই দুটীর একটী পথও গ্রহণ করেন নাই। তিনি অন্যায়কে রোধ করতে গিয়ে একটী ভুল পথ অবলম্বন করলেন। যখন তিনি ৯ই জুলাইকে সমগ্র ভারতব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন ধার্য্য করলেন তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ দিলেন এই বিক্ষোভ প্রদর্শন না করবার জন্য। সুভাষচন্দ্র এই সময়ে যদি তাঁর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ ক'রে শুধু চার আনার কংগ্রেস সদস্য থেকে, প্রচারকার্য্য চালাতেন তবে কংগ্রেস সভাপতির কিছু করবার বা আপত্তি করবার সুযোগ থাকতো না, এবং তার এই প্রচারকার্য্য ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা ছিল। ঠিক যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্যদল গঠনের

সময় করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি সংঘের বিধি অগ্রাহ্য করলেন। সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি থেকেও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের আদেশ অমান্য ক'রে সমগ্র ভারত ব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এইভাবে দেশবাসীর কাছে প্রদর্শিত হ'ল যে, কংগ্রেসের উচ্চতম কর্ম্মকর্ত্তার নির্দ্দেশ নিম্ন কর্ম্মকর্ত্তাগণ অনায়াসে অমান্য ক'রে চলতে পারেন। এতে জনসাধারণের চোখে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান শুধু যে ছোট প্রতিপন্ন হ'ল তাই নয়, কংগ্রেস Constitution-এর কোনোও মূল্যই রইল না। কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যে বিধি-নিয়ম কংগ্রেসের মধ্যে আমরা নিজেরা ইচ্ছে করে গঠন করেছি শৃঙ্খলার সঙ্গে কার্য্য নির্ব্বাহ করবার জন্য, সে বিধান অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রত্যেকে তা' মানতে বাধ্য। কোনো প্রতিষ্ঠানের আইন এবং শৃঙ্খলা যদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ অবজ্ঞা এবং ভঙ্গ ক'রে চলেন বা আপন খুশী অনুসারে তার interpretation বা ব্যাখ্যা দেন তবে সে প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে বাধ্য।

এখানে প্রশ্ন এই যে কংগ্রেসকে ভেঙ্গে ফেলতে আমরা চাই কিনা। যে প্রতিষ্ঠানকে বহু বৎসর ধ'রে তিল তিল ক'রে বুকের রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষ গ'ড়ে তুলেছে, সমগ্র ভারতে আপামর জনসাধারণ, যে প্রতিষ্ঠানকে আপন মনে ক'রে স্বাধীন সংগ্রামের প্রতীক মনে ক'রে সাড়া দিয়েছে, প্রাণে শক্তি পেয়েছে—যে প্রতিষ্ঠান ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের বীজ বহন ক'রে চলেছে, যে প্রতিষ্ঠান ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব'লে সমগ্র বিশ্বে পরিগণিত হয়েছে, যে প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশা পোষণ করি, সে প্রতিষ্ঠানকে আমরা ভেঙ্গে ফেলতে চাই না, ধ্বংস করতে চাই না। কংগ্রেস বিভ্রান্ত হ'লে তাকে আমরা সংশোধন করব, বদলে দেব,—নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব সরিয়ে নতুন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আনব, কিন্তু ভেঙ্গে যেতে দেব না, লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হ'তে দেব না, তার উপর দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা হারাতে দেব না। তেমন কাজ যিনিই করুন, তিনি যতবড় নেতাই হোন, তাঁকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি শাস্তি বিধান

যদিও কংগ্রেসের নিম্ন কর্ম্মকর্ত্তাগণকে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কংগ্রেস সভাপতি শাস্তি বিধান করতে পারেন, কিন্তু অধিকার আছে ব'লে তিনবছরের জন্য সুভাষচন্দ্রকে সমস্ত নির্ব্বাচিত পদ থেকে বঞ্চিত করাতে কংগ্রেসই ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। এমন কঠোর শাস্তি না দিলেই কি চলত না? শুধু সতর্ক ক'রে দিলেই কি যথেষ্ট হ'ত না? একথা সত্যি যে, বামপন্থীদিগকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা সুনজরে দেখেন না। বামপন্থী-ভীতি কংগ্রেস দপ্তরে অতি প্রবল। যে কংগ্রেসের বিধি-নিয়ম পালন করবার জন্য জনমত আপনি গ'ড়ে ওঠা উচিত, সেখানে শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হয় কেন? যেহেতু, দক্ষিণপন্থী নেতারা নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন

হয়েছেন। তাঁদের সংস্কারমূলক মনোভাবকে সুরক্ষিত করবার জন্য বিঘ্নকারী বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন বামপন্থীদিগকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হয়ে নির্বিঘ্নে মন্ত্রীত্ব বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা আপোষরফা করবার পথকে সুগম ক'রে তুলতে চান। কোথায় গেল তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল উন্মাদনা, আর কোথায় গেল তাঁদের পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে যুঝবার প্রেরণা।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলী ও অবৈধ রিকুইজিসন সভা

গত ১৭ই জুলাই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্দ্দেশ দেন যে, নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব মিটাবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটী ক'রে ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হোক্, এবং এই ট্রাইবুন্যালের উপর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ সদস্যের আস্থা থাকা চাই।

বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে সুভাষচন্দ্রের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও তিন চতুর্থাংশ ছিল না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রিকুইজিসন সভা আহ্বান করলেন পুরাতন কার্য্যকরী সমিতি ভেঙ্গে নিয়ে নতুন কার্য্যকরী সমিতি গঠন করবার জন্য। এই রিকুইজিসন সভা যে নতুন কার্য্যকরী সমিতি গঠন করল, তাতে দেখা গেল সুভাষচন্দ্রের দল তিন চতুর্থাংশ হয়েছে, এবং এই তিন চতুর্থাংশের ভোটের জোরে শুধু তাঁরই দলের লোক নিয়ে ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যাল গঠিত হ'ল।

গণতান্ত্রিক নীতিকে পদদলিত ক'রে এইভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যাল গঠন করাতে এবং রিকুইজিসন সভাটী নিয়মবিরুদ্ধ হওয়াতে কংগ্রেসের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির তরফ থেকে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে অভিযোগ পেশ করা হয়।

কতকগুলি কারণে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই রিকুইজিসন সভা এবং তদ্বারা গঠিত ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যাল অবৈধ ব'লে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। তিনি রিকুইজিসন সভা আহ্বানকারীদের নিকট হ'তে কৈফিয়ৎ দাবী করলেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দিতে নির্দ্দেশ দিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সহঃ সম্পাদক সমস্ত কাগজপত্রাদি সহ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট গেলেন। কিন্তু কাগজপত্রগুলি সন্তোষজনক ছিল না। এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও তিনি দিতে পারেন নাই।

যে কারণগুলি রিকুইজিসন সভা এবং ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যালকে অবৈধ ঘোষণা করেছে সেগুলি এই—

(১) রিকুইজিসন সভা আহ্বান করবার নিয়ম এই যে সভার নোটিশ কাগজে বের করতে হবে এবং প্রত্যেক সদস্যের নিকটও পৃথক পৃথক ক'রে দিতে হবে। যেদিন কাগজে নোটিশ বার করা হবে এবং যেদিন সভা আহ্বান করা হবে এই দুইদিন বাদ দিয়ে মাঝখানে সাতদিন সময় থাকা নিয়ম। এই নিয়ম পালন করা হয় নাই। কারণ ১৯শে জুলাই কাগজে নোটিশ বার হয়েছে এবং ২৬শে জুলাই সভা আহ্বান করা হয়েছে—মাঝেখানে ৬দিন মাত্র আছে।

(২) রিকুইজিসন সভা আহ্বান করলে, যাঁরা আহ্বান করেছেন তাঁদের সকলের নাম কাগজে বার হওয়া নিয়ম। কিন্তু তা হয় নাই,—শুধু লেখা ছিল "শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য বহু"। কাগজে নোটীশ লক্ষ্য ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে যখন কয়েকজন সদস্য বঙ্গীয় কংগ্রেস আফিসে গিয়ে রিকুইজিসন সভা আহ্বানকারী সকল সদস্যদের নামের তালিকা দেখতে চাইলেন তখনও তাঁদের দেখতে দেওয়া হ'ল না।

(৩) ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক সদস্যকে যে নোটিশ দিতে হয় তার Certificate of posting রাখবার নিয়ম। সেখানেও দেখা গেল Certificate-এ শুধু নাম আছে, ঠিকানা অনেকগুলিরই নেই। কয়েকজনের চিঠি স্থানীয় ঠিকানায় না পাঠিয়ে অন্য ঠিকানায় পাঠানো হয়, তাতে তাঁরা পান নাই বা পেতে অনেক দেরী হয়েছে।

(৪) নোটিশের নীচে সভা আহ্বানকারীদের নাম দস্তখত করা থাকে। নিয়ম এই যে, নোটিশটী প্রত্যেক পাতায় পুনরুল্লেখ করা থাকে, কিন্তু আসল কাগজপত্রে দেখা গেল যে কয়েকটা পৃষ্ঠায় নোটীশ ছিল এবং কতকগুলি পৃষ্ঠায় ছিল না।

(৫) কতকগুলি দস্তখতে নাম ছিল, কিন্তু তারিখ ছিল না। অর্থাৎ ১৭ তারিখে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ইলেক্‌সন ট্রাইবুন্যালের গঠনের নির্দ্দেশ পেয়ে ১৮ তারিখের মধ্যে মফঃস্বল থেকে লোক আসা অসম্ভব হওয়াতে নামের নীচে সদস্যদের তারিখ দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে ১৮ তারিখের মধ্যে নোটিশ দিলে তবে ১৯ তারিখে কাগজে বার হবে। কাজেই মফঃস্বল থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে সদস্যদের আসা সম্ভব হয় না ব'লে সকলের তারিখ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সকলের নাম বিনাই সভা আহ্বান করা হয়েছে।

এই সমস্ত কারণে এবং রিকুইজিসন সভা আহ্বান করার আদৌ সন্তোষজনক কোনো কারণ না দেখাতে পারায় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ওই রিকুইজিসন সভা এবং তৎকৃত ইলেক্‌সন ট্রাইবুন্যাল অবৈধ ঘোষণা করেছেন। পুরাতন কার্য্যকরী সমিতি পুনরায় কার্য্য পরিচালনা করবে। ইলেক্‌সন ট্রাইবুন্যাল ৩০শে জুলাই তারিখের মধ্যে বৈধ ভাবে গঠিত না হওয়াতে ওয়ার্কিং কমিটি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর তা' গঠন করবার ভার দিয়েছেন।

বৃটিশ নীতি ও তিয়েনৎসিন

স্পেন ও আবিসিনিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন ক'রে তাদের পতন ঘটিয়েছিল, সুদূর প্রাচ্যে তিয়েনৎসিনেও তার পুনরাবৃত্তি করে ব্রিটিশ শুধু জাপানকে তুষ্ট করেনি, নিজের লজ্জা, অপমান ও অক্ষমতা সমগ্র জগতের কাছে পরিস্ফুট করে তুলেছে, জাপান তিয়েনৎসিনে ব্রিটিশদের খাদ্যদ্রব্য সররবাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদের করায়ত্ত হতে বাধ্য করেছে। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সর্ব্বসমক্ষে নিলর্জ্জ ভাবে অপমান করেছে। এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের ও ইংরেজ নারীদিগকে উলঙ্গ ক'রে তল্লাসী ক'রে সমস্ত চীন এবং জগতবাসীকে জাপান দেখিয়েছে ব্রিটিশ মর্য্যাদার মূল্য কতটুকু।

এইভাবে জাপানী সৈন্যের করুণার আশ্রয়ে থেকেও ব্রিটিশের ধৈর্য্যচ্যুতি তো হয়ই নাই বর চেম্বারলেনের কাপুরুষোচিত উক্তি অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন, চীনে জাপানের বর্ত্তমান অবস্থায় জাপানীগণের নবলব্ধ রাজ্য রক্ষার্থ ও তথায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থ জাপানের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন স্বাভাবিক। রাজ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিঘ্ন সৃষ্টি হলে এবং কেউ শত্রুদিগকে সাহায্য করলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এমন কোনো কর্ম্ম করবেন না যা'তে জাপানীদিগের উপরোক্ত নীতি ও কর্ম্মে বাধা জন্মাতে পারে। এই সঙ্গে চীনাস্থিত ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বা ব্রিটিশের প্রজাগণকেও এরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে চীনকে জাপানী হিংস্রতার কবলে ঠেলে দিয়ে একটার পর একটা ঘটনায় সমগ্রজগতের সম্মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ টেনে আনছে, তাতে অন্যদেশগুলির পতনের সাথে সাথে তার নিজের পতনের দুর্য্যোগও চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে।

'মন্দিরা'র নিকট ১০০০৲ টাকা জমানত দাবী

শ্রাবণ মাসে হঠাৎ তলব এল 'মন্দিরা'র একটী প্রবন্ধের জন্য সরকার ১০০০৲ টাকা জমানত দাবী করেছেন। এই প্রবন্ধটী হচ্ছে 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামে একটী প্রবন্ধ। সকলেই জানেন 'সমাজ তন্ত্রবাদ' একটী বৈজ্ঞানিক বিষয়। বর্ত্তমান যুগে এরূপ প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রায় সব কাগজেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু সব কাগজেরই জমানত দাবী করা হয় না। রাজনৈতিক মতবাদ এবং শিক্ষা প্রচার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এই ধরণের কাগজগুলি সরকার সুনজরে দেখেন না এবং এদের তুলে দেওয়াই হয়ত সরকারের অভিপ্রায়। বাংলা দেশের প্রেস আইন অত্যন্ত কড়া। মন্ত্রীগণও এর অপব্যবহার বন্ধ করবার চেষ্টা করেন না।

আরো কতকগুলি কাগজ এইভাবে জমানত দাবী করায় উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে। সরকার জানেন 'মন্দিরা' ব্যবসা হিসাবে চালিত নয় যে, এতগুলি টাকা তাঁরা জমানত দিতে পারেন। তাই তাঁরা মারণ-অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে ১০০০৲ টাকা দাবী করেছেন। এই ভাবে 'চলার পথে' ও 'গণশক্তি' নামে দুইখানি পত্রিকা উঠে গিয়েছে। 'মন্দিরা'র আপন ঘরে টাকা না থাকলেও বাংলার জনসাধারণ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে 'মন্দিরা'কে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বানে এগিয়ে আসবে। তাঁদের শক্তিই 'মন্দিরা'র আপন শক্তি ও আপন প্রতিষ্ঠা।

তাঁদেরই সাহায্যে এই ১০০০৲ টাকা জমা দিয়ে পুনরায় 'মন্দিরা' প্রকাশিত হ'ল। এই টাকা জমা দিতে সাহায্য ক'রে দেশবাসী সরকারকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা জানেন। আমরা জানি সরকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রীয় শক্তি। সরকারও জানে যে এই রাষ্ট্রীয়বলের কাছে জনগণের সদিচ্ছা আজও দুর্ব্বল। তা' হোক্, তবুও যে "মন্দিরা" আজ জাতির সদিচ্ছা লাভ করে' এখনকার মত টিকে গেল, তাতে আমরা খুশী।

'মন্দিরা'র এই সঙ্কটে যাঁরা অর্থ দিয়ে, গ্রাহক হয়ে ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য ক'রে বাঁচিয়েছেন তাঁদের সকলকে 'মন্দিরা' আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

by **C. F Andrews.**

[The True India—A plea for understanding. Published by George Allen and Unwin]

Miss Mayo-র Mother India যেদিন প্রথম প্রকাশিত হয় সেদিনটাও জাতির ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন—যেমন স্মরণীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস। সমস্ত জাতি সেদিনও সেই মিথ্যা আঘাতের নির্ম্মম কশাঘাতে আর একবার নূতন করে সচেতন হয়ে উঠেছিল বিশ্বের দরবারে নিজের স্থানের সম্বন্ধে, অনুভব করে নিয়েছিল নিজের প্রতিকারহীন অপমান ভরা অসহায়ত্ব, টনটন করে উঠেছিল তার সারা অঙ্গে যেখানে-যেখানে রয়েছে সে-সব সত্যিকারের কলঙ্কের ক্ষত। সেদিন Mother India-র যোগ্য প্রত্যুত্তর নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ৺লালা লাজপত রায়, ৺ধনগোপাল মুখার্জ্জী, রঙ্গস্বামী আয়ার। সেই বলিষ্ঠ, অনাড়ম্বর সত্য-সন্ধ, তথ্যপূর্ণ বহু গুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন সংসারে সত্যের যদি কোনও মর্য্যাদা থাকত তাহ'লে Mother Indiaর রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের একদিনও দেরী হ'ত না। কিন্তু আজ একযুগ পরেও Mother India দেশে দেশে best seller-দের সঙ্গেই বিক্রী হচ্ছে। Mother Indiaর সুরেই আরও বহু নূতন বই লেখা হচ্ছে। আর মাননীয় Andrews লিখেছেন, Un-happy India ইত্যাদি বইয়ের দুর্ভাগ্যবশত: বিদেশে নাকি কোনই প্রচলন নেই। তাই ভাবি, True India মহদুদ্দেশ্যেই হয় তো লেখা হয়েছে, তার ভিতরকার contents নিয়েও আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, মহামতি Andrews-কে আমরা আমাদেরই একজন মনে করি, ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসেন, গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথ এঁরা দু'জন Andrewsএর কাছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতীক—আর তাঁদের মধ্যে দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করতে চেয়েছেন, তাই সেই অন্তর্দৃষ্টিও তাঁর সবটুকু আমাদের সঙ্গে না মিললেও ভাসা ভাসা অথবা অগভীর যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও True India বাস্তবিকই ভারতবর্ষের কতটুকু কাজে লাগবে? ভুল বুঝতেই যারা চায়, ভুল ভাঙ্গালেও যাদের ভাঙ্গে না, ভুল বোঝাবার প্রকাণ্ড আয়োজনের ব্যবস্থা যাদের জন্য নেপথ্যে যাঁরা করে চলেছেন তাঁদের শক্তি আর সামর্থ্য যখন অপরিসীম তখন সেইখানে তাদের সামনে True India-র মতন একখানি ক্ষুদ্র বইয়ের আবির্ভাব আমাদের মধ্যে খুব বেশী আশার সঞ্চার করে না।

বইখানি শুধু বই হিসাবে ধরতে গেলে—যদিও খুব চিত্তাকর্ষক অথবা উদ্দীপনাভরা মনে হয়নি—তবু সত্যের সহজ সুর বইখানিকে একটা স্বাভাবিক মর্য্যাদায় মণ্ডিত করে রেখেছে। তবে মাত্র ২৩৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশের ছবি কতটুকুই বা ফুটে ওঠে। দেশের

দারিদ্র্যের সম্বন্ধে বারে বারে উল্লেখ করা চলে, সেই দারিদ্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না,—দেশের ধর্ম্মের ও cultureএর কিছুটা আভাস দেওয়া চলে, কিন্তু বিদেশীরা যারা নাকি কিছুই জানে না—যারা ভারতবাসীর চরিত্রের সম্বন্ধে যে কোনও কথায় অথবা ইঙ্গিতেই বিচলিত হয়ে সত্যি কি-না জানবার জন্য বারে বারে Andrews-এর কাছে এসেছে—তারা এ থেকে True India-র সত্য পরিচয় কতটুকু পাবে?—True India-কে চেনাতে যদি সত্যিই হয—আরও ব্যাপক, আরও বিশদ, আরও বহুবিস্তৃত, আরও গভীরতর সাহিত্যের প্রচুরতম সৃষ্টির দরকার। আর বাস্তবিকই—মহামতি Andrews এর কাছেও তাঁর ভারতবর্ষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করে আমরা এর চেয়ে আরও অনেক বেশী আশা করতে পারি না কি?

এই প্রসঙ্গে মনীষী ৺বিপিনচন্দ্র পালের Soul of India বইখানির কথা মনে হয়। আমরা পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি সেই দিকেও আকর্ষণ করছি।

শ্রীবীণা দাস

প্রথম প্রশ্ন—উপন্যাস। লেখক—শ্রীরাইমোহন সাহা, প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুগে যুগে, দেশে দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেখা যায়, কবি ও সাহিত্যিকরাই জনসাধারণকে নব নব চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করে থাকেন। তাঁদের অন্তর্নিহিত দৃষ্টি-শক্তির কাছে রাষ্ট্রগত, সমাজগত, জাতিগত পঙ্কিলতার গ্লানিগুলি আগে ধরা পড়ে, তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মের গলদ দেখিয়ে এমন সব ছবি আঁকেন তাঁরা, তাঁদের লেখনী দিয়ে নিসৃত হয় এমন সব ভাবধারা, যাতে জনসাধারণের চোখ খুলে যায়। তাদের মনে জাগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবল ইচ্ছা, ফ্রান্সে রাষ্ট্র বিপ্লবের মূলে ভল্‌টেয়ার, রুশোর দান কতখানি তা আমরা জানি, আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের মূলে Uncle Tom's Cabin—একখানি বই কি ভাবে সাহায্য কোরেছে তা আমরা ভুলতে পারি না। আমাদের নিজেদের দেশেও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' ভিতর দিয়ে কি প্রচার ক'রতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজে' পল্লী গ্রামের কেমন নিখুঁৎ ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন!

প্রথম প্রশ্নের লেখক শ্রীযুক্ত রাইমোহন সাহাও তেমনি আমাদের সমাজের দোষ ত্রুটিগুলি দেখাবার জন্য এই উপন্যাসখানি রচনা কোরেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক'রে ফুটে উঠেছে আমাদের জাতিভেদ-প্রথা। ব্রাহ্মণের মেয়ে মায়া ও নীচ জাতীয় পরেশের মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতিভেদ প্রথা। তাই মায়ার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেল, শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবলে আশ্রয় নিয়ে যে তার ব্যর্থ জীবনের জ্বালা জুড়ায়। এদিকে মায়ার বন্ধু বীণা, উচ্চ শিক্ষিতা জজের মেয়ে, নিজের উচ্চজাত ও আভিজাত্য গৌরবে একদিন যাকে ফিরিওয়ালা বলে' অশ্রদ্ধার চোখে দেখলো, আরেকদিন তাকেই তার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাটুকু দান করে, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল

হ'য়ে উঠলো। সেখানেও তাদের মিলনে বাধার সৃষ্টি করলো জাতিভেদ প্রথা। রামু চাঁড়ালের ছেলে শুনে, ঘৃণায় বীণা তার প্রতি বিরূপ হয়ে,বিমানকে যাকে সে রামুর চেয়ে অনেক নীচে স্থান দেয়, তাকেই তার জীবন সঙ্গীরূপে বরণ করতে রাজী হ'ল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত বিমানের সঙ্গেও বীণার মিলন হয়নি। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বীণা বিমানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু বীণার মতন উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়ের কাছে জাতিভেদ-প্রথা নিয়ে এরকম সংস্কার আমরা আশা করি না। যার সহৃদয়তা ও কর্ম্মশক্তি দেখে সে আকৃষ্ট হল, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলো, চণ্ডালের ছেলে শুনে আরেকদিন তারই প্রতি ঘৃণায় বিরূপ হয়ে ওঠা খুব অস্বাভাবিক মনে হয়। ভামুর প্রতি বীণার সত্যকার প্রেম সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে মনে। এতে মনে হয় লেখক উপন্যাসখানির নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে যত বড় বড় কথাই বলান না কেন, তাদের একটু বেশী রকমের দুর্ব্বল-চিত্তের করে ফেলেছেন। সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে অনেক কথাই তারা বলে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতন মনের জোর তাদের কারুরই নেই। যাত্রা দলের ব্রাহ্মণ, হাড়ি, মুচি ও ডোমের একত্রে খাওয়ার মধ্যে যে উদারতার আভাষ দিতে চেয়েছেন, গান্ধীজীর অস্পৃশ্য আন্দোলনের পর এর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই।

লেখকের মত, আমাদের দেশের রাজনীতি, আমাদের সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতির উপরে নির্ভর করে, তাই সমাজ-নীতির পরিবর্ত্তন করতে চান্ অবাধে বিবাহের নীতি প্রচলন দ্বারা জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ করে'। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রথার সমস্ত গলদ তো ঐ জাতিভেদ প্রথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কত অশিক্ষা, কত কুসংস্কার, কত অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন আমাদের মন। তার জন্য কত-খানি দুর্ব্বল ও অসহায় আমরা একথাও অস্বীকার করা যায় না কিন্তু একমাত্র অবাধ বিবাহ প্রচলনের মধ্যেই কি এর সমাপ্তি? লেখক অনুরূপ মত পোষণ করেন, তাই বইখানির নামও 'প্রথম প্রশ্ন' দিয়েছেন। কিন্তু বইখানির নাম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—তিনি উপন্যাসটির মধ্যে যে যে সমস্যার উল্লেখ কোরেছেন, তাতে ঐগুলোই আমাদের প্রথম প্রশ্নের বিষয় নয়। রাজনৈতিক সমস্যাই আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এ সমস্যার যতদিন না সমাধান হয় ততদিন আমাদের প্রথম প্রশ্নের বিষয় হওয়া উচিৎ রাজনীতি, সমাজনীতি নয়। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে না এলে সমাজ-নীতির বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে বলে' মনে হয় না।

যাই হোক্, উপন্যাসখানি আধুনিক অনেক উপন্যাসের চেয়েই ভালো। উপন্যাসটির প্লটের মধ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকলেও ভাষার দৈন্য বিশেষ কোথাও চোখে পড়ে না। বরঞ্চ পড়তে ভালই লাগে।

শ্রীমতী রাণী দেবী

'শ্রীহর্ষ'—বার্ষিক সংখ্যা ১৯৩৯

ছাত্রসমাজ পরিচালিত শ্রীহর্ষ এবারে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। ছাত্রসমাজ একদিন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রিকাখানি বার করেছিল আজ তাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সে উদ্দেশ্য সফল

হ'য়েছে। শ্রীহর্ষ আজ সত্যই "শ্রী" ও "হর্ষের" অতুল অধিকারী হ'য়েছে। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায়, কাগজখানির মূল লক্ষ্য কি। এর প্রধান লক্ষ্য জনসমাজের মনে গণ-আন্দোলনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। প্রত্যেক প্রবন্ধই গণ-আন্দোলনের বিষয় নিয়ে লেখা। M. N. Roy তাঁর The Working Class and The National Democratic Revolution নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের দেশে Proletarian Revolution এখন আসতে পারে না"। Próletarian Revolution হবার আগে Bourgeois Revolution হওয়া দরকার। বর্ত্তমানের শ্রমিক-আন্দোলন ও কৃষি-আন্দোলন নিয়ে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র দত্ত, সুধীন্দ্র প্রামাণিক, এস, এন, রায়, অনিলা ব্যানার্জ্জি প্রমুখ অনেকেই শ্রীহর্ষে লিখেছেন। তার মধ্যে অনিলা ব্যানার্জ্জির The Stakhanov Movement নামক প্রবন্ধটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই Stakhanov Movement যে কি তা' আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমানে প্রত্যেক factory ও industryতে division of labour-এর প্রচলন আছে। এই division of labour হওযাতে প্রত্যেক শ্রমিকেরই কাজের সুবিধা হ'যেছে এবং উৎপাদনও বেড়ে গেছে। কিন্তু strict division of labour বলতে যা' বোঝায় তা' প্রায় কোন factoryতেই এখন পর্য্যন্ত দেখা দেয়নি। Stakhanov Movement এর U S S.R এ এই নিয়ম সম্পূর্ণ সম্ভব হ'যেছে। যেমন কোনও কযলার খনিতে যদি একজন hewer ছ-ঘণ্টা ধরে কেবল কযলাই কাটে, তা'হলে সে অনেক কযলা ঐ সময়ে কাটতে পারবে। আর যদি ছ'ঘণ্টায কয়লাকাটা, কাঠকাটা, খুঁটি বাঁধা ইত্যাদি পাঁচরকম কাজ করে তা'হলে কোন কাজই সে ভাল করে করতে পারবে না বা কোন কাজই তার এগোবে না। যে কযলা কাটবে সে কেবল ছ'ঘণ্টা ধ'রে কয়লাই কাটবে, যে কাঠ কাটবে সে কেবল কাঠই কাটবে এবং যে খুঁটি লাগাবে সে কেবল খুঁটিই লাগাবে, এইরকম কাজের বিভাগ থাকলে প্রত্যেক শ্রমিকই তার নিজের নিজের বিভাগের কাজ বেশী মন দিয়ে করতে পারবে। তাতে কাজও ভাল হ'বে, উৎপাদনও বেশী হ'বে। আগে একজন hewer ৬ ঘণ্টায় ৭ টন কয়লা কাটত, কিন্তু Stakhanov Movement হ'বার পর দেখা গেছে, এখন একজন hewer ৬ ঘণ্টায ১০২ টন কযলা কাটে। সম্প্রতি আরও কয়েকটী দেশের factoryতে এই পদ্ধতি দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশে প্রায সব কাগজেই এই সব সংবাদ জানা যায় না। আমরা আশাকরি শ্রীহর্ষ আমাদের আরও দেশ বিদেশের আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ দেবে।

শ্রীমতী স্নেহলতা সেন

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এগারোটা বাজে

নিরিবিলি বসে' এক পেয়ালা চা খাবার এ-ই সময়। সমস্ত সকাল গেছে সংসারের অবিশ্রান্ত খাটুনি—এখন এক পেয়ালা চা খেয়ে শরীর মন তাজা করে' নিন্। সাম্‌নে পড়ে আছে সারাটা দিন—মুখর বিকেল আর সুন্দর সন্ধ্যা। এক পেযালা চা নিয়ে আরামে বসে' এই দীর্ঘ দিনটাকে আপনি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন, তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা

সব জায়গায় সব সময় চলে

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌শ্যান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 119

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বা· আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

আকাশে বাতাসে যখন আগমনীর বাঁশী বাজে, তখন

প্রিয়জনের সঙ্গ কামনায় মন উন্মুখ হয়ে ওঠে :

প্রিযজনেব সহিত মিলনেই পূজাব উৎসব হয সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ।

প্রিয়-সম্মেলনের সুলভ উপায়

পূজা কন্‌সেশন যাতায়াতী টিকিট

আগামী ৪ঠা অক্টোবব, ১৭ই আশ্বিন থেকে ৮ই নবেম্বব, ২২শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত **৬৬ মাইল** বা তাব চেযে বেশী দূবেব জন্য নিম্নলিখিত হাবে পাওযা যাবে ঃ—

১ম, ২য ও মধ্যম শ্রেণী—১⅓ ভাডায যাতাযাত
তৃতীয „ ১⅔ „ „ (১৫০ মাইল পর্য্যন্ত)
তৃতীয „ ১½ „ „ (১৫১ মাইলের উপব)

প্রকৃতপক্ষে ১৫১ মাইলেব সুলভ ভাডাব সুবিধা ১৩৬ মাইল থেকেই পাওযা যাবে।
এই টিকিটেব স্থিতিকাল (মেযাদ) ৪৫ দিন, কিন্তু ১১ই ডিসেম্ববেব পর এব ব্যবহাব চলবে না।
যাতাযাতেব পথে যে কোন ষ্টেশনে নামা যাবে, তবে একই লাইনেব একদিকে একবাবেব বেশী যাওযা যাবে না।
অন্যান্য বেল ও স্টীমাবেব সঙ্গে যোগ বেখেও এই টিকিট পাওযা যাবে।

পূজার উৎসব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিয়ে দেশ-ভ্রমণের উৎসবে যোগদান করুন।

দেশ-ভ্রমণের সুলভতম উপায়

অবাধ-ভ্রমণ টিকিট

১ম শ্রেণী—৬০৲ মধ্যম শ্রেণী—১৫৲
২য় „ —৪০৲ ৩য় „ —১০৲

আগামী ২৮এ অক্টোবব থেকে ১০ই নবেম্বব পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে। টিকিট কেনার পরদিন থেকে ১৫ দিন পর্য্যন্ত এই বেলেব সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও ইচ্ছামত যাত্রাবিবতি করা চলবে। এই টিকিটের জনপ্রিযতাব কথা এখন সকলেবই সুপবিচিত।

এপর্য্যন্ত যত সুলভ টিকিট প্রবর্ত্তিত হযেছে এই টিকিটের স্থান তাদেব সবার উপরে।

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

নং টি/১৭৫/৩৯

= সূচী =

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি-স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের গহনা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গহনা প্রস্তুত করিয়া ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী আরও কমান হইয়াছে
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইন সম্বলিত বি ৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয়।
১২৪.১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়
টেলিগ্রাম

শিল্পী—ইন্দু

দ্বিতীয় বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

স্মারণিকী

ক্ষিতীশ রায়

তাহাদেব গান গাই,
নবজীবনেব বেদীতে যাহাবা জীবন সঁপিল ভাই।
তরুণ যাহাবা আহুতি আগুনে আঁকিল নূতন দিন
অনাহত সুরে বাজাল যাহাবা শতবক্ষেব বীণ,
ভাঙিল যাহাবা তুর্দম তেজে বর্তমানের কাবা
অরূপরতন খুঁজিযা পেয়েছে যাহাবা সর্বহাবা,
তাহাদেব গান গাই
নবজীবনেব বেদীতে যাহাবা জীবন সঁপিল ভাই।
তাদেবে স্মবণ কবি,
যাযাবব জন যাহাবা নিখিল বিশ্ব লযেছে ববি।
মুসাফির মন যাহাদেব ভাই ঘব বাঁধিযাছে পথে
পিছনেব ডাক যাদেবে আবার ফিরাবে না কোনো মতে,
পথের ধূলায ধূসব যাদেব অফোটা কুসুম রাজি
তাহাদের তবে আমাব মনেব মন্দিবা ওঠে বাজি,
তাদেবে স্মরণ কবি
যাযাবব জন যাহাবা নিখিল বিশ্ব লয়েছে ববি।

এমাজন নদীর পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

(Down the Amazon)

সৌরমণ্ডলের তুলনায় পৃথিবী আমাদের কত ছোট বিজ্ঞানীরা এক একবার এই কথা ভাবতে বসেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত কোটি গ্রহ তারকা, পৃথিবীর অপেক্ষা তারা কোটি কোটি গুণ বড়, কত কোটি তারকার আলোকরশ্মি অযুত বৎসর আগে যাত্রা ক'রে আজও আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি, কত অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্র আজও আমাদের কল্পনার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি—এই সব কথা ভাবলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু সৌরমণ্ডল অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কথা বাদ দিলেও আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎটুকুর পরিচয়ইবা কতটুকু নিয়ে থাকি। পৃথিবীর যে অংশগুলিতে মানুষের বাসা, বাণিজ্য-বেসাতি, ধনদৌলত—সেই অংশগুলি ভিন্ন আমরা আর কোথাও অগ্রসর হইনে। এই পৃথিবীতে যতটুকু ভূভাগে মানুষ বাস করে, তার চেয়ে অনেক বেশি অংশের সঠিক পরিচয় এখনও অজানা রয়ে গেছে। সভ্য মানুষ, কাজের মানুষ তাদের ধার ঘেঁষে যায়, কিন্তু তাদের রহস্য উদ্ঘাটনের কোনো চেষ্টা পায় না। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মধ্যেও উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর শত সহস্র যোজনব্যাপী তুষার প্রদেশ, আফ্রিকার বহু অগম্য স্থান, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু ভূভাগ, মহাসাগরগুলির সুদূর দিগন্ত, অনাবিষ্কৃত দ্বীপ, অনাবিষ্কৃত জাতি—অনেক বিষয়ে আমরা এখনো অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি।

আজ আমি একটি মহাদেশের এক অংশের কথা আলোচনা করব—যার সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি সংবাদ রাখিনে। সেই মহাদেশটির নাম দক্ষিণ আমেরিকা। ভূগোলে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রায় একই আকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু আফ্রিকা সম্বন্ধে আমরা যেমন বৃটিশ সংবাদ প্রতিষ্ঠান রয়টারের মারফৎ নানারূপ সংবাদ পেয়ে থাকি তেমন সংবাদ দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে পাইনে। এর কারণ দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে সামান্য একটখানি ভূভাগ ছাড়া এত বড় মহাদেশের আর কোথাও বৃটিশের এলাকা নেই। এ ছাড়া ভূগোলে আমরা এই মহাদেশের কয়েকটি অংশের নাম পাই মাত্র—যেমন, কলম্বিয়া, ভেনজুয়েলা, ইকোয়েডর, পেরু, বোলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আরজেনটাইনা, এবং ব্রেজিল। এই মহাদেশের প্রাকৃতিক রূপ অতি বিচিত্র। চারিদিকে মহাসমুদ্রবেষ্টিত, পশ্চিম দিকে প্রায় সাত হাজার মাইল দীর্ঘ পর্ব্বতমালা, সহস্র সহস্র মাইলব্যাপী গহন অরণ্য, শত সহস্র যোজনব্যাপী উচ্চ মালভূমি এবং এদেরই মাঝখানে অরণ্যে, পর্ব্বতে, মালভূমির চারিদিকে, সভ্যতা লেশহীন ভয়ঙ্কর নরখাদক জাতির রাজত্ব। এদেরই ভিতরকার একটি অংশের কথা আমি কিছু বলব। পৃথিবীতে এমন ভয়ঙ্কর স্থান খুব কম আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে সহস্র সহস্র মাইল লম্বা চওড়া এই বিশাল ভূভাগটির নাম আমাজোনিয়ান প্লেন্। এই সমতল ভূভাগ উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় এক হাজার মাইল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রায় তিনহাজার মাইল বিস্তৃত। এর উত্তরাংশ দিয়ে বিষুবরেখা অর্থাৎ ইকোয়েটর অতিক্রম করার জন্য উত্তাপের মাত্রা খুব বেশি, প্রায় সকল সময়েই গ্রীষ্মপ্রধান।

পৃথিবীতে যে কয়টি বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদী আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন অন্যতম। কিন্তু এমাজনকে সর্ব্বপ্রধান এই কারণে বল্‌ব যে, এর চারিদিকে শত শত শাখা প্রশাখাযুক্ত নদীর ধারা চারিদিক থেকে এই মহানদীতে এসে মিলেছে। শাখানদীরা ছোট নয়, তারা প্রায় এক একটি উত্তর ভারতের যমুনা নদীর মতো। বড় একটা মাকড়সা যেমন তার চারিদিকে জাল বিস্তার করে, তেমনি এমাজন্ নদীর প্রধানতম প্রবাহটি শত শত মাইলব্যাপী শাখা প্রশাখার জালে এই সুবৃহৎ সমতল ভাগকে সকল দিক থেকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। প্রত্যেক নদীর চারিদিকে ভীষণ অরণ্য, বিভীষিকাময় নরখাদক আদিম জাতি, নদীর জলে হিংস্র সরীসৃপ, অরণ্যে ব্যাঘ্র, বন্য হস্তী, প্যান্থর, মারাত্মক কীট, রক্তপিপাসু পতঙ্গ, মারাত্মক বাদুড়, আক্রমণকারী নানাবিধ শ্বাপদ,— এই সকল জীব জানোয়ারে এমাজনের বিস্তীর্ণ রাজ্য বিপদসঙ্কুল। মাত্র ষাট সত্তর বছর আগে এই সুবিশাল ভূখণ্ডের অন্তরে কোনো সভ্য মানুষ পদার্পণ করতে সাহস করেনি, যে অল্প সংখ্যক দুঃসাহসী এর সীমানার কাছে অগ্রসর হয়েছিল তারা আর কোনদিন ফিরে আসেনি। আজ পর্য্যন্ত বহু শত মানুষ এই অদ্ভুত দেশে যাবার চেষ্টা ক'রে প্রাণ দিয়েছে। এই ভূখণ্ডের চতুঃসীমায় যদিও বহু জাতির বহু সাম্রাজ্য গণ্ডী, কিন্তু এর ভিতরকার মানচিত্র আজও প্রস্তুত হয়নি। কথাটা শুনতে অবশ্য আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু এই সমতল ভাগে কোথায় কি আছে, কোন্ দেশের কোন্ রাজ্য, কোন্ নদীর পর কোন্ নদী—তার কোনো সঠিক বিবরণ নেই। গ্রাম বলো, শহর বলো, দেশ বলো, পথঘাট বলো, চাষ আবাদ অথবা শৃঙ্খলাযুক্ত কোনো মানুষের কেন্দ্র বলো—এর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। চারিদিকে নীরেট, জমাট, জটিল অরণ্য আর ভয়াবহ নদীর খর প্রবাহ, এ ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার মতো এত বেশি নদীর সংখ্যা জগতে আর কোথাও নেই।

এই এমাজনের দেশে ভ্রমণ করা যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ তা' সহজেই অনুমান করা যায়। জীবনকে যারা তুচ্ছ মনে করে, বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে যারা একটুও প্রাণের মায়া করেনা, সেই একদল দুরন্ত বালকের কীর্ত্তির কথা আজ বল্‌ব। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল রাজ্য আবিষ্কার করার আনন্দে তারা একদা পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

সে আজ কয়েক বছরের কথা। কাজ্‌কো নামক পেরুর অন্তর্গত এক শহরে একটি ভৌগলিক সমিতি ছিল, সেই সমিতিতে এক তরুণ আনাগোনা করতো, তার নাম ডন ফস্‌টিনো মাল্‌ডোনাডো। তিনের ছিল অটুট সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, ঘরের আরাম আর অলস জীবন যাপন তার ভালো লাগতো না। দুঃখ, দুর্গমে আর দুর্য্যোগে অন্ধের মতো ছুটে গিয়ে সে প্রাণের তৃপ্তি খুঁজে বেড়াতো। এই ডন্ একদা তার ভাই গ্রেগরি ও আর ছ'জন বিশ্বাসী তরুণকে নিয়ে এমাজনের পথে বেরিয়ে পড়ে। কী

ভযঙ্কব দুঃসাহসেব মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া তরুণের দল যে ঝাঁপিযে পড়লো তা' তারা জানতো না। পথে কোথাও খাবাবেব সংস্থান নেই, সঙ্গে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেই, পথেব কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু তাদেব প্রাণেব পিপাসা ছিল অদম্য। সোনাব স্বপন বুনেছিল তাবা কল্পনাব আকাশে। যাত্রার সময সবাই তাদেব অশ্রু ছল ছল চোখে বিদায দিল। সবাই জানে অবণ্যেব বিভীষিকাব মধ্যে, দিশাহারা নদীর রহস্যে তারা লুপ্ত হযে যাবে, তাদেব চাবিদিকে অনাহাব ও মৃত্যু, তাদেব নৌকোব ওপব থেকে জল জন্তুবা গ্রাস করবে,—কিম্বা এব চেযেও ভযঙ্কব, নবখাদক বর্ব্বব জাতিব আক্রমণে তাবা লক্ষ্য স্থলে পৌঁছবাব আগেই বিনষ্ট হবে। মৃত্যু তাদেব নিশ্চিত। ডনেব দলও প্রতিজ্ঞা কবেছিল, পরাজিত হযে তাবা ফিববে না, মৃত্যুকেই ববং ববণ ক'বে নেবে।

ভ্রমণের প্রথম অবস্থায তারা পর্ব্বত ও অবণ্য অতিক্রম ক'বে চললো। বেতবন ও কাঁটাঝোপ অতিক্রম ক'বে ঘন কুযাসাব ভিতব দিযে পাহাড়েব ভীষণ চড়াই উৎরাই ডিঙিযে, গাছপালার ডাল ভেঙে পথ কেটে এবং সাবা দিনমান অন্ধকাবে হাতড়ে হাতড়ে তাবা চলতে লাগলো। বৃষ্টি ও কুয়াসা থেকে আত্মবক্ষাব জন্য গাছেব তলায তাবা আশ্রয নেয, অসভ্য জাতির আক্রমণেব ভযে আগুন জ্বালাতে পাবে না, পিচ্ছিল খাড়াই পাহাড়েব গাযে লতাব মূল আঁকড়ে ধবে পথ পেবিযে যায—হাত ফস্‌কে গেলে গর্জ্জমান নদীতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু—পথে একটু বিশ্রাম নিতে গেলে সহস্র সহস্র বিষাক্ত মশাব আক্রমণ—এই ভাবে তাবা ক্লান্ত দেহে এগিযে চলেছে।

অরণ্যেব দৃশ্য সুন্দব ও ভীষণ। যতই তাব অন্তবে প্রবেশ করো যেন রূপকথাব বাজ্য। গাছেব ডালপালা, লতাপাতা, শ্যাওলা ও শিকড়েব ঝুবিতে আচ্ছন্ন একটি অসাড় প্রাণীহীন জগৎ। ফুল কোথাও নেই, কিন্তু লতা পাতা ও শ্যাওলা শিকড়েব অদ্ভুত স্বপ্নময গন্ধ,—চাবিদিকে বহস্যময প্রাচীন স্তব্ধতা, নিজ নিশ্বাসেব শব্দে নিজের শবীব আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। যদি একটি কীট অথবা পতঙ্গ সহসা চীৎকাব ক'বে ওঠে, তুমি চমকে উঠবে। তাবপব যখন ধীবে ধীবে বাত্রিব ছাযা নামে, তখন মনে হয শত সহস্র প্রেতেব কাযা গাছেব ডালে ডালে ঘুবে তোমাকে অবরোধ করেছে,—এবং তখনই চেযে দেখো, এখানে বাত্রির একটা নূতন জগৎ কবাল চেহাবা নিযে জেগে উঠেছে। বানবেব চিৎকাবে, বন্য শ্বাপদেব গর্জ্জনে, ভেকেব আর্ত্তনাদে, মানুষ-মারা পাখীব ডাকে, কীটপতঙ্গ-বাদুড় ও মশাব আওযাজে অরণ্য পবিপূর্ণ। এমনি অবস্থাব ভিতব দিযে ডনেব দল এগিযে চললো। তাদেব ভয ছিল পাছে পিছন থেকে চুপি চুপি কেউ এসে তাদেব আক্রমণ কবে, পাছে নবখাদকের বিষাক্ত তীব জঙ্গল ভেদ ক'বে এসে তাদেব শবীব বিদ্ধ কবে, কিম্বা সহসা গাছেব ডালের উপব থেকে তাদেব ঘাড়ে প্যান্থব লাফিযে পড়ে। ছোটখাটো বিপদেবো শেষ নেই। তাদেব জামা কাপড়ে এমন-সব ভযানক পিঁপড়েব দল ঢুকে পড়ে যে, তাদেব দংশনে মনে হয জ্বলন্ত লোহার ছুঁচ তাদের শবীর বিঁধিযে দিযেছে। বাত্রে বন্য বাদুড় পাযের আঙুল কেটে নেয, লতাপাতার কুৎসিত গন্ধে বমি আসে। একমাস এই ভাবে উপবাসক্লিষ্ট দেহ নিযে তাবা নদীব ধাবে এসে আবার একটু স্বস্তি পায়।

নদীতে এসে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'বে, ববাব গাছেব আঁশ সংগ্রহ ক'রে, তারা ভেলা তৈবী

বলে। তাদেব খাদ্য হোলো বন্য কদলী। নদীতে মাছ প্রচুব কিন্তু বন্যাব কাল, ধরবাব উপায় নেই। জাল ও ছিপ কিছুই ছিল না। এরপবে আবাব দুঃখ গভীব হোলো। ভেলাটা দুর্ব্বল, অতগুলি মানুষেব ভাব সইলো না, নদীব ঢেউয়েব মধ্যে ভেঙে পডলো, আবর্ত্তে ঘুবপাক খেযে তলিযে গেল,-অন্যত্র গিযে ভেসে উঠলো। এই বিপদেব মধ্যে কাঠেব তক্তা ধবে বীব বালকেব দল স্রোতেব সঙ্গে যুদ্ধে মাতলো,—সাঁতার জানেনা, হাত ছেড়ে গেলেই মৃত্যু। এই ভাবে বাত্রি প্রভাত হলে তাবা দেখলে তীবে ক্লান্ত হযে তারা প'ড়ে বযেছে। সেইদিন সহসা একদল বর্ব্বব শাল্‌তি বেযে যাবাব সময তাদেব দেখতে পেযে বন্যভাষায চিৎকাব ক'বে উঠলো, তাবপবই বাশি বাশি তীব ছুড়তে লাগলো। কি ভাগ্য, একটিও ওদেব গাযে লাগলো না। ওদেব এই বাঁচাটা দৈবাৎ।

এই নবখাদকেব দল একরূপ উলঙ্গ অবস্থায থাকে। কালো তামাব মুদ্রার ন্যায তাদেব গাযেব বং। তাবা যে তীব ও বর্শাগুলি ব্যবহাব কবে, তাব আগায 'ক্যাবেযাব' নামক এক রকম মাবাত্মক বিষ মাখানো থাকে,—বর্শাগুলি বৃহৎ ও ভাবি। যে সমযেব কথা বলছি তখনকাব দিনে তাবা আবো বেশি হিংস্র ছিল, এবং লোকালযেব ধাবে এসে ঔপনিবেশিকেব দলকে হত্যা ক'বে চ'লে যেতো। লুটপাট ক'বে চাষবাস নষ্ট ক'বে দিতো। এইবাব আমাদেব তরুণেব দল এক বিস্তীর্ণ ও গভীব নদীব উপবে এসে উত্তীর্ণ হোলো। তাদেব পোষাক পবিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন, পবিশ্রমে ও অনাহাবে অবসন্ন। ক্ষুধার্ত্ত আটটি দৃঢসঙ্কল্প মানুষ ঈশ্ববেব দিকে চেযে বললে, পবাজয স্বীকার কবব না, ববং মৃত্যু আলিঙ্গন কবব। সাবাদিন প্রতিদিন তাবা উপবাসে জীর্ণ হচ্ছে এই কেবল ভাবে, আব চেযে দেখে তাদেব পথেব কোনো দিশা নেই, সীমা নেই, সৌভাগ্যেব সঙ্কেত নেই, তবু তারা বজ্রকঠিন প্রাণ নিযে পিছন দিকে না চেযে দৃঢ ভাবে নদীব উপব দিযে নূতন ভেলায ভেসে চলে। আকাশপথে ঈশ্বব হযত তাদেব প্রতি স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কবেন। কোনো কোনো দিন হযত অকস্মাৎ বন্য কদলীব গাছ তাদেব চোখে পডলো, তীবে লাফিযে প'ড়ে তাবা ছুটলো, লুব্ধ উন্মত্ত আটটি প্রাণী বন্য জানোযাবেব ন্যায সেগুলি চোখেব পলকে গ্রাস করলে। এ ছাড়া আব কিছু নেই, দিনগুলি সূর্য্যেব উত্তাপে জ্বলন্ত, ক্লান্ত। ভেলা থামিযে ঘুমোতে গেলে বন্য মাছি আক্রমণ কবে, পতঙ্গেব দংশনে শবীবেব বক্ত জ্বলে উঠে জমাট বেঁধে যায। দেখতে দেখতে গাযেব চামড়ায ঘা হয। অবণ্যে বন্যশূকব ও বানব দেখা যায বটে, কিন্তু তাদেব শিকাব কববাব অস্ত্র নেই, নচেৎ কিছু মাংস খেতে পাওযা যেতো।

আবাব একদিন একদল নবখাদক তাদেব আক্রমণ কবলে। তাবা পালাতে পাবলো বটে তবে একটি বন্ধু তাদেব বর্শায আক্রান্ত হোলো। কিছুকাল পরে আব একদল জংলীকে তাবা দেখতে পেলো,—এবা একটু ভদ্র কাবণ তরুণ-দলকে দেখেই তাবা পালালো। ডনেব দল তাদের জন্য নদীর তীরে কিছু উপহার রেখে দিয়ে অন্তবালে বইলো, সেই জংলীব দল ফিবে এসে সেগুলি পেযে খুশি হোলো। তাদেব সঙ্গে ভাব ক'বে একখানা শাল্‌তি নৌকো তাবা কিনলে। খাদ্য অবশ্য কোথাও নেই, কিন্তু এই শাল্‌তিটি সকলের আগে দরকার। উপবাসী তরুণেব দল আবাব চললো শাল্‌তি

ঠেলে,—এইভাবে পাঁচশো মাইল পথ। তারপর তারা বহু কষ্টে বহু দুঃখ জয় ক'রে একদা এমাজনের প্রধান শাখা বেণী নদীর সঙ্গমে এসে উত্তীর্ণ হোলো। পেরুবাসীগণের কাছে এই আবিষ্কার চিরস্মরণীয়।

ক্রমে ক্রমে তারা বিশাল এমাজনের বিপুল প্রবাহের সুদূর কল্লোল শুনতে শুনতে এগিয়ে চললো। কত অরণ্য, গুহা, পর্ব্বতপ্রান্ত, জটিল জটা-পথ, হিংস্র মানুষ ও পশুর আক্রমণ—সমস্ত পেরিয়ে তারা চললো। পথের দুর্ভাগ্যকে তারা প্রায় জয় ক'রে এনেছে, এবার 'মাদেরা' নদী পেরিয়ে এমাজনের তীরে উঠলেই তারা আহার ও আশ্রয় পাবে। হে ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নদীতে দেখলে এপার থেকে ওপার অবধি একটা প্রকাণ্ড বাধা। এটা বেণী নদীর বান। আশপাশের পার্ব্বত্য জলস্রোতের ভয়ানক আঘাত, তরঙ্গদল আকাশ পর্য্যন্ত ধাবিত হচ্ছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তারা তীরে শাল্‌তি আনলো। দুর্ব্বল দেহ ও জরজরভাব, মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলছে, পতঙ্গের দল দেহে অবিশ্রান্ত দংশন করছে—কিন্তু তারা হতাশ হোলো না, বিপদকে জয় করার জন্যই বিপদ আসে। তারা আবার যাত্রা করলো, অল্পক্ষণ পরে এমাজনকে দেখে জয়ের আনন্দে সকলে চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ভাগ্যের বিদ্রূপ, জলের নীচে পাহাড়ের চোরা গুহার ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত তারা লক্ষ্য করেনি, তাদের শাল্‌তি খরস্রোতে ঘুরপাক খেয়ে পাহাড়ের কানায় আঘাত করলো, এবার আর সেই ভয়াবহ ক্ষুব্ধ জলস্রোত আর ক্ষমা করলো না, তাদের সবাইকে আছাড় মেরে নদীর তলায় তলিয়ে দিলে। সেই দুঃসাহসী দলের মাত্র দুজন জলের ধাক্কায় পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে প্রাণ রক্ষা করলে,—আর বাকী ছ'জন, আমাদের দলপতি ডন্ আর সেই আহত বন্ধু সমেত,—অনন্ত জলরাশির রাক্ষসী গ্রাসের অতলে চিরদিনের জন্য তলিয়ে গেল।

অতঃপর দলপতির জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুটি সহচর অনেক বিপদ ও দুর্য্যোগ কাটিয়ে একজন ব্রেজিলবাসীর সাক্ষাৎ পেলে। তাদের সেই যুগান্তকারী দুঃসাহসিক ভ্রমণ ওইখানেই শেষ হোলো।

ডন্ আজ নেই, কিন্তু তার কীর্ত্তির পদতলে নমস্কার। তার জয় গৌরব আজ কে নেবে? প্রাণ দিয়ে সে এক নূতন মানচিত্র তৈরী ক'রে গেল, আজ তার আবিষ্কৃত ভূভাগে নূতন মানব সভ্যতার আনাগোনা চলছে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পেরুবাসীরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ডনের সেই শোচনীয় মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে আজও প্রণাম জানায়।

(অল্‌ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে)

দেবতার জন্ম

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

সুবিস্তৃত যাদুঘরের সুবিন্যস্ত কক্ষে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি ও প্রস্তরাদি সাজান আছে, সমস্ত কক্ষটি বেশ পরিষ্কার—যেন ধর্ম্ম-স্থানের মতই ফিটফাট। প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিও বেশ পরিষ্কার—তাদের চকচকে অঙ্গে শুভ্র প্রাচীরগাত্র হতে ঠিকরে আলোর ধারা পড়ছে। এসব মূর্ত্তি বহু প্রাচীন, এককালে এঁদের নিজ নিজ এলাকার মধ্যে এঁরা বহু প্রতাপশালী ছিলেন—কত মন্দির, কত পূজা, কত উপাসনা—এঁদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হ'ত। তারপর একদিন আসল—যখন মানুষ এঁদের ভুলে গেল। মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তির অংশ হতেও যেমন এঁরা বঞ্চিত হ'ল, তেমন এঁরা বঞ্চিত হ'ল তাদের মন্দির, পূজা, আরতি থেকেও। মানুষের সমাজ, মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, মানুষের মন হতেও এরা নির্ব্বাসিত হ'ল। ধার্ম্মিকদের হাতে এরা কেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, কেউ মাটির গর্ভে প্রোথিত হয়ে আত্মরক্ষা করল—কেউবা অবজ্ঞায় অবহেলায় কোন অখ্যাত কোণে আত্মবিস্মৃত হয়ে বেঁচে রইল। তারপর ধর্ম্মের বন্যা যখন কমে আসতে লাগল, মানুষ যখন তার অতীত ও ভবিষ্যৎকে মানবদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, তখন আবার এদের খোঁজ সুরু হ'ল। অজ্ঞাত-অখ্যাত স্থান হ'তে এদের কুড়িয়ে এনে যাদুঘরে রাখা হ'ল। বহুশত বৎসর পরে আবার মানুষের আদর-সোহাগ, আবার মানবের হৃদয়ের ও প্রীতি স্পর্শ পেয়ে, যেন যাদুঘরের যাদুমন্ত্রে এঁদের অসাড় অঙ্গে প্রাণের সঞ্চার হয়ে উঠল। তাঁদের বহুদিনের বিস্মৃত কথা আবার যেন স্মৃতিপটে ফুটে উঠতে লাগল।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে এঁরা যেমন নিত্যই মানবের প্রীতি ও আদর পেত, আবার তেমনি—হয়তবা তার চেয়েও বেশী—প্রীতি ও সেবা মানবের কাছে পেয়ে তাঁদের বহুযুগের পুরাণো কথা মনে উঠতে লাগল। যেন স্বপ্নপুরীর মায়ার বন্ধন থেকে, তাঁরা মানব-হৃদয়ের সোণার কাঠির পরশ পেয়ে জেগে উঠল।

তাদের হৃদয়ের ভিতর কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসাই জাগছিল, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে তা' যেন মুখ দিয়ে বের হতে পারছিল না। ক্রমে তাদের মনের কথা ও ব্যথা মুখে বের হতে লাগল।

রাত্রি তখন গভীর—হঠাৎ বাইরের একটা আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। একজন বললেন—"বা, কি সুন্দর বাইরের আকাশ—সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে যেন প্রকৃতিটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। অশান্ত শিশু যেমন নিদ্রার কোলে চুপটি করে নিজকে এলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি ক্ষ্যাপা আকাশ তার সমস্ত ক্ষ্যাপামিকে সংযত করে নিষুতির কোলে নিজকে এলিয়ে দিয়েছে। কতকাল এই দৃশ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম।"

২য় মূর্ত্তি বললেন—"সত্যিই বলেছ ভাই। কোন গহ্বরে পড়েছিলাম। কিন্তু একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়—কেন এরা আমাদের এমনি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে?"

৩য়—"সে প্রশ্ন তো সবারই মনে জাগে। কিন্তু কে তার জবাব দেবে?"

৪র্থ—"জবাব চেয়েই-বা আমাদের লাভ কি? হয়ত এমন নিষ্ঠুর উত্তর দিবে যে তখন আফ্‌সোস হবে, কেনবা জানতে চেয়েছিলাম।"

৫ম—"তবুও জেনে নেওয়া ভাল। নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থার জন্য, অপ্রস্তুত থাকার চেয়ে প্রস্তুত থাকা ভাল।"

১ম—"রোজ তো সকালে একটি বেশ ভদ্রমত লোক আসে, তাকে একবার জিজ্ঞাসাই করা যাক না কেন ...."

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হ'ল যাদুঘরের অধ্যক্ষকে সবাই এক সময় জিজ্ঞাসা করবে।

পরদিন যাদুঘরের অধ্যক্ষ এলে সমস্ত মূর্ত্তিদের মুখপাত্র হিসাবে সিলেনাস (Silenus) প্রথম কথা আরম্ভ করলেন। সিলেনাস বললেন—"নমস্কার মশায়, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, জবাব দিবেন কি?"

অধ্যক্ষ—"বেশ, বলুন।"

সি—"দেখুন, আমরা সবাই বহুপুরাতন—আজকার জীব আমরা কেউ নই। আমাদের জীবনে যে কত রকম বৈচিত্র ও ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটেছে তা' বোধহয় জানেন। এমন একদিন ছিল—যে আমরাই ভাগাভাগি করে সমস্ত মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতাম। মন্দিরে মন্দিরে আমাদের আরতি, প্রতি পর্ব্বত-শিখর, প্রতি চঞ্চলা স্রোতস্বিনী, প্রতি বৃক্ষ, প্রকৃতির প্রতি প্রহেলিকা, প্রাণের যত কিছু প্রাচুর্য্য,—সবই ছিল আমাদের উদ্দেশ্যে, মানবের সঙ্গে আমরা লীলা খেলা করেছি, তাদের উপর জুলুম করেছি, তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, পেয়েছি প্রীতি, পূজা, শ্রদ্ধা সবই।

"তারপর একদিন আসল—সেদিন এক নূতন উন্মাদনায় মানুষ মেতে উঠল, সেদিন আমাদের স্পর্শ, আমাদের দৃষ্টি, আমাদের স্মৃতি—সবই মানুষের কাছে হয়ে দাঁড়াল কলুষিত। তখন সুরু হল আমাদের লাঞ্ছনার পালা, যে আমাদের যত লাঞ্ছনা করতে পারবে, যে আমাদের এই মূক দেহে যত নিষ্ঠুর আঘাত করতে পারবে, ধর্ম্মের খাতায়, পরকালের হিসাবে, তার পাওনা ততই বড় হয়ে উঠবে। সেই নির্ম্মম অত্যাচারে আমাদের অনেকের প্রস্তর দেহ ভেঙ্গে চুড়ে গুঁড়িয়ে গেল, আর কতক মাটির নীচে বা কোন অখ্যাত স্থানে কোন রকমে দেহ বজায় রাখল।

"হাঁ—হয়ত বলবে আমাদের পাথরের দেহের উপর অত্যাচারই-বা কি হতে পারে, নির্ম্মমতাই-বা কি ঘটতে পারে। তুমিও এ কথা জিজ্ঞাসা করছ? নিত্য যে স্নেহ ও প্রীতির স্পর্শ দিয়ে তুমি আমাদের মূক শরীরকে মুখর করে তুলেছে, তুমি কি বোঝ না আমাদের মধ্যেও একটা মর্ম্ম আছে। ফিডিয়াস (Pheidias) যদি বেঁচে থাকতেন তবে বুঝতেন, যে এথেনার বিরাট মূর্ত্তি তিনি গড়েছিলেন,

তাতে আঘাত করলে বেদনা কোথায় বাজে। আমাদের এই পাথরের ভিতরও একটা বেদনা বাজে। আমাদের মর্ম্মস্থল হয়ত এই প্রস্তর দেহের মধ্যেই নেই, কিন্তু বিশ্বের কোথাও আছে—স নিত্যকার। স্থান বা কালের দ্বারা তুমি তাকে অস্বীকার করতে পার না। আর পার না লেই—আজ শত শত বৎসর পর তুমি এসেছ আমাদের ক্ষত-স্থলে প্রলেপ দিতে। তোমার স্নেহ-প্রীতি—তোমার ভক্তি—তোমার পূজা, এত শত বৎসর পর আমাদের বহু পুরাণো স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

"আমাদের প্রশ্ন হ'ল এই এত শত বৎসর পর আজ কি আবার আমরা তোমাদের পূজার পাত্র হয়ে উঠেছি? তাও তো ঠিক মনে হচ্ছে না। আজ এত যুগ পরে আমাদের এত আদর যত্ন কেন?

"জবাব দেবে কি? তোমরাও কি আমাদের মান? তোমাদের জীবনে কি আমাদের কোন স্থান আছে? এতকাল শুনে এসেছি আমরা ফাঁকি, আমরা মিথ্যা, আমাদের স্বীকার করা পাপ।"

(খ)

অধ্যক্ষ কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন—"তোমাদেরই সবাইর সম্বন্ধে এক জবাব দেওয়া যায় না। আমি ভিন্ন ভিন্ন করে জবাব দিব। তোমার নিজের কথা প্রথমে ধর, তুমি সিলেনাস তোমাকে স্বীকার আমরা করি—আজও যখন বনস্পতির সবুজ পত্রের আড়াল থেকে একটা অশরীরি ধ্বনি আসে, তখন আমাদের মনে তোমার বংশীধ্বনিই জাগিয়ে তোলে। যখন আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রকৃতি আয়ত্ত করতে শেখে নি, তখন তুমিই তাদের শিখিয়েছিলে, কি ক'রে বনের সম্পদকে ঘরে বরণ ক'রে নিতে হয়। কৃষির বহু সম্পদ তুমি মানুষকে শিখিয়েছ, তার নীরস কর্ম্মকঠোর জীবনে, তুমিই শিখিয়েছিলে কি ক'রে শব্দহীন বেণুর পঞ্জর হ'তে সুমধুর ধ্বনি বের করতে হয়। দ্রাক্ষার চাষ ও স্বাদ শিখিয়ে দিয়ে তুমি মানবের জীবনে নূতন আনন্দের দ্বার খুলে দিয়েছিলে। তোমার জ্ঞান গরিমার স্পর্শ দিয়ে মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছিলে। তা' সত্ত্বেও তোমাকে অস্বীকার করি কি ক'রে? বনের মর্ম্মর ধ্বনির মধ্যে যে তোমারই প্রাণের স্পন্দন ধ্বনি শোনা যায়—তা' অস্বীকার করি কি ক'রে? জানত-অজানত পদে পদে তোমার দান, তোমার প্রাণ, তোমার বংশীধ্বনি, তোমাকে আমাদের মাঝে জীবিত রেখেছে।

"তাই এত শত বৎসর পরও—হে বনদেবতা, তোমাকে এই নবযুগের অভিবাদন জানাচ্ছি। দেশ দেশে কালে কালে তুমি নূতন নূতন রূপ ধরছে। কোথাও হয়েছ প্যান, কোথাও ফনাস (Faunus) কোথাও সিলভেনাস (Silvanus)। সেই সব অতিক্রম ক'রে, তোমার যে নিত্যকার রূপ তাকে আমাদের নমস্কার জানাচ্ছি।"

সবাই কিছু সময় চুপ করে থাকার পর একটি বিমর্ষবদনা-বিযোগ-বিধুরা তন্বী-নারীকে দেখিয়ে সিলেনাস বললেন—"ঐ যে বিষাদ-রূপিনী নারী, এঁকে তোমরা স্বীকার কর?"

অধ্যক্ষ—"ইনি ঈসিস্ (Isis)। একে চিনি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? মিশর-জননী, আজ এই নবযুগ তোমার উদ্দেশ্যে তার প্রণতি জানাচ্ছে।

"সেই সুপ্রাচীনকালে তুমিই বিশ্বকে শিখিয়েছিলে প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে। তোমার দুঃখে জননী—বিশ্বপ্রাণ কেঁদে উঠেছিল। ওসিরিসের (Osiris) বিরহে যে দুঃখের সাগর তোমার অন্তর থেকে উথলে উঠেছিল, তার বক্ষ ভেদ ক'রে বের হ'ল মানব জীবনে প্রেমের খেলা।

"তোমার সেই অশ্রুধারা আজও বিশ্বমানবের চোখে চোখে আছে, তোমার সেই দ্বারে দ্বারে করুণ ক্রন্দন আজও বিশ্বমনের দুয়ারে গুমরে মরছে, তোমার সেই বিরহের জ্বালা আজও বিশ্বের চির-বিরহী মনে জ্বলছে। বিশ্বমানবকে তুমি যে প্রেমের দীক্ষা দিয়েছিলে সে আজও তা' ভোলে নি।

"হে বিজয়িনী, তোমার দেশকে যারা জয় করেছে, তারাও তোমার মন্দির দুয়ার থেকে দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে তোমার পূজা প্রচার করেছে। গ্রীস, রোম বিজয়ী বেশে এসেও তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। আজ কত সহস্র বৎসর পরে তোমাকে আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি।"

ঈসিসের পাণ্ডুর বদনে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তির আভা খেলে গেল।

অধ্যক্ষ আবার বলতে লাগলেন—"শুধু তাই নয—তুমি মাতৃ মূর্ত্তির প্রতীক। হোরাস-জননী ঈসিস—স্তন্য-দানরতা হোরাস-জননী ঈসিস—আজও বিশ্বের মাতৃমূর্ত্তির প্রতীক হয়ে আছো। হে বিশ্বজননী, তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছি।

"সুদূর অতীতে, যখন জীবন-ধারনোপায়ের প্রাচুর্য্য ছিলনা, তখন তুমি মিশরের কৃষকদের শিখিয়েছিলে গম যব শস্যাদির চাষ। মিশরের কৃষক বহু যুগ পর্য্যন্ত তোমার ঋণ স্বীকার ক'রে তোমার উদ্দেশ্যে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। তাই তারা নূতন শস্য পেয়ে, সকলের পূর্ব্বে তোমাকে তাদের প্রণতি জানাত।

"দেশ ও যুগ ভেদে তোমার বহু মূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে, তাই কেহ তোমাকে বলত "বহুনামা", কেউ বলত "সহস্র-নামা," কেউ বলত "সবুজ-রাণী", কেউ বলত "অন্নপূর্ণা" (Lady of Bread) কোথাও তুমি সিরিস (Ceres) কোথাও ডিমিটর। যে নামে বা যে রূপেই তোমাকে দেখি না কেন তুমি আজও আমাদের জীবনে সত্য হয়ে আছ। তোমাকে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।"

কিছু সময় পর সিলেনাস আবার বললেন—"ঐ যে দেখছ, প্রিয়দর্শন, উন্নত-ললাট, স্ফীত-গ্রীব, সুকুমার অথচ দৃঢ়-সংগঠিত দেহ তরুণ, এর নাম হ'ল ডাইওনিসাস। একে তোমরা কি ভাবে গ্রহণ করেছ?"

অধ্যক্ষ বললেন—"ডাইওনিসাস, তুমি ছিলে প্রাচীনকালের দুঃখ বহুল জীবনে আনন্দবিধায়ক। সমাজপতিদের চেষ্টা সত্ত্বেও দিকে দিকে অন্তরে অন্তরে তোমার পূজা প্রচারিত হয়েছিল। নীতিবাগীশদের সমস্ত কঠোর শাসনকে এড়িয়ে তোমার জয়যাত্রা প্রাচ্য হ'তে প্রতীচ্য পর্য্যন্ত চলেছিল।

নীতির প্রশ্রয়দাতা বলে তোমার খ্যাতি ছিল। সেই অপবাদ তুমি বরণ করে নিতে ভীত হও নি আর তার বিনিময়ে, তুমি তৎকালীন মানুষের সুখবিরল জীবনে তোমার সাধ্যমত সুখের সন্ধান দিয়েছ।

"তুমি মানবকে শিখিয়েছ বনের ফলকে গৃহ-উদ্যানে এনে মানবের খাদ্যরূপে তার চাষ কি ক'রে করতে হয়। তাই কৃতজ্ঞ মানব তোমাকে আখ্যা দিয়েছিল "ফলবর্দ্ধক," "ফলদেবতা," "ফলবান"। তুমি তাদের শিখিয়েছিলে কি করে দ্রাক্ষারস নিঃসরণ করে কর্ম্মকঠোর, দুঃখ-দীর্ণ, অল্পাশয় জীবনে একটু আনন্দের বিধান করা যায়। সেই যুগে যখন শতদিক থেকে বিধিনিষেধের বন্ধন, অভাবের নাগপাশ, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, আর মানবের অজ্ঞানতা, তার জীবনকে কেবল দুঃখেই ভরে দিয়েছিল, তখন তুমি তাদের ক্ষুধিত ও পিপাসিত মনের জন্য যে অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেলে, তার জন্য আজও মানব তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। হে আনন্দের দেবতা, তোমাকে প্রণাম।

"তারপর তুমিই প্রথম মানুষ ও পশুর পার্থক্য মানুষকে জানিয়ে দিলে। তুমি প্রথম দেখিয়ে দিলে যে পশুকে তার কাজে লাগিয়ে মানুষ তার জীবনের দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব করতে পারে। কৃষিকার্য্য যখন মানুষের পক্ষে ছিল আনন্দহীন দুঃখময়, তখন তুমি নিজ হাতে হালের সঙ্গে বলিবর্দ্দ জুড়ে, মানুষকে শিখালে কি করে তার শ্রম পশুকে দিয়ে লাঘব করতে পারে। তখনকার মানুষের ইতিহাসে এর মূল্য যে কতখানি ছিল, তা' আজও আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

"শস্য যখন মানুষ ক্ষেত থেকে কেটে ঘরে নিয়ে যেত, সে জানত না কি করে তার তুষ খসাতে হবে। তুমি স্বহস্তে সূর্প নিয়ে লোককে শিখালে কি করে তুষ থেকে শস্য খসাতে হয়। তাই সূর্প তোমার পূজার অন্যতম উপকরণ ছিল। হে দেবতা, তোমার এই দানের জন্যও তোমাকে প্রণতি করছি।

"তুমি চেয়েছিলে মানুষের জীবন থেকে দুঃখ ও শ্রমের ভারকে লাঘব করতে এবং সুখের ভাগকে বাড়িয়ে দিতে। হে মানব বন্ধু, হে দ্যু-পুত্র, এর জন্য তুমি বহু অপবাদ বরণ করে নিয়েছ, এর জন্য তুমি সাধারণ মানবের মত পরিশ্রম করে সহজ পন্থা তাদের শিখিয়েছ। তোমার সেই ত্যাগ ও দানের জন্য তোমাকে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

"যখন মানব মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল, মৃত প্রিয়জনের বিরহে কাতর হয়ে পড়ত, তখন তোমার নিজের জীবন দিয়ে আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও তার পুনর্জাগরণ (Resurrection) তাদের শিখিয়েছ। যুগে যুগে দেশে দেশে যে Resurrection এর বার্ত্তা, আত্মার পুনর্জাগরণের বার্ত্তা, মৃত্যুর ভিতরও মঙ্গলের ও নবজীবনের বার্ত্তা শুনতে পাই—তোমার সমাজকে তুমিই তা' শিখিয়েছিলে। তাই নীতিবাগীশদের শত নিন্দা সত্ত্বেও, জনসাধারণ তোমাকে স্থান দিয়েছিল তত্ত্বজ্ঞদের মধ্যেই। তুমি তোমার সমাজকে শিখিয়েছিলে দৈহিক সুখের ও আনন্দের সন্ধান, তুমি শিখিয়েছিলে আর্থিক ও খাদ্যের সচ্ছলতার পথ, তুমিই তাদের শিখিয়েছিলে আত্মিক স্বাধীনতার বাণী। এক কথায় সেই কঠিন কঠোর দিনে মানব জীবনকে সহনীয়, রমণীয় ও উপভোগ্য করতে চেয়েছিল। হে মানবের অন্যতম আদিগুরু, হে নরদেবতা তোমাকে প্রণাম।"

কিছু সময় আবার সবাই নীরব থাকার পর সিলেনাস বললেন—"ঐ যে প্রশান্ত শুভ-শ্রী-মণ্ডিত দীপ্তিমান মূর্ত্তি দেখছ ইনি হ'লেন কোয়েটজালকোট্‌ল (Quetzalcoatl) এঁকে তোমরা কি ভাবে নিয়েছ ?"

অধ্যক্ষ শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করে বললেন—"হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তোমার আসন মানবের হৃদয়ে নিত্য হয়ে থাকবে। যে যুগে মানব সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরে ছিল, যখন মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ছিল স্বল্প, যখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কঠিন তখন জগতের এক সুদূর প্রান্তে তুমি সত্য ও জ্ঞানের বার্ত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে, প্রীতি ও প্রেমের দীক্ষা তাদের দিয়েছিলে, সমাজ ও জীবনযাত্রাকে তুমি সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলে।

"যখন তোমার যুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের নামে হিংসাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত, যে হিংসার বৃত্তি জগৎ থেকে আজও বিলুপ্ত হয় নি, সেই প্রাচীন যুগে তুমি মানবকে শিখিয়েছিলে—অহিংসার বার্ত্তা, প্রীতির বার্ত্তা, প্রেমের বার্ত্তা। তুমি তাদের শিখিয়েছিলে জীবন যাত্রাকে কি ক'রে সহজ করতে হয়,—কৃষি-কার্য্যের বহু কৌশল তুমি তাদের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, প্রস্তর ও ধাতু ব্যবহারও তুমি তাদের শিখিয়েছিলে, তুমি তাদের জন্য উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিলে, তুমি রাষ্ট্রশাসনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলে। তোমার জাতির আদি সংহিতা তুমিই প্রণয়ন করেছিলে।

"তুমি ছিলে তোমার জাতির উষার দেবতা। তাদের জাতীয় জীবনের উষায় তুমি তাদের যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলে, তাই ছিল তাদের পথ-নির্দ্দেশক। তোমার জাতির পূর্ব্বগগনে তুমি উদয় হয়েছিলে, জাতির পশ্চিম গগনে তুমি অস্ত গিয়েছিলে। তুমি তাদের শিখিয়েছিলে, যে যায়, সে আবার ফিরে আসে। তাই বহুকাল তোমার আশায় পূর্ব্ব দিকচক্রবালের দিকে তারা তাকিয়ে ছিল। তারপর যখন একদিন তাদের দেশের পূর্ব্ব বেলা-ভূমে এসে উপস্থিত হ'ল—তাদের আরাধ্য চিরকাম্য দেবতা নয়—নৃশংস শ্বেতাঙ্গ দস্যু, তখনও কিন্তু তারা সে দস্যুকে তোমারই প্রতিরূপ বলে মনে করেছিল। সেই ভুলের দণ্ড তারা পেয়েছে, তবুও কি তাদের কাছে আর কখনও ফিরে আসবে না ? আসবে, একদিন তোমার জাতি তোমাকে ফিরে পাবে। সমস্ত বিশ্বের সাথে একযোগে সেদিন তারা তোমাকে পাবে।

"হে দেবতা, বহুদূর থেকে তোমার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি। বিশ্বের সুধী সমাজ আজ তোমাকে চিনেছে তাই মেকসিকোর দেবতাকে তারা বরণ করে নিতে সঙ্কুচিত হয় নি।"

এমনি করে আরও বহু প্রাচীন দেব-দেবীর কথা হ'লে পর অধ্যক্ষ বললেন,—"সিলেনাস, এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছ, কোন দৃষ্টিতে আমরা তোমাদের দেখি। তোমাদের আমরা জীবনে বরণ ক'রে নিয়েছি। পরজীবনে কোন সুখভোগের আশায় নয়, ইহজীবনে তোমাদের প্রসাদে ধনদৌলৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশায় নয়। আমরা তোমাদের গ্রহণ করেছি—আমাদের পূর্ব্বজরা তোমাদের আবিষ্কার করেছিল, বিকসিত করেছিল, তাদের জীবনকে মধুময় করার জন্য। তোমরা ছিলে তাদের রসবোধের সৃষ্টি তাদের কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ, তাদের কষ্ট বহুল জীবনে সুখ-সঞ্চারক,

আজও আমরা তোমাদের গ্রহণ কচ্ছি আমাদের রসবোধ দিয়ে, আমাদের কাব্য দৃষ্টি দিয়ে, আমাদের পথ সন্ধানী মন দিয়ে। মানবজাতির সেই ঘোর অন্ধকার দিনে তোমরা যেটুকু আলোর সন্ধান মানব মনকে দিয়েছিলে, তার দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করে মানব এই জ্ঞানালোক উজ্জ্বল যুগে এসে পৌঁছেছে— সেই স্মৃতির কৃতজ্ঞতাও তোমাদের প্রাপ্য।

"মানব তোমাদের পেয়েছিল হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে—তাদের জীবনের সেই স্বপ্নলোকের প্রদোষে। তখনও মানুষ তার বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতিকে জানতে ও বুঝতে পারেনি। তখন তার জীবনপথের একমাত্র অবলম্বন ছিলে তোমরা। তারপর যখন মানব তার নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ বুঝতে লাগল, যখন সে সৃষ্টি রহস্যের কোন একরকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে লাগল, তখন থেকে • রা নিজেদের উপর নির্ভর করতে শিখল। তাই তোমাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলে গেল।

"তারপর এক যুগ আসল সেটা হ'ল সমাজে ও রাষ্ট্রে একাধিপত্যের যুগ। সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্মের চেহারাও বদলে গেল সেখানেও একাধিপত্য সুরু হ'ল। একের বহুত্ব বা বহুর একত্ব স্বীকার করলে রাষ্ট্রের একাধিপত্য টেকে না তাই ধর্ম্মেও তা' স্থান পেতে পারল না। আজ যা Hinotheism বা Pantheism নামে পরিচিত ও ধিক্কৃত, এমনি কিছুই ছিল মানবের আদি ধর্ম্ম, মানব-অন্তর তার নিজের সত্যিকার অভাবের জন্য যা সৃষ্টি করেছিল এবং যা রূপ নিয়েছিল তোমাদের নিয়ে, তা' আস্তে আস্তে লোপ পেল। আজকার মানব আবার তাঁকে খুঁজে পেয়েছে। তাই তোমাদেরও তারা বরণ করে নিয়েছে।"

(গ)

অধ্যক্ষের বাক্যের ভিতর এমন একটা উদ্দীপনা ও প্রেরণা ছিল যে, সবাই যেন মোহাবিষ্টের মত শুনছিল। অধ্যক্ষ যখন থামলেন। তখন সবাইর বদন আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তিতে, নবচেতনা সঞ্চারের উত্তেজনায়, উদ্ভাসিত হ'তে লাগল। কিছু সময় পরে সিলেনাস-ই আবার আরম্ভ করলেন, 'এতক্ষণ তুমি যাঁদের কথা বললে, এঁরা কেউ একছত্র অধিপতি ছিলেন না। কেউ তা' হ'তেও চায নি। আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ হয়ত ছিল, কিন্তু একছত্র আধিপত্যের দাবী আমরা কেউ করি নি। কিন্তু, ঐ যে দেখছ একটু দূরে একখানা পাথর, ওখানা ছিল একজন একছত্র দেবতার আসন। থ্রেসীয়দের মধ্যে গেটাই (Gatai) নামক উপজাতির ছিলেন তিনি সর্ব্বময় দেবতা বা ঈশ্বর। তাঁর নাম ছিল জালমোকসিস। তোমাদের জীবনে সেই একেশ্বরের স্থান কতটুকু, তা বলবে কি ?"

অধ্যক্ষ—"জালমোকসিসের (Zalmoxis) কথা আমরা খুব বেশী কিছু জানিনা। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক প্লেটোর (Plato) পুস্তক হ'তে জানতে পারি যে তিনি পারদর্শী ছিলেন যাদুমন্ত্রে, কতকটা ভয় দেখিয়ে, কতকটা প্রলোভন দেখিয়ে, কতকটা মানবের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রভুত্ব ও প্রভাব স্থায়ী করতে।

"এত সময় যাঁদের কথা বলেছি, তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন দ্বৈত ভুলে যেতে, সর্ব্বত্রই দেব দেখতে। মিশরের কৃষক যে শস্য সে নিজে জন্মাত, যে শস্য সে কেটে ঘরে তুলত, তার মধ্যে দেব দেখত। ইসিস তাকে গম-যব দিয়েছেন। সেই ইসিস গম-যবের গাছে তার প্রতি দানায়, কণায় কণায় লুকিয়ে আছেন। তাই সে শস্য কেটে, ঐ শস্যের মধ্যে নিহিত চেতনাকে— দেবতাকে—সে যে আঘাত করল, তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করত।

"তেমনি প্রতি বৃক্ষে, প্রতি নদ-নদীতে। প্রতি পর্ব্বত শিখরে, প্রতি পশু-পক্ষীতে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, তারকায় প্রকৃতির প্রতি অভিব্যক্তিতে তারা দেবতার দ্যুতি দেখত। সত্য ছিল তাদের নিকট সর্ব্বব্যাপী, তারা জানত দেবতার কোন নির্দ্দেশ বা সীমা নেই। তেমনি সময়ে জালমোকসিস, তুমি বলেছিলে, তুমি ভিন্ন আর কোথাও দেবত্ব নেই, কোথাও সত্য নেই, আর কোথাও মঙ্গল নেই। বিশ্বকে তুমি কামরায় কামরায় ভাগ করে দিলে—প্রথম কামরায় বইলে তুমি একা—একমাত্র সত্য, একমাত্র নিত্য,একমাত্র মঙ্গল এবং আর কোথাও দেবতা নাই, সত্য নাই, মঙ্গল নাই। এই অবশিষ্টকে আবার তুমি নানা শ্রেণীতে ভাগ করলে। যারা তোমায় বিশ্বাস করে, তোমায় মানে, তোমায় পূজা দেয়, তাদের জন্য তুমি ব্যবস্থা করলে কুৎসিত আনন্দ, কুৎসিত সুখ, কুৎসিত বিলাস, আর যারা তোমায় বিশ্বাস করে না, তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নয়—তাদের জন্য বীভৎস শাস্তির ব্যবস্থা করলে। আজকার মানব তোমার সেই দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের প্রলোভন দুয়েরই অতীত।

"আজ মানব জেনেছে, সত্যি যা, মঙ্গল যা, নিত্যকার যা, তা' কোথাও সীমাবদ্ধ নয়, তা' সর্ব্বত্র ছড়িয়ে ও জড়িয়ে আছে। সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে তা-ই, এবং তাতেই বিশ্বের ধর্ম্ম। যখন জ্যোৎস্না-প্লাবিত নীলাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অনন্তের দিকে তাকাই, তখন বিশ্বের যে দেবতা, তাকে খুঁজতে কোন বিশেষ পন্থার অনুসরণ করতে হয় না। যখন পর্ব্বত-শিখর-বাহী স্রোতস্বিনীর সঙ্গে ধেয়ে ধেয়ে সাগরসঙ্গমের দিকে চলতে থাকি, তখন বিশ্বের যে জীবনদাতা, তার সন্ধান পেতে দেরী হয় না। যখন পূর্ব্ব গগনে আলোর ভেলা বেয়ে সূর্য্যদেবকে উদয় হ'তে দেখি এবং তেমনি পশ্চিম গগনে অস্ত যেতে দেখি, যখন দিনের পর দিন দেখি একদিক থেকে উদয় হয়ে একই সূর্য্য অপরদিকে অস্ত যেয়ে আবার অপরদিকে উদয় হয়, তখন একথা বুঝতে দেরী হয় না অমৃত ও মৃত্যু, মঙ্গল ও অমঙ্গল, সত্য ও মিথ্যা, দেবত্ব ও অ-দেবত্বের যে পার্থক্য, তা' নিতান্তই বাহ্যিক ও অবাস্তব। তাই আদিম মানব মঙ্গলের ভিতরও যেমন তার ঈশ্বরকে দেখত তেমনি অমঙ্গলের ভিতরও তার ঈশ্বরকে দেখত। তারা জানত ঋতুরাণী পারসিফোন সারা বৎসর তাদেরই সুখ বিধানে নিযোজিত থাকবে না —এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের গণ্ডীর বাইরে আরও কিছু আছে, দেবতা সেখানেও থাকবে। বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর গণ্ডী টনেও তারা দ্বৈত বুদ্ধিকে চিরস্থায়ী করতে চায় নি। এই ব্যবহারিক জগতের বাইরে কোন দ্বৈত বুদ্ধিকে তারা স্বীকার তাই করত না।

"তেমনি স্থলে তুমি নৃশংস প্রভুর মত, যে তোমাকে না মানবে তার জন্য ব্যবস্থা করলে বীভৎস দণ্ড। তোমার পাওনা এক পাউণ্ড মাংসের শেষ কণাটুকুও তোমার চাই। একদিকে তুমি নিষ্ঠুর

পরদিকে তুমি হিংসুটে—ঈর্ষায় তুমি জর্জ্জর। তোমার নির্দ্দেশ ও আদেশ সম্বন্ধে তর্ক-সংশয়—এতটুকু সন্দেহ—তুমি সহ্য করতে রাজী নও। তেমনি ঈশ্বর দিয়ে আজকার দিনের বিজ্ঞানের যুগের মানবের চলে না। আজ মানুষ জানে প্রতিশ্রুত স্বর্গসুখেরও যেমন কোন মূল্য নেই, তোমার ব্যবস্থিত নরক যন্ত্রণারও কোন ভয় নাই। তাই আজ আর তোমাকে মানতে রাজী নয়।

"আজ মানুষ চায় তেমনি দেবতা, যে তার কাছে কিছু দাবী করবে না—ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে কোন রকমেই কিছু প্রত্যাশা করবে না—অথচ যে বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত জড়িয়ে আছে,—যে রূপে রূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে, যে মানুষের জীবনে প্রীতি দিচ্ছে, বেদনা দিচ্ছে, অনুভূতি দিচ্ছে, প্রেরণা দিচ্ছে, যে মানবকে, ব্যষ্টিকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে রখছে। আজ আমরা যে দেবতাকে মান্‌ছি যে আমার পূজার প্রার্থী নয়, সে আমার দণ্ড ও পুরস্কারদাতা নয়,—অথচ সে আমাকে ও সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে আছে।

"তোমার নিষ্ঠুর দাবীর ফলে মানুষের জীবন থেকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গলময়, সবই সে হারাল, তার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কৃপা-ভিখারী ক্রীতদাসে পরিণত হ'ল। মানব তার দেবতাকে খুঁজে নিয়েছিল তার জীবনের সাথী ও বন্ধু হবার জন্য, তুমি তার কাল হয়ে দাঁড়ালে অত্যাচারী প্রভু।

"মানুষ চেয়েছিল বিশ্বদেবতা, বিশ্ব-প্রভু নয়। সে (Personal God) ব্যক্তিক ঈশ্বর চায় নি সে চেয়েছিল জৈবিক ঈশ্বর (Cosmic god); সে চেয়েছিল তার খেলার সহচর, তার শ্রমের বন্ধু, তার দুঃখের ভাগী, তার সুখের সাথী,—নিষ্ঠুর খেয়ালী প্রভু সে চায় নি। বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক কি লিখেছেন জান "The gods of the Iliad are men, beautiful mighty and vicious. I understand them I like them or dislike them, even when I dislike them I love them তারপর তোমার মত ব্যক্তিক একেশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, " is an old Jew—a maniac—a monomaniac, a raging mad man—who spends his time in growling and hurling threats I don't understand him—I don't love him His perpetual curses make my head ache and his savagery fills me with horror He is a lunatic—who thinks himself judge, public prosecutor and executioner rolled into one " (R Rolland)

"তোমার নিষ্ঠুর দণ্ডের ভয় ও তোমার কুৎসিত ও অতি নিম্নস্তরের পুরস্কারের প্রলোভন মানুষের জীবন থেকে কাব্যকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, সৌন্দর্য্যকে কেড়ে নিয়েছে, মঙ্গলকে ডুবিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানকে অস্বীকার করেছে। তাই যুগে যুগে, দেশে দেশে, যত কবি, যত প্রেমিক, যত জ্ঞানী-দার্শনিক,—সবাই তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। তোমাকে ও তোমার বিধানকে লঙ্ঘন করেই, তাদের প্রতিভাকে তারা ফুটিয়ে তুলেছে। তাই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো তোমাকে যাদুবিদ্যাবিশারদ বলেছেন।

"যেদিন মানুষ তার সহজদৃষ্টি হারাচ্ছিল অথচ তার বিজ্ঞান ও দর্শনকেও সে গড়ে তুলতে পারে নি সেদিন তারা চেয়েছিল একজন নির্ম্মম শাসক যে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে সবাইকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। গোধূলির সময় গোষ্ঠ প্রত্যাগত গৃহপালিত পশুর ন্যায়—তাদের একজন রাখালের প্রয়োজন তখন ছিল, সে প্রয়োজন যেমন ছিল তার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় তেমনি ছিল, তার ধর্ম্মে। কিন্তু আজ মানুষ তার সত্তাকে জেনেছে, তার বিশ্বকে চিনেছে, বহি প্রকৃতিকে সে জয় করেছে—আর তারই ফলে সে তার কাব্যকে ফিরে পিয়েছে, তার শিব ও সুন্দরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গড়ে তুলছে। সে আজ পুনর্লব্ধ কাব্যদৃষ্টিতে দেখছে তার দেবতা ও সে আজ অভিন্ন—তাই সে বলতে পারছে I celebrate myself and sing myself.

"সে আজ মৃত্যুর ভয়কে এড়িয়েছে—তাই সে আজ তোমার ভয়কেও সে এড়িয়েছে—সে আজ আর তোমার দাস নয়, সে আজ জয়ী—আত্মপ্রভু।

Oh while I live to be the ruler of life—not a slave
To meet life as a powerful conqueror "

প্রাচীন ঋষি লাওটজের শিক্ষা,—আমরা মরব কিন্তু ধ্বংস হব না—আবার আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠছে, তাই আজকার কবি বলতে পারছেন ঃ

"For not life's joys alone I sing, repeating
the joy of death !
The beautiful touch of Death soothing and
benumbing

"জালমোকসিস, মানবের আজকার জীবনে তোমার স্থান নাই। আমরা বিশ্বদেবতাকে (Cosmic god) মানতে পারি, আমার নিজ সত্তাকে (the self) মানতে পারি, আমরা অজ্ঞেয় অনির্দ্দিষ্টকে (the absolute) মানতে পারি। আমাদের প্রেমের দেবতা বা সখাকে মানতে পারি, আমাদের কাব্যের বা সৌন্দর্য্যের দেবতাকে মানতে পারি, যে মানবজীবনকে মধুময় ও রঙ্গীন করে তুলবে। কিন্তু আজকার জীবনে ব্যক্তিক ঈশ্বর—যে ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, আমার বশ্যতা ও পূজা আদায় করবে, যে বিশ্বের একাংশকে চির-অন্ধকারে, চির-অমঙ্গলে, চির-অজ্ঞানে, অনন্তকালের জন্য বীভৎস শাস্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে এবং অপর অংশকে অতি কুৎসিত ও কদর্য্য দৈহিক বিলাসে ডুবিয়ে রাখবে- তেমন ঈশ্বরের প্রয়োজন আজকার মানুষের আর নেই।

"আজ মানুষ জেনেছে তার দেবতা তার সঙ্গে ও বিশ্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আছে। সমস্ত বিশ্বময়—যেখানে যা কিছু আছে—সমস্ত মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ, সুখ-দুঃখ সবাইর মধ্যেই তার দেবতা আছে।"

"জালমোকসিস, ঐ দেখ বাইরে বর্ষার বারিধারায় সমস্ত প্রকৃতি স্নিগ্ধ হ'যে ফুটে আছে, সে তার পরিপূর্ণ যৌবনকে সাজিয়ে রাখছে, শরতের প্রাচুর্য্যে ও সাফল্যে সে তার সাফল্য পাবে। আর তার মধ্যে মানুষ তার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর হেমন্তের স্নিগ্ধ স্পর্শ এসে প্রকৃতিকে জানিয়ে দেবে শীতের নিষুতি পুরীতে তার সমস্ত সবুজকে ও প্রাচুর্য্যকে সঙ্কুচিত করে রাখতে হবে। দেখতে দেখতে তার সমস্ত সংযোজনা ও প্রাচুর্য্য ঘুমিয়ে পড়বে। মানুষ তার নিজের দেবতাকেও তখন ঘুমন্ত দেখবে। তারপর বসন্ত তার পিকবধূর আহ্বানে যখন দুরন্ত বেশে মানবের মনকে ও প্রকৃতিকে নাচিয়ে তুলবে, সেই উদ্দাম দুরন্তপনার মধ্যেও মানুষ তার দেবতাকেই দেখতে পায়। মানুষ আজ জেনেছে যে দেবতাকে সে একদিন প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে তার সাথী ও সঙ্গী হ'বে বলে গড়েছিল, সেই দেবতা কোন ফাঁকে তার প্রভু হয়ে বসেছিল। সে আজ বুঝেছে তার দেবতা তার অন্তরের সৃষ্টি, কিন্তু সে তার দেবতার সৃষ্টি নয়,—যেমন কবি তার অন্তর থেকে কাব্য-দেবীকে সৃষ্টি করে, যেমন শিল্পী তার হৃদয়কে নিংড়িয়ে তার শিল্প-বাণীকে সৃষ্টি করে—আর তার নিজের সৃষ্টিকে অবলম্বন করেই তার অন্তর ফুটে উঠে, তার সৃষ্টিশক্তি সার্থকতা লাভ করে, সে শান্তি পায় ও জগতের শান্তি বিধান করে। মানুষের কাছে দেবতাও একদিন তাই ছিল। তার অন্তরের কাব্য, শিল্প, সৌন্দর্য্যবোধ, মনীষা সব একদিন সার্থক হয়েছিল, তার সৃষ্ট দেবতাকে অবলম্বন করে।

"কিন্তু আজ একদিকে মানুষ প্রকৃতির উপর জয়ী হয়েছে—তার ফলে তার জ্ঞানভাণ্ডার আজ পূর্ণতর হয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা মানুষকে তার সার্থকতা ও শান্তির নূতনতর পন্থা জানিয়ে দিয়েছে। তার পুরাতন সৃষ্টির মধ্যে আজকার মানব তার উন্নত শিল্পকলা, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার উন্নত রসবোধকে তৃপ্তি দিতে পারে, এমন যা কিছু পাচ্ছে, তা সাদরে গ্রহণ কচ্ছে।" কিন্তু জালমোকসিস তোমার ব্যক্তিক ঈশ্বরত্বের অভিমানে ও দাবীতে, তুমি প্রথম থেকেই মানব-মনের এই সব বৃত্তিগুলিকে নিরোধ ও অস্বীকার করেই চলেছ। তাই আজকার মানব তোমাকে গ্রহণ করতে পারে না। তার জীবনের যা কিছু প্রিয়—তার জ্ঞান, তার রসবোধ, তার শিল্পকলা, তার প্রেম ও প্রীতিকে—বিসর্জ্জন দিয়ে তোমাকে সে গ্রহণ করতে রাজী নয়।

"হে অভিমানী ঈশ্বর—তোমাকে আজ আমরা বরণ করতে পাচ্ছি না। হে মানুষের অজ্ঞানের প্রভু আজ আমাদের জীবনে তোমার প্রয়োজন নেই।"

সত্যমপ্রিয়ম্

শ্রীরাধারাণী দেবী

একদা পুরুষ কুসুমকোমলা নারীর অঙ্গে
কুসুম আভরণের শোভায় হয়েছিল বিমুগ্ধ।
সেদিন কাননের সমস্ত ফুল নির্মূল করে নারী
সযত্নে সাজিয়েছিল আপনার কবরী, কণ্ঠ, প্রকোষ্ঠ।
স্পর্শঅসহিষ্ণু পুষ্পদামের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যবিলাসে
আজ বিরাগ এসেছে পুরুষের।
চন্দন পত্রলেখায় হয়েছে এখন অরুচি।
একালের নারী তাই রতির কুসুমসজ্জার আদর্শ ত্যাগ করে
রুদ্রাণীর রুদ্রাক্ষমাল্য তুলে নিয়েছে কণ্ঠে।
অঙ্গে নেই তার লোধ্ররেণুর অঙ্গরাগ।
সাড়ম্বর সালঙ্কৃত রূপের চেয়ে নারীর নিরাভরণ সৌন্দর্য্যেই
নবযুগের পুরুষের অভিরুচি।
নর্ম্মসহচরী অপেক্ষা কর্ম্মসহচরীর প্রতিই তাদের অভিলাষ।

পুরুষ যুগে যুগে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে
জীবনের গতিবেগে সম্মুখের অভিমুখে।
নব নব সৃষ্টির আনন্দে, নব নব আবিষ্কারের গৌরবে।
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে,
বিধাতার সৃষ্টির পাশাপাশিই রচিত হয়ে চলেছে
পুরুষের সৃষ্টি গৌরব।
মস্তিষ্ক তার সুসার্থক, বীর্য্য তার বিশ্বজয়ী, শক্তি তার সীমাহীন
জ্ঞান তার জ্যোতির্ম্ময়।
আজ অন্ধ অজ্ঞান নারী কেবলমাত্র
দেহ, মন ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিলাসে,
প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর্য্যবান পুরুষের
মনোহরণে অসমর্থ।

আজকের যুগে পুরুষ চায়
নারীর মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ, স্বকীয়তার অস্তিত্ব,
জ্ঞানের দীপ্তি, শক্তির সজীবতা।

অন্ধকার গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো নারী
প্রখর দিবালোকে পৃথিবীর উদার অঙ্গনে।
ধেয়ে ছুটে চললো পুরুষের অধিকারে আপনার দাবী জানাতে।
বললো, আমরা স্বাধীনা, আমরা মানবনা পুরুষকে।
হবো না মা, হবো না পত্নী।
স্বার্থপর পুরুষ জাতি এতকাল ভুলিয়েছে আমাদের

আনন্দে নবযুগের নবীনেরা এগিয়ে এলো
এই নারীদেরই সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে।
বললে,—হাঁ, এদেরই তো চাই।
এরাই এই নবযুগের অগ্রদূতী, আমাদের মানসী।
বর্ত্তমান যুগে যে সকল আধুনিকাদের
আমরা দেখতে পাচ্ছি শক্তিমতীরূপে,
বিশ্বের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যাঁরা
জীবনের নানাবিচিত্র দ্বন্দ্বস্থলে দেখা দিচ্ছেন
পুরুষেরই পাশাপাশি,—
রাষ্ট্রিক আন্দোলনে, সামাজিক আন্দোলনে,
শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন আন্দোলনে যাঁরা
এগিয়ে এসেছেন স্বাধীনারূপে
মনুষ্যত্বের সহজ অধিকার গ্রহণ করে,—
তাঁদেরও এই দৃপ্ত ও মুক্ত নবজীবনের পশ্চাতে আছে
পুরুষেরই একান্ত অভিপ্রায়, পুরুষেরই প্রয়োজনের নির্দ্দেশ
নবযুগের যুবা আজ নারীকে কেবলমাত্র
গৃহপ্রাঙ্গণ-সীমাতেই লাভ করতে চান্‌না,
রণ-অঙ্গনেও পেতে চান্ তাকে নির্ভীক পার্শ্ববর্ত্তিনী রূপে।

রুচি নেই এখন নির্জ্জীব, দুর্ব্বলা, পরনির্ভরশীলাতে।
তাদের বাঞ্ছিতা,—আত্মপ্রত্যয়মতী, দৃঢ়চিত্তা, সবলানারী
মনুষ্যত্ব যাঁর জড়তায় সুষুপ্ত নয়।

বিগত যুগের প্রাচীনা প্রপিতামহী এবং
বর্ত্তমান যুগের আধুনিকা প্রপৌত্রীর মধ্যে
কর্ম্মে ও রূপে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন,
মূল মনস্তত্ত্বে বৈপরীত্য ঘটেনি আজও।
সে মনস্তত্ত্ব অবচেতন চিত্তের অতলতলে
একই ধারায় সক্রিয় রয়েছে।
মূলতঃ পুরুষের মনোহরণ প্রবৃত্তি নারীর জীবনে
যতদিন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে
বড়ো স্থান অধিকার করে থাকবে,
ততদিন তার স্বাধীনতার উপায় নেই।

মেয়েদের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে,
আধুনিক পুরুষেরা যেমন মেয়ে চায়
আধুনিকা মেয়েরা তাই-ই হয়ে উঠছে মাত্র
তারচেয়ে এতটুকু অন্য কিছু নয়।
কিন্তু চিরকাল কি এমনিই চলবে?
পুরুষ নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ব লাভ
কোনও দিনই কি নারীর সম্ভব হবে না?

জীবনটা বড্ড ছোট

(১)

শ্রীবীণা দাশ

আমি অন্ততঃ আমার সবটা আমার জীবনটার ছোট্ট পরিধির মধ্যে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিনা। আমার কত ইচ্ছা, কত কামনা, কত উচ্চ অভীপ্সা, কত গভীর কর্ত্তব্য বুদ্ধি তারা আমাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করছে, আমার প্রতিটি মুহূর্ত্ত গ্রাস করে ফেলছে, আমাকে রেহাই দেয়না, বিশ্রাম দেয়না। আবার কত ছোট খাট সাধ, কত মৃদু অস্ফুট অভিলাষ, কত ক্ষীণ দুর্ব্বল আকাঙ্ক্ষা আমার কানে কানে অহরহ তাদের দাবী জানায়, অতি করুণ সুরে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্জ্জি পেশ করে—সেগুলিকে এড়িয়ে চলাও আমার পক্ষে খুব সহজ হয়না। কেমন করে যে মানুষ তার সসীম জীবনের সঙ্গে তার অসীম আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে চলে, কেমন করে সে তার অফুরন্ত ইচ্ছাকে জীবনের এই নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র দিনের মধ্যে ভরে নিতে পারে, সেইটাই হয়ে উঠেছে আমার আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেক তো ভাবলাম, কিছুতেই কোনও উপায় দেখতে পেলাম না। যত বেশী ভেবেছি তত মনে হয়েছে দোষ আমার নয়, দোষ আমার পারিপার্শ্বিকের নয়—দোষ জীবনের, এত ছোট হওয়া তার কোনও মতেই উচিত হয় নি। আর জীবন যদি এত ছোটই হয় তার চারিদিকে এত সহস্র পথের ইঙ্গিত, এত অজস্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ, এতবড় বিপুল জ্ঞানের সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী প্রসারতা থাকা—অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। আর আমার মনে হয় আমি এই নিয়ে যা কিছু ভেবেছি সবটুকু যদি ঠিক মত আপনাদের সামনে মেলে ধরতে পারি আপনারা সবাই আমার মতে মত দেবেন—অনেকের অনেক দুঃখ দূর হয়ে যাবে, অনেক বেদনা বোধ স্বচ্ছ হয়ে যাবে—সকলে বুঝবেন তাদের অনেক কর্ত্তব্যের বিচ্যুতি, অনেক আকাঙ্ক্ষার দুস্ফুরণ, অনেক সাধনার অসিদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়—কেবল এই একটি মাত্র ব্যাপার "জীবনটা কত ছোট"।

লোকের যাতে ভুল ধারণা না হয় তাই বলে রাখি আমি একজন সাধারণ মানুষ, অতিমানুষ হওয়ার গৌরব যেমন আমি করতে পারি না, অমানুষ হওয়ার বঞ্চনার হাত থেকেও আমি মুক্ত। সাধারণ মানুষ। সাধারণ, অতিসাধারণ দোষগুণ, ত্রুটি বিচ্যুতি, ভালোমন্দ নিয়েই আমি জন্মেছি। বিপুল সম্ভাব্যতা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকেনি, আবার দীপ্তিহীন নগণ্যতার মাঝে তলিয়ে যাবার জন্যও আমি সৃষ্ট হয় নি। শক্তি খুব বেশী নাহোক মস্ত বড় আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার দুঃসাহস আমার আছে। বিশেষ কোনও অবদান, বিশেষ কোনও ক্ষেত্র, আমার জন্য শুধু আমারই জন্য অপেক্ষা করে যদি নাও থাকে, পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত এগিয়ে যাবার আহ্বান আছে আমার রক্তে, আমার আকাঙ্ক্ষায়। কেবলমাত্র "রুটি" খেয়ে বেঁচে থাকতে, যারা পারে না, আমি তাদেরই

একজন। আমাব ভালোলাগার জিনিষ বহু, আমার অন্তরের ক্ষুধার জন্য প্রযোজন অনেক। এ· আমি, এ হেন আমি আজ পৃথিবী থেকে চলে যাবাব সময—আজ যখন আমার যৌবনের শেষ রশ্মি আমাব দিগন্তকে করুণ করে তুলেছে—সেই ম্লান আলোর দিকে চেযে চেয়ে আমাব শেষ কথা বলে যাচ্ছি "জীবন, তুমি বড ছোট ? তোমার মধ্যে আমার গ্রহণ করার ছিল অনেক, কত কামনা তুমি আমার মধ্যে জাগিযেছিলে, কত আকাঙ্ক্ষা তুমি আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত কবে তুলেছিলে। মিটল না কিছুই, পূর্ণ হল না কোনও সাধ। তোমার আঁচল ভবা মণিমুক্তার প্রত্যেকটি হাতে তুলে দেখাব সময়ই আমার হ'লনা, অথচ তাই দি:য মালা গেঁথে নিজেকে সাজাবার স্বাধীনতা তুমি আমায দিযেছিলে। বন্ধু! আবাব তোমাব সঙ্গে দেখা হ'বে কিনা জানি না। যদি হযও এত ব্যস্ত হযে তুমি এসনা, এমন কবে ধরা দিতে না দিতে তুমি পালিযে যেওনা। তোমাকে যদি পাই যেন আবও একটু বেশী সময পাই। এমন বুক ভরা ক্ষোভ এতবড একান্ত অতৃপ্তি নিযে যেন তোমায় বিদায দিতে না হয"।

জীবনের প্রথম বারোটা বছর আমি সব সময বাদ দিয়ে বাখি। কারণ তখনও তো আমি আত্ম-সচেতন হযে উঠিনি, সে দিনগুলির অপচয যদি আমি কবেও থাকি তাব জন্য দাযী আমি নই। কিন্তু তাবপর যেদিন থেকে আমাব জীবনেব কিছুটা ভার আমাব উপব এসে পড়ল,যেদিন থেকে আপন ইচ্ছামত, রুচি মত, কিছু পবিমাণে দিনগুলিব বিধি ব্যবস্থা কবার অধিকাব আমি পেলাম—সেইদিন থেকেই আমার আবম্ভ হযেছে এই সময নিযে কাডাকাডি টানাটানিব অভাব আর অকুলান। প্রথমেই বলেছি প্রতিভাশালিনী আমি নই, একটা খুব অসাধাবণ ধবণেব বহুমুখীনতাও আমাব নেই। তাইতো বলি আমাব সমযেব বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সে অভিযোগ মানব সাধারণের, আমার যে সমস্যা সে সমস্যা সার্ব্বজনীন।—আমার স্বাধিকারেব যুগেব প্রথম যে কথা মনে পড়ে সে হচ্ছে আমার বই পডার কথা, বই পডতে প্রথম থেকেই বড ভালবাসতাম। এখনও বাসি, কিন্তু বড় দুঃখ হয ভাবতে বই পডাব সময আমার হয না। আমাব ভালো লাগে সাহিত্য পডতে—ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত। আব ভালবাসি ইতিহাস, ভালবাসি রাজনীতি সংক্রান্ত বই। কিন্তু শুধু ইংবেজী সাহিত্যের আধুনিকতম বইগুলির প্রতি যদি সত্যিকাবের মনোনিবেশ করতে যাই, সেগুলির প্রত্যেকটি পডাব ইচ্ছা যদি কবি তাহলে আমার সংসাবে কোনও কাজই করা হবে না। "আমার চুল বাঁধা হবে না, আমার রান্না করা হবে না—আমার হবেনা আবও কত কি"।

অথচ খুব আস্তে বই যে পড়ি তাও তো নয়। গল্পের বই ঘণ্টায পঞ্চাশ পাতা পড়তে পারি Serious বই—তিরিশ পাতা। মনে পড়ে আমাদেব কলেজেব Libraryতে শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাসের মোটা মোটা বইগুলিব দিকে বিস্ময়ভরা চোখে বহুবার তাকিয়ে দেখেছি, আর মনে মনে হিসাব করে দেখেছি—কতদিন কত ঘণ্টা কতখানি করে পড়লে বইগুলি সব শেষ করা সম্ভব হয়। আজ জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িযেছি,—কত না-পড়া বই আমাকে পিছন থেকে ডাকছে, কত লোভনীয় মলাট আরও লোভনীয় নাম নিয়ে আমায প্রলুব্ধ করছে, বলছে, "আমাদের তুমি হাতে তুলে নাও

আমাদের বুকভরা অমৃত তুমি পান কর।" এই তো গেল শুধু বইয়ের কথা। তারপর প্রকৃতির ভাব, প্রকৃতির আমন্ত্রণ আমাকে কেমন করে যে আচ্ছন্ন করে তোলে কি ভাবে যে ব্যাকুল করে তোলে, সে খবর শুধু আমিই জানি। আমিই জানি কত ভালোলাগে আমার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তারা গুণতে। আমার ভাল লাগে নদীর ধারে অন্ধকারে বসে বাঁশী বাজাতে, আমার ভাল লাগে রাশি রাশি ফুল নিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে, খেলা করতে। কিন্তু সময় কই? আমাকে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়, আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁচতে হয়। আমার সময়ের প্রতি নিমেষ, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল বাঁধা দিয়েছি সংসারের দাবী মেটাতে। আমি চাই মানুষের দুঃখ দূর করতে। আমি চাই মানুষের বেদনার প্রতিবিধান করতে। মানুষ বড় মূঢ়, বড় দুর্ব্বল, তাদের মূঢ়তা আর দুর্ব্বলতা যে সব জটিলতা, কদর্য্যতার অন্ধকার সৃষ্টি করে চলেছে, আমার এই মূঢ় দুর্ব্বল হাতেই সে সব সহজ করে সুন্দর করে তোলার ভার আমি নিয়েছি। এই আমার স্পর্দ্ধা, এই আমার গৌরব, এই আমার 'আমি'ত্ব। শুধু ওরই দোহাই দিয়ে সব কিছু আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। এ ছাড়া অন্যদিকে যদি বেশী মন দিই নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী লাগে। অথচ এও আমি জানি আমার মনের স্বাভাবিক প্রবণতা অন্যদিকেও আছে—খুব বেশী করেই আছে। অনেকে আমায় বলে, "তুমি একটু আধটু লিখতে পার, লেখা পড়ার সাধনা কর।" কিন্তু জ্ঞান বড় কঠোর তপস্বী, তার কাছে আমার জীবনটাকে বাঁধা দিতে আমি পারব না। তার হাতে একবার নিজেকে ধরা দিলে আমার জীবন শুকিয়ে যাবে, সেখানে ফুল ফুটবেনা, পাখী গান গাইবেনা। আমি চাই জীবনে সরসতা। আমার ভাল লাগে প্রিয়জনের কাছে বসে পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল গল্প করে কাটিয়ে দিতে—শুধু গল্প করতে ভালোলাগে বলে গল্প করতে—শুধু যার সঙ্গে গল্প করছি তাকে ভালোলাগে বলে গল্প করতে—সেই যে কা'রা বলেছিল "তারা সূর্য্যকেও ক্লান্ত করে তুলেছিল তাদের একটানা কথা দিয়ে"—ঠিক তাদের মতন। এ ছাড়া আমার আরও ভালোলাগে কল্পনার রঙ্গীন নৌকায় পাল তুলে দিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে, ভেসে যেতে অনেক দূরে—সুদূরে—জীবন মরণ সব ছাড়িয়ে। সময়ের আধিপত্য সেখানে নেই—ঘড়ির ঘণ্টা সেখানে শোনা যায় না। এত কিছু চাই বলেই আমি পেলাম না। মরণের ঘুম যখন দুচোখ ভরে নেমে আসছে তখনও জীবনের অপরূপ রূপের দিকে শেষবারের মতন তাকিয়ে শেষ অনুযোগ আজ করে যাচ্ছি—

"জীবন, তুমি বড় ছোট"।

এ জীবনটা বড্ড বড়

(২)

শ্রীবীণা দাশ

"মনে হয় এ জীবন বড় বেশী আছে
যত বড়, তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন।"

আমি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—কত দীর্ঘ পথই না অতিক্রম করে এসেছি।—আমার পথ-চলার কী প্রকাণ্ড ইতিহাস। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কত দুঃখ, কত সুখ, কত শ্রান্তি, কত ধূলিধূসর বিষণ্ণ অবসাদ।—কবে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম, "কোন সে ঊষার আলোকরথে"—আজ ভাল করে মনেও পড়েনা। অথচ আজও পথের কোন শেষই দেখতে পাইনা, এখনও আমার আকাশে সন্ধ্যার নিবিড়তা ঘনিয়ে আসার বহু দেরী, এখনও আমার জীবনে মধ্যাহ্নের প্রখরতা। বয়সের হিসাবে, আমি এখনও দুয়ের কোঠারও সবটুকু অতিক্রম করিনি —বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হন আমার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য দেখে, গণৎকার গুণে বলে আয়ু আমার দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু বুক যে আমার কেঁপে ওঠে। কি করব আমি আমার এই দীর্ঘ জীবন নিয়ে? পথের মাঝখানেই আজ বসে পড়েছি, পায়ে আমার শক্তি নেই এগিয়ে চলার, দৃষ্টিতে আমার শূন্যতার অবসাদ। আমি আমার কাছে ফুরিয়ে গিয়েছি। আমাকে আমার আর ভালোলাগে না। আজ আমার একটি মাত্র প্রশ্ন একটি মাত্র ব্যাথা, একটি মাত্র অভিযোগ "জীবনটা বড্ড বড়, এত বড় কেন?"—আর কিছুদিন আগেও যদি জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিতে পারতাম—জীবনকে আমি বিদায় দিতাম অশ্রুভরা চোখ নিয়ে, সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণ নিয়ে। জীবনকে ভালোবসিনি তাতো নয়। আমায় সে অনেক কিছু দিয়েছে। বড় সাধ ছিল আমার সেই ভরা পাত্রখানি মরণের হাতে হাসিমুখে তুলে দেব। কিন্তু একে একে পাত্র আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে বসেছে। কিন্তু পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যের জোয়ারের পরে এল শূন্যতার রিক্ততার ভাটা। নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে নিজেই সময় সময় চমকে যাই। সেদিনের স্মৃতি আজও বুকে শিহরণ আনে, আজও ক্ষণিকের জন্য জীবনটাকে মধুময় বলে ভুল করায়—ঠোঁটের কোণে আসে হাসি, চোখের কোণে স্বপ্ন। মনে পড়ে শৈশবের কৈশোরের সেই দিনগুলি—মা বাবা ভাইবোন প্রিয়পরিজন দিয়ে ঘেরা আমাদের সুখের সংসার। সেখানে ছিল আশ্রয়, ছিল আরাম, ছিল উল্লাস, ছিল পরম নির্ভরতায় ভরা স্নেহের প্রশ্রয়ে লালিত নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা। সেই সুনিশ্চিত কক্ষপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে জীবনকে একদিন উল্কার মত বেরিয়ে পড়তে হ'ল।—আজ আর সেখানে ফেরা যায় না, সেই ছোট্ট আবেষ্টনী আজ আর জীবনকে ধারণ করতে চায় না।

তারপর প্রথম যৌবনের সেই রঙ্গীন, উজ্জ্বল, উত্তপ্ত দিনগুলি। আজ অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, ভালো সেদিন বন্ধুদের বাসতাম কি করে? মানুষকে মানুষের অতখানি ভালো লাগাও সম্ভব হ'তে পেরেছে ভেবে, আজ আমার আশ্চার্য্য লাগে! আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে সেদিন কি করে অত আশা করতে পারতাম, অত বড় আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পোষণ করতে পারতাম অত বিশ্বাস, অত স্পর্দ্ধা, অত উৎসাহ, আমার ছিল কি করে? তারপরের ইতিহাস, কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। নিষ্ঠুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থা। তবু দুঃখের রক্তটীকা ললাটে এঁকে নিয়ে পরাজয়ের প্রকাণ্ড গ্লানি মাথায় তুলে নিয়েও সেদিনও আমি মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিনও আমার হৃদয়ে ভরে ছিল পরম পরিপূর্ণতার আনন্দে, সুগভীর পরিতৃপ্তির প্রসন্নতায়।

—তারপর? তারপরই আরম্ভ হ'ল এই বৈচিত্র্যহীন আগ্রহহীন—নিরুৎসুক নিতান্ত অকেজো দিনগুলির ক্রমাগত আসা-যাওয়া। আমার জীবনের উপন্যাসের এই পরিশিষ্টটুকু একেবারেই বাজে। আমার জীবননাট্যের পিছনে যদি নাট্যকার কেউ থাকেন তাঁর রসজ্ঞানকে আমি প্রশংসা করতে পারছিনা। সুখের দিনের উৎসবের বাতি সবই একে একে নিভে গেল—সেই অন্ধকারের মধ্যে একা বসে বসে আমার আজ কেবলই কান্না পায়। দুঃখের চিতায় আমার যা কিছু শ্রেয়ো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু লোভনীয় সবই আমি একে একে তুলে দিয়েছি, এই শ্মশানের শূন্যতায় আরও কতদিন আমি বসে থাকব? আরও কতদিন?—আমি জানি জীবনের কাছে আর আমার কিছু পাবার নেই—তার সবটুকু মূর্ত্তি আমি দেখে নিয়েছি—এত বেশী দেখেছি যে মনে হয় অতখানি না দেখলে না জানলেই বুঝি হ'ত ভাল! সে আমায় কোনও নূতনত্ব কোনও বৈচিত্র্য দিয়েই আর ভোলাতে পারছে না। তাই তার কাছে এবার আমি ছুটি চাই। আর কিছু নয়, শুধু একটুখানি ঘুরিয়ে যাওয়া, একটুখানি অবসান, একটুখানি সমাপ্তি!—বাস্তবিক কোনও কিছুই করতে আমার ভালো লাগে না আনন্দ পাই না। —"দ্বিতীয়বার শোনা গল্পর" মতই সবকিছু আমার কাছে আজ নীরস, অর্থশূন্য। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলাম সেদিন যেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তেও আমার আর ভালো লাগলনা।—জীবন যদি এত দীর্ঘই হয় তার মত প্রচুর, বিচিত্র, অফুরন্ত আয়োজনও বিশ্বে থাকা দরকার। কিন্তু আছে কি?—আমি সন্দেহ করছি—আমি বিশ্বের দরবারে আমার challenge জানিয়ে যাচ্ছি!
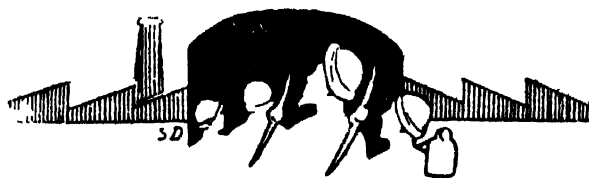
ডায়েরীর ছিন্ন পত্র

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

চায়ের পর্ব্ব শেষ হলো। একটি পুরাতন আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে লিখছি। লজ্জার বালাই নেই, কারণ আমার ডায়েরী লেখার বাতিকের কথা এরা সবাই জানে। সামনে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ মাঠ। শুধু সবুজ হলেও রঙে বৈচিত্র্য আছে। কোথাও গাঢ়, কোথাও বা হাল্কা, উজ্জ্বল—মাঝে মাঝে খোঁড়া মাটি আর বড় বড় গাছের কালোটে ভাব। পূব-দক্ষিণের দিঙ্‌মণ্ডলটিতে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষ শ্রেণীর কিনারা। একজন স্থানীয় ভদ্রলোক আমাদের দেখতে এসেছেন। বয়সে প্রবীণ হলেও তাঁর চলন ও বলন হচ্ছে গ্যালাণ্ট। আমার স্ত্রী রমাকে উদ্দেশ্য করেই বোধ-করি পাশের আলোকচিত্র-শিল্পী শিবনাথকে উচ্চকণ্ঠে বোঝাচ্ছেন যে দূরের বঙ্কিম রূপালি রেখাটি হচ্ছে গোরাই নদী। সহরবাসী লোক কথায় প্রবীণ হলেও ভৌগোলিক জ্ঞানে কাঁচা হয়। প্রবল বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন উত্থিত হলো—"বলেন কী মশাই, যে নদী পথে এলাম সেত এদিকে।" শিল্পীবর অঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন পাশ্চাৎভাগে অর্থাৎ আমার দিকে। আমি কটাক্ষে ব্যঙ্গ করবার সুযোগ পেলে বড় একটা ছাড়ি না, বল্লাম—"তার মানে বেঁকে গেছে।" এত সহজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই বোধকরি বৃদ্ধ উৎসাহিত হয়ে সুরু করলেন—"নদী ক্রমেই এগিয়ে আসছে মাটি খেয়ে খেয়ে—একি আজকের বাড়ী।"

বাড়ীটি শুনেছিলাম এক কালে কোন দুর্দ্দান্ত ইংরাজ নীল-ব্যবসায়ীর কুঠি ছিল। কিংবদন্তী শোনবার জন্যে কান খাড়া রাখলাম। পাকা গল্পকারেরা কথার পিছনে একটা রেশ দিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করে। এও তাই।

একটু গুছিয়ে বসে সুরু করলেন—"সে ছিল একদিন যখন পাল্টা জবাব দিতে পারতো বাঙ্গালী জমিদাররা। সেদিন কি আর আছে দাদা—লাঠালাঠি খুনোখুনি লেগেই ছিল। আমারই জ্ঞানতঃ এ বেটারা ঐ ঘরের মধ্যে বাবুদের নায়েবকে পুরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল্লে—বাস্ আর রক্ষে আছে—পরদিনই সাহেবদের লেঠেল সর্দ্দারের কাটা মুণ্ড—"

রমা আতঙ্কব্যঞ্জক শব্দের সঙ্গে 'বাবা' স্মরণ করে জড়সড় হয়ে বসলো। আমার অপাঙ্গে ভর্ৎসনা গ্রাহ্যই করলো না। তার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট অধ্যাপক বন্ধুবর স্বর্ণকান্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে আপন মনে ঠোঁট চাটছিল। মানসিক উত্তেজনার সময় ঠোঁট চাটা ছিল তার মুদ্রাদোষ। সহসা উদ্দীপিত হয়ে বলে উঠলো সে—"এখানে একটা পুকুর ছিল—"

বৃদ্ধ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ কত গরীব মানুষের দেহ যে ওর মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই—"

স্বর্ণকান্ত অতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, বল্লে—"সে গল্প রাত্রে হবে এখন।" বুঝলাম প্রবীণ ভদ্র ব্যক্তিটি স্থানীয় লোক হিসাবে বিশেষজ্ঞ বিবেচিত হলেও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ গল্পের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্স-এর পরিবেশন করে উঠতে পারছিলেন না বলে বন্ধুবর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

এই মনোরম জায়গাটি হচ্ছে স্বর্ণকান্তের মামার বাড়ীর দেশ। অনেক রঙ বেরঙের স্মৃতি সম্ভারে সমৃদ্ধ। বহু স্মরণীয় আনন্দময় ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত। শৈশবের অতিরঞ্জিত স্মৃতি পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট চক্ষুর সামনে মর্য্যাদা হারাতে বাধ্য। কিন্তু বন্ধুবর আমাদের চির নবীন। এখনও রূপকথার মত আষাঢে কাহিনী শুনতে ভাল বাসেন, এই বুড়ো বয়সেও ভূত প্রেতের গল্পে ওর রোমাঞ্চ হয়, সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা দেখে আত্মহারা হয়ে যান।

এই দেশটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় এই প্রথম। কিন্তু এই প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আর নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ শাখা প্রশাখার মধ্যে অশরীরী শক্তিনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বহু পূর্ব্বে বন্ধুবরের গল্পের মধ্যে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কথা, অসম সাহসিক ছোটমামার কাণ্ড কারখানার সংবাদ অনেক শুনেছি। দেখলাম রাত্রের অন্ধকারে আসাই ছিল ভাল। তাহলে ধারণা আর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিসংবাদ এতখানি প্রকট হ'ত না। নৌকায় বসে ভেবেছিলাম প্রভাত উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেখবো ভয়াবহ শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দেখলাম মখমল-মসৃণ তৃণ-খচিত প্রান্তর, বিরাট মৃত্তিকা প্রাকারে অসংখ্য রন্ধ্রের মধ্যে পাখীর বাসা, আম কাঁটালের কোলে কলার গাছ আর বাঁশের ঝাড়। নাম-না-জানা গাছ পালার অভাব ছিলনা। কিন্তু তা' বলে অরণ্য বলা নিশ্চয় চলে না। আরও দেখলাম খড়-ছাওয়া কুঁড়ের পাশে কুদৃশ্য কোঠা, অবগাহনরতা পল্লীবধূর বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহরেখা, কলস সংযুক্ত সুঠাম কটিতট, অবগুণ্ঠনের অন্তরালের গভীর চকিত দৃষ্টি, অস্থিসার উদর-সর্ব্বস্ব শিশু—বাঙ্গালীর বংশ তিলক। আর দেখেছি আকাশ আর জলের সৌন্দর্য্য—আকণ্ঠ পান করেছি বল্লে অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু কোথায় আমাদের বন্ধুবরের বাঘ কুমীর, কোথায় ডাকাতের দল, কোথায় ঘনান্ধকার জঙ্গল—দেখতে পেলাম না।

ঘাটে উঠে যে পথটি দিয়ে হেঁটে কুঠিতে উঠেছি সেটি গগনস্পর্শী তরুমালায় আচ্ছাদিত ছিল বটে কিন্তু ঝাউ, মেহগনী, শিশু প্রভৃতি অভিজাতবংশীয় তরুবরের শ্রেণী করে বিভীষিকার সৃষ্টি করছে ?

আরও কিছু পরে মুখ প্রক্ষালন শেষ করে যখন চায়ের প্রতীক্ষা করছি, প্রভাতের নবীন অরুণ-আভা গলিত স্বর্ণের মত বৃক্ষ-চূড়া ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তারপর দিবালোকের লেলিহান জিহ্বা আসে-পাশের ভগ্নাবশেষ ইষ্টক স্তূপ আর ঘনবিন্যস্ত গাছ-পালার ভিতর হতে যাবতীয় অন্ধকার ও সংশয় নিকিয়ে মুছিয়ে নিল।

তখনও কিন্তু স্বর্ণকান্তর দৃষ্টির মধ্যে যত রাজ্যের পুলক, ভয় ও বিস্ময় পুঞ্জীভূত।

অকস্মাৎ হাসির হুল্লোড়ে চমক ভাঙলো। বুঝলাম সহুরে শিল্পীপ্রবর কোন উচ্চ অঙ্গের অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলেছে। কথার প্রবাহ ক্রমে ছন্নছাড়া হয়ে ছোট ছোট উপহাস ও শব্দ ক্রীড়ায়

রূপান্তরিত হলো। বুঝলাম সভা ভঙ্গপ্রায়। কবিবর দিলদার হোসেন এতক্ষণ তন্ময় হয়েছিল—সেও মুখর হয়ে পড়লো। লেখায় মনোনিবেশ করা দায় হয়ে উঠলো।

স্নিগ্ধ সমীরণ আর সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য সত্বেও দীর্ঘায়িত নৌকা যাত্রাটি দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছিল শ্রান্তিতে। মনের শ্রান্তি দেখলাম আসলে ভীতি। সাঁতার না শেখার দণ্ড। শুখনা ডাঙায় পা পড়তেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেহ কেদারার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পন করে পর্য্যন্ত শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে পড়ছিল।

রবির কিরণ তখনও নিস্তেজ। পাখীর কাকলি ক্ষান্ত হয় নি। একটি বড় পাখী (কিম্বা ছোট পাখী বড় গলায়) সরোবর প্রান্তের গুল্মরাশির মধ্য হতে আনন্দ জ্ঞাপন করছিল। দূরে, বহু দূরে কয়েকটি চাষী কাজ করছিল। মাথায় তাদের টোকা। স্বর্ণকান্তের মাসীমা বল্লেন—"ওরা আমাদেরই লোক, ভাড়া খাটছে—"

শিবনাথ বলে ফেল্লে—"কেন ওদের নিজেদের জমিজমা নেই?"

"ছিল, এসব জমি ওদেরই বাপ ঠাকুরদাদের ছিল, এখন আর নেই"—

"আপনারা ছাড়িয়ে দিলে ওদের কি দশা হবে"—

"কুষ্টিয়া কারখানায় কিম্বা কোলকাতার কোন চটকলে কাজ নেবে হয়ত, কেমন করে বলি।"

"কারখানা উঠে গেলে তখন?"

"অতকথা জানিনা বাপু"—বলে মাসীমা পাক ঘরের তত্ত্বধান করতে উঠে গেলেন। আমরা ফটো-শিল্পীর জিজ্ঞাসার প্রাদুর্ভাবে মজা পাই, কিন্তু কখন কখন এক একটি প্রশ্ন অপ্রস্তুতকর হয়ে পড়ে।

স্বর্ণকান্ত, দিলদার, রমা, শিবনাথ সবাই এবার গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্বর্ণকান্ত প্রস্তাব করলো,—"এবার গ্রামটিকে প্রদক্ষিণ করে আসা যাক।" আলোকচিত্র-শিল্পী তার খর্ব্ব দেহের ওপর যন্ত্রপাতির থলি ঝুলিয়ে নিল পৈতার ভঙ্গীতে। রমা এসে কানে কানে ধমক দিল—"তোমাকে নাচতে যেতে হবে না,—এরা গেলে পুকুরে নামবো।" কবিবরের দৃষ্টি অবনত থাকলেও কান খাড়া ছিল, বল্লেন—"বটে, আমি বুঝি শুনতে পাইনি—"

বল্লাম—"পুকুর পাড়েও যাচ্ছিনা, বেড়াতেও যাচ্ছিনা, আমার লেখা আছে--"

তিনজনে এক একটি ভাঙা হ্যাট সংগ্রহ করে খালি পায় বেরিয়ে পড়লো। রমা গেল মাসীমার সন্ধানে।

খাতা সরিয়ে রেখে বহুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলাম। ছেলেবেলাকার কথাগুলি স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। অনেক সময় ঘটনার রেখা অপসৃত হয়ে গেলেও অনুভূত আনন্দ অটুট থাকে। তেমনি ভাবধারা অবান্তর অবয়ব-শূন্য হলেও তাজা আনন্দ আহরণ করে আনছিল।

ক্রমে রবির কিরণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বৃক্ষ-ছায়া ছোট হয়ে এল। পাখীর কূজন থেমে গেলো। একটিমাত্র খরধার কর্কশ ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় নীরবতা ভঙ্গ করছিল। রেলিং-এর

বক্র ছায়া রেখা এসে পড়লো পদপ্রান্তে। রমা ফিরে এসে সামরিক ভঙ্গীতে পদচারণ সুরু করে দিলো। বুঝলাম পাক ঘরের ব্যবস্থা গুরুতর। প্রাচীন বারান্দাটি মনে হলো দেহভারে বিকম্পিত। কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করবার সাহস হলো না।

পুষ্করিণী তীর হতে ডাক আসতে উঠতে হলো। রমা কখন নেমে গেছে লক্ষ্য করি নি। ঘাটে নেমে সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয়ে গেলো। একটি পরিচারিকা দেখলাম অদূরে এক কাঁড়ি তৈজস পত্র নিয়ে বসে গেছে। রমার আনন্দ ধরে না। কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করে তোলপাড় করে তুললো জল। এক চক্ষু ঝিয়ের ওপর রেখে যেই ডুবিয়ে দিয়েছি অমনি স্বর্ণকান্ত ছুটে এলো রুদ্ধশ্বাসে—

"অত্যান্ত অন্যায়—দুজনেই সাঁতার জান না—পা হোড়কে গেলে বাঁচাবে কে ইত্যাদি।" রমা সে বক্তৃতা অগ্রাহ্য করে বল্লে—"ভারী মজা কিন্তু, জীবনে এই প্রথম পুকুরে স্নান করলাম।"

একটু পরে আবার হই হই করে জলে নেমে পড়লাম। বাকি সকলে যখন সাঁতার দিয়ে পারাপার হচ্ছে আমি একটি বংশ দণ্ড অবলম্বন করে পা ছুঁড়তে লাগলাম। রমা তার এলোচুলের বোঝা পিঠের ওপর ফেলে কাপড় চোপড় নিয়ে উপস্থিত হলো।

তারপর আহারের পালা। ব্যবস্থা হয়েছিল অপরিমিত। মিষ্টান্নের পর্য্যায় আসবার পূর্ব্বেই অতি পুষ্ট মৎকুনের মত অচল অনড় হয়ে গেলাম। স্বর্ণকান্তের বাক্যস্ফুলিঙ্গ কিন্তু সমান বেগে স্ফুরিত হচ্ছিল—

"এক পাল ছেলে মেয়ে আমরা বাইরে বসে খেতাম ভাতে ভাত আর ঐ পাথরের গামলার মধ্যে গরুগুলোকে খেতে দেওয়া হতো। গাছ তলায় একটা বড় চুল্লী ছিল—"

মাসীমা বল্লেন—'তাতে হলুদ সিদ্ধ হতো।"—শিবনাথ ভোজনের সময় বড় একটা কথা বলে না, কিন্তু এতবড় বিস্ময়ে মৌন থাকা যায় না—বল্লে "হলুদ সিদ্ধ হয়ে কি হতো।"

মাসীমা বুঝিয়ে দিতে বল্লাম "ভাবছিলে রঙ তৈরী হতো?" আসল কথা আমিও জানিতাম না কিন্তু ব্যঙ্গ করবার সুযোগ পেলে ছাড়বো কেন।

স্বর্ণকান্ত দধির পাত্রটি চেটেপুটে চাকচিক্যমান করে তুললো, তারপর আঙুলগুলি লেহন করতে করতে বল্লে—"দেওয়ালের যেখানে সেখানে আমার টোকা কবিতা দেখতে পাবে, ঐ কপাটে ওয়াড্‌সওয়ার্থে-এর কটা লাইন বিশ বছর পরেও স্পষ্ট রয়েছে।"

সাবেকি আমলের সিন্ধুক, বাসন, লাঠি সড়কি তাকে ক্রমাগত ছেলেবেলাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ ব্যাগাটেল নিয়ে নাড়া চাড়া করবার পর সকলে আলস্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। রবিবর দিলদার নাসিকা ধ্বনিতে জ্ঞাপন করলো যে সে স্বপ্ন রাজ্যে ধাবন করেছে। আমাদের ব্যঙ্গোক্তিতে তন্দ্রা ভেঙে যেতে জড়িত কণ্ঠে বল্লে, চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। ক্রমে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। একে একে সকলে নিদ্রামগ্ন হয়ে যেতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। বাহিরে লতা-পাতা

গাছ-পালা সব দেখি নিস্পন্দ প্রাণহীন হয়ে গেছে। আম, সুপারি, লিচু, বেল, কাঁঠাল, তেঁতুল ইত্যাদি বহুবিধ বৃক্ষের ছায়া ধারণ করে পড়ে আছে নিশ্চল সরোবর-মুকুর।

তারপর অপরাহ্ণের প্রথম চঞ্চলতা এল বাতাসের দোলা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর মধ্যে হলো প্রাণের সঞ্চার। আমরা চায়ের টেবিলে জড় হলাম। প্রবীণ ভদ্রলোকটি আবার উপস্থিত হলেন। রবির কিরণ নিস্তেজ হতে উদ্যানের হরিৎ আবরণ উজ্জলতর হয়ে উঠলো। শাক-সব্জির ক্ষেত্র অতিক্রম করে ডাল-পালার কারুকার্য্যময় ছায়া গিয়ে পড়লো বেড়ার অপর প্রান্তে। প্রভাতের টল টলে রক্ত বিন্দুর মত বিলাতী বেগুনগুলি দেখলাম রৌদ্রতাপে বিমর্ষ হয়ে গেছে। মাসীমা ছিঁড়ে আনলেন কতকগুলি।

সন্ধ্যার মুখে এক একটি লাঠি আর টর্চ্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। স্বর্ণকান্ত, শিবনাথ আর রমা এগিয়ে গেলো। দিলদার আমাকে নিয়ে একটু ঘুরে চল্লো। মাসীমা বৃদ্ধের সঙ্গ নিলেন। হঠাৎ চাঁদ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কবিরা চন্দ্রমার প্রশস্তি গাইতে গিয়ে আবেষ্টনীর কথা ভুলে যায়। দেখলাম আলো ছায়ার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ছড়িয়ে রয়েছে মাঠ বাট ঝোপ ঝাড়। ভাবলাম গান জানলে সুরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতাম মনের আনন্দ। কথা কইতে স্পৃহা হলো না। দিলদার কবি মানুষ, গোপন ব্যাথা বোধ করি বুঝে নিল। কাঁধের ওপর হাত রেখে নীরব সহানুভূতি জানিয়ে চল্লো। একটি ধোঁয়ার পর্দ্দার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। দিলদার বল্লে, গোয়াল ঘর হতে মশা তাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। একেই বলে সাঁজাল। কথাটি বেশ ভাল লাগলো—প্রথম শুনলাম বটে কিন্তু মনে হলো জানতাম। বন্ধুবর বল্লে—"আমি অবাক হই তোমার লেখা বাঙলা পড়ে, চিরকালটা বিদেশে কাটিয়ে এসে কেমন করে এ ভাষায় দখল এলো।" খুশী হয়ে মনে মনে ফুলতে লাগলাম। রমা দেখলাম উভয় পার্শ্বে দুই বন্ধুকে নিয়ে একটি শিলাখণ্ডের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে। আমরা যেন কতই বিদেশী এমনি ভাণ করে তাদের সামনে পায়চারি করে বলাবলি করতে লাগলাম যে, আজকালকার ছেলে মেয়েদের অবাধে মিশতে দিয়ে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে। স্বর্ণকান্ত হোহো করে হেসে উঠলো। মাসীমা এসে পড়তেই আমরা মাঠে নেমে পড়লাম। রাস্তার দুধারে ডালপালার আড়ালে আকাশ ঢেকেছিল। দিলদার ডাক দিল "আহা-হা দেখবে এস"—একটি পাতলা মেঘের অবগুণ্ঠন চন্দ্রালোকে উদ্দীপ্ত হয়ে ভেসে চলেছিল। স্বর্ণকান্ত আমাকে যেতে দিল না,—"দিলদার গেঁয়ো মানুষ কিন্তু তুমি সাপ খোপের দেশে আদাড়ের মধ্যে যেতে পাবে না।" রমা কি একটা কড় কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পথের আধো-অন্ধকার কাল করে একটি দ্বিচক্র যান গড়িয়ে এল। আরোহী শীর্ণকায়, গাঢ় শ্যামবর্ণ ও বাত্যাতাড়িত বংশদণ্ডের মত ঈষৎ নুব্জ। আমাদের আগমন সংবাদ ও পরিচয় তিনি বোধকরি পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন, কারণ আলাপের প্রতীক্ষা না করে বাঘের গল্পের অবতারণা করে বল্লেন,—"আপনি ত সিংহের দেশ থেকে এসেছেন আপনার তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের বাঘ দেখতে ছোট হলেও শয়তান কম নয়—এই দেখুন না—।" গল্পটি সকালে শুনেছিলাম।

বর্ণনাভঙ্গীর পার্থক্য আর অতিশযোক্তির দৌড দেখে খুব মজা লাগলো। মাসীমা রস ভঙ্গ করে উঠে বললেন—"ওসব গল্প কি আর শুনতে বাকি আছে—তার চেযে বাডী চলুন।" দিলদার বল্লে,—"আচ্ছা আমাদের আহারের চিন্তা ছাডা আর কিছু ভাবতে পারছেন না, এ জ্যোৎস্না ছেডে--" মাসীমা বললেন—"তবে তোমরা থাক আমি চল্লাম।" রমাও মাসীমার সঙ্গ নিতে দিলদার ক্ষুব্ধ হযে বল্লে—"তাহলে জ্যোৎস্নার আর কি রইলো, চলো যাই।" স্বর্ণকান্ত আপত্তি করলো না। সর্প ভীতি তাকে প্রায পেযে বসেছিল। দিলদার আমাকে টেনে নিযে গিযে কানে কানে মন্ত্র দিলো নদীর ধারে যেতেই হবে—"স্বর্ণকান্ত আপত্তি করবে, সাহস থাকে ত এসো।" সাহস? আমার বিক্রম উজিযে উঠলো। বল্লাম—"সাপের ভয আমার নেই তবে একবার বলা উচিত, আপত্তি না হয নাই শুনলাম।"

স্বর্ণকান্ত ঘোরতর ভাবে অসম্মতি জানিযে, রমার শরণাপন্ন হযেও যখন আটকাতে পারলো না তখন এক একটি বিকটাকার টর্চ্চ আর একটি করে বিরাট লাঠি সঙ্গে দিলো। নীল পচাবার হাউসগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হযেছিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। হৃদকম্প উপস্থিত হলো। দিলদার কাছে এসে বল্লে—"বাম পার্শ্বের তীব্র গন্ধ ব্যাঘ্র জাতীয কোন বন্যজন্তুর হবে।" স্বর্ণকান্তর কথা মনে হলো। পথটি শঙ্কাকুল হলেও অনতিক্রম্য নয। সহসা নদীর তীরে এসে মন্ত্রমুগ্ধ হযে গেলাম। দক্ষিণে কাচের মত নিষ্কম্প স্তব্ধ নদী সারা অঙ্গে সোনালি রং মেখে পডেছিল, বামে স্লেট, তারপর ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপী নীল-কালোর অপূর্ব্ব বিলযন। বালুচর জন শূন্য নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। পৃথিবী মনে হলো সমাধিগ্রস্ত, ব্রহ্মাণ্ডের কক্ষপুটে স্বপ্নচারিতার মত দিক ভ্রষ্ট। কখন কোথা হতে মন্থর অচঞ্চল বাতাস এসে নদীর আবরণে আঘাত করলো বুঝতে পারলাম না। চক্ষের পলকে দেখি শত সহস্র উর্ম্মিমালার মধ্যে চন্দ্রমা শতধা হযে নাচছে। দূরাগত একটি গানের সুর কাছে এগিযে এল একটু একটু করে। তিনটি মাল বোঝাই নৌকা পরস্পরের সহিত রজ্জুবদ্ধ হযে ভূতের মত ঝুপ্ ঝাপ্ করে চলেছে। দিলদার বল্লে,—"মাঝিদের এ গান সহরের বৈঠকে অশ্রাব্য বেসুরা শোনাবে, কিন্তু এখানে স্রোতধ্বনির সঙ্গে, পাডের ছুটন্ত ঝোপ ঝাডের সঙ্গে সুর এমন মিলিযে গেছে যে অবাক লাগে, আরও কিছুদূর যেতে দাও তারপর মন দিযে শোন—এতে সাঁওতালদের আদিম সুরের, হিন্দুস্থানী ভজনের সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে।" অনেকক্ষণ শুনলাম স্তব্ধ হয়ে। বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি একটি অখণ্ড রাগিণী সৃষ্টি করে দূর হতে আরও দূরে চলেছিল। মনে হলো এই একই সুর শুনেছি আফ্রিকার জঙ্গলে কাফ্রীদের গানে। বল্লাম না কিছু। দিলদার কিছু দূরে এগিযে গিযে গলা ছেডে গান গাইলে একটি দুটি করে অনেকগুলি। কবিবরের কণ্ঠসঙ্গীত লোভনীয কিন্তু আমার মন পডেছিল ছডিযে। ভাবছিলাম একটি নৌকা কিনে আজীবন জলে জলে কাটিযে দিলে মন্দ হয় না।

নিকটের গ্রাম হতে একটি যুবক এসে প্রশ্নবানে বিরক্ত করে তুললো। কে আমরা, কোথায় উঠেছি, ক'দিন থাকবো ইত্যাদি।

বাড়ী ফিরলাম ভিন্ন পথে। বারান্দার একপার্শ্বে সরাসরি কয়েকটি শয্যা বিস্তৃত, আর এক প্রান্তে ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে দেখলাম। স্বর্ণকান্তর সামনে পড়বার সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু সে কোথা থেকে এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল পিছনের পাক-ঘরের ছাদে। গোয়াল ঘরের তীব্র গন্ধ চুল্লীর রোষ্ট চিকেনের সঙ্গে মিশে যে অভিনব আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা হয় না। বন্ধুবর বল্লে—"ঠাট্টা নয়, ঐ দিকটা দেখ।" বাস্তবিক অল্প আলোতে কলা গাছের বাগানটি দেখে মনে হচ্ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের কোন উদ্ভিদ্‌সঙ্কুল দ্বীপের ধারে জাহাজ ভিড়েছে। স্বর্ণকান্ত বল্লে —"একটু পরে ঝোপের তলার অন্ধকার সরে গেলে ইন্দ্রজালের মত রূপ বদলে যাবে—মহাভারত রামায়ণে বর্ণিত ঋষির আশ্রমের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হবে।"

রোষ্ট চিকেনের হাঁড়ি বোধ করি নামলো, কারণ গোয়াল ঘরের গন্ধ প্রবল হয়ে উঠলো। আশ্রম দেখার লোভ সংবরণ করে সরে পড়লাম। একটু পরে স্বর্ণকান্ত দেখি অনিচ্ছুক দিলদারকে রমার পাশ থেকে তুলে টেনে নিয়ে চলেছে।
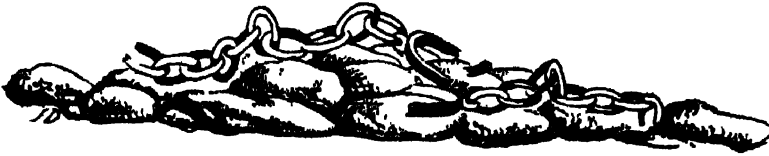
চাঁদ ও তুষার

বুদ্ধদেব বসু

আর সারারাত তুষারের রূপালি আগুন
আমার রক্তে জ্বলে।
হোটেলের ছোট্ট ঘরে, অন্ধকারে, লেপের নির্জীবক আরামের প্রলেপের চাপে
বন্ধ আমি, এদিকে পূবের পাহাড়ের উপর দিয়ে
চাঁদ উঠে এসেছে আকাশের খাড়া চড়াইয়ে ভ্রমণের অর্ধ-পথে—
এবার বুঝি নামবার পালা। সহরের ধাপে ধাপে আলো জ্বালা
যেন কোন অযুবন্ত দেয়ালির উৎসবের মালা,
তবু আকাশে এ কী ভাসে! এ কী নির্লজ্জ অসংযত আলো!
এত সুন্দর যে চাঁদ, এমন অনাবৃত হওয়া কি তার ভালো!
গাছেদের মিশকালো ছায়াগুলি চুম্বনের মতো নিবিড়,
পাহাড়ি পথের মোড়ে মোড়ে হঠাৎ যুগলের শয্যা যেন।
তুমিই বলো, চাদ, এত নির্লজ্জ হওয়া কি ভালো?

উত্তরে কাঞ্চনজংঘার
পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারে রূপালি আগুন।
একি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত? না কি দূরে বহু দূরে
এরই সন্ধানে আমাদের স্বপ্ন-অভিসার? অস্পষ্ট অপরূপ
ঝিলিমিলি তুলে শাদা ময়ূরের মতো আমার দিকেই আসছে?
জানি না। হোটেলের ছোট্ট ঘরে বন্ধ আমি
তবু গুহার মধ্যে হাওয়ার নিঃশ্বাসের মতো,
ব্যর্থ জীবনে বাক্যরচনার ছিদ্রপথের মতো
আমার রক্তে তুষারের রূপালি আগুন
কাল সারারাত জ্বলেছে।

অন্নদাস বিপ্লবী

শ্রীহেমেন রায়

পল্টু একখানা সবংাদ পত্র আনিযা বলিল, "মেসোমশায, আজ একটা বড মজাব খবর বেবিযেছে।"

মধ্য বযস, একহাবাব চাইতে একটু বেশী, দেডহাবা বলিলেই ঠিক হয, এই বকম শরীর লম্বাও নয অথচ বেঁটেও নয, এই বকম দৈর্ঘ্য, প্রস্থে বুকটা মন্দ যায না, এইরূপ আডা, বং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুটি ঢলঢল কি জ্বল জ্বল ঠিক কবা দুরূহ, এমনি ডুবিযা-ভাসিযা-থাকা দৃষ্টিসম্পন্ন ধবাধরবাবু বলিলেন, "কি লিখেছে বে?"

কথাটা হইতেছিল ধবাধববাবুব বৈঠকখানায। স্থানটা—একটু আলোকপ্রাপ্ত গ্রাম। ধবাধববাবু হইতেছেন সববকম মজলিশেব মধ্যম। সূর্য্যোদয হইতে সূর্য্যাস্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে এক প্রহব বাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাব বাসায কলিকা ঠাণ্ডা হয না, এই প্রসিদ্ধি তাঁহাব ছিল।

ধবাধববাবুর অনেক গুণ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, কণ্ট্রাক্টাবী বা বাস্তাব ঠিকাদাবী, গ্রহশান্তি, পৌবহিত্য, সাক্ষী-পাঠ-পডান, কালোযাতি, গ্রাম্য-সালিসী, সমাজ-নেতৃত্ব, গণকগিবি ও আর্য্যনাট্য প্রতিভা তাঁহাব তো ছিলই, তাব উপব বাজনৈতিক কষ্টি পাথবেব কাজও তাঁহাকে কবিতে হইত।

গম্ভীবভাবে তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বাজনৈতিক সোনাব পাথববাটি বোধ হয?"

পল্টু নব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও উচ্ছ্বসিতব মত বলল, "যে সে কথা নয মেসোমশায। এ আপনাব আন্দাজেব বাইবে।"

জ্ঞানীকে যদি গুণী না বলা যায তাহা হইলে ভিতব ভিতব তিনি যেমন ক্ষুণ্ণ হ'ন তেমনি বেমালুমভাবে ধবাধববাবু একটু আস্ফালন কবিযাই কহিলেন, "আন্দাজ কবতে পাবব না! কি বকম? ব্যাপাবটা খুলেই বলতো দেখি?"

পল্টু ধমকেব ভযে পত্রিকা পডিতে লাগিল। বলিল, "শিবোনামায লেখা 'অন্নদাস বিপ্লবী'।"

একটু শ্লেষেব হাসি হাসিযা ধবাধববাবু বলিলেন, "ওঃ বাধে কেষ্টো, এই তোমাব আশ্চর্য্য খবব? এ আব কে না জানে? কিন্তু বাপু পডলেই হ'ল না। বিবেচনা কব ওটা যদি লোককে ঠকাবাব জন্য লিখে থাকে। এমন তো ঢেব ঘটনা ঘটে। এই ধব যেমন জাল তলোযাব। লোকে মাথা ঘামিযে অস্থিব, কি পদার্থ দিযে তলোযাব তৈবী কবলে তাকে জাল তলোযাব বলা যায। কেউ বলল সীসে, কেউ বললে দস্তা। এমনি টিন, কাঠ, কাচ, সোনা, রূপা কত কিছুব কথা লোকে ভাবলে, কোনটাই ঠিক হ'ল না। একজন বলল—পিতলকি বাটাবী কামে নাহি আওল। তাও মঞ্জুর হ'ল

...। আসল ব্যাপারটা কি জানিস? এই জালরে মাছধরা জাল, তাই দিয়ে তৈরী একটা ? লাযাবের আকার। তাই বলছিলাম—শুধু পড়লেই হ'ল না, মর্ম্ম বোঝা চাই।"

পল্টু ঘাবড়াইয়া গেল। বিনীতভাবে বলিল, "তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? শিরোনামা কি বদলে পড়ব?"

"গারো কম্নেকার" কাগজে ছাপা বিস্ময়ের চিহ্নের মত মুখের উপর নাকটি টিকোলো করিয়া এই কথা কয়টি কহিলেন শ্রীধরাধরচন্দ্র। ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পল্টু বলিল, "আজ্ঞে।"

স্বাভাবিক কণ্ঠে বিজ্ঞতার স্বরে ধরাধরবাবু বলিলেন, "অত সোজা নয় গো। নাম পাল্টালেই হ'ল? লেখক আছেন, সম্পাদক আছেন, তার ওপর ওটা যদি লেখক না হয়ে লেখিকারই হ'য়ে থাকে তিনিও আছেন। এখানে সদর মফঃস্বল এসে গেল। এই সব বস্তুতান্ত্রিক বিচার ক'রে বুঝতে হবে। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। আমাদের মুনি ঋষি,—তাঁরা সব ত্রিকালজ্ঞ, যোগী, তাঁরা কি বোকা ছিলেন?"

পল্টু এ ঘোর পাকে পড়িয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ভীতিব্যঞ্জক অবস্থার কথা মনে করাইয়া দিল। শিষ্যোস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নাম্—শিষ্য, শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও, নীরব ভাষায় চোখ মুখের ভাবে পল্টু প্রকাশ করিল।

প্রসন্ন হইয়া ধরাধর বলিলেন, "ওটা অন্নদাস বিপ্লবী নয়। ওর ভুলটা হচ্ছে কোথায় জানিস? তালকানা ব'লে একটা জিনিষ আছে। তেমনি স্থলকানা একটা কথা আছে। এ হয়েছে তাই। লেখকের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ও যদি আমাদের শ্যামগঞ্জ জানত শ্যামগঞ্জের আখড়া তাহলে মনে পড়তো। আর তা'হলেই অন্নদা বৈরাগীর কথা মনে হ'ত। সব শুদ্ধ হয়ে যেতো। এইজন্য অলঙ্কার কর্ত্তারা বলেছেন—স্থান ভ্রষ্টাঃ ন শোভন্তে, দন্তাঃ কেশাঃ নখাঃ নরাঃ। অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট হলে বা দন্ত, কেশ, নখ গেলে নর বানর হয়ে যায়, কোনো শোভা থাকে না।"

সভাশুদ্ধ সকলে কহিয়া উঠিল, বাহবা, বাহবা, বেশ।

ধ্বজুকাকাও গ্রামের একজন মাতব্বর ও সমঝদার, যাকে আজকাল বলে রূপদক্ষ। তিনি ধরিয়া বসিলেন, "ক'রকম কানা আছে ধরাধর?"

ধ্বজাধারীদাদার প্রশ্ন ঠেলিয়া দিবার নহে। ইনি গ্রামের ছোটদের কাকা বড়দের দাদা এবং বুড়াদের বাপধন। সকলেরই আদর যত্নের পাত্র।

সুতরাং ধরাধরবাবু উত্তর করিলেন, "যেমন বামুন আছে তিন প্রকার—কান-কুঁকো, শাক-কুঁকো ও উনোন-কুঁকো, তেমনি অসাধারণ কানা আছে তিন রকম—তালকানা, স্থলকানা, আর পাতকানা। এদের ভগবানের অবতার বলতে পার। চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, চরণ আছে চলিতে পারে না। বুঝলে?"

পণদা কলেজের ছাত্র। ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে। তার জ্ঞান অনেকের চেয়ে বেশী। অন্ততঃ সে তাই মনে করে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বলিয়া ফেলিল, "কাগজটা পড়াই

হোক না। তারপর যে যাবার যাবে, যে থাকার থাকবে। তখন সমালোচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে।”

ধরাধর হটিবার পাত্র নন। উত্তর দিলেন, “আচ্ছা তাই হোক। কিন্তু ‘সর্ব্বশাস্ত্র প’ড়ে কলি হলি হত মূর্খ। সবশেষে সমালোচনা হতে পারে বটে,—তাই ব’লে সবাই মিলে আলোচনা হো হবে না?” এই বলিয়া হুঁকার দিকে হাত বাড়াইলেন।

ইত্যবসরে পল্টু আরম্ভ করিল—“নূতন যুগে, যুগোপম বিদ্রোহী আত্মার সমাবেশে গঠিত বিপ্লবী সম্প্রদায় তাহার অভঙ্গ নির্ম্মম কঠোর সংকল্প লইয়া আপনাদের সম্মুখীন হইতেছে। অন্নদাস বিপ্লবী এই প্রথম ঊষার অরুণ কিরণে আবীর কুমকুমী রক্তস্মরে বিশ্বটাকে রাঙ্গাইয়া দিবার উদ্যমে উদ্যত।”

ধরাধরবাবু বেশ নির্ব্বিরোধে শুনিতেছিলেন। কিন্তু অন্নদাস বিপ্লবী কথাটি শুনিয়া তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায় আবার কণ্ডূয়ন আরম্ভ হইল। যেমন মাহেন্দ্রক্ষণ আছে, তেমনি শব্দেরও মোহিনীশক্তি মানিতে হয়। সংস্কৃত পড়িতে গিয়া ‘কর্ম্মকারস্য ভস্ত্রা’ কথাটি কাহারও কাহারও মনে যেমন কণ্ডূয়ন উৎপন্ন করিয়াছে, অন্নদাস বিপ্লবী কথাটিও তেমনই ধরাধরকে অধীর অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

ধরাধর হুঁকাটি ঋজুদাদাকে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—“দেখ, আমাদের দেশটা শুধু শাস্ত্রে বদেৎ করেছে এবং গুরু মুখে শ্রোতব্য করেই রসাতলে যেতে বসেছে। ‘অন্নদাস বিপ্লবী’ কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো।”

গুণনিধি পণ্ডিত মহাশয় এইবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, “ওর আর মুস্কিল কি আছে? আমি বলে দিচ্ছি শুনে নাও। অন্ন ও স্বর্ণ দুই বোন ছিল। পীতাম্বর পড়ুই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তা-ভজাদের বিরোধী হয় অথচ আখড়া বা আড্ডা ছাড়ে না, তাদেরই কথা হয়তো বলছে। খুব সম্ভব তাই। অথবা আরেক অর্থ এই হতে পারে যে অন্নের অভাবে পেটের দায়ে হয়েছে বিপ্লবী। অথচ দাস মনোভাব ছাড়তে পারে নি। আহা বড় করুণ কাহিনী। পড় বাবা পড়।”

পণ্ডিত মশায়ের ব্যাখ্যায় সাগর বক্ষের দোল একটু প্রশমিত হইল। ধীরভাবে পঠন পাঠন চলিতে লাগিল। মধ্যে রণদা কেবল একবার বলিল, “পণ্ডিত মশায় একটা সার্ব্বজনীন তথ্যের সন্ধান দিলেন। Economic Interpretation of History অকাট্য—ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেয় কার সাধ্য?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “বুঝলাম না বাবা। এত ফলিতার্থ। একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বল।”

রণদা বলিল, “জর্ম্মানীতে কার্ল মার্ক্স নামে এক মহানুভবের আবির্ভাব হয়। তিনি ইতিহাসের নতুন ভঙ্গী দৃষ্টিকোণে ধরেন।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “আর কষ্ট করতে হবে না বাবা, বুঝেছি। উনি যে আমাদের ঘরের লোক। মেলেচ্ছদের মুখে ঠিক উচ্চারণ হয় না বলে যত গণ্ডগোল। নৈলে সবই এক। ধর

এই জর্ম্মাণী কথাটা। বস্তুতঃ ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। সর্ম্মন জাতির আবাস ভূমি—তাই নাম হয়েছে সর্ম্মনী। সেটা মেলেচ্ছ বেটারা করে বসেছে জর্ম্মাণী। স্মরণ শক্তির আধিক্য থেকে ঐ নামটা হয়ে থাকতে পারে। অথবা বৌদ্ধ শ্রমণরা গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকবে। তার থেকে শর্ম্মনী কথার উৎপত্তি হয়েছে। আর ঋষি চার্ব্বাকের অনুকরণে নাম করেছিল ঋষি কার্ব্বাক। বোকাগুলো তাকে করেছে, ঐ যে কি বললে ?—"

রণদা বলিল, "কার্ল মার্ক্স। কিন্তু পণ্ডিত মশায় আপনার নজীর কিছু আছে ? মুখের কথা বললেই তো মানব না।"

"হাঁ, হাঁ, আছেরে বাবা আছে। অথর্ব্ববেদে হেয়াযণের গৃহ্য সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। দেখে নাও গে। তারপর পড়ে যাও বাবা পড়ে যাও।"

এবার ধ্বজুকাকা এক ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসিলেন। ভাষাতত্ত্বে মন দিলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে চিন্তা করিতে লাগিলেন "সার্থনী ও জর্ম্মনী। এর থেকে কি হয়েছে সম্মার্জ্জনী ?"

কথাটা লুফিয়া লইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া বসিলেন, "তাতে আর সন্দেহ আছে ? আচ্ছা, বাবা রণদা, জর্ম্মানীরা কি সম্মার্জ্জনী ফ্যামিলি ?" রণদা ফট্ করিয়া উত্তর করিল, "ভণ্ড, ঠকবাজদের পক্ষে তাই বটে।"

ধ্বজুকাকা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "পুরাণে চার্ব্বাক মুনির যে মাসতুত ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়ার কথা পাওয়া যায় ইনি কি তিনি ?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "হাঁ রণদা ইনি কি নাস্তিক? সাধারণের সুখবাদী ? তা' যদি হয় তা'হলে আর যান কোথায় ? এতদিনে মীমাংসা হ'ল।"

রণদা পণ্ডিত মহাশয়ের কথার উত্তরে বলিল, "হাঁ।"

এত হাঙ্গামা দেখিয়া পল্টু বাদ সাদ দিয়া পড়িতে লাগিল। "বর্ষা-স্নান, নির্ম্মল, ধূলি-ধূম মেঘ বিনির্ম্মুক্ত, সুন্দর আকাশ। পুলিনে পুলিনে কাশের গুচ্ছ। বাগানের কোণে কোণে ঝরা শুভ্র শেফালির ব্যথা ভরা বুক পাতা বিস্তারিত আসন। মাথার উপর অনন্ত নীলিমা। ইষ্ট-বিরহ-দুঃখ-কাতর বর্ষার অশ্রুসেচনের পর স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, শুভ্রসাজে পবিত্র অন্তরের ছাপখানি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া প্রকৃতিরাণী শারদ-সঙ্গীতের গীতালি ঢঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে শোভিত হইয়া মিলনের আনন্দ বার্ত্তা করিতেছেন। তাই এত হাসি হাসে আজি জ্যোৎস্না সুন্দরী।"

ধরাধর এইবার ধৈর্য্য হারাইলেন বলিলেন "এত গৌরচন্দ্রিকা রাখ তো। আসল ব্যাপারখানা কি খুলে বল। এতো বুঝছি কে একজন আসবে অথচ এসে পৌঁছল না। এই সুখ দুঃখের সংসারে এরকম হয়েই থাকে।" ধুকিতে ধুকিতে পল্টু পড়িল, "তালকাটা গ্রামে ধূমধামে অম্বিকাপূজার আয়োজন চলিতেছিল।" "নাও, এইবার মেও সামলাও। আমি তালকাণা বলেছিলাম তাতেই তোমরা হল্লা করার যোগাড়ে ছিলে। এ যে আবার গ্রাম এল তালকাটা," বলিয়া ধরাধর হাপুস নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কথাটি না কহিয়া পল্টু পড়িয়া চলিল "দেহের তৃপ্তির জন্য নূতন জুতা, কাপড় ও পাত্রানুসারে গহনা এবং রসনার তৃপ্তির জন্য ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা, তাছাড়া পূজাবাড়ীর

সামিযানাব বাহিবে চন্দ্রচুড পক্ষীব স্বাদ গ্রহণেব আযোজন, নাসিকাব তৃপ্তিব জন্য গন্ধপুষ্প, সে আতব ধূপ, ধুনা ও চন্দনাদিব নিযোজন, চক্ষু-কর্ণেব তৃপ্তির জন্য নাটকাভিনযেব বন্দোবস্ত হইযাছিল অবাস্তবকে বর্জ্জন কবিবাব জন্য নাট্যপীঠেব বাস্তবেব বাস্তবিক আবহাওযা, পাবিপার্শ্বিক ও কুশীল আমদানী কবা হইযাছিল। নাট্যোল্লিখিত ব্যাক্তিগণ নিজ নিজ ভূমিকায কৃতিত্ব দেখাইযাছিল।"

"তোব কৃতিত্বেব নিবৃচি কবিছে। আসল বিষয বস্তুটা পড়ে শোনা।" বলিযা বগদা গর্জ্জ কবিযা উঠিল।

পল্টু বিনা বাক্যব্যযে পড়িযা চলিল—"গুণগড়েব বাজা কবন্ধ বাহাদুব বিশিষ্ট শ্রোতাব আসনে আসীন ছিলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইযাছিলেন দুর্ম্মুখ। বাজাবাহাদুবেব প্রশ্নেব উত্তবে সে অভিনীত বিষয বস্তু বুঝাইযা দিতেছিল। এক দৃশ্য নাটিকা, পালা উত্তব গো-গৃহেব যুদ্ধ। প্রথমেই আসিলেন দ্রৌপদী। তিনি অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদিগকে আগতপ্রায যুদ্ধে উত্তেজিত ও উদ্বোধিত কবিতেছেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে, সুষ্ঠু উচ্চাবণ সহকাবে, স্ববগ্রাম উঠাইযা নামাইযা অনর্গল কহিতে লাগিলেন— "নন্দ যত বাটে মোক শুদ্রানী বলিকিবি গালিদলে মু প্রতিজ্ঞা কবিলু নন্দবংশ ধ্বংস কবিমি। নন্দ যদি মোব গোড ধবিকিবি মাপ চায, মু দবেইনা দবেইনা।"

"বাজা জিজ্ঞাসা কবিলেন—এ কি বকম হল? উত্তর-গো গৃহেব যুদ্ধ। অথচ চন্দ্রগুপ্তেব মাতা মুবা পাট বলে গেল? তাও আবাব উডিয়া ভাষায? এব মানে? দুর্ম্মুখ কবযোডে নিবেদন কবিল—মহাবাজ অপবাধ নিবেন না। আজকাব অভিনযেব বিষযবস্তু ভাষা দিযে বোঝাব নয, ভাব দিযে বোঝাব। মুক্তি সংগ্রাম আগতপ্রায কিনা, তাই সকলেব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মেনে নেওযা হোযেছে। দ্রৌপদী যিনি সেজেছেন তিনি উড়িষ্যা প্রান্তেব লোক। আত্মসম্মান বক্ষা কবে আসবে নেমেছেন। ঠাট-দোবস্ত, বর্ত্তমান অ-জন প্রিয বাষ্ট্রভঙ্গিতে হবে। তাই দ্রৌপদীব মুখে চন্দ্রগুপ্তেব মাতা মুবাব উক্তি, অতি সুশোভন হযেছে। তাছাডা ভদ্র মহিলা, লজ্জা সবম ত আছে। সভার মাঝে কেশাকর্ষণ, বস্ত্র হবণেব কাহিনী কি কবে বলে বলুন তো? একে বলে শিল্প কলায নতুন কাযদা (new technique in art), বাজাব নিকট এবাবে সমস্তই প্রাঞ্জল হইযা গেল।

তাবপব আসিল মযদানবেব অধীনে যে শ্রমিকদল কার্য্য কবিযা অশ্বমেধ যজ্ঞেব সময ইন্দ্র প্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লী) যুধিষ্ঠিবেব স্বচ্ছ স্ফটিক প্রাসাদ গড়িযাছিল। তাবা আজ অন্নেব কাঙ্গাল পবণে ছেঁডা কৌপীন। মযদানব অর্থ সম্পদে বেশ গোছাইযা লইযাছে। সর্দ্দাবী পদটি তথাপি ছাডে নাই। তাই নিত্য দুইবেলা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বুভুক্ষু শ্রমিকবা তাবস্ববে বলিযা বেডাইতেছে কাঁহা গইলিবে মযদান বোযা? ভিতব ভিতব গুড-চূডা, উপব উপবাস। বাজাব প্রশ্নেব উত্তব দুর্ম্মুখ বুঝাইযা বলিল যে, শ্রমিক-নেতা ধনিকেব আওতায বেশ শাঁষালো হোযেছে। শ্রমিক ে তিমিবে, সে তিমিবে। ধর্ম্মঘট কবানো ও ভাঙ্গানো আযেব একটা বেশ প্রশস্ত পথ বেবিযেছে। একটি বিরহ সঙ্গীতের ভাব একজন কাবুলীর উপব পড়িয়াছিল। পস্তু ভাষায় গান শ্রোতাদে অবোধ্য হওযায তাহাকে বাদ দেওযা হয—পল্টু ইহাও পডিল। ধবাধর—"কাবুলীকে আব

ছাড়ানো কেন ?" ধ্বজুকাকা বলিল—"ওটা গান্ধারীর বাপের বাড়ীর দেশ কিনা, ওদের কি করে বাদ দেওয়া যায় বল ?

তারপর আসিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি মহামহারথিগণ, পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে। তাই অর্জ্জুন বালক উত্তরকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজে তার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। উত্তর বলিল—"ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি নমস্যগণ, আপনারা বীর, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক। অথচ গোপনে অরক্ষিত পুরী আক্রমণ করেছেন শুধু গরু চুরির জন্য। লজ্জা করে না আপনাদের ?"

মহারথিগণ লজ্জা পাইয়া সমস্বরে বলিলেন—"ধর্ম্ম বুঝি, অধর্ম্মও বুঝি, কার্য্যও বুঝি অকার্য্যও বুঝি। কিন্তু কি করব ? আমরা অন্নদাস। দুর্য্যোধন অর্থ দিয়া আমাদের কিনে রেখেছে, তাই অন্যায়কে ন্যায় ব'লে না চললে আমাদের উপায় নাই। বালক, যখন ধরা পড়েছি, আমাদের কলঙ্ক মোচানর জন্য একটা কিছু কর।"

এমনসময় নাটকীয় প্রয়োজনে বাঁশ-সখা শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে অপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিতে ইঙ্গিত করিলেন। ও বংশী বাজাইতে লাগিলেন--প্রাণের সুবল আয়রে আয় ঘরে,

গাভী বৎস লয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছিস দ্বারে

প্রখর তপন তেজে, অঙ্গ তোমার গেছে ভিজে,

--হায়রে—

এমন যোগাযোগের ক্ষণে শ্রোতারা চীৎকার করিয়া উঠিল—এযে বাবা একেবারে গ্রীষ্ম বাদল একদম অসহ্য।

পাল চাপা, নাট্যাভিনয় সহসা থামিয়া গেল"।

ধ্বজুকাকা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এর নাম অভিনয় ?", পল্টু পড়িতে লাগিল—"ইহা অভিনয় নয়।"

আতকাইয়া উঠিয়া ধরাধর জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে একি সত্যি ?"

পল্টু পড়িয়া গেল--"নিছক সত্যি।" তখন সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল। পল্টু পড়িল—"ভারতভূমে স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে এই অভিনয় চলিতেছে ও গৃহবিবাদ এবং আত্মকলহ বাড়িতেছে।" সহসা সকলের বদন মণ্ডলে কে যেন কালি মাড়িয়া দিল এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সভাভঙ্গ করিয়া যে যার গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অদূরে জমাদার রাম খেলাওন সিং তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল

"ত্যজহু আশ নিজ নিজ ঘর যাহু

লিখহু বিধি বৈদেহী বিবাহু"

বর্ষার রূপ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

রমলা পূবের জানালার কাছে বসিয়া উলের জামা বুনিতেছে, আর মাঝে মাঝে অন্যমনে মেঘলা আকাশের দিকে তাকায়। হূ হূ করিয়া হাওয়ার স্রোত এক একবার জানালার রেশমী পর্দ্দাগুলিকে দিগন্তভূমির সমান্তরাল করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে আছড়াইয়া পড়ে, আর টেবিলের আস্তরণ, পশমের গোলকটি, রমলার গায়ের শাড়ী—সব এলোমেলো করিয়া দেয়। রমলার এত ভাল লাগিল।

পাশে খাটের উপরে শুইয়া স্বামী খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রমলা সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "কি সুন্দর হাওয়া।"

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "সুন্দর নাকি? আমি তো ভয়ানক চটে যাচ্ছি। কাগজের পাতাগুলো ধরে রাখা যাচ্ছে না মোটে—একদম ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।"

"ভারি বেরসিক তুমি।" একটু চুপ করিয়া থাকিতে বাহিরে কালো মেঘের ঘোমটার অসংখ্য ছিদ্রপথে বিরহিনীর অজস্র চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে সুরু করিল। ক্রমে ঝম্ ঝম্ নুপূরের তাল, ক্রমে উন্মাদিনীর প্রলয়নৃত্য। রমলা সেলাই স্থগিত রাখিয়া জানালার পথে ব্যাকুল আনন্দভরে চাহিয়া রহিল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তূপ ক্রমশঃ আকাশময় একাকার হইয়া গিয়াছে, তীরের মত বারি-ধারাগুলি হাওয়ার প্রবল ধাক্কায় কখনও পশ্চিমে, কখনও দক্ষিণে, অসংবৃতভাবে ছুটাছুটি করিতেছে ছাউনীঘেরা জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে সহজে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না, তবু একটা বেপরোয়া দুঃসাহসী ঝাপ্‌টা কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া রমলাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রমলা গ্রাহ্য করিল না। উচ্ছ্বসিতভাবে আবার স্বামীকে বলে, "এবার উঠে এসে দেখ, বাইরে কি হচ্ছে।"

সুরেশ বলিল, "জল আস্‌ছে নাকি? জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।"

"ধ্যেৎ।" বলিয়া রমলা জানালার আরও কাছে গিয়া মুক্ত জলোহাওয়ার সমক্ষে সারা অঙ্গ পাতিয়া দিল।—"বর্ষাকালটা কী সুন্দর যে আমার লাগে।"

"আষাঢমাসে জন্ম তোমার বুঝি? তাই, না?"

"হবে হয়তো। কিন্তু সত্যি তুমি জানো না, এ যে কত সুন্দর। তোমার দেখবার চোখ নেই, কি করে জান্‌বে?"

স্বামী হাসিয়া বলিল, "তোমার চোখ থাকলেই আমার দেখা হবে।"

রমলা তাণ্ডবমত্ত নারিকেলগাছগুলির চূড়ার দিকে তাকাইয়া প্রায় আপন মনেই বলিল, "বিপর্য্যয়ের মধ্যে কি উল্লাস, বেদনার মধ্যে কত আনন্দ, বর্ষার রূপ দেখে খানিকটে তার আভাস

পাওয়া যায়। না? সাধে কি রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি? দেখ, ঐ আকাশের যে কোণটায় গাঢ় অন্ধকার নেমেছে, আর গাছের মাথাগুলো আনন্দে উন্মাদনৃত্যে ভেঙেচুরে যাবার যোগাড়—এর চেয়ে সুন্দর ছবি আর কোথাও দেখেছ? কেন যে মানুষে বর্ষাকে ভালোবাসে না, তাই ভাবি।"

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা, এবার থেকে বাসবো"

রমলা স্বামীর মাথার কাছে খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আদর করিয়া বলিল, "তোমাকে মেঘদূতখানা পড়ে একটু শোনাই? কেমন?"

বাহিরে ঝড়ের দাপটে পৃথিবী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছে, ভিতরে সুখনীড়ে কপোতকপোতীর মত তরুণ তরুণী দুইটি মেঘদূত আলাপনে রত—প্রচণ্ড একটা বিদ্যুতের চমক্ কুতূহলী কটাক্ষ হানিয়া উঁকি দিয়া দৃশ্যটি দেখিয়া গেল।

বিকালবেলা হইতে কোথা দিয়া অলক্ষ্যে একটু একটু জল আসিতে আসিতে রমলাদের বাড়ীর চারিধার ঘেরাও করিয়া ফেলিল। এ তো বাদলের জল নয়। পূবী হাওয়ার টানে নদীর জল উছলিয়া উঠিয়াছে। সুরেশ বলিল, "বান আসছে।" সহর্ষে রমলা বলিল, "বাঃ।"

রাত্রির আচ্ছাদনের তলায় রমলা যখন সুখনিদ্রায় অচেতন, সেই অবসরে বানের জল তর্ তর্ করিয়া সমস্ত বাড়ীর প্রাঙ্গণখানি ছাইয়া ফেলিল, দোতলা দালানখানি জলের মধ্যে জাগিয়া রহিল যেন দ্বীপের মত।

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া রমলার আনন্দ আর আর ধরে না। এত জল, এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য সে আর কখনও দেখে নাই। মাঠে, আঙিনায়, পুকুরে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—একটি স্থির সমুদ্র। উপরে বারান্দায় রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া রমলা সুরেশকে বলিল, "ঠিক যেন উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ! না?"

পাশের বাড়ীর রাজহাঁসগুলি জল দেখিয়া আনন্দে আকুল, ভাসিতে ভাসিতে রমলাদের আঙিনায় আসিয়া ক্রীড়ারত হইল।—"আমার কি ইচ্ছে করছে, জানো? রূপকথার রাজকন্যার মত ঐ রাজহাঁসের শাদা পাখায় চড়ে দূর দিগন্তে চলে যাই।"

সুরেশ বলিল, "একেবারে নিরুদ্দেশযাত্রা?—বেচারী আমার উপায় কি হবে?"

রমলা হাসিয়া বলে, "তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। দুইজনে দুই রাজহাঁস বাহন করে পাশা-পাশি ভেসে যাবো—যতদূরে মন যায়। কেমন?—ওগো, তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে এসো না? আমি ছবি তুল্‌ব।"

বেলা বাড়িয়া যায়, জলও বাড়ে। বেলা পড়িয়া আসে, কিন্তু জল তবু কমে না। সেদিন কাটিয়া গেল, পরদিনও গেল, কিন্তু বন্যার জল মাঠঘাট দখল করিয়া তেমনিই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। উপর হইতে মেঘের ধারা কখনও কখনও আত্মসংবরণ করে, কিন্তু নীচে নদীর আবেগ কমে না। রমলা ঘরে বসিয়া জামা বোনে, আর গুন গুন করিয়া গান গায়। কাল সন্ধ্যাবেলা চুপি চুপি একটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

আজ গোটা তিনেকের সময় সে ষ্টোভ্ ধরাইয়া খানকয়েক চপ্ ভাজিতে বসিয়াছিল। সুরেশ একটি মোড়ার উপরে বসিয়া তদারক করিতেছে, অর্থাৎ রমলার হিজিবিজি গল্পগুজবের মধ্যে মধ্যে ফোঁড়ন কাটিতেছে। রমলা বলে, "আজ বিকেলে লীলাদের ওবাড়ীতে জল দেখতে যাব, কেমন? আর ওধারে ঐ মিস্ত্রীবৌয়ের ওখানেও। দেখি, কে কেমন মজা করছে!"

"বেশ।"

রমলা কড়াই হইতে তপ্ত দুইখানা চপ্ চীনামাটির ছোট্ট রেকাবীটির উপরে নামাইতে নামাইতে স্বামীর মোড়াটার কাছে ঠেলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, গরম গরম খেতে থাক আমি ভাজ্‌তে থাকি।"

একটু থামিয়া আবার "বর্ষার দিনে খেতে সব চেয়ে আরাম। না?"

সুরেশ হাসিয়া উত্তর করে, "হুঁ, যদি ঘরে খাবার থাকে।"

অপরাহ্নে বৃষ্টিটা একটু ধরিয়াছে। রমলা ও সুরেশ জলযোগ সমাধা করিয়া বর্ষার ছবি দেখিতে বাহির হইল। শাড়ীখানা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি টানিয়া তুলিয়া রমলা থপ্ থপ্ করিতে করিতে জল ছিটাইয়া ছিটাইয়া সশব্দে চলিয়াছে, আর চারদিকে সকৌতুক দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতেছে। ছোট বড় গাছগুলি আমজ্জিত দাঁড়াইয়া, আর স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কচুগাছের পাতার ভীড়। রমলার পায়ের কাছেই একটি কচুপাতার উপরে এক গণ্ডূষ টল্‌টলে জল, আর একটির উপরে একটা জোঁক লক্‌লক করিতেছে। "ও বাবা!" বলিয়াই রমলা একলাফে স্বামীর গা ঘেঁসিয়া খানিকটা জল ছিট্‌কাইয়া শাড়ীর কিয়দংশ ভিজাইয়া ফেলিল।

সুরেশ রহস্য করিয়া বলে, "দেব নাকি গায়ের উপর ছেড়ে?"

চলিতে চলিতে আজানু জল জঙ্ঘা অবধি উঠিয়া আসিতেছে। লীলাদের ঘরগুলি আর একটু ওদিকেই। রমলা কোনমতে বড় ঘরখানার দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। "কি গো, ঝড়বাদলে কেমন আছ সব? দেখতে এলাম।"

লীলা ঘরের এক কোণে বসিয়া ষ্টোভ ধরাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, ডাক শুনিয়া ফিরিয়া শুষ্কমুখে একটু হাসিল। লীলার মা বলিলেন, "আ—র আছি। ছোটখুকীতো পরশু থেকে জ্বরে পড়েছে. কানাইটারও আজ দেখছি একটু গা গরম গরম। এদিকে রান্নাঘর তো জলে জলময়! কি করে যে দিন যাচ্ছে, বাছা।"

রমলা চাহিয়া দেখিল, হাঁড়িপাতিল, থালাবাটি সব ঐ শোবার ঘরেরই একপাশে আনিয়া জড় করা হইয়াছে, দরজার ওধারে বারান্দার উপর ভিজা কয়লার স্তূপ। বারান্দারই অন্যপাশে একখানা চৌকির উপরে লীলার বাবার বিছানাখানা। রমলা বলিল, "কই, ছোটখুকী কই দেখি?"

পাশের কামরাটিতে বেলা কাঁথামুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, আর খাটের কাছেই মেঝেতে কানাই একবাটি মুড়ি কোলের কাছে লইয়া অর্দ্ধেক ছড়াইতেছে, অর্দ্ধেক চিবাইতেছে। নালিশের সুরে সে বলিল, "চিবোতে পারছি না মা, একেবারে স—ব মীইয়ে গেছে।"

মা বলিলেন, "বর্ষার দিনে মুড়ি অম্‌নি মীইয়েই থাকে। ভালো মুড়ি পাব কোথায়? ওই খেতে হয়।"

লীলা জল চাপাইয়া ওদিক হইতে বলিল, "এরোরুটের কৌটোটা কিন্তু একেবারে খালি হয়ে গেল মা। এই এবারকার মত হল। কাল সকালে আর হবেনা। দাদাকে আর একটা আন্‌তে বলে দিয়েছ তো?"

"হুঁ। কিন্তু বেচারীর এত জিনিষ একসঙ্গে মনে থাকলে হয়। কেরোসিনও নেই, নুন গলে জল হয়ে গেছে, ডালও নেই। বলেছি তো সবই।"

লীলা বার্লির জল নাড়িতে নাড়িতে রমলাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়ীতে জল হয়েছে, বৌদি?"

"হুঁ—" বলিয়া একটা দীর্ঘ টান দিয়া রমলা বলিতে যাইতেছিল, "ভারি সুন্দর," কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শেষ অংশটুকু কেমন যেন মুখের মধ্যেই রহিয়া গেল।

আবার ঝপ্ ঝপ্ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। রমলা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, লীলার দাদা আফিস-ফেরৎ বাড়ী আসিতেছেন। আফিসের কেরাণী, ঝড়বাদলেও ছুটি নাই, কাজেরও বিরাম নাই। তিনি আসিতেছেন—মাথায় একটি ছাতা একহাতে ধরা, আর একহাতে কেরোসিনের বোতল ও একটি বার্লির কৌটা আঙ্গুলের অপূর্ব্ব কসরতে পাশাপাশি দোদুল্যমান। শার্টের পকেটটি অস্বাভাবিক ফুলিয়া আছে এবং দুইতিনটি কাগজের পোঁট্‌লা সেখান হইতে বাহিরে উঁকি দিতেছে। দুইটি হাতই ব্যাপৃত, অতএব পরণের কাপড়খানি তুলিয়া ধরিবার সুযোগ নাই, নিম্নার্দ্ধে ভিজিতে ভিজিতে তিনি বিরসমুখে ঘরে আসিয়া উঠিলেন। রমলা একটুখানি ঘোম্‌টা টানিয়া ওপাশে সরিয়া গেল।

হঠাৎ পায়ের আঙ্গুলে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা নরম-নরম কি একটা স্পর্শ লাগিতে সে চম্‌কাইয়া তাকাইয়া দেখে—একটা কেঁচো। সারা গায়ের মধ্যে শিব্ শিব্ করিয়া যেন একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। একলাফে দুই পা পিছাইয়া বেলার খাটের কাছে আসিয়া দেখে, কানাইএর বিকীর্ণ মুড়িগুলির পাশেতে দুই তিনটি লম্বা লম্বা কেঁচো মোড়াইতে মোড়াইতে অগ্রসর হইতেছে। সাতঙ্কে রমলা বলিল, "ওরে কানাই, ওঠ্ ওঠ্। দেখছিস্ না, কি আস্‌ছে ও গুলো?"

কানাই নির্ব্বিকারভাবে চাহিয়া দেখিল, বলিল, "ও দূরে আছে।" তারপরে ঘরের কোণের ঝাঁটা হইতে দুইটা কাঠি ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিল, "দাঁড়া ব্যাটারা, মজা দেখাচ্ছি।" একটা কেঁচোর গায়ে একটি শলাকা দিয়া সজোরে এক খোঁচা দিতেই সেটা তড়াক করিয়া কুণ্ডলাকারে লাফাইয়া উঠিল। রমলা ঘৃণায় ঠোঁট্ উলটাইয়া বলিয়া উঠিল, "ম্যাগোঃ!"

লীলা দাদার খাওয়ার জায়গা করিয়া দিতে এঘর হইতে ঝাঁটা লইতে আসিল। রমলাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "তোমার ভয় করছে বুঝি, বৌদি?"

"ভয় নয় ভাই, ঘেন্না করছে! তোর করে না?"

লীলা একটু হাসিয়া বলিল, "কবে আবার না? কিন্তু কি করব ভাই? বর্ষাকালে প্রতিবছর এ উৎপাত যে লেগেই আছে! এবার না হয় বান হওয়াতে আর একটু বেশী।"

লীলা ঝাঁটা লইয়া বারান্দায় আসিল। দাদা দশটার সময় আফিসে গিয়াছিলেন অভুক্ত, উনুনের অভাবে, খাদ্যসামগ্রীর অব্যবস্থায়, অত সকালে ভাত বাঁধিয়া দিতে পারে নাই। দুপুরবেলা কোনরকমে চালডাল সিদ্ধ করিয়া যে খিচুড়ী বাঁধিয়া নামানো হইয়াছে, সেই ঠাণ্ডা আহার্য্যটুকু একটু গরম চড়াইয়া লীলা বারান্দা ঝাঁট দিতেছে, আর দড়ির মত মোটা এক সারি বাঁধা পিপীলিকার দংশনে বারবার পা ঝাপ্‌টাইতেছে, হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, "ও—মাঃ।"

"কি হলরে?"

লীলা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "দেখ এসে শীগ্‌গির, কি একটা দেখলাম যেন। দাওয়ার কোণে ঐ ফাটলের মধ্যে থেকে একটা ল্যাজের মত বেরিয়ে আছে।

মা ও দাদা সভয়ে যুগপৎ বলিলেন, "সা—প?"

রমলার অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিল। কোনরকমে তাড়াতাড়ি বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে বলিল "যাই ভাই লীলা, আবার বৃষ্টি আসছে।"

লীলারা তখন সাপ লইয়া ব্যস্ত। রমলা কাপড় গুটাইয়া বাহিরে নামিয়া পড়িল। সুরেশ বাহিরের ঘরে লীলার বাবার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, পত্নীর সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল।— "কি, এবার বুঝি মিস্ত্রীবাড়ী যাওয়ার পালা? চ—ল।"

"না, না, আর মিস্ত্রীবাড়ী-টাড়ী নয়। এবার বাড়ী যাব।"

"কেন? এত শীগ্‌গির? বর্ষার রূপে অরুচি ধরলো নাকি?"

রমলা বলিল, "না, তা কেন?—"

"তবে?"

রমলা হয়তো বা কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কিসের দুর্গন্ধ পাইয়া নাকে আঁচল চাপিয়া ধরিল। নিরীক্ষণ করিয়া দেখে—চার পাঁচ হাত দূর দিয়া পীতাভ কয়েকখণ্ড কি যেন মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতেছে।—"থুঃ, থুঃ, ওয়াক্!"

মজুর

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ চৌধুরী

আমবা পাইনি কেহ পৃথিবীব স্নেহ ভালোবাসা
সমাজেব দ্বাবে দ্বাবে গ্লানি আব অপমান ছাড়া .
সফল হয়নি কভু আমাদেব কোনরূপ আশা—
কাবো বুকে বাজে নাই আমাদেব বেদনাব সাড়া

আমবা পাইনি কভু মানুষেব কোনো অধিকাব
পবিপূর্ণ এ জীবনে অপূবণ বযে গেছে কত .
আমাদেব বেদনায ভিজেনাক কাবো আঁখিধাব,
অতলে তলাযে গেছে আমাদেব সুখ শান্তি যত ।

আমবা দিযেছি বহু এই মহা ধবণীব লাগি'—
কলে মোবা দিনবাত কবিতেছি প্রাণপণ কাজ .
আমাদেব বক্তধাবে কল যত উঠিযাছে জাগি ঃ
তবু হেয ঘৃণ্য মোবা এ বিশাল জগতেব মাঝ ।

আমাদেবি শ্রমজলে বেচে আছে ধনিকেব দল- -
তবু নিপীড়ন চলে অহবহঃ আমাদেব'পবে.
যুগান্তেব অভিশাপ আমাদেবে কবেছে বিকল •
মানুষ হইতে তবু আশা আজি জাগিছে অন্তবে ।

পরিবর্ত্তন

অনুবাদিকা—শ্রীমতী স্নেহলতা সেন

বর্ত্তমান রাশিয়ায় বহু ভূতপূর্ব্ব অপরাধী, যারা এককালে চুরি, জুয়াচুরি ইত্যাদি ক'রে ঘৃণিত জীবন যাপন করত, তাদের ম[illegible] অনেকেই আবার সৎ পথে এসে রাশিয়ার সমাজে অনেক দায়িত্বসম্পন্ন কাজ করছেন। অনেক বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। নিম্নলি[illegible] গল্পের নায়ক জোসেফ এলম্যান এককালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবন যাপন করতেন। বর্ত্তমানে তিনি সাংবাদিকের কাজ করছেন। [illegible] গল্পটী তাঁরই আত্মকাহিনী।

হঠাৎ কখন কেমন ক'বে আমাব জীবন পথেব চক্রবেখা ঘুবে গেল, কবে আমাব প্রথম একবা[র] ভাল হবাব সখ হল, আজ আপনাদেব আমি সেই কথাই বলব। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'বেই আমা[র] জীবন যাত্রা সুরু হয। স্কুল জীবনেই আমি চুবি কবতে শিখি। এই বিদ্যায হাতেখড়ি হ'ল আমা[র] একটী ছোট্ট বন্দুক চুবি ক'বে। অবিলম্বেই এই চুবিব কথা প্রকাশ হ'যে পড়ল, সন্দেহ কব[ল] আমাকে। সে যাত্রায বাবা যদি আমাব সহায না হতেন তাহলে আমাকে স্কুল থেকে বিতাড়ি[ত] হ'তে হ'ত। তাবপবে দশটী বছব পাব হ'যে গেছে। এই সুদীর্ঘ দশবছরে আমি আমাব ব্যবসা[কে] পাকা ক'বে নিলাম, প্রায বাবটী সহবেব পুলিশ আমাব পেছু তাড়া করল। এহেন ঘৃণিত জীব[ন] আবম্ভ কবেও আমি এককালে ভাল হযেছিলাম। কিন্তু কেমন ক'বে ভাল হলাম সেই কথাই বলছি।

শেষবাবেব মত প্যাবিসেব জেল থেকে বেবিযে আবাব আমাব বাল্যেব শত-স্মৃতি-বিজড়ি[ত] অতি পবিচিত মস্কোতে ফিবে এলাম। নগবীব এক নির্জ্জন প্রান্তে আবাব আমাব বাসা বাঁধলাম। শবতেব এক সুন্দব সন্ধ্যায পথে বেড়াতে বেবিযেছি। মস্কোব সন্ধ্যাব সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয় দৃশ্য। এই মনোবম দৃশ্য দেখলে মনে আপনা হতেই পবিত্র ভাবেব উদয হয। জনগণেব হর্ষোৎফুল্ল কলব[ব] সন্ধ্যাব স্নিগ্ধ সমীরণে ভেসে আসছিল, এই পবিত্র আবহাওযা মানুষেব মনেব সকল পাপেব ছা[প] মুছে দিযে স্বর্গীয পবিত্রতায ভবে দেয। বিগত ঘৃণিত জীবনেব যবনিকা টেনে আবাব নব জীবন লাভে[র] আকাঙ্ক্ষা জাগে। মনটা যখন আমাব এইবকম অভিনব ভাবে আপ্লুত তখন ঘুবতে ঘুরতে আ[মি] একটি সিগাবেটেব দোকানে সামনেব সিগারেট কেনবাব জন্য উপস্থিত হলাম। আমাব সাম[নে] হ্যাটকোটধাবী মধ্যমাকৃতিব একব্যক্তি দোকানে কি কিনছিলেন, ঢুকেই দেখি লোকটীব পেছনে এক[টি] হলদে বংএব চামড়াব ব্যাগ ভূমিতে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ সকলের অলক্ষ্যে চিবদিনেব অভ্যাসম[ত] আমি সেটিকে কুড়িযে নিলাম। কিন্তু ব্যাগটী আত্মসাৎ ক'বে পুনবায পুবোণো পাপেব পথে ফি[রে] যাব, কি সেটিকে তাব মালিককে দিযে ভাল হব এই দ্বিবিধ দ্বিধায মনটা ক্ষণিকেব জন্য চঞ্চল হ[য়ে] উঠল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই আবাব ভাল হবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'যে উঠল। লোকটির দিকে এগিযে গি[য়ে] বললাম, "এটি কি আপনাব ?" লোকটী আমাব কথায চমকে উঠে নিজেব পকেটে হাত দিযে বললে "হ্যাঁ, ওটা আমারই।" ব্যাগটী তাকে ফিবিযে দিতে তিনি আমায অনেক ধন্যবাদ দিলেন ও আম[াকে]

হাত দুটী ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, "আপনি আজ আমাব মস্ত উপকার কবলেন, কেবল ধন্যবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কববাব জন্য তিনি আমায বারবাব পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন, আমি অতি বিনীতভাবে তার আমন্ত্রণ অস্বীকার কবলাম, ততক্ষণে ক্ষুদ্র জনতাব মধ্য থেকে আমাব প্রচুর সুখ্যাতি আরম্ভ হযে গেছে। পাঠকগণ নিশ্চযই বুঝতে পারছেন এবক। অভিজ্ঞতা কত নতুন। সেদিন প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয আনন্দ নিযে দোকান পবিত্যাগ করলাম।

কিন্তু ব্যাগ সংক্রান্ত ব্যাপাব সেইখানেই পবিসমাপ্ত হলনা। পবেব দিন সন্ধ্যায আমি যখন সিনেমা গৃহ থেকে ফিবছিলাম তখন এক পবিচিত কণ্ঠস্বব কানে এল, চেযে দেখি একটী মোটব গাড়ীর ভেতব থেকে আমাব গতদিবসেব বন্ধু সেই ব্যাগেব মালিক সহাস্যে আমায ডাকছেন, তিনি বললেন, "আজ যখন আপনাব দেখা পেযেছি তখন আপনাকে আমাব বাড়ীতে নিযে যাবই।" এবাবেও আমি তাব আমন্ত্রণ অস্বীকাব করলাম।

ব্যাগঘটিত ঘটনাব সেদিনেও যবনিকা পতন হ'লনা। কযেকদিন পবে এক ছুটীব দিনে পার্কে বেড়াচ্ছি। সেখানে দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকল প্রকাব লোকই বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ভিড়েব মধ্যে একটা লোকেব সঙ্গে ধাক্কা লাগবাব উপক্রম হতেই চেযে দেখি লোকটী আব কেউ নয সেই ব্যাগেব মালিক। এবাবে তিনি একলা ছিলেন না। তাঁব পাশে একটী সুন্দবী স্ত্রীলোক ছিলেন। আমি কিছু বলবাব আগেই তিনি আমায জড়িযে ধবে সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'এবাবে আপনাকে হাতেব মধ্যে পেযেছি। উত্তবে আমি বললাম, "আপনি দেখছি বীতিমত আমাব পেছনে ধাওযা কবেছেন।" তিনি তাঁব স্ত্রী ভেবা আলেকজাণ্ডোভনাব সঙ্গে আমাব পবিচয কবিয়ে দিলেন। এবং তাঁব নিজেব নাম আইভ্যান পেট্রোভিচ বলে পবিচয দিলেন। আমাকেও নিজেব প্রকৃত নাম গোপন বেখে একটী ছদ্মনামে আত্মপবিচয দিতে হ'ল। তিনি বললেন, "আজ আব আপনি কোনমতেই আমাদেব হাত এড়াতে পাববেন না। আজ রাত্রে আপনাকে আমাদেব সঙ্গে আহাব কবতে হ'বে কি বল ভেবা?" ভেবাও এই কথায সায দিযে বললেন, "হ্যা, আজ যাতে আঁপনি আব আমাদেব ফাঁকি দিযে না যেতে পাবেন সেজন্য আপনাকে আমবা আমাদেব মোটবে কবে নিযে যাব।" এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলাম। কিন্তু কোন ওজব আপত্তিই টিকবেনা মনে ক'বে বাজী হওযা ছাড়া আমাব উপাযন্তব রইলো না। পেট্রোভিচ ও আমি পেছনেব সিটে বসলাম, ভেবা সামনের সিটে বসে মোটব চালিযে নিযে গেলেন, গাড়ীটা নগরের মাঝখানে একটী সাদা বাড়ীব সামনে এসে থামল। মোটব থেকে নামতে নামতে পেট্রোভিচ বল্লেন, "পলাতককে আজ গৃহে এনে হাজিব কবেছি।" আমবা সকলে ভেতবে প্রবেশ কবলাম, গৃহে প্রবেশ কবে ভেরা আহাবের আয়োজন কবতে লাগলেন, আব পেট্রোভিচ তার সুসজ্জিত গৃহগুলি আমায দেখাতে লাগলেন, ড্রইংরুমে ঢুকে একটী পিয়ানো দেখে আমাব খুব বাজাতে ইচ্ছা হল। বাজাতে গিযে আমি অবাক হযে গেলাম। এতদিনের অভ্যাসেও আমি পিযানো বাজনা একটুও ভুলিনি। আমাব বাজনা শুনে ভেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবতে লাগলেন। আইভ্যান আমার সঙ্গীতে পাবদর্শিতা দেখে বল্লেন আমি নিশ্চয়ই মস্কো

অধিবাসী। আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'ল। আমি বল্লাম্ না, "আমি এই সহরে বেড়াতে এসেছি।" একটু হতাশ হ'যে আমার বন্ধু বললেন, "আপনি যদি এই সহরের অধিবাসী হ'তেন তা'হলে আপনাকে এখানকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তিকরে দিতাম, যাই হোক আপনার কিন্তু সঙ্গীতের চর্চ্চা রাখা উচিত।" একটু হেসে আমি বল্লাম, "সঙ্গীত শেখায় আমার প্রযোজন কি? আমার পেশা কোন শিল্পকলা থেকেই পৃথক নয়।" এই ব'লে আর একদফা মিথ্যার শরণ নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পেশা কি?" আমি বল্লাম, "আমি একজন সাংবাদিক।" তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'সাংবাদিকের কাজত খুবই আনন্দদাযক।" তিনি বল্লেন, আমি নিশ্চযই কোন বিশেষ কাজে মস্কোতে এসেছি। আমিও মাথা নেড়ে জানলাম তাঁর অনুমান সত্য। আমার কথা শুনে তেরা জানালেন যতদিন আমি এখানে আছি ততদিন আমাকে তাঁদের অতিথি হ'যে থাকতে হবে। তাদের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। যতদূর সম্ভব নম্রভাবে তাদের আতিথ্য থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। আমি আমার এই পরম দযালু বন্ধুদ্বযের গৃহে কিছু দিনের জন্য অধিষ্ঠিত হলাম। যে ঘরটীতে পিযানো ছিল সেই ঘরেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হল। একদিন একা ঘরে বসে আছি এমন সময টেবিলের পাশে ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই প্রশ্ন হ'ল, "এটা কি সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার কমরেড লিওনভের বাড়ী?" প্রশ্ন শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। আমার মত একজন প্রসিদ্ধ চোর কিনা বসে আছে সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বারের ঘরে। আমি প্রশ্নকর্ত্তাকে অপেক্ষা করতে বলে আইভ্যান পেট্রোভিচের সন্ধান গেলাম। তার পড়বার ঘরে ঢুকে কম্পিত কণ্ঠে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার নাম কি লিওনভ?" তিনি অতি সহজভাবেই উত্তর দিলেন "হ্যাঁ আমার নাম লিওনভ।"

আমার জীবনের একমাত্র সৎকর্ম্মের এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিদান পেযে মনে হতে লাগল বাকী জীবনটা সৎভাবে কাটালে কেমন হয। সৎভাবে জীবন যাপন করবার কল্পনা আমার পক্ষে এতই অভিনব যে, ঐ সংকল্প যেদিন আমার মনে হ'ল সেদিনটাকে আমি ক্যালেণ্ডারে লালকালি চিহ্নিত করে রাখলাম।

মস্কোর পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমার শৈশবের মস্কোর সঙ্গে আজকের মস্কোর এই অভাবনীয পরিবর্ত্তন আমার মনকে বিস্মযাকুল করে তুলছিল। একদিন আমিও এই মস্কোর অধিবাসী ছিলাম এবং এর সেই বিরাট কর্ম্মসংগ্রামের সৈনিক ছিলাম। কিন্তু আজ সে কথা আমার কাছে স্বপ্নের মত। তখনকার মস্কো অধিবাসীগণ মাথার ঘাম পাযে ফেলে আপন অভাব অভিযোগ ভুলে গিযে, দেশকে নতুন করে গড়তে ব্যস্ত। নতুন উদ্যমের নেশা যাদের কেটে গেল তারা পরিশ্রমের পথ, কষ্টের পথ, ছেড়ে দিযে নিজেদের স্বার্থ খুঁজতে লাগল। এই মুষ্টিমেয জনকয়েক স্বার্থান্বেষী রাশিয়ার মহান আদর্শের কথা ভুলে গিযে অর্থ ও সুখের সন্ধান করতে লাগল। আমিও তাদেরই মত কর্ত্তব্যের পথ ছেড়ে পাপের ঘুর্ণিপাকে নিজেকে ফেলে দিলাম।

"লয়শা!" হঠাৎ শৈশবের নাম ধরে কে ডাকতেই চেয়ে দেখি আমার বাল্যের বন্ধু সুরা দাঁড়িয়ে আছে। নিমেষেই শৈশবের সমস্ত স্মৃতি চকিতে একবার আমার মানসপটে ভেসে উঠল, অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সুরাও আমার মুখের পানে চেয়ে বিস্ময়ের হাসি হেসে বলে উঠল, "আমায় চিনতে পাচ্ছনা? আমি সুরা।" একটু সামলে নিয়ে বললাম "হ্যাঁ, তোমায় চিনতে পেরেছি।" সুরা বললে, "এখনও কি তোমার লেখক হবার সখ আছে? এতদিন কি তুমি মস্কোতেই ছিলে?" কেন জানিনা তাকে মিথ্যা করে বললাম না, "আমি এই মাত্র মস্কোতে পৌঁছেছি।" আমার কথা শুনে সুরা আমাকে মস্কো সহর দেখিয়ে আনবার প্রস্তাব করল। তার প্রস্তাবে আপত্তি করতে পারলাম না। আমার সামনে পুনরায় এক পরীক্ষা উপস্থিত হল। যে মস্কোর কোণ অনুকোণ পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল আজ সুরাকে পথ প্রদর্শক ক'রে সেই মস্কো পরিদর্শনে আমাকে বেরোতে হবে। সুরা বাস্তবিকই খুব ভাল মেয়ে। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে জানলাম সে গত ছ'বছর যাবৎ এখানে আছে এবং শীঘ্রই স্থপতি বিদ্যায় ডিগ্রীলাভ করবে, সুরার সংস্পর্শে এসে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল একই আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে কি করে দুইটি বালক বালিকা বিভিন্ন চরিত্রের হতে পারে। অবশেষে আমাকে সুরার নির্দ্দয় প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'ল। সে জানতে চাইল আমি কি করি। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হয়ে রইলাম, "আমি চোর" এই কথাই তাকে বলা উচিত ছিল। কিন্তু এই নির্ম্মম সত্যটী বলবার সাহস আমার ছিল না। মিথ্যার অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে তার কাছে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলে জাহির করলাম, আমার কাল্পনিক সাংবাদিক জীবনের কয়েকটী রচিত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ব'লে তাকে আমার সম্বন্ধে সংশয়শূন্য করবার চেষ্টা করলাম, শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলতে বলতে ক্লান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলাম।

শীতকাল প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আমার বয়স ছাব্বিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। প্রায় দু'মাস আমি চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে সৎভাবে জীবন যাপন করছি। কর্ম্মহীন অলস জীবন আর ভাল লাগছিল না। জীবনের আধখানা বৃথাই কাটিয়েছি। এতদিন যে জীবন কাটিয়েছি আজ তা' অত্যন্ত একঘেয়ে লাগছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মস্কোর এক পথ ধরে চলেছি। কোন কিছুতেই আজ আর আনন্দ পাইনা। বইতে মন বসাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। আমার আত্মকাহিনী কারুকে না বলতে পারা পর্য্যন্ত আমি শান্তি পাব ব'লে মনে হয়না। অবশেষে স্থির করলাম দিনের পর দিন আর এমন ভাবে কাটতে দেবনা। পরদিন সকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রকিউরেটারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। প্রৌঢ় প্রকিউরেটার সামনেই ব'সে ছিলেন। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি আমার মুখের দিকে এমন করে তাকাতে লাগলেন মনে হ'ল যেন তিনি আমার উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলে তাকে সম্বোধন করব। তিনি বল্লেন, "কমরেড্ বললেই যথেষ্ট হ'বে।" সে মুহূর্ত্তেই গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তা দ্রুত পদ-বিক্ষেপে আমার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে বুঝলাম আমার সামনে সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রকিউরেটারকে বললেন, "ইনি একজন শিক্ষিত চোর

এই সহবেব প্রত্যেক পুস্তক বিক্রেতাই একে চেনেন।" প্রকিউবেটার তার কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা কবলেন "তুমি কি শিক্ষিত?" আমি ঘাড় নাড়লাম। এই কথা শুনে তিনি অধিকতব উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি রকম কাজ কবতে চাও?" আমি মাথা নীচু কবে এই কথাই চিন্তা কবতে লাগলাম, সাংবাদিক জীবনেব প্রতি বরাবরই আমাব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু সাহস কবে একথা আমি তাদেব বলতে পাবছিলাম না। আমাকে ইতস্ততঃ কবতে দেখে প্রকিউবেটাব ভরসা দিয়ে আমাব সত্যকাব ইচ্ছা জানাতে বললেন। অনেক ইতস্ততর পর তাকে বললাম, "কোন সংবাদপত্রে আমি কাজ কবতে চাই। কিন্তু সে কল্পনা আমার কাছে স্বপ্নেব মত। কিন্তু সংবাদপত্র পবিচালনা কবা সৎ লোকেব কাজ। উত্তবে তিনি বললেন, "আজ তুমি যখন এখানে এসেছ এবং এই মুহূর্ত্তে যেকথা বল্লে তাতে প্রমাণ হচ্ছে তুমি আর অসৎ নও।" আমি যে সৎ হ'য়েছি সে বিশ্বাস সেই দিনই আমাব প্রথম হ'ল।

রাজনৈতিক মতবাদ সংগঠন

কালীপদ ঘোষ

দেশেব বাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সঙ্কটাপন্ন। কংগ্রেসেব বর্ত্তমান নেতাবা দেশেব স্বার্থেব বিরুদ্ধে কাজ কবিতে উদ্যত বলিযা কর্ম্মীদের মনে সন্দেহ, বামপন্থীবা দলাদলিতে এবং পবস্পবেব মতবিবোধে নিজেদেব শক্তিব ব্যবহাব কবিতে অক্ষম। ইহাতে কর্ম্মীবা যে হতাশায ও ক্ষোভে ব্যথা পাইতেছেন তাহাদের কথায ও লেখায তাহাব সাড়া পাওযা যায। কিন্তু যাহারা দূরে বসিযা সংবাদপত্র ও সাময়িকী পড়িযা ভাবতবর্ষেব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছেন তাহারা এই সঙ্কটকালেব মধ্যেও আলোর বশ্মি দেখিতেছেন।

গত আঠাব মাসেব মধ্যে দেশীয বাজ্য সমূহেব আন্দোলন, প্রজা আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিযনের প্রসাব সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাছে। এই সকল মুক্তিসংগ্রামের অনুকূল শক্তি বলিযা ইংলণ্ডে ও আমেবিকায ভাবতেব বন্ধুবা উল্লাস প্রকাশ কবিযাছেন। অথচ উক্ত আঠাব মাসের মধ্যে ভাবতেব বাজনৈতিক লেখায ও চিন্তায যে নূতন নূতন শক্তিব আবির্ভাব হইযাছে তাহা অনেকে লক্ষ্য কবেন নাই, এবং লক্ষ্য কবেন নাই বলিযা মুক্তি সংগ্রামে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পাবেন নাই। বাস্তবভাবে চিন্তা করিলে স্বীকাব কবিতে হয, যে শক্তিশালী চিন্তাস্রোত বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের মত আজ ভাবতবর্ষে ছাপাইযা পড়িযাছে, উহাদের স্থান ও প্রভাব প্রজা আন্দোলনের চাইতে কিছু কম নয। আজকার চিন্তায ভারতের অদূর ভবিষ্যতের ব্যাপাবগুলিতে জনশক্তির স্থান এবং সেই শক্তির প্রযোগেব প্রণালী ও কায়দাকৌশলের উদ্বোধন হইতেছে। এই কাজে "মন্দিরা"

লেখক লেখিকারা এবং আর যাঁহারা নিযুক্ত হইযাছেন তাঁহাবা সকলেই অপবিসীম দাযিত্ব বহন করিতেছেন।

গত আঠার মাসের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদেব সমর্থনে অনেকগুলি সংবাদ ও সামযিক পত্রিকার প্রচার সুরু হইয়াছে, অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে, ছাত্রমহলে অগণিত পাঠমণ্ডল (ষ্টাডি সার্কল) স্থাপিত হইযাছে ; ইহাদের সংখ্যা যে ক্রমাগত বাডিযা চলিবে তাহা অনুমান কবা কিছু কঠিন নয়। তাবপব, দেশে পরাধীনতার বেদনা ও সেই কাবণ প্রযুক্ত মনোভাবেব মধ্যে, শ্রমিক আন্দোলনেব বাল্যাবস্থায সহসা সমাজতন্ত্রবাদের প্রবেশ হওযায যে, অনেকগুলি বিভিন্ন দলেব সৃষ্টি হইবে তাহাও বোঝা যায। একদিকে সমাজতন্ত্রবাদেব প্রতি প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে দলগত মতপার্থক্য ঃ এই দুইযের মধ্যে পডিযা প্রত্যেকদল যে তাহাদেব নিজস্ব মত ও প্রণালী ঘোষণাব জন্য সংবাদপত্র ও প্রকাশালয় স্থাপনা কবিবেন তাহা অবশ্যম্ভাবী এবং যুক্তিসঙ্গত। যে সমযে আমবা গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহেব দাবী কবিতেছি সেই সমযে প্রত্যেক দল ও ব্যক্তি যাহাতে নিজ নিজ মত প্রকাশ কবিতে যথেষ্ট সুযোগ পায এবং এমনকি পরস্পবেব সাহায্য পায তাহা সকলেব দেখা কর্ত্তব্য। এই প্রকাবে দল ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সহাযক হইবাব ইচ্ছায পুস্তিকা (প্যাম্ফলেট) প্রকাশ সম্বন্ধে কযেকটি কথাব অবতাবণা কবা হইতেছে।

পুস্তিকা প্রকাশেব কথা উল্লেখ কবিতে সহজেই ইহাব যথার্থ সুবিধা, অসুবিধা ও কার্য্যকাবিতা সম্বন্ধে অনেক কথা মনে উঠিবে, এবং প্রস্তাবটিব সবলতার জন্য অনেকে ইহাকে মোটেব উপব লঘু বলিযা মনে করিবেন শঙ্কা হয। কিন্তু গণআন্দোলনেব অতীত ও আধুনিক ইতিহাসের সহিত যাহাদেব পরিচয আছে তাহাবা অবশ্য জানেন যে পুস্তিকা প্রচাব ইহার সহিত অবিচ্ছিন্ন।

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের শাসকেবা সর্ব্বদা আমাদেব মনে পবাধীনতাব বোধ সচেতন বাখেন, তাব ফলে মানব সভ্যতায ইংরাজী সাহিত্যেব দান স্বীকাব করিবাব মত মনেব প্রসাবতা আমাদেব সহজে আসেনা। ইংবাজী ভাষার গৌরব সুইফ্‌ট, মিল্টন, ডিফো, টম পেইন যে তাঁহাদেব সমযেব পুস্তিকা লেখক বলিযা খ্যাত ছিলেন সে কথা আমাদেব চেষ্টা কবিযা স্মবণ কবিতে হয। সুইফটেব "মডাবেট প্রোপোজাল", "ড্রেপিয়াব লেটাবস্" সমস্ত আযার্ল্যাণ্ডকে অত্যাচাবী জমিদাব শাসকদেব বিরুদ্ধে জাগাইযা তুলিয়াছিল। টম পেইনেব "আমেবিকান ক্রাইসিস" পবাজিত ওযাশিংটনেব সৈন্যদেব মনে এমনতর নবজীবন সঞ্চাব কবিযাছিল যে, তাবা ফিবিযা দাঁডাইযা ডেলাঅযাব নদী পার হইযা বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হয। ইংলণ্ডের ইতিহাসেব পাতাগুলি শ্রেণীযুদ্ধেব ইতিহাসে ভবা। এব প্রত্যেক যুদ্ধে দেখা যায় যে জনসাধাবণেব পক্ষ পুস্তিকা প্রচার তাদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিযাছে। ১৬৪০-৬০ খৃষ্টাব্দের "লঙ্ পার্লামেন্টেব" আমলে অসংখ্য পুস্তিকা ছাপা হইয়াছিল ; একটা পুস্তকাগারে ঐ সমযেব ২২,২২৫ খানা পুস্তিকা সংগ্রহ করা হইযাছে এবং উহা কিছু সম্পূর্ণ নয়। ১৮৩৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের "চার্টিষ্ট" আন্দোলন,—বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম বিকাশ,—পুস্তিকা প্রচারের এবং তাদের প্রভাবের বিস্তৃত পবিচয় দিযাছিল। ফবাসী

দেশের ইতিহাস হইতেও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। রুশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে লেনিনের পুস্তিকাগুলির কথা আজ আর কাহারও অজানা থাকা উচিত নয়, এবং রুশিয়ার বিপ্লবীদলে লেনিন একমাত্র পুস্তিকালেখক ছিলেন না। সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে ১৮৪৮ সালের মার্কস ও এঙ্গেলসের "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো" আজও অভিনব, আজও জ্ঞান, প্রেরণা ও উত্তেজনার উৎস।

বর্ত্তমান ইওরোপ ও আমেরিকায় উত্তম সংবাদপত্র, অসংখ্য পুস্তক ও লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের আন্দোলনে পুস্তিকা প্রচার একটা উচ্চস্থান গ্রহণ করিতেছে। ভারতবর্ষেও জনমণ্ডলীকে সমাজতন্ত্রবাদের কথা জানাইতে এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ ও দাবিগুলি সম্যকভাবে আলোড়ন করিতে নানাধরণের পুস্তিকার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। প্রয়োজনটি গুরুতর, এবং অবিলম্বে এই কাজটি সকল রাজনৈতিক দলের ও প্রকাশকদের হাতে লওয়া উচিত।

পুস্তিকার স্থান সংবাদপত্র ও পুস্তকের মধ্যবর্ত্তী। সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাগুলি নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের সহায়ক হইলেও, স্থানের অভাবে তাহাদের প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতে হয়। নানা-বিষয়ের আলোচনার মধ্যে পড়িয়া কোনও একটা প্রবন্ধ স্থায়ী বৈশিষ্ট্য লাভ করেনা, এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুরাণ হইয়া পড়ে। পত্রিকাগুলির সংরক্ষণ ও সেগুলির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা অতি অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব হয়। এই সকল অসুবিধা পুস্তিকার পক্ষে দাঁড়ায় না। তারপর, পুস্তকের মূল্য, আকার, ভাষা ও ভাল লাইব্রেরীর অভাবে সেগুলি কেবল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের হাতে পৌঁছিতে পারে। অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত ব্যক্তিরা পুস্তক হাতে পাইলেও কোন গভীর বিষয়ের পাঠে মন দিতে পারে না। অধিকন্তু পুস্তকের বিষয়বস্তুতে সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনার স্থান হয় না, হইলেও তাহা সাধারণের জন্য লেখা হয় না, সেজন্য দেশব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে তাহারা বিশেষ সাহায্য করে না। সহজ ভাষায় লেখা পুস্তিকা এই অসুবিধাগুলিও এড়াইয়া চলে।

পুস্তিকা ছাপাইবার প্রাথমিক ব্যয় অল্প বলিয়া ক্ষতির দুশ্চিন্তা কম। পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে শুনা যায় না। তবে ভারতবর্ষে যাহাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই তাহারা প্রথমে পুস্তিকার লেখক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটু সাবধান হইলে নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবেন। ছাপা, কাগজ এবং রঙ্গীন বা দু'রংএর মলাটে তাকে সুদর্শন করিলে পুস্তিকা বিক্রয় করা সহজ হইবে। ১৬, ২৪, ৩২, ৪৮, ৬৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা /০, /১০, ৵০, ৶০, ।০ মূল্যে লোকের মন আকর্ষণ করিবে। পুস্তিকা দু'এক দিনে বা দু'এক সপ্তাহে পুরাণ হইবে না, ভাল প্রয়োজনীয় পুস্তিকা বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বিক্রয় হইতে পারে, পরে ঘরোয়া লাইব্রেরীতে স্থান পাইবে।

পুস্তিকার ভাষা অবশ্য সুপাঠ্য হওয়া চাই। সেগুলি জনসাধারণের জন্য,—বিশেষত পরিবারস্থ মহিলাদের, ছাত্রদের ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জন্য,—লেখা হইলে দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক

আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য যোগাইবে। এই উপায়ে পুস্তিকার পৃষ্ঠপোষকেরা তাহাদের স্ব-স্ব মতের প্রসার ও দলের পুষ্টি লাভ করিবেন।

যদি বিদ্বান ব্যক্তিরা ও রাজনৈতিক নেতারা পুস্তিকা লিখিতে এবং সম্ভ্রান্ত প্রকাশকেরা পুস্তিকা প্রকাশ করিতে হাল্কা বা হীন কাজ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের ইউরোপ ও আমেরিকার নজীর দেখাইতে পারা যায়। এমন কি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ন্যায় অভিজাত প্রকাশকেরাও সম্প্রতি ৩ পেনী মূল্যের অনেকগুলি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, তাদের লেখকদের অনেকেরই নাম বিশ্ববিখ্যাত, যথা:—স্যার আর্থার সল্টার, জুলিয়ান হাক্সলে, স্যার আলফ্রেড জিমার্ণ। ইংলণ্ডের কম্যুনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিট, আমেরিকার কমুনিষ্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার, ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট নেতা মরিস্ ঠোরে (Thorey) প্রত্যেকেই অনবরত পুস্তিকা লিখিতেছেন। এই তিন দেশেই কম্যুনিষ্টরা তাদের দলের লোকসংখ্যার তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাব ও শ্রদ্ধা উপভোগ করে। বহুসংখ্যক পুস্তিকার প্রচার তার একটা প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষে এখন অনেকে সমাজতন্ত্রবাদের বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন ও লিখিতেছেন। মার্কসীয় সাহিত্যেরও অনুবাদ করা হইতেছে। এ সকলই প্রয়োজনীয় কাজ, এবং এতদ্দ্বারা যে মুক্তিসংগ্রামের কর্ম্মীদের বর্ত্তমান কাজে ও সমস্যায় কিছু কিছু সাহায্য হইতেছে তাহাও অনুমান করা যায়। তবুও দৈনন্দিন সমস্যার আলোচনায় নিযুক্ত পুস্তিকার অভাবের কথা ভোলা শক্ত। আমাদের শক্তির ও সুযোগের ষোল আনা ব্যবহার করা হইতেছে না। অবিলম্বে এই দুর্ব্বলতা দূর করা প্রয়োজন। প্রত্যেক কর্ম্মীর ও স্বাধীনতাকামীর মনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকিলে আগত মুক্তিসংগ্রামে আমাদের বিজয় নিশ্চিত।

বিজ্ঞাপনে একদিন

শ্রীমতী

চলেছি বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। চৌরঙ্গীতে দুজনে ট্রাম থেকে নেমে গেলাম একটা কি মস্তবড় দোকানে, প্রকাণ্ড হরফে তার সাইনবোর্ডে পরিচয় দেওয়া। বিজ্ঞাপন তারা অনেক কাগজেই দিয়ে থাকেন। হঠাৎ দোকানের কর্ম্মচারীগণ দুটী মহিলার আগমনে শশব্যস্তে দুটী চেয়ার টেনে দিয়ে মহাযত্নে সমাদর করে বসতে আমন্ত্রণ ক'রে বললেন—"কি জিনিষ চাই আপনাদের?" আমরাও অপ্রস্তুত না হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"ম্যানেজারবাবু আছেন?" কর্ম্মচারীগণ বড়ই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। একজন তো সরেই গেলেন—আরেকজন অঙ্গুলি সঙ্কেতে ম্যানেজারবাবুর অদূর অবস্থান

নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে অন্য খদ্দেরকে আপ্যায়িত ক'রে তাব প্রযোজনেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দেওযা এ বা কেউ প্রযোজনই বোধ করলেন না। যাহোক একটু পরে পুনরায স্মবণ করিযে দিলাম আমাদের প্রয়োজনের কথা। এবারে একজন হৃষ্ট পুষ্ট নধরকান্তি প্রৌঢ অতি ধীরমন্থব গতিতে এসে উপস্থিত হলেন। বিশাল বপুটী তাঁর জামার মর্য্যাদা বক্ষা করা মোটেই প্রযোজন বোধ কবেনি—তাই পাঞ্জাবীটা ঠেলে ঠুলে নিজেই আগে আগে চলছে। তার ওপর দেখলাম জামাটা হাত থেকে কনুই অবধি এত মযলা যেন ছাই মেখে নিযেছেন—আর কি দুর্গন্ধ। গাযের ঘামের আব পেঁয়াজেব দুটো গন্ধ মিলে যে সুগন্ধি আসছিল তার সঙ্গে মেশানো ছিল তাব নোংরা জামাটাব বোট্কা গন্ধ। তাছাডা লোকটাব তাম্বুলাসক্তি অত্যধিক থাকাব দরুন পুরু রাঙ্গা ওষ্ঠাধব ছাডিযে নীচের দিকে এদিক ওদিক গডিযে গডিযে আসছে চূন খযের মিশ্রিত লাল রস। দেখেই তো আমার চীৎকার এসে গেল। নেহাৎ দোকানের মতো যাযগা না হলে হযতো চোখ বন্ধ ক'বে চেঁচাতাম। যাহোক এদিক ওদিক চেযে নিজেকে সামলে নিলাম। আমাব সাথীটি বলল, "আমরা বিজ্ঞাপনেব জন্য এসেছি, আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন।" লোকটা বোধহয় বিজ্ঞাপনেব জন্য দুটী মহিলাকে আসতে শুনে অসম্ভব কাণ্ড কিছু একটা কল্পনা ক'বে নিলেন। এমন অসম্ভব কাণ্ড যে মেযেবা কবতে পাবে তাবা পুরুষ কি নাবী সে বিষযে তাঁব হযতো সন্দেহ এল। তোত্লা ছিলেন ব'লে অনেক কষ্টে অনেক পানেব বস ছিট্কিযে বললেন, "অ অ অ অন্য কোথাও দে দে দে দেখুন মশাইরা, এখানে এ—সব হ হ হ হবে টবে ন্না।" তৎক্ষণাৎ বেবিযে রাস্তায় এসে দুজনে হাসিব চোটে ফেটে পডলাম। দুদণ্ড গডিযে গডিযে হেসে নেবাব এত প্রযোজনও মানুষের হয! সেদিন বুঝলাম হাসি একটী অতি কষ্টদাযক ব্যাধি—এ ব্যাধি সভ্যজগতে থাকা উচিত নয, শোভনীয নয।

তারপর আবো কতকগুলি কোম্পানীতে গেলাম, কেউ বিজ্ঞাপন দিল কেউ দিল না। উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটনাও ঘটল না। সর্ব্বশেষে সন্ধ্যাব সময সেদিনেব মতো বিজ্ঞাপন সংগ্রহেব শেষ-বাডীতে এলাম। যে সমস্ত কোম্পানীতে বিজ্ঞাপনের জন্য যেতে হয তা' সাধারণতঃ থাকে বড বড় রাস্তায। কিন্তু আমরা এবাব যে ঠিকানা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম একটা অতি সংকীর্ণ গলিব মধ্যে। বাডীব গাযে নম্বরটী ঠিক আছে কিন্তু কোম্পানীর নাম নেই। সন্দেহ হ'ল সত্যই এখানে কোন কোম্পানীব অবস্থিতি থাকতে পাবে কিনা। বাডীটি তেতলা, কিন্তু অত্যন্ত পুরোণো। সন্ধ্যে হযেছে, রাস্তায বাতি জ্বালতে এসেছে—সরু গলিটায দাঁডিযে কেমন যেন বিশ্রী লাগছে। আমরা ঢুকব কিনা ইতস্ততঃ করছি দেখে একটা ছোট মেযে বেবিযে এসে বলল, "এসো না ভেতবে, মাকে ডাকব?" তবু আমবা দাঁডিযে দাঁডিযে কি ভাবছি দেখে সে রেগে গেল—তা' ছাডা মেযেদের হাতে ঘডি পরা দেখে সে জ্বলে উঠল। ঘৃণাব সঙ্গে নাক সিট্কিয়ে বলল্ "এঃ!, মেযেছেলে আবাব হাতে ঘডি পরা হযেছে।" আমরা তাকে কত ঘডি দিতে চাইলাম, সে কিছুতেই রাজী তো হ'লই না আবা মুখে তার ঐ একই কথা। এমন সময একটী বড ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম যে সেই কোম্পানী এই ঠিকানায় আছে কি না। সে বলল, "তিন তলায়।"

চৌরঙ্গীতে, ডালহাউসী স্কোযারে যত বড বড কোম্পানীতে গেছি তিনতলা, চাবতলা, পাঁচতলা সব উঠেছি লিফ্‌টে। কত প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদেব মতো এক একটা আফিস। কত ফ্যান, কত মস্ত মস্ত টেবিল চেযার, কত রকমের বাতি দিনের বেলাই জ্বলছে, কী গম্ভীব গম্‌গমে তার আবহাওয়া আর, কত বকমের লোকই না সেখানে নীরবে কাজ ক'বে যাচ্ছে। কিন্তু এ কোনখানে এলাম! এর মধ্যেও বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানী থাকতে পাবে? আবাব তেতলায। বিজ্ঞাপন দেবে এ বাড়ীর বাসিন্দা? কিছুতেই বিশ্বাস হয না, মনও এগোতে চায না। অনেক ইতস্ততঃ অনেক জল্পনার পর দুজনে মিলে স্থিব কবলাম, দেখাই যাক এব মধ্যে বিজ্ঞাপন দেবাব মত কোম্পানী থাকতে পারে কেমন ক'রে এবং সে কোম্পানী কি প্রকার পদার্থেব সৃষ্টি। কৌতূহল মিটিযে বাড়ী ফিরব এই সিদ্ধান্ত ক'রে ঢুকে পডলাম ভেতবে। এ বাড়ীতে পা দিযেই বুঝলাম অনেক ভাডাটেব বাস এখানে। ঢুকেই দেখি বাঁ দিকে একটা খুপ্‌রী ঘব, দিনেব বেলায সূর্য্যদেবেব সে ঘবে প্রবেশ নিষিদ্ধ, একেবাবে কডা শাসন—ফাঁকি দিযে উঁকি মাববারও উপায নেই, আব বাতে তো মা বসুন্ধরা আপনিই শীতল হযে যান, তখন বাতাসের কোনও প্রযোজনই থাকে না সে কথা আব কেনা জানে! বুঝলাম বাড়ী যারা তৈযারী করেছিল তাবা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। ঘবটা যত ছোটই হোক একটা হ্যারিকেন টিম টিম ক'বে জ্বলছে। সে আলোয দেখলাম কতগুলি মানুষেব বাচ্চা 'এঁডি, গেঁডি, ছানা, পোনা' মিলে সে কি হরেক বকমের বব তুলে চীৎকাব করছে। কিলবিল কবা একদল কেন্নোর বাচ্চা নয়, একগাদি আধমবা কুঁচো চিংডি নয, একেবারে মানুষ জাতীয কীট কুঁযোবঘরে মানুষ হচ্ছে, মেষ কদাপি নয। হায দ্বিজেন্দ্রলাল।

একটু এগিযে দেখি উপবে উঠবাব সিঁডি। নীচেব দিকে তাকিযে লোভ সংববণ করা দায় হযে উঠল। সাবাদিন ঘুবছি, ক্ষিদে পেযে পেযে বোধটাও প্রায লুপ্ত হযে গিযেছিল। কিন্তু সিঁড়ির নীচে বসে কেবোসিনের ডিবেব আলোয যে বিধবা মেযেটী দুই পা ছডিয়ে বসে তালের বড়া ভাজছে সে আমাদের সতৃষ্ণ লোলুপ দৃষ্টিব দিকে একবাব ভ্রুক্ষেপও করল না। ছাই তুমি মাযের জাত, ক্ষিদে টের পাওনা? কোথায তুমি অন্নদা দিদি, কোথায রইলে অভযা,—কোথায় আছ তোমরা! শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ খিদেয মবে যাচ্ছে, আর অন্নদাদিদি কিনা নিরুদ্দেশ। তুচ্ছাই শরৎবাবু, ও শুধু তোমাব কল্পনা, এমন ক্ষিদের সময তোমাব নাবীজাতি কিনা স্থির হযে বসে শুধু বডা ভাজে, খেতে দিতে জানে না। আমি যদি কখনো নারী চরিত্র আঁকি তাকে আমি ঠিক যেমনটী দেখলাম তেমনটীই তুলিতে ফলাব, সে সাবিত্রী নয, পশুরাজ নয়, অন্নদা দিদি তো কিছুতেই নয়,—সে হবে একেবারে আমার নিজে চোখে দেখা এই বড়া ভাজা মেযে—শুধু পারে পরিপাটী ক'রে রাঁধতে, জানে সঞ্চয ক'বে রাখতে, হযতো লুকিয়ে নিজে খেতেও জানে—কিন্তু জানে না ক্ষুধার্ত্ত আগন্তুককে খেতে দিতে, হযতো বা আগন্তুকের মনোবাঞ্ছা টের পেলে বডাশুদ্ধ গামলাটাই মুখে ছুঁডে মারবে, আশ্চর্য্য নেই কিছুই এর!

উঠলাম দোতলায়। এখানে দেখি ছোট্ট একটু বারান্দায় একটা উনুন, আর তার কাছেই এক

হাঁড়ি ভাত ফেন গালা হচ্ছে। কাছেই অনেকগুলি পিঁড়ি পাতা রয়েছে, তার সামনে থালাগুলো দেখবার মতো। বিয়ে বাড়ীতে শুধু অমন প্রকাণ্ড থালার ব্যবহার দেখেছি। এযে দেখি বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। ওরে বাবা! তিন হাত চওড়া থালায় খাচ্ছে বসে আড়াই আঙ্গুলের ছেলে মেয়েরা। এমন মজার ব্যাপার জীবনেও দেখিনি। বুঝলাম এই তেতলা বাড়ীতে একেবারে রামরহিমের মহাভারত চলছে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দেবে এ বাড়ীর বাসিন্দা। আবার তিন তলায় তার অবস্থান! নমুনা তো নীচের থেকেই দেখছি। দেখাই যাক সে কি ধরণের বা কোম্পানী আর কীবা তার বিজ্ঞাপনের বহর।

তিন তলায় পৌঁছে দেখি একটী শোবার ঘরে এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী গল্প করছেন। তাঁরা আমাদের দেখে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন—আমরাও অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেলাম। মহিলাটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কাকে চাই, কোম্পানীর নাম শুনেই বললেন "হ্যাঁ, এটাই"। যাক্ এতক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

আমাদের বসতে দিলেন পাশের ঘরে। ঘরটা একাধারে কি যে নয় তাতো জানি না। ডিসপেনসারী (কবিরাজী), পড়ার ঘর, শোবার ঘর, বৈঠকখানা আবার থালাবাসন তরকারীর ঝুড়ি বঁটিটাও আছে,—অর্থাৎ একাধারে অন্দরমহল ও বাহির মহল। আমরা বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলতেই বললেন "আপনাদের তো স্বদেশী পত্রিকা, আমাদেরও স্বদেশী কবিরাজী ব্যবসা—আমরা পরস্পরকে সাহায্য করলে তবে তো দেশের আশা। তা' আমাদের ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনারা ছাপাতে পারেন সে তো সুখের কথা, তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখবেন। দেশী লোক আমরা উভয়ে উভয়কে সাহায্য না করলে দেশটা জাগবে কি করে? আমরা আমাদের বিজ্ঞাপন তুলতে দিচ্ছি—তবে আপনারাও যেন দয়া ক'রে অমনি খরচ ছাড়া ছাপাবেন—দেশের লোক যদি দেশী লোককে সাহায্য না করে··· ···· "

ধৈর্য্যের সীমা আমাদের বহুক্ষণ পার হয়ে গিয়েছিল। আমরা যে দেশের লোকের বন্ধু নই তা' তাঁর কাছে প্রমাণ ক'রে আবার সেই ঐতিহাসিক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নীচে।

সর্ব্বদল সম্মেলন

অধ্যাপক পিকার্ডের অভিনব বেলুন বহন করিতেছে।

অনাবিষ্কৃত দেশ

শ্রীসত্যভূষণ সেন

নূতন একটী অনাবিষ্কৃত দেশের কথা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক মহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এমন একটী দেশ, যেখানে মানব পূর্ব্বে কখনো যায় নাই। মাত্র কয়েক বছর পূর্ব্বে যাহা প্রথম আবিষ্কৃত হইল।

“এমন একটী দেশ যেখানে মানব পূর্ব্বে কখনো যায় নাই।” আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তে বহু অনাবিষ্কৃত দেশ পড়িয়া আছে, মানচিত্রে যাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু মানব জাতির কাছে তাহা নূতন নহে। কলম্বস যেদিনে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ইউরোপকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করেন, তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবজাতি আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক মূল্য যত বেশী হউক না কেন, তখনকার আমেরিকাকে অনাবিষ্কৃত দেশ বলা চলে না।

মানবের কৌতূহল যুগে যুগে তাহাকে নবনব দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মানবের মনের কোণে হয়ত একটা অস্পষ্ট আশা ছিল এই যে ধরণীর কোন অজানা কোণায়, কোন বিশাল হিমাগিরির অপর পার্শ্বে বা কোন প্রশান্ত মহাসাগরের নীলিমায় ঘেরা সুদূর কোন দ্বীপে, এমন কোন দেশ আছে যাহা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর একেবারেই বিপরীত। নূতন দেশের কাহিনী শুনিবার জন্য সবাই আবিষ্কারকদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাহারাই ছিলেন মানব জাতির Hero বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত, হিমালয় অভিযান ও মেরু অভিযানের ফলাফল জানিবার জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মুখ হইয়া থাকিত।

ইতিমধ্যে Wright Brothers এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়া আকাশে উড়িলেন। এবং তাহার পর বছর কুড়ি পার হইতে না হইতে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়ার উপর এরোপ্লেন উড়িতে লাগিল এবং আফ্রিকার গভীরতম অরণ্যের রহস্য এরোপ্লেন ও ফটোর সাহায্যে কলিকাতার চায়ের টেবিলে পরিবেশিত হইতে লাগিল। উড়োজাহাজ ধরণীর উপর হইতে রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত করিল।

মানবের নজর পড়িল তখন ভূগর্ভে মাটীর নীচে, খনির মজুরেরা বলিল নীচে বড় গরম। পরীক্ষায় দেখা গেল প্রতি দুইশত ফিট নীচে তাপ একডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধি পায়। তিন হাজার ফিট নীচে এত গরম যে সহ্য করা অসম্ভব। পৃথিবীর এপার ওপার সুরঙ্গ কাটিয়া সহজ রাস্তা করিব এবং সেই সহজ পথে ভারত হইতে আমেরিকা যাইব তাহার আর উপায় রহিল না। এই রাস্তা করিতে পারিলে কত সুবিধা হইত জানেন? আমরা গাড়ীতে চড়িয়া সুরঙ্গ পথে গাড়ী ছাড়িয়া দিতাম, মাধ্যাকর্ষণের জোরে ক্রমশঃ তাহার গতি বৃদ্ধি হইতে হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে ছুটিতাম। কেন্দ্র পার হইবার পরে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি গাড়ীর বিপরিত দিকে থাকায় তাহার গতি ক্রমশঃ কমিত এবং আমেরিকা পৌঁছিয়া গাড়ী একেবারে থামিয়া যাইত। এখান হইতে আমেরিকা যাইতে সময় লাগিত মাত্র চল্লিশ মিনিট এবং Petrol কয়লা প্রভৃতি না লাগায় এক পয়সাও খরচ হইত না। কিন্তু মাটীর নীচে উত্তাপ যে ভাবে বাড়ে তাহাতে মনে হয় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে গালান লোহার গুদাম আছে। তাহার মধ্যদিয়া রাস্তা তৈয়ারী বা গাড়ী চালান সম্ভব নহে।

গরমের ভয়ে ভূগর্ভের রহস্য অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল। মানব তখন সাগরের নীল জলের বুক চিরিয়া রহস্যের সন্ধানে যাত্রা করিল। প্রবাল মুক্তা অনেক পাওয়া গেল—অদ্ভুদ গাছপালা—নব নব জাতীয় জলজ প্রাণী—কত কিছুর সহিত পরিচয় হইল। একখানা নূতন জগতের পটভূমি তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল।

কিন্তু উন্মুক্ত হইয়াই আবার তাহা বন্ধ হইয়া গেল। নীচে যতই যাওয়া যায় জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকে। জলে ডুব দিলে জল আমাদেরকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দেয়—নীচে ডুবিয়া থাকাই কষ্টসাধ্য। এই ভাবে আমরা যতই বেশী নীচে যাই জলের চাপ তত জোরে আমাদের উপর দিকে ঠেলিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদ্রের নীচে যদি কোন ডুবুরি ক্রমাগত নীচের দিকে যাইতে থাকে কিছুদূর যাইবার পর সমুদ্র তাহাকে আর উপর দিকে ঠেলে না, চাপিয়া আরও নীচে ডুবাইতে চাহে। তাহার কারণ যতই নীচে যাওয়া যায় জলের চাপ ততই বাড়ে এবং সেই চাপে বায়ুর volume কমিয়া ছোট হইয়া যায়। বুকের উপরে হাতি উঠাইলে ব্যায়ামবীর রামমূর্ত্তির যে অবস্থা হয়, জলের নীচে নামিয়া ডুবুরিরা তাহা কিছু কিছু কল্পনা করিতে পারে। সেই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার জন্য Dr William Bebbe এক বিশাল ইস্পাতের বলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, বলের ভিতরে Oxygenএর রসদ লওয়া হইল এবং নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়া পূর্ণ করিয়া বলটীকে উপরের জাহাজ হইতে শিকল দিয়া নীচে নামাইবার ব্যবস্থা হইল। বলের এক পার্শে মোটা শক্ত কাচের জানালা ছিল যাহা দিয়া বাহিরের সব দেখা যায়। বলটীকে কখন নামাইতে ও কখন উঠাইতে হইবে তাহাও উপরে সঙ্কেত করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত হাঙ্গামা করিয়াও সমুদ্রতলে আধমাইলের বেশী নীচে নামিবার উপায় আবিষ্কার করা গেল না।

বাসুকীর রাজ্য পাতাল—সেখানে আধ মাইলের মাইল পোষ্টের নীচে আর বেশী যাওয়ার উপায় মানুষের নাই। বরুণদেবের রাজ্যেও সেই অবস্থা। মানব তখন স্বর্গ রাজ্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সেদিকে তাহার পথ কোথায় গিয়া শেষ হইবে পথের দুইধারে কি দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা কিছুই জানা ছিলনা। কিন্তু যাহা সে পাইল তাহা তাহার উদ্দাম কল্পনাকেও হার মানাইল। সে পথে যে সব বাধা তাহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিতে দিতে আমরা ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতে থাকিব।

ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে উড়িবার পোষাক

বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠিবার সময় দেখা যায় ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বাতাসের পরিমাণও যে কমিতেছে তাহা বুঝা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে। বেশী উপরে উঠিলে ভয় হয় বুঝিবা শীতে জমিয়া মরিয়া যাইব। তদুপরি বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাতাসের চাপ কম হওয়ায় শিরা ধমনী প্রভৃতি ফাটিয়া পড়িতে চায়।

এইগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ১৭৬২ খৃঃ অব্দে Glaisher নানা যন্ত্রপাতি লইয়া বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠিলেন। বিভিন্ন উচ্চতায় উত্তাপ, জলীয় বাষ্প, বৈদ্যুতিক অবস্থা, Oxygen এর অংশ এবং আরও বহুবিষয়ে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উর্দ্ধে আরোহণ করিবার সময় মানবের অনুভূতির পরিবর্ত্তনও তাহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। নাড়ী সাধারণ অবস্থায় মিনিটে ৭৬ বার চলে কিন্তু ২০ হাজার ফুট উর্দ্ধে তাহা বাড়িয়া ১১০ হয়। এই উচ্চতায় তিনি তাঁহার নিজের বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন এবং সামান্য নড়াচড়াতেই হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন। বেলুন যখন আরও উর্দ্ধে উঠিল তখন তাঁহার সমস্ত দেহে একটা অবসন্নতা আসিল এবং সেই আচ্ছন্নভাব বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে ২৯ হাজার ফুট উঠিয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন।

Glaisher এর অভিজ্ঞতার কথা শুনিবার পরে স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে মানব তাঁহার কৌতূহল দমন করিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু অজানা যাহাকে ডাক দেয় সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। বহু আবিষ্কার (explorer) উর্দ্ধলোকের রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই শ্রেণীর সহিদদের আত্মদানের ফলে যুগে যুগে মানবের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে

কিন্তু শীঘ্রই একটা উপায় আবিষ্কার হইল উপরে না উঠিয়াও ঊর্দ্ধলোকের অবস্থা পরীক্ষা করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইউরোপের মানমন্দির সমূহ হইতে, আপনা আপনি লেখা পড়ে এইরূপ যন্ত্রপাতি সহ ছোট ছোট বেলুন আকাশে উড়াইয়া নভঃস্থলের অবস্থা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই সব বেলুনের খরচ অনেক কম এবং একটা মস্ত সুবিধা ইহাতে কাহারো প্রাণ যাইবার ভয় নাই।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক De Bort তাঁহার মানমন্দির হইতে যখন ঐরূপ বেলুন দিয়া প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন তখন সকলের বিশ্বাস ছিল যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করা যায় উষ্ণতা ততই কমিতে থাকে এবং অতিশয় ঊর্দ্ধে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাল্পনিক absolute zero তে পৌছান যায়। absolute zero অর্থে বরফের উষ্ণতা হইতে ২৭৩' ডিগ্রি নীচে। absolute zeroতে কোন জিনিষের কি অবস্থা হইবে তাহার কাল্পনিক বর্ণনা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া আছে। কৌতূহল হইলে পড়িয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সব ভবিষ্যৎবাণী এ যুগে ছেলেভুলান ছড়ার মতই নিরর্থক ও মনোরম হইয়া পড়িয়াছে।

De Bort এর পরীক্ষায় দেখা গেল ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় প্রথমতঃ উষ্ণতা কমিতে থাকে কিন্তু ৩৫ হাজার ফুট বা ৬।৭ মাইলের উপরে উঠিলে তখন আর উষ্ণতা কমে না। তাহার পরে যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করা যায় উষ্ণতা একই থাকে, বরফ হইতে ৫৭ ডিগ্রি নীচে। তাহাই যদি হয় তবে ভয়ের বেশী কারণ নাই। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এরূপ তাপ আছে এবং তাহার মধ্যে মানুষ বাস করিতে পারে। নভঃ বিজ্ঞানে এই আবিষ্কার যুগান্তর আনিয়াছে।

এই যে একটী সমউষ্ণ বায়ুস্তর কমলার খোসার মত পৃথিবী ঘেরিয়া আছে ইহারই নাম Stratosphere। আমরা যে atmosphere এ বাস করি তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ মাইল গভীর এবং তাহার নাম Troposphere। Stratosphere ও Troposphere এর মধ্যে প্রায় দুই মাইল গভীর একটা স্তর আছে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Tropopanse।

অধ্যাপক পিকাডের সাতমনী ওজনের গোণ্ডোলা

পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল একটী মাত্র atmosphere ঊর্দ্ধে ক্রমশঃ শীতল, সূক্ষ্ম ও লঘু হইতে হইতে একেবারে শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে বিশ্বব্যপী যে উষ্ণতা শূন্য (absolute zero), পদার্থ শূন্য, অসীম শূন্য বর্ত্তমান তাহারই মধ্যে। এখন প্রমাণিত হইল শূন্য বলিয়া কিছুই নাই। এবং stratosphere এ যে শৈত্য তাহাতে মানুষ বাঁচিতে পারে। সেখানকার বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্মতা (lightness) ও

oxygen এর স্বল্পতা আমাদেব তত বেশী ভযেব জিনিষ নাও হইতে পারে। কাবণ উড়োজাহাজে চড়িযা ঘণ্টাখানেকেব মাঝে ২২ হাজাব ফুট আরোহণ কবিযা এভাবেষ্টের মাথায উঠিলে সাধারণ অবস্থায় আপনি সংজ্ঞাহীন হইবেন সত্য কিন্তু হিমালয অভিযাত্রীদেব মত একটু একটু করিযা সহাইযা নিযা (acclamatised) পদব্রজে এভাবেষ্ট আবোহণ করুন আপনাব বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। অতএব ধীবে ধীবে নিজেদেব অভ্যস্ত কবিলে—আমবা কেন stratosphere এ বিচবণ কবিতে সক্ষম হইব না, তাহাব কোন কাবণ পাওযা যায না।

সে যুগেব কবি উর্দ্ধে স্বর্গলোকেব কল্পনা কবিতেন বাজসভাব একটা বড (magnified) সংস্কবণ। কবিব বঞ্চিত হৃদযেব যে আকাঙ্ক্ষা ইহলোকে সার্থক হইবাব সম্ভাবনা নাই, তাহাই

তুষাবেব উপব পতিত গোণ্ডোলাটিব উদ্ধাব কার্য্য চলিতেছে

কল্পনার সাহায্যে স্বর্গলোকের রূপ দিত। বিংশ শতাব্দীব অনাবিষ্কৃত স্বর্গলোকে এক বিশাল শক্তিব খনির অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে। যে যুগেব যে প্রযোজন। কিন্তু ইহা কবিব কল্পনা নহে, প্রকৃতই শক্তির সন্ধান পাওযা গিযাছে এবং তাহাব নাম দেওযা হইযাছে' Cosmic Ray

ইহাঁরই স্বরূপ বুঝিবাব জন্য Dr Anguste Piccard প্রথমে Stratosphere এ প্রবেশ করেন। বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন এই বশ্মিগুলিব উৎপত্তি বহুবহু উর্দ্ধে, কিন্তু এতই তাহাদেন Penetrating Power বা প্রবেশ শক্তি যে মাইলেব পব মাইল বাযুস্তব ভেদ করিয়া তাহাবা শুধু ধরাপৃষ্ঠ পর্য্যন্তই পৌঁছায না, মাটীব নীচেও বহুদূর প্রবেশ কবিযা থাকে। তাহাদেব শক্তি এতই প্রচণ্ড যে সম্পূর্ণরূপে তাহাদেব গতি রুদ্ধ করিতে হইলে ধরাপৃষ্ঠ ৩২ ফুট পুরু সীসার পাত দিযা মুড়িয়া দিতে হইবে। তাহাবা আমাদেব দেহ ভেদ করিযা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে। যদি

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে ঘিরিয়া না রাখিত এবং এই Cosmic রশ্মি যদি পূর্ণতেজে আমাদের আক্রমণ করিত তবে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। পরীক্ষাদ্বারা এই রশ্মি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইতে Piccard যখন Stratosphere-এ উঠিবেন স্থির করিলেন—বিচক্ষণ ব্যক্তিরা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন যে Piccard-এর আর রক্ষা নাই। নভঃস্থলের অন্যান্য বিপদ যেমন তেমন, কিন্তু Cosmic রশ্মি যখন তাঁহার দেহের অনুপরমানুগুলির ion electron প্রভৃতিকে কক্ষচ্যুত করিয়া ফেলিবে তখন তিনি দেহটীকে রক্ষা করিবেন কি কৌশলে? Piccard কে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাঁহারা ভবিষ্যৎবাণী করিলেন এবার বেচারীকে 'দেহরক্ষা' করিতে হইবে।

অধ্যাপক পিকার্ডের এই বেলুনটিতে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল

Piccard বেলুন তৈয়ারী করিলেন সম্পূর্ণ নূতন ধরণে। তাহার বসিবার Gondollaটী হইল এলুনিমিয়ামের সাতফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটী ফাঁপা বল। তাহার ভিতরে দরজা বন্ধ করিয়া (Hermetically sealed) বসিলে Stratosphereএর বায়ুর স্বল্পতাজনিত কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না। বলের ভিতরে প্রচুর Oxygen লওয়া হইল এবং উষ্ণতার অভাবে যেন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে না হয় সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল। শুধু Cosmic রশ্মি হইতে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা হইল না। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঐ রশ্মির সবগুলি ক্ষমতা পরীক্ষা করা, মানবদেহের উপর তাহার কি reaction তাহাও গবেষণার অন্তর্গত বিষয় ছিল।

বেলুনটীর ব্যাস ছিল ১০০ ফুট এবং তাহাতে ৫ লক্ষ ঘন ফুট gas ধরিবার স্থান ছিল। কিন্তু ছাড়িবার সময় ইহার সম্পূর্ণ আকারের মাত্র সাত ভাগের এক ভাগ গ্যাসে ভর্ত্তি করা হইল। যেন

উর্দ্ধে বাযুব চাপ কমিবাব সঙ্গে সঙ্গে ইহা আকাবে বাড়িতে পাবে। প্রথমেই ইহাকে পরিপূর্ণ আকারে ফুলাইলে শেষে উপবে উঠিযা বাযুব চাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটী ফুলিতে ফুলিতে নিশ্চযই ফাটিযা যাইত।

এত পবিশ্রম যত্ন ও সাহসেব পুরস্কার উঠিতে উঠিতেই Picard লাভ করিলেন। এক নযনাভিবাম দৃশ্য তাঁহাব নযন গোচব হইল, চতুর্দ্দিকে অদ্ভুত গভীব নীল আকাশ এবং তন্মধ্যে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র চন্দ্রমা দিনেব বেলাতেও ঝক্‌মক্ কবিতেছে! কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের আনন্দ তাঁহার একমাত্র পুবস্কাব নহে। Cosmic বশ্মি সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ কবিলেন। এবং সর্ব্বোপরি নিজেব জীবন বিপন্ন কবিযা প্রমাণ কবিলেন যে ঐ অনাবিষ্কৃত নভোদেশে প্রবেশ কবিযাও সুস্থশবীবে প্রত্যাবর্ত্তন কবা যায।

এই অনাবিষ্কৃত দেশেব ডাক অনেককেই পাগল কবিযাছে। Soviet ও U. S A ব অনেক বৈজ্ঞানিক সেই ডাকে সাড়া দিযাছেন। অনেক দুঃসাহসী explorer ইহাতে আত্মাহুতি দিযাছেন। তাঁহাদেব জয পবাজযেব কাহিনীব বিস্তাবিত বর্ণনা এ প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নহে। যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইযাছে তাহাব আধিকাংশই আজপর্য্যন্ত নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাহা সাধাবণ মানবেব কোন কাজে আসে না। কিন্তু যখন ইহা কাজে লাগিতে আবম্ভ কবিবে তখন এই আবিষ্কারকে ভগবানের দানহিসাবে শ্রদ্ধা করিব কিম্বা শযতানেব অভিশাপ মনে কবিযা ঘৃণা কবিব তাহা আজও অনুমান করিবার সময আসে নাই।

যুদ্ধেব পূর্ব্বে উড়োজাহাজেব যে অবস্থা ছিল তাহাতে বাস্তব জীবনে সে যে এত শীঘ্র এমন অপরিহার্য্য হইযা উঠিবে তাহা আমাদের স্বপ্নেবও অগোচব ছিল। Stratosphere যে ভবিষ্যতে কি খেলা খেলিবে—পৃথিবীব্যাপী এক আসন্ন মহাযুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইযা আজ তাহা কল্পনা কবিতে পাবিতেছি না। কিন্তু ইউবোপীয সমবনাযকেরা চুপ কবিযা বসিযা নাই। রুষীয সমব বিভাগেব একজন নেতৃস্থানীয ব্যক্তি সেদিন বলিযাছেন, "আমবা Cosmic বশ্মি বুঝি না। Stratosphereটী আগে জয কবা আমাদেব পক্ষে অতীব প্রযোজনীয। আমাদেব বিশাল দেশ, শত্রু যদি Stratosphere হইতে আমাদেব উপব air raid কবে—সে বড মারাত্মক হইবে। Stratosphere এব সকল বহস্য আমাদেব নখাগ্রে থাকা চাই।"

Stratosphere এব এক এক level বা উচ্চতায এক এক দিকে (direction) বিপুল বেগে বাযু বহিযা থাকে। বিপুল বেগে অর্থাৎ ঘণ্টায ৭০০-৮০০ মাইল বেগে। মনে করুন আপনি কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইবেন। আপনি Stratosphere এব সেই স্থানে আরোহণ করিলেন যেখানে বাযু লণ্ডনেব দিকে বহিতেছে। সেইখানে উঠামাত্র শুধু হাওযার জোবে ঘণ্টায ৮০০ মাইল বেগে ছুটিতে থাকিবেন এবং সাত ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে পাঁচহাজাব মাইল অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে পৌঁছিবেন। আপনার মনে যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে তবে সেই অবস্থায় বোমা নিক্ষেপ করিযা

লণ্ডন ছারখার করিতে পারেন। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৫ মাইল ঊর্দ্ধে anti air craft gun আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। কাজ শেষ করিয়া অবশেষে যেই উচ্চতায় (level) লণ্ডন হইতে কলিকাতার দিকে বায়ু বহিতেছে সেখানে উঠিলে বিনা পরিশ্রমে ৬।৭ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ফিরিতে পারিবেন।

Stratosphere এর বায়ু এত পাতলা যে সাধারণ উড়োজাহাজ সেখানে উড়িতে পারেনা। কিন্তু নূতন ধরণের এক উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা সাধারণ জাহাজের মত ঘনবায়ুতেও উড়িতে পারিবে আবার বায়ু সূক্ষ্ম হইলে Propellor (পাখা)-এর Pitch ক্রমশঃ বাড়াইয়া stratrophere এও উড়িতে পারিবে। এই উড়োজাহাজ চালক একটা বিশেষ ধরণের পোষাক পরিয়া লয় যেন বায়ুর সূক্ষ্মতা, চাপের স্বল্পতা শৈত্যের আধিক্য প্রভৃতি হইতে তাহার কষ্ট না হয়। পোষাকটী দেখিতে অনেকটা ডুবুরির পোষাকের মত।

Stratosphere এর অস্তিত্বের একটা প্রমাণ আমরা প্রত্যহ পাইয়া থাকি কিন্তু খেয়াল করিনা বলিয়া লক্ষ্য করি না। Londonএর Radioর Programme আমরা কলিকাতায় বসিয়া পরিষ্কার শুনিতে পাই কিন্তু রেঙ্গুন বা দিল্লী কাছে হইলেও তাহাদের Programme অনেক সময়ই অস্পষ্ট হইয়া পৌঁছায়! অথচ লণ্ডন পৃথিবীর বিপরীত দিকে, সেখান হইতে আলোকরশ্মি বা বৈদ্যুতিক রশ্মি এখানে আসিবার স্বাভাবিক পথনাই। তবে লণ্ডনের Broadcasting station এর বৈদ্যুতিক রশ্মি কোন পথে কলিকাতা আসে ?

Stratosphere এর বাহিরে চতুর্দ্দিক বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ—যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Heaviside layer of free electricity (আবিষ্কারক Heaviside এর নাম হইতে)। Radioর বৈদ্যুতিক রশ্মি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই layerএ প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহা ধরণীতে ফিরিয়া আসে। Heaviside layer আবার চতুর্দ্দিকে appleton layer দিয়া ঘেরা। এই সব বৈদ্যুতিক শক্তির layer গুলির জন্যই পৃথিবীর এপিঠ হইতে ওপিঠে wireless এ সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হইয়াছে। নতুবা Rodioর রশ্মিই হউক আর wireless এর রশ্মিই হউক ঊর্দ্ধে শূন্যে মিলাইয়া যাইত পৃথিবী ঘুরিয়া ওপারে যাইত না।

কিন্তু এই বিশাল শক্তির উৎস কি শুধু আমাদের কথা বলিবার ও কথা শুনিবার কাজে আসিবে ? আর কিছু নহে ? অনাবিষ্কৃত দেশের সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় পৃথিবীর যাবতীয় কয়লা ও তেলের খনি ছেলেখেলা মাত্র। কি উপায়ে ইহাকে মানবের ব্যবহারে আনা যায় বিভিন্ন দেশে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। যে জাতি প্রথমে এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে—সমগ্র পৃথিবী একত্রিত হইয়াও তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

এই দুর্জ্জয় শক্তি মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইবে, না পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে তাহা ভবিষ্যৎবাণী করিবার সময় এখনো আসে নাই।

ফরাসী বিপ্লবের দান

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্ এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফরাসী বিপ্লবের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইযাছিল, তাহাতে সম্পত্তির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া নূতনভাবে সমাজ সংস্থান করিবার মতো সূক্ষবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি সেই সময়ের লোকের ছিলনা। সুতরাং এই অবস্থায সমাজ গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব ও মতদ্বৈধ স্বাভাবিক। মুদ্রা সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণা স্পষ্ট ছিলনা। সমাজ জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সহিত দ্রব্য বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রার প্রচলন হইযাছিল। সমাজের দৈনন্দিন জীবনে মুদ্রার প্রযোজনীযতা অত্যন্ত বেশী, কিন্তু মুদ্রা সমস্যার সরল সমাধান অতিশয কঠিন। টাকার প্রচলন আরম্ভ হইবার সহিত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইল এবং লাভ ও লোভ নিবৃত্তির উপায হইয়া দাঁড়াইল। মুদ্রা দ্রব্য-মূল্যের বাহ্যরূপ। যে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয, যাহাকে সহজে ও ইচ্ছানুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং যাহার বিভক্ত অংশগুলি একত্রিত করিলে তাহার স্বাভাবিক গুণের কোনরূপ ব্যত্যয় হযনা, এইরূপ বস্তুই মুদ্রার আকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। সোণা ও রূপা এইরূপ স্বাভাবিক গুণ যুক্ত এবং এই জন্যই ইহারা মুদ্রার আকারে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। মুদ্রার ক্রয় শক্তিতে মানুষের বিশ্বাস জন্মিলে, রাজা খাঁটি সোণা বা রূপার সহিত খাদ মিশাইযা মুদ্রা বা নোট প্রচলন করিতে লাগিলেন। যত টাকার নোট চালাইতে হয, সেই পরিমাণ সোণা বা রূপা মজুত রাখাই সাধারণ বিধি।

ফরাসী বিপ্লবের পর সমাজ সংস্থানের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভাব।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরাসী গণতন্ত্র প্রথম হইতেই অর্থ অনটনের নাগপাশে আবদ্ধ হইযাছিল। উভয়েই টাকা কর্জ্জ করিতে লাগিল এবং ঋণের টাকার সুদ দিবার জন্য নোট ছাপাইতে লাগিল। বিপ্লবের জন্য উভয়েরই অত্যধিক ব্যয হইযাছিল। উভয়েই ঋণভারে জর্জ্জরিত হইযা-ছিল। উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস হইযা যাওযায—করধার্য্য করিবার মতো উপযুক্ত সম্পত্তি ছিলনা, যুক্তরাষ্ট্র পতিত জমি ও ফ্রান্স বাজেযাপ্ত জমির উপর করিল। উভয়েই হুবহু নোট ছাপাইতে লাগিল। কাগজের টাকার পরিমাণ গচ্ছিত সোণা ও রূপার মূল্য অপেক্ষা অধিক হওযায গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা অস্থাযী হইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সোণা ক্রয করিতে লাগিল কিন্তু তাহা আমদানী দ্রব্যের মূল্যরূপে বিদেশে রপ্তানি হইযা গেল। লোকের হাতে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে নানা রকমের নোট কাগজ প্রভৃতি ছাড়া—আর কিছুই রহিল না।

অবাধ নোট ছাপাইবার ফল।

মুদ্রার উৎপত্তি ও প্রচলনের ইতিহাস জটিল কিন্তু সমাজে ইহার ব্যবহারিক মূল্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি কথা বলিতে পারা যায়। মানসিক বা শারীরিক কাজ করিয়া বা সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ টাকা দিয়া মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার্য্য বস্তু ক্রয় করিতে পারে কিনা দেখিতে হইবে। ভ্রমণ, বক্তৃতা, অভিনয়, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবহার্য্য বস্তুর অন্তর্গত। যখন কোন সমাজের লোক টাকার ক্রয়শক্তির উপর আস্থাবান হয় অর্থাৎ সে যখন দেখিতে পায় যে, তাহার যে টাকা আছে সেই টাকার বিনিময়ে সে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার্য্য বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ তখনই টাকা বা বাণিজ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। তখনই মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করে, সমাজে আতঙ্ক ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। এইজন্য টাকার মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয় না হইলেও টাকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ের উপযুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে। টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত না হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বৃদ্ধির সহিত টাকার ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারযোগ্য বস্তুর পরিমাণ কমিয়া গেলে কিম্বা তাহার অপচয় ঘটিলে মূল্য ও মজুরি বাড়িয়া যায় অর্থাৎ, টাকার ক্রয় করিবার শক্তি কমিয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে একটিমাত্র গোলা তৈরী করিতে যে পরিশ্রম ও উপকরণ ব্যয় হয়, তাহাতে একটি কৃষক পরিবারের সারা বৎসর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে কিম্বা সেই ব্যয়ে একজন ব্যক্তি এক বছরকাল অবসর ভোগ করিতে পারে। যখন ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে এবং তাহার স্থান পূর্ণ না হয়, তখন টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, তখন দ্রব্যের মূল্য ও পরিশ্রমের অর্থমূল্য হ্রাস হইয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালকগণ টাকা কর্জ্জ করেন, সমাজের কর বহন করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া সুদ দিবার অঙ্গীকারে নোট ছাপাইতে থাকেন। চলতি টাকার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি হয়। লোকের অবস্থাহীনতার জন্য দ্রব্যমূল্যের সমতা থাকেনা।

মুদ্রা প্রচলন নীতির ভিত্তি শিথিল হইয়া গেলে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। বাজারে দ্রব্যের মূল্য উঠিতে থাকে। লোকের মনে সন্দেহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিমান লোকেরা অপদার্থ কাগজের টাকা ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করে। যাহাদের আয় নির্দ্দিষ্ট এবং যাহাদের তহবিলে টাকা মজুত থাকে। তাহারা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অসুবিধা ভোগ করে, যাহারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা সমাজে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

মুদ্রা প্রচলন নীতির শৈথিল্যের কুফল।

বিপ্লবীগণের নিকট আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। ইহার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের আর্থিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনিশ্চয়তায় তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছিল। সাময়িক অভিযান ও যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণের মধ্যে ফ্রান্সের গণতন্ত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল,

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা।

ফ্রান্সের নবগঠিত সৈন্যবাহিনী যেরূপ স্বদেশ প্রেম ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কিন্তু এইরূপ উত্তেজনা স্থায়ী হয়না। অবিরত উত্তেজনায় ব্যক্তির ন্যায় জাতির স্নায়ুমণ্ডল অবসাদগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার উদ্দীপনায় পরমায়ু দীর্ঘ হইলে চৈতন্য তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং আলস্য পুনরায় তাহার স্বাধিকার স্থাপনে সমর্থ হয় ডাইরেক্টরীর আসনে বিজয়ী ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। দারিদ্র্য অভাব ও অনটনের সময় একটির পর একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। প্রচুর খাদ্য সম্ভার যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তির লোভ উদ্রেক করে, সেইরূপ বিজিত দেশ সমূহের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ফ্রান্স চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে সে দ্বিধা বোধ করিল না।

মানুষের চিত্ত-নদী উভয়দিকে প্রবাহিত হয়, ইহার এক শাখা কল্যাণের দিকে, অন্য শাখা পাপের দিকে বহিয়া চলে। ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রে এই বিপরীত ধর্ম্মী দ্বিত্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল

ফরাসী জাতীয় চরিত্রের দ্বিত্বরূপ।

ফ্রান্সই প্রথমে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে অস্পষ্টতার কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। নূতন আদর্শের কিরণ সম্পাতে তাহার মনের দিগন্ত আলোকিত হইয়াছিল, তাহার হৃদয়পটে ভাবী মনুষ্য সমাজের জ্যোতির্ম্ময় ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুক্তির আলোক দূতরূপে গণতান্ত্রিকতার পুরোহিত হইয়া সাম্যের বার্ত্তা বহন করিয়া ফ্রান্স বিজিত দেশ সমূহে আবির্ভূত হইল তাহার আনন্দের প্রাচুর্য্য জীবনের গতিবেগ ইউরোপের মানুষের মনে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া দিয়াছিল।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জেনোয়া, উত্তর ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, রোম ও নেপলস প্রভৃতি স্থানে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইল। এই অগণিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী ফ্রান্স পূর্ণযৌবনা মুক্তির অনবদ্য রূপের আলোকচ্ছটায় শোভা পাইতেছিল। ইহা ছবির একদিক। ছবির অন্যদিকে ফরাসী রাষ্ট্র ও ফ্রান্সের দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ পিপাসু পৈশাচিক মূর্ত্তির লেলিহান জিহ্বার উৎকটরূপ। একদিকে মহান আদর্শের অত্যুচ্চ গৌরীশৃঙ্গ, অন্যদিকে মৃত জাতি সমূহের অবারিত শোষণ ও অর্থগৃধ্নুতার অন্ধকার কূপ। এই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তিদ্বয়ের সংঘাত আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বের ন্যায় ফ্রান্সের জাতীয় জীবনকে এক অভিনব আকার দান করিয়াছিল।

ষ্টেট্‌স জেনেরেল বা জাতীয় মহাসভা আহ্বানের দশবছরের মধ্যেই বিপ্লব-অগ্নিতে পবিত্র নবগঠিত ফ্রান্সের জাতীয় জীবন তাহার সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পঙ্কিলখাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল

উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুতি।

কালের রথচক্র যতই আবর্ত্তিত হইতে লাগিল ততই তাহার পুরাতন চিরপরিচিতরূপ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডলে ছিল মদ্যপায়ী গণ্ডস্থলের রক্তিম আভা, তাহার বাহুতে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির উদ্দাম শক্তি। কেবল মাত্র তাহার মস্তক সুশোভিত হইয়াছিল রাজমুকুটের স্থলে স্বাধীনতার হীরক মণ্ডিত কিরীটে। ফ্রান্সের সৈন্যবাহি

সাম্য-স্বাধীনতাব আদর্শ অন্তর্হিত।

নূতনভাবে গঠিত হইলেও, তাহাব নৌ-বহর দুর্ব্বল হইয়া গিযাছিল, পুরাতন যুগের ধনীব স্থানে নূতন ধনী, পুরাতন কৃষক-সম্প্রদাযেব পবিবর্ত্তে অধিকতব করবাহী ও কঠোরতব পবিশ্রমী কৃষক সম্প্রদায, পুবাতনেব জীর্ণ পবিচ্ছদে আবৃত নবতব রাষ্ট্রনীতি পুবাতন যুগের ধন বৈষম্য, আভিজাত্য গৌবব, কঠোব দাবিদ্র্য, কুটরাষ্ট্রনীতি পুনবায নূতন সাজে নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। বিশ্বমানবতাব সুমহান আদর্শ, সাম্য, স্বাধীনতাব স্বর্গরাজ্য দিবাস্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইযা গেল। বাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে গড়িযা তুলিবাব আশা আকাঙ্ক্ষা বিলীন হইযা গেল। যে নূতন বাষ্ট্র সর্ব্বহারাদেব আশ্রয, স্বাধীনতাব দুর্গ ও সাম্যেব লীলানিকেতন হইবাব স্পর্দ্ধা কবিযাছিল, তাহা কালের কবলে নিযতিব বিধানে মাত্র কথায পর্য্যবসিত হইযা গেল।

ভারতের তূলা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কাঁচা মাল বেচিযা যে দেশ তাহাব মূল আযেব উপর নির্ভব কবে, তাহাব বিপদ অত্যন্ত বেশী। যাহাদেব যখন প্রযোজন তখন লয, তাহাব পব হয ভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত সস্তায পায, না হয নূতন বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইযা লইতে বাধ্য হয, আব না হয কোনও স্বল্পমূল্যের পবিবর্ত্ত পদার্থ পাইযা পূর্ব্বে যে দেশ হইতে আমদানী হইত, তাহা হইতে আব লয না। ভারতেব তূলাব অবস্থা আলোচনা কবিলে এই সকল বিষয বেশ পবিস্ফুট হইযা উঠে।

এমন দিন ছিল,—ইংবাজ আসিবাব অনেক পরেও, ভাবতবর্ষ নিজের সমস্ত তূলা যোগাইযা বিদেশে বস্ত্রাদি বপ্তানী কবিযা টাকা আনিযাছে। ১৮১৬-১৭ সালে সমস্ত ভাবতবাসীর বস্ত্রই দেশে প্রস্তুত হইযা বিদেশে কার্পাস বস্ত্রাদি আড়াই কোটী টাকাব উপর বপ্তানী হইযাছিল।

ইহাতে ইংবাজেব যত লাভ হইযাছিল, তাহাতে তাহার "মন উঠে" নাই। তাহাবা মৎলব করিল ভাবত হইতে তূলা আনিযা, বস্ত্রাদি ভারতে সববরাহ কবিতে হইবে তাহাতে লাভের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কি কবিযা ভারতের বস্ত্রশিল্প নষ্ট কবা হইযাছিল, তাহাব পরিচয দিবার ভিন্ন স্থল প্রযোজন। বর্ত্তমানে তূলাব কথায নিবদ্ধ থাকাই শ্রেযঃ।

যখন ইংবাজ দেশে কলকাবখানা স্থাপন কবিল, তখন তাহাব কাঁচা তূলাব বিশেষ প্রযোজন হইয়া পড়ে। সেই কাবণে ভাবতীয়দের উৎসাহ দিযা, টাকা ছড়াইযা, নিজ দেশ হইতে কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক পাঠাইয়া এ দেশে তূলা চাষেব উন্নতি সাধন করিতে "উঠিয়া পড়িযা লাগিয়া গেল।"

তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যে জাতীয় তূলা হইতে মসলিন প্রভৃতি প্রস্তুত হইত তাহা, তাহারা উপেক্ষা করে এবং অন্য তূলা জন্মাইতে যত্নবান হয়। ফলে এক সময় ভারতবাসী একেবারে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে,--"হইয়া পড়ে" বলিলে ভারতীয় শিল্পীর অপমান করা হয়। বাধ্য হইয়া সকল শিল্পী কৃষিতে মনোনিবেশ করে। একথা কেবল বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ই বাজ যাহা এখানে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছে, তৎসংক্রান্ত সকল শিল্পই লোপ পাইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া ৪ ... গাঁইট (আন্দাজ ৫ মণ) পাওয়া যায় ৫৭ লক্ষ ৭৯ হাজার। ব্রিটিশ ভারতে জমির ... শতকরা ৬০ ভাগ আর ফলন ৬৫.৫ অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ ১১ হাজার গাঁইট। বাকী জমি ও তূলা জন্মে করদ রাজ্যে।

ভারতের চাষ।

তূলার জমি হিসাবে পঞ্চনদের স্থান সর্ব্বোচ্চে, সমস্ত জমির মাত্র ১১.১% দখল করিয়া ফসল দেয় ২০.১%। জমির পরিমাণ হিসাবে মধ্য প্রদেশ ও বিহারের স্থান প্রধান। তাহার পর যথাক্রমে বোম্বাই, পঞ্চনদ, মদ্র, সিন্ধু, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি। বাংলার নাম মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ জমির ২% দখল করে।

করদরাজ্যের মধ্যে হায়দ্রাবাদ প্রধান, ভারতের সমস্ত তূলার জমির ১৩.৮% ঐ অংশে পড়ে, জমির পরিমাণও প্রায় ৩৬ লক্ষ একর। তাহার পরই বোম্বাই প্রদেশের করদ রাজ্য সকল, মধ্য প্রদেশের করদ রাজ্য সকল, বরোদা, পঞ্চনদের যুক্তরাজ্য সকল, গোয়ালিয়ার, রাজপুতানার করদ রাজ্য ইত্যাদি।

ফসলের হিসাবে পর পর, হায়দ্রাবাদ ও পরে পরে উপরোক্ত করদরাজ্য সকলের স্থান। এখানেও পঞ্চনদের করদরাজ্যগুলিতে ফলে খুব বেশী। জমি হিসাবে মাত্র ৩.৩% পড়ে কিন্তু ফলনের বেলায় ৬.৭%। মধ্যপ্রদেশে ফলনের পরিমাণ খুবই কম। পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

প্রতি প্রদেশেই আবার কতগুলি জেলা আছে যেখানে অপর স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষ হয়। সাধারণের মধ্যে এই সকল জেলার নাম জানিবার কৌতূহল থাকিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্য বিষয়ক ছাত্র, তূলা ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিকদের এই সকল স্থানের নাম জানা প্রয়োজন।

জেলা পরিচয়।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে—আকোলা (৮,২০,০০০ একর) অমরাবতী, যোৎমল, বুলদানা, ওয়ার্দ্ধা, নাগপুর, চিন্দবারা ও হোসাঙ্গাবাদ।

বোম্বায়ে—আহম্মদাবাদ (৫,১৭,০০০ একর), দক্ষিণ খান্দেশ, ধারবাড, বিজাপুর, বেলগাঁ, সুরাট।

মদ্রে—বেলারী (৬৫০,০০০ একর), কোইম্বাটুর, মাদুরা, ত্রিনবল্লী, রামনাদ,

পঞ্চনদে—মণ্টগোমেরী (৩,৪৫,০০০ একর), লায়ালপুর, মূলতান, লাহোর, ফিরোজপুর, শাহাপুর, বিহারে সারণ (৯,০০০ একর), রাঁচি এবং উড়িষ্যার অঙ্গুল, আসামে গারো পাহাড়, এবং

যুক্ত প্রদেশে আলিগড় (৮৭,০০০ একর), বুলন্দসর, মথুরা, মীরাট ও সাহারণপুর (৩৪,০০০ একর) জেলা তূলা চাষের জন্য বিশেষ সমাদৃত।

বাঙ্গলায় তূলা চাষ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে ৫২,০০০ একর এবং ময়মনসিংহ এবং বাঁকুড়ায় খুব সামান্য চাষ হয়। ঢাকার তুলায় প্রস্তুত মসলিন জগতকে এক সময় চমৎকৃত করিয়াছিল। সাধারণ লোকে মনে করেন, ঐ তুলার আঁশ (fibre) বা তন্তু দীর্ঘ এবং দৃঢ় ছিল। অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল কিনা, এখন বলা কঠিন, তবে দীর্ঘ ছিল না এ কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন। ঐ তূলা অত্যন্ত কোমল এবং উহার তন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল। সুনিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িয়া তাহাই এত সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত হইত যে, আজও তাহার অনুরূপ সূতা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই।

বাঙ্গলার তূলা

ভারতের তূলা এককালে ইউরোপের বহু স্থানে রপ্তানী হইত, কিন্তু জগতের বাজারে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া পড়াতে ভারতীয় তূলার সে সমাদর আর নাই। এখন অনেক দেশেই তূলা উৎপন্ন হইতেছে এবং এখন যাহাদের নাই তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তূলা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে। যাহারা জমি ও আবহাওয়ার দোষে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছে না, তাহারা নানা প্রকার যৌগিক তন্তুদ্বারা অভাব মিটাইতেছে।

এই সকল চেষ্টার ফলে এখন পৃথিবীতে প্রচুর তূলা জন্মিতেছে। অনেকে মনে করেন, চা, রবার, চিনি প্রভৃতির ন্যায় জগতে তূলার উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

তূলা বিষয়ে আমেরিকা জগতে সকলের অগ্রণী এবং তাহার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। বিশেষ চেষ্টার ফলে আজ রুশ গণতন্ত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করিল। চীন রাজ্যে নানা গোলমালে আর সমস্ত উৎপন্ন পণ্যের হিসাব রাখা সম্ভব নয়, তাহা হইলেও লোকে চীনকে ভারতের পরেই স্থান দিয়া থাকে। ব্রেজিল, মিসর, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর তূলা জন্মিতেছে। পরিশিষ্ট (খ) হইতে সমস্ত পাওয়া যাইবে।

পৃথিবীর সমস্ত তূলার ৭০ ভাগ বা ততোধিক আমেরিকা, ভারতবর্ষে ও রুশে জন্মে। তন্মধ্যে আমেরিকায় ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ। আমেরিকার জমিতে ভারতবর্ষের অপেক্ষা ঢের বেশী ফলে। প্রধান কয়েকটি দেশের ফসল পরিশিষ্টে (গ) দেওয়া হইল।

উৎপাদন ও ফলন

তূলার বাণিজ্যের বিষয় বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে তূলার পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত। পরে ইংরাজের কারখানায় লাভ প্রয়োজনে ভারতবর্ষে তূলা চাষের উৎসাহ

দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালে জন ব্রাইট্ (John Bright)-এর সভাপতিত্বে

ভারতে তূলা চাষের প্রবর্ত্তন

কমিটী (Select Committee) নিযুক্ত হয়। সাক্ষ্যদানকালে বিশেষজ্ঞরা ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত প্রযোজনের তূলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। জমির রাজস্ব বা কর এবং ক্ষেত্র হইতে বন্দর পর্য্যন্ত তূলা লইয়া যাইবার অসুবিধাই ইহার অন্তরায়। এই সময় ইংলণ্ডকে প্রধানতঃ আমেরিকার উপর তাহার প্রয়োজনের তূলার কবিতে হইত। সাম্রাজ্যের নানা অংশে তূলা উৎপাদন করিয়া লওয়া তাহাদের কতক তূলা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইত (১৮৪৬) ১৫,৩০০ টন, সেস্থলে আমেরিকা হ ১,৭০,৭৭০ টন। ভারতীয় তূলা দামে সস্তা কিন্তু গুণে হীন। তাহাতেই তূলার উন্নতির রাজসরকারের "কৃপাদৃষ্টি" পড়ে।

এই চেষ্টা একেবারে ফলবতী হয় নাই, একথা কেহ বলিবে না। তূলা যথেষ্ট জন্মিযাছে এবং রপ্তানীও হইযাছে, কিন্তু জমিদারের খাজনা, বাজার রাজস্ব, দালালের পারিশ্রমিক, কুঠিযালের খুসীমত দামে বিক্রয় করিয়া চাষীর কি রহিল, তাহা বলা বড় কঠিন। এই সকল কৃষকের জীবিকার্জ্জনের প্রায়ই অন্য পন্থা ছিল, সে সকল বন্ধ হওয়ায় অপর দিক দিয়া নিঃস্ব হইতেছিল,

চাষীর দুঃখ

তাহার উপর রপ্তানীর পরিমাণের এবং মূল্যের অনিশ্চয়তা থাকায়, তাহারা কোনও রকমে লাভবান্ হইতে পারে নাই।

১৮১৫-১৬ সালেও কার্পাস শিল্পিজাত বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে গিযাছে দুই কোটী টাকার উপর, ১৮৩২ সালে তাহা ১৫ লক্ষ টাকায় আসে। ১৮৩৭ সালের হিসাবে দেখিতে পাই ১৫,৩০০ টন তূলা

পুরাতন বাণিজ্য

ভারত হইতে যায়। ১৮৪১ সালে উহা ৮৭,০০০ টনে পৌঁছে। সিলেক্ট কমিটী বসিবার প্রাক্কালে (১৮৪৬) আবার কিছু কমে। ইহা কেবলমাত্র ইংরাজের অংশ। ইতিমধ্যে অন্য জাতিরা ও ভারতীয় কার্পাস অধিক পরিমাণে লইতে আরম্ভ করে।

১৯২৩-২৪ সালে পর পর দুই বৎসর যথাক্রমে ৯১ কোটী এবং ৯৫ কোটী টাকার তূলা বিদেশে বিক্রীত হইল। জাপান এই কয় বৎসর প্রতি সনেই ৪৬ কোটী, ৪৭ কোটী টাকার তূলা লইযাছিল। ইটালী, চীন, বেলজিযম, ইংরাজ, ফরাসী, স্পেন, নেদারলণ্ড প্রভৃতি তখন অনেক তূলা লইযাছে। পরিশিষ্ট হইতে প্রতি দেশের গৃহীত তূলার দাম পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাণিজ্যের এ সুদিন থাকে নাই। ৯৫ কোটী টাকার পরই ১৯২৬-২৭ সালে একেবারে ৫৯ কোটী টাকায় নামিযা যায়। শেষ রপ্তানী (১৯৩৮—৩৯) মাত্র ২৪ কোটী টাকায় নামিয়াছে। তূলার বাজার জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সুতরাং জাপান লইলে বেশী বিক্রয় হয়, তাহা না হইলে আর হয় না।

তূলার দামও অসম্ভব রকম হ্রাস পাইযাছে ১৯২৭-২৮ সালে ও ১৯৩৮-৩৯ সালে সমপরিমাণ তূলা রপ্তানী হয় (যথাক্রমে ৪,৮২,৩৩৬ টন ও ৪,৮২,৬৫৮ টন) কিন্তু টাকার হিসাবে দেখা যায় ১৯২৭-২৮ সালে ৪৮ কোটী টাকা পাওয়া গেল আর ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র ২৪ কোটী, অর্থাৎ ঠিক আধাআধি।

বর্ত্তমানেও জাপান আমাদের প্রধান খরিদ্দার। (১৯৩৮-৩৯) ২৪ কোটী টাকার তুলার মধ্যে তাহার অংশ সওয়া ১১ কোটী টাকা (৪৭·২%), পরেই ইংরাজ তিন কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা (১৪ ৮%); চীন, জার্ম্মাণী, ফরাসী, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি অপরাপর ক্রেতা।

আমদানী আছে সাড়ে আট কোটী টাকার তুলা, তন্মধ্যে কেনিয়া উপনিবেশ দেয় পৌণে, পাঁচ কোটী টাকার মাল (৫৫ ৪%), তাহার পরই মিসর (প্রায় দুই কোটী ২২ ০%), সুদান, আমেরিকা, টাঙ্গানাইকা প্রভৃতি আমাদের বিক্রেতা।

আমদানী যাহারা করে তাহাদের মধ্যে বোম্বাই বন্দর প্রধান। আট কোটী টাকার তুলা (৭ কোটী ৯০½ লক্ষ), ৯২ ৯%, সেখানে নামে। বাঙ্গলা ৫ ৩%, আর মদ্র ১ ৭।

যতদিন তুলা আমদানী হইতেছে, তাহার মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১ লক্ষ ৩৪ ৫ হাজার টন তুলা ১২ কোটী টাকায় আসে। ইতোপূর্ব্বে এরূপ আমদানী আর হয় নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বর্ত্তমানে আমদানী তুলার উপর যে শুল্ক স্থাপিত রহিয়াছে, তাহাতে আমদানী হ্রাস পাইতেছে।

ঝড়তি তুলা (waste cotton) রপ্তানী হয় এবং যাহারা তুলার ব্যবহার জানে, অথচ ভাল তুলার দাম বেশী পড়িবে বলিয়া কাজে লাগায় না, তাহারা ভারতের ঝড়্তি তুলা লয়, ইহার দাম প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ইংরাজ লয় সাড়ে ২৬ লক্ষ টাকার মাল (৩২ ৮%), তাহার পর জার্ম্মাণী, তাহার অংশ মোট টাকার সিকি। আমেরিকা, সুইডেন, বেলজিয়ম, ফরাসী প্রভৃতি দেশও কম বেশী লইয়া থাকে।

ইহা হইতে ঐ সকল জাতি সেলুলোজ (Cellulose) লয় এবং তাহা হইতে সেলুলয়েড্, কাগজ, বিদ্যুৎশক্তি রোধক (Insulating) নানারকম বস্তু, নকল সিল্ক প্রভৃতি অজস্র বস্তু।

আমরা কেবল কাঁচা মাল পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত, এ সকলের দিকে কবে মন দিব?

তামসী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

তামসী রেখেছি নাম, তমস্বিনী রজনীর মত
সুদীর্ঘ কুন্তল-পুঞ্জে শ্যামতনু রেখেছে আবরি'।
গম্ভীর মহিমা তা'র স্থিরাননে বিরাজে নিয়ত,
নিশীথ-প্রশান্তি যেন দু'টি নেত্রে রাখিয়াছে ভরি'।

বুদ্ধির চকিত দীপ্তি প্রকাশিছে ভাবে ও ভঙ্গীতে
তিমির-সঞ্চিত নভে স্পন্দমান তারার মতন,
ক্রোধক্ষিপ্ত বক্ষ তা'র সিন্ধুসম বহে তরঙ্গিতে,
দীপ্ত নেত্রে দামিনীর জ্বলে জ্বালা তীব্র অসহন।

সুন্দরী সে, ভীষণা সে, অপূর্ব্ব সে গম্ভীর মহিমা।
বিচিত্র বসনে সাজি' আসেনা সে ইন্দ্রধনু তুলি'।
ক্ষুদ্রতার নাহি লেশ। দেহবন্ধ হারায়েছে সীমা,
শক্তির প্লাবন তা'র লাবণ্যের কূলে ওঠে দুলি'।

সমাচ্ছন্ন চেতনায় রহস্যের ঘনচ্ছায়াতলে
কভু হেরি শত তারা, বিদ্যুতের দীপ্তি কভু জ্বলে।

ন্দর।

বারিদ বরণ
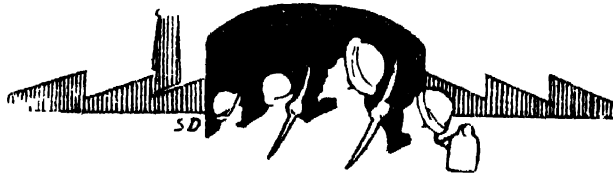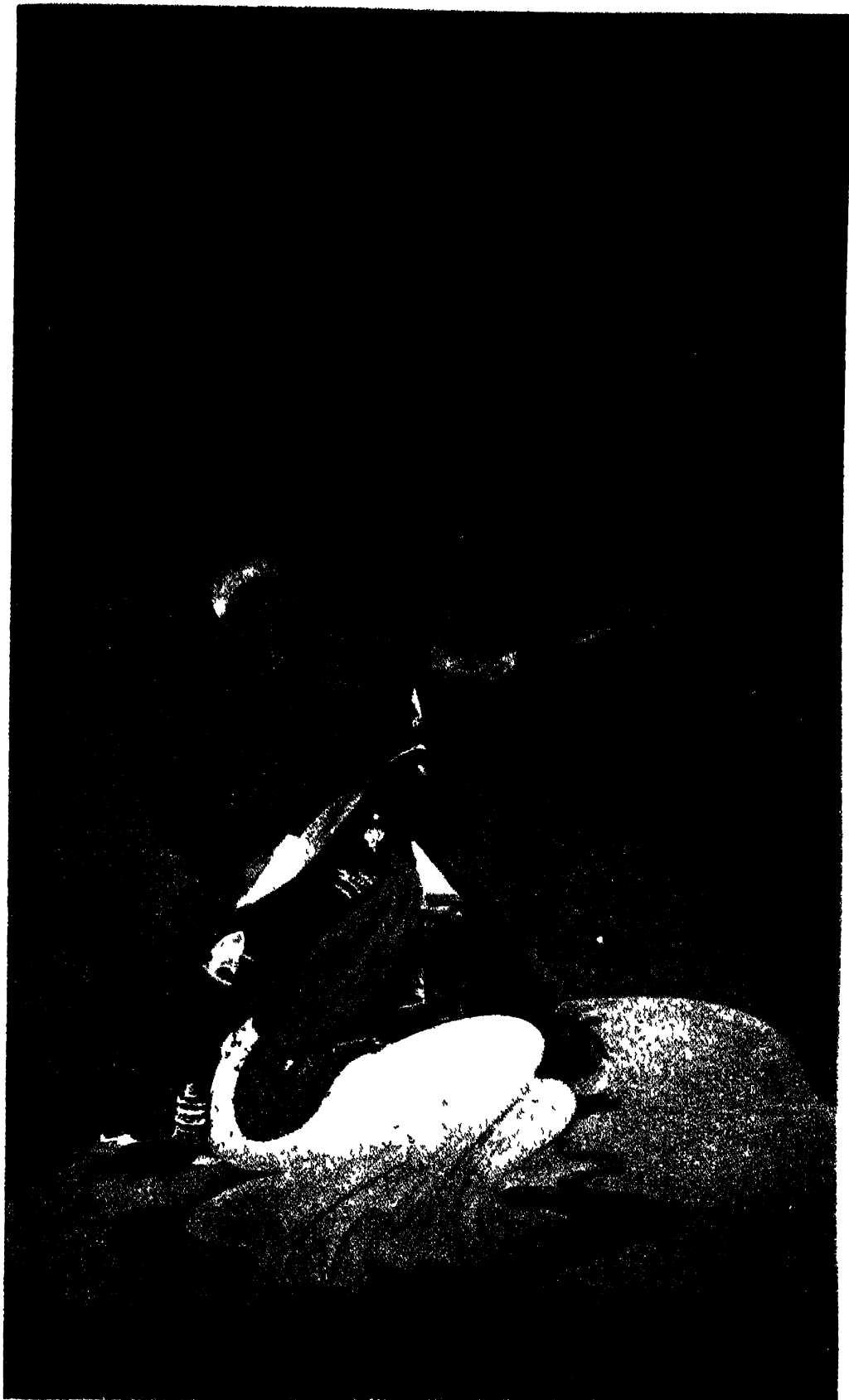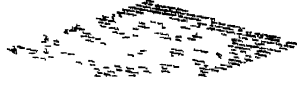
প্যারিসে

শ্রীমতী শোভা ছুই

বার্লিন থেকে ভোর পাঁচটায় প্যারিসে পৌঁছলাম। তখনও বেশ অন্ধকার, মহানগরী নিদ্রায় অচেতন। ট্রাম, বাসের ঘড়ঘড়ানী ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠলাম। কোন্ ঠিকানায় যেতে হবে ড্রাইভারকে বুঝান মুস্কিল। পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝি না। গন্তব্যস্থানের ঠিকানাটা কাগজে লিখে দেওয়া হ'ল। তবুও সে বুঝতে পারল না। মুস্কিলে পড়া গেল, কি করা যায়। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস—কতক্ষণ রাস্তায় এরূপ ভাবে থাকা যায়। এমন সময় দেখা গেল একটা পুলিশ আস্‌ছে, তাকে ঐ লেখাটী দেখাতে সে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলে। ড্রাইভার ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিলে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার প্যারিসের দিকে চাইলাম, এই সেই সুন্দরী বিলাসিনী প্যারিস, দেশে থাক্‌তে যার কত গল্প শুনেছি, কল্পনায় যাকে নিয়ে কত রঙ্গীন জাল বুনেছি —আজ সত্য সত্যই সেই প্যারিস আমার সাম্‌নে। কিন্তু সুন্দরীর সূক্ষ্মভেলের অবগুণ্ঠনের ন্যায় প্যারিস তখন পাতলা কুয়াসায় ঢাকা। কাজেই ভাল বুঝতে পারলাম না। প্রায় আধঘণ্টা ঘুরবার পর রুদাব্‌সে অবস্থিত "হোটেল দ্য ফ্রান্সে" পৌঁছলাম। সেখানে হোটেলের ম্যানেজারকে অনেক ডাকাডাকির পর উঠান হ'ল। মুখ ধুয়ে কফি খেয়ে একটু বিশ্রাম করবার পর ঐ হোটেলে আমাদের এক বন্ধু থাকতেন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেইদিনই বৈকালে আমরা ফ্রান্সের বিখ্যাত পাঁথিও দেখতে রওনা হ'লাম। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। প্রায় সবগুলিই যুদ্ধের ছবি। মাটির তলার ঘরে ফ্রান্সের বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষিদের এবং প্রধান প্রধান দেশ নেতৃবৃন্দের কবর আছে। এখান থেকে আমরা প্যারিসের বিখ্যাত গির্জ্জা "নোটরডামে" গেলাম। সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে সিন নদীর ধারে গেলাম। রাস্তার দুপাশে তখন প্যারিসের নরনারী এক এক কাপ চা কিম্বা অন্য পানীয় ও খাবার নিয়ে গল্পগুজবে মত্ত। পুরুষ ও নারী সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখন বাইরে আমোদে মেতে আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া চওড়া রাস্তাগুলি নানা-রূপ আলোর বাহারে ঝল্‌মল করছে। হোটেল রেঁস্তোরা থেকে গান বাজনার রেশ ভেসে আস্‌ছে, অগণিত নরনারী রাস্তায় বেড়াচ্ছে। যেদিকে তাকান যায় যেন আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে।

পরদিন আমরা বিখ্যাত Paris International Exposition (প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী) দেখ্‌তে গেলাম, এই প্রদর্শনীর বিষয়ে বিজ্ঞাপন লণ্ডনে থাকতেই দেখেছিলাম। প্রদর্শনীটি বিখ্যাত সিন নদীর তীরে অবস্থিত। বিরাট প্রদর্শনী—অন্ততঃ ১৫ দিন সমানে ঘুরলে তবে ভাল করে সব দেখা হয়। প্রদর্শনীর ভিতরটা খুব সুন্দর সাজান। বাগান, হরেক রকমের আলোর

মালা, সিনেমা, রেস্তোরা কিছুরই অভাব নেই তার ভিতর। এর ভিতর বিভিন্ন দেশের ... মণ্ডপ করা হ'য়েছে। প্রত্যেক মণ্ডপে সেই সেই দেশের শিল্পকলা ও সেই সেই দেশের ... বিখ্যাত জিনিষগুলি দেখান হ'য়েছে। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা তাদের ষ্টলগুলি এমন সুন্দর ... সাজিয়ে রেখেছেন যে দেখ্‌লে অবাক্ হয়ে' শুধু চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের আধুনিক ট্রেনের মডেলও দেখান হ'য়েছিল। প্রদর্শনীটী ভাল ক'রে ঘুরেফিরে দেখবার জন্য মোটরেরও ব্যবস্থা ছিল। এর ভিতরই প্যারিসের বিখ্যাত স্তম্ভ ইফেল টাওয়ার। তার ... একটা সার্চ্চ লাইট ছিল যার আলো প্যারিসের বহু দূর থেকেও দেখা যেত। প্রদর্শনীর ... একটা সুন্দর ফোয়ারা ছিল। একটা ডিম্বাকৃতি পাইপের ভিতর ২২টী ছিদ্র করা ... রাত্রি ৯টার পর ঐ ছিদ্রগুলির মুখ খুলে দেওয়া হ'ত, তখন তার ভিতর থেকে ... চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। সেই সময় ঐ ফোয়ারার জলে নানাবর্ণের আলো ... সৃষ্টি হ'ত।

একদিন প্যারিসের উপকণ্ঠে ভার্সাই দেখতে যাওয়া হ'ল। রাস্তায় দুই একটী লোককে ইসারায় জিজ্ঞাসা করা হ'ল—ভার্সাই কোন পথে? তাদের উত্তর কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। যাই হোক্ ম্যাপ দেখে প্রথমে মেট্রো অর্থাৎ under ground train-এ যেতে হ'ল। পরে বাসে চড়ে ভার্সাইয়ে পৌঁছলাম। এই প্রাসাদেই গত মহাযুদ্ধের সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হলে সুন্দর সুন্দর ছবি—সবই যুদ্ধ সংক্রান্ত। মধ্যে মধ্যে ফ্রান্সের রাজারাণীর এবং বিখ্যাত বিখ্যাত সৈনিক ও মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। প্রাসাদের পশ্চাতে বেশ সুন্দর সাজান বাগান, দুপাশে নানাপ্রকার গাছ—মাঝখান দিয়ে বরাবর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ফোয়ারার জল—আশে পাশে সুন্দর সুন্দর দল। প্রাসাদ থেকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন নানারঙের ফুল, লতাপাতা কাটা সুন্দর গালিচা বিছান আছে। এই প্রাসাদেরই আর একটা অংশে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হয়—সেই ঘরে একহাজার লোকের বস্‌বার ব্যবস্থা আছে। ঘরটী আলোকিত করবার জন্য ৩৫ হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের আলোর ব্যবস্থা আছে। ভার্সাই থেকে সন্ধ্যা ছটার সময় প্যারিসে ফিরে এলাম। নানারাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্যারিসের বিখ্যাত রাস্তা "সাঁজে এলিজে"তে পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে রাস্তা চারিদিকে চলে গেছে—উপর দিয়ে সারি সারি ... ঝুলছে। রাস্তার দুপাশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দোকান, রেঁস্তোরা, হোটেল, আলোক মালায় সজ্জিত —এই সব হোটেলেই আমাদের দেশীয় রাজারা দরিদ্র প্রজার রক্তশোষণ করা অর্থ অকাতরে ... করেন।

পরদিন লুভার মিউজিয়ামে গেলাম। এইটী প্রথমে রাজপ্রাসাদ ছিল এখন মিউজিয়ামে পরিণত হ'য়েছে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করদের প্রস্তুত ছবি, প্রস্তর মূর্ত্তি ও ধাতব ... আছে। এখানে র‍্যাফায়েলের অঙ্কিত ম্যাডানোর একটী মাতৃমূর্ত্তি আছে। চিত্রটীর নাম "La-Bella-Jardinere."

...দিন প্যারিস থেকে ৬০ মাইল দূরে গ্রাম্যঅঞ্চলে বেড়াতে যাওয়া হ'ল। জার্ম্মাণীর গ্রাম্য-অঞ্চলের ... ফ্রান্সের গ্রাম্যঅঞ্চল তত পরিষ্কার নয়। বাড়ীগুলিও তত সুন্দর নয়। সে দিন ... গু—বৃষ্টি পড়ছিল—কন্‌কনে বাতাসে হাত পা জমে যাবার উপক্রম—এইজন্য মোটর ... আরামদায়ক হ'ল না।

আর একদিন সন্ধ্যায় আর একটী মিউজিয়ামে গেলাম। সেখানে বিখ্যাত বিখ্যাত ঘটনা ... ক'রে মোমের মূর্ত্তি সাজান আছে এবং সেগুলি এত স্বাভাবিক যে কাছে দাঁড়ালে জীবন্ত বলে ...। যেমন হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছেন, কোথাও পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ... ঘরে দেখ্‌লাম চারিদিকের দেওয়াল কাঁচ দিয়ে সাজান এবং সেখানে নানারকম আলোর ...স্থা আছে যে এক এক বার সুইস টিপ্‌লে আলোর পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যের ... হয়। যেমন প্রথমে সুইচ্‌ টিপতেই মনে হ'ল যেন আমরা এক বিরাট সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে নানারূপ আমোদ প্রমোদ হচ্ছে। আবার পরমুহূর্ত্তেই সেই আলো নিবিয়ে আর একটা সুইচ্‌ টিপতেই দেখতে পেলাম আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে, সমস্ত ঘর চাঁদের শুভ্র আলোয় ভ'রে গেছে, কুল কুল ঝরণা বইছে, তার ধারে যত তরুণ তরুণী বেড়াচ্ছে ইত্যাদি। আবার সেই আলো নিবিয়ে অন্য সুইচ্‌ টিপতেই অন্য দৃশ্য আরম্ভ হ'ল। এই সব দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সুইচ্‌ টিপবার সঙ্গে সঙ্গেই এক মুহূর্ত্তেহ হ'যে যাচ্ছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্যারিসের মত কোথাও নেই। প্রত্যেক পা ফেলতেই সিনেমা, থিয়েটার, বেলা ৯টা থেকে সিনেমা দেখান আরম্ভ হয় আর গভীর রাত্রিতে শেষ হয়। গভীর রাত্রিতে ট্রাম, বাস, আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্রেনে লোক গিস্‌ গিস্‌ করতে থাকে। রাত্রিতে নাচে গানে নানারকম আলোর খেলায় মহানগরী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তারপর এরা বেশ ভদ্র ও অহঙ্কার শূন্য। আমরা যেখানেই গিয়েছি বেশ ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি। এরা একটু বেশী কথা বলে। আর এদের মধ্যে বর্ণ-বিদ্বেষ মোটেই নেই। পথে ঘাটে, কাফে, রেস্তোরায়, সিনেমায়, থিয়েটারে সর্ব্বত্রই এখানে খুব বেশী কাফ্রি দেখা যায় এবং তাদের সঙ্গে এরা ... সন্ধ্যায় ফরাসী সুন্দরীরা কাফ্রী পুরুষের সহিত নাচে, গানে আহারে বিহারে যোগ ... ইতস্ততঃ করে না।

শেষ বিচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহেমন্ত তরফদার।

আপাততঃ আব কারও কোনও বক্তব্য থাকার কথা নয়। সুতরাং এখন অনায়াসেই সভা ভঙ্গ ক'বে দেওয়া যেতে পারে। বাত্রিও হ'যেছে কিন্তু এইবার লক্ষ্য কবা গেল যে জাষ্টিস্ রায হাইকোর্টে নতুন। বযসেও তিনি সমবেত বিচাবকগণেব মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ, ক্লাবে নতুন ত' বটেই। তাই স্বাভাবিক সঙ্কোচ তাঁব নীববতার কাবণ অনুমান ক'রে জাষ্টিস্ দাশগুপ্ত—তাঁকে আহ্বান ক'বলেন, "মিঃ বায আপনি ত' সাবাক্ষণ চুপ করেই বইলেন! কিছু বলুন অন্ততঃ?" সভাস্থ সকলেই তৎক্ষণাৎ সায দিযে ব'ললেন, "হাঁ, কিছু বলা উচিত।"

জাষ্টিস্ বায বিষণ্ণ ভাবে মুখ তুলে বললেন, আপনাবা সবাই যা বলেছেন তাতেই আমাব কথা বলা হযেছে। আমাব নতুন আর কিছু ব'লার নেই। তাছাড়া জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জি, কিছু মনে কববেন না আশা কবি—আজ আমাব মনটা বড়ই খাবাপ। "ব্যাপাব কি? মন কেন খারাপ? কি হযেছে?" সকলের অনুরোধে জাষ্টিস্ বায চেযারটা একটু এগিযে নিযে এলেন, বললেন, "জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জিব সঙ্গে কিছু আলাপ কবব, অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিলুম। আপনাবা এখন নিজে থেকেই আদেশ দিলেন, এব জন্যে ধন্যবাদ। জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি, আজ আমি একজনের ফাঁসিব হুকুম দিযে এসেছি কিন্তু তখন থেকেই মনে স্বস্তি পাচ্ছি না।"

"অবাক কাণ্ড। জজিযতি ক'বতে গেলে ফাঁসীব হুকুম কাকে আব না দিতে হয? এর জন্য মন খাবাপেব কি আছে?"

জাষ্টিস্ বায বল্‌লেন, "আছে, এই আমাব প্রথম ফাঁসীব কেস্। আর হযত সেই কারণেই নানা প্রশ্ন মনে উঠ্‌ছে।" কাগজখানা টেবিলেব ওপব জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জির সুমুখে রেখে বললেন,—"আপনাব কথা লিখেছে, পেন্‌সান নেওযাব কথা। লিখেছে নিবপেক্ষ ন্যায বিচাবের গুণে আপনি দেশের সকলেব সম্মানেব পাত্র। এখানে এঁবাও সকলে তাই বল্‌লেন। আমি আপনার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যদিও বেশী পাইনি, তবুও আপনাব গুণমুগ্ধ। সন্ধ্যা থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, কবে আপনার মত এই বকম উত্তীর্ণ হযে যেতে পাবব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'চ্ছে, আমার হয়ত সে সম্ভাবনা নেই। ন্যায বিচাবেব নামে একজনকে মৃত্যুব কবলে নাবিযে দিলুম। কিন্তু বিচার করবার আমার অধিকাব কি? তা' ছাড়া ন্যায কি, তাই বা কি ক'বে জানি?"

অবশ্যই এ নিযে তর্ক কবা যেতে পাবে। এবং তর্ক চল্‌লও। তুমুল তর্ক। জাষ্টিস্ চ্যাটার্জিব মনে তখনও গুঞ্জন কবে ফিবছে—joy of living—বাস্তবিক কাউকে মৃত্যুর রাজ্যে পাঠাতে অনুশোচনা হবাবই কথা। কিন্তু কেস্‌টা কি?

কেস্ খুবই সোজা। মানদা বাববনিতা। বয়স পঞ্চাশেব কাছাকাছি। ওবই ভাঁড়াটে তুক্রন মেয়েকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে, গয়না, টাকা কড়িব লোভে। ইতিহাস একটা আছে, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে। হুগলীব কোন ভদ্রঘবেব মেয়ে। চেহাবা ভাল ছিল। একজন ছাত্র বাব করে নিয়ে আসে, সে তখন ওকালতী পড়ত। কালীঘাটে এনে বাখে, কিছুদিন পবে সখ মিট্‌লে সে সরে পড়ে। মানদা তখন আব কি কবে? ঘবেব পথ খোলা ছিল না, বলাই বাহুল্য। সুতরাং পথেই দাঁড়াতে হ'লো। তাবপব পথ থেকে পথান্তবে যেতে যেতে আজ ফাঁসী কাঠের গোড়ায় পৌঁছল। পৌঁছল বটে, কিন্তু আমি পৌঁছে দেবাব কে? দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা কি আমি?"

অভিজ্ঞ বিচাবপতির মুখে এই কথা হাস্যকব ছেলেমানুষী। ফাঁসীর হুকুম এই প্রথম হ'তে পাবে, তা' ব'লে এতটা নার্ভাস্ হ'য়ে পড়াব কোন মানে হয়না, সুতবাং আবাব তর্ক চল্‌ল। ক্রাইম কাকে ব'লে? ক্রাইমের ভেতবে ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধীব দায়িত্ব কতটুকু থাকে? কতটুকু বা সমাজেব?

কিন্তু, এই সময় ক্লাবেব ভৃত্য এসে সংবাদ দিল যে ভীষণ ঝড় জল আস্‌ছে। সুতবাং মীমাংসা স্থগিত বেখে সবাই উঠে পড়লেন। বাইবে ড্রাইভাববা মোটবে স্টার্ট দিলেন।

এত বাত্রে ক্লাব থেকে ফিবেই যদি কেউ সোজা গিয়ে লাইব্রেবি ঘবে ঢোকে লেখাপড়াব কাজ কববাব জন্যে তবে সেটা কাবো ভাল লাগবাব কথা নয়। বিনোদিনী দস্তুবমত অনুযোগ করলেন, খিদে না থাকাব কথাটাও তাঁব পছন্দ হ'লোনা—ক্লাবে গিয়ে মানুষ এত কিইবা খেতে পাবে বা খেয়ে থাকে যে বাড়ী এসে তাকে আব খেতে হবে না? ওদিকে মুস্কিল হ'য়েছে এই যে অম্বলেব ব্যথাব কথাটাও নিতান্ত মিথ্যা নয়, সত্যিই যদি বাড়ে সে ভয় যে না আছে তাও নয়, কাজেই বেশী উপরোধ কবাও ভাল হবে না।

জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি তাঁকে বোঝালেন, সত্যিই খিদে নেই। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে। আমাব জন্যে বসে থাকাব কোন দবকাব নেই। কতকগুলি অত্যন্ত জকবী চিঠি পত্র লেখাব আছে, আজ বাত্রেই না লিখলে নয়। লক্ষ্মিটি, দেবী ক'রোনা, আমি যত তাড়াতাড়ি পাবি কাজগুলো সেরেই ঘুমোতে যাব।

দবজা বন্ধ ক'বে দিয়ে জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি ঘবেব ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একবাব—খানিকটা যেন অকারণেই ঘরের ভিতরকাব চাবদিকটা একটু দেখে নিলেন। এখন কি কবা যায়? ক্লাব থেকে আস্‌বার পথেই কর্ত্তব্য একবকম ঠিক হ'য়ে গেছে। বেশী সময় কেনই বা লাগ্‌বে? এখন—হাঁ এখন কেবল একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে, অবস্থাটা একটু বুঝে নিতে হবে।

বিনোদিনীব কাছে মিছে কথাটা নিতান্তই ফস্ কবে মুখ দিয়ে বাব হয়ে গেল। আব নইলে কিই বা বল্‌তেন? জরুরী কাজ যে সত্যিই এমন কিছু আছে যা' আজ বাত্রেই না' কবলে চ'লেনা, তা' নয়। এখন শুধু· ·দাঁড়াও একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে।

বড় অদ্ভুত লাগছে। খালি একটা কথা—একটা শব্দ যেন বহুদূর থেকে মাথার ভিতরে এসে অবিরত ঘুনছে। তার প্রতিধ্বনিটা নাছোড়ভাবে মগজের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—Joy of living—Joy of living!

কি এর মানে? কথাটার কোন মানে আছে? হাঁ—মনে হয় বেশ চমৎকার একটা মানে আছে, খানিক্ষন আগেও মানেটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে। কথাটার প্রাণ গেছে মরে, কেবল কাঠামখানা ভাঙ্গা কাঁশীর মত ঝন্ ঝন্ ক'রে বাজ্ছে—মাথার চারপাশে। .. ক্লাবে না গেলেই হোতো।

কিন্তু তাতেই বা কি হো'ত? বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বড় অসহায় বোধ হচ্ছে, বড় ভয় কর্ছে! .. মনে হ'চ্ছে মাথার খানিকটা অংশ যেন কেমন অসাড় হ'যে গেছে, আর খানিকটা জেগে আছে। জলের ভিতর ডুব দিযে ব'সে থাক্‌লে যেমন একটা ভীষণ স্তব্ধতার সঙ্গে তাল রেখে কানের পাশে কি একটা যেন ঝম্ ঝম্ করে বাজ্‌তে থাকে—ঠিক্ সেই রকম লাগ্‌ছে।

সমস্ত জীবনে এত একা বোধ হয়নি আর কখনও, এত দুর্ব্বল লাগেনি কোনদিন। আর আজ—আজই,—যখন মনে হলো জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত্তটিকে হাতের মুঠোয ধরা পাওয়া গেল—ঠিক তখনই, কিন্তু তবু, এতে আর ভুল কিছু নেই। সবই ঠিক ঠিক মিলে গেছে,—হুগলী, কালীঘাট ......মানদা ছেলেটি ওকালতী পড়ত।...... .

তারপর? তারপর অনেক কথা। জীবনের ঘাটে ঘাটে জীবন প্রবাহ যে পলি নিয়ে আসে, সেই মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হ'যে আছে অনেক কাহিনী, অনেক স্মৃতি। যে সব ঘটনা জীবনে যুগান্তর নিয়ে আসে তারাও পর মুহূর্ত্তেই পিছনে ফেলে আসা জীবনের বিলীন প্রায় পদচিহ্নের তলায় আত্মগোপন ক'রে থাকে, কেইবা আর তাদের খোঁজ করে—? কিন্তু স্রোত যে আবার উজানে বইতে পারে, এক নিমিষের তরঙ্গাবর্ত্তে বহুদিনের বাঁধাঘাট চূর্ণ হ'যে ভিতরের জীর্ণ কঙ্কালসার হ'যে আস্‌তে পারে এটা আগে হিসাব করা হয়নি।

কিন্তু হিসাব করলেই বা' কি হ'তো? ভাঙ্গা বাঁধ ফিরে গড়বার আয়োজন কি হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল? সত্যিই সেদিন মানদাকে, কিশোরী মানদাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হওয়ার কাজটা যে সহজ হয়নি, একথা আজকার দিনে কে বিশ্বাস করবে? কে বিশ্বাস করবে এ কথা যে বাইশ বছর বয়সের ল-কলেজের ছাত্র প্রাণতোষ আর আজকার দিনের জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি এক লোক নয়? আর বিশ্বাস না ক'রলে দোষ দেওয়ার আছে কি? বিস্তীর্ণ উষর-মরু প্রান্তরের ধূ ধূ বালুকা রাশির নীচে বিরাট বনানী স্তব্ধ, সংহত হ'যে আছে এ কথা কেও বিশ্বাস করবে না। আর যদি কেউ খুঁড়ে দেখে, সে দেখবে শুধু দগ্ধ কুণ্ডে প্রস্তরের স্তূপ। সেই শ্যামল অরণ্যানী তার সবুজ শোভা নিয়ে,—তার বসন্ত—শরতের ফুল ফলের—সম্ভার নিয়ে, তার অশোক কিংশুকের—দীপ্ত রক্তরাগ নিয়ে এই নিকষ কালো মৃদঙ্গার স্তূপে পরিণত হয়েছে, এ কথা কেউ মানতে চাইবে না।

কিন্তু তবু এ সত্যি। তরুণ বয়সে তিনি একটি মেয়েকে ভাল বেসেছিলেন, উদ্দাম সে ভালবাসা। ভালবেসে তাকে ঘরছাড়া ক'রে এনেছিলেন,—নিতান্ত দায়ীত্বজ্ঞান-হীনের মত, এ কাজ করবার জন্য যে দুর্দ্ধর্ষ সাহস দরকার হয় সে সাহস তখন তাঁর কোথা হ'তে এসেছিল, এই এক বিস্ময়। সামান্য কয়েকটা দিনের মধ্যে ঝড়ের মত সব ব্যাপার ঘটে গেল। আজ সব স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে হয় অন্য লোকের জীবনের একটা ঘটনার মত, উপন্যাসে পড়া একটা পরিচ্ছেদের মত, তখন হাতে ছিল টাকা, প্রাণে ছিল অনেক কল্পনা, বিধবা মানদাকে নিয়ে কালীঘাটের সেই ছোট্ট বাসাটায় দুটি মাস ধরে অনেক আকাশ কুসুম রচনা করা হয়েছিল।

তারপরেই এল বাবার মৃত্যু। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মাথার ওপরে একখানা খড়ের চাল পর্য্যন্ত নেই, যার নীচে মাথা গুঁজে একটা দিন থাকা চলে। যেন ঝড়ের বেগে একটার পরে একটা ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। ধনী ব্যবসায়ী বাবা যে ভিতরে ভিতরে এমন সর্ব্বস্বান্ত তা' কেউ জান্‌ত না। যেদিন জানা গেল সেদিন আর কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে তিনি সেখানে নেই। তারপর যে ঝড় উঠ্‌লো, যে ধুলা বালি উড়লো, সেই ঘূর্ণীর মধ্যে জীবন সংগ্রামের সেই প্রাণান্ত বিক্ষোভের মধ্যে কোথায় বা মানদা, আর কোথায় বা তিনি।

তারপর যেদিন নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুৎ মিল্‌ল, হাইকোর্টের উকিল প্রাণতোষ চ্যাটার্জির খ্যাতি সারা বাংলা দেশ ছড়িয়ে পড়ল, সেদিন—কিন্তু সেদিন কি আর মানদার খোঁজ করা সম্ভব ছিল?

ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় ছিলনা।

অথবা হয়ত তেমন ইচ্ছাও ছিলনা, কে জানে? মনে পড়ছে একজন ইংরাজ কবির কথা। দুজন মানুষ অন্ধকার রাত্রির মাঝে দূর সমুদ্রের বুকে বিভিন্ন পথবর্ত্তী দু'খানা জাহাজের মত যখন কাছাকাছি হয় তখন একের আলো অন্যের উপর ফেলে একটু ক্ষণ তারা নিজেদের দেখে নেয়, পর মুহূর্ত্তেই সেই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে অগ্রসর হ'তে হ'তে নিঃসীম অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে হারিয়ে যায়, আর তাদের কখন দেখাশোনা হওয়ার নিশ্চয়তা নেই।· ··কিছু নিশ্চয়তা ছিলনা বটে, তবু দেখা শোনা হোলো। হাঁ হোলই ব'ল্‌তে হবে, কিন্তু কি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে।

মনে আছে, বাবার অসুখের তার পেয়ে বাড়ী যাওয়ার দরকার যখন হোলো, হাতে টাকা ছিল না। মানদা তার গলার সরু চেন হারটি, তার একমাত্র অলঙ্কার, না চাইতেই খুলে দিয়েছিল, বিক্রী ক'রে টাকা যোগাড় করবার জন্য, তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। যখন আবার তাকে দেখা গেল, সে তখন গয়নার লোভে মানুষ খুন ক'রে আইনের চরম দণ্ড নিতে চলেছে। কিন্তু সে নীরবে গেলনা, যেমন নীরবে এতদিন, এত দীর্ঘদিন এই বিপুল জনতার বিশাল অভ্যন্তরে আত্মগোপন ক'রে ছিল, তেম্‌নি চুপে চুপেই সে চ'লে যেতে পারত। কিন্তু তা' গেলনা, যাওয়ার আগে সে সম্ভাষণ করে' গেল। জানিয়ে গেল, বড় কঠিন ভাবে জানিয়ে গেল যে সে প্রতিশোধ নিয়েছে।......

কিন্তু এর জন্য দাযী কে? এই পঁযত্রিশ বছরে যত পাপ, যত গ্লানি, যত কুৎসিত কদর্য্যতা যে তার চারপাশে জমিযে তুলেছে, তার জন্যে কি সেই দাযী।

দাঁড়াও, আর একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে।

রাত্রি দু'টা বেজে গেছে। ঘর অন্ধকার, টেবিলের উপর যে বাতি জ্বালান ছিল, ঝড়ের এক ঝাপটায সে কখন নিভে গেছে। এই অন্ধকার ঘরে এত রাত্তির পর্য্যন্ত একা জেগে আছেন জাষ্টিস চ্যাটার্জি। চিন্তার যেন তাঁর আর কূল নেই।

কিন্তু এত চিন্তারই বা আছে কি? এতক্ষণে এই কথা নিঃসন্দেহে জানা গেল যে হিসাবের ভুল হয়েছে, তার ফলে হার হোলো, আজই সন্ধ্যাবেলা মন খুশীতে ভরপুর হ'যে ব'লে উঠেছিল, এত দিনে সার্থকতা লাভ করা গেল। জীবনের সাধনা সফল হোলো। কিন্তু এখন তার মিথ্যাটা ধরা প'ড়ে গেছে। দেখা গেল জীবনের ভিত্তি মূলে প্রকাণ্ড একটা আঁধার গহ্বর হাঁ ক'রে আছে। বিরাট একটা মিথ্যাকে নিঃশেষে অগ্রাহ্য ক'রে তারই বনিয়াদের ওপর জীবনের সৌধ গড়ে তোলা হ'যেছিল, মনে হ'যছিল এরই চূড়ায উঠে আকাশ ছোঁযা যাবে। দেখা গেল সে তাসের ঘর, একটা জোর হাওযার ঝাপ্‌টাও সইবে না। একে ব'লো সার্থকতা? একে ব'লো মুক্তি? মিথ্যা দিযে মুক্তি কেনা যায?

তবে আর এই মিথ্যার ইমারত সাজিযে রেখে লাভ কি? একে ভেঙ্গে দিলেই ত' হয।

হাঁ, ভেঙ্গেই দিতে হবে, আজ সন্ধ্যায আদালত থেকে বেরোবার সময মনে হ'যেছিল যে মামলা চুকে গেল। কিন্তু না, তা' যাযনি। জীবনে বহু মানুষের বিচার করা হ'যেছে। বহু পরিশ্রম ক'রে অন্যের অপরাধের বিচার ক'রে যখন মনে করা গেল যে সব কর্ত্তব্য সমাপন হোলো, তখনই শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরার পথে দেখা গেল যে আজও শেষ হযনি। নিজের অত্যন্ত কাছে কাছে যে অপরাধী এতদিন নিযত বাস ক'রে এসেছে, তাকে দণ্ড দিতে বাকী আছে। জীবনের শেষ বিচার আজও শেষ হয়নি।

হুঁ, বিচার করতে হবে। অপরাধীকে দণ্ড দিতে হবে। এ বিবেকের কথা নয, ন্যাযের শাসন বিবেকেরও উপরে। ন্যায়ের বিধান অমোঘ, সেখানে কারও পরিত্রাণ নেই।

ওরা বলেছিল মানদার একটা ইতিহাস আছে। হায, ওরা ইতিহাসটাই দেখ্‌লে, তার রচযিতাকে দেখ্‌লেনা, যে মানুষ অলক্ষ্যে থেকে সেই ইতিহাসে একটার পর একটা পরিচ্ছেদ যোজনা ক'রে এসেছে, তাকে কেউ জান্‌লে না। বাধ্য হ'যে যে পাপ ক'রল সেই যাবে ফাঁসী, আর যে সেই পাপীকে সৃষ্টি করল সে রেহাই পেযে যাবে? তা' হবে না, তাকে দণ্ড নিতে হবে।

হাঁ দণ্ড নিতে হবে। এমনকি যে পরম মুহূর্ত্তে জীবনকে সে প্রত্যক্ষ করেছে ঐকান্তিক ভাবে, জীবন-সত্তার পরম রমণীযতায আবিষ্ট হ'যে অনুভব করেছে Mere joy of living, সেই জমাট মুহূর্ত্তেই তাকে নরহত্যার চরমদণ্ড নিতে হবে, হত্যার চেয়েও যা' বীভৎসতর, এমন অবস্থার মধ্যে মানুষকে জোর করে ঠেল দেওযার দণ্ড নিতে হবে।

তবে আর দেরী করে লাভ কি? প্রাণতোষ। বিচারপতি প্রস্তুত হও। দুর্ব্বল ব'লে মানদার ওপর নিরঙ্কুশভাবে অত্যাচার করেছিলে। সে তার শোধ নিয়েছে, সে তোমাকে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। প্রস্তুত হও।

জাষ্টিস্ চ্যাটার্জি উঠে পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে বাতি জ্বালালেন। তারপর দেয়ালের গায়ের আলমারী খুল্‌লেন, খুলে তার মধ্য থেকে রিভলবারটি বার করে নিলেন। বাতির আলোয় ভাল ক'রে দেখে নিলেন ঠিক্ তৈয়ার আছে কিনা।

—হ্যা ঠিক্ আছে।

তারপর আবার বাতি নিভে গেল।

এখন আকাশভরা অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী ঢেকে গেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে বিমলা দলী ঘুমিয়ে আছে, নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে। স্তব্ধতায় গা ঢেলে অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে। দুষ্কৃতি-কারীকে সাজা দেওয়ার এই উপযুক্ত অবসর। কিছু লিখে যাওয়া দরকার হয় কি? না, কি হবে লিখে? কেউ একথা বুঝবেনা। তাছাড়া আর দেরী করা উচিত নয়। এই অন্তিম মুহূর্ত্তে পাপিষ্ঠের জন্য সমস্ত বিশ্বচরাচর থেকে স্নেহধারা উথলে উঠছে। রিভলবারটি ফেলে দিয়ে এখন একবার এই সুষুপ্ত ধরিত্রীকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরতে সাধ হয়। এখনই ঠিক এই মুহূর্ত্তে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই তার সব চেয়ে বড় শাস্তি। আর দেরী নয়। লোভাতুরকে বিশ্বাস নেই, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।..বেশী কিছু কষ্ট নয়। সেটা এই, হাঁ, এমনি করে চিবুকের নীচেয় লাগিয়ে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এখন ট্রিগারটায় কেবল একটু চাপ দিলেই হয়। হাতটা বড় কাঁপছে। তা কাঁপুক, ভয়ের জন্য যে কাঁপছে না তা তো জানাই আছে। তা আর কি? ন্যায়ের দণ্ড ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা করে না। সে দিন সেই স্বদেশী ছেলেটির ফাঁসির রায় লিখতে হাত ঠিক এমনি করে কেঁপেছিল, কিন্তু তাতে কিছু আটকায়নি। আজও আটকাবে না।

শেষ

ওয়ার্দ্ধা ভ্রমণ

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
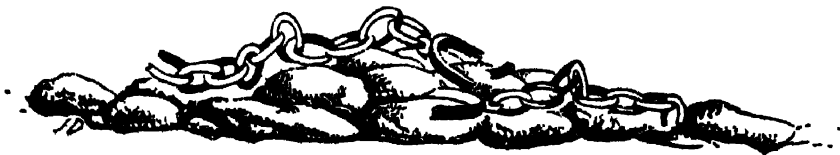
৭ই সেপ্টেম্বর। বড বাজাবেব ভিতব দিযে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে খেতে ট্যাক্সি এসে থামল হাওডা ষ্টেশনেব প্রবেশ দ্বাবে। ঝব্ ঝব্ কবে কতগুলা গ্যাস্ বেব কবে দিযে বেচাবা হাফ্ ছেডে বাঁচল। ভিতবে ঢুকে ওযার্দ্ধাব টিকেট কেটে বি এন্ আর বোম্বে মেলের ঘাডে চেপে রওনা হওযা গেল। আমাব মত আবো বহু যাত্রী ও তাদেব প্রত্যেকেব স্তূপীকৃত মালে বোঝাই হ'যে বেচাবা হাঁপাতে হাঁপাতে চললো। খানিকটা যায, আব থামে—আবাব হাঁপাতে হাঁপাতে চলে। এমনি করে চললো সাবা বাত, আব সাবা দিন। গাডীতে উঠে বসলেই মনটা চায এক নিশ্বাসে গিযে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে। কিন্তু গাডীর চাকা মনের সঙ্গে পাল্লা দিযে পাববে কেন? এবোপ্লেনেব মত যদি থাকত তাব আকাশে উডবার পাখা, তবে না হয খানিকটা চেষ্টা চলতে পাবত। কিন্তু বেচাবা রযেছে কঠিন লোহাব বাঁধনে মাটিব সঙ্গে বাঁধা। কত পাহাড কত প্রান্তব—কত গাঁ, কত সহর তাকে অতিক্রম কবতে হয মাটীব পবে গডাতে গডাতে ও মাঝে মাঝে লোকালয দেখে দেখে জিকতে জিকতে। ১৪ ঘণ্টায ৭৫২ মাইলেব মাথায এসে নেবে পডলাম ওযার্দ্ধা ষ্টেশনে।

অন্য দেশেব কথা জানিনে। কিন্তু আমাদেব এ দেশে বেলে চলা নিতান্তই বিডম্বনা। কযলাব কালিতে ও মাথাভর্ত্তি কযলাব গুঁডোতে ভূত সেজে বেবিযে এলাম ষ্টেশনেব 'ওভাব-ব্রিজ' পেবিযে। ষ্টেশনের কাছেই নিউ বেষ্ট্ হাউস্ নামে হোটেল, আমরা সেখানে গিযে উঠলাম। খালি ঘর পাওযা গেল না—বাত্রে শুতে হবে বাবান্দায। মাশুল বাব আনা দৈনিক ও খাওযা প্রতি বেলা ছয আনা। এই ছয আনা দিযে যা খাবাব মিলতো, তা বাঙ্গালীব পক্ষে একেবাবেই অখাদ্য। খানিকটা অডহড় দাল, ট্যাডসেব ঘ্যাট, কিছু ভাত ও খানকতক চাপাটি। বোজ খেতে বসে আমবা বলাবলি কবি—"আর পাবা যায না।" কিন্তু উপায নাই বলে পাবতে হয তারপবেও আবার। এমনি করে পাঁচ ছয়টা দিন আমবা সেখানেই কাটিযে দিযেছি।

৮ই তাবিখ সন্ধ্যায সেখানে গিযে পৌঁছেছি ও ১৪ই সকালে সেখান থেকে রওনা হযে এসেছি। এই কয়দিন সেখানে যা কিছু দেখবাব আছে, দেখেছি এবং কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিব মেম্বব ও অন্যান্য আগন্তুকদেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবেছি। ওযার্দ্ধা মধ্যপ্রদেশেব একটা জেলা—সহবটা বিশেষ বড নয—দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই। পাহাডে জাযগা—দূরে দূবে ছোট ছোট টিলা—উঁচু নীচু জমিন—যেন পৃথিবীব বুকেব পরে ঢেউযেব 'দে-দোল' খেলা। মোটেব উপব স্বাভাবিক দৃশ্য সুন্দব। জল হাওযাও স্বাস্থ্যকর। আর আছে কযেকটা প্রতিষ্ঠান, যা' মহাত্মা গান্ধী সেখানে থাকেন বলে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই গডে উঠেছে। প্রথম হচ্ছে মগন-বাডী—মগনলাল গান্ধীব স্মৃতি রক্ষার্থে স্থাপিত। এখানে গ্রামোদ্ধার সমিতির (Village Industries Association) প্রধান

কেন্দ্র। এখানকার কাজের অনেকগুলি বিভাগ আছে, যথা—গুড় প্রস্তুত, গম পেশা, চাল ছাঁটাই, তেলের ঘানি, কাঠ ও লোহার কারখানা, মৌমাছি পালন, চরখা, কাগজ তৈযারী, মাটির জিনিষ তৈযারী ইত্যাদি। এ ছাড়া আর আছে মগন সংগ্রহালয ও শিক্ষানবিশদের থাকবার জন্য একটা বোর্ডিং। মগন সংগ্রহালয হচ্ছে গ্রামের তৈযারী জিনিষপত্রের একটা স্থায়ী প্রদর্শনী। আর বোর্ডিংটাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শিল্প শিক্ষার জন্য আগত জনা পঞ্চাশেক শিক্ষা-নবিশের থাকবার ব্যবস্থা আছে। তারা আসে—দুই মাস ধরে শিক্ষা নেয—তার পর যে যার জায়গায় চলে যায। আবার নূতন করে আর এক দল এসে বোর্ডিং ভর্তি করিযে দেয। শিল্প বিভাগগুলিতে জিনিষপত্র তৈযেরী হয এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শিল্প প্রণালী ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পরীক্ষা ও তার উন্নতি বিধানের চেষ্টা হয। সেখানকার কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয যেন সবটাই একটা বিরাট পণ্ডশ্রম। কিন্তু এই অভিমত বাস্তবিকই ঠিককিনা, তা' ভাল করে বুঝবার জন্য যথাযথ অনুসন্ধানের সময করে' উঠতে পারিনি।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান নল-বাড়ী। এখানে আছে চামড়ার কারখানা ও চরখা বিভাগ। তৃতীয় হচ্ছে হিন্দুস্থানী তালিমী শিক্ষা-মন্দির। এটা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শে প্রকল্পিত ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-প্রণালী (Wardah scheme) অনুসারে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তৈযেরী করবার একটা স্কুল। এখানে বিভিন্ন জাযগা থেকে এসে দেড় শত লোক এক সঙ্গে ছয মাস থেকে শিক্ষা নিযে চলে যায এবং ফিরে গিযে ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-প্রণালীর আদর্শে নূতন নূতন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করে। চতুর্থ মহিলা আশ্রম। এটা একটা মহিলাদের শিক্ষার জন্য বোর্ডিং স্কুল। এখান থেকে বেরিযে অধিকাংশ মহিলাই বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের কর্ম্মী হিসাবে কাজ করে।

১১ই তারিখ রাত্রে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমরা পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞেস করলাম—"বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদের কর্ত্তব্য কি?" তিনি বললেন—"সেই জন্যেই তো আমরা সকলে এখানে এসেছি। এখন সবাই মিলে যুক্তি করে যা' করণীয, স্থির করতে হবে।" আমরা বললাম—ঠিক যা-ই হোক, মহাত্মাজীর কিন্তু এখন কংগ্রেসের ভিতরে এসে পরিপূর্ণ দাযিত্ব গ্রহণ করা উচিত। তাঁকে না হ'লে ওযার্কিং কমিটির অধিবেশন হয না—গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি তিনি মুশাবিদা করে' না দিলে চলে না। কংগ্রেসে সর্ব্বতোভাবে তার নেতৃত্বই চলছে আজও। অথচ নামে তিনি পরামর্শদাতা মাত্র। এ যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' অবস্থা। এ অবস্থা দু চার দিন চললেও, বছরের পর বছর চলতে পারে না—বর্ত্তমান সঙ্কটের মত সঙ্কটের দিনে তো নযই। সঙ্কটের দিনেই হয়ে থাকে নেতৃত্বের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায প্রমাণিত হয—সে নেতৃত্ব আর চলতে পারে, কি পারে না। সে নেতৃত্বে দেশের কাজ এগোয কি এগোয না। যদি অধিকাংশ মনে করে যে সে নেতৃত্বে কাজ আর এগোয না, তবে তখনই হয সে নেতৃত্বের অবসান ও অপর কোনো নব নেতৃত্ব স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি। মহাত্মাজী যদি এই সঙ্কটের সমযে তার নেতৃত্বের পরীক্ষা না দিয়ে শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে থেকে নিজের প্রভাব রক্ষা করতে থাকেন, তবে তাতে দেশের কাজ এগিযে যাবার পথে

বাধাব সৃষ্টি হবে। এখন তার উচিত নিজের নামে নেতৃত্ব গ্রহণ করা, নয় তো একেবারেই সবে দাঁড়ান।

পণ্ডিতজী শুধু বললেন—"কথা খুবই ঠিক—বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁব তা' কবা উচিত ছিল।"

আমরা বললাম—"কিছুদিন থেকে আমরা দেখছি, আপনি এমন ভাবে চলছেন যেন পেনসন নেবাব ব্যবস্থা কবছেন। ব্যাপারটা যে কি আমবা ঠিক বুঝতে পাবছিনে।"

তিনি বললেন—"আগে দেশময ঘুবে ঘুবে বেড়াতাম, এখন আর তা' কবিনে। এই তো? দেশময ঘুবে ঘুরে বেড়িয়ে নিজকে জাহিব করা আমি অন্যায মনে করি। আমি সারা বছর ধরে এই বরে' বেড়াব—আমাব আব কি কোন কাজ নেই? যাব যাব নিজেব প্রদেশে কত কাজ—সে কাজ করবার লোক নেই। আব আমবা ঘুবে ঘুবে বেড়াই। কংগ্রেসটাকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে সুশৃঙ্খল সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা দরকাব, তা' কেউ আমরা করিনে। এমন কি 'অল্ ইণ্ডিযা কংগ্রেস কমিটিব' অফিসটা পর্য্যন্ত ভাল ভাবে চলে না—তাব ফলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিযেছে। অথচ আমাদের সকলকেই পেযে বসেছে ঘুরে বেড়াবার দুর্বুদ্ধিতে। আমাব মতে এটাকে আইন করে' বন্ধ করে দেওযা উচিত। তা' ছাড়া আমাদেব মস্ত বড দোষ—আমবা চাই ব্যক্তি বিশেষেব নেতৃত্ব। প্রতিষ্ঠান যে-কোনো ব্যক্তিব চেযে বড। দশ জনকে নিযে প্রতিষ্ঠান। তাই দশের মতে চলবে সব কাজ। কিন্তু দশেব মতের চেযে ব্যক্তি-বিশেষেব মতটাকে আমবা বেশী মূল্যবান মনে করি বলে আমবা চাই—সেই ব্যক্তি-বিশেষ দেশময ঘুরে ঘুরে গলাবাজি কবে বেড়াবে। অথচ প্রতিষ্ঠানের চেযে ব্যক্তি বড হ'যে ওঠায দেশময কত যে অনর্থেব সৃষ্টি হচ্ছে, তার ইযত্তা নেই।

আমাদেব ওখানে আমবা সব সমযে চেষ্টা কবি যাতে কোনো ব্যক্তি-বিশেষেব মতেব প্রাধান্য না হয—কোনো একটা সিদ্ধান্ত যাতে সকলেব সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হিসেবেই গৃহীত ও প্রচারিত হয়। তাই আমাদেব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিব প্রেসিডেণ্ট কে হবে, তা' নিযে আমাদেব বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই—যে কেউ একজন হ'লেই হ'ল।

কিন্তু তোমাদের বাংলা দেশে দেখি এ নিযেই যত মারামারি। তোমাদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য-সংখ্যাও অসম্ভব রকম বেশী। এত লোক নিযে সভা করে' তর্ক ও বিচার চলতে পারে। কিন্তু এতে কাজ এগোয না। ফলে এক জনেব কর্ত্তৃত্বই (one man rule) কাযেম হ'যে দাঁড়ায। তোমাদের হযেছেও তা-ই।"

পণ্ডিতজী এই ভাবে একটার পব একটা বিষয নিযে বক্তৃতা দিযে চললেন। তার বক্তৃতাব বেগটা একটু মন্দীভূত হ'যে আসতে আমরা তাব কোনো কোনো কথা সম্বন্ধে তর্ক তুললাম। বাধা পেয়ে ও নূতন চিন্তাব যোগাযোগে পণ্ডিতজীর বক্তৃতার স্রোত আবার তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠলো। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তাব পরে বাত বেশী হ'য়ে যাওয়ায় আমবা উঠে পড়লাম। স্পষ্টই বুঝলাম পণ্ডিতজী পেন্‌সন নিতে যাচ্ছেন না—বরং এগিয়েই যেতে চাচ্ছেন কর্ম্মের পথে নেতৃত্বের প্রেরণা নিযে।

১২ই সকালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার কথা। খুব সকালে দু' খানা একায় চড়ে আমরা গান্ধী দর্শনে সেওগাঁ রওনা হলাম। একখানাতে আমি ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। আর একখানায় হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। আমাদের হোটেল থেকে রেষ্ট্ হাউসের রাস্তা দিয়ে, সুভাষবাবুর আস্তানার পাশ দিয়ে, যমুনালাল বাজাজের বাড়ীর সমুখ দিয়ে, নবভারত বিদ্যামন্দিরের ধার দিয়ে, মহিলা আশ্রম পেরিয়ে গিয়ে আমরা সহরের বাইরে মাঠের ভিতরে এসে পড়লাম। সামনে পাহাড়ে দেশের উঁচু নীচু ঢেউ খেলান পথ—কোথাও ছোটখাট টিলার মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে ওদিকটাতে নেমেছে—কোথাও বা এক পাশে গায়ের উপর দিয়ে দোলায়মান পৈতার মত লম্বিত্ হ'য়ে চলেছে। পথের দুধারে ফসলের ক্ষেতে গাঢ় সবুজ ঢেলে দেওয়া—সুপ্রচুর জোয়ারী, চিনা বাদাম, অড়হড় উপহারের আয়োজন।

আমাদের মুসলমান গাড়োয়ানকে সুরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন :

—"এখানকার সব লোক গান্ধীজীকে মানে ?"

—"না, সাহেব। সব লোক কোথায় মানে ?"

—"তবে কারা মানে ?"

—"কংগ্রেসের লোকেরা মানে।"

—"আর মানেনা কারা ?"

—"হিন্দুরা মানে না।"

—"মুসলমানেরা মানে ?"

—"না—তারাও মানে না।"

—"আচ্ছা, সুভাষবাবুকে চেন ?"

—"বাবু সুভাষ চন্দ্র বোস ? হাঁ, তিনি তো সত্যনারায়ণ বাজাজের কুঠিতে আছেন।" (সত্যনারায়ণ বাজাজ হচ্ছে ওয়ার্দ্ধা মিউনিসিপালিটিতে কংগ্রেসের বিপক্ষ দলভুক্ত একজন মিউনিসিপাল কমিশনার)

—"সুভাসবাবুকে কারা মানে ?"

—"হিন্দুরা মানে।"

—"আর মুসলমানেরা ?"

—"মুসলমানের মধ্যেও কেউ কেউ মানে।"

—"আচ্ছা, গান্ধীজী বলেন—সুতা কাটলে স্বরাজ হবে। তুমি কি বল ?"

—"সুতা কেটে স্বরাজ কেমন করে হবে, সাহেব ?"

—"তবে হবে কেমন করে' ?"

—"দুসমনের সঙ্গে লড়তে হবে। তারপরে তাকে গদী থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের কাউকে বসাতে হবে। তবেই হবে।"

—“আচ্ছা, গান্ধীজী যদি সুতা কেটে-ই স্বরাজ আনতে পারেন, তবে সেটা কেমন হবে ?”

—“তা যদি হয়, তবে তো তিনি সবাইকে কংগ্রেস বানিয়ে ছাড়বেন। তার মতলবখানাই তা-ই।”

—“তাতে ভালই তো হবে।”

—“ভাল হবে কেমন করে, সাহেব। হিন্দুও থাকবেনা, মুসলমানও থাকবেনা—সব কংগ্রেস হ'য়ে যাবে। তাতে কি ভালটা হবে ?”

সে দেশের কথ্য-ভাষা মরাঠী। কিন্তু আমরা যাতে বুঝতে পারি, সেজন্যে লোকটী হিন্দীতেই কথা বলছিল। এরূপ অকুণ্ঠ আলাপ ও নিঃসন্দেহ মতামত শুনতে আমাদের ভারি মজা লাগছিল এবং এক্কার ঝাঁকানীর কষ্টেরও খানিকটা লাঘব হচ্ছিল। হঠাৎ লোকটি বলে উঠলো—

“ঐই দেখ, সাহেব, গান্ধী-আশ্রম, সেওগাঁ।”

আগামীবারে সমাপ্য

কুকুরের ডাক

ইন্দ্রজিৎ রায়

এই এক-ঘেঁয়ে দিনগুলো যখন চলে, মনে হয় যেন একটা দিন একটা বছর, আর যখন চলে যায় তখন যেন এক একটা বছর এক একটা দিন। দিনের, মাসের, বছরের দাগ কাটবার কোথাও কিছু নেই।

এই বসে থাকার আরামের ভেতর আরামও নেই আনন্দও নেই। বিস্ময়ের ভিতর আরাম না থাকতে পারে, আনন্দ আছে।

আর এই বিস্ময়ের বস্তুটীরই একান্ত অভাব এই দিনগুলোর ভেতর। সকাল যায়, সন্ধ্যা আসে। সন্ধ্যা যায়, সকাল আসে। ওদের চেহারা একটা থেকে আর একটার আলাদা করবার উপায় নেই।

মাসকতো আগে মিঠে রোদের সূর্য্যোদয় দেখতে বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়াতুম, আর আজকের প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রথম দর্শন নিম ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বারান্দার ওপ্রান্ত থেকে।

কয়মাস আগে সন্ধ্যায় শুকতারা বারান্দার সামনে জ্বল জ্বল করে চেয়ে থাকতো, আজ ভোরে তালা খুলে দেওয়ার পর ঘরের পেছন দিকে যখন বেড়াতে যাই, ম্লান চোখে তখন ও বিদায় নেয়।

এই যা তফাৎ।

কিন্তু আকাশও ফিকে হ'য়ে গেছে। রঙের তার বদল হযতো আরও হয়, আমাব চোখেব যে ক্লান্তি ধরে গেছে।

চারপাশে ঐ মডার খুলির দৃষ্টি মেলে পাথরের দেয়ালগুলো এক চিরনিঃসাড নীরব তাণ্ডব নাচ নাচে। ওর বীভৎস বিকৃতি মনেব অসাডতাকেও বিকৃত, বিকৃতি বোধকেও অসাড করে' তোলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কযটি কাজ একেব পব এক সাজানো, তাদের কোন প্রযোজন অপ্রযোজন বোধ নেই, অসাডভাবে আপন মনেই হযে যায় যেন।

গণাগণতি কযটি লোকের মুখ আজও দেখছি, কালও দেখছি। তাদেব সাথে ধরাবাঁধা কয়টি কথা আজও বলছি, কালও বলছি। দৃষ্টিরও কৌতূহল নেই, কথাও অর্থশূন্য, না বল্‌লেও বলাব আবেগ আসবে না বলেও তৃপ্তি পাবার কিছু নেই।

দিনগুলো একের পব এক আসে, এসে যেন আর যেতে চায না, নাক্‌কে মুখকে চেপে ধবে এখানেই থেকে যেতে চায।

সমাজে কেউবা বলে, আর অনেকেবা মেনেই নেয, আরামেই আছি বৈ কি? ভবাপেট ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা বোঝে না। কিন্তু তাব চেযেও বোধ হয, বদ্ধজীবেব জ্বালা মুক্তজীব কম বোঝে।

সুখেই আছি। কেবল যা' সামান্য একটু অভাব, একটু হাসি-কান্নার মরুস্থানেব। মৃগতৃষ্ণিকার জল খুঁজি শুখনো মরা খবরের কাগজেব wit and humourএব ডোবাতে।

এই যে আবাম—ভোবে উঠে মুখ ধুতে না ধুতেই চা তৈবী, তাবপর বসে শুযে কিছু সময় কাটলো, স্নানাহাব, খববেব কাগজ পাঠ, দিবানিদ্রা, যা-হোক একখানা বই হাতড়ানো; আবার খাওয়া, খেযেদেযে বাতের মত কুঠি বন্ধ হ'যে যাওয়া—মনে মনে বিদ্রোহ জাগে এব বিরুদ্ধে।

ছুত্তোব! যা হবার হোক, করে বসি একটা কিছু।

কিন্তু আমি একলা নই। এক ধরণেব সমাজ আছে এখানেও। আমাব খেযালে সকলের না পোষাতেও পারে।

নিজের ওপব দিযে যায এমন কিছু করেও এই নিযমেব একঘেযে ধাবাকে দাও ওলট পালট করে'।

কি করতে পারি?

হয়তো একবেলা, ছু'বেলা, একদিন, ছু'দিন না খেয়ে কাটিযে দিতে পারি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জনড অচল জগতে তাতেই বিপ্লবের তরঙ্গ উঠবে। এ ওর কানে কানে জিজ্ঞেস করবে, খাযনা কেন বাবু? কর্ত্তব্যপরায়ণ সিপাইশাস্ত্রী, তাদের গিযে রিপোর্ট করতে হবে, কেন যেন খায়না বাবু। তারপর আনাগোনা প্রশ্ন। ভালো লাগেনা এই scene create করতেও। আর এক scene create করা যায় মৌনী হ'যে। তাও vulgar বোধ হয়।

মনে পড়ে, আচ্ছা কুঠিবদ্ধ রাতটাতো একান্ত আমার। তা' নিয়ে আমি যেমন করে

ছিমিমিনি খেলতে পারিতো। এই রাতকে নিয়েই নিয়ম ভাঙ্গবো। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই বা শুতে হবে কেন? সকল রকমে নিষ্ফল জীবনের কেবল এই সজাগ দৃষ্টি দিয়ে রাতকে বিদ্ধ করবো। আজকে আমার এই মৃগযাতেই বৈচিত্র্যের আনন্দ দিক্‌।

রাত হয়। আলো নিভিয়ে চেয়ে বসে থাকি।

পরদার পর পরদা রাতের কালো আঁধারকেও উপভোগ করবার উপায় নেই। ঐ সামনে চেয়ে আছে তীব্র চোখে একটা অর্থহীন বিজলি বাতি। শুধু অন্ধকারের সৌন্দর্য্যই নয়, নীরবতার গাম্ভীর্য্যকেও একটা অস্বাভাবিক তীব্র চীৎকারে বিদীর্ণ করেছে যেন ও।

কতো রাতই বা। অথচ চারদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম। এ যেন রূপকথার সেই মৃত 'রাজপুরী। আমারই আশেপাশে এই দেযাল দিয়ে ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটুকুর ভেতর ছোট্ট একটু সহর প্রায়। অথচ এতগুলো মানুষ যে আছে তার কোন প্রমাণ নেই, কোন নিশানা নেই। বাড়ীতে একজন কেউ মরলে, সেই সন্ধ্যায় বাড়ীর যে-চেহারা রোজই সন্ধ্যায় এতগুলো মানুষের এই আবাসের সেই চেহারা।

একটু শব্দ শোনবার জন্য কাণের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। ঘরের যেন দম বন্ধ হয়ে আছে— একটা হাওয়ায় যদি জানালাটা খুলে দেয়, যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

ডালপালায় আঁধার বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শশ্মানঘাটে অশ্বত্থ গাছ। আঁধার রাতে তারই কাছাকাছি এসে পড়তে ভূতের ভয়ে চঞ্চল পথিক যেমন একান্ত মনে কামনা করে হঠাৎ একজন সঙ্গী যেন জুটে যায়, তেমনি আকুল হয়েই চাই যেন একটা শব্দ।

আমার একান্ত মনের বাসনা বুঝি আঘাত হানে নীরবতার গভীরে।

সুদূর থেকে ভেসে আসে একটা কুকুরের ডাক, আঁধারের গাম্ভীর্য্যকে যেন গম্ভীরতর করে' তোলে।

খানিকটা ডেকে থামে। থেমে আবার ডাকে। এমনি চলতে থাকে। ··

মন আর সেদিকে নেই। এক মুহূর্ত্ত আগের তীব্র কামনা এই মুহূর্ত্তে আর নেই। মন চলে গেছে সুদূর অতীতে।

অনেক কাল আগেকার একটা কথা মনে পড়ে। সেদিনও এমনি একটা কুকুরের ডাক শুনেছিলাম।

নিমন্ত্রিত হয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে গেছি গান শুনতে। বিকেলে থেকে গান, সন্ধ্যের পরেই বাড়ী ফিরবো।

ভাল গায়ক, বেশ জমেছে, সময় হুহু করে বয়ে যায়, কখন সন্ধ্যে পেরিয়েছে খেয়াল হয় নি। তবে রাত বেশী হবারও কথা নয়। কারণ গায়কও সকাল সকালই গান ভেঙ্গে বিদায় নেবে।

নদীর ধারের পথে বাড়ী ফিরছি, ছোট এক খানি মাঠ—কয়খানি মাত্র চষাজমি, তারপরই গ্রাম।

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ, গানের বেশ মনের ভেতর বাজছে। নদীর ওপারে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ মাঠ থেকে ঝির ঝিরে হাওয়া বয়ে আসছে। উপভোগ করতে করতে মন্থর পায়েই চলছি।

গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে—কুকুর ডেকে উঠলো। আজকের মতো এমনি নিস্তব্ধতার গভীরতাকে ফুটিয়ে সেদিন ও যেন আমায় ডেকে বললো: নিশি দ্বিপ্রহর।

ত্বরিৎ ছুটলাম। এত রাত হয়ে গেছে এরই ভেতর। হবার তো কথা নয়। বছর কতক বাদে বাড়ীতে এসেছি। আগের দিনে সন্ধ্যার পরে এমনি আড্ডা থেকে বা নদীর ধার থেকে বাড়ী ফিরবার পথে হয়তো শুনতাম পালেদের বাড়ী থেকে আসছে খোল বাজিয়ে সংকীর্ত্তনের শব্দ, নয়তো ঘোষেদের উঠোনের আড্ডা থেকে "কচ্চে বারো" পাশার চীৎকার। আজ এরই ভিতর এমন নিঝুম। তার ভেতর কুকুরের ডাক।

নদীর ধারের পথ ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবার মতলবে সোজা পথ ধরলাম। মাঠের পাশেই বদন মোল্লার বাড়ী। সে একখানা মাদুর বিছিয়ে উঠোনে শুয়ে পড়েছে।

উঠে বসে বল্‌লে: "সেলাম বাবুজি।"

জিজ্ঞেস করলাম: "এরই ভেতর শুয়ে পড়েছ বদন। রাত কি বেশী হয়ে গেছে?"

"রাত কোথায় বাবু? এইতো সন্ধ্যে হল।"

"তবে ঘর সব আঁধার কেন?"

"আর বাতি জ্বেলে কি করব বাবু বলুন।" বদন উঠে একটা মোড়া এনে দেয়। জিজ্ঞেস করলুম: "খাওয়া দাওয়া করবে না?"

"খাওয়াতো সন্ধ্যের আগেই মাঠ থেকে ফিরে স্নান করে সেরে নিয়েছি।"

"রাত্রে খাওনা?"

বদন বললে: "সেদিন কি আর আছে বাবু? তখন দুপুরে বাড়ী এলে নেয়ে খেয়ে বিকেলে আবার মাঠে যেতাম, রাত্তির বেলা খেয়ে দেয়ে গল্পগুজব করে ছয়দণ্ড দুপুর রাতের পরে শুতাম।"

"এখন কি একবারই খাও?"

"মাঠে নাস্তা নিয়ে যাবার মনিষ্যি তো আর নেই, রাত থাকতে উঠে পান্থাই হোক্ মুড়িই হোক্ দুটো খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। তারপর আর এই সন্ধ্যের আগে এসে ভাত খাই।"

একটা কৌতূহল জাগে। বলি: "আচ্ছা বদন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, একটু ভেবে বলতো, আগের দিনে কি নিজেকে সুখী মনে হতো?"

আজকের আমারই মতো অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে বসে থাকে খানিকটা।

একটা নিশ্বাস ফেলে, তারপর টের পাই একটু হাসে, ধীরে ধীরে বলে: "বাবুজি, দুঃখের দিনে পড়ে একথাটা অনেক সময়েই ভাবি।... ...সুখ কি বাবুজি?... সুখ কাকে বলে?... আগের দিনেও ভাবতাম, আমাদের গরীবের কপালে কি খোদা সুখ লিখেছে? এখনও ভাবি, খোদা যা' করবার দিয়েছে করে', দিন গুজারা করে' দি। তবে সেদিন ভাই দুটো ছিল, ছেলে মেয়ে

ছিল—কচিৎ কোনোদিন একখানা নূতন কাপড় একটু মেঠাই যদি কিনে দিতে পেরেছি, ওদের মুখে একটু হাসি দেখেছি। তাও একজনকে দিতে পেরেছি তো আর একজনের কথা ভেবে মনটার ভেতর খচখচ করে বিঁধেছে। তবু আমাদের গরীবের কপালে তাতেই যা' হোক্ একটু আনন্দ জুটতো।”

আরও দু' একটা কথার পর বিদায় নিই। এখান থেকেই সুরু হল বন জঙ্গলের পথ। কি পরিষ্কার চবান জায়গা ছিল এসব। আজ কেবল কাঁটা জঙ্গল আর অন্ধকার—সরীসৃপের শপ্ শপ্ গতিবিধ। এই সন্ধ্যের পরেই পথ চলতে গা ছম্‌ছম্ করে।

ভাবতে ভাবতে চলি ঐ বদন মোল্লার কথাই। কি জোযান তিন্‌টে ভাই-ই ছিল! ওদের লাঠিকে ভয় না করতো, এ অঞ্চলে এমন মানুষ কম।

কয বছর আগের কথাই-বা?

কলেজে পড়ি তখন। যখনই বাড়ী আসি। গ্রামের ছেলেগুলোর আড্ডা জমে আমারই ঘরে। খাবার সময়ও কেউ কেউ জোটে, তা' নইলে কেবল ঐ সময়টাই যার যার বাড়ী। তা' ছাড়া পড়া, ঘুম, খেলা, গল্প, স্নান, বেড়ানো—সব এক সঙ্গে।

ওদের নিয়ে স্নান করছি। জনকতক জল ছিটাছিটি করছে। সামনে একখানা ডিঙ্গিতে এক-জন জেলে মাছ ধরছে, আর একজন বৈঠে ধরে আছে। অনিল জল ছিটাতে ছিটাতে ঐ ডিঙ্গিখানার তলায় গিয়ে সাঁতার কাটছে, দেবু তারই দিকে জল ছিটাচ্ছে। খানিকটা জল গিয়ে লেগেছে যে-জেলেটি বৈঠে ধরে আছে, তার গায়ে।

কাছাকাছি একখানি গ্রামে কয়েক শো ঘর জেলের বাস। বাংলা দেশের সব জায়গার জেলেরাও যেমন, কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত এগাঁয়ের এরাও তেমনিই ছিল। সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ান হয়েছে, এক মিশনারী সাহেবের কৃপায়। আর আত্মসম্মান ফিরে পেতে সুরু করেছে তার সাহচর্য্যে।

জল গায়ে লাগতে জেলেটি উঠেছে গালগালি করে'। বৈঠে তুলে কাছাকাছি অনিলকে পেয়ে মারে আর কি। অনিল যতো বলে সে তার গায়ে জল দেয়নি, সে ততো রাগে আর গাল দেয়। আমি জেলেটিকে বুঝাতে চেষ্টা করি। সে কাণও দেয়না। রেগে বৈঠে নিয়ে তাড়া করে। ছোট ছেলে অনিল, ভয়ে ডুবেই মরে বুঝিবা। নৌকায় উঠে বৈঠেখানা কেড়ে নিতে গেছি, অপর জেলেটি লগি নিয়ে আমায় আক্রমণ করেছে। এর হাতের বৈঠে ছিনিয়ে ওর হাতের লগি ধরেছি, ধ্বস্তা ধ্বস্তিতে ডিঙ্গি গেল ডুবে। বৈঠে, লগি, কাঠ, জাল—সব কুড়োবার, নৌকো তুলবার জন্যে জেলে দুটো ব্যস্ত হয়ে উঠে, সাহায্য করি, ছেলেদের ডাকতে তারাও যা পারে করে।

নৌকো যখন ঠিক হয়ে যায়, যাবার বেলায় জেলেরা শাসিয়ে যায় দেখে নেবে ওরা।

সেকথা আমার কাণেও যায়নি। ওরা কেউ কেউ শুনেছিল। বলতে হেসে উড়িয়ে দিই। ওরাও ভুলে যায়।

রোজকার মতো পরদিন স্নান করছি। ছেলে পিলেরা অনেকে উঠে পড়েছে। দু' একজন তখনও জলে। আমিত উঠবো উঠবো করছি।

পাশেই শব্দ হয় 'ঝপাৎ'।

ডাঙ্গা থেকে হঠাৎ একটি লোক ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জোয়ান খাটো চেহারা, মালকোচা মেরে কটিটি মাত্র বেড়ে কাপড় পরা। জলে পড়েই বলে: "কাল যে বড় মেরেছিলে।"

এক মুহূর্ত্তেই ব্যাপারটা বুঝে নিই। ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় এমনি চেহারাই আরও দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বলিঃ "মেরেছিলাম, বেশ করেছিলাম।" ও আক্রমণ করে। নিজেকে সামলে নিয়েই ওর চুলের গোছাটা ধরে' সাঁতার জলে পড়ি। ওকে চুবিয়ে রাখি, নিজেও ডুব দিই, একএকবার ভেসে উঠি আর বাকী দু'জনের চোখে মুখে প্রাণপণে ঘুসি মারি, আবার ডুব দিই।

জলের ভেতরে সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

বাঁ হাতের তলায় যে রয়েছে, দমবন্ধ হ'য়ে আসবার মতো হয়ে সে আপ্রাণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে।

এর ভেতর অপর দু'জনের একজনের চোখ ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। রক্ত দেখে দু'জনই বোধ হয় ঘাবড়ে যায়। তাড়াতাড়ি মাঝনদীর দিকে গিয়ে জলের প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে চম্পট দেয়। তৃতীয়টি একেবারে ফাঁকে পালায় দেখে, প্রথমটিকে ছেড়ে দিয়ে তাকে তাড়া করি, কিন্তু তিনজনই তখন জানের দায়ে সাঁতার কাটে, ধরে কে?

এদিকে কি হচ্ছিল, তা' লক্ষ্য করবার আমার অবকাশ ছিল না।

এতগুলো কাণ্ড ঘটতে বোধ হয় মিনিট খানেকের বেশী সময় লাগে নাই।

আগে কারো চোখে পড়ে নাই—স্নানের ঘাটের পশ্চিম দিকে বদনদের বাড়ীর কাছে বরাবর অপর কতকগুলো খালি নৌকোর মাঝে একখানা বড় ছড়ের নৌকায় লুকিয়ে ছিল প্রায় ত্রিশজন জেলে লাঠি শড়কি আর বৈঠে নিয়ে।

আমার উপর আক্রমণ দেখে ছেলেপিলেরা ডাঙ্গা থেকে চীৎকার দেয়: "নির্ম্মলবাবুকে মেরে গেল।" বদনরা তিন ভাই বাড়ী থেকে লেঠেলের ডাক ছাড়ে।

জবাবে নৌকোর জেলেরাও লেঠেলের ডাক ছাড়তে ওপারে খেজুর বনের ভেতর থেকে দেখা গেল প্রায় ৫০।৬০ জন জেলে লাঠি, ঢাল, শড়কি নিয়ে নদীর দিকে আসছে। বদন মোল্লার তিন ভাই লাটি হাতে নিয়ে পিছোবার লোক নয়। তাদের চীৎকারে গ্রামের আর জনকতক লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়ে।

কিন্তু জেলেদের অগ্রদূতরা এরই ভেতর রণে ভঙ্গ দেওয়াতে জেলের নৌকোও তাড়াতাড়ি মাঝ নদীতে গিয়ে ভাটার পথে এবং ওপারের জেলেরাও বাড়ীর পথে ছুটিতে থাকে। খানিক দূরে গিয়ে ঐ তিনজনকে নৌকায় তুলে নেয়।

বদন মোল্লারা ওদের তাড়া করে, আর বলে,·· ·· জেলের এত স্পর্দ্ধা, যেখানে পাবে আজ ওদের বংশকে দেখাবে। ক্রমে বদনের দল পুরু হয়ে উঠে।

আমার একলা একটা মানুষের ওপর আক্রমণের জন্য এত বড় অভিযান।—এ যখন দেখি, তখন অনেক কিছুই ক্ষমা করতে পারি। বদনদের ডেকে ফিরতে বলি। কার কথা কে শোনে? আর এ-অবস্থায় ফিরতে ওরা কখনও শেখে নাই।

দৌড়ে ডাকাডাকি করে থামাই। বলিঃ "কোথায় গিয়ে ধরবে ওদের?"

"ওদের গাঁয়ে গিয়ে।"

"পাগল।"

"একবারের জায়গায়তো দু'বার মরবো না বাবু!"

"তাতো বুঝলাম, কিন্তু গাঁও চড়াও হয়ে মারপিট করবে?"

"ও সব আপনারা দেখবেন বাবু! ওরা গাঁও চড়াও হয়ে মারপিট করতে আসেনি?"

বলে' সেলাম ঠুকে চলে যায়।

আবার দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে' বলিঃ "মারতে এসে ওরাইতো মার খেয়ে গেছে। আমার জন্যেইতো যাচ্ছো, আমি তোমার হাত ধরে' বলছি ফেরো।"

জিভ্ কেটে আবার সেলাম দিয়ে বলে: "এর পরে আর কথা চলে না।"

ভাইদের ডাকে:

"চলরে সোনা।" এরই ভেতর ওদের হাঁক ডাকে জন পঞ্চাশ জুটে গিয়েছিল লাঠি, শড়কি নিয়ে। আমার সাথে সাথেই ফেরে। কিন্তু সেকি বিদ্রোহের কলরব নিয়ে!

সেই বদন এই। হাত পা শুখ্‌নো, পেট জোড়া পিলে। ভাই দুটো গেছে। স্বামীস্ত্রীতে কোনোমতে দুটো খেয়ে দুঃখের দিন কাটায়। কোথায় বা লাঠি, কোথায় বা লেঠেলি!

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলি। সমস্ত গ্রামটা নিঝুম, যেন নিশীথের ঘুমে অচৈতন্য—সবে কিন্তু রাত আটটা।

যে-পথ ধরেছি, তা'তে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর ওপর দিয়েই যেতে হবে। গ্রামটা যেন অন্ধকার, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর লুকোনো দু'চার খানা ঘর খা খা করে। ক্বচিৎ এক আধখানা বাড়ীতে একটা দীপ জ্বলছে মিট্ মিট্ করে'।

দূর থেকে কুকুরের ডাক তেমনিই ভেসে আসছে।

পরেশ খুড়োর উঠোনে পড়তেই ঘরের ভেতর থেকে রুগ্নের কাত্‌রানির সাথে প্রশ্ন আসে: "কে?"

"আমি নির্ম্মল।"

"আহা, বাবা নির্ম্মল এসেছ? এস, এস, ঘরে এস। এই কতক্ষণ থেকে ছেলেটা 'জল' 'জল'

’রে’ কেঁদে এই হয়তো ঘুমিয়ে পড়লো। আমারও এমন জ্বর, উঠে একটু জল ভরে দেওযা শক্তিতে কুলোলোনা না।”

“সেকি? খুড়িমা কোথায়?” ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলি।

“সেও জ্বরে অজ্ঞান হযে আছে তুপুবের পব থেকে। আজ আব এ বাড়ীতে কাউকে জল ভরে’ দেবার কেউ নেই। ও ঘরে মা, বৌদি, খোকন, বুড়ি সব পড়ে আছে।”

পরেশ খুড়ো কুঁকিয়ে কুঁকিযে একটাব পব একটা কথাগুলো বল্‌লেন।

একটা দিযাশলাই চেযে নিযে আলো জ্বালতে গিযে দেখি তেলশূন্য প্রদীপেব বুকে শল্‌তে পোড়া ছাই’জমে রযেছে।

আঁধারের ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে ওঠে কাত্‌বানি আর গোঙানি। আব অবিবাম নাকে এসে লাগে জ্বরেব আর হযতো বা ঘামে ভেজা নোংবা কাঁথা বালিশেব গন্ধ। জেলখানাব আজকের এই চারপাশের মড়ার গুমোট আর সেদিনে এই অর্দ্ধমৃতেব গুমোট নাককে এক সঙ্গে চেপে ধরে।

হাঁপসে উঠি।...

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে খুঁজে পেতে বহুকষ্টে একটা কেরোসিনেব কুপো বেব কবি। নিবু নিবু ক’রেও জ্বলতে থাকে সেটা।

পরেশ খুড়ো বলে’ যেতে থাকেন: “পাশেব বাড়ীব মাসীমা, তু’এক দণ্ড পবপব এসে দেখে শুনে যাচ্ছিলেন। তিনিও সন্ধ্যে থেকে আসেন নাই। সে বাড়ীরও সবাবই জ্বব। তিনিই কেবল ভাল ছিলেন। কি জানি, এতক্ষণে তাঁবও জ্বব এসে গেল, না, আব কাবো বাড়াবাড়ি হ’লো।”

কুপোটি নিযে এঘর ওঘব কবে’ তিন বাড়ীব খবব নিই। ডেকে ডেকে যাব সাড়া কোন মতে পাই, সে অমনি চীৎকাব কবে: “জল”, “জল”। জল খাইযে দিদিমাকে, পবেশ খুড়োকে আশ্বাস দিই: “ভাববেন না, একটু বাদেই আসছি। বাত্রে এখানেই শোব।”

পরেশ খুড়ো আশীর্ব্বাদ করেন।

বাড়ীব পথে পড়ি। কি ভাবি? ভাবনাও আসেনা। চাবদিকেব অন্ধকাব নিস্তব্ধতাব ভেতর থেকে ঐ শব্দ আসে—খোলের নয, কীর্ত্তনের নয, কচ্চে পোযাব নয—কুকুবেব ডাক!

নীরবতা অন্ধকারকে নিবিড় আলিঙ্গনে চেপে ধবে।

কুকুর এক ঘেয়ে নিবানন্দ ডাক ডেকে যায।

* * * * * *

রাত ভোর হ’তে আর কতো দেরী?

কারাগারে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

সন্ধ্যা হযে আসে—
আঁধাবেব দৃঢ নাগপাশে,
আকাশেব কাল ছাযা বাঁধে ধরণীবে—
সূর্য যায অস্তাচলে, নাহি চায কাবো পানে ফিবে।
কার টানে কে যে ছোটে কখন কোথায!
কে জানে তা'—পিছু পড়া প্রাণ শুধু করে হায় হায।

হেথায কাবার মাঝে,
দপ্তবেতে শেষ ঘণ্টা বাজে—
সমাপ্ত দিনের কাজ—জলে জল ঢালা—
এরি মাঝে পডিযাছে ঘরে ঘরে দোরে দোবে
বজ্র বন্ধ তালা।

সেপাই পাহারাদার
চলে গেছে বন্ধ কবি দ্বাব।
আমিও একেলা ঘবে শূন্য মনে বসি,
অজানিত ভবিষ্যেব মন গডা লক্ষ আঁক কষি।
হেথায সকলি শান্ত—
নীবব নিঝুম পুবী—একেলা একান্ত।

শুধু কাণে শুনি, জাগে সমস্ত আকাশব্যাপী অনাহত ধ্বনি—
একটানা ঝিল্লিরব—যেন চিব কালধাবা চিরসঞ্চরণী—
চিরজাগা মহাপ্রাণ—চিব চলন্তিকা—
বিশ্বেব ধ্বনিব পিছে, অনাদি অনন্ত এক পরিপ্রেক্ষণিকা।
যেমনি ধবাব ধ্বনি ডুবে যায নীরবতা মাঝে,
অমনি শুনিতে পাই—ঝিল্লির সে অজস্র ঝঙ্কার
অবিরাম অবিশ্রাম অনাহত বাজে।
এ-ই কি গো নৈঃশব্দের মরমের বাণী?
ঝিল্লি কণ্ঠে দিনরাত মর্ম ব্যথাখানি

ঝঙ্কারি ফিরিছে কি গো দিকে দিকে অনির্বাণ সুরে ?
ওই যে সুদূরে—আকাশের সারা বুক জুড়ে,
উদ্বেল নীলিমা রাশি—সুবিপুল সুনীল উচ্ছ্বাস—
সে-ও কি সে বেদনারি অন্তহীন পরম প্রকাশ ?

কে বলে যে নীরবতা মূক, বাক্যহীন ?
তাহার অন্তর মাঝে বাজিছে যে বীণ—
অহরহ জাগে যে ঝঙ্কার,
পূর্ণ করি এ বিশ্ব সংসার,
শুনিতে চাহিনা তাই, পাইনা শুনিতে।
আমাদেরি কলকণ্ঠ, কর্ম কোলাহল, বহু বিচিত্র ভঙ্গিতে
ডুবে যায় বাণী তার—মর্মস্পর্শী অনাহত সুর।
বুঝিতে পারিনে তাই—নৈঃশব্দের অব্যক্ত সঙ্গীতে বিশ্ব ভরপুর
জগতের যত কথা—শব্দের লহরী—
দিবা বিভাবরী
বিক্ষোভিত যাহে সদা নীলাম্বর বেলা—
সে সকলি নৈঃশব্দ-সাগর-বুকে তরঙ্গের খেলা।

এ বিশ্বের কর্ম কোলাহল থেকে দূরে,
কঠিন কারার মাঝে—"স্থিরতার চির অন্তঃপুরে"—
প্রাচীর অরণ্য তলে—জীয়ন্ত কবরে—
লোহার গবাদে রুদ্ধ ক্ষুদ্র কোঠাঘরে,—
মলিন সায়াহ্নে আজি বসি হেথা একা সঙ্গীহীন,
শুনিতেছি একমনে আত্মহারা, হয়ে চিন্তালীন,
ঝিল্লিরবে নৈঃশব্দের মরমের বাণী—
কি করুণ ব্যথা ভরা,
একান্ত বিহ্বল করা,
নিদারুণ একাকিত্ব মর্মরিছে রাত্রিদিন
বক্ষে কর হানি।

নাসিক জেল।
১৫. ২. ১৫

বিহারী নাপিত

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

সংস্কৃতে আছে—নবাণাং নাপিতঃ ধূর্ত্তঃ। কিন্তু নাপিত না হইয়াও বিহারী এত ধূর্ত্ত কেম্ন করিয়া হইল? বিশ্বাসী লোকেরা কহিবেন যে, এ আর কিছু নয়, পূর্ব্বজন্মের জের। অবিশ্বাসীরা বলিবেন যে,—উহুঁ, তা নয়, এ-জন্মেরই সঙ্গদোষের ফল। আমার ধারণা,—তাও নয়, বিহারী জেলে আসিয়া নাপিতের কাজ পাইয়াছিল, তাই নাপিতের মতই ধূর্ত্ত হইয়াছিল।

না হইয়া উপায় ছিল না—দ্রব্যগুণ বলিয়া একটা কথা তো আর খামোকা হয় নাই। যে সিংহাসনে বসে সেই রাজা হয়—এক কুকুর ছাড়া, কারণ ওর জুতা কামড়াইবার অভ্যাস ও কিছুতেই ছাড়িতে পারে না, তেমনি যার হাতে ক্ষুর থাকিবে সেই নাপিত হইতে অবশ্য বাধ্য। যাঁরা নিজ হাতে কামান তাঁরা এ দলে পড়েন না, কথাটা ভদ্রলোকদের ও সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ থাকিল কিন্তু।

বেঁটে খাটো কালো বিহারী দোষ করিয়াছিল, তাই জেলে আসিয়াছিল। কিন্তু আরও কি দোষ করিয়াছিল যাতে জেলে আসিয়া নাপিত হইতে হইল, তা আমার জানা নাই। শুধু আন্দাজ করিতে পারি, এ নিশ্চয় তার ললাট-লিখন। তার কপাল-ফলকের অদৃশ্য পরিচয়-লেখা কমাণ্ডাণ্ট ফিনি-সাহেব দেখিয়াই পড়িয়া ফেলিয়া থাকিবেন। এবং ক্যাম্পে একজন নাপিতে পোষাইবে না জানিয়া যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বিহারীকে দিয়া সমাধান করিবার দৈব-নির্দ্দেশও ঐখানে পাইয়া থাকিবেন। দেউলীক্যাম্পে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম যে, আসল ও অকৃত্রিম নাপিত মাঙ্গিলালের পিছনে হবু-নাপিত বিহারী যন্ত্রপাতির ছোট্ট টিনের বাক্সটী বগলে লইয়া চলা-ফিরা করে, যেন বাঘের পিছনে ফেউ।

মাঙ্গিলাল তালিম দেয়, বিহারী তাহা আরও করিতে চেষ্টা করে। দিনকয়েক যাইতে তার হাত পাকিয়াছে মনে করিয়া মাঙ্গিলাল দুঃসাহস দেখাইয়া ফেলিল, বাবুদের গালে ব্রুশ ঘষিয়া সাবান মাখাইতে শিষ্যকে সে আদেশ করিল।

বিরাট বপু সতীনবাবু ডেকচেয়ারে বসিয়াছিলেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া যে ভাবে ধমকে দিল, তাতে ঘরশুদ্ধ আমরা সকলে চমকাইয়া উঠিতে একান্ত বাধ্য হইলাম। মাঙ্গিলাল কাঁপুনি সামলাইয়া লইয়া ব্রুশ নিজ হাতে লইল। কিন্তু বিহারী অটল রহিয়া গেল, বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া আবশ্যক বোধ করিল না।

সতীনবাবু থু-থু করিয়া মুখ-গহ্বর হইতে সাবানের ফেনা নিষ্ঠীবনরূপে পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"এই উল্লুক, বদনকা ভিতরমে তুমি সাবান মাখাচ্ছ কোন আক্কেলে! মুখের ভেতরটাও কামাতে হবে নাকি?"

বিহারী মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিল যে, না, সে ভয নাই। মুখে বলিল—"মুখ সাফ্ হোয়ে যাবে।"

"—ব্যাটার কথা শুনেছেন ? আরে, আপনারা এদিকে ফিরুন, একটী আস্ত শয়তান ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছেন না ?"

পাশেই দুখানা লোহার খাট জুড়িয়া লইয়া খেলা চলিতেছিল, তাশ বাঁটিতে বাঁটিতে রুণুবাবু কহিলেন—"বৃথা চেষ্টা বিহারী, নক্‌লী নেই, ও একদম কয়লাকা আস্‌লী রং হ্যায। তোমার সাবানের কম্ম নেহি হ্যায় বাপু।"

বিহারী দাঁত বাহির করিয়া দেখাইল, মানে হাসিল। তার সঙ্গে আমরাও হাসিয়া ফেলিলাম। সতীনরায কহিল—"বেণু, টেবিল থেকে ব্যাটাকে একটা সিগ্রেট্ দাওতো। মহাপুরুষ ব্যাক্তি, বুঝতে পারছনা, সময়ে টের পাবে। দাও, ওর প্রণামীটা দাও।"

বিহারী হাত পাতিযা অম্লান বদনে সিগ্রেট্ গ্রহণ করিল, দেখা গেল কোন উপহার সে প্রত্যাখ্যান করেনা।

রুণুবাবু ডাকিযা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা বিহারী, ক্ষৌরকর্ম্মে হাতখড়ি কি তুমি আমাদের গালের 'পর দিযেই চালাচ্ছ ?"

বিহারীর গলার আওযাজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কিন্তু কি কৌশলে যে তা কর্কশ হয নাই, তা তার গলার মেকারই বলিতে পারেন। বিহারী এই ভাঙ্গা গলায চেঁচাইযা কথা বলিত, বোধ হয তার ধারণা ছিল যে, জোরে কথা বলিলে বাতাসের ধাক্কায গলার পাইপটার ত্রুটি ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সারিযাও যাইতে পারে—মানুষের হঠাৎ হার্ট-ফেল করিতে পারে, তেমনি হঠাৎ যন্ত্রের ত্রুটি সরিতেও ন্যাযতঃ কোন বাধা থাকা উচিত নয়,—তা ছাড়া ফুসফুসের শক্তিটাও এই অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে,—এক ঢিলে দুই বিহঙ্গম বধ করিবার মতলব আর কি।

সেই অপূর্ব্ব ভাঙ্গা গলায বিহারী চেঁচাইযা জানাইল—"না, ফিনি সাহেব বোলেছে যে, পাতিল কিনিযে দেবে। পাতিলে মাটি মাখাযে নিযে আগাড়ি ক্ষুর চালানো শিখে লিব, পিছু হাত ঠিক হোযে গেলে বাবুলোককে দাঁড়ি হামি বানাবে।"

শুনিযা সতীনরায কহিল—"ওই আর এক ব্যাটা জুটেছেন! বলিহারী বাবা বুদ্ধি, পাতিলে মাটি মেখে ক্ষুর মক্‌স করা! যেমন বাবা তুমি বিহারী, তেমন তোমার ফিনি সাহেব—একেবারে সোনায সোহাগা।"

রুণুবাবু কহিলেন—"বিহারী হো, এত্‌না বিল্লি চিল্লতে কেঁও ?"

—"বিল্লি নেই বাবু, ময়ুর আছে!"

—"এঁ্যা, বলিস কিরে ? ময়ুরের এমন মধুর ডাক ? কয়েকটা ধরে দিতে পারিস ?"

সতীনরায় বাধা দিল—"থাক, ও সখের দরকার নেই। দূরে মাঠে ডাকছে, তাই কোনমতে

টিকে গেছি। কানের কাছে ক্যাম্পের ভেতরেই যদি ডাক সুরু করে, তবে প্রাণ সামলানো দায় হবে বলে রাখলাম। এখন যার সাহস হয় ময়ূর পুষুক।"

রুণুবাবু তাশ হইতে চোখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন —"ভো ভো ভূণ্ডিলমুনি, মাভৈঃ। ঠিক করেছি, রবিঠাকুরকে ডজনখানেক পাঠিয়ে দেব, কান পেতে রাতদিন কেকাধ্বনি শুনুন। যত সব ইয়ে,—আবার কবিতা লিখেছেন, উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে। বিহরে নয় প্রাণহরে, ওটা ছাপার ভুল হয়েছে নিশ্চয়।"

বিহারী বলিল—"সাহেবকে বলে ডিম আনিয়ে লিন না।"

ভুঁড়ি ও বিপুলবপুর জন্য সতীনবাবের নাম রুণুবাবু ভূণ্ডিলমুনি রাখিয়াছিলেন। ভূণ্ডিলঋষি বিহারীকে ধমক দিয়া উঠিল—"থাম ব্যাটা, আবার বুদ্ধি বাৎলে দিচ্ছেন। একেই হনুমান, তায় রামের আজ্ঞা।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু রুণুবাবু অপ্রতিভ না হইয়াই কহিলেন—"সাধু সাধু, ঋষিবর, মাথায় শুধু গোবর নয়, রসজ্ঞানও আছে দেখছি।"

বিহারী ধমক খাইয়া থামিল না, বাবুরা থামিলেই বলিতে লাগিল যে, সত্যই ডিম পাওয়া যায়, মোরগের সাহায্যে তা দিয়া ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা মিলিবে, যদি কথা মিথ্যা হয় তবে তখন বিহারীর কান যেন বাবুরা কষিয়া আচ্ছা করিয়া মর্দ্দন করেন।

—"ভাগ ব্যাটা, ভাগ্"—বলিয়া সতীন রায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার পাশে বসিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে কহিল—"দাঁড়াও বেণু, আস্‌ছি। ও ব্যাটা হনু দাশের তাশ খেলার সখ মিটিয়ে দিচ্ছি।"

রুণুবাবু চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করিয়া বলিলেন—"এস বৎস ভূণ্ডিল, তোমার সঙ্গে বাঁ হাত দিয়েই তাশ খেলব।"

বিহারী কহিল—"আর কোন্ বাবু কামাবেন—লিন।"

—"বেরিয়ে যাও বাবা, এখন ভূণ্ডিলে ও হনুতে লড়াই, এ ফেলে কে গাল কামাতে দেবে?" বলিয়া সতীন রায় তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আগাইয়া আসিল।

পট পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

দিন যাইতে লাগিল, এতদিনে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, দিন কারু জন্য বসিয়া থাকে না। বরং আমরাই দিনের নাগাল পাইবার জন্য বসিয়া আছি। ইতিমধ্যে তিন তিনটা বছর পার হইয়া গেল। একটি ক্যাম্পের স্থানে পাঁচটী ক্যাম্প খোলা হইয়াছে, একশত বন্দীর বদলে পাঁচশত বন্দী মজুত হইয়া মরুভূমিতে বসবাস করিতেছে।

ইংরেজীতে একটি বচন আছে—Morning shows the day, অর্থাৎ যে পাখী উড়িবে সে বাসাতেই ফরফর করিবে, ডিমভাঙ্গা বাচ্চা কেউটে বাহির হইয়া ফণা তুলিয়া ফোঁস্ করিয়া উঠিবে। কাজেই, প্রথম দিনেই সতীন রায় সত্য সন্দেহ করিয়াছিল যে, বিহারী মহাপুরুষ ব্যক্তি, ভিতরে মাল আছে।

পুরাকালে কর্ণ সহজাত কবচ লইয়া জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু এক বেটা দেবতা বামুন সাজিযা তা চুরি করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু বিহারী জন্মিবাব সঙ্গে ধৈর্য্যেব যে অভেদ্য ও সুদৃঢ় কবচ লইয়া আসিযাছে, কোন বেটা চোবের সাধ্য নাই তা' মাবিযা নিবে—তা' সে দেবতা বামুন পুলিশ যত বড চোরই হউক না কেন। মবাব আগে বিহারী প্রাণ দিতে পাবে, কিন্তু ধৈর্য্য ছাড়িযাছে একথা এক বুক গঙ্গাজলে নামিযা সত্যবাদী যুধিষ্ঠিব বলিলেও, মাপ কবিতে হইবে, তা' বিশ্বাস করিতে পারিব না।

বিহারী সম্বন্ধে দ্বিতীয বক্তব্য—তাব মুখের সব সময়ে লাগিযা থাকা হাসি। তাব মুখ কালো বটে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা মলিনতাগোছেব কিছু কেহ দেখিতে চেষ্টা কবিলে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে, পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক কবিযা দিতেছি। সূর্য্যও মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ে, কিন্তু বিহাবীব মুখে দুঃখের ছাযা পডিতে পাবে না, এমনই ধাতুতে এ-মুখ তৈবী হইযাছে।

এই মহাপুরুষ চরিত্রেব তৃতীয বৈশিষ্ট্য, ধৈর্য্য ও অক্ষুণ্ণ হাসি বাদ দিলে, তা' তাব জীবনযাত্রার ষ্টাইল বা ভঙ্গী। তার ভাবখানা এই যে—আপন পথে চল্ আপনি, অর্থাৎ আপন খুসীমত চলিতে থাক, অপরের চীৎকারে কান দিও না, দিবাব মোটেই আবশ্যক নাই, ও ঘেউ ঘেউ আপনিই ক্লান্তিতে কাবু হইযা ঠাণ্ডা মাবিযা যাইবে।

বিহারীর চরিত্রেব মূল কাঠামোখানি দেওযা হইল, এব 'পবে একটু বুদ্ধি ও কল্পনাব রং ও মাটি লাগাইয়া লইলেই বিহাবীব প্রতিমূর্ত্তি যে কেহ গডিযা দেখিতে পাবেন।—

খবর পাওযা গেল ম্যানেজাব বোম্বে হইতে বৃহৎ আযতনেব চিংড়ি মৎস আনযন কবিযাছেন। সমুদ্রের মাছ কিনা, তাই ওজনে এক একটী আধ সেব তিন পোযা। মেছো বাঙ্গালীবাবুবা বার বার রান্না ঘবেব দিকটা ঘুবিযা দেখিযা যাইতেছেন, ঘণ্টা পডিলে যেন প্রথম ব্যাচেই আসিযা জুটিতে পারেন। ম্যানেজার স্বযং বান্না ঘবেব সমুখে চেযাব পাতিযা সমস্ত তদাবক করিতেছেন। বড একটা উনুনের উপর তারও চেযে বড একটা পিতলেব ডেক্‌চি চাপাইয়া ক্ষীণকায শ্রীনিবাস ওবফে চিনিবাস দুই হাতে খুন্তি চালনা করিতে কবিতে কহিল—"ও মোণ্ডল, লাকডী নিযে এস।" বলিযা মণ্ডলের দিকে টেবা চোখে চাহিল।

ম্যানেজার মনে করিলেন, চিনিবাস তাঁব দিকে তাকাইযা আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ?"—

চিনিবাস উত্তর দেয না দেখিযা তিনি গলা একটু চডাইযা বলিলেন—"কি চাই চিনিবাস ?"

চিনিবাস ম্যানেজারবাবুব উপব হইতে দৃষ্টিটাকে অন্য দিকে সবাইযা নিযা ম্যানেজারবাবুকে দেখিতে পাইল, কহিল—"লাকডী বাবু।" বলিযা চোখ ঘুবাইযা আনিযা তির্য্যক দৃষ্টি উনুনেব অগ্নিগর্ভ উদরে নিয়া ন্যস্ত কবিল, সেখানে ইন্ধনেব চাহিদা সত্যই আছে কিনা সে বিষযে আবও সঠিক সুনিশ্চিত হইবার জন্য।

সমুখ দিয়া বিহারী গেটের দিকে চলিযাছিল; ম্যানেজাব ডাকিলেন—"এই বিহারী!"

"বাবু"—বলিয়া বিহারী পথের মধ্যে থামিয়া পড়িল।

—"ওখান থেকে লেডকী দিয়ে যাতো।" বলিয়া ম্যানেজার ওখানটা অঙ্গুলির অগ্রভাগে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

বিহারী গম্ভীর হইয়া এবং আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"লেডকী? লেডকী জেলে কোথায় পাব?" তারপর মত প্রকাশ করিল—"ও আচ্ছা চীজ্ বটে, লেকিন—"

—"নে ব্যাটা, থাম্। তোর আর রসিকতা করতে হবে না। যা, নিয়ে আয়।"

বিহারী কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, লেডকী সে জেলে কোথায় পাইবে, বাহিরে হইলে নয় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে পারিত, বাবু তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন কিন্তু ওজিনিষ এখানে যোগাড় করা তার চৌদ্দপুরুষের শক্তির বাহিরে, তাহাকে মাপ করিতে হইবে।

অক্ষরের একটু আগুপিছু জায়গা সামান্য বদল হওয়ায় এই অসামান্য সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাই ব্যাটা শয়তান সুযোগ পাইয়া প্যাঁচ্ করিতেছে, কথাটা বলিয়াই ম্যানেজার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সংশোধনের উপায় নাই, বলা কথা জিভে ফিরাইয়া আনা যায় না, আর ছোঁড়া তীর তূণে আসে না।

চিনিবাস রক্ষা করিল, কহিল—"নে বাপু, খুব হয়েছে। তাড়াতাড়ি ছোট দেখে ক'খানা লাকড়ী দিয়ে যা দেখি।"

বিহারীর দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল, দাঁত বাহির হইয়া পড়িল, ভাঙ্গা গলায় চেঁচাইয়া বলিল—"ও, লাকড়ী? তাই বল, লেডকী নেই, মাঙ্গাযা"—বলিয়া দুই হাতে এক বোঝা কাঠ লইয়া রান্না ঘরের দিকে আগাইয়া আসিল। সমুখ দিয়া যাইবার সময় ম্যানেজার তার টিকিটা ধরিয়া টানিয়া দিয়া কহিলেন—"ব্যাটা, শয়তান—"

রথটারে সংবাদ পৌছিল, মিনিটে সারা ক্যাম্পে রাষ্ট্র হইয়া ছড়াইয়া পড়িল যে, ম্যানেজার কি একটি অসম্ভব বস্তু চাহিয়াছিলেন, বিহারী ছিল বলিয়া তাঁর চরিত্র রক্ষা হইয়াছে।

কয়েকদিন পরের ব্যাপার।—

ভোর বেলা। শীতের রৌদ্রে রান্নাঘরের সামনে ম্যানেজার চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছেন। কাছেই কয়েকজন কয়েদী পিঠ দিয়া রৌদ্র সেবন ও বঁটি পাতিয়া হাত দিয়া তরকারী কর্ত্তন করিতেছিল এবং মুখে কথা বলিতেছিল। সম্মুখেই বৃহৎ মৃদঙ্গের আকৃতি গুটিকতক কুমড়া ও একঝুড়ি তরিতরকারী। এমন সময়ে নকুলী আসিয়া মুখভারী করিয়া ম্যানেজারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে?"

—"বাবু, আমাকে অন্য কাজ দিন, ওঘরে আমি কাজ করব না।"

—"কেন, কি হয়েছে?"

—"ওঘরে আমি থাকব না।"

—"কেন, ওঘরে কি দোষ করল?"

—"না বাবু আমাদের গাযেও মানুষের রক্তমাংস, ও ঘরে আমি থাকতে পারব না।"

সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে ম্যানেজার বলিলেন—"তোদেব গায়েও মানুষের রক্ত মাংস, বেশ, স্বীকার করেই না হয় নিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি শুনি না?"

—"কাপ্তানবাবু—"

নকলীর আর বাকীটা না বলিলেও চলিত। একটী কাঠি জ্বালিলেই সাবা ঘরে আলো পড়ে, ও নামটী শুনিয়াই সমস্ত ঘটনা যেন ম্যানেজারবাবুর চোখে উজ্জল হইযা দেখা দিল।

শোনা গেল, নকলী কি একটা কাজ কবিযাছে কিম্বা কবে নাই যে জন্য কাপ্তানবাবু অতিশয উত্তেজিত ও তেমনি অতিশয ক্রুদ্ধ হইযাছিলেন। ক্রোধ হইলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ক্রোধ না হইলেও নাকি ক্যাপ্টেনের ও জিনিষ সচবাচব থাকিত না, ক্রোধ হইলে তো কথাই নাই। ফলে, যথেষ্ট প্রহার ও গালাগালিব সাহায্যে ক্যাপ্টেন নকলীব যৎপরোনাস্তি শারীরিক ও মানসিক পীড়া উৎপাদন কবিযা ছাডিযাছেন।

উপস্থিত কযেদীরা একমত হইযা গেল যে, কাপ্তানবাবুব বাগটা সত্যই একটু বেশী, বড মারধর করেন এবং যা মুখে আসে তাই বলিযাই গালিগালাজ কবিযা থাকেন। কাপ্তানবাবুব দাপটে ও-ঘরে কোন ফালতুই বেশী দিন কাজ করিতে পাবে নাই, একমাত্র নকলীই কিছুদিন সেখানে টিকিযা আছে। এর আগেও নাকি আবও দুইবাব মাব খাইযা নকলী ও-ঘবেব কাজ ছাডিযাছিল, অন্যান্য বাবুরা বলিযা কহিযা বুঝাইযা তাকে দুইবাবই ঘবে ফিবাইযা নিযাছে। কিন্তু আবনা, মানুষেব ধৈর্য্য নাকি অসীম নয, জীবন থাকিতে নকলী আর ও-ঘরে যাইতেছেনা—এই রকমই একটা ভীষ্মেব প্রতিজ্ঞা সে এবাব কবিযা ফেলিযাছে।

কাপ্তানবাবু তাঁহাব আসল নাম নয, পিতৃদত্ত নাম সকলেই ভুলিযা গিযাছে, এমন কি তিনি নিজেও আর সে-নামে ডাকিলে সাড়া দিতে ভুলিযা যান। পিতৃদত্ত নাম অব্যবহাবে লোপ পাইয়া ঘটনাক্রমে বন্ধুদের প্রদত্ত নামটা কাযেমী হইযা গিযাছে। বৃহৎ ব্যক্তিদেব এমনই হইযা থাকে, বাপমার নিকট হইতে শবীবটা ছাডা আব কোন ঋণ গ্রহণ করেন না, বাদবাকী সবই স্বোপার্জ্জিত।

—চিনিবাসের কপালেব চোখদুটা টেবা, বুদ্ধিটাও ছিল তদনুযাযী, কাজেই একদিকে তাকাইয়া অন্যদিকের বস্তু সে বেশ দেখিযা লইতে পারিত। কহিল—"বাবু, ওঘরে বিহারীকে দিয়ে দিন।" শুনিয়া কযেদীরা সমস্বরে সায দিল যে, ইহাই একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা।

প্রস্তাব শুনিয়া ম্যানেজাবের মাথাটাও সাফ্ হইয়া গেল, চিনিবাসের টেরা চোখে দেখা ভবিষ্যৎটা তাঁর সোজা দৃষ্টিতেও পরিষ্কাব ধরা পডিল।

ম্যানেজারবাবুকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিযা চিনিবাস লজ্জা পাইল, মুচকি হাসিয়া বলল—"পাঠিয়ে দিন বাবু, দেখুন কি হয়।" বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

হুকুম পাইয়া এক কয়েদী বিহারীকে টেনিস মাঠ হইতে ধরিয়া আনিল। আনিয়া

ম্যানেজারের সম্মুখে দাঁড করাইয়া দিল। ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বিহারী দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত তাকে দেখা গেল না।

জিজ্ঞাসা করিল—"কি বাবু ?"

—"কোথায় কাজ করিস্ ?"

—"টেনিস মাঠে জল দিচ্ছি।"

—"যা, চার নম্বর ঘরে কাজ করবি।"

—"মাঠ থেকে চলে আসলে কান্তিবাবু মেরে ফেলবেন, অন্য কাউকে ও-ঘরে দিন।"

কান্তিবাবু খেলার সেক্রেটারী।

ম্যানেজারবাবু কহিলেন—"কান্তিবাবুকে আমি বলব, তুই গিয়ে ঘরে কাজ কর।"

এতক্ষণ পরে বিহারী দরকারী প্রশ্নটা করিল—"কেন, নক্‌লীর কি হোল, কাজ করবে না ?"

—"না, ও টেনিস মাঠে জল দেবে, তুই ঘরে কাজ করবি।"

শুনিয়া বিহারী দুই পা পিছাইয়া গেল, ভাঙ্গা গলায় চেঁচাইয়া উঠিল—"বাবারে, ও-ঘরে কে কাজ করবে। কাপ্তানবাবু একেবারে মেরে ফেলবেন।"

না শুনিয়াও ব্যাপারটা অনুমান করায় ও তার চোখমুখের ভঙ্গী দেখিয়া ম্যানেজারও হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—"নে, ইয়ার্কি রাখ, ঘরে কাজ করগে যা।"

—"না বাবু, অত মার কে খাবে ?—কিরে, কাপ্তানবাবু বুঝি খুব ঠুকেছেন, না ?" শেষেরটুকু নকলীকে জিজ্ঞাসা করিল।"

বিহারী রাজী হয় না দেখিয়া ম্যানেজার ধমকাইলেন, বিহারীর সেই একই কথা—"না বাবু, অন্য যে কোন কাজ দিন, ও-ঘরে না।"

কয়েদীরা বিহারীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, এ-দুর্দ্দিনে সেই শুধু রক্ষা করিতে পারে। অসুরদের হাতে ঠেঙ্গানি খাইয়া দেবতারাও এমনি করিয়া কখন পিতামহ ব্রহ্মাকে, কখনও বা কৈলাসের শিবঠাকুরকে আবার কখনও বৈকুণ্ঠের নারায়ণকে মিনতি ও কাকুতি করিত। বিহারীর মন ভিজিয়া গেল, অবশেষে নক্‌লীর সঙ্গে জায়গা বদল করিতে সে স্বীকৃত হইল।

ভোরটা নির্ব্বিঘ্নেই পার হইল।—বেড-টি লইয়া বিহারী খুব ভোরে চার নম্বর ঘরে ঢুকিল। ডাকিয়া কহিল—"ফণীবাবু, ও ফণীবাবু, চা নিন।" বলিয়া এক বাটি চা ফণীর টেবিলে রাখিল।

ফণী বিছানায় জাগিয়া শুইয়াছিল, কহিল—"আমি চা খাইনে, অন্য বাবুদের দে।"

ইতিমধ্যেই বিহারী ডানহাতে কেটলী, বাঁ হাতের পাঁচ অঙ্গুলে চারিটী পেয়ালা ঝুলাইয়া লইয়া আর এক সিটের সামনে গিয়া হাজির হইয়াছে। টেবিলে কাপ রাখিয়া চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল—"কাপ্তানবাবু, চা খান।"

কাপ্তানবাবু মশারীর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিলেন—"কি, চা ? মশারিটা তোল তো।" বলিয়া অপাঙ্গে বিহারীকে দেখিয়া লইলেন।

বিহারী অন্য সিটে আগাইয়া গিয়াছে, মশারি তুলিতে আসিল না, সিটে সিটে হাঁকিয়া চা বিলি করিতে লাগিল।

কাপ্তানবাবু মিনিটখানেক তাকাইয়া থাকিয়া ডাকিলেন—"এই, মশারি তুল্‌লি নে ?"

বিহারী ঘাড় ফিরাইল না, যেখানে ছিল সেখানেই রহিল, ভাঙ্গা গলার উত্তরটা পাঠাইয়া দিল—"চা দিয়ে নেই।"

কাপ্তানবাবু নিজেই মশারি তুলিয়া চাঁদোয়া করিয়া রাখিলেন, চায়ের পেয়ালায় উপুড় হইয়া চুমুক দিয়া কহিলেন—"এই, একটা ডিস্ দিয়ে যা।"

—"যাই।"—উত্তর আসিল, কিন্তু বিহারী আসিল না। চা-বন্টন শেষ করিয়া যখন ডিস্ হাতে নিজে আসিল, তখন কাপ্তানবাবু সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিয়াছেন। বিহারী কহিল—"ডিস্ নিন।"

—"এটা নিয়ে যা।" বলিয়া কাপ্তান টেবিলের উপর পেয়ালাটা দেখাইয়া দিয়া সিগ্রেটে আগুন দিলেন।

—"খাওয়া হয়ে গেছে? ডিস লাগবেনা ?" বলিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া বিহারী খালি পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। পেয়ালা ইত্যাদি ধুইয়া কেটলী হাতে একসময়ে বিহারী বাহির হইয়া গেল। ঘরের বাবুরা চোখে চোখে কথা বিনিময় করিলেন, কাপ্তান তা' বুঝিয়াও বুঝিবার দরকার বোধ করিলেন না।

কয়েক ঘণ্টা পরে টিফিনের ঘণ্টা পড়িল। যে যেখানে ছিলেন, ঘরে ও বারান্দায় হাজির হইলেন। টিফিনের প্লেট হাতে হাতে বিলি হইতে লাগিল। কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া কাজ সারিতে লাগিলেন। র‍্যাকেট হাতে কাপ্তেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বারান্দায় লোহার খাটটার পর র‍্যাকেট রাখিয়া ড্রামের জলে মুখ ধুইয়া লইয়া খাটে আসিয়া বসিলেন, ডাক দিলেন—"দিয়ে যা।"

এক প্লেট খিঁচুড়ীর চূড়ায় এক চামচ মাখন বসাইয়া বিহারী আনিয়া সামনে হাজির করিল। দেখিয়াই তিনি উত্তপ্ত হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গলাতেই কহিলেন—"যা নিয়ে যা।"

—"খাবেন না ?"

—"না।"

—"কেন ?"

—"এ জিনিষ আমি খাইনে।"

—"কেন, সব বাবুইত খাচ্ছেন।"

—"যা, নিয়ে যা। অত কথার তোর দরকার কি ?"

একপক্ষ দরকার নাই বলিলেই দরকার শেষ হয়না, অন্যপক্ষেরও একটা সম্মতির দরকার হয়।

তাই অন্যপক্ষ কহিল—"তবে কি খাবেন ?" প্রশ্ন শুনিয়া কাপ্তান যে ভাবে বিহারীর দিকে তাকাইলেন, তাতে বিহারীর অন্ততঃ দশপা পিছাইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু সে সমান সামনেই

খাড়া হইযা রহিল। ফণীদত্ত কহিল—"খেযে দেখুন, খেতে ভালো হযেছে। নে, আর একটু বেশী মাখন দে।" কাপ্তান থামাইযা দিলেন—"না, আনিসনে।" বিহারী কহিল—"ফল এনে দেব ?"

কাপ্তান চুপ কবিযা রহিলেন। মৌন সম্মতিবোধক বলিয়াই বরাবব গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। তা'ছাডা কাপ্তানেব বোধ হয সত্যই ক্ষুধা পাইযা থাকিবে। বিহাবী ফল আনিতে যায দেখিযা তিনি কহিলেন—"আগে আমাকে চা দিযে যা।"—চা দিযা বিহারী ফল আনিতে চৌকায চলিযা গেল।

কযেকটুক্‌রা আনাবস ও সামান্য কিছু ফল লইযা বিহাবী ফিরিল, কিন্তু পরিমাণ দেখিযা কাপ্তান সন্তুষ্ট হইলেন না, মুখে বলিলেন—"আমাব জন্য খি চুডী ফিচুডী আনবি নে, বুঝলি ?"

—"বুঝেছি"—বলিযা বিহাবী উত্তব দিল।

বাবুদের অনেকেই ঘবে খাইতেন। কাপ্তানেব খাবাবও ঘবে আসিত, রান্নাঘবে গিযা খাইতে তিনি পছন্দ করিতেন না। ঘণ্টা শুনিযা বাবুবা বান্না ঘরে চলিযা গিযাছেন। টেবিলেব উপব খাবার বাখিযা বিহারী ডাক দিল—"বাবু, কাপ্তান বাবু!—" কোন সাডাশব্দ না পাইযা খাবাব ঢাকা দিযা বাখিযা সে বাহিব হইযা গেল।

খাওয়া দাওযা সাবিযা বাবুবা ঘবে ফিবিযাছেন। দ্বিতীয বৈঠকের খাওযাও অনেক দূব আগাইযাছে। উচ্ছিষ্ট থালা বাসন উঠাইযা লইতে বিহাবী ঘবে আসিযা দেখিল যে, কাপ্তানের খাবার তেমনি ঢাকা পডিযা আছে। বাহিবে আসিযা দেখিল কাপ্তানবাবু স্নানেব জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এখন তাঁব তৈলমর্দ্দনপর্ব্ব চলিতেছে। লুঙ্গিটা এমন সুকৌশলে পরিধান করিযাছেন যে, লজ্জাঢাকার জন্য ন্যূনতম স্থান বাদ দিলে সর্ব্বশবীবই উন্মুক্ত, প্রথম দৃষ্টিতে লুঙ্গিটা অনেকেব দৃষ্টিতে পডেনা। বিহারী কহিল—"এখনও চান কবেন নি ?"

—"ভাত নিযে যা, আমার দেবী আছে। দেড ঘণ্টা পবে নিযে আসবি।"

—"আচ্ছা"—বলিযা থালাবাসন লইযা বিহাবী চলিযা গেল, মলিবাব জন্য সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইযা দিযা মিনিট কয়েকের মধ্যে ফিরিযা আসিল।

বারান্দায আসিযা সে থমকিযা দাঁডাইল। কাপ্তানসাহেবকে কি বকম দেখাইতেছে, মুখটা অন্যরকম হইয়াছে। বাঁ হাতে একপাটি দাঁত লইযা ব্রুসেব সাহায্যে কাপ্তান মার্জ্জনা করিতেছেন। হাতেব দাঁত পাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইযা দেখিযা বিহাবী ঘরে গিযা ঢুকিল এবং কাপ্তানবাবুর খাবার লইযা বাবান্দায় আসিল।

জিজ্ঞাসা করিল—"কখন আনতে হবে ?"

—"এক বাজে।" দাঁত হাতে, ফোক্‌লা মুখে ফিস্‌ ফিস্‌ কবিযা দুটী শব্দ উচ্চারণ কবিযাই কাপ্তান ক্ষান্ত হইলেন। বেশী বাৎ করার বিপদ তিনি এডাইযা গেলেন।

—"বহুৎ আচ্ছা"—বলিয়া বিহাবী খাবার ফিবাইযা নিযা গেল।—

কাপ্তান টেবিলের সামনে চেয়ার পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, বিহারী খাবারেব থালা আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

চলিয়া যায় দেখিয়া কাপ্তান ডাকিযা বলিলেন—"এক গ্লাশ জল দিযে যা।"

কুঁজা হইতে বড় একটা কাঁচের গ্লাশে জল ভরিযা আনিযা বিহাবী বাবুব হাতে দিল। একটু খানি জল হাতের তালুতে লইয়া চুমুক দিয়া কাপ্তান পান কবিযা লইলেন, প্রদীপ্ত উদর বহ্নিকে যেন কাক-স্নান করাইযা লইলেন।

বিহারী কহিল—"আর কিছু চাই?"

—ভাতে হাত দিযাই কাপ্তান আগুন হইযা গেলেন, কহিলেন—"এ কি এনেছিস?"

"কেন? ভাত।"

—"ভাত শুকিযে লোহা হযে গেছে, আক্কেল নেই এ ভাত খায কেমন কবে?"

—"আপনি বল্লেন ফিবিযে নিযে যা, একটাব সময আনবি, তাই এনেছি।"

—"সেই ভাত তোমাকে আনতে বলেছি উল্লুক? যা, গবম ভাত নিযে আয।"

—"গবম ভাত? তা' এখন কোথায পাব? চৌকা ধোযা মোছা সাবা হযে গেছে সে কখন। বাত্র ছাডা গরম ভাত পাওযা যাবে না।" বলিযা সে চুপ কবিল। কাপ্তান বিহাবীব দিকে তাকাইযা বহিলেন, বিহাবী কাপ্তানের দিকে তাকাইযা বহিল এবং ঘবেব বাবুবা সভযে উভযের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিহারী বলিল—"এবেলা এই খেযে নিন।"

উপদেশে বাকদে আগুন লাগিল। সমস্ত ঘবটাই চমকাইযা উঠিল। কাপ্তান টান মাবিযা ভাতের থালাটা টেবিল হইতে নীচে ছুঁডিযা ফেলিলেন, থালাটা মেঝেতে পডিযা আর্ত্তচীৎকাব তুলিয়া থামিল, ভাত তবকাবী ইত্যাদি সর্ব্বত্র ছডাইযা পডিল।

—"থালাটা ভেঙ্গে গেছে"—বলিযা বিহাবী স্বগতঃ উক্তি কবিল কিম্বা বাবুদেব অবগতির জন্য তা' পেশ কবিল বুঝা গেল না, কাপ্তান তডাক কবিযা চেযার ছাডিযা উঠিযা আসিযা বিহারীর ঘাডে ধরিলেন। মুখে বলিলেন—"বেবো।" তাবপর বিহাবীকে ঘাড ধরিযা ঠেলিযা নিযা চলিলেন। বিহাবীব ইচ্ছা ছিল যে, স্থানটা পবিষ্কাব কবিযা থালা নিযা বাহিব হয। কহিল —"ওগুলো নিযে যাচ্ছি।"

—"বেরো হাবামজাদা। ঘরে ঢুকবি তো খুন করে ফেলব।" কাপ্তান বিহারীকে দরজা দিয়া বাবান্দায বাহির কবিযা দিযা আসিযা বিছানায় টান হইযা শুইযা পডিলেন। বিহারীও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিযা আসিল। ঝাঁটা দিযা ঘব সাফ কবিতে লাগিযা গেল, শুধু একবার মন্তব্য করিল "ঝাঁট দিয়ে দিলাম, ভাঙ্গিকে পাঠিযে দিচ্ছি, ফিনাইল দিয়ে ধুযে দেবে।" টেবিল হইতে মাছ-মাংস ডাল ইত্যাদির বাটিগুলি একটী একটী কবিযা থালায তুলিল, কাপ্তান দেখিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য কিছু করিলেন না।

মিনিট দশবারো পবে বিহারীকে আবার ঢুকিতে দেখা গেল, কাঁচের গ্লাশটার জল ফেলিয়া দধিতে ভরিয়া আনিয়াছে, ছুটুকবা লেবু দধির উপর জাগিয়া আছে।

কাপ্তানবাবুর শয্যার দিকে সোজা সে আগাইয়া গেল। তার দুঃসাহসে বাবুরা ভাবিত ও শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু যার জন্য ভাবনা সে কিন্তু পরম নির্ব্বিকার। তার ভাঙ্গাগলাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বিহারী ডাকিল—"বাবু, উঠুন। আর কিছু পাওয়া গেলনা, দৈ এনেছি, সরবত করে খান।"

বাবু উঠিলেন না।

—"খালি পেটে থাকলে অসুখ করবে, উঠুন। এবেলা এ দিয়ে কোনমতে থাকুন, সন্ধ্যা হলেই খাবার নিয়ে আসব।"

বাবু এখনও উঠিলেন না।

—"কাপ্তানবাবু, উঠুন।"—বিহারী ডাকিতে লাগিল।

যণী দত্ত কহিল—"ঐ দৈ তে কি পেটে ভরবে?"

—"খু-উব। তিন পোয়া দৈ হবে, এতে পেট না ভরলে আবার এনে দেব। বাবু, উঠুন।"

কাপ্তান মৌনভঙ্গ করিলেন—"রেখে দিয়ে যা, জ্বালাতন করিস্ নে।"

—"এতে হবে, না আরও নিয়ে আসব?"

উত্তর না পাইয়া কহিল—"এই রাখলাম, দেরী করবেন না, খেয়ে নিন।" বলিয়া গ্লাসের মাথায় ছোট্ট একখানা খাতা চাপা দিল।

পরে কহিল—"বাবু, একটা সিগারেট দেবেন?"

আবদার শুনিয়া ঘরের মধ্যে বাবুদের অবস্থা সঙ্গীন হইল, যাহাদের সহ্যশক্তি কম, তাঁহারা বারান্দায় গিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন—"বাবাগো, হারামজাদা আস্ত ডাকাত।"

ঘরের মধ্যে যণী দত্ত কহিল—"শুনলেন নিকুঞ্জবাবু, বেটার কথা। এই তোর সিগারেট চাওয়ার সময় হল? না খেয়ে বাবু পড়ে আছেন, তোর একটু আক্কেল নেই? যা, এখন যা, পরে নিস্।"

বিহারী দাঁড়াইয়াই রহিল, আবেদন পুনরায় আবৃত্তি করিল—"বাবু, একটা সিগারেট দিন।" কাপ্তান কথা কহিলেন না, কেস হইতে একটা সিগারেট খুলিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন, বেহারী হাত বাড়াইয়া তুলিয়া নিয়া সেটা কানে গুজিয়া রাখিল।

—"আমি যাচ্ছি, দই লাগলে আমাকে ডাকেন যেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে কাপ্তান রান্নাঘরে গিয়াই আহার করিলেন, তিন বছরে এই প্রথম তিনি পায়ে হাটিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন। বিহারীর পাল্লায় পড়িয়া কাপ্তানের এতদিনের অভ্যাস নষ্ট হইল।

পরের দিন ভোরে টিফিনের আসরে বাবুদের পরম উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং পরম পরিতোষের সহিত তাহারা ভোজন করিতেছেন। খাবারটা আজ ভালোই হইয়াছে, ঘৃতপক্ক অন্নের সহিত গরম গরম মাংস।

নিকুঞ্জবাবু ফণীদত্তকে কহিতেছেন—"আমার যে কি একটা বদ অভ্যাস হয়েছে, বুঝলেন ফণীবাবু, ভালো জিনিষ আমি বড়ই ভালবাসি।"

—"আপনারও ঐ রোগ? আমি ভাবতাম যে, আমি একাই এরোগে ভুগছি। বিহারী, আর এক চামচ ভাত ও একটু মাংস দেতো। নে বেটা আপত্তি করিসনে, মনে কষ্ট দিলে আসছে বার জ্যান্ত দুর্ভিক্ষ হয়েই জন্মাবি কিন্তু। দেখিস্, পড়ে না যেন।"

—"সব বাবুকে দিতে হবে তো।"—বলিয়া বিহারী গৃহে প্রবেশ করিল।

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন—"এই যে কাপ্তান, আসুন। একেবারে হোমফিষ্ট্।"

জীবন সরকার জিজ্ঞাসা করিল—"হোম ফিষ্ট্, সে আবার কি?"

—"ও আপনারা নেটিভরা বুঝবেননা। কি বলেন কাপ্তান, আমাদের হোম-ওয়েদার হোম ফিষ্ট এসব এরা কি বুঝবে। এই বিহারী, কাপ্তানবাবুকে খাবার দিয়ে যা।"

বাবুদের প্লেট হইতে তপ্ত ধোঁয়া উঠিতেছে। সুগন্ধ সারা বারান্দায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কাপ্তান লোহার খাটে যুৎ হইয়া বসিলেন, কহিলেন—"নিয়ে আয়।"

—"যাই বাবু"—বিহারীর ভাঙ্গাগলা ভিতর হইতে বাহিরে আসিল এবং পরে সে নিজে আসিয়া দেখা দিল। খাবারের প্লেট কাপ্তানের সম্মুখে ধরিয়া দিল। খাবার দেখিয়া কাপ্তান বিহারীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

ফণীদত্ত ডাকিয়া কহিল—"একি, ফল এনেছিস্ যে?"

—"বাবু বলেছেন, খিঁচুড়ী ফিঁচুড়ী আনবি না।"

—"শুনলেন নিকুঞ্জবাবু বেটার কথা। আরে ঘি-ভাত মাংস হোল খিঁচুড়ী ফিঁচুড়ী?"

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন—"তোর আক্কেল কি রকম বলত? রাগের মাথায় একটা কথা বলেছেন, আর তুই তা' সত্য বলে ধরে আছিস্? যা' ফিরিয়ে নিয়ে যা—"

—"এখন আর তা' হবেনা। ফিরিয়ে নিয়ে কি হবে, ঘি-ভাত আর নেই। নিন্ বাবু" বলিয়া ফলের প্লেট পাশে রাখিয়া দিয়া বিহারী ঘরে গিয়া ঢুকিল। কাপ্তানের মুখের দিকে আর তাকানো যায়না, সে মুখে আগুন জ্বলিতেছে।

* * * * * *

ম্যানেজার বলিলেন—"বিহারীকে সবাতে বলছেন, কিন্তু কাকে দেই বলুন?"

কাপ্তান কহিলেন—"নকুলীকেই দিন।"

—"সে যাবেনা। যদি যায় আমার আপত্তি কি?"

—"সে যাবে, রাজী হয়েছে।"

বিকালের টিফিন লইয়া নকুলীই ঘরে ঢুকিল।

ফণীদত্ত ডাকিল—"ও নিকুঞ্জবাবু, পর্দ্দা তুলুন, দেখুন কে এসেছে—"

"কেগো আসিলে, ভালোবাসিলে—"বলিয়া পর্দ্দার বাহিরে নিকুঞ্জবাবু আসিয়া চমকাইয়া গেলেন।" "এঁ্যা, একেবারে বাবু হয়ে গেছিস দেখছি। পেলি কোথায়?" বলিয়া নকুলীর গায়ের গরম জামা ও পায়ের দামী জুতার দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

নকুলী প্লেটে খাবার সাজাইতে সাজাইতে কহিল—"বাবু দিয়েছেন।" বলিয়া সামনের খাটে কাপ্তানকে দেখাইয়া দিল। —"ও–" বলিয়া নিকুঞ্জবাবু চুপ করিলেন। ফণী দত্ত চোখে চোখে সঙ্কেত গ্রহণ করিল, মুখে কোন কথা বলিল না।

বিহারী আসিয়া ঢুকিল। কাপ্তানের সম্মুখে গিয়া ভাঙ্গা গলায় যতটা সম্ভব অভিমান ফুটাইয়া লইয়া কহিল—"বাবু, আমাকে তবে তাড়িয়ে দিলেন? ঘরের কাজ কি আমাকে দিয়ে হোত না?"

কাপ্তান টিফিনে ব্যস্ত রহিলেন

উত্তর দিল ফণী দত্ত -"হুঁ, তোমার চুদিনের জ্বালায় বাবুর শুধু পাগল হওয়া বাকী। কয় বেলাতেই বাবুকে আদ্ধেক কাব ছেড়েছিস্।"

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন—"তুমি বাপু, লোক মেটেই সুবিধের নও, তোমার জন্য কি বাবু শেষে আত্মহত্যা করবেন।"

বিহারী এসব কানে তুলিল না, কহিল—"বাবু, নকুলী গরমজামা পেল, জুতো পেল। আর আমাকে কিছু দিলেন না। মারতো আমিও খেয়েছি—" ফণীদত্ত কহিল "তবে আর কি, পাওনাতো হয়েই গেছে।"

—"বাবু, একটা জামা দিন, না হয় একটা গেঞ্জি দিন।" ভাঙ্গাগলায় প্রার্থনা হইল।

কাপ্তান কথা কহিলেন— 'যা পরে আসিস্।"

—"এখন তবে একটা সিগারেট দিন।" বলিয়া বিহারী হাত পাতিল। সিগারেট লইয়া ক্ষণপরে বিহারী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তার ভাঙ্গা-গলার গান শোনা যাইতে লাগিল। ফণীদত্ত নিকুঞ্জবাবুকে কহিল—"বেটা আস্ত একটা গুণ্ডা, কাণ্ড দেখলেন?"

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন—"নাপিত যে।"

কৈশোরিকা

কিশোর কিশোরীদের জন্য

—জাতীয়তাবাদী—

মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৷৷০ টাকা

প্রতি সংখ্যা—।০ আনা

জহরলালের চীন যাত্রা

বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারত ও চীনে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র বর্ত্তমান। প্রাচ্যের এই দুই প্রতিবেশী বহুদিন ধরে বিদেশীর উৎপীড়নে নিপীড়িত, বহু দুঃখ দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত, তাই বিপদের দিনে দুঃখের দিনে একে অন্যকে দরদের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে স্মরণ করে। আজকের দুর্দ্দিনে বিপন্ন বিধ্বস্ত চীন ভারতকে আমন্ত্রণ করেছে, তার অন্তরের শুভকামনা প্রার্থনা ক'রে। জহরলাল ভারতের প্রতিনিধি রূপে ভারতের জনগণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে চীনাগণ জাপানীদের বর্ব্বরআক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপন সংগ্রামে লিপ্ত। চীনের এই দুর্দ্দিনে, প্রতিবেশীর এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে পরাধীন অক্ষম ভারত শুধু অন্তরের সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনাই জানাতে পারে। সেই শুভাশীষ ও মঙ্গল কামনা বহন ক'রে নবীন ভারতের দূত জহরলাল যখন চীনে পদার্পণ করলেন, তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা ও আন্তরিক অভিনন্দন জহরলালকে মুগ্ধ করেছিল। যুদ্ধরত চীন অতিথির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপত্তার সর্ব্বোত্তম যে ব্যবস্থা করেছিলো তাতে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। সেখান হ'তে জহরলাল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন তার একটী বর্ণনা দিয়েছেন। শত্রুপক্ষ যখন বিমান আক্রমণ করে, তার ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে বিপদসূচক সাঙ্কেতিক ধ্বনি প্রচার করা হয়, তৎক্ষণাৎ অতিদ্রুত ভাবে দলে দলে সহস্র সহস্র বেসামরিক জনগণ ভূগর্ভস্থ পরিখার মধ্যে প্রবেশ করে। এরূপ আক্রমণ দুইঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলে। কোন সময় প্রতি-আক্রমণদ্বারা শত্রুদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়া হয় আবার কখনো দেখা যায় কোন গ্রাম বা নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জহরলাল লক্ষ্য করেছেন যে, চীনাগণ এরূপ আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে তারা সে সময়ে বেশী ভীত বা বিচলিত হয় না।

চীনে জহরলালের অভিজ্ঞতা ভারতের অমূল্য ধন। সুপ্রাচীন এই দুই মহাদেশের মধ্যে বহু দুঃখ দুর্দ্দশা ও সমস্যার সাদৃশ্য আছে, হয়তো সমাধানও একই পথে। চীন ও ভারত, দুয়ের মত ও পথ, ভাব ও ধারার আদান প্রদানে যে নিবিড়তা, যে বন্ধন গড়ে উঠবে তা' সর্ব্বতোভাবে কাম্য। এই দুই বিশাল দেশের জনগণ ও মনীষিগণ যে ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির যোগাযোগ করেছেন তার মধ্যে নিহিত আছে প্রাচ্যের স্থায়ী কল্যাণ।

রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে মিতালি

সাম্যবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে যে কোনো রকমের বন্ধুত্ব হ'তে পারে একথা বললে কিছুকাল আগেও লোকে পাগল বলতো। কেননা, মতবাদ হিসাবে এ দুটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন এবং

এতকাল পর্য্যন্ত জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে গভীর বিদ্বেষ ও প্রবল শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। জার্মানীতে সাম্যবাদ প্রচার বন্ধ করবার জন্য সরকারের কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং জার্মান সাম্য-বাদিদের উপর কঠিন শাস্তি প্রযোগ করা হয়েছে। রাশিয়াও জার্মানীর প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাব স্পষ্টভাবে এতকাল ঘোষণা ক'রে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক কূটনীতিতে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কে যে কখন কাহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করে তা' আগে থেকে বলা যায় না। রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব আজ আর শুধু কল্পনার বস্তু নয়, আজ তা' বাস্তবে পরিণত সত্য। এই মিতালির প্রথম পর্ব্বে হয়েছে সোভিয়েট-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি। তারপরে কয়েকদিন যেতে না যেতেই হয়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক অনাক্রমণ-চুক্তি।

সোভিয়েট-জার্ম্মান বাণিজ্য চুক্তি

গত ১৯শে আগষ্ট বার্লিনে সোভিয়েট-জার্মান বাণিজ্য ও ঋণ লেনদেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে রাশিয়া সাত বৎসরের জন্য শতকরা পাঁচ মুদ্রা হারে কুড়ি কোটী রাইখমার্ক ধার পাবে। রাশিয়াকে দুইবৎসরের মধ্যে ঐ পরিমাণ মুদ্রার জার্মান মাল ক্রয় করতে হবে। অন্যদিকে রাশিয়া দুই বৎসরের মধ্যে জার্মানীতে আঠারো কোটি রাইখমার্কের রাশিয়ার মাল বিক্রী করবে।

এই চুক্তির খবরে বৃটিশ ও ফরাসী ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে যে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল তা' বলাই বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গেই খবর এল যে শীঘ্রই রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে একটা সামরিক আনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। এই অনাক্রমণ চুক্তি হ'লে জার্মানী যে পোলাণ্ড আক্রমণ করবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না। আর তখন রাশিয়াও যে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না তাও একরকম নিশ্চিত। কাজেই খবরটাতে বৃটেন্ এবং ফ্রান্সের উৎকণ্ঠার আর অবধি রইল না।

সোভিয়েট জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি

গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দশবৎসর বলবৎ থাকবে। চুক্তিতে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি আছে—

(১) চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ কিংবা আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করতে কিংবা পরস্পরকে একাকী অথবা অন্যকোনো শক্তির সহযোগিতায় আক্রমণে বিরত থাকবে।

(৩) তৃতীয় পক্ষদ্বারা স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে যদি কোনো একটী রাষ্ট্রের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে অপর রাষ্ট্র কোনো ভাবেই তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য করবে না।

(৩) চুক্তির তৃতীয় সর্ত্তে উভয়ের "সাধারণ স্বার্থ বিশিষ্ট সমস্যাগুলি" সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।''

(৪) কোনো শক্তিপুঞ্জ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোনো একটির বিরোধী হয, তবে অপব স্বাক্ষরকাবী সেই শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগদান করতে পারবে না।

(৫) বিবোধেব মীমাংসাব জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে মতেব আদান প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজন হ'লে তাব জন্য সালিশী কমিশন নিযুক্ত কবা হবে।

(৬।৭) চুক্তিব ৬ এবং ৭ নম্বব সর্ত্তে বলা হযেছে যে চুক্তিব মেযাদ দশ বৎসর এবং এই চুক্তি অবিলম্বে উভয দেশে সবকাবীভাবে অনুমোদন কববে।

এই চুক্তির খবব প্রকাশ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই ইওবোপেব সর্ব্বত্র একটা প্রবল বিহ্বলতা ও উদ্বেগের সঞ্চাব হয।—একটা ভাবী সমবেব আশঙ্কায ইওবোপের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হযে উঠলো।

এতদিন পর্য্যন্ত বৃটেন তোষণ-নীতিব দ্বাবা জার্ম্মানীকে তুষ্ট ক'বে অবশ্যম্ভাবী মহাসমরকে ঠেকিযে বাখতে ব্যর্থ চেষ্টা কবেছে। একে একে যখন তাব সমস্ত শান্তিনীতি বিফল হ'ল তখন সে ফ্রান্সেব চাপে পড়ে বাশিযাব সঙ্গে চুক্তি কবতে অগ্রসব হ'ল। কিন্তু তাব দীর্ঘসূত্রতার ফলে মাসেব পর মাস কেটে গেল, চুক্তি আব হযে উঠলো না। অবশেষে বাশিযা বিবক্ত ও সন্দিহান হযে জার্ম্মানীব সঙ্গে অতি দ্রুত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন ক'বে ফেললো। এতে আন্তর্জ্জাতিক পবিস্থিতিতে নতুনতব জটিলতাব সৃষ্টি হ'ল। জাপান ও স্পেন এতে খুশী হ'ল না। এব দ্বাবা "কমিউনিজম বিরোধী" চুক্তিবও অপঘাত মৃত্যু সংঘটিত হ'ল।

গত মহাযুদ্ধেব পবে পববাজ্য আক্রমণেব প্রথম পর্ব্ব সুরু হয ১৯৩১ সালে, যখন জাপান ন্যাযনীতি বিসর্জ্জন দিযে এবং পূর্ব্বতন সমস্ত চুক্তি পদদলিত ক'বে নিষ্ক্রিয শক্তিগুলিব চোখেব সামনে চীনেব কাছ থেকে মাঞ্চুবিযা ছিনিযে নিল। তাবপব ১৯৩৫ সালে ইটালিব ইথিওপিযা অভিযান, ১৯৩৬ সালে জার্ম্মানীব বাইনল্যাণ্ড অধিকাব, ১৯৩৭ সালে অষ্ট্রিযা দখল, ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকাব,—একেব পব এক সমস্তই নির্ব্বিবাদে ঘটে গেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স তখন বাধা তো দেযই নি, বরং শুধু শান্তিনীতিব বুলি আউড়ে নিষ্ক্রিয থেকে আক্রমণকারীগণকে তাদের কাজ হাসিল কবতে পবোক্ষভাবে সাহায্য কবেছে। এদিকে বিজয়ী শক্তি অসংযত স্পর্দ্ধায বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চাব কবে চলেছে। তবুও বৃটেন ও ফ্রান্সের "benevolent neutrality"র পাষাণ প্রাচীর শিথিল হয নি।

এই নয বৎসবের লজ্জাকর অভিনযেব মধ্যে একমাত্র বাশিযাই বরাবর স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ ক'বে এসেছে। চেকোশ্লোভাকিযাব শোচনীয দুর্ভাগ্যের পর সে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে পশ্চিম ইওরোপেব কুটীল রাজনীতিক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনতে আবম্ভ করল।

রাশিযা আজ সামবিক শক্তিতে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র ব'লে পরিগণিত। এই শক্তির বলেই সে এইভাবে দূরে থাকবার নীতি গ্রহণ করতে ভবসা পেলো। এ দিকে জার্ম্মানী যখন ক্রমেই অধিকতর দুর্দ্দান্ত হযে উঠতে লগেলো তখন বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হ'তে আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু তাদের দীর্ঘসূত্রতার ফলে রাশিয়াব মনে তাদের আন্তবিকতা

সম্বন্ধে একটা প্রবল সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলো না। এই দ্বিধা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রে জার্মানী অতি তৎপরতার সহিত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ক'রে ফেলে সারা দুনিয়াকে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত ক'রে দিলো।

জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করলে বৃটেন ও ফ্রান্সকে এখন রাশিয়ার সাহায্যের আশা ত্যাগ করেই পোলাণ্ডের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

পোলিস্ জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ

গত ১লা সেপ্টেম্বর নাৎসীনেতা হের হিটলার পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানী ডানজিগ ও করিডর হারিয়েছিল। হিটলার ঘোষণা করলেন, ডানজিগ ও করিডর জার্মানীর ছিল এবং এখনো আছে। তিনি আরো বলেন, জার্মানীর আধিপত্য ব্যতীত ডানজিগ বর্ব্বরতার লীলাভূমি হবে: শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটমাট করবার জন্য পোলিশ দূতের আগমন প্রতীক্ষায় তিন দিন অপেক্ষা ক'রে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে অনন্যোপায় জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করেছে —এই ঘোষণা জার্মাননেতা হিটলার সমগ্র জগতে প্রচার ক'রে রণতূর্য্য বাজিয়ে সমগ্র ইউরোপকে যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত হতে বাধ্য করলেন।

হের ফরষ্টারের ঘোষণা

ডানজিগের নাৎসীদলের নেতা ও ডানজিগ সেনেটের প্রেসিডেন্ট হের ফরষ্টার ডানজিগের অধিবাসীদের এবং হিটলারের নিকট এই ঘোষণা জ্ঞাপন করেছেন যে, ডানজিগের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং এখন থেকে ডানজিগের রাজ্যভাগ ও অধিবাসীগণ রাইখের (জার্মানীর) অন্তর্গত বলে পরিগণিত হবে। এবং অনতিবিলম্বে তিনি তা' কার্য্যে পরিণত করেছেন।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগদান

হের হিটলার জার্মান সৈন্যবাহিনীর নিকট যে ঘোষণা করেন, তাতে বোঝা যায় যে জার্মান সৈন্যগণ পোলিস সীমান্ত অতিক্রম ক'রে পোলাণ্ড আক্রমণ করেছে। সেজন্য বৃটিশ এবং ফরাসী গভর্নমেন্ট মনে করেন যে, পোলাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন করা হয়েছে। এবং তদ্দ্বারা বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেন্ট পোলাণ্ডকে সাহায্য করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা' পালনের অবস্থা সৃষ্টি করা হ'য়েছে। অতএব বৃটিশ গভর্নমেন্ট জার্মানীকে জানান যে, যদি জার্মান গভর্নমেন্ট পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণাত্মক কাজ স্থগিত না রাখেন এবং অবিলম্বে পোলিস রাজ্য থেকে তাদের সৈন্য অপসারিত করবার প্রতিশ্রুতি না দেন, তবে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ইতস্ততঃ না করে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করবেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হের হিটলারের নিকট হ'তে কোন উত্তর না পাওয়াতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন, বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ফরাসী রাজদূত মিঃ কলোনদ্রিও হের ভন রিবেনট্রপকে অনুরূপ চরম পত্র দেন, এবং বেলা ৫টার মধ্যে উত্তর না পেয়ে ফ্রান্স ও জার্মানী যুদ্ধরত জাতি বলে ঘোষণা করেন। ইওরোপে সমরানল ছড়িয়ে পড়ল—একদিকে জার্মানী অন্যদিকে পোলাণ্ড, ফ্রান্স ও বৃটেন।

কিন্তু পোলাণ্ডকে সোজাসুজি সাহায্য করবার কোনো পথ বৃটেন বা ফ্রান্সের নেই। শুধু পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ ক'রে জার্মানীকে উদ্ব্যস্ত বা স্থানচ্যুত করবার প্রচেষ্টা ছাড়া পোলাণ্ডে সৈন্য বা রণসম্ভার প্রেরণের কোনো পথ ছিল না। তাই পোলাণ্ডে শুধু একা পোলিস সৈন্যগণই যুদ্ধে লিপ্ত,—জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ-দ্বারা পোলাণ্ডকে রক্ষা করা তাই সম্ভব হ'ল না—পোলাণ্ডের পতন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলো। একটীর পর একটী নগর হস্তগত ক'রে অবশেষে ওয়ারসতে জার্মান সৈন্যদল প্রবেশ করল।

সোভিয়েট-মাঞ্চুকুও সীমান্তে সংঘর্ষের অবসান

এদিকে মলোটভ ও জাপানী রাজদূতের আলোচনার ফলে মঙ্গলিয়া-মাঞ্চুকুও সীমান্তে জাপ-সোভিয়েট বিরোধের অবসানের জন্য একটী সাময়িক চুক্তি হয়েছে। ঠিক হয়েছে যে সোভিয়েট-মঙ্গলিয়া এবং জাপ-মাঞ্চুকুও সৈন্যগণ পরস্পরের সঙ্গে আর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। চুক্তির সর্ত্তগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি আছে—

১। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সৈন্যঘাটির যে সীমা ছিল তাই বহাল থাকবে।

২। বন্দী বিনিময়।

৩। সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য অনতিবিলম্বে উভয় পক্ষ থেকে দুইজন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক করা হবে।

জাপানের সঙ্গে এই সন্ধির ফলে পূর্ব্বদিকে সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধ এবং আক্রমণ স্থগিত রেখে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে পশ্চিমে ইওরোপের রণাঙ্গণে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেলো।

সোভিয়েট বাহিনীর পোলাণ্ড আক্রমণ

এদিকে সোভিয়েট ধীরে ধীরে তার সৈন্যবাহিনী ও রণসম্ভার সোভিয়েট-পোলিস সীমান্তে জমা করতে লাগল। অবশেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভোর ছয়টার সময় সোভিয়েট বাহিনী উত্তরে পোলজক্ থেকে দক্ষিণে কামিনেজপডলস্ক পর্য্যন্ত পাঁচশত 'মাইল ব্যেপে পোলাণ্ডের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। রাত্রিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পোলিস রাজদূতকে জানান যে সোভিয়েটের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং পোলাণ্ডে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতরুশিয়ান ও ইউক্রেনিয়ানদিগকে রক্ষার জন্য

লালফৌজকে অগ্রসর হবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পোলিস রাষ্ট্রদূতকে যে নোট দেওয়া হয়েছে তাতে মঃ মলোটভ জানিয়েছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট যে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে এই ব্যবস্থায় তা' ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মতে এখন আর পূর্ব্ব সন্ধি সমূহের কোনো অস্তিত্ব নাই—কারণ এখন পোলিস গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব নাই—গভর্নমেণ্ট কোথায় আছেন তাও জানা যায় না। ভূতপূর্ব্ব পোলিস রাষ্ট্র ভেঙ্গে প'ড়ছে এবং গভর্নমেণ্ট পলায়ন করেছে। পোলাণ্ডে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবার কেউ নেই। কাজেই সোভিয়েট তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরায় রক্ষা করবার চেষ্টা করছে।

নোটের ওপর বোঝা যায় যে পোলাণ্ডে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতরুশিয়ান ও ইউক্রেনিয়ান আছে সে সম্বন্ধে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট পূর্ব্ব চুক্তিতেই পোলাণ্ড ভাগাভাগি স্থির ক'রে রেখেছিল। তাই সোভিয়েট পোলাণ্ড আক্রমণ করলে জার্মান বাহিনী ব্রেটলিটেভস্ক সহর সোভিয়েট বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর জার্মান বেতারে ঘোষণা করা হয় যে সোভিয়েট বাহিনী সমগ্র রুমানীয়-পোলিস সীমান্ত অধিকার করেছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট সৈন্যগণ বিপুলভাবে রুমানীয় সীমান্তে এসে অবস্থান করতে থাকে।

জার্মানীর পূর্ব্বইওরোপ অভিযানে বাধা

জার্মানী কল্পনা করেছিল যে এক একে সমস্ত পূর্ব্ব ইওরোপ হস্তগত করে একবার ভূমধ্য সাগরে পড়বার পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে পারলে তার বাণিজ্য বিস্তারের অবাধ সুবিধা হবে। ভূমধ্য সাগরের উপকূলের সমস্ত দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করবার সুযোগ মিললে ভবিষ্যতে যুদ্ধে জার্মানী অপরাজেয় শক্তি ব'লে পরিগণিত হ'তে পারবে, কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধে যেরূপে অর্থনৈতিক blockade এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধাব্যাঘাত জব্দ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে সেরূপে আর জার্মানীকে কারো জব্দ করা সম্ভব হবে না।

এই পরিকল্পনা নিয়ে হের হিটলার একে একে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড আক্রমণ ক'রে তাদের হস্তগত করেছে। তারপর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রুমানিয়া এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র যুগোশ্লাভিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রকেও মুষ্টিগত করে ভূমধ্য সাগরে পড়বার রঙ্গীন আশায় হিটলার অদম্য উৎসাহে চলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে পরিকল্পনায় বজ্রাঘাত হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়ে শত্রুভাব আর নাই—এদিকে সোভিয়েট পোলিস রুমানীয় সীমান্ত দখল ক'রে বসেছে, জার্মানী আর দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগোতে পারছে না। অতএব পূর্ব্ব ইওরোপে পথ পরিষ্কার ক'রে ভূমধ্য সাগরে যাবার ইচ্ছা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। এতে ক'রে এই প্রমাণ হ'ল যে পূর্ব্ব ইওরোপে নাৎসীজার্মানী যে প্রবল পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠছিল তা' আর হ'তে পাবল না এবং রাশিয়া সেখানে আপন প্রভাব বিস্তার করে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়,-জার্মানীকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী আইন গুলিও

বন্দ করে দিতে বলা হযেছে। ফলে রাশিয়াব যে কমিউনিজম প্রচার বন্ধ করতে জার্মানী এতকাল চেষ্টা করে এসেছে, সেই কমিউনিজম মতবাদ সমগ্র ইওরোপে প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পেলো। অন্যদিকে নাৎসীবাদ প্রচারেব যে আযোজন পূর্ণোদ্যমে চলছিল তা' প্রতিহত হবার সম্ভাবনা হযে রইল।

গান্ধী-লিনলিথগো সাক্ষাৎকার—

বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর আমন্ত্রণে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সিমলায মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভযের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী আলোচনা চলে। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অতি জটিল ও সঙ্কটময মুহূর্ত্তে এই আলোচনার উপর সকলেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানও খানিকটা প্রত্যাশা করেছিলেন।

সিমলা ত্যাগ করবার প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন, "বড়লাটের সঙ্গে আমার কোন বোঝাপড়া হযনি, বড়লাট ভবন থেকে আমি রিক্ত হস্তে ফিরে এসেছি। একপ বোঝাপড়া কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে হতে পারে।"

তাঁর এই গভীর নৈরাশ্যজনক কথায বেদনার উদ্রেক করে। গান্ধী লিনলিথগো সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতা এই সঙ্কটের দিনে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ককে আরো অপ্রীতিকর করে তুলবে না কি? মহাত্মা কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বোঝাপড়ার ইঙ্গিত করেছেন। আমরা আশা করি, গান্ধী শূন্যহাতে ফিরলেও ভারতের জাতীয প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার সমযে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও আত্মনিযন্ত্রণ অধিকারের দাবী স্বীকৃত হবে।

বড়লাটের ঘোষণা

ইউরোপীয যুদ্ধের সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণার জন্য সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। সিমলায কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয পরিষদের সম্মিলিত বৈঠকে বড়লাট সেই বহু প্রত্যাশিত বাণী ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায ইউরোপীয যুদ্ধ সম্পর্কে বহু কথা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বাণী নেই, ভারতীয সমস্যাগুলির সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। কেবল এই কথাটি আছে যে, বর্ত্তমানে ফেডারেশনের প্রবর্ত্তন স্থগিত রইল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ফেডারেশনের কি গতি হবে সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। শুধু বলেছেন, ফেডারেশন পরবর্ত্তীকালের লক্ষ্যরূপে রইল। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিযন্ত্রণ অধিকারের উপর লক্ষ্য রেখে যে ধরণের ফেডারেশন চায বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাতে সম্মতি দেবেন কিনা সে প্রশ্নের কোন উত্তর এতে নেই। সুতরাং এই বাণী ভারতবাসীর নিকট আশ্বাসের বাণী নয়। তবে ফেডারেশনকে যে তার বর্ত্তমান অবাঞ্ছনীযরূপে আপাততঃ জোর ক'রে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হচ্ছেনা এইটুকুই মন্দের ভালো।

কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বিবৃতি

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি ছয়দিন আলোচনার পর যে সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তার গুরুত্ব খুব বেশী। এই বিবৃতিতে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর অন্তরের কথাকে রূপ দিয়েছে, ভাষা দিয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী শোষণ ও অন্যায়ের অবসান ক'রে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্ভাবনায় সারা দুনিয়ার গণশক্তি আজ চঞ্চল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মৈত্রী ও সমান অধিকারের দাবী আজ সর্ব্বত্র মুখর হয়ে উঠেছে। এমনি সময়ে কংগ্রেসের এই বিবৃতি অতি সময়োপযোগীই হয়েছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারই যে কংগ্রেসের আদর্শ এবং শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের সমস্ত জাতির মুক্তিই যে তার কাম্য এই কথা ঘোষণা ক'রে কংগ্রেস জাতীয় প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রেখেছে।

পররাজ্য আক্রমণের এবং স্বাধীনতা হরণের নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ বরাবরই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে তার মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে এসেছে, কিন্তু নিজে পরাধীন ব'লে সে আক্রান্ত জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য করতে পারে নি—তবু তার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছে নানা ভাবে। বর্ত্তমান যুদ্ধেও আক্রান্ত পোলাণ্ডের প্রতি যে তার আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে সে কথা জ্ঞাপন করেও কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তার যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ঘোষণা করতে আহ্বান করেছে।

কার্য্যকরী সমিতি বলেছেন—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষাই যদি বৃটেনের আদর্শ হয় এবং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষাই যদি বৃটেনের যুদ্ধে যোগ দেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে তার অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিত। ভারতের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই তবে সে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করতে পারবে, যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে ভারতীয় জনগণই ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে নিরাপদ করবার দুর্ভাবনার বোঝা যদি আমাদের মাথা পেতে নিতে হয় তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কতদূর নিরাপদ হয়েছে, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কপট না হ'লে এ প্রশ্ন চেপে রাখা সম্ভব নয়। এই অনিবার্য্য প্রশ্ন সকলের মনেই উঠেছে—কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও এই প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর উত্তরের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিকর্ত্তব্য নির্ভর করছে।

ফ্যাসিস্তবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পায়। এই যুদ্ধদ্বারা যদি বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যবাদী অধিকার, উপনিবেশ, ন্যস্ত স্বার্থ ও সুবিধাদি বজায়

রাখবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে এর সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু বৃটেন যদি গণতন্ত্র রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জগতে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে তার নিজের সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিত্যাগ ক'রে অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে এবং ভারতবাসীকে গণপরিষদদ্বারা নিজ গঠনতন্ত্র ও কার্য্যনীতি প্রণয়ন করতে দিতে হবে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতই অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করবে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করতে পারবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্তবাদ উভয়ের ধ্বংসের উপরই প্রকৃত গণতন্ত্র নির্ভর করছে। কেবলমাত্র এই ভিত্তিতেই নূতন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। পৃথিবীতে এই প্রকার নূতন সমাজ গড়ে তোলার কাজে কংগ্রেস সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ঘটনার দ্রুত সমাবেশের জন্য এবং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। সমস্যাগুলির পূর্ণ তাৎপর্য্য কি, প্রকৃত আদর্শ কি এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের অবস্থা কি হবে তা ভালো ক'রে উপলব্ধি করবার জন্য এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটেনের মনোভাব স্পষ্ট ক'রে জানবার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন।

কার্য্যকরী সমিতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষ চায় সকল দেশের সমস্ত জনগণের মুক্তি—চায় এমন জগৎ, যে জগৎ হিংসার বিভীষিকা ও সাম্রাজ্যবাদের পীড়নমুক্ত।

আমরা আশা করি ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ কংগ্রেসের দাবী মেনে নিয়ে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে জগতে প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নূতন ভিত্তি স্থাপন করবেন।

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রী[illegible]বেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

(১৯৩৮-১৯৩৯)

৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

—ব্রাঞ্চ—

বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা, ঢাকা

চল্‌তি বীমা (১৯৩৭-৩৮)	১৪	কোটি	৬০	লক্ষেব উপব
মোট সংস্থান	,,	২ ,,	৯৭	লক্ষেব ,,
বীমা তহবীল	,,	২ ,,	৬৭	লক্ষেব ,,
মোট আয়	,,		৭৯	পক্ষেব ,,
দাবী শোধ	,,	১ ,,	৬০	লক্ষেব ,,

—এজেন্সি—

ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস—কলিকাতা

কোল্ড ক্রীম অভ রোজেজ

গোলাপ-গন্ধ প্রসাধন প্রলেপ

শীতেব দৌবাত্ম্য হইতে হাত, পা, মুখ, ঠোঁট ও গাত্র চর্ম্মেব লাবণ্য বক্ষা কবে। সৌন্দর্য সাধনাব শ্রেষ্ঠ সহায এবং শৌখিন সম্প্রদাযের পবম বন্ধু। ইহাতে মোম বা চর্বিব লেশ নাই।

সুদৃশ্য আধারে ও টিউবে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা : বোম্বাই

= সূচী =

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাসিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি-স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের গহনা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গহনা প্রস্তুত করিয়া ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।
মজুরী আরও কমান হইয়াছে
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইন সম্বলিত বি ৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয়।
ফোন বড়বাজার ১৭৩৩
১২৪.১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়
টেলিগ্রাম ট্রিলিয়ান্টস্
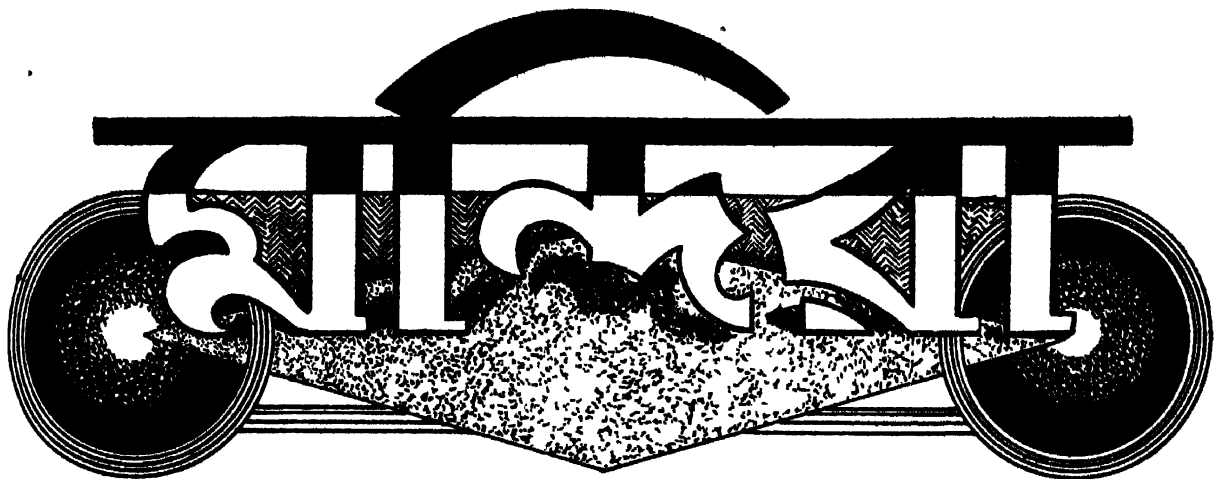
দ্বিতীয় বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৬ | ৭ম সংখ্যা

সুখী

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

হ্রদ, কান্তার পেরিয়ে
পাহাড়, জঙ্গল, জলধি, জলদ
অতিক্রম ক'রে,
সূর্য্য, বায়ু-বাষ্প, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সীমা
উত্তীর্ণ হ'য়ে—
হে আমার চিত্ত
এগিয়ে চল তোমার চঞ্চল গতিতে ;
ঠিক যেমনি সুপটু জলবিহারী, সন্তরণকারী
বিক্ষুব্ধ উর্ম্মির বুকের উপর
নিজেকে পুলকের আবেগে ছেড়ে দেয়
তেমনি ক'রে তুমি চলে যাও
এই অপরিসীম বিস্তৃতিকে ভেদ ক'রে
অব্যক্ত পৌরুষ উল্লাসে ভেসে ।

পৃথ্বীর দূষিত বায়ু থেকে
দূরে চলে যাও তুমি
সুদূরের শুদ্ধ স্নিগ্ধ সমীরে
পূতস্নান ক'রে নেও,
যে নির্ম্মল আগুনের ধারা
বিমল ব্যোম ব্যেপে আছে
পান কর সে পুণ্য পবিত্র মদিরা।

জীবনের যে ক্লেদ ও ক্লান্তি
তাদের গুরুভার দিয়ে
ধূমাচ্ছন্ন জীবনকে ভারাক্রান্ত করে,
তা' থেকে মুক্ত হয়ে
সবল বিহগের মত
শুভ্র শান্ত বিস্তৃতির মধ্যে
যে ভেসে চলে যেতে পারে
সে-ই জীবনে সুখী।

সে-ই সুখী—
যার চিন্তা সঙ্গীতময় বিহঙ্গের মত
প্রতি প্রভাতে মুক্ত উল্লাসে
সুদূর আকাশের পানে
ছুটে চলে যায়,
সে-ই সুখী—
জীবনের আবিলতার ঊর্দ্ধে
যে ভেসে চলে যেতে পারে,
যে বিনা আয়াসে বুঝতে পারে
কুসুমের প্রাণের ভাষা,
বিশ্বের মৌন কামনা,
জীবনে সে-ই সুখী।*

* Baudelaireএর ফরাসী কবিতার গদ্য অনুবাদ।

বিস্‌মার্ক ও হিটলার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে Vistula নদীর পার্শ্ব হইতে দক্ষিণে Carpathian পর্ব্বত ও Danube নদী পর্য্যন্ত ও পশ্চিমদিকে Rhine নদী পর্য্যন্ত ভূভাগে যে টিউটন জাতি বাস করিত, তাহাদিগকে German বা Deutsch জাতি কহে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এই টিউটন জাতিরই Vandal, Franc প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা Italy, Spain ও France প্রভৃতি দেশ আক্রমণ করে ও সেইখানে বসবাস করিতে থাকে। পূর্ব্বপ্রান্তে এই German জাতির সঙ্গে Slav জাতির নিরন্তর সঙ্ঘর্ষ ইতিহাসে দেখা যায়। প্রাচীন কাল হইতেই এই German জাতির পূর্ব্বোক্ত ভূভাগে নানা বিচ্ছিন্ন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাশীয়া রাজ্যটি প্রধান হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই Austria আপন প্রাধান্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত German রাজ্যগুলি পরস্পর একতাবন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে একটি মহাসভা আহূত হয় এবং সেই সভায় প্রাশীয়ার রাজাকে সমগ্র Germanyর সম্রাট বলিয়া স্বীকার করা হয়। এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলি তাহার অধীনতা মানিয়া লয়। ব্যবস্থা হয় এই যে, প্রাশীয়ার রাজার দুইটি মন্ত্রণা সভা থাকিবে, একটি বিভিন্ন German রাজন্যবর্গ লইয়া ও অপরটি জনসাধারণ লইয়া। এই দুই সভার সমবেত নাম Reichstag Prussiaর এই রাজার নাম Frederick William IV Austria কিন্তু এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় না। ইহার কিছুদিন পরে Germanyর অন্য রাজন্যবর্গের সহিত প্রাশীয়ার মনোমালিন্য ঘটে এবং তাহারা Austriaর পক্ষ সমর্থন করে। পরিশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Austriaর সহিত প্রাশীয়ার যুদ্ধ হয়। এবং Austria সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এবং এই যুদ্ধে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে Austria Germanyতে প্রাশীয়ার প্রাধান্য স্বীকার করে কিন্তু Austriaর রাজ্যসীমা অক্ষত থাকে।—এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র জার্ম্মান জাতি প্রাশীয়ার রাজার অধীনে এক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কিছুদিন পরে France-এর রাজা Napoleon III Austria, Bavaria, ও Italyর সহযোগে প্রাশীয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ইহার ফলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং প্রাশীয়ার বিজয়ী সৈন্য প্যারিসএ প্রবেশ করে ও France-এর নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ বিপুল অর্থ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই যুদ্ধের ফলে France কে Alsace প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার পর হইতেই German সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে জার্ম্মানীতে যে সমস্ত চিন্তাশীল মনীষি ও দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তাদ্বারা সমগ্র ইউরোপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাঁহাদের

চিন্তার মধ্যে জার্ম্মান জাতিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং জার্ম্মান জাতির ভবিষ্যৎ যে পরম গৌরবমণ্ডিত এবং জার্ম্মানজাতিই যে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব লইবার উপযোগী এই মন্ত্রটী নিরন্তর আপন দেশবাসী-দিগের কাণে জপ করিয়া আসিতেছেন। Nietzsche প্রভৃতিরা বারম্বার এইকথা প্রচার করিয়াছেন যে, তেজস্বী অতিমানুষ ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ ন্যায় ও ধর্ম্মনীতি খাটে না—তাহারা পাপপুণ্যের বাহিরে। বলের উপরেই জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ভিত্তি এবং Bismarck-এর সময় হইতেই জার্ম্মাণ জাতি বলের দ্বারাই সংসার জয় করা যায় এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াই কাজ করিয়া আসিতেছে। গত ১৯১৪—১৯১৮ মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মানী ও Austria যখন সম্পূর্ণভাবে ভ্রষ্টশ্রী হইল তখন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহারা একান্ত দুরবস্থার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। পরিশেষে যখন গৃহবিচ্ছেদ ও অর্থাভাবে একান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িল তখন ১৯৩১এ Hitler-এর উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইল। এই ১৯৩২ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত হিটলার একাধিপত্য গ্রহণ করিয়া জার্ম্মান জাতির পূর্ব্ব গৌরব ও দুর্দ্ধর্ষ বলদর্প ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

Hitler-এর রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে Bismarck-এর নীতির সহিত তাঁহার প্রভূত সাদৃশ্য রহিয়াছে। Hitler প্রাধান্য লাভ করিয়াই বলসংগ্রহের দিকে একান্ত ভাবে মনোযোগী হইলেন। গত যুদ্ধে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্ম্মানীর সমস্ত সামরিক বল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে জার্ম্মানী বলবৃদ্ধি করিতে না পারে সন্ধিতে সে সর্ত্তেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু হিটলার যখন এ সমস্ত সর্ত্ত উপেক্ষা করিয়া বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, বাধ্যতামূলক ভাবে সমস্ত নাগরিকই যাহাতে সৈন্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন তখন মিত্রপক্ষের কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। Bismarck বা Hitler উভয়েরই মনোভাব এক। তাঁহারা উভয়েই এই মন্ত্রে দীক্ষিত যে, সন্ধি সর্ত্ত বা বাগদান ইহার কোনই মূল্য নাই। এগুলি কেবল মাত্র বল গুছাইবার অবসর মাত্র। রাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্রই এই যে অপর-পক্ষের নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন রাখা। যে উদ্দেশ্যে Bismarck Austriaকে প্রাশীয়ার বশবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই হিটলার সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে Reich বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। Bismarck-এর প্রধান নীতি ছিল এই যে শত্রুদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। সেইজন্য তিনি পোলদিগকে জব্দ করেন। France ও England-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইবার জন্য Belgium-এর প্রতি France-এর লোভ বাড়াইবার চেষ্টা করেন ও পরিশেষে সেই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া France-এর সহিত England-এর মনোমালিন্য ঘটান। Hitlerও France ও England এর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইবার জন্য এই কথা প্রচার করেন যে Russiaর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া France আপনাকে Russiaর অনুবর্ত্তী রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে England কিছুদিন France এর প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। এইসময় জার্ম্মানীর কাগজে সকল সময়ই রাশিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশিত হইত কিন্তু Cezechoslovakia দখল করিবার পর হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানী হইতে একটি কথাও বলা হয় নাই। আবার

এদিকে ইটালীকে এ্যাবিসিনিয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিযা England-এর সহিত ইটালীর মনোমালিন্য বাড়াইতে হিটলার বিশেষ চেষ্টা করিযাছেন, আবার অপরদিকে Englandকে বলিয়াছেন তাহারা ইটালীর এ্যাবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে। ইটালীর সহিত England-এর এই মনোমালিন্যের ফলে ইটালী আসিযা জার্ম্মানীর সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আবার স্প্যানিস যুদ্ধে ইটালীকে উৎসাহিত করিয়া একদিকে তাহার বলক্ষয় ও অপরদিকে Spain-এর কয়েকটী বন্দর স্বায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা ও Spain হইতে পারদ, টিন প্রভৃতি আত্মসাৎ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইটালী Austriaকে আপনার একান্ত বশবর্ত্তী করিবা তুলিযাছিল। কিন্তু ইটালী এইভাবে যখন ক্ষীণবল ও মিত্রহীন হইল তখন Hitler অনাযাসে Austria দখল করিলেন, মুসোলিনির কথাটি কহিবার সাধ্য রহিল না।

যখন ১৯৩৫ সালে Hitler Versailles সন্ধি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিযা বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তখনি তিনি সকলের ভয ও সন্দেহ অপনয়ন করিবার জন্যে এক বক্তৃতায বলেন—

"The German Government will scrupulously obseive any treaty voluntarily signed by them even if it was diawn up before they took over the Government and power. They will therfore in particular observe and fulfill all obligations arisinng out of the Locarno Pact so long as other parties to the treaty are willing to adhere to the same fact Germany neither intends, nor wishes to interfere in the internal affairs of Austria, to annex Austria or to conclude anschluss" এই Locarno Pact ১৯২৫ সালে হিটলার প্রধান হইবার পূর্ব্বে স্থির হয় এবং ইহার সিদ্ধান্ত মতে ইউরোপের মধ্যাংশ ও পশ্চিমাংশে জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সীমানা কখনও অতিক্রম করিবে না এই সর্ত্তে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হিটলারের ঐ উক্তির ৯ মাস পরেই তিনি Locarno Pact-এর সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবে Rhineland দখল করেন। এবং তাহার অল্পকাল পরেই ১৯৩৬ এর মে মাসে বক্তৃতাতে বলেন—"We have no territorial demands to make in Europe অর্থাৎ ইউরোপে আর কোনও স্থান দখল করিতে আমরা চাই না। এবং বলেন যে পরস্পরের সন্ধিতে মিলিত হইতে প্রস্তুত আছি। Hitler যখন পদে পদে সন্ধি ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং নিজের বল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তখনও England নিশ্চেষ্ট রহিল। এবং England এ বলবৃদ্ধির প্রস্তাব স্থগিত রহিল। ১৯৩৫ এর Mayতে হিটলার বলিলেন যে জার্ম্মানী কাহারও সহিত আকাশ যুদ্ধ লিপ্ত হইবে না এই মর্ম্মে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। তখন এইকথা উঠিল যে এই প্রসঙ্গে অন্য সকল বিষযেরও একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন তখন হিটলার উত্তর করিলেন যে এতবড গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা তিনি christmasএর পূর্ব্বে করিতে পারিবেন না। যখন ডিসেম্বর মাস সমাগত হইল তখন হিটলার উত্তর করিলেন যে এ্যাবিসিনিয়ার ব্যাপারের একটা মীমাংসা না হইলে তিনি এ বিষযে কিছু বলিতে

পারেন না। খৃষ্টমাসের বন্ধের প্রাক্কালে তিনি ইংরেজ দূতকে বলিলেন যে France রাশিয়ার সহিত যে সন্ধি করিয়াছে তাহা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে। কাজেই তিনি বিমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন না। সন্ধি হইল না বটে কিন্তু এই অবসরে হিটলার নয়মাস সময় পাইলেন এবং সে সময়টি যুদ্ধ সজ্জা বাড়াইবার চেষ্টার ব্যয় করিলেন।

Bismarck যেমন প্রত্যেকটি পা ফেলিবার সময় চারিদিক দেখিয়া ও হিসাব করিয়া চলিতেন—হিটলারও সেইরূপই। Austriaর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে Bismarck হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে রাশিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাইবে না, কারণ Polandকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে উভয়েই ইচ্ছুক। তিনি France এর রাজা Napoleon III কে এইভাব দেখাইয়াছিলেন যে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধে France উদাসীন থাকিলে Luxembourg ও বেলজিয়ামের অংশবিশেষ France এর অধিকার ভুক্ত হইতে পারে। এই প্রত্যাশায় অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের সময় France নিশ্চেষ্ট রহিল এবং সহায়হীন অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া Bismarck জয়ী হইলেন। আবার ইহার পরে বেলজিয়ামের প্রতি ফরাসীদের লোভের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া ফরাসীদের সহিত যুদ্ধের সময় ইংরেজকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। যদিও ১৯২৫ Locarno Pactএ ইহা স্থির হইয়াছিল যে জার্ম্মানী আর পশ্চিম সীমান্ত বাড়াইবে না, তথাপি ১৯৩৬ মার্চ্চে রাইনল্যাণ্ড দখল করিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে খবরের কাগজে রাইনল্যাণ্ড না পাওয়াতে জার্ম্মানীর যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে ও রাইনল্যাণ্ড পাওয়া যে তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ মিত্র পক্ষ কোনরূপ ইঙ্গিত করিতেছেনা--তখন তিনি কোনরূপ ইঙ্গিত না দিয়াই রাইনল্যাণ্ড দখল করিয়া বসিলেন। ঐ সময় Locarno Pact ভাঙ্গার দাবীতে যদি মিত্র পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন তবে জার্ম্মানী কিছুদিন রাইনল্যাণ্ড দখল করিতে সাহস পাইত না। যদি দুঃসাহসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত তবে জার্ম্মানদিগকে পরাজিত করা কিছুই ক্লেশকর হইত না। পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া সকলেই একরূপ যুদ্ধে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দিতো। রাইনল্যাণ্ড দখল করিয়া হিটলার যখন 'সিগফ্রিড লাইনের' দুর্গ শ্রেণী রচনা করিতে লাগিলেন তখন হিটলারের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত ছিল না। অষ্ট্রিয়া দখল করিবার সময়ও হিটলার Lord Halifaxএর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং সেই আলাপনেই হিটলার বুঝিয়াছিলেন যে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহে। এই সময়ে হিটলার ইংলণ্ডে যে বাণী প্রচার করেন যে, ইংলণ্ড যদি যুদ্ধ এড়াইতে চান তবে মধ্য ইয়োরোপের ব্যাপারে তিনি যেন কোনও হস্তক্ষেপ না করেন, ইহার কোন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর ইংলণ্ড হইতে দেওয়া হয় নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিবার সময় হিটলার পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে ইংরেজেরা কিছুতেই যুদ্ধে ব্রতী হইবে না—ইংরেজ যুদ্ধ না করিলে France কিছুতেই একলা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। Locarno Pact ভঙ্গ করিয়া জার্ম্মানী যখন পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য ইয়োরোপে ক্রমশঃ রাজ্য অধিকার করিতে লাগিল এবং ইংরাজেরা এ বিষয়ে উদাসীন রহিল তখন সর্ব্বত্রই এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে হিটলার

যাহাই করুক না কেন ইংরাজ কিছুতেই যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে পারে না। গত জুলাই মাসে আমি নিজেই সকলেরই এই মনোভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

প্রচারকার্য্যে হিটলারের ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি পাওয়া কঠিন। খবরের কাগজের মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের মনোভাব গঠিত হয়, এই জন্য হিটলার সমস্ত খবরের কাগজগুলিকে রাষ্ট্রনিয়মের দ্বারা সংযত করিয়াছেন। প্রত্যেকদিন মধ্যাহ্নকালে propaganda ministryতে সমস্ত সাংবাদিকদিগের একটি সভা হয়। ঐ সভায় সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে কিরূপ খবর বাহির হইবে, শিরোনামাগুলি কিরূপ হইবে, বিদেশীয় সংবাদের কিরূপ সমালোচনা হইবে, কোন্ সংবাদ বাহির করা যায় বা যায় না তাহার বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ নির্দ্দেশ না মানিলে সেই কাগজ উঠাইয়া দেওয়া হয়। এক সময় কোন খবরের কাগজে স্থানাভাবে Goebbelsএর ছবি দেওয়া হয় নাই বলিয়া সেই কাগজ উঠাইয়া দেওয়া হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল হইবার পর হইতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিবার জন্য সাংবাদিকদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ইংল্যাণ্ড হইতে যতটুকু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পোল্যাণ্ড জয় করিতে হইলে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা থাকা আবশ্যক এইজন্য চেকোশ্লোভাকিয়া জয় করিবার পর হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও বাহির হয় নাই। ইহার ফলে ইংরাজ বারংবার রাশিয়ার দ্বারে সন্ধির প্রার্থনা করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে বঞ্চিত হইল এবং জার্ম্মানী রাশিয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। এইরূপ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেও পারে নাই। এই ব্যাপারে জার্ম্মানী যেরূপ মন্ত্রগুপ্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা অতি বিস্ময়কর। তবেই দেখা যাইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীতে Bismarck যেরূপ কূট রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীতে হিটলারও সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মিত্রহীনভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে যেভাবে হিটলার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে এবার বোধ হয় তাঁহার অতিলোভে মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

রাশিয়ার সঙ্গে গুপ্ত সন্ধির ফলে আজ মনে হইতেছে যে জার্ম্মানী মিত্রপক্ষকে খুব দাবাইয়া দিয়াছে এবং জার্ম্মানী ও রাশিয়া মিলিয়া পোল্যাণ্ডকে যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে রাশিয়াকে সহায় পাইয়া জার্ম্মানী মিত্রপক্ষ অপেক্ষা অনেক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই মনে হয় যে রাশিয়াকে ডাকিয়া ঘরের কাছে আনাতে জার্ম্মানীতে অন্তর্বিপ্লব ঘটিবার বন্দোবস্ত পাকা হইয়া যাইবে। মিত্রপক্ষ যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারে তবে রুশীয় আদর্শে জার্ম্মানীতে অন্তর্বিপ্লব ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ অন্তর্বিপ্লব ঘটিলে শুধু যে জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটিবে তাহা নহে, ইহাতে সমস্ত মধ্য ইয়োরোপের বল্‌শেভিক ভাবাপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কৈফিয়ৎ

শ্রীহেমন্ত তরফদার

ভাই মনিদি',

তোমার চিঠি পেয়েছি। পেয়েছি তার মানে এই নয় যে তোমার লেখা কাগজখানি আমার হাতে এসে পড়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে তোমার গালাগালিগুলো আমি হজম করেছি। বাস্তবিক মনিদি' হজম করেছি। অবশ্য যদিও মাস তিনেক সময় লেগে গেছে, তবু হজমটা হয়েছে খুব ভালভাবেই। এবং সেটা অত্যন্ত ভালভাবে হয়েছে বলেই আজ তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, নইলে হোতোনা। ছেলেবেলায় তোমরা সকলেই আমাকে খুব অভিমানী ব'লতে না? ভেবে ভাখো, ছেলেবেলাটা মানুষের কখনো ম'রে যায় না। শুধু সে, তোমারই কথায় ব'লতে গেলে নতুন নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে অজানাকে আবিষ্কার ক'রতে ক'রতে এগিয়ে চলে। সুতরাং অভিমানেরও সংস্কার সম্ভব, এমন কি, আমার অর্থাৎ তোমাদের পরম দুর্দ্ধর্ষ রমার পক্ষেও এটা সত্য।

ব'ললুম তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু, এটা ঠিক সত্যি কথা নয়। কারণ, তোমার কথার কোন উত্তর আমি দেব না। এবং তারও কারণ হচ্ছে এই যে তুমি তোমার সমস্ত অন্তরের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে যে সব কথা বলেছ তার জবাব দেওয়া নিরর্থক মনে করি। না, জবাব আমি দেব না। আমি শুধু কয়েকটি কথা তোমাকে আজ ব'লব যা একান্তভাবে আমারই কথা। এবং এ আমি তোমাকে কোন একদিন ব'লতামই। কারণ, একে কৈফিয়ৎ বল আর যাই বল কোন এক আকারে এই সব কথার কিছু কিছু তোমার কানে পৌঁছে দেবার একটা নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে। যে হেতু, আমার সমস্ত ছেলেবেলাটা কেটেছে তোমার কাছে, আমার যা কিছু শিক্ষা এবং মানসিক প্রবৃত্তি সব তোমার কাছে থেকেই হয়েছে। তাই, বর্ত্তমান জীবনধারা তোমাকেই সব চেয়ে বেশী আঘাত এবং অবমাননা করেছে, এ আমি জানি। তোমার কাছে জবাবদিহী ক'রতে আমি বাধ্য।

কিন্তু মনিদি, কি জবাব আমি দেব? আমি শুধু আমার মনের সরল সত্যকথাগুলো সোজা-সুজি বলে দিতে পারি। তাতে কি তোমাদের মন ভ'রবে? আজ যখন চোখ মেলে চেয়ে দেখি, দেখ্‌তে পাই তোমাদের সঙ্গে আমার জীবনের এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। একে আর কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পারিনে। আজ আবার সেই পিছনে ফেলে আসা জীবনের অতি-পরিচিত কক্ষপথে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা সহজও নয়, স্বাভাবিকও নয়। তবু আমি একথা বুঝি যে এই স্পর্দ্ধিত মনোভাবকে তোমরা কখনও ক্ষমা ক'রতে পারবে না। বাস্তবিকই পার না। কেনই বা পারবে? কারণ, তোমরা মনে করেছ, তোমাদের সেই রমা, যাকে তোমরা অনেক কষ্টে অনেক যত্নে পৃথিবীর পথের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিয়েছিলে, একটা 'আইডিয়াল' ক'রে যাকে সমাজে দাঁড় করান

ছিল তোমাদের বহুদিনের স্বপ্ন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম কৃষ্টি ও জ্ঞানের আলোয় যার চিত্ত মার্জনের চেষ্টা তোমরা বিধিমতে করেছ', সে যখন তোমাদের সব আশা-জাল ছিঁড়ে ফেলে তোমাদের আশা ও আদর্শের দিক্ থেকে যাকে বলে অত্যন্ত অবৈধ একটা পথে পা বাড়ালে এবং দ্রুতপদে এগিয়ে চ'লল, তখন তোমাদের আশাহত মনের মর্মদাহ যে কি পরিমাণ হতে পারে তা আমি ভুক্তভোগী না হ'লেও কল্পনা ক'রতে পারি। তাই ঘৃণার বিক্ষোভ আর মনের মধ্যে পুষে রাখ্‌তে না পেরে অবশেষে আজ চার বছর পরে তুমি যখন আমাকে গালাগালি দিলে, আমি একটুও অবাক হই নি। দুঃখ পেয়েছিলুম কিনা জান্‌তে চেয়ো না, শুধু এইটুকু জেনো যে আমি বিস্মিত হই নি। কেন হবো? আমি হাজার হোক্ তোমাদেরই রমা। তুমি আজ আমাকে 'স্বৈরিণী' বলে গাল দিয়েছ, কিন্তু অনেক দেরীতে। চার বছর আগে আমি নিজেই নিজেকে ওই রকমের আরও অনেক কথা ব'লে লাঞ্ছিত করেছিলুম। কিন্তু তাতে কিছু কাজ হ'ল না। কাজেই তুমি যখন আমাকে ভ্রষ্টা বলেছ, তোমাদের পক্ষ থেকে কিছুই অন্যায় হয় নি। আমার পক্ষ থেকে অন্যায় হয়েছে কিনা তার বিচার কে ক'রবে? আমি অন্ততঃ নয়। কারণ আমি কোন দিন কারও কাছে কাজের সাফাই গাইব না। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার।

এখন তুমি জিজ্ঞাসা ক'রবে যে তবে আমি কি জবাব দেওয়ার জন্যে এই চিঠি লিখ্‌তে বসেছি? সে কথা আগেই বলছি, তোমার চিঠির জবাব আমি দেব না। আমার চরিত্রের সাফাইও নয়। কৈফিয়তও ঠিক বলা চ'লবে না। একে ইতিহাস ব'লতে পার। হাঁ, ইতিহাস সব মানুষের জীবনেরই একটা থাকে, আমারও আছে। তবে এই ইতিহাসটি একটু বড়। একেবারে খুব বড় অবশ্য নয়, কিন্তু খুব ছোটও নয়। তাই আজ তোমাকে শুধু এর ভূমিকাটুকু লিখে পাঠাবো। যদি চাও তবে পরে বাকী পরিচ্ছেদগুলো পাঠানো যাবে। আপাততঃ তুমি আমাকে ক্ষমা ক'র। মানে, তুমি চেয়েছিলে কৈফিয়ৎ, আর আমি পাঠাচ্ছি জীবন চরিতের ভূমিকা। এর জন্যে আমাকে ক্ষমা কর।

তোমার ঐ কথাটা খুব সত্যি। সেদিন যাকে বরণ করেছিলুম সে মানুষ,—বাবার, মার ও তোমাদের মত বন্ধুবান্ধবদের মনোনীত স্বামী বলেই শুধু নয়। সেদিন তোমাদের গাঁথা বরণ মালার মধ্যে আমার নিজের মনের সুষমাও মাখানো ছিল। বাস্তবিক, স্বামীকে আমি ভালবেসেছিলুম। এবং শুনে হয়তো তুমি খুব অবাক হয়ে যাবে—আজও বাসি। সত্যি, ওর মত পুরুষ মানুষকে কেউ ভাল না বেসে পারে? শুধু আমিই নয়, দূর থেকে অনেক মেয়েই ওকে ভালবেসেছে। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ, মাঠের মত কপাল, কবাটের মত চওড়া বুক—ও যেন একটা "গ্রীক ষ্ট্যাচু"। গভীর ওঁর চোখের দৃষ্টি, মেঘের মত গম্ভীর ওঁর গলার স্বর। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শোনার একটা 'থ্রিল' আছে। সুতরাং সেদিন তোমাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে প্রসন্ন মনেই স্বামীর ঘর ক'রতে এসেছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া মেয়ে সেকালের আভিজাত্যগর্বী জমিদার ঘরের বধূ হ'তে চলেছে, তার ভবিষ্যত নিয়ে তোমাদের একটা গোপন আশঙ্কা আমার চোখ এড়ায় নি। কিন্তু

এই আশঙ্কার ছায়া আমার মনে একটুও পড়ে নি। কারণ, আমি জানতুম, শিক্ষা যদি আমার যথার্থ হ'য়ে থাকে, তবে সে আমার জীবনের কাজেই লাগবে। যারা আমার মধ্যেকার মানুষটাকে যথার্থই চায়, আমার বাইরের সাজ সজ্জা তাদের পথের অন্তরায় হবে না, তুমি জান এই সংকল্প আমার জয়ী হয়েছিল। সুতরাং আমি সুখী হ'তে পেরেছিলুম। হাঁ, বিয়ের পর দু'বছর আমার সমান সুখী বোধ হয় কেউই ছিল না।

স্বামী আমাকে ভালবাসতেন। অবশ্য এটা ঠিক যে পুরুষ মানুষ কখনো সবখানি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে না। তবু যতটা ওদের পক্ষে সম্ভব সে তুলনায় আমার স্বামী আমাকে ভালই বাসতেন। অন্ততঃ তখন, কতখানি ভালবাসতেন, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন আমার মনে আসে নি। আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেতুম, সেবা ক'র্‌তে পেতুম—এই আমার যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া, কিছুদিন একসঙ্গে বাস ক'র্‌তে ক'রতেই, তাঁর নানারকমের কাজ কর্ম্ম, তাঁর বিভিন্ন নেশার সঙ্গে আমি আমার অস্তিত্বকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। তাঁর জমিদারী আছে, তাঁর খেলাধূলা আছে, তাঁর ঘোড়া আছে, আর আছে সবার ওপর তাঁর বন্দুক আর শিকার। আমিও ছিলুম, এবং হয়ত' এদের যে কোন'টার চেয়ে আমি তাঁর পক্ষে হয়ত' একটু বেশী করেই ছিলুম। কিন্তু তবু এটা মনে রাখতে হবে যে এরাও ছিল। এবং এদের সবাইকে সরিয়ে তাদের সবখানি জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে কল্পনাও আমি কোনদিন করি নি। এই সব ছাড়া তাঁর একটা জিনিষ বড় ছিল বা আছে যেটা তোমরা হয়ত' তত লক্ষ্য কর নি—সে তাঁর গাম্ভীর্য। অবশ্য গাম্ভীর্য ব'ললে জিনিষটা ঠিক বোঝায় না। তবে আমি এখন হাতের কাছে আর কিছু সুবিধা মত না পেয়ে ওইটাই ব্যবহার ক'রলুম। শুনতে পাই, মহাভারতের কর্ণ যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন তাঁর কবচও কুণ্ডল ছিল। ইনিও তাই। ওই গাম্ভীর্য বস্তুটা এঁর সহজাত, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই মানুষকে কয়েক হাত দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, তখন তোমার আর এতটুকু সাধ্য থাক্‌বে না যে তুমি আর একটি পা-ও এগিয়ে ওঁর দিকে যাও। এই গাম্ভীর্য যেন ওঁর একটি দুর্গ, কারণে অকারণে এর মধ্যে আশ্রয় নিতে পারলে, তাঁর আর কোন' চিন্তা থাকে না। তখন তাঁর মুখ চোখ দেখ্‌লে তুমি মনে ক'রবে সে মানুষ যেন কোথায় চলে গেছে। তখন তাঁর যথার্থ স্বরূপটি জান্‌তে হ'লে তাঁর যত কাছে যাওয়া দরকার তত কাছে যেতে এ পর্যন্ত বোধ হয় কেউই পারে নি। এমন কি আমিও না। লজ্জার কথা হ'লেও আমাকে স্বীকার ক'রতে হ'ল।

কিন্তু দরকারই বা কি কাছে যাওয়ার? ব্যবধান হয়তো বা একটু আছে তাই বলেই কাউকে কি আর ভালবাসা যায় না? না তার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া যায় না? আমার কিন্তু সত্যিই এতে বাধে নি। তিনি আমাকে জমিদারীর কাজ বুঝিয়ে দিতেন, বাধ্য' ছাত্রীর মত আমি কাজ শিখে নিতুম। কিছুদিন বাদেই তাঁর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমি নিজে ক'রে দিয়েছি। দেশ বিদেশের খেলোয়াড়দের ডেকে খেলার আয়োজন করা তাঁর একটা নেশা, এই নেশার ভাগ আমিও নিয়েছিলুম। আর যখন তিনি এক একবার দূরে শিকারে যেতেন, ফিরে

আসার পরে কয়েকটা দিন—ওঃ কী "রোমান্টিক্"। "এ্যাড্ভেঞ্চারাস্" বাঘ, বুনো মোষ, ভালুক শিকারের গল্প! শিকার না করেও শুধু শিকারের গল্প শোনাই যে কত উত্তেজক সে তুমি বুঝবে না। ওই রকম শিকারীর কাছ থেকে ওই রকম ঘোড়সোয়ার, ওই রকম অব্যর্থ-সন্ধানী, ওই রকম উদাত্ত কণ্ঠস্বরওয়ালা শিকারীর কাছ থেকে না শুনলে তুমি ধারণাই ক'রতে পারবে না যে 'রয়েল টাইগার' শিকারের গল্প কী মারাত্মক রকম 'থ্রিলিং"। আর ভেবে দ্যাখো, ঘরের মধ্যে জানালার কাছে বসে তুমি যখন এই গল্প শুনছো, যখন প্রত্যেকটি কথার নাচে তোমার বুকের ভিতরটা নাচ্ছে তখনও মনে তোমার এই চিন্তা রয়েছে যে এই মানুষ তোমার স্বামী।—না, আমার কোন' দুঃখ ছিল না। দিন আমার বেশ কাটছিল'।

এই ভাবে অনন্তকাল কেটে যেতে পারত' আমি আপত্তিও ক'রতাম না। আজ আশ্চর্য মনে হয় বটে, কিন্তু সেদিন সত্যিই আশ্চর্য ছিল না। বুনো ঘোড়া অনায়াসে বশ ক'রে, তার পিঠে চ'ড়ে যার স্বামী শিকার ক'রে বেড়ায়, সেই স্বামীর জীবনের কোন ছায়া তার জীবনে হয়ত' প'ড়ত না। কোন'দিন হয়ত' তার মনেও প'ড়ত না যে জীবনের বিস্তৃতিটাই সব নয়, তার প্রাবল্যের স্থানও আছে। জীবন ব্যাপক যদি না হ'ল, অন্ততঃ গভীর হ'য়ে উঠুক্। এমন কথা যদি সেদিন কেউ ব'লতও আমি বুঝতে পারতুম না। আমি সুখেই ছিলুম। কিন্তু এই সুখে বাধা প'ড়ল। কে বাধা দিল' যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া শক্ত হবে। হয়ত' আমার অদৃষ্ট, আর যদি অদৃষ্ট না মান', তবে তোমার কথারই পুনরুক্তি ক'রতে হয়—আমার ভিতরকার যে মানুষটা আবিষ্কার ক'রে চলেছিল সে। কিন্তু যেই হোক্, প্রথম ধাক্কাটা দিলেন স্বামী নিজেই। তিনি সন্দেহ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন—আমার চরিত্রে।

সে বার রিষড়ার বাগান বাড়ীতে কিছুকাল আমরা ছিলুম, প্রায় ছ'মাস হবে। সেইখানেই ঘটনাটা ঘটে। ব্যাপারটা এত হঠাৎ এবং এমন তাড়াতাড়ি হ'ল যে আমি যেন আগাগোড়া সমস্তটা বুঝতেই পারলুম না। অথবা, হয়ত, অনেক আগেই জিনিষটার সূত্রপাত হয়েছিল, আমি লক্ষ্য করি নি। যেদিন লক্ষ্য ক'রলুম, দেখি সে অনেকদূর এগিয়েছে। স্বামী আমাকে রীতিমত সন্দেহ ক'রতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর স্বভাবতঃ গভীর দৃষ্টির মধ্যে যেন কিসের একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। আমার ওপর তিনি চোখ রেখেছেন। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ভাল বুঝি নি। শুধু ভাবান্তরটাই চোখে পড়েছে। শিকারে যাওয়া বন্ধ, খেলাধুলা বন্ধ, কথা প্রায় নেই ব'ললেই হয়। গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়েছে। তার ওপর যেন এক পোঁচ বিষাদের কালিমা। কয়েকদিন লক্ষ্য ক'রে দেখলুম তিনি রাত্রে ঘুমান না। রাত্রে অনেকসময় অকারণেই আমাকে ডেকে জাগান—শুধু ঘুমিয়েছি কিনা, এইটা জেনেই চুপ করেন। দিনের বেলায় যখন ঘরে থাকেন, মনে হয় যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নেন্। অনেক রকম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রেও মনের খবর কিছু পাই নি। শেষে একদিন পরিষ্কার হ'ল। একদিন সকালে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কাল রাত্রে তুমি কি বাগানে গিয়েছিলে?" বাগান আমার

শোবার ঘরের নীচেই। কিন্তু বাগানে আমি যাই নি। তাই ব'ললুম, "কই না, আমি ত' যাই নি? কেন, কি হয়েছে?"

ব'ললেন, "কিছু না।" একটু দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পরে বাইরে চলে গেলেন।

তারপর দিন আমার ঝি এসে আমায় খবর দিলে "বাবু ডাক্‌ছেন, বাগানে।" বাগানে গিয়ে দেখি মুখ নীচু ক'রে কী যেন একটা দেখ্‌ছেন। আমি কাছে যেতেই আমায় ব'ললেন, "দ্যাখ' ত' এ কি?"

একটু ঠাহর ক'রে দেখ্‌লুম ঘাসের ওপর কয়েকটা পায়ের দাগ। বিশেষ কিছু বুঝতে পারলুম না। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি মুখ তুলতেই কেমন একটা অদ্ভুত ভাবে ব'ললেন, "কি দেখলে?"

ব'ললুম, "পায়ের দাগ।"

জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কার জান?"

জুতাওয়ালা পায়ের দাগ। ব'ললুম, "তা' ত জানিনে। বেশ লম্বা পা দেখা যাচ্ছে, তোমারই হয়ত' হবে?"

তেমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "জান না?" ব'লে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই সকাল বেলা স্বামীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল অতবড় বাগানখানা তার সমস্ত গাছপালা বাড়ী ঘর দোর নিয়ে আমার চারদিকে যেন নাচতে সুরু করেছে। আমি কি দেখছি? স্বামীর চোখে মুখে এ কি?

—সন্দেহ? অবিশ্বাস? আমার ওপর? পর মুহূর্তেই দেখি তিনি আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে নেই, চলে গেছেন। তারপর আমি যে কেমন ক'রে সে দিন ঘরে ফিরে এসেছিলুম তা আমি আজ পর্যন্ত একবারও মনে ক'রতে পারি নি।

সেদিনটা যে কেমন ক'রে কেটেছিল সে কাউকে বোঝান' যায় না। সে চেষ্টাও আমি ক'রব না। সারাদিন আমি ঘরে পড়েছিলুম, রাত্রে শোবার সময় স্বামী যথারীতি ঘরে এলেন। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসলুম। কিন্তু তিনি তাঁর খাটের ওপর না গিয়ে সোজা আমার কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ও বেলা তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি তার মানে বুঝেছ?"

কি জবাব দেব—চুপ ক'রে রইলুম।

একটু পরে মেঘমন্দ্রস্বরে আবার প্রশ্ন হোলো। আস্তে আস্তে ব'ললুম, "বুঝেছি।"

ব'ললেন, "তোমার কিছু বলার আছে?"

গলা দিয়ে স্বর বেরিয়েছিল কি না জানিনে তবে ব'লবার চেষ্টা ক'রেছিলুম, "আছে।"

আদেশ দিলেন, "বল'।"

তেম্‌নি আস্তে আস্তে ব'ললুম, "আমি নির্দোষ।"

জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "পরীক্ষা দিতে পারবে?"

ব'ললুম, "কি পরীক্ষা চাও বল!"

"ব'লছি"—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে তাঁর সেই বাঘমারা 'রাইফেলটি' নিয়ে ফিরে এলেন। হাতে কয়েকটা টোটা। ব'ললেন, "আজ রাত্রে সে যখন আসবে, এইগুলি তার বুকে বসিয়ে দেব, দেখতে পারবে?"

মনে মনে ব'ললুম, "মা ধরণী দ্বিধা হও।" তবু আমি নিশ্চয় জানতুম বাগানে সত্যি সত্যি কেউ আসে না। ওঁর নিজের পায়ের দাগ দেখে মনে এই সন্দেহ এসেছে। কিন্তু চুপ ক'রে থাকা অন্যায় হবে, তাই ব'ললুম, "আচ্ছা, তুমি ক'র গুলী আমি দাঁড়িয়ে দেখব।" তারপর আরও একটু বেশী এগিয়ে গেলুম, ব'ললুম, "দাও আমি নিজের হাতে টোটা ভ'রে দেব।"

কিন্তু এর ফল হ'ল উল্টো। স্বামী অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, ঠোঁটের কোণে ভীষণ নিষ্ঠুর একটুখানি হাসি। বাঘ শিকারীর হাসি। বোধ হয় মনে ক'রলেন, এও ব্যাভিচারিণীর একটা ছল। তারপর বন্দুকটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। ব'ললেন, "দাও ভ'রে টোটা, হাত যেন না কাঁপে।"

দিলুম ভ'রে, হাত কাঁপল' না।

একখানা চেয়ারে আমাকে ব'সতে ব'ললেন। তারপর আর একখানি চেয়ার আমার পাশে এনে রাখলেন। বন্দুকটা টেবিলের ওপর রেখে আলো নিবিয়ে দিয়ে এসে আমার পাশে ব'সলেন। সেই অন্ধকারে দু'জনে ব'সে রইলুম। ঘণ্টা খানেক পরে আমার গায়ে একটু নাড়া দিয়ে ব'ললেন, "সাহস আছে এখনও?"

সাহসের অভাব ছিলনা। ব'ললুম, "আছে।"

আরও ঘণ্টা দুই কেটে গেল। হঠাৎ একসময়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন কিন্তু কোন শব্দ না ক'রে। আস্তে আস্তে জান্‌লার কাছে এলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ ক'রে আমাকে ডাক্‌লেন, "এস।" উঠে গেলুম। ব'ললেন, "শোন।" কান পেতে শুনলুম স্পষ্ট শোনা গেল বাইরে একটা মানুষের পায়ের শব্দ। বুকের ভেতরটা ধপ্ ধপ্ ক'রে উঠলো। স্বামী আমার হাত শক্ত ক'রে ধরে রইলেন। হাতটা যেন আমার ভেঙে যাচ্ছে। একটু ঝাঁকানি দিয়ে ব'ললেন, 'কেমন, এখনও সাহস আছে?"

ব'ললুম, "হাঁ, আছে।"

"তবে নিয়ে এস বন্দুক।"

টেবিলের ওপর থেকে বন্দুক এনে তাঁর হাতে দিলুম। ব'ললেন, "আস্তে আস্তে এস' আমার সঙ্গে।"

তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি এতক্ষণ শুধু সাহসের অভিনয় করেছি। বেশীক্ষণ এ সাহস আমার থাকবে না। শেষ মুহূর্তে নিশ্চয় আমি ভেঙে প'ড়ব। কিন্তু সেই শেষ মুহূর্তটা কি রকমের হ'তে

চলেছে সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা ক'রবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি শুধু জানতুম, আমি নির্দোষ এইটা প্রমাণ ক'রব। স্বামীর পিছনে পিছনে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

সে রাত্রে চাঁদের আলো ছিল। নিঝুম রাত্রি। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো পড়ে সমস্ত বাগানখানা ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। একটু দূরে একটা ঝিলের জল আলোয় চক্ চক্ ক'রছে। আমি বিশেষ কিছু না ভেবে চিন্তেই স্বামীর পিছে পিছে চলেছি। তাঁর হাতে গুলিভরা বন্দুক। আর একটুখানি গিয়ে হঠাৎ আস্তে আস্তে আমাকে ব'ললেন, "দেখ চেয়ে সামনে।" চমকে চেয়ে দেখি একটু দূরে সাদা রঙের কি একটা যাচ্ছে। স্বামী আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললেন, "গুলী করি এবার?"

ব'ললুম, "কর।" কিন্তু তিনি গুলী ক'রলেন না। এগিয়ে যেতে লাগলেন। হয়ত' আমাকে আরও একটু সময় দিয়ে দেখলেন শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ি কিনা। সাম্‌নে যে চলেছিল সে একটা ঝোপের পাশে গিয়ে যেন বসে প'ড়ল। জায়গাটায় ঝাপ্‌সা একটু আলো আছে। কিন্তু এতদূর থেকে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। শুধু ঝোপটার পাশ দিয়ে সাদা রং একটুখানি দেখা যাচ্ছে মাত্র। বন্দুকের নিশানা ঠিক ক'রে ধ'রে স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এইবার গুলী ক'রব। যদি কিছু বলার থাকে এখনও বল।"

ব'ললুম, "কিছু বলার নেই। গুলী কর' তুমি।"

মুহূর্তে কি যেন একটা হয়ে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে ভয়ানক একটা শব্দ। তার প্রতিধ্বনি আকাশের কোলে মিলিয়ে যাবার আগেই কোথা থেকে ভীষণ বুকফাটা এক কান্না। সামনের ঝোপের গাছপালাগুলো নড়ছে। মনে হচ্ছে যেন ওইখানে কে ছটফট ক'রে কাঁদছে। সেই কান্না, সেই তীক্ষ্ণ করুণ কান্না, মনে হচ্ছে যেন সেই ভৌতিক আলোছায়ার কুহকে ঘেরা নিস্তব্ধ নিশীথিনীর কোন গোপন কক্ষ থেকে উঠে বিশ্বলোকের মর্মতল পর্যন্ত বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে। মনে হ'ল যেন বাগানের বোবা গাছপালাগুলো পর্যন্ত একসঙ্গে হাহাকার ক'রে উঠলো। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ঝোপের কাছে চলে এলাম। ম্লান চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল একজন মানুষ মাটির ওপর পড়ে আছে, আর তার বুকের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ছটফট ক'রছে—আমাদের ঝিয়ের বিধবা মেয়ে গোলাপী।

এ এক দৃশ্য। আমি কোথায় আছি, কি হয়েছে, কি আমার করা উচিত, এ সব কিছু আমার খেয়াল নেই। আমি শুধু দেখছি একটি দৃশ্য। মৃত লোকটি পড়ে আছে। দুই হাতে মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। একবার তাকে জোরে বুকের ভেতর চেপে যেন পিষে ফেলতে চাইছে। কখন বা তার গালের ওপর গাল রেখে করুণ সুরে কেঁদে উঠ্‌ছে। শেষে কান্না থামিয়ে ওকে উন্মাদিনীর মত চুমু খেতে লাগলো। কপালে, গালে, চোখে, শেষে মুখে—অবিশ্রান্ত চুমু। ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁট খুলে মুখের ভেতর মুখ দিয়ে পাগলের মত চুমু দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে কঠিন আলিঙ্গনে ওর দেহটা নিপীড়িত ক'রছে। যেন ওই মেয়েটি শুধু ওর দীপ্ত যৌবনের উদগ্র বাসনার আগুন দিয়েই মৃত লোকটির তুষারশীতল দেহে তাপ ফিরিয়ে আনবে। অদ্ভুত দৃশ্য!

ওই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ খুলে গেল। রাত্রির বিভীষিকার মধ্যে, শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, করুণ কান্নার মধ্যে দিয়ে আমি যেন নিজেকে চিনলুম। না, আমার যেন একটা জন্মান্তর হ'ল। আর এই নবজীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সেই ম্লান, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় আমি আমার জীবন বিধাতার হাতছানি দেখ্‌তে পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম আমি অবিশ্বাসিনী হব'।

মনিদি, আজ আমি আর কিছু শিখ্‌তে চাইনে। তুমি হয়ত ব'লবে এর পরও তোমার অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু, আমি বলি মনিদি,—থাক্, কিছু ব'ল না। কথা অনেক বলা যায় But my friend, we are all in the grip of life, and a mighty grip it is ... *

মোপাসাঁ অবলম্বনে

ভারতের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার

গত ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণী পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান করার পর যে আর একটি মহা-যুদ্ধের সূচনা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য দুনিয়ার অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিরাট বিপ্লবের আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। এ বিপর্য্যয় হইতে ভারতবর্ষও রক্ষা পায় নাই, কারণ দুনিয়ার সমুদয় দেশের অর্থ ও বাণিজ্যনীতি এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ। তাই আজ ভারতবর্ষের বাজারেও আমরা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। ইতি মধ্যেই বোম্বাই ও কলিকাতার শেয়ারের বাজারে কোম্পানীর কাগজের মূল্য অত্যন্ত দ্রুত নামিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পনের দিন আগেও সাড়ে তিন টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৭ টাকারও ঊর্দ্ধে, কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই তাহা নামিয়া ৮৪।৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরও যুদ্ধভীতির জন্য বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পনের দিন পূর্ব্বেও যে শেয়ারের দাম ছিল ১০৯।১১০ টাকা, অধুনা তাহার দাম হইয়া গিয়াছিল ৯২॥০।৯৩॥০ কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঐ গুলির দর কমিয়া গেলেও শেয়ার মার্কেটে অন্যান্য জিনিষের দর বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। তূলা, কয়লা, পাট, চা, প্রভৃতির দর বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের বাজারে পণ্যদ্রব্যের দরও যুদ্ধের অজুহাতে অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি অর্ডিনান্স জারি করিয়া এই অকস্মাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া খুচরা দোকানদারগুলির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল, অসম্ভব লাভের আশায় তাহারা জিনিষের মূল্য দুই গুণ তিনগুণ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট যে এই অসাধু প্রচেষ্টাগুলিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়াছেন তাহা সময়োচিত হইয়াছে, এখন দেখা যাক যুদ্ধের মত একটি অস্বাভাবিক সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে দেশের কল্যাণ কিম্বা অকল্যাণ সাধিত হইবে।

ভাবত গভর্ণমেণ্ট ভাবত রক্ষা আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে ঔষধ পত্রাদি, খাদ্যদ্রব্য, লবণ, কেরোসিন ও সস্তাদামের সুতি কাপড সম্বন্ধে পণ্যমূল্য নিযন্ত্রণ কবিবার ক্ষমতা দিযাছেন। পাইকারী এবং খুচরা বিক্রয প্রত্যেক অবস্থাতেই পণ্যমূল্য ধার্য্য করা হইবে। ইহাও ঠিক হইযাছে যে ১৯৩৯ সালেব ১লা সেপ্টেম্বব তাবিখে যে বাজার দর ছিল সর্ব্বোচ্চ, মূল্য ধার্য্য কবিতে হইলে উহা অপেক্ষা কমপক্ষে শতকবা দশটাকা অধিক মূল্য ধার্য্য কবিতে হইবে। গভর্ণমেট আবো বলিযাছেন রপ্তানীব জন্য খাদ্য-শস্য ক্রয কবিবাব ইচ্ছা আপাততঃ গভর্ণমেণ্টের নাই এবং বেসবকাবী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রপ্তানীর ফলে ভাবতে খাদ্য-শস্যেব পবিমাণ চাহিদা মিটাইবার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইযা পডিলে ঐ বেসবকাবী ব্যক্তি কর্ত্তৃক খাদ্য-শস্য বপ্তানী নিযন্ত্রণ করাব পূর্ণ অভিপ্রায গভর্ণমণ্টেব আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয কেবল মাত্র ক্রেতাদিগেব সুবিধাব প্রতি দৃষ্টি বাখিযাই গভর্ণমেণ্ট পণ্যমূল্য নিযন্ত্রণ করিযাছেন। অনেকে হয়ত বলিবেন আমাদের দেশে চাষী ও কতক-গুলি কলওযালাদেব ইহাতে অসুবিধাব সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ যুদ্ধেব মবশুমে আমাদের দেশেব জিনিষ পত্রেব দাম বাড়িতে বাধ্য। লোহা লক্কড, প্রসাধন দ্রব্য, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কযলা, ধাতবদ্রব্য প্রভৃতি জিনিষেব মূল্য বাডিযা যাইবে, এবং তাহাব ফলে এই সব দ্রব্যেব উৎপাদকগণও অধিক লাভবান হইবে, কিন্তু খাদ্য-শস্য ও ভাবত গভর্ণমেণ্টেব ইস্তাহার অনুযাযী কযেকটী নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যেব মূল্য নিযন্ত্রণ কবা হইলে আমাদেব দেশেব চাষীরা ও ঐ নির্দ্দিষ্ট গুটিকযেক দ্রব্যের উৎপন্ন-কারীবা যুদ্ধেব বাজারে সুবিধা লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাতে চাষীদের লাভবান হইবার আশা নিতান্তই কম।

অর্থনীতিব সাধাবণ নিযম অনুসাবে কতকগুলি কাবণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পাবে। প্রথমতঃ যদি পণ্যেব যোগান ঠিক থাকে অথচ চাহিদা বাডিযা যায। দ্বিতীযতঃ যদি পণ্যের চাহিদা ঠিক থাকে অথচ যোগান বা উৎপাদন কমিযা যায। কিন্তু পণ্যমূল্যেব উপব চাহিদা অথবা যোগানেব প্রভাব কার্য্যকবী হইতে কিছু সময় লাগে। বর্ত্তমানে যুদ্ধেব অজুহাতে যে হঠাৎ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাব কাবণ চাহিদা বৃদ্ধি বা যোগানেব স্বল্পতা কোনটিই নহে, এই মূল্য বৃদ্ধিব প্রকৃত কারণ—ব্যবসাযীবা মনে কবিতেছে যে যুদ্ধেব জন্য ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে মাল কম রপ্তানী হইবে, অথচ ভারতবর্ষেব কাঁচামাল এবং খাদ্য-শস্য যুদ্ধবত জাতিদিগেব বিশেষ প্রযোজন হইবে, ফলে ভাবতবর্ষেব প্রায সব বকম জিনিষেবই মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের এই মূল্য বৃদ্ধিব হেতুব উদ্ভব হইবার আগেই তাহাবা নিজ নিজ সঞ্চিত মালের মূল্য প্রায দুই তিনগুণ বাড়াইযা দিল। ক্রেতাদের নিরুপাযতাব সুযোগ লইযা তাহারা ভাবিল এবার রাতাবাতি ফাঁপিযা উঠিবে। ঠিক এই সমযে গভর্ণমেণ্ট যে তাহাদেব অসাধু উদ্দেশ্যেব পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন তজ্জন্য জনসাধারণেব ধন্যবাদার্হ।

এখন দেখা যাক, গভর্ণমেণ্টের এই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণেব ফলে গরীব চাষীদের কোন অনিষ্ট সাধন হইবে কিনা। এই যুদ্ধের জন্য যদি ভারতের খাদ্য-শস্য প্রচুর পবিমাণে বিদেশে বপ্তানী

হইত তবে খাদ্য-শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য তাহার মূল্য বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হইত। এমত অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের জোর করিয়া দেশের মধ্যে পণ্যমূল্য কমাইয়া দেওয়া সমীচীন হইত না, দিলেও তাহা কৃষকদিগের পক্ষে ক্ষতিজনক হইত, কিন্তু ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহার ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে আপাততঃ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে খাদ্য-শস্য রপ্তানী করিবার ইচ্ছা ভারত গভর্ণমেণ্টের নাই। সুতরাং যুদ্ধের জন্য ভারতের খাদ্য-শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির কোন কারণ ঘটে নাই। তবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ভারতের খাদ্য-শস্যের উপর টান পড়িতে পারে। তখন অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকেও বর্ত্তমান নীতি বদলাইতে হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে যুদ্ধের জন্য দেশের মধ্যে যদি অন্যান্য জিনিষের দাম বাড়িতে দেওয়া হয়, অথচ কৃষিজাত খাদ্য-শস্যের মূল্য অনুরূপ বাড়িতে দেওয়া না হয় তবে কৃষকদের দুরবস্থা আরও বাড়িয়া যাইবে। এই বিষয়টী বেশ একটু গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভারতীয় কৃষককে বর্দ্ধিত মূল্যে নিজের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে হয় কিন্তু নিজের পণ্যের বিনিময়ে অনুরূপ বর্দ্ধিত মূল্য না পায় তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা যে আরও বেশী শোচনীয় হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে এই শোচনীয় অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের উচিত চাষীদের এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের একটী তালিকা প্রস্তুত করা। কৃষিজাত খাদ্য-শস্যের মূল্যের উঠা-নামার সঙ্গে যদি ঐ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মূল্যও এক অনুপাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় তবে কৃষকদিগের অবস্থা আর বেশী শোচনীয় হইতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্ট খাদ্য-শস্যের ও জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া না দিলে যে আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইত এমন কথা বলা যায় না। ধরিয়া লওয়া যাক যুদ্ধের জন্য অন্যান্য জিনিষের সহিত খাদ্য-শস্যেরও দাম বাড়িয়া গেল। তাহার জন্য কৃষকদের money income পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল, কিন্তু তাহাদের আর্থিক আয় বেশী হইলেও প্রকৃত আয় অথবা real income বেশী না হইতেও পারে। যদি কৃষিজাত দ্রব্য অপেক্ষা কৃষকদের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেশী হইয়া যায় তবে তাহাদের আর্থিক আয় বাড়িলেও প্রকৃত অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। এই অবস্থাতে যাহাতে কৃষকদের উপনীত হইতে না হয় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার পর গভর্ণমেণ্টকে আর একটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কৃষকদের real income আরও বাড়ে তাহার জন্য পণ্যমূল্য কৃষকদের অনুকূলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কৃষকরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদেশে একটী অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন অবস্থায় অর্থনীতির সাধারণ নিয়মগুলি খাটে না। অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যনীতিও এমন অবস্থায় প্রযোজ্য নয়। দেশের কৃষি-শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুকেই এখন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশের লোকের মঙ্গল কল্পে পরিচালিত করিতে হইবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে শুধু পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। গভর্ণমেণ্টকে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর হিতের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবস্থা অনুসারে রদবদল করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভুল হইবে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় দেশের সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয়, বণ্টন প্রণালী, শ্রমিকদের মজুরী প্রভৃতি অর্থনৈতিক সব কিছু ব্যবস্থাকেই গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। যে শিল্পগুলি গভর্ণমেণ্টের অর্ডিনান্সের আওতার বাহিরে পড়িল তাহার মালিকরা এই সুযোগে বেশী লাভ করিবে, অথচ শ্রমিকদের নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করায় শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইবার তাগিদ তাহাদের থাকিবে না। এমতাবস্থায় দেশের অধিকাংশ পুঁজির গতি হইবে এই সকল fortunate শিল্পগুলির দিকে। ইহার ফলে দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের উৎপাদকগণকে পুঁজির অভাবে ভুগিতে হইবে। সুতরাং দেশের শিল্পকে এইরূপ ভাগ্যহীন ও ভাগ্যবান এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখা গভর্ণমেণ্টের উচিত হইবে না। আরও একটী কথা, বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কল্পে যে সকল ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। পণ্য নিয়ন্ত্রণকে একটী বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থার উপর স্থাপিত না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমাজের সকল শ্রেণীর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অন্ধভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের সুযোগে শিল্প সমুত্থানের পথে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। সুতরাং গত মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে ফুড কনট্রোলার যেরূপে Regulation 2, G অনুসারে দেশের পণ্য উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতেন ভারতবর্ষেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদনের খরচ, gross এবং net লাভ প্রভৃতি সমুদয় খবর লইবেন এবং আরও দেখিবেন যাহাতে সকল শিল্পগুলি অল্প বিস্তর সমান এবং ন্যায় সঙ্গত লাভ করিতে পারে। সেইরূপ ক্রেতাদের অথবা জনসাধারণের পক্ষ হইতেও দেখিতে হইবে তাহাদের কার্য্যকরী ক্রয়-ক্ষমতা (effective purchasing power) অনুসারে তাহারা যেন অন্ততঃ তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি পাইতে পারে। শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও দেখিবার আছে যে তাহারা যেন এমন উপযুক্ত মজুরী পায় যদ্দারা তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা, efficiency of labour বজায় থাকে এবং তাহার উন্নতি হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইলেও সামাজিক কল্যাণ সাধন করিতে হইলে ইহার প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। যুদ্ধের সময় এগুলি প্রবর্ত্তন করিয়া সুফল ফলিতে দেখিলে গভর্ণমেণ্ট শান্তিকালেও এই সকল ব্যবস্থাকে কায়েম রাখিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ নীতিতে অনেকে সমাজতন্ত্রবাদের গন্ধ পাইয়া আতঙ্কিত হইতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ এবং rotten laissez faire এর দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সামাজিক কল্যাণ কল্পে অর্থনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করিয়া পিছু হটিবার সময় আর নাই।

তোমাকে

শ্রীমতী বীণা দাস

তুমি চাও আমি লিখি।

আমিও চাই। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে তিন তলার ঘরের মধ্যে বসে রাশীকৃত বই চারিদিকে জড় করে নিয়ে সাহিত্য-সাধনা করতে আমার ইচ্ছা করেনা। আমি জানি সে ভাবে লেখা আমার আসবে না। সেরকম করে যদি লিখতে আমি যাই লেখায় আমার পাণ্ডিত্য থাকবে প্রাণ থাকবেনা, কল্পনা থাকবে সত্য থাকবেনা, প্রশংসা অর্জ্জন হয়তো করতেও পারি কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ একটুও কি লাভ করতে পারব ?

তাই তো বলি আমায় তুমি ছেড়ে দাও। জীবনের ধারা আমার নদীর প্রবাহের বাধাহীন অবিশ্রান্ত গতিতে পথে বিপথে দুর্গমে নির্জ্জনে বয়ে চলুক। ভয় করোনা,—সময় নষ্ট যদি কিছুটা হয় হোকনা, ব্যর্থ মরুভূমিতে যদি স্রোত মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে আসে তাও হ'তে দাও। জীবনের সেই প্রবাহের পিছনে অনন্ত উৎস যদি থাকে—শুকিয়ে সে যাবেনা। আর তার সেই গতি স্রোতের কলধ্বনিতে যে সুর আপনিই বেজে উঠবে সেই তো হ'বে সত্যিকারের গান।—তুমি আমায় লিখতে বল। কিন্তু কি ধরণের লেখা আমাকে দিয়ে যে সম্ভব তুমি হয়তো ঠিক জাননা। কিন্তু আমি তো জানি। আমি তো জানি—আমার লেখার সবচেয়ে বড—হয়তো বা শুধু একটীমাত্র অবলম্বন আমার অনুভূতি। আমি যা অনুভব করিনি তা আমি লিখতে পারিনা। তাই যতক্ষণ আমার অনুভূতিতে সাড়া না জাগে, নাড়া না পড়ে—আমার অন্তরের সপ্তস্বরার প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কম্পন না জেগে ওঠে, আমার কণ্ঠ মূক—আমার অন্তর ভাষাহীন। বুদ্ধি দিয়ে আমি যা গ্রহণ করি আমার সমগ্র সত্তার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে নেওয়া দরকার—তবেই তাকে আমি রূপ দিতে পারব। আমি যা পেয়েছি সকলকে দিতে আমি চাই—কিন্তু পাওয়া আমার দরকার, সত্যিকারের পাওয়া, সমগ্র জীবন দিয়ে পাওয়া। তাই বলি আমাকে অনুভব করতে দাও। বিশ্বের সুখ দুঃখের স্পন্দন আমার বুকে স্পন্দন তুলুক। তবেই তো আমি দিতে পারব বিশ্বের মূক কণ্ঠে ভাষা। বিশ্বের মানবের দুঃখ, অভাব, অভিযোগ—ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা আকুতি এদের প্রতিফলিত করবার, পরিচালিত করবার, প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার যদি আমায় পেতে হয়, তার মূল্যও যে আমাকে দিতে হ'বে, অনায়াসে বিনাক্লেশে অর্জ্জন করবার লাভ করবার জিনিষ সে তো নয়। বিশ্বকে দূরে রেখে দিলে আমার কিছুতেই চলবেনা—বইয়ের মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে যে পরিচয় আমার অন্তত: সবটুকু তাতে ভরবেনা! আমার দরকার হয় নেমে আসতে, মিশে যেতে, নিজেকে মিলিয়ে দিতে, অনুভূতির—সহানুভূতির অচ্ছেদ্য নাগপাশে জড়িয়ে দিতে, তাদের সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড মানব-সমাজের সঙ্গে—যাদের কথা নিয়ে ব্যথা নিয়ে যুগে যুগে সাহিত্য গড়ে উঠেছে,—যাদের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নার কালি দিয়ে—কত বই, কত

কাব্য কত ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে—যা পড়ে তুমি আনন্দ পাও আর আমাকে বল "তুমি কবে ওইরকম লিখবে?"

যাঁরা কবি, যাঁরা স্রষ্টা, যাঁদের লেখা চিন্তাজগতে বিপ্লব এনেছে—যাঁদের এক একখানা বইয়ের অবদান উপলব্ধি করে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই—তাঁদের সবার জীবন কি সেই ভাবে কেটেছিল—যে ভাবে তুমি চাও আমার জীবন কাটুক? নিরালা ঘরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আর কল্যাণের ভিতর? শুভ্র, অনাবিল, নিষ্কলুষ সহজ সুষমায় পরিবেষ্টিত স্বচ্ছন্দ মাধুর্য্যে মণ্ডিত আবেষ্টনীর ভিতর? আমার তো সন্দেহ হয়। আমার তো মনে হয় অনেকেই তাঁরা অনেক তিক্ত মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে গিয়েছেন জীবনে—অনেক ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন, আকণ্ঠ গরল পান করে বিলিয়ে গিয়েছেন অমৃত। তুমি হয়তো বলবে Milton, Wordsworth, Tennyson এর কথা,—আমি বলব তোমায় Gorky, শরৎচন্দ্র, Oscar Wilde এর কথা।

তোমার কথামত ঘরের মধ্যে বসে বসে বই পড়লে জ্ঞান আমার বাড়বে সত্যিই, জ্ঞানের মূল্য আমি অস্বীকারও করিনা। হয়তো সেই পুঞ্জীভূত জ্ঞানের স্তূপ দিয়ে যে স্তম্ভ আমি গড়ে তুলব—আমার কবরের উপর স্মারক-ফলক তাতে বেশ ভালো করেই তৈরী করা যাবে—তাতে লেখা থাকবে আমার নাম—আমার জন্ম, আমার মৃত্যু।—কিন্তু সেই কি তুমি চাও?

তার চেয়ে তুমি বল, আমায় উৎসাহ দাও, আমায় আশীর্ব্বাদ কর—পৃথিবীকে আমার নিজের চোখ দিয়ে আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি দেখে নিই—আমার সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় হোক।

জানি তুমি যা ভাব সবই ঠিক। জানি সে আমায় আঘাত করবে, তার সেই নগ্ন মূর্ত্তি সবটুকু সহ্য করা আমার সহজ হ'বেনা। এও জানি বাস্তবের সেই দুর্গম পঙ্কিল পথে যেতে যেতে আমার সর্ব্বাঙ্গে লাগবে অনেক ধূলো কাদা—অনেক মলিনতা আবিলতা। তাহোক, তবু দেখো তুমি, সত্যের সহজ শুভ্রতায় সেদিন আমি আরও পবিত্র হয়ে উঠব, প্রত্যক্ষতার আনন্দে আমি হয়ে উঠব সমৃদ্ধ, আমার বুক ভরে উঠবে অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে।

সৃষ্টির আনন্দ যদি আমাকে পেতে হয়—সৃজনের পূর্ব্বের সমগ্র বেদনাটুকুও যে আমাকে সহ্য করতেই হবে।

প্রভাত-নগরী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায

নগরীর রাজপথে একে-একে নিবিল দীপালি
থেমে গেছে রাত্রির উৎসব,
প্রমোদে যাপিল যা'রা নর-নারী বহ্নি বুকে জ্বালি,
গাঢ়সুপ্ত নিশ্চল, নীরব।

অস্তাকাশে ম্লান পাণ্ডু নিষ্প্রাণ চাঁদের ক্ষীণরেখা
—রজনীর ছিল যাদুকর,
সৌধশিরে, তরুচ্ছায় এঁকেছিল কত স্বপ্নলেখা,
—শেষ-শয্যা রচে দিগন্তর।

ধীরে ধীরে কৃষ্ণধূম ভেদ করি' পূর্ব্বাকাশতলে
ভয়ঙ্কর বহ্নিশিখা জাগে,
রক্তমেঘে প্রভাতের দীপ্ত তীব্র রশ্মিমালা জ্বলে
যজ্ঞ কা'রা করে পূরোভাগে।

সুপ্তিভঙ্গে চমকিয়া নির্নিমেষ নেহারে নগরী
ধীরে অঙ্গে অঞ্চল সম্বরে,
সে পবিত্র অগ্নিকণা ব্যগ্রহস্তে মুঠিমুঠি ভরি
লেপিছে অশান্ত বক্ষ' পরে।

কা'রে চেয়ে দীপমালা জ্বেলেছিল গত রজনীতে,
মেলেছিল ব্যগ্র আলিঙ্গন,
বাঁধিতে চাহিয়াছিল পুষ্পডোরে, হাসিনৃত্যগীতে
ভুরুভঙ্গে বাঁকায়ে নয়ন?

কেহ বাঁধা পড়ে নাই, শূন্যবক্ষ অনির্ব্বাণ জ্বলে
ছিন্ন ডোর, ঝরিয়াছে ফুল,
বিলুণ্ঠিত পান-পাত্র সুবিশাল সৌধকক্ষ তলে,
স্মৃতিগন্ধে বাতাস ব্যাকুল।

আজি তাই ঊর্দ্ধপানে নগরীর আকুল অঞ্জলি
উঠিযাছে মিনতির মত,
কি কামনা সিন্ধুসম ওঠে তা'র অন্তরে উচ্ছলি',
তারি বক্ষে হাসে রশ্মি শত।

প্রাণের মূলতত্ত্ব

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ বি-এস-সি

মনোরমা ধরণীর বুকে অহর্নিশ জলে স্থলে সর্ব্বত্র জীবন্ত প্রাণী চরিযা বেড়াইতেছে, বৃক্ষলতাদি তৃণ গুল্ম প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রাণ শক্তির পরিচয দিতেছে এবং অন্যান্য জীবের প্রাণ ধারণের প্রধান উৎসরূপে বিরাজ করিতেছে। বিশ্বভরা এই যে প্রাণের স্পন্দন ইহার মূলে কি? প্রাণিগণের অবযবে এমন কি পদার্থ থাকিতে পারে যাহার শক্তি এত মহত্তর বা উচ্চতর?

আমাদের অনেকেরই ধারণা, জীবন্ত প্রাণী মাত্রেই "প্রাণ" বা "আত্মা" বলিযা একটী স্বর্গীয পদার্থ বিদ্যমান। এই আত্মা অথবা প্রাণ যখন জীবদেহ ত্যাগ করিযা বিশ্বের মহাশূন্যে বিলীন হইযা যায, তখন জীবন্ত প্রাণীটি অসাড় প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয। ঐরূপ একটি অলৌকিক পদার্থ বাস্তবিক আছে কিনা নিশ্চয করিযা বলা যায না, কারণ কোন বৈজ্ঞানিকই ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। তাহারা কল্পনা করিযাছেন যে সমস্ত প্রাণী দেহেই এমন একটি মূল পদার্থ আছে যাহার সাহায্যে প্রাণী সকল তাহাদের জীবনের পরিচয দিতে সমর্থ হয। প্রাণকে কি বাস্তবের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব? ইহা সামান্য একটু স্পন্দন মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করিযা স্থির করিযাছেন, যদিও প্রাণকে বাস্তবের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নহে, তথাপি প্রত্যেকটি জীবদেহেই এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান আছে যাহার প্রধান ধর্ম্ম জীবদেহে প্রাণের স্পন্দন জাগাইযা তোলা। বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করেন উত্তপ্ত মেদিনীর বুক ক্রমশঃ শীতল হইতে হইতে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয, যখন হঠাৎ একদিন আপনা হইতেই অসাড় প্রাণহীন পদার্থে প্রাণের স্পন্দন জাগিযা উঠে, তারপর ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেই উদ্ভব হয অপরাপর জীবন্ত প্রাণীর।

স্বতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীদেহে মনের উদ্ভবও কি এইরূপে প্রাণহীন জড় পদার্থ হইতেই? সুগন্ধি কুসুমের বিকাশে কবির মনে নানা ছন্দের অবতারণা হয, শিল্পী তাহা দেখিযা মনোরম চিত্রের সৃষ্টি করেন, আবার একজন বৈজ্ঞানিকের মনে ঐরূপ কল্পনার উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছা হয় ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি জানিয়া নিবার। ইহাদের প্রত্যেকেই

জীবন্ত কিন্তু একের মনের বিকাশ অন্যটির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এইখানেই প্রভেদ প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রত্যেক জীবের। জীব জগতে যখন এইরূপ বৈষম্য লক্ষ্য করা হয় তখন একটি মাত্র পদার্থকে জীবনের মূল বস্তুরূপে মানিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি জীবজগতে উহাদের কার্য্যক্ষমতা, গঠন এবং সঙ্কলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

মানুষ তাহার আহারের সংস্থান করে, দেহের পুষ্টি সাধন করে এবং অবশেষে পুত্র কন্যাদের জন্ম দান করিয়া একদিন নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এ সমস্ত সকল জীবন্ত প্রাণীরই ধর্ম্ম এবং যে কোন প্রাণীকেই এই সকল কার্য্যক্ষম বলিয়া আমরা জানি। উপরন্তু মানুষ যে কথাবার্ত্তা এবং দৈহিক ও মানসিক কার্য্যদ্বারা নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে করে সেগুলিকে পৈশিক সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বলিয়া মানিয়া নিলে তাহার সঙ্গে আর কোন প্রাণীরই জাতিগত পার্থক্য থাকে না—কারণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী এমনকি উদ্ভিদও খাদ্য গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে নূতনের জন্মদান করিয়া নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উচ্চতর বৃক্ষদেহেও নানারূপ অঙ্গ সঞ্চালন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলেই তাহার পত্রপল্লব অবনিমত হইয়া পড়ে। "অ্যালগি" (Algae) অথবা "ফাঙ্গি" (Fungi) নামক অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ তাহাদের দেহসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশের সাহায্যে অনায়াসে চলিয়া বেড়ায়। সাধারণ উদ্ভিদ অচল তাই বলিয়া তাহাতে প্রাণের কোন লক্ষন নাই একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। আচার্য্য জগদীশ তাঁহার অত্যশ্চার্য্য আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, উদ্ভিদের ও অপরাপর যে কোন সচল প্রাণীর অনুভূতি আছে। বর্ত্তমানে আমরা সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য, উদ্ভিদও জীবন্ত এবং অন্যান্য জীবের সহিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

জীবদেহে প্রাণের উৎস এই মূল পদার্থটীর নাম "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" (Protoplasm)। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হুগো ভন মোল (Hugo Von Mohl) ১৮৪৬ খৃঃঅব্দে সর্ব্বপ্রথম উদ্ভিদ দেহস্থ কোষের কঠিন আবরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, স্বচ্ছ এবং অর্দ্ধতরল একটী পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং তাহাকে "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" (Protoplasm) বলিয়া অভিহিত করেন। ইতিপূর্ব্বে ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক ডুজার্ডিন (Dujardin) "ফোরামিনি ফেরা" (foramini fera) নামক জীবের জীবন্ত পদার্থটির নাম দেন "সেক্রোড্" (Sacrode)। পার্থিব সকল জীবদেহস্থ "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর ঐক্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান মোল অথবা ডুজার্ডিন কাহারও ছিল না। ১৮৬১ খৃঃঅব্দে "সুল্‌জে" (Schullze) সর্ব্বপ্রথম জীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর স্বরূপ পরিচয় দানে জগতবাসীকে বিস্মিত করেন।

সকল জীবকেই প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এক কোষী (unicellular) ও বহুকোষী (multicellular)। এককোষী প্রাণী এমিবা (amœba), ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) ইত্যাদি এবং বহুকোষী প্রাণী—উদ্ভিদ, মনুষ্য এবং অপরাপর জীবন্ত প্রাণী।

মনুষ্য, উদ্ভিদ, এমিবা, ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি যে কোনরূপ জীবদেহ হইতে প্রাপ্ত "প্রোটো-জ্‌ম্"ই আকৃতিতে এবং ধর্ম্মে সম্পূর্ণ এক। সবক্ষেত্রেই ইহা একটী স্বচ্ছ, অর্দ্ধতরল পদার্থ ভিন্ন

আর কিছুই নহে। এই অত্যাশ্চার্য্য পদার্থটীর সকল ধর্ম্মেই প্রাণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম এই যে "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" (Protoplasm) স্বয়ং গতিশীল। জীব কোষের কঠিন আবরণ হইতে মুক্ত "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর গতির নাম "এমিবয়েড" (amœboid) কারণ সাধারণ এমিবা অথবা প্রাণীদেহস্থ রক্ত কণিকা এইরূপ গতিসম্পন্ন। জীবকোষের কঠিন আবরণে আবদ্ধ অবস্থাতেও ইহা স্থির থাকে না—নদীস্রোতের ন্যায় অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়।

এই পদার্থটীর আরও অত্যাশ্চার্য্য গুণ এই, ইহা বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) হইতে জীবদেহের খাদ্য সংগ্রহ এবং তদ্বারা নিজের পুষ্টি সাধন করিতে পারে। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্"এ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কণা বর্ত্তমান, তন্মধ্যে "ক্রোমেটীন" (chromatin) নামক কণাগুলির কার্য্যক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এগুলি "ক্রোমাইড" (chromide) রূপে সমস্ত "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত থাকে অথবা সবগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া এক বা ততোধিক 'নিউক্লিয়াস" (nucleus) এর সৃষ্টি করে। কাজেই "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্"কে ঘনীভূত অংশ "নিউক্লিয়াস" (nucleus) এবং জীবকোষের অবশিষ্ট অর্দ্ধতরল পদার্থ "সাইটোপ্লাজ্‌ম্" (cytoplasm) এ ভাগ করা যায়। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই মনে করিতেন যে "নিউক্লিয়াস" বিহীন "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" ও জীবন্ত প্রাণীরূপে বিরাজ করিতে পারে কিন্তু দেখা গিয়াছে, "ক্রোমেটীন" কণা সম্পূর্ণরূপে "প্রোটোপ্লাজম" এ মিশিয়া থাকিতে পারে, কাজেই সাধারণ পরীক্ষাদ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আধুনিক গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে সমস্ত জীবদেহেই "ক্রোমেটীন" বর্ত্তমান। ইহা জীবকোষের মস্তিষ্ক বিশেষ, কারণ কোষের সমস্ত কার্য্যই "ক্রোমেটীন" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং "ক্রোমেটীন" বিহীন "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর সমষ্টি জীবন্ত থাকিতে পারে না।

সমস্ত জীবদেহেই "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" বর্ত্তমান কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও তাহারা সম্পূর্ণ এক নহে এমনকি একই জীবের বিভিন্ন কোষের "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এ সামান্য পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে পৃথক কোষের কার্য্যসূচীও সম্পূর্ণ পৃথক। বৈজ্ঞানিকগণ আরও দেখিয়াছেন যে "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" অনেকগুলি জীবন্ত অংশের সমষ্টি। ইহাদের প্রতিটী জীবদেহ গঠনে অপরিহার্য্য এবং তাহাদের অপূর্ব্ব সমাবেশেই "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর এরূপ অত্যশ্চার্য্য গুণাবলির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই একটী মাত্র পদার্থদ্বারাই প্রকৃতি তাহার বৈচিত্র্যময় জীবরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

জীবনের উৎস এই পদার্থটীর স্বরূপ জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিক অনেক গবেষণা করিয়াও বিশেষ কোন পুরস্কার লাভ করে নাই। জীবন্ত পদার্থের গঠন সম্বন্ধে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা অতি অল্পই জানা যায়—কারণ বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বেই জীবন্ত পদার্থটী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বৈজ্ঞানিককে এই মৃত বস্তুটীকেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। জীবন্ত পদার্থকে জীবন্ত রাখিয়া বিশ্লেষণ করিবার সৌভাগ্য এযাবৎ কাহারও হয় নাই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া আশা করা

[য] না। আমাদিগকে মৃত "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হবে—পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, কার্ব্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), নাইট্রোজেন Nitrogen) ও অক্সিজেন (Oxygen), এ কয়টী মৌলিকপদার্থের সমাবেশে "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" [গ]ঠিত।

জীবগণ খাদ্যের সহিত কার্ব্বোহাইড্রেট (Carbohydrate), প্রোটীন (Protein), ফ্যাট Fat) প্রভৃতি গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহাদের দেহে যথেষ্ট মৃত "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" গৃহীত হয়। এই [স]কল খাদ্য জীর্ণ হইলে জীবদেহে নূতন "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর সৃষ্টি এবং তাহাতেই জীবের পুষ্টি সাধন [হ]য়। বায়ুস্থ "অক্সিজেন" (Oxygen) এর সাহায্যে জীবদেহে অবিরত দহনকার্য্য [চ]লিতেছে অর্থাৎ "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর ধ্বংস হইয়া তাহার ফলে তাপ (Heat), পৈশিক শক্তি muscular enrgy) এবং "কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড" (Carbon dioxide) প্রস্তুত হয়। ঐ তাপ (Heat) জীবদেহের তাপ (temperature) রক্ষা করে। পৈশিক শক্তিদ্বারা জীব চলিয়া বেড়াইতে এবং অপরাপর অঙ্গ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয় এবং অবশিষ্ট "কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড" বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়। এদিকে বৃক্ষজাতিও নিতান্ত নিরপেক্ষ থাকে না, সে তার পত্রপল্লবের সহায়তায় বায়ুস্থ "কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড" গ্রহণ করে। সূর্য্য কিরণ ও পত্রস্থ 'ক্লোরোফিল্" (chlorophyll) এর মিলিত শক্তিদ্বারা এই "কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড" হইতে "ফরম্যালডিহাইড" (formaldehyde), ষ্টার্চ্চ (Starch), শর্করা (Sugar) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই গুলি বৃক্ষের খাদ্য এবং ইহাদের দ্বারাই বৃক্ষ নিজদেহের পুষ্টিসাধন করে অর্থাৎ "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর সৃষ্টি করে।

জীবনের উৎস "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর সৃষ্টিকল্পে "কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড" জল, পত্রপল্লবস্থ "ক্লোরোফিল্" এবং সূর্য্যরশ্মি এই কয়টীর একত্র সমাবেশ অতীব প্রয়োজন। প্রাণীদের জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদজাত খাদ্য যেরূপ অতীব প্রয়োজন সেইরূপ উদ্ভিদের জীবনের জন্যও এই কয়েকটী দ্রব্য অপরিহার্য্য।

যদিও উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তথাপি তাহাদের মধ্যে এমন একটী পার্থক্য রহিয়াছে যাহার জন্য ইহাদের দুইজাতিকে এক বলা সম্ভব নয়। যে কোন উদ্ভিদ অসাড় প্রাণহীন অজীব পদার্থ হইতেই প্রাণের উৎস "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" এর সৃষ্টি করিতে পারে, মানুষ অথবা অপরাপর প্রাণীদের সে ক্ষমতা নাই বলিয়াই তাহারা বাধ্য হইয়া তাহাদের প্রধান উৎস "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" গ্রহণ করে উদ্ভিদের নিকট হইতে। মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গর্ব্ব করে —তাহাকেও তাহার জীবনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় বৃক্ষ জগতের নিকট। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানবকে তাহার সবচেয়ে বড় সুহৃদকেও অপরিসীম দানের কথা স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দেখা যায় না।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, জীবের প্রাণবন্ত দেহের গঠনের নিমিত্ত কোন নূতন ধরণের মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয় না। যে সকল মৌলিক পদার্থ বৃক্ষলতা ও মানবদেহ গঠনের আবশ্যক

তাহার প্রতিটী জল, বায়ু ও মৃত্তিকারূপ প্রাণহীন পদার্থেই বিদ্যমান। "প্রোটোপ্লাজম্" (যাহা জীব জগতে জীবনীশক্তির আধার) প্রকৃত পক্ষে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেনদ্বারা গঠিত, আমরা জানি, কিন্তু ইহাদের প্রতিটী একত্রিত করিয়া শত চেষ্টাতেও প্রাণবন্ত "প্রোটোপ্লাজম্" প্রস্তুত করিতে পারি না—যদিও প্রকৃতির যাদু মন্ত্রে এই সকল মৌলিক পদার্থের সহায়তায় নির্ব্বিঘ্নে প্রাণবন্ত "প্রোটোপ্লাজম্" এর সৃষ্টি হয়। এই একটীমাত্র পদার্থদ্বারাই এই দিগন্তপ্রসারী ধরিত্রীর বুকে সকল প্রকার জীবদেহে প্রাণের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যুগ যুগ ধরিয়া।

নালন্দার কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কার্ত্তিক মাসের শেষ। শীতের প্রভাব বাঙ্গালা দেশে ভাল করিয়া না পড়িলেও বিহারের পাটনা সহরে বেশ একটু পড়িয়াছিল। আমি বিশেষ একটু কার্য্যোপলক্ষে পাটনা যাইয়া স্নেহভাজন সুহৃদ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের ওখানে দুই তিন দিন ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ লইয়া জানিলাম সকালের কলিকাতাগামী একটা গাড়ীতে গেলে বক্তিয়ারপুর পৌঁছিতে বেলা প্রায় ন'টা হইবে এবং নালন্দা পৌঁছিতে বারোটার বেশী বেলা হইবে না। কাজেই আমি সেই সকালের গাড়ীতেই নালন্দা দেখিতে চলিলাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর গৌরব ও স্মৃতি বহন করিয়া মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাঁকিপুরে যে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম সেই গাড়ীখানার ভিতর একটি গুজরাটি যুবক ও তাঁহার পত্নী ছিলেন। উভয়ই তরুণ। আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহারা এখন রেঙ্গুন যাইতেছেন। ইহারা জহুরী। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী সহরে মস্ত বড় হীরা জহরতের দোকান আছে। ব্রহ্মদেশের রুবির কারবার তাহারা অনেক দিন যাবত করিতেছেন। মেয়েটি বলিল, আপনি যদি রেঙ্গুন কিংবা ফরাসী দেশে বেড়াতে যান আমাদের অতিথি হবেন কিন্তু, আমরা রেঙ্গুনের কারবার দেখে-শুনে প্যারী যাব—পিতাজী অর্থাৎ তাহার শ্বশুর মহাশয় তারা গেলে গুজরাটে অর্থাৎ বাড়ী আসিবেন। তাহাদের নামাঙ্কিত কার্ড, ঠিকানা ইত্যাদি দিতেও এতটুকু বিলম্ব করিল না। কিন্তু আজ এক বৎসর পরে নালন্দার কথা লিখিতে বসিয়া দেখিলাম, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবে হারাইয়া বোধ হয় অন্যায়ও হয় নাই, কেননা ফরাসী দেশ ভ্রমণের আশা পর জীবনের জন্য মুলতুবি রাখিয়া দিয়াছি।

বক্তিয়ারপুর ঠিক্ বেলা নয়টার সময় পৌঁছিলাম। রেলওয়ে ওভারব্রিজটি পার হইয়া অপর দিকের প্ল্যাটফর্মে আসিলাম। সেখানে বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের গাড়ী তৈয়ারী ছিল। টিকেট

কিনিবার আধঘণ্টা পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর মধ্যে একজনও বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলাম না। বেশীর ভাগই বিহারী ব্যবসায়ীর দল। মাড়োয়ারীও অনেক আছেন। তাঁহারা এখান হইতে নানা পণ্যদ্রব্যের কারবার করেন। এ অঞ্চলটার ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা যাইতেছি নালন্দা দর্শনে—আর মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা যাইতেছেন অর্থ উপার্জ্জনে।

ছোট গাড়ী ছোট পথ দিয়া চলিতেছিল। বিহারের পল্লী পথ দিয়া গাড়ী চলে। বিস্তৃত প্রান্তর। ধানের ক্ষেত। সবুজ ও সুন্দর। বায়ুভরে হেলা দোলা করিতেছে। গাড়ীর ঝাঁকুনি শরীরকে পীড়া দিতেছিল। আর ঘন ঘন বাঁক, কাজেই এপথে যাত্রাটা সহজও ছিলনা আর আরামেরও ছিল না। তবে নূতন প্রদেশের নূতন ছবি। খুব দূরে দূরে পল্লী। মাটির দেয়াল ঘেরা বাড়ী, খোলার ছাউনি। মাঝে মাঝে সমৃদ্ধ পল্লী, দালানকোঠা ও অনেক আছে। রেলপথের পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে, সে পথে অসংখ্য মাল বোঝাই গাড়ী সার বাঁধিয়া যাইতেছে। কোন ভাড়া নাই। মাঝে মাঝে লরি চলিতেছে, বাস্ ও যাত্রী লইয়া ছুটিতেছে।
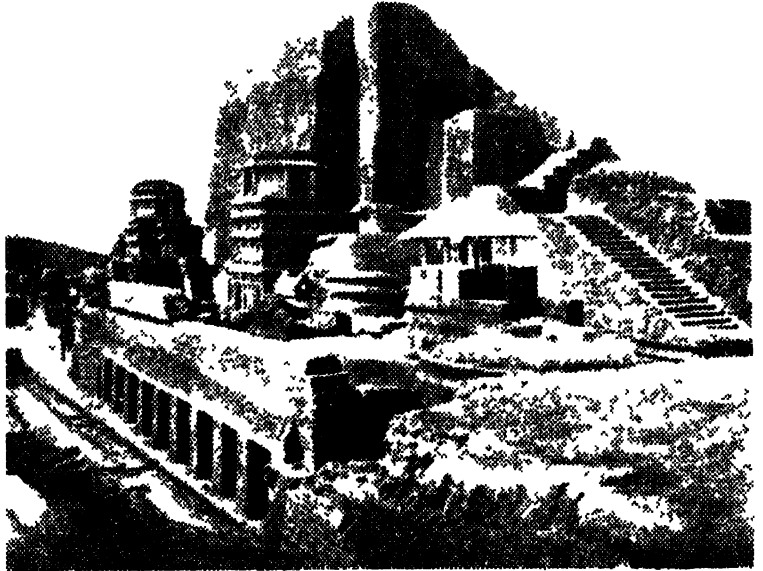
বিহার সরিফ ষ্টেশনটি বেশবড়। ছোট সহর এই বিহার সরিফ। বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এপথে আসিবার সময় দূর পাহাড়ের গায়ে একটি পুরানো মসজিদ ও সমাধি দেখিতে পাইতেছিলাম। এখানকার আশে পাশে প্রচুর গোল আলুর চাষ হয়। গাড়ী বোঝাই গোলআলুর চালান হয়, বেশীর ভাগ আলুই কলিকাতাতে আসে। এখানকার পানও বেশ মিষ্টি, সিলাওর পানের বেশ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

প্রধান স্তূপের সাধারণ দৃশ্য—নালন্দা

বেলা বারোটার পরে নালন্দা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে নালন্দা অবস্থিত। ষ্টেশনের কাছেই চীনাদের একটি ধর্ম্মশালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একতলা দালান। আমি সেখানে যাইয়া ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষকে বলিলাম যে আমার জিনিষপত্র এখানে রাখিয়া নালন্দা দেখিতে যাইব। তিনি হাসিয়া বলিলেন, দিব্যি পরিষ্কার হিন্দীতে, "এত আপনাদেরই বাড়ী ঘর। এসে এখানেই দুইটি আহার করবেন।" একথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এমন করিয়াই অজানা বিদেশে পর আপনার হয়। এখানে কয়েকটি সিংহলী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা

তীর্থযাত্রা উদ্দেশে বাহিব হইযা বৌদ্ধগযা বেডাইযা নালন্দা দর্শনে আসিযাছেন। এখান হইতে তাঁহাবা রাজগীব দর্শন করিয়া কলিকাতাব পথে সিংহল ফিবিবেন। এই দলেব যিনি অভিভাবক, তিনি সিংহলেব একটি বেল লাইনেব ষ্টেশন মাষ্টার। চমৎকাব ইংবাজী বলেন দলেব সকলেই। মেযেবাও বেশ ইংবাজী বলিতে পাবেন। একটী মেযে মিশনাবীদেব স্কুল ও কলেজে পডিযা মানুষ হইয়াছেন।

মেযেটী ভদ্রলোকেব জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেখিতে শ্যামলা—বাঙ্গালী মেযেদেবই মত গডন ও মুখশ্রী। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাবাও আমাদেব সঙ্গী হইলেন।

কার্ত্তিক মাসেব রৌদ্র বেশ প্রখব ছিল। পথ ধূলিভবা। দুই দিকে গাছেব সাবি। আবাব কোথাও গাছ নাই। দূবে দূবে দুএকটা গাছ। সকলেব চেযে ভাল লাগিতেছিল মাঠেব বিস্তৃত দৃশ্য। আব দূরে দূবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হস্তীবযূথেব ন্যায় ছোট ছোট একটি পাহাড, নিঃসঙ্গে ধূসব হস্তীব মতই আঁকা বাঁকা হইযা শোভা পাইতেছিল বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র।

একটি ছোট গ্রাম পাইলাম। গ্রামেব মধ্য দিযা পথ। পথেব দুই ধাবে ছোট ছোট বাডী। দাবিদ্র্যেব সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত। গোরু চবিতেছে, ছাগল-ভেডা লাফালাফি করিতেছে। উলঙ্গ কৃষ্ণকায ছোট ছোট শিশুবা ধূলি লইযা খেলা কবিতেছে—ধূলি ছডাইতেছে, ধূলি উডাইতেছে। গ্রামটি পার হইবা মাত্রই চোখে পডিল—নালন্দাব বিবাট প্রান্তব মধ্যস্থ অতীতেব কীর্ত্তি-চিহ্ন সব স্তূপ। নীল আকাশেব তলে বৌদ্রদীপ্ত প্রান্তবেব মাঝখানে এক কালেব বিবাট বিশ্ববিদ্যালযেব সব কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিব নীচ হইতে আবাব আকাশেব দিকে মাথা তুলিযা দাঁডাইযাছে। নালন্দা আসিযা মনে হইতেছিল এখনই বুঝি পীতবসনধাবী মুণ্ডিত শীর্ষ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণেব দর্শন মিলিবে—তরুণ ছাত্রগণেব প্রতিভামণ্ডিত মুখশ্রীব সাক্ষাৎ পাইব।

ডানদিকে একটী ছোট পথ। পাশাপাশি সোজা চলিযা গিযাছে। নালন্দাব ছোট যাদু-ঘরটির দিকে। দুই দিকে আমগাছেব সাবি। গাছগুলি নূতন লাগানো, এখনও তেমন বড হয নাই। ছাযাশীতল পথটি দিযা অফিসে আসিলাম। যে ভদ্রলোক এখানকাব ভাবপ্রাপ্ত, কলিকাতা যাদুঘরে তাঁহার সহিত আমাব দুই একবাব পবিচয হইযাছিল বলিযা পবম সমাদরেব সহিত গ্রহণ কবিলেন এবং দেখাশুনার সুবিধা কবিযা দিলেন।

আমাব এখানে আসাব অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদাব মহাশয দস্যুহস্তে নিহত হইযাছিলেন। ননীবাবু কিছুদিন নালন্দাযও ছিলেন, কাজেই এখানকার চৌকিদাব ও চাপবাশিবা পর্য্যন্ত সেই শান্ত ধীব ও পবহিতৈষী কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিব জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন কবিল। তাঁহাবাই মবিযাও বাঁচিযা থাকেন, যাঁহাবা এমন করিযা মানুষের মনেব উপব আপনাব মধুব চবিত্রেব প্রভাব রাখিযা যাইতে পাবেন।

যাদুঘবটিব মধ্যে সেকালেব প্রত্নচিহ্ন সব সযত্নে সাজানো বহিযাছে। অবলোকিতেশ্বব, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, অবলোকিতেশ্ববও তাবা, ত্রৈলোক্যবিজয, মৈত্রেয, বিষ্ণু, কত মূর্ত্তি সব পাথরের ও ব্রোঞ্জের সুবক্ষিত আছে। সেকালের কুলুপ—সেকালের ধাতুপাত্র, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি,

মাটিব ভাঁড়, জালা সব অতি সুন্দরভাবে সাজানো বহিযাছে। একদিন যাহারা এই সব ব্যবহার করিযাছিল, আজ তাহারা সুধু ইতিহাসেব পৃষ্ঠাযই স্মবণীয় রহিযাছেন।

আমরা মিউজিযাম দেখিযা ববাবব চলিযা আসিলাম ধ্বংসস্তূপ সমূহের দিকে। প্রথমে দেখিতে আসিলাম প্রধান স্তূপটি। কি বিবাট সে স্তূপ, একদিন কত বৃহৎ যে ইহাব আযতন ছিল, তাহা এখনও বুঝিতে পাবা যায়। সিঁডি চলিযাছে স্তবে স্তবে উপরেব দিকে। বিরাট মন্দিব হযত সেখানে ছিল। উপর হইতে চাবিদিকেব দৃশ্য দেখায অতি মনোবম।—কে যেন শ্যামল বসনখানি বিছাইযা দিযা আনন্দে ধীবে ধীবে দোলা দিতেছে। স্তূপেব আশেপাশে চৈত্য। চৈত্যগুলিব গায়ে সব মূর্ত্তি খোদিত। কোথাও বিবিধবর্ণে সুবঞ্জিত। আজও অনেক স্থলে তাহা বিবর্ণ হয নাই। চৈত্যগুলি কোনটি ছোট, কোনটি বড। সাবি বাঁধিযা চলিযাছে।

উপবে উঠিবাব যে সিঁডিব কথা বলিলাম, সে সিঁডি দেখিলে মনে হয বুঝি এইমাত্র স্থপতি তাহাব কাজ শেষ কবিযা বিশ্রাম কবিতে গিযাছে। এতটুকু নষ্ট হয নাই। কি চমৎকাব তার গঠন-নৈপুণ্য। এই সব স্তূপ ও চৈত্য ছোট ছোট ইটেব তৈবী। তাবপর দেখা যায যে অনেক কিছু পবিবর্ত্তনই ইহাদেব উপব দিযা চলিযা গিযাছে।

চৈত্য এবং মানসিব হেতু উৎসর্গীকৃত স্তূপ—নালন্দা

স্তূপের গাযে অনেক কিছু দেখিবাব আছে। হিন্দুদেব দেবীব মূর্ত্তিও কযেকটি স্তূপেব নীচে দেখিলাম। ইহা হইতেই বুঝিতে পাবা যায বৌদ্ধদেব পর হিন্দুনবপতিদেব প্রভাব যে নালন্দায ছিল তাহাই বুঝিতে পাবা যাইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয যেখানে ছিল, ছাত্রাবাস যেখানে ছিল, সেই সব শ্রেণীবদ্ধ বাডীগুলি ভগ্নাবস্থায দাঁডাইযা আছে। কোনটিব দুইটি তলা, কোনটির তিনটি বা কোনটিব একটি তল দাঁড়াইযা আছে। ছোট ছোট কুঠুবিগুলি, কুলুঙ্গিগুলি, স্থানে স্থানে অগ্নিদাহেব চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায। কোথাও পুঁথি রাখিবার ও প্রদীপ জ্বালিবাব কুলুঙ্গিটি, জলপাত্র সকলেরই চিহ্ন পডিযা আছে। যেখানে দেবতা থাকিতেন, যেখানে বসিয়া অধ্যাপক অধ্যাপনা কবিতেন; যেখানে ছাত্রেবা স্তোত্র গান
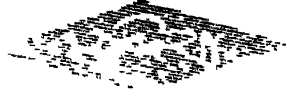
করিতেন, অধ্যাপককে ঘিরিয়া বসিয়া বিতর্ক ও আলোচনা করিতেন, সেই সব স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমাদের পরিদর্শক বলিল, বড়গাঁ গ্রামের নীচে আরও অনেককিছু বাড়ীঘর আছে—ক্রমে ক্রমে সে সব খনন করা হইবে।

একটি প্রাচীর ঘেরা স্থানে বটগাছের তলায় বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি। কৃষ্ণবর্ণের কাষ্ঠপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রা—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি বিরাট। গ্রামবাসীরা এই বুদ্ধমূর্ত্তিটিকে এতদিন কালভৈরবের মূর্ত্তিরূপে পূজা করিত ও জল চড়াইত, এখনও এখানে তাহাদের অবাধগতি।

অল্প একটু দূরে নূতন খুঁড়িয়া একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাটির একটি বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি মাথার দিকের অংশটা ভগ্ন। তাহার এক পাশে চিত্রের চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। পরিদর্শক বলিলেন—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শীঘ্রই এই চিত্রগুলি প্রকটিত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে, বোধ হয় এতদিনে তাহা হইয়াছে। আমরা সেই চিত্রগুলির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় পরিস্থিতি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত

ইউরোপ সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতির দিকে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর আলোচনা চুক্তি ইউরোপের জটিল সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। তবে অস্পষ্টতার মধ্যে যেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা' হচ্ছে এই যে, পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিরূপিত হয়ে গেল। পোল্যাণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র শক্তি অন্য কোন শক্তির সক্রিয় সহায়তা ছাড়া কিছুতেই ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তার জার্ম্মানীকে বাধা দিতে হবে। পোল-জার্ম্মান সীমান্ত সুরক্ষিত থাকায় পশ্চিম সীমান্তে সে জার্ম্মানীকে অন্ততঃ কিছুদিন বাধা দিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু জার্ম্মানীর সদ্য-লব্ধ রাজ্য চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে দক্ষিণ দিকের আক্রমণই তার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক হবে। সে আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে পোল্যাণ্ডের পক্ষে মিত্রশক্তিদের সামরিক ও অস্ত্রসম্ভার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে পোলিশ সীমান্তে সৈন্য ও রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই একমাত্র কার্য্যকরী সহায়তা সে পেতে পারে রাশিয়ার কাছে। তাই দেখা গেল ফ্যাসিষ্ট অগ্রসর নীতির বিরোধী শক্তি হিসাবে রাশিয়া অপরিহার্য্য। তাই গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টায় মনোযোগী হ'ল।

এদিকে জার্ম্মানীর পূর্ব্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে বলশেভিকদের প্রবলতম শত্রু একেবারে রাশিয়ার দরজায় এসে হানা দেবার উপক্রম করেছে। বিশেষ ক'রে পোলাণ্ড অধিকার রাশিয়াকে জার্ম্মানীর নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবে। এ অবস্থায় জার্ম্মানীর পোল্যাণ্ড বিজয় রাশিয়ার পক্ষেই হ'বে সবচেয়ে মারাত্মক, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল জার্ম্মান-বিরোধী চুক্তিতে রাশিয়াকে পাওয়াত গেলই না বরং রাশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। এমন কি পোল্যাণ্ড বিজয়েও রাশিয়া নীরব সম্মতি জানাল। রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচক হয়েও নিজেই সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যজয় অভিযান সুরু করল—এমন ইঙ্গিত কোন কোন জায়গা থেকে এল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা যারা একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন তাদের পক্ষে প্রকৃত অবস্থা বোঝা শক্ত নয়।

দীর্ঘ দিনব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী-রাশিয়া মৈত্রী আলোচনার ফলে রাশিয়া নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল যে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ, ফরাসী এমন কি পোল্যাণ্ডও রাশিয়ার 'লাল-ফৌজের' সাহায্যে জার্ম্মানীকে বাধা দিতে আগ্রহান্বিত নয়। ইংরাজ ও ফরাসী প্রতিনিধিদের উত্তরে Marshal Voroshilov জানালেন যে, রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে সর্ব্বপ্রকার সৈন্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে এই সর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব পোল্যাণ্ড রাশিয়ানদের সৈন্যসমাবেশ করবার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রস্তাবের অন্তরালে প্রকারান্তরে পোলাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্ত রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে. এমন কি যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরেও এই প্রদেশ থেকে রাশিয়ান সৈন্য অপসারিত করা হ'বে না—এই ধরণের একটি অভিসন্ধি রাশিয়ার আছে বলে অনেকে দোষারোপ করেছেন। এই মতভেদের জন্যই সোভিয়েট মৈত্রী আলোচনার অবসান হ'ল। কিন্তু রণকৌশলের দিক থেকে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা না হ'লে সোভিয়েট বাহিনীর কোনও সাহায্য পাবার আগেই পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীর করায়ত্ত হবে, তখন পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ও রণসম্ভার জার্ম্মানীর হস্তগত হওয়ায় সে অধিকতর শক্তিশালী হবে। দ্বিতীয়তঃ পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হ'বার যুদ্ধ সংঘটিত হবে রাশিয়ার সীমান্তে, এ অনুরোধ শুধু অসঙ্গত নয়, অন্যায়ও। রাশিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে জার্ম্মান-ইটালীর সম্মিলিত শক্তি এমন কি পূর্ব্ব সীমান্তে জাপানের আক্রমণ সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর গ্রাস থেকে রক্ষা করা মোটেই অসম্ভব ছিল না।

ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির 'বলশেভিক' বিরোধী মনোভাব রাশিয়ার কাছে অজানা নয়। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের যে জার্ম্মানীর রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারণে বিশেষ আপত্তি নেই, তাও জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের সময় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে পোল্যাণ্ড ব্যাপারে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নিজ স্বার্থের সংযোগ আছে—তা ছাড়া চেক্ ও অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সাধারণের চক্ষে অতি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই রাশিয়া আশা করেছিল অন্ততঃ পোল্যাণ্ডের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রী শক্তিগুলির সম্মিলিত ভাবে হিটলারকে বাধা দেওয়া হয়তো বা অসম্ভব না ও হ'তে পারে। কিন্তু অনতিবিলম্বে রাশিয়া বুঝতে

পারল যে, কেবল মাত্র রাশিয়ার মিতালীর সুযোগ নিয়ে হিটলারকে নিজেদের সুবিধামত একটা রফায় রাজী ক'রে পোল্যাণ্ডে মিউনিক নাটকেরই অভিনয় হতে পারে। রাশিয়া এ ব্যাপার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাই শ্রেয় মনে করল। দীর্ঘদিনব্যাপী মৈত্রী আলোচনার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মনোভাবে সুস্পষ্ট বোঝা গেল যে ডানজিগের ভাগ্য নিরূপিত হয়ে গেছে। এই শেষ মুহূর্ত্তে বিশ্বাসভঙ্গ ব্যাপারে অপরের সাথে নিজেকে জড়িত করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় রাশিয়া কোনও শক্তির ক্রীড়নক না হয়ে পূর্ব্ব ইউরোপ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করল। রাশিয়া স্পষ্টই বুঝতে পারল পোল্যাণ্ড রক্ষার একমাত্র কার্য্যকরী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। সে জানত যে অনন্যোপায় হয়ে শেষ মুহূর্ত্তেও যদি পোল্যাণ্ড তার প্রস্তাবে রাজি হয় তবে হয়তো তাকে রক্ষা করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে এও জানতো ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যখন বুঝবে যে হিটলারের সামরিক পরাভবের ফলে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন তারা কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকবে না। একদিকে বলশেভিক রক্ষণকর্ত্তা অপরদিকে আসন্ন-বিপ্লব জার্ম্মানীর মধ্যবর্ত্তী পোল্যাণ্ডও কিছুতেই বিপ্লবের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। জার্ম্মানীর মিত্র ইটালীর অবস্থাও অনুরূপ হ'তে বাধ্য হ'বে। সমগ্র পূর্ব্ব ইউরোপেই যদি এইরূপে বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে আরম্ভ হয় তবে ইউরোপের সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই টলটলায়মান হয়ে উঠবে। সুতরাং যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ড রক্ষা করবার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করল না—তারা একা রাশিয়াকেও সে সুযোগ দেবে না। একথা জেনে এবং গণতন্ত্রী শক্তিগুলির আন্তরিকতা শূন্য ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে রাশিয়া এ ব্যাপারে জড়িত থাকা অবাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করল। রাশিয়াকে ভবিষ্যতে কোনও দিন না কোনও দিন সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই যতদিন সম্ভব শান্তি অব্যাহত রাখবার চেষ্টা সে করবে তা সহজেই বোঝা যায়। সেই অশুভ দিন যত দেরীতে আসে তার পক্ষে ততই মঙ্গল, কারণ সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসারের ফলে বর্ত্তমানে সময়ই নিজে থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিষ্টবাদীদের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েটের পক্ষে কাজ করছে। তা ছাড়া কেবল মাত্র ড্যানজিগের জন্যই একটা বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ড্যানজিগ রক্ষা করা দরকার এই জন্যই যে ড্যানজিগ দখল পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু পোল্যাণ্ড রাশিয়ার সাহায্যে নিজ-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় না। কাজেই তাকে রক্ষা করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পোল্যাণ্ড নাৎসী অধিকারে আসা রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই বিপদের বহুলাংশে উপশম হয় যদি জার্ম্মানীর সাথে বর্ত্তমানে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবার মত কিছু করা থেকে বিরত হওয়া যায়।

এ সুযোগ অবিলম্বে এল জার্ম্মানীর কাছ থেকে। হিটলার জানত যে রাশিয়াকে বিরোধী ক'রে মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে যুদ্ধে নামা যুক্তিযুক্ত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট মৈত্রী আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয়েছিল ততদিন হিটলারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট

মৈত্রী আলোচনা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হিটলার সোভিয়েটের নিকট অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করে পাঠাল। রাশিয়া মস্কো প্রহসনের তাৎপর্য্য ততদিনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। বিক্ষুব্ধ নাৎসী প্রতিবেশী অপেক্ষা চুক্তিবদ্ধ জার্ম্মানী অনেকাংশে নিরাপদ। রাশিয়া হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল।

জার্ম্মানী যদি এখন পোল্যাণ্ড গ্রাস করে, তবে তার দায়িত্ব রাশিয়ার নয়—রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানীর হাতে তুলে দেয় নি।

বৃটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে জার্ম্মানী-রাশিয়ায় নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেবার এক গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রকৃতই যদি হিটলার এরকম কোনও প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে থাকে তবে প্রকারান্তরে সে "রক্ত-বাহিনীর" শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছে। জার্ম্মান-জনগণের কাছে প্রকৃত ঘটনা বেশী দিন গোপন রাখা চলবেনা যে,রাশিয়ার তুষ্টি হিটলারকে বেশ চড়া দামেই কিনতে হ'য়েছে। এই ঘটনা জার্ম্মান জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিস্তার করবে তা হিটলারের অনুকূল মোটেই নয়।

রোমন্থন

বা

প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

মনটা বড়ই মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। একে সুখী রাখিতে জন্মাবধি প্রাণান্ত খাটিয়া আসিতেছি কিন্তু কিছুতেই মনের ধাতটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কতবার যে এ সোনার হরিণের পিছনে ছুটিয়া চঞ্চল হইয়াছে, আবার কতবার যে অভিশপ্তা অহল্যাপাষাণীর মত জড় স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তার সংখ্যা রাখি নাই, রাখা সম্ভব নয় বলিয়াই। কখন কিসে যে এর আনন্দ ও উৎসাহ হইবে বা কিসে যে দুঃখ পাইয়া এ ম্রিয়মান ও মুহ্যমান হইবে, এতদিনেও তা পূর্ব্বাহ্নে টের পাইতে পারিলাম না। এমন মনকে নিয়া ঘর করিতে করিতে সত্যই মাঝে মাঝে ধৈর্য্য হারাইতে হয়। উপায় থাকিলে প্রাণ-বৃক্ষের গাত্র হইতে অনাবশ্যক পরগাছার মত মনকে কোনদিনে শিকড়শুদ্ধ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতাম এবং জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।

মন মুখ ভার করিয়া আছে। অথচ যতদূর জানি এজন্য আমার নিজের কোন দোষ নাই। বাংলাদেশে পূজা প্রচলনও আমি করি নাই, কিম্বা পূজায় কলিকাতা খালি করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িবার পরামর্শও আমার দেওয়া নয়। যত সব লোক কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তাদের আমি চিনিওনা, জানিওনা। তারা থাকিয়া যে আমার কি ইষ্ট সাধন করিত, তাও আমার জানা নাই। অথচ পূজায় কলিকাতা ছাড়িয়া তারা দলে দলে চলিয়া গেলে মন আমার দুঃখী হইয়া উঠিতে কোন বাধা করিল না। এওতো আমি বলিয়াছিলাম যে, ইচ্ছা হইলে টিকিট কিনিয়া এই স্রোতের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পার, শেওলার মত ভাসাইয়া নিবে, কিন্তু ঠিক ঘাটে গিয়াই ঠেকিবে—গ্রামে কয়দিন কাটাইয়া আবার উল্টাস্রোতে বেশ ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তখন কিন্তু মন রাজী হয় নাই।

ছত্রপতির কথা মনে পড়িল। দুঃসময়ে যাকে মনে পড়ে সে-ই নাকি আসল বন্ধু। দুর্ভিক্ষের সময় যে-কাছে থাকে, অন্নের অংশে ভাগ বসাইতে নয়, নিজের অন্নে অংশীদার করিতে, বিষ্ণু শর্ম্মা তাকেও বান্ধব বলিয়াছেন। এতবড় কলিকাতাতে যখন মানুষের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন সকল মানুষের সঙ্গ ও সান্নিধ্য নিজের মধ্যে গোলাজাত করিয়া লইয়া ছত্রপতি আমার মত দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধমৃতদের আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

আমার সুনাম যাদের সহ্য হয়না, তারা যে এই আকর্ষণের চৌম্বক-কেন্দ্র অন্যত্র আবিষ্কার করিয়া থাকে, তা আমি জানি। স্বীকার করিতে কোন কুণ্ঠাই নাই যে, ছত্রপতির বয়স্থা শিক্ষিতা একটী বোন আছে, তার সঙ্গেও আমি আলাপাদি করিয়া থাকি। সে শিক্ষিতা ও সুন্দরী, কিন্তু তার

এ দুটো সৌভাগ্যের জন্য আমাকে দোষী করা চলেনা। পৃথিবীতে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অসংখ্য কুৎসিত ও অশিক্ষিতা মেয়েমানুষ রহিয়াছে এবং হলপ্ করিয়া বলিতে পারি যে পৃথিবীতে সুন্দরী মেয়েমানুষ-গুলিকে পাঠাইবার জন্য জীবনে আমি কোনদিন কারু কাছে কোন আবেদন নিবেদন জানাই নাই। আদিপিতা আদম ইভ্‌কে সৃষ্টি করিয়া যে ভুল করিয়াছেন, বংশানুক্রমে এতদিন পরে আমার উপর তার যেটুকু দায়িত্ব বর্ত্তায় একমাত্র সেটুকুই শুধু স্বীকার করিতে রাজী আছি। ইহা শুধু নামেই দায়িত্ব, আসলে এর কোন দায় নাই, কারণ কোটি কোটি বৎসরের বহু বণ্টনে ব্যয় হইয়া বহু পূর্ব্বেই এ প্রথম পাপ একপ্রকার লোপ পাইয়া গিয়াছে, আমাদের রক্ত কাজেই এতদিনে শুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, ছত্রপতির যে একটী বোন আছে, এতথ্য আমার জ্ঞানে জায়গা নেওয়ায় আমি নিজেকে মোটেই বিপদগ্রস্ত মনে করিনা—জ্ঞানবৃক্ষের ফলগুলি বহু চাষে আমরা দোষমুক্ত করিয়া উপাদেয় ভক্ষ্য করিয়া লইয়াছি।

পর্দ্দা ঠেলিয়া ছত্রপতির কক্ষে ঢুকিলাম। ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া ছিল। পায়ের শব্দে চোখ মেলিল, চশমার পুরু পাথরটা ভেদ করিয়া দৃষ্টিটাকে সামনে আগাইয়া আনিয়া একটী পদার্থে বাধা পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করিল যে, সে পদার্থ টী আমি, তার জনৈক বন্ধু। উৎসাহের সঙ্গে সোজা হইয়া বসিল। মুখে তার আলো জ্বলিল, বুঝিলাম সত্যই খুসী হইয়াছে।

মুখে শুধু বলিল, বস। দেশে যাওনি? বলিয়া একটা চুরুট নিজে লইয়া বাক্সটা আমার দিকে আগাইয়া দিল।

কহিলাম,—না, আর যাওয়া হয়নি। কি করছিলে?

—ডেকচেয়ারে শুয়ে রোমন্থন করছিলাম।

—রোমন্থন। মানুষের নাকি সে শক্তি নেই? শুনেছি, ওটা পশুদেরই কেবল একচেটিয়া ব্যাপার।

ছত্রপতি উত্তর করিল,—ভুল শুনেছ। গবাদি পশুর ন্যায় মানুষও রোমন্থন করে, তবে জীব হিসাবে উচ্চস্তরের বলে তার গিলিত চর্ব্বণও একটু উচ্চধরনের। পশু থেকে মানুষ এগিয়ে গেছে, তাই তার এ function টা developed হয়েছে খুব বেশী।

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝতে পারলাম না, বুঝিয়ে বল একটু।

—বল্‌ছি। পশুরা স্থূলখাদ্য পেটভরে জমা করে রাখে, তারপর অবসরমত রোমন্থন করে। আমরা পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগৎ থেকে শব্দ স্পর্শ রূপ ইত্যাদি সাধ্যমত নিয়ে থাকি, তা সমস্তই গিয়েই স্মৃতির ঘরে জমা হতে থাকে। পরে স্মৃতি থেকে চিন্তার সাহায্যে সেগুলোকে উদ্ধার করে রোমন্থন চলে, অসার আবর্জ্জনার অংশ বেরিয়ে যায়, সার অংশটুকু মনে সংক্রামিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্মৃতিকে এই ভাবে যে যত আবর্জ্জনা মুক্ত করে, ততই সে চিন্তানায়ক ও শক্তিমান হয়। দুটো মানুষের মধ্যে যদি সত্যিকার তফাৎ কি জানতে চাও, তবে এইখানেই খোঁজ নেবে, যার স্মৃতি যত সংস্কারমুক্ত সে তত উঁচু শ্রেণীর মানুষ। মানুষ বলতে একটা species

বুঝায় বটে, যেমন তৃণ বলতে দূর্ব্বা ও বাঁশ সকল কিছুকেই বুঝায়। অসংখ্য শ্রেণীভেদ রয়েছে মানুষ জাতির মধ্যে। evolution process মানুষে এসে থেমে যায়নি, সেটা অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই মানুষের রাজ্যে এত স্তরভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

ছত্রপতি একটু থামিয়া আবার বলিল,—দেখ, তুমি আসবার কিছু আগেই একটা নূতন fact জানতে পারলাম।

চা ও খাবার নিয়া একটী তরুণী ঘরে ঢুকিল, ছত্রপতির বোন,—চৌম্বকশক্তির আকর্ষণ কেন্দ্র, আমার বিরুদ্ধ দলের মতে। টেবিলের উপর খাবার সাজাইয়া রাখিতে লাগিল, একটু বিশেষ সাজ-সজ্জা করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। ছত্রপতি জিজ্ঞাসা করিল,—কোথাও যাচ্ছিস নাকি ?

—ঠাকুর দেখতে যাবো। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—ফিরে না আসা পর্য্যন্ত চলে যান না যেন, অনেক কথা আছে, বুঝলেন ?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম।

– নিন, খেয়ে নিন। দাদা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খেয়ে নিয়ে গল্প কর। বলিয়া বাহির হইয়া গেল। খাবার খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারপর, তোমার নূতন fact কি বলছিলে ?

—খাবারটা খেয়ে নাও।

—খেতে খেতে বল।

—আগে একটু শান্ত হয়ে নাও। আয়নায়ও ছায়া পড়ে, মানুষের মনেও ছায়া পড়ে। কিন্তু আয়নার সঙ্গে মানুষের মনের সামান্য একটু তফাৎ আছে। আয়নার সমুখ থেকে কায়া সরে গেলে ছায়াও সঙ্গে যায়। কিন্তু মনের বেলা তা হয় না, কায়া সরে গেলেও ছায়াটাকে রেখে যায়। ঐ ছায়াটাই একসময়ে ঢেউয়ের মত শান্ত হয়ে মনে মিলিয়ে যায় এবং সংস্কার হয়ে টিকে থাকে। তোমার মনের আয়নার ছায়াটা মিলিয়ে নিক,—বল্‌ছি। বলিয়া চায়ে চুমুক দিল।

বক্তব্যের ভাষা যাহাই হউক, ইঙ্গিতটা অতি সরল। ছত্রপতিকে ভালোমানুষের মতই মনে হয় বটে, কিন্তু শয়তানীতে আসলে সে শয়তানের প্রায় সমান।

চা শেষ করিয়া ছত্রপতি সুরু করিল,—যেকথা বলছিলাম। আজ জানতে পারলাম যে, আমরা চিন্তাকে চালনা করি না, চিন্তাদ্বারা চালিত হই। ইচ্ছে হলেই তুমি চোখকে এদিক থেকে ওদিকে ফেরাতে পার, কিন্তু ইচ্ছে হলেই চিন্তাকে তুমি তেমন ভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে নিতে পারনা, কিম্বা এক বিষয়ে ধরে রাখতে পারনা। চিন্তার হালটার ঠিক জায়গায় হাত রাখিনে বলেই ইন্দ্রিয়জগতে আমরা এলোমেলো ভাবে ইতস্ততঃ অর্থহীন ঘুরে মরি,—অথচ এরকম হবার কোন আবশ্যক নাই।

—ইচ্ছা করলেই কি চিন্তার উপর দখল আনা যায় ? ধর, ইচ্ছা হলেওতো আমরা চিন্তা বন্ধ করতে কখনও পারিনে।

—পারি। ইচ্ছে হলে চোখ বন্ধ করতে পার, আর চিন্তা বন্ধ করতে পারবেনা কেন ?

—তা' যদি সম্ভব হত তবে মানুষ এমন করে দুশ্চিন্তা কুচিন্তার মার খেয়ে মরতনা।

—আর ভুল চিন্তার প্রলাপও বকত না। একটু চেষ্টা করে দেখ, চিন্তা, যুক্তি ইত্যাদির functionটাকে বেশ আয়ত্তে আনতে পারবে।

—অভ্যাসে অনেক কিছুই হয়, স্বীকার পাই, কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হয় তা মানতে পারব না।

—এটাকে তুমি আকাশ কুসুমের মত মনে করছ কেন? এযে অসম্ভব নয়, তার প্রমাণ যাদের genius বল তারা। চিন্তার ঠিক জায়গাটীতে যে কোন কারণেই হোক তাদের হাত গিয়ে পড়ে, তখনই তারা হয় প্রতিভাবান ও creative। অবশ্য চিন্তার এ level টায় তারা unconsciously যায়। ওটাকে যদি তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের মত সহজ ও স্বাভাবিক করে নিতে শিখত, তবে তাদের খুঁটিনাটি কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম যাবতীয় ব্যাপারই creative হত এবং তাদের শক্তির উৎস কখনও শুকিয়ে যেতনা বা তাতে ভাঁটি পড়ত না। শক্তির যে কেন্দ্রটিতে প্রতিভাবানরা অজ্ঞাতসারে যুক্ত হয়, সেখানে সকল সময়ের জন্যই সচেতন সংযোগ রাখা সকলেরই সম্ভব,—তবে একটু পরিশ্রম ও চেষ্টা অবশ্য দরকার।

—প্রতিভাবানরাই যেখানে unconsciously যায়, সেখানে সাধারণ ব্যক্তিরাও চেষ্টার জোরে যেতে পারে,—এযেন কেমন ঠেকছে।

—তুমি factটাকে আমার মত দেখতে পাওনি, তাই তোমার সন্দেহ লাগছে। geniusরা জাগ্রত অবস্থাতেই সেখানে সহজে উঠে যায়, যাওযার ব্যাপারটা যদিও unconsciously ঘটে। আর সাধারণ লোকেরাও সেখানে যায়, কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতে যেতে পারে না, পারলেও ক্বচিৎ কদাচিৎ, তাও একটী ক্ষণের জন্য মাত্র।

—সাধারণ লোকেরাও geniusদের স্তরে যায়, বল কি?

—যায়, তবে স্বপ্নের রাস্তা ধরে। নিজেই জান, যখন তুমি স্বপ্নে আমার বোনকে দেখ, তখন সে তোমার কাছে রক্তমাংসের reality নিয়েই আসে, ইচ্ছে হলে তাকে তুমি ছুঁতে পার, তার সঙ্গে কথা বলতে পার, সেও তার স্বভাবানুযায়ী কথাবার্ত্তা বলে, চলে বেড়ায়, তোমাকে রক্তমাংসের হাতেই স্পর্শ করে, তোমার কোন সন্দেহ থাকে না যে এ রক্তমাংসের মেয়ে নয়। অথচ স্বপ্নের মেয়েটি আসলে তোমরাই চিন্তার সমষ্টি মাত্র। এখন ভেবে দেখ, চিন্তাকে এমন জায়গায় আয়ত্ত করা যায়, তখন চিন্তাতে রূপরসস্পর্শ ইত্যাদি পাঁচটি গুণধর্ম্মই দেখা যায়। যা তুমি নিত্য বহির্জগতের রিয়ালিটিতে দেখতে পাও।

চুরুট টানিতে টানিতে বলিলাম,—ভাবিয়ে তুল্লে দেখছি।

ভাব্‌বার কিছু নেই। এখন এই factটা স্বীকার কর যে, চিন্তাকে চালনা করতে জানলে তা বাইরের রিয়ালিটির মতই solid রূপ পায়, জীবন্ত হয়ে উঠে। লক্ষ্য করে থাকবে, পরিষ্কার চিন্তা যার, তার কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় যে, সে যেন ভিতরে কিছু দেখছে এবং তারই সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভাষায় কপি করছে, ফটো নিচ্ছে, রঙ্গে এঁকে তুলছে।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ছত্রপতি আবার সুরু করিল। কহিল,—এ থেকে আর একটা তথ্যও পাওয়া যায়। যাকে matter বল, রিয়ালিটি বল, তা যে ধাতুতে তৈরী চিন্তাও সে একই ধাতুতে তৈরী। বিশেষ একটা porcessএর মধ্য দিয়ে গেলে চিন্তাই দানা বেঁধে একসময়ে matter হয়ে উঠে।

—তোমার একথা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার পাবেনা।

—তা পাবেনা। বৈজ্ঞানিক হলেও তারা মানুষ এবং মানুষের বুদ্ধি মুক্ত নয়। কাজেই বুদ্ধি থাকলেও বুদ্ধির 'পর বৈজ্ঞানিকদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এজন্যইত চিন্তারই রূপান্তর বা অবস্থান্তর matter একথা মানতে বৈজ্ঞানিকের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে বাধে। যাক, geniusদের মত আর যে বস্তুটি দুর্ব্বোধ্য যার explanation চলে না, সে হল personality—ব্যক্তিত্ব। একই প্রণালীতে এদুটোকে বুঝতে পারবে।

—তুমি কি বলতে চাও যে, genius ও personality একই বস্তু ?

—হাঁ, তাই বলতে চাই। একই বস্তু দুজায়গায় দু রূপ নিয়েছে, তফাৎটা শুধু বাইরের রূপের।

আমি আপত্তি করিলাম,—এমনই তো প্রায় দেখা যায় যে, বড় genius, অথচ ব্যক্তিত্ব মোটেই নাই। আবার বড় personality, কিন্তু জিনীয়স নয়।

ছত্রপতি উত্তর দিল,—এ তোমাদের দেওয়া সংজ্ঞা ও নামের বিভাগ। এ দুইয়ের পার্থক্য শুধু এই যে, প্রতিভাবানদের বেলা চিন্তার বিশেষ স্তর খুলে যায়, আর personalityর ক্ষেত্রে শক্তিটা চিন্তার বিশেষ স্তর না খুলে চরিত্রের সারা কাঠামোটায় ছড়িয়ে পড়ে।

এজন্যই একজনের দেখা যায়—creative power, সৃজনশক্তি, অপরের দেখা যায়—will power, ইচ্ছাশক্তি। একদিকে হোল আইনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথের দল, অন্যদিকে হোল নেপোলিয়ন হিটলারের দল। সমাজ ও সভ্যতার সত্যিকার progressএর জন্য এরাই দায়ী ও অধিকারী।

—তোমার এ মতবাদ আধুনিক সমাজ গ্রহণ করবে না।

—কেন করবে না ? আমি তো বলছি যে, সকলেই এদুটোর একটা হতে পারে। geniu ও personality জন্মের উপর নির্ভর করবেনা, ওটা কমবেশী সবাই হতে পারবে নিজ নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রমে।

—তুমিতো ভরসা দিচ্ছ, এখন উপায়টা কি বল ? কোন পথে কি ভাবে চেষ্টা করা চলতে পারে এজন্য ?

—উপায়টা ঠিক পরিষ্কার বলতে পারব না, আরও কয়েক দিন ভাবতে হবে। যার মধ্যে কর্ম্মশক্তি বেশী, মানে রজোগুণী ব্যক্তিদের সহজ হবে personality গড়ে তোলা, আর যারা ভাবতে বুঝতে পারে, মানে সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের সহজ হবে genius হওয়া—temperament বুঝে চেষ্টা করতে হবে যদি ফল পেতে চাও।

—তাতো বুঝলাম, কিন্তু উপায়টি কি তাই বলনা।

—সাধারণ ভাবে বলছি, details এখন দিতে পারব না। যে কেন্দ্রে চিন্তা ইচ্ছা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, সে কেন্দ্রটীর উপর অধিকার লাভ করতে হবে। সেখানে যেতে হবে সজ্ঞানে, তবেই কেন্দ্রটিতে থেকে ওগুলোকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করতে পারবে। এই গোটা শরীরটাই একটা মেশিন, অবশ্য তার স্থূল সূক্ষ্ম নিজস্ব নিয়মকানুন অনেক আছে যা মেনে সে চলে। এই মেশিনের steering wheelটা highest ও deepest centreএ থাকে, এ হালটাকে হাতের মুঠোয় পেতে হবে—লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এটুকুই এখানে বলা হোল।

—লক্ষ্যের কথাতো আগেও বলেছ এখন উপায়ের কথাটা বল দেখি।

—উপায় সম্বন্ধেই বলছি। তার আগে একটা কথা মনে রাখতে বলি যে, এই মেশিনের সামান্যতম কাজটি পর্য্যন্ত, শরীরও মন দুয়েরই, নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে একটি কেন্দ্র হতে। এখন, শরীর ও মনের যে কোন কাজ ধরে উজান মুখে যদি যেতে চেষ্টা কর, তবে এক সময়ে ঠিক উৎস-কেন্দ্রটিতে পৌঁছে যাবে। ধর শারীরিক কাজ, এই যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। খোঁজ নেও দেখবে একটা কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে, তার আকর্ষণে বাইরের বাতাস ভিতরে আসে, আবার তারই বিকর্ষণে ভিতরের বাতাস বাইরে যায়। ওখানটায় মনোসংযোগ করলে কেন্দ্রটি বা শক্তিস্থানটি আয়ত্তে আসবে, ফলে প্রাণের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হবে। এর পরের কাজ হচ্ছে, প্রাণের কেন্দ্র অনুসন্ধান করা, সেটা পেলেই দেখতে পাবে যে, অসীম প্রাণ বা universal life এর সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। প্রাণ-প্রবাহের উজান ঠেলে সেখানে যাতায়াত যদি তোমার সহজ হয়, তবে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও পরিমিত প্রাণের সীমা তুমি পার হয়ে গেলে। কাজেই—sex, hunger, self preservation ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিয়মের অত্যাচার থেকে তুমি রেহাই পেলে, কারণ ওগুলি খণ্ড প্রাণের ত্রুটি মাত্র। এই ভাবে তখন তুমি পরিমিত প্রাণের মধ্যেই অমিতায়ু হওয়ার সঙ্কেত পাবে, সীমাবদ্ধ শক্তির মালিক হয়েও অসীম শক্তির উৎস থেকে চাহিদা ও প্রয়োজন মত শক্তি সরবরাহ করতে পারবে। ব্যক্তিত্ব বা দৃঢ় ইচ্ছার প্রতিবন্ধক যে সব বস্তু, যেমন ভয় দ্বিধা সঙ্কোচ ইত্যাদি, যা ক্ষুদ্র প্রাণের গায়েই জড়িয়ে উঠে, তা আর তোমার থাকবে না। শারীরিক পথ ধরে যাবার কথা বল্লাম, মনের পথ ধরে গেলেও ঠিক এই ভাবেই যেতে হবে এবং যাওয়া যায়।

—থাক, ভাই। আর দরকার নেই। এ কঠিন আলাপ যদি আর চালাও, তবে ঠিক আমার মাথা ধরা সুরু হবে। অন্য কোন কথা আরম্ভ কর।

—বেশ, আমিও হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বিষয়টা একটু কঠিন। বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বুঝাতে গিয়ে বড় বেগ পেতে হয়েছে। কেন জান ? যে জিনিষটাকে বুঝাতে চাই, বুঝাতে গেলেই তার সঙ্গে অলক্ষ্যে যোগ ছিন্ন হয়ে যায়, আবার যোগ প্রতিষ্ঠিত করে জিনিষটাকে দেখে নিতে গেলে বুঝাবার চেষ্টাটা নিষ্ক্রিয় হয়ে থেমে যায়,—একই সময়ে উজান ভাঁটি দুদিকে সাঁতার কাটার মত কঠিন ব্যাপার এ। কেন্দ্রে স্থির থাকা, আর পরিধিতে গতিমান থাকা—এদুটো একই সঙ্গে

সমানভাবে কেমন করে যে হয় তা জানি, কিন্তু আমি নিজে তা আয়ত্ত করতে পারিনি। যাক্ থামতে বলে বাঁচিয়েছ।

—অন্য কথা বল।

—কি কথা শুনতে চাও ?

—ধর রাজনীতির কথা, বড়লাটের ঘোষণা, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বত্যাগের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কথা। পরিস্থিতি সম্বন্ধে তোমার মত কি শুনি ?

—আমার কোন মত নেই। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি, 'আমি শ্রীমতী বুদ্ধের দাসী দ্বা হতে দ্বারে বৃথাই ফিরিছে,' বৃথাই ডেকে যাচ্ছে—'হোল যে প্রভুর পূজার সময়'। অপেক্ষা করে আছি, কবে দেখতে পাব, 'জাগে মহাবীর নয়ন মেলিয়া, জাগিছে সব্যসাচী'।—একটা চুরুট দাওতো। বলিয়া ছত্রপতি হাত বাড়াইল।*

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লেখকদের আহ্বান করছি।

মঃ সঃ

রোমন্থনের রোমন্থন

শ্রীসুপ্রসন্ন মজুমদার

শ্রীযুত অমলেন্দু দাশগুপ্তের "রোমন্থন" নামক আলোচনার ছাঁচে ঢালা প্রবন্ধটী দেখলাম। তাঁর মতে গবাদি পশুর ন্যায় মানুষও রোমন্থন করে, তবে জীব হিসাবে উচ্চ স্তরের বলে' তার গলিতচর্ব্বণও একটু উচ্চ ধরণের। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগৎ থেকে যা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির ঘরে জমা করে রাখি, পরে সেখান থেকে চিন্তার সাহায্যে সেগুলোকে উদ্ধার ক'রে রোমন্থন করি। এই প্রক্রিয়ার ফলে অসার আবর্জ্জনার অংশ বেরিয়ে যায়, সার অংশটুকু মনে সংক্রামিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, তিনি তাঁর স্মৃতির ঘর থেকে অনেক-কিছু রোমন্থন ক'রে অসার আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে যে সার অংশটুকু তাঁর মনে সংক্রামিত হয়েছিল, তাই প্রকাশ করেছেন এই লেখাতে। আমিও তাঁরই কথিত প্রক্রিয়া অনুসারে তাঁর "রোমন্থন" নামক প্রবন্ধের রোমন্থন করলাম।

প্রবন্ধটীর সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল বক্তব্য বিষয়টী ছোট, কিন্তু তাও আগাগোড়া লেখকের confusion of thoughts-এর পরিচয় দিচ্ছে। যুক্তিতর্ককে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন, confusionকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছেন ভাবপ্রবণ ভাষার ভিতর দিয়ে কতকগুলি dogmatic assertion দ্বারা। তিনি পাঠকের মন ভোলাতে চেয়েছেন, কিন্তু তার বিচারবুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করতে চাননি, তার intellect-এর প্রতি মর্য্যাদা দেখান নি।

তিনি বলেছেন—"Evolution process মানুষে এসে থেমে যায় নি।" ঠিক কথা। কিন্তু তার পরেই বলছেন—"সেটা অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।" অন্তর্মুখী শব্দটা খুব catching, বিশেষতঃ আমাদের দেশের লোকের কাছে। শব্দটা শুনলেই মনের মধ্যে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব জাগে, চোখবুজে থাকতে ইচ্ছে হয়, যুক্তিতর্কের দিকে মন এগোয় না, বিচার-বুদ্ধি অসাড় করে দেয়। এই কৌশলটী প্রয়োগ করেই তিনি থেমে গেছেন, ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু অন্তর্মুখী evolution বলতে তিনি কি বোঝেন তা সুস্পষ্ট করে বলেন নি।

Darwin-এর theory অনুসারে যে evolution process, তাতে অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে যাবার কোন কথা নেই,—বহির্মুখী development-এর ফলেই অন্তরের যে পরিণতি, মনের যে উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী সেই কথাই তাতে আছে। সে theoryর মূল ভিত্তি Geology, Embryology, the Physiology of plants and animals এবং organic chemistry—এগুলির মধ্যে অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে যাবার কোন বার্ত্তা মেলে না। Evolution process-এ মানুষ পরিবর্ত্তিত হয়ে অন্য এক নবতর, উন্নততর type-এর জীবে পরিণত হবে। তার সে পরিবর্ত্তন বাইরের, অর্থাৎ বহির্মুখী

হয়ে সে এগিয়ে যাবে—আর এই বাইরের পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফলেই তার মনোজগতেরও পরিবর্ত্তন ঘটবে, তার অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে যাবার ফলে তার বাইরের পরিবর্ত্তন ঘটবেনা, অথবা বাইরের কাঠামো অবিকল বজায় রেখে কেবলই অন্তর্মুখী হয়ে এগিয়ে চলবে তাও ঘটবেনা।

এই হচ্ছে Darwin-এর Evolution theoryর মর্ম্ম। অমলেন্দুবাবু যদি নতুন কোন Evolution theory বাতলাতে চান, অথবা Darwin-এর theoryর উপর কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে চান, তবে তাঁর আরও পরিষ্কার ক'রে, আরও বিশদ ক'রে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।

লেখক এক স্থানে বলছেন—"চিন্তার ঠিক জায়গাটীতে যে কোন কারণেই হোক্ genius-দের হাত গিয়ে পড়ে, তখনই তারা হয় প্রতিভাবান ও creative—অবশ্য চিন্তার ঐ levelটায় তারা unconsciously যায়।" কিন্তু কি কারণে genius-দের হাত গিয়ে চিন্তার ঠিক জায়গাটীতে পড়ে তা তিনি বললেন না, অন্যলোকের হাতই বা সেখানটায় পড়ে না কেন তাও ঠিক বোঝা গেল না। অন্যত্র তিনি বলছেন যে, সাধারণ ব্যক্তিরাও সেই স্তরে যেতে পারে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতে নয়, স্বপ্নের রাস্তা ধরে। আবার বলছেন—"চিন্তার হালটাকে হাতের মুঠায় পেতে হবে।" যারা unconsciously চিন্তার ঐ স্তরে যায় তাদের হাতের মুঠায় হালটা কেমন করে থাকবে তা ঠিক বোঝা গেল না—হাতের মুঠায় হাল রাখা তো একটা conscious effort, একটা সচেতন উদ্দেশ্যমূলক কাজ, unconscious গতি বা প্রগতির মধ্যে তার স্থান কোথায়? আর স্বপ্নের রাস্তা ধরে যারা চলবে তাদেরও হাতের মুঠায় হাল থাকবেই বা কেমন ক'রে—সে হালও কি স্বপ্নের হাল? মোটের উপর আত্মপ্রতিবাদশীল পরস্পরবিরোধী কথাবার্ত্তায় সবটা যেন কেমন গুলিয়ে গেছে।

মনে হয় তিনি genius-দের তাদের পারিপার্শ্বিক থেকে আলাদা ক'রে, isolate ক'রে দেখেন। কিন্তু মানুষ, প্রত্যেকটী মানুষ, তা সে যত বড় geniusই হোক্, সকলেই তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই গঠিত। প্রত্যেকটী physically normal মানুষ যা হয়ে ওঠে—তা সে geniusই হয়ে উঠুক—অথবা গড়-পড়তা মানুষই হয়ে উঠুক—তার মূলে রয়েছে যাকে ইংরেজীতে বলে upbringing. "Upbringing, that is the totality of the conditions of the life of an individual, forms man" প্রতিভাবানদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কথাটাকে তিনি কোথাও স্বীকার করেন নি।

তারপর genius কি করে হওয়া যায় personality কি করে গড়ে তুলতে হয় তার উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কবিত্বময় mystic ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টাকে আরও বেশী ধোঁয়াটে, আরও বেশী কুয়াশাচ্ছন্ন করেছেন। "শরীর ও মনের উৎস-কেন্দ্রটীতে পৌঁছান", "প্রাণের কেন্দ্র অনুসন্ধান করা," "অসীম প্রাণ বা universal life-এর সঙ্গে যোগ," "প্রাণ প্রবাহের উজান ঠেলে সেখানে যাতায়াত," "প্রাকৃতিক নিয়মের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া," "পরিমিত প্রাণের মধ্যেই অমিতায়ু হওয়া" ইত্যাদি কথাগুলি শুনতে বেশ, কিন্তু বোঝা যায় না কিছুই। মনে হয় যেন কোন অবাস্তব জগতে কতকগুলি phantoms-এর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। Philosoply এই

phantoms-এর নাম দিতে পারে, কিন্তু শুধু কোন নাম দিলেই তা জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসে না। কাজেই তাঁর এই mysticism-এর রাজ্যে ভাবের ফানুশ উড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ, কিন্তু তাতে genius হবার এবং personality গড়ে তুলবার উপায় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করতে পারলাম না।

অমলেন্দুবাবুর আর একটী dogmatic assertion—"বিশেষ একটা processএর মধ্য দিয়া গেলে চিন্তাই দানা বেঁধে এক সময় matter হয় ওঠে।" কথাটা বহু পুরাতন, বৈজ্ঞানিক যুগের আগের সিদ্ধান্ত। অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে আজকের দিনেও বহুলোকে আঁকড়ে ধরে আছেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে, ঠিক নৈষ্ঠিক orthodox সনাতনীদের মতো। এ মনোভাব অবৈজ্ঞানিক, বিচার-বুদ্ধিকে এ পঙ্গু করবার প্রচেষ্টা, মানুষের জ্ঞানের পরিধি যে বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে তাকে অস্বীকার করা, চোখ বুজে পড়ে থেকে গতিশীল জগতের বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা। তাই আলোচনার মধ্যে একজন যখন বললেন—"তোমার একথা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করবে না," তখন অন্যজন এই বলে বিচার-বিতর্কের পথ রোধ করে যবনিকা টানলেন—"চিন্তারই রূপান্তর বা অবস্থান্তর matter, এ কথা মানতে বৈজ্ঞানিকের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে বাধে।" বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি হ'ল সংস্কারাচ্ছন্ন। যাঁরা বিচার বিশ্লেষণ না করে কিছু গ্রহণ করেন না, যাঁরা পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, experiment না করে, তন্ন তন্ন ক'রে তলিয়ে না দেখে কোন সিদ্ধান্ত করেন না, তাঁদেরই বুদ্ধি হ'ল সংস্কারাচ্ছন্ন। আর যুক্তি দিয়ে convince করবার চেষ্টা না ক'রে শুধু dogmatic assertion যে অবৈজ্ঞানিকেরা করেন তাঁরাই হলেন সংস্কারমুক্ত।

দর্শন শাস্ত্রের basic প্রশ্ন এই matter ও mindকে নিয়ে। Mind আগে, না matter আগে? কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা রূপান্তরিত হয়েছে? Mind থেকে matter, না matter থেকে mind? এই material worldএর অস্তিত্ব কি চিরন্তন, না এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে absolute ideaর অস্তিত্ব এই জগতের বাইরে কোথাও ছিল এবং যার থেকে এই material worldএর সৃষ্টি হয়েছে?

Natural Science সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যখন ছিল অতি স্বল্প ও সীমাবদ্ধ তখন এই material worldএর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে idealist view—অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে absolute idea ছিল কোথাও না কোথাও এবং সেই ideaই রূপান্তরিত হয়ে matterএ পরিণত হয়েছে—মানুষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু Natural Scienceএর উৎকর্ষের ফলে, বিশেষ ক'রে প্রধান তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের (1. The discovery of the cell as the unit, out of the multiplication and differentiation of which all organisms arise and develop. 2 Theory of the transformation of energy 3. Theory of evolution) পরে এই idealist view অচল, irrational, বিজ্ঞানকে অস্বীকার না করে এ মত মেনে নেওয়া চলে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষ আজ জেনেছে—"Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter"

Materialism জিনিসটা কি, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি, তার ঐতিহাসিক background কি, এ সমস্ত ব্যাপার ভালো করে না জেনে বুঝেই অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন। শব্দটার উপরই অনেকের একটা philistine prejudice আছে। আমাদের বিশ্বাস অমলেন্দুবাবুর এই রকম philistine prejudice নেই। তাই তাঁকে আর একবার রোমন্থন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং তার ফলের জন্য উদগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

বর্তমান ভারতে নারীর কর্তব্য

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

বর্তমান ভারতে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে, বর্তমান ভারতের অবস্থার প্রশ্নই সর্ব প্রথম উঠবে। বর্তমান ভারতের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ এবং সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিকপ্রভৃতি দিক দিয়ে সমস্যা বহুল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এর ফলে জাতির আজ অভাব অভিযোগের অন্ত নেই, দুঃখ দুর্দশায় মুমূর্ষু হয়ে যেন তারা বেঁচে রয়েছে। এর মূলে ধন বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাই প্রধান কারণ, কেননা এই ব্যবস্থাই জাতিকে তার প্রকৃত অধিকার হতে বঞ্চিত করে। সুতরাং জাতির এই দুঃখ দুর্দশা, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, এই সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করাই আজকে নারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কেননা নারী শক্তির আধার, সৃজনীর মূল, কল্যাণের প্রতিমা, বিশ্বের দরবারে নারীর স্থান অন্যতম শীর্ষে। তবে এক্ষেত্রে সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার সুব্যবস্থা ব্যতিরেকে এ কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব হবে না, পরাধীনতা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করবে।

অতএব বর্তমান রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামই নারীর কর্তব্যের প্রথম সোপান হবে, যার দ্বারা ধন বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সুষ্ঠু ও যুক্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় জাতির অভাব অভিযোগ বিদূরিত হবে, দুঃখ দুর্দশা লাঘব হবে, প্রভূততম কল্যাণ সাধন হতে পারবে। সুতরাং আজকে নারীকে আপন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডির আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ থাক্‌লে চল্‌বে না, বাইরের জগতের ভার যুক্তির সাথে গ্রহণ ক'রে জাতিকে উন্নত করতে, দেশকে সমৃদ্ধ করতে, সমগ্র পৃথিবীর সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগ রেখে ভারতের মুক্তি সাধনায় আজ তাদের জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করতে হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, জাতীয় সংগ্রামে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করলে, নারীর কার্যপ্রণালী সহজ হবে, কার্য্যকরী হবে এবং জাতির সকল সমস্যার মীমাংসা সরল হতে পারবে সে বিষয় আমাদের দেখ্‌তে হবে।

একথা মতদ্বৈধ ব্যতিরেকে সত্য যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রে অথবা কোনও কিছুকে আশ্র না ক'রে কোনও কার্যপ্রণালী সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কেন্দ্র ক'রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসে যোগদান ক'রে, কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করাই, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোলাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সোপান হবে।

কংগ্রেসের পরিপুষ্টতাই জাতিকে বল দেবে, এবং কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুযায়ী জাতীয় সংগ্রামে নারীর কর্তব্য সহজ হবে, কাজ করবার পথ সরল হবে। কংগ্রেসই বর্তমান ভারতে নারীর কর্তব্য সম্পাদনের পথ প্রদর্শক হবে।

সঙ্ঘবদ্ধশক্তিতে গঠনমূলক কাজ করতে হবে, তারই প্রভাবে মার্জিত ও সুসংস্কৃতরূপে দেশ গঠন করতে হবে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চিন্তায়, জ্ঞানে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সুতরাং শিক্ষিতা মেয়েদের আজ আদর্শ জাতি গঠন করা গঠনমূলক কার্যের প্রথম সোপান হবে।

আমাদের দেশ কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় এখনও ছেয়ে রয়েছে। এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হতে জাতিকে মুক্ত করে নব আলোর উন্মেষে তাদের জাগ্রত করে তোলাই জাতি গঠনের উদ্দেশ্য। কুসংস্কার দেশ ও জাতির প্রধানতম বৈরী, উন্নতির মূলে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ পর্দা ও পণ এবং নারী বিক্রী প্রথা বর্তমানের অন্যতম প্রধান কুসংস্কার।

ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহের প্রচলন অত্যাধিক। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী হতে জানা যায় জন্মগ্রহণের পর হতে পাঁচ বৎসরের প্রতি হাজারে ত্রিশজন, পাঁচ হতে দশের ভেতরে প্রতি হাজারে ১৯৩ জন এবং দশ হতে পনেরো বৎসরের ভিতর প্রতি হাজারে ৩৮১ জন বালিকা বিবাহিতা হয়। এর ফলে নারী জাতি ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়, তাদের অকাল মাতৃত্ব রুগ্নজননী ও রুগ্ন শিশুতে দেশ ছেয়ে যায়, শিশু মৃত্যুর হার বেড়েই চলে, বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ প্রসূতির অকাল মৃত্যু হয়। অকাল বৈধব্যের বিপুল নারী সংখ্যা, বাল্যবিবাহ যে দেশের কি ক্ষতির সেই কথাই প্রমাণ করে। জাতির উন্নতি এবং সঙ্ঘবদ্ধশক্তি অর্জনের মূলে জাতিভেদ প্র প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। কেননা এই প্রথা জাতিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে, সম্প্রদ উপসম্প্রদায় গড়ে তুলে জাতিকে ক্ষুদ্র গণ্ডির সঙ্কীর্ণতম আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ করে। সমা ব্যবস্থায় যে জাতি উচ্চবর্ণের দৃষ্টি ও স্পর্শের বহির্ভূত সেই নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ও নমঃশূ প্রভৃতি জাতির সঙ্ঘবদ্ধ সহায়তা ব্যতিরেকে কোনও উদ্দেশ্যই সাফল্য অর্জন করতে পারে ন শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রায় বলেছেন, "জাতীয় আন্দোলন হোক্, বা যে কোনও প্রগতিশীল আন্দোল হোক্, যখন ডাক আসে তখন যদি অত্যাচারিত অবহেলিত অস্পৃশ্যগণ উচ্চবর্ণের পাশে এসে

দাঁড়ায়, তবে তাদের দোষ দিতে পারা যায় না। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যারা দেবপূজা করতে পারে না, তারা কি করে একতাবদ্ধ হয়ে দেশপূজা করতে পারবে ?" সুতরাং এই কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত জাতি উন্নত হতে পারে না। জাপানে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, ওদের দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাস করলেও জাতিভেদ প্রথা নেই বলে।

পর্দা প্রথার প্রভাবে ভারতীয় সমাজের এক প্রান্ত ভাঙ্গন ধরা থাকেই, কেননা এই কুসংস্কারে, আলো বাতাসের অভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্য হয় পঙ্গু, সৌন্দর্য্য হয় ম্লান, চিন্তাশক্তি স্ফুরিত হতে পারে না। ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও তরল মেধার মেয়েদের কাছে কেউ কখনও বলিষ্ঠ সুস্থ এবং তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের সন্তান আশা করতে পারে না। এবং এই পর্দা প্রথায় নারী বাহিরের বিশাল জগতের পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়, বাইরের জগতের সাথে যোগসূত্র রাখতে সমর্থ হয় না, শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের পথে বাধা জন্মে। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অর্জনের মূলে এই মেয়েদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না, জাতিগঠন সার্থক হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে নারী যখন প্রার্থী মনোনয়ন ও ভোটাধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করেছে, তখন তা কার্য্যকরী করা একান্ত প্রয়োজন, পর্দা প্রথার প্রাধান্যে তাকে সুপ্তির তলে মগ্ন করলে চল্‌বে না।

আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই পণ প্রথার প্রচলন আছে। কিন্তু এই প্রথার কোনও যুক্তিপূর্ণ কারণ নির্ণয় করা যায়না। বরং এই কুসংস্কারে জাতি ক্রমশঃ নির্জীব ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ভদ্র সমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, ও লাঞ্ছিতা মেয়ের দল দিয়ে জাতি পরিপুষ্ট হতে পারে না, এই পণপ্রথার জন্যে নিম্ন শ্রেণীর সমাজে অর্থের লোলুপতায় বাল্য বিবাহের হার ক্রমশঃ বেড়ে চলে এবং অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়।

নারী বিক্রী প্রথা আমাদের একটি অন্যতম প্রধান কুসংস্কার। এর ফলে নারী হয় ক্রীতদাসী, ভোগের বস্তু, তাদের মাঝে যে স্বাধীনসত্তা থাক্‌তে পারে তা উপলব্ধি করবার শক্তি তাদের চিরতিমিরে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু বর্তমান ভারতের এই সমস্যা বহুল প্রাঙ্গণে কোনও নারীকে পিছিয়ে পড়লে চল্‌বে না, একতাবন্ধনে প্রত্যেকটি নারীর আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং এই কুপ্রথা হতে জাতিকে মুক্ত করতে এর বিরুদ্ধে অভিযান করাই বর্তমান ভারতে শিক্ষিতা নারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই কুসংস্কারের মূলে যে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা প্রধানতঃ দায়ী সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। সেইজন্যই হরবিলাস সর্দার প্রবর্তিত আইন কেউ উপলব্ধি করতে পারলো না। ঘরে ঘরে এখনও বাল্যবিবাহ হচ্ছে।

যে দেশে ৩৫ কোটী জনসাধারণের শিক্ষার জন্য রাজস্বের মাত্র ৮ ভাগ অর্থাৎ ২৯ কোটী টাকা ব্যয় হয় এবং এর মধ্যে ১৮ কোটী জনসাধারণের তহবিল হতে প্রদত্ত হয়, সে দেশে এর চেয়ে বেশী জনশিক্ষার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে মেয়েদের প্রথম কর্তব্য নারী জাগরণ করা, এইটেই তাদের গঠনমূলক কাজের পথ প্রদর্শক, এবং নারী শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা বিদূরণই এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তবে রাষ্ট্রের সহায়তা ব্যতিরেকে এ কাজ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে

পারে না, কেননা অর্থই সব কাজের মূল, এবং সেই অর্থের প্রতিকূলতার জন্য এ দেশে মাত্র ৪০ লক্ষ মেয়ে শিক্ষিতা। শিক্ষার প্রভাবেই সোভিয়েট রাশিয়ার দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার প্রচার ও নিরক্ষরতার বিদূরণ করতে হলে প্রচুর অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

সেইজন্য আজ এই অজ্ঞতার কারাগার হতে সমগ্র নারী জাতিকে মুক্ত করতে, তাদের শিক্ষা অর্জনের পথের বাধা বিপত্তিগুলি দূর করতে, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সহায়তায় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে, এবং তাদের অশিক্ষার সুপ্তি থেকে জাগ্রত করতে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে নারী-কল্যাণ সমিতিদ্বারা মহিলা সম্মেলনের আহ্বান করে নারী আন্দোলন করতে হবে।

.ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা বক্তৃতা ক'রে দেশের দুরবস্থার কথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, জাতীয়তা প্রীতিতে জাগ্রত করতে হবে, দেশের শিল্প দ্রব্যকে উন্নত করতে হবে এবং বিদেশী দ্রব্য দেশের উন্নতির মূলে যে বাধা স্বরূপ সেই কথা বোঝাতে হবে। কুসংস্কার জাতিকে যে কি অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত করে রাখে উদাহরণ দিয়ে তাদের মর্মে রেখা টেনে দিতে হবে। নিরক্ষরতার শোচনীয় পরিণাম জানাতে হবে, শিক্ষা-প্রীতি ও পাঠস্পৃহায় তাদের জাগ্রত করে নূতন আলোর সন্ধান দিতে হবে, শিক্ষা অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এবং সেইটেই হবে নারীর বর্তমান ভারতে গঠনমূলক কার্যের প্রধান কর্তব্য। কেননা শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনও কিছুরই উন্নতি সাধন হতে পারে না। এর জন্য বয়স্কাদের নিরক্ষরতা বিদূরণ করতে দ্বিপ্রাহরিক অবৈতনিক বিদ্যালয় করে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, ফ্রি পাঠাগারের সাহায্যে তাদের বই পড়তে দিয়ে পাঠানুরাগী করে তুলতে হবে। শিক্ষার রস ও উপকারিতা তারা উপলব্ধি করলে শিক্ষা অর্জন এবং প্রদানের বন্ধুর বাধা বিপত্তিগুলি অতিক্রম করে তারা এগিয়ে যেতে পারবে, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে উৎসুক হবে, এমনি করে ধীরে ধীরে নিরক্ষরতা বিদূরণ হবে, দেশ শিক্ষিত হতে পারবে। তবে দরিদ্র ঘরের মেয়েদের শিক্ষা প্রদান অর্থ ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না, কেননা তাদের মনে পাঠস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠলেও, দারিদ্র্যই প্রতিকূলতার সৃষ্টি করবে। এর জন্য দেশের ধনী, জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রচুর সহানুভূতি, সমবেদনা ও অকৃপণ হস্তের অকুণ্ঠিত দানের প্রয়োজন। এর জন্যে মেয়েদের উন্নতিকল্পে, মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকে ধনী, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্ত্রী এবং যে সব মেয়েরা স্বাবলম্বী তাঁরা যদি তাঁদের সাধ্যমত দেশের মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য মাসিক অথবা বাৎসরিক সাহায্য করার সঙ্কল্প করেন, এবং সেই প্রাপ্ত অর্থ যদি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় ব্যয় হয় তবে 'দেশ এই অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারবে। এর জন্য কর্মী মেয়েদের নানাদিক দিয়ে শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়ে দিতে প্রচুর স্বার্থত্যাগ ও দেশের সেবায় অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শিক্ষার পাশেই উন্নত নৈতিক চরিত্রের স্থান, এই দুএর মিলনেই সুন্দর জাতি গঠন হতে পারে।

সুতরাং নৈতিক চরিত্রকে মার্জিত করতে পতিতাদের পাঁকের তল থেকে টেনে আনতে হবে, নীতি ও জ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে, তাদের অসংযম চিত্তবৃত্তিকে পরিবর্তিত করে, শিক্ষা এবং তাদের যাত্রা পথের অভাব অভিযোগগুলির মীমাংসা করে তাদের সংশোধন করতে হবে। তাদের এই চিত্তবৃত্তির মূলে অর্থ সমস্যাই যে মুখ্যতম এ কথা সত্য কিন্তু তাদের অশিক্ষা ও অসংযমও অন্যতম একটি কারণ। সেই জন্য পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন নারী জাতিকে এই কলঙ্ক মুক্ত করলেও, তাদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকার করতে হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সচরাচর দেখা যায় সমাজের ঘৃণিত অবহেলিত এবং অকাল বৈধব্যপ্রাপ্ত মেয়েরাই কুল হারানো ঢেউএর মত পতিতাবৃত্তির দ্বারস্থ হয়। অর্থকরী ভিত্তির পরে শিক্ষার প্রতিষ্ঠাই তাদের অর্থ সমস্যার সমাধান করতে পারবে, চরিত্রের সংযম সাধনাই তাদের মার্জিত করবে।

শ্রদ্ধেয়া লেডি অবলা বসুর অধিনায়কত্বে নারীর অর্থ সমস্যা বিদূরণ করতে নিখিল ভারত নারী-শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য এবং বাণী বিদ্যামন্দিরের কর্ম পদ্ধতি গঠনমূলক কার্য্যের যোগ্য অনুকরণীয় এবং বিভিন্ন দেশের, বম্বে, মাদ্রাজ, প্রভৃতির সেবা-সদন প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র পাঞ্জাবের আর্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মহনীয়। এইগুলির দ্বারা নারীর অর্থ সমস্যা ও অনেকাংশে অভাব অভিযোগ বিদূরিত হতে পারবে।

বয়ন ও সূচিশিল্প প্রভৃতি দ্বারা ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁতের প্রচলনে আর্থিক দুরবস্থা দূরীভূত হতে পারবে। অতীতে এই শিল্পকলায় নারীর স্থান ছিল অন্যতম, ঢাকাই মোস্‌লিন ও বেনারসী শাড়ী তৈরীর ইতিহাসে নারীর সে শিল্পনৈপুণ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও আসামের ঘরে ঘরে তাঁতের প্রতিষ্ঠা রয়েছে, এণ্ডি, মুগা এবং নিজের পরিধানের বস্ত্র বয়ন করা সেখানকার মেয়েদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এদের এই আদর্শ অনুসরণ করলে, মেয়েরা আর্থিক দুরবস্থা হতে মুক্ত হতে পারবে, অর্থের তাগিদে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হবে না, স্বাবলম্বী হতে পারবে। এবং দেশের শিল্প ক্রমে সমৃদ্ধ হবে, কুটীর শিল্পের প্রচার হবে। এ বিষয় শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় প্রতিষ্ঠিত সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্য গঠনমূলক কার্যের যোগ্য অনুকরণীয়, পথ প্রদর্শক।

তাহলেই বোঝা যায় নারী আন্দোলন করে নারীকে জাগ্রত করে তাদের শিক্ষা ও অর্থ সমস্যা হতে মুক্ত করাই সুসংস্কৃত উন্নত জাতি গঠনের প্রথম সোপান। ঘরে ঘরে মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠবে, সংযত সুন্দর চরিত্রের পরিচয় প্রদান করবে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, নিজের দেশের এবং জাতির দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করবে, প্রতিকারে উন্মুখ হবে, এবং নারীর সেই চিত্তবৃত্তির প্রভাবে আদর্শ সন্তানে দেশ ভরে যাবে, শিক্ষিতা মায়ের শিক্ষিত ছেলেতে জাতি সমৃদ্ধ হবে, এবং তবেই শক্তিমান জাতিতে দেশ পরিপুষ্ট হবে। সঙ্ঘবদ্ধ মিলিত শক্তির প্রভাবে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ সরল হবে, ভারতের মুক্তির সুর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে, এবং বর্তমান ভারতে নারীর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারবে।

বিপ্লবী ফ্রান্স

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম-এ

মেকিয়াভেলির রাষ্ট্রনীতির আদর্শে গঠিত ইয়োরোপীয় রাজতন্ত্রের পীড়নে এবং পররাষ্ট্রীয় দপ্তরখানায় কূট বুদ্ধির বন্ধনে মানবতা রুদ্ধশ্বাস হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মানুষের স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা স্পৃহা শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিল। মানুষ নূতন পথে চলিতে চায় কারণ নবসৃষ্টির উন্মাদনা বাঁধন মানে না। স্থিতিবাদীর দল, বিষয়বিচারীর দল তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে, শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল রচনা করিয়া তাহার উচ্ছ্বাসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে প্রয়াসী হয় কিন্তু তাহাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়না। মানুষ যখন তাহার আনন্দে বিভোর হয় তখন তাহারই প্রেরণার মধ্যে নবসৃষ্টির প্রাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে এইরূপ বাঁধন ভাঙ্গার অভিব্যক্তি প্রকৃষ্ট রূপ পাইয়াছিল। ইউরোপের ভৌগলিক সীমার মধ্যে গ্র্যাণ্ড মনার্কির জন্মস্থান ও লীলানিকেতন ফ্রান্সে বিক্ষুব্ধ মানবতা ব্যক্তি-বেষ্টনীর মমত্ব-মোহকে প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। মানবতার দুর্ব্বার বেগ ফরাসী-জাতির শিরায় শিরায় যে তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, যে উচ্ছ্বাস তাহার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে শক্তির রক্তচক্ষু ম্লান হইয়া গিয়াছিল, বিধি-বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ রাজশক্তির অন্যায় অধিকার অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল কিন্তু ফরাসীগণ ইংরাজের পথ অনুসরণ করিয়া তাহাদের রাজাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিপ্লবের ন্যায় ফরাসী বিপ্লবও রাজতন্ত্রের অন্যায় দাবী ও তাহা নির্ব্বিবেক সঙ্কীর্ণ স্বার্থলিপ্সায় প্রতিক্রিয়ারূপে ইউরোপের পটভূমিতে দেখা দিয়াছিল। গ্রাণ্ড মনার্কের উচ্চাভিলাষ আড়ম্বরপ্রিয়তা ও পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি, ইউরোপব্যাপী যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের অত্যাধিক ব্যয় ফ্রান্সের প্রজাদিগকে গুরু করভাবে পীড়িত করিতেছিল। সম্রাটের বিলাসিতা ও জাঁকজমকশীলতা রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় প্রজাদের ধনোৎপাদনী শক্তির তুলনায় অত্যন্ত বেশী ছিল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রজাগণ রাজার পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদ করে নাই। পররাষ্ট্রনীতি যে তাহাদের দুর্দ্দশার মূল কারণ, ইহা বুঝিতে হইলে যে শিক্ষা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা তাহাদের ছিল না। ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের ন্যায় ফ্রান্সের প্রজাদের কর দিবার শক্তি ছিলনা। কিন্তু ফ্রান্সের অভিজাত ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে নানা বিষয়ের কর দিতে হইত না বলিয়া জাতিসাধারণ করভারে অধিকতর পিষ্ট হইতেছিল। এইজন্য ফ্রান্সের এই দুই সম্প্রদায় সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল কিন্তু ইংল্যাণ্ডে অভিজাত ও জনসাধারণের স্বার্থ সমান ছিল বলিয়া তাহারা রাজার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ফ্রান্সের রাজনীতিক আকাশ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহা

কেহ লক্ষ্য করে নাই। এমন কি আমেরিকাব 'স্বাধীনতা যুদ্ধেব' সময ফরাসীবিপ্লবেব কোন নিদর্শন পাওযা যায নাই।

সম্রাট, অভিজাত ও পুবোহিতগণকে লইযা সমালোচনা ও ব্যঙ্গ চলিতেছিল, কিম্বা রাজনীতি সম্বন্ধে উদার চিন্তাব অভ্যাস ছিলনা। কিন্তু সর্ব্বহাবাদেব মর্ম্মন্তুদ কাতর ক্রন্দনের দুর্ব্বার ফল্গুধাবা যে অতর্কিতে উচ্ছ্বসিত হইযা চিরাচবিত প্রথা, বিধি নিষেধ শৃঙ্খলা শৃঙ্খল ভাসাইযা দিবে, তাদের উষ্ণ নিশ্বাস যে ফবাসী দেশকে এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে পবিণত করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। ফ্রান্সে উচ্চচিন্তা ও উদাবমতের অভাব ছিলনা। সাহিত্যের ভিতর দিযা জাতির ভাবধাবা প্রবাহিত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমার্দ্ধে মণ্টেস্কুব (১৬৮৯-১৭৫৫) সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ফ্রান্সের তদানীন্তন সামাজিক, বাজনৈতিক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিশ্লেষণ করিযা তাহাদেব অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা ও শৈথিল্যেব উপব আলোকপাত কবিযাছিল। মনুষ্য সমাজকে পুনর্গঠন কবিবার যে সজ্ঞান প্রচেষ্টা, দার্শনিকপ্রবব জন্‌লকেব প্রধান কীর্ত্তি, মণ্টেস্কু ছিলেন তাহার জ্বালাময মূর্ত্তি, পববর্ত্তী-যুগেব চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহাবই পদাঙ্ক অনুসবণ কবিযা নৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বেব অবতাবণা কবিযাছিলেন। সেই যুগেব চিন্তাধাবা, বুদ্ধি বিচাববৃত্তি কি "এনসাইক্লোপিডিষ্ট' (সর্ব্ববিদ্যা সংগ্রহকার) নামক একদল প্রতিভাশালী লেখক ও সমালোচকদেব বচনায প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। মনস্বী ডিড্‌রোট ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। অন্যাযেব প্রতি ঘৃণা, দাসব্যবসাযের নিন্দা, কবস্থাপন-নীতির অসামঞ্জস্য, বিচাবকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ, যুদ্ধেব বায বাহুল্য, নূতন রকমেব সমাজ গঠনেব কল্পনা শিল্পেব উন্নতিব প্রতি সহানুভূতি তাহাদেব হৃদযে হিল্লোল জাগাইযা তুলিযাছিল। ধর্ম্ম ও অতীন্দ্রিয় বস্তুব প্রতি বিদ্বেষ তাহাদেব নবরাষ্ট্র পবিকল্পনায পবিস্ফুট হইযা উঠিয়াছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে মানুষেব ন্যাযবুদ্ধি সহজ ও অকৃত্রিম, তাহার বাষ্ট্রনৈতিক চেতনা স্বাভাবিক। একমাত্র আধ্যাত্মিকতা ও পবিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা যে মানুষেব আত্মাকে ঐশ্বর্য্যশালী কবিয়া তোলে, মানুষের সহিত মানুষেব গভীর আত্মীযতা স্থাপন কবে, আন্তবিক সহযোগিতাব পরিস্থিতির মধ্যে সমাজসেবার আশঙ্কা সৃষ্টি কবে। এই সমযে এনসাইক্লোপিডিষ্টদেব ন্যায একদল অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তি আবির্ভাব হইযাছিল। ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টন সম্বন্ধে ইহাদেব মত অনন্যসাধারণ ছিলনা, কোড্ ভিলা নেচাবেব লেখক ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিন্দা কবিযাছিলেন, তিনি সোসালিজমের প্রবর্ত্তক। উনবিংশ শতকের যে সকল চিন্তানাযক সোস্যালিষ্ট নামে অভিহিত হইযাছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। এই যুগেব চিন্তাশীল লেখকদের অন্যতম রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। তাঁহার চিন্তাধারা বুদ্ধি ও হৃদয, বিচাব ও ভাবুকতা গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থল, তাঁহাব মতে সুপ্রাচীনকালে মানুষ স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও সুখী ছিল। কালক্রমে পুরোহিত, রাজা ব্যবহাবজীবী প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। তাহারাই সহজ মানুষেব নিত্যকালের ধর্ম্মভাব নষ্ট করিযা তাহার অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিযা দিয়াছিল। ভল্‌টেয়ারে ছিলেন ফরাসী বিপ্লববাদের দার্শনিক। রুশো ছিলেন এই বিপ্লবযজ্ঞের পুরোহিত। তিনি ফ্রান্সকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, রুশো কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজের উচ্ছেদ করিয়া ক্ষান্ত

হন্ নাই, তাঁহার মত সমাজগঠনের পরিপন্থী। প্রাচীকালের সকল মানুষ স্বাধীন ছিল, কেহ কাহারও প্রভুত্ব বা দাসত্ব করিতনা, কালক্রমে তাহারা একমত হইয়া তাহাদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ ও গুণজন ব্যক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। স্বইচ্ছায় নিজেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁহাকে রক্ষক নিযুক্ত করে। রাজা রাষ্ট্রশক্তির আধার নন, পরিচালক মাত্র, রাষ্ট্রশক্তির আধার জাতি। শাসক জনসাধারণের ভৃত্যমাত্র, প্রভু নয়। রাজা শাসক প্রভুত্বের দাবী করিলে উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই মতবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তি। ফরাসী বিপ্লবরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে বর্ত্তমান গণতন্ত্র যুগের আরম্ভ। রাজার উপর আক্রমণ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হইয়াছিল, ব্যবসাবাণিজ্য কৃষি শিল্পের উপর ইউরোপের রাজারা অযথা হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ফ্রান্সের জনসাধারণ যখন নিঃশেষ হইবার উপক্রম, তখনও লুইরাজাদের বিলাস ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর আদায় পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল, এই জাতীয় অত্যাচারই রুশোর অগ্নিময়ী লেখনীর ইন্ধন জোগাইতেছিল। সার্ব্বজনীন্ ইচ্ছার উপর রুশোর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। রক্ষকের আবশ্যকতা বোধ স্বাভাবিক হইলেও ইচ্ছার ভিন্নত্ব অনিবার্য্য। তাহার এই মতবাদ কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত। তিনি স্বভাববাদী ছিলেন। সাম্য চিরন্তন নীতি নহে। মানুষ একটি অপরিবর্ত্তনীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কোন দুইজন ব্যক্তির একই সামর্থ একই শক্তি নাই। বৈষম্যই সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের অন্তর্হিত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগত, বিভেদ ও তারতম্যের উপর সাম্য স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। রুশোর মতবাদ মনোজ্ঞ কবিমানসের অনুভূতি ধারায় অভিষিক্ত বটে কিন্তু তাহা বস্তুতন্ত্রহীন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদর্শবাদের এইরূপ চিন্তাবীররা ফ্রান্সের সামাজিকও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সাম্যবাদ, প্রজাতন্ত্রবাদ, স্বভাববাদ প্রভৃতি মতবাদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্রের চিরন্তন মূলনীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। ফ্রান্সের সম্রাট পূর্ব্বের মতই বিলাস উপকরণে ও নারীরূপের মধ্যে বিভোর হইয়া থাকিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গ ও অভিজাতগণ আরাম কেদারায় সুখে ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অর্থসচিবগণ ঋণ করিয়া রিক্ত রাজকোষ পূর্ণ করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ করভারে ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ও আর্ত্তনাদ, শাসন ও শোষণ, দারিদ্র্য ও ক্লীবতা, অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া বুভুক্ষু মানবের মর্ম্মন্তুদ রোদন শোনা যাইতেছিল কিন্তু নির্ম্মম লোভ ও স্বার্থপরতা, হৃদয়হীন আইন ও অর্থহীন বিধি নিষেধ সহজ মানুষের মুক্ত প্রাণের স্বচ্ছগতি রোধ করিতে পারিল না। টমাস পেনের লেখনীমুখে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া যেমন আমেরিকানদের অবসাদ ও ভীরুতা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ রুশোর ভাবধারার অগ্নিসুরা পান করিয়া এক নূতন ফরাসী জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, শীঘ্রই কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত বিপ্লব প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে ফ্রান্সে দেখা দিল।

ষোড়শ লুই তখন ফ্রান্সের সম্রাট। তিনি নির্ব্বোধ ও অল্প শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পত্নী

মেরী অ্যাণ্টইনেট্ আড়ম্বর ভালবাসিতেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সন্দেহের বহির্ভূত ছিল না। যখন ব্যয় বাহুল্যে রাজকোষ শূন্য ও দেশে অসন্তোষ বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, তখন তিনি রাজমন্ত্রী-গণের নানা প্রকার ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন, অভিজাতগণের আড়ম্বর প্রিয়তার ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। যাজক ও সম্ভ্রান্তগণের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার পন্থা অবলম্বন করিলেন। ক্যালোন নামক এক ব্যক্তি অর্থসচিব ছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যেন যাদুবিদ্যার সাহায্যে টাকা উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তিনি ঋণের উপর ঋণ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তিনি অভিজাতগণের এক সভা আহ্বান করিয়া সম্পত্তির উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। ভূস্বামিগণ রুষ্ট হইল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টেটস্ জেনেরেল নামক মহাসভা আহুত হইল। অভিজাত পুরোহিত ও জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল। প্রথম দুই শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ৫৯৩ এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ৬২১ ছিল। ইংলণ্ডের হাউস অব্ কমন্স সভার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যা গরিষ্ঠদল হিসাবে জাতির প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিল এবং তাহাদের মতামত না লইয়া কেহ কর স্থাপন করিতে পারিবে না বলিয়া স্থির করিল। তাহাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া সম্রাট সভাগৃহ বন্ধ করিয়া দিলেন। জননায়কগণ একটা ময়দানে সমবেত হইল এবং দেশে প্রকৃত রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সভা ভঙ্গ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সম্রাট বল প্রয়োগ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ সম্রাটের আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল। অবশেষে এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের ভোট দিবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলেন। এদিকে সাম্রাজ্ঞী প্ররোচনায় মার্শল ডি ব্রোগলিওর নেতৃত্বে বিদেশী সৈন্যদল আমদানী হইল। সম্রাট পূর্ব্বের কথা অনুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেন। প্যারিস ও ফ্রান্স বিদ্রোহী হইল। ব্রোগলিও উত্তেজিত জনমণ্ডলীর উপর গুলী চালাইতে সাহস করিলেন না। প্যারিসে ও অন্যান্য বৃহৎ নগরে অস্থায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইল। সম্রাটের সৈন্যদলকে বাধা দিবার জন্য ন্যাশন্যাল গার্ড নামে নূতন জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হইল।
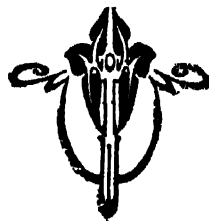
পোলাণ্ডের পতন

বিগত মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে ক্ষীণকায় বিলুপ্তপ্রায় পোলাণ্ড পুনরায় ইয়োরোপের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পুষ্টকলেবরে স্থান পেয়েছিল। এই নবগঠিত পোলরাজ্যে জার্মানীর এক সমৃদ্ধিশালী অংশ যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে পোলাণ্ডের উপর জার্মানীর লোভ এবং নজর বরাবরই রয়ে গেল। পোলাণ্ডও জার্মানীর আশঙ্কায় ফ্রান্সের সাহায্যে আধুনিক রণসম্ভার ও যুদ্ধ সজ্জায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ইঙ্গো-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির প্রচেষ্টা যদি সফল হত তবে পোলাণ্ড সোভিয়েটের নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য পেতে পারত। তাতে হয়তো এভাবে তার পতন ঘটতো না। কিন্তু রাশিয়ার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে গেলে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পোলাণ্ডে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিতে হয়। সে অধিকার দিতে পোলাণ্ড শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কারণ পোলিস গভর্নমেণ্টের সাম্যবাদভীতি অন্যান্য গভর্নমেণ্টের মতই প্রবল। রাশিয়ার সৈন্য পোলাণ্ডে প্রবেশ করলে সেখানে তারা সাম্যবাদ প্রচার ক'রে গণবিপ্লবের বীজ বপন করবে এই আশঙ্কায় তাদের পোলাণ্ড প্রবেশের অধিকার দিয়ে সে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হ'ল না।

এই ভাবে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে রাশিয়া বুঝলো যে, দুনিয়ার ছোটবড় সমস্ত রাষ্ট্রগুলির কাছে আজও তারা অস্পৃশ্য অপাংক্তেয়। ঠিক এমনি সময়ে জার্মানী এলো তার কাছে মৈত্রীপ্রস্তাব নিয়ে। রাশিয়া দেখলো একটা দেশ এখনো আছে যে তার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে অবাদ্ধ হতে ও সামরিক চুক্তি করতে প্রস্তুত।

তাছাড়া এও সে বুঝলো, তার সাহায্য না পেলে পোলাণ্ড জার্মানীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও অতদূর থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য ক'রে তাকে রক্ষা করতে পারবে না,—ফলে পোলাণ্ড অধিকার করে জার্মানীর মতো একটি প্রবল শক্তি তারই ঘরের কাছে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বসবে। শুধু তাই নয়, সাম্যবাদের প্রধান শত্রু নাৎসীবাদ পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইয়োরোপে প্রভাব বিস্তার করবে। রাশিয়া তাই কাল বিলম্ব না ক'রে জার্ম্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন ক'রে কূট রাজনীতিতেও যে তারা সিদ্ধ হস্ত, বিস্ময় বিমূঢ় দুনিয়ার কাছে তারই পরিচয় দিল।

অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করা ভিন্ন সোজাসুজি পোলাণ্ডে গিয়ে যুদ্ধে যোগদান করার পথ না থাকাতে একাকী পোলাণ্ডকেই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হ'ল—এবং

পতন তার অনিবার্য হয়ে উঠলো। পোলিস গভর্নমেণ্ট যখন অকস্মাৎ রুমানিয়ায় আত্মগোপন করলো এবং জার্মানী যখন পোলাণ্ডের পশ্চিম অংশ অধিকার ক'রে পূর্ব দিকেও অভিযান সুরু করলো তখন সোভিয়েটের পক্ষে স্থির থাকা আর সম্ভব হ'ল না। লাল ফৌজ এসে শ্বেত রাশিয়া এবং ইউক্রেনিয়া দখল করলো। এই স্থানগুলি পূর্বে রাশিয়ারই ছিল। মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়া যখন অন্তর্বিপ্লবে বিপদগ্রস্ত তখন বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারলো না। তাই সেদিনকার রাষ্ট্রনায়ক লেনিন যখন অপমানজনক সর্তে ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধিতে রাশিয়ার রাজ্যসীমা সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন এই শ্বেত রাশিয়া এবং ইউক্রেনিয়া পোলাণ্ডকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আজ স্ট্যালিন হিটলারকে চালবাজীতে হারিয়ে দিয়ে হৃতস্থান উদ্ধার ক'রে পোলাণ্ডের একটা অংশকে নাৎসী কবলিত হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছেন।

তারপর সংবাদ পাওয়া গেল পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস আত্মসমর্পণ করেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুনরায় পোলাণ্ডের পতন লিখিত হ'ল। রুশো-জার্মান চুক্তিতে নতুন ক'রে পোলাণ্ডের সীমারেখা নির্দ্ধারিত হ'ল। এই ভাবে পোলাণ্ডের পতন ও অঙ্গচ্ছেদ পর্ব সমাধা হ'ল। স্থির হয়েছে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে একটি পোল রাজ্য থাকবে বাফারষ্টেটরূপে,—সেই রাজ্য করদ রাজ্য বা অধীনে স্বাধীন রাজ্য হবে তা কিছু এখনো চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নি।

বলটিকে রাশিয়ার নীতি

পোলাণ্ডের পতনের পর রাশিয়া রুমানিয়া সীমান্তে লাল সেনাবাহিনী স্থাপন করে বলকান রাজ্যগুলিকে নিরাপত্তা রক্ষা এবং আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। জার্মানীর অগ্রগতি এদিকে রুদ্ধ হল। রাশিয়ার নূতন পর্ব আরম্ভ হ'ল বলটিকে। এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বলটিকে এই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সঙ্গে রাশিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আপন প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ক'রে উত্তর ইয়োরোপেও ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছে। প্রথমে এস্তোনিয়ার এলাকাভুক্ত ডাগোরি এবং ওসেল দ্বীপে নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য সোভিয়েট এস্তোনিয়া গভর্নমেণ্টের নিকট দাবী জানায়।

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও এস্তোনিয়ার মধ্যে দশ বৎসরের জন্য এক পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি ও একটী নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে সোভিয়েট তার দাবী অনুসারে ওসেল ও ডাগোরিতে নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলি স্থাপন করতে পারবে। সোভিয়েট বিমানবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর অংশ নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলি অধিকার করে থাকবে। এস্তোনিয়ার বন্দরগুলি দিয়ে সোভিয়েট পণ্য প্রেরণ বর্দ্ধিত করার ব্যবস্থাও বাণিজ্য চুক্তিতে হয়েছে।

এই চুক্তির ফলে রাশিয়া রীগা উপসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলো। রীগা বন্দরের সঙ্গে মস্কো-রেলপথের যোগ আছে। গত ২০ বছর ধ'রে শীতকালে বলটিক সমুদ্রে আসার যে

বিপজ্জনক বাধা ছিল আজ তুষারহীন বলটিকের মধ্য দিযে সোভিযেটেব সেই বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হ'ল।

তারপর নিমন্ত্রণ গেল লিথুযানিযা ও ল্যাটভিযায। এদেব সঙ্গেও সোভিয়েট অন্যান্য সামবিক প্রস্তাবের সঙ্গে পারস্পবিক সাহায্যচুক্তি ও বিমানঘাঁটি স্থাপনেব ব্যবস্থা ক'বে নিল। ল্যাটভিযার পশ্চিম উপকূলে বলটিক সমুদ্রেব উপর লিবাউ ও উইনডাউতে নৌঘাঁটি এবং কযেকটী বিমানঘাঁটি স্থাপনেব সম্মতি পাওয়া গেল।

ফিনল্যাণ্ডেব সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি কববাব জন্য আলোচনা চলছে। এইভাবে একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইযোরোপে এবং অন্যদিকে উত্তব ইযোরোপে বাশিযাব ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জার্মানী শঙ্কিত হযে উঠেছে। বলটিকে ডানজিগ ও মেমেল অধিকাব ক'বে হিটলাব যে শক্তি অর্জন কববাব প্রযাস পেযেছিলেন সোভিযেট সেখানে অধিক শক্তিশালী হযে উঠল। কূটচালে হিটলাব স্ট্যালিনের নিকট পরাজিত হযেছেন।

শুধু তাই নয, পাছে ভবিষ্যতে স্বভাবসিদ্ধ চালে হিটলাব সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মানদের দাবী নিযে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলটিক বাষ্ট্রগুলিব প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি দেবাব সুযোগ পায সেই আশঙ্কায দূবদৃষ্টি সম্পন্ন স্ট্যালিন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্ট্রগুলি থেকে জার্মানদেব সবিযে নিতে দাবী জানিযেছেন। এও জানা গেছে যে বলটিক অঞ্চলে সোভিযেটেব একটী 'ম্যাজিনো লাইন' গঠনের সংকল্প আছে।

ইউবোপেব এই দুর্যোগের সুবিধা নিযে সোভিযেট যেভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন হযে উঠেছে তাতে কেবল হিটলাব নয, স্পেন এবং ইটালিও আতঙ্কিত হযে উঠেছে।

জার্মানীর শান্তি প্রস্তাব

পোলাণ্ডেব পতন ও ভাগ বাটোযাবা সমাধান ক'বে জার্মানী ও বাশিযা একটা চুক্তিতে কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করে। তার মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল:—জার্মান সোভিযেট চুক্তিব চূড়ান্ত সুপ্রতিষ্ঠা, পূর্ব ইযোবোপেব ব্যাপারে এই উভয জাতিব মধ্যে অন্য কোন তৃতীয পক্ষকে আব হস্তক্ষেপ কবতে না দেওযা, পুনবায শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জার্মানীব বিরুদ্ধে যে নিষ্ফল সংগ্রাম চালাচ্ছে তাব থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলা, এবং নিবৃত্ত না হ'লে জার্মানী ও বাশিযা কিরূপে সে অবস্থার সম্মুখীন হবে সে বিষযে স্থিব সিদ্ধান্ত কবা। জার্মানী ও বাশিযাব এই চুক্তি সম্বন্ধে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন বলেন যে, পোলাণ্ড বণ্টনেব যে চেষ্টা হযেছে তা অন্যায়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যে সংকল্প নিযে তাঁবা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হযেছেন কোনোরূপ ভীতিপ্রদর্শন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে সেই সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

গত ৬ই অক্টোবর রাইখষ্ট্যাগে জার্মান নেতা হেব হিটলাব তাঁব শান্তিপ্রস্তাব ঘোষণা কবেন। তিনি বলেন জার্মানী ও রাশিযা পোলাণ্ডে কারও হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। ইযোরোপেব নিবাপত্তা রক্ষাই নাকি এই যুদ্ধেব উদ্দেশ্য। এই নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই বোধ হয অষ্ট্রিযা, চেকোশ্লোভাকিযা, মেমেল প্রভৃতি স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একে একে জার্মানীর কুক্ষিগত হয়েছে।

এই নিরাপত্তা রক্ষা ক'রে তিনি যে শান্তি প্রস্তাব করেছেন তাই তাঁর শেষ কথা ব'লে বিবেচনা করতে হবে। শান্তির জন্য তিনি ইউরোপীয় শক্তি সমূহের এক সম্মেলন আহ্বান করবার প্রস্তাব করবেন। তার পূর্বে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। উপনিবেশ সমূহ ব্যতীত জার্মানী নাকি সকল দাবীই ত্যাগ করেছে। তিনি পূর্ব ইযোরোপের নূতন সীমা নির্ধারণ ও ইহুদী সমস্যার মীমাংসাও এই সঙ্গে করতে চেয়েছেন।

হিটলারের এই মনোভাবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমগ্র ইযোরোপের শান্তি বিপর্যস্ত ক'রে ভার্সাই সন্ধি ভাঙ্গতে তিনি স্থির সংকল্প। সমগ্র জার্মান জাতিকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই পোলাণ্ড ধ্বংস ক'রে তিনি গর্বের সঙ্গে সদম্ভে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভার্সাই সন্ধি নাকচের প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেছেন। তারপর তাঁরই ইচ্ছানুসারে শান্তিপ্রস্তাব গৃহীত হয়ে জগতে তাঁর নির্দেশানুযায়ী ফ্যাসিষ্ট শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

যদি ভার্সাই সন্ধি ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য হয় তবে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা কি সর্বাগ্রে স্বীকৃত হবার কথা নয়? জার্মানীর নতুন সীমা নির্ধারণ বলতে কি এই বোঝা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব ইযোরোপ জার্মান রাইখষ্ট্যাগের কবলিত হউক? ইহুদী সমস্যার কিরূপ মীমাংসায় তাঁর সুবিধা হবে জানা নেই,—হয়তো সমগ্র জগৎ তাঁর ইহুদী দলন নীতি সমর্থন করুক এই তাঁর অভিপ্রায়।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের উত্তর

জার্মান ডিক্টেটার হের হিটলারের শান্তি প্রস্তাব মিঃ চেম্বারলেন অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করবার জন্য তিনি ইযোরোপীয় সমস্যার যত চেষ্টা করেছেন সবই হিটলার ব্যর্থ ক'রে দিয়ে পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিলেন। এখন জার্মানী যে শান্তি প্রস্তাব এনেছে তা গ্রহণ করতে হ'লে ইংলণ্ডকে জার্মান চ্যান্সেলারের বিজয় অভিযান এবং যথেচ্ছ আচরণের অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়ে এই অধিকার স্বীকার করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব। হিটলার যে শান্তি প্রস্তাব করেছেন তাতে ইংলণ্ডকে আত্মসমর্পণ করতেই আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়া জার্মানীকে বিশ্বাস করার মত কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হিটলার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি বার বার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং নীতি পরিবর্তন করেছেন। অতএব ইংলণ্ড আর হিটলারের এরূপ ফাঁকা কথার উপর আস্থা রাখতে পারে না। তিনি এও বলেছেন যে, পররাষ্ট্রগ্রাস মেনে নিয়ে শান্তির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে না। জার্মান চ্যান্সেলারের প্রস্তাবগুলি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের কোনো কথাই এতে নাই। যদি এগুলি স্পষ্টও হ'ত তবু প্রশ্ন উঠত যে পররাষ্ট্র আক্রমণ যে বন্ধ হবে এবং জার্মানী যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে এ সম্বন্ধে জগতকে নিঃসন্দেহ হবার মতো কি কার্যকরী পন্থা জার্মান গভর্নমেণ্ট অবলম্বন করবেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পররাষ্ট্রগ্রাস মেনে নিয়ে শান্তির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে

না। আরো বলেছেন ইংলণ্ডের সত্যিকারের উদ্দেশ্য হ'ল এমন একটা উন্নত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যার ফলে জগতের ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের নিকট যুদ্ধবিগ্রহ আর অপরিহার্য হয়ে উঠতে না পাবে, জগতে সবাই যাতে স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র রক্ষা ক'রে নিঃশঙ্কচিত্তে শান্তিভোগ করতে পারে। এটা আশার বাণী নিঃসন্দেহ। কিন্তু এটা কি ইংলণ্ডের সত্যিকারের আন্তরিক নীতি? এই নীতি অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে কি ভাবে কার্যতঃ প্রয়োগ করা হবে সে প্রশ্ন করবার অধিকার ভারতবাসীর আছে, আর চেম্বারলেনের কথার মধ্যে আন্তরিকতা, অকপটতা কতটুকু আছে তাও এতে বোঝা যাবে। ভারতের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর জগতের প্রকৃত শান্তি অনেকখানি নির্ভর করছে। বৃটিশ রাজনীতিকগণের সম্মুখে তাই আজ পরীক্ষা উপস্থিত—তাঁদের আন্তরিকতা এবং জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের সদুদ্দেশ্য কার্যতঃ প্রমাণ করার জন্য।

লিনলিথ্‌গো নীতি

ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি প্রকাশের কিছুদিন পরে পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করেন। মহাত্মাগান্ধী, জহরলাল প্রমুখ ভারতের জননেতা থেকে আরম্ভ করে চুনোপুঁটি অনেকের সঙ্গেই তিনি সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, সাভারকার, আম্বেদকার, এমন কি বাঙলা দেশের শ্রীযুক্ত যতীন বোস প্রভৃতিও বাদ যান নি। সকল দল, সকল উপদল, সকল সম্প্রদায় এবং এমন সকল ব্যক্তি যাঁরা তাঁদের নিজেদের ছাড়া আর কারো প্রতিনিধিত্ব করেন না, সকলকেই লর্ড লিনলিথ্‌গো অকৃপণ দাক্ষিণ্যে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

এই আলোচনার প্রারম্ভে যা কিছু গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য ছিল শেষ পর্যন্ত তা কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কংগ্রেস ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ব্যাপারে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র কংগ্রেস—কিন্তু দেখা গেল বড়লাট সকল সম্প্রদায়কে এবং ছোট বড় সকল দলকে কংগ্রেসের সমকক্ষ হিসাবে, সমান প্রতিনিধি হিসাবে আহ্বান করেছেন এবং আলোচনা চালিয়েছেন—এর অর্থ বোঝবার ক্ষমতা এদেশের জনগণের আছে।

কংগ্রেস দাবী করে কংগ্রেসই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের ভাষাই ভারতের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ভাষা, ভারতের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা জনসাধারণকে দিয়ে পালন করাবার ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। বর্তমান শাসন সংস্কার অনুযায়ী নির্বাচনগুলিতেও তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তবুও প্রতিক্রিয়াপন্থী ও প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সমস্ত দলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে আলোচনা ক'রে তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত দাবী উপস্থিত করবার অনুরোধ করলে বা তাঁদের সকল দলকে দলাদলি ভুলে ঘরোয়া মীমাংসা ক'রে নিতে বললে ভারতের কোনো সমস্যা কোনোদিনই সমাধান হবেনা। ভারত বহুজাতি, বহু মত, বহু সম্প্রদায়ের সম্মিলন ক্ষেত্র। স্বাধীনভাবে এদের রাজনৈতিক

মিলন সাধন এরা নিজেরা কবে নিতে পারে যেমন সোভিয়েট রাশিয়া করেছে। কিন্তু এদের প্রতিনিধি বাইরে থেকে স্থির কবে' দিয়ে পরস্পরেব আশা, ভাষা, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তের অনৈক্য ঐক্যে পরিণত করতে হবে বললে এবং পরিণত হ'ল তবে কিছু দেবাব প্রতিশ্রুতিব মধ্যে নৈতিক উপদেশ থাকলেও সত্যিকারের আশা কববার মত কিছু থাকে না।

কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা,—সে বিষয়ে যদি সকল নেতাগণ একমত থাকেন তবে ঘবোয়া বিবাদ মীমাংসা করতে উপদেশেব প্রয়োজন নাই। এই মূল বিষয়টুকুকে দৃষ্টিপথের বাইরে রেখে প্রতিনিধি স্থিব করলে অনৈক্য অবশ্যম্ভাবী। সে ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের মিলনের চেষ্টা করতে উপদেশ দিলে অপ্রাসঙ্গিক বিতর্কই তাব ফল দাঁড়ানো অবশ্যম্ভাবী। বিচক্ষণ বৃটিশ রাজনীতিকগণ সে ফল পূর্ব থেকে জানতেন না, এমন ধাবণা কবা মূঢ়তা। এই সংকটকালে সরকারের অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েব অবতাবণা না ক'বে একেবাবে আসল উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত কবাই প্রয়োজন।

বড়লাটের ঘোষণা

লর্ড লিনলিথ্‌গো ভাবতে যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টেব নীতি সম্বন্ধে ঘোষণা কবার পূর্বেই তাব পূর্বাভাস পাই ভারত সচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডেব বক্তৃতার মধ্যে। পার্লামেণ্টে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন, কংগ্রেস দাবী জানাবার সময়টা ভাল নির্বাচন করে নাই। তিনি বলেন ইংলণ্ডের এই বিপদেব দিনে, এই জীবন মরণ সংগ্রামেব সময় কংগ্রেসের এইরূপ দাবী না কবাই উচিত ছিল। উপযুক্ত সময় এলে তখন আপনিই এ বিষয়ে তাঁরা বিবেচনা ক'বে দেখবেন।

অতি পুবাতন কথা পুনবাবৃত্তি ক'রে কিছু লাভ নেই। উপযুক্ত সময় কাকে বলে তার কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম আছে কিনা তাও জানা নেই। বহু পূর্ব থেকেই কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করেছে—একথা ইংলণ্ডেব দুর্দিনে নতুন করেও কিছু জানায় নি। তবে ভারত যে অন্যদেশেব গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে সেখানে তার নিজের কি অবস্থা এবং কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে বিষয়ে তার একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। ভাবতের নিজেব যদি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার না থাকে তবে অন্যের জন্য সেই কাবণে সে লড়তে যাবে একথা ভারতেব নেতারা—যাঁদেব লর্ড লিনলিথ্‌গো ডেকেছিলেন তাঁরা ভারতবাসীকে বলতে যাবেন কোন গৌরবে? সুতরাং ইংলণ্ডের এই বিষয়ে ভারতে কি নীতি তা জানা একান্ত প্রয়োজন, প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন।

গত ৯ই অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবে এই দাবী করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ ব'লে ঘোষণা করতে হবে, এবং অবিলম্বে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে তা কার্যে পরিণত করতে হবে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হ'তে এরূপ ঘোষণা কংগ্রেস দাবী করেন।

বড়লাটের কাছ থেকে কংগ্রেসের দাবীর উত্তরের জন্য সকলেই ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলেন। বড়লাট অবশেষে যে ঘোষণা করেছেন তা অহেতুকভাবে দীর্ঘ, কিন্তু এই সুদীর্ঘ

ঘোষণায় নতুন কোনো কথাই নাই। বৃটিশ গভর্নমেন্টের ভারতে সেই সনাতন নীতির কোনো পরিবর্তনই হয় নাই। পূর্বেও যে নীতি, যে বুলি, যে গাঁথুনি চলেছিল আজও তার কিছুই রদবদল হ'ল না।

কংগ্রেস জানতে চেয়েছিল ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেন্টের অভিমত কি? যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্য করবে সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভারতেও স্বীকৃত হবে কিনা? প্রত্যুত্তরে বড়লাট বললেন, সে কথার উত্তর দেবার সময় এখনও আসে নি। তবে যুদ্ধ থেমে গেলে তখন সকল দল, সকল সম্প্রদায় ও দেশীয় নৃপতিবৃন্দের প্রতিনিধিদের নিয়ে সেই সময়ের উপযোগী শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

এই সঙ্গে বড়লাট ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সনের শাসন সংস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এরূপ করবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। গতবারের গোলটেবিল বৈঠকের প্রহসন ভারতবাসীর মন থেকে মুছে যায় নি। আবার সেই সকল দল আহ্বান ক'রে সেই বৈঠকের পরিকল্পনায় ভারতবাসী পুলকিত হয়ে উঠছে না—তারা অতীতের অভিজ্ঞতা ভুলে যায় নি।

আর, নানা দল, নানা স্বার্থ, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দেশীয় নৃপতিমণ্ডলী—এদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশেই এমনি নানা দল, নানা স্বার্থ, বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে—তবুও তার মধ্যে একটা রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি অসম্ভব হয়নি। তবে যদি শাসন কর্তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব অনৈক্যের সূত্র ধরে বিরোধের সৃষ্টি ও পুষ্টি করা প্রয়োজন হয় তা হলে তা করা অবশ্য খুব সহজ এবং তাকে মুখ্য স্থান দিয়ে বড় করে দেখানও কঠিন নয়। ভারতবাসীর উপর সমগ্র দেশের শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এলে এই সব অনৈক্য ও দলাদলি গৌণ হয়ে যাবে, সমস্ত বিরোধের তখন অবসান ঘটবে। আজ প্রয়োজন ভারতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতিপরিবর্তনের, প্রয়োজন ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী মেটাবার শুধু সদিচ্ছা প্রকাশ করা নয়, তা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা।
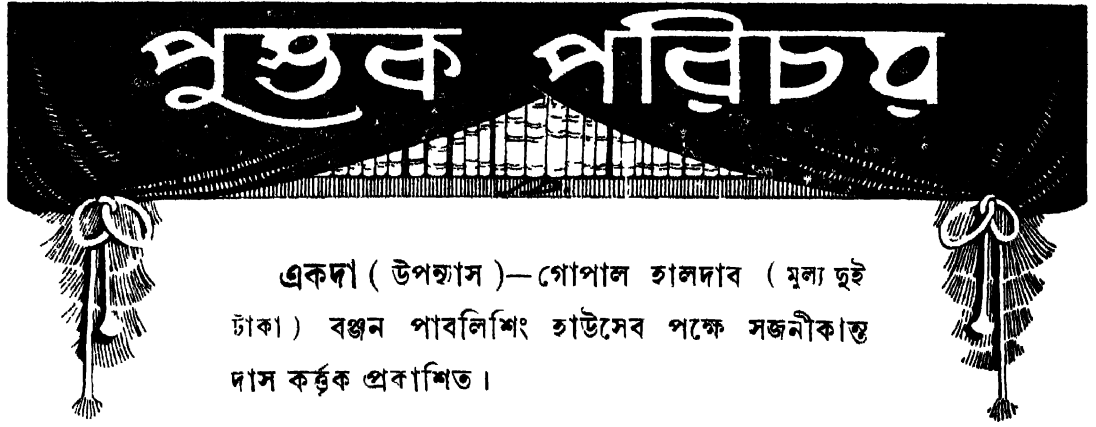
একদা (উপন্যাস)—গোপাল হালদার (মূল্য দুই টাকা) রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

বইখানি পড়িয়া প্রথমেই মনে হইল যে, এ-বইয়ের পাঠক-সংখ্যা অতি নির্দিষ্ট। সচরাচর উপন্যাস পাঠক যে-শ্রেণীর লোক, তাঁহারা এ বই পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। অধিকারী ভেদ কথাটা স্বীকার করিতেই হয়। যাঁরা মনন-শীল, প্রশ্ন-সমস্যার মীমাংসা-সন্ধান যাঁদের স্বভাব, তাঁরাই এ-বইয়ের সত্যিকার পাঠক। এ-বই তাঁদের ভালো লাগিবে। কারণ সমস্যা গ্রহণে বা মীমাংসা অনুসন্ধানে কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নাই। লেখকও তাঁর নায়ক জীবনকে seriously গ্রহণ করিয়াছেন, জীবন দিয়া প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছেন। লাইব্রেরীতে অধ্যাপকদের ক্লাবে বা আড্ডায় যে-জাতীয় এ্যাকাডেমিক মনোবৃত্তি দেখা যায় সে arm chair intellectualism বা অর্থহীন চিন্তার বিলাসিতা এখানে নাই।

এ-বইয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জ্জটি মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের কথা মনে আসিল। বুদ্ধদেব শক্তিমান লেখক সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা intellectual pose নিয়া তিনি চলিয়াছেন। তাঁর লেখা পড়িতে গিয়া বার বারই মনে পড়ে যে, তিনি শ্বাসকে রোধ ও সংযত করিয়া ঐ poseটী রাখিতেই গলদঘর্ম্ম, বুদ্ধির সহজ ও স্বাভাবিক স্থিতি তিনি আয়ত্ত করিতে আজও পারেন নাই। কাজেই তাঁর কোন রচনাই বুদ্ধিকে নাড়া দেয় না, বুদ্ধির উপজীব্য সত্যিকার কোন রস আজ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব পরিবেশন করিতে পারেন নাই। স্বকৃত একটি অস্বাভাবিক মানসিকতার কঠিন খোলের মধ্যে আত্মরক্ষায় তিনি ব্যস্ত, সেখানে থাকিয়াই একজাতীয় অসুস্থ ও রুগ্ন দিবাস্বপ্নে তিনি বিভোর। হালে তিনি socialist হইয়াছেন, কিন্তু রিয়ালিটির সঙ্গে বা সমাজ-জীবনও বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর লেখার সত্যিকার কোন যোগ নাই।

ধূর্জ্জটিবাবু সম্বন্ধে বক্তব্য—তাঁর নিজের কোন বক্তব্য নাই, অর্থাৎ তিনি প্রকৃত artist ও creative নন। তাঁর বুদ্ধি criticএর বুদ্ধি শুধু। বুদ্ধি তার ধারালো, কিন্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখায় তিনি অভ্যস্ত। অনেক সময় তাঁকে brilliantও হয়তো মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধির বাহিরের দিকটাতেই তিনি এলোমেলো বিচরণশীল, গভীরে কোন কেন্দ্রের সন্ধান তিনি পান নাই। সর্ব্বোপরি, তিনি সাহিত্যিক নন, বহুবিষয় জানিয়া ও পড়িয়া বুদ্ধি তাঁর উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়, ফলে অধ্যাপক সাহিত্যিক হইবার চেষ্টা করেন।

দিলীপকুমার সম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, ক্ষমতা ও শক্তিতে এ দুয়ের একজনেরও কাছাকাছি আসিতে তিনি পারেন না। তবে দিলীপকুমার বুদ্ধির দিক দিয়া sincere, অন্ততঃ এবিষয়ে তাঁর

সচেতন চেষ্টা রহিয়াছে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দিলীপবাবু অধিকারী পুরুষ নন, তাঁর নিজস্ব দেয় কিছু নাই। বহু মনীষির বক্তব্য ফেরী করিবার ভার তাঁর। His Master's Voice তাঁকে বলা চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁর মাষ্টার-এর সংখ্যা অনেক। চিত্রব্যাঘ্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে, বহুলোকের কাছে পাওয়া বহু রঙ্গীন তালি দেওয়া আলখাল্লা পরা সাহিত্যিক-বাউল তিনি।

এই তিনজনের মধ্যে বুদ্ধদেব ব্যতীত অপর দুইজনের বাংলা ভাষার তেমন কোন দখল নাই। যদিও এ দুজন অনেক লিখিয়াছেন সত্য এবং বাংলাতেই লিখিয়াছেন। বুদ্ধদেব আধুনিক সাহিত্যে তরুণদের অন্যতম মুখপাত্র, ধূর্জ্জটিবাবু আধুনিক শিক্ষিতদের অন্যতম মুখপাত্র এবং দীলীপবাবু পুরাতন সাধনার আধুনিক সংস্করণের একজন ভক্ত প্রচারক। এ তিনের কেহই আজিকার বাংলার প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না, সেজন্য কোন অধিকার অর্জ্জন তাঁরা করেন নাই—এক এ-যুগে জন্মানো ছাড়া।

বিবেকানন্দের পরে যে বাংলা আজিকার দিনে আসিয়াছে, আসার পথে বহুপ্রাণ ও বহুশ্রম ব্যয় করিতে তাকে হইয়াছে, বহু দুঃখ ও বহু বিপদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রাণ দিয়া চেষ্টা দিয়া যে শক্তি বাংলাকে সম্মুখ গতি যোগাইয়াছে, তারাই বাংলার সত্যিকার যৌবন বা তরুণ শক্তি।

গোপালবাবু এর খবর রাখেন এবং সে খবর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেই সঞ্চিত আছে। শিক্ষা ও জ্ঞানে তিনি ধূর্জ্জটিবাবুর সমশ্রেণীর, সাহিত্য শক্তিতে তিনি বুদ্ধদেবের সম-গোষ্ঠি এবং সাধনায় ও নিষ্ঠায় তিনি দিলীপকুমারের চেয়েও স্বধর্ম্মে অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই বর্ত্তমান বাংলার কথা বলিবার অধিকার এদের চেয়ে গোপালবাবুর বেশী এবং বলিবার শক্তিও যে তাঁর আছে, তার প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাস এই 'একদা'।

'একদা' উপন্যাস তিনি একটি দিনকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চাতের ও পিছনের দিগ্বলয় পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। বইয়ের নায়ক একজন শিক্ষিত তরুণ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী। একটী ভোর হইতে আর একটি ভোরে বইয়ের সমাপ্তি। বইখানিতে গোপালবাবু বৃহৎ বৃহৎ পটভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হয় একটি বৃহত্তর ও সমগ্র ছবির খানিকটা অংশ এই 'একদা'—যদিও নিজের খণ্ডে এ নিজে সুসমাপ্ত।

গোপালবাবুর মন অতি সচেতন ও সম্বেদনশীল। মানসিক পরিমণ্ডলের সূক্ষ্মতম পরিবর্ত্তন তাঁর মনে ধরা পড়ে ও স্পন্দন তোলে। বইখানি কয়েক পাতা পড়িলেই লেখকের এ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। গোপালবাবুর ভাষা চলন্ত ও জীবন্ত। তাঁর নিজস্ব ষ্টাইল আছে এবং তা বেগবান।

বইখানি লেখা জেলখানাতে রোগশয্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষার মধ্যে। এই কারণেই বোধ হয় বইখানির মধ্যে গতির একটা দ্রুততা বহিয়া গিয়াছে। কর্ম্মজগতের ঘটনাবাজি দ্রুত পায়ে আসিতেছে এবং দ্রুত পায়ে সরিয়া যাইতেছে। ঠিক তারই সহিত সমান পা ফেলিয়া নায়কের

মনের ক্রিয়াব ধাবা চলিতেছে—অর্থাৎ সে সমস্ত ঘটনা অবস্থা ইত্যাদির judgement ও valuation মন সঙ্গে সঙ্গেই কবিয়া যাইতেছে। গতিই বোধ হয় গোপালবাবুর নিকট একমাত্র সত্যবস্তু। জীবন তাঁর নিকট শুধু activity, নিষ্ক্রিয়তা মানেই মৃত্যু। যে ক্ষণটী কর্ম্মহীন ব্যয়, তা তাঁর নিকট অপব্যয় ও অপমৃত্যু। এই মানসিকতাব জন্যই সমগ্র পুস্তকের আড়ালে একটী ধাবমান ও অতিক্রুত গতিবেগ দেখিতে পাই।

সাহিত্যরসিক অথচ মননস্বভাব ব্যক্তিদেব 'একদা' উপন্যাসখানি পড়িয়া দেখিতে অনুবোধ কবি। পডিযা তৃপ্তি পাইবেন—একথা বলিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ আমি বোধ করি না।

জীবনেব ও কর্ম্মক্ষেত্রেব দাবী মিটাইযা সাহিত্যেব নিরবচ্ছিন্ন সেবাব সময় লেখক পাইবেন কিনা জানিনা। যদি সাহিত্য সেবায় তিনি যত্নশীল হইতে পারেন, তবে সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত। 'একদা'তেই সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ও ইঙ্গিত রহিযাছে, সাহিত্য-সেবার সুযোগ তাঁব হউক, সাহিত্যেব স্বার্থেব জন্যই এ প্রার্থনা করি।

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

৩০নং অপাব সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসবস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

= সূচী =

দ্বিতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ | ৮ম সংখ্যা

হে অভিমন্যু—

সপ্তরথীতে ঘিবেছে তোমারে, হে আর্জুনি
বক্ষে তোমাব হানে সুকঠিন অপৌরুষেব তীব
চক্রব্যূহেব নির্মম জাল বিস্তারি দেয বুনি
চীৎকাব শোনো, হে অভিমন্যু, কৌরব গৃধিনীব।

তুমি তো রযেছো একেলা দাঁড়াযে কোথা পাণ্ডবসেনা
কোথায় তোমার অনুচরদল অযুত অক্ষৌহিনী
বৈরী-বন্ধু, একাকাব আজি কারেও যাযনা চেনা
তোমাব প্রাণের পসরারে লযে বণিকেব বিকিকিনি।

জরাজয়ী তব তরুণচিত্ত মানিবেনা পরাজয
বীরের স্বর্গ লভিবার তবে উন্মুখ মনোরথ
অগ্রগমন শৌর্য তোমাব পন্থে করেনা ভয
তুমি তো জানোনা, হে অভিমন্যু, প্রত্যাগমনপথ।

বক্ষের শিরা রণিযা ওঠে কী রূঢ় দুন্দুভি নাদে
পেশী কী তোমার ফুলিযা ওঠেনা নিষ্ফল আক্রোশে
ধর্মযুদ্ধে অধার্মিকেরা ষড়যন্ত্রেব ফাঁদে
তোমারে বধিল, হে অভিমন্যু, বীর্যবিহীন রোষে।

শ্রীক্ষিতীশ রায়

একটী অসম্ভব ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীসতীভূষণ সেন

কলিকাতা হইতে রাত্রের গাড়ীতে কখনো বাড়ী গিয়াছেন? ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ জাগিয়া দেখিলেন গাড়ী খালি—আলো নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রি অন্ধকার, সমস্ত জগৎ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘন তমসা ভেদ করিয়া মেল গাড়ী তুফান বেগে ছুটিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ—সূচিভেদ্য অন্ধকারে, কোনদিকে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না।

দূরে একটী আলোকপুঞ্জ দেখা গেল। ক্রমশঃ তাহার মধ্য হইতে একটী আলোকস্তম্ভ সামনে আসিয়া যেন আশ্বস্ত করিল। সেটী পিছনে পড়িল আর একটী সম্মুখে আসিল। এই ভাবে আলোর পর আলো। একটি আলো ম্লান হইয়া পিছনে পড়ে, সম্মুখ হইতে আর একটী আলো আগাইয়া আসে। সেটী ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে থাকে পরে আবার নিষ্প্রভ হইতে হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। একটী সহরের পাশ দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে।

ক্রমে আলোর সংখ্যা কমিয়া আসিল। নিবিড় অন্ধকারে গাড়ী ডুব মারিল। পিছনের দিকে দেখা গেল সহরের সবগুলি আলো মিলিয়া একটা আলোকপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছে। বহুক্ষণ অন্ধকারে চলিবার পরে সম্মুখে আর একটী আলোকপুঞ্জ দেখা গেল, আর একটী সহর কাছে আসিতেছে।

কিন্তু রেলগাড়ী চড়িয়া কয়েকঘণ্টার ভ্রমণ নহে, আজ আমরা বহু দূরপথে যাত্রা করিতেছি। সম্মুখে যে সুদূর পথ পড়িয়া আছে, মাইলের হিসাবে তাহার পরিচয় বুঝান যাইবে না। এতবড় একটা অঙ্ক হইবে যে, সে দূরত্ব যে কত বিশাল তাহার কোন ধারণাই হইবে না।

চন্দ্র দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। ইহার একটা ধারণা করা যায়। নয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যতদূর হয় ততদূর। সূর্য্যের দূরত্ব তাহার তিনশ' আশীগুণ। মনে মনে ইহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। যদিও আমরা এরোপ্লেনের যুগে বাস করি তথাপি একদমে সাড়ে তিন হাজার বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার কল্পনা আমাদের পক্ষেও সম্ভব নহে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটী উনত্রিশ লক্ষ মাইল। ইহাই হইল জ্যোতির্ব্বিদের মাপকাঠির ইঞ্চি। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহাদির দূরত্ব এই মাপকাঠি দিয়া মাপা হইয়া থাকে। কিন্তু সৌরজগৎ পার হইয়া গেলে এই ইঞ্চিতে আর কুলাইবে না। অসীমের সমুদ্রে আমাদের সৌরজগৎ একটী বিন্দু মাত্র।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন—আজ আমরা অসীমের সীমার সন্ধানে যাত্রা করিব। আমাদের পথ মাপিবার জন্য যে অভিনব মাইল পোষ্ট ব্যবহার করিব তাহার বর্ণনা পরে দিতেছি।

অসীমের পথ কোন্ দিকে এবং সে পথে চলিতে কোন্ যান ব্যবহার করিব?

অসীমের পথ চারিদিকে এবং সেই পথে একটী মাত্র যান চলে। যান বলিতে যাহা বুঝি তাহা নহে কিন্তু তাহাতেই আমাদের কাজ চলিবে।

শরৎ রজনীতে কোটী কোটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোটী কোটী নহে, খালি চোখে একস্থান হইতে মাত্র দুই হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয়ের একমাত্র সূত্র তাহাদের আলো। তারকা হইতে আলো তরঙ্গাকারে পৃথিবীতে আসে। জলের তরঙ্গের সহিত আলোর তরঙ্গের অনেক প্রভেদ। সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ আকারে। জলের একটী সাধারণ তরঙ্গ একহাত পর্য্যন্ত হয—এই একহাতের মধ্যে আলোর তরঙ্গ থাকে এক কোটী। জলের তরঙ্গের এক হাত যাইতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে—সেই এক সেকেণ্ডে আলোর তরঙ্গ ১৮৬,০০০ মাইল চলিযা যায।

এখানে একটী আলো জ্বালিলে আকাশে যে আলোর তরঙ্গ সৃষ্ট হইবে তাহা প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিযাশী হাজার মাইল বেগে ছুটিতে থাকিবে। তাহার একটী তরঙ্গ পৃথিবী ছাড়িযা চন্দ্রের পাশ কাটাইযা দূরে বহুদূরে তারকার রাজ্য দিযা ছুটিতে থাকিবে। আমরা যে পথে যাইব মনে করিতেছি সেই পথে। আমরা সেই তরঙ্গটীর পিঠে চড়িযাই রওনা হই।

আলোর তরঙ্গে আরোহণ করিযা আমরা তাহারই মত বেগে ছুটিতেছি। সোয়া সেকেণ্ড পরে চাঁদের পাশ দিযা যাইবার সময কৌতূহল বশে তাহার দিকে ফিরিযা চাহিলাম। কোথায সেই চাঁদ কবিরা যাহার সহিত সুন্দরীর মুখের তুলনা করিযাছেন? বিশ্রী কতকগুলি কালো পাহাড় ও কালো গুহার পাশ দিযা ছুটিতেছি। গাছ নাই, পালা নাই, জীবনের কোন চিহ্নই নাই। দূর হইতে যাহার অনুপম সৌন্দর্য্য আমাদের মুগ্ধ করে, কাছ হইতে যে তাহা এত কুৎসিত তাহা কে ভাবিযাছিল?

পাঁচ সেকেণ্ড পরে আমরা চন্দ্র পার হইযা চারগুণ দূরে গিযা পড়িযাছি। পৃথিবীকে খুবই ছোট দেখাইতেছে। আমরা চাঁদকে যতটুকু দেখি ঠিক ততটুকু। তেমনি গোল এবং তেমনি সুন্দর। পৃথিবীর হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, ফ্যাজিজ্‌ম কমিউনিজ্‌মের প্রলয প্রভৃতি সব ভুলিযা পৃথিবীর নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখিযা মুগ্ধ হইলাম। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরিযা চাহিয়া দেখি ধরিত্রীদেবী ছোট হইতে হইতে একেবারে একটী গ্রহের মত ছোট হইয়া গিযাছেন। ছেলে-বেলায ভূগোলে পড়িযাছি পৃথিবীও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতির মত সূর্য্যের একটী গ্রহ। এতদিনে তাহা ঠিকমত অনুভব করা গেল।

মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। সূর্য্যদেবের সে দাপট আর নাই। পাঁচ বছর চলার পরে সূর্য্যদেবকে অতিশয ছোট মনে হইতেছে। শরৎকালের আকাশে যে দুই হাজার তারকা মিটি মিটি করিযা আমাদের দিকে চাহিযা থাকে তাহারই একটী তারকার মত। পাঁচ বছর আলোর গতিতে চলিবার পরেও আমরা মাত্র যাত্রা সুরু করিযাছি ধরিতে হইবে। এখনো আমাদের "সহরের" তারকাদের মাঝেই আছি। এইভাবে সহস্র সহস্র

বৎসর কিম্বা লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে হইবে। সম্মুখে সূর্য্যের মত কোটী কোটী নূতন নূতন সূর্য্য মিটি মিটি করিতে করিতে আমাদের সহিত পরিচয় সুরু করিবে। তার পর ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে হইতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আলো ও উত্তাপ বিকীরণ করিয়া আবার ধীরে ধীরে ম্লান অস্পষ্ট হইয়া পিছনে পড়িয়া থাকিবে। আমরা চলিতে থাকিব।

এইবার আমাদের পথের মাপকাঠির কথায় ফিরিয়া আসি। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই সব দূরত্ব মাপিবার জন্য আলো-বছর (light-year) নামে একটী মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আলো-সেকেণ্ড হইল ১৮৬,০০০ মাইল। আলো-মিনিট হইল তাহার ষাট গুণ। আলো-বছর প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব সোয়া আলো-সেকেণ্ড। কাছের গ্রহেরা থাকেন কয়েক আলো-মিনিট দূরে। দূরের গ্রহদের বাড়ী কয়েক আলো-ঘণ্টার পথে। কিন্তু আমাদের সবচাইতে কাছে যে নক্ষত্র আছেন তাঁহার ইংরাজি নাম proxima centauri এবং তাঁহার রাজ্যের সীমা পাঁচ আলো-বছর দূরে অবস্থিত।

এইরূপে নক্ষত্রের পর নক্ষত্রের রাজ্যের সীমা পার হইতে হইতে আমরা আমাদের গন্তব্য পথে ছুটিতেছি, আকাশ যেন ক্রমশঃ নক্ষত্রহীন হইতেছে। নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। অবশেষে এমন একস্থানে আসিয়া পড়িলাম যেখানে আর নক্ষত্র নাই। আমরা শূন্য গগনের ফাঁকা যায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি। এতক্ষণ যে সব নক্ষত্র পার হইয়া আসিলাম, তাঁহারা সকলে—তন্মধ্যে আমাদের সূর্য্যও আছেন—সবাই মিলিয়া যেন দল বাঁধিয়া একত্রে বাস করেন। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি তাঁহাদের পৃথক পৃথক ভাবে আর চেনা যাইতেছে না। সকলে মিলিয়া একটী আলোক পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আরও বহুদূর নক্ষত্রহীন শূন্যের মধ্য দিয়া যাইবার পর সম্মুখে আর একটী আলোকপুঞ্জের দেখা পাইলাম। সমগ্র নভোমণ্ডল ব্যাপিয়াই এইরূপ পুঞ্জে পুঞ্জে নক্ষত্র বর্ত্তমান। দূর হইতে সবগুলি নক্ষত্রের আলো মিলিয়া যে একটী অস্পষ্ট আলো দেখা যায়, তাহারই নাম নীহারিকাপুঞ্জ (Nebula), সব চাইতে দূরের যে নীহারিকাপুঞ্জ আমরা পৃথিবী হইতে চোখে দেখিতে পাই (যেটী Andromedaয় অবস্থিত) তাহা প্রায় নয় লক্ষ আলো-বছর দূরে অবস্থিত। এই যে বিশাল দূরত্ব অসীমের তুলনায় তাহাও গোষ্পদ। আমরা সেই অসীমের সীমা বাহির করিব।

চন্দ্র, সূর্য্য. নক্ষত্র সকলেরই দেখা পাইয়াছি। কিন্তু নিশিঠাকুরাণীর কালো গলায় ছায়াপথের যে সুন্দর হারটী দেখা যায় তাহার কাছে তো এতবছরেও যাইতে পারিলাম না। পৃথিবী ঘেরিয়া এই ছায়াপথ—মনে হয় পৃথিবী বুঝি ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু আমরা ছায়াপথের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি সে যেন ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ এই কোটী কোটী নীহারিকাপুঞ্জ মিলিয়া ছায়াপথ সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব নীহারিকাপুঞ্জ অপেক্ষাকৃত নিকটে তাহাদের আমরা চিনিতে পারি—যাহারা অতি অতি দূরে তাহারা সকলে মিলিয়া আকাশে ছায়াপথ সাজাইয়া রাখে। পৃথিবী বা সূর্য্য ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে নহে—কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় পাঁচ কোটী

আলো-বছর দূরে। ইহা জ্যোতির্ব্বিদের কল্পনা নহে। কেন্দ্রের সেই নীহারিকাপুঞ্জের ফটো পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে।

বছর দুই পূর্ব্বে আট কোটী আলো-বছর দূরের একটী নীহারিকাপুঞ্জ আমেরিকার Mount Wilson observatoryর ফটোর প্লেটে ধরা পড়িয়াছে। যে দূরবীণে বন্দী করিয়া এই আলোক-রশ্মিকে ফটোর প্লেটে ফেলা হইয়াছিল—সেই দূরবীণের আয়নাখানির (observatoryর রাক্ষুসে দূরবীণে object glass এর lens এর বদলে concave mirror ব্যবহৃত হয়) ওজন একশত দশ মন। তাহার ব্যাস একশত ইঞ্চি এবং তাহা তের ইঞ্চি পুরু। এত বড় একখানা আয়নার উপযুক্ত কাচ নিখুঁতভাবে ঢালাই করা, তাহাকে ঘসিয়া মাজিয়া আয়না প্রস্তুত করা এবং ঐরূপ ভারি ও ভঙ্গুর বস্তুকে একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া দূরবীণে বসাইয়া দেওয়া যে কি ব্যাপার তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিব না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় আয়না প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বসিয়া অসীমের রহস্যভেদ করা সম্ভব হইবে না।

যে আলোকরশ্মি সেদিন ঐ ফটোর প্লেটে ধরা পড়িয়াছে সে যেদিন এই সুদূরপথে পৃথিবীর দিকে যাত্রা করিয়াছিল সেদিন পৃথিবীতে মানবের জন্ম হয় নাই। বিশালকায় সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী তখন এখানে রাজত্ব করিত। দৈর্ঘ্যে তাহারা ছিল একশত ফুট এবং ওজন হইত প্রায় দেড় হাজার মন পর্য্যন্ত। তাহারা এত ভারি ছিল যে তাহাদের পায়ে যে অত ভার কিরূপে বহন করিত তাহা বুঝা কঠিন। সম্ভবতঃ তাহারা জলে কাদায় গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকিত। মাটীর উপর শুইয়া শুইয়া একটু আধটু হাটিতেও হয়ত পারিত। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহারা কোটী কোটী বৎসর ধরণীতে রাজত্ব করিয়াছে। মানব তাহার শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি লইয়া এখনো ততদিন রাজত্ব করে নাই।

কিন্তু ঐ অতিকায় সরীসৃপেরাও চিরকাল টিকিতে পারিল না। তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও কর্ম্মক্ষম স্তন্যপায়ী জীবের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া তাহারা ধরণী পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। স্তন্যপায়ীর মধ্য হইতে ক্রমশঃ মানবের উদ্ভব হইল—অসভ্য বনমানুষ বহু পরিশ্রমে সভ্য হইল।

পৃথিবীতে যখন এইসব ঘটনা ঘটিতেছিল—এই সমস্ত সময় সেই আলোকরশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটিতেছিল। এই সেদিন মাত্র তাহা তাহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়াছে।

যে নীহারিকাপুঞ্জ এই রশ্মির ইঙ্গিত আমাদের পাঠাইয়াছে—আজ তাহার কি অবস্থা তাহা আমাদের বুঝিবার উপায় নাই। আট কোটী আলো-বছর পরে তাহার আজকের অবস্থা জানা যাইবে। ততদিনে হয়ত মানবের পরিবর্ত্তে কোন উন্নততর জীব এখানে বাস করিবে।

অসীমের সমস্ত নীহারিকাপুঞ্জের আলো দূরবীণে পাওয়ার মত বড় দূরবীণ করা যখন সম্ভব হইবে তখনো বহু নীহারিকাপুঞ্জের সন্ধান আমাদের কাছে আসিবে না। তাহাদের প্রথম

রশ্মি আজও পৃথিবীতে পৌঁছায নাই। সৃষ্টির আদিতে তাহা পৃথিবীর পথে যাত্রা করিযাছে, কবে পৌঁছিবে কে বলিতে পারে। তাহাদের অস্তিত্ব সুধু বৈজ্ঞানিকের কল্পনায়।

ছাযাপথ ভেদ কবিযা আমবা ছুটিতেছি। ফটোর প্লেটে যাহাবা ধরা দিয়াছে সেই সব নীহারিকাপুঞ্জ ভেদ করিযা প্লেটে যাহাবা ধরা পডে নাই তাহাদের পার হইয়া—যাহাদের আলো আজও পৃথিবীতে পৌঁছায নাই তাহাদেবও পিছে ফেলিযা আমরা ছুটিতেছি। এই ভাবে চলিতে চলিতে আমবা পথেব শেষে পৌঁছিব।

এখন আমরা বাডী ফিবিতে চাই। কিন্তু হিসাব করিযা দেখি সোজা নাক বরাবর চলিতে থাকিলেই অতি সহজে বাডী ফিবিতে পারিব। সেইটাই ফিবিবার সোজা পথ। কারণ শূন্যও ভূপৃষ্টের মতই গোলাকার। সোজা সামনেব দিকে চলিতে থাকিলে একদিন না একদিন পূর্ব্বেব স্থানে ফিরিযা আসিবই। কিন্তু কতকাল চলিতে হইবে? ঠিক কবিযা বলা কঠিন। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ মনে কবেন বাবশত কোটি বছর আলোর গতিতে ছুটিতে পারিলে অসীম প্রদক্ষিণ করিয়া আসা যায়। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ অনুমান কবেন আবো বেশী সময লাগিবে।

আবাব কেহ কেহ বলেন আলোব গতিব চাইতে অধিকতব বেগে চলিতে না পাবিলে আমরা কোনদিন ফিবিতে পাবিব না।

মানব ও ঈশ্বর

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

য়েরোড়া জেল, পুণা।
২৮শে আষাঢ়—১৩৪২

দিনের পর দিন আস্‌ছে আর যাচ্ছে। জেলের ভারি আবহাওয়া, কারাগৃহের করুণতা, ১৫শত কয়েদীর মনের ক্লেদ ও গ্লানি,—তারপর জেলের প্রাচীরের পর প্রাচীর, সিপাই, শান্ত্রী, কোন কিছুতেই আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে আটকে রাখ্‌তে পারছে না। কিন্তু এই যে দিন আস্‌ছে আর যাচ্ছে—কি তারা রেখে যাচ্ছে? আমার মনকে তারা কি দিয়ে যাচ্ছে?

সেই কবে সুরু করেছি ইংরাজের জেলে আস্‌তে। জেল যে কতটা নির্ম্মম হতে পারে তা এখানে আসবার পূর্ব্বে এতটা অনুভব করতে পারিনি। এখানকার ব্যবহার যে positively খারাপ তা হয়ত বল্‌তে পারব না, কিন্তু এর কোনখানেই মানবস্পর্শ নেই। সবই যন্ত্রের মত চল্‌ছে—ঠিক প্রয়োজন মেপে চল্‌ছে কিন্তু মানুষের মন প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের জন্য অনেক সময় বেশী অস্থির হয়। কয় ছটাক তেল নুন চাই, কয়টা কাপড় জামা চাই—তার খোঁজ এরা নেবে, কিন্তু এর বাইরে কোন কথাই এরা বলবে না। কেউ এসে আমাদের এখানে বসবে না—শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাও যেন আইন বিরুদ্ধ—ভদ্রতাসূচক সম্ভাষণ করা, নমস্কার জানানো সবই নিষিদ্ধ।

চারিদিকে কেবল প্রাচীর আর প্রাচীর—তালার পরে তালা, তার উপর, মানুষের মনও যেন এখানে তালাবদ্ধ ও প্রাচীর বেষ্টিত, স্বচ্ছন্দ গতি এখানে শরীর বা মন কেউ পেতে পারে না। চারিদিক থেকে শরীরটা ও মনটাকে যেন সঙ্কুচিত করতেই এরা ব্যস্ত। আর সমস্ত দিন মনটা ছট্‌ফটিয়ে মরছে একটু মুক্ত হাওয়া ও মুক্ত মানব সঙ্গ পাওয়ার জন্য। শরীর দাপিয়ে মরছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটে বেড়াবার জন্য। বাইরের দিক থেকে আজ আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আজকের সঙ্গে তুলনা করে ১৭বছর আগের চিত্র কল্পনা করতে পারি। ১৭বছর আগের অবস্থায় পড়েই এক বাঙ্গালী রাজবন্দী এই জেলে আত্মহত্যা করেন।

ছোট্ট একটি খুলিতে (cellএ) বদ্ধ হয়ে আছি। Reading jailএর সেল (cell) থেকে তবু Oscar Wilde দেখ্‌তে পেতেন,

—"That little tent of blue
which prisoners call the sky"

কিন্তু আমার এই খুলিতে (cellএ) ব'সে প্রকৃতির আকাশ তার চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা কিছুই দেখা যায় না। এমনি এদের নির্ম্মাণ কৌশল যে আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাও যেন তাদের কারাগৃহের গোপনতার মধ্যে দৃষ্টি দিতে না পারে।

আজ মনে পড়ে একদিন আমার জীবনে, তোমার জীবনে, আমাদের সকলের জীবনে ঈশ্বর বা ভগবান বলে একটা কিছু ছিল। আজ জীবন থেকে তাকে মুছে ফেলেছি—কিন্তু যখন জেলের

নিঃসঙ্গতা ও নির্ম্মমতার বোঝা বিশেষ ভারি হয়ে ওঠে—যখন এখানকার মানবস্পর্শহীন জীবন ও বাহিরের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কালিমা দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করে দেয়, তখন মনে হয় হয়তবা ভগবানকে মুছে না ফেললে, একটা মিথ্যাকে আশ্রয় করেও শান্তি পেতাম। কিন্তু অমনি মনের সজীবতা ধাক্কা দিয়ে সুপ্তি থেকে নিজেকে জাগিয়ে দেয়। নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা নিয়ে অপরের দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করতে মন লজ্জিত হয়, নিজের সৃষ্টিকর্ত্তার কাছেও এই দুর্ব্বলতার লজ্জা নিয়ে যাওয়া চলে না।

তাই মন তার নিজের মধ্যে শান্তি ও শক্তির সন্ধান করে। আর শক্তির সন্ধান করে নিজের স্মৃতির মধ্যে। নিজের স্মৃতির মধ্যে কত প্রিয় সম্ভাষণ জমে আছে, কত প্রিয় সঙ্গ সেখানে সঞ্চিত আছে, কত স্নেহ, ভালবাসা, কত প্রীতি কত আশা, কত মাধুর্য্য সেখানে আছে। আমার 'ব্যথার পূজার' দেবতাও সেই স্মৃতির মধ্যেই আছেন। নিজের জীবনের সঙ্গ ও সাহচর্য্যের ভিতর, নিজের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার ভিতর, নিজের জীবনের সুখ দুঃখের ভিতর, নিজের জীবনের আবেষ্টন ও পরিস্ফুটনের ভিতর, আর সঙ্কোচ ও বিকাশের ভিতর যে দেবতাকে না পাব, তাকে কোনো এক অবোধ্য, অগম্য, অদৃষ্ট, অনানুভাব্য গণ্ডির মধ্যে যেয়ে কি পাওয়া যায়? আর পেলেই বা তা দিয়ে আমার কি কাজ হবে? অর্জ্জুন যখন তাঁরই বন্ধু কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখ্‌তে পেলেন, তখনই তাঁর সব সাধনা সার্থক হয়েছিল। যশোদা একদিন গোপালের মাঝেই তাঁর চরম দেখা দেখে নিয়েছিলেন। আর সেই দেখার মধ্যেই তার সমস্ত ধর্ম্ম সাধনা বিকশিত হোয়েছিল। বাংলার ধর্ম্ম সাধনার আর এক রূপ ফুটে উঠেছিল হিমালয়-কন্যা উমাকে আশ্রয় ক'রে।

মানুষ ও তার আরাধ্য দেব বা দেবীর সঙ্গে এক মধুর সম্পর্কের স্মৃতি দেখছি উমা-জননী মেনকার বিলাপে—

> "গিরিবর, আর আমি পারি নে হে
> প্রবোধ দিতে উমারে।
> উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
> নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।"

তাই আমার জীবন থেকেও পোষাকী ভগবানকে বিদায় দিয়ে এই নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মম দিনেও আপশোষ করি না।

২৯শে আষাঢ়—

কাল লিখেছি জীবনথেকে পোষাকী ভগবানকে বিদায় দিয়ে আজও আপশোষ করি না।

কথাটা আজ বহুবার মনের মধ্যে জেগেছে। এই যে একটি ঈশ্বর বা বা ভগবান সৃষ্টি ক'রে মানুষ তার মনকে জড়িয়ে রাখে—এর সার্থকতা কি? Theology তে যে God আমরা পড়তে পাই বা সাধারণ লোকে হল্লা ক'রে সোরগোল ক'রে বিধিবদ্ধ শব্দ আওড়িয়ে নানাভাবে যে ঈশ্বরের পূজা বা আরাধনা করে, তার সঙ্গে মানবজীবনের যে কি logical সম্পর্ক

থাকতে পারে বুঝি না। আমার দুইটা স্তোক বাক্য, বা স্তুতি বা সাধারণ ভাষায় যাকে বলে তোষামোদ—তা দিয়ে যে ভগবানের দয়া কিনতে হয়—আমার কাজের পূজা, আমার আত্মাহুতির পূজা যে দেবতার দয়া পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়—সে খেয়ালী ভগবানের দয়ার মূল্য আমার কাছে কতটুকু? সেদিন দেখলাম মহাত্মাজী প্রার্থনার খুব সুখ্যাতি করেছেন। তাঁর philosophy of life অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পারিনা। এটাও ঠিক বুঝতে পারলাম না।

প্রার্থনার একটা subjective value থাকতে পারে—কিন্তু এর objective value যে কি থাকতে পারে, বুঝি না। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সবাই দুঃখে কেঁদে থাকে—কেউ সরবে, কেউ নীরবে। এই ক্রন্দনের মাঝে একটা সান্ত্বনাও তারা পায়। অন্তরের সঞ্চিত দুঃখভার অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়—ঐ কাঁদার ভিতর দিয়ে। মা ধারে থাকলে শিশু মার কাছে যেয়ে কাঁদে, মা ধারে না থাকলে মাকে স্মরণ করে সে কাঁদে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকও অনেক সময় তাই করে। এই যে কাঁদা এটা হ'ল তার নিজের কাছে তার নিজের ব্যাথার পূজা—outpouring of his heart to himself

ঠিক তেমনি বা তার চেয়েও বড় শান্তি সে পায় সঙ্গীতে, কাব্যে, শিল্পে, ও প্রকৃতির লীলায়। চরম দুঃখের সময় নিজেকে শোনাবার জন্যই সে গান গায়, কবিতা পড়ে, নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্যই লোকে দুঃখের সময় প্রকৃতির লীলায় ডুবে থাকতে ভালবাসে, চিত্রে শিল্পে মগ্ন হ'য়ে থাকতে চায়। তার অন্তরের দেবতার পূজা সে এই ভাবেই সম্পন্ন করে। তারপর—তার শান্তি পাবার, তার অন্তর দেবতার পূজার আরও পথ আছে। অতীতের প্রিয় স্মৃতি, ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনার সাহায্যেও মানুষ সেই শান্তি পেতে পারে। এবং পেয়েও থাকে। ঠিক তেমনি—যার এই সব কোনো অবলম্বন নেই—সে তার কল্পিত ঈশ্বর বা ভগবানের প্রার্থনায়, পূজায় সেই শান্তি পেতে পারে। এটা একেবারেই নিছক subjective। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মানুষের aesthetic sense—তার কাব্য-বুদ্ধি প্রায় কিছুই ছিল না—যখন মানুষের মনে প্রেম ও প্রীতির চেয়ে হিংস্রতার প্রভাই বড় ছিল, যখন সে প্রকৃতির নগ্ন নিষ্ঠুরতাকে নিজের সৃষ্টির সাহায্যে মাধুর্য্যময় করে তুলতে পারে নি, যখন বাহ্য আবেষ্টন তার জীবনের সর্ব্বময় প্রভু ছিল, তখন তার পক্ষে ঐ কল্পিত ঈশ্বর বা ভগবানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ মানুষ তেমন নিঃসহায় নয়, তেমন প্রেম, প্রীতি হীন নয়, তেমন সৌন্দর্য্য-ও কাব্য-বুদ্ধি হীন নয়, প্রকৃতি আজ তার কাছে হিংস্র ও কদর্য্য প্রভু নয়—আজ তার অনুভূতি (feeling) ও বুদ্ধির (intellect) সম্পদ ও সৌন্দর্য্য দিয়ে সবটা জয় করেছে, সুন্দর করেছে, মাধুর্য্যময় করেছে—আজ আর তাকে ধার করা ভগবানের আশ্রয় নিয়ে, মিথ্যার অঞ্জলি সাজিয়ে শান্তি ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে কেন?

'যাঁকে কখনও দেখি নাই, কারাগৃহের নিঃসঙ্গ জীবনে সেই ভগবানের চিন্তায় যে শান্তি পেতে পারব—যে শক্তি পেতে পারব, তার চেয়ে কি অনেক বেশী শান্তি ও শক্তি পাব না নিজের প্রিয় চিন্তায়? এই বয়স পর্য্যন্ত জীবনের যা কিছু সঞ্চয় তা সবই হ'ল প্রেয়কে আশ্রয় ক'রে। সেই প্রেয় হয়ত জীবনে বহুরূপেই এসেছে—বহুরূপেই তাকে পেয়েছি, বহুরূপেই তাকে

পূজেছি, আজও বন্ধুরূপেই সে আমার মনে জেগে আছে। নিজের কর্ম্মধারায়, চিন্তাধারায়, সঙ্গে সাহচর্য্যে সেই প্রেম জড়িয়ে আছে,—এবং সেই আমাকে ভবিষ্যতের আশায় জিইয়ে রাখ্ছে। তাই আমার আজকার পূজাও তারই পায়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রারম্ভে একটা নিঃসহায় মাংসপিণ্ড হয়ে এসেছিলাম—ধার্ম্মিকদের ভগবানে আমাকে তাই করে পাঠিয়েছিলেন। যাদের আশ্রয় ক'রে ভগবানের বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে—জীবনের এখানে এসে পৌঁছেছি—তাদের চেয়ে এক ভগবানকে, যিনি আমাকে নিঃসহায় অবস্থায় হিংস্র আবেষ্টনের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আজ যদি বড় করে দেখি, সেটা হবে অকৃতজ্ঞতার পাপ। দেহ ও মনের সম্পদ আজ যা আমার আছে—তার ঋণ কার কাছে? অন্ততঃ ধার্ম্মিকদের ভগবানের কাছে নয়।

৩০শে আষাঢ়

কাল একটা প্রশ্ন তুলেছি দেহ ও মনের আজ যা সম্পদ আমার আছে—সে ঋণ কার কাছে?

ধার্ম্মিকগণ জবাব দিবেন—ভগবানের কাছে। ছোট কাল থেকে কথাটা শুনে শুনে এমনি এতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি যে, এর অন্য কোনো উত্তর ভাবতে কষ্ট হয়। বড় জোর হয়ত ভগবান যখন মান্তে রাজী না, তখন প্রকৃতি দেবীকে তার স্থানে বসিয়ে তুষ্ট হব। কিন্তু যেই আমাকে সৃষ্টি করে থাকুক personal God বা ঈশ্বরই হোক বা অন্ধ প্রকৃতিই হোক, আমার জন্ম মুহূর্ত্তে যে ভাবে সে আমাকে বিশ্বে পাঠিয়েছে তার জন্য তার কাছে বেশী কৃতজ্ঞ হবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। নিজের দেহ ও মনের কোন বল কোন সম্পদই আমাকে দিয়ে দেন্ নি—আর বাইরের আবেষ্টনকে এমনি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর করে গড়েছেন, যে সে তার রক্তাক্ত দশন নিয়ে আমার কচি মন ও দেহকে চিবিয়ে খেতেই উদগ্রীব, সে অবস্থায় মরে যাওয়াই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাই কঠিন। ভিতরের নিঃসহয়তা ও বাইরের নির্ম্মমতা থেকে বেঁচে আজ দেহ ও মনের যে সম্পদ পেয়েছি—তার জন্য ঋণ যদি কারুর কাছে স্বীকার করতে হয়, তবে God বা ঈশ্বর বা প্রকৃতির কাছে নয়—সে ঋণ মানব সমাজের কাছে। গণ্ডিকে ছোট ক'রে নিজের পিতামাতা, ভাইবোনদের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইনা, সমাজের নানা স্তর থেকে যে সব উপহার ও উপঢৌকন পেয়ে পেয়ে আমার দেহ ও মন পুষ্ট হয়েছে, তাদের সবার কাছেই ঋণ মেনে নিচ্ছি। গীতায় এই ঋণকে স্মরণ ক'রেই বোধ হয় বলেছে—যজ্ঞ করে এর শোধ না দিলে, পাপ ভক্ষণ করা হয়। কেবল গীতার শ্লোকের মধ্যে "দেবাঃ (দেবতাগণ) শব্দের বদলে "সমাজ" শব্দ বসিয়ে নিতে হবে।

"দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবযন্তু বঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ,"

৩য় অধ্যায়ঃ

সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রেই কদর্য্যতা ও নিষ্ঠুরতার খেলা যতটা দেখ্তে পাই, সৌন্দর্য্য ও কোমলতার খেলা ততটা পাইনা; ধ্বংসের মধ্যেই যেন সমস্ত সৃষ্টির শেষ পরিণতি—এতেই তার আনন্দ।

তুনিয়াতে potential creation (সম্ভাব্য বা সুপ্ত সৃষ্টি) যা আছে তার শতাংশও kinetic creationএ (বাস্তব সৃষ্টিতে) পরিণত হবার সুযোগ পায়না। জন্মের পূর্ব্বেই এরা ঝ'রে পড়ে।

কবি হয়ত বলবেন :

"জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

এটা হ'ল মানুষের কাব্য-দৃষ্টি—মানুষের সৌন্দর্য্য বুদ্ধির কথা। যে ফুল না ফুটতে ঝরে প'ড়েছে—তার ভিতর যে আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা আছে—সে ত' মানবের কাব্যকথায় তুষ্ট হ'তে পারে না। পুষ্প কোরকের কোমল কামনাকে ত প্রকৃতি কোনো খাতিরই করল না। বটবৃক্ষের লক্ষ লক্ষ বীজের মধ্যে হয়ত তুই একটির বুকের কামনা রূপ ধরে' সবুজ আকাশের গায় নিজের সবুজ অঞ্জলি পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আর সব অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কোথায় ডুবে যায়।

তারপর চেয়ে দেখ জীব জগতে—সেখানেও একই ধ্বংসের লীলা চলেছে। কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী—কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী—অকালে মৃত্যুর আবর্ত্তে ডুবে যাচ্ছে। পৃথিবীর আলো বাতাস দেখবারও এদের অবসর হয় না। বড় হ'য়ে একে অপরকে খাচ্ছে, মারছে—এ নইলে যেন এদের জীবন ধারণই চলে না। আর এর নামই হ'ল Struggle for Existence and Survival of the Fittest.

তারপর এলাম মানুষের জগতে। সৃষ্টির স্বাভাবিক লীলাকে—তার তাণ্ডব লীলাকে—মানুষ সংযত ক'রে নিয়ে, তবে বেঁচে আছে। এখানেই হ'ল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ যেদিন সৃষ্টির ধ্বংস লীলাকে জয় করতে পারল—সে দিনই তার কাছে রুদ্র হ'ল শিব—মঙ্গলময়। সে দিনই ধ্বংসের দেবতা হ'ল তার কাছে নটরাজ। আকাশের বিদ্যুতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হ'ল দাহন করা, মৃত্যুর বাহন সে। কিন্তু মানুষ সেই বিদ্যুতকে আয়ত্ত করে নিয়েছে—তাই আজ রুদ্ধ আলো বাতাস হীন কক্ষে (cell) বিদ্যুতের আলো ও পাখার সাহায্যে এ সব লিখ্‌ছি।

বাইরের প্রকৃতির ধ্বংসলীলাকেও সে যেমন জয় করেছে, নিজের অন্তরের কদর্য্যতাকেও সে তেমনি জয় করেছে। স্বাভাবিক হিংস্রতার বদলে সে নিজের অন্তরে প্রেম ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা করছে, নগ্ন লোলুপতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে খর্ব্ব করে সে সংযম ও পরার্থবোধকে জাগিয়েছে, দেহের ক্ষুধাকে দমন ক'রে অন্তরের ক্ষুধাকে প্রবল করেছে, কদর্য্য কামলালসাকে দাবিয়ে সে তার কাব্য-বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে বড় করেছে। যুগ যুগ সঞ্চিত মানব সমাজের এইসব সাধনা ও অর্জ্জিত ধনের উত্তরাধিকার যাদের দয়ায় পেয়েছি—তাদের চেয়ে কোন্ দেবতা আমার কাছে বড় হতে পারে?

অবশ্য এ থেকে মনে ক'রো না—সৃষ্টির সঙ্গে ভাল বলে কিছুই মানব-শিশু পায়নি। তা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয়। বটবীজের মধ্যে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবার একটা সুপ্ত কামনা যেমন আছে, তেমনি মানব-শিশুর দেহ ও মনের সৃষ্টির সময়েই একটা অন্ধ কামনা থাকে সুন্দর হবার, মহৎ

হবার, শক্তিমান হবার, প্রিয় হবার। কিন্তু এই কামনা ও তা সফল করবার শক্তি, তার মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ—অথচ তার ভিতরে ও বাহিরে এর বিরুদ্ধ কামনা ও শক্তি অত্যন্ত প্রবল।

এবং এই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি ও কামনার বশেই মানুষ নিষ্ঠুর হয়, কুৎসিৎ হয়, নির্ম্মম হয়। আজ যে আবেষ্টনের ভিতর বসে এ সব লিখ্‌ছি, সেখানে মানুষের এই দিকটা এতই প্রবল যে তলিয়ে না দেখ্‌লে সমস্ত মানুষ জাতটার উপর ধিক্কার জন্মে যায়। মানুষ যেখানে চেষ্টা ক'রে সুন্দর ও মহৎ না হয়, যেখানে সে স্বাভাবিকতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়, সেখানেই তার সৃষ্টিদত্ত রূপ ফুটে ওঠে। এইসব প্রতিষ্ঠানে তা বিশেষ করে দেখা যায়। এ সব কতকটা যেন impersonal organisation—এখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন জনসঙ্ঘের moral বা aesthetic sense নৈতিক বা সৌন্দর্য্যবুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ নেই। এখানকার কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগত জীবনে যা অন্যায় বলে মনে করবে, এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তারা অম্লান বদনে তা করে যাচ্ছে। এর কোন কাজের জন্যই এরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী নয়—এখানকার ভালমন্দর ছাপ তাদের জীবনে লাগে বলে' এরা মনে করে না। এই সব প্রতিষ্ঠান প্রকৃতির মতই নিষ্ঠুর machine—এর কর্ম্মচারীরা তারই অঙ্গ।

যারা এ সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রচলিত ভাষায় সবাই ধর্ম্মভীরু তারা, ঈশ্বর ও ভগবানে বিশ্বাসী। কিন্তু এমন নিরেট করেই এরা সব গড়েছে—তাদের ভাষায় তারা যাকে ঈশ্বর বলবে—সেও যেন এর কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে না পায়। ঈশ্বরের কল্পনা মানব মনে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে মানুষের আদিম স্বভাবধর্ম্মকে—তার সৃষ্টিলব্ধ কদর্য্যতা ও নির্ম্মমতাকে দমন ক'রে রাখ্‌তে অনেক সাহায্য করেছে। এ সব প্রতিষ্ঠান গড়বার সময় মানুষ এমন মন নিয়েই গড়েছে যেন তার ঈশ্বরবুদ্ধি এসে সৃষ্টির স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা ও কদর্য্যতাকে খর্ব্ব না করে। তাই নিজেদের মনকে ও নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে চারিদিক দিয়ে বেঁধেছেঁদেই তারা এ সব গড়েছে।

তাই কবি গেয়েছেন :

"That every prison that men build
Is built with bricks of shame,
And bound with bars lest Christ should see
How men their brothers maim.
With bars they blur the gracious moon,
And blind the goodly Sun.
And they do well to hide their Hell,
For in it things are done
That son of God nor son of Man
Ever should look upon ?"

কবির এই কথার মধ্যে যেখানে ঈশ্বরের ইঙ্গিত আছে—সেখানে যদি আমার ভাষায় মানবের কাব্য-বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি বসিয়ে নিই, তবে এসব প্রতিষ্ঠানের সঠিক ব্যাখ্যা পেতে পারি। মানুষ তার primordial ferociousness—তার আদিম নিষ্ঠুরতাকে খু'লে দিয়েছে এখানে।

প্রতিমাসে এ জেলে ২।১ টা ফাঁসী হচ্ছে। আমাদেরই পাশে ফাঁসীর লোকগুলো থাকে। ইন্দ্রের সিংহাসনের মত ফাঁসীর কক্ষ (cell) গুলোতে একের পর এক করে লোক আসছে আর চলে যাচ্ছে। সে দিন একটা শিখের ফাঁসী হ'ল।

ফাঁসী কক্ষ থেকে যাবার সময় 'সৎশ্রী আকাল' 'সৎশ্রী আকাল' বলে চীৎকার করতে করতে সে চলে' গেল।

দূর থেকে এদের অনুভব ক'রে আমাদের মনে যে আঘাত লাগে— এখানকার কর্ম্মচারীদের মনে সামনে দাঁড়িয়ে ফাঁসীমঞ্চে ঝুলিয়ে দিয়েও সে আঘাত লাগে না। কারণ তারা জানে এ ক্ষেত্রে তারা মানুষ নয়—part of a machine, প্রকৃতির ধ্বংস লীলার একটা সামান্য ক্ষেত্রে তারা একটু জোগান দিচ্ছে। সেই আদিম যুগের অবশেষ এই সব জেল—আজও এ সব চলছে। সমস্ত মানব সমাজের—যারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মে বিশ্বাসবান—তাদের ধর্ম্মবোধ এতটুকুও মাথা নাড়া দেয় না। পৃথিবীর সব দেশের এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানই একই ধারা বেয়ে চলেছে—এদেশ ওদেশের পার্থক্য বিশেষ নেই। এ আশা আমরা করি—মানুষ যেদিন তার human relationএর দিক থেকে দেখবে, যেদিন তার কাজকর্ম্মে human touchকে সে বড় করে দেখবে, সেদিন এসব প্রতিষ্ঠানের চেহারা বদলে যাবে।

ক্রমশঃ

সুমেরু

শ্রীবিনোদ চৌধুরী

কারাপ্রাচীরের উঁচু দেয়ালের অভ্যন্তরের যে পৃথিবী তাহা এত আরামদায়ক এবং নিরাপদ যে বহির্জগতের লোকের কাছে হয়ত এই কথা অদ্ভুত শুনাইবে। জেলখানা তো জেলখানা—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম—ঘানি টানা, নারিকেলের ছোবড়া দলিয়া পিষিয়া দড়ি তৈয়ার করা ইত্যাদি অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। এবং এর যদি ব্যতিক্রম হয় তবে ডাণ্ডাবেড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠিপেটা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় শাস্তিবিধান। এই নয় কি সাধারণ লোকের ধারণা?

কিন্তু জেলে যে আরাম আছে একথা বুঝান কষ্টসাধ্য। দুখানা মোটা কাল কম্বলের, কাল দাগকাটা দুটি হাফ্‌প্যাণ্টের, একখানা গামছা এবং একটি জামার কি যে মোহ তাহা অনেকের বুদ্ধির অগম্য। সকালের লাপ্‌সি টিফিনের আর দুবেলা মাপকরা ডালভাত তরকারীর বা কি এমন যাদু থাকিতে পারে অনুমান করা সত্যিই কঠিন। সন্ধ্যায় ঘরে তালাবন্ধ হইয়া এবং সকালে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঘুম হইতে উঠিয়া 'ফাইল' করিয়া বসিয়া 'সরকার সালাম' বলাতেও বা কি সুখ অনেকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য। তারপর সবচেয়ে বড় অসুবিধা যা প্রত্যেকের কাছেই অনুভূত হইবে সে নেশার সামগ্রীর অভাব—তামাকসেবীর তামাক, আফিংখোরের আফিং—মদ, গাঁজা, চরসের কথা বাদই দেওয়া গেল। কয়েদীরা এই সবের অভাব অনুভব করে না কি?

তবে জেলখানায় স্থান সঙ্কুলান হয় না কেন? আর একটা লোক জেলখানারূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যেই একবার বাহির হয় সেইবা কি করিয়া আবার এমন নরকে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে ভাবিবার বিষয়—পণ্ডিতেরা গবেষণা করিবেন। আমাদের এত মাথা ব্যাথায় কাজ কি? জেলের কয়েদী সুমেরুকে লইয়াই আমার গল্প, তাঁহার কথাই আরম্ভ করা যাক্।

সুমেরুর নিজের স্ত্রীকে খুন করিবার অপরাধে সাজা হয় বিশ বছরের। ত্রিশ বছর বয়সে জেলে ঢুকিয়া সে এখন প্রায় বুড়া হইয়া গিয়াছে। তবু তার হাসিতামাসা নাচগানে জেল অনেক সময় আনন্দমুখর হইয়া উঠে। মেথরের কাজ করিয়া সে তাহার বন্দীজীবন একরকম শেষ করিয়া আনিয়াছিল। ঐ কাজে সে ওস্তাদ্। দুই মিনিটে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফিনাইল বা ছাই ঢালিয়া মেথরের কাজটী ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া রাখে, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা সে দুচোখে দেখিতে পারে না।

অনুসন্ধিৎসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"হ্যাঁরে সুমেরু, এত কাজ ফেলে তুই মেথরের কাজ নিলি কেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুমেরু খুব খানিকটা হাসিয়াছিল—যেন আমি একটা আস্ত বোকা। তারপর উত্তর দিয়াছিল, "বাবু জেলে'র চেয়ে সুখের চাকরী আর নাই। খাটুনি কম, একটু তেল সাবানও

মিলে। আব মাঝে মাঝে এক টুকরা মাছ আব দু তিন টুকবা মাংস বেশী খেতে পাই। আব গোটা চাব বিড়িও পাই—ও জিনিষটা না হলে বাবু আমাব একদম চলে না।"

ঐ কথাব আর জবাব খুঁজিয়া পাই নাই। জেলে সুমেরুর সংসার ছোট নহে। তার 'পাগলা' আর 'বুড়ী' মাছ ছাড়া ভাত মুখেই দিতে চায না। এই পাগলা আব বুড়ীকে লইযা তাহার যত বিপদ এবং ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয। মেথবের কাজ করিয়া হাত পা ভাল কবিযা না ধুইলে পাগলাতো কাছেই আসিতে চায না। আব বাত্রে একখানা কম্বল পাতিয়া না দিলে বুড়ীর ভাল ঘুমই হয না। সমস্ত দিন সুমেরুব পিছে পিছে ঘুবিযা পাগলা আব বুড়ী সুমেরুকে যতই উত্যক্ত করুক না কেন সুমেরু তাহা মোটেই গায মাখে না। ববং তাহাদেব না দেখিলে সুমেরুব মন হা হুতাশ কবে। তাহাদেব কোলে পিঠে কবিযা মানুষ কবিযাছে সুমেরু। তাহাদের অসুখ বিসুখে যেন সুমেরুব সমূহ বিপদ। কাছে বসিয়া আদব কবিযা খাওযাইতে সুমেরুব বোজ দুই ঘণ্টা সময নষ্ট হইযা যায। এই জন্য মাঝে মাঝে কোন কোন নূতন সিপাহীর চোখ রাঙানীও তাহাকে সহ্য কবিতে হয। কিন্তু স্নেহেব এমনই স্বভাব, প্রিযজনেব জন্য স্নেহেব বশে মানুষ কি না করিতে পারে। রাত্রে আদব কবিযা গাযে হাত বুলাইযা বুড়ীকে সুমেরুর ঘুম পাড়াইতে হয। বুড়ো বযসে সুমেরুব কতই না ঝঞ্ঝাট।

ঠাট্টা করিযা সুমেরুকে একদিন বলিযাছিলাম, "সুমেরু তোব মেযাদ যে ফুবাযে এলো। অল্পদিনের মধ্যেই তো ছাড়া পাবি। পাগলা ও বুড়ীকে নিযে যেতে পারবি তো? আগে থেকে 'হুকুম' আনিযে নে।"

সুমেরু শুনিযা হাউ হাউ কবিযা কাঁদিযা দিযাছিল। আশ্চর্য্য বোধ কবিযাছিলাম। জেলখানার কি এত মোহ সুমেরুকে পাইযা বসিযাছে। বাইবেব পৃথিবীকে এই কয বছবে সে কি কবিযা ভুলিযা গেল যে ছাড়া পাইবাব কথা শুনিলে সে ভযে শিহরিযা উঠে। এমন অদ্ভুত কযেদী আরও কত আছে কে জানে? জেল-অন্ত প্রাণ সুমেরু। বেচাবীব জন্য সত্যিই দুঃখ হয। বহিঃপৃথিবীর মানুষ, আজ আলো বাতাসেব ভযে অস্থিব হইযা পড়ে। সাত "খাতায" শুইযা আর জেলের মেথরের কাজ কবিযা করিযা সে এত বদলাইযা গিযাছে কেমন করিযা? সাঁওতাল পবগণায তাব যে বাড়ী ছিল সে উহা ভুলিযা গিযাছে। মহুযার বনে ঘুবিযা ঘুবিযা যে মানুষ হইযাছিল আজ সে অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে তার পাগলা ও বুড়ীকে পাইযা নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত করিতেছে ভাবিলে সত্যিই আশ্চর্য্য হইতে হয।

জেলখানার প্রত্যেক কযেদীই সুমেরুকে ভালবাসে। সাদা সার্জেণ্ট হইতে পাঞ্জাবী বেহারী সিপাই শাস্ত্রী, 'জেলর' বাবু হইতে "সুপার" প্রত্যেকেরই সুমেরুর প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব আছে দেখিযাছি। সুমেরু যেন জেলেব নিজস্ব মানুষ। সুমেরুকে না হইলে জেল চলে না আর সুমেরুও জেল ছাড়িতে চাহে না। অনেকদিন সুমেরুকে বলিতে শুনিযাছি, "বাবু আমি যেন জেলেই মরিতে পারি।" এযে তাহার অন্তরের একান্ত কামনা তাহাব বলিবার ভঙ্গী এবং চোখ মুখেব চেহারা

হইতেই অনুমান করিয়াছিলাম। হতভাগা সুমেরু—সাঁওতালী—মুক্ত প্রকৃতি হারাইয়া তোমার একি অধঃপতন হইযাছে বলিযা অনেকদিন চিন্তা কবিযাছি। অত্যন্ত আশ্চর্য্য লাগিয়াছে।

দুপুর দুইটা পর্য্যন্ত সুমেরুব ছুটি। তখন সে প্রায়ই পাড়া বেডাইতে বাহির হয, অবশ্য জেলখানাব পাডাটি একটি ওযার্ডেই অবস্থিত। সাত নম্বর ওয়ার্ডে'ই সুমেরুর বাড়ী। সে পাডার প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই সুমেরু যায আব তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনে। অবশ্য পাগলা ও বুড়ী তাহাব সাথে সাথে থাকে। যেদিন পাগলা ও বুড়ী সাথে থাকে না সেদিন অন্যান্য কয়েদীদের অনুরোধে আধা হিন্দি ও বাংলায কোমব নাচাইযা গান করিতে হয়। সুমেরু কাহারো অনুরোধই প্রত্যাখান কবিতে পারে না। কিন্তু পাগলা ও বুড়ীর সামনে সুমেরু লজ্জায় গাইতে পারে না, নাচাতো দূরের কথা। বুড়ো মানুষ সুমেরুকে নাচায বলিযা অনেকদিন অনেককে মন্দ বলিয়াছি। কিন্তু প্রত্যেকেব মুখেই শুনিযাছি সুমেরুকে নাচিতে আর গাইতে না বলিলে নাকি সে মনে মনে দুঃখিত হয। হতভাগার মনের এ আবাব কি খেযাল কে জানে।

মাস ছ'সাত আগে পাগলা আব বুড়ীব এক ছেলে হইযাছিল। সুমেরুব তখন কি আনন্দই না দেখিয়াছি। পাঁচদিনের শিশুকে কোলে লইযা আদর করিয়া চুমো খাইযা সুমেরুর জীবনে ঐ পাঁচটা দিন কি সুখেই না অতিবাহিত হইতে দেখিযাছি। বুড়ীব ছেলে হইবে যখন সুমেরুর কাছে প্রতীযমান হইয়াছিল তখন হইতে কি আদব যত্নেই না সুমেরু বুড়ীকে খাওযাইয়াছে। বুড়ীর সামান্য সুযোগ সুবিধার জন্য সুমেরু জেলখানাব ডাক্তাববাবুর হাতে পাযে ধরিযা কাকুতি মিনতি করিয়াছে। সুমেরুতো বুড়ীর সন্তান হইবে এ বকম আশা এক বকম ছাড়িযাই দিয়াছিল। কিন্তু তাহার সুখে বাদ সাধিবার জন্য যে বুড়ীব ছেলে হইবে একি সুমেরু কোনদিন কল্পনা কবিয়াছিল? দিনের পর দিন কত আশা এবং আকাঙ্ক্ষা লইযা সুমেরু বুড়ীব ছেলেব জন্মদিনের জন্য প্রতীক্ষা কবিয়াছে। জেলেব প্রত্যেকেব কাছে সে গল্প করিযা বেডাইযাছে তাহাব বুড়ীর ছেলে হইবে। প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করিযা জানিযা লইয়াছে বুড়ীকে কি খাওয়াইলে ভাল হইবে। একদিন দুপুরে শুইয়া ছিলাম সুমেরু আসিযা সালাম্ দিযা কাছে বসিল। অনুমান করিলাম কোন মতলব আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কি মনে করে? ভাল আছিস্‌তো?" সুমেরু তাহার সুমুখের উঁচু দাঁত বাহির করিয়া হাসিযা উত্তব দিযাছিল, "বাবু আপনাদের দোযায় আমার কিসের অভাব। আর যে কদিন বাঁচি জেলেই যেন কাটাইতে পারি সে দোয়া করুন।"

তারপর সুমেরু একটু গম্ভীব হইযা বলে, "বাবু আমার বুড়ীর ছেলে হইবে তাই একটু হমিপথি ওষুধ নিতে আসিয়াছি।"

কথা শুনিয়া হাসিযা বলিয়া উঠিযাছিলাম "দূর বোকা! আমি কি ডাক্তার যে আমার কাছে ঔষধ আছে?"

আমার কথা শুনিযা সুমেরুব চোখ মুখ এমন দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে আমিও যেন কিরূপ অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। তাহার বুড়ী নাকি দুদিন ধরিয়া কিছুই মুখে দিতেছে

ভীষণ কষ্ট। উঠিয়া—চক্রবর্ত্তীর কাছ হইতে একটা ঔষধ আনিয়া দিলাম। তখন তাহার কি না। আনন্দ। বার দুই সেলাম ঠুকিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইযাছে এই ভাব দেখাইযা দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া গেল। তারপরে আর তার কোন খোঁজ নেওয়া হইযা উঠে নাই।

* * * *

একদিন খুব ভোরে একটা কাতর গোঙানি শুনিযা ঘুম ভাঙ্গিযা গেল। সাত নং ওয়ার্ডে ভীষণ হট্টগোল সুরু হইয়াছে। আব সার্জ্জেন্ট সিপাহী অনেকে সেখানে জমা হইযাছে। সুমেরু মাটিতে পড়িয়া মাথা আছড়াইযা কাঁদিতেছে। বুড়োর এরূপ হৃদযবিদারক আর্ত্তনাদে সবাই তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কিন্তু সুমেরুকে প্রবোধ মানান যাইতেছে না। খবর লইযা আদ্যোপান্ত জানিলাম। পাঁচদিন আগে বুড়ীর এক ছেলে হয।—সুমেরু তাহার নাম দিযাছিল 'ঝুমরু'। আজ প্রাতে সুমেরুর নিজের পাযের নীচে পড়িযা ঝুমরু প্রাণ হারাইযাছে। ঝুমরুর মুখ দিযা এক ঝলক তাজা টাটকা রক্ত বাহির হইযাছিল। আর বার দুই কোন মতে ম্যাঁও ম্যাঁও করিযা সুমেরুর কোলেই ঝুমরু শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। পাগলা ও বুড়ী ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে আর সুমেরু মাথা কুটিযা ও হাহাকার করিয়া সমস্ত জেলখানা অস্থির করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসহায স্নেহান্ধ সুমেরু। তাহার এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা জানাইযা তাহাকে আরো কাঁদাইতে মন চাহিল না। ইউরোপীয সার্জ্জেন্টরা মুখ টিপিযা হাসিতেছে দেখিলাম। কয়েদীদের অনেকে সুমেরুর দুঃখে ব্যথিত হইযাছে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সুমেরুর যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ হইবে কি করিযা। সিপাহীদের লাঠির ভযে সব কযেদীই নিজ নিজ কাজে চলিযা গেল। কেবল সুমেরু, পাগলা ও বুড়ী ঐখানে পড়িযা রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জানালা দিযা এই করুণ দৃশ্য দেখিলাম। সত্যই মনটা একটা অব্যক্ত বেদনায ভরপূর হইযাছিল। পাষাণপুরীর খুনী আসামী সুমেরুর হৃদয়ে এত স্নেহ মমতা কি করিযা থাকিতে পারে ভাবিযা ভাবিযা অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিযাছি। কাটখোট্টা, রোগা, কাল আবলুসের মত চেহারা সুমেরুর এত দুঃখ কিসের জন্য। এই সুমেরুইতো অন্যায় অপরাধের শাস্তি বিধান করিতে যাইয়া স্ত্রীকে নিজ হাতে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াছিল।

* * * *

জেলে দিন কাটিয়া যায়। সুমেরুর দুঃখের ইতিহাস একেবারেই ভুলিযা গিয়াছিলাম। সুমেরুও ভুলিয়াছে। এরূপ ভুলিতে পারে বলিয়াই মানুষ সংসারে টিকিযা থাকিতে পারে। সুমেরুও মাস দুই যাইতে না যাইতে ঝুমরুকে ভুলিযাছে। পাগলা ও বুড়ীকে লইয়া আবার তাহার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু এখন সুমেরুকে নাচিতে গাইতে বলিলে সে অস্বীকার করে। কেমন জানি মনমরা হইয়াছে সে। হাসি তামাসাও আর তাহার নাই। কেউ কেউ বলাবলি করে "বুড়ো হয়েছে কিনা?" কেউবা বলে ঝুমরুই সুমেরুর বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কিন্তু

অন্তরীক্ষে বসিয়া একজন বুঝিতে পারিয়াছিলেন সুমেরু এসব কারণে এত দমে নাই।—তাহার দমিবার কারণ তাহাব বন্দীজীবন ফুরাইয়া আসিতেছে। বাহিরে যাইবার ভয়ে সে এখন হইতে শিহরিয়া উঠিতেছে। জেলখানার প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে সুমেরুব কলহাস্যে নাচগানে মুখর হইত সে সুমেরু আজকাল একেবারে উদাসীন প্রকৃতিব হইয়া গিযাছে। কাজ কর্ম্মেরও আর তাহার সেই পূর্ব্বের ক্ষিপ্রকারিতা নাই। রুটীন্ মাফিক সব কাজ কবিযা যায সত্যি কিন্তু আজকাল সুমেরুব নিজের চোখেও সে কাজ বিসদৃশ ও বিশৃঙ্খল ঠেকে। কিন্তু তাহাকে কেউ কিছু বলে না। আহাব নিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয কাজে তাহার একটা অনিচ্ছাব ভাব প্রকট হইযা উঠে। 'পাগলা' ও 'বুড়ীর' আদর যত্ন কমিযাছে বৈকি ? তাই ইদানীং সুমেরুব অতি আদরেব 'পাগলা' ও 'বুড়ী' তাহার সহকারী রঘুযার সাথে ভাব করিতেছে। সুমেরু দেখিয়াও দেখে না। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয।

আবো কিছুদিন কাটিযা গেল। বড একটা অসুখ বিসুখ বা আপদ বিপদ না হইলে জেলে কে কার খোঁজ নেয। সুমেরুব সংবাদ তাই নেওযা হয নাই। আমরা যেমন খাইযা দাইযা, খেলিয়া, পড়িয়া এক ঘেযে জীবন যাপন কবিতেছিলাম, সুমেরুও ভাবিয়াছিল তাহাব দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম কবিয়া দিনপাত করিতেছে। কিন্তু সুমেরুব মনেব অন্তঃস্থলে যে একটা বিপ্লব আবম্ভ হইয়াছে তাহা অনেকেব নিকট অজ্ঞাত বহিয়া গেল। তাহার হৃদযে যে গভীর ক্ষত বেখাপাত কবিয়াছে তাহার খোঁজ পাওযা আয়াস সাধ্য ছিল সন্দেহ নাই।

সুমেরু আর দিন দুইবাদে মুক্তি পাইবে। ইতিমধ্যে ইহা তাহাকে জানানো হইযাছে। তাহাতে যে তাহার মানসিক অবস্থার আবো ভীষণ পবিবর্ত্তন হইযাছিল তাহা পবে অনেকেব মুখে শুনিযাছি। সব সময়ে তাহাকে নাকি অস্বাভাবিক চঞ্চল দেখাইত। সুমেরু তাহাব পাগলা ও বুড়ীর সমস্ত ভার রঘুযাকে দিয়া তাহার নিকট কাতব প্রার্থনা কবিযাছে যেন বঘুযা উহাদের ভালভাবে বাখে। পাগলা ও বুড়ীর কি কি জিনিষেব উপব ঝোঁক বেশী রঘুয়াকে সবিশেষ জানাইয়া দিযাছে। জেলের প্রত্যেকের কাছে যাইযা সুমেরু তাহাব অজ্ঞাতসাবে কৃত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিযাছে। প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ খুলিযা কাঁদিযাছে। কয়েদীবা তাহাকে প্রবোধ বাক্যে অনেক হিতোপদেশ দিযাছে এবং বাহিবে যাইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইযাছে।

কাল প্রাতে সুমেরু চলিযা যাইবে। এই কথা মুখে মুখে চারিদিক ছডাইয়া পডিয়াছে। একথা আমিও শুনিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম সুমেরু ভোরে যাইযা অপরাহ্নেই আবার জেলে ফিরিবে। কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম সুমেরু বাহিরে যাইয়া থাকিতে পারিবে না। জেলখানাময তাহার প্রাণ। তাহার আধুনিক কালের যে পরিবর্ত্তন সেটা তাহার মনের একটা দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নহে।

সকালবেলা ভীষণ হট্টগোলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল ঝুমরুর মৃত্যু দৃশ্য। মনে হইল কোন হতভাগা না জানি আজ আবার প্রাণ হারাইয়াছে। ভোরেই এমন একটা

অশুভ চিন্তা মনে হওয়াতে কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই খবর পাইলাম সুমেরু আত্মহত্যা করিযা মবিযাছে। হতভাগ্য সুমেরু। তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছাই শেষে জযযুক্ত হইল। বহির্জগতের প্রতি যে অশ্রদ্ধা ও তিক্ততা লইযা সে জেলে আসিয়া ঢুকিয়াছিল এই দীর্ঘ বিশ বছরেও তাহাব কিছুমাত্র উপশম সে কবিতে পারে নাই। যে অকৃতকার্য্যতার শাস্তি বিধান করিযা সে কারাবরণ করিতে বাধ্য হইযাছিল, বাহিবে যাইযা কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচ হীন সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিব সঙ্গে আবার তাহাকে লড়িতে হয এই ভযেই হতভাগা বুড়ো সুমেরু আজ নিজের প্রাণ উৎসর্গ কবিয়াছে। তাহার এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা, বহির্জগতেব প্রতি তাহার এ উপেক্ষা —সুমরু জেলে থাকিযা কিছুটা ভুলিযাছিল সত্য কিন্তু বাহিবে যাইবাব কথা শুনিলেই নিজেব স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা মনে পড়িত এবং তাহাকে গভীব পীড়া দিত— এই সত্য আজ সুমেরুব আত্মাহুতিতে সম্যক উপলব্ধি কবিতেছি। তাহাব হৃদযে এতটুকু মার্জ্জনার স্থান নাই।

ভারতের বন সম্পদ

শ্রীমতী স্নেহলতা সেন

বন জঙ্গল বলতেই একটা নোংরা দৃশ্যেব পরিকল্পনায মনটা আমাদেব স্বভাবতই কুঞ্চিত হযে ওঠে। সত্যই বন জঙ্গলময আবর্জ্জনা-সঙ্কুল স্থান আমাদেব মনে কাব্যবসের চেয়ে ঘৃণা অবজ্ঞাব ভাবই বেশী সৃষ্টি কবে। প্রকৃত পক্ষে বন জঙ্গল আদৌ ঘৃণার বস্তু নয। সেই আদিকালের অসভ্য জাতি থেকে আধুনিক কালের সভ্য জাতি পর্য্যন্ত বনের প্রযোজনীয়তা সমান ভাবেই অনুভব করছে। আদিম অসভ্য যুগের চেযে আধুনিক সভ্য যুগেই বনেব প্রযোজন অনেক বেশী বেড়ে গেছে। খাদ্যেব প্রযোজনের জন্য জমিব প্রযোজনীযতা অনেক বেড়েছে। কিন্তু ঘরবাড়ী, কলকারখানা, আসবাবপত্র, শকট-যান নির্ম্মাণেব জন্য বনেব প্রযোজনীযতাও কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়।

সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি দিযে দেখতে গেলে বন জঙ্গল প্রকৃতিব শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্যেব অবদান। বন জঙ্গলময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কবিব কাব্য বচনার প্রধান উপাদান যোগায। কবি মনের কল্পিত রূপের ছাপ লেগে তৃণলতা মহীরুহ সকলই সুন্দরতম হযে ফুটে ওঠে। গগনস্পর্শী মহীরুহ থেকে নগণ্য তৃণদলের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায না। মানুষ, পশু, পক্ষী সকল প্রকার জীবই অরণ্যের কোলে শান্তিময নিরাপদ আশ্রয় লাভ ক'রে সুখে দিন কাটিযে দেয। মানুষ যখন সমাজ থেকে বিতাড়িত হয তখন অরণ্যই হয তাব একমাত্র আশ্রযস্থল। অরণ্যের বুকে আশ্রয় লাভ ক'রে, অরণ্যের ফলমূল খেয়ে অরণ্যের সৌন্দর্য্য দর্শন করেই সে তখন সমাজের

সুখ ভুলে যায়। সমাজের শত নিয়মের আবদ্ধ গণ্ডির চেয়ে এই মুক্ত স্বাধীন সহজ জীবনই হ'য়ে ওঠে তার কাছে অধিক প্রিয়। মানুষের কোলাহলের চেয়ে পাখীর কলরবই লাগে বেশী ভাল। তাই কবি গেয়েছেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।"

বিস্তৃত ঘন বনানী আবহাওয়াকে সব সময়ই আর্দ্র রাখে এবং তাপও নিয়ন্ত্রিত করে। আর্দ্র আবহাওয়ার ফলেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বৃষ্টির আধিক্য বেশী। যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে তখন গাছ পাতার ঘন সন্নিবেশই গাছের নীচের মাটিকে রক্ষা করে। গাছপালা যদি না থাকত তাহলে প্রবল বারিধারা পাহাড়ের গায়ের সমস্ত মাটিকে ধুয়ে নিয়ে নদী-নালা সব ভরাট করে ফেলত। ফলে জলপ্রবাহের ব্যাঘাত ঘটত। বর্ষার সময় বন্যার আধিক্য দেখা দিত। আর গ্রীষ্মের সময় নদী-নালা সব শুকিয়ে যেতো। জলের অভাবে জমি ক্ষেত সবই অনুর্ব্বর হয়ে উঠত। কিন্তু এ হেন শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় বস্তু আজ অনেক স্থলে বিধ্বস্ত বিলুপ্ত প্রায়। বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতার ফলে বনের পর বন উজাড় ক'রে কাঠ তৈরী ক'রে কলকারখানা ফার্নিচার, ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ হচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে ভারতবর্ষে নদী-নালার আজ চরম দুর্গতি হয়েছে। প্রতি বছর বন্যায় সমস্ত দেশ ভেসে যাচ্ছে, গ্রীষ্মের সময় জলের অভাবে, অজন্মায় সারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের হাহারব উঠছে। এই দ্বিবিধ মৃত্যু কবলে পড়ে সোনার ভারত আজ ছারেখারে যেতে বসেছে।

বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট ভারতের বনবিভাগ সংরক্ষণে মন সংযোগ করেছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা অতি শিথিল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বনবিভাগ সংরক্ষণের জন্য গভর্ণমেণ্ট বনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে, Reserved এবং Protected. বনবিভাগের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে অনেক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এর পরিবর্দ্ধনকল্পে অনেক বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছে। এই বনবিভাগ থেকে গভর্ণমেণ্ট এখন বেশ মোটা আয় করছে। কিন্তু ঐ লাভটুকু নিয়ে যা হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টির এবং সহানুভূতির আরও অধিক প্রয়োজন। অবহেলার ফলেই ভারতের অরণ্য সমূহ আজ লোপ পেতে বসেছে এবং বনের বিস্তৃতি কমে এসেছে বলেই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে ভারত আজ ধ্বংসের পথে চলেছে। প্রয়োজনের একটা দিক দেখলেই চল্‌বেনা। ঘরে ফার্নিচার সাজাবার জন্য কলকারখানা প্রস্তুতের জন্য কাঠের জন্য গাছের প্রয়োজন, আবার জমিতে ফসল ফলিয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করতে বৃষ্টির জন্য গাছের প্রয়োজন।

বড় বড় গাছ থেকে যে কাঠ হয় তার প্রয়োজন অসংখ্য। এই রকম কাঠ একাধারে ইট, লোহা উভয়েরই কাজ করে। এই প্রয়োজন আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সমান ভাবেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এই জন্য বনকে আমাদের পুরাতন বন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে এও সত্য যে কয়লা, তেল, ইলিক্ট্রিসিটি, গ্যাস ইত্যাদি কাঠের প্রয়োজনীয়তা অনেক স্থলে হ্রাস করছে। কাঠ বিনা আধুনিক যন্ত্রজগৎ অচল অবস্থায় পরিণত হবে। ঘরবাড়ী ফার্নিচার নির্ম্মাণের জন্য কাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলনাবিহীন, দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণের জলযান, স্থলযান, সুবিস্তৃত রেলপথ, এমন কি

দেশ বিদেশে মাল চালান দেবার বাক্স পর্য্যন্ত প্রস্তুতের জন্য কাঠের প্রয়োজন। কেবল বাইরের কারখানাই নয় খনির অভ্যন্তরে ছাদের পতন নিবারণ করবার জন্য স্থূলাকার কাঠের স্তম্ভ প্রয়োজন।

লোহা স্থায়িত্বে কাঠ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু কাঠ হালকা বলে ব্যবহারে অনেক বেশী সুবিধা হয়। বহু বৎসর ব্যবহারেও লোহার শক্তি ক্ষয় হয় না। কিন্তু তা সত্বেও কাঠকে লোহার প্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অত্যুক্তি হবে না। ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার দিকটা দেখলে কাঠকে লোহার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। সুদূর পল্লীগ্রামের মূর্খ সূত্রধরেরাও এমন চমৎকার কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে যে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। যদি একটু হিসেব করে কাঠের ব্যবহার করা হয় এবং অধিক কাঠ উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় তা' হলে বনবিভাগ ধ্বংসের আর কোন আশঙ্কাই থাকে না। বনবিভাগ পরিবর্দ্ধনের প্রতি সামান্য চেষ্টা থাকলে কাঠের পরিমাণ বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু লোহার বেলায় এ নিয়ম আদৌ খাটে না। লোহা উৎপাদনে মানুষের হাত মোটেই নেই। অত্যধিক ব্যবহারে লোহার খনি উজাড় হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাঠের বেলায় এ আশঙ্কা একেবারেই নেই। ধাতু-বিজ্ঞান আলোচনা করলে দেখতে পাই বনের সাহায্যে আরও অনেক পদার্থই উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির পর্য্যালোচনা করলেই আমাদের মনে উদ্ভিদজাত দ্রব্যের একটা পরিষ্কার ধারণা হবে।

গাছ থেকে কাঠ বার করে নেবার পর নিকৃষ্ট কাঠগুলি জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহার হয়। ইঞ্জিন, কারখানার মেশিন ইত্যাদি চালাবার জন্য কাঠের আগুন ব্যবহার হয়ে থাকে, রন্ধনাদির জন্যও ঐ কাঠ ব্যবহার হয়। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই কাঠদ্বারা নির্ম্মাণ হয়। ঘরের ছাদ দরজা, থাম সবই কাঠের। ব্যবহার অনুপযোগী নিকৃষ্ট কাঠে অতি উৎকৃষ্ট কাঠকয়লা প্রস্তুত হয়। এই কাঠকয়লার প্রয়োজনীয়তাও অনেক। এমন কি রন্ধনাদির পর যে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে তাও ব্যবহারে লাগে। স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারগণ সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি ধাতব পদার্থের জিনিষ তৈরী করবার সময় কাঠকয়লার আগুন থেকে তাপ প্রস্তুত ক'রে জিনিষ তৈরী করে। তা ছাড়া ধোঁয়া কম হয় ব'লে অনেক কাজেই কাঠকয়লা ব্যবহার করা হয়। বারুদ প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্ট কাঠকয়লার প্রয়োজন হয়। সকল রকম উদ্ভিদ, বিশেষ ক'রে বাঁশ থেকে কাগজ তৈরী হয়। কাগজ তৈরীর জন্য বাঁশের প্রয়োজন অত্যধিক সন্দেহ নেই কিন্তু তা ছাড়াও বাঁশের আরও অসংখ্য প্রয়োজন আছে।

এতদ্ব্যতীত রবার, গাটাপার্চ্চা, নানা রকম আঠা ইত্যাদিও উদ্ভিদজাত পদার্থ। রবারের প্রয়োজনীতা যে কত বেশী তা এখানে উল্লেখ করা একেবারেই অসম্ভব। কেবল এইটুকু উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে রবার বিনা বর্ত্তমান সভ্যতা একেবারেই অসম্ভব হ'ত। রবারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়াতে রবারে চাষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে রবার গাছ অধিক পরিমাণে জন্মায়। ইবনাইট্, ভলকানাইট্ প্রভৃতি প্রচলনে গাটাপার্চ্চার ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। কিন্তু এসিডের ব্যবহারে পাইপ, পাম্প ইত্যাদির জন্য গাটাপার্চ্চার ব্যবহার হয়। তা ছাড়া, জলের মধ্যে গাটাপার্চ্চার স্থায়িত্ব অতি বিস্ময়কর। এই প্রয়োজনে উৎকৃষ্ট গাটাপার্চ্চার আদর এখনও

খুব আছে। গাম্‌স্‌ এবং রেসিন্‌স্‌ও প্রচুর পরিমাণে হয়। কিন্তু জঙ্গল হ'তে সে সকল সংগ্রহ এবং রীতিমত ব্যবহারের অভাবে তারা এখনও উপযুক্ত সমাদর থেকে বঞ্চিত। বার্ণিস, সাবান, জোড়নের আঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরীর জন্য রেসিনস্‌ ও গাম্‌স্‌-এর প্রয়োজন অনেক। এজন্য এগুলি উৎপাদন ও সংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ফল, ছাল, পাতা থেকে কষ প্রস্তুত হয়। এই পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। এই রপ্তানী থেকে ৫০ লক্ষ টাকা লাভ হয়ে থাকে। বনজাত তৃণ ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত ব্রাস এবং ঝাঁটা প্রভৃতি থেকে আমাদের ১৫ থেকে ২০ লাখ পর্য্যন্ত আয় হয়ে থাকে। একথা প্রায় সকলেই জানে যে আমাদের দেশে প্রতিবছর রঞ্জন ও কষের কাজে ব্যবহৃত বস্তু তিন ক্রোড় টাকার উপর আমদানী হয়। কষের জন্য গাছের ছাল, কোচনিয়েল এবং খয়ের প্রভৃতি প্রায় ৩৭ লাখ টাকার জিনিষ আমাদের দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে।

ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকাই ছাল সরবরাহের প্রধান স্থান। ছাল সরবরাহ করে আফ্রিকা প্রায় ২৩ লাখ টাকা আয় করে। আমাদের দেশে বনবিভাগের প্রতি উপযুক্ত যত্ন থাকলে আমাদের দেশে এই বল্কল আমদানী বন্ধ হ'তে পারত।

ভেষজ প্রস্তুতের জন্য উদ্ভিদ বিদেশ থেকে এদেশে খুব কমই আমদানী হয়। সে গুলিও চেষ্টা করলে এদেশে উৎপাদন করা যায়। কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি দেশে এই প্রকার উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে জন্মায়। ভারতে উৎপন্ন, ভেষজ বৃক্ষ সমগ্র ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরে অনেক দেশে ওষুধ তৈরীর জন্য সরবরাহ হয়ে থাকে। এই ভেষজ তৃণ বাইরে রপ্তানী করেও ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ২৮ লাখ টাকা লাভ করে। ভারতে বনজাত জিনিষ অসংখ্য। উল্লিখিত জিনিষগুলি ভারত যে অরণ্য সম্পদে কতখানি ঐশ্বর্য্যশালী তারই পরিচায়ক।

কিন্তু বিরাট বনানীর অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডারের উপরোক্ত বৃক্ষলতাদি মাত্র কয়েকটি এবং তারও সমস্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। আরও বহু আছে যা থেকে লোকে উপার্জ্জন ক'রে জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু সমস্তই অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারের বনবিভাগ আছে, কিন্তু তার নীতির আমূল সংশোধন প্রয়োজন। সকল রকম ব্যয় করেও প্রতি প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ক্ষতি এখনও হয় না। সুতরাং এদিকে কিছু উন্নতি সাধন করতে পারলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল।

ওয়ার্দ্ধা ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

ওয়ার্দ্ধা থেকে সেওর্গা মাইল পাঁচেকের পথ। মহাত্মা গান্ধীর ওখানে যাওযার পূর্ব্বে পথ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না- ছিল একই জাযগা দিযে বার বার পাযে হেঁটে চলার ফলে যে একটু খানি পথের আভাস জেগে ওঠে, তা-ই মাত্র। কিন্তু এখন পাকা রাস্তা দিযে মটর চলে স্বচ্ছন্দে। মহাত্মা গান্ধী সেখানে থাকেন বলে' লোক চলাচল বেড়েছে খুব বেশী। তাই তাদের যাতাযাতেরও ব্যবস্থা করতে হযেছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড থেকে। সেওর্গা অতিশয ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম—গাযে গাযে বসান খান কতক টালির ঘরের সমষ্টি মাত্র। গ্রামে ঢুকবার পথে প্রথমেই হিন্দুস্থানী তালিমী শিক্ষা-সংসদের প্রধান কেন্দ্র—তার পরেই মহাত্মাজীর আশ্রম। আশ্রম থেকে গ্রামের ঘরগুলির মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জাযগা—দূর থেকে দেখে মনে হয যেন গ্রামের খবরাদির জন্যে পাহারাদার গ্রামের দোরগোড়ায বসে। আর মনে হয যেন গ্রামের ঘরগুলি ভাবের ঘোরে ও আত্মীযতার টানে এ ওর ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেযে পড়েছে—আর আশ্রমের ঘরগুলি মাথা উঁচু করে সোজা একক দাঁড়িযে আছে একটা সম্ভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে।

আশ্রমে ঢুকে মাটির দেওযাল ঘেরা ছোট্ট একখানা টালির ঘরের মধ্যে এসে মহাত্মাজীকে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। মহাত্মাজী হেসে বল্লেন—"তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে বসে আছি।" মহাত্মাজীর তখন বেড়াতে যাবার সময—আমাদের জন্যেই সেদিন তাঁর বেরোতে দেরী হ'যে গিযেছিল।

আমরা চলে আসতে দেখলাম—রোদের ভিতরেই তিনি বেড়াতে বেরিযেছেন এবং আর একজন তাঁর মাথার পরে ছাতি ধরে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। আরো অনেক লোকের মধ্যে সেদিন খান আব্দুল গফুর খান ও রাজকুমারী অমৃত কাউর-ও ছিলেন মহাত্মাজীর সঙ্গী।

মহাত্মাজী মাটিতে আসন পেতে বসেছিলেন। আমরাও তার সামনে আর একটা আসনে বসে পড়লাম। মহাত্মাজীর একপাশে আর একটা আসনে রাজকুমারী অমৃত কাউর বসেছিলেন যেন আমাদের পুরোনো জমিদারী সেরেস্তায নাযেবের মুহুরী। অনুরূপ কাজই তিনি ক'রে থাকেন, যখনই আশ্রমে আসেন মহাত্মাজীর সান্নিধ্য লাভের জন্যে। বসতে না বসতেই তাড়াতাড়ি আলাপ শেষ করার তাগিদ পাওয়া গেল।

মহাত্মাজীকে আমরা বললাম—"ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সঙ্কটের সৃষ্টি হযেছে। এখন আর আপনার শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে না থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও পূর্ণ দাযিত্ব গ্রহণ করা উচিত।"

মহাত্মাজী হেসে বললেন :—"আমি বুড়ো হয়েছি—শরীর ক্রমে অশক্ত হয়ে পড়ছে—দরকার মত প্রদেশে প্রদেশে চক্কর দেওযা আমার পক্ষে এখন একেবারেই অসম্ভব। এ অবস্থায় বাজনৈতিক আন্দোলনেব নেতৃত্ব করা কি আর আমাকে দিযে চলে ?"

আমরা—"আপনাব ঘোরাঘুরি করবার দরকার কি ? সে কাজ তো অন্য কাউকে দিয়েও চলতে পারে।"

মহাত্মাজী—"তা হয না। আমাকে নেতাব আসন নিতে হ'লে, আমাকেই ক'রে তুলতে হবে সে আন্দোলনের উপযুক্ত আবহাওযা ও অনুকূল অবস্থাব সৃষ্টি। নইলে আমার ভাবাদর্শ অনুযাযী কাজ হ'বে না—হবে, আমাব নামে অন্যের মত চালান।"

আমরা—"এই যদি অবস্থা হ'যে থাকে তবে ত্রিপুবীর পন্থ-প্রস্তাবের কি প্রয়োজন ছিল ? এই সঙ্কটের দিনেও যদি আপনার নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা না থাকে, তবে পন্থ-প্রস্তাব পাশ করিয়ে কংগ্রেসে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করার কোনো মানে হয না।"

মহাত্মাজী—"আমাব মত নিযে তো সে প্রস্তাব পাশ কবান হযনি—আমি তার কি জানি ? (I was not a party to the resolution.)"

আমরা—"লোকে তো তা জানেনা। আপনার উচিত ছিল তখনই এ কথা সর্ব্ব-সাধারণের কাছে ঘোষণা ক'রে দেওযা।"

মহাত্মাজী—"প্রথম কথা—আমি ত্রিপুবীতে উপস্থিত ছিলাম না। তাবপবে খবরের কাগজে সে প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখতে গিযে আমি আমার মত অনেক পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি।"

আমবা—"তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা যে এত দূর গড়িয়েছে, সাধারণ লোক তা ধরতে পারেনি। তা ছাড়া, আপনাব পরবর্ত্তী কাজ-কর্ম্মে এমন কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যাযনি, যাতে লোকের সেরূপ ধারণা জন্মিতে পাবে। তারা মনে কবে, আপনি নিশ্চযই এই সঙ্কটের দিনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আবার নিজের হাতে নেবেন।"

মহাত্মাজী—"দেখ, এক সময অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেছিলাম। তখন বলেছিলাম—এক বছরে স্বরাজ হবে যদি আমরা কতগুলি বিশেষ সর্ত্ত পালন ও কতগুলি বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি কবতে পারি। কিন্তু তা পারা যাযনি, স্বরাজও হযনি। লোকে বলে—তুমি যে সর্ত্ত দিযেছিলে, এক বছরে তার পরিপূরণ সম্ভব কি না, তাও তোমার বোঝা উচিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, তোমার নিজের চেষ্টার দ্বারাই আবশ্যকীয় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। আমি স্বীকার করি—তা আমি কবতে পারিনি (I plead guilty to the charge)। তবে যতটা আমরা আশা করেছিলাম, তা না হলেও, সে আন্দোলন ব্যর্থ হযনি। এই যেমন গভর্ণমেণ্টের দেওয়া খেতাব সম্বন্ধে লোকের কি মোহ-ই না ছিল। কিন্তু খেতাবের সে কদর আর নেই। একটা সহরে কেউ খেতাব পেলে সহরময় উৎসবের ফররা লেগে যেত। এখন লোকে খেতাব পেয়ে লুকিযে ফিরতে ব্যস্ত হয়—সবার সে 'ছি-ছি'র পাত্র হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু সেই থেকে এই বিশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি, আজও আবশ্যকীয় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারিনি। আমার ভাবে ভাবিত লোকের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয়। এমন কি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বররা পর্য্যন্ত আমার পথের পথিক হ'তে চায় না (I cannot carry even the Working Committee with me)। এ অবস্থায় আমার পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করা চলে না—তার কোনো মানেও হয় না।"

আমরা—"আজও যে কোনো প্রস্তাব আপনি কংগ্রেসকে দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে পারেন। আজও দেশের অধিকাংশ লোকের আপনার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর অক্ষুণ্ণ আছে। অথচ আপনি মনে করেন—আপনার মত ও পথের সমর্থক লোকের একান্ত অভাব। এ তো ভারি মজার অবস্থা! এ অবস্থায় তো আর কারো পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করাও সম্ভবপর নয়। কেউ কিছু বললেই, লোকে জিজ্ঞেস করবে—'মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে কি বলেন?' যে 'মেজরিটি' আজও আপনার প্রতি বিশ্বাসবান, তারা তো আপনার মতামতের অপেক্ষায় থাকবেই। তারা জানে—নামে না হোক, কাজে আপনার নেতৃত্বই চলছে কংগ্রেসে আজও—ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলি পর্য্যন্ত প্রায় সবই আপনারই মুসাবিদা। আজ এই সঙ্কটের দিনে আপনি বলছেন যে আপনি কিছুই করতে পারেন না। এখন অন্ততঃ আপনার মনের এই অবস্থাটা দেশের লোককে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যাতে নেতৃত্বের জন্যে আপনার মুখ চেয়ে থাকার অভ্যাস লোকের ঘুচে যায়।"

মহাত্মাজী—"লোকে যদি একথা না বুঝে থাকে, তবে আমার পক্ষে একমাত্র করণীয় হচ্ছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগ না দেওয়া এবং রাজনীতি সম্পর্কে যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদের সঙ্গে দেখা না করা।"

আমরা—"তা আপনি যা ভাল মনে করেন, করবেন। আমরা শুধু বলতে এসেছিলাম যে প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসে আপনার নেতৃত্বই চলছে—অথচ চার আনার মেম্বরও আপনি নন। এখন অন্ততঃ এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত। কংগ্রেসের 'মেজরিটি' যখন আপনার পক্ষে আছে, তখন এই সঙ্কটের দিনে যা কিছু করণীয় তার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব আপনার নিজেরই নেওয়া উচিত।"

এই ভাবের আলোচনা হ'তে হ'তে মহাত্মাজী এক সময় বললেন—"Let us see. I am not altogether hopeless. অর্থাৎ দেখা যাক—কি করা যায়। আমার নিজের কাজে নারা সম্বন্ধে এখনও আশা একেবারে ছেড়ে দেইনি।"

এর পরে বাংলা দেশ ও সুভাষবাবু সম্বন্ধে কথা উঠল।

আমরা বললাম :—"সুভাষবাবু নিজেকে বামপন্থী বলে প্রচার ক'রে তাদের পক্ষ হয়ে দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লেগে গিয়েছেন। কিন্তু পদে পদে ভুল ক'রে বিপদে পড়ছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির আচরণেও ভুল হচ্ছে পদে পদে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রথমেই বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল—সুভাষবাবুর যে অভিযোগ তার মূলে কোনো সত্যতা আছে কিনা

এবং দেশে তার সমর্থন কতটা। যদি তাঁরা মনে করতেন যে তাঁর অভিযোগের মূলে সত্যতা আছে কিম্বা তার সমর্থকের দল প্রচুর, তবে তখনই তাঁর সঙ্গে একটা রফা করা উচিত ছিল। তাঁরা তা করলেন না। তারপরে, সুভাষবাবু ভুল ক'রে, যাঁদের সঙ্গে তাঁর লড়াই, পায়তাড়া করতে গিয়ে প্রথমেই তাঁদের মুঠোর মধ্যে গিয়ে দিলেন ধরা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের আদেশ অমান্য ক'রে। বুদ্ধির দোষে এক পা বেশী এগিয়ে দিয়েছিলেন আর কি। তখন ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা ক'রে, দিয়ে দিলেন একটা ভারি সাজা। একবার সাজা দিয়ে আর পেছন ফেরা চলে না। এরপরে যখন সুভাষবাবু আবার কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করার পথ নিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রতিকার স্বরূপ এমন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল যাতে তাঁর নিজের ও অন্য সবাইর মনে চিরতরে এই কথাটা মুদ্রিত হ'য়ে যায় যে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কংগ্রেসকে অমান্য করা চলে না। সুভাষবাবুর প্ররোচনায় বাংলার কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যে প্রস্তাব পাশ করেছে, তা' প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপরে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দিয়েও তা' পাশ করান হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি কি ঘুমুচ্ছে ?—এ সব দেখতে পায় না ? সবল হস্তে এ সব পাগলামী বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল প্রথম সূচনাতেই, যাতে কংগ্রেসকে অমান্য করার সাহস কোনো কংগ্রেস মেম্বরের কখনো না হয়! ওয়ার্কিং কমিটি চুপ করে থেকে যে একটার পর একটা এরূপ ঘটনা ঘটতে দিচ্ছে, তাতে ওয়ার্কিং কমিটির দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে এবং এই দুর্ব্বলতার ফলে কংগ্রেসটাই দুই ভাগ হ'যে যাচ্ছে। সময় মত উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এরূপ অবস্থা হ'ত না।"

মহাত্মাজী বললেন :—"Subhash is maddened at the sight of the crowd But he does not know that these platform demonstrations do not mean anything. I don't doubt his patriotism, his boldness, but he is doing positive harm to the cause."

(জনতার ভিড় দেখেই সুভাষের মাথা বিগড়ে যায়। কিন্তু সে জানেনা যে স্টেশনের এই ভিড় ও উন্মাদনার অর্থ নেই। তার সাহস, তার দেশ-প্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ করিনে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কাজের সত্যিকার ক্ষতি যাকে বলে, তা-ই তার দ্বারা হচ্ছে।)

এই সময়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে মহাত্মাজীর বেড়াতে যাবার বেলা অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের তখনই উঠে পড়তে হ'ল।

মহাত্মাজীর ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে মহাত্মাজী যখন আশ্রমে থাকেন, তখন আশ্রমের লোক-সংখ্যা তিরিশ বত্রিশে দাঁড়ায়। তিনি যখন থাকেন না, তখন থাকে মাত্র ১০।১২ জন। আশ্রমের এক দিকে দেখলাম মৌমাছি পালন ও আর এক দিকে গো-পালনের ব্যবস্থা। যে ঘরে গো-বৎসরা থাকে, সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম যে একজন লোক একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে কি যেন করছে। সেই যন্ত্রটা থেকে শোঁ-শোঁ করে' ষ্টোভের আগুনের মত আগুন বেরোচ্ছে এবং লোকটি সেই আগুন ঘরের সমস্ত

মেজেটাতে বুলিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে অমনি করে পোকা পোড়ান হচ্ছে। আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুরেনবাবু বললেন—"আশ্রম তো দেখা হল, কিন্তু আমার মনে একটা মস্ত সমস্যা রয়ে গেল।" আমরা বললাম—"কি?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন—"সমস্যাটা হচ্ছে, ওই যে ওখানে লোকটি পোকা পোড়াচ্ছে, এটা হিংসা, কি অহিংসা।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

(ক্রমশঃ)

শেষ সাধনা

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

আকাশে ঝঞ্ঝা, ধরায় কামান, পাতালে বাসুকী নাগ,—
দলিত নরের বক্ষে লেগেছে ঘন রক্তের দাগ।
মহাকাল তার ভয়াল আস্য মেলিছে লাস্য ভরে,
স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, সুখ-আশা উড়িছে রোশেখী ঝড়ে।
গৃহের শান্তি মিলাল চকিতে,—আঁধার এসেছে ছেয়ে,
স্নেহের নিগড় টুটে টুটে যায় কাহার পরশ পেয়ে।
দেউল-দুয়ার বন্ধ এবার,—জ্বলে না আরতি-দীপ,
অহঙ্কারীর প্রেমহীন কর-পরশে শুকায় নীপ।
দেবদাসী আজ সেবাদাসী হোলো,—হোলো কামনার প্রিয়া,
দখিনা বাতাস বহে স্বার্থের দুষ্ট বারতা নিয়া।
ধরণী ব্যথায় আমারে শুধায়—আখি তার ছলোছলো,
'ওগো কবি, আজ বেণুকা তোমার বাজাবে কী না গো বলো।'
'মাটি-মা আমার, মাটি-মা আমার',—কেঁদে উঠি উচ্ছ্বাসে
চেয়ে ছাখ ওই করালী আঁধার আকাশে ঘনায়ে আসে।
বেণুকা আমার বাজাবার সাধ আজো জাগে হিয়ামাঝে,—
শুধু সন্দেহ শুনিবে কী কেহ?—মরিব কী একা লাজে?
ধরণীতে আজ আলো নাহি হায়,—শুধু আঁধারের খেলা,
স্বার্থপঙ্কু বক্ষে তোমার অন্ধ নরের মেলা;

লোভ-দেবতার হোম-বহ্নিতে আকাশ গিয়াছে ঢাকি,
ব্যথা-শঙ্কার অশ্রুতে আজ মুদে মুদে আসে আঁখি।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় ধেযান আজিকে সুন্দর দেবতার,
বেপথু পরাণ লাজে ম্রিয়মান,—কাঁদে শুধু বারেবার।
আজো যদি বাজে বাঁশরী আমার আজো যদি গান গাই,—
দ্বিধা জাগে মনে শুনিবে কী কেহ, শুনিবে কী আজ তাই।
তবু বাঁশীখানি তুলে নিব মাগো,—তবুও বাজাব সুর,
দেখিব তোমার বেদনা করিতে পারি কি পারি না দূর,
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিব কেবল, বাজাব বাঁশরী শুধু,
দেখি নিভাইতে পারি কী না এই সাহারার মরু ধূ ধূ।
বাধা যদি আসে, মানিব না বাধা, কাঁটা যদি ফুটে পায়,
সে কাঁটা ভাবিব ফুল স্বরগের—সুখ ভাবি' বেদনায়।

তবু, তবুও * * *

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ

সেদিন ট্রেণে অসম্ভব ভীড়। একশত এগার নম্বরের যাত্রী যাহারা তাহাদের পয়সায় রেল কোম্পানী বেশ মোটা রকমের লাভ করিলেও ব্যবস্থাদির বরাদ্দের বেলায় প্রায়শই ভুলিযাই যান। আবার যাত্রীবর্গের সুখসুবিধা তদারকের জন্য যে সব 'এড্‌ভাইসরি কমিটি' গঠন করা হয় তাহা এতই নির্জ্জীব যে অনেক সময়েই 'মিউচিয়েল্ এড্‌মিরেশ্যন সোসাইটী'তেই পরিণত হইযা পড়ে। তাই যেখানে "৩০ জন বসিবেক" সেখানে তিনগুণ লোক ঠাসাঠাসি গাদাও হইযা সজীব ও সচল বস্তাবন্দী মালের মতই চলে। তবে রেলযাত্রীদের এইরূপ অবস্থায় হামেসাই পড়িতে পড়িতে খানিকটা গা-সওয়া হইযা গেলেও মাঝে মধ্যে এক আধটু প্রতিবাদ 'প্রেস' ও 'প্লাটফর্ম্মে' যে দেখা যাইতেছে তাহাই একটু আশার কথা, হয়ত বা সুদূর ভবিষ্যতে সম্যকপ্রকার ব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে।

গাড়ী ছাড়ার আর সময়ও নাই। নানান দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া ফিরিযা অনেকটা যখন হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম তখন উচ্চশ্রেণীর 'সারভেন্ট্‌স্' কামরা হইতে আমারই মত এক

সহযাত্রী ডাকিয়া আশ্রয় দিলেন। মধ্য রাত্রের এই বিড়ম্বনায় মনটা এমনই উষ্ণ হইয়া পড়িল যে আশ্রয়দাতৃর সহিত আলাপ আদৌ আর জমিল না, এমন কি কখন যে তিনি তাঁহার অভিষ্টস্থানে নামিয়া গেলেন তাহাও ঠিক ঠাহর হইল না। উষ্ণ হইলেও উষ্মা প্রকাশ করিবার কিন্তু সুযোগ কই! ট্রেণ আপন মনেই চলিয়া চলিয়া বলিয়া দিতেছে, তা'হ'লে * * তা'হ'লে * *। গতির এই তালে ও ছন্দে বোধহয় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল। কিন্তু কেন যে হঠাৎ তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল আজ আর তাহা মনে নাই। কেবল এইটুকুই মনে আছে, চাহিয়া দেখি হাতের কাছে চিঠির একটুকুরা পড়িয়া রহিয়াছে। কাহার চিঠি, কেইবা ফেলিয়া গেল তাহাও জানি না। তবে ইহাও বলিতে পারি, অনেকের সাথে মতের ও পথের ঐক্য না থাকিলেও চিঠিখানি যে প্রনিধানযোগ্য তাহাতেও আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুহৃদবরেষু,

অনেকদিন বাদে বাইরে এসেছি। বাল্যের সাধ, যৌবনের আশা, এবং প্রৌঢ়ের আকাঙ্ক্ষা পার করেই এসেছি। বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাতে ও পারস্পরিক পরিস্থিতির সংঘর্ষে আমাদের জীবনে কতই না বিপর্য্যয় ঘটে যায়। ভাগ্যের 'ক্রিয়েটর'স্থলে ভাগ্যের 'ক্রিচার' বই আর ত' আমরা কিছুই নই। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কত লেখার রেখাপাত মনের পরতে পরতে কতই রঙ বেরঙ্গের সুরে বেজেছিল, আর আজ বাইরে এসে সবই যেন একাকার হ'য়ে যায়। কিসের টানে কার ডাকে কোথা থেকে কেমন ক'রে আজ যে এখানে এসে উঠেছি তারও আর যে হদিস্ পাই না। তবু, তবুও তোমাকে এই লেখা।

বংশ পরিচয়ের ঐতিহ্য অথবা পুরুষপরম্পরায় আভিজাত্য আমাদের দাসত্বের দাগটাই স্পষ্ট করে তোলে না কি? আমাদের কর্ম্মে ও আমাদের ধর্ম্মের তাই যখনই অতীতটাকে বেশী টানাটানি করতে গেছি তখনই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সুষ্ঠু ও সুচারু শালীনতায় তার রমনীয় ও কমনীয় শোভা যতখানি বিকাশ না হয়েছে তার থেকেও অধিক প্রকাশ পেয়েছে গোঁড়া ও মূঢ় অহমিকতা। তা বলে এও আমি বলতে চাই না যে, অতীতটাকে আবর্জ্জনার স্তূপে ঠেলে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোহে অনির্দ্ধারিত বর্ত্তমানের বেসাত বসাই, আধুনিক শিক্ষায় এবং বর্ত্তমান দীক্ষায় এখনকার ঢঙে কাঁচা রঙ্ ধরিয়ে প্রাচ্য আকৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য প্রকৃতির সমাবেশ করি। বিদেশী মোহ ও বিজাতীয় মাদকতা ছন্দে বন্দে, আকারে ও ইঙ্গিতে কিম্বা ভাব ও ভঙ্গীতে স্বাদেশিকতার ছিঁটেফোটায় আমাদের ধীরে ধীরে উপাদেয় ও উপভোগ্য খিচুড়ী করেই যে তোলে সেটাও যেন না ভুলি।

ঘরে বাইরে অবিচার ও অনাচারের প্রবাহ আমাদের গতানুগতিক জীবনের দিনগুলি ক্রমশই বিস্বাদ ও বিষাক্ত করে তুলেছে। তাই বোধ করি সুজলা ও সুফলা এই বাঙ্লায় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরও এই বিষ সঞ্চারিত হ'য়ে পড়তে দেখা যায়। দলগত ও ব্যক্তিগত সেবায়

কতখানি শক্তি এই সংস্থাগুলিতে নিযোজিত হয সেটা আমাদের আলোচনার বিষযবস্তু নয় বরং তাঁবাই সেটা বিবেচনা কববেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টিব পবিকল্পনায অন্তঃসলিলা ব্যক্তিস্বার্থ নেতৃত্বে ও কর্ত্তৃত্বে কত যে কলহের সৃষ্টি ক'বে দেশেব পূজায় ব্যাঘাত ঘটিযেছে এবং দশেব সেবায আঘাত দিযেছে, সেটাও একবার ভেবে দেখার প্রযোজন পডেছে। কিন্তু তাই বলে এই বিচার ও বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে নিশ্চল ও নিথর হযে দর্শকেব স্থান নিলেও যে চলবে না। দেশপ্রেম ও দেশসেবার প্রেরণায দুর্ব্বাব দুনিবাব বিদ্রোহবাসনা, কাবও কাবও মতে দুৰ্দ্দৈব দুর্দ্দিনেব পবিচাযক হ'লেও, আমাদেব পথে এক নূতন অধ্যাযেব নব প্রভাবই সৃষ্টি কবতে পাববে। স্বাধীনতাব উপাসক স্বাধীনচেতাব দলীয ও উপদলীয বিভাগে বিভক্ত হ'তে অস্বীকাব করায অনেক বিডম্বনাই হযত ভোগ করতে হ'বে। ধন, জন, সহায, সম্বল সবটাবই অভাবে সর্ব্বথা খরচেব খাতাযই হয়ত পডতে হ'বে। জমাব ঘবে সর্ব্বদাই হয়ত শূন্য দেখাও যাবে। তবুও, দুনিয়ায কেউ না চাইলেও জগতটাকে আকডিয়েই ধরতে হ'বে। নিঃস্ব আমবা নিঃশেষে সর্ব্বত্র নিঃসহায হ'য়ে পডছি যে।

বাইবে এসেছি। কিন্তু বাইবটা যে ভিতবের থেকেও অন্ধকার। 'কাউন্‌সিল' ও 'এসেম্‌ব্‌লী', 'এযোযার্ড' ও 'বিযোয়ার্ড', 'ডিটেন্‌শ্যন্‌', 'এক্‌স্‌টেন্‌শ্যন্‌' নানাপ্রকাব ঢেউযে খানিকটা দিশেহাবাই হ'তে হয়। বাজবন্দীদেব জন্য অল্পবিস্তব সমালোচনা হ'লেও প্রজাবন্দীদের কথা কাউকেই ত' বলতে শুনা যায না। নিভৃতে ও নিবালায তাদেব ব্যাথাব গাথা যদিও বা কখন উঠেই পড়ে, সদরে কোথাও তাদের যে কোন সাড়াই দেয না।

বাইবে এসে অনেক কিছুই দেখা যায। আপদকালে যাঁদেব জাতীয অভিযানের ফুরসুৎ হয নাই সামান্য এই সম্পদকালে তাঁদেব এখন বাজনৈতিক অভিসাব সুরু হযেছে। পুবাতন প্রতিষ্ঠান যেমন 'ব্যান্‌ড্‌' হযে গেছে নূতন সংস্থান তেমনিই 'ম্যান্‌ড্‌' হযে উঠেছে। চাবিদিকে হৈ-হৈ বৈ-রৈ, মতের ও পথেব জোযাব-ভাঁটায, ভাবের ও দৈন্যের মান অভিমানে যে নূতন বন্যা বইতে আবম্ভ করেছে। তাতে আমাদেব স্থাযী হওযা দূবে থাকুক, ঠাঁই পাওযাই দুরূহ। তবু, তবুও * * *।

চিঠিখানাব সবটুকু নাই, এবং যেটুকুও বা আছে তাহাব সহিত অনেকেরই অনেকরকম মতদ্বৈধ হইতে পারে। তথাপি ইহাব ভিতর এমন প্রাণস্পন্দনের সাথে সাথে করুণ অথচ দৃঢ় ভাবধারার মূর্চ্ছনা ভাসিযা উঠে তাহা আমাদের, আলোচনা বা গবেষণা নহে, একটু বিবেচনা করিযা দেখিলে মহাভাবত যে অশুদ্ধ হইযা পড়িবে না, ইহাও বোধকরি আশা করা যাইতে পারে।

গ্রাম

শ্রীমতী সবিতারাণী ঘোষ

গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছোট্ট গ্রামটি, শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে ভরা। তারই তলা দিয়ে বয়ে যায় ছোট্ট নদী। ঢেউগুলি তার সারাক্ষণ নেচে চলেছে। ঢেউয়ের এই নাচ দেখেই বোধহয় কবি বলেছেন :

"ওরা দিবস রজনী নাচে
তাহা শিখেছে কাহার কাছে,"

ঢেউয়ের এই নাচ কার কাছে শেখা জানি না, কিসের আনন্দে, কোন্ অসীমের উদ্দেশ্যেই বা নদীর এই অন্তহীন বয়ে চলা। শুধু পারার আনন্দেই কি ও এত উছলা। তাই কি ওর এত হাসি, এত আনন্দ, এত কলোচ্ছ্বাস। কে জানে ওর বুকের গভীর অতলে কোন দুঃখ, কোন ব্যথা লুকিয়ে আছে কি না। ভিতরে সে যাই হোক তার বাইরের রূপ দেখিয়েই সে আমাদের ভুলিয়েছে। গ্রামের কথা, গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা মনে হলেই প্রথমে মনে পড়ে নদীর কথা। নদী। নদী। চপলা চঞ্চলা নদী।

নদী বয়ে চলেছে আর সেই নদীর উপর দিয়েই পাল তোলা নৌকায় ভেসে চলেছি আমরা। মাঝি গান ধরেছে—

"নদে বাসীরে আমার মা যেন কাঁদে নারে দেখ ভাই।"

গানটা গ্রাম্যমাঝি নিজের মনে এমন প্রাণ দিয়ে গেয়েছিল যে ক্ষণিকের জন্য মনটা তখন কোন্ সুদূর অতীতে ফিরে গিয়েছিল। কল্পনায় তখন ভেসে উঠেছিল নিমাইয়ের গৃহ পরিত্যাগের পূর্ব্বক্ষণটি। নিমাইকে দেখিনি। তাঁর গৃহত্যাগের কাহিনী গল্পেই শুনেছি, তবুও চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম নিমাইকে। নিমাই—সামনে তাঁর উচ্চ আদর্শ, সেই আদর্শের জন্য তিনি ত্যাগ করে চলেছেন গৃহ সংসার, প্রিয় পরিজন সব, গৃহ ছেড়ে চলেছেন তিনি। উদ্দেশ্য তাঁকে ডাক দিয়েছে। কিন্তু যাবার পূর্ব্বক্ষণটিতে তাঁর মনে পড়েছে মায়ের কথা, তিনি চ'লে গেলে তাঁর মা কাঁদবেন সে কথা ভেবে তিনি বিচলিত। তাই আকুল সুরে গ্রামবাসীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

"নদে বাসীরে আমার মা যেন কাঁদে নারে দেখ ভাই।"

আর তাঁর সেই আকুল প্রার্থনা যেন কত যুগ পরে গ্রাম্যমাঝির কণ্ঠ চিরে ফুটে বেরুচ্ছে। ঘাটে একটা বুড়ি স্নান করছিল, চেঁচিয়ে বল্ল—"ও মাঝি মা কাঁদলো ত নিমাইয়ের কি ?" মাঝির কানে সে কথা গেল না। সে তখন ঘুরে ফিরে গাইছে—"নদেবাসীরে আমার মা যেন কাঁদে নারে দেখ ভাই।" কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল সত্যই ত। মা কাঁদলো ত নিমাইয়ের কি ? চলার আনন্দে যে জন বিভোর, কে কোথায় কাঁদলো দেখবার কি সময় আছে তার ? সামনে যাকে

এগুতে হবে পিছন ফিরে তাকাবার তার দরকারই বা কি, সময়ই বা কোথায়! কিন্তু মা—তাঁর দুঃখ ত অস্বীকার করা যায়না। একমাত্র অবলম্বন ঐ নিমাই, সেও তাঁকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে' গেল। তবে কিসের মায়ায়, কাকে নিয়ে, কার আশ্রয়ে থাকবেন তিনি! তাঁর সেই বুকফাটা আর্ত্তনাদের বাণীও "ওরে নিমাই, ছেড়ে কোথায় গেলিরে"—গানের সুরে প্রকাশ পেয়েছিল একজন বড় গায়কের কণ্ঠে। রেকর্ডে শুনেছিলাম সে গান। মাঝির গানের মতন সে গান এমন করে মনকে নাড়া দিতে পারে নি। এর থেকেই মনে হয় গানের মধ্যে ডুবে গিয়ে গাইতে না পারলে গানের মাধুর্য্য থাকে না। মাঝি-সেত কাউকে শোনাবার জন্য গায়নি, আপন মনে সে গেয়ে চলেছিল, সুরের বাঁধাবাধি, সময়ের কড়াক্কড়ি ত সেখানে ছিলনা, আপন মনে সে গেয়েছিল, তাই বুঝি ওর গান অত ভাল লেগেছিল।

জন্ম থেকেই এই সহরের বুকে বাস। সহরের প্রাণহীন কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দেখতেই অভ্যস্থ। তাই যখন গ্রামে গেলাম গ্রামের সেই শান্ত কোমল শ্রী, পাখীর কূজন, নদীর কল্লোল তান, মাঝির গান, এ সবের মধ্যেই প্রাণের সাড়া পেলাম, সব কিছুই আমাদের ভাল লাগলো। কিন্তু এ ভাল লাগাইত সব নয়। কবি বলেছেন—"শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রাম গুলি।" কিন্তু কোথায় শান্তি! শুধু কান্না আর হতাশ্বাসে ভরা যেখানকার প্রত্যেকটি গৃহ, সেখানে শান্তি আছে কি? কবি যিনি, কল্পনা নিয়ে তাঁর খেলা, মানব জীবনের কঠোর বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে কান্না হাসির দোলার মধ্যেও চিরজীবন গানের ডালা বয়ে চলেন, সাধারণ মানুষের ত তা নয়। ক্ষণিকের কল্পনারাজ্য ছেড়ে সে যখন এই ধূলা মাটির ধরণীতে নেমে এসে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হ'তে থাকে, তখন ঐ মাঝির গান, পাখীর কূজন, নদীর কল্লোল কিছুই যে তাকে আনন্দ দিতে পারেনা। তাকে পীড়া দেয় গ্রামবাসীর ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মুখগুলি। ঘুরে ফিরে মনে পড়ে তাদের কথা, শত শত নরনারী, পল্লীর ঐ শান্ত ছায়া সুনিবিড় কোলেই বাস করে। মানুষ তারা তবু মানব জীবনের সতেজ প্রাণ স্পন্দন নেইত তাদের মধ্যে তিল মাত্র। মানুষ হয়ে, মানুষের মতন বাঁচবার অধিকার নেইত তাদের। জীবনের কোন সাধ, কোন আহ্লাদই তাদের মেটেনা কোনদিন। জন্ম থেকে পেট ভরে খেতে পায় না, শীতে গায়ের সবখানি ঢাকবার মতন সংস্থানও নেই তাদের, ওষুধ খেয়ে রোগের হাত থেকে বাঁচবারও সামর্থ্য নেই। কিছুই পায়না তারা, কিছুই জানে না তারা! এই না পেয়ে পেয়ে অভাব বোধও তাদের শুকিয়ে গেছে, চাইতে জানে না, তারা শুধু জানে দুঃখ ভোগ করতেই তারা এ পৃথিবীতে এসেছে। বিধাতা তাদের পূর্ব্ব জন্মের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এ সংসারে পাঠিয়েছেন, আজীবন দুঃখ ভোগ করেই তারা পাপ খণ্ডন করবে। এই তারা জানে, এর চেয়ে আর বেশী কিছু ভাবতে পারে না! এরা কি মানুষ! মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায় এদের মধ্যে? বনের পশুপাখীরাওত কোন রকমে খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে, এদের যে সে ক্ষমতাও নেই। কিসের জীবন এদের! এর প্রতিকার করতে কেন পারিনা। এ না পাবার জন্য দাযী কি আমরা, না আর কেউ! জানি এদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে কি রয়েছে কিন্তু জেনেই বা আমরা কি করতে পারছি।

দুদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে যাই, সেখানকার মাঝির গান, পাখীর কূজন, বনের ছায়া আমাদের মুগ্ধ করে। গ্রামবাসীর দুঃখ দৈন্য দেখে হয়ত একবার 'আহা' বলি, বড় জোর দুখানা পুরোণ কাপড় আর দু'চার আনা পয়সা দান করেই দানগর্ব্বিত অন্তরে ফিরে আসি। কই তাদের সঙ্গে মিশে, তাদেরই একজন হয়ে থাকতে পারিনা ত সেখানে। গ্রামে থেকে, ওদের সঙ্গে মিশে, ওদেরই একজন হয়ে ওদের বোঝার ওদের শোচনীয় অবস্থার কথা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করার প্রেরণা দেব এ ইচ্ছা ত মনে কতবারই জেগেছে, কিন্তু সেখানে থাকতে পারিনি ত। সহরের মোহ আমার সেই গ্রামে থাকার ইচ্ছায় বাধা দিয়েছে, টেনে এনেছে আবার সেই পাষাণকায়া রাজধানীরই বুকে।

গ্রামে দৈন্যের যে নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি দেখে এসেছি তার কোন প্রতিচ্ছবিই ত এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। তবে কি দারিদ্র্য নেই এখানে? অন্নাভাবে, অর্থাভাবে লোক মরেনা এখানে? না এখানেও দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, খেতে না পাওয়ার বেদনা, বিনা চিকিৎসায় রোগ ভোগের যন্ত্রণা সবই আছে।

তবু গ্রামবাসীদের মতন এদের নগ্ন দুরবস্থা চোখে এমন বড় হয়ে দেখা দেয় না। সহরের বাইরের চাকচিক্য, বাইরের মোহ দিয়ে ঘিরে রাখে তার আসল রূপটীকে, মিথ্যা আবরণে ঢেকে দেয় তার বুকের গভীর ক্ষতটীকে, ভুলে যাই তার কপট হাসির শঠতায়, ডুবে যাই কৃত্রিম কলরোলে।

ইউরোপীয় পরিস্থিতি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত

১৯৩৪ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগুলির মধ্যে শক্তির অনুপাতে পৃথিবী পুনর্বিভাগ-দ্বন্দের সূচনা দেখা দেয়। এর অল্প পরেই ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে এবং জার্ম্মানী পর পর অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও মেমেল অধিকার করে ও স্পেনে ফ্যাসিষ্ট প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র গঠনের সহায়তা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের চোখের উপরে এ সমস্ত অনাচার সাধিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি পর্য্যন্ত এতে বাধা দেবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, পরোক্ষ ভাবে সাহায্যই করে এসেছে।

১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধিতে বিজয়ী শক্তিগুলির উদ্দেশ্যই ছিল জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি চিরতরে খর্ব্ব করা, যাতে ভবিষ্যতে সমগ্র ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শোষণে তারা হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু রাশিয়ার বলশেভিকদের দ্রুত উত্থান তাদের সমস্ত কল্পনাকে ম্লান করে দিল। রাশিয়ার নব উত্থান ইউরোপের নূতন শক্তি-সমন্বয়কে বিপর্য্যস্ত করলো। বলশেভিকদের সাফল্য ও পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে আতঙ্কিত করে তুলল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অবিলম্বে তাহাদের ভার্সাই নীতির ত্রুটী বুঝতে পারল।

মধ্য ইউবোপে একটা প্রবল পবাক্রান্ত বলশেভিক বিবোধী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভূত হ'ল। জার্ম্মানীতে হিটলাবেব অভ্যুত্থান তাই সাম্রাজ্যবাদী বাষ্ট্রগুলিব কাছে একান্ত বাঞ্ছিত বলে মনে হ'ল। জার্ম্মানীব পূর্ব্বদিকে অগ্রসব নীতিব অবশ্যম্ভাবী পবিণাম রাশিযা-জার্ম্মান সঙ্ঘর্ষ কল্পনা ক'রে সমগ্র পৃথিবীব গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রগুলি উৎফুল্ল হযে উঠল। একমাত্র এই আশাতেই তাবা জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপানেব সর্ব্ববকম অনাচাবেব নীবব সমর্থক হযে বইল।

কিন্তু সমস্ত আশা ও অনুমান ব্যর্থ ক'বে চেম্বাবলেনের কূটনীতিব পবাজয সূচিত ক'রে রুষ-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষবিত হযে গেল। বাশিযাব সঙ্গে মিতালী ক'বে জার্ম্মানী প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেব প্রতিদ্বন্দ্বী হবাব সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেব নীতি পবিবর্ত্তন একান্ত প্রযোজন হযে পডল। বর্ত্তমান যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডেব এই পবিবর্ত্তিত নীতিবই ফল। প্রকৃতপক্ষে ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য ক'বে জার্ম্মানীব একে একে অষ্ট্রীযা, চেকোশ্লোভাকিযা ও মোমল দখল, বাইনল্যাণ্ডকে পুনবায অস্ত্র সজ্জিত কবা, জার্ম্মানীব অস্ত্র সম্ভাব বৃদ্ধি কবা, বিমান বাহিনী গঠন কবা প্রভৃতি সন্ধিসর্ত্ত বিবোধী কার্য্যে বাধাপ্রদান না ক'বে পবোক্ষভাবে জার্ম্মানীব শক্তি ও স্পর্দ্ধা বৃদ্ধিতে সাহায্য কবাব ফলেই আজ পোলাণ্ডেব স্বাতন্ত্র্য বক্ষাব জন্য এক নবমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবা তাদেব পক্ষে অপবিহার্য্য হযে উঠলো।

হিটলাব মধ্য ইউরোপে এক সভ্যতা-ধ্বংসকাবী বিভীষিকায পবিণত হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মৌন সম্মতি পেযে। সে শৈথিল্য দূরীভূত ক'বে প্রকৃত নাৎসী বর্ব্বরতাব বিলোপ সাধন কবাই যদি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেব কাম্য হযে থাকে তবে সে উদ্যমকে পৃথিবীব সমস্ত স্বাধীনতা ও শান্তিকামী লোকই যে সমর্থনেব দৃষ্টি নিযে দেখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবিক পক্ষে জার্ম্মানীব পববাজ্য গ্রাসেব প্রতি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেব অবিচলিত ঔদাসীন্যই তাদেব পৃথিবীব কাছে হেয করে তুলেছিল। সে ঔদাসীন্যেব পবিসমাপ্তি ঘটলে সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয লোকই আনন্দিত হবে সন্দেহ নেই।

ভার্সাই সন্ধি যে মোটেই সুবিবেচনা প্রসূত নয, অনেক অশান্তিব বীজ যে এব মধ্যে নিহিত বযেছে, বহু বিশেষজ্ঞ এ বিষযে এ ধবনেব মতামত প্রকাশ কবেছেন। আব ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সও ভার্সাই সন্ধিকে কোন মর্য্যাদাই দেযনি। ইটালীব আবিসিনিযা বিজয স্বীকাব ক'বে নেওযা—জার্ম্মনীর অষ্ট্রিয়া ও চেক বাজ্য গ্রাসে পবোক্ষ সম্মতি তাব প্রমাণ। সুতবাং হিটলারের অগ্রসব নীতিকে বাধা দেওযা বর্ত্তমান যুদ্ধেব একমাত্র প্রশংসনীয উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেদিক থেকেও হিটলাবের অগ্রসব পথে এক দুর্ভেদ্য অন্তবাল বচিত হযেছে। কামান গোলাবারুদ নিযে আক্রমণ না কবেও প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব-ইউবোপে হিটলার-বাদেব বিরুদ্ধে তীব্রতম সংগ্রাম চালিযেছে সোভিযেট বাশিযা। গত একমাসেব ঘটনা স্রোতেব গতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে ইউবোপীয বাষ্ট্রনীতিব প্রধান ভূমিকায অভিনয কবছে বাশিয়া—যে বাশিযা কিছুদিন আগেও ইউবোপীয় শক্তিগুলির নিকট অপাংক্তেয বলে বিবেচিত হযেছে। বাশিযা অপ্রতিহত ভাবে অগ্রসর

হয়ে জার্ম্মানীর আকাঙ্ক্ষিত বাল্টিক সমুদ্রে সামরিক ঘাঁটী নির্ম্মাণের আশা, কৃষ্ণসাগরের পথ তথা ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের পথ চিরতরে বন্ধ করেছে—সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিগুলি দীর্ঘদিন ধরে সমবেত চেষ্টায় যা করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু তার এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য রাশিয়াকে বহু তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। "রক্ত বাহিনীর" পোল্যাণ্ড প্রবেশের ঠিক পরই এই সমালোচনার সুরু হয়। পোল্যাণ্ডে রুশ সৈন্যের প্রবেশ সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যজয়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত ক'রে রাশিয়াকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার একটা চেষ্টা ধনিক শ্রেণীর প্রসাদলোভী কতকগুলি সংবাদপত্র করে এসেছে। তাই প্রত্যেক সত্যান্বেষীর পক্ষে বাস্তব ঘটনার অবিকৃত ভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর বুখারেষ্ট থেকে রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, পোল্যাণ্ডস্থ পররাষ্ট্র-দূত ও রাষ্ট্রীয় দপ্তরখানা প্যোলাণ্ড পরিত্যাগ ক'রে রুমানীয়ায় প্রবেশ করেছে। তারও কয়দিন আগে থেকে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছিলেন যে, পোলিশ গভর্ণমেণ্টের অবস্থিতি সম্পর্কিত কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। ১৬ই সেপ্টেম্বর 'টাইমস্'-এর সংবাদদাতা পোল্যাণ্ডে সামরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অন্ততপক্ষে "যে-পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মানী সুষ্ঠুভাবে ধ্বংস করছে তার ওপর অধিকার রক্ষা করবার জন্য জার্ম্মানীর যথেষ্ট সৈন্য পোল্যাণ্ডেই নিযোজিত করতে বাধ্য হবে।" তার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে ১৬ই সেপ্টম্বর পোল্যাণ্ডে যুদ্ধের একরকম পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

পোল্যাণ্ডের নিকটতম একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র হ'ল সোভিয়েট রাশিয়া। পোল্যাণ্ডের ভাগ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হিটলারবাদের দ্বারা আতঙ্কিত হবার কারণ যদি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কারও থাকে তবে সে হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। হিটলারের পূর্ব্ব দিকে অগ্রসরের শেষ লক্ষ্য যে সমগ্র ইউরোপের শস্যক্ষেত্র ও তৈল সম্পদে পরম সমৃদ্ধিশালী রাশিয়ান "ইউক্রেন" এ বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। রাশিয়ার পক্ষে তাই পোল্যাণ্ড রক্ষা আত্মরক্ষার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে রাশিয়া পোল্যাণ্ড রক্ষার জন্য কোনও কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিল। একমাত্র এই আশাতেই সে ইঙ্গ-ফরাসী-রাশিয়া আলাপ আলোচনায় যোগদান করেছিল। এই আলোচনার ব্যর্থতার কারণ এখন সকলের নিকটই সুস্পষ্ট। সে আলোচনার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিরূপিত হয়ে গিয়েছিল। ষ্টেট্সম্যানের সামরিক সংবাদদাতা তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "যদি পোল্যাণ্ডকে বিসর্জ্জন দিতে হয় তবে তার একমাত্র কারণ হবে এই যে, সে রুষ সৈন্যের পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ দেবার অধিকার অস্বীকার করেছিল। যদি পোল্যাণ্ড অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়—তবে তাকে নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করতে হবে।" কিন্তু তা করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৬ই সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি ঘটল। সঙ্গে সঙ্গেই পোল্যাণ্ড-রুশীয় অনাক্রমণ চুক্তির অবসান ঘটল। কাজেই ১৭ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার পোল্যাণ্ড

প্রবেশকে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা নিতান্ত বিদ্বেষবুদ্ধি প্রসূত। মৃত্যুর পরেও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা ধর্ম্মনীতির দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও রাজনীতিতে তার কোন স্থান নেই।

১৭ই সেপ্টেম্বর রুষবাহিনী ৫০০ মাইল জুড়ে ৪০ মাইল অভ্যন্তরে কার্জ্জন লাইন পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'ল। ১৯১৯ সালে Allied Supreme Council এই কার্জ্জন লাইনকে রুষ-পোলিশ সীমান্ত বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন। ১৯২০ সালে রাশিয়া যখন শত্রু কর্ত্তৃক নানাদিক থেকে আক্রান্ত হ'ল পোল্যাণ্ডও তখন কার্জ্জন লাইন পার হয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করলো। রাশিয়া তখন বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবে বিব্রত থাকায় পোল্যাণ্ড কর্ত্তৃক অধিকৃত ইউক্রেন্ এবং শ্বেত-রাশিয়া তাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। তদবধি এই প্রদেশর সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পোলিশ রাষ্ট্রের অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও রাশিয়া পোল্যাণ্ডের নিকট এই অংশ দাবী করেনি। কারণ সে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী ও সন্ধি-সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তা ক্ষুণ্ণ করেনি। কিন্তু পোলিশ গভর্ণমেন্টের পতন ও নাৎসী সৈন্যের দ্রুত অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে এই অংশের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকা সে যুক্তিযুক্ত মনে করল না। পোলিশ রাষ্ট্রের অধীনে তারা সুব্যবহার পায়নি, কিন্তু নাৎসী শাসনাধীনে তাদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না। এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা বাদ দিলেও জার্ম্মান সৈন্য একেবারে রাশিয়ার সীমান্তে উপনীত হওয়ার উপক্রম করেছিল।

রাশিয়ার পোল্যাণ্ডের অংশ অধিকারে সমগ্র পৃথিবী বিস্ময় ও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেই একই ঘটনায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও এমেরিকার রাজনৈতিক মহলে গভীর সন্তোষের সঞ্চার করেছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে জর্জ্জ বার্ণাড শ' টাইমস্ পত্রিকায় লিখেছিলেন, "রাশিয়া থেকে যে খবর আসছে তা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মঙ্গলজনক।" প্যারীর রাজনৈতিক মহলের মতামত সম্পর্কে রয়টারের এক সংবাদ প্রকাশিত হয় "এখানে বিস্ময়ের কোনও আভাস নেই। জার্ম্মান প্রচার সত্ত্বেও এই মতই সর্ব্বত্র সমর্থিত হচ্ছে যে, রাশিয়া জার্ম্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে এরূপ মনে করবার কোনও কারণ নেই।" পক্ষান্তরে রাশিয়ার পোল্যাণ্ড প্রবেশ জার্ম্মানীর চির-বাঞ্ছিত 'ইউক্রেন' অধিকারের আশা সুদূরপরাহত করেছে। পূর্ব্ব-ইউরোপে রাশিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধির ফলে জার্ম্মানীর অগ্রসর নীতির পরিসমাপ্তি ঘটতে বাধ্য হবে।—আর এই অগ্রসর নীতি বন্ধ হতে বাধ্য হওয়ায় জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে দ্রুততর ক'রে হিটলারী শাসনের অবসান ঘটাবার পথ সুগম হ'য়ে উঠবে।

সপ্তাঙ্ক

(Seven stages of life)

শ্রীমতী বীণা দাস

তার খুব ছোটবেলার কথা ভাবতে গেলে ভালো করে মনে পড়ে কেবল একটিমাত্র ঘটনা। —রোজ রাতে বাবা তাকে নিজের পাশে নিয়ে শোয়াবার চেষ্টা করতেন. সারাদিন ধরে কত খোসামোদ করে রাখতেন "তোর দাদা দিদিরা সবাই ছোটবেলায় আমার পাশে শুত, রাতে শুয়ে শুয়ে কত মজার গল্প বলব।" "সেই রাজপুত্রর গল্পটা শেষ করবে বাবা?" "হ্যাঁ সেটা তো করবই, আরও কত।" লোভে পড়ে বাবার বিছানায় এসেই কোনও দিন শুয়ে পড়ত, কোনও দিন বা ঘুমন্ত ছেলেকে বাবা তুলে নিয়ে যেতেন, কিন্তু ঘুমের মাঝে বাবাকে জড়াতে গিয়েই যেত ঘুমটা ভেঙ্গে, আর আচমকা ঘুম ভেঙ্গে মনটা উঠত ভয়ে কান্নায় ভরে, "কোথায় শুলুম, মা বুঝি পাশে নেই?" পাশের হাতটা তুলে নিয়ে দেখত—না একগাছিও চুড়ি নেইত, মুখে হাত দিয়ে দেখত খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। তক্ষুনি সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনরকমে দরজা হাতড়িয়ে, মশারি সরিয়ে, দাদা-দিদিদের মাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে টলতে টলতে মার পাশে এসে পড়ত। ভোরবেলা শুনত মা বাবাকে বকছেন, "কেন ওকে নাও বাপু? রাতে অন্ধকারে আসতে গিয়ে কোনদিন যাবে হোঁচট খেয়ে পড়ে।" মাকে দুহাত দিয়ে আরও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ত।

তারপরের স্মৃতি—মা সকালবেলা কুটনো কুটতে বসতেন, তখন সে মা'র পাশে বসে পড়া করত "First Book"। "The Dove-এর গল্প তো আমার হয়ে গিয়েছে না মা? Horse এর গল্পটাও হয়েছে।" "দূর, অত কখন হ'ল,—আচ্ছা বল দেখি মানে—" "মা, এই অঙ্কটা বলে দাও, যোগ না বিয়োগ না গুণ" "দূর পাগলা, তা বলে দিলে তুই আর কি করলি" "না মা শুধু এইবারটী বল।" আঁক কষতে কষতে হঠাৎ মাকে চমকে দিয়ে মা'র কোলের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ত। মা বকতেন, "দস্যিছেলে এরকম করে আসে, সামনে খোলা বটি!" মার বকুনীকে ছাপিয়ে উঠত ছেলের কৌতুকোচ্ছল হাসি।

ইস্কুলে যখন যেত, মা'র বড় ভয়। রোগা ছেলে, অত Foot ball খেলা কি ওর সহ্য হ'বে? ছেলেরা এসে আবার মাকে বলে দিত, "মাসীমা—ও আবার আজ কুস্তী করেছে।" "তোমরা একটু দেখনা বাবা।" "দেখিতো মাসিমা, ও কারুর কথা শোনে না, কুস্তীতে ওর মুখ টুখ লাল হয়ে গিয়েছিল, আমিই তো তখন ছাড়ালাম।" মার আরও ভয় ওই ড্যাংগুলি খেলাটা, 'কি যে সৃষ্টিছাড়া খেলা মানুষ বের করে বাপু।' Tiffinএর সময় বাড়ী ফিরে সে দেখত মা খেতে বসেছেন, আর সবাই খেয়ে চলে গিয়েছে, মা একা খাচ্ছেন। "মা আমার খাবার কই?"—দুমিনিটে খাওয়া শেষ করে চলে যাচ্ছে, মা ডাকেন, "এত শীগ্‌গীর কি খেলিরে, আয় আমার কাছে দু'গরোষ খেয়ে

যা।" মা তখন দুধ ভাত কলা খাচ্ছেন—তাব মুখে এক গ্রাস তুলে দেন। "আবও এক গবোষ—ও খোকা।" খোকা ততক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু মা'ব মাখা সেই দুধভাতেব স্বাদ আজও এত বছব পবে যেন মুখে লেগে রয়েছে, অত মিষ্টি কবে মা মাখতেন কি করে ?—

কলেজ জীবনে মা'র সঙ্গে প্রায়ই গণ্ডগোল হ'ত বাতে বাড়ী ফেবা নিয়ে। যখন যত রাতেই হোক বাড়ী এসে দেখত মা বারাণ্ডায আলো নিবিয়ে বাস্তার দিকে মুখ করে চুপটি করে বসে আছেন। মাব কথা ভেবে, মাব সেই বকম একলা বসে থাকাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলে তার সব আমোদ আহ্লাদেব ইচ্ছা কোথায় পালিয়ে যেত. কিন্তু বন্ধুবা যে ছাড়ে না—তাছাড়া !

যেদিন একটু বেশী বাত হত মা কথা কইতেন না, খাবাব টাবাব ঠিক কবে দিয়ে একটু দূবে গিয়ে বসে থাকতেন। খোকাব সাহস হ'তনা মা'ব মুখেব দিকে তাকাতে। কোনও দিন প্রাণপনে সাহস কবে বলে ফেলত, "আজ Ben Hoor দেখতে গিয়েছিলাম মা, ওঃ Madona-কে যা সুন্দব দেখাচ্ছিল, মুখের ভাবটা ঠিক তোমাব মত, হ্যাঁ মা সত্যি, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনা, যাবে মা তুমি একদিন দেখতে ?" বলতে বলতে মাকে জড়িয়ে ধবে। এবপব আব মাব চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না।

ছেলে মা'কে ছেড়ে চলে গিয়েছে। মা সাবাক্ষণ ডাকছেন "ফিবে আয, ফিবে আয, ফিরে আয।" মা'ব চোখে শুধু অবিশ্রান্ত জল। পাড়াপ্রতিবেশিনীবা এসে সান্ত্বনা দেন, "দিদি, অত অধীর হ'লে কি চলে, তুমি এমন অস্থিব হ'লে সেও যে সেখানে পাগল হয়ে উঠবে। তাছাড়া কেবল কি তুমি, কত মা'ব ছেলে আজ কোলছাড়া হয়ে বয়েছে, তাবা কি করে সহ্য কবছে বলতো ?" মা চোখেব জল মুছে ফেলেন, জোর কবে মুখে হাসি টেনে এনে গল্প কবেন, ছেলের গল্প। "এবাব যখন সে হঠাৎ বাইরে যেতে চাইল, মনটা আমার তখনই কেমন কবে উঠেছিল, কত বাবণ কবলাম কিছুতেই কি শুনল। যাবাব সময আমাব খুব পিঠ চাপড়িয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গেল, যেন আমিই তাব ছোট মেয়ে।" মা আবাব একটুখানি হেসে ওঠেন, কিন্তু শ্রোতাদেব চোখ এবাব সজল হয়ে আসে।

জেলেব অন্ধকার ঘবে শুয়ে শুয়ে ছেলেও তখন মাকেই স্বপ্ন দেখছে, মাব জলভবা চোখ।

মা'ব খোকা এখন বড হয়ে উঠেছে। এখন তার অবাধ স্বাধীনতা, অসীম ক্ষমতা ! গভীর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তার মুখখানাকে করে তুলেছে অসম্ভব বকম গম্ভীব, প্রকাণ্ড দাযিত্বেব বোঝা মুখের মধ্যে নিয়ে এসেছে একটা চিন্তাকুল ভাব। স্বভাবের স্বাভাবিক দৃঢ়তা আব তেজ চেহারাটা কবে তুলেছে কঠিন, উগ্র, দৃপ্ত।—লোকে দেখলে চট কবে কাছে এগুতে সাহস পায় না। বন্ধুবা অনুযোগ কবে, "তুই দিন দিন এমন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছিস কেন ?" আত্মীয় স্বজন চিন্তিত হ'ন "একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই, শরীবে কি এত সইবে ?" খোকা কারো কথাব কোনও উত্তর দেয় না। খালি রাত্রিবেলা শোবার ঘরে গিয়ে মার ছবিখানার সামনে যখন শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে, তখন সে খুলে দেয় মনেব দরজা, সেখান থেকে আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবের মত বেরিয়ে আসে তার সারাদিনেব পুঞ্জীভূত শূন্যতার

জ্বালা। সে জানে তার সব আছে, নেই কেবল মা। সেই একটিমাত্র না থাকা তার আর সমস্ত থাকাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সংসারে কত লোকেরই তো মা নেই, সকলের কি এমনি হয়? হয় হয়তো, কে জানে, তাদের মনের ভিতরের খবর ক'জন জানছে? খোকারেও কি বাইরে থেকে দেখে লোকেবুঝতে পারে কিছু? তাছাড়া থাকগে অন্যদের কথা, তার মনে যা হয়, মার অভাবে সে যে কতখানি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে, সেইটুকুই সে জানে,তারই ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সে অবসন্ন, অন্যের কথা সে ভাবতে পারে না। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে, টেবিলে মাথা রেখে সে কাঁদে, অনেক রাত অবধি। বছর পাঁচেক আগে মাও এই ঘরে বসে ওর জন্য এমনি করেই কাঁদত।

বাড়ীতে অসুখ। ডাক্তার নার্স আত্মীয়স্বজন সমাগমে বাড়ীটা একেবারে ভরে উঠেছে—এতদিন যে বাড়ী শূন্য পড়ে থাকত। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উৎকণ্ঠিত। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, বাঁচবার কোনও আশাই নেই। রোগী নিজে আজ বারবার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছিল, সারবার আশা আছে কি না, ডাক্তার সত্যি কথাই বলেছে। আর তাই শুনে রোগীর মুখে আজ অনেক দিন পরে দেখা দিয়েছে হাসি, যে হাসি আজ ১০ বছর ধরে কেউ কোনও দিন দেখতে পায়নি। মৃত্যুর পর কি হয় সে জানে না,—আত্মার অমরতায় তার আস্থা কম। তবু মরতে আজ তার ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে, কারণ তার মাও একদিন মরে গিয়েছিলেন।—আর কিছু না হোক্ মা'কে ছেড়ে থাকার তার শেষ হ'বে। এর চেয়ে বেশী আর কি সে চাইতে পারে? এর বেশী আর কি?

বিপ্লবী ফ্রান্স

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭৮৯ সালের জুলাই মাসের বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ, ব্যাষ্টিল নামক কারাগৃহ পুড়াইয়া দেওয়া হইল, ব্যাষ্টিল ধ্বংস ফ্রান্সের রাষ্ট্রীক সত্তানুভূতির নিদর্শন। বিপ্লব-বহ্নি সমগ্র ফ্রান্সে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, অভিজাতগণের প্রাসাদ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বহুলোক দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেল। নূতন যুগের উপযোগী করিয়া যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহা "জাতীয় পরিষদে"র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে লাগিল।

মেকিয়াভেলির মতবাদের উপাসক প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে ছিল। সেই সকল দেশের রাজা ও পরিষদবর্গ ফ্রান্সের অনিষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুরোহিত-গণ পুরাতন সমাজ ও প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। আর্টই-এর কাউন্ট, বুর্জেন-এর ডিউক প্রভৃতি নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণের সহিত সম্রাজ্ঞী পত্রালাপ করিতেছিলেন। নবগঠিত ফরাসী জাতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়াকে উত্তেজিত করিতেছিল। ইতঃপূর্ব্বে ফ্রান্স দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। জমিসংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। জাতীয় পরিষদের আভ্যন্তরীণ কার্য্য পদ্ধতির শৃঙ্খলা ছিল না। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সকল দিক হইতে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল।

কৃষকদের দাসত্ব, ফিউডাল আদালত, বিশেষ অধিকার, করমুক্তি প্রভৃতি অন্যায় প্রথা বাতিল করিবার জন্য পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে আরও তিন চারি বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। গণতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার উন্মাদনায় স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের যে আবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রাচীন বিধি-বিধানের সংস্কার হইয়াছিল। নানা রকমের অন্যায় কর, বর্ব্বরোচিত শাস্তিবিধান, পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। দ্রুত পরিবর্ত্তন ধ্বংস ও বিদ্রোহের বিভীষিকার ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টি চলিতেছিল। মুক্তির আনন্দে অধীর জননায়কগণের অন্তরে যে আবেগ লহরী ছুটিয়া চলিয়াছিল তাহার আবর্ত্তে ন্যায় অন্যায় বোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সৃষ্টি কমলের নূতন দল খুলিয়া গেল। ফ্রান্সের মানস সরোবরে মানব মহিমার ফুল ফুটিয়া উঠিল। তাহার অন্তরশায়ী নারায়ণ সহস্র শীর্ষ তুলিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহার সহস্রফণা স্বাধীনতা সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণে উজ্জ্বল হইয়া দিক্‌চক্রবালকে আলোকিত করিয়া দিল। বিশ্বজগৎ এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল।

প্রাচীন প্রথার উচ্ছেদ হইল। সমষ্টির হাতে ব্যষ্টির ক্ষমতা অর্পিত হইল। ব্যক্তিগত অধিকার ও শ্রেণী বৈষম্য দূর হইল। জননায়কগণ সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইল। নীতি ও মতের অনৈক্যবশতঃ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। যে রাষ্ট্রিক আবহাওয়ায় একাধিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয় না, সে আবহাওয়া আপাত স্বাস্থ্যকর হইলেও অনিষ্টকর ও অসহ্য। যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাতদিগের সদস্য লইয়া গঠিত দক্ষিণপন্থী দল প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। ইহারা প্রগতি বিরোধী ছিল এবং প্রাচীন বিধি ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া শ্রেণীগত বৈষম্য, পদ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত ছিল। ইহাদের কোন আদর্শ ছিলনা। মরি, কাজালিস্, ডিপ্রেমেনেসসিল এই দলের নেতা ছিলেন, ইহারা সংখ্যায় অল্প ছিল।

কেন্দ্রীয় নরমদল নেকারের অধীন ছিল। মৌলিয়র, মালোয়েট্, লালি, টেলেনডেল ও ক্লায়মণ্ট টনায় এই দলের নেতা ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র তাহাদের আদর্শ ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দলের কর্ণধার নেকারের রাজনৈতিক প্রতিভা ছিলনা। ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন ও বৈপ্লবিক নীতির বিরাট সম্ভাব্যতাকে আয়ত্ত করিবার মত দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি তাঁহার ছিলনা।

বামপন্থীদলের সদস্যগণ কোন একটী বিশেষ মূল নীতি দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তবে সাধারণতঃ তাহারা সকলে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। শ্রেণী অধিকার ও অত্যাচারকে ঘৃণা করিত। নীতি ও মতের অনৈক্যবশতঃ তাহাদের মধ্যেও দুইটী উপদলের সৃষ্টি হইয়াছিল। রোবস্পীয়র, পিটন, এবং বুজোট্ প্রমুখ উগ্রবামপন্থীগণ গণতন্ত্র স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। বার্নেভ, ডুপোর্ট, লামেথ্ এবং ব্রিটন গণআন্দোলনে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং বামপন্থীগণের সকল কর্ম্ম অনুমোদন করিতেন। আইনজ্ঞ সিয়েস্ এবং বক্তা মিরাবো গণপরিষদের দুইজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

উচ্চবংশে জন্ম হইলেও মিরাবো পিতার উৎপীড়নে হতাশ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে তাহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন। এইজন্য তিনি মনপ্রাণের সহিত বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, লেখনী ও বক্তৃতা দ্বারা গণপরিষদের সদস্যগণের সাহস ও জনগণের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে বিপ্লব ও অনিশ্চয়তার প্রধান পুরোহিত বলিয়া ভাবিতেন। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে তিনি আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিতেন না। ফ্রান্সের উন্নয়ন বিষয়ে তাহার পরিকল্পনা নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু ছিলনা। রাজতন্ত্রের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিলনা, বরং তিনি ইহার সমর্থন করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ধ্বংসে তাহার বিদ্বেষ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তি ও উষ্ণমস্তিষ্ক কোন বন্ধু বা সহকর্ম্মী সহ্য করিতে পারিত না। জনপ্রিয়তা লাফেট ও নেকারের শক্তির মূল উৎস ছিল কিন্তু মিরাবো তাঁহাদের মত অল্পবুদ্ধি মানুষকে ঘৃণা করিতেন। অর্থাভাব ও উত্তমর্ণদের তাড়না তাঁহার জীবনে শান্তি সুখ নষ্ট করিয়াছিল। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও অবস্থা বৈগুণ্যে এই মনীষী তাঁহার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত

করিতে পারেন নাই। বিপ্লবের রথচক্র যেরূপ দুর্ব্বারবেগে অগ্রসর হইতেছিল তাহাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি তৎকালে কাহারও ছিলনা।

প্রথমতঃ জাতীয় পরিষদ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার আদর্শে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া "মানুষের দাবী" নামে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিল। সমাজ ও রাষ্ট্রকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার আগ্রহাতিশয্যে পরিষদের সদস্যগণ অতিমাত্র দার্শনিকতার আশ্রয়ে যে ভাবসৌধ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বাস্তবজীবনের অতিশয় বাস্তব সমস্যাগুলি অতি অল্পই স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের দর্শনকে ভাববিলাসের ক্ষেত্র হইতে নামাইয়া মানব সমাজের দৈনন্দিন বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্থাপন করিলে নৈরাশ্য সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। সদস্যগণের সম্মতিক্রমে পরিষদকে অবিভক্ত রাখা হইল। নেকারের নির্দ্দেশমত সম্রাটের সহিত পরিষদের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইল। সম্রাট ইচ্ছা করিলে যে কোন আইন চারি বৎসর বন্ধ রাখিতে পারিবেন কিন্তু যথাক্রমে দুইটী আইন সভায় তাহা গৃহীত হইলে সম্রাটের প্রতিকূল মত কার্য্যকরী হইবে না।

এদিকে প্যারিস ও অন্যান্য সকল প্রদেশে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল চলিতে লাগিল। লাফেট্ জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ডেস্‌মোলিনস্ লুসটালো এবং মারাট আলিয়ানিষ্ট দলের প্রধান নেতা ছিলেন। ডানটন্ ও সেণ্ট হিউকজ তাহার বক্তা ছিলেন। ডিউক অফ্ আর্লয়েন্সএর মুষ্টিমেয় পৃষ্ঠপোষকগণের প্রভাব বেশী ছিল। তাহারা সম্রাটকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কিম্বা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল। ডিউকের দলের লোকেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল। খাদ্যাভাবে তাহাদের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সময় ফ্লাণ্ডার্স হইতে রাজার সৈন্যদল ভার্সাই-এ উপস্থিত হইল। রাজপ্রাসাদে একটী বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। একদিকে ভোজের প্রখর সমারোহ ও আড়ম্বর, অন্যদিকে অন্নহীন জাতির আর্ত্তনাদ, একদিকে রাজার সৈন্য সমাবেশ, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পরিষদ প্রবর্ত্তন,--এই দুই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে জনসাধারণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল!

৫ই অক্টোবর একদল রমণী নগরের দুর্ভিক্ষপীড়িত নিম্নশ্রেণীর বহুলোককে লইয়া একটী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া ভার্সাইএর দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের কঙ্কালসার মূর্ত্তি, চর্ম্মাবৃত পঞ্জর, অগ্নিগর্ভ কোটরগত চক্ষু, রুক্ষ কেশ, ক্রুদ্ধ কুকুরের মত মুখভঙ্গি। তাহাদের অট্টহাসির বিকট শব্দে মহানগরী শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের নিঃশ্বাসে বাতাস রসহীন,—চক্ষুর দৃষ্টিতে নিরাশার বাণী পরিমূর্ত্ত। তাহারা পশুর ন্যায় উদ্দাম বেগে ছুটিতে লাগিল। "হা অন্ন, হা অন্ন" বলিয়া আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে করিতে এই অন্ন-ভিক্ষু কাঙালের দল অগ্রসর হইতে লাগিল। হিংস্র আনন্দে তাহাদের ভীষণ দন্তপাতি বিস্ফারিত, আর সেই বিস্ফারণে তাহাদের কদর্য্য নাসিকা কুঞ্চিত। পরিষদগৃহে এই আর্ত্ত বুভুক্ষু জনতা প্রবেশ করিল। সদস্যগণ ভীত, সন্ত্রস্ত, নিস্তব্ধ। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্রাট তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

শান্তি রক্ষার জন্য লাফেট্ সৈন্য বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। রক্ষীদলের পরিবর্ত্তে নিজের সৈন্য রাখিয়া তিনি সম্রাটকে নিরাপদ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একদল লোক পশ্চাতের দরজা দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল, রক্ষীগণকে হত্যা করিল, রাণীর সন্ধানে ছুটিল। রক্ষীগণ বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। তিনি সম্রাটের নিকট পালাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। লাফেট্ সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হইলেন, আক্রমণকারীর দলকে প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। প্রাসাদের বাহিরে উত্তেজিত জনতার চিৎকারে আকাশ কম্পিত হইল। লুই প্রাসাদ বাতায়নে আবির্ভূত হইলেন, ক্ষিপ্ত জনতাকে আশ্বস্ত করিলেন। রাজ পরিবার পরদিন সন্ধ্যায় টুইলারিনে উপস্থিত হইলেন। উত্তেজিত জনতা নিহত রক্ষীদলের রক্তাক্ত মুণ্ড বর্ষা ফলকে তুলিয়া বিকট উল্লাসে রাস্তা কাঁপাইয়া শোভাযাত্রা করিল। "আর ভয় নাই, আমরা রুটীওয়ালা, তাহার স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে লইয়া আসিয়াছি" বলিতে বলিতে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত নরনারী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই বৎসর প্রথম বিপ্লবের যুগ। সম্রাট টুইলারিন্ প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইলে, তাঁহারা মামুলি বিশ্বাসভঙ্গ নীতি পরিহার করিতে পারিলে, উদারতা, দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জনশক্তির প্রতিরোধ না করিলে বিপ্লব প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি গ্রহণ করিত না, হয়ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি রাজ মুকুট রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ ছিল।

ফ্রান্সের পার্লামেণ্টরি শাসন পদ্ধতি স্থাপিত হইল। সম্রাটের যথেচ্ছচারিতা ক্ষুন্ন করা হইল, জাতীয় পরিষদ সমগ্র দেশ শাসন করিতে লাগিল। কিছুকালের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিষদ গঠনমূলক সংস্কার করিতে লাগিল। সময়ের অল্পতা, শাসনকার্য্যে অর্ব্বাচীনতা, অবস্থা বিপর্য্যয় ও সমস্যাগুলির জটিলতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে ইহার কার্য্যসূচী অল্প ছিল না। শারীরিক দণ্ড, বিনা বিচারে আটক, ধর্ম্মমতের জন্য পীড়ন প্রভৃতি ফৌজদারী আইনের ধারাগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। সমগ্র দেশকে আশীটি অংশে বিভক্ত করা হইল। সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল। বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য নূতনভাবে আদালত স্থাপিত হইল, কিন্তু বিচারকগণ জাতীয় পরিষদের সদস্যগণের ন্যায় ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেন। ভোটের দ্বারা বিচারক নিযুক্ত হইলে ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা হানি হয়, অভিজ্ঞতার অভাবে ইহা তাহারা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। গির্জ্জা সংলগ্ন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। দান ও শিক্ষার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি ছাড়া সকল সম্পত্তি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। ষ্টেট্ হইতে যাজকগণের মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, তাহাদের নিয়োগ নির্ব্বাচনের দ্বারা হইতে লাগিল। নূতন শাসনতন্ত্রে ক্যাবি-নেটের সহিত পরিষদের সম্পর্ক ছিল না। এই দুই বিভাগের সম্পর্ক না থাকায় কেন্দ্রীয় শাসন দুর্ব্বল হইয়াছিল। সহরে ও গ্রামে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা পরিষদের ব্যবস্থা ইচ্ছানুসারে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারিত।

রাজার আন্তরিক সমর্থন এবং অভিজাতগণের যথার্থ স্বদেশপ্রেম থাকিলে জাতীয় পরিষদ ফ্রান্সের স্থায়ী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত। ক্রমশঃ

সমাজের কয়েকটি সত্যিকারের ছবি

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের চারিদিকে শালবন, তারই ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা একটি পথ চলে গিয়ে পড়েছে এক ছোট্ট নদীতে। গ্রামে অল্প কয়েক ঘরের বাস, তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে কুটীরগুলি তাতে থাকত সাঁওতালরা, কয়েকটি ইঁটের বাড়ীতে দুচার ঘর ভদ্র পরিবারও বাস করতেন। ঠিক সেই গ্রামেরই অনুরূপ ছোট একটি পোষ্ট আফিস। সামনের ঘরটি পোষ্ট মাষ্টারের আফিস– ভিতরে একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী পুত্ররা থাকতেন। ঠিক পোষ্ট আফিসের সামনে কিছুটা শালবন ছাড়িয়েই আমাদের ছোট খড়ের বাড়ীখানি। বাড়ীতে দুইখানি ঘর, পেছনে একটু জমি ও রান্নাঘর। দূর থেকে বাড়ীটি বড়ই সুন্দর দেখাত। গ্রামে পৌঁছেই গরুর গাড়ী চড়ে যেতে হ'ল ১০ মাইল দূরে এর থানায় হাজিরা দিতে। তারপর কয়েকদিন পরে অন্তরীণের জীবনে যখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তখনকার একটী ঘটনা আজও মনে হয়।

খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গতে ঘরের সামনে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি,- দেখি ঠিক দরজার ধারে শুয়ে এক মহিলা। পরিধানে তার শতছিন্ন একটি বস্ত্র, মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহা ও আরও কয়েকটি চুড়ি। তার অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য দেখে বুঝতে পারলাম বাঙ্গালী মেয়ে নয়। ভাবলাম পথের কোনও ভিখিরী, ঘুম ভাঙ্গলেই ভিক্ষা নিয়ে চলে যাবে। তারপর দুপুর এসে গেল, সে দেখি তখনও বসে। বাড়ীর সবাই এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম। কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পেলাম না, শুধু বাড়ী কোথায় অনেকবার জিজ্ঞাসা করাতে হাত উঁচু করে আকাশটা দেখিয়ে দিল। সবারই ভয় হল হাতে যেরকম প্রকাণ্ড নোখ, হয়তো পাগল কখন ভেতরে ঢুকে আমাদের আহত করে দেবে। তাকে কিন্তু কিছুতেই সরানো' গেল না, যদিবা ডেকে ঢুকে সামনের খালি বাড়ীর বারান্দায় নিয়ে বসান হয়, সন্ধ্যা হলেই দেখি ঘরের সামনে এসে বসেছে। বুঝতাম অন্ধকারে সেখানে ভয় করত। কয়েকদিন পরে বুঝতে পারলাম, যদিও মনে মনে তাকে দেখে ভয় করে ওঠে তবু সে বাড়ীর যেন একজন হয়ে গেছে। ঠিক চারবার তার খাবারটি তাকে পৌঁছে দিলেই তবে মনটা নিশ্চিন্ত হয়। কোনও দিন কিন্তু সে আমাদের ওপর এতটুকু উপদ্রব করেনি, ঠিক খাবার সময়টাতে দেখি আমাদের দেওয়া একটি পুরানো থালা ও জলখাবার গেলাসটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার ধারটিতে। দুপুর বেলা এর একদিন তেষ্টা পেলে গেলাসটা নিয়ে দাঁড়াত, বুঝতে পারলে জল ঢেলে দিতাম। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে আমাদের শত প্রশ্নগুলি সে কেমন নির্ব্বিবাদে এড়িয়ে গেল। তাকে মাঝে মাঝে স্নান করাতে ডেকে নিয়ে যেতাম, সামনের কুয়ার ধারে। সাবান গায়ে মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেবার সময় কোনও আপত্তি করত না, যা বলতাম খুবই লক্ষ্মীর মত তা মেনে চলত। একখানি ফর্সা কাপড় দিয়েছিলাম, সেইটা পরে রইল। খুব ভয় করলেও একদিন তার আঙ্গুলের বড় বড় নোখগুলি কেটে

দিলাম, দেখলাম সে কোনও বাধাই দিল না। যা হোক উন্মাদিনীর নখাঘাতে যে মৃত্যু হবে না সে বিষয়ে একটু নিশ্চিন্ত হ'লাম। এমনি করে কয়েকমাস কেটে গেল। ইন্‌স্পেক্টরবাবু প্রথম খোঁজ খবর নিতে আস'তন, একদিন বল্লাম "থানায যদি এইরকম ধরনের কোনও মেয়ের তার স্বামী বা অন্য কেউ খবর নিতে আসে এর সন্ধান দেবেন। তার পরদিন বিকেলে আমাদের এলাকার ছোট একটি নদীর ধারে বেড়িয়ে ফিরে শুনি, চৌকীদাররা এসেছিল, অনেক প্রশ্ন বা ভীতিপ্রদর্শন করেও তার ঠিকানা জোগাড করতে পারেনি। ভয়ে যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মনে কত কি ভাবলাম, হয়তো সংসারে খুব বেশী ঘা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে, হয়তো স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে আজ সে গৃহছাড়া, আবার ভাবলাম হয়তো মাথার বিকৃতি হওয়াতে ঘরসংসার ছেড়ে চলে এসেছে! কিন্তু এতদিনেও তো কেউ তার সন্ধান করল না। তখন আমারও স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল,—কি জানি কি ভেবে তার দু একদিন পরে একটু কষ্ট স্বরেই হয়তো তাকে জানিয়ে দিলাম, কতদিন তার ভার আমি বইব? সে বাড়ীর সন্ধান বলুক, তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমার ছুটী হ'লেই বাড়ী ফিরে যাব, এর তখন কি দুর্দ্দশা হ'বে? এও এক মহা চিন্তায় পড়লাম! যদি এ পাগল সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠতে যায়? –তারপর অন্ধকারে যা'র ভয় করে তাকে একলা রেখে যেতে যে কষ্ট হ'বে।—সবাই বলত সে বোবা এবং হাবা। তাকে বেশী বোঝানো নিষ্ফল, এই ভেবে ঘরে চলে গেলাম। তারপর যেমন সন্ধ্যা আসে অন্যদিনের মতন, তেমনি গাঢ অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে এল। সন্ধ্যার আগেই ঠিক গোধূলি লগ্নে রাখাল বালকদের সঙ্গে আমাকেও ছুটতে হ'ত কুটীর পানে—নয়তো আবার জেলখানা।

তারপর দীর্ঘ সন্ধ্যা চারিদিকের শালবন পরিবেষ্টিত ছোট বাড়ীটিতে বারান্দায় বসে থাকতাম, খুব দূরে দু' একটি বাড়ী থেকে আলো দেখা যেত। অনেকে বলতো আশে পাশে নেকড়ে —এমনকি বাঘের পর্য্যন্ত পায়ের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। অনেকে বল্ল লোঠা বলে এক ডাকাতশ্রেণীর দল সেখানে আছে, রাতে তারা বন থেকে মানুষের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। তাই প্রায় আটটা নয়টায় দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকতাম। দেখলাম পাগলী এসে ঠিক শুয়েছে। অন্যদিনের মতও ভোরে উঠে দেখি সে জানলার ওপাশে নেই, ভাবলাম বোধহয় কোথাও ভিক্ষা আনতে গেছে কারণ তার দুদিন আগে একদিন দেখি ভাতখাবার সময় থালা নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কিছুটা চাল, চালশুদ্ধ থালা আবার আমার হাতে তুলে দিতে গেল, আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। এ আবার কি বিপদ। শেষে কি ভিখিরীর ব্যবসা আরম্ভ হয়ে যাবে না কি? সেদিন তার চাল ফেরৎ দিয়ে দিলাম।

কিন্তু দরজার বাইরে গিয়ে দেখি তার সেই থালাটা গেলাসটা যেন গুছিয়ে রেখে গেছে। থালার ওপর দেখি তাকে দেওয়া সাবানের টুকরোটী পর্য্যন্ত রয়েছে। একটী ফিতে দিয়েছিলাম সেটি পর্য্যন্ত। হঠাৎ মনে হল বোধ হয় রাতে তার স্বামী এসে তাকে হাত ধরে নিয়ে গেছে। কিম্বা অনেক দিনের ভুলের পর আবার বুঝি তার সব স্মৃতি ফিরে এসেছিল। তাই সে চলে গেছে তার সোনার সংসারে। সেখানে তার কত আদর কত সম্মান, হয়তো তার ছেলে-মেয়েরা তাকে

ফিরে পেয়ে কত আনন্দই না করছে। এই রকম কত কল্পনাই না তাকে ঘিরে মনের ভিতর দেখা দিল। তারপর অনেকক্ষণ চলে গেল, তার কথা আর মনে ছিল না। খেতে বসেছি, এমন সময় আমাদের ঝি কাছে ষ্টেশনে জল আনতে গিয়েছিল, ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্ল, "দিদিমণি, যে পাগলীর জন্য তুমি এত করলে সে কি কিণ্ডি করেছে দেখবে এস।" ভাবলাম বুঝি সে আমার অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, কিম্বা কাউকে আহত করেছে, বা আরও কিছু। তারপরে শুনলাম যে সে-সব কিছুই করেনি। শুধু আমায় একেবারে মুক্তি দিয়ে গেছে। ভোর রাতে বম্বে মেল পাস্ করে, তারপরেই দেখা যায় তার ছিন্ন মস্তক লাইনের ওপারে রয়েছে, রক্তাক্ত দেহ লাইনের ওপরে। ঝি বল্ল "দিদিমণি, ও পাগল ছিল না, সবই বুঝত, বোবা কালাও ছিল না,—তাহ'লে তোমার সব কথা শুনত কি করে? ও খালি কথা বলত না, পাছে ওর দুঃখের জীবনের কথা সবাইকে বলতে হয়, তাই বোবার ভান করে থাকত।" বুঝে দেখলাম, সত্যিই তো তাই। ভাবলাম দিনের পর দিন পাশেই শুয়েছিল, অথচ তার জীবনের ইতিহাসের রহস্যজাল একবিন্দুও ছিন্ন করতে পারলাম না। শিক্ষার গর্ব্ব করি, মনস্তত্ত্ববিদ্যার গর্ব্ব করি, কিন্তু তার কাছে এক মস্ত পরাজয় হয়ে গেল। বাবা বল্লেন, "পৃথিবীর কোনও মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যে দুঃখ ব্যথা ওর বুকে জমাট বেঁধে ছিল, সে সব সে পৃথিবীর কোনও মানুষের কাছেই জানাতে চায়নি. যিনি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু তাঁর কাছেই তার সমস্ত অভিমান সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করতে গেছে।"—

তারপর একমাস পরে ছুটী পেয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।
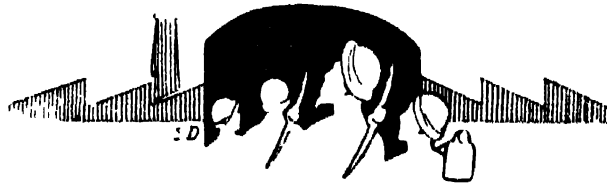
নালন্দার কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

নালন্দা দেখিলেই একটা কথা মনে হয় যে, সেকালে এমন নিভৃত স্থানে কেন বৌদ্ধগণ এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন? রাজধানী হইতে দূরে, বুদ্ধদেবের জীবনের সহিত স্মৃতিসম্পর্ক বিহীন অপরিজ্ঞাত স্থানে এত বড একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা কেমন করিয়া তাহাদের মনে আসিয়াছিল, আজ তাহা আমাদের কাছে শুধু একটা কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

সেই একদিন পঞ্চম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবাসী শুধু নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কীর্ত্তি ও যশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্ত রাজাদের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল। গুপ্ত রাজারা জানিনা কেন এই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন?

চীনপর্য্যটক ফাহিয়ান যখন আনুমানিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে নালন্দা আসেন, তখন নালন্দা ছিল একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রাম বিরল বসতি, আর একটি মাত্র স্তূপ ছিল তথায় বিদ্যমান। ঐ স্তূপটি শাক্যসিংহের প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্তের স্মৃতিজ্ঞাপক রূপে পরিচিত ছিল।

একদিন গুপ্তরাজাদের শুভদৃষ্টি পড়িল এই শ্যামল বনানী শোভিত বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে। হিন্দু গুপ্তরাজারা এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতির জন্য রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতে লাগিলেন। শক্রাদিত্য সম্ভবতঃ কুমারগুপ্ত [৪১৪-৪৫৪ খৃষ্টাব্দে] একটি বিহারের প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। কুমারগুপ্ত নালন্দার প্রান্তর ভূমে যে বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথাগতের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণের পূজার ও সঙ্গীতের স্থান ছিল। নৃপতি তথাগতগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য [আঃ ৪৮৬—৪৭২ খৃষ্টাব্দ] এবং বুদ্ধগুপ্ত [আঃ ৪৭৫—৫০০ খৃষ্টাব্দ] প্রভৃতি নৃপতিরাও কয়েকটি বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়া নালন্দার গৌরব বর্দ্ধন করেন। বজ্র নামে একজন নৃপতি সম্ভবতঃ বালাদিত্যের বংশেরই কেহ হইবেন এবং মধ্য ভারতের একজন নৃপতিও নালন্দার আরও কয়েকটি বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছিলেন। এই ভাবে পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এসিয়ার নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন।

তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে নাগার্জ্জুনের একজন বিশিষ্ট শিষ্য আর্য্যদেবও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তারনাথের একথা সত্য হইলে নালন্দার বয়স আরও দুইশত বৎসর পিছাইয়া যায়। নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেবের আবির্ভাব কাল এখনও সঠিক ভাবে জানিতে পারা যায় নাই।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে নালান্দাব অবস্থা কেমন ছিল, সে বিষয়ে তেমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওযা যায় না।

সে সমযে ভারতের ইতিহাসে এক ভীষণ কুগ্রহের অভ্যুদয হইয়াছিল। হূন নরপতি মিহিবকুল উত্তব ভাবতে প্রতিষ্ঠালাভ কবিযাছেন। মিহিরকুল ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মেব ঘোবতব বিরোধী। তিনি একদিন সদম্ভে আসিযা মগধেব রাজধানী পাটলিপুত্র নগব আক্রমণ কবিলেন। নৃপতি বালাদিত্য বর্ব্বব হূন নৃপতিব পবাক্রমে বিপর্য্যস্ত হইযা পডিলেন। নিরুপায নৃপতি বালাদিত্য প্রাণভযে বঙ্গসাগবেব তরঙ্গাভিঘাত বিক্ষুব্ধ এক নির্জ্জন প্রদেশে আসিযা আশ্রয গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ হূন নৃপতি মিহিবকুল যখন পাটলিপুত্র আক্রমণ কবেন, তখন তাঁহাব নিকট নালন্দার কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না, কাজেই একথা একেবাবে অবিশ্বাস্য নহে যে তাঁহার হাতে নালন্দাও শ্রীহীন হইযা পডিযাছিল। তারপব যেদিন মহারাজ চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনেব সাহত গৌড নৃপতি শশাঙ্কেব রণ-কোলাহল দিকে দিকে পবিব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সমযে নালন্দাব যে কোন কিছু ক্ষতি হয নাই, এমন কথা বলা চলে না।

মহাবাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিযাই ইতিহাস প্রচার কবিতেছে। বৌদ্ধ গযায বোধিদ্রুম অগ্নিদ্বারা দগ্ধ কবা এবং বৌদ্ধ গযাব অতুল কীর্ত্তি সেখানকাব বিবাট মন্দিব ধ্বংস কবিযা-ছিলেন বলিযা কুখ্যাতি মহাবাজা শশাঙ্কেব নামেব সহিত জডিত হইযা আসিতেছে। আজিও তাহাব নিরাকবণ হয নাই।

নালন্দাব কথা সেকালে কেই বা না জানিত? কাজেই শশাঙ্ক নালন্দাব কোন না কোন ক্ষতি কবিযাছিলেন, এইরূপ একটা কথা মনে আসে, তবে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযেব কোনও অনিষ্ট কবিযাছিলেন বলিযা প্রমাণ পাওযা যায না।

বিখ্যাত চীন পর্য্যটক ইউ যান-চাঙ যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযে আসিযাছিলেন, তখন নালন্দা আবাব তাহার পূর্ব্ব গৌববে অধিষ্ঠিত রহিযাছে। যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিপ্লবেব দরুন বিহার মন্দিব ও অধ্যযন গৃহ ইত্যাদিব যে কিছু ক্ষতি হইযাছিল তাহা পুনবায সংস্কৃত হইযাছে। আবার পূর্ব্বেবই মত অধ্যযন ও অধ্যাপনা চলিতেছে। বিদ্যার্থিগণেব আনন্দরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযেব অট্টালিকা সমূহ কেমন ছিল, একবার তাহা কল্পনা করিযা লইতে পার। বিশ্ববিদ্যালযেব মধ্যবর্ত্তী সৌধটি ছিল বিবাট—তাহার সহিত সাতটি বিদ্যাভবন সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহার আশে পাশে ছিল বিহাব ও মন্দিব। তাহার কোন কোনটি বহুতলবিশিষ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল, তাহাব উপবে উঠিলে মনে হইত যেন একেবারে মেঘলোকে আসিযা পৌঁছিযাছি। সেখানে দাঁডাইলে মেঘের বিচিত্র লীলা দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া দিত।

এই বর্ণনা যে অত্যুক্তিপূর্ণ তাহা মনে হয় না। কেননা মহারাজ চক্রবর্ত্তী যশোবর্ম্মণের শিলালিপি হইতেও জানিতে পারি যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহার সমূহ এবং মন্দিরগুলি অতি উচ্চ ছিল আর সেকালে এই সমুদয় বিহার ও মন্দিরের চারিদিকে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ বহু

সরোবর ছিল, সে সমুদয় সরোবরে নীলপদ্মরাজি শোভিত থাকিয়া সকলের মন মুগ্ধ করিত। ঐ সমুদয় সরোবরের নির্ম্মল জল পানীয়রূপে এবং শতদল সমূহ দেব পূজার জন্য ব্যবহৃত হইত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিক ঘিরিয়া উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান থাকায় বহির্জগতের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ইৎসিং যখন সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে নালন্দা আসিয়াছিলেন, [৬৭৫ খৃষ্টাব্দ] তখন তিনি নালন্দা বিহারে ৩,০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ইউ-যান-চাঙ যখন নালন্দা ছিলেন সে সময় শ্রমণ সংখ্যা ছিল ১০,০০০ দশ হাজার। এই বিবরণ কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা সম্ভবপর নহে। তবে বিবিধ প্রামাণিক বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ৩,০০০ হইতে ৫,০০০ পাঁচহাজার পর্য্যন্ত শ্রমণগণ সর্ব্বদাই বসবাস করিতেন। নালান্দা বিহারের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গৃহ ছিল, শ্রমণগণের শিক্ষা ও পদ মর্য্যাদা অনুযায়ী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহারা বাস করিতেন। নালন্দার খনন কার্য্যের দ্বারা যে সমুদয় বাস কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটি একজনের থাকিবার উপযোগী, কোনটি বা দুইজনের বসোপযোগী। সেই সমুদয় গৃহে পাথরের নির্ম্মিত শয়ন বেদী, প্রদীপ রাখিবার কুলুঙ্গী, এবং রান্না করিবার জন্য চুল্লী রহিয়াছে। উনুনগুলি বেশ বড়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সে সময়ে বহু ছাত্র একসঙ্গে আহার করিতেন এবং সেইজন্য খাদ্য দ্রব্যাদিও হয়ত একসঙ্গেই প্রস্তুত হইত।

বিহারগুলি সমান্তরাল ভাবে সজ্জিত। একটির পাশে একটি এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে সার বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের গঠন প্রণালী, এবং পরস্পরের ব্যবধান ও স্থাপত্য কৌশলের প্রমাণ দিতেছে।

ক্রমশঃ

মধুপুরের ট্রেণে

শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্ত

এবার পুজায় গিয়েছিলাম মধুপুরে। ভেবেছিলাম সপ্তমী পুজার দিন যাত্রা করছি, ভীড় হ'বেনা বিশেষ, কিন্তু মা দুর্গা তাতে নারাজ হলেন। যত ভীড় যেন সপ্তমী পুজার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ষ্টেশনেই যাত্রীর ভীড় আর কামরাপূর্ণ লোক দেখে আমার যাত্রার আনন্দ অর্দ্ধেক কমে গেল। অনেক কষ্টে খুঁজেপেতে ট্রেণের একখানি মাত্র তিনবেঞ্চওলা ফিমেল কমপার্টমেণ্টের একটি খুপরী পাওয়া গেল, তাতেই উঠে পড়লাম। মাল ছিল সঙ্গে অনেক—সেগুলিকেও খুপরীর মধ্যে কোন রকমে স্থান দেওয়া গেল। এবারে যাত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ষ্টেশনের দিকের বেঞ্চটীতে বসেছেন এক ঠোটরঙ্‌করা ভুরুআঁকা বব্‌কাটা মেম, হাটুর উপরে উঠেছে তার ফ্রক আর পা ভেঙ্গে অর্দ্ধেক বেঞ্চ নিয়ে বসেছেন, আর অর্দ্ধেক নিয়ে বসেছেন একটি বাঙ্গালী বৌ পাশে রেখে একটি সুটকেশ। মাঝের বেঞ্চটীতে আর একজন বৌ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ছেলেপুলে নিয়ে বসেছেন। বাকি আর একটী বেঞ্চ, তাতে বসেছেন সব জায়গাজুড়ে আমাদের রাজার ধর্ম্মবোন নেটীভ খৃষ্টান এক স্কুল শিক্ষয়িত্রী। তার কাছে আমিও কিছুদিন শিক্ষানবীশ ছিলাম। তিনি বেঞ্চের অর্দ্ধেকটী রেখে আমার অনুরোধে এক জন লোককে বসতে দিলেন আর অর্দ্ধেকটী,—সুবিবেচনায় তিনি রাজধর্ম্ম মেনে চলেন। অতএব অন্য বেঞ্চের বৌটীর শরণাপন্ন হলাম।

বললাম, "দয়া ক'রে, আপনার সুটকেশগুলিকে বাঙ্কে রেখে দেবার সৌভাগ্য আমায় দিন।" অবশ্য বসবার উচ্চাশা নিয়েই কথাটী বলি। তার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হলাম না। বসবার একটু খানি স্থান হ'ল। মালে আর মানুষে গাড়ী একেবারে ভর্ত্তি। তবু এলেন এক বৃদ্ধা থুরথুরে মাড়োয়ারী। ওঃ বলতে ভুলে গেছি এর মধ্যে আবার একটী বৃদ্ধা গিন্নী উঠেছেন, মালের চোটে পা ঝুলিয়ে বসবার আর উপায় নেই। কাজেই মাড়োয়ারী সেই অতি বৃদ্ধা মহিলাকে নিতে সবাই নারাজ। কেউই উঠতে দেবেনা। আমি উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু দেখলাম যে-যায়গা জুড়ে আমি আছি তাতে আমি ছাড়া আর অন্য কেউ বসতে পারেনা। বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন, দেখলাম কারুর বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই।

ট্রেণে চড়লেই আমার দেশপ্রীতি জেগে ওঠে—Indianদের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা আর অব্যবস্থায় পাই লজ্জা। কেউ যা গ্রাহ্য করলোনা—আমার যেন সেটাই হ'লো কর্ত্তব্য। একেই কি বলে বাহাদুরী দেখানো? না প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা? যাই হোক্, গেলাম মেমের কাছে—বললাম, দেবী, কৃপাক'রে একটু সরো, বৃদ্ধা বসুক। তার ভ্রূধনু উঠলো বেঁকে, বললেন, "আমি কি করবো? এত-লোকের তো উঠবার কথা নয় এইটুকু খুপরীতে, রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে বলো ব্যবস্থা করতে।" বললাম—"দেবী, এখন সেটা সম্ভব নয়," যদিও মনে মনে জানি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের মালের

সামিলই মনে করেন, "উঠে যখন পড়েছেই বুড়োমানুষ তখন আপনি একটু সোজা হয়ে বসে জায়গা দিন না ?" এতেও যখন হ'লোনা তখন বেশ একটু কড়া সুরেই বললাম, "সবাই আমরা এখানে সমান—আপনি একলা এত জায়গা জুড়ে থাকতে পারেন না।" এরপরে তিনি সামান্য একটু নড়ে বসে' বৃদ্ধাকে জায়গা দিলেন। বৃদ্ধা বসতে পারলো। গাড়ী ছাড়ার আর পাঁচ মিনিট বাকী, এক ভদ্রমহিলা উঠলেন বাচ্চা নিয়ে, থাকলেন দাঁড়িয়ে। সঙ্গে এল অনেক মাল। কুলি এসে লাগালো বেজায় গোলমাল—মাল রাখে কোথায়--সে চায় কাজ সারতে, অন্যের জিনিষ ফেলে সে জিনিষ রাখতে চায়, কাজেই উঠলো সোরগোল। "আরে গেল যা—এই কুলি ক্যায়া করতা হ্যায় ?" "আঃ বাছা দেখতে পাচ্ছ না ?" "এই ওটী আমার"---এই সঙ্কটে দেখা দিলেন এক রেল কর্ম্মচারী। ইতিমধ্যে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন, মাল রেখেছে এমন ক'রে একটু নড়াচড়া পেলেই আমাদের ঘাড়ে তারা নেবেন স্থান। এর পরেও মাল বিভ্রাট। কর্ম্মচারীটী বিলক্ষণ কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বললেন, "পায়খানার সামনে মাল রেখেছ কেন ? এই কুলি মাল সরাও।" কুলি মাল তুলতে গেল বাঙ্কের উপর, সেখানও ছিল মাল ভর্ত্তি। দেখলাম অবস্থা সঙ্গীন, কুলিকে বাধা দিয়ে কর্ম্মচারীকে বললাম, "আপনি বলছেন, কিন্তু অবস্থা দেখছেন তো ? আপনি কোথায় একটী সুন্দর ব্যবস্থা করবেন, না মানুষ চাপা দেবার ব্যবস্থা করছেন, একে লোকই ধরছেনা তাতে আবার এই অসম্ভব মাল।" তিনি রুষ্ট হয়ে বললেন', "এইটুকুতো যাচ্ছেন তার জন্য এত কথা।" বললাম, "না এইটুকু মালের তলায় পিষে যাওয়াই ঠিক ছিল—আমারই অন্যায়।"

কথার ফল সহজেই দেখা দিল, কুলি মাল নামিয়ে নিয়ে গেল। আর দু মিনিট। ভাবলাম এই বুঝি শেষ। কিন্তু না, আবার আর একজন, তিনি একটু দাঁড়ালেন, পরে মেমটীকে সরে বসতে বললেন কিন্তু মেম সরতে নারাজ। নব আগন্তুকাও হটবেন না। তিনি বললেন, "আপনার পিছনের মালটী সরান। দেবী এবারে শিউরে উঠলেন, "আরে ওটীতে যে খাবার।" "তা থাকলোই বা খাবার, একপাশে রেখে দিন –দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি ?" দেবী দেখলেন শক্ত পাল্লায় পড়েছেন, অগত্যা মাল সরিয়ে রেখে যায়গা দিলেন।

ট্রেণ চলল। সবার জায়গা হল, শুধু আমিই থাকলাম দণ্ডায়মান হয়ে। সবার সুবিধা দেখতে গেলাম, কিন্তু আমার বসবার কথা কেউ ভাবল না, মুখে একটু কৃতজ্ঞতার চিহ্নও দেখলাম না। মালে ঠেসান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম। স্বাধীন ভারতের রেলওয়ের কি রকম ব্যবস্থা করা হবে। বেশীক্ষণ চিন্তা করা গেল না। যাত্রীনীরা আলাপ পরিচয় সুরু করে দিয়েছেন। প্রশ্নের হাত হতে আমিও নিস্তার পেলাম না। এইবার আর এক দৃশ্য পটের সুরু হ'ল। মনে হ'ল কত যুগের আপন আমরা যাত্রা করেছি এক সঙ্গে, লক্ষ্যও এক। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম গল্পে আর বর্ণনার ধরনে, কত যে মজার মজার কথা হ'ল—

* * * * *

"এর মধ্যে তেমন মেয়েমানুষ নেইতো কেউ ?" আমরা সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে দেখলাম বক্তা আমাদের বাঙ্গালী বৃদ্ধা গৃহিণীটী। তিনি আমাদের উৎসুক নয়নের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলে চললেন, "বাবাঃ আজও আমার বুকটা দুর্‌দুর্‌ করে—কি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ। জাতই ওদের আলাদা কিনা। সেবার লক্ষ্ণৌয়ে যাচ্ছি। গরমকাল। গাড়ীতে হয়েছে ভীষণ ভীড়, তার উপর মাল। সঙ্গে আমার ছোট নাতি নাতনী রয়েছে। কর্ত্তার আবার ভীষণ ভয়। সঙ্গে ছেলেপুলে রয়েছে, যে রকম মাল বোঝাই করা হয়েছে—তাতে চাপা পড়ার আশঙ্কাই বেশী।

সব চেয়ে শেষে উঠেছিল একটি up country মেয়ে। তাঁর সঙ্গে বাচ্চা কাচ্চা ছেলেপুলে অনেক। আর সেই অনুপাতে মালের পরিমাণও যথেষ্ট। কর্ত্তা সঙ্গের পুরুষটিকে বললেন,—এত মাল মেয়েদের গাড়ীতে দেবেন না, ছেলেপুলে রয়েছে, পড়লে পরে কি রকম হবে বলুনতো, মালগুলো সরান। সে কর্ণপাতও করলে না, উপদেশে বরং খিঁচিয়ে উঠল—কোথায় সরাবো, জায়গা নেই বাবু। বলে চলে গেল। কর্ত্তার দেখুন সবতাতেই মাথা ব্যথা—আমি বললাম, তুমি যাও বাপু কিচ্ছু হবে না। তিনি তো কিছুতে শুনবেন না, গার্ড সাহেব যাচ্ছিলেন, তাকে ডেকে বল্লেন,—মশাই এর একটি ব্যবস্থা করুন, মালের গরমে মানুষ মারা পড়বে নাকি ? কিছু এমন খারাপ কথা বলেন নি, যেমন ঐ মেয়েটী বলছিল না ঐরকমই—বলেই আমার দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম।—পরক্ষণেই সামলে নিলাম। "তারপর বুঝলেন তো ?" বুঝলাম "বুঝলেন" কথাটা ভদ্র মহিলার মুদ্রা দোষ।

"বুঝেছেন ?" গার্ড তো 'দেখি মশাই' বলে চম্পট দিলেন।

আমি বললাম, তোমাকে আর হাঙ্গামা করতে হবে না।

তিনি বললেন, না এরকম কার যেতে পারবে না, মাল কমাতেই হবে। সেই up country মেয়েটী খামকা চটে উঠে কর্ত্তাকে বললো—চুপ রহো উল্লুকা বাচ্চা। এ শুনে কার না রাগ হয় বলুন ? কর্ত্তাতো পুরুষ মানুষ, বললেন, আমি উল্লুকের বাচ্চা, না তুমি নেংটী কুকুর। নেংটী কুকুর যেমন পাঁচ ছ'টি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে গর্ত্তে বসে থাকে তুমিও তেমনি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে চিল্লাচ্ছো, সাহস থাকে বেরিয়ে এস না। তারপর বুঝলেন সেকি কাণ্ড—মেয়েটী হঠাৎ কোমর থেকে এক ছুরি টেনে বের ক'রে ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়লো—তারপর ও মেয়েটার আর কি, কর্ত্তাই যায় যায়। আমি ভাবলেম বুঝি মেরে দেয়ই বা এক ঘা, না তা না। বীর পুরুষের ছোরা দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়েছে। গিন্নিমা বলতে লাগলেন—"কর্ত্তার আবার heart-এর অসুখ আছে কিনা। এতে তো গেল খুব বেড়ে। ঔষধ ছিল আবার আমার কাছে। ট্রেণ চলছে, দিতে পারছিনা। পাশের গাড়ীতে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি বললেন, ভয় পাবেন না মা, আমি সব দেখব শুনব। তাকেই বললুম, দেখুন আমাকে একবার আপনাদের কামরায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, ওর ঔষধটা খাইয়ে দিয়ে চলে আসব। তিনি বললেন, মা বড্ড ভীড়, ঔষধটা আমাকে দিন, আমি খাইয়ে দেব,—কি ক'রে অচিন লোককে দিই বলুন। বললাম, না ওর

এই অবস্থা, আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।”—ভাবতো গিন্নীর Mentality, বাঙ্গালী মেয়েদের যে কতরকম কুসংস্কার আছে, একজনের অসুস্থ অবস্থায় আর একজনকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যাক্, আসল কথা গল্পটা শোনা যাক। “তারপর বুঝলেন, অনেক কষ্টে ঝিকে পাঠিয়ে দিলাম, সে গিয়ে ঔষধ খাইয়ে এল। বুঝলেন, কর্তাকে যখন নামানো হোল, তখন আর তিনি নিজে নামতে পারলেন না, ধরাধরি করে নামাতে হোল।”

তার পর আর সব নিতান্ত সাধারণ কথা। তাই উঠে সবে রেলের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরের দিকে চেয়ে দেখি বাংলার চিরপুরাতন চিরসুন্দর শ্যমল সোনালী মূর্ত্তি। ঘন সবুজ গাছ আর স্বর্ণ-শীর্ষ ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে কৃষকের বাড়ী। এই ক্ষেতগুলো যখন দেখি তখন কিছুতেই মনে হয়না যে কৃষক একে সৃষ্টি করেও দুঃসহ দারিদ্র্যে নিপীড়িত। চেয়ে আছি, বাইরের দৃশ্যে বৈচিত্র্য নেই—সেই এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি,—তবু বিরক্তি লাগেনা—কেমন একটা শ্যমল স্নিগ্ধতা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ছেলে বেলা দেশে যাবার সময় যেমন অত্যাগ্র উৎসাহ এবং আনন্দ নিয়ে রেলের জানালায় মুখ রেখে বাইরে চেয়ে থাকতাম। মনে হত ক্রমশঃ গ্রামের নিকটে যাচ্ছি, যত দূরত্ব কমে আসতো ততো আনন্দ হোত আর জায়গাটার সঙ্গে আত্মীয়তা হোত। আজো চেয়ে দেখি কিন্তু দৃশ্যের সঙ্গে আর মনের সঙ্গে যোগসূত্রটী কোথায় যেন আলগা হয়ে গেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে নানা রকম অদ্ভুত ভাবনা আসে। মনে হয় ক্ষেত পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ি—দেখে আসি গ্রামটা কেমন।

ক্ষেতের দিকে তাকালে আস্তে আস্তে এটা মিলিয়ে—আমাদের গাঁয়ের শেষে ধানের ক্ষেতটা ভেসে ওঠে। সেই ক্ষেতের মাঝখানে সরু খাল, সেই খালের জলে ছোট্ট জেলে ডিঙি দোলে। আর পাশে মেটে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে আমি যেতাম চলে পাশের গাঁয়ে, রাস্তায় দেখা হত কত লোকের সাথে। খুব ভাল লাগত, দেখে কেমন একটা আনন্দ আর আরাম সেটা ঠিক বোঝান যায় না। তাদের ওপর আমার একটা সহজ দাবী ছিল। কেউ আমাকে দেখে দূরে দাঁড়াত সরে—কেউ হেসে জিজ্ঞেস করত কতদূর যাব আমি? ওদের সঙ্গে আমার আলাপ জমতো খুব। সহজ ঔৎসুক্য ওদের খুব বেশী—সহরে সেটা অসভ্যতা। ওদের ঔৎসুক্যে আমারও বাড়ে কৌতূহল। ওদের আমিও উল্টে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করি।

আসানসোল থেকে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। ক্রমশঃই যে বাংলা ছাড়িয়ে যেতে চলেছি বেশ বোঝা যায়—ক্ষেত হয়ে আসে বিরল। মাঠের রং বদলিয়ে রাঙা হয়ে আসে। এখান-কার মাটি যেন নিয়েছে সন্ন্যাস, তাই সে পরেছে তার গৈরিক বহির্বাস। দূরে পাহাড়ের পাওয়া যায় আভাস, দূর থেকে মেঘের মত দেখা যায়। ছোট ছোট পাহার তবু বেশ লাগে, বোধ হয় বেশী পাহাড় দেখিনি ব'লে—কিম্বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্যে। জানলা গলিয়ে দেখছি আর ভাবছি নানা কথা, মাঝে মাঝে দুটো একটা নদী পড়েছে। যারা বাংলার মেঘনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়ালখাঁর সুবিস্তৃত বক্ষ দেখেছে তাদের এ নদী দেখলে হাসি পাবে, কারণ নদীতে নেই জল,

আছে বিস্তৃত বালুবক্ষ, তার মাঝ দিযে ক্ষীণ জল ধারা। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে কোন রকমে বযে চলেছে ঝির ঝির ক'বে—তবু এর একটা সৌন্দর্য্য আছে। বিকেলের রোদ প'ড়ে নদীর জল আর বালু কবে চিক চিক, যেন কে রূপোর গুঁড়ো ছড়িযে দিযেছে। বালির ওপর দিযে যে এককালে জল বযে যেত তা বোঝা যায় বালির ওপর জল প্রবাহের দাগ দেখে—বর্ষাকালে না কি এব বেগেব মুখে লোক পারেনা দাঁড়াতে। মাঝে মাঝে বেলেব দুপাশ ওঠে উঁচু হয়ে—পাশে দেখা যায় পাথব—বুঝি পাহাড়ের দেশে চলেছি। মিহিজাম ষ্টেশন ছাড়িয়ে দেখি—বাংলার ও বিহারেব সীমা নির্দ্দেশ ক'রে একটুকবা কাষ্ঠ দাঁড়িযে রযেছে, তার এক দিকে লেখা বাংলা একদিকে লেখা বিহার। আব বেশী দেবী নেই, শীঘ্রই পৌঁছাব গন্তব্য স্থানে। মাত্র গোটা তিনেক ষ্টেশন বাকি, বারবার ঘড়িব দিকে তাকাচ্ছি কখন ট্রেণ পৌঁছায।

আস্তে আস্তে কাবমাটার ছাড়িযে গেলাম, এবার মধুপুর। আমবা প্রায সবাইই মধুপুরে নামব। কেবল আমাব শ্রদ্ধেযা শিক্ষযিত্রী আব সেই বৃদ্ধা মাড়োযাবী মহিলাটি বাদে। গল্পবলা গিন্নিটি আমাকে বললেন, "আমাদেব বাড়ী যেও, কেমন? আমবা এক নম্বব কুণ্ডু বাংলায উঠছি।" আমি স্বীকৃত হলাম। আব দেরী নাই মধুপুব এসে গেছে, গাড়ী থেকে কুণ্ডু বাংলা দেখা যায—আগেব বাবও দেখা ছিল, ভদ্রমহিলাকে ডেকে দেখিযে নিলাম। ট্রেন ষ্টেশনে থামল, বিকেলেব পড়ন্ত আলোয় মধুপুবে পৌঁছলাম।
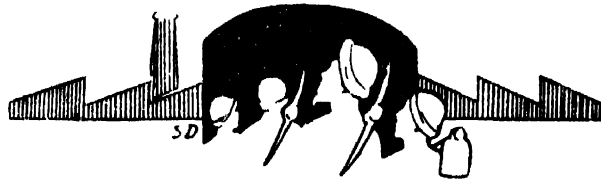
কবি না ভূত ?

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

কি হইতে যে কি ঘটিয়া বসে, আজ পর্য্যন্ত মাথামুণ্ড ছাই কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কার্য্যকারণের জট খুলিয়া একখানি অচ্ছিন্ন সূত্র বাহির করিয়া আনিতে বুদ্ধি যতই পরিশ্রম করে, জট ততই বেশী পাকাইয়া বসে—বুদ্ধির অদৃষ্টে শুধু হয়রানিই সার হয়। দেখিয়া শুনিয়া শেষে বলিতে হয়,—দেখ কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়ায়।

ব্যাপারটা বলিতেছি। আগে অবস্থাটা একটু জানাইয়া লই।—

আদা এবং কাঁচা কদলী সম্পর্কের কতগুলি মারাত্মক বস্তুকে একটা খোলের মধ্যে মারণ-মন্ত্রী বৈজ্ঞানিকেরা সুকৌশলে ঠাসিয়া ভরিয়া রাখে, তারা সেখানে শান্ত হইয়াই থাকে। কিন্তু বাহির হইতে উস্‌কানি পাইলে আর শান্তিরক্ষা হয় না, সশব্দে ফাটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটাইয়া তবে থামে।

বক্‌সা-দুর্গে এতগুলি লোককে যে-ভাবে ঠাসিয়া ভরিয়া রাখিয়াছে, ভয়ে প্রায় আধমরা হইয়াই আছি, কখন যে ফাটিয়া পড়ে তা অদৃষ্টই জানেন। এরা এমন মাল-মশল্লায় তৈরী যে, বাহির হইতে উস্‌কানির আবশ্যক করে না, নিজেদের তাপেই যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া আছেন। তবে রক্ষা এই যে, তাপটাকে সঞ্চিত হইয়া বৃহৎ কাণ্ডের উপযোগী মাত্রা পর্য্যন্ত উঠিতে দেওয়া হয় না, কর্ত্তৃপক্ষ ছোটখাটো খিটিমিটি একটা না একটা লাগাইয়া রাখেনই। উত্তাপের এই ভাবে অপচয়ের ও খেলিবার একটা পন্থা খোলা পাওয়ায় আমরাও বাঁচিয়া যাইতেছি, সরকারও দুশ্চিন্তা হইতে সুরক্ষিত হইয়া আছেন।

আমাদের জন্য আমাদের ভাবনার অবধি ছিল না। আমরা যারা বুদ্ধিমান ছিলাম, কাজেই, তাদের কাজ বাড়িয়া গেল। মাথা ঘামাইতে লাগিলাম যে, যে ভয়-আশঙ্কায় আধমরা হইয়া আছি, সেগুলিকে কি উপায়ে ঠেকাইয়া দূরেই রাখা যায়। দায়ে পড়িলে বুদ্ধি খোলে। আমাদের বুদ্ধিও খুলিল। আমরা গোড়ার কথাটাই ধরিয়া ফেলিলাম যে, মানুষকে কদাচ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া দিন কাটাইতে দিতে নাই। দিলে ভিতরে শয়তানের কারখানাঘরে বড় বড় হাতুড়ী কর্ম্মব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

মাথার মধ্যে শয়তানের কামারশালা খোলা হউক, এ আমরা চাহিতাম না। অতএব, ঠিক হইল যে, থিয়েটার নয় যাত্রাই অভিনয় করা হইবে। অতীন বসু ভালো ছাত্র (এখন পি-আর-এস হইয়াছেন), ভালো লেখেন, সবচেয়ে ভালো তাঁর উৎসাহ। তিনি যাত্রার পালা লিখিয়া ফেলিলেন, নাম দিলেন মহুয়া।

নীচে ছ' নম্বর ব্যারাকে আসর পাতা হইয়াছে। উঃ, যাত্রা যা জমিয়াছে, তা কহতব্য নয়। মুহুর্মুহু হাসি, উল্লাস, করতালি—হিমালয়ের কোলে নির্জ্জন ভূখণ্ডের রাত্রিকে পাগল করিয়া ফেলিল।

বুড়া পাহাড়ের সাধ্য রহিলনা যে, গাম্ভীর্য্য বজায় রাখে। দূরের ঝরণাটা দূর হইতেই অনুমানে-আন্দাজে আভাষে-ইঙ্গিতে যতটুকু রস ভাগে পাইল, তাতেই ক্ষেপিয়া গেল, পাথর হইতে পাথরে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া সে এক রীতিমত মাতলামী সুরু করিয়া দিল। পাহাড়ী হরিণ জলপান করিতে আসিয়া উৎকর্ণ হইল এবং দূর হইতে ডাকিয়া আমাদিগকে বাহবা-বাহবা উৎসাহ পাঠাইল।

রাণী তাঁর লোমশ বাঁ হাতে তরবারি লইয়া কি ভীষণ যুদ্ধই না করিতেছেন, চক্ষু যথাসম্ভব লাল করিয়া লইয়া মেয়েলী গলায় গর্জ্জন করিয়া দস্যুকে ধমকাইতেছেন—"ওরে ওরে, পাপিষ্ঠ পামর! থাকে যদি বীর্য্য এই বাহুতে আমার।" উঃ, দোহাই রাণী, ক্ষমা দেও, পেটে যে খিল ধরিল—কিন্তু এইতো সবে সুরু, প্রায় সবটাইতো বাকী রহিয়াছে।

নীচে ছ' নম্বর ব্যারাকে যখন বীর্য্যময়ী রাণী কাপড় গাছকোমর বাঁধিয়া দস্যুর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, উপরে তখন এক ভদ্রলোক বাহির হইতে তিন নম্বর ব্যারাকে গিয়া ঢুকিলেন। গায়ে সার্ট, পায়ে কেডস্—সেই অবস্থাতেই লোহার খাটে দেহ রক্ষা করিলেন।

ওদিকের এক খাটে এক ভদ্রলোক বিছানায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। কয়দিন জ্বর গিয়াছে, আজই কেবল বিরাম দিয়াছে, তাই আর হাঁটিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া যাত্রা শুনিতে যান নাই। এতক্ষণ একা ছিলেন। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে, কালীবাবু?"

জুতাপায়-সার্ট গায় উত্তর দিলেন—"হুঁ।"

—"চলে এলেন যে? ভালো লাগল না।"

—"কি?"

—"যাত্রা। কেমন জমেছে?"

—"যাইনি।"

—"যাননি? কেন?"

—"না।"

ব্যস, এর পরে আর প্রশ্ন চলেনা। ভদ্রলোক বুঝিলেন যে, কালীবাবু এখন স্ব-স্বভাবে নাই। এতক্ষণ একা একা থাকিয়া রোগী মানুষের সঙ্গের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, কথা বলিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন,—তাই মনে মনে কারু আগমন কামনা করিতেছিলেন। আলাপের মতই লোক আসিয়াছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে কালীবাবুর ন্যায় এতবড় আলাপী আসরী লোকেরও মন ভার, কথা বলিতে চাননা। সুতরাং, ভদ্রলোক পূর্ব্বের মতই খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অথচ চুপ করিলেই রোগের দিকে মন যায়।

কালীবাবুর পরিচয় সংক্ষেপে দিবার অর্থ হয় না। কারণ কোন সিন্ধুই বিন্দুতে সংক্ষিপ্ত হইবার নহে। আর বিস্তারিত পরিচয়, সে সুবিধা এ ঘোর কলিতে তো সম্ভবই নয়। সে ব্যাসদেবই

বা কই, যিনি মহাভারত অনর্গল বলিয়া যাইবেন, এবং সে গণেশই বা কই, যিনি ঘ্যচ্ ঘ্যচ্ করিয়া তা লিখিয়া লইবেন।

তবু কাজ চালাইবার জন্য কালীবাবুর দুটী পরিচয় দিতে হইল। কালীবাবু কবি। মহাকবির সঙ্গে নামের মিলটা আকস্মিক নহে। পুরাণো আমলের লোক বলিয়া মহাকবি ছিলেন মা কালীর দাস, আর আধুনিক অগ্রগতির যুগে বলিয়া আমাদের ইনি আগাইয়া গিয়া হইলেন মা কালীর পদ। কালিপদবাবু কবি, এই প্রথম কথাটা মনে থাকে যেন। কালীবাবুর দ্বিতীয় পরিচয়, ইংরেজীতেই বলি—তিনি full of Vitality পৃথিবীতে রওয়ানা হইবার সময় তাড়াহুড়ায় আমরা অনেকেই অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই ঠেকার সময় অনেক জিনিষই ভিতরে খুঁজিয়া পাইনা, সংসার ও জীবনের ক্ষেত্রে এজন্য মারও কম খাই না, অপদস্থও কম হইনা। জানিনা কালীবাবু আসিবার সময়ে প্রাণভাণ্ড হইতে আবশ্যকের চেয়েও এত বেশী প্রাণ কি কৌশলে সঙ্গে লইতে পারিয়াছিলেন। ন্যায্য বণ্টনে ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর যতটুকু প্রাপ্য হইত, তার চার পাঁচগুণ অধিক তাঁর সম্বল রহিয়াছে, অভয় পাইলে বলিতে পারি যে—কালীবাবু চোর, পাওয়ানার উপরও বেশী ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়াছেন। সৃষ্টির গেটে প্রহরী সব সময়ে সজাগ থাকে না, নইলে চোরাই মাল লইয়া এমন বেমালুম কালীবাবু নামিয়া আসিতে পারিতেন না।

শ্রীকান্ত বলিয়াছিল—"টগরতো আমার কাহিল হবার মেয়ে নয়।" তবে কালীবাবু কাহিল হইলেন কেন? যিনি একাই দশজনের সমান কথা বলেন, মনে রাখিতে হইবে দশজনের আন্দাজ প্রাণ একা ভাণ্ড হইতে খাবল মারিয়া খাইয়া জন্ম লইয়াছেন, তিনি চুপ মারিলেন কেন? আমরা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়াছিলাম যে, আসরে দুমণ কথা হইলে প্রায় দেড়মণ কালীবাবু একাই সাপ্লাই করিতেন। সেই কালীবাবুর মুখে কথা নাই, কথা এড়াইয়া যাইতেছেন। সাপের মুখে ব্যাং পড়িয়াছে—তবু সাপ মুখ খোলে না, কথা পাইয়াও কালীবাবু ছাড়িয়া দিলেন,—এই অসম্ভব সংযমের কারণ জানিতে হইলে সাইকোলজি পড়িবেন।

ও আমি পড়িনাই। তবে ব্যাপারটা নিজের মত করিয়া একপ্রকার বুঝিয়াছি। কথা বলিবার সময় একমুখেই যিনি দশানন, চুপ করিবার পালা আসিলে দশজনের মুখের ভাব একমুখে লইয়া তাঁকে বোবা হইতেই হইবে—গাণিতিক নিয়মে এইতো পাওয়া যায়। আর একটা কথা, অধিক প্রাণের সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। স্বল্প প্রাণ কলসের জল, কিন্তু অধিক প্রাণ নদীর মত, সেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে। কালীবাবুর আপাততঃ ভাঁটির টান চলিয়াছে।

রোগী ভদ্রলোক যথেষ্ট চুপ করিয়াছেন মনে করিয়া আবার কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। ডাকিলেন—"কালীবাবু?"

—"বলুন।"

ভদ্রলোক দমিলেননা, বলিলেন—"যান, যাত্রা শুনে আসুন।"

—"না।"

শুনিযাই তিনি বুঝিলেন ভীষ্মেব বাক্য। এব আর নট্‌-নড়ন নট্‌-চডন।

ভদ্রলোক ভিন্ন পথ ধরিলেন।

জিজ্ঞাসা কবিলেন—"শবীব খাবাপ নাকি?"

—"না।"

কালীবাবুর শবীব খারাপ, এ কি একটা প্রশ্ন হইল। লোকে শুনিলে হাসিবে যে।

—"তবে?"

তবেটায বক্তা মন বা অমনি কিছু বিষযে ইঙ্গিত করিযা থাকিবেন।

কালীবাবু উত্তব দিলেন—"অমনি।"

শুনিযাছি সাগবেব ঢেউ পাহাডে প্রতিহত হইযাও অভিজ্ঞ হযনা, ঢেউযেব পর ঢেউ ব্যর্থ আক্রমণ কবিযা চলে কঠিন পাথবেব বিরুদ্ধে। ভদ্রলোকের সাগরেব ঢেউযের স্বভাব ছিল কিন্তু তিনি ঠেকিযা শিখিলেন, মানিযা নিলেন যে, এখন 'নো-এডমিশন।' পাথবেব ঘবটায এধাব হইতে ওধাব পাথরের মতই কঠিন নীববতা চাপিযা বসিল।

—"কালীবাবু, দেখুন দেখুন।"

আহ্বানে সাবা ঘরটা চমকাইযা উঠিল।

কালীবাবু উঠিযা বসিলেন—"কি?"

—"ঐ দেখুন।"

উপবে জানালাব দিকে ভদ্রলোক অঙ্গুলি ইঙ্গিতে কালীবাবুর দৃষ্টি ঠেলিযা দিলেন। পাথরেব দেয়ালে ছোট জানালা, তাবই ফাঁক দিযা বাহিবে পাহাডেব চূডা ও আকাশ দেখা যাইতেছে। সেখানে পাহাডেব মাথায ও আকাশে আশ্চর্য্য রং লাগিযাছে। আকাশে কোথাও চাঁদ উঠিযা থাকিবে। কালীবাবুর মন হাবাইযা গেল। উঠিযা দাঁডাইযা কহিলেন—"চলুন, বাইবে গিযে দেখি।"

—"বাইরে ঠাণ্ডা। আমি আব যাবনা, আপনি দেখে আসুন।"

পরামর্শেব প্রযোজন ছিলনা। কালীবাবু বাহিব হইযা গেলেন।

বাহিবে আসিযা একেবারে মুগ্ধ হইযা গেলেন। চাঁদ দেখা যাইতেছিলনা, পূবেব পাহাডটা তাকে আডাল কবিযা বাখিযাছে। ওখানে রূপালী বং জ্বলিযাছে। এ রূপে কালীবাবু মজিলেন।

অধৈর্য্য হইযা উঠিলেন, চাঁদেব সঙ্গে দেখা কতক্ষণে হইবে। চূডাটার আডালেই সে আসিযাছে, মিনিট কযেক পরে মুখ বাহিব কবিতে পারিবে। সেই কযেক মিনিট কালীবাবুর নিকট হাজাব জন্মেব মত সুদীর্ঘ ঠেকিল। জ্যোছনার টানে সমুদ্র উদ্বেল হয়, কালীবাবুর প্রাণ-তরঙ্গিনীতে যৌবন-জোযাব উত্তল হইয়া উঠিল। এখন এ প্রাণ তরঙ্গ সামলাইবে কে?

ব্যারাকের সামনেই একটু সমতল স্থান, মাপে ছোট একটা মাঠেব সমান, পাথর চাঁচিয়া

করা হইয়াছে। তারি পশ্চিম দক্ষিণ কোণায় একটা প্রকাণ্ড ববাব গাছ। গাছটার গোত্র প্রথমে ঠিক করিতে না পারিয়া বট বলিযা ভুল কবিযাছিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ছিল না, তাডনায় ভুল সংশোধন হইল। বটকে ববার গাছ বলিযাই চিনিলাম। জানিনা, গাছটা এতদিনেও সেই এক পায়ে খাড়া রহিতে পাবিযাছে কিনা। আসিবাব কালে তো ওব অক্ষয় পবমায়ু কামনা করিযা আসিযাছিলাম।

গাছটাব দিকে কালীববুব দৃষ্টি পডিল। দেখামাত্রই গাছ বন্ধুব মত প্রেবণা যোগাইল, উপরে উঠিলেই তো চাঁদকে অভ্যর্থনা কবা যায়।—গাছে আমবাও চডিযাছি, অস্বীকাব করিব না। কিন্তু মই ছাডা ও রবার গাছে চডিবার পথ কোথায়? পথ কবাই প্রতিভাবানেব কাজ। কালীবাবু সত্যই গাছে চডিযা বসিলেন। স্বভাব নাকি মবিলেও যায না, কত জন্মপূর্ব্বেব শক্তি এত মৃত্যুতেও দমে নাই, এ জন্মেও কালীবাবুব পিছু তাডা কবিযা সঙ্গ লইযাছে। ডাকুইন সাহেবেব কথায কত দেখিযা শুনিযা তবে না আজ এত দৃঢ আস্থা স্থাপন কবিযাছি।

একটা উঁচু ডালেব অগ্রভাগে ঠ্যাং ঝুলাইযা কালীবাবু যথাসম্ভব প্রেমাসন কবিযা বসিলেন। প্রেমেব জন্য অনেক প্রেমিকই অনেক কষ্ট স্বীকার কবিযাছে, ইতিহাসে, পুবাণে, কাব্যে তাব বহু উদাহরণ আছে। কিন্তু প্রেমেব জন্য বৃক্ষাবোহণ কোন ইতিহাসেই পডি নাই। তাও যদি বক্তমাংসেব মানুষেব জন্য হইত। চাঁদেব জন্য উঁচু গাছের আগডালে ঠ্যাং ঝুলাইযা বসিযা অপেক্ষা কবা—কালীবাবুব প্রতিভাবই উপযুক্ত কাজ।

উচ্চ হরিধ্বনি উঠিল—যাত্রা ভাঙ্গিল। মহুযা নির্ব্বিঘ্নে মনেব মানুষেব আশ্রয়ে পৌঁছিযা গিযাছে।

সতীশ বায একটু বযস্ক মানুষ, ভীডেব ভযে কিছু আগেই আসব ছাডিযা উঠিযাছিলেন। সিঁডি ভাঙ্গিযা তিনি উপবে ববার গাছেব তলায যখন আসিলেন, তখন চাঁদ পূব-পাহাডের মাথায মুখ বাহির কবিল। বৃক্ষে প্রেমিক কবিব আনন্দ বেদনাদাযক হইযা উঠিল, মুগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"বাঃ—"

শত হউক, কযেকজন্মেব আগেব অভ্যাস, সে জোবে এজন্মে এব চেযে বেশীক্ষণ গাছের ডালে থাকা সম্ভবপর হযনা। তদুপরি, উল্লাসে দাঁডাইতে গিযা শবীবে নৃত্য-বেগ সঞ্চারিত হইযাছিল। ডালশুদ্ধ ভাঙ্গিযা কালীবাবু নীচে পডিলেন।

রাযমহাশয পাথরেব মত যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁডাইযা পডিলেন। দেখিলেন, উপর হইতে গাছের ডালেব ঘোডায চডিযা কে সশব্দে নীচে নামিলেন। সেই কে দুইপা দুইহাত ভেকেব মত মাটীতে পাতিযা বসিযা তাঁর দিকে মিটি মিটি চাহিতেছে। রায় মহাশয চক্ষু বুজিলেন।

তিনি অজ্ঞান হইলেন না। দাঁডানো অবস্থাতেই মূর্চ্ছাব যাবতীয লক্ষণ বজায় রাখিলেন। একটা গোঁ-গোঁ শব্দ জপ কবিতেও ত্রুটি করিলেন না। নীচে সিঁডির গোড়ার দিকে লোকজন আসিয়া

গিয়াছিল। কয়েকজনে দৌড়াইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং রায়মহাশয়কে ধরিয়া ফেলিলেন। বিস্তর অভয় দেওয়ায় বুড়ামানুষ চোখ খুলিলেন।

জিজ্ঞাসা করা হইল—"কি হয়েছে? ওরকম করছিলেন কেন?"

—"ভূত।"

—"ভূত? বলেন কি?"

—"ঠিক বলি। নিজ চোখে দেখেছি। ঐ যে—"

একজনে সদ্যভাঙ্গা গাছের ডালটা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া দেখাইল—"এতো বরার গাছের একটা ডাল, ভূত কি বলছেন?"

—"ঐতে চড়েই নেমেছে। উপর থেকে ঐ চড়ে ধপাস্ করে সামনে পড়ল।"

—"শেষে?"

—"শেষে আমি ভয়ে চোখ বুজি। চোখ খুলে দেখি - শূন্যে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি চোখ বুজি।"

—"ঘোড়াটা ফেলে গেল যে?"

রায়মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, ছেলে ছোকরার ঠাট্টা শোনার অভ্যাসও আছে, চটেনও না। কিন্তু সব জিনিষ সব সময়ে ভালো লাগেনা।

চটিয়া কহিলেন—"আমি কাউকে তো বিশ্বাস করতে ডাকিনি। কাজে যাও—"

—"আচ্ছা, আপনিই বলুন, এ কেউ বিশ্বাস করবে?"

—"তবে বলতে চাও, নিজের চোখে দেখা জিনিষও বিশ্বাস করব না? তোমাকে দেখছি, ওকে দেখছি, ডাক্তারকে দেখছি, বলব যে, না—দেখছি না। নিজ চোখে দেখলাম, বলে কিনা, ভুল দেখেছেন।"

ওধারে গাছের আড়ালে সুদীর্ঘ খুঁটির উপর কাঠের মঞ্চ টিনের চাল মাথায়, সেখানে বন্দুক কাঁধে দুজন সিপাহী পাহারা দিতেছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কিছু দেখিয়াছে কিনা। না, তাহারা কিছু দেখে নাই। তা, দেখিবে কেন? যদি, নাই দেখিবে, তবে অত শূন্যে উঠিয়া পাহারা দিবার আবশ্যক কি, নামিয়া আসিলেই হয়। উপর হইতে দুর্গের মধ্যে ভূত নাবিল, আর উপরে থাকিয়াও কিছু করাতো দূরে থাক, চোখে পর্য্যন্ত সেটাকে দেখিল না। ফাঁকি দিয়া তলব নিতে ওস্তাদ যত সব। অবশেষে একজন স্বীকার পাইল যে, ডালভাঙ্গার মত একটা শব্দ কানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তারা খেয়াল করে নাই।

ডাক্তার গুরুগোবিন্দ সহজে ডাক্তার হন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন - "আপনি নিজ চোখে দেখেছেন।"

—"এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, নিজে চোখে দেখেছি।"

—"কি রকম দেখলেন?"

—"ডালটার উপর সে চেপে মাটীতে থাবা মেরে বসেছে। সাদাজামা কাপডপরা মানুষেব মত

—"হুঁ"—বলিয়া ডাক্তার ব্যাবাকেব দিকে হন হন্ কবিয়া চলিযা গেলেন।

রাযমহাশয়কে নিযা সবাই ব্যারাকের বারান্দায আসিলেন। লোহার খাটে বসাইয়া তাঁকে দিয়া একই কাহিনী বার দুযেক আবার আবৃত্তি করাইলেন। ভাঙ্গা ডালটা সাক্ষীব মত সামনে রাখা হইযাছে।

এমন সময ভিতরে ডাক্তাব গোবিন্দেব গলার চীৎকার শোনা গেল—"ধরেছি, ভূত ধরেছি।"

তাডাতাডিতে কালীবাবু পাযের জুতা খোলেন নাই, বাগ মুডিযা দিযা পডিযাছিলেন, কিন্তু জুতার খানিকটা বাহির হইযাছিল। লক্ষণ দেখিযা বোগ ধবা ডাক্তাবের অভ্যাস, জুতা দেখিযা ভূত ধরিলেন। বাগশুদ্ধ কালীবাবুকে চাপিযা ধবিযা চীৎকাব কবিতে লাগিলেন।

কযেকজনে আসামীর হাত ধবিযা বাবান্দায বাযমহাশযেব সম্মুখে আনিযা হাজিব কবিল। কালীবাবু লজ্জিত হইয়াইছিলেন, গাছে চডাব জন্য নয, আচমকা ভয পাইযা বুডামানুষেব না জানি কি হইযা থাকিবে এই ভাবনায।

ডাক্তাব গোবিন্দ কালীবাবুব হাত ধবিযাছিলেন, কহিলেন—"এই নিন আপনাদের ভূত। শুনেই মনে হযেছে, ব্যাপাব নিশ্চয কিছু আছে। গাছেব ডাল খামোকা ভাঙ্গে কেন? জামাকাপড-পবা লোকের মত কিছুই বা উনি দেখেন কেন? কিন্তু লোকটী কে, মনে মনে আন্দাজও একটা করেছিলাম।"

বাযমহাশয় সব শুনিযা চটিযা গেলেন।

কালীবাবু কহিলেন—"দাদা, আমি কি জানি যে আপনি আসছেন। আব তামাসা দেখুন, ভাঙ্গবি তো ভাঙ্গ একেবাবে মাহেন্দ্রক্ষণে,—ভয পেযেছেন খুব?"

—"থাক্ থাক্, খুব হযেছে। আপনার লাগেনি তো?"

কালীবাবুব সঙ্গে বাযমহাশয কযদিন কথা কহিলেন না। জীবনে যদিও একটা ভূত দেখিলেন, তাও লোকটা এমন অপদার্থ যে ধবা পডিয়া নষ্ট কবিযা দিল। যতসব ইযে ধরিযা আনিযাছে, কবি না ভূত।

বন্দী-মুক্তি

বাংলা সরকাব ঘোষণা করেছেন যে, বন্দী-মুক্তি কমিটিব সুপারিশ অনুসারে চল্লিশ জন রাজনৈতিক অপবাধে দণ্ডিত বন্দীকে কোনমতেই মুক্তি দেওযা হবে না। কযেকজন বন্দীকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি ও কযেকজনের দণ্ডকাল কিঞ্চিৎ মকুব করাব পরামর্শ বন্দীমুক্তি কমিটি দিযেছে। যাঁদের সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেবার কথা, তাঁবা গভর্ণমেণ্টেব কাছে undeitaking দিযে আত্মসম্মানেব বিনিমযে মুক্তি ক্রয় কবতে স্বীকৃত হন নি। ফলে ৮৭ জন বন্দী কাবাপ্রাচীবের অন্তবালে আজও অবরুদ্ধ বইলেন।

এতদিন ধ'বে বন্দীমুক্তি সমস্যা বাংলায একটা ভাবাক্রান্ত জটিল অবস্থার সৃষ্টি ক'বে তুলেছে। বন্দীদিগেব গত অনশনেব সময এই সমস্যাব একটা আশু সমাধানেব সম্ভাবনা মনে হযেছিল। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কোনো সমাধানই হ'ল না। সুভাষচন্দ্র বন্দীদেব প্রতিশ্রুতি দিযেছিলেন যে, সবকাব দুইমাসেব মধ্যে মুক্তি না দিলে তিনি দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে বন্দীদের মুক্ত কববেন। বন্দীবা তখনকাব মত অনশন ত্যাগ ক'রে জীবন বক্ষা কবেন।

অবশেষে সরকাবী ঘোষণায দেখি সমস্যার কোন সমাধান হ'ল না। যে সমস্ত বন্দীকে ইতিমধ্যে সবকাব মুক্তি দিযেছেন তাঁদেব মুক্তির ফলে কোথাও তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কার্য্য কবেছেন, অথবা কোথাও কোনো বিজ্জনক অবস্থাব সৃষ্টি কবেছেন এমন কথা শোনা যায না। এঁদেব মুক্তি যদি সঙ্গত ও তাতে নিরাপত্তা বক্ষা হযে থাকে তবে বাকী ৮৭ জন সম্পর্কেও তা হবে না কেন তা সাধাবণেব বুদ্ধিব অগম্য।

৮৭ জন বন্দীর অববোধ যে অসন্তোষ, যে ক্ষত জাগিযে বাখল তাতে বিক্ষুব্ধ বাংলার জটিল অবস্থা আবো বেশী সঙ্গীন হযে উঠবে না কি?

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতেব স্বাধীনতা দাবী করেছিল, এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাদেব ঘোষিত নীতি ভাবতবর্ষে প্রযোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার উত্তব জানতে চেয়েছিল। বডলাট লর্ড লিনলিথগো উত্তর দিযেছেন "এখনো সময নহে"। যুদ্ধ অবসান হলে সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে পরামর্শ কবা যেতে পাবে। এই প্রতিনিধিগণ আমন্ত্রিত বা নির্ব্বাচিত হবেন তাও স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি। বলা বাহুল্য, এই সনাতন নীতি, মামুলী-কথাব পুনরাবৃত্তি শোনবার বা তাতে আস্থা স্থাপন করবার যুগ কংগ্রেসের অতীত হয়ে গেছে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে ভারতবাসী আজ জানে যে, সকল দল, উপদল, সম্প্রদাযের প্রতিনিধিদের নিয়ে পুনরায় গোলটেবিল বৈঠকের মূল্য কি!

গান্ধীজী উত্তরে বলেছেন, "বড়লাটের কথাগুলির মধ্যে সমস্তই অতি সুন্দরভাবে অস্পষ্ট ক'রে রাখা হয়েছে। ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণের অভিপ্রায় বা আগ্রহ গ্রেটবৃটেনের যে আছে তার কোনই প্রমাণ বড়লাটের কথাগুলির মধ্যে নাই।"

বড়লাটের ঘোষণার কয়েকদিন পরে গত ২২শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বড়লাটের বিবৃতি ওয়ার্কিং কমিটির মতে অসন্তোষজনক এবং তা মামুলী নীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে ভারতীয়দের মধ্যে যে দলাদলির কথা উল্লিখিত হয়েছে তা গ্রেট বৃটেনের প্রকৃত অভিপ্রায় চাপা দেবার অজুহাত মাত্র। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের বিবৃতি সর্ব্বপ্রকারে নৈরাশ্যজনক ব'লে মনে করেন।

ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে সকল কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বড়লাটের বিবৃতির নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রাদেশিক আইনসভায় অনুমোদন করিয়ে পদত্যাগ করবার আদেশ ছিল। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে, সকল প্রদেশেই মন্ত্রিগণ বিনা বিতণ্ডায় পদত্যাগ করেছেন। এবং আসাম ভিন্ন অন্য প্রদেশের গভর্ণরগণ নিজেদের হাতে শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

এই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ দুই প্রকারে সম্ভব হ'তে পারত। প্রথমতঃ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা,—দ্বিতীয়তঃ শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি ক'রে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে গভর্ণরকে বাধ্য করা। কংগ্রেস প্রথম উপায়টাই অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয় পন্থাটা অবলম্বন করলে যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি হ'ত সে পথ কংগ্রেস হয়তো ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেছে। অথচ শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি ক'রে যদি গভর্ণরকে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে বাধ্য করা হ'ত তবে বিতৃষ্ণা এবং অসন্তোষের বহ্নি জনগণকে আপনা থেকে আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে পারতো—কিন্তু কংগ্রেস সে পথে পদার্পন করে নি।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ক'রে অদ্যাবধি কোনো কংগ্রেসী প্রদেশেই গভর্ণরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য ক'রে গভর্ণমেণ্টকে বিকল করবার প্রচেষ্টা দেখা যায় নি।—তারা কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করবার যে সুযোগটুকু পেয়েছিলেন তা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান ক'রে চলেছিলেন—অবশেষে সঙ্কটসৃষ্টি করবার সময় যখন ঘনিয়ে এলো তাঁরা সে পথ এড়িয়ে আপনিই পদত্যাগ ক'রে সরে গেলেন।

স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতা

পার্লামেণ্ট কমন্স সভায় ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মিঃ ওয়েজ উড বেন ভারত সম্পর্কে কয়েকটী প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ প্রদান করবার জন্য গ্রেট বৃটেন কতটা অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত তা' তাঁদের স্থির করতে হবে। আরও বলেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা কেবল ভারতের একচেটিয়া নয়, প্রত্যেক দেশেই অনুরূপ সমস্যা আছে—এই সমস্যার সমাধান কোনো দেশে হয়েছে, কোনো দেশে হয় নাই। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান ভারতই করবে।

মিঃ ওয়েজ উড বেনের এই সকল বাক্যে মূল্য দেওয়া স্যামুয়েল হোর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এত কালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁর বৃথা যায় নি। তাঁর কূটনীতির আবিলস্রোতে ওয়েজ উড বেনের যুক্তিগুলি তলিয়ে গেছে। স্যামুয়েল হোর বলেছেন, স্বাধীন জাতি সমূহকে নিয়ে গঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ভারতবর্ষ যাতে তার যথাযোগ্য স্থান লাভ করতে পারে তাই তাঁদের অভিপ্রায়। বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁরা নাকি তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছেন! এবং সেই জন্যই ১৯৩৫ সনে ভারতশাসন আইন প্রণয়ন ক'রে ভারতকে বহু ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে দায়িত্বশীল শাসনের প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমানে অসম্ভব। কারণ তা' করলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়ে উঠবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে গ্রেট বৃটেন সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত—কিন্তু নিজের দোষে ভারত তা গ্রহণ করতে পারছে না—এই দলাদলি, এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা, এগুলি দূর করতে না পারলে তো আর স্বাধীনতা দেওয়া চলে না। অকালে স্বাধীনতা পেলে নিজেরা মারামারি ক'রে মরবে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তো একটা দায়িত্ব আছে—বিশেষতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির স্বার্থরক্ষার্থ শুষ্ক কর্ত্তব্য তাঁদের ক'রে যেতেই হবে! কি করা যাবে, উপায়ান্তর নেই!

বড়লাটের ঘোষণার পর স্যার স্যামুয়েলের বক্তৃতা ভারতবাসীকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলবে সন্দেহ নেই।

পুনরায় ব্যর্থ দিল্লী বৈঠক

পুনরায় আলোচনা করবার জন্য বড়লাট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্না দিল্লীতে গিয়েছিলেন। সে আলোচনাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তার মূল কারণ শাসক ও শাসিতের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

বড়লাট নেতৃবর্গের নিকট যে প্রস্তাব করেছিলেন তা এই যে, যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে মিলিত ভাবে কাজ চালাবার সুবিধার জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিরা যাতে শাসন পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন সেই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা চলনসই বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক।

এই প্রস্তাবের উত্তরে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বড়লাটকে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসের অভিপ্রায় অনুসারে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষিত না হ'লে বড়লাটের বিবৃতি অনুসারে কাজ করা বা বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুসারে সহযোগিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। তিনি দুঃখের সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে, এর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রশ্ন আনা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করতে সকলেই চেষ্টা করছেন—কিন্তু ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করবার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোনো সম্পর্ক নাই—কংগ্রেস কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা দলের জন্য স্বাধীনতা চায় না। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই তার কাম্য।

আসল কথাটা বুঝতে কারও বেগ পেতে হয় না। গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবটা এড়িয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জটিলতার অবতারণা ক'রে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিতে ব্যগ্র। বড়লাটের উক্তিতে প্রকাশ, আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসন করতে পারলে তবে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করা। এই কথাটিকে বড়লাটের, তথা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মনের কথা ধরে' নিলে বিরোধ দাঁড়ায় উভয় পক্ষের মূল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

কংগ্রেস তার আদর্শ এবং আত্মসম্মান বিসর্জ্জন না দিয়ে বড়লাটের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও রাজনৈতিক দল সকল দেশেই বিদ্যমান,—তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা সকল দেশেই আছে—কংগ্রেসও তাই দাবী করে, এবং অন্তর্বিরোধ দূর করবার জন্য স্বাধীনতাই আগে প্রয়োজন।

এবারের দিল্লী বৈঠক যে ব্যর্থ হয়েছে তার জন্য সাম্প্রদায়িক সমস্যা দায়ী নয়—দায়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির বিরোধ। যতক্ষণ ভারত সম্পর্কে বৃটেনের নীতি না ঘোষিত হবে ততক্ষণ অন্য প্রস্তাব কংগ্রেস আলোচনা করবে না। পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, ভারতকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করবার আবশ্যকতা নাই একথা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভিন্ন আর কেউ বলবে না। স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য নাই, তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে টেনে এনে তাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় ক'রে দেখিয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নীতি এবং স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবকে চাপা দেবার চেষ্টা অসঙ্গত। এতে আসল সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

তুরস্ক, বৃটেন ও ফ্রান্সের ত্রিশক্তি চুক্তি—

তুরস্ক এবং সোভিয়েটের মধ্যে চুক্তির জন্য যে আলোচনা কিছু দিন ধরে চলছিল সেটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু তার অনতিকাল পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে স্থির হয় যে, তুরস্ক আক্রান্ত হলে বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে সাহায্য করবে। বৃটেন ও ফ্রান্স রুমানিয়া ও গ্রীসকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার ফলে যুদ্ধ বাধলে তুরস্ক সাহায্য করবে। এই সর্ত্ত ব্যতীত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জড়িয়ে পড়লে চুক্তিকারী শক্তিগণ সম্মিলিত আলোচনা করবে, এবং তুরস্ক অন্ততঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি উদার নিরপেক্ষতার মনোভাব গ্রহণ করবে ইত্যাদি। তবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে পারে এমন কোনো কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে তুরস্ক বাধ্য থাকবে না।

এই চুক্তির ফলে জার্ম্মানীর পূর্ব্ব-ইয়োরোপ এবং এশিয়াতে নাৎসীবাদ প্রচারের পরিকল্পনার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপ ও পূর্ব্ব-ইয়োরোপে জার্ম্মানীর দ্বার এভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ জার্ম্মানী রুষ্ট হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। আবার উত্তরে বল্টিকেও তার প্রতিপত্তি বিস্তারের যে কল্পনা ছিল তা সোভিয়েট রাশিয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে। যে আকাঙ্ক্ষা, যে

প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন জার্ম্মানী বল্টিকে দেখছিল হঠাৎ দেখা গেল সে শক্তি, সে ক্ষমতা সোভিয়েট রাশিয়ার মুঠার মধ্যে চলে গেছে। এরূপ চতুর্দ্দিক থেকে ঘা খেয়ে আহত জার্ম্মানী পশ্চিম মোহড়ায় সৈন্য সমাবেশ ক'রে ভালো করে যুদ্ধ চালাবার মতলব করছে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের শান্তি প্রস্তাব—

পশ্চিম মোহড়ায় ব্যাপক ভাবে আক্রমণ কবার আযোজনে জার্ম্মানী নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানগুলিতে শুধু যে মহলা দিচ্ছে তা নয়, সৈন্য সামন্ত কেন্দ্রীভূত করছে। বেলজিযাম ও হল্যাণ্ডের সীমান্তে যে ভাবে সৈন্য আমদানী ও যুদ্ধাযোজন চালিযেছে তাতে মনে হয এতদিনের তর্জ্জন গর্জ্জন ও জাহাজ ডুবি থামিযে এবার বুঝি এই দুই ক্ষুদ্র দেশকে কেন্দ্র ক'রে এদের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে ঘায়েল করবার প্রচেষ্টা চলেছে।

তাবপরেই সংবাদ এল বেলজিযামেব রাজা লিযোপোল্ড এবং হল্যাণ্ডেব রাণী উইলহেলমিনা যুদ্ধরত জাতিগুলির নিকট এক শান্তি প্রস্তাব ক'বে আবেদন জানিয়েছেন। বড বড প্রতিবেশী শক্তিগুলি যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু সেজন্য ক্ষুদ্র দেশগুলিব যে প্রাণ যায। এই শোচনীয় অবস্থায় পড়ে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের রাজা ও রাণী শান্তিব জন্য শেষ বক্ষায প্রবৃত্ত হযেছেন। তাঁরা আবেদন করলেন যে, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হ'যে তাঁরা ইযোবোপের শান্তি প্রতিষ্ঠাব প্রস্তাব কবছেন। যদি সকল শক্তিব সম্মতি পাওয়া যায তবে তাঁরা শান্তির সর্ত্ত নির্দ্ধাবণ করবেন।

কিন্তু এই প্রস্তাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মানী কাবো নিকট হ'তেই তেমন সাডা পাওয়া গেল না। ইংলণ্ড জানিয়েছে যে প্রযোজনেব অতিবিক্ত একদিনও তাঁরা যুদ্ধ করবেন না। ইযোরোপকে জার্ম্মান আক্রমণ থেকে বক্ষা করা এবং ইযোবোপে সম্মানজনক শান্তি স্থাপন করবার উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ড এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হযেছে। অর্থাৎ জার্ম্মানীকে ঠাণ্ডা না করা পর্য্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ স্থগিত রাখতে পাবেন না। ফ্রান্সও অনুরূপ উত্তর দিযেছে। জার্ম্মানীইবা ছেড়ে কথা কইবে কেন ? কিছু পূর্ব্বে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এক বক্তৃতায বলেছিলেন "আমবা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হযেছি যে, ইয়োরোপে এমন দুর্দ্দিন আর ঘটতে দেব না। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যখন সময় আসবে তখন নতুন জগৎ গডব, সেই জগতে জাতিগুলি আব পাগলের মতো কেবল অস্ত্রবল সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত হবে না।" অতএব এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওযা পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যুদ্ধ থামাতে পারে না।

এদিকে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সেব এই বক্তৃতা হিটলারের মাথা আগুণ করে দিল। তিনিও হুঙ্কার দিযে জানিয়ে দিলেন, শান্তি স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের এই মাথাব্যথা যে সত্যি তার প্রমাণ কোথায় ? "যদি বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিত তবে আমরা তার নিকট মাথানত করতাম।"

উভয় পক্ষ যখন একে অন্যকে এরূপ তীব্র শ্লেষের সঙ্গে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চালাচ্ছে

তখন অতিক্ষুদ্র রাজ্য বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের শান্তির আশা যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে তাতে দ্বিতীয়বার ভাববার কিছু নেই।

মিউনিক বিয়ারসেলারে বিস্ফোরণ

মিউনিকের পানশালা বিয়ারসেলারে হের হিটলার বক্তৃতা দিয়ে চলে যাবাব মিনিট দশেক পর সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। এই ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অনুসন্ধান দেবার জন্য পাঁচলক্ষ মার্ক ঘোষণা করা হয়েছে।

অনেকে বলেন হিটলারের প্রাণনাশের জন্য এই বিস্ফোবণ হয়েছে। বিদেশীগণের অর্থাৎ ফ্রান্স ইত্যাদি জার্ম্মানীর শত্রুপক্ষের কারসাজি বলেও অনেকের ধাবণা। আবার ফ্রান্স মনে কবে রাইখষ্ট্যাগে একবার যেমন অগ্নিকাণ্ড নাৎসীগণ নিজেরাই কবেছিল ঠিক সেইরূপ এই বিস্ফোরণও কোনো মতলবে জার্ম্মানী নিজেই কবেছে। আবার যে ভাবে ধরপাকড চলছে তাতে বোধ হয় যে জার্ম্মানীতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা গোপন ষডযন্ত্র চলছিল—তারই এটা একটা প্রকাশ।

এতগুলি মতামত, এত জল্পনা কল্পনা, এর মধ্যে কোনটি যে সত্য তা বোধগম্য হওয়া সহজ নয়।

নোবেল প্রাইজ

এই বৎসরে যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডেব মঃ ফ্রান্সই সিলান্‌পা অন্যতম। ইনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ফিনল্যাণ্ডেব কৃষকদেব জীবন সম্বন্ধে যে অনবদ্য এবং চিত্তাকর্ষক চিত্র তিনি এঁকেছেন তা সর্ব্বত্রই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর পুস্তকাবলীর মধ্যে "মিক হেরিটেজ" এবং "ফল্‌স্ এস্লিপ হোয়াইল ইয়ং" এই দুইখানি বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বইগুলির মধ্যে তাঁর মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা অপূর্ব্বভাবে ফুটে উঠেছে। ফিনল্যাণ্ডেব কৃষকদের জীবন অতি নিপুণভাবে তিনি দেখিয়েছেন। রুশ বিপ্লবের সময়কার চতুর্দ্দিকেব অবস্থা তিনি এমন সুন্দর ভাবে লিখেছেন যে ঐ সময়কাব সামাজিক ইতিহাসেব মধ্যে তাঁর স্থান অতি উচ্চে।

মঃ সিলান্‌পা ১৮৮৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ফিনল্যাণ্ডের কৃষকদের জীবনযাত্রা বিষয়ে বহু ছোট ছোট গল্প লিখে যশস্বী হ'ন। তাঁব দরদী হাতেব সুনিপুণ লেখনী বিশ্বের বিপুল যশ ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে এনে দিয়েছে নোবেল পুরস্কাব।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুটেনানডেট এবং জুরিকের অধ্যাপক রুজিকা ১৯৩৯ সালের রসায়নশাস্ত্রের নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ণেষ্ট অরল্যাণ্ড লরেন্স ১৯৩৯ সালের পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। পরমাণুকেও ভাঙ্গবার যন্ত্র "সাইক্লোটোন" আবিষ্কার ক'রে

তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে এই পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর এই আবিষ্কারের মূলে একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। লরেন্স খুব দরিদ্র ছাত্র ছিলেন—কষ্ট ক'রে বিদ্যার্জ্জন করেছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি এলুমিনিয়মের ব্যবসা করতেন এবং হোটেলে বাস করতেন। একদিন একজন জার্ম্মান রাসায়নিকের একটা প্রবন্ধে চুম্বকে ইলেকট্রিকের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি পাঠ করলেন। এর থেকেই "সাইক্লোটোন" যন্ত্রের পরিকল্পনা তাঁর মনে উদয় হয়। বহু গবেষণা, বহু পরীক্ষার পর অবশেষে এই যন্ত্রটী তিনি আবিষ্কার ক'রে জগতকে বিস্মিত করেন। নিখিলবিশ্ববৈজ্ঞানিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর যন্ত্রের কার্য্যকারিতা দেখিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। আমেরিকায় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে তাঁর আবিষ্কারের জন্য পাঁচ শত পাউণ্ডের একটী পুরস্কার দেওয়া হয়। আর্নেষ্ট লরেন্স এই পুরস্কারটাও লাভ করেছেন।

আমরা এই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত অধ্যাপকগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

৩২নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

'তারকা'র ইঙ্গিত

ছায়া-ছবির জগতে **শ্রীমতী কানন দেবীর** মত সর্বজনপ্রিয় 'তারকা' কমই আছেন। শ্রীমতী কানন দেবী বলেন: "কোনো ছবিতে কাজ করতে করতে যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই এক পেয়ালা চা খেয়ে নি।" হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী জোন্ ক্রফোর্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে কানন দেবীর মিল আছে। ক্রফোর্ড্ও এক পেয়ালা চা খেতে খেতে রিহার্স্যাল দেন। কানন দেবী বা জোন্ ক্রফোর্ড্ আপনি যাঁরই ভক্ত হন্ না কেন, জানবেন যে সে-'তারকা'র দীপ্তি জোগাচ্ছে চা-ই।

'তারকা'রা চায় ভারতীয় চা

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 13c

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
,, সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
,, ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্ত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

= সূচী =

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি-স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের গহনা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গহনা প্রস্তুত করিয়া ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।

মজুরী আরও কমান হইয়াছে

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইন সমন্বিত বি ৩নং ক্যাটালগ পাঠান হয়।

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড

রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে

প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা বাৎসরিক বোনাস্	আজীবন বীমায়	১৬৲
	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৬ | ৯ম সংখ্যা

আমরা

শ্রীঅনিমেশ সেনগুপ্ত

আমরা উড়িয়া যাব শব্দহীন স্তব্ধ অন্ধকারে
ভাষাহীন শর্ব্বরীর স্বপ্নাতুর হিয়া তলে
মুখর করিয়া দিতে তারে।
উষার তমসা তীরে সিন্দুর-রঙিন ধরা
সূর্য্যের সোনালী আলো পথে
মাধবী মিলন তিথি অমিয় লাবণি ঝরা
আমরা চলিনা পথ পূর্ণিমার রথে।
বিরহ বিধুরা যেথা দিয়েছে গুণ্ঠন টানি
ঘন কৃষ্ণ গুমোট আঁধারে
অশ্রান্ত পাখার ঘায়ে আঁধার কাটিয়া চলি
বেদনার সেই পারাবারে।

যে পথে সবাই চলে সে বহু-নন্দিত পথে
আমাদের নহে অভিসার,
উতলা আকুল বায়ে বকুল বিছান প্রাতে
আমরা গাঁথিনা ফুল হার।

ঊষর বালুর বুকে মরুচারী মুশাফির
আমরা খুঁজিয়া ফিরি তারে
কোরকের কচিবুকে কুসুমের স্বপ্ন যেথা
সমাধি রচেছে বারে বারে।

দেখেছি অনেক নেতা শিখেছি অনেক নীতি
শুনিযাছি বহু বড কথা
তোষামুদে স্তাবকের রসহীন রসনায়
ধ্বনিযাছে বহু জয়গাঁথা,
মানুষ পাযনি তৃপ্তি মেটেনিক ক্ষুধা তার
অতীন্দ্রিয় সে বাণী ঝঙ্কারে,
এ বিশ্বের গতি ধারা আমরা ভাসাযে দেব
বিধর্ম্মীয় স্রোতের জোয়ারে।

সম্মুখে বন্ধুর পথ উপলে উপলে বাধা
সীমাহীন তপ্ত তেপান্তর
ফেনময় তুঙ্গ বক্ষে তুলিয়াছে লক্ষ ফণা
খর স্রোতা নীল অজগব
কালবৈশাখীর রাতি নিবেছে চাঁদের বাতি
দোলা জাগে অশ্রুপাবাবাবে
উতলা সে সিন্ধুবুকে সাঁতার কাটিযা যাব
জানি আমাদেব লাগি খেযাতরী ভিডিবেনা পারে

যাদের হাতে স্ত্রী শিক্ষার ভার

হাজরা বেগম

বছর খানেক আগে "লীডার" পত্রিকায় একটা ছোট খবর বার হয়েছিল যে, বেনারসের মিউনিসিপ্যাল মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা দুমাস মাইনে পান নি, কারণ মিউনিসিপ্যাল বাজেটে ওঁদের মাইনে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়নি ভুল বশতঃ। এই রকম একটি খবর জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার করে নি এবং পরে ঐ বেচারী শিক্ষয়িত্রীরা সে মাইনে পেয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধেও কোন খবর পাওয়া যায় নি।

আজকে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে বড় বড় কথার মাঝখানে খুঁজে দেখি মেয়েদের রোজগার করবার দুটি মাত্র রাস্তাই রয়েছে, প্রথম চিকিৎসা-বিভাগ আর দ্বিতীয় শিক্ষা-বিভাগ। এই শিক্ষয়িত্রী-দের কথাই আজ আমি বলছি আর এদের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টার জন্য যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী তিন রকমের। প্রথম সরকারী চাকুরে, দ্বিতীয় প্রাইভেট স্কুল বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের চাকুরে, আর তৃতীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের চাকুরে। এর মধ্যে সরকারী স্কুলের চাকরী সাধারণ শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীর মেয়েদের পাওয়া এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। সরকারী স্কুলগুলির চাকরীতে চাকরীর স্থায়িত্ব বা ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে কিন্তু মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক স্কুলগুলির বা প্রাইভেট স্কুলগুলির শিক্ষয়িত্রীদের অবস্থা সাধারণ দিন-মজুরদের অবস্থার মতই শোচনীয়। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের যে উপায় তা নিতান্তই জঘন্য। বিজ্ঞাপনে মাহিনার হারের কোন উল্লেখ থাকে না—এবং সর্ব্বনিম্ন মাহিনা নিতে ইচ্ছুক এইরকম আবেদনকারিণীর আবেদনই গ্রাহ্য হয়। শিক্ষাবিষয়ক আইনগুলি শুধু সরকারী স্বীকৃত স্কুলগুলিতেই প্রযোজ্য। কিন্তু সরকারী স্বীকৃত নয় এই রকম স্কুলের সংখ্যাই অধিক, যেখানে চাকরীর স্থায়িত্ব, প্রভিডেন্টফাণ্ড, একমাসের নোটিস এইরকম সুবিধাগুলি শুধু স্থায়ী কর্ম্মচারিণীদের জন্যই। আইনতঃ একবছর চাকরীর পরই স্থায়ী হিসাবে গণ্য ক'রে নেওয়া নিয়ম, কিন্তু নানা উপায়ে এ আইনকে ফাঁকি দেওয়া হয় এবং অন্ততঃ তিন বছর পরে স্থায়ী কর্ম্মচারিণী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলিতে মাহিনার প্রাথমিক হার হচ্ছে ১৬ টাকা। গরীব মিউনিসিপ্যালিটিতে আরো কম—আর প্রাইভেট স্কুলগুলিতে হার হচ্ছে প্রায় দশটাকা যা আমাদের দেশের সাধারণ মজুরের মজুরির কাছাকাছি। মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির প্রাথমিক মাহিনার হারের কোন বৃদ্ধি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় হারে আঠার টাকা থেকে চব্বিশ টাকা পর্য্যন্ত আছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে যদি বেতন বৃদ্ধির কোন নিয়ম থাকেত তা সাধারণতঃ নির্ভর করে কমিটী মেম্বারদের দয়া আর শিক্ষয়িত্রীর তদ্বিরের ওপর। কোন কোন

স্কুলে দশবছরের চাকরীর পর ছমাসের মাহিনা বোনাস হিসাবে দেওয়া হয় কিন্তু চব্বিশ বছর চাকরীর পরও কোন রকম পেনসনের বন্দোবস্ত থাকে না।

আমাদের সামাজিক পরিবেষ্টন এমন যে, কোন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পাওয়া কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ এই সব চাকরী বিধবা ও বিবাহিতা মেয়েরাই পেয়ে থাকেন। এঁরা সাধারণতঃ স্কুলের ওপর নির্ভর করেই সন্তান সন্ততিদের ভরণ পোষণের সংস্থান করেন। তারপর স্কুল থেকে এঁদের বাসার দূরত্ব থাকায় যাতাযাত খরচে ঐ স্বল্প মাহিনা থেকে একটা মোটা অঙ্ক বার হয়ে যায়—এ ছাড়াও বর্ষা বাদলের হাঙ্গামা তো আছেই।

স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পরিশ্রম যথেষ্ট। একে স্কুলগুলো ছোট হওয়ায় ক্লাশরুমগুলো নিতান্ত অপরিসর, তার একাই হয়ত একজন শিক্ষয়িত্রীকে জন পঞ্চাশ ছোট বড় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হয়। আমি নিজেই একটা মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কথা জানি যেখানে ২জন শিক্ষয়িত্রীকে প্রায় দেড়শ জন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে হয়, অথচ আইনে পঁয়ত্রিশ জনের বেশী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাশ করার নিয়ম নেই। ছোট ঘর, না আছে আলোবাতাসের লেশ, এইরকম একটি ঘরে গরমের সময় শিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছেন গুটি পঞ্চাশেক মেয়েকে, স্কুল নির্দ্দিষ্ট বইগুলি ত আছেই, এ ছাড়াও ব্যায়াম, খেলাধুলা, ড্রিল—মেয়েদের শারিরীক ও মানসিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে তাঁকে। আমার বিশ্বাস ঐটুকু ঘরে যদি পঞ্চাশটা মুরগীর ছানাকে ছেড়ে দেওয়া যায় ত নড়াচড়ার অভাবেই সেগুলো মারা পড়বে। এই রকম পরিবেষ্টনের মধ্যে আপনারা কি করে আশা করতে পারেন হাসিমুখ শিক্ষয়িত্রীকে, যিনি আপনাদের ভবিষ্যৎ নারী জাতির শিক্ষার ভার নিয়েছেন?

বাইরের কোন লাইব্রেরী থেকে বই বা সাময়িক পত্রিকা পড়বার স্বাধীনতা তাঁর নেই—স্কুল ক্যারিকুলামে কি অদলবদল হোল সে বিষয়েও তিনি অজ্ঞ। দরকারী ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট এসবের অভাব ত তাঁকে সব সময়েই ভোগ করতে হয়। ডেস্ক, চেয়ার-এর বালাই নেই স্কুলে—এমন কি তাঁর নিজের বসবার চেয়ারও থাকেনা—কোন কোন স্কুলে পড়াবার সুবিধা অনুযায়ী বই পত্রও দেওয়া হয়না। শিক্ষয়িত্রীকে নিজের চেষ্টায় যোগাড় করে নিতে হয়। তারপর স্কুল ইনেসপেক্টার বা কমিটি মেম্বারদের আসা যাওয়া ত আছেই। মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মতই তাঁরা স্কুলে উদয় হন—শিক্ষয়িত্রী যিনি অত্যধিক কাজের চাপে ব্যস্ত থাকার দরুন বা এই কারণে শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়ত স্কুল রেজিষ্টারে কিছু লিখতে বাদ দিয়েছেন বা ভুল হয়ে গিয়েছে—তাঁর এই ভুলের জন্য সকলের সামনে একপ্রস্থ ধমকানী ত তখনই—সময় সময় তাঁর ঐ সামান্য মাহিনা থেকে এক আধ টাকা ফাইনও দিতে হয়।

কোন কোন স্কুলে রবিবারও শিক্ষয়িত্রীদের খাটিয়ে নেওয়া হয়। এবং এই একদিনের বিশ্রামটুকু বিক্রী করেও বেচারীরা কোন রকম মূল্য পান না। শিক্ষয়িত্রীর পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের খাটুনি ত আছেই, তদুপরি বাড়ীর রান্না, বাসন মাজা, সেলাই—পরদিনের জন্যও কিছু পড়াশুনা করাও আছে। যে শিক্ষয়িত্রীর আবার নিজের ছেলেমেয়ে আছে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয়।

মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলোতে বছরে শিক্ষয়িত্রীকে ছয় সপ্তাহ ছুটি দেবার বন্দোবস্ত আছে কিন্তু অন্যান্য স্কুলে এরকম থাকাটাই একটা ব্যতিক্রম। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রীকে বদলে কাজ করবার জন্য অন্য কাউকে স্কুলে পাঠাতে হয়; ন্যায্য ভাবে দশবারো টাকা মাহিনার দরুন প্রাপ্য টাকাটি দিতে হয় অপরকে চাকরী বজায় রাখবার জন্য। প্রসবান্তে শরীর সুস্থ হ'যে ওঠবার আগেই তাঁকে স্কুলে দৌড়াতে হয় পেটের জন্য—সঙ্গের বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে।

স্কুলে ছোট শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ায় আবার আইনতঃ বাধা আছে। কাজেই তাঁকে ২।৩ টাকার মাহিনায় কোন চাকর রাখতে হয় শিশুটির দেখা শুনা করবার জন্য। নয়ত আরো সস্তায় শিশুটিকে দুধের সঙ্গে কিছু আফিম মিশিয়ে খাইয়ে বাড়িতে শুইয়ে রেখে যেতে হয় স্কুলে—অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা শিশুটি নিঃঝুম হয়ে পড়ে থাকে। একটি স্কুলে হঠাৎ একদিন স্কুল কমিটির একজন মেম্বার এসে পড়ায় একজন শিক্ষয়িত্রীর কোল থেকে তার শিশুটিকে ছিনিয়ে সরিয়ে রাখা হোল—আর সে শিশুর কি আকাশভেদী চীৎকার—আর কান্না। আমার সময় সময় এখনও সে দৃশ্য মনে পড়ে।

মোটামুটি এই হোল একজন শিক্ষয়িত্রীর জীবন—যাদের ওপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নারীদের শিক্ষা আর চরিত্রগঠনের ভার আমরা অর্পণ করেছি। আজ যখন প্রত্যেক প্রদেশেই নিরক্ষরতা দূর করবার আন্দোলন চলছে তখন এই আন্দোলনের কর্ম্মীদের উচিত হ'চ্ছে প্রথমে এই শিক্ষয়িত্রীরা যাতে ভাল ভাবে জীবন যাপন করবার, পড়াশুনা করবার সুযোগ পায় তা দেখা। এদের বাদ দিলে নিরক্ষরতা দূর করবার আন্দোলন বৃথাই হ'বে।

শিক্ষয়িত্রীদের দুর্দ্দশার প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতার জন্য শিক্ষয়িত্রীরা নিজেরাই কতকটা দায়ী। সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করলে, সংবাদ পত্র মারফৎ জনমত গঠন করলে, আর আইন সভা মারফৎ আইন পাশ করাবার চেষ্টা ক'রে এঁরা সরকার ও জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে পারেন। আজ সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের দিনে আমি এঁদের সংঘবদ্ধ হ'তে অনুরোধ করছি। সমাজে এঁদের দান সামান্য নয়, এঁদের দুঃখও তাই অসামান্য। আমার বিশ্বাস জনসাধারণ এঁদের দাবীর পিছনে দাঁড়াবেন *

* National Front হইতে
অনুবাদক শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়।
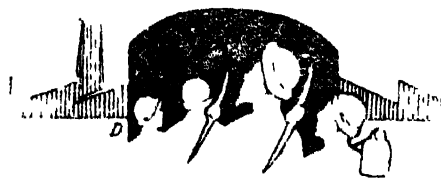
মানব ও ঈশ্বর

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

৩১শে আষাঢ়—

কাল যে human relation এর কথা বলেছি, সেটাই হ'ল মানব সমাজ ও মানব সৃষ্টির বিশেষ গুণ—special connotation, আর তারই ফলে এই পৃথিবী ও বিশ্ব প্রকৃতি রমনীয় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিই বল, ঈশ্বরই বল—যে-ই এই দুনিয়া সৃষ্টি করে থা'ক, মানুষ তার উপর অনেক কারসাজী করে, এটাকে কার্য্যযোগ্য ক'রে নিয়েছে। ছোটকালে বিশ্বামিত্রের গল্প শুনতাম—ঈশ্বরের উপর রাগ করে তিনি নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট prototype বা নমুনা থেকে প্রায় সব দ্রব্যেই তাঁর সৃষ্ট অনুকরণ অপেক্ষাকৃত ভাল। জানিনা এ গল্পের মূল কোথায়। কিন্তু যিনি এই গল্প সৃষ্টি করেছেন তাঁর ভূয়োদর্শন ও জীবনদর্শনকে শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই। জীব বাসের অনুপযুক্ত, কদর্য্য ও নির্ম্মম বাহ্য আবেষ্টনকে মানুষ চেষ্টা ক'রে বাসযোগ্য, সুন্দর ও কোমল ক'রে নিয়েছে।

হয়ত কেহ প্রশ্ন তুলবেন—স্বাভাবিকতা বা naturalness এর মধ্যে সৌন্দর্য্য ও কোমলতা নেই—আছে কি কৃত্রিমতার (artificality) মধ্যে? এর জবাব দেওয়ার পূর্ব্বে একটা কথা ব'লে নেওয়া দরকার। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে কোন জিনিষ সম্বন্ধে কোন বিশেষণ বা ব্যাখ্যা একান্ত ক'রে (in an absolute sense) বলা চলেনা। যাকে আমরা অন্ধকার বলি তার মধ্যে একেবারেই আলো নেই—তা ঠিক নয়। যাকে আমরা কদর্য্য বলি—তাতে সৌন্দর্য্যের কোন লেশই নেই—তা সত্য নয়। যে গুণটার প্রাচুর্য্য, তার বিশেষণেই আমরা দ্রব্যকে অভিহিত করি। সৃষ্টির আদিম অবস্থাকে আমরা কদর্য্য বলি—নির্ম্মম বলি—তার অর্থ এই নয় যে রমনীয়তা বা কোমলতার কোন ছোঁয়াচই সেখানে ছিলনা।

এ কৈফিয়ৎটুকু দেবার পর ঐ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আজ কবি ও শিল্পীরা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হচ্ছেন—সেটা সত্যিকার প্রকৃতি নয়—সেটাও মানুষের সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিম অবস্থায় প্রকৃতির যে হিংস্র, উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম মূর্ত্তি ছিল, মানুষ তাকে কমনীয় করেছে, সজ্জিত করেছে, শান্ত করেছে এবং তারই ফলে সেই প্রকৃতি thus refind—মানুষের ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করেছে। আজ যদি সমস্ত দুনিয়াময় কেবল বিশৃঙ্খল শেফালীফুলের ঝাড়ই থাকত তবে "শেফালীফুলের মনের কামনা" কবির বুকে শিহরণ না জাগিয়ে বিতৃষ্ণাই জাগাত। আজ যদি চারিদিকে কেবল বিরাট শালবনবীথি থাকত আর তার মাঝে কোন বৃক্ষ শাখায় কবি বসে থাকতেন, তবে "শালের বনে থেকে থেকে" যে 'ঝড়দোলা' দিত, তাতে কবির মনে কাব্যরসের বদলে ত্রাসেরই সঞ্চার হ'ত। উদ্দাম, বিশৃঙ্খল প্রকৃতিকে মানুষ কেটে, ছেঁটে গুছিয়ে সাজিয়ে কাব্য সরস্বতীর কুঞ্জবনে পরিণত করেছে।

বিরাট অরণ্যানীকে গুছিয়ে সাজিয়ে মানুষ কোথাও আবাস, কোথাও উপবন, কোথাও কুঞ্জবন, কোথাও বাগান, কোথাও বাগিচা প্রভৃতি করেছে। আর মানুষের হাতের তৈরী কৃত্রিমতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বলে বিরাট বটবৃক্ষের শ্যামল শোভা মানবমনকে তৃপ্তি দিতে পারে, বাসভূমি, বাগান ও বাগিচা তৈরী হয়েছে বলেই বনের শোভা আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

বাহ্য প্রকৃতির বেলায় যেমন, মানুষের নিজের বেলায়ও তেমনি। নরদেহের প্রতি রক্তকণায়, প্রতি লোমকূপে যে সব কদর্য্য বাসনা লুকিয়ে আছে—তারা যে মানুষের মনুষ্যত্বকে গ্রাস ক'রে তার প্রভু হ'তে পারে নি, সেটা প্রকৃতি বা ঈশ্বরের দয়া নয়—সেটাও মানুষেরই চেষ্টার ফল। যেখানে তার কাম ছিল, সেখানে সে প্রেমকে বসিয়েছে, যেখানে তার ক্রোধ ছিল, সেখানে সে ক্ষমাকে প্রতিষ্ঠা করেছে; যেখানে তার লোভ ছিল, সেখানে সে ত্যাগকে স্থাপন করেছে, যেখানে তার ভয় ও মোহ ছিল, সেখানে সে স্নেহ ও ভক্তিকে স্থাপন করেছে; যেখানে মদ ছিল প্রবল সেখানে সে সেবা ও বিনয়কে প্রবল করেছে, যেখানে মাৎসর্য্য ছিল সেখানে আজ এসেছে দয়া ও সহানুভূতি।

এমনি করে সে নিজের ভিতরকে সুন্দর ও রমনীয় করে নিয়েছে। প্রকৃতির প্রবল ধ্বংস লীলা দেখে সে প্রথমে ভীত হ'ত, তার সেই ভয়ের স্ফুরণ হ'ল তার ধর্ম্মাচরণে। গাছ পাথর, পশু পক্ষী, ভূত প্রেত, দেব দেবী, তারপর একেশ্বর—এ সবটার পূজায় ও প্রীতির প্রচেষ্টায় মানুষের সেই অন্ধযুগের নিঃসহায় ভয়েরই স্ফুরণ দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ হ'তে লাগল—তার বিজ্ঞান ও দর্শন গড়ে উঠতে লাগল। তাই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবুদ্ধির বিরোধ সনাতন। বিজ্ঞানবুদ্ধি বল্‌ছে সব জিনিষই মানুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে—সবটাকে humanise করতে। আর ধর্ম্ম বল্‌ছে মানুষের দৃষ্টিকে খর্ব্ব করতে—কেবল মেনে নিতে—সবটাকে মানব পর্য্যায়ের বাইরে এনে de-humanise ক'রে divinity ও devil এর—দেবতা বা দানবের পর্য্যায় নিতে। যা তুমি পেয়েছ—তাকে চরম সত্য বলে মেনে নিবে—বিচার করবেনা—এই হল ধর্ম্মের প্রথম দাবী, অর্থাৎ মানব দৃষ্টি (human standard) বা মানব-সম্পর্ক (human relation) বা মানব-বুদ্ধিকে (human sense) বিসর্জ্জন দিয়ে চল্‌তে হবে। এখানেই হ'ল নানা মানব প্রতিষ্ঠানের কদর্য্যতার ও নির্ম্মমতার গোড়ার কথা। ধর্ম্ম আচরণের ভিতর দিয়ে মানুষ যে তার মানুষ-বুদ্ধিকে বাদ দিতে শেখে তার ফলে সে আত্ম-সম্মোহনের বশে আসে। এই আত্ম-সম্মোহনের বা self-hypnotismএর বশে সে তার নিজের কাজকর্ম্মকে human relationএর মাপ কাঠিতে মাপে না—সবটাকেই সে দেখে ধর্ম্ম-প্রণোদিত মেনে নেওযার বুদ্ধি দিয়ে। শত অপকর্ম্মের সহজ স্খালনোপায় তার জানা আছে—অবসরমত তোমাদের উৎকোচ দিয়ে সে তার জীবনের ভাগ্যবিধাতাকে তুষ্ট করতে পারবে। এর ফলাফলে যা সে পাবে তাও পাবে পরকালে; কাজেই এখানকার পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর সঙ্গে তার যে কোন সম্পর্ক আছে, সেটা সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।

যদি মানব সমাজে human conduct কে—মানুষের কাজকর্ম্মকে বিচার করার এক মাত্র মানদণ্ড human relation হ'ত, তবে মানুষ এমন নির্ম্মম সমাজ-বিধি ও রাষ্ট্র-বিধি গড়তে

পারত না। বিধবা বালিকা কন্যার দুঃখে পিতামাতার বুক ফেটে যায়—কিন্তু human relation —মানুষের সহজ সম্পর্ক ত' সেখানে আস্‌ছেনা—আস্‌ছে পরকালের চিন্তা, আস্‌ছে ধর্ম্মবুদ্ধি। ধর্ম্মযুদ্ধ বল, inquisition বল, fanaticism বল, অন্ধ গোঁড়মি বল—সবার পিছনেই মানব-সম্পর্কের অভাব। আজ মহাত্মাজী যে হরিজন আন্দোলন করছেন তার পুরা ফল তিনি পাচ্ছেন না—কারণ he is moving in a vicious circle। ধর্ম্মের বিধানকে তিনি বাক চাতুর্য্যে ব্যাখ্যা করে এড়িয়ে চলতে চান কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করার ইচ্ছা বা সাহস তাঁর নেই। কাজেই সনাতনীর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি কোন যুক্তি না দেখিয়ে—তিনি দেখাচ্ছেন ধর্ম্ম-সূত্রের ওরকম ব্যাখ্যা নয়। সূত্রকে যতদিন মানছি, ততদিন ওরকম ব্যাখ্যা নয়—এরকম ব্যাখ্যা, এ বাক-চাতুর্য্য দিয়ে প্রকৃত সমাস্যাকে এড়িয়ে চলতেই হবে, ততদিনই তার ব্যাখ্যা জনে জনে নানারকম করবে—কাজেই যুক্তি সেখানে হার মানে।

কিন্তু তিনি যদি ধর্ম্মসূত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে human relation বা মানব-সম্পর্কের উপর দাঁড়াতেন তবে, যুক্তি ও ভাবাবেগ (sentiment) সবই তাঁর দিকে থাকত—আন্দোলনের পিছনে জোর দাঁড়াত। কিন্তু আজ তাঁর আন্দোলন পঙ্গু—চলবার শক্তি নেই, সনাতনীদের হৃদয় নাড়াবেন কি দিয়ে?

মানবার বৃত্তি এমনি মানুষকে পেয়ে বসেছে যে মেনে চলাই আজ মানুষের ধর্ম্ম ও গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছে। "Render unto Cæsar" কথার প্রতিধ্বনি নানা দিক থেকে আস্‌ছে। এই যে obedience বশ্যতা-ধর্ম্ম—এর মধ্যে কোন বিচার নেই—it is not a question of merit—it is a question of virtue ভালবলে মানছি—একথা বলা চলেনা, মানতে হবে বলেই মানছি এবং মেনে চলাই ধর্ম্ম। সমস্ত ধর্ম্মের সার কথা হ'ল, মেনে চলা—তাই এটাকে essence of all religions বলা চলে। এবং এটা হ'ল সমস্ত মানব-সম্পর্ককে অস্বীকার করা—negation of all human relation। এ বৃত্তির বশে মানুষকে আমরা মানুষ বলে দেখিনা—নিজেকেও মানুষ বলে দেখিনা। আমরা সবাই একটা শৃঙ্খলের অংশ—links in a chain। স্বাধীন সত্তা কারুরই নেই।

কারাগৃহের যে মূর্ত্তি আমরা দেখ্‌ছি তার মূলেও হচ্ছে ঐ negation of human relation—মানব সম্পর্ককে অস্বীকার করা। Conventional moral sense প্রচলিত নীতি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে গিয়ে মানুষ মানুষকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। এই নিঃসহায় মানুষগুলির দুঃখ কষ্ট বা লাঞ্ছনার প্রতি সহানুভূতি দেখানও এখানকার বিধানে অন্যায়, মানব বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে এখানকার বিধি বিধানের কোন ব্যতিক্রম, এরা সহ্য করবে না। যে প্রদেশের লোকদের মনে docility বেশী ও virility কম, সে প্রদেশেই এই মানব সম্পর্ককে তত বেশী ক'রে অস্বীকার করা হয় —এবং সেখানকার মানব চরিত্রের এ দিকটা সব প্রতিষ্ঠানেই ফুটে উঠে।

আজ প্রস্তর বেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত বদ্ধ কক্ষে ব'সে want of human relation এর কথাই

সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। এ সব impersonal প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে কয়েদী পর্য্যন্ত সবাই যেন ভুলে থাকে যে তারা মানুষ—তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মানব-সম্পর্ক আছে। একটা hieraichy of obedients চলে এসেছে—যন্ত্রের অংশের মতন সবাই চলছে—moving human figures but not haman beings—চলমান মানব মূর্ত্তি কিন্তু কেউ মানুষ নয়। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতির দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রত্যেক দেশে ও কালেই এই সব বিধিবিধানদ্বারা চালিত প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিধানের প্রতি আনুগত্যই প্রবল হয়ে উঠে—মানব বুদ্ধি চাপা প'ড়ে যায়।

আজ তাই ভাবছি কি ক'রে মানব জীবনে ও সমাজে human relation কে বড় করে তোলা যায়। মানব দৃষ্টির মধ্যে এ পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারলে—জগতের অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়। একটা বিরাট প্লাবন—Cataclysmic upheaval—না হ'লে, তা সম্ভব নয়, মানব জীবনটা revaluate করা দরকার। মানুষের দাম যে কেবল মনুষ্যত্বই—এ বোধ জাগানো দরকার। অন্য সব কথা—পরকাল, মুক্তি, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতি বা ধর্ম্মবিধান, আপ্তবচন, revealed scriptures সবই বৃথা যদি মানব-বুদ্ধি ও মানব-সম্পর্কের মাপকাঠিতে তার মূল্য না পাই।

তাই আজ খুব ভাল ক'রেই এ গৌরবটা বোধ করছি যে বাঙ্গালার কবি চণ্ডিদাস বিশ্ব-দর্শনের শেষ কথা ব'লে গিয়েছেন—

"শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

সমাপ্ত

পথ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পথিক পথ চ'লেছে, অতীতের স্মৃতি বিজড়িত পল্লীপথ। কিছুই কি পরিবর্ত্তন হয়নি আজও? হয়েছে বই কি? যেটুকু আনন্দ-উৎসব শৈশবেও সে দেখেছে, তাও আজ লুপ্ত। দু'চারটি লোকের জীবনযাত্রার ক্ষীণ প্রয়াস, নীরবতার বুকে অকস্মাৎ দু'জনার কলহ-কোলাহল, আদর্শহীন উৎসাহহীন মৃত্যুপাণ্ডুর প্রাণ। শিশুরা আসে, তাদেরও মুখে ফোটেনা সুন্দর হাসি, অন্তরে-বাহিরে অপরিচ্ছন্নতার গ্লানি, দারিদ্র্যের শোচনীয় মালিন্য।

স্বপ্ন জাগে মনে। পথ চলে, আর ভাবে, এই সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল পথ যেন হয়েছে শোভন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন কুটীর-মালা,—সামনে ফুলের বাগান, ঘরে-ঘরে হাসি-উচ্ছল নিশ্চিন্ত জীবন, ফুলের মত সুন্দর

সরল শিশুর হাসি, দিনান্তে মিলন-ঘরে গ্রামবাসীদের আলাপ আলোচনা, হাসি আর গান, সন্ধ্যার পরে ঘরে আর পথে উজ্জ্বল দীপালোক, সর্ব্বত্র যেন প্রাণের চিহ্ন দেদীপ্যমান।—স্বপ্ন মিলিয়ে আসে।

দুপুরবেলা। গৃহস্থদের বিশ্রামের সময়। নদীতীরের ইস্কুলে চ'লেছে বিদ্যাদানের সেই সনাতন রীতি। সেই শাসন-তর্জ্জন, শ্রমক্লান্ত শিক্ষকের প্রাণান্ত প্রয়াস,—আর শিশুদের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শ্রদ্ধাহীন, কৌতূহল-হীন শ্রবণ-চেষ্টার পুনরাবৃত্তি।·· মনে হ'ল, যদি এই শিশুদের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা যেত জীবনের উল্লাস, দৃষ্টিতে তাদের ফুটে উঠত অজানাকে জান্‌বার অদম্য কৌতূহল, হাসিতে খেলায় সুন্দর হ'ত তাদের জীবন, সুমুখের নদীজলে হয়ত শোনা যেত দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ, আর পাল্লা দিয়ে চ'ল্‌ত তাদের বাঁচখেলার নৌকো! বনে-বনে হ'ত চড়ুইভাতি, খেলার মাঠে চল্‌ত খেলাধূলো, দলে-দলে বেরুত তা'রা দেশ দেখতে, নূতনকে জান্‌তে, জ্ঞান অর্জ্জন ক'র্‌তে! এমনি ক'রে জীবনের স্রোত একবার যদি ফিরে আসত—অন্ততঃ এই শিশুদের জীবনে।

সন্ধ্যা হ'ল। ইস্কুল কখন ছুটী হয়ে গেছে। ছেলেরা ফিরে গেছে যে যা'র ঘরে। দোকানী দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ী চ'লেছে। ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌ছে সমস্ত গ্রাম। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা চারিদিকে। গভীর ঘুমের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

কি প্রগাঢ় আলস্য এ'দের জীবনে! দরজার সাম্‌নেই আগাছা, জঙ্গল, ফেল্‌বার উৎসাহ নেই, ঘরের পিছনে ঘনকালো বন—যমের প্রহরীদের মত বিভীষিকা রচনা ক'রে আছে। ঘর-দোরে শ্রী নেই, সর্ব্বত্র যেন অসহ্য উদাসীনতা। কি ক'রে বদ্‌লাবে এই জীবনের ধারা? কবে জাগবে এদের হৃদয়ে স্বপ্ন, আস্‌বে সৌন্দর্য্যবোধ, ফির্‌বে রুচি?

রাত্রি ঘনায়। খ'ড়ো ঘরের মাথার উপরে আকাশ তারায় ভরা। গ্রাম নিঃঝুম। অন্ধকার নির্জ্জন পথে পথিক একা। এর উঠানের উপর দিয়ে, ওর বারান্দার ধার দিয়ে, ঘন বনের মধ্যে কাদায়-ভরা সরু পথ বেয়ে গ্রামের শেষ সীমানায় পৌঁছল। দু'ধারে খোলা মাঠ, উপরে কালো আকাশ। ঝির্‌ঝির্ ক'রে বাতাস বইছে। ঘরদোর চোখে পড়েনা। তখনও আবছা অন্ধকার। পথিক ভাবেঃ কবে এই ক্ষেতে ক্ষেতে দু'ল্‌বে অফুরন্ত সোনার ফসল, পথঘাট হবে পরিচ্ছন্ন সুন্দর, জীবন হ'বে কর্ম্মময় আর দিকে দিকে শুন্‌ব নবসৃষ্টির গুঞ্জরণ-গান?

খেদ

শ্রীমতী শোভা মিত্র

(১)

চিন্তাধাবায শান্তি না পাই
শূন্য অশ্রুজল—
ব্যর্থ ব্যথার মর্ম্মবাণী
শোনাই কারে বল্ ?
হাত-পা যাদের শৃঙ্খলিত,
সদাই যারা ত্রস্ত, ভীত
কর্ম্মবিমুখ পঙ্গুজাতি
ভারতবাসীর দল।
এদেব মাঝে সাম্যগীতির
নাইরে কোন ফল।

(২)

মুখ বুজে সব যাচ্ছে স'যে
নাইক' প্রতিবাদ।
প্রভুর পদে দিচ্ছে বলি
উচ্চমনের সাধ।
মানবতার নাই মহিমা
লাঞ্ছনাবও হয না সীমা
অর্দ্ধঅঙ্গ রয উলঙ্গ
আধপেটে পায ভাত।
মরবে তবু করবে না 'রা'
আমাদের এই জাত।

(৩)

চরণ 'পরে চরণ তুলে
আপন জ্ঞাতি ভাই,
সৌধে থাকে বাজার হালে—
দেখছে ওরা তাই।
অসন্তোষের বহ্নিতাপে
পোড়ায না এ দারুণ পাপে
নম্রশিরে বিভেদটাকে
মানছে সর্ব্বদাই।
এদের মাঝে সাম্যগীতির
নাই কোন ফল নাই

বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার অভিমুখে

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়

অনুবাদিকা—শ্রীমতী অনিমা সেন।

মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যুগবিপ্লবকারী আবিষ্কার সমূহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিষয়ে প্রত্যেকটি মতবাদই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানবের সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, আইনকানুন সকলই ঈশ্বর অথবা তদ্রূপ কোন অসীম অশেষ ও সর্ব্বশক্তিমান দৈবশক্তির সহিত জড়িত করিয়া প্রচার করা হইত। ইহার পরবর্ত্তীকালে জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বমূলক গণতন্ত্রের নীতিকে ভিত্তি করিয়া শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। কারণ মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং কার্য্য-কারণ-নির্ণায়ক শক্তি ধীরে ধীরে দৈবশক্তির প্রভাবকে অপসারিত করিল—রাজার ঐশ্বরিক নেতৃত্বও সন্দিহান হইয়া উঠিয়া রাজশক্তির দেবত্বে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও মানবের উৎপত্তি এবং মানব সমাজ বিবর্ত্তনবাদের কারণ সম্পর্কে লোকের প্রচুর অজ্ঞতা ছিল।

সমাজের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন দিনেও ইহার সূত্রের সাক্ষাৎ পাই, এবং সমাজ ব্যবস্থার এই দীর্ঘ বিবর্ত্তনের ধারা বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মানবের আদিপুরুষ ও ইতিহাসের বিচিত্র ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া, বর্ব্বরতা হইতে তাহার সভ্যতার অভিমুখে এই ধীর অগ্রগমনের কাহিনী সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওযার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্মান্ধতা মানব উৎপত্তির ইতিহাসকে আবৃত করিয়া রাখিযাছিল, তাহা অপসারিত হইল। অবশ্য অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও এই অন্ধ ধারণা প্রচলিত রহিযাছে। কিন্তু এই মতবাদ সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের অশেষ সাহায্যে আসিল। লুই মরগ্যানের (Lewis Morgan) গবেষণা আদিম মানব ও তাহার সামাজিক গঠনের উপর সুস্পষ্ট আলোক সম্পাত করিযাছে। ইহার পর আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষের আচার ব্যবহার, সামজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে উপকথা ও পৌরানিক অর্দ্ধঐতিহাসিক গল্পের শরণাপন্ন হইতে হইল না। কারণ তাঁহারা আজও আমাদের মধ্যেই বসবাস করিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা কল্পনা হইতে বাস্তবকে বেশী ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহাদের সহিত একান্তভাবে পরিচিত হইতে পারেন।

হেগেল (Hegel) মানব সমাজের ক্রমিক-ধারা প্রদর্শন করিয়া ইতিহাসকে বিজ্ঞানের কোঠায় উত্তোলন করেন এবং কার্ল মার্ক্স্(Karl Marx) ও এঙ্গেলস্ (Engels) ইতিহাসের বাস্তব দিকটা ফুটাইয়া তুলেন। ইহার পর আপনা হইতেই বোঝা গেল যে মানুষ কোন আদিম দুষ্কৃতির ফলে ঈশ্বর রোষে বিতাড়িত কোন স্বর্গভ্রষ্ট জীব নহে, অথবা পৃথিবী-ধ্বংসকারী বিরাট প্লাবনকালীন

ঈশ্বর অনুগৃহীত সংখ্যাবিশেষের উত্তরাধিকারীও নহে। এই পৃথিবীও কোন খেয়ালী স্রষ্টাব খেলাচ্ছলে সৃষ্ট বস্তু নয়, এবং মানবসমাজের রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থাও কোন অনন্ত ক্ষমতাশালী ঈশ্বর অথবা কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া প্রচলিত হয় নাই। মানুষ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছে—সেই সংগ্রামই সমাজের ভিত্তিস্থাপন করিযাছে। এই সমাজে উৎপত্তির প্রত্যেকটী কাবণই তাই পার্থিব ও বাস্তবে নিহিত।

মানবের উৎপত্তি অন্তহীন জৈবিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটি যুগান্তের সূচনা করিযাছে। মানুষও এককালে পশু বিশেষ ছিল, কিন্তু তাহাব জীবন সংগ্রামের জন্য নিত্য নূতন উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেব দৈহিক শক্তি ছাডাও অন্য বস্তুব সাহায্য লইতে আবম্ভ করে। জন্তুদের শীতনিবারণের জন্য লোম জন্মায়, কিন্তু সেই একই কারণে মানুষকে নিজেব দেহ আবৃত করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে গাছের পাতা, বাকল, জন্তুব চামডা, ও তূলাব সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই, দেখা গেল যে প্রাণী যখন আদিম মানবের কোঠায পৌছায তখন মাংস-ভোজী জীবজন্তুর মত তাহার আর দাঁত ও নখের বৃদ্ধি হয় না। তখন সে পাথরকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহাব করে এবং তাহার পরে তীব ও ধনুকে শিবার করে। বানবেব লম্বা লম্বা হাত পা জন্মায ডালে ডালে লাফাইয়া চলার জন্য। একদিন হঠাৎ একটা ডাল ভাঙ্গিযা ফেলে এবং তৎপবে ইহাকেই ফল পাডিবার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করে। এইরূপ করিযাই আদিম মানবের পূর্ব্বপুরুষের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতির উপর মানুষের জয়।

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যতীতও যখন অন্য বস্তুবিশেষকে আত্মবক্ষার নিমিত্ত ব্যবহার করার মত বুদ্ধি জন্মায, তখন দেহবক্ষার নিমিত্ত দৈহিক যন্ত্রবিশেষের অভিযোজনার (দেহকে তাহার বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওযাইযা লইবাব) প্রয়োজন আসে। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মানুষের অগ্রগমন সংঘটিত হয, দৈহিক বলপ্রযোগেব প্রযোজনীযতার অবসানে এবং প্রকৃতিকে জয় করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে। নিজেব অস্তিত্ব বজায বাখিবার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি সমূহেব বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই আদিম মানবের দল গঠন ও সমজাতীযদেব সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইযা পডে এবং আদিম মানব সমাজের সূত্রপাত হয। প্রথমে শিকারেব জন্য, পরে গৃহপালিত পশুচাবণের জন্য এবং সর্ব্বশেষে ভূমিকর্ষণের জন্য তাহারা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিল। সুতবাং, মানুষ যখন তৎকালজাত প্রাকৃতিক সম্পদে নিজেব শ্রম প্রয়োগ করিয়া নূতন কিছু উৎপাদনেব চেষ্টা করিল, তখনই সমাজ গঠন সুরু হইল।

মানুষ ক্রুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, খেয়ালী ভগবানের খেয়াল নয। কাহারও খেয়ালেই মানুষের সৃষ্টি হয নাই। মানুষের সঙ্গেই সৃষ্টিব আবম্ভ। ক্রমোন্নতিশীল সৃষ্টির কৌশলই মানুষকে নিম্নস্তরেব জীব হইতে বিভেদ করে। যদিও নিম্নস্তবের জীবজন্তুরও কিছু সৃষ্টিশক্তি আছে। কিন্তু সেই শক্তি চিরস্থির—পরিবর্ত্তনশূন্য। সুতরাং ইতিহাসের প্রথম অরুণোদয়ের যুগে ও তৎপরবর্ত্তীকালেও মানুষের এই উৎপাদনী শক্তিই সমাজের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

যুগে যুগে ধর্ম্মশাসন, নৈতিক রীতি, নাগরিক নিয়ম-কানুন সকলেরই উৎপত্তি ও প্রচার হইযাছে সমসামযিক উৎপাদন অবস্থানুযায়ী। কোনকালেই কোন একটিমাত্র আইন সকল অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয হইযা মানব সমাজকে নিযন্ত্রিত করে নাই। নিত্যকাল বসিয়া কোন ঐশ্বরিক শক্তিই মানুষের অদৃষ্ট লইয়া ভাঙ্গাগড়া করিতেছে না, কিংবা কোন অদৃশ্য বা সর্ব্বকার্য্যকারণের শেষ হেতুস্বরূপে এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা যাবতীয পার্থিব পদার্থ নিয়মিত হইবে।

যদিও বর্ব্বর অবস্থাতেই সমাজের সূত্রপাত হইযাছিল, তবুও মানুষ যখন ভূমিকর্ষণ করিয়া ফললাভ করিতে আরম্ভ করিল তখনই সমাজ দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুগান্তকারী জ্ঞানই আহারন্বেষণ ও পশুচারণের নিমিত্ত নিত্যভ্রাম্যমান যাযাবর যুগের যবনিকা টানিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট এলাকায দলবদ্ধ হইযা মানুষ বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, এবং সমাজও একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করিল। প্রত্যেকটি দল দলবদ্ধ লোকের নিমিত্ত কিয়ৎপরিমাণ ভূমিস্বত্ব দলের চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করিয়া লইল। তখন কোন সর্ব্বগ্রাসী প্রবৃত্তিও ছিল না, কারণ কর্ষণশক্তির পরিমাণের দ্বারাই জমির সীমানা নিরূপিত হইত, অর্থাৎ দলবদ্ধ জনসংখ্যার সমবেত পরিশ্রমে যে পরিমাণ জমি কর্ষিত হইতে পারিত, সেই পরিধির জমিই সেই দলের হইত। অতএব ভূস্বত্ব ছিল সাধারণের, কারণ জমি কর্ষিত হইত সমবেত সম্প্রদাযের পরিশ্রমে। কোন ব্যক্তিবিশেষের পরিশ্রমে জননী ধরিত্রী অতি অল্পই দান করিতেন। সুতরাং উৎপাদনের প্রণালী, সমবেত সম্প্রদাযের যথোপযুক্ত খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীযতা এবং সমবেত পরিশ্রমই আদিম মানব সমাজের সম্বন্ধ নিযন্ত্রণ করিত। সমবেত চেষ্টার যে ফল, তাহাও তাহারা সমভাবে ভোগ করিত। তজ্জন্য 'তোমার-আমার' এ বিভেদের স্থান ছিল না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি।

স্থির হইযা বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই মানবের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই আদিম যুগের যন্ত্রপাতিও তৈযারী হইতে লাগিল। এই নূতন উৎপাদন প্রণালী সমবেত শ্রমপ্রণালীর সহিত বিবাদের সূত্রপাত করিল। যাহারা যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিত তাহারা ভিন্নভাবে একলা কাজ করিতে পারিত। আদিমযুগে তাহারাই নিজেদের শ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করিতে থাকিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইল।

ক্রমে ক্রমে সম্প্রদাযের সাধারণ স্বার্থ অপসৃত হইতে লাগিল এবং বিভিন্নমুখী স্বার্থের সংঘাতপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন সমূহকে শাসন করিবার জন্য আইনের প্রযোজন হইল। আইন তৈয়ারী করিতে হইলেই কোন প্রমাণের দরকার হয়। ধর্ম্ম এক বা বহু মহামানব সৃষ্টি করিয়া সেই প্রমাণের যোগান দিল। যেহেতু তাহারা দৈবশক্তিসম্পন্ন শুধু সেই কারণেই তাহারা মানুষ অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। সুতরাং তাহাদের উক্তির উপর আর কোন সাক্ষ্যের দরকার হয় না। অতীতের সকল

আইন প্রণেতারাই তাই অলৌকিক ভাবানুপ্রাণিত সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই তাহাদের ধর্ম্মপত্তনের ভিত্তিস্বরূপ হইযাছিল। সেই হইতে এক সর্ব্বকার্য্যকারণহেতু স্বরূপকে কল্পনা করা হইল, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং তাহার দোহাই দিযা মরজগতের সকল আইনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল স্বর্গীয় আইনের লক্ষ্য ছিল একান্তই জাগতিক। কারণ এই আইন হইযাছিল নূতন ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিসমূহের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য।

কালে কালে আদিমযুগের উৎপাদনের একটী প্রধান উপাদান জমি পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত হইল। নিজ নির্ম্মিত যন্ত্রদ্বারা কর্ষিত ভূমির ফলের উপরও অধিকার জন্মিল। সুতরাং এইরূপ প্রথায় কর্ষিত জমিতে আর সাধারণ স্বার্থ থাকিল না, আদিম সমাজ গোষ্ঠিতে বিভক্ত হইল। এই সকল গোষ্ঠি আবার কতকগুলি পরিবারের সমষ্টিতে গঠিত হইল। এই সকল পরিবারে কর্ত্তৃত্ব করিত বযোবৃদ্ধ পুরুষেরা। গোষ্ঠিপতি সমস্ত ভূস্বত্বের মালিক ছিল, এবং এই গোষ্ঠিপতিই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য স্বাধীন কৃষকের জমি বেদখল করিযা জমিদার হইযা দাঁড়াইল। অথবা রাজকীয় ঈশ্বর শাসিত রাজস্বত্বের আবির্ভাব ও সেই নৃপত্বের দাবীতে সকল দ্রব্যের উপর রাজস্বত্ব স্থাপিত হইল।—যাহাই হউক, সমাজ আর স্বাধীন জনসঙ্ঘ থাকিল না।

সমাজ বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। কিন্তু জমি তখনও উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান এবং মানুষের উৎপাদনী শক্তি নিঃশেষে জমিতে প্রযোগ করা হইত। জমির অধিকারীই সমাজে প্রভাবশালী শক্তিসম্পন্ন হইযা উঠিল। সুতরাং ভূম্যাধিকারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক রাজা দাঁড় করাইযা তাহার অধীনে থাকিযা নিজেদের ভূ-সংরক্ষণ করিতে লাগিল। প্রচলিত ধর্ম্ম আইন প্রভৃতির কাজই ছিল এই সকল বিধিব্যবস্থার সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা।

সমাজ বিভাগ।

সমাজ নানারূপে স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওযার ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম সুরু হইল। এই বিরোধ অবিরতভাবে চলিতে থাকে। এবং মধ্যে মধ্যে এত ভীষণ আকার ধারণ করে যে, সামাজিক নিয়মে বিপর্য্যয় ঘটে তখনই যখন কোন নিয়ম অচল হইযা ওঠে এবং নূতন আইন উদ্ভূত হয। কারণ বাধা পাইয়া মানুষের সৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর হইযা ওঠে।

কোন নির্দ্দিষ্ট সামাজিক নিযম কোন বিশেষ উৎপাদন প্রণালীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ মানুষের সৃষ্টি। উৎপাদন প্রণালী উৎপত্তির জন্য সমাজের সৃষ্টি হইল এবং সেই প্রণালীই সমাজের কাঠামো ও উদ্দেশ্য নিযন্ত্রণ করিযা দিল। তাই, যখন অন্য উন্নততর উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন পুরাতন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস ঘনাইযা আসিয়াছে। কারণ, মানুষ ঈশ্বর নয়, আর তাহার সৃষ্টিও তপস্যার জন্য নয়, সে চায কেবল নূতনতর ও বৃহত্তরের দিকে অগ্রসর হইতে। কাজেই, তাহার সৃষ্টি কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। অবশ্য পুরাতন প্রণালীতে যাহারা শক্তির অধিকারী হইয়াছিল—তাহারা সহজে এই নূতন পন্থাকে

গ্রহণ করে নাই, বরং ইহার মূলোৎপাটনে চেষ্টিত হইয়া অগ্রগমনে বাধা দিয়াছে। সুতরাং রক্ষণশীলতা ও উৎপাদনশীলতায় বিরোধ বাধিয়াছে। মানব তখন দুইটী পন্থার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে। একটী হইতেছে—পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা অর্থাৎ মৃত্যু, আর অপরটী নূতনতর পন্থাকে গ্রহণ করা—গতিকে গ্রহণ করা, অর্থাৎ জীবন। কারণ জীবিতের লক্ষণই গতিশীলতা। কাজেই, দ্বিতীয় পন্থাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব যাহারা এই পথে বিঘ্নস্বরূপ, তাহাদের সরিতে হইবে।

এইটীই সমাজের বিবর্ত্তনবাদের প্রধান কথা। সুযোগ সুবিধা এবং নানামুখী স্বার্থ নূতন উৎপাদন-প্রণালীর বিরুদ্ধে আনে বিরোধ এবং মানুষ মনুষ্যত্ব না হারাইয়া রক্ষণশীল হইতে পারে না, কারণ নিত্য নূতনতর পন্থাকে গ্রহণ করিয়াই সে ধীরে ধীরে বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আজিকার সভ্যতাও বহু ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ, কিন্তু মানুষের জানিবার জানাইবার ও করিবার আগ্রহ তাহাকে ক্রমশঃ উন্নততর ও মহত্তর পথে লইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

ইহুদীর মেয়ে

৺বিমল সেন

পাহাড়ী দেশ। সবুজ পাইন্ আর পুষ্পিতা লতাকুঞ্জ তাকে ক'রে রেখেছে একখানি সাজানো বাগানের মতো। পাদদেশে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সুবিশাল প্রান্তর। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ছোট্ট গিরিদেশটিকে দেখায় যেন আকাশের কোলে মেঘবরণ কন্যার এলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশি। সূর্য্য যখন পূব-আকাশে উঁকি দেয়, তখন মেঘ-কন্যা তার এলায়িত কেশ বেণীবদ্ধ ক'রে অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল নিয়ে নবোদিত সূর্য্যকে অভিনন্দন করে; তারপরেই যেন সে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পালায়।

তাকে আর দেখা যায় না। তার পরিবর্ত্তে এই রহস্যময়ীকে রক্ষা করার জন্য যেন চতুর্দ্দিকে অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ায় শত শত গিরি-সৈন্য। কী সুন্দর সে দৃশ্য! তরুলতার সবুজ বর্ম্ম পরে শিখরের পর শিখর হাত ধরাধরি ক'রে চারিদিকে রচনা ক'রেছে দুর্ভেদ্য গিরি-প্রাচীর। দেখে মনে হয় যেন ঝড়ে-নাচা সমুদ্রের ঢেউ নাচ্‌তে নাচ্‌তে হঠাৎ অচঞ্চল পাষাণে পরিণত হ'য়েছে।

পাহাড়ী দেশ বটে, তবে এখানে তুষারের উপদ্রব নেই। আমাদের দেশের মতোই শীত, আমাদের দেশের মতোই গরম। আমাদের দেশের মায়েদের মতোই সেখানকার মেয়েরা সমস্ত দিন ঘরকে তাঁদের মঙ্গল হস্তে পবিত্র করে রাখে, আর বেলা যখন প'ড়ে আসে, দল বেঁধে কাঁকন বাজিয়ে গাগরী-কাঁখে জল্‌কে চলে। সূর্য্য মুঠো মুঠো আবির ছড়াতে থাকে তাদের সর্ব্বাঙ্গে, সান্ধ্য-সমীর প্রাণখোলা উল্লাসে দুলিয়ে দিয়ে যায় তাদের আঁচল। তারপর আসে স্নিগ্ধ গোধূলি।

পাহাড়ের কোল বেয়ে তারা ঝর্ণায় নাবে, কলকণ্ঠের কাকলিতে ঝর্ণার কলধ্বনি যেন চাপা পড়ে যায়। কোনদিন বা সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে। কোনদিন বা বাড়ীফেরার পথে পাইনের আড়াল থেকে ধনুকপানা চাঁদ হাসিমুখ বাড়িয়ে বলে, সুন্দরি, বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছ আজ।

এই ইহুদীদের দেশ যেরুজালেম্। আজ এই ইহুদী জাতি খৃষ্টানদের পৈশাচিক অত্যাচারে গৃহহীন, দেশহীন, জাতিত্বহীন, যাযাবর। কিন্তু আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, সেই দু' হাজার বছর আগে এদের এদশা ছিলনা। খৃষ্টধর্ম্মের তখন জন্মই হয় নি। কাজেই ইহুদীদের তখন দেশ ছিল, জাতি ছিল। এই ইহুদীজাতিরই এক শাখা আসিরিয়ার রাজার অত্যাচার সইতে না পেরে তাঁর মুল্লুক ছেড়ে যেরুজালেমে এসে বসতিস্থাপন করেছিল। জায়গাটা যেমন সুরক্ষিত, তাতে তারা আশা ক'র্‌লো যে এখানে এসে কোন শত্রুই আর সহজে কিছু ক'রতে পারবে না। তারা এখানে নিরাপদ, অন্ততঃ আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে।

ইতিহাসের এম্‌নি বিচিত্র গতি, আজ পৃথিবীতে আসিরীয় জাতির চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু তখনকার দিনে আসিরিয়ার নামে সমস্ত পৃথিবী কাঁপ্‌তো। কাজেই আসিরিয়ার রাজা এই ইহুদীদের যে এম্‌নি এম্‌নি এতো সহজে ছেড়ে দেবেন, এটা আশা করা বৃথা। কয়েক বছর মাত্র ইহুদীদের সুখে-শান্তিতে কাট্‌লো। তারপর একদিন—সেই দিনটি দিয়েই আমাদের কাহিনী সুরু ক'র্‌ছি।

দুই

সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে একটা শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে এক বিদেশী এসে যেরুজালেমে ঢুক্‌লো। সাম্‌নেই একদল ছেলেমেয়ে খেলা ক'র্‌ছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লো, খোকা, তোমাদের সর্দ্দারের বাড়ী কোথায়?

ছুই—ব'লে খোকাটী অবাক্ হ'য়ে বিদেশীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিদেশী একটু হেসে আবার প্রশ্ন ক'র্‌লো, এখন গিয়ে সর্দ্দারের দেখা পাব বাড়ীতে?

হুঁ, ব'লে খোকাটী চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে তখন এগিয়ে ব'ল্‌লো, আজ্ঞে, ওর কথামতো সর্দ্দারের বাড়ীতে গেলেই আপনি নাকাল হবেন। সর্দ্দার এখন বাড়ীতে নেই। ফি শনিবার রাষ্ট্রসমিতির সভা হয় কিনা, তিনি সেখানে।

রাষ্ট্রসমিতি কোন্ দিকে গেলে পাব?

সোজা এই পথে চ'লে যান্ না। দেখ্‌বেন একটা মন্দির, তার পাশেই লালপানা রাষ্ট্র-সমিতির বাড়ী।

বেশ· ব'লে পথিক আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে নগরের দিকে এগোতে লাগ্‌লো। দু'পাশে ছবির মতো ছোট্ট বড় বাড়ী, তাতে ছেলেমেয়ের দল খেলা ক'র্‌ছে। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। চোখে ধাঁধা লেগে যায়, কোন্ ফুলগুলি বেশী সুন্দর? এই লতাকুঞ্জের নির্ব্বাক ফুল, না, ঐ

মানুষের ঘরের কলরতা শিশু-পুষ্প ? মাঝে মাঝে পশরা মাথায় পশারিণীর সঙ্গে দেখা হয়। চোখ এক অপরূপ আবেশে এলিয়ে আসে।

অল্পকিছু পরেই রাষ্ট্রসমিতির বাড়ীর দেখা মিল্‌লো।

দরোয়ান দুয়ারে ব'সে। পথিক তাকে ব'ল্‌লো, সর্দ্দারকে ব'লগে যাও, আসিরিয়ার রাজদূত তার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

দরোয়ান্‌ চ'লে গিয়ে মিনিটতিনেক পরে ফিরে এসে ব'ল্‌লো, ওপরে চলুন্‌, সর্দ্দার আপনাকে ডাক্‌ছেন।

দূত দরোয়ানের সঙ্গে উপরে চ'লে গেল।

বেশ বড় একটা হলঘরে রাষ্ট্রসমিতির সভা হচ্ছে। সর্দ্দারকে নিয়ে দশজন সভ্য। সকলেই রীতিমত গম্ভীর। দূত যেতেই সর্দ্দার তাকে বস্‌তে ব'ললেন। তারপর জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন, আপনি কি সংবাদ এনেছেন জান্‌তে পারি কি ?

দূত একখানা চিঠি বের ক'রে সর্দ্দারের হাতে দিয়ে ব'ল্‌লো, আজ্ঞে হ্যাঁ। এই সম্রাটের আদেশপত্র, পড়্‌লেই সব কথা জান্‌তে পার্‌বেন।

সর্দ্দার চিঠিখানা খুলে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। যতই পড়্‌ছেন, ততই যেন তার চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কোনমতে চিঠি-পড়া শেষ ক'রে ব'ল্‌লেন। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে বসুন্‌। আমরা পরামর্শ ক'রে এর জবাব দিচ্ছি।

রাজদূত পাশের ঘরে চ'লে গেল।

সর্দ্দার তখন উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লেন, ভাইসব, এমন অপমানকর চিঠির কী যে জবাব দেব, তাই আমি ভেবে পাচ্ছিনা, কিন্তু আগে চিঠিখানা তোমরা শোনো, আমি পড়্‌ছি ব'লে বেশ জোরে জোরে সর্দ্দার পড়্‌তে লাগ্‌লেন,

'মহামহিমান্বিত অতুলপরাক্রমশালী রাজচক্রবর্ত্তী আসিরীয় সম্রাটের আদেশক্রমে তাঁহার ইহুদীপ্রজাদের জানান যাইতেছে যে, যশকলা পূর্ণ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে সম্রাট শীঘ্রই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন। এতদুদ্দেশ্যে যে বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মেলন করা হইতেছে, ইহুদী প্রজারা যেন অনতিবিলম্বে তাহাতে ন্যূনকল্পে একহাজার সৈন্য পাঠায়। এতৎসঙ্গে যেরুজালেমের ইহুদীদের ইহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাহার ফল বড় বিষময়, বড় ভয়ঙ্কর হইবে।

ইতি—আসিরীয় সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী।'

পড়া শেষ হ'ল, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। সভাগৃহ নীরব নিস্তব্ধ। একটা বিরাট ঝড়ের আগে প্রকৃতির যেন নিষ্কম্প স্তম্ভিত অবস্থা।

এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রলো এক তরুণ। সে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লো, এর কি জবাব দেবেন ঠিক ক'রেছেন সর্দ্দার ?

সর্দ্দার গম্ভীরভাবে ব'ল্‌লেন, তোমরাই বলো, কি এর যোগ্য জবাব ?

যোগ্য জবাব ! তরুণের চোখমুখ দিয়ে আগুন ঝ'ল্‌সে উঠ্‌লো, ব'ললো, ও চিঠি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে দূতকে ফিরিয়ে দিন্‌, ব'লে দিন্‌, আসিরীয় সম্রাট যতই রাজচক্রবর্ত্তী হন্‌, ইহুদীরা কোনদিন তার প্রজা ছিলনা এখনো তার প্রজা নয়। একহাজার ইহুদী দূরের কথা, যেরুজালেমের একটা কুকুরও তার ডাকে সাড়া দেবেনা।

সর্দ্দার ব'ল্‌লেন আসিরীয় সম্রাট জানেন, তোমরা এম্‌নি জবাবই দেবে। তাইতো চিঠির শেষে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘনের ফল বড় বিষময়, বড় ভয়ঙ্কর।

তরুণ ব'ল্‌লো, অর্থাৎ আবার একটা ইহুদী-আসিরীয় লড়াই সুরু হবে, এই তো ? কিন্তু সর্দ্দার, আমরা পরের পা চেটে যে শান্তি মেগে নিতে হয়, তা চাই না। লড়াইয়ের অশান্তি হাজারগুণে আমাদের কাম্য।

সর্দ্দার ব'ল্‌লেন, তোমরা সকলেই কি তবে এই জবাবের পক্ষপাতী ?

মিলিতকণ্ঠে জবাব হ'ল, নিশ্চয়।

তোমরা সবাই যুদ্ধ ক'র্‌তে প্রস্তুত ?

হাঁ।

সর্দ্দার বললেন, আদেশপত্রের জবাব ? তার জবাব এই।

বেশ, আমি রাজ-দূতকে ডেকে এই কথাই ব'লে দিচ্ছি।

দূতকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনা হ'ল।

সর্দ্দার ব'ল্‌লেন, দেখুন আপনাদের সম্রাটের ঔদ্ধত্য দেখে একটা মস্তবড় শিক্ষা আমাদের হ'ল। তা হচ্ছে এই যে, মানুষ যতই নরম হয়, ততই অত্যাচারীরা তাকে পেয়ে বসে। কেউটে দেখে যারা পিছিয়ে যায়, ঢোঁরাস্‌ দেখে তারাই বীর-দর্পে লাফিয়ে পড়ে। একবার আপনাদের অত্যাচার নিষ্প্রতিবাদে স'য়েছিলাম্‌ ব'লে আবার আপনারা এই অত্যাচারের হুম্‌কি দেখাতে সাহস পেয়েছেন।

রাজদূত ব'ল্‌লো, আপনাদের এ বক্তৃতা শুন্‌তে আমি আসিনি। আমি সম্রাটের আদেশ-পত্রের জবাব চাই।

সর্দ্দার ধীরস্থির কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, আদেশপত্রেব জবাব? তার জবাব এই ব'লে চক্ষের নিমিষে পত্রখানা তুলে টুক্‌রো টুক্‌বো ক'রে ফেল্‌লেন। তারপব ব'ল্‌লেন, আপনার সম্রাটকে জানাবেন, ইহুদীরা কোনকালে তার প্রজা ছিল না, আব আজও তার প্রজা নয়। আসিরীয়াব যশেব জন্য ইহুদীরা প্রাণ দেবেনা।

রাজদূতের চোখ রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো, বীরত্বতো দেখালেন, কিন্তু এ বীরত্বের ফল কি জানেন?

হ্যাঁ। জেনেশুনেই আমবা চিঠির যোগ্য জবাব দিয়েছি! দূত বিদায় হ'ল।

রাষ্ট্রসমিতিও আসন্ন যুদ্ধেব আয়োজনের দিকে মন দিল।

তিন

সে যুগের যুদ্ধ অবশ্য এ যুগেব যুদ্ধেব মতো এতোটা মাবাত্মক ছিল না। মানুষ মারাব বৈজ্ঞানিক প্রণালী তখনও এতোটা পবিমাণ আবিষ্কৃত হয়নি। তখন সাম্‌না সাম্‌নি লডাইযেব প্রধান হাতিযার ছিল তরবারি, আর দূর থেকে লডাই হ'ত প্রধানতঃ তীব ধনুক দ্বাবা। কাজেই সুরক্ষিত দুর্গে একপক্ষ আশ্রয় নিলে, আব একপক্ষেব পক্ষে তাদেব কাবু কবা ছিল ভযানক শক্ত। দুর্গ-প্রাচীর ছেঁদা কবাব জন্য তখন একবকম যন্ত্র তারা আমদানী কব্‌তো এবং পাথব ছোঁডার যন্ত্র দিয়ে দুর্গের ভিতরে বড বড পাথর ছুঁডে ফেল্‌তো। তাতেও কিছু সুবিধা না হলে দুর্গের কাছেই তাঁবু ফেলে দুর্গ অবরোধ কবে থাক্‌তে হত। আশা, খাবাব যখন ফুরিয়ে যাবে, ক্ষুধার তাডনায শত্রু পক্ষ দুর্গের বাইরে আস্‌তে বাধ্য হবে। তাই বলে অববোধকারীরা নিজেবাও অনির্দ্দিষ্টকাল পবেব দোবে ধন্না দিয়ে ব'সে থাক্‌তে পারতো না, কারণ তাদেব খাদ্যভাণ্ডাবও অক্ষয নয। আজ হ'ক্‌, কাল হ'ক্‌, খাদ্যাভাব এবং আরো নানান্‌ বকমের অভাব তাদেবও এসে আক্রমণ করে।

যাই হোক্‌, দুর্গের সুবিধাটা ছিল তখনকার যুগে আত্মরক্ষার একটা মস্ত সুবিধা। আব যেরুজালেমের ইহুদীদের এই সুবিধাটা যথেষ্ট পবিমাণেই ছিল। পাথর এনে দেয়াল গেঁথে তাদেব এ দুর্গ নির্ম্মাণ কব্‌তে হযনি, প্রকৃতিদেবী গিরিপ্রাচীব দিয়ে নিজে এ দুর্গেব সৃষ্টি কবেছেন। কাজেই ইহুদীরা ঠিক্‌ কব্‌লো, আসিবীয়বা খুব সম্ভব অসংখ্য সৈন্য নিযে এসে হাজির হবে; প্রথমটা তাদেব মতো সুশিক্ষিত এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে লড্‌তে যাওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়; প্রথম্‌ দুর্গে শক্ত হ'যে বসে থাক্‌তে হবে. তারপর মাসখানেক পরে আসিরীযেরা একটু হতাশ হ'য়ে পড্‌লে দুর্গ থেকে বেরিযে মার্‌ মাব্‌ রবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পডা যাবে।

এই ভেবে তারা মাসখানেকের উপযোগী খাবার সংগ্রহের দিকে মন দিলে। কাজটা খুব সোজা ছিল না। ভারতবর্ষের মতো এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে মানুষের বছরভোর খাবাব

জন্য যা দরকার, তা ষোলআনা সেই দেশেই জন্মায়। প্রায় দেশেরই স্থানান্তর থেকে আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হয়। বিশেষতঃ যেরুজালেমের মতো পাহাড়ী দেশগুলোর। খাবার তবু যেমন-তেমন জলের অপ্রাচুর্য্যে পাহাড়ী দেশগুলোকে বিশেষভাবে ভুগ্‌তে হয়। যেরুজালেমের অবস্থাও এম্‌নি ছিল। ইহুদী ধনী জাতি, কাজেই পয়সার দৌলতে খাবারসংগ্রহে তাদের তেমন কষ্ট পেতে হ'ল না। তাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়ালো জল নিয়ে। কারণ নগরের ভিতরের একটিও জলাশয় বা ঝর্ণা নেই। ঝর্ণাগুলি সবই পাহাড়ের কোলে, কাজেই নগরের বাইরের দিকে। শত্রু নগর অবরোধ ক'র্‌লে সেখান থেকে জল আনা যে কী বিপজ্জনক তা ভাব্‌তেই গা শিউরে ওঠে। ঝর্ণাগুলি যদিও অপেক্ষাকৃত গুপ্তস্থানে এবং সাধারণতঃ বাইরের লোকের চোখে পড়ে না, কিন্তু নগর অবেরাধকালে শত্রুচরদের চোখ এড়াবে বলে ভর্সা করা যায় না। যাই হ'ক্, সাবধান হওয়া ভালো। ইহুদীরা ঘড়ায় ঘড়ায় জল এনে পিপা, জালা, কলসী ভর্‌তী কর্‌তে লাগ্‌লো যাতে ঝর্ণা-পথ অবরুদ্ধ হ'লে তাদের জলের অভাবে না ছাতি ফেটে মর্‌তে হয়।

এ ছাড়া যুদ্ধের অন্য সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের তো কথাই নেই। এবার যেমন তেমন শত্রুর সঙ্গে লড়াই নয়, শত্রু স্বয়ং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আসিরীয় সম্রাট্। দেশের স্কুল কলেজ বন্ধ হ'য়ে গেল। খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ বন্ধ হয়ে গেল, লড়াই-ক্ষ্যাপা যুবকদল সৈন্যের দলে নাম লিখিয়ে সুদক্ষ সেনাপতির তদারকে দুবেলা জোর কুচ্‌কাওয়াজ সুরু করে দিল। বেশী বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধের ডঙ্কা বাজ্‌লে দেশে যেমন চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, ইহুদীদের মধ্যেও তেমনটা হ'ল।

উত্তেজনা যখন চরমে উঠেছে, তখন হঠাৎ একদিন দিগ্‌মণ্ডল অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিজালে আবৃত ক'রে আসিরীয় সম্রাটের বিরাট সৈন্যবাহিনী দেখা দিল। ইহুদীরা প্রাণে প্রাণে কেঁপে উঠ্‌লো। অসংখ্য সৈন্য আস্‌বে তারা জান্‌তো, কিন্তু সে অসংখ্য যে এতো, এ.তারা কল্পনা কর্‌তেও পারেনি। সর্দ্দার ভালো করে নজর ক'রে ব'ললেন, চল্লিশ হাজারের ওপর অশ্বারোহী লড়াই কর্‌তে এসেছে। নগর-তোরণ বন্ধ করে দাও।

সশব্দে সেই বিরাট্ দু-পরদা দুয়ার বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। তার কিছু পরে শত্রুও এসে নগর তোরণের কাছে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। আসিরীয় সম্রাট্ স্বয়ং আসেননি, এসেছেন তার বিখ্যাত এক সেনাপতি। সেনাপতিমশাই প্রথমটা এসে তো খুব হুঙ্কার এবং লম্ফ ঝম্ফ সহকারে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ইহুদী-বাচ্চাদের যুদ্ধে আহ্বান কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সব বৃথা, কেউ কোন্‌ো জবাব দেয়না, দুয়ারও খোলে না। সেনাপতি তখন হুকুম দিলেন, দোর ভেঙে ফেলো।

তৎক্ষণাৎ ভীম আকৃতি জন তিরিশেক সৈনিক একটা দু-চাকাওয়ালা গাড়ী ঠেলে নিয়ে এলো দোরের কাছে। গাড়ীতে লম্বালম্বি ভাবে আট্‌কানো বিরাট একটা লৌহদণ্ড। তারই অগ্রভাগ দিয়ে দোরে ঘা দিতে হয়। অনেক শক্ত দোরও এর দু-চার ঘায় ভেঙে যায়। ইহুদীরা এ জান্‌তো, কাজেই এ যন্ত্রে যাতে দোর না ভাঙে, তারই ব্যবস্থা তারা আগে থাকৃতে ক'রে রেখেছিল। সুতরাং

সেনাপতি মশাইয়ের হুকুমে মুহুর্মুহুঃ যন্ত্র চল্‌লো বটে, কিন্তু দোর যে অনুমাত্র ভাঙ্‌বে, তার এতোটুকু লক্ষণও দেখা গেল না।

সেনাপতি তখন জন কয়েক সৈনিককে হুকুম কর্‌লেন, দেখে এসো, নগরের আর কোনদিক্ দিয়ে ঢোকার সুবিধা করা যেতে পারে কিনা।

সৈনিকরা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, এবং নগর প্রদক্ষিণ করে এসে জানালো, না হুজুর, এর চারিদিকে খাড়া উঁচু পাহাড়, ঢোকার কোন উপায় নেই।

তবে তাঁবু ফেল। আমরা এদের অবরোধ কর্‌বো। দেখি এরা কতদিন ইঁদুরের মতো গর্ত্তে লুকিয়ে থাকে।

পথশ্রান্ত সৈনিকদল এ আদেশে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো। তাঁবু খাটানোর কাজ চল্‌লো, এবং সন্ধ্যে হবার আগেই সারি সারি উইয়ের ঢিপির মতো সারি সারি তাঁবুতে নগরবহিস্থ প্রান্তর একেবারে ছেয়ে গেল।

তারপর নৈশভোজ। খাবার সঙ্গেই ছিল, জলও ছিল, কাজেই দক্ষিণ হস্তের কর্ম্মে কোনরূপ ব্যাঘাত হ'ল না। বেশ পরিপাটিরূপে ভোজন সমাধা ক'রে সেনাপতিমশাই অনুচরদের বল্‌লেন, দেখ, এরকমভাবে হা-পিত্যেশীর মতো ব'সে থাক্‌তে হ'লে পুঁজি নষ্ট করাতো চল্‌বেনা। যে জল আর খাবার আনা হ'য়েছে, তা আপাততঃ তোলা থাকুক্। এই মুল্লুক থেকেই যতদিন সম্ভব ও দুটো নেওয়া চলুক্। কাল সকালে উঠেই জল আর খাবার সংগ্রহ ক'রে এনো, ভুল না হয়।

যে আজ্ঞে হুজুর।

রাতটা নিরাপদে কাট্‌লো. ভোরে উঠে শতাধিক অনুচর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল প্রান্তরের মধ্যে। কিন্তু যত এগোয় তত তাদের চক্ষু স্থির হয়। একী প্রান্তর! মাইলের পর মাইল শুধু কাঁটাগাছ ছড়ানো, তা এমন ক'রে পায়ে বেঁধে যে ঘোড়া বারে বারে থম্‌কে দাঁড়ায়। সূর্য্য যেন অগ্নির ঝাণ্ডা দোলাচ্ছে। অথচ মরুভূমিও নয়। যতদূর চক্ষু যায়, কোথাও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে কি ক'রে খাবার মিল্‌বে? গভীর নিরাশায় তারা তাঁবুর দিকে ফিরে চল্‌লো।

খবরটা শুনে সেনাপতি অবশ্য খুব খুসি হ'লেন না। খানিক কি চিন্তা ক'রে ভাণ্ডারীকে ডেকে পাঠালেন। ভাণ্ডারী এসে নমস্কার করে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করলেন। ওহে, আমরা কতদিনের রসদ সঙ্গে এনেছি?

আজ্ঞে, আড়াই মাসের।

জল?

ওটা তত নেই।

তবু, কতদিনের মতো আছে শুনি?

আজ্ঞে, দিন দশেকের।

দিন দশেকের! সেনাপতি · · বেশ ভাবিত হ'লেন। তাইতো, মোটে দশদিনের জল, জলের কি করা যায়? দেখো, জল খুব কম কম খরচ ক'র।

যে আজ্ঞে।

ভাণ্ডারী চ'লে গেলে সেনাপতি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীকে ডেকে বললেন, দেখো মরদ, এই পাহাড়ী মুল্লুকে জল নেই, এ হ'তেই পারে না। আমি শুনেছি পাহাড়ের গা ফেটে ঝর্ণা বেরোয়। তোমার ওপর ভার রইলো, তুমি যেমন ক'রে হ'ক আজকের মধ্যে পাহাড়ের গা পাতি পাতি করে খুঁজে ঝর্ণার জল বের ক'রবে। মনে রাখবে, ঐ ইহুদী ব্যাটাদের জব্দ ক'রতে হ'লে আমাদের এখন সব চেয়ে বড় দরকার জল খুঁজে বের করা।

সহকারী নমস্কার ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেল। সমস্তদিন পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুরেও কোনও ঝর্ণার খোঁজ পেল না। সেনাপতিমশাই মনে মনে বেশ একটু দমে গেলেন। তাইতো, শেষটা সামান্য জলের অভাবে ইহুদী ব্যাটাদের কাছে · না, যে ক'রে হ'ক্ এর প্রতিকার ক'র্‌তেই হবে।

সহকারীর চোখে ঝর্ণা না পড়ার কারণ ইহুদীদের সতর্কতা। রাষ্ট্রসমিতির কড়া হুকুম, দিনে কেউ ঝর্ণায় জল নিতে যাবেনা, জল নিতে যাবে রাতে। কাজেই শত্রুরা কি ক'রে এতো সহজে খোঁজ পাবে যে কোথায় ঝির্ ঝির্ ক'রে ঝর্ণা-ধারা ব'য়ে চ'লছে। রাতে এক-একটি ক'রে ইহুদী যুবক নাবে আর নিঃশব্দে জল তুলে নিয়ে উঠে যায়। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় তাদের নজর করা যেন আরও শক্ত।

কিন্তু পাঁচদিনের দিন রাতে এই গুপ্তঝর্ণা-রহস্য শত্রুচরের কাছে ব্যক্ত হ'য়ে পড়লো। চর সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা কলসী ভাঙার শব্দ তার কানে এলো। তারপরেই সে জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে নজর ক'রে দেখ্‌লো, যেন কতক'গুলি নির্ব্বাক্ ছায়ামূর্ত্তি পাহাড়ের কোল বেয়ে নাব্‌ছে, আর কানে আস্‌ছে জলের ক্ষীণ কলোচ্ছ্বাস। সমস্ত রাত সেখানে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ভোরের আলো ফুটতে দেখ্‌লো তার অনুমান মিথ্যা নয়। বহু উর্দ্ধে পাহাড়ের কোলে ঝর্ণাধারা। কিন্তু পাহাড় সেখানে এতো খাড়া যে বাইরে থেকে ঝর্ণার কাছে ওঠা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু নিশ্চয়ই ও ঝর্ণাধারা নীচে কোথাও নেবে এসেছে। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখ্‌লো, হাঁ, তাই। কিছুদূরে একেবারে ভূমি পাহাড়ের সংযোগস্থল ঘেঁষে ঝর্ণাধারা আত্মপ্রকাশ ক'রেই প্রান্তরগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে। সুখবরটা সে ছুটে গিয়ে সেনাপতিকে দিল।

সেনাপতিতো একেবারে একলাফে সপ্তমস্বর্গে উঠ্‌লেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যাও, এক্ষুনি দুশো তীরন্দাজ নিয়ে গিয়ে ঝর্ণা আট্‌কাও। দিনে কি রাতে কোনো ব্যাটা ইহুদী যেন তা থেকে একঘড়া জল না নিতে পারে।

এমনিভাবে ইহুদীদের জলের উৎস অবরুদ্ধ হ'ল।

বিশেষ চিন্তার কথা। আসিরীয়রা যদি একমাসের পরও দিনের পর দিন অবরোধ চালাতে থাকে, তাহলে উপায়? ইহুদীদের মুখে একটা চিন্তার কালো ছায়া পড়লো।

আর আসিরীয় শিবিরে উঠতে লাগলো ঘন ঘন উল্লাস ধ্বনি।

চার

দেড়মাস পরে। .. ..

আসিরীয় সেনাপতির অবরোধ তোলার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। ইহুদী-নগরে সুরু হ'য়েছে প্রচণ্ড জলাভাব। জল যা তোলা ছিল, সব নিঃশেষ হ'যে গেছে। প্রত্যেক জলপাত্র শুষ্ক। আর জল নেই ব'লেই প্রত্যেকের বুকে অসহ্য পিপাসা। তাদের মুখভাব দেখলে মনে হয়, জীবন্ত দেহগুলিকে কে যেন আগুনে পুড়িয়ে মারছে। কী ভীষণ সে তৃষ্ণার দাহ! প্রথম দু'চারদিন কেউ কিছু ব'ল্লোনা। তারপর আর না পেরে ছুটে গেল ঝর্ণার দিকে। অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে আসিরীয় তীরন্দাজের বিষাক্ত তীর এসে তাদের কণ্ঠবিদ্ধ করলে।

জনতা পাগলের মতো হ'যে সর্দ্দারের কাছে ছুটে গেল, সর্দ্দার হুকুম দাও, আমরা ঝর্ণা পুনরধিকার করি।

সর্দ্দার স্থির ভাবে ব'ল্লেন, না।

সে কি সর্দ্দার? তবে কি আমরা পিপাসায় ধুক্‌তে ধুক্‌তে ম'র্‌ব? ঝর্ণা অধিকার করতে পারি, এতটুকু শক্তিও কি আমাদের নেই?

সর্দ্দার ব'ল্লেন, শক্তি তোমাদের আছে, কিন্তু স্থির বিবেচনা শক্তি নেই।

কেন?

আজ যদি তোমরা মরিয়া হ'যে ঝর্ণা অধিকার ক'র্‌তে যাও শত্রু বুঝবে তোমাদের জলের অভাব পড়েছে। তখন ওরা আরো শক্ত ক'রে শিকড় গেড়ে বস্‌বে। অবরোধও তুল্‌বে না, ঝর্ণাও ছেড়ে দেবে না। তোমরা কি ক্ষণিক উত্তেজনার বশে জাতির এই চরম দুর্ভাগ্যকে ডেকে আন্‌তে চাও?

জনতা খানিক্ষণ স্তব্ধ থেকে বল্‌লো, কিন্তু আমরা যে আর পারি না সর্দ্দার। বুক জ্বলে যাচ্ছে। মন জ্বলে যাচ্ছে। মায়ের বুকে দুধ নেই, তার সাম্‌নে কোলের ছেলে পিপাসায় ধুক্‌তে ধুক্‌তে ম'র্‌ছে। এযে অসহ্য সর্দ্দার।

সর্দ্দার চোখ মুছে ব'ল্লেন, দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাও ভাই।

সেই সন্তানহারা জননী ভিড় ঠেলে সর্দ্দারের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, তার কোলে সেই মৃত শিশু। তার চুল রুক্ষ, তার চোখে আগুন, ব'ল্‌লো, দেবতা? সর্দ্দার দেবতা নেই! তার প্রমাণ আমার কোলে! কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, ওগো একফোঁটা, একফোঁটা জল দাও! তোমার এত জল, পৃথিবী ডুবিয়ে দেবার বেলা তো তোমার জলের অভাব হয় না, আমি এত চাই না, চাই মাত্র

এক ফোঁটা, একবিন্দু, তাই দিতে পার না? দিলেনা, দিলেনা, এককোঁটা জল দিলে না। কে দেবে? কোথায় দেবতা? দেবতা নেই। সর্দ্দার, দাও, জল দাও, বাছা আমার এখনো বাঁচতে পারে। এককোঁটা জল দাও।

সর্দ্দার সজল চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

পাগলিনী জননী ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লো, দিলে না? তুমিও দিলে না?

তারপর গর্জ্জন ক'রে উঠলো, তবে কেন তুমি সর্দ্দার হ'য়েছিলে? এককোঁটা জল দেবার যার মুরোদ নেই, সে কেন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? দাও, নগরতোরণ খুলে দাও, আমি আসিরীয়দের কাছে যাব, তাদেব কাছে গিযে এককোঁটা জল চাইব। তাবা দেবে, এককোঁটা জল দেবে। বাছা আমার বাঁচবে। ওগো, আমাব যে এ ছাডা আব কেউ নেই গো।

পাগলিনী হাহাকাব কবে আবার ভীড়ে মিলিযে গেল।

সর্দ্দার শূন্যদৃষ্টিতে চেযে রইলেন।

এক বৃদ্ধ ব'ল্‌লেন, সত্যি সর্দ্দার, এরকমভাবে চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে আর কতদিন নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে? এর চাইতে যে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ কবাও ছিল ভালো।

শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ?

হাঁ, স্বেচ্ছায ধবা দিলে তবু দযা পাবাব একটু আশা আছে, নইলে যেরকম অবস্থা, আজ হোক্ কাল হোক্ তাদের কবলে পড়তেই হবে।

পিপাসা-ক্ষুব্ধ জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

আমরা এরকম শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা চাইনা। দোব খুলে দাও, আমরা আসিরীয়দের সঙ্গে সন্ধি ক'রব।

সর্দ্দার ব'ল্‌লেন, ভাইসব, তোমবা যে এতোটা দুর্ব্বল চিত্ত তা আমি জান্‌তুম না। সময যখন ভালো, তখন বীরত্ব অনেকেই দেখাতে পারে। খাঁটি বীরত্বের পরীক্ষা দুঃসময়ে। জাতির স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে প্রশ্ন, সেখানে এর চাইতেও যাতনা, এর চাইতেও হৃদয়বিদারক দৃশ্য বুক ফেটে গেলেও সইতে হয। আজ শত্রুর কাছে নতজানু হ'য়ে জল খেযে প্রাণ হয়তো বাঁচাতে পার কিন্তু তারপর? তারপর যে দীর্ঘদিন, দীর্ঘযুগ জাতির ভবিষ্যতেব গর্ভে র'য়েছে, তাব কথা ভেবে দেখেছ কি? ভেবে দেখেছ কি, যে পরাধীনতা এর চাইতেও শোচনীয় মৃত্যু, এর চাইতেও তিক্ততর বেদনা। আমাদের বংশধরগণ অহরহ তখন যে অভিশাপ দেবে, তারা যে তপ্ত অশ্রু ফেল্‌বে, তার দাহ যে কবরেও আমাদের তিষ্ঠুতে দেবে না।

তবে কি ক'রব সর্দ্দার! এ পিপাসার জ্বালা আর যে সইতে পারি না।

প্রার্থনা কর ভাই। দেবতার চরণে প্রার্থনা কর।

কতদিন এম্‌নি ভাবে পিপাসার সাথে লড়াই ক'রে কাটাব সর্দ্দার?

সর্দ্দার একটু ভেবে ব'ললেন, আর পাঁচটা দিন দেরি কর ভাই। এই পাঁচদিন দেবতার

কাছে প্রার্থনা জানাও, প্রভু, বক্ষা কর, আমাদের তৃষ্ণার দাহ হ'তে রক্ষা কর, আমাদের পরাধীনতা হ'তে বক্ষা কব। তাবপবও যদি কিছু না হয়, পরামর্শ ক'রে যথাকর্ত্তব্য করা যাবে।

একটী নাবীকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল, কি ক'রবেন তখন ? ধরুন্ দেবতার কাছে পাঁচদিন প্রার্থনা জানিযেও জল মিল্‌লো না তখনই কি আপনাবা জাতির স্বাধীনতাকে গর্ব্বিত বিদেশীর চরণে বলি দেবেন ?

বেশ তীক্ষ্ণ, সজোর, ঝাঁঝালো কণ্ঠ। সকলে একযোগে প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে চাইলো। নিরাভবণা, রুক্ষকেশ, জ্যোতিঃমণ্ডিতা অপূর্ব্ব সুন্দবী বিধবা। সকলের কণ্ঠেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'ল—যুডীথ্।

যডাণ

যুডীথ কণ্ঠস্বর আবো ঝাঁঝালো ক'বে ব'ল্‌লো, হঁ্যা, আমি যুডীথ, আমি জান্‌তে চাই, এই কি বিশ্বাসপবাযণ ইহুদীব মতো কথা ? এই কি মানুষেব মতো কাজ ? দেবতা কি আমাদেব কোন তোযাক্কা বেখে চলেন যে আমবা তাঁর উপব এমন হুকুম চালাব ? কতদিনে দযা ক'ব্‌বেন তা তাঁর ইচ্ছা। ক্ষুদ্র মানুষ আমবা, কী স্পর্দ্ধা আমাদের যে তাঁর কাজের সময বেঁধে দিই। আমবা শুধু প্রার্থনা কবতে পাবি বৈ তো নয।

একজন ব'লে উঠ্‌লো, কিন্তু প্রার্থনা নিষ্ফল হ'লেই তো আত্মসমর্পণ কবার প্রশ্ন উঠ্‌বে।

যুডীথ, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, না, উঠ্‌বে না। ভগবদ্ কৃপা না হ'লেই যে ধুলায লুটিযে পড়্‌তে হবে, তাব মানে কি ? আমবা কি মানুষ নই ? নিজেদেব স্বাধীনতার জন্য যদি নিজেবা যুদ্ধ কব্‌তে না পারি তো মানুষ হ'যে জন্মেছিলাম কেন ? আপনাবা আত্মসমর্পণেব কথা ভুলেও মনে আন্‌বেন না। সর্ব্বসাধাবণকে একথা বেশ পরিষ্কারভাবে জানিযে দিন যে আমরা পিপাসায তিলে তিলে শুকিযে মবব, তবু শত্রুর কাছে মাথা নোয়াব না।

সর্দ্দা'বের যেন মনে হ'ল, ভগবানের বাণী যুডীথের মধ্য দিয়ে আজ আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। তিনি ব'ললেন, তাই হ'ক্ না। পুণ্যবতী তুমি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন দয়া ক'বে একপশ্‌লা বৃষ্টি দিযে তিনি ইহুদী জাতটাকে বাঁচান।

যুডীথ ব'ল্‌লো, সে প্রার্থনা অহরহই কব্‌ছি সর্দ্দার। আজও ক'র্‌ব।

সবাই যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

যুডীথও তার বাড়ীটিতে ফিরে এল। এক বৃদ্ধা পরিচারিকা বাদে বাড়ীতে আর কেউ নেই। নির্জ্জনে ব'সে যুডীথ দেশের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

এই মেঘমায়ামণ্ডিত শৈলমালা, সবুজ বনভূমি, ধূসর প্রান্তর, রঙ্গীন সূর্য্যোদয়, মায়ামণ্ডিত সূর্য্যাস্ত,···· সকলের সঙ্গেই তাঁর কল্পনা বিজড়িত। তাঁর কাছে এ শৈলভূমি অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। এ প্রিয়ভূমির মুখে পরাধীনতার দুরপনেয় কালিমা লিপ্ত হবে? এ সম্ভাবনার চিন্তাও যেন তার বুকে শেলের মতো বাজলো।

যুডীথ স্বাধীনতার আনন্দে তন্ময় হ'য়ে যেন স্বপ্ন দেখতে লাগলো, সেই শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে সে একা। আকাশ দিয়ে নিরাশার কালো ঢেউ ছুটে আস্‌ছে নীচে তৃষ্ণার্ত্ত নরনারীর বুকফাটা চীৎকার। এমন সময় কে যেন তাকে উচ্চকণ্ঠে ব'লে গেলেন, যুডীথ, এ জাতিকে নিরাশার হাত হ'তে, পিপাসার জ্বালা হ'তে বাঁচাবার ভার তোমার।

যুডীথ ব'ল্‌লো, দীনা নারী আমি, আমার সে শক্তি কোথায় প্রভু?

উত্তর হ'ল, তুমি দীনা নও। চেয়ে দেখো, শক্তি তোমার নিজের মধ্যে। তোমার রূপে, তোমার মেধায়, তোমার নির্ভীকতায়।

তারপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

যুডীথ লাফ দিয়ে উঠে ব'স্‌লো। কে এ? কে কথা ব'লে গেলেন? রূপ, বুদ্ধি নির্ভীকতা ···। রূপ? যুডীথ ধীরে ধীরে দর্পণের কাছে এসে দাঁড়ালো। হাঁ, পোড়া রূপ আজো তার দেহে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো বিরাজ ক'র্‌ছে। কিন্তু নারীর রূপ ·এ কি কাজে লাগবে প্রভু? কি ক'রে তৃষিত নরনারীর কণ্ঠে এ পিপাসার বারি এনে দেবে? কি ক'রে প্রবল প্রতাপ আসিরীয় বাহিনীকে পরাজিত ক'রবে?

যুডীথ উন্মনা হ'য়ে ভাবতে লাগলো এ দৈববাণীর কি অর্থ? কি সার্থকতা?

তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে উঠতেই সে চম্‌কে উঠলো। তারপর অস্থিরভাবে পায়চারী ক'র্‌তে লাগালা। ঘুমোতে যখন গেল সে, তখন অনেক রাত।

পাঁচ

যুডীথ মিরারী-ইহুদীর আদরের কন্যা। অপূর্ব্ব সুন্দরী, দেখে মনে হ'ত যেন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী দুধপাথর খুদে এক জীবন্ত নারী-প্রতিমা সৃষ্টি ক'রেছেন। চাইলে আর চোখ ফির্‌তো না। এমন সুন্দরী আর গুণবতীর বরের অভাব হয় না। মানাসেসের সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়ে গেল।

কিন্তু কিছুদিন যেত না যেতে যুডীথ বিধবা হ'ল। মানাসেস অনেক ধনদৌলৎ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে সতীর তৃপ্তি হবে কেন? যুডীথ স্বামীর শোকে সন্ন্যাসিনীর মতো হ'ল।

নিরাভরণা, উপবাস-ক্ষীণা, রুক্ষকেশ, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জিত। এমনি ক'রে যুভীথের দিনের পর দিন কাট্‌ছিল।

কিন্তু সেদিন ভোরের আলোয় চোখ মেল্‌তে সবাই অবাক্ হ'রে দেখলো, যুভীথ যেন আর সে যুভীথ নেই। কি একটা আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তির আলোকে যেন তাঁর এতদিনকার জমাট-বাঁধা অন্ধকার দূর হয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

যুভীথ সমস্ত দিন আনন্দ ক'রে কাটালো। সন্ধ্যার দিকে সর্দ্দারকে ডেকে দুজনে অনেকক্ষণ ব'সে কি পরামর্শ হ'ল। সর্দ্দার চলে গেলেন। যুভীথ, তখন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ডেকে বল্‌লো, আমায় সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাওতো।

পরিচারিকা ভাবলো ঠাট্টা। অতি মাত্রায় অবাক্ হ'য়ে সে যুভীথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

যুভীথ হেসে ব'ললো, হাঁ করে চেয়ে আছ কি? তোরঙ্গ খুলে আমার ভালো জামা কাপড় গয়নাপত্তর যা কিছু সব নিয়ে এস। আমি আজ অভিসারে যাব।

পরিচারিকা আর কোন কথা না ব'লে আদেশমত জিনিসপত্র এনে যুভীথকে সুন্দর ক'রে সাজাতে বস্‌লো। চুল আঁচড়ে, রেশ্‌মী কাপড় পরিয়ে, গায়ে গন্ধ বিলেপন মাল্যাদি দিয়ে সাজানো যখন শেষ ক'র্‌লো, তখন যেন মনে হ'ল বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সাগর মন্থন ক'রে সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর উদ্ভব হ'য়েছে।

পরিচারিকা যুভীথের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে ব'ল্‌লো, সাজানোতো হ'ল, এবার কোথায়, কাকে ভোলাতে যাবে মা?

যুভীথ ব'ল্‌লো, তাতো দেখবেই, তোমায়ও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

হাঁ, ভালো কথা দিন চার-পাঁচের উপযুক্ত খাবার সঙ্গে নাও।

নিচ্ছি।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই আঁধার রাতের বুক চিরে আগে আগে চ'ললেন যুভীথ। আর তার পিছন পিছন কৌতূহলী পরিচারিকা। দুজনে পাহাড়ী পথ বেয়ে তর্ তর্ করে নামতে লাগলেন। নগরসীমান্তে পৌঁছামাত্র নগররক্ষী দ্বার খুলে দিল। যুভীথ বাইরে শত্রুদের ছাউনির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

আঁধার রাতে পল্লীতে আগুন লাগলে যেন চারিদিকে একটা সন্ত্রস্ত কোলাহলের সাড়া প'ড়ে যায়। যুভীথের মতো এমন অপূর্ব্ব সুন্দরীকে এমন সময় তাদের আড্ডায় দেখে সৈন্যদের মধ্যেও তেমনি কোলাহলের সাড়া পড়ে গেল। সবাই এসে ভীড় ক'রে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। যুভীথের চারিদিকে হাজার শ্যেন দৃষ্টি।

কিন্তু যুভীথ সে দিকে দৃক্‌পাতও ক'র্‌লো না। পরম নিশ্চিন্তভাবে বল্‌লো, তোমাদের সেনাপতিমশাই কোথায়?

সৈন্যদের মধ্যে একজন বল্‌লো, কেন, তাঁর কাছে তোমার কি দরকার ? তুমি কে ?

যুডীথ ধীরকণ্ঠে বললে, আমি একজন হিব্রু নারী। আর এই আমার পরিচারিকা। বিনা সৈন্যক্ষয়ে ইহুদীদেব দেশজয় করার ফন্দি আমি জানি।

সৈন্যগণ কোলাহল করে উঠল, কি। কি ফন্দি ?

যুডীথ তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, সে সেনাপতি ছাড়া আর কাউকে তো ব'ল্‌ব না।

অগত্যা যুডীথ আর তার পবিচারিকাকে সেনাপতির শিবিরেব কাছে হাজির করা হ'ল।

সেনাপতি মশাই তখন মণি-মাণিক্য-খচিত চাঁদোয়ার তলে কৌচে গা ঢেলে দিযে আরাম করছিলেন। আরামে বাধা পেযে তিনি চেঁচিযে উঠলেন, আঃ, দুপুবরাতেও যে একটু চোখ বুজব, তার জোটি নেই। কি। কি হযেছে ?

আজ্ঞে হুজুর, আপনার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে

কি ? একজন লোক এযেছে ? দেখা কবার আর সময খুঁজে পাযনি। দে ব্যাটার মুণ্ডুটা উড়িয়ে।

আজ্ঞে, হুজুর, তিনি ব্যাটা নয়। তিনি স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক ?

সেনাপতি একলাফে কৌচ হ'তে উঠে পড়লেন। স্ত্রীলোক ব্যাপারে কোনদিনই তার অরুচি, অনাদর বা সময় অসময ছিল না। চাঁদির বাতিটা হাতে তিনি তাঁবুর বাইবে এলেন। একঝলক আলোক এসে যুডীথের মুখে পড়লো। যুডীথ সেনাপতির মুখেব দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সেনাপতির হাত থেকে চাঁদির প্রদীপটা খ'সে গেল। এমন সুন্দরী সেনাপতি জীবনে দেখেন নি। একি মানবী ? না, দেবকন্যা ?

বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ ক'বে সেনাপতি ব'ললেন, কি চাই তোমার ?

যুডীথ নিজের একটা পরিচয় দিযে ব'ল্‌লো, দূর থেকে আপনার বহু সুখ্যাতি শুনেছি সেনাপতি। আপনার জ্ঞান, শিক্ষা, বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল—কোনটা রেখে কোন্‌টার প্রশংসা ক'রব।

সেনাপতি একেবারে গ'লে যাবাব মতো হ'যে বললেন, তা তা আমাব মধ্যে গুণ এমন আর কি আছে। ইহুদীদের জব্দ করতে পারলে তবু যা হক কিছু হত।

যুডীথ এক পল দেরি না কবে বলে উঠলো, যদি ? সে কি সেনাপতি মশাই, আপনার আবার যদি কি ? যদি কি, আপনি নিশ্চয় পারবেন ইহুদীদেব জব্দ ক'রতে।

কই এতদিন বসে ও তো ব্যাটাদের কিছু করা গেল না।

যুডীথ গম্ভীরভাবে ব'ললে, কিন্তু কোন কিছু করা গেল না, তার কারণ খুঁজেছেন ?

না।

আমি এর কারণ জানি।

জানো ?

হাঁ। তাই ব'লতেই তো আসা।

সেনাপতি গুপ্ত রহস্যটা শুনবার আশায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ব'ললেন, বলো, বলো।

যুডীথ বললেন, দেখুন সেনাপতি, আপনারা যত বড বীরই হ'ন না কেন, ইহুদীরা যতদিন সদাচার রক্ষণ করে চ'লবে ততদিন তাদের কেশস্পর্শও ক'রতে পারবেন না। কারণ ধর্ম্মই ততদিন ওদের রক্ষা করবে। আপনি খোঁজ রাখুন, কখন ওরা অনাচারে লিপ্ত হয।

সেনাপতি বললেন, তুমি তো ব'ললে, খোঁজ রাখুন, কিন্তু ব্যাপারটা কি পর্য্যন্ত শক্ত একবার বোঝ দেখি। ইহুদী ধর্ম্মে কোনটা সদাচার, কোন্‌টা অনাচার, তা আমরা কি করে জানি। তা ছাড়া ওদের ভেতরে এমন বিশ্বাসী গুপ্তচর বা কোথায় পাই ?

যুডীথ বললো, সেনাপতি যদি হুকুম করেন তো আমি কাজটা ক'রে দিতে পারি।

সেনাপতি ব'ললেন, কিন্তু তোমাকে তো ভালো বোঝা গেল না। তুমি ইহুদী নারী হ'যে কেন এতো রাতে শত্রু শিবিরে এলে। আমাদের গুপ্তরহস্য বলায কি তোমার লাভ ? কি তোমার উদ্দেশ্য ?

আমার লাভ ? আমার উদ্দেশ্য ? যুডীথের চোখে আগুন ফুটে উঠলো, কিন্তু দেখতে না দেখতে তা পরিণত হ'ল কুটিল হাস্যে। সেনাপতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে যুডীথ বললো, সেনাপতি, কেউ যদি আপনার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, ইহলোকের সর্ব্বোত্তম রত্ন লুণ্ঠন করে নিতে আসে, কি দণ্ড আপনি তার বিধান করেন ?

মুণ্ডচ্ছেদ ?

আমিও তাই করব সেনাপতি। নগরের কেউ আমায সাহায্য করতে পারবে না। তাই তো বেরিযে এসেছি বুকে প্রতিহিংসার আগুন নিযে।

ও ঃ ... সেনাপতি ভাবলেন, এ নারী অপূর্ব্ব সুন্দরী ব'লে নগরে নিশ্চযই এর উপর অত্যাচার হ'যেছে, আর নগরবাসীরা কেউ একে সাহায্য করে নি ব'লে প্রতিহিংসার জ্বালায শত্রু-শিবিরে এসে আশ্রয নিযেছে। তা মন্দ কি। একঢিলে দুপাখী মারা যাবে। সুন্দরীলাভ এবং ইহুদী জয। তোফা। ব'ললেন, সুন্দরী তা'হলে আমাদের শিবিরেই থাক্‌ছতো ?

যুডীথ বললো, হাঁ, আপাততঃ তো আছি। দরকারমতো শহরে ঢুকে আবশ্যক সংবাদাদি নিযে আসবো।

তখন সেনাপতির হুকুমে সুন্দর একটি তাঁবু ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারপর এলো রাশি রাশি খাবার।

যুডীথ সে খাবার স্পর্শও করলে না। তাদের নিজেদের আনা খাবারই যথেষ্ট ছিল।

পরিচারিকা ব'ললো, মা, তোমার উদ্দেশ্য তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

যুডীথ জবাব দিল, ক্রমে সব বুঝবে।

ছয়

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল।

সেনাপতি যুডীথকে দেখে পাগল। যুডীথকে না পেলে জীবনই বৃথা। সঙ্গীরা ব'ললে, তারজন্য চিন্তা কি সেনাপতি? ওতো আপনার হাতের মুঠোয়। আজ রাত্রে বেশ বড় রকমের একটা ভোজ দিন। তাতে বিশেষ ক'রে যুডীথের নেমন্তন্ন থাক্'ব। যুডীথকে একা ঘরে পেয়ে আপনি আপনার কথা ব্যক্ত ক'রবেন। ও নিশ্চয়ই এ প্রস্তাব লুফে নেবে।

তদনুসারে সেই রাতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হ'ল। যুডীথ সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্লো। এই সুযোগই যেন এতদিন সে খুঁজছিল। আজ তার কার্য্যসিদ্ধির লগ্ন উপস্থিত একান্তে ব'সে সে দেবতা চরণে প্রার্থনা জানা'লো, হে ঠাকুর, তুমি এতোকাল নারীর রূপকে করেছিলে শুধু লালসার সামগ্রী অথবা প্রশংসার বস্তু। আজ তা'কে শাণিত কৃপাণে পরিণত কর, আজ তাকে প্রতিহিংসার হলাহলে রূপান্তরিত কর। দেশকে শত্রুর হাত হ'তে মুক্ত করবার জন্য আমার এ রূপ নিয়ে খেলা, আমার এ প্রেমের অভিনয়—এর জন্য তুমি নারীর রূপকে অভিশপ্ত ক'র না ঠাকুর তুমি আজ আমার রূপকে লক্ষগুণে বর্দ্ধিত কর।

প্রার্থনা শেষ করে যুডীথ অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হ'ল। তারপর পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে উৎসব-ক্ষেত্রে সেনাপতির কক্ষে উপস্থিত হ'ল।

সেনাপতির স্ফূর্ত্তিতে সেদিন জোয়ার ডাক্‌লো। মদদাত্রী স্বয়ং মনমোহিনী যুডীথ। কাজেই পানের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল। পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ হচ্ছে। শেষে এমন হ'ল যে আর মাথা তোলবার শক্তি নেই। সেনাপতি শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। ঘরে তখন যুডীথ একা। গভীর রাত্রি।

যুডীথ সচকিত হ'য়ে দাঁড়ালো। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু—তাকে ধ্বংস করার এইতো উপযুক্ত সময়।

ক্ষিপ্রহস্তে বসনের তল হ'তে একখানা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ছোরা বের ক'রে দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে একবার ঈশ্বরের নাম নিল, তারপর সেই ছুরি সজোরে সেনাপতির গলায় বসিয়ে দিল। শির স্কন্ধচ্যুত হ'ল, সেনাপতি একবার হাঁ-হুঁ করবারও অবসর পেলেন না, যুডীথের হাতের ছোরা রক্তে রঙীন্ হ'য়ে উঠ্‌লো।

পরিচারিকা এতক্ষণ বাইরে ব'সেছিল। যুডীথের আহ্বানে ভিতরে এসেই স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। যুডীথ বিনা বাক্যে স্থির অকম্পিত হস্তে সেনাপতির মুণ্ডটাধরে পরিচারিকার থলিতে ভ'রে দিল। পরিচারিকা ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

যুডীথ বল্‌লো, চলো, এখনই আমাদের নগরে ফিরতে হবে।

দুজনে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো। কেউ তাদের বাধা দিল না, কারণ তেমন হুকুম ছিল না। অন্ধকার ভেদ ক'রে দুজনে এসে নগর তোরণের কাছে দাঁড়ালো। তোরণ খুলে

গেল। যুডীথ সেনাপতির মুণ্ডটা নগর সীমান্তে ঝুলিয়ে রেখে খুব জোরে রণভেরীতে ঘা দিলো। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মতো হাজার হাজার বীর ইহুদী যুবক অস্ত্রহাতে ছুটে এলো। আবার নগর তোরণ খুলে গেলো।

'সেই ছুরি সজোরে সেনাপতির গলায় বসিয়ে দিলে'

আসিরীয় সৈন্যরা এসবের কিছুই টের পায়নি। টের পেল যখন চারিদিকে উদ্যতদণ্ড ইহুদী সৈন্য। সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, সেনাপতি কোথায়? সেনা-পতি কোথায়? সেনাপতির তাঁবুতে দলে দলে সৈন্য ছুটে গেল। গিয়ে দেখে সেনা পতির ধড়টা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সৈন্যেরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হ'যে পড়্‌লো। সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত হ'যে যে যে দিকে পারে ছুটে পালালো।

পরদিন যখন পূবের আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো, দেখা গেল, প্রান্তর আসিরীয় সৈন্যের শবে পূর্ণ। একটি জীবিত আসিরীয় সৈন্যও সেখানে সেই।

বীর নারী যুডীথের কীর্ত্তি ইহুদীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে উঠ্‌লো, জগতে এই বোধ হয় প্রথম দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌লো, নারীর রূপ এবং নারীর বুদ্ধি।

ওয়ার্দ্ধা ভ্রমণ

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

(৩)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শেওগাঁয গান্ধী আশ্রমের পাশেই হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘেব প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্র। ওযার্দ্ধা শিক্ষা প্রণালী অনুসাবে মৌলিক শিক্ষা প্রচারেব জন্য যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছে, তাবই নাম হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ। এখানে সংঘেব প্রধান আফিস ও একটি আদর্শ স্কুল আছে। সংঘেব সম্পাদক শ্রীযুক্ত আর্য্যনাযকম্ সস্ত্রীক এখানেই থাকেন। তিনি নিজে সিংহল-বাসী—বোলপুব শান্তি-নিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র। তাঁব পত্নী শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী, অধ্যাপক ফণিভূষণ অধীকারী মহাশয়ের কন্যা—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয ও বোলপুব শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী। এঁরা উভয়েই সংঘের কাজ-কর্ম্মকে জীবনের ব্রত কবে নিযেছেন।

গান্ধী আশ্রম থেকে বেরিযে আমরা সংঘের আফিসে গেলাম। সেখানে আশাদেবী খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা কবে বসালেন ও সেখানকার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সব কথা আমাদের বুঝিয়ে বললেন। এই শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব হচ্ছে একটা কোনো শিল্পকে কেন্দ্র করে' শিক্ষার ব্যবস্থা। হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ একটা বিরাট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ কবেছে। তারা চায, সমগ্র দেশের সাত বৎসর হ'তে চৌদ্দ বৎসর বয়সেব ছেলে মেযেদেব এই মৌলিক শিক্ষা প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত করে' তুলবে। এই উদ্দেশ্যে তাদেব পক্ষ থেকে একটা দেশ জোড়া প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রণালীতে সত্যিকাব শিক্ষা কতটা হবে, সে সম্বন্ধে কোনো অভিমত প্রকাশ করা আমার পক্ষে এখনও সম্ভব নয। তবে যা দেখলাম, তাতে আমার ভালই লাগল। আশাদেবী আমাদিগকে তাদের আদর্শ স্কুল দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছেলেদেব অসঙ্কোচ সহজ ব্যবহার, হর্ষোৎফুল্ল কথাবার্ত্তা শিক্ষকের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীযতা—আমাব ভারি চমৎকার লেগেছে। দেখে বুঝলাম—এদের শিশুমন সহজ অনুসন্ধিৎসু তাজা মনই রযেছে—শাসনেব চাপে আধমরা হযে যায়্‌নি। আমরা যেতেই মাষ্টার মহাশয ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন:—

"বল দেখি, এরা কারা? কোন্ জাতেব লোক?" সবাই আমাদেব পানে চেয়ে রইল।

মাষ্টার—"তোমাদের আশা দিদি যা, এঁরাও তাই। আশা দিদি কি?"

উত্তর (অনেকে একসঙ্গে)—"আশাদিদি বাঙ্গালী।"

মাষ্টার—"এঁরা কি?"

"বাঙ্গালী"

মাষ্টার—"বাঙ্গালীর বিশেষত্ব কি?"

ছেলেরা আমাদের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বলল—"লম্বা কাপড় পরা।"

আর একজন বলল—"খালি মাথা।"

মাষ্টার—"হঁ্যা—খালি মাথা—এইটেই বটে বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব। বাঙ্গালীরা মাথায় টুপী কিম্বা পাগড়ী—কিছুই পরে না। আচ্ছা, বল দেখি, এঁরা কোন ভাষায় কথা বলেন?"

কেউই কিছু বলতে পারলে না।

মাষ্টার—"তোমরা কি জাত?"

"মহারাষ্ট্রী।"

মাষ্টার—"তোমরা কোন ভাষায় কথা বল?"

"মারাঠী ভাষায়"

মাষ্টার—"বাঙ্গালী কোন ভাষায় কথা বলে?"

"বাঙ্গালী ভাষায়।"

মাষ্টার—"হাঁ, বাংলা ভাষায়। বাঙ্গালী হ'ল জাতের নাম। তাদের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা।"

ছেলেরা হাতের তকলীতে সুতো কাটছিল—সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চালাচ্ছিল নিঃসঙ্কোচে। আমাদের সাধারণ পাঠশালায় যেমন দেখা যায়, ছেলেদের কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব—যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় অপ্রীতিকর কাজ করে যাচ্ছে, নেহাত না করলে নয় বলেই তেমন ভাবটা এদের দেখলে মনে হয় না।

মহাত্মাজীর সঙ্গে যে দিন আমাদের কথাবার্ত্তা হয়, তার পরের দিন আমরা কংগ্রেস-সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের জাতীয় দাবী কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদের লিখিত অভিমত আমরা রাজেন্দ্র প্রসাদের হাতে দেই এবং তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যাতে তা ওয়ার্কিং কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। সেটা ছিল ইংরেজীতে লেখা। তার বাঙ্গালা অনুবাদে যা দাঁড়ায়, তা এই :—

(১) যেহেতু কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের ভোটের জোরে মোট এগারটা প্রদেশের মধ্যে আটটা প্রদেশে নিজেদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব কায়েম করতে পেরেছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যে সমগ্র দেশের প্রতিভূ হিসেবে কথা বলবার অধিকারী।

(২) লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব ও হরিপুরা কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব—এই দুই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইংরাজের সঙ্গে একটা সন্ধির দাবী কংগ্রেসের এখনই করা উচিত। এই সন্ধির এক পক্ষ ইংরেজ ও অপর পক্ষ হবে কংগ্রেস। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা আমাদের নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা বলে' তার মীমাংসা কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসার পরে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের রূপ ও গঠন স্থিরীকৃত

হবে দেশের সর্ব্ব সাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লি (Constituent Assembly) দ্বারা।

(৪) প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটি দ্বারা সমগ্র দেশ পরিব্যাপ্ত। এই প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করে' কনষ্টিটিউযেন্ট অ্যাসেম্‌ব্লি গড়ে তুল্‌তে হবে। তবে এই উদ্দেশ্যে এই কমিটিগুলি ১৮ বছর ও তদূর্দ্ধ বয়সের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের ভোটে নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। এইভাবে নির্ব্বাচিত প্রাইমারী কমিটিই হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতীয় গভর্ণমেন্টের বাস্তবিক ক্ষুদ্রতম রূপ (Nucleus of the Government in future)।

রাজেন্দ্র প্রসাদ কাগজটা হাতে নিযে পড়লেন। তারপরে লিখিত বিষয়টা বিশদ করে' বুঝাবার জন্য আমরা বললাম—

"ইংরাজ স্বেচ্ছায আমাদের দাবী মেনে নেবে কিনা এবং না নিলে কোন্ পন্থায আমাদের দাবীর পরিপূরণ সম্ভব হতে পাবে, সেটা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের দাবীর সত্যিকার স্বরূপটা যে কি, তা আমাদের ভাল করে বোঝা ও দেশের লোককে বোঝান দরকার। আসল কথা হচ্ছে—পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসার পরেই কনষ্টিটীউযেন্ট অ্যাসেমব্লি ডাকার ব্যবস্থা এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। সমগ্র দেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস, তার চেষ্টায তার হাতেই আসবে পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং তারপরে সেই কংগ্রেসই ডাকবে কনষ্টিটিউ-য়েন্ট অ্যাসেমব্লি। আর, কংগ্রেসের প্রাইমারী কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটিগুলি যদি সেই ইউনিয়নের সমস্ত পূর্ণ বযস্ক জন সংখ্যা (স্ত্রী-পুরুষ) দ্বারা নির্ব্বাচিত হয, তবে কংগ্রেসটাই তখন হয়ে দাঁড়াবে সত্যিকার কন্‌ষ্টিটিউযেন্ট অ্যাসেমব্লি।"

কংগ্রেসের হাতে কেমন করে পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আসবে—মহাত্মাজীর পন্থায, তার নেতৃত্বে তা সম্ভবপর কিনা—এসব কথা আমরা রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করিনি। কংগ্রেসে আজও গান্ধী নেতৃত্বই চলছে—আজও কংগ্রেসের অধিকাংশ লোক (majority) গান্ধীজীকে নেতার আসনে না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখে। কাজেই গান্ধী নেতৃত্বে যা সম্ভব তা ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনাও আজ কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব—বিশেষতঃ এই পরিপূর্ণ সঙ্কটের দিনে। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ—গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের সভ্য হযে গান্ধীবাদ ছাড়া অন্য কিছু বলতেই পারেন না। অথচ আমাদের বিবেচনায় গান্ধীবাদে, গান্ধীজীর পন্থায, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব। এরূপ অবস্থায স্বাধীনতা লাভের পন্থা নিযে রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওযা একেবারেই নিরর্থক। তাই তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমরা কোনো আলোচনা করিনি। আমাদের মতে—কংগ্রেসে যারা বর্ত্তমানে অধিকাংশের সমর্থন পাচ্ছে, লক্ষ্য ঠিক রেখে তারা তাদের পন্থায এগিয়ে যাক্। তাদের পন্থার অযৌক্তিকতা ও ব্যর্থতা যখন অধিকাংশ লোকে বুঝবে, তখন আসবে আমাদের নব নেতৃত্ব কায়েম করার ও নূতন পথে আমাদের প্রচেষ্টা পরিচালিত করার দিন। তবে ইতিমধ্যে সুযোগ সুবিধা মত বর্ত্তমান নেতৃত্বের অসম্পূর্ণতা দেশের লোককে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন—"হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে ইংরেজরা তো রাজি হবে না।"

আমরা বললাম—"তারা তো রাজি হবেনা তাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে। তারা যাতে রাজি হবে, তাতেই কি মিটবে এ সমস্যা? মিটবে না। আমরা যদি সবলতার সঙ্গে আমাদের দাবী নিয়ে শক্ত হয়ে না দাঁড়াই, তবে এ সমস্যা কখনই মিটবে না। আমরা মনে করি, গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মাজী সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিটীর সভাপতি হয়ে ও বিলেতে বসে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে রাজি হযে মস্ত ভুল করেছেন। বলা উচিত ছিল, "এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার—আমরা দেশে বসে নিজেরা নিজেদের ভিতরে যেমন করে' হোক, মিটিয়ে নেব। কি ভাবে কেমন করে করবো তা নিয়ে ইংরেজের মাথা ব্যথার প্রযোজন নেই। তাদের সঙ্গে এ বিষয়টা নিযে আলোচনা করতে, কিম্বা তাদের হাতে এটা ছেডে দিতে আমবা একেবারেই রাজী নই।" এই কথা বলে তখন যদি মহাত্মাজী শক্ত হয়ে থাকতেন, তবে আজ অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াত। আজ যখন বিপদে পড়ে ইংরাজেরা কংগ্রেসকে ডাকার প্রযোজন বোধ করছে, তখন ডাকার পুর্ব্বেই এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিযে তবে কংগ্রেসকে ডাকত। ভুল যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন অন্ততঃ এই ভাবের স্পষ্ট দাবী নিয়ে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়ান দরকার।"

রাজেন্দ্র প্রসাদ এ সম্বন্ধে আব কোনো আলোচনার মধ্যে এলেন না। আমরা তখন বাংলা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি কি স্থির করলেন, তা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—"ওযার্কিং কমিটির মতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির গৃহীত প্রস্তাবের ভাষা নিতান্ত আপত্তিজনক হয়েছে। আর তাদের যে প্রস্তাব অনুসাবে প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি রূপে সুভাষবাবুর বদলে আর কাউকে নির্ব্বাচিত করা হবে না বলে' স্থির হযেছে, তা নাকচ করে' দিযে আর কাউকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করে নিতে আদেশ দেওয়া হবে।"

এই কথা বলেই তিনি আবার বলতে লাগলেন—"সুভাষবাবুও এসেছিলেন আমায় এই কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি তাঁকেও এই জবাবই দিয়েছিলাম। তাতে তিনি বললেন যে, 'বঙ্গীয প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটি আমাকেই আবার সভাপতি করতে চেয়েছিল। আমি তখন অনেক বলে' কয়ে তাদের থামিযে রেখেছি। তখন তারা সভাপতির আসন খালি রাখবে বলে স্থির করে। এখন যদি ওয়ার্কিং কমিটি এই আদেশ দেয, যা আপনি বলছেন, তবে আর তাদের থামিয়ে বাখা যাবেনা—তারা নিশ্চয়ই আমাকেই আবার সভাপতি নির্ব্বাচিত করবে।' আমি বললাম—'ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ অমান্য করে' যদি তারা তা-ই করে, তবে তো প্রাদেশিক কমিটিই disciplinary action—এর (শাস্তিমূলক ব্যবস্থার) মধ্যে পড়ে যাবে!' সুভাষবাবু বললেন—'সে ক্ষেত্রে নূতন করে' বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হ'তে পারবে কি না, সে কথা ভেবে দেখেছেন? বাংলাদেশে এমন কে আছে, যে তা পারবে? পারবেনা কেউ। তবু যদি কমিটি হয়, তবে সে কমিটি নামে মাত্রই কমিটি থাকবে এবং যারা করবে, তাদের আর এর পরে

লোকের সমক্ষে বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে না—ঘরের কোণে লুকিয়েই থাকতে হবে।' আমি বললাম—'In that case Bengal will be out of the picture. No help' (তার ফলে বাংলা আর কোনো কাজের মধ্যেই থাকবে না। এই হবে আর কি !)"

রাজেন্দ্রবাবুর কথা শুনে আমরা বুঝলাম যে, বড় বড় কথা বলে সুভাষবাবু খানিকটা মুখের বড়াই করে গেলেন—চেষ্টা করলেন যদি ধমক দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা নিজের সুবিধা মত কাজ করিয়ে নিতে পারেন। শুনছি সুভাষবাবু নাকি বলে থাকেন যে Bluffing is politics, তারই খানিকটা নমুনা দেখালেন আর কি। আমরা বললাম—"ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেছে—দেখা যাক, এখন সুভাষবাবুই বা কি করেন এবং বাংলা দেশেরই বা কি অবস্থা হয়।"

পরে যা ঘটেছে, তাতে তো দেখতে পাচ্ছি, সভাপতি সুভাষবাবু হন নি—অন্য লোকেই হয়েছেন। এমন কি, সুভাষবাবুকে সভাপতি করার কিছুমাত্র চেষ্টা হয়েছে বলেও জানা যায়নি।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না। তাই সেখানে কি আলোচনা হয়েছে তা-ও আমরা জানিনে। তবে দুচারটে কথা, যা গাল-গল্প হিসেবে লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল, তার কিছু কিছু আমাদের কানেও এসেছে। একটা কথা বিশেষ ভাবে চলন হয়েছিল যে "এক কদম তো বাংলাইযে"। ব্যাপারটা এই :—

সুভাষবাবুর মতামত শুনবার জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি তাকে ডেকেছিল। তিনি উপস্থিত হয়ে প্রথমেই বললেন—"ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আমরা এই প্রস্তাব পাশ করেছি যে ওয়ার্কিং কমিটি যদি যুদ্ধে বাধাদান নীতি গ্রহণ করে' সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা না করে, তবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আমরা তা করব।"

এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত একজন দেশ-পূজ্য নেতা নাকি বলেছিলেন—

"কি ? ধমক (ultimatum) ? আমরা দেশের চারদিক থেকে এখানে এসে মিলিত হয়েছি সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে' বর্ত্তমান সঙ্কটে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে। আর তুমি এসেছ ধমক দিয়ে সবাইকে দিয়ে তোমার খুশী মত কাজ করিয়ে নিতে ? এর চেয়ে অবভ্যতা (vulgar) আর কিছু হতে পারে না।"

সুভাষবাবু এ কথার জবাব না দিয়ে নাকি বলেছিলেন, "দুঃসাহসিক এমন একটা কিছু করতে চাই যা দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়ে যাবে"।

এর জবাবে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি নাকি বলেছেন :—

I believe, we have travelled for away from romantic politics. (আমার বিশ্বাস আমরা ভাবপ্রবণ রাজনীতির যুগ অনেক পেছনে ফেলে এসেছি।

তারপরে একজন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর সুভাষবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন :—

"আপনারা যে সত্যাগ্রহ করতে চান, কিভাবে করবেন? আপনাদের plan and programme কি?"

সুভাষবাবু নাকি বলেছিলেন—তা আমরা এখনও ভাবিনি। পরে একটা কিছু ঠিক করে নেওয়া যাবে।

এই কথাব জবাবে নাকি সুভাষবাবুকে সেই কথাটা বলা হয়েছিল—"এক কদম তো বাৎলাইযে" (কেবলমাত্র একটা পদক্ষেপ-ই না হয বলুন)।

যেদিন ওযার্কিং কমিটিব অধিবেশন শেষ হয, সেদিনই সকাল বেলা আমরা ওয়ার্দ্ধা থেকে চলে আসি। কলের গাড়ী গড়িযে গড়িযে চললো কলকাতা অভিমুখে—আর আমরা গাড়িতে বেঞ্চের উপর চিৎপাত হযে শুযে ভাবতে লাগলাম, নিজেরা কোন্দল কবে' স্বাধীনতার সোজা পথ কি চমৎকার তৈরী হযে উঠছে।

সমাপ্ত

সৈন্যদের চা-প্রীতি

সৈন্যদের মধ্যে চায়ের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—এখন চা যুদ্ধক্ষেত্রেব একটী অনিবার্য্য পানীয় বলে' গণ্য হয়। গত মহাযুদ্ধেব সময় চা কত কাজ দিয়েছিল তা যাবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে তাদের সকলেরই মনে আছে। চায়েবই সাহায্যে সৈন্যরা অমানুষিক কষ্টেব সম্মুখীন হতে পেরেছিল। সে সময়ে সৈন্য-ভর্ত্তি কোন ট্রেণ যখনই কোন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই দলে দলে কোমলপ্রাণ মেয়েরা তাদের গরম চা এনে খেতে দিয়েছে।

আজকাল অল্ডারসটে সৈন্যরা শিক্ষিত হচ্ছে। ওখানকার আইন মতই সৈন্যদের পাঁচবাব কি ছ'বার চা দেওয়া হয়। এর উপর তারা আবার চা কিনেও খায়। প্রথম আসে এদের ভোর বেলাকাব চা আব বিস্কুট, তারপর সকালের খাবারের সঙ্গে চা, বেলা এগারোটার সময় আবার চা আসে, তারপর বিকেলের খাবারের সঙ্গে চা। এর পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট এদের বিশ্রাম, সে সময়ে অনেকে ক্যান্টিন্-এ গিয়ে চা কিনে খায়। পৌনে পাঁচটার সময় আবার সৈন্যদের চা আসে, আবার রাত্রির খাবাবের সঙ্গে চা দেওয়া হয়।

এরপর সৈন্যদের আর কোন কাজ নেই। কেউ কেউ সহরে গিয়ে সিনেমা দেখে আর চা খায়, কেউ কেউ ক্যান্টিন্-এ গিয়ে ডার্ট খেলে আর চা খায়, কেউ বা বিলিয়ার্ড খেলে আর চা খায়, কেউ বা শুধু চা খেয়েই সময় কাটায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বাধীনতার সাধনা

অধ্যাপক—শ্রীপ্রভাষ চন্দ্র ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাব মধ্যে যে ভাবধারা বহিযা চলিযাছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদে‹ ধারণাটিকে সুস্পষ্ট করিযা লইবাব সময আসিযাছে, বহুবৎসব ধরিযাই রচনাগুলির অনেক সমালোচনাই হইয়া আসিযাছে, বাবংবাব তাহাদের বিষযে সাধাবণেব মতামতেব অনেক পরিবর্ত্তন হইযা গেল, এখনও এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, হযতবা সকল সমযেই থাকিবে। কিন্তু আমবা সাধারণ পাঠকেরা, রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির অধ্যযন কালে কি অনুভব করি, কি বুঝিতে পারি, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব, ধারাবাহিকভাবে এই লেখাগুলির সহিত অন্তবেব পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে বহুদিনেব সাধনার প্রযোজন, আমাদেব এই চেষ্টার মধ্যে কত না অসম্পুর্ণতা, কত না ব্যর্থতা আসিয়া পড়ে, কতদিনে যে এই চেষ্টায অন্তত আংশিক সাফল্যও পাইব তাহাও জানি না, এ বিষযে আমরা পূর্ব্বে কিছু চেষ্টা করিয়াছি, এখানে সেই আলোচনা হইতেও কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথেব রচনাগুলি সম্বন্ধে একটি কথা প্রথমেই বলিযা বাখিতে হইবে, এগুলির সকলেরই সহিত প্রত্যেকের যোগ এবং প্রত্যেকেরই সহিত সমগ্রের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান, কবিব নিজের লেখায় তাঁহার কাব্য প্রবন্ধাদির বিষযে যে আলোক সম্পাত হইযাছে এখানে বিশেষ করিয়া তাহাই আমাদের অবলম্বন, তিনি নিজেই এই কথাটি বুঝাইযা দিয়াছেন, “বঙ্গভাষার লেখক” গ্রন্থে তিনি লিখিযাছেন, “বিশ্ববিধির একটা নিযম এই দেখিতেছি যে যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে সব কবিযা দেয না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয না যে, সে একটা সোপান পবম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইযা দেয যে, সে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয যে ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য,—এমনি তাহার সৌন্দর্য্য—এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্য মাত্র, সে কথা গোপনে থাকে—বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সে-ই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিযা তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এম্‌নি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলেব চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পবিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।”

“কাব্য রচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই, অন্ততঃ আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটাকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই

যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি এসম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি যে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র,—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারাও চেনেনা।· ··জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ— তাহাব সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতা কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যেব মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকুল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙ্গাচোরাকেও তিনি নিয়ত গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বাবে সে সীমাছিন্ন কবিযা দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনাদ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিযা দিতেছেন।”

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই আমরা এই মুক্তির সাধনার ইতিহাসেরই বিভিন্ন অধ্যায় দেখিতে পাই। ‘প্রকৃতিব প্রতিশোধ’ নামক নাট্য কাব্যটির আলোচনায তিনি নিজেই একথা স্পষ্ট করিযা দিয়াছেন। “ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইযাই অসীম, প্রেমকে লইযাই মুক্তি। প্রেমের আলোচনা যখনই পাই তখনি সেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আমাব মনেব মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমবা আপনাকে ভুলিয়া যাই।· আমার ত মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওযা যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনেব পালা। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতল স্পর্শ গভীরতাকে এক কণাব মধ্যে সংহত করিযা দেখাইতেছে-- ইহা লইযা আলোচনা করা হইযাছে। তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোন মূল্য আছে কি না, এবং কাব্য হিসাবে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” এব স্থান কি তাহা জানিনা—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে একটিমাত্র আইডিযা অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিযাছে।” (জীবন-স্মৃতি ১৩২৮ সাল)

স্বাধীনতার আকর্ষণই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। সকলপ্রকাব অধীনতা সবরকমের বন্ধন হইতেই তিনি আশৈশব মুক্তি কামনা করিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে সেই সময়ের বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি এবং আমাদের সাহিত্যের অবস্থার কথা ভাল করিয়া বুঝিযা লইতে হইবে। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের পরিবারের ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ছবিটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার চেষ্টা করা উচিত। কবির নিজের ভাষাতেই ইহার খানিকটা পরিচয় দিতেছি। তাঁহার শৈশবে আমাদের জাতির ইতিহাসে একটা অবাস্তব মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনার যুগ চলিতেছিল, বায়রণই ছিলেন সেই সময়ের আদর্শ; আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্ম্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপটা প্রবেশ করিতেই পায় না—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ, সমাজের, কর্ম্মক্ষেত্রের এই

অবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন সাধন সে সময়ে কাহারও লক্ষ্য ছিলনা, সে সময়ের বংলাদেশের অশুচি, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সমাজ ও জাতির জীবন, সাহিত্য ও নৈতিক আদর্শ সবই কলুষিত হইয়া গিয়াছিল, মানুষের চিত্তের আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য কোনও আগ্রহই ছিলনা, সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার দিকেও কোনও ঝোঁক দেখা দেয় নাই। বায়রণের কবিতা এবং তাঁহার জীবনের প্রতি সেই সময়ের বাঙ্গালী যুবকদের অন্ধ আকর্ষণের প্রকৃত ব্যাখ্যাও এখানেই পাওয়া যায়। আমাদের সমাজ হইতে সে সময়ে সকল রকম প্রকৃত স্বাধীনতাই ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছিল; কতকটা বা নিজেদের দোষে, কতকটা বা সময়ের প্রভাবে আর বেশীর ভাগ পশ্চিমের দৃষ্টান্তে আমাদের নিজস্ব সকল কিছুই যে দূষিত হইয়া পড়িতেছিল, "যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবল মধ্যাহ্ন তন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে।"

"বাঙ্গালী জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে তখন একটা মৃদু আরামের, একটা অত্যন্ত কোমল সুখের আকাঙ্ক্ষার আভাস দেখা দিয়াছিল, সেই আরামের বন্ধনটাকে ছিন্ন করিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য আত্ম-নিবেদনের ভাব খুব কমই ছিল।

"মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহা সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্য ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানব চরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না।" অথচ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় কেবল এই অবস্থাই ছিল। "দেশের পরিচয়হীনও সেবাবিমুখ দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" অথচ শিক্ষিতমণ্ডলীর সকলেই যেন "একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পলোকে" বাস করিতেন। "মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ।" আমাদের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে একটা ধারকরা মানসিক বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়াছিল, ইহারও মধ্যে ছিল একটা বিলাস। সত্য সন্ধানের তপস্যা বা দেশসেবার পরিপূর্ণ আয়োজনের বিশেষ কিছুই দেখা যায় নাই। বরং সেই সময় হইতে আমাদের দেশ জাতি ও সমাজের পরাধীনতার বন্ধন ক্রমশঃ আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিতেছে—এ কেবল বিদেশীর সৃষ্ট শৃঙ্খল নয়, ইহার মধ্যে আরো বেশী তীব্র বন্ধন-দুঃখ আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করিয়া লইয়াছি ও লইতেছি। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে সমগ্র মানব সমাজে দুই এক দেশ ব্যতীত কোথাও প্রকৃত স্বাধীনতা ছিলও না, এখনও নাই, তবে এখানে কেবল আমাদের নিজেদেরই অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

মনের ও আত্মার স্বাধীনতাই কবির সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য; স্বাধীন মনের স্বাধীন আনন্দই

তাহার জীবন ও রচনা উভয়কেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা, অনুরাগের দৃষ্টিতে যখন আমরা সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পাই তখনই প্রকৃত মুক্তিলাভ করি। এই সত্যটিই তাঁহার লেখায় প্রকাশ পাইযাছে। আর এই সত্যের অভিজ্ঞতাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার উৎস। বিশেষ করিযা 'প্রভাত সঙ্গীতে'র কবিতাগুলির মধ্যেই এই স্বাধীনতা প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে কবি এই সমযের ইতিহাস দিযাছেন, "জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম।—এমন সমযে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কি উলট-পালট হইয়া গেল। —সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিযা শেষ হইযাছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী স্কুলেব বাগানেব গাছ দেখা যায। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয হইতেছিল। চাহিযা থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখেব উপব হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিযা গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তবঙ্গিত।—সেই দিনই 'নির্ঝরেব স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসাবিত হইযা বহিয়া চালিল।"

এই ভাবে কবির হৃদযে স্তরে স্তবে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ কবিযা তাঁহার অন্তরে বিশ্বেব আলোক বিচ্ছুরিত হইযা পডিল। সমস্ত দুর্ব্বহ ভার দূর হইয়া গেল। পরিপূর্ণ মুক্তির অমৃতধারা স্পর্শে তাঁহার জীবনেব নির্ঝরধাবা নৃত্য কবিতে করিতে ছুটিযা চলিল, অনন্ত বিশ্বেব সহিত তাঁহাব আপন প্রাণের প্রেমের মিলনে সমস্ত বাহিরের বাধা ভাঙ্গিযা গেল—

জাগিয়া দেখিনু চারিদিকে মোব
পাষাণে রচিত কাবাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধারে বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন
চারিদিকে তার বাঁধন কেন
ভাঙ্গরে হৃদয় ভাঙ্গরে বাঁধন
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর,—

অহো কি মহান সুখ অনন্ত হইতে হারা
মিশাতে অনন্ত প্রাণে অনন্ত প্রাণের ধারা। (প্রভাত সঙ্গীত)

কবির সমস্ত রচনাতেই এই অনন্ত প্রাণেরই জয় গান। কবি নিজেই একথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। "আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল—সকালে

জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবন আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতন করিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নআকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইযা উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মাযাপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব অসম্ভবের সীমানা ছাডাইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেবো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনেব প্রথম উন্মেষে হৃদয আপনার খোরাকের দাবী করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইযা গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিযা ঘিরিযা নিজের মধ্যেই নিজের আবর্ত্তন সুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদযটার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙ্গিযা গেল, নিজেব চিরদিনের যে সহজ অধিকাব হারাইলাম সন্ধ্যা সঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে বহিযাছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বাব জানিনা কোন্ ধাক্কায হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইযাছিলাম, তাহাকে পাইলাম আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশী পাওযা গেল।”

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্তেব গতি নির্ণয করিতে হইলে প্রভাত সঙ্গীতের কবিতাগুলিই আমার প্রধান সহায, অবশ্য তাহাবই সহিত পাঠ কবিতে হইবে এই সমযেবই লেখা আর একটি এখন অতি দুষ্প্রাপ্য গদ্যগ্রন্থে “আলোচনা”য, এই গ্রন্থ হইতেই ববীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্টভাবে পাওযা যাইবে। ভাব রাজ্যে আমাদের অন্তরেব অনুরাগ কি ভাবে আমাদিগকে অনন্ত স্বাধীনতাব মধ্যে লইযা যায তাহার বিষযে এই গ্রন্থে কবি বলিতেছেন, যখন একজন ভাবুক একটি গোলাপ ফুল দেখেন “তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুবায না, যদিও সে ফুলটী দেড ইঞ্চি অপেক্ষা আযত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীবতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না, তথাপি হৃদযের প্রেম তাহাকে যতই দাওনা কেন, তাহার ধাবণ করিবার স্থান আছে। সে আবো তোমাকে এমন নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায, সেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীযতার মধ্যে হারাইযা যাইতে হয। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মত হৃদযের মধ্যে শুনিতে পাওযা যায যে সকলেরই মধ্যে অসীম আছে, যাহাকেই তুমি ভালবাসিবে সে-ই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইযা যাইবে, সে-ই তোমাকে তাহার অসাম দান করিবে।· যেখানে অনুরাগ নাই সেইখানেই সীমা, সেইখানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার। জগতকে যে ভালবাসিতে শিখে নাই স ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আটকা পডিযাছে। ··সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যেব কিরণ বিকীরিত হয়।”

প্রভাত সঙ্গীতে স্বপ্ন ভঙ্গের নির্ঝর চারিদিকে যে কারাগার দেখিতে পাইয়াছিল, এই সেই কারাগার, বিশ্বের প্রতি অনুরাগেই সে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করে। “আলোচনা” গদ্যগ্রন্থে কবি এই কথাটা বলিতেছেন, “অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে

পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারিনা, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ বোধ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ একমাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। ..পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহার অসীম বিস্তারে প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহাব মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদযের বিচরণ ক্ষেত্র অতি বৃহৎ হৃদযের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই।... ...সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে; একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পাবে, বিশ্বচরাচরের মহা সমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেম সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার নূন্যাধিক স্বাদ পাওযা যায।"

ক্রমশঃ

সমাজের কয়েকটী সত্যিকারের ছবি

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

ঐ কয়েক মাসের স্মৃতি নাড়াচাড়া কবলে আর একজনকে বড্ড বেশী মনে পড়ে, সে হচ্ছে ঐ গ্রামের চাববছরের একটি ছেলে ধীরু।

একদিন দুপুরে সামনের বারান্দায বসে আছি, এমন সময দেখি কার মিষ্টি গলায কে বলে উঠল "আমাকে দুটো চাল দেবে?" গাযে তার জামা নেই, হাতে একটি মাটিব থালা। মনে মনে বিরক্ত হ'লাম, এই ছোটবেলা থেকেই বাবা মা একে ভিক্ষে করতে শেখাচ্ছে? চাল না দিযে থালায মুড়ি দিলাম, বল্লাম, "ঐখানে বসে খাও।" দেখলাম, একগাল হেসে সে মুড়ি খেতে বসে গেল। পাশে ঐ গ্রামেরই এক ঝি ছিল। তার কাছে যা শুনলাম তা এই। ওর বাবা ছিল ঐ গ্রামেরই পিয়ন, হঠাৎ অসুখ হয়ে মারা যাওয়ার পর ওর মা চলে গেছে কার সঙ্গে নদীর ওপারে ঐ গ্রামে। তাবপর সেই মা'র উদ্দেশ্যে ঝি যত পারে গালাগালি করল অনেকক্ষণ ধরে। এমন মিষ্টি ছেলে ফেলে মা চলে গেল কেমন করে ভেবে পেলাম না। তারপর দিন থেকে দেখি সকালে মুড়ির জন্য, ভাত খাবার সময় ভাতের জন্য ধীরু এসে হাজির হয়। পিসির বাড়ী থাকে, সে খেতে দিতে চায়না, আমার বাড়ী আসতে শিখিযে দিয়েছে। পিসি খেতে দেবে কি, সে নিজেই খেতে পায়না, তার ছেলেমেয়েরা খেতে পায়না। স্বামী অথর্ব্ব হয়ে পড়ে রয়েছে, সে ইঞ্জিনের কয়লা

থেকে কয়লা বেচে দু'চার পয়সা রোজগার করে। তার কিছুদিন পরে দেখি ধীরু আমার বন্দী-জীবনের মস্ত বড় সঙ্গী। সকালে বিকেলে তার হাত ধরে বেড়াতে যাই, তাকে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। 'দিদি' বলে ডাকত, আর সব ছেলেমেয়ের চেয়ে তার দাবীটা যে সবচেয়ে বেশী সেকথা সবাইকেই জানিয়ে দিত। অন্য কোনও ছেলের হাত ধরে বেড়াতে গেলে মাটিতে বসে পড়ত কিছুতেই সে যাবে না।

একদিন আমার কাছে একটী গ্রামের বৌ এসে গল্প করতে লাগল, খানিক পরে তার আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম, সে ছিল ধীরুর মা-বাবা যে বাড়ীতে থাকত ঠিক তার পাশের ঘরে। তার কাছে শুনলাম, ধীরুর বাবা তার মাকে বড্ড বেশী মারত, এখনও নাকি তার শরীরে সে সব মারের চিহ্ন দেখতে চাইলে দেখতে পাওয়া যাবে। কোনও দিন সেই ধীরুর মা'র মুখে কেউ হাসি দেখতে পায়নি। তারপর হঠাৎ হ'ল তার স্বামীর মৃত্যু। যে সংসারে তার কোনওদিন সুখ হয়নি সে সংসারের ওপর তার মায়াও পড়েনি। কাজেই ছেলে নিয়ে চলে গেছে নদীর ওপারে আবার নূতন করে সংসার পাততে—কিছু সুখের আশায়। তার কিছুদিন পরে ধীরুর পিসি মিথ্যে বলে ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে আর ফিরিয়ে দেয়নি। বলে পাঠিয়েছে, ধীরুর মা আর যদি এই গ্রামে কোনওদিন আসে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরবে না ইত্যাদি। গ্রামের অন্যরাও তাকে সে কাজে সাহায্য করবে বলেছে। যে কেউ ঐ গ্রামে যায় তাকেই ধীরুর মা হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বলে তার ছেলেকে দিয়ে আসতে। ঐ পাশের বাড়ীর বৌকে বলেছে সে ঠিক নদীর ওপারে বসে থাকবে, সকালবেলায় ধীরুকে যেন দিয়ে আসি আমি। সে নাকি জানতে পেরেছে ধীরুকে আমি ভালবাসি। বলে পাঠালুম চেষ্টা করব।

আমার পক্ষে কিন্তু যাওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ সেটা নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাইরে। আর ধীরুকে না পাওয়া গেলে সবাই আমাকেই সন্দেহ করবে, অত বড় যে দোষী তাকে সাহায্য করলেও আমাকে গ্রামবাসীরা একঘরে করে তুলবে। তাদের এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে—প্রকাণ্ড অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কার সাধ্য? সেই পিসির সবচেয়ে বড় সমর্থক গ্রামের ছোট খাট এক জমিদার। তাঁর সম্বন্ধে এত কথা কানে শোনা যেত যে তা আর না লেখাই ভালো! নৈতিক জীবনের মাপকাঠিতে যার স্থান অনেক নীচে সেই বোধ হয় অন্যের দোষ গুণের বিচারক হ'তে বেশী ভালবাসে। কি করা উচিত এই রকম যখন ভাবছি তখন একদিন সকালে ধীরু এল কাঁদতে কাঁদতে, তার পা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। খানিকবাদে দেখি—অন্য গ্রামের এক জমিদার এসে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করলেন, জমিদার গৃহিণী সামনে খৈ এর সঙ্গে পয়সাছড়াতে ছড়াতে আসছিল, দুপাশে দু'জন তাঁকে বাতাস করতে করতে আসছে। ভিখারীদের দেখাদেখি ধীরুও পয়সা কুড়োতে গেছে, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। পরিশ্রান্ত জমিদার গৃহিণীর পরিচর্য্যায় সবাই এত ব্যস্ত যে কে পড়ে গেল বা আহত হ'ল তা দেখাবার তাদের অবসর নেই। তারপর দিন সকালে ধীরু এল না, অনেক বেলায় ভাত খেতে এল, ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। তার পিসতুত ভাই কোন ডোবায় মাছ

ধরছিল, সেও তার সঙ্গে ডুবে ছিল, খুব ছোট ছোট মাছ নিয়ে এসেছে আমার জন্য। আমার কাছে এসে—ওর জন্য যে জামা তৈরী করেছিলাম সেইটা পরত। —বাড়ী যাবার সময় খুলে নিতাম। তার আগে অনেক জামা সে হারিয়ে আসত, বলত খুলে রাখলেই কে নিয়ে নেয়। অনভ্যস্ত বলে বেশীক্ষণ জামা গায়ে থাকত না। সে দিন বল্ল জামা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আগের মত কে নিয়ে নেবে বলে দিলাম না—"বিকেলে এলে পরিয়ে দেব।" বিকেল বেলা সময় মত এল না দেখে তার বাড়ীতে খুঁজতে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ীতে অন্য কেউ নেই, অন্ধকার ঘরে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরে নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে ক'বার ডাকার পর 'দিদি' বলে হেসে একবারটি ডাকল। সন্ধ্যা হওয়াতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। রাত্রে ঝিকে দিয়ে বার্লি পাঠাতে, সে ফিরে এসে বল্ল "মুখ দিয়ে ফ্যানা উঠছে, খাবে কি দিদিমণি।" রাতে বের হ'তে পারলাম না, আইন অমান্যর অপরাধে পড়ে যাই। ছোট ভাই ডাক্তার দেখিয়ে আনল। সকালে খোঁজ নিয়ে শুনলাম রাত্রেই ধীরু চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না—একবার দেখতে গেলাম, দিদি বলে আর ডাকল না। ফিরে এসে ওর জামাগুলি পাঠিয়ে দিলাম, বল্লাম, "ঐগুলিও যেন ওর সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়।" তার কিছুদিন পরে নদীর ধারে বেড়াতে গেছি, ঝি দেখাল সেই ছোট খাটখানা যাতে করে ধীরুকে নিয়ে গিয়েছিল। ওরই কাছে নাকি তাকে পুঁতে রেখে গেছে। হঠাৎ মনে হয় ওর মা হয়তো এখনও নদীর ওপারে অপেক্ষা করছে তার ছেলেকে পৌঁছে দেব এই আশায়। কিম্বা লোকের মুখে হয়তো খবরটা তার কানেও পৌঁছে গেছে। ভাবলাম হ'লই বা একটি ছেলের অকাল মৃত্যু অযত্নে—অনাদরে—তবুও সমাজের শাসনবিধি ঠিক রইল। তার কাছে মা'র চোখের জলের কতটুকুই বা মূল্য।

দেশী বীমা কোম্পানীর উন্নতি

দেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে যে বছর শেষ হয়েছে এদের সেই বছরের রিপোর্ট দেখে আমরা খুসী হয়েছি। কোম্পানী তাদের ব্যবসায়ের সুনাম বজায় রেখে দিন দিন উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে দেখে দেশবাসী মাত্রই গৌরব বোধ করবে।

আলোচ্য বছরে কোম্পানীর মোট ৩১৪২৬৯০০৲ টাকার নূতন কাজ হয়েছে, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে ৭১৫৭৭০৲ টাকার বেশী কাজ হয়েছে। প্রিমিয়াম আয় আগের চেয়ে বর্দ্ধিত হয়েছে। লাইফ ফাণ্ড ২৯০০০০০৲ উনত্রিশ লক্ষ টাকা বেশী হয়েছে। বোনাস ও দাবী পরিশোধিত হয়েছে মোট ২৫১৮২৩১৲ টাকা। খরচের হার আরও শতকরা ১৲ এক টাকা কমেছে। কোম্পানীর বর্ত্তমান খরচের হার শতকরা ২৮·৯৲ টাকা মাত্র। কোম্পানীর সিকিউরিটি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়েছে, যার ফলে নতুন বীমা আইন অনুসারে প্রয়োজনানুরূপ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই করা হয়েছে।

আমরা এই দেশী প্রতিষ্ঠানের দিন দিন উন্নতি ও সুনাম কামনা করি।

বিপ্লবী ফ্রান্স

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

রাজার আন্তরিক সমর্থন এবং অভিজাতগণেব যথার্থ স্বদেশ প্রেম থাকিলে জাতীয় পরিষদ ফ্রান্সের স্থায়ীপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত। মিরাবো এই সময়েব প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবার মত বাজনীতিক প্রতিভা ও সুস্পষ্ট ধাবণা তাঁহার ছিল। ইংল্যাণ্ডের ক্যাবিনেট শাসন-প্রণালীব ত্রুটীবিচ্যুতি সম্বন্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন না। ব্যাপকভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন কবিয়া ব্রিটিশ শাসন প্রণালীব দোষ ত্রুটী পরিহার বা সংশোধন কবিবাব ফ্রান্সের উপযোগী বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন কবিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যেব জন্য জনসাধারণগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হয়। নেতার দায়িত্বজ্ঞান, আদর্শ নিষ্ঠা ও সাধুতা না থাকিলে এই সুকঠিন কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিরবোব চরিত্রের দৃঢ়তা ছিলো না। মন্ত্রিত্বলাভের বাসনা তাঁহার সুমহান উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিযাছিল। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যুতে ফ্রান্স একজন গঠন প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীকে হারাইল এবং সম্রাটের সহিত জাতীয় পবিষদের আন্তরিক সহযোগ স্থাপনের শেষ আশা ও সুযোগ অন্তর্হিত হইল।

সম্রাটের পার্শ্বচরগণ মিরাবোর পরিকল্পনায সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দেশেব ভালমন্দ কিসে হইবে, তাহা তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থসিদ্ধি। জাতীয় পরিষদকে কোন বকমে অচল করিয়া তুলিতে পাবিলে তাহাদের নষ্ট স্বর্গরাজ্য পুনরায ফিরিয়া আসিবে, সনাতন পদ্ধতিব শুষ্ক কঙ্কালে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ মনোভাবেব সহিত তাহারা কার্য্য করিতে ছিল। তাহাদেব পবামর্শ অনুসাবে সম্রাট প্যাবিস্ ত্যাগ কবিলেন কিন্তু ভারিনিস্ নামক স্থানে ধৃত হইলেন। বিপুল জনতার সহিত তিনি প্যারিসে পুনবায় প্রবেশ করিলেন। সম্রাটকে কডা পাহাবা দিয়া বাখিবাব ব্যবস্থা হইল। পবিষদ রাজদ্রোহিতা কঠোর ভাবে দমন করিতে ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের পলায়নের জন্য লোকের মনে একটা অবিশ্বাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সুযোগে জেকোবিন ও অর্লিযেনিষ্ট দলের প্রগতিপন্থীগণ রাজতন্ত্র.শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ করিয়া খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঘোষণা করিল.রোবস্পীয়র, ডান্টন, ম্যারাট্ প্রভৃতি বামপন্থীগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন

জেকোবিন দল এই যুগের ফ্রান্সে স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত ছিলেন। ফ্রান্সের জনমনে যে বৈপ্লবিক ভাব উদ্বোধিত হইয়াছিল, তাহা এই সর্ব্বস্বহীন স্বদেশপ্রেমিক তরুণদলের অন্তরে পরিমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিত্ত বা সম্পত্তি বলিয়া কিছুই ছিল না। কোনরূপ স্বার্থের আকর্ষণ তাহাদের স্বাধীন চিন্তার প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। লাফেট ও মিরাবো প্রচলিত শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তরুণ বয়সে লাফেট স্বেচ্ছাসেবক হইয়া আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, মিরাবো স্বয়ং অভিজাতবংশীয় ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের বিত্তশালী অভিজাত-গণের প্রভাবে তাঁহার মন এমন আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তিনি ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্রকে ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রেব আদর্শে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আরাস্ হইতে সমাগত ক্ষুরধার বুদ্ধি দরিদ্র ব্যবহারজীব রোবস্পীররের তরুণ মনের উপর রুশোব মতবাদের ছাপ গভীব ভাবে পড়িয়াছিল। রুশোর আদর্শকে তিনি জাতীয জীবন-বেদের পুণ্যমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিযাছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী ডাণ্টন প্যারিসের একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার ব্যবহারজীব ছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার জ্বালাময় আবেগে শ্রোতৃবর্গের মন অভিভূত হইত। ম্যাবাট ইহাদের অপেক্ষা বযসে প্রবীণ ছিলেন। সুইস্ বংশে তাঁহার জন্ম হইযাছিল। বৈজ্ঞানিক বলিযা তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিযাছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কযেক বৎসব ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত করিযা তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায প্রকাশ কবিয়াছিলেন, বেঞ্জামিন, ফ্রাঙ্কলিন ও গেটের ন্যায চিন্তাশীল মনীষিগণও তাঁহার পদার্থবিজ্ঞান বিষযক আলোচনায় আকৃষ্ট হইযাছিলেন। বৈপ্লবিক যুগে ফ্রান্সেব রাজনৈতিক আকাশে ম্যারাট একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায শোভা পাইতেছিলেন। বিপ্লবের প্রেরণায তাঁহাব লেখনী শক্তিশালী হইযাছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁহার মন ঐশ্বর্য্যশালী হইযাছিল। বৈপ্লবিক নীতিতে তাঁহাব আস্থা গভীর ছিল, দারিদ্র্য তাঁহাব মনেব শুভ্রতাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। দুবারোগ্য চর্ম্মরোগ তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কবিযা তাঁহার শেষ জীবনকে দুর্ব্বহ ও শোচনীয় করিযাছিল।

জেকোবিন দলের নেতাগণ উগ্র আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁহাদেব মতে বিপ্লব অভিব্যক্তির আধুনিকতম ধারা। বিচাব বুদ্ধির আলোকে যে নীতি তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট, তাহাকে চিন্তায ও কর্ম্মে বর্জ্জন করাকে তাঁহাবা আত্মহত্যার সমান ভাবিতেন, তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অনুভূতি ও চিন্তা বৈপ্লবিক নীতির সমর্থনে নিযুক্ত হইযাছিল। যাহা প্রাচীন তাহা বর্জ্জনীয়, বিপ্লববাদের এই চরম যুক্তি তাঁহাদের জীবনের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতায পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই বিত্তহীন, অভিজাত্য-হীন নিঃস্ব স্বদেশ সেবকদের স্বচ্ছ মনেব গতিবেগ দুর্ব্বার শক্তিতে বিপ্লবের স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিল, নিপীড়িত নরনারীর বেদনার ছবি তাঁহাদেব লেখনীমুখে বা বক্তৃতায় মর্ম্মস্পর্শী রূপ পাইয়াছিল। স্বাধীনতা ও সাম্যের একনিষ্ঠ সেবাই তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহাদের দেশপ্রীতির আদর্শ উচ্চ ও সুমহান ছিল, বিশ্বমানবতার আহ্বানে তাঁহাদের মানবতা সময়ে সমযে ক্ষুণ্ণ হইলেও, অনুভূতিব আতিশয্যে তাঁহাদেব অনুসৃত পন্থা কখন কখন কঠোর হইলেও, তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা ও দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীব স্বাধীনতা অর্জ্জনের ইতিহাসে বিরল।

রুশোর দার্শনিক মতবাদের প্রেরণায় তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে মানুষের স্বভাবের মধ্যে বর্ব্বরতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, পৃথিবীতে পশুর প্রভুত্ব মানবতার আদর্শকে নিত্য অপমানিত করিতেছে। এই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কবল হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে হইলে আইনের উদ্ধত মহিমাকে খর্ব্ব করিতে হয়। মানুষের মনে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান জাগাইয়া তুলিতে হয়, ব্যাপকভাবে

তুনিয়ার ব্যবস্থা করিয়া সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন করিতে হয়, উদারতা, মৈত্রী ও ভালবাসার মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করিতে হয়, ইহাই মানুষের সুখ ও স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায।

যখন আমরা ভুলিযা যাই যে আমাদেব সেবাব বস্তু রাষ্ট্র নয, পরিবার—বিশ্বজগতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত মানব-পরিবার, তখনই আমবা আত্মহত্যা করি। আমাদেব মনে রাখিতে হইবে যে সেই পরিবারই শ্রেষ্ঠ যে পবিবাবেব অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে সহজ স্বতঃস্ফুরিত আনন্দ আস্বাদন করে, সুখকব কর্ম্মে তাহার অন্তর্নিহিত সংগঠনী শক্তির উদ্বোধন হয়, স্বাধীন প্রেম সম্পর্কে তাহার উর্দ্ধতন হয় এবং জীবনের আনন্দ হইতে ঈর্ষাব মূল উৎপাটিত হইযা তাহা বিকশিত, স্ফুরিত ও অভিব্যক্ত হয, কলা ও বিজ্ঞানলক্ষ্মীব ঐশ্বর্য্য সম্পদে ও সৃজনী প্রতিভায়।

অষ্টাদশ শতকে গণতন্ত্রের যে সকল মূল আমেরিকায কার্য্যকরী হইযাছিল, ফ্রান্সে তাহা সম্ভব হয় নাই, ফ্রান্স ও আমেরিকার পবিস্থিতি বিভিন্ন ধরণেব ছিল। আমেরিকাব শ্বেতকায় অধিবাসীগণের মধ্যে সামাজিক সাম্য বর্ত্তমান ছিল। সুতবাং তথায গণতান্ত্রিক নীতি সুফল প্রসব করিযাছিল কিন্তু ফ্রান্সেব জীর্ণ ও শতধা বিছিন্ন সমাজ শবীবে গণতন্ত্র নূতন সত্ত্ব প্রলযঙ্করী মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইযাছিল। প্যাবিসেব জনসাধারণেব অবস্থা শোচনীয হইযাছিল, তাহাদেব শিল্প বিলাসেব বস্তু উৎপাদন কবিত। তাহাদের কর্ম্ম বিলাসী জীবনেব তুর্ব্বলতার উপর নির্ভর কবিত। বিপ্লবের যুগে বিলাসী অভিজাতবর্গ নগর ছাডিযা চলিযা গেল। বিলাস দ্রব্যের পর্য্যটক ক্রেতাগণের গতিবিধি সংযত করিযা দেওযা হইয়াছিল। ব্যবসাযে বিশৃঙ্খলা ঘটিল, এই বৃহৎ নগবী বেকার বুভুক্ষু নরনারীতে পূর্ণ হইযা গেল।

জনমনেব উপর জেকোবিনদেব অপবিসীম প্রভাব, তাহাদেব অনমনীয সাধুতা ও নীতিব দৃঢতা দেখিযাও সম্রাটের পক্ষ সমর্থকারিগণ ভাবিযাছিল যে তাহাবা জেকোবিন দলকে হস্তগত করিযা নিজেদের কাজ উদ্ধাব কবিযা লইবে কিন্তু তাহা হয নাই। নানা জটিল সমস্যা স্বার্থ ও নীতির ঘাত প্রতিঘাতে ফ্রান্সের বাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কোন প্রতিবেশী রাজা তাহাকে আক্রমণ করে নাই। ফ্রান্সের অন্তর্বিরোধেব প্রতিক্রিযা পোলাণ্ডেব উপর পতিত হইযাছিল। ১৭৯১ সালেব প্রুসিয়ার রাজা ও অষ্ট্রীযার সম্রাট পিলানিজ নামক স্থানে সম্মিলিত হইযা এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে ফ্রান্সে শৃঙ্খলা ও বাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাব উপব সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। ফ্রান্সের দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ও রাজকর্ম্মচারীগণ মিলিত হইয়া এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিল এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সীমান্তের উপকণ্ঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

ফ্রান্স 'গায়ে পড়িয়াই' সর্ব্বাগ্রে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। গণতান্ত্রিক দল ভাবিয়াছিল যে ইহাতে বেলজিয়মের সমজাতীয় ও সমভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ অষ্ট্রিয়ার বশ্যতা হইতে মুক্ত হইবে। রাজভক্তগণের মতে ইহাতে রাজমর্য্যদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু মারাট ইহার বিরুদ্ধাচরণ

করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জনসমাজে যে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি উদ্বোধিত হইয়াছিল, তাহা রাজতন্ত্রীগণের প্ররোচনায় আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে নষ্ট হইয়া যায়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই সামরিক নীতির মধ্যে নেপোলিয়নের ভাবী সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল। ১৭৯২ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে সম্রাট পরিষদে আসিয়া যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করিলেন। অপরূপ উত্তেজনা ও উল্লাসের সহিত সদস্যগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনদল ফরাসী সৈন্য বেলজিয়াম প্রবেশ করিল। ইহাদের মধ্যে দুইদল সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল। লাফেটের নেতৃত্বে তৃতীয় দল ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। প্রুসিয়া অষ্ট্রিযার পক্ষ অবলম্বন কবিল। ডিউক অফ্ ব্রুনসউইকের নেতৃত্বে সম্মিলিত যোদ্ধাদল ফ্রান্স আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। ডিউক ঘোষণা করিলেন যে রাজার কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্যই তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই সমর সজ্জা করিতেছেন এবং রাজ-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার প্রচেষ্টা আরও চলিতে থাকিলে, তিনি পরিষদ ও প্যারিস্ উভয়কেই রীতিমত শাস্তি দিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ডিউকের এই হাস্যকর আস্ফালন ফ্রান্সে বিপুল অসন্তোষ, বিক্ষোভ, অন্তর্দ্দাহ সৃষ্টি করিল। এই উদ্ধত ঘোষণায় সকল শ্রেণীর মন নাড়া দিয়া উঠিল। নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ, মধ্যপন্থী, এমন কি রাজতন্ত্রীগণ উগ্র বামপন্থী হইয়া উঠিল।

ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। জেকোবিন বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া গেল। বিদ্রোহীগণ হোটেন ডি ভিলি নামক স্থানে সমবেত হইল। তাহারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। সম্রাট নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুইস্ দেহরক্ষীগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে তিনি রাজপরিবারকে পরিষদের হস্তে সমর্পণ কবিলেন। পরিষদ তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিল। বিদ্রোহীগণ অযথা রক্তপাতে আরও উত্তেজিত হইল ও সুইস্ রক্ষীগণকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

লুইএর মত একজন নির্ব্বোধ ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিকে লইয়া প্রতিনিধি সম্বলিত রাজতন্ত্র করিবার চেষ্টা বৃথা দেখিয়া সম্রাটকে পদচ্যুত ও বন্দী করা হইল। শাসন কার্য্যের ভার একটী সমিতির উপর অর্পণ করিয়া নূতন শাসনব্যবস্থা রচনা করিবার জন্য গণপরিষৎ আহূত হইল। এদিকে মিত্রশক্তির সম্মিলিত সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। একটীর পর একটী দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। তাহাদের অভিযান প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। প্যারিস্ অধিকারের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকগণের বিশ্বাসঘাতকতার নগ্নমূর্ত্তি বিভীষিকার ছায়া বিস্তার করিল। দেশদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ধর পাকড় পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্যারিসের কারাগারগুলি পূর্ণ হইয়া গেল। দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের হত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া মারাট চিন্তিত হইলেন। সাময়িক বিচারালয় স্থাপন করিয়া দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। হত্যার তাণ্ডব চলিতে লাগিল। জঘন্য নৃশংসতার সহিত বন্দীগণকে হত্যা করিয়া

তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড বর্ষাফলকে উত্তোলন করিয়া ক্ষিপ্ত জনতা বিকট উল্লাসে নগবেব ভিতর দিয়া শোভাযাত্রা করিল। রাজকুমারীর ছিন্ন মস্তক বর্ষাফলকে তুলিয়া রাণীকে দেখাইবার জন্য লইয়া গেল।

সে কি নারকীয় দৃশ্য। ক্ষিপ্ত মনুষ্য পশুর দল উদ্যত বর্ষাফলকে শত শত নরনারীর রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড বিদ্ধ কবিয়া দৈত্যের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য কবিতেছে। তাহাদের পদভবে মেদিনী কম্পিত, তাহাদের পৈশাচিক চীৎকারে আকাশ প্রকম্পিত। সভ্যতা ও সংস্কৃতিব কেন্দ্রস্থল—বিলাস ও আনন্দের লীলা নিকেতন প্যারিস্ আজ যেন বক্তপিপাসু রাক্ষসের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

যখন প্যারিসে এই নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন সেনাপতি ডুমোরিজ্ ফ্লাণ্ডারস্ হইতে একটি সৈন্যদল লইযা ভার্ডুনেব নিকট শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি বোধ করিলেন। ভামি নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। প্রুসিযার সৈন্যবাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই পরাজয়ের পব ডিউক অফ্ ব্রুনস্উইক রাইন নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্যাম্পেনেব টক আঙ্গুব খাইযা তাঁহার বহু সৈন্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইযাছিল। ভামির যুদ্ধ সামান্য হইলেও পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা একটি চিরস্মবণীয় ঘটনা। ইহা ফবাসী বিপ্লবের ভাগ্য নির্দ্ধারণ কবিযাছিল।

১৭৯২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বব তারিখে জাতীয গণপবিষদের অধিবেশনে প্রজাতন্ত্র বা রিপাব্লিক ঘোষিত হইল। রাজাব বিচার ও প্রাণদণ্ড হইল। ফ্রান্সেব অবাধ বাজতন্ত্রের সমাধি হইল, তাঁহাকে বলি দেওযা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁহাকে সবাইযা না দিলে ফ্রান্সের বাঁচিবার উপায় ছিল না। অসন্তুষ্ট ক্ষমতাহীন রাজা দেশেব অশান্তি ও অনর্থের মূল, লুই বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে বিদ্রোহ ও অশান্তি দানা বাঁধিযা উঠিত সন্দেহ নাই। তাঁহাকে দেশে বন্দী করিযা বাখিলে ষডযন্ত্রের সৃষ্টি হয, তাঁহাকে ছাডিযা দিলে বিদেশে শত্রুবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার মরণ-বাঁচনের উপর দেশের কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর কবিযাছিল। মারাট্ দৃঢতার সহিত বলিযাছিলেন যে, অপরাধ, ক্রুটী ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহার বিচার কঠোরভাবেই হওযা উচিত কিন্তু প্রচলিত শাসন পদ্ধতি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে তিনি যে অপবাধ করিযাছিলেন, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য কবা চলিবে না। কাবণ তাঁহাব পূর্ব্বে তিনি স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার স্থান আইনের উপবে ছিল। সুতরাং তিনি বেআইনী কাজ করিতে পারেন না। তাঁহার অপরাধের বিচার হইযাছিল। তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন। গিলোটিন যন্ত্রে তাঁহার শিরচ্ছেদন হইল। নরহত্যার এই অভিনব যন্ত্র গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিযাছিলেন। বিপ্লবের গৌরব দৃপ্ত কবি ডানটন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—ইউরোপেব রাজারা আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, একজন রাজার ছিন্নমুণ্ড আমরা তাহাদেব নিকট প্রেবণ করিলাম। ক্রমশঃ

উদ্ভিদের দান

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গুহ বি, এস্-সি।

গাছপালা, সবুজপাতা ও সূর্য্যরশ্মির সহাযতায স্বীয খাদ্য তৈরী ক'রে জীবন ধারণ করে। পাখী ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণী দুর্ব্বল উদ্ভিদ দেহ থেকেই তাদেব খাদ্য আহরণ করে। আবার বাঘ সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী তাদের তীক্ষ্ণ দন্তরাজি দ্বারা খাদ্যের ব্যবস্থা করে। এ বিষয়ে মানুষ সত্যি অপরাপর প্রাণীর কাছে দীন—তাব নখ ও দন্ত শিকাব ধববাব পক্ষে মোটেই অনুকূল নয উপরন্ত গাছপালার ন্যায আহার্য্য তৈরী করবাব ক্ষমতাও প্রকৃতি তাহাকে দেন নাই। কিন্তু প্রকৃতি সবচেযে বড ঐশ্বর্য্যটী দিযেছেন মানুষকে,—যাব বলে আজ মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বেব আসন লাভ করেছে। সে ঐশ্বর্য্য হ'ল তাব সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

ইতব প্রাণীকে প্রকৃতি দযা কবে যেটুকু দিযেছেন তাতেই সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত। সুদূর অতীতে মানবও একদিন কেবলমাত্র আহাব ও নিদ্রার ব্যবস্থাতেই ছিল সন্তুষ্ট,—এর বেশী সুখের কল্পনাও সে তখন করতে পারত না। কিন্তু মানব বুদ্ধিব ক্রমবিকাশেব ফলে বুঝতে পাবল যে মানুষ কেবল পশু পক্ষীর মত আহাব ও নিদ্রার জন্য সৃষ্টি হযনি। জীবন ধাবণেব একটা ধবাবাঁধা গণ্ডিব মধ্যে আলস্যে গা ঢেলে দিলে তাব চলবে না। তার চাই উন্নতি, চাই প্রগতি, পবস্পরেব সুখ সুবিধারও মঙ্গলেব জন্য করবাব মত কাজ অনেক আছে, শুধু বাঁচা মরা ও জীবন ধাবণেব সূক্ষ্ম হিসাব তার কাছে অতি তুচ্ছ কাজ।

মানুষের কাজ অনেক সে কথা ঠিক, কিন্তু এত কাজ ক'রতে গেলে যে প্রভূত শক্তিব প্রয়োজন তাব সন্ধান কে বলে দেবে? এ সমস্যারও মীমাংসা হয় মানুষের বুদ্ধির বলে। মানুষ বুঝতে পারে প্রকৃতি তাঁব অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রযোজনীয সকল জিনিষই সঞ্চয় করে রেখেছেন— মানুষ তা' থেকে তার অভাব দূব কব্‌বে বলে। তাই মানুষের মনে জেগে ওঠে নানা আশা ও কর্ম্ম প্রেরণা। নিত্য নূতন উদ্দমে মানুষ এগিযে চলে সভ্যতার দুর্গমপথে।

কালক্রমে প্রকৃতির সকল গুপ্তরহস্যেরই চরম মীমাংসা ঘটছে অনুসন্ধিৎসু মানবের কাছে। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নিত্য নূতন সম্পদ আহরণ করে মানুষ নিজে যশস্বী হচ্ছে। মানুষ উদ্ভিদের কাছ থেকে শুধু তার নিত্য প্রযোজনীয় খাদ্য পেয়েই সন্তুষ্ট হয়নি—আধুনিক বিজ্ঞানের বলে সে উদ্ভিদেব সহায়তায় আবও কতশত সুখ সুবিধার উদ্ভব করেছে যে সে কথা ভাবলেও মনপ্রাণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

প্রাচীন মানবের অস্ত্র বস্ত্রাদি বৃক্ষদেহ হতে বচিত হ'ত। নব্য সভ্য যুগের জ্বালানী কাঠ গাছেরই সঞ্চিত পদার্থ বিশেষ। বর্ত্তমান সভ্য জগৎ কয়লা ও তেলের বশীভূত বেশী কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ "স্থির করেছেন যে কয়লা, তৈলাদিও বৃক্ষজাত দ্রব্য।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায়, পৃথিবীর বহুস্থানে ছিল গভীর বন। তখন মেদিনীর বুক ছিল ভূমিকম্পপ্রবণ—তাই হয়তো এক প্রবল আলোড়নের ফলে সে গভীর বন ভূগর্ভে আত্মগোপন করে। তারপর সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ভূগর্ভে বায়ুশূন্য স্থানে থেকে সেগুলি ক্রমে ক্রমে কয়লায় পরিণত হয়।

বৈজ্ঞানিক যুগে এই কুৎসিৎ নোংরা কয়লার এত আদর কেন? এর উত্তর এই, কয়লাকে বাদ দিয়ে সভ্য জগৎ চলতে পারে না। সভ্যজগতের নিদর্শনই হচ্ছে কল-কারখানা যান-বাহনাদি এবং কয়লা না হ'লে ঐ সকল পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের দৈনন্দি জীবনেও যে কয়লা অতীব প্রয়োজনীয় একথা হয়তো কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই মনে করিয়ে দিতে হ'বে না।

কয়লাকে ১০০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত ক'রলে "কোল গ্যাস" (coal gas) নামক গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস আলো জ্বালাবার ও ল্যাবরেটারীর কাজে খুবই দরকারী বলে গণ্য। ক'লকাতার গ্যাসের আলো এই "কোল গ্যাস" দিয়েই জ্বালান হয়। শুধু ক'লকাতা নয় পৃথিবীর অনেক মহা-নগরীতেই এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

কয়লা থেকে "কোল গ্যাস" প্রস্তুত কালে "কোক্" (coke), "গ্যাস কার্ব্বন" (gas carbon) এবং "আলকাতরা" পাওয়া যায় এবং এগুলির প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশী। আমরা কয়লা বলে যে জিনিষটি পুড়িয়ে থাকি তাই "কোক্" তারপর "গ্যাস কার্ব্বন" আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে না এলেও বৈদ্যুতিক কার্য্যে ইহা অপরিহার্য্য। কয়লা থেকে পাওয়া জিনিষগুলোর মধ্যে "আলকাতরার" গুণ অনেক।

আলকাতরাকে উত্তপ্ত করলে সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় "বেন্‌জিন" (Benzene) "টলুইন্" (toluene) ইত্যাদি। "বেন্‌জিন" থেকে বর্ত্তমানে "মটর স্পিরিট" (motor spirit) এবং "এনিলিন" (aniline) তৈরী করা হয়। এই "এনিলিনে"র সহায়তায়ই পরিশেষে পাওয়া যায় নানা বর্ণের রং। এই মসিকৃষ্ণ আলকাতরা থেকেই যে মনোহর রং পাওয়া যেতে পারে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এই দুর্গন্ধময় আলকাতরা থেকে যে সুগন্ধি এসেন্স তৈরী হয় একথাই বা কে ভাবতে পারে! এই আলকাতরা থেকেই পাওয়া যায় "ন্যাপথেলিন" (naphthalene) ও চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশী মিষ্টি "স্যাকারিন" (saccharin)। শুধু তাই নয় বৈজ্ঞানিকগণ এ থেকেই তৈরী করেছেন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক "পিকরিক এসিড" (picric acid)। সত্যি এসব কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। আবার আলকাতরা থেকেই সবশেষে পাওয়া যায় "পীচ্" (pitch)—যা দিয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ নগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে নীলের চাষ হত প্রচুর কিন্তু পরদেশী বৈজ্ঞানিক আলকাতরা থেকেই নীল তৈরী করাতে আমাদের দেশের একটী প্রধান শিল্প চিরতরে লোপ পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা থেকে শুধু আলকাতরা এবং আলকাতরাজাত দ্রব্যাদি পেয়েই সন্তুষ্ট হন নি। তাঁরা কয়লা থেকে দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য হীরক প্রস্তুত করে জগৎবাসীকে স্তম্ভিত ও বিস্ময় বিমূঢ় করেছেন।

বর্ত্তমান সভ্যজগতের আব একটী অপরিহার্য্য বস্তু কাগজ। আমরা জানি, "Pen is mightier than the sword" কিন্তু কাগজের অভাবে সেই অসীম শক্তিশালী "Pen" ও অচল। বৈজ্ঞানিকগণ অনেকদিনের অনেক চেষ্টাব পর বৃক্ষদেহ থেকে তার প্রয়োজনীয় কাগজ তৈরী করেছেন। কাগজ তৈরী কবতে হলে কাঠ অথবা বাঁশকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সেদ্ধ করে "মণ্ড" (pulp)-এ পরিণত করা হয। এই মণ্ড পরিষ্কার কবে তাবপর একটী সূক্ষ্ম ছাঁকনি সাহায্যে কাগজে পরিণত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এসব কাজে যথেষ্ট পারদর্শিতার প্রয়োজন, তবে বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে মানুষের সকল কঠিন কাজই সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে, কাজেই কাগজ তৈরী করাও এখন অতি সহজ কাজ। আমাদের দেশে স্থানে স্থানে এখনও কযেক ঘর "কাগজী" পবিবার কাগজ তৈরী ক'রে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ কত কষ্ট করে তালপাতার সাহায্যে লেখাপড়া কবতেন কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে নূতন নূতন সম্পদ অর্জ্জন করে লাভবান হচ্ছেন এবং মানুষেব অনেক দুঃখই দূব করছেন।

উদ্ভিদ বায়ুস্থ "কার্ব্বন ডাই অক্সাইড" (carbon dioxide) গ্রহণ করে এবং সূর্য্যালোকে সবুজপাতার সহাযতায় তা' থেকে তৈবী করে "ষ্টার্চ্চ" (starch) এবং শর্কবা। এই শর্করা পরিশেষে "সেলুলোজ" (cellulose) এ রূপান্তরিত হযে বৃক্ষদেহে সঞ্চিত হয। আমাদেব বস্ত্র বয়নের সূত্র, চলচ্চিত্রেব ফিল্ম এবং অপরাপর ব্যবহার্য্য আসবাব পত্রাদি প্রস্তুতের প্রধান উপাদান "সেলুলয়েড" (celluloid) এ সবই "সেলুলোজ" থেকেই উদ্ভূত। শুধু তাই নয় আধুনিক মনীষিগণ বৃক্ষজাত "সেলুলোজ" এব সাহায্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করে জগৎবাসীকে বিস্মিত করেছেন।

ব্রহ্মদেশ, চীন, এবং জাপানেই বেশমের ব্যবহার সব চেয়ে বেশী। ৩২০০০ রেশম কীটের জীবনের বিনিময়ে শুধু একসেব মাত্র প্রকৃত রেশম পাওযা যায। কাজেই আমরা বেশ বুঝতে পারছি, কৃত্রিম রেশমেব প্রচলন হওযাতে কতগুলি হতভাগ্য জীব নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেযেছে।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত কল্লে কাগজেব মতই "মণ্ড" প্রস্তুত ক'রে তাকে "কার্ব্বন ডাই সাল্‌ফাইড (carbon disulphide) নামক একটী পদার্থে দ্রব কবা হয়। তারপর তাতে "কষ্টিক সোডা" (caustic soda) দিলে চট্‌চটে আঠাল যে পদার্থটী পাওযা যায তাকে বলা হয "ভিস্কোজ" (viscose)। একে রাসাযনিক প্রক্রিযাতে পরিষ্কার কবে যন্ত্র সাহায্যে পাকিয়ে নিলেই সুদৃশ্য রেশম পাওযা যায়।

"সেলুলোজ" থেকে শুধু কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করেই বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নি—তাঁবা এ থেকে ভয়ঙ্কব বিস্ফোরক "গান কটন্" (gun cotton) তৈরী করে শান্তির ক্রোড়ে আশ্রিত জগত-বাসীকে বিপদগ্রস্ত করেছেন।

আজ আমরা দেখছি, বৈজ্ঞানিক বৃক্ষ এবং বৃক্ষজাত দ্রব্যাদি থেকেই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন কবছেন, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছেন এবং করছেন। এরপব যে আরও কতশত অদ্ভুত জিনিষ তাঁরা এই বৃক্ষদেহ থেকে তৈরী করবেন তার ঠিকানা কে জানে?

বর্ত্তমান যুদ্ধ

শ্রীযতীশচন্দ্র ভৌমিক

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি কি এবং তার কি পরিণতি হতে পারে তা বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে যুদ্ধরত ও যুদ্ধে স্বার্থবান শক্তিগুলোব মূলগত স্বার্থ কি এবং সে স্বার্থ সফল করার জন্য তারা কি পলিসি পছন্দ করে ও অনুসরণ কবছে। আমরা জানি বর্ত্তমান কালের আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের মূলে রযেছে প্রধানত অর্থ-নৈতিক কারণ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধ বাইরে রূপ নেয 'Power Politics' এর সংঘর্ষেব মধ্যে দিযে। শান্তি, স্বাধীনতা, ডেমোক্রেসী প্রভৃতি গালভবা বড বড নীতিব অন্তবালে এই 'পাওয়ার পলিটিকস্'এব ক্রিযাই চলছে। যুদ্ধরত ও যুদ্ধে স্বার্থবান শক্তিগুলোর প্রত্যেকেবই উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজে অন্যের বা অন্যদের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হওযা। নাজী জার্ম্মানীর মতলব আমরা জানি নিজের রাজ্য বিস্তার, ইযোরোপে প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও মিত্রশক্তির কাছ থেকে উপনিবেশ আদায করা। কলোনি পাবাব জন্য জার্ম্মানী নরম গবম সব রকমেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইংবেজকে টলাতে পারেনি। ইংরেজ যে জার্ম্মানীকে শান্ত করবার জন্যই চেকোশ্লোভাকিযাকে বলি দিয়েছিল, এটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তার ফল এই হল যে, ইংবেজেব দুর্ব্বলতার সন্ধান পেযে জার্ম্মানীর বিজিগীষা বেড়েই চলল। ইংরেজেব অতীত আচরণ থেকে জার্ম্মানী আশা কবেছিল যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ কবলেও ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত তাব বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাও নামতে পারে। তাব ভয ছিল সেভিযেট রুশিয়াকে। তাই ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিযেট প্যাক্টের ব্যর্থতার সুযোগ নিযে সে যখন সেভিয়েটের সঙ্গে প্যাক্ট করতে সক্ষম হল, তখন সে নিশ্চিন্তে পোল্যাণ্ড আক্রমণ কবল।

ধনতান্ত্রিক ও পুবাণো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফরাসীর স্বার্থ হচ্ছে status quo—অর্থাৎ নিজেদের সামরিক শক্তিবলে তারা এতদিনে যে প্রভাব ও লাভবান সাম্রাজ্য অর্জ্জন করেছে তা'—বক্ষা করা। যুদ্ধে তাবা সহজে লিপ্ত হতে ইচ্ছুক নয। কারণ তাতে তাদের নতুন লাভের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে, কিন্তু সঞ্চিত সম্পত্তি কিছু খোযাবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম চললে,অথবা যুদ্ধে পরাজিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে দেশেব অভ্যন্তরে গোলযোগ দেখা দিতে পারে যার ফলে শাসন শক্তি ধনিকদের হস্তচ্যুত হতে পারে। এই সব বৃহত্তর লোকসানের আশঙ্কায় তারা এতদিন নতুন সাম্রাজ্যবাদী জাপান, ইটালী ও জার্ম্মানীব হাতো অনেক অপমান হজম করে নিযেছে। এবং পরের খরচায় এই নতুন সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তিগুলোর মনোবঞ্জন করবার চেষ্টা করেছে। অনেক দিন ধরে তারা জার্ম্মানীকে দিয়ে সাধাবণ শত্রু বলশেভিক রুশিযাকে দাবিয়ে বাখার আশাও পোষণ করে আসছিল। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। জার্ম্মানীব আক্রমণ নীতি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে তার প্রভুত্ব ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে চলল। অপরদিকে ডেমোক্রেটিক ইংরেজের প্রেস্টিজ ক্রমেই নিম্নগামী

হয়ে চলল, ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি এখন আর ইংরেজ-ফরাসীর ভরসা রাখে না। সাম্রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে mother countryর শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জমে উঠছে। দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ কোলাহল তুলে দিলে : আর এরকম অপমান অসম্মান সহ্য করা চলেনা। রাজশক্তির কর্ণধার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনুধাবন করলেন যে, এখন আর একটু শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে নাজী ও ফ্যাসিষ্টদের প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলবে। ইয়োরোপের মোড়লী ইংরেজ-ফরাসীর হস্তচ্যুত হতে ত বসেছেই পরন্তু ইংরেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তির পর্য্যায়ে নেমে আসবে, এবং তারপর তার সাম্রাজ্যের ওপর বাইরে থেকে আসবে নতুন সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তিগুলোর আক্রমণ এবং ভিতর থেকে উঠবে বিদ্রোহ। অতএব শান্তি, স্বাধীনতা ও ডেমোক্রেসির জন্য যুদ্ধে নামছে এই বলে ইংরেজ ও ফরাসী যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

তারপর সোভিয়েট রুশিয়া। সোভিয়েট রুশিয়া ইংরেজ-জার্ম্মান যুদ্ধে সরাসরি ভাবে লিপ্ত নয়। কিন্তু সে এ যুদ্ধের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েট রুশিয়াই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে ও যুদ্ধ-অন্তে ইয়োরোপ যে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করবে তাতে রুশিয়ার হাত যে অনিবার্য্যরূপে এবং বিশেষরূপেই থাকবে—তাতে সন্দেহ করার বিশেষ অবসর নেই। ইয়োরোপে নাজী-ফ্যাসিষ্ট আক্রমণভীতি যখন ক্রমাগতই বেড়ে চলেছিল তখন সোভিয়েট রুশিয়া সত্যিই বিবেচনা করছিল, ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলে জার্ম্মানীকে বাধা দেবার চেষ্টা করা যায় কিনা। কিন্তু ইংরেজ যখন মাসের পর মাস ধরে তালবাহানা করতে লাগল, তখন রুশিয়া সন্দেহ করতে সুরু করল যে প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি করে নাজী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতলব ইংরেজের নেই, শুধু সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তির ভয় দেখিয়ে জার্ম্মানীকে দলে টানতে চায়। রুশিয়াও এই ডিপ্লোমেটিক যুদ্ধে হার মানলে না। পোল্যাণ্ডের মধ্যদিয়ে সোভিয়েট রুশিয়াকে সৈন্যচালনা করতে দিতে যখন ইংরেজ ও পোল্যাণ্ড রাজী হলনা, তখন রুশিয়া Anti-aggression front গঠনের আশা এবং বোধহয় ইচ্ছাও ত্যাগ করল। অবশ্য নাজী-আক্রমণ ঠেকাবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোকে নিজের প্রভাবাধীনে আনার উদ্দেশ্যও যে রুশিয়ার ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। এবং ইংরেজ ও পোল্যাণ্ড যে শেষ পর্য্যন্ত রুশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট করল না, এও তার অন্যতম কারণ। ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট প্যাক্ট স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানী রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার সুযোগ পেল। এ চুক্তির জন্য জার্ম্মানী অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিল। রুশিয়াও দেখল এই অবস্থায় জার্ম্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে তার লাভই বেশী। ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধলে রুশিয়া কি করবে সে সম্বন্ধে সে আগেই একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল বলে মনে হয়। পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ অধিকার করা, বাল্টিক প্রদেশগুলোকে তার নিয়ন্ত্রাধীনে আনা, বল্কান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা এবং সুবিধা পেলে, মধ্য এসিয়া ও উত্তর চীনে ঢুঁ মারা। জার্ম্মানীর সঙ্গে চুক্তি হওয়ায় রুশিয়া তার পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলো সফল করবার একটু সুযোগ পেয়েছে হয়ত।

জার্ম্মানী যদি রুশিযার সঙ্গে সন্ধি না করেও পোল্যাণ্ড আক্রমণ করত, তা হলেও রুশিয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এখন যা কচ্ছে তাই করবার চেষ্টা করত তাতে সন্দেহ নাই। ক্যাপিটালিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং নাজী জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে দুই পক্ষই দুর্ব্বল হবে, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী যে পরিমাণে দুর্ব্বল হবে সে পরিমাণে সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হবে। অতএব ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুদ্ধ সোভিয়েট রুশিয়ার দিক থেকে মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। রুশিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করেছে বটে কিন্তু নিজে যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ দেবার মতলব নাই। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকলে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেবারও সম্ভাবনা আছে। তাই এটা মনে করা যেতে পারে যে জার্ম্মানী যাতে অল্পদিনের মধ্যে কাবু হয়ে না পড়ে, সে জন্য রুশিয়া প্রয়োজন মত কিছু কিছু যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, তেল ও খাদ্যদ্রব্যাদি জার্ম্মানীকে বিক্রি করতে রাজী থাকবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রুশিয়া কি ভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অনেকখানি সফল হয়েছে তা আমরা জানি। হোয়াইট রাশিয়ান ও উক্রেনিয়ান অধ্যুষিত পোল্যাণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চল অধিকার করে রুশিয়া সেখানে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করছে। এস্টোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া ও লিথুনিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তিদ্বারা উক্ত বাল্টিক প্রদেশগুলোতে নৌ ও বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা এবং সৈন্য মোতায়েন করবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এককথায় রুশিয়া তার পশ্চিম ও বাল্টিক সীমান্তের রক্ষণ ব্যবস্থা অনেকখানি শক্তিশালী করে নিয়েছে; বাল্টিক প্রদেশগুলোর বৈদেশিক নীতি এখন তার হাতের মুঠোয়, বাল্টিক অঞ্চল হতে নাজী প্রভাব উৎখাত করেছে; এবং এটা মনে করা কিছুমাত্র ভুল নয় যে অচির ভবিষ্যতে এই দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার ওপরও সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব এসে পড়বে।

বল্কান অঞ্চলে রুশিয়া এখন পর্য্যন্ত ভাল করে চাপ দেয়নি। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে রুশিয়া এখন বাল্টিক অঞ্চলে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে নিয়ে ব্যস্ত আছে, এবং অপর কারণ তুরস্কের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়নি। বাল্টিক অঞ্চলের ভাগ্যের সঙ্গে তুরস্কের স্বার্থ জড়িত। জার্ম্মানী ও ইটালী বল্কানে চড়াও হলে তুরস্কের ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কি স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। রুশিয়ার থেকেও সে বিপদ আশঙ্কা করে। কিন্তু এত শক্তিশালী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধতা করা সে যুক্তিযুক্ত মনে করেনা। খুব সম্ভব রুশিয়া দাবী করেছিল যে সে বল্কান অঞ্চলে ঢুকলে বা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হলে তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকবে এবং দার্দ্দানেলিসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করতে দিতে পারবেনা। তুরস্ক যদি নিশ্চিন্ত হতে পারত যে বল্কান অঞ্চল আক্রান্ত হবেনা তবে সে রুশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী দার্দ্দানেলিসের মুখ বন্ধ করে দিতে রাজী হত। এদিকে মিত্রশক্তি তুরস্ককে দলে টানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল এবং অবশেষে অনেক সুবিধাজনক সর্ত্ত দিয়ে একটা ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদন করছে।

প্রথমতঃ, তুরস্ককে যদি কোন ইয়োরোপীয় শক্তি আক্রমণ করে তবে এই চুক্তি অনুসারে

বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্ককে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, কোন ইয়োরোপীয় শক্তির আক্রমণমূলক কাজের দরুন যদি ভূমধ্যসাগরে কোন যুদ্ধ বাধে তবে এই ত্রি-শক্তি পরস্পরের সাহায্য করবে। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর আক্রমণে তুরস্কের স্বার্থহানির আশঙ্কা আছে। তৃতীয়ত, রুমানিয়া ও গ্রীসকে যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করতে গিয়ে যদি বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তুরস্ক তাদের সাধ্যমত সাহায্য করবে। কিন্তু তুরস্ক কোন অবস্থাতেই এমন কোন কাজ করতে বাধ্য নয়, যাতে তাকে রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পাবে। সন্ধিব এই সর্ত্ত অনুযায়ী জার্ম্মানী, ইটালী বা বুলগেরিয়া যদি রুমানিয়া বা গ্রীসকে আক্রমণ কবে এবং বৃটেন ও ফ্রান্স যদি তাদের সাহায্যে যুদ্ধে নামে, তবে তুরস্ক তাদেব সাহায্য করবে এবং দার্দ্দানেলিসের মধ্য দিযে মিত্রশক্তির যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করতে দিবে। কিন্তু ধবা যাক্ রুশিযা বেসারাভিয়া দখল করে নেয এবং রুমানিয়া আক্রমণ করল। সে ক্ষেত্রে বৃটেন ও ফ্রান্স রুমানিয়াকে সাহায্যেব জন্য যদি রুশিয়াব বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, তখন তুবস্ক মিত্রশক্তিকে সাহায্য করবেনা। তখন তুরস্ক দার্দ্দানেলিসের পথে মিত্রশক্তির যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করতে নাও দিতে পারে কারণ তাতে তাকে রুশিযার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। অপর পক্ষে রুশিয়া নিজেই যদি দার্দ্দানেলিসের মুখ বন্ধ করবার আযোজন করে, তখনও তুরস্ক কোন বাধা দিতে রাজী না হতে পাবে। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে বৃটেন ও ফ্রান্সেব হিসাবে এই ত্রিশক্তি চুক্তির মূল্য অনেকখানি কমে যায়।

কিছুদিন থেকে মিত্রশক্তি ডিপ্লোমেটিক ক্ষেত্রে পর পর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছিল। এই ত্রিশক্তি চুক্তি তাদেব পক্ষে প্রথম জয় বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, মিত্রশক্তি বনাম রুশিয়ার সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এই ত্রি-শক্তি চুক্তির বিশেষ মূল্য নাই। এবং এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বল্কান অঞ্চলের উপর বর্ত্তমানে জার্ম্মানী বা ইটালী অপেক্ষা রুশিযার চাপই পড়বার সম্ভাবনা বেশী। অপরপক্ষে জার্ম্মানী বা ইটালী যদি বল্কানের ওপর চড়াও হয় তবে রুশিযা যে রুমানিয়ার দিকে অগ্রসর হবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় জার্ম্মানী ও রুশিয়া তুরস্কের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হযেছে। এবং তুরস্ক বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর অসন্তুষ্টিকে ততটা ভয় না করলেও রুশিয়ার অসন্তুষ্টিকে ভয় করে। ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদনেব পরেও তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী সারাজগলু মস্কো গিযে রুশিযার সঙ্গে একটা নতুন চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করছে।

ইটালী এখন পর্য্যন্ত কোন পক্ষে যোগ দেয়নি। ইটালী নতুন সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তি, তাই পুরোণো সাম্রাজ্যবাদীব শক্তির সঙ্গে তার স্বার্থবিরোধ রয়েছে। অপরদিকে জার্ম্মানী ইটালীর রাজনৈতিক মিত্র। কিন্তু কিছুদিন থেকে রোম-বার্লিন-এক্সিস্‌এর অংশীদার হিসেবে জার্ম্মানীই প্রধানত লাভবান হচ্ছিল। জার্ম্মানীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর রাষ্ট্রনীতি ক্রমেই জার্ম্মানীর অধীন হয়ে পড়ছিল। তা ছাড়া বল্কান অঞ্চলের ওপর ইতালীরও লোভ আছে। সেখানেও জার্ম্মানীর সঙ্গে তার স্বার্থ-বিরোধ রয়েছে। তাই ইটালী চায় যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানী ও মিত্রশক্তি দুই পক্ষই দুর্ব্বল হোক। যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দেবার ভয় দেখিয়ে মিত্রশক্তির

কাছে এলজিরিয়া, কর্সিকা, টুনিস্ জিবুতি ও সুয়েজের ওপর অধিকার দাবী করতে পারে। ইংরেজের পরাজয় ব্যতীত ইটালী ভূমধ্যসাগরে একছত্র আধিপত্য অর্জ্জন করতে পারেনা। অপরদিকে জার্ম্মানী বা রুশিয়া যদি বল্কান অঞ্চল আক্রমণ করে, ইটালী সেখানে ভাগ বসাবার চেষ্টা করবে। সেই ক্ষেত্রে মিত্রশক্তি যদি রুমানিয়া ও গ্রীসকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অগ্রসর হয় তবে মিত্রশক্তির সঙ্গে ইটালীর সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতালী জার্ম্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ও চাহেনা। কারণ, তা হলে একদিকে ইংরেজ যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, অপরদিকে সোভিয়েট রুশিয়ার অগ্রগতি অপ্রতিহত বেগে চলতে থাকবে। বল্কান অঞ্চলে সোভিয়েটের প্রবেশ ইটালী চায়না। তা ছাড়া, পরাজিত জার্ম্মানীতে সোভিয়েট তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা ইতালীর পক্ষে খুবই আশঙ্কার কারণ।

রুশিয়া বাল্টিক-অঞ্চল এখনো পূরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়নি। এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করে রুশিয়া তার বাল্টিক প্রোগ্রামের প্রথম অংশ নিষ্পন্ন করেছে। তারপর সে ফিন্ল্যাণ্ডের ওপর চাপ দেয়। রুশিয়ার দাবী ছিল, (১) ফিন্ল্যাণ্ড রুশিয়াকে লেনিন্গ্রাডের প্রান্তবর্ত্তী কিছুটা ফিনিস্রাজ্য ছেড়ে দেবে, তার পরিবর্ত্তে রুশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডকে কেরেলিয়ান অঞ্চলে তার দ্বিগুণের ওপর ভূখণ্ড ছেড়ে দেবে, (২) ফিনল্যাণ্ড রুশিয়াকে ফিন্ল্যাণ্ড উপসাগর ও বাল্টিকে কয়েকটা দ্বীপ এবং আর্টিক সাগরের তীরে নৌ-ঘাঁটি বসাবার জন্য কয়েকটা যায়গা ইজারা দেবে। এবং অন্য কোন শক্তি আলাণ্ড দ্বীপ সুরক্ষিত করার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবেনা এ সর্ত্তে রুশিয়া ফিন্ল্যাণ্ডকে আলাণ্ড দ্বীপ সুরক্ষিত করতে দিতে রাজী আছে। অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট রাজী হয় না। ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করে রুশিয়াকে পূর্ব্বোক্ত অধিকারগুলো দিতে গেলে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও sovereignty ক্ষুণ্ণ হবে। রুশিয়া অবশেষে ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

সোভিয়েট রুশিয়ার পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ অধিকার, বাল্টিক ও বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা, এক কথায় রুশিয়ার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র নীতি সম্প্রতি একটা প্রধান আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সোভিয়েটের শত্রুরা ত রুশিয়ার তীব্র সমালোচনা করছেই, সোভিয়েটের সমর্থক এবং সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বীও অনেকে সোভিয়েটের বর্ত্তমান নীতি সমর্থন করা কঠিন বলে মনে করছে। সাধারণ ভাবে অভিযোগ হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট রুশিয়া এতদিন বড় বড় আদর্শের কথা বলে এসেছিল, যেমন জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার, আক্রমণমূলক নীতির নিন্দা, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধে আপোষ আলোচনার নীতি—এ সবই সে আজ পদদলিত করছে। এক কথায়, সোভিয়েট রুশিয়া নতুন সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে লিপ্ত হয়েছে।

বিচার করতে গেলে মাপকাঠি বা মূল্যমানের কথা আসে। এখন দেখা যাক্ একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া ও সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থকদের এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রুশিয়ার যারা বিরুদ্ধবাদী সমালোচক তাদের পরস্পরের মাপকাঠি কি। মানুষের মূল্যমান মানুষের

মূলস্বার্থ ও মূলনীতি অনুসারেই প্রধানত তৈরী হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে, সোস্যালিষ্ট রুশিয়াকে যতদূর সম্ভব শক্তিশালী করা এবং সুবিধামত অন্যান্য দেশেও যাতে সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তার চেষ্টা করা। বুর্জ্জুয়া ন্যাশনল ষ্টেট্-এর অস্তিত্বের অধিকার কিম্বা আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরীণ বিরোধের ক্ষেত্রে অহিংসপন্থা—এগুলোকে সোভিয়েট রুশিয়া বা সোস্যালিষ্টরা নীতি হিসাবে (on principle) গ্রহণ করে না। স্থান কাল পাত্র ভেদে সময় সময় policy বা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আর আমরা জানি অপর পক্ষে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও জাতীয় স্বাধীনতাব অধিকার ও অহিংসপন্থাকে কোন দিনই নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নাই। গাযের জোরে অপবের স্বাধীনতা হরণ ও হরণের চেষ্টা, অধীন দেশকে শোষণ ও তাব জনসাধারণকে দাবিযে বাখাব চেষ্টার ইতিহাসই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের ইতিহাস। এইখানে তাদের থেকে সোভিযেট রুশিয়ার তফাৎ আমবা দেখতে পাই। সোভিযেট রুশিয়া গায়ের জোরে পোল্যাণ্ড অধিকাব করেছে সত্য, কিন্তু অধিকারের পর রুশিয়া সেখানে যে সোভিযেটতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে তার অধীনে সেখানকার জনসাধারণ যে পোলিশ ধনিক ও জমিদারের অধীনে থাকার চেযে ভাল অবস্থায থাকবে এটা আমরা আশা করতে পারি। বাল্টিক শক্তিগুলোকে রুশিযা চাপ দিযে তার আওতার মধ্যে এনেছে তা ঠিক্। এবং রুশিয়াব প্রভাবে ও চাপে এ দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাও ক্রমে ক্রমে সোস্যালিষ্ট হযে উঠবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাতে ওদেশেব জনসাধারণেব স্বার্থ হানি হবে বলে আমবা আশঙ্কা করি কি? যদি না করি, তবে সে সম্ভাবনাকে আমাদের অভ্যর্থনা করাই উচিত। ফিন্‌ল্যাণ্ডকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সোস্যালিষ্টদের কর্ত্তৃত্বে একটি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে, এবং সোভিয়েট রুশিযা সেই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। হেলসিংফরস্-এর গবর্ণমেণ্ট পরাজিত হলে ফিন্‌ল্যাণ্ডে সোভিযেট রুশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে একটি সোস্যালিষ্ট ব্যবস্থা গডে তুলবার চেষ্টা হতে পারে। রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে সত্য, কিন্তু তার কাজের ফলে যদি সেখানে বুর্জ্জুযা ন্যাশনল ষ্টেটের পরিবর্ত্তে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে ফিনিস্ জনসাধারণের লাভ না লোকসান? তার পর রুশিযার 'Finnish adventure' এব আর একটা দিক আছে। বাইর থেকে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সাহায্যে কোন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কতটা সম্ভব ফিন্‌ল্যাণ্ডএর এ এক্সপেরিমেণ্ট দ্বারা তা অনেকটা বোঝা যাবে। এরপর রুশিযা অন্যান্য বাল্টিক রাজ্য ও বল্কান রাজ্যে এ পরীক্ষা করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম্ম হচ্ছে পররাজ্য ও জনসাধারণকে শোষণ। রুশিয়ার বলপ্রয়োগের পদ্ধতির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের পদ্ধতির মিল আছে সত্য, কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাস করি যে কোন ষ্টেটের ওপর বলপ্রয়োগ করলেও রুশিযার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জনসাধারণকে শোষণ করা নয়, তবে সোভিয়েটকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করতে পারি না।

আমরা দেখেছি রুশিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজকে যতদূর সম্ভব শক্তিশালী করা

এ উদ্দেশ্য সফলের জন্য বাল্টিক সাগরে তার সামরিক ঘাঁটি সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। বাল্টিক তীরবর্ত্তী রাজ্যগুলো এত দুর্ব্বল যে শত্রুরা সহজেই তাদের ওপর দিয়ে রুশিয়াকে আক্রমণ করতে পারে। বলা যেতে পারে যে বাল্টিক ও বাল্টিক উপকূলে রুশিযাকে ঘাঁটি বসাতে দিলে এস্‌টোনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলোকে নিজে স্বাধীনতার জন্য রুশিযার দযার ওপর নির্ভর করতে হবে। এ যুক্তির কোন মূল্য নেই, কারণ রুশিযা এদের এত বেশী শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে, বাল্টিকে ও বাল্টিকের তীরে রুশিয়াব ঘাঁটি না থাকলেও তাদেবকে রুশিযার দযার ওপর নির্ভর করতে হবে। এস্‌টোনিযা, ল্যাটভিয়া ও লিথুনিযা এটা বুঝেই রুশিযার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওযাই সমীচীন মনে কবেছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডও একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। তবু সে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁডাবাব সাহস কোথায পেল এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে। বাস্তবিক, ফিনল্যাণ্ড খুব সম্ভব রুশিযার চুক্তি প্রস্তাব অস্বীকার করত না যদি না স্কাণ্ডেনেভীয় দেশগুলো—সুইডেন, নরওযে, ডেনমার্ক এবং আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্র (এবং বোধ হয় বৃটেন ও ফ্রান্সও) তাকে পবামর্শ ও আশ্বাস না দিত। কম্যুনিষ্ট বিরোধী বলে বহুদিন ধরেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের সুনাম আছে। তারপর বাল্টিক প্রদেশগুলো একে একে রুশিযার প্রভাবে এসে পড়ছে দেখে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের শঙ্কিত হযে ওঠবাব কথা। এর চেযে সেগুলো নাজী জার্ম্মাণীর প্রভাবে থাকাও তারা ভাল মনে করে। ফিনল্যাণ্ডের পর নরওযে, সুইডেন ও ডেনমার্ক সোভিযেটের প্রভাবাধীনে এসে পডাব সম্ভাবনা। এই দেশগুলোর সঙ্গে ইংলণ্ডের আর্থিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই সোভিয়েট রুশিযার অগ্রগতি রুদ্ধ করার আযোজন চলতে লাগল। তার প্রথম ধাপ হল ফিন্‌ল্যাণ্ডকে আশ্বাস ও সাহায্যের আশা দিযে রুশিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে প্রবোচিত করা, দ্বিতীয় ধাপ হল লিগ্ অব নেশনস্ থেকে রুশিযাকে বহিষ্কৃত করা এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডকে যথাসম্ভব সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করা। লিগ-এব 'কন্‌ভেনসন' অনুসাবে রুশিযা যে আক্রমণকাবী, এবং সেজন্য রুশিয়াকে বহিষ্কৃত করবার অধিকাব লিগের আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-লিগ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলেও বা ইটালী এবিসিনিযা আক্রমণ কবলেও তাদের বহিষ্কারের জন্য কোন উৎসাহ দেখায নি, এবং এবারেও পোলাণ্ড আক্রমণের প্রশ্ন এডিযে গেল, ইংরেজ ও ফরাসী নিযন্ত্রিত সেই লিগ যখন রাতারাতি রুশিযাকে বহিষ্কৃত করবার সিদ্ধান্ত কবে, তখন তাব আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ লোকের মনে সন্দেহ জাগে। লিগের সভ্যবা ফিন্‌ল্যাণ্ডকে যথাসম্ভব সাহায্য দিবার প্রস্তাব পাশ করেছে। কিন্তু সোভিযেট রুশিযাকে হটাবার মত যতটা কার্য্যকবী সাহায্যের প্রযোজন তা ফিন্‌ল্যাণ্ড মিত্রশক্তির কাছে পাবেনা এটা সুনিশ্চিত।

• সোভিয়েট রুশিয়ার অগ্রগতি ইউরোপীয যুদ্ধের পবিস্থিতিতে একটা সম্পূর্ণ ওলট পালট এনে দিয়েছে। যুদ্ধের 'ডিপ্লোমেসি' অচিবেই একটা নতুন মোড নেবে লিগ থেকে রুশিযার বহিষ্কার তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নাজি-ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উভয়ে পরস্পরকে যতটা ভয়ের কারণ মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় করতে সুরু করেছে সোভিয়েট রুশিয়াকে। জার্ম্মানী আর যুদ্ধ চালাতে চায় না। যুদ্ধে নেমে সে মাত্র লাভ করেছে পোল্যাণ্ডের কতটা অংশ, অপরদিকে বাল্টিকে

সে আধিপত্য হারিয়েছে, বল্কানেও এর পর রুশিয়ার প্রভুত্বই সবচেয়ে বেশী হবে। যুদ্ধ যত বেশী দিন ধরে চলবে, তা জার্ম্মানীকে সে পরিমাণেই রুশিয়ার ওপর নির্ভরশীল করে তুলবে। তা ছাড়া অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কাও যে নেই তা নয়। তাই জার্ম্মানী এখন সন্ধি করতে পারলে বাঁচে, অবশ্য মুখ রক্ষা হয় এমন কোন সন্ধি। অপরপক্ষে মিত্রশক্তি জার্ম্মানীকে অনেকটা কাবু করতে চায় সত্য কিন্তু একেবারে অকর্ম্মণ্য করে দিতে চায়না। তাহলে কন্টিনেন্টে বলশেভিজমের অগ্রগতি রোধ করবার কেউ থাকে না। জার্ম্মানীতে সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে তারা মহা আশঙ্কার চোখে দেখে। জার্ম্মানী যাতে সোভিয়েটের কবলে না আসে সে জন্য তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে। এর জন্য দরকার হলে তারা তাদের স্বাধীনতা ও ডেমোক্রেসী প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে প্রয়োজন মত ভেজাল মেশাতে ইতস্তত করবে না, তা নীরিহ অভাগা পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার খরচায় হোক না কেন। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মহলের এক অংশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিচ্ছে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে। চেম্বারলেন অবশ্য বলেছিলেন যে হিটলার ও নাজি গবর্ণমেণ্টের পতন না হলে তাঁর স্বস্তি নেই। কিন্তু বৃহত্তর বিপদ—'greater peril' দেখা দিলে এই হিটলার ও নাজীদের সঙ্গেই আপোষ করা যেতে পারে। রুশিয়াকে লিগ থেকে বহিষ্কৃত করে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধির এবং তাকে নিয়ে আবার সোভিয়েট-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের পথ পরিষ্কার হচ্ছে কিনা কে জানে।

সোভিয়েট-ভীতিই আজ পাশ্চাত্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় নিয়ন্তা।

সোভিয়েট রুশিয়া যদি (জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করার দরুন) যুদ্ধ বাধবার পরোক্ষ কারণ হয়ে থাকে, তবে, মনে হয়, ভাবী শান্তিরও পরোক্ষ কারণ হবে সে। কিন্তু এ শান্তি কত দিনের?

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

গত ২৩শে নভেম্বর এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে ওয়ার্কিং কমিটি এক অধিবেশন হয়ে গেছে। ওয়ার্কিং কমিটি ইউরোপীয় যুদ্ধ এবং ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যে প্রস্তাবটী গ্রহণ করেছেন তা' নৈরাশ্যজনক। কিছুদিন যাবৎ গান্ধীজী লেখার মধ্য দিয়ে দেশের জনমতকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য গড়ে তুলছিলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর কতকগুলি লেখা যে ভাবে বৃটিশ রাজনীতির কূটচাল উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়ে জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে আন্দোলনের পথে পরিচালিত করবার পূর্ব্বভাস দিয়েছিল তা' ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবটীতে ক্ষুন্ন করা হয়েছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতে কি নীতি গ্রেটবৃটেন গ্রহণ করবে তা' স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবার এবং যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে গ্রেটবৃটেন বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সে নীতি ভারতেও প্রয়োগ করবার দাবী কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিল। কিন্তু সুচতুর সম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘিষ্ঠের এবং দেশীয় নৃপতিদের জটিল সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে আত্মশাসন নিয়ন্ত্রণে ভারতের অযোগ্যতা উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রছে। কংগ্রেসের এই অতি ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা ও অস্বীকার করাতে আপোষের পথও রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রশ্ন থাকে, কিন্তু তাই ব'লে তা' রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অযোগ্যতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এরূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যার অছিলায় কে কোথায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে? ঘরোয়া সমস্যা ও অন্তর্ব্বিবাদ সকল দেশেই থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা এবং আত্মশাসনে সকলেরই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৃটেনের রাজনৈতিক কূটচাল এসব যুক্তি মানে না। তাই লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের বক্তৃতায় কংগ্রেসের দাবী উপেক্ষিত হ'ল। কিন্তু তারপরেও দেখি ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতিতে রয়েছে যে "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদিও আপোষ প্রচেষ্টার দরজা কংগ্রেসের মুখের উপরই বন্ধ ক'রে দিয়েছে তথাপি ওয়ার্কিং কমিটি সম্মানজনক আপোষ নিষ্পত্তির জন্য যত্নবান থাকবে।" যেখানে আপোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, অস্বীকৃত হয়েছে, সেখানে আপন মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কংগ্রেসেরও নীরব থেকে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করাই যুক্তি সঙ্গত ছিল। তাতেই দেশকে সংগ্রামের দিকে আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করতো। বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়লে সিদ্ধিলাভ সহজসাধ্য হয় না।

গণ-পরিষদ

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে একটী নতুন আলোকরেখা দেখা যায় যদিও তা' এখনো সম্পূর্ণভাবে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। সেটি গণপরিষদ সম্পর্কে। এ যাবৎ গণপরিষদ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোনো

স্পষ্ট বাণী ছিল না। কিন্তু এবারের প্রস্তাবে আছে জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদের মারফতে নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতবাসীর অধিকার থাকবে। স্বাধীনজাতির শাসনতন্ত্র প্রণয়নের একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায় হল গণপরিষদ। এই পরিষদই হবে আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র কর্ত্তৃপক্ষ। কিন্তু কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর বৃটেনের শাসনকর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে ততক্ষণ গণপরিষদ আহ্বান করতে গেলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন। সে অনুমোদন লাভ করতে গেলে গণপরিষদ গঠনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সর্ত্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ গোড়ার ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা মনে করি কংগ্রেসের এ দাবী সময়োপযোগী হয়েছে এবং জাতির মুক্তি যে এইপথেই একদিন আসবে, তা' দেশের জনসাধারণ বুঝবে এবং নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দাবী তারা করতে শিখবে।

গান্ধীজী চান ইংরাজের 'হৃদয়ের পরিবর্ত্তন' হয়ে এই গণপরিষদ আপনা থেকেই তাঁরা অনুমোদন করুক। কিন্তু গণপরিষদ দূরে থাক, গণতন্ত্র এবং আত্মশাসন নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিই তাঁরা স্বীকার করেন নি। যেখানে শাসক শাসিতের সম্পর্ক বর্ত্তমান, সেখানে 'হৃদয়পরিবর্ত্তনে'র নীতির কার্য্যকারিতায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এই গণপরিষদ যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রাপথে সিদ্ধিলাভের একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর তা' আমরা স্বীকার করি, কিন্তু অপরের অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্য সম্বল ক'রে যে সেই উচ্চস্তরে পৌছান যায় না—সেখানে আরোহণ করতে হয় আপন শক্তি বলে বিঘ্নবহুল বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে ক্ষতবিক্ষত পায়ে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে—ইহা জাতি ক্রমে বুঝবে।

গণ-পরিষদ সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা

'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী গণপরিষদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গণপরিষদের প্রস্তাব কংগ্রেসে প্রথম এনেছেন পণ্ডিত জওহরলাল—বর্ত্তমানে গান্ধীজী এর সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও উদ্যোগী সমর্থক। গান্ধীজী যেভাবে গণপরিষদ সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করছেন তাতে এটা ক্রমেই জনপ্রিয় আলোচনার বস্তু হ'যে দাঁড়িয়েছে—এটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। যতই আলোচনা চলবে ততই এ বিষয়ে জনগণের ধারণা স্পষ্ট ও দূরদর্শী হবে, এবং বর্ত্তমানের এই অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন কল্পনা একদিন স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্টরূপ পরিগ্রহ করবে।

গান্ধীজী বলেন, জনসাধারণের দ্বারা এই গণপরিষদের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হবেন। নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্কগণ সকলেই ভোট দিবার অধিকারী হবেন। তাতে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অন্য শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ হবে। সকলের মধ্যেই তখন একটা রাজনৈতিক ঔৎসুক্য ও চেতনা আপনা থেকেই জাগবে। মুসলমানদের জন্য পৃথক ভোটের ব্যবস্থায়ও গান্ধীজী রাজী আছেন—এমন কি প্রয়োজন হ'লে পৃথক ভোটের ব্যবস্থা না ক'রে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য তাদের সংখ্যানুযায়ী আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থায়ও তিনি প্রস্তুত। এইভাবে সাম্প্রদায়িক বিবাদের নিরসন হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে গান্ধীজী মনে করেন।

তিনি আরও মনে করেন যে, ভারতের অবস্থানুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা একমাত্র এরূপ গণ-পরিষদই করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই জনগণের অভিপ্রায় প্রকৃতভাবে ব্যক্ত হতে পারে। এই জনগণই পরিষদের মধ্য দিয়ে আনবে তাদের স্বায়ত্তশাসন।

গান্ধীজী মনে করেন বৃটীশজাতি ও ভারতবাসী উভয় জাতিব মধ্যে সম্মানজনক মীমাংসার ফলে এই গণ-পরিষদ আসা উচিত। কোন আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে গণ-পরিষদের জন্য সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা তিনি করবেন। এই কথা মনে কবেই হযতো গান্ধীজী বৃটিশ সরকারেব "বন্ধদরজার" পরও আপোষ চেষ্টার পথ নিজের দিক থেকে খোলা রাখতে যত্নবান হযেছেন। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহনীতিতে 'হৃদয পরিবর্ত্তনে'র প্রতি আস্থা এদিকেই নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিনের বৃটিশ রাজনীতির কূটচালের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর আছে তাতে তাঁর মনেও সন্দেহ এসেছে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদ অনুমোদন কববে কিনা। তাই তিনি অবশেষে জানিযেছেন যে "এমন অবস্থাও আসতে পারে যখন গণ-পরিষদের জন্যই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রযোজন হবে।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাব

গত ২৭শে অগ্রহাযণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কিত এক প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে মিঃ ফজলুল হক্ আনেন। প্রস্তাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নাৎসীজার্ম্মানীব আক্রমণেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় পরিষদের পক্ষ থেকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে পূর্ণ সহানুভূতি ও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস জানানো হয। আরো বলা হয যে, যুদ্ধাবসানে .যন ভাবতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয, তাতে যেন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদাযগুলির পূর্ণ সম্মতি এবং অনুমোদন থাকে এবং তাদের কার্য্যকরী রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকে।

এই প্রস্তাবটী সমর্থন করতে গিয়ে মিঃ ফজলুল হক্ অনেক মজার কথা বলেছেন। যুদ্ধে ভাবত লিপ্ত হযেছে, অথচ ভারতের সম্মতি কেন নেওযা হয় নি, তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাতে নাকি সামরিক গুপ্ততথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমরা জানি কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিনা অনুমতিতে তাদের যুদ্ধে লিপ্ত দেশ বলে মনে করা হয নি—কিন্তু সেখানে সামরিক গুপ্ততথ্য প্রকাশ হ'য়ে পড়ার কোনো প্রশ্ন বা আশঙ্কা ওঠে নি।

'প্রধানমন্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকব কথা বলেছেন যখন উপসংহার করলেন, "আমরা কেন স্বাধীনতা দেওযার জন্য ইংলণ্ডের কাছে যাব? স্বাধীনতা কেউ কোনদিন কাউকে দেয না। স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে আদায় করতে হয। হিন্দু ও মুসলমানদেব আমি বলতে চাই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে।" তাঁর মুখে একথা হাস্যকর, কিন্তু এমন সার কথা ভুলেও তাঁর মুখথেকে বের হ'তে দেখে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জাগে—বুঝি আর দেরী নাই।

যুদ্ধ সম্পর্কিত এই প্রস্তাবটী নিয়ে বহু তর্ক বিতর্কের অবতারণা হয়েছে,—এমন কি মন্ত্রীদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা

করেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের স্বার্থ ও অধিকার যথোচিতভাবে রক্ষার দাবী খুবই সঙ্গত, কিন্তু ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন না থাকলে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যাবেনা—এরূপ দাবী নিতান্ত অসঙ্গত। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা আদৌ বলা হয় নাই। ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির সমস্ত প্রস্তাব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ না করলে ভারত রাজনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারবে না এরূপ দাবী অস্বাভাবিক ও গণতন্ত্রবিরোধী।

মন্ত্রীদের মধ্যে এই প্রস্তাব নিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হবার ফলে শ্রীযুত সরকার পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগে বোঝা যায় বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী কি রকম সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন।

মিঃ জিন্নার মুক্তি দিবস

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী সমূহের পদত্যাগ ও ভারতে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের অবসানের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ২২ শে ডিসেম্বরকে বিশেষ উপাসনা দিবস হিসাবে পালন করতে মিঃ জিন্না সমস্ত মুসলমান সমাজের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। এটাকে 'মুক্তি দিবস' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে! হায় রে! মুক্তি কার কাছ থেকে? বিদেশী শাসকজাতির হাত থেকে নয়,—পরাধীনতার শৃঙ্খল হ'তে নয়—অধীনতার অপমান থেকে নয়—মুক্তি চাই ভিত্তিহীন, অপ্রমাণিত, কাল্পনিক অবিচারের হাত থেকে। এ বিংশ শতাব্দীতে এমন মুক্তি কাহিনী কে কবে কোন দেশে শুনেছে!

যে সময় কংগ্রেসের তরফ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল ও মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎ ও আলোচনার দ্বারা সম্মানজনক একটা মীমাংসার আশা অনেকেই করছিলেন ঠিক সেই সময় কংগ্রেসকে অযথা এভাবে আক্রমণ করাতে সেই মীমাংসার আশা ভেঙ্গে গেল। বোঝা গেল মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও মীমাংসা বা আপোষ করতে রাজী নন। নতুন ক'রে অকারণে হঠাৎ এই সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাবার প্রেরণা কেন এবং কোথা হ'তে এল কিছুই বলা যায় না।

গান্ধীজী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি এর প্রতিবাদ করেছেন এবং দেশের এই রাজনৈতিক সঙ্কটের দিনে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

গান্ধীজী বলেন যে, মুক্তিদিবস পালন করার অর্থ এই হয় যে, কংগ্রেসীমন্ত্রিমণ্ডলীর অবিচার প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু অভিযোগগুলি তদন্ত হবার জন্য বড়লাটের নিকট যে দাবী জিন্না করেছেন, তার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানার জন্য কি অপেক্ষা ক'রে তারপরে 'মুক্তি দিবস' পালন সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত নয়? গান্ধীজী মুসলমান সমাজকে এই 'মুক্তি দিবস' পালন থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছেন।

আরো আশ্চর্য্য এই যে, যখন তাঁদের অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একত্রে সফরে বেরিয়ে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বারবার দেশবাসীর তরফ থেকে আহ্বান করা হয়েছে, তখন তিনি বৃটিশ রয়েল কমিশনের উপর অভিযোগ তদন্তের ভার দিবার প্রস্তাব করেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কাম্য সেই কংগ্রেস এই বৃটিশ রয়েল কমিশনের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পাবে না। মুসলিম লিগেও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সুতরাং মুসলিম লিগও তার পূর্ব্বনীতি বিসর্জ্জন না দিযে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না।

বাংলার মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্ এতদিন ধরে পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে যে পত্রালাপ চালাচ্ছিলেন তাতে দেখা গিয়েছিল যে এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত তদন্তের জন্য মিঃ হক্ ও পণ্ডিতজী শীঘ্রই ঘটনাস্থল সমূহে গমন করবেন। কিন্তু হঠাৎ দেখি সুর বদলে গেছে—ফজলুল হক্ সাহেব আর দেশী ভাইদের নিকট সাক্ষাৎ প্রমাণাদি দিবেন না বা বিচারের অপেক্ষা করবেন না—তাঁর চাই রয়েল কমিশন। বিলেত থেকে কবে রয়েল কমিশন আসবে, বা আদৌ আসবে কিনা সে বিষয়ে মিঃ জিন্না থেকে মিঃ হক্ অবধি সকলেরই সন্দেহ আছে—ততদিন অন্ততঃ প্রত্যক্ষ তদন্তে ভুয়া অভিযোগের প্রমাণ সংগ্রহের দাযিত্ব থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল।

'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র কমিউনিজম্ ভীতি

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় পর পর দুইটী প্রবন্ধ বেরিয়েছে 'ভারতে কমিউনিজম্' সম্বন্ধে। সম্পাদকীয় মন্তব্য করতে গিয়ে ষ্টেটস্‌ম্যানের কমিউনিজম্ ভীতি প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ষ্টেটস্‌ম্যানের এরূপ ভীতি দেখলে আমরাও আতঙ্কিত হযে উঠি। কে জানে এটা প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বাভাস কিনা,—মনে হয়, বুঝি বা আসন্ন দুর্য্যোগের পূর্ব্বলগ্নে জানিয়ে দিল লৌহকপাটগুলি ঘন ঘন খুলবার এবং কুলুপ দেবার সময় সন্নিকট।

অতীতে ষ্টেটস্‌ম্যানের ইঙ্গিতের এরূপ দুশ্চেষ্টা বহুবার আমরা দেখেছি,—তাই ভারত রক্ষা আইনেও যেমন বিস্মিত হই নি, ষ্টেটস্‌ম্যানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেও তেমনি আশ্চর্য্য হই নি।

এই প্রবন্ধে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে চমৎকার ভাবে বিভেদ আনবার চেষ্টা রয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা যখন গঠনমূলক কাজ করছে বামপন্থীরা নাকি তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দখল করতে ব্যস্ত হয়েছে। পূর্ব্বে দক্ষিণ ও বামপন্থীগণের স্বাযত্তশাসন লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে নাকি কমিউনিষ্টগণ ভারতের উত্তর দিক থেকে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট কামনা করছে। মস্তিষ্ক উর্ব্বরই বটে। এক এই ষ্টেটস্‌ম্যান ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই যে ভারত আবার বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট কামনা করে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ও গ্লানি চিরতরে লোপ করা ভারতের সর্ব্বদলের রাজনীতিকদেরই কাম্য—এ তথ্য জেনে শুনেও যদি কেউ মিথ্যা প্রচার করে তবে একথা না ভেবে উপায় নেই যে, এর পশ্চাতে আছে দুরভিসন্ধি, ঘনিয়ে আসছে দুর্য্যোগের তিমির রাত্রি!

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

গত ২৫ ও ২৬শে অক্টোবর ওয়াই, ডবলিউ, সি, এ, হলে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ের বেগম হামিদ আলি সভানেতৃত্ব করেন। তাঁহার বক্তৃতা ভারতের নারীদিগের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার আবহাওয়া যখন ভারতকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে ঠিক সেই সময়ে নারীর এই উদার আহ্বান, ঐক্য ও মিলনের বাণী দেশে আশা ও প্রেরণা সঞ্চার করবে। বেগম হামিদ আলি বলেছেন, নারী সম্মিলনীর কর্ম্মীদের মধ্যে প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই—সকলেই ভারতের কন্যা এবং সেভাবেই তাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে একযোগে কাজ করছেন। বেগম হামিদ আলি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র বিরোধিতা ক'রে সমালোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, "পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা আমাদের জাতীয়তার একটা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল অঙ্গ স্বরূপ। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটা সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এর উচ্ছেদ করা নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য। আমাদের ভারতীয় নারীদের এ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হয়ে কাজ করা উচিত।" তিনি আরও বলেছেন যে, দেশের জনগণ শিশুদের মত রঙীন চকচকে কাচের জন্য বিবাদ ক'রে মরছে, কিন্তু হাতের কাছে যে অমূল্য রত্ন প'ড়ে আছে তা' দেখতে পাচ্ছেনা। বেগম হামিদ আলির এই বক্তৃতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এরূপ মনোভাব সারা ভারতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হোক্ এই কামনাই করি।

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন

আশুতোষ বিল্ডিংসে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়ে গেছে। সভাপতি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। ভারতের ইতিহাস অতি অস্পষ্ট এবং অতীত ভারত সম্বন্ধে কোনো ধারাবাহিক জ্ঞান ইতিহাসে নাই। সভাপতি বলেন, ইতিহাস চর্চ্চার দিকটা ভারতে বড়ই উপেক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন, মধ্যযুগ, অথবা বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো সভ্যতার ইতিহাস রচনায় ভারতীয় কোনো ঐতিহাসিকের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই। পক্ষান্তরে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় অগ্রসর দেশের ঐতিহাসিকগণই ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ব্যাখ্যায় বহু আলোক সম্পাত করেছেন। চতুর্দ্দিকের মানব সভ্যতার ধারার সঙ্গে যোগ না রাখলে ভবিষ্যতে ভারতকে আরও গুরুতর ফল ভোগ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের একখানি সমগ্র ইতিহাস রচনা করার কথা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটা কার্য্যে পরিণত করা উচিত।

বিদেশী ঐতিহাসিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতের ইতিহাসকে বহু স্থানে বিকৃত ক'রে প্রচার করেছে। 'অন্ধকূপ হত্যা' তারই একটা নিদর্শন। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর ইতিহাসে

একথা প্রমাণ করে গেছেন। এরূপ বিশদ ভাবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আদ্যোপান্ত রচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পাঞ্জাব প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীযুত মানবেন্দ্র রাযকে লাহোবে সম্বর্দ্ধনাব জন্য আয়োজন কবা হয়েছিল। ২৫শে নভেম্বর তিনি যখন সাহারানপুরে পৌঁছেন তখন সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে শ্রীযুত রাযের পাঞ্জাব প্রবেশ একবৎসরেব জন্য নিষিদ্ধ ক'বে এক আদেশ জারী কবা হয।

শ্রীযুত রায পথিমধ্যে মধ্যবাত্রিতে এরূপ আদেশ পেযে অবাক হযে বলেছেন যে, যে নোটিশটী তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাব তারিখ ছিল ৭ই নভেম্বব অথচ তাঁকে তা' দেওযা হয়েছে ২৫শে নভেম্বর। এতদিন কেন এই আদেশ জারী কবা হয নি তা' তিনি জানতে চেযেছেন। এই নোটিশ আগে পেলে তাঁর অর্থহানি এবং মধ্যপথে এত ঝঞ্ঝাট ও কষ্ট সহ্য কবতে হত না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা পরাধীন দেশে আশা করাই বিড়ম্বনা। এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ কবতে গিযে যে সব যুক্তি পবিষদে সেকেন্দার হায়াৎখান দেখিযেছেন তা' যেমন মামুলী তেমনি হাস্যকর।

৺দীনেশচন্দ্র সেন

গত ২০শে নভেম্বর বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন পবলোক গমন করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজীবন সাধনা যে কযজন মনীষী কবেছেন তাঁদেব মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন অন্যতম। বাঙ্গালা সাহিত্যেব এমন একজন একনিষ্ঠ ও অনুবাগী সেবকেব মৃত্যুতে বাংলার অপূবণীয় ক্ষতি হযে গেল। বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যও তার ইতিহাস নিযে আজকাল পণ্ডিতগণ কত আলোচনা ও গবেষণা করবাব সুযোগ পেযেছেন—কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও এইগুলি অত্যন্ত অসুবিধার বস্তু ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেনই এই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করে বহু কষ্টে, বহু সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সুযোগ এনে দিযেছেন। তাঁব তথ্য সংগ্রহেব ও লেখনীব বিবাম ছিল না।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য, ঘরেব কথা ও যুগ সাহিত্য, বৃহৎবঙ্গ, মযমনসিং গীতিকা এবং আরও কতকগুলি কথা গ্রন্থ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় পুস্তক তিনি বচনা ও সম্পাদনা করেছেন। সাহিত্য সেবাব পুরস্কার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয তাঁকে 'ডি, লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা একজন সত্যান্বেষী ও জ্ঞানানুবাগী সাহিত্যিক হাবালো সন্দেহ নেই।

ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রাশিয়া

গত মহাযুদ্ধের পর বাইরের শক্তিগুলির দ্বারা উৎসাহিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হযে অনেকগুলি স্থান রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে রাশিযার অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ফিন্‌ল্যাণ্ড তার অন্যতম। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একে অন্যকে সর্ব্বদাই সাহায্য ও

পারাস্পরিক চুক্তি করে রক্ষা ক'রে থাকে। নইলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে ওঠে, বৃহৎ রাষ্ট্রেরও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাঘাত হয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের সীমানাভুক্ত আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ সামরিক দিক থেকে রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত ৩১শে মে রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ সোভিয়েট ইউনিয়নের পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা দেন তাতে বলেন যে, আলাণ্ড দ্বীপে দুর্গ প্রকারাদি নির্ম্মাণ করলে তা ভবিষ্যতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা থাকে। ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশ পথে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত, কাজেই আলাণ্ড দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি বসালে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে সোভিয়েটের যাতায়াতের পথ বন্ধ করা যেতে পারে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাশিয়ার আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় বল্‌টিকের পথে সোভিয়েট রাশিয়াতে যেতে কতগুলি ঘাঁটি রাশিয়ার পক্ষে সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে জন্যই একে একে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সামরিক চুক্তি ক'রে রাশিয়া তার শক্তি দৃঢ় করেছে। এখন ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকেও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি স্থান ও সামরিক চুক্তি সে করতে চেয়েছে। এখানে চেকোশ্লোভাকিয়া বা অষ্ট্রিয়ার মত ফিন্‌ল্যাণ্ডকে গ্রাস করতে বা অধীনতাপাশে শৃঙ্খলিত করতে সোভিয়েট চায় নাই। এই চুক্তিতে রাশিয়াও বিনিময়ে নিজের কিছু স্থান ছেড়ে দিতে এবং উপযুক্ত অর্থ দিতে রাজী ছিল। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড এই চুক্তিতে রাজী হয় নি। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ বেধে গেল।

এই রাজী না হওয়ার মূলে আছে অন্যরাষ্ট্রের উস্কানি ও প্ররোচনা। নইলে মাত্র ৪ হাজার টনের দুটো যুদ্ধ জাহাজ, চারখানা গানবোট, ৭টী মোটর-টর্পেডো বোট, তিনটি মাইন বসানো জাহাজ এবং ৫ খানি সাবমেরিন নিয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ড সাহস ক'রে প্রবল রাশিয়ার বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হতোনা। চারিদিক থেকে রাশিয়ার এই অভিযানের বিরুদ্ধে যত চেঁচামেচি হয়েছে তার মধ্যে জাপান ও ইটালীর গলার উচ্চতার বহর দেখে হাসি পায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক

অবশেষে ফিন্‌ল্যাণ্ড রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বিচার প্রার্থনা করেছে। জার্ম্মানী, ইটালি ও জাপান বহুপূর্ব্বেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করেছে। আমেরিকা তো কোনো-দিনই যোগ দেয় নাই। রাশিয়া কোনক্রমে মুমূর্ষু রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তিম নিশ্বাস লক্ষ্য করছিল। বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাকী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে খেলা করছিল। সে সময় ফিন্‌ল্যাণ্ড বিচারের প্রার্থনা জানালো। বসলো বৈঠক। আসামী রাশিয়া জানালো সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কিম্বা ফিনদিগকে যুদ্ধের হুমকীতে আতঙ্কগ্রস্ত করে নাই। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক আহ্বানের কোনো কারণ উপস্থিত হয় নাই;—অতএব সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে যোগদান করবে না। হয়তো সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপযোগিতার অবসান হয়েছে বহুপূর্ব্বেই।

ক্ষুদে উরুগুয়ে গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করবার দাবী জানিয়েছে। যাই হোক্ অনেক জল্পনা ও উপরোধ অনুরোধের ব্যর্থতার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ দেখলো যে সোভিয়েট-ফিনিশ বিরোধ মীমাংসা করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব রাষ্ট্রসঙ্ঘ সোভিয়েট রাশিয়াকে সঙ্ঘ হ'তে বিতাড়িত ক'রে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করল। অন্য উপায়ে বাধা দেবার শক্তি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাই—থাকলে বহুদিন পূর্ব্বেই বহু সত্যকার অন্যায়ের প্রতিকারই সে করতে পারতো এবং আজকের দিনের বর্ব্বরতার হিংস্র অভিযানও তার দেখতে হ'ত না।

জার্ম্মানীর চুম্বক মাইন

ইওরোপে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চলছে। একদিকে 'সিগফ্রিড' অন্যদিকে 'ম্যাজিনো' লাইন ট্যাঙ্ক, বিমান বহর ও কামান সাজিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—যুদ্ধের কোনো দামামা সেখানে বাজেনা অথচ যুদ্ধ নাকি চলছে। অর্থাৎ যাকে বলে উচ্চ স্তরের যুদ্ধ—রক্তপাত ক'রে বীরবিক্রম দেখানো অতীতের সেকেলে যুদ্ধ—তাতে আধুনিকতাও নাই, রুচিও থাকে না—এখন সবই অর্থনৈতিক কিনা, রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ ক'রে যুদ্ধ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় না করলে কালের উপযোগী হয় না—সবই বিস্বাদ ও নিরামিষ ঠেকে। তাই ইওরোপে চলেছে অর্থনৈতিক যুদ্ধ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীকে ঘায়েল করবার জন্য অর্থনৈতিক ব্লকেড করেছে,—তার সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ ক'রে উপোষ করিয়ে জব্দ করতে চেষ্টা করছে—তখন উপায়ান্তর না দেখে জার্ম্মানী পরাজয় মেনে সন্ধি করতে বাধ্য হবে—যেমন বিগত মহাযুদ্ধে হয়েছিল। আবার জার্ম্মানীই বা ছাড়বে কেন? সেও বৃটেনের বাণিজ্য বন্ধ ক'রে শুকিয়ে মারতে চেষ্টা করছে। তার অস্ত্র দেখছি ইউবোট ও চুম্বক মাইন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন ইউবোট নাকি তাঁরা আয়ত্তে এনেছেন। কিন্তু চুম্বক মাইনই হচ্ছে হিটলারের সেই গোপন মারণাস্ত্র যার দ্বারা সে ইংলণ্ডকে জব্দ করবার হুমকী দিয়েছিল। জার্ম্মানরা নাকি এই চুম্বক মাইন সমুদ্রের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রেখেছে—টেম্‌স্‌নদীর মোহনায় পর্য্যন্ত তাদের দেখা যায়। এই সব ইউবোট ও চুম্বক মাইন দিয়ে জার্ম্মানী বহু বৃটিশ রণতরী ও বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই চুম্বক মাইনগুলি নাকি সমুদ্রে ভাসতে থাকে—কোনো জাহাজ কাছাকাছি এলে লোহার আকর্ষণে ছুটে গিয়ে জাহাজের গায়ে লাগে ও ফেটে গিয়ে জাহাজটী ডুবিয়ে দেয়।

এভাবে বহু জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেলো তবু এই বর্ব্বর অস্ত্র সংযত হ'ল না। একে অন্যকে এরূপে অর্থনৈতি ভাবে দেউলিয়া করার যে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে মনে হয় যুদ্ধের গতি মন্থর হলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার সম্ভাবনা—যদি না ইতিমধ্যে অন্যকোনোরূপ নতুন পরিস্থিতি এসে হঠাৎ মোড় ফিরিয়ে অন্যত্র কেন্দ্রীভূত করে।

বাটার কারখানা সম্বন্ধে ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর অভিমত।

"যোগ্যতা থাকলে কতখানি করতে পারা যায় তার একটা দৃষ্টান্ত বাটাকোম্পানী। এই কোম্পানী যখন এদেশে প্রথম কাজ আরম্ভ করেন তখন এর বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছিল। বিদেশী মূলধন এদেশের সস্তা মজুরির সুবিধা নিতে এসেছে, ওদের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে এদেশের জুতাওয়ালারা বেকার হয়ে পড়বে, ইত্যাদি প্রচার খুব জোর চলেছিল। কিন্তু কার্য্যদক্ষতা ও সদিচ্ছার জোরে বাটা এসব গোঁড়ামিকে জয় করেছেন"। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী বাটার কারখানায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখে এসেছেন। ওখানকার সব ব্যবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী

হয়েছেন। বাটার কারখানায় কারিগর ও শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর বহু যুবককে বিশেষভাবে শিক্ষিত করা হয়েছে। এঁদের অনেককে কোম্পানীর খরচায় ইউরোপে পাঠান হয়েছে আরো ভালভাবে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করার জন্য।

জুতা প্রস্তুতের কাজে যেমন, জুতা বিক্রয়ের কাজেও তেমনি বাটা কোম্পানী অত্যন্ত উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছেন। দোকানগুলিতে খরিদ্দারদের সঙ্গে যে ভদ্রতা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করা হয় তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কারখানার সমস্ত ব্যবস্থাও বেশ সন্তোষজনক এবং আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত। দেশীয় কারিগরদের বেকার হয়ে পড়ার যে আশঙ্কা প্রথম প্রথম ছিল তাও সত্য হয় নি। কারণ জুতার বাজার এত প্রসারতা লাভ করেছে এবং জুতার চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে জুতার কারিগরদের বেকার বসে থাকবার কোন প্রয়োজনই হয়নি। অধিকন্তু, ভারতীয় কাঁচামালের যে সব অংশ আগে চাহিদার অভাবে পড়ে থাকত, নষ্ট হোতো, তাও এখন বাটার কারখানায় কাজে লেগে যাচ্ছে।

ডাঃ চক্রবর্ত্তীর মত এই যে বাটা উন্নত আদর্শ দেখিয়ে এদেশীয় পাদুকা-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছেন। অথচ অপরের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোন প্রতিযোগিতায় তাঁদের নামতে হয় নি। তিনি আরো বলেন যে লাভের কোন অংশ বিদেশে চলে যাচ্ছে না, এদেশেরই শিল্পোন্নতির কাজে খাটান হচ্ছে।

কারখানায় ও বাটানগরে যে সমাজজীবন গড়ে উঠছে তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদানের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই সেখানে আছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী আশা করেন যে কারখানার মালিকেরা এখন বাটানগরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেবেন।

৩২নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এগারোটা বাজে

নিরিবিলি বসে' এক পেয়ালা চা খাবার এ-ই সময়। সমস্ত সকাল গেছে সংসারের অবিশ্রান্ত খাটুনি—এখন এক পেয়ালা চা খেয়ে শরীর মন তাজা করে' নিন্। সাম্‌নে পড়ে আছে সারাটা দিন—মুখর বিকেল আর সুন্দর সন্ধ্যা। এক পেয়ালা চা নিয়ে আরামে বসে' এই দীর্ঘ দিনটাকে আপনি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন, তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা

সব জায়গায় সব সময় চলে

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌সান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 119

ডোঙ্গরের
বালামৃত

সেবনে দুর্ব্বল এবং শীর্ণাঙ্গ-বিশিষ্ট
বালক-বালিকাগণও অবিলম্বে সবল হয়।

ক্যালকাটা কমার্সিয়েল
ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অ[illegible]
২নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটি সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

ক্যাশ সার্টিফিকেটের সুদের হার :
৮৪৲ টাকায় তিন বৎসরে ১০০৲
৮।৶০ আনায় তিন বৎসরে ১০৲
সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার :
বার্ষিক শতকরা ৩৲

বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের প্রধান
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা রহিয়াছে।

প্রিয়জনকে উপহার দিতে জহরতের ও গিনি সোনার অলঙ্কারই শ্রেষ্ঠ। ফ্যাসানের
আধুনিকতায় নিত্য নূতন ডিজাইন না হইলে কাহারও মনোমত হয় না
অথচ স্থায়িত্বের দিকেও নজর রাখিতে হইলে

—একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান—

হেড্ অফিস—Cal. 594.　　ব্রাঞ্চ—South 1361

(স্থাপিত ১৮৮২)

বিনোদবিহারী দত্ত

ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার

হেড্ অফিস :—১এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।

দক্ষিণ কলিকাতা বাসীর জন্য

নূতন ব্রাঞ্চ :—৮৪ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর।

ইহা ব্যতীত অন্যত্র ব্রাঞ্চ নাই।

মিত্র মুখার্জ্জী কোং

= সূচী =

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে

প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা বাৎসরিক বোনাস্	আজীবন বীমায়	১৬৲
	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাসিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

দ্বিতীয় বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৬ | ১০ম সংখ্যা

অগ্রদূত

শ্রীক্ষিতীশ রায

আমবা লুপ্ত সৌরকিবণ ভাই
হিবণদিগঞ্চলে আমাদেব ঠাঁই
শঙ্কাবিহীন আশ্বাসভবে গাই
নবীনের জযগান।

প্রদোষ ধূসব গগনে আমবা হেবি
অরুণোদযের সহেনাকো আব দেবী
পূর্ব তোবণে শুনেছি বজ্র ভেরী
জীবনেব আহ্বান।

অনাগত জনে তোমবা তো জানিবেনা
জনতার ভীড়ে সাক্ষাত মিলিবেনা
আগামী কালেব আমরা মুক্তিসেনা
অভযব্রতীব দল।

আমরা যে ভাই দূব অজানার কবি
হৃদযে মোদেব ভবিষ্যতেব ছবি
ঊষাব আকাশে দেখি যে রক্তরবি
কিরণ সমুজ্জ্বল!

পায়ে-চলার পথের বস্তি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

কলিকাতার চলতি জনপ্রবাহের মধ্যে স্থানে স্থানে বস্তি গড়ে উঠেছে। সে সব বস্তির বাসিন্দার জনপ্রবাহের ছিট্‌কে পড়া টুকরো—চলমান জগৎ থেকে এরা স্খলিত হ'য়ে পড়েছে। চলবার পথের পাশে থেকেও এরা চলবার পথের বাইরে। এদের কোন পরিচয় নেই—এরা সবাই স্ব-স্ব পরিচয়েই খ্যাত। পিতৃ পরিচয়—কি বংশ গৌরব এদের কারুর নেই। পিতা-মাতা এদের কোথায় কবে ছেড়ে গিয়েছে—তারও কোন হিসাব কেউ লয় না—পিতা মাতা কার কি নাম দিয়েছিল সে অনুসন্ধানও কেউ করে না। ধর্মের গণ্ডি এদের পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে রাখে না।

এরা আছে দিনের পর দিন রাস্তার ধারে সান বাঁধানো পায়ে-চলার পথের উপর। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—এমনি এরা কাটিয়ে দিচ্ছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর শরৎ এল—সে চলে গিয়ে হেমন্তও শীতকে ডেকে দিল, এরপর পিক বঁধুর কুহুধ্বনি নিয়ে এল বসন্ত। বর্ষায় ঘর ছাইবার বা ছাদ মেরামত করবার এদের প্রয়োজন হয় না, সাদরে এরা শিরে ও শরীরে তার বর্ষণকে বরণ ক'রে নেয়। হেমন্তে শস্য সংগ্রহের আগ্রহ এদের নেই—এদের শস্য জমা হচ্ছে সবার ঘরে ঘরে। শীতকে এরা ভয় করে না—শীতের শীতল হস্ত এদের দেহে বুলিয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়—অন্তরের তপ্ত তাপে। বসন্তের পিক বঁধু এদের শরীরে কোন রোমাঞ্চ জাগায় না—মনের খবর এদের কে রাখে। তারপর গ্রীষ্মের খরতাপ এদের দেহের সমস্ত জ্বালাকে শুষে বাষ্প ক'রে নিয়ে যায়। এমনি করে এদের দিন কাটে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

তোমরা হয়ত বলবে—এত অ-প্রাণী জগতের কথা—উদ্ভিদেরও নীচে যারা। হয়ত তাই—কিন্তু বাহ্য আকৃতিতে এরা মানুষ। মন এদের আছে কি না, প্রকৃতি এদের মানবীয় কি না—চলমান চঞ্চল জনতা সে খোঁজ রাখে না। ট্রামের পর ট্রাম, মটরের পর মটর, বাসের পর বাস চলছে—পায়ে-চলার পথে এদের গা ঘেঁষে কত লোক চলছে। এদের অস্তিত্ব তাদের মনে কেবল একটুখানি ছোঁয়াচ দেয়—সে স্পর্শ মানব স্পর্শ নয়—সে স্পর্শ বীভৎস দৃশ্যের স্পর্শ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

গলিত এদের দেহ—কদর্য্য এদের বসন—ঘৃণ্য এদের আচার—কুৎসিৎ এদের আবেষ্টন পাশ দিয়ে যেতে ঘৃণা হয়—নাকে কাপড় দিয়ে গেলেও যেন শুচিতা বজায় রাখা যায় না—চোখ ফিরে যেতে চায় অন্য দিকে। কেউ অন্ধ—চোখের দু'কোন বেয়ে কি সব নির্গত হয়ে জমে আছে। কেউ খঞ্জ, কারুর হাত নেই—হয়ত গলিত ক্ষত থেকে পূঁজ পড়ছে। কারুর মুখের এক দিকের চোয়াল নেই—সমস্ত কুৎসিত দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে। কারুর গলিত দেহ—মাছি ভন ভন করছে।

কেউ ধারেই বমি করে রেখেছে—কেউ বা মলত্যাগ করেছে। এই বীত-মনুষ্যত্ব মানব দেহগুলি মানুষের মনে বীভৎস রসেরই সঞ্চার করে।

আমি পায়ে-চলার পথের চলতি জনপ্রবাহের অংশ হয়ে চলছি,—যাই-আসি। নাক বন্ধ ক'রে, চোখ ফিরিয়ে চলে যাই। এরাও দেখি হাসে—বরং কাঁদতে এদের দেখছি ব'লে মনে হয় না। হয়ত কান্না জমে জমে এদের আন্তরের গভীর গহ্বরে পাথর হয়ে আছে- ক'বে তা গ'লে avalanche হ'য়ে বেরুবে, জানি না।

এ সমাজ সাম্যের আদর্শ—শ্রেণী বা স্বার্থের সংঘর্ষ এখানে নেই। ধর্ম্ম এদের একই—বা কিছুই নেই। অর্থের দ্বন্দ্ব এদের নেই—ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব এরা জানে না। রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও এদের কিছু নেই—ফজলুলহকের শাসন ও ইংরাজের শাসনের পার্থক্য এদের কাছে কিছু মাত্র নেই। প্রদেশে প্রদেশে ঝগড়ার খবরও এরা জানে না। কোন ধর্ম্ম্য নেতা, কোন শ্রমিক নেতা বা কোন রাষ্ট্রীয় নেতা এদের কাছে আসে না,— ভাটিও এদের নেই।

কিন্তু তবুও এরা মানুষ—চলতি পথের মানুষের বাতাস এদের গায় লাগে। সে দিন শুনছি এরা বলছে—আরে ভনিয়া, জার্ম্মনী নাকি আবার লড়াই করেছে? ভনিয়া বলছে—তুমহার-হামাহার কি হোবে এ খবরে?

৩য়—না-রে ভাই, জার্ম্মেনী বহুৎ লড়াই করতে পারে—এসে পড়লে কি হবে কে জানে। হয়ত বা এখান থেকে সরিয়ে দিবে।

৪র্থ—কালু যে কি বলছিস, ওদের উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফিকছে ওরা এসে পড়বার আগেই রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'বে। বাবা, সে যা বোমা।

আর একদিনের কথা—

ভূতা বলছে—শুনছ তোমরা গান্ধী মাহারাজের সঙ্গে নাকি এ দিকে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই লাগছে।

মির্জা বলছে—গান্ধীজী লোকটা ভাল --কিন্তু মুস্কিল হয়-- এই গান্ধীজীর সঙ্গে লড়াই সুরু হ'লেই পুলিশের জুলুম বেজায় বেড়ে যায়—আর রাস্তার দু'ধারের লোকদের তাড়িয়ে বেড়ায়—আমাদের থাকা হয় মুস্কিল।

সেদিন দেখছি একটি পাগলী ও একটি অন্ধ আলাদা হ'য়ে বসে বেশ কি আলাপ করছে—তাদের চোখে-মুখে সমস্ত কদর্য্যতা ছাপিয়েও যেন একটা স্বাভাবিক মানব মনের ছবি ফুটে উঠছে। প্রতিবেশীরা কেউ ঠাট্টা করছে—কেউ হিংসার দৃষ্টি দিচ্ছে।

মানিক বলছে—আজ যে ভাই কিছুই মিলল না।

লালু বলছে—আমাব প্রায-শুকানো ঘাকে খুচিযে কাঁচা করে নিয়েছি—এ দেখিয়ে আজ কিছু পেযেছি।

এমনি সময় পাশের চৌতালা সৌধ থেকে কিছু ভুক্তাবশিষ্ট রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল।

কুকুরে-মানুষে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল—

...

বড়দিনেব ছুটি—পৌষের বাতে বাসায ফিবছি—একটু বেশী রাত হযেছে। খুব ঠাণ্ডা পড়ছে ও লাগছে—পাযে-চলাব পথের বস্তিব লোক ঘুমিযে পড়েছে। সিমেন্ট বাঁধানো বাস্তা—নীচ থেকে ঠাণ্ডা উঠছে—হযত এখান ওখান থেকে একটা কাটা চাটাই—বা শশ্মান থেকে কুড়িযে আনা কিছু বিছানার টুকবা-টাকবা গাযেব উপব দিযেছে। আব উপব থেকে ঠাণ্ডা ঝবে পড়ছে। সঙ্গে একজন সাথী উভযে আলাপ করছি—এই শীতেব মধ্যে কি ক'বে এভাবে শুযে আছে—এদের কি ঠাণ্ডা লাগে না।

সুপ্ত বস্তি থেকে একজন বলল—আমাদেব ঠাণ্ডা লাগলে যে চলে না, বাবু। একটু থমকে দাঁড়ালাম—কি তাকে জবাব দিব। সে-ই আবাব বলল্, "ঠাণ্ডায আব দাঁড়িযে থাকবেন না বাবু, চলে যান—আমাদেব দিন এমনি কাটছে—কাটবেও।"

কে যেন ঠেলে দিল, পিছন থেকে। দ্রুত চলে আসলাম। একটু আসতেই শুনি কে একজন গোংড়াচ্ছে—আবাব একটু দাঁড়ালাম। সেই স্বব থেকেই আবাব আওয়াজ এল—কি আর দেখছেন বাবু, আজ বাত্রেই ওব শেষ হবে।

... ...

পবদিন বিকাল বেলা আবাব যাচ্ছি—সেই পাযে-চলাব পথেব বস্তিব ভিতর দিযে। দেখি উপুড় হ'যে একটি যুবক পড়ে আছে—মনে পড়ল কালকাব বাত্রেব সেই গোংড়ানী। শরীবে উন্মুক্ত কাঁচা ক্ষত মাছি ভন ভন কবছে! বস্তিব লোক নিরুদ্বেগে ব'সে আছে—গল্প কবছে। চলমান জগতেব দু'চাবটি লোক সেই মৃত যুবক দেহ দেখছে—একজন বলছে—এ মুসলমান—অর্থ যেন এই এব পারলৌকিক সদগতি কে কববে, তার বিচাব হচ্ছে।

চলতে চলতে কে একজন বলল—আহা বেচারা মরে পড়ে আছে!—মরাটা তার 'আহা'ব কারণ নয—এমনি পড়ে থাকাটা তাব 'আহা'ব কাবণ।

আমার সঙ্গী বলল্—বেচাবা মবে বেঁচেছে। নিকটেই ঐ বস্তির একটি জীব বসে ছিল, এক দিকের গাল তাব একদম নেই—সবগুলি দাঁত বেব হযে মুখের অভ্যন্তরের সমস্ত কদর্য্যতাকে খুলে ধরেছে—হাতটা বেঁকানো, পা পঙ্গু। বললাম—সত্যি-ই এর বেঁচে থাকার সুখটা কোথায!

বন্ধু বলল—তবুও এ চায বেঁচে থাকতে, এবও মনে সুখের বাসনা, ভোগের কামনা, বাঁচবাব আকাঙ্ক্ষা আছে।

মনটা ভার হয়ে উঠল—চলছি পথ বেয়ে। হঠাৎ দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট হল একটা রিক্সার প্রতি। দুটি যুবক—পোষাক দেখে মনে হল, একটি অ বাঙ্গালী মুসলমান, আর একটি হয়ত বাঙ্গালী। রিক্সায় চড়ে আসছে। হঠাৎ রিক্সা থেমে গেল অ-বাঙ্গালীটি হিন্দী ভাষায় দু'একটা গালি দিয়ে রিক্সা কুলির পিঠে দু'একটা ঘুষি মারল—রিক্সা থেমে গেল। যুবক দুটি নেমে হন হন ক'রে রাস্তার অপর দিকে এক গলি দিয়ে চলে গেল।

কুলিটা চীৎকার ক'রে হিন্দীতে বলতে লাগল, "পায়সা দিবে না—পয়সা দিবে না?"

একটু দাঁড়িয়ে দেখলাম—সঙ্গের বন্ধু বললেন চলুন—কাজ আছে। তাইত দেরী করলে চলবে কেন, আমরা যে চলতি জগতের অংশ—এদের মত ছিটকে পড়া স্থাণু অংশ নয়।

চলতেই শুনলাম চৌতালা বাড়ি থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে গানের ধ্বনি—

পায়ে-চলার পথের বস্তির জগৎ পিছনে পড়ে রইল। চলমান জগতের সঙ্গে মিশে গেলাম। কলিকাতার রাস্তার ভিক্ষুক সমাজ পিছন থেকে তখনও ডাকছে। কে এরা। সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি? এরা বঞ্চক কি বঞ্চিত? এরা কি পরান্নভোজী না বিপ্রলব্ধ? সমাজের কাছে এদের ঋণ জমছে? না, এদের প্রতি কর্ত্তব্য-অপালনের ঋণ সমাজকে একদিন পরিশোধের চেষ্টা করতে হবে?

সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব

শ্রীমতী তরুলতা সেন বি এ,

আমি সাহিত্যিকা নই। নিতান্ত অনুরোধে পড়ে আমাকে বাধ্য হয়ে দু'চারটা কথা বলতে হচ্ছে। সাহিত্য বল্‌তে কি বোঝায়, কি কি গুণ লেখার ভিতর থাক্‌লে তা সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করে, সে সব পণ্ডিতি কথা আলোচনা করবার আমার শক্তিও নাই, তার আবশ্যকতাও নাই। এই টুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে—যে রূপ, রস, গন্ধ বিশ্বে অন্তর্নিহিত বা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, যাকে অনেকে দেখ্‌তে পান না, প্রকাশ করতে পারা দূরের কথা, আবার অনেকে আছেন যাঁরা দেখ্‌তে পান, অনুভব করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না। আবার দু'চার জন বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন যাঁরা তা প্রকাশও করতে পারেন। শেষোক্ত ভাগ্যবানেরাই হচ্ছেন সাহিত্যিক। যে রসের, আস্বাদনে আমরা ইতরে জনাঃ বঞ্চিত ছিলাম, সাহিত্যিক মনীষীরা সেই রস আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে ধরেন। এ গুলো মানুষের মনের ও আত্মার খোরাক। এই খোরাক যাঁরা যোগান তাঁরা মানবতার অতিবড় হিতৈষী বা দাতা, তাঁরা মানব সমাজের নমস্য।

কিন্তু সাহিত্যিকের এই সম্মান ও গৌরবলাভের যোগ্যতা না থাকলেও লোভ আমাদের অনেকেরই আছে। কারণ এত বড় সম্মানের মর্য্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক; তাই

আমরা বাজারে অল্প সংখ্যক খাঁটি সাহিত্যিকের পাশে অসংখ্য মেকী সাহিত্যিক দেখ্‌তে পাই। তাদের কাজ হচ্ছে পরের ঐশ্বর্য্য অপহরণ ক'রে তাকে নূতন ক'রে সাজিয়ে নিজের নামে চালানো। প্রকৃত জহুরী যেমন খাঁটি ও মেকির মধ্যে পার্থক্য অতি সহজেই ধরতে পারেন, মানুষের মনও খাঁটি ও মেকী সাহিত্যের ভিতরকার প্রভেদ সহজেই অনুভব করতে পারেন। তাই অনুকরণ সাহিত্য, নকল সাহিত্য, বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ সাহিত্য শুক্‌নোপাতার মত দুদিন বাদে ঝরে পড়ে। প্রকৃত সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তা শুধু বর্ত্তমান সত্যকেই সুরে ও রঙে প্রকাশিত করে ধরে তা নয় অধিকন্তু কোনো সত্যের জন্মকে ও ভাবী কালকে তারা মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে আবাহন করে আনে। তাঁদের আগমনী গান থেকেই আমরা জান্‌তে পারি একটা বড় কিছু সত্য দেশের সম্মুখে প্রকাশিত ও আবির্ভূত হবার জন্য অপেক্ষা করছে,—যে সত্য সেই দেশ ও কালকে মহিমান্বিত ক'রে তুল্‌বে।

রবীন্দ্রনাথ আজও বেঁচে আছেন, তাই অবশ্য আমরা বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে খুব উঁচু আসন দাবী করতে পারি। তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর তিরোধানের পর আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কাউকে এখন দেখা যাচ্ছে না যিনি বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের পতাকা নূতন ক'রে উঁচু ক'রে বিশ্বের বা বাংলার দরবারে ধরতে পারেন, কিম্বা বাংলার জীবন ইতিহাসের মোড় ফিরবার এই দিনে তার পথপ্রদর্শক হ'তে পারেন। এই কথা বলে আমি বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকদের মনে আঘাত দিতে চাই না। তাঁদের মধ্যে অনেক শক্তিমান লেখক আছেন যাঁদের style বা প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ততটা তীব্র নয়, যা মানুষের মনের উপর নূতন আলোক সম্পাত করতে পারে, যে আলোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে আমরা নূতন সত্য দেখ্‌তে পাব।

বর্ত্তমানের নিন্দা ও অতীতের প্রশংসা মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একে মানুষের দুর্ব্বলতা আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতারও প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষই মানুষকে নূতন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করে, নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। সুতরাং আমার অভিযোগ মিথ্যা হ'লেও দুঃখ করবার কারণ নাই। দুঃখ হ'চ্ছে এই যে—আমার খুব আশঙ্কা—আমার এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। বঙ্কিম তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে বাংলায় স্বদেশ-প্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, তাঁরই আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্‌ হ'তে বাংলায় প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হয়ে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্কিমের সাথে সাথেই প্রায় এলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি বাংলা ভাষার উদ্যানে যে কাব্যবিতান রচনা করেছেন, রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে তার তুলনা সমস্ত বিশ্বে মেলা দুষ্কর। তিনি আজ শুধু বাংলার সাহিত্যিক নন, বিশ্বের চিন্তা জগতের একজন মহারথী। তাঁরই জীবনের মাঝখানে এলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের মত জগৎজোড়া ব্যক্তিত্বের পাশে দাঁড়িয়েও তিনি আমাদের নূতন জ্ঞান ও সমাজের উপর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যেতে পেরেছেন, এটা কম কথা নয়। যোগেন্দ্র সরকারের শিশুসাহিত্য হ'তে শিশুরা "আনন্দে কবিতে

পান সুধা নিরবধি,", সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল"এর জুড়ি আর আমরা পাইনা। "কজ্জলী" ও "গড্ডালিকা"রও আর আজ নূতন রূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

হেমচন্দ্রের "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুকি ঘুমায়ে রবে?"

নবীনচন্দ্রের সেই খেদোক্তি—

"সাধেকি বাঙ্গালী মোরা চিরপরাধীন,
সাধেকি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন, করে অপমান
প্রতি দিন শত শত চক্ষের উপরে?
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হ'বে এক মত -
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ—"

—এই সবই কবির প্রাণের স্পন্দনে ও অনুভূতিতে জীবন্ত। আজকাল হয়ত অনেকেই আরও শতগুণ সুন্দর বাক্যবিন্যাস ক'রে কবিতা লিখে থাকেন, কিন্তু তাহা মানুষের হৃদয়কে এভাবে স্পর্শ করতে পারে না। এই সব রচনাকে inspired আখ্যা দেওয়া চলে না।

সাহিত্য দুই রকমে সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাবে, যথা— বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ে। অথবা দেশের কোনও বিশেষ প্রাণ-স্পন্দনের অভিব্যক্তিতে। স্বদেশী যুগে যে গানে ও কবিতায় দেশ ভেসে গিয়েছিল তাহার মূলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রেরণাকে শুধু জয়মাল্য দেওয়া চলে না—তার জন্য দায়ী সেই সময়কার ভাবের বন্যাধারা, যা অনেক সাধারণ কবিকেও অনুপ্রেরণা দিয়ে বড় সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এখন আমরা যে কালের ভিতর দিয়ে চলেছি তাতে নূতন সাহিত্য-সম্রাটের দর্শন লাভ ঘটেনি বলে দুঃখ আমি করতাম না যদি আমাদের সাহিত্য-প্রতিভা একটা সবল ও সার্থক democracyর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে দেখ্‌তে পেতাম। ক্ষেত্র তার জন্য খুবই উপযুক্ত ছিল। ভারতবর্ষ, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী, আজ যে জীবন-মরণ সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীতে খুব কম জাতির ভাগ্যেই এরূপ সন্ধিক্ষণ এসেছে। আমরা একটা খুব বড় রকমের মোড় ফিরবার মুখে দাঁড়িয়ে আছি। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, স্বাধীনতা এবং সবার উপরে আর্থিক অবস্থা—সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের বিরাট সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বসভ্যতাও একটা বড় পরিবর্ত্তনের

মুখে এসে পৌঁছেছে। নূতন যুগ, নূতন সভ্যতা অতি সন্নিকট বলে মনে হয়। বিশ্বের এই আসন্ন নূতন পটভূমির মাঝখানে আমরা কি রূপ নেবো, আমাদের স্থান কোথায় হবে, নিজেকে তৈরী করে নিয়ে আমরা বিশ্বকে আবার কিছু দিতে পারব কি? না—সকলের পিছনে সবার কৃপার পাত্র হ'য়েই থাকব—এরূপ নানা গুরুতর পরিস্থিতি ও চিন্তার মাঝখানে আমরা এখন উপস্থিত।

এরূপ বিরাট সমস্যা থেকেও আমাদের সাহিত্যিকেরা কোন রকম প্রেরণাই পাচ্ছেন না। এত বড় মর্ম্মান্তিক পরিস্থিতিও আমাদের সাহিত্য জগতে বিন্দুমাত্র আলোড়ন উপস্থিত করতে পেরেছে বলে অনুভব করতে পারছি না। সাধারণ প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করবার অবস্থা দেশে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, realism থেকে অনেক দূরে সরে এসে পড়ায় নূতন সৃষ্টির বেদনা-স্পর্শ আমাদের সাহিত্যিকদের নিকট যেন এসে পৌঁছতে পারছে না। দেশের নাড়ীর সাথে যোগসূত্র আমাদের সাহিত্যিকেরা হারিয়ে ফেলেছেন। তারই ফলে আজ এই tragedy এবং যে সাহিত্য তৈরী হচ্ছে তাও ডাঃ হেমেন্দ্র সেনের ভাষায় "কোটপ্যাণ্ট পরা কালা সাহিত্য"। আমাদের সাহিত্য-সাধনা করবার পূর্ব্বে যেখানে আমরা জন্মেছি, যেখানে আমরা বিচরণ করছি, যাদের সঙ্গে আমাদের জীবন-গ্রন্থি জড়ানো, তাকে ও তাদের সবকে আমাদের চিন্‌তে ও জান্‌তে হবে। আরাম কেদারায় বসে যেমন আজকার দিনে রাজনীতি চর্চ্চা চলে না—ঘরের মাঝখানে বসে থেকে সাহিত্য সৃষ্টিও হয় না। দেশের জল-বায়ু-কাদা, ঝাড়-জঙ্গল-পাহাড়, খাল-বিল-নদী, কোল-ভীল-সাঁওতাল, চাষী-মজুর, সবার সাথে কাঁধ মিলিয়ে মিশতে পার্‌লে, সবার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগ নিতে পারলেই সত্যিকারের সাহিত্যিক আমরা পাব। নইলে শুধু বালিগঞ্জের লেকের অভিজ্ঞতা আমাদের সাহিত্যকে প্রাণ দিতে পারবে না।*

* রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাঁচি হিন্দু বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১২ই নভেম্বর তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

অশোকা না Mrs Roy ?

শ্রীমতী বীণা দাস

আমাদের সে সময় আশঙ্কা হ'ত অশোকাকে দেখে হয়তো লোকের চাঁদা-phobea রোগ দেখা দেয়। তার ১৯ বছরের জীবনে সে একা যত চাঁদা আমাদের তুলে দিয়েছিল হিসাব তার কেউ রাখিনি, নইলে সেটা এখনও একটা বিস্ময়ের বস্তু হয়েই থাকত নিশ্চয়। শুধু কি আমাদের ? তার এই ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার কথা কারো কাছেই গোপন ছিল না, (প্রতিভাতো কোন দিনই চাপা থাকে না !) --তাই দক্ষিণ কলিকাতার subscription তোলার কাজটা ওরই একচেটিয়া ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায়। কোন্ গরীব ছেলে টাকার অভাবে fees দিতে পাচ্ছে না, কোথায় কাদের জন্য Defence fund খোলা হয়েছে, কারা টাকার অভাবে libraryতে ভালো বই কিনে উঠতে পারছেনা, কোন্ clubএর ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে—কোথায় বন্যাপীড়িতদের কান্না জেগে উঠেছে—সবাই-ই সব শেষে অন্তিম আশা নিয়ে অশোকার কাছে এসে দাঁড়াত। আমরা ওকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, "অশোকা, তোর বারে বারে লোকের কাছে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করেনা ?" আমাদের কথায় ও রেগে উঠত। "তার মানে ? আমি কি নিজের জন্য চাই নাকি ?" "যার জন্যই চাস, লোকেরা কি ভাবে বল্‌তো, একবার দুবার হ'লে না হয় হ'ত বার বার একই লোকেদের কাছে—।" "তা কি করব, ওদের রয়েছে অপর্য্যাপ্ত—আর এদের হ'চ্ছে দরকার, যাকে বলে bare necessities ! সমাজে যত দিন এরকম mal-distribution থাকবে ততদিন তো এরকম করতেই হবে—আমি সেই mal-distribution একটুখানি দূর করবার চেষ্টা করি মাত্র, আর কিছুই নয়। আমাদের এখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমি হচ্ছি একটা main factor,—অপরিহার্য্য অঙ্গ। মিথ্যেই তোরা Economics পড়িস, কাজের বেলা কেউ কিছুই নোস্।" অশোকার মতে আমরা ভীরু, আত্মপরায়ণ, অকেজো। আর বাস্তবিকই যুক্তিটা তার মেনে নিলেও বড়লোকের বাড়ী বার বার হাতপাতার লজ্জা কাটিয়ে উঠতে আমরা কিছুতেই পারতামনা। কত ধরণের বড়লোক, কত বাড়ীতে কতরকমের অভ্যর্থনা যে পেতে হয় সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাও যে একেবারেই ছিলনা তা তো নয়—অশোকার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমরাও ঘুরেছি যে। অশোকার tactics ছিল অনেকরকম। কোথাও সে এমন জোরের সঙ্গে চাইত, মনে হ'ত যেন এ তার মস্ত বড় দাবী, ওকে 'না' বলা একেবারে অসম্ভব। যেন ও ওর গচ্ছিত টাকাই ফিরে চাইছে, কিম্বা ধার দিয়েছিল সেইটাই ! কোথাও কোথাও রাগ করত, বকাবকি করত—কোথাও বা আবদার। হাতপাতার লজ্জা, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমান, নিরাশ হওয়ার দুঃখ, অধ্যবসায়ের চরম পরীক্ষার ক্লান্তি, কোনও কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারত না—বিচলিত করা তো দূরের কথা ! যুক্তি দিয়ে অনুভূতিকে কি এমন করে দূর করা যায় ? আগে তো জানতাম না ! ও বলতো

"অনুভূতির ক্ষেত্রেও আমার নজীর আছে ভাই—আমি হচ্ছি রবীন্দ্রনাথের 'ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া'

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
ওদের সবার ঘরে ঘরে।"

আমি নিজে একবার ওর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে বড় বেশী উপকৃত হয়েছিলাম, সেই ঋণটুকু এখানে স্বীকার ক'রে নিই। কোনও কারণে একসপ্তাহের মধ্যে কিছু বেশী পরিমাণে টাকা আমার দরকার হয়ে পড়েছিল। এরকম অসম্ভব যে কি করে সম্ভব হ'বে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না! গেলাম অশোকার কাছে। টাকার পরিমাণ শুনে একটু সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকাল, বল্ল, "কি করবি এত টাকা?" "যাই-ই করি—বড্ড দরকার, যোগাড় করে তোকে দিতেই হ'বে ভাই।" আবার খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষকালে বল্ল, "আচ্ছা।" তিন দিন পরেই টাকাটা আমি পেয়েছিলাম। কি করে যে এত শীঘ্র এত টাকা ও যোগাড় করল ওকে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে আমার হয়নি, আজও আমি জানি না। তবু ওর কথা যখনই ভাবি ওর সেদিনের সেই দৃষ্টিটা আমার মনে পড়ে আর মনে পড়ে সেই ছোট্ট কথা "আচ্ছা"—নির্ভর করার মত এমন কণ্ঠস্বর আমি বড় বেশী শুনিনি।

তারপর কতদিন—কতদিন ওকে দেখিনি। ও থাকে বিদেশে স্বামীর কাছে। ওর মাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি। একদিন তিনি বল্লেন, "অশোকা এসেছে—।"

গেলাম ওর কাছে। তখন বেলা ৯টা, শুনলাম তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। সামনে এসে যখন দাঁড়াল, দুজনেই প্রথমটা কিরকম যেন হয়ে গেলাম। কি বলব মুখে আসছিলনা—শেষকালে হঠাৎ পুরাণো দিনের কথা মনে পড়ে গেল, খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বল্লাম, 'অশোকা, টাকার জন্য এসেছি।" "টাকা কিসের টাকা? ও হ্যাঁ, মা বলছিলেন বটে 'মন্দিরা'র না কিসের security চেয়েছে। কিন্তু ভাই ওসব ব্যাপারে সাহায্য করা তো এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়,—উনি পছন্দ করেন না।"—"নাম না হয় না দিলি, এমনি কিছু দেনা—তুই নিজে।"—"না—না, সে সব পারব টারব না। তারপর চা টা খাওয়া হয়েছে? আনতে বলব? শরীর আছে কেমন?—ভালো?" "না 'চা' 'টা' এখন চাই না। শরীর ভালই। তুমি কেমন আছ? আগের চেয়ে আরও তো ভাল দেখাচ্ছে—কতদিন পরে দেখা! চিনতে কিন্তু অসুবিধে হয়নি কিছু। রোকার মত আর কি কি বলেছিলাম মনে নেই ঠিক, উঠে আসতে পারলেই যেন বাঁচি। আমি তো আর অশোকা নই—mal-distribution দূর করবার factor বলে নিজেকে ভাবতেও পারি না। প্রত্যাখ্যাত হলে খারাপও আমার লাগে—তাছাড়া বন্ধুর কাছে। সে ব্যাপারে অশোকা কোন্ যুক্তিবলে নিজেকে আঘাত থেকে রক্ষা করত? ভুলে গিয়েছি।

ব্যাপারটা আমি চেপে যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু কেমন করে সবাই-ই জেনে গেল! আমাকে বকল, "যেমন তোমার বুদ্ধি Mrs. Roy এর কাছে গিয়েছো টাকা চাইতে—Mr. Roy অত বড়

Govt. Officer; স্বদেশীর নামে যে ক্ষেপে ওঠে।" "আমি তো Mrs. Roy এর কাছে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম 'অশোকার' কাছে।" আমার কথায় সবাই ওরা সজোরে হেসে উঠল।

অর্থাৎ - Mrs. Roy এর থেকে অশোকাকে নাকি আবার তফাৎ করা যায়?

অর্থাৎ—এতদিন এত বছর এত পরিবর্ত্তনের পরেও নাকি সেই অশোকাকে আবার খুঁজে পাওয়া যায়?

অর্থাৎ—সংসারের রথচক্রে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর গৃহের উত্তপ্ত আবেষ্টনে গুঁড়িয়ে যায় কত উচ্চতম আদর্শ, কত মহত্তম পরিকল্পনা, শুকিয়ে যায় কত সহানুভূতির আর্দ্রতা, কত সহৃদয়তার কোমলতা, অশোকা তো অশোকা।—

কিন্তু ওরা তো কেউ অশোকাকে চিনত না, আমাদের সেই কলেজ জীবনের অশোকা!

বিপ্লবী-ফ্রান্স

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

ফ্রান্সের ইতিহাসে নবযুগের অবতারণা হইল। দীর্ঘকালের অবসাদ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার কাটিয়া গেল। সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজপুরীর কন্যা যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে, রাজার হত্যায় ফ্রান্সের মানবাত্মা তেমনই উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের জন্য রেপারিকের জন্য প্রবল অনুরাগের স্রোত সমগ্র দেশ প্লাবিত করিল। দেশে কিম্বা বিদেশে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি, রফার কথা উত্থাপন করা চলিল না। দেশ হইতে রাজার পৃষ্ঠপোষক ও গণতন্ত্রবিরোধীগণকে নির্ম্মূল করিতে হইবে, বিদেশে বিপ্লবপন্থীগণকে রক্ষা ও সাহায্য করিতে হইবে—বিশ্বে, সমগ্র ইয়োরোপে ফ্রান্সের গণতন্ত্র স্বাধীনতার প্রতিভূ হইবে, এইরূপ মনোভাব ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। নবীন উদ্দীপনার আতিশয্যে ফ্রান্সের তরুণ দল অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা দলে দলে আসিয়া জাতীয় সৈন্যবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করিল। জন্মভূমির কান্ত-মধুর রূপ কল্পনার সহিত তাঁহার ভীম ভৈরবী মূর্ত্তি একজন তরুণ যুবকের মনে স্থান লাভ করিয়া "মার্শেলস" নামক সঙ্গীতে মন্দ্রিত হইয়া উঠিল। এই সঙ্গীত তৎকালীন জাতীয় মনোভাবের প্রতীক্। সেই অবধি ইহা ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া আসিতেছে। ইহার মূর্চ্ছনায় এখনও স্বদেশ প্রেমের মদিরা ক্ষরিত হয়, সমগ্র জাতির মনে অপরূপ অনুভূতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই সঙ্গীতের উন্মাদনী শক্তিতে মাতিয়া ফ্রান্সের তরুণদল শত্রুধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইল। তাহাদের নবোদ্বোধিত প্রাণের উদ্দাম উন্মাদনার সমক্ষে নবোদিত অরুণরাগস্পর্শে অন্ধকারের ন্যায় বৈদেশিক শক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। ১৭৯২ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ফরাসী সামরিক শক্তি ফ্রান্সের প্রাপ্তসীমা অতিক্রম করিল এবং বিদেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দশ লুইএর বিজয় অভিযানের গৌরব অতিক্রম

করিল। ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ব্রুসেলস্ নগরে উপস্থিত হইল, সেভয় অধিকার করিল, মেয়েনস্ পর্য্যন্ত তাহাদের বিজয় অভিযান বিস্তৃত হইল, হল্যাণ্ডের অধিকার হইতে সেলড্ কাড়িয়া লওয়া হইল।

রাজার ফাঁসী হইবার পর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দূতকে ইংল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগের অভিজাত সামরিক কর্ম্মচারিগণের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফ্রান্সের যুবশক্তি নূতন জীবন, নূতন উদ্যমের আবেগে প্রবল পদাতিক সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিল। ইহা অন্তর্বিপ্লব ও বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের দমনে ব্যস্ত ছিল। এইজন্য ফ্রান্সের নৌবহর অবজ্ঞাত ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের নৌবহরের সহিত ইহার সমকক্ষতা করা অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ফরাসী বিপ্লবের উপর ইংল্যাণ্ডের সহানুভূতিপূর্ণ উদার মনোভাব নষ্ট হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স ইয়োরোপের সমবেত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ করিতে লাগিল, অষ্ট্রিয়ানগণ বেলজিয়ম হইতে বিতাড়িত হইল। হল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। ডাচ্‌দিগের নৌবহর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়নের অধিনায়কত্বে ফরাসী সৈন্য পিড্‌মণ্ট অতিক্রম করিয়া মানটুয়া ও ভিরোনা পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়া লইল। এই অসময়ে ফ্রান্সের অভিযান ও দেশ জয় চমকপ্রদ। এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার প্রভাবে ফরাসী চরিত্রে এক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বের পেশাদার সৈন্যগণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধ করিত, তাহাদের কোন উচ্চ আদর্শের উন্মাদনা, বা দেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা ছিল না। তাহারা শ্রমিকের ন্যায় মজুরী লইয়া যুদ্ধ করিত। কিন্তু এই জাতীয় সৈন্যবাহিনী বিজয় লাভের জন্য, স্বদেশের গৌরব ও বাহুবল বিস্তারের জন্য, জাতীয় মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। বস্ত্র ও খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও তাহাদের উৎসাহের অভাব হয় নাই। যে সকল অভাব অসুবিধার জন্য পেশাদার সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইত তাহা ১৭৯৩-৯৪ সনের ফ্রান্সের সৈন্যগণ হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

ম্যারাটের মৃত্যুর পর রোবস্পীয়র জেকোবিন দলের নেতা হইলেন। তাঁহার দেহ ক্ষীণ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ ভীরু ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল না। সাধারণ লোকে যে ভগবানের উপাসনা করিত, সে ভগবানে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিতেন যে, বিশ্বের নিয়ন্তা পরমপুরুষ। তিনি রুশোর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে একমাত্র তিনিই ফ্রান্সের নব প্রতিষ্ঠিত রেপাব্লিকের চালক ও রক্ষক এবং শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা হস্তগত করিলেই রেপাব্লিক দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার মতে, রাজা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের শোণিতে গণদেবতার জন্ম এবং সেই শোণিতই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। পশ্চিমাঞ্চলে লা ভেন্‌ডি জেলার অধিবাসিগণ অস্ত্র ধারণ করিল। দক্ষিণাঞ্চলে লিয়নস্ এবং মার্শেলেস্ বিদ্রোহ করিল। টুলোন নগরে ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের সৈন্য ছাউনি পাতিল, ইহার শাস্তি—হত্যা—অবাধ হত্যা। হত্যা ব্যতীত

প্যারিসের বস্তির লোকেরা সন্তুষ্ট হইল না। এই পৈশাচিক নীতির রুদ্রলীলা চলিতে লাগিল। অসংখ্য নরনারীর জীবন উৎসর্গ করা হইল। ১৭৯৪ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে তের মাসের মধ্যে ১২২০ জন এবং পরবর্ত্তী সাত সপ্তাহে ১৩৭৬ জন ব্যক্তি গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ আহুতি দিল। রাণীও এই যন্ত্রের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। রোবসপীয়রের বিরুদ্ধাচারী বহু ব্যক্তিকে গিলোটিন করা হইল। যাহারা পরমপুরুষবাদ স্বীকার করিল না তাহাদিগকেও গিলোটিন করা হইল, গিলোটিন যন্ত্র অত্যধিক ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়াছিলেন বলিয়া ডান্টনকে গিলোটিন করা হইল। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিলেটিন যন্ত্র প্রবলবেগে শত শত নরনারীর মুণ্ড ছেদন করিতে লাগিল। দমন, ধর্ষণ, হত্যা, রক্তপাত অবিরাম চলিতে লাগিল। অভিজাত ও ধনিগণ দরিদ্রের পোষাক পরিয়া ছদ্মবেশে পলাইতে চেষ্টা করিল। রক্ষিগণ তাহাদের হাত পরীক্ষা করিতে লাগিল, তাহারা যে ব্যক্তির হাত কোমল দেখিত তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শিরশ্ছেদ করিত। নররক্তের আস্বাদ পাইলে ব্যাঘ্র যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিতে থাকে, তেমনি রোবস্পীয়রও শোণিত পিপাসা তৃপ্তির জন্য নৃশংস ও নিষ্ঠুর হত্যা অবাধে চালাইতে লাগিলেন। প্যারিসের মাটী নর শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল। যাহারা এই বিভীষিকার অভিনয় করিয়াছিল তাহারাও নিষ্কৃতি পাইল না।

রোবস্পীয়র বিশ্বাস করিতেন যে এই রক্তরঞ্জিত পথেই ফ্রান্সের মুক্তি আসিবে। পৃথিবীতে মানবতার স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। মনুষ্য জীবনে, রাষ্ট্রে ও সমাজে এক নূতন যুগের অবতারণা করিবার অদম্য উৎসাহে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ জন সভ্য লইয়া একটী ক্ষুদ্র শাসন পরিষদ গঠিত হইল। দেশের সমস্ত জমী সমানভাবে ভাগ করিয়া দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ধনীর উপর গুরু কর স্থাপন করা হইল। কিম্বা তাহার সম্পত্তি রাজেযাপ্ত করিয়া লইয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল, একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কঠোর আইন করা হইল, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গের ব্যবস্থা সহজ করা হইল, জারজ ও ক্ষেত্রজ সন্তানের মধ্যে পার্থক্য রহিল না। মাসের নূতন নাম দেওয়া হইল, দশ দিনে সপ্তাহ, এই ব্যবস্থা করিয়া নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল। ওজন ও মাপের জন্য দশমিকে ব্যবহৃত হইল, উগ্র বামপন্থীগণ ভগবানকে নির্ব্বাসিত করিয়া বিচার বুদ্ধির উপাসনা করিতে লাগিলেন। নটার ডেম গির্জ্জায় "বুদ্ধির ভোজ" নাম দিয়া একখানি নাটকের অভিনয় হইল, রোবস্পীয়র ইহার অনুমোদন করিতে পারিলেন না। তিনি নাস্তিক্ ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতা অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি, যে পরমপুরুষ অত্যাচারপিষ্ট নিরপরাধ ব্যক্তিগণের রক্ষাকর্ত্তা এবং যিনি বিজয়গর্ব্বদৃপ্ত পাপীগণের শাস্তি বিধান করেন, তাহার সম্বন্ধে ধারণা সহজ মানুষের চিরন্তনী অভিজ্ঞতা। যাহারা "বুদ্ধির ভোজ" নাটক অভিনয় করিয়াছিল গিলোটিনে তাহাদের শিরশ্ছেদ করা হইল। একদিকে পরমপুরুষবাদের অন্ধতা, অন্যদিকে নরশোণিত-পাত, এই বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির অস্বাভাবিক সামঞ্জস্য জগতের ইতিহাসে বিরল। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি মস্তিষ্ক বিকৃতির নামান্তর। পরমপুরুষবাদ ফ্রান্সের জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিষদ স্বীকার করিয়া লইলেন,

পরম পুরুষের মহিমা প্রচারের জন্য একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হইল। আড়ম্বরের সহিত শোভাযাত্রা করা হইল, পাপ ও নাস্তিকতার দুইটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের সামনে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইল এবং অগ্নিশিখার মধ্য হইতে জ্ঞানের মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তারপর রোবস্পীয়র প্রধান বক্তারূপে পরমপুরুষের মহিমা বিবৃত করিলেন। একমাস নির্জ্জন বাসের পর তিনি পুনরায় কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ও তাঁহার সহায়কগণ বন্দী হইলেন। তাঁহাকে গিলোটিন যন্ত্রের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার রক্তপিপাসু জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা পড়িয়া গেল, সন্ত্রাসযুগের অবসান হইল।

কোন ব্যক্তি বা জাতির গুণাগুণের যথাযথ পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, সেই যুগের মাপকাঠি লইয়া তাহার বিচার করিতে হইবে। কারণ ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে ধারনা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক সত্য ও ন্যায়ান্যায় বিচারের সময় যুগ বা পরিস্থিতির কথা আমাদের মনে উদয় হয় না। বিশেষ কোন সঙ্কল্প সাধনের জন্য যখন কোন জাতি আরামের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ সাধনে ব্রতী হয়, তখন তাহার কাজে ও ব্যবহারে, আত্মদানে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তাহার অন্তর্নিহিত মহৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঐশ্বর্য্যই তাহার চরিত্রের পরম সত্য।

ফ্রান্সের লুইরাজগণ ও তাঁহাদের পার্শ্বচর অভিজাত শ্রেণীর কার্য্যাবলী ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল, প্রিন্স, ডিউক, কাউণ্ট প্রভৃতি উপাধিধারীগণ সুবর্ণখচিত পোষাক পরিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় বিচরণ করিতেন। ভল্টেয়ার প্রমুখ ভাবুকদের শিক্ষার ফলে সাধারণ ব্যক্তির মনে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবেশ করিয়াছিল। ইয়োরোপে সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুদ্ধ বিগ্রহে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। যুদ্ধ ও আড়ম্বরের ব্যয় বাহুল্যে রাজা ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। আবার ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ফ্রান্সের লোকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহারা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতি হইয়াছিল। তাহাদের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণও এই মত পোষণ করিতেন, উগ্র বামপন্থীগণও সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে ফরাসী জাতি জাগ্রত হইয়াছিল, বিপ্লবের যুগে হত্যা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তাহাদের অজেয় আত্মিক শক্তির মধ্যে যে মহান সত্য ছিল তাহা বিশ্বমানবের পরম সম্পদরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই পরমবিত্ত লাভের জন্য কয়েক সহস্র মনুষ্যের রক্তপাত যীশুখৃষ্ট বা বুদ্ধদেবের অনুশাসনের বিপরীত হইতে পারে কিন্তু মধ্যযুগের ইয়োরোপে অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যে সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়াছিল কিম্বা বর্ত্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্য কূটনীতি পরিচালিত মহাযুদ্ধের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের যূপকাষ্ঠে যে সহস্র সহস্র বিকারগ্রস্ত লোকের আত্মবিসর্জ্জন সংঘটিত হইতেছে, তাহার তুলনায় ইহা নগণ্য। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে সোম অভিযানের প্রথম দিনই ব্রিটিশ সেনাপতিগণ যত লোক ধ্বংস করিয়াছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তত লোকের প্রাণ নষ্ট হয় নাই। সন্ত্রাসযুগে যাহাদের জীবন বলি দেওয়া হইয়াছিল,

তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতক ও প্রজাতন্ত্র বিরোধী ছিল। সামান্য অপরাধের জন্য যখন প্রাণ বধের ব্যবস্থা ঐ যুগের নীতি ছিল, তখন ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় একটা মহাপ্রলয়ের সময় দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া বিশেষ কোন দোষের কথা নয়। সুসভ্য ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক ছিল। ১৮০১সালে একটী চশমা চুরির অপরাধে বার বৎসর বয়সের একটী বালকের ফাঁসী হইযাছিল। ১৮১০ সালে পাঁচ শিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নিবারণের প্রস্তাব হইলে ইংল্যাণ্ডের তদনীন্তন প্রধান বিচারপতি দুঃখের সহিত বলিযাছিলেন উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা মাথার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে কি পায়ের উপর ভর দিযা দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা থাকিবে না। সুতরাং ঐরূপ বিপজ্জনক প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। যে সকল দেশে চক্ষুর জন্য চক্ষু, দন্তের জন্য দন্ত উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা, সেই সকল স্থানে উচ্চ আদর্শলাভের উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত মানুষ যে দেশদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

১৭৯৮ সালের পর ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসন কার্য্যে প্রভুত্ব লাভের প্রচেষ্টায় জটিল হইযাছিল। তাহাদের মধ্যে উগ্র প্রজাতন্ত্রী হইতে অবাধ রাজতন্ত্রী পর্য্যন্ত ছোট বড় বহু দল ছিল। তাহারা রাষ্ট্রে প্রভুত্ব লাভের জন্য পরস্পর বিবাদ ও চেষ্টা করিতে থাকিলেও এমনকি কিছু ত্যাগ স্বীকার করিযা সকলেই শাসন বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ও কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে ব্যগ্র হইযাছিল, পর পর কয়েকটি বিদ্রোহ হইযাছিল। প্যারিসের গুণ্ডাদল গোলমালের সুযোগ লইয়া পক্ষাপক্ষ বিচার না করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিত। শাসন কার্য্যে সুবিচারের জন্য পাঁচ জন সদস্য লইয়া ডাইরেক্টরী স্থাপিত হইল। নেপোলিযন নামে একজন তরুণ সেনাপতি ১৭৯৫ সালের বিদ্রোহকে দমন করিয়া বীরত্ব ও কৌশল দেখাইযাছিলেন। ডাইরেক্টরীর আমলে বিদেশে বিজয়ী ফ্রান্স স্বদেশে গঠনমূলক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ নিজেদের স্বার্থক্ষুধা মিটাইতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা বা উন্নতি করিতে হইলে যে সাধুতা ও চরিত্রবলের প্রয়োজন, তাহা তাহাদের ছিল না। স্বার্থহানির আশঙ্কায় তাহারা কোন নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নাই। তাহাদের মধ্যে কারনট সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন কিন্তু শয়তানি বুদ্ধির জন্য বারাস অন্য সকলকে অতিক্রম করিযাছিলেন। ইতিহাসের এই প্রগতি ও পরিবর্ত্তনের যুগে ডাইরেক্টরীর শাসনকাল ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে উর্ব্বর ছিল। এই পঞ্চবার্ষিক শাসনকালের পূর্ব্বের বিধি ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত ও স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের উত্তেজনা ও উৎসাহ ফ্রান্সের ধমনীতে নূতন রক্তের স্রোত বহাইয়া দিযাছিল। তাহার গতিবেগ হল্যাণ্ড, বেলজিযম, সুইজারল্যাণ্ড, দক্ষিণ-জার্ম্মানী ও উত্তর-ইতালীতে অনুভূত হইয়াছিল। সকল স্থানেই রাজতন্ত্রের সমাধির উপর প্রজাতন্ত্রের মন্দির গড়িযা উঠিল। আদর্শ প্রচারের সাধু উদ্দেশ্য এবং পুরাতন জগৎকে ভাঙ্গিযা নূতন করিয়া গড়িবার উচ্চ মনোবৃত্তি ফ্রান্সের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করিবার হীন প্রচেষ্টায় পর্য্যবসিত হইল। স্বাধীনতা

ও উচ্চ আদর্শের উপাসকগণ দস্যুর ন্যায় বিজিত দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশের শূন্য কোষাগার পূর্ণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। জগতে সাম্য মৈত্রীও স্বাধীনতা স্থাপনের ধর্ম্মযুদ্ধ পরস্বাপহরণ ও পরধনলোলুপতার সঙ্কীর্ণ নীতির চরিতার্থতার সর্ব্বগ্রাসী মন্ত্রে পরিণত হইল।

ইংরাজ ও ফরাসী, এই দুই জাতিই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের মূলে ছিল একটা ব্যবহারিক লক্ষ্য। ইংরাজ চাহিয়াছিল শুধু একটা রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তন কিন্তু ফরাসীর লক্ষ্য শুধু তাহা ছিল না; ভাবের উন্মাদনায় ইংরাজ আত্মহারা হয় না, কিন্তু ত্যাগ করিবার শক্তিতে তাহারা ফরাসীর অপেক্ষা কিছু কম না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লাভালাভের কিছু লক্ষ্য থাকিলে তাহাদের ত্যাগ স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠে। ফরাসী কল্পনাপ্রবণ, আদর্শবাদী, ইংরাজ বস্তুতন্ত্রী, ফরাসী শিল্পী প্রকৃতি, ইংরাজ কর্ম্মী প্রকৃতি।

সমাপ্ত

দ্বন্দ্ব
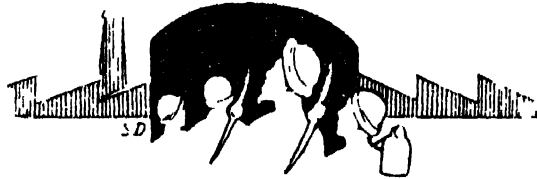
শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

আমি গান গাই
সমুদ্রের বুকে নাবিকের মতো,
উত্তাল ঢেউয়ে যখন জীবন সংশয় হলো,
পাটাতনের উপর সাহস-সঞ্চয়ের গান।
ঝড়োপাখী যেমন গান গায়
উড়ায় হাওয়ায় অজস্র কলরব,
ভ্রুক্ষেপ করেনা শুধু-শ্বাস-ক্ষয় হলো কিনা
অথবা বসন্তের জন্মগান গাইচে নাকি।
সমুদ্র-পাখী উর্ধ্বকে আঁকড়ে ধরেচে
প্রাণপণে সামনে চলচে এগিয়ে
সামনে আরো সামনে সমুদ্রতট
পাখার ঝাপটানি ক্রমাগত চলেচে।
গানের মাঝে আমি শান্তিতে ছিলাম
মেঘের উপরে আর সাধারণ পরিধির বাইরে:
দুঃখের আশু সান্ত্বনা গানে
আর গানেই গর্ব ভারসাম্য পায়।
তবু এইখানে আমি আছি
প্রবল দুইশক্তির মাঝখানে যেনো,
আমাকে মধ্যস্থতা বাঁচাতে পারে না
আমাকে সংস্থান আনন্দ দেয়না।
এ রকম কেউ বেঁচে থাকবেনা:
নির্দোষকে টুঁটি চেপে মারা হচ্ছে,
নিঃসঙ্গ তারকারা রক্তরাংগা আকাশে মিলালো
প্রত্যূষে যখন দুইটি জগৎ আলিঙ্গন করেচে।
জীবনের রক্তিম অগ্রগতিতে
গর্ব সংকুচিত হলে সমান-সংস্থিতি এলো,
এক সুরে সংগীত ধ্বনিত হলো,
দুঃখ মর্মে হানা দিয়েচে।
নতুন কামনা নিয়ে আগে চলো,
যে পৃথিবীতে ঘর বেঁধেচি আর ভালোবেসেচি
সে আমাদের নয়—এবং প্রেতাত্মাই শুধু
দুই আগুনের মাঝখানে বাঁচে। *

* C Day Lewis হইতে

যেদিন জ্বলবে আলো

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

শীতের রাত। ভাঙ্গা হারমোনিয়ামটার ওপর উপুড় হোয়ে বুঝিবা সে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। জোরে একটা শব্দ কোরে আধখোলা দরজার পাট দুটো দেয়ালের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা কিছু মাটীতে পড়ার শব্দ আর একটা চাপা আর্ত্তনাদ, "মা, মা, মাগো⋯ "

রংমালা ধড়মড় কোরে উঠে বসলো।

"কে ডাকে, কে-ও?"

আর কোন সাড়া এলো না। চারিদিকে গ্রামের নৈশ নিস্তব্ধতা, খোলা দরজাটা দিয়ে শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

বুকের ভেতরটা তখন তার ভয়ানক টিপ্ টিপ্ কোরছে। ত্বরিতে খাটের ওপর থেকে নেমে, পেরেকে ঝোলানো লণ্ঠনটা এনে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে দেখলো, আড়াআড়িভাবে চৌকাটের ওপর একটী নাতি-ক্ষুদ্র মনুষ্যদেহ আধাকাত আধা-উপুড় হোয়ে পড়ে আছে। পিঠের এক পাশে অর্দ্ধেকটা বসানো একটা ছোরা লণ্ঠনের আলো পড়ে চক্‌মক্ কোরে উঠলো। রংমালা বোধ হয় স্বতঃই একটা চীৎকার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোলো না। বাতিটা আরও কাছে নিয়ে ভাল কোরে দেখলো, নেহাৎ অল্প-বয়স্ক একটী ছেলে, রুক্ষ ধূলি-ধূসরিত চুল, শীর্ণ মলিন দেহ, মলিন তার বেশ। একেবারে নিঃসাড় নিস্পন্দ, নাকে হাত দিয়ে দেখলো শুধু অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়ছে। অতি সন্তর্পণে তাকে ঘরের ভেতর টেনে এনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বাইরে চলে গেল। কতক্ষণ পরে রংমালা ফিরে এল কতগুলি কচি গাঁদা পাতা নিয়ে। সেইগুলি ভাল কোরে চিবিয়ে চিবিয়ে থেঁৎলে ফেললো। ছোরাটা আস্তে আস্তে টেনে উঠিয়ে ফেলে গাঁদাপাতাগুলি ক্ষতটার মধ্যে দিয়ে শক্ত একটা নেকড়া দিয়ে ভাল কোরে বাঁধলো। যতক্ষণ রক্তটা বন্ধ না হোল ততক্ষণ অপেক্ষা কোরলো, তারপর তাকে পাঁজাকোলা কোরে বিছানার ওপর নিয়ে ভাল কোরে ঢেকে-ঢুকে শুইয়ে দিল।

পরদিন অনেক বেলায় সমস্ত গায়ে বেদনা নিয়ে মনির যখন ঘুম ভাঙ্গলো, রংমালার তখন স্নান পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। ছোরার আঘাতটা তেমন কিছু মারাত্মক বলে তার মনে হয়নি, স্মরণ পড়লো মাথার ওপর লাঠির বাড়িটার জন্যই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দুপুর রাতে একবার তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, একবার মনে হয়েছিল একান্ত স্নেহভরে কে যেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর বেশীকিছু সে চিন্তা কোরতে পারেনি, গভীর অবসাদভরে তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চোখমেলে চারিদিকটা সে একবার ভাল কোরে দেখলো। ছোট ঘরখানা। একখানা খাটেই প্রায়.সবটা ভরে গেছে। আসবাব-পত্র আর কিছু খাটের ওপব থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। দেয়ালের গাযে অসংখ্য ঠাকুর দেবতার ছবি আর ক্যালেণ্ডার। সদ্য-স্নাত রংমালা তখন প্রসাধনে ব্যস্ত, চুল না পাকলেও বেশ বোঝা যায় যে তার বয়স অনেক হ'য়েছে। মনি তাকে দেখে প্রথমটা মোটেই প্রীত হোতে পারলো না। যেমন মোটা, তেমনি কালো। চেহারার মধ্যে বীভৎস ভাবটাই প্রকট, সামনে দাঁড়িযে যেন একটা মূর্ত্তিমতী দুঃস্বপ্ন।

মনিব যে ঘুম ভেঙ্গেছে রংমালা তা প্রথমে জানতে পাবেনি। ফিবে দেখে ও তার দিকেই চেযে আছে। রংমালা মনিব মাথার কাছে এগিযে গেল।

"কেমন বোধ হচ্ছে আজকে?"

"অনেকটা ভাল। আপনিই আমাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খাটে শুইযেছেন?"

"হ্যাঁ"

প্রথম দেখেই রংমালার প্রতি ওব যে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা এসেছিল, বংমালা যে ওর জীবন রক্ষা কোরেছে এই কথা জানবার পরেও সেটা গেল না। মনি কৃতজ্ঞতা অনুভব কোরলো, কিন্তু বিশেষ প্রীত হোতে পারলো না।

"বাডী কার?"

"বাড়ী কোথায, এক খানাই ত মাত্র ঘর। তা· ···আমাবই।"

"এখানে আর কে থাকে?"

"আর কেউ থাকে না এখানে।"

"ও" মনি চুপ কোরলো।

রংমালার অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, এবার সে ফুরসৎ পেল প্রশ্ন কোরবার।

"বিছানাটায় তোমার কোন কষ্ট হযনি ত রাত্রে?"

"কষ্ট?—এই বিছানায়!" মনি আর কিছু বলতে পারলো না, সহসা।

একটা ছেঁড়া মাদুবের ওপব কর্কশ একটা কম্বল গায দিযে রাতেব পর রাত যাব কেটে যায়, তাকে যদি হঠাৎ একদিন রাত্রে একটা পালং নরম লেপ আর বালিশ দিয়ে সকাল বেলা ভদ্রতা কোরে জিজ্ঞেস কবা হয়, "কোন কষ্ট হযনি ত বাত্রে?" তাহলে বাস্তবিকই তার জবাব দেয়ার বিশেষ কিছু থাকে না। এই সামান্য স্নেহ-সৌজন্যে মনি বাস্তবিকই এতটা মুগ্ধ হোল যে রংমালার প্রতি মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের পোষিত বিতৃষ্ণ ভাবটার আর একটুও অবশিষ্ট রইল না।

কিছুক্ষণ থেমে ধরা গলায় আবার সে জবাব দিল, "না একটুও না। তবে ব্যাথার ত একটা কষ্ট আছেই।"

"হ্যাঁ, তাত আছেই। তবে ঘা'টা তেমন ভয়ানক কিছু নয়। কোন ডাক্তারও লাগবে না। দু'চার দিনের মধ্যে আমিই ও ভাল করে দিতে পারবো।"

"আসল চোটটা আমার মাথাতেই লেগেছিল। তবে ছোবাটাও এমন জায়গায় বসিয়েছে যে একটু নড়তে চড়তে গেলেই লাগে।

রাত্রে বাঁধা ব্যাণ্ডেজটা খুলে আবার রংমালা নতুন কোরে সেটা বাঁধলো, তারপর বললো, "এসব ঘটনা এ অঞ্চলে মোটেই আশ্চর্য্যের কিছু নয়, তোমার মত ছেলেমানুষের ওপর কার এত আক্রোশ হোল বুঝতে পারছি না।"

"আমি ছেলে মানুষ নই।"

রংমালা হেসে ফেললো।

"আহা তা নয় নাই হ'ল, তবু জিজ্ঞেস কোরছি, বলবে আমায়?"

রংমালাকে বলতে মনির কিছুই আপত্তি নেই।

সে থাকে কোলকাতায়। মাত্র আগের দিন সকালে এসেছে শ্যামনগরে। উদ্দেশ্য তিন নম্বর পাটকলের লুপ্ত ইউনিয়নটাকে পুনর্গঠন করা। ইউনিয়ন দিয়ে কি হয়, এবং সেটা যে সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত ব্যাপার, সে সব রংমালাকে ভাল কোরে বোঝাতে হোল প্রথমেই।

দেড়বছর আগে তিন নম্বর পাটকলে একটা বড় রকমের ধর্ম্মঘট হয়। তখন অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মনিও এসেছিল এখানে ইউনিয়নের তরফ থেকে কাজ কোরতে। ধর্ম্মঘটে যদিও শ্রমিকরাই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে, মিলের মালিকরা মহম্মদ নামে একজন বুড়ো কুলি-সর্দ্দারকে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে ভাড়াটে মজুর আনতে নিযুক্ত কোরেছিল। এই ব্যাপারে কোন অজ্ঞাত ধর্ম্মঘটী ক্ষেপে গিয়ে সর্দ্দার মহম্মদকে খুন করে।

মহম্মদ মরবার পর তার ছেলে রফিক সর্দ্দার পদে বাহাল হয়। এই পদটী পেয়েই বাপের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হিসেবে সে প্রতিজ্ঞা করে যে "জান কবুল" তবু সে তিন নম্বর কলে আর কোন ইউনিয়ন গড়তে দেবে না। অনেকে অনেক চেষ্টা কোরেছে কিন্তু রফিকের ভয়ে বেশীদূর কেউ এগোতে পারেনি। সেও শ্যামনগরে পা দেওয়া মাত্র রফিক এসে তাকে শাসিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনি ভয় পাবার ছেলে মোটেই নয়। .

মোটামুটি যদিও সে সাবধানেই ছিল, রাত্রের অন্ধকারে ঠিক তার কোলকাতা ফিরবার মুখে কারা যে তাকে লাঠি আর ছোরা দিয়ে আক্রমণ কোরলো মনি তার কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু তার মনে আছে যে এই বসতি বিরল রাস্তাটার ওপর শুধু রংমালার দরজাটা খোলা পেয়ে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটতে থাকে এবং চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

সব কথা না জানলেও, ধর্ম্মঘট আর দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর সে আগেই রাখত। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনির সব কথা শুনে সে মন্তব্য কোরলো, "তা ভালই কোরেছিলে বাপু আমার ঘরে ঢুকে, আশে পাশের সব লোকই ত রফিকের হাতের মুঠোয়।"

"রফিককে আপনি চেনেন নাকি?"

"চিনি অল্প অল্প। সর্দ্দার মহম্মদকে অবশ্য খুব ভাল কোরেই চিনতাম।"

তারপর মনির একটু অস্বস্তি ভাব লক্ষ্য কোরে বললো, "তা বলে তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে আমি রক্ষাই কোরবো। আমাকে তুমি পুরোপুরিভাবে বিশ্বেস কোরতে পার।"
তাকে যে সে বিশ্বাস কোরতে পারে সে বিষযে অবশ্য মনিরও কোন সন্দেহ ছিল না।

চারদিনের দিনের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনি ঘোষণা কোরলো যে সেই দিনকার সন্ধ্যার বাসেই সে কোলকাতা যাবে। রংমালা প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল যে ঘা'টা একেবারে শুকোয়নি, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে আবার চিড়্ খেতে পাবে। বিশেষ কাজ আছে, সকলেই তারজন্য অপেক্ষা কোরে আছে, মনি একেবারে অধীর। অগত্যা রংমালাকে রাজী হোতে হোল। দুপুরবেলা খেতে বসতে গিয়ে থালার দিকে চেয়ে মনি একটু হাসলো, "বিশেষ ঠেকায় না পড়লে এত আদর যত্ন ফেলে সহজে কি আর কেউ যেতে চায়।" পরমুহূর্ত্তেই তার মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

"আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন মার কাছ থেকে আমি শেষ বারের মত বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন ঠিক এমনি কোরেই আমাকে পরম যত্নে খাইযে দিয়েছিলেন।"

রংমালার সম্বন্ধে মনি শুধু মাত্র একটা আন্দাজ কোরতে পারে, কিন্তু মনির সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ই রংমালা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে। সংসারে আপনার বলতে মনির শুধু ছিল এক মা। তিনিও কিছুকাল আগে মারা গেছেন। সে কোলকাতায পাইস হোটেলে খায এবং একটা শ্রমিক সংঘের অফিসে থাকে। খবরের কাগজ বিক্রী কোরে নিজের খরচ চালায। ম্যাট্রিক পাশ কোরে কলেজের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু অর্থাভাবে আর এগোতে পারেনি।

তবে একটা বিষযে রংমালার প্রথম থেকেই একটা খটকা ছিল। "আচ্ছা, তোমরা যে সামান্য মজুরদের জন্য প্রাণপণ করো, মরতে পর্য্যন্ত রাজী আছো, এতে কি তোমরা টাকা পাও?"

"টাকা?" মনির খুব হাসি পেল, "হ্যাঁ তা টাকা পাওয়ার সুযোগ দুএকটা মাঝে মাঝে আসে বৈকি; এই ত সেদিন উল্টোডাঙ্গার একটা মিলের ম্যানেজার আমাকে চুপি চুপি ডেকে বলেছিল যে তার পাশের মিলটায মাস তিনেকের জন্য একটা ধর্ম্মঘট লাগিয়ে দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।"

"তা পেলে হাজার টাকা?"

মনি আবার হাসলো।

"কেন, আমার চেহারাটা দেখে হাজার টাকার মালিক বলে মনে হয নাকি?"

"নিশ্চয়ই না" রংমালা এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে মনিরা কোন কিছু লাভের আশায় কিছু করে না।

"কিন্তু টাকা না পেলে এসব করো কেন?"

"লোকে কি সব কিছুই টাকার জন্য করে?"

"অন্ততঃ আমি ত সে রকমই জানি।"

"একেবারেই ভুল জানেন। এই ধরুন না আপনি, আমার জন্য যে এত কোরলেন, বিপদ ঘাড়ে নিলেন, কিছু টাকা পয়সারও ক্ষতি কোরলেন, এ সবই কি টাকার লোভে?"

রংমালার সামনে একটা নতুন জগত খুলে গেল। তার নিজের মধ্যেও যে মহত্বের সামান্য একটু কণিকা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকতে পারে তা সে এতদিন ধারণায়ও আনতে পারেনি। মনি প্রথম থেকেই তাকে "আপনি" সম্বোধন কোরে তার বহুদিনকার লুপ্ত আত্মচেতনাকে নাড়া দিয়েছে। এই নূতন আবিষ্কারে তাব নিভৃত অন্তবে একটা নূতনতর আনন্দের অনুভূতি জাগলো।

তারপর মনি তাদেব উদ্দেশ্য কি, এই সব আন্দোলনের ভেতর থেকে তারা কি চায়, খুব সহজ ভাষায় বংমালাকে সব কথা বুঝিযে দিল। রংমালাও সব কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে শুনলো, তারপর বললো, "মজুরদের কথা না হয হোল, কিন্তু আমাদের কি হবে? আমাদের কি কোন কিছু আশা কোরবার পর্য্যন্ত নেই?"

বাস্তবিক পক্ষে এদের কথা সে কোনদিন চিন্তাই কবেনি এর আগে, তাই সহসা কোন উত্তর দিতে পাবলো না। মনির এই ইতঃস্তত ভাবটা রংমালার চোখ এডাল না।

"তোমাব কথা না হয ছেডেই দিলাম কিন্তু তোমার বড়রা যাঁরা নাকি সমস্ত দুনিযার দুঃখীদের জন্যই চিন্তা করেন, তাঁবাও কি আমাদেব কথা কিছু বলেন না? তোমাদের দয়া পাবার যোগ্যও কি আমরা নই?"

মনি আরও অনেক্ষণ চুপ কোরে চিন্তা কোরলো। আস্তে আস্তে মনে পডলো, বহুদিন আগে পড়া বাংলা মাসিকের একটা প্রবন্ধের কথা, রুশিয়ার অনুরূপ দুঃখিণীদের জন্য ১৯১৭ সালের স্থাপিত গভর্ণমেন্ট কি কোরেছিলেন সে সম্বন্ধে লেখা, মনির স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ফিরে এলো।

"তাঁরা বিশেষ কিছু না বললেও আমি জানি আমরা কি কোববো। প্রথমেই এই ব্যবসাটাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে ঘোষণা কোরতে হবে। তারপর তাদের প্রত্যেককে একটা খুব বড রকমের উপনিবেশ মত ঘেরাও যায়গায় নিযে যেতে হবে। সেখানকার প্রথম কাজ হবে তাদের সকলকে আধুনিক পদ্ধতিতে শাবীরিক ও মানসিক চিকিৎসা করান; দ্বিতীয় কাজ হবে কয়েকটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে তোলা, তৃতীয়, সেখানে কযেক বকম শিল্পের কাবখানা খুলে সকলকে চারঘণ্টা খাটিযে ভাল মাইনে দেওয়া। চারঘণ্টা তারা খাটবে আর চারঘণ্টা তারা পডবে এই থাকবে ব্যবস্থা। তারপব ছুটী, এই সময়টা থিয়েটাব বাযোস্কোপ দেখবে, একজন শিক্ষযিত্রীর তদারকে বাইরে বেডাতে যাবে, অথবা খেলাধূলো কোরবে। এমনি থাকতে হবে মাত্র তিন বছর, তারপর আবার মুক্ত, পূর্ব্বের ছাপ সব ধুয়ে মুছে আবার সমাজে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু আমরা যে পাপী, সমাজ কি আর আমাদের ফিরিয়ে নেবে?"

"আরে, আপনি নেহাৎ সেকেলে দেখছি, পাপ আবার কি?"

রংমালা একেবারে থ' খেয়ে গেল। এতবড় একটা গুরুতর কথা যে এমন ভাবে কেউ বলতে পারে তা তার কল্পনারও অতীত।

মনি আবার বললো, "অবশ্য সমাজ যাতে পাপের কুসংস্কার ভুলে গিয়ে এই সব নতুন মানুষদের আবার ফিরিয়ে নেয় তাদের মধ্যে, সে জন্য আমাদেব যথেষ্ট প্রচার চালাতে হবে।"

"কিন্তু এসব হবে কবে?"

উত্তরে সে যা বললো রংমালা তাব কিছু বুঝলো কিন্তু বুঝলো না অনেক কিছু। তবে তার এটুকু ধারণা হোলো যে কোন একটা ভবিষ্যতেব নির্দ্দিষ্ট দিন, যা নাকি মনির মত ছেলেরা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে আহরণ কোরবে, এসব হবে তাব পবে। দেরী আছে, তা থাক, তবু আশা তো! রংমালা নিজেকে অনেকটা হালকা অনুভব করে।

মনির যাবার সময় রংমালাও একরকম জোর করেই তার সঙ্গে চললো বাস স্টেশন পর্য্যন্ত। কোথায় কোন আততায়ী লুকিয়ে আছে কে জানে, তবে রংমালা লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে থাকলে আর কিছু ভয় নেই।

চলতে চলতে মনি জিজ্ঞেস কোরলো, "আচ্ছা, যদি পাপই মনে করেন, তবে এলেন কেন এ পথে?"

"এসেছি কি আর বাছা সাধ কোরে? আমরা ছিলাম খুব গরীব, দুবেলা দুমুঠো খেতেও পেতাম না। বাপের ঘর ছেড়েছিলাম প্রথম গওনার লোভে, এটা তারই শাস্তি।"

"গওনার লোভে? তা পেয়েছেনও ত কম না।"

"ও, যা সব তুমি দেখেছ? ওর কোনটাই সোণা নয়, সব ফাঁকি, শুধু লোক দেখাবার জন্য।"

সহানুভূতিতে দুই চোখ তার আর্দ্র হোয়ে এলো, অনেকক্ষণ সে আর কোন কথা বলতে পারলো না।

তাকে বাসে উঠিযে দিয়ে রংমালা বার বার কোরে বলে দিল, ঘা'টা নিয়ে সে যেন বেশী নড়া চড়া না করে। আর তার থেকে কথা আদায় কোরলো, সে আবার এসে তার বাসাতেই উঠবে! মনি হাত তুলে প্রণাম কোরলো তাকে, বাস ছেড়ে দিল।

তারপর সে ক্ষুদ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিস্তব্ধ বনপথ ধরে একাকী শূন্য ঘরে ফিরে চললো। ছোট্ট লণ্ঠনটাতে পদক্ষেপের জাযগাটুকুর বেশী আলো হয না, চাবদিকের জমাট অন্ধকার-ঠিক তার অন্ধকার ভবিষ্যতের মতই কালো। বংমালা ভাবছিল, অশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য।

এরা সব কোন জগতের মানুষ, যেখানে লোক ছেঁড়া মাদুরের ওপব রাত্রিবাস করে কিন্তু হাজার টাকার লোভে মুগ্ধ হয় না, অথচ পাপের কথা শুনলে বলে, কুসংস্কার?

আর একটা কথাও তার মনে বার বারই তোলপাড কোরছিল, মনি যখন সেদিন "মাগো" বলে চীৎকার কোরে তার চৌকাঠের ওপর এসে আছাড় খেয়ে পডলো সে অমন ধড়মড় কোরে জেগে বসেছিল কেন?

নালন্দার কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সারি সারি বিহারের ধংসাবশেষের পাশ দিয়া ঐগুলিসব দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। রৌদ্রের তেজ সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। সিঁড়ি বাহিয়া এক একটি বিহারের উপরে উঠিতেছিলাম। দেখিয়া মনে হইতেছিল যদি কোনও অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে আবার অতীতের সব মানুষেরা ফিরিয়া আসিত, আবার এই বিহারগুলি, বিদ্যার্থীভবনগুলি ও বিদ্যাপীঠসমূহ পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া পাইত তবে বুঝিতে পারিতাম এই বিশ্ববিদ্যালয কত বড বিরাট ও পৃথিবীর কতবড় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। সেকালের লোকেরা বুঝিবা বিস্মিত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত।

নালন্দা বিহার সুধু একটি বৌদ্ধ বা ধর্ম্মকেন্দ্র বিহার মাত্রই ছিলনা, ইহার সবচেয়ে বড খ্যাতি ছিল বিদ্যাদানের জন্য। ইউ-য়ান-চাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতে যাইয়া বলিযাছেন : এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার সব সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন, তাঁহাবা বৌদ্ধধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। সাবাদিন তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করিতেন, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত—এই বিদ্যালয়ের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিযা শ্রমণেরা ও শিষ্যেরা সকলেই প্রফুল্লচিত্তে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। তখন দেশে দেশে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযের বিদ্যা ও গৌরব প্রচারিত হওযায বিদেশ হইতে সব ছাত্রেরা যেমন শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন, তেমনি অধ্যাপকেরাও আসিতেন, তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে। নালন্দার ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সকলের মনের মধ্যেই বিশেষ একটা আগ্রহ দেখা যাইত।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন—একদিকে যেমন তিনি পরম পণ্ডিত হইতেন তেমনি দযা-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্যও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। সে সমুদয পণ্ডিতগণেব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এখানে বলিব না। তবে কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিষয় সামান্য ভাবে কিছু আলোচনা করিব।

এক সময়ে ধর্ম্মপাল ও চন্দ্রপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা অধ্যক্ষ ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহারা গ্রন্থ রচনা কবিয়া গিয়াছেন। গুণমতি ও স্থিরমতি নামক পণ্ডিতদ্বয়ের নাম তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। প্রভামিত্র ও জিনমিত্র যেমন তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি তাঁহারা উভয়েই সদালাপী ছিলেন। বাঙ্গালী শীলভদ্রের নাম পণ্ডিত সমাজে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শীলভদ্রের কথা লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন :

"চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, ইউ-য়াং-চাং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। * * * যাঁহার পদতলে

বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। ইউ-য়ান-চাঙ যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড় রাজা, এমন কি হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন। কিন্তু সে পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। * * শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। * * ইউ-য়ান-চাঙ এক যায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টিকা টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।"

শীলভদ্র অতি তরুণ বয়সে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া রাজার নিকট হইতে একটি নগর লাভ করিয়া তাহার রাজস্ব হইতে একটি বিরাট সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও নালন্দার নিকটবর্ত্তী গ্রাম শীলাহ্ শীলভদ্রের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ এ সমুদয় পণ্ডিতেরা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

ইউ-য়ান-চাঙ যখন নালন্দা ছিলেন, সে সময়ে প্রায় ১০,০০০ শ্রমণ এখানে বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে এমন এক সহস্র শ্রমণ ছিলেন, যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের অভিমত সমুদয় বৌদ্ধ জগত পরম শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে, বেদ, ইত্যাদি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা, হেতুবিদ্যা (Logic), শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) অথর্ব্ববেদ (Magic) সাঙ্খ্যদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এক কথায় ভারতীয় সমুদয় শাস্ত্রেরই এখানে অধ্যাপনা চলিত।

বুদ্ধ

সেকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশে দেশে এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, অতি দূর দেশ হইতেও বিদ্যালাভের জন্য ছাত্রগণ এখানে আসিতেন। চীন দেশ হইতে যে কেবল ফাহিয়ান, ইউ-য়ান-চাঙ, এবং ইৎসিংই আসিয়াছিলেন তাহা নহে—থোংমি, হিউ-য়েন্ চিউ, তাও-হি, হোই-নি, আর্য্যবর্ম্মণ, বুদ্ধধর্ম্ম, তাও-সিং, তাং, হোই, লু, প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা বিদ্যার্থীগণ, চীন,

কোরিয়া, তিব্বত এবং তোখারা হইতে নালন্দা আসিয়াছিলেম শিক্ষালাভের জন্য এবং পুঁথি সংগ্রহের নিমিত্ত। এই সব ছাত্রেরা যেমন পড়িতেন, তেমনি আপনাদের দেশে জ্ঞান প্রচারের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহের নকলও করিয়া লইতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ বড় সহজ ছিল না। দশজন প্রবেশার্থী ছাত্রের মধ্যে দুইজনের বেশী প্রবেশলাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ, প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিল এমনি কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থী নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে ঐ সমুদয় কঠিন প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারিত না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী একটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতেন, শত শত পরম পণ্ডিত অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করিতেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী লাইব্রেরী না থাকিলে কিরূপে চলিতে পারে? নালন্দার যে অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার নাম ছিল ধর্ম্মগঞ্জ, Mart of knowledge অর্থাৎ বিদ্যা-বিপণি। তিনটি বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকাতে নালন্দার লাইব্রেরী শোভা পাইত। এই তিনটি বাড়ীর বড় সুন্দর নাম ছিল যেমন "রত্নসাগর", "রত্নোদধি" ও "রত্নরঞ্জক"। নালন্দার এই লাইব্রেরীতে যে কত সংখ্যক পুঁথি সংগৃহীত ছিল তাহা এখন বলা কঠিন। ইৎসিং বলিয়াছেন যে এই লাইব্রেরীর মধ্যে ৪০০ খানি এত বৃহৎ সংস্কৃত পুঁথি ছিল যে তাহাদের প্রত্যেকটিতে ৩৫০০,০০০ করিয়া শ্লোক নিবদ্ধ ছিল।

সেকালের নৃপতিরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব মোচনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেন। গুপ্ত নৃপতিরা এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য রাজগণ ইহার উন্নতি-কল্পে ধনদান করিতে কোনরূপ কার্পণ্য করিতেন না। রাজা রাজড়াদের দানের জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীগণের নিজেদের কোনরূপ ব্যয় বহন করিতে হইত না। ছাত্রগণের খাওয়া পরার কোনরূপ চিন্তা ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক শত খানি গ্রামের রাজস্ব ব্যয়িত হইত, ঐ সমুদয় গ্রামগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ছিল। ছাত্রগণের সর্ব্ববিধ ব্যয় ভার, যেমন আহার, বাসস্থান, বস্ত্রাদি এবং চিকিৎসা ব্যয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরাই বহন করিতেন। হিন্দু রাজারাই বেশীর ভাগ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিতেন।

নালন্দার খ্যাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, তারপর উহার ধ্বংসের যুগ আরম্ভ হইল বিদেশীর হাতে। আমরা নালন্দার প্রাপ্ত যশোবর্ম্মণের খোদিত লিপি হইতে জানিতে পারি যে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতবর্ষের কোনও বিদ্যায়তনই নালন্দার সমকক্ষ ছিল না। নবম শতাব্দীতে নালন্দার প্রতিষ্ঠা ছিল জগৎযোড়া, যবদ্বীপ ও সুমাত্রার নৃপতি বালপুত্রদেব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মিত্র বঙ্গ-নৃপতি দেবপালকে পাঁচখানি গ্রাম দান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত মঠের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য। ঐ গ্রাম

পঞ্চকের রাজস্বের কতকাংশ প্রাচীন পুঁথি নকল কবিবাব জন্য ব্যযিত হইবাব নির্দ্দেশ—["ধর্ম্মবত্নস্থ লেখনার্থম"] ও ছিল।

অষ্টম শতাব্দী ও তাহার পববর্ত্তীকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযের বহু অধ্যাপক তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচাবের জন্য মনোযোগী হইযাছিলেন। এজন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযে তিব্বতীয ভাষা শিক্ষাদানেবও সুব্যবস্থা ছিল। নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দ্রগোমি ছিলেন ইহার প্রধান অধিনাযক। চন্দ্রগোমি অষ্টম শতাব্দীব প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, তাঁহাব লিখিত বহু গ্রন্থ তিব্বতীয ভাষায অনূদিত হইযাছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয হইতে শান্ত বক্ষিত ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয নৃপতি খ্রী-শ্রেন-ত্যু-সান কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইযা তিব্বত গমন কবেন। তিব্বতীযরা তাঁহাকে বাজোচিত সম্বর্দ্ধনায সম্বৰ্দ্ধিত করিযাছিল। তাঁহার নির্দ্দেশ ক্রমে তিব্বতে একটি বিহার নির্ম্মিত হইযাছিল। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে শান্তবক্ষিতের মৃত্যু হয, মৃত্যুব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারেব জন্য তিব্বতে অনেক কিছু কাজ কবিযা গিযাছেন। নালন্দাব অন্যতম অধ্যাপক কাশ্মীরের অধিবাসী শ্রমণ পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন। এই ভাবে দেখিতে পাই যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযেব সংস্কৃতিব প্রভাব দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। দেশে দেশে তাহাব কীর্ত্তি প্রচাবিত ছিল।
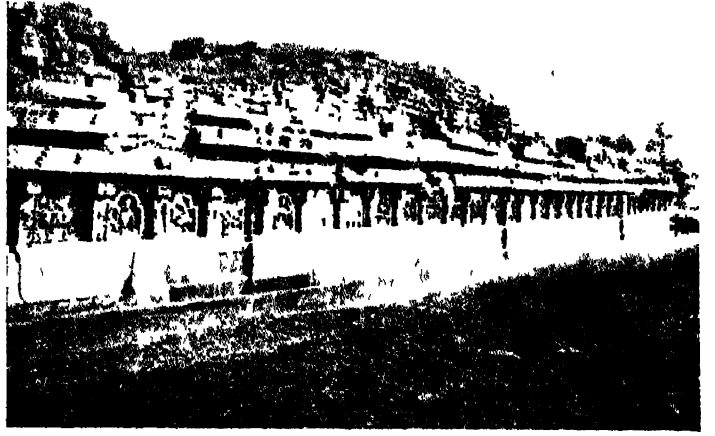
প্রস্তর মন্দির

আমরা তারনাথের লিখিত বিবরণী হইতে জানিতে পাবি যে সময সময বিক্রমশীলার অধ্যাপকেরাও আসিয়া নালন্দার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। একাদশ শতাব্দীব প্রথম হইতে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালযের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযেব প্রভাব হ্রাস পাওযাও অসম্ভব নহে। তিব্বতীয ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব সূচিত হইতে থাকে, সেজন্যও নালন্দার পতনের অন্যতম কারণ হওযা অসম্ভব নহে। তবে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিল দারুণ দুর্দ্দিন। সে দুর্দ্দিনে নালন্দার বিদ্যাভবন, লাইব্রেরী সব ধ্বংস হইয়া গেল। নালন্দার হাজার হাজার অধিবাসীরা তুরুষ্কদের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে

পারিলেন না। তুরুষ্কেবা "ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি পালটি যাহা কিছু ছিল সাবও।" তুরুষ্কীয়দের আক্রমণেব ফলে যাহা ধ্বংস পাইযাছিল তাহারও কতকটা আংশিক ভাবে সংস্কৃত হইল এবং মুদিতভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উহাব ভাব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নালন্দাব পূর্ব্ব গৌরব যাহা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাও ধ্বংস পাইল দুইজন তীর্থিকেব সহিত কতিপয নবাগত অর্ব্বাচীন ছাত্রের কলহের দরুন। এই কাহিনীব মূলে কতটা সত্য আছে বলা যায না। যে কারণেই হউক নালন্দা যে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছিল তাহাত আমরা প্রত্যক্ষ ভাবেই দেখিতে পাইতেছি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযেব ইতিহাসেব সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসও বিজডিত।

ক্রমে বেলা পডিযা আসিতেছিল। শরীব ক্লান্ত হইযা পডিয়াছিল। আমার পরিদর্শক চৌকিদার একটি জলাশয় দেখাইযা বলিল, এই তালাওর নীচেও অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—বিহাব ইত্যাদি বহিযাছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চাবিটি ছোট বড স্তূপ দেখিযা নালন্দাব ধর্ম্মশালাব দিকে চলিলাম। মনে হইল—কতবড ধ্বংসের বাজত্বেই না আমবা বাস করিতেছি। মানুষের জীবন—মানুষের কীর্ত্তি—কি তাব পবিণাম! আবার যখন নালন্দাব খনন-কার্য্য আবম্ভ হইবে তখন না জানি আবও কত কীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইযা আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ কবিবে।

ধর্ম্মশালাব চৈনিক লামা ফোচিন লামা (Fochin Lama Chinese Temple) আমাকে সযত্নে গ্রহণ কবিলেন। সেখানে ইন্দাবাব জলে স্নান করিযা তৃপ্তিলাভ কবিলাম এবং তিনি আমাব জন্য তাঁহার বালক ভৃত্য দিযা ডাল, ভাত ও তবকাবি বান্না কবিযা বাখিযাছিলেন, তাহাই পবম তৃপ্তিব সহিত ভোজন করিলাম।

সন্ধ্যা ছযটার গাডীতে নালন্দা ছাডিযা বাজগীব অভিমুখে বওনা হইলাম। নালন্দা আমাদের ঘবের কাছে—সকলেরই এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালযেব ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য।

সমাপ্ত

পাখী
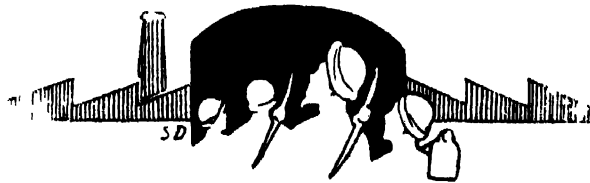
শ্রীবিমল বসু

সখ ক'রে পাখী পোষে সৌখীন মানুষ।
পোষমানা পাখী ওরা সেই মানুষের।
ঘন নীল আকাশের স্বপ্ন দেখে পাখী
কী পিপাসা ঘন নীল আকাশের তরে
সে পিপাসা আমাদের চোখে।

পক্ষ মেলে আকাশের বুকে
ভেসে যাবে নিরুদ্বেগে স্বপ্নভরা স্বচ্ছন্দ আনন্দে,
ওদের এমনি আশা এমনি স্বপন।
সে স্বপনে বাধা দেয় পায়ের শৃঙ্খল
আর পিঞ্জরের মায়া।
পায়ের শৃঙ্খল বাজে নিঠুর লীলায়,
প্রসারিত পক্ষ তাই ছোট হ'য়ে আসে
বন্ধনের তীক্ষ্ণ রূঢ়তায়।
স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

পাখী তাই শ্রান্ত ক্লান্ত বন্ধন ব্যথায়
বসে বসে ছোলা খায়, ঝিমোয়
আর রাধা-কৃষ্ণ বুলি বলে।
তবু কিন্তু স্বপ্ন দেখে নীল আকাশের!

দাঁড়ে-বসা, ছোলা খাওয়া আর রাধা-কৃষ্ণ বুলি
বিনিয়ে বিনিয়ে বলে অহোরাত্র দিন।
কর্ম্মহীন জীবন তাদের।
পোষমানা পাখীদের শান্তির জীবন
আত্মা বুঝি কাঁদে শুধু বন্ধন ব্যথায়
আর পরাধীনতায়!

বাসনা কামনা আর মদ মত্ততার
পৈশাচিক উল্লাসে ভরেছে নিখিল পৃথ্বী;

বাজপাখী আর শকুনের কৃষ্ণ পক্ষ ছায়ে
গগনের নীল রঙ কালো হয়ে ওঠে।
পোষমানা দাঁড়ে-বসা পাখীদের
ভীরুহিয়া কাঁপে —অমঙ্গল আশঙ্কায়
আকাশের কালো রঙ দেখে।
অকস্মাৎ নামে যদি বাজ পাখী
বাজের তীব্রতা নিয়ে,—নেমেছে তো কতদিন।
শকুনের তীক্ষ্ণ নখরের আর
সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর নিঠুর আঘাতে
কত কত পোষমানা পাখী নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে
এই বহু পদচিহ্ন আঁকা পৃথিবীর বুকে।

সে কথা তো ওরা জানে।
এমনি কলঙ্ক-ম্লান ইতিবৃত্তে ভরা
পোষমানা পাখীদের ইতিহাস।
তাই আজ শঙ্কা জাগে উহাদের চোখে।
সৌখীন মানুষ দেয় অভয়ের বাণী।
পাখীরা ঝিমোয় আর ভয়-ভরা চোখে চায়।

ওপরে শকুন ওড়ে আর ওড়ে বাজ
পোষমানা পাখীদের মাথার ওপরে,
সৌখীন মানুষের আশ্বাস-ছায়ায়
পাখীরা ঝিমোয় আর কাঁপে
ভীরু ডানা। আর ভাবে ঃ
এর চেয়ে মুক্তপক্ষ হয়ে
স্বাধীন বন্য-বিহঙ্গের মতো উড়ে যাওয়া ভালো
ভেসে যাওয়া ভালো অনন্ত উদার
নীল আকাশের বুকে।
বাজ আর শকুনে ভরা আকাশের বুকে
মুক্তপক্ষ হ'য়ে মুক্ত চিতে
দাঁড়ানো ভালো মৃত্যুর সম্মুখে।

—ওপরে শকুন ওড়ে আর ওড়ে বাজ
শীকারের অন্বেষণ ছলে।
আর দাঁড়ে বসে কাঁপে ও ঝিমোয
পোষমানা পাখী
মানুষের আশ্বাস-ছায়ায।
এক চোখে হাসি আর জল অন্য চোখে
জীবন মৃত্যুর দু'টী পূর্ণ প্রতিছায়া
উহাদের ভীরু দুই চোখে।

জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে রূপকথার সওদাগর যেতেন দেশ-দেশান্তরে, জাহাজ-বোঝাই মণিমাণিক্য নিয়ে, আমার তেমনি ভালো লাগে, মনের সাগরে সওদাগরী ক'রে ফিরতে। মানুষে মানুষে অন্তরের যে পরম ঐক্য, তাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করবার সাধনা না করে আমারা মূর্খের মত কতই না ব্যবধান সৃষ্টি করছি, দিনের পর দিন। ভাবের রাজ্যে তরী ভাসিয়ে মানুষের দিন চলেনা জানি, কিন্তু বাস্তব জীবনেও কি আমরা লাভবান হচ্ছি এই ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে?

লাভ, ক্ষতি - সব কথারই অর্থ আপেক্ষিক। আমি যাকে লাভ মনে করছি, আর একজন হয়ত তা'কে লাভ বলে মনে নাও করতে পারে। কিন্তু, তথাপি উচ্চতর জীবনের যে আদর্শের প্রতি মার্জ্জিতরুচি মানব শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে এতকাল, তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। সেই আদর্শকে সমাজে মূর্ত্ত করে তুল্‌তে পারলে তাকে পরম লাভ ব'লেই আমরা গণনা কর্‌ব, আর তার বাধা ঘট্‌লে মনে করবো মহাক্ষতি।

কত সহিষ্ণুতা, কত ধৈর্য্য, কত ত্যাগ, কত আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক মানুষকে চিন্‌তে হ'লে। এই সর্ব্বগ্রাসী জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত মানুষের কতটুকু আছে সে সুযোগ, আর কতটুকু আছে সে উৎসাহ?

জীবনে নেই অবসর, মুহূর্ত্তকাল চুপ ক'রে ভাব্‌বার অবকাশ; স্বপ্ন, কল্পনা, আদর্শ তাই মাথা তুলতে পারে না। শিক্ষিতের মনও নিরালোক আবেষ্টনে যেন আপনা হতেই অসাড় হ'য়ে আসে।

ছুটির দিন, শীতের সকাল। প্রভাত রৌদ্রের ঈষদুষ্ণ স্পর্শ বেশ মনোরম লাগছে। বিখ্যাত ফিনিশ ঔপন্যাসিক সিলানপা'র "মীক্ হেরিটেজ" পড়্ছিলাম। কত দূরের দেশ ফিন্ল্যাণ্ড—বর্ত্তমানে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আলোড়িত ফিন্ল্যাণ্ড্। অথচ—আপন অন্তরে অনুভব করছি দরিদ্র নায়ক 'জুসি'র ভাগ্যবিড়ম্বনার বেদনা। মনে হচ্ছেনা ত সে দূরের বা একান্ত পর। এমন কি, তুষার দেশের সেই শীতের রাত্রি, ঘোলাটে দিন, স্বপ্নালু সন্ধ্যা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠছে আমার মনে। 'পেন্জামি'র মৃত্যুর পর অসহায়া দরিদ্রা বিধবা 'মাইজা' সন্তানটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সংসারের অজানা পথে, সুকঠোর জীবন-সংগ্রাম বেশীদিন সহ্য হ'ল না তাঁর। লাজুক ছেলে 'জুসি' ভাস্লো আপন নিয়তির স্রোতে। কখনও চাষের কাজে, কখনও বনে-বনে কাঠ কেটে, কত রকমে তা'কে করতে হয়েছে জীবিকার সংস্থান। লাজুক, মুখচোরা ছেলে সে, সবাই দেখে তাকে অবজ্ঞার চোখে। দলের মধ্যে থেকেও সে সব সময়ে দল-ছাড়া। এলো স্বপ্নময় যৌবন। কে জানে কি ক'রে সে 'রীণা'কে ভালোবেসে ফেল্লে,—বিয়ে করল তাকে। তা'রপর অবিরাম দুঃখের ঢেউ ঠেলে ঠেলে উজান-পথে এগিয়ে চলা, দিনের পর দিন অশ্রান্ত সংগ্রাম, নিত্য অশান্তির বিক্ষোভ। ক্রমে ঘনিয়ে আসে অবসাদ। 'রীণা' মারা গেল, জুসি', বৃদ্ধ 'জুসি'—আবার সংসারে একা।

বহুকাল প্রবাসী পুত্রের প্রভাবে কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, সন্তান-স্নেহ-তৃষিত 'জুসি' জড়িত হয়ে পড়ল শ্রমিক-আন্দোলনে এবং সম্পূর্ণ বিনাদোষে, তার সারল্যের অপবাধে দণ্ডিত হলো মৃত্যুদণ্ডে। ভাগ্যহীন জীবনের ক্ষীণ প্রদীপশিখা নিবে গেল—পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে। কত জীবন নাটকেরই ত' এম্নি করে যবনিকা পতন হচ্ছে পৃথিবীময়, কে তার খোঁজ রাখে। অথচ মানব-জীবন কি এতই মূল্যহীন, এতই তুচ্ছ? তার সুখ-দুঃখ, তার সংগ্রাম, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন—আমার যে মনে হয়, অমূল্য সম্পদ্। তাই সাহিত্যের সাগরে, মানব মনের এই অকূল সমুদ্রে, আমি কবি সওদাগরী,—যা দেখি, তাই ভালো লাগে। কত ভবঘুরে পথিকের চঞ্চল পদধ্বনি, কত প্রীতিস্নিগ্ধ সংসার-চিত্র, কত বিভিন্নমুখী আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত,—আমাকে মুগ্ধ করে, আবিষ্ট করে, আমি নিজেকেই যেন প্রতিফলিত দেখি মহা-জীবন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায়। ভৌগোলিক, সামাজিক সকল প্রভেদ কোথায় মিলিয়ে যায়, আমি দেখি—এক অখণ্ড জীবন-সাগর, বিচিত্র তরঙ্গ লীলায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বাধীনতার সাধনা

পূর্ব্বানুবৃত্তি

অধ্যাপক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

অসীম বিশ্বের বোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম হইতেই অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক, সেটা কেবল দার্শনিক তথ্য, বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে নহে, একান্তভাবেই অন্তরতম চিত্তের উপলব্ধি, সত্যের একেবারেই অব্যবহিত প্রকাশ। যখন আমাদের অনেকেরই মন কেবলমাত্র ঘরের ক্ষুদ্র কোণটির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া দূষিত বাতাসে কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই আনিলেন অসীম আকাশের ডাক, তিনিই প্রথমে শুনাইলেন :

আঁধার কোণে থাকিস তোরা,
জানিস কিরে কত যে সুখ।
আকাশ পানে চাহিলে পরে,
আকাশ পানে তুলিলে মুখ।

এই যে অসাধারণ সরল ভাষায় আত্মপ্রকাশ, এই যে অপূর্ব্ব স্বচ্ছভাবপ্রবাহ, কৃত্রিম সাহিত্যের মধ্যে ইহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। সেই সময়ের বিশ্বপ্রকৃতি কবিকে একান্তভাবেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই সময়ের সকল রচনাতেই সেই অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, শৈশবে তিনি ছিলেন চাকরদেরই শাসনের অধীনে, "নিজেদের কর্ত্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিক দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। · গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ীর ভিতরেও আমরা যেমন খুসি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।

এক একদিন মধ্যাহ্নে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। সেই নির্জ্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। আরো দূরে দেখা যাইত উচ্চ চূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্ব দিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমিও ঐ অজানা বাড়ীগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাইকরা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারিনা। মাথার উপরে আকাশব্যাপী তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সমুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত। ··· ছেলেবেলার

দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগতটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ্যে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোন একটা বাধা মাত্রই নহে, তখন সেটা কি অসম্ভব আশ্চর্য্যই মনে হইয়াছিল! তিনি বলিলেন, সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইযা উপরে উঠিযা যাওনা, কোথাও মাথা ঠেকিবেন। আমি ভাবিলাম সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলি স্বর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইযা কোন লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইযা বসিযা ভাবিতে লাগিলাম।"

"আলোচনা" নামক গদ্য গ্রন্থে কবি অনেকটা এই ভাবের কথাই বলিতেছেন, "এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিযা আছে, যেন খানিকদূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেযনা, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা, যদিও মণ্ডপের উর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম তথাপি জানিতে পারিতাম যে উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র।"

অসীম আকাশই কবির কাছে অসীম স্বাধীনতার প্রতীক, "পূরবী" কাব্যগ্রন্থের বকুলবনের পাখীর মতই কবি অসীম নীলিমা পিয়াসী, বাল্যকালে এই অসীম নীলিমার প্রেমই তাঁহার জীবন মনকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল।

শোন শোন ওগো বকুলবনের পাখী,
কবে দেখেছিলে, মনে পড়ে সে কথা কি?
'বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলাম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধে বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেতো মোরে ডাকি' ডাকি'।
সহজ রসের ঝরণা ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।
শোনো শোন ওগো বকুলবনের পাখী,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি?
নগ্ন পরাণ লয়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেতো অবিরত কৌতুকে
সবকাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

প্রথম যৌবনে রচিত লেখাগুলির মধ্যে অনেক স্থানে কবির অনন্ত আকাশের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় "অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার" তিনি তাঁহার কবিতার জন্য ঘর বাঁধিযাছিলেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে" তিনি গাহিযাছিলেন :

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তিকরি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।

তেমন সমুদ্রভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ গাহিয়া উঠে
আকাশ পূরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙ্গে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চাহে প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।

বাল্যকালের আকাশের উদার শোভায় কবির গভীর আনন্দের স্মৃতি প্রভাতসঙ্গীতের কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পাইযাছে।

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে।
নবীন রবির আলো,
সে যে কি লাগিত ভালো,
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত ফুলের মত ফুটায়ে তুলিত মোরে।

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল
ডেকে ডেকে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে।

শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখী।

অসীম উদার বিশ্ব-জগৎ হইতে কবি যে অনন্ত জীবনের আনন্দধারা পাইযাছিলেন, এই সময়েব রচনায সর্ব্বত্র সেই আনন্দধারা উচ্ছ্বসিত হইযা উঠিতেছে, "নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যাবা, সেই ছেলেদের চোখেব চাওযা নিযেছি মোর দুচোখ পুরে", এই সমযে তিনিই যেন প্রথম আকাশ পানে চাহিযাছিলেন, আকাশপানে মুখ তুলিয়াছিলেন। সেইখানেই অসীম মধুব মুক্তিব স্বাদ পাইযাছিলেন,

আকাশ পানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কি সুখ পায়

চাহিয়া আছে আমার মুখে
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ ভরা প্রাণ

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়।
আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়।

প্রকৃতিব সৌন্দর্য্যেব মধ্যে অসীমের যে আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে তাহা এমনই একান্ত প্রত্যক্ষভাবে কবির চিত্তকে অধিকার কবিযা রহিযাছে, হৃদয এমনই অব্যবহিতভাবে ভূমাব স্পর্শ লাভ করিতেছে যে সেইজন্যই তাহাব এইরূপ অসামান্য সরল প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ রচনার ভঙ্গীকে হযত অনেকে কাঁচা হাতেব লেখা বলিযা অবজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ রচনা সাহিত্যে খুবই বিরল। ইহা কল্পনা নহে, ইহা উপলব্ধি। ইহা কবিত্ব নহে, ইহা সত্য।

"সমালোচনা" নামক গদ্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের কথাই বলিয়াছেন "আমি যখন রাত্রিকালে অসংখ্য তারার দিকে চাহিয়া আমার অনন্ত জীবন কল্পনা করিতেছি, জগতের একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আমার প্রাণের বিচরণ ভূমি হইয়া গিয়াছে, আমি যখন নূতন নূতন আলোক, নূতন নূতন গ্রহ মাড়াইয়া নূতন নূতন জীবকে স্বজাতি করিয়া, বিস্ময়বিহ্বল পথিকের মত অনন্ত

বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি, বিচিত্র জগৎপূর্ণ অনন্ত আকাশের মধ্যে যখন আমার জীবনের আদিঅন্ত হারাইয়া গিয়াছে, যখন আমি মনে করিতেছি এই কাঠা তিনেক জমির চারিদিকে পাঁচিল তুলিয়া এইখানেই ধূলির মধ্যে ধূলিমুষ্টি হইয়া থাকা আমার চরম গতি নহে, জল বায়ু আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিশ্বচরাচর আমার অনন্ত জীবনের ক্রীড়াভূমি।" ইহাতেই কবি অসীম সুখে মগ্ন হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার প্রাণের অধিকার বাড়িয়াছিল, ইহাতেই তাঁহার প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

প্রভাত সঙ্গীতের দুইটি কবিতা "অনন্ত জীবন" এবং "অনন্ত মরণ" এই অসীম বিশ্বব্যাপী আনন্দ লীলারই অভিব্যক্তি, "প্রভাত উৎসব" কবিতাটিতেও এই আত্মহারা আনন্দের অবস্থারই প্রকাশ। "সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। বিশ্বজগতে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম। সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখিনাই—এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সকল মানব দেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎ ভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য্য নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গরু আরেকটা গরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে. ইহার মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—(প্রভাত উৎসব)

ইহা কবি কল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুতঃ যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিলনা।"

এইখানেই মুক্তির উপলব্ধি, স্বাধীনতার স্বাদগ্রহণ, সকল সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া কবি বিশ্বের সমগ্রতাকে হৃদয়ের প্রাকারের মধ্যে গ্রহণ করিতে চান, ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, বর্জ্জনের দ্বারা নয়, গ্রহণের দ্বারাই বিশ্বকে ভোগ করিতে হইবে। "গীতায় আছে কর্ম্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয় বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় "মা গৃধঃ" লোভ কোর না। সৌন্দর্য্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম্ম।" (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই মনকে জাগানোর, এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যভোগের, এই সত্য দৃষ্টিলাভের, সুন্দরের মধ্যে সেই অনন্তের স্পর্শলাভেরই ইতিহাস।

মনজাগানোই আমাদের সকলপ্রকার দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাইবার, স্বাধীনতা লাভ করিবার সাধনার প্রথম সোপান, সৌন্দর্য্য প্রেমই আমাদেব মনকে জাগাইতে পারে, বিশ্বের সহিত আমাদের মিলনের সম্বন্ধকে মধুর কবিযা দেয। 'প্রভাত সঙ্গীত', 'প্রকৃতির পরিশোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার সময়েই ববীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাবেই এই সত্য উপলব্ধি করিযা "আলোচনায়" লিখিয়াছিলেন, "যখনি হৃদযেব উন্নতি সহকাবে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখন জগতের হৃদয় সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমাব মধ্যে উথলিত হইযা উঠিবে। আমি কতখানি জানিব কতখানি পাইব তাহার সীমা নাই। ...সৌন্দর্য্য হৃদযে প্রেম জাগ্রত কবিযা দেয এবং এই প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। কৃমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইযা আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই। কে আনিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কাবণ অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্য শরীর ধারণ করিযাছে। প্রেম যেখানে ভাষা সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয সৌন্দর্য্য সেখানে গান। প্রেম যেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর। এইজন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তোলে।"

কবিদেব কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আব কিছু নয, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিযা দেওযা। সৌন্দর্য্য উদ্রেক কবার অর্থ আর কিছু নয়,—হৃদযেব অসাডতা অচেতনতাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদযের স্বাধীনতা ক্ষেত্র প্রসাবিত কবিযা দেওযা। ...তাঁহাবা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন, জগতেব সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা তাঁহাদেব হৃদযের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইযা আমাদেব চোখে পডিতে থাকুক, তবেই আমাদেব প্রেম জাগিযা উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইযা পডিবে। কবিরা সেই সৌন্দর্য্যেব কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সজীব মন্ত্রবলে হৃদযের বন্ধন মোচন কবিতেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্য আমাদের হৃদযে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই মহারাজ কর্তৃক রক্তপাতহীন জগৎ জযের জন্য প্রতীক্ষা করিযা রহিযাছেন।

কবিকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহার রচনাগুলিতে এই স্বাধীনতার সাধনারই তত্ত্বব্যাখ্যা। "কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না" স্বাতন্ত্র্যেব মিথ্যা অন্ধ বিদ্রোহেব অবস্থাকে অতিক্রম করিযা ববীন্দ্রনাথ প্রকৃত মুক্তিবই পথে অগ্রসব হইলেন, স্বাধীনতার মধ্যেই তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিল, সংসারের নানা অবস্থায় নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও, সকল প্রকার বন্ধন সত্ত্বেও তাঁহার মন সর্ব্বতোভাবে মুক্তই রহিল; চারিদিক হইতেই তিনি প্রাণেব প্রবল বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন, সমগ্র বিশ্বের বৃহৎ উদার জীবনকে বিচিত্র ভাবে নিজেব জীবনে উপলব্ধি কবিবার প্রযাসে আত্ম নিয়োগ করিলেন, এই ভাবেই তাঁহার স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ হইল।

সমাপ্ত

বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার অভিমুখে

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

দুই

কৃষিক্ষেত্রে যৌথশ্রমের উপরেই ছিল আদিম গোষ্ঠি সমাজের বনিয়াদ। এই বনিয়াদ ভেঙে যেতে থাকে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে।—কৃষিযন্ত্রের (লাঙ্গলাদির) উদ্ভাবনের ফলে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একা স্বতন্ত্র একখণ্ড জমি চাষ করা সম্ভব হয়ে এলো, এদিকে অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারাও লোকে একা একা হাতের কাজে নানারকম জিনিষপত্র তৈয়ার করতে সুরু করল। কোন ব্যক্তির পক্ষে সুতরাং এই সময় থেকে নিছক তার নিজের শ্রমজাত দ্রব্যাদি তার নিজস্ব বলে দাবী করা সম্ভব হোলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরু এই ভাবে। সমাজ ক্রমে নতুন এক বনিয়াদের উপর এসে দাঁড়াল। উৎপাদন যন্ত্রাদি যার অধিকারে, সে-ই উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক,—এই হোলো এ সমাজের মূল নীতি। এই সমাজের চরম বিকাশ হয়েছে পুঁজিপতিদের আমলে। ইতিমধ্যে কিন্তু বিচিত্র রকমের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও লুপ্ত হয়েছে।

মালিকিয়ানার প্রথম দিকে ক্রীতদাসদেরকেই শ্রমে নিযুক্ত করা হোতো। এই দাস প্রথা অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল, কিন্তু এর কাঠামো সর্ব্বত্রই এক।—সেটা এই যে, দাসকে ইচ্ছামত কাজে খাটানো হোতো, তার শ্রমশক্তি বজায় রাখবার জন্য ন্যূনতম যতটুকু খাদ্যাদি তার প্রয়োজন তা তাকে দেওয়া হোতো, অবশ্য শুধু যে তাকেই বাঁচিয়ে রাখা হোতো তা নয়, লাভের খাতিরে দস্তুরমত দাসবংশই সৃষ্টি করতে হয়েছিল, কারণ দাসের সন্তান সন্ততিরাও মালিকেরই দাস, যেমন গরুর বাচ্চাগুলাও গরুর মালিকেরই সম্পত্তি—অতএব দাসের বংশবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হোতো।

আমাদের এই সুপবিত্র ভারতভূমি কোনদিন দাসপ্রথাদ্বারা কলুষিত হয় নি - কোন কোন গোঁড়া অথবা কাণ্ডজ্ঞানহীন ঐতিহাসিক এ রকম মত পোষণ করেন। প্রাথমিক পুঁজিদারদের সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে তার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উন্নততর সমাজ প্রবর্ত্তনার সূত্রে দাসপ্রথা আপনা থেকেই এসেছিল, প্রয়োজনের খাতিরেই এসেছিল। ভারতবর্ষে সেটা কোনদিন আসে নি একথা বলার অর্থ হচ্ছে ভারতবর্ষ সেই আদিম যুগেই রয়ে গেছে। আসল কথা কিন্তু এই যে, ভারতবর্ষে দাসপ্রথা পশ্চিম-এশিয়ায় (ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি) অথবা ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী (গ্রীস্ ইটালি প্রভৃতি) দেশে প্রচলিত প্রথার অনুরূপ ছিল না, এই মাত্র। কিন্তু দাসত্ব যে ছিল সে বিষয়ে আন্দাজেরও কোন অবসর নেই। আমাদের মহাকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যাদিতে তার রাশি রাশি প্রমাণ রয়েছে। এই প্রথার মস্ত বড় একটা অংশ আমাদের জাতি-ব্যবস্থায় আজও দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে যাঁরা বন্দী হোতো শুধু তারাই নয়, কখন কখন পরাজিত এক একটি গোটা জাতিকে দাস শ্রেণীভুক্ত করা

হয়েছে। তথাকথিত 'আর্য্য' বিজেতারা ভারতবর্ষে এইটাই করেছিলেন। বিজিত অধিবাসিদেরকে তাঁরা সমস্ত রকম দাসত্বের কাজে লাগিয়েছিলেন, এবং পরে সমাজের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে এদেরকে স্থান দিয়েছিলেন। 'শূদ্র'দেরকে দাস বলা হোতো। নিছক অন্যের সেবা করবার জন্যই যারা জীবন ধারণ করে তারাই দাস। যে সমাজে এই রকম দাসের গোটা একটা শ্রেণীই ছিল, সেখানে দাসপ্রথা ছিল না, একথা বলার কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সমাজে এই শ্রেণীগত দাসত্বের লুপ্তাবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায়। ঘৃণিত অস্পৃশ্যতা তার একটি কুৎসিত নিদর্শন। মধ্য এশিয়ার যাযাবর বিজেতারা এদেশের বিজিতদের উপর এই প্রথা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাস তাদেরকে আর্য্য বলে গৌরবান্বিত করেছে। আর্য্য নাম তারা নিয়েছিল কিন্তু এদেশ জয় করার পরে। সংস্কৃতে 'আর্য্য' মানে, প্রভু।

দাসপ্রথার আমলে শ্রমশক্তি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বিলাসদ্রব্যাদি, মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি তৈয়ারির কাজে। দাসের শ্রমের বিশেষ কোন মূল্যই ছিল না, থাকলেও তা অতি সামান্য, কাজেই মালিক তাঁর খুসীমত এই শ্রম যত্র-তত্র ব্যয় করতে পারতেন। এটা বিশেষ করে তখনই সম্ভব যখন দাস পাওয়াও যেত প্রচুর সংখ্যায়, যুদ্ধ জয়ের ফলে এবং জনাকীর্ণ দেশ অধিকার করার পরে। যাই হোক্ ক্রমে দাসশ্রমের উপর ভিত্তি ক'রে সমাজে একটি পরগাছা শ্রেণীর আবির্ভাব হতে থাকে। এই শ্রেণীর বিলাসের জন্য, তাদের গৃহকর্ম্মাদির জন্যই দাসশ্রম উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হতে থাকে। বিলাসময় জীবন শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলে গণ্য হয়। ফলে শ্রমশক্তি ক্রমশঃ সমাজের প্রয়োজনের ক্ষেত্র -বিশেষতঃ কৃষি থেকে সরে আসতে থাকে। কৃষিই ছিল তখনকার সমাজের প্রধান উপজীব্য। সুতরাং এই সমাজ ক্রমে তার ভারকেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে দাসশ্রমের উপর প্রবর্ত্তিত উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যায়।

ভারতবর্ষের দাস প্রথা ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ইজিপ্ট্ অথবা গ্রীস ও রোমের মত না হওয়াতে এখানে এই ভাঙনের ব্যপারটা ওই সব দেশের মত অত দ্রুত এবং চমকপ্রদ হয় নি। কিন্তু তবুও প্রাচীন ভারতবর্ষেও বড় বড় সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলিতে তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগে বৌদ্ধ অভ্যুত্থান ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিরুদ্ধে এই প্রকারের একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। বুদ্ধ নিজে সেই সমাজের বিলাসী পরগাছাদের বিরুদ্ধে একটি মূর্ত্ত প্রতিবাদ। এরই পর সেই পুরাণো সমাজের ধ্বংসের পর এক নবতর, উন্নততর সমাজের গোড়া পত্তন হয়। এর প্রায় হাজার বছর পরে প্রতিক্রিয়ার উজানস্রোতে বৌদ্ধসমাজের ভাঙন ও ব্রাহ্মণ্য অভ্যুদয় সুরু হয়। কিন্তু সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ আর ফিরে আসে নি, যে নতুন সমাজ বিবর্ত্তিত হয়েছিল তার কাঠামো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন নামটি মাত্র ছিল, কিন্তু সেই পৌরাহিত্য প্রভাব আর পুনরুজ্জীবিত হয় নি। এই যুগের হিন্দুরাজাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গোড়া পত্তন হয়।

দাসশ্রমজীবী সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর সামন্তসমাজের উদ্ভব হোলো। এ যুগের

উৎপাদন ব্যবস্থা আরো স্বতন্ত্র। জমির উপর মালিকিয়ানা স্বত্ব যা পূর্ব্বতন যুগেই স্বীকৃত হয়েছিল, এই সমাজের ভিত্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। দাসপ্রথার স্থানে ভূমিদাস প্রথার উৎপত্তি হোলো।

এই ভূমিদাস প্রথাও অবশ্য ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইউরোপীয় প্রথা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য নিতান্তই বাহ্যিক। সামন্ত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মোট কথা হচ্ছে এই যে ভূমিদাস তার নিজস্ব যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি চাষ করত। উৎপন্ন শস্য থেকে তার ও তার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকী সমস্ত জমীর মালিককে দিতে বাধ্য ছিল। জমীই এখনও উৎপাদনের প্রধানতম ক্ষেত্র। কিন্তু চাষী নিজে জমীর মালিক নয়। স্বাধীন চাষীকে উৎখাত ক'রে, অথবা সামরিক শক্তিসম্পন্ন জাতির পরদেশ জয়ের ফলে এই সামন্ত-তন্ত্রের উদ্ভব হয়। সৈনিকেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে জমী চাষ করতে থাকে। সৈন্যদলের অধিনায়ক এবং নায়করা জমীর মালিক হন। এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রথা ভারতবর্ষে অতীতকালে শুধু যে ছিল তাই নয়, বহুল পরিমাণে আজো রয়ে গেছে।

ক্রমে এই সমাজের ভিতর থেকেই মানুষের সভ্যতার আরো নূতনতর অধ্যায়ের সূচনা হোলো যখন ধীরে ধীরে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব হতে লাগল, নতুন ধরনের সমাজ-বিপ্লব সুরু হোলো। সামন্ত ভূস্বামী ও ভূমিদাসদের মাঝামাঝি আর একটি শ্রেণী ক্রমশঃ বেড়ে উঠল, ব্যবসায়ীদের শ্রেণী। ভূস্বামীদের শোষণের ফলে ভূমিদাসেরা—এবং তারাই সমাজের প্রায় পনের আনা অংশ—বরাবরের জন্যই পেটভাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল, এ অবস্থায় কোনপ্রকার শিল্পোন্নতি সম্ভব নয়। কারণ সমাজের সর্ব্বসাধারণ যতদিন নিরন্তর উপবাসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ততদিন পর্য্যন্ত শিল্পবস্তুর উৎপাদন নিরর্থক। উৎপাদনের মূল প্রেরণা হচ্ছে চাহিদা। নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের উষর ক্ষেত্রে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের কণামাত্রও ব্যাহত না ক'রে জনসাধারণের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। এই জন্য দারিদ্র্যকে তখন খুব গৌরবের আসন দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র সামন্তযুগের সংস্কৃতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জয়গানে মুখর।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান সভ্যতার অগ্রদূতেরা তখন দ্বারে এসে করাঘাত করতে সুরু করেছে। এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর গতিরোধ করা আর সম্ভব ছিল না। ভূমিদাস প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে আর যাই হোক্ কৃষির প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্যাদি সমস্তই আর উৎপাদকের ভোগে ব্যয়িত হোতো না। সুতরাং উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করা হোতো। বিশেষতঃ অন্যান্য বিলাস দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্যও বিক্রয় করা প্রয়োজন হোতো। এই প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমে বাজার বাড়তে লাগল, ব্যবসায় বাণিজ্যাদির বিস্তার হতে লাগল। প্রথম দিকে ব্যবসায়ী অবশ্য ভূস্বামীর তাঁবেদার হিসাবেই কাজ করত। পরে বণিককে স্বাধীন বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ তার সাহায্য ছাড়া ভূমিদাসদের শোষণ-লব্ধ বস্তু টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য প্রথম প্রথম ব্যবসার ছাড়পত্রে বিধিনিষেধ কিছু কিছু ছিল। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তারের

সঙ্গে সঙ্গে এসব ক্রমে বাতিল হতে থাকে। বাণিজ্যের ফলে মুনফা। সুতরাং বিধিনিষেধ সত্বেও বণিকের পক্ষে ধনসঞ্চয়ে বিশেষ বাধা হচ্ছিল না। এই সঞ্চিত ধন ক্রমে বণিক নানাপ্রকার শিল্পাদির সৃষ্টি ও উন্নতির কাজে খাটাতে সুরু করে। ফলে আরো ধনার্জ্জন এবং শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ। এর অব্যবহিত ফল, ভূস্বামী একাধিপত্যে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

সংঘর্ষের সময় ক্রমে ঘনিয়ে এলো। আধুনিক শিল্পোন্নতির মূলে রয়েছে শ্রমিকের শ্রম নিয়োগের স্বাধীনতা। সুতরাং এই উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিশ্রম যারা করবে তারা যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন না হচ্ছে, জমীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার বাধ্যতা তাদের যতদিন না ঘুচে যাচ্ছে ততদিন শিল্প অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির ভিতর আটক থাকতে বাধ্য, তার বিপুল বিস্তার সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরও একটি দিক্ আছে। শিল্পোন্নতির জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে চাহিদা চাই। সেই জনসাধারণ যতদিন মাত্র পেটভাতায় রয়েছে ততদিন তাদের কোন চাহিদা থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃষিজাত বস্তুর কিছু উদ্বৃত্ত যদি তাদের হাতে না থাকে তবে তাদের মধ্যে নতুন কোন চাহিদার সৃষ্টি হতে পারে না। এই দুই প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে সুতরাং সামন্ত ভূস্বামীকে আগে ঢিট্ করা দরকার। প্রথমতঃ মানুষকে তার ইচ্ছামত স্থানে তার কায়িক শ্রম বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিতে হবে,—অর্থাৎ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, নিছক নুন-ভাতের খরচা ছাড়া আরো কিছু বেশী যাতে জনসাধারণের হাতে থাকে সেটা দেখতে হবে—অর্থাৎ ভূস্বামীর লভ্যাংশ কমাতে হবে। প্রথমটির অর্থ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার উচ্ছেদ। দ্বিতীয়টি আরো মারাত্মক, ভূস্বামীর আইনসম্মত অধিকার লোপ। কারণ আইনতঃ ভূস্বামীই ভূমিজ সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তাঁর পকেটে হাত না দিয়ে জনসাধারণকে ছিটে ফোঁটাও দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ভূস্বামীদের সমস্ত অধিকারের রক্ষাকর্ত্তা রাজা। অর্থাৎ এক কথায় রাজতন্ত্রের মধ্যে সামন্ত সমাজের মূলসূত্রগুলি কেন্দ্রীভূত। সুতরাং নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানের শিল্পসভ্যতাকে সে যুগের রাজতন্ত্রের সঙ্গে আগে ভালমত বোঝাপড়া করে নিতে হয়েছে, সে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছিল রক্তাক্ত সংঘাতের পথে। ইতিহাসে এই সংঘাতের নাম বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা আজো আছেন বটে, কিন্তু সে রাজতন্ত্র আর নেই। রাজা এখন শুধু নাম মাত্র। অবশ্য যে সব স্থানে এ সমস্যার মীমাংসা হয়েছে কিছু পরিমাণে রফানিষ্পত্তির সাহায্যে সেই সব স্থানেই রাজা এখনও টিকে আছেন। সেই সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রেও সুতরাং খুঁত রয়ে গেছে, মধ্যযুগের সামন্ত সমাজের প্রতীককে এখনও ওই সব দেশ বহন করে চলেছে।

ক্রমশঃ

ঢেউ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

ভরা ভাদ্রের মেঘনায় আজি উজান উঠছে ক্ষেপে,
বাঁধের সীমানা ভাঙি ছোটে ঢেউ শতেক যোজন ব্যেপে
রাক্ষুসি আজ দুলে দুলে নাচে মরণলীলার তালে,
ঢেউয়ের পর ঢেউরা ছুটিয়া শস্য জড়ায় জালে।
ঘোলা কালো ঢেউ ফেনায়ে উঠিছে ফুলের মুকুট শিরে,
চৌদিকে বাজে ঝড়ের ডমরু বাতাস নাচিছে তীরে।
জলের রূপসী পাতাল পুরীর নাগ-কন্যার দল,
নবীন বানের পরশ পাইয়া হইয়াছে চঞ্চল।
পাতাল পুরীর বন্দিনী সুতা কাঁদিছে রাত্রি দিন,
রূপসীরা গেছে জল-উৎসবে রাখি দুঃখিনীরে ভিন্।
চারিদিকে হায় চেড়ীর প্রহরী কঠিন লৌহদ্বার,
কাঁদিয়া রূপসী কাটায় পহর ধৈর্য্য ধরেনা আর।
হেথায় আকাশে মেঘের পাহাড়ে যুবতী মেঘের খেলা,
সূর্য্য আজিকে ঘুমায় অঘোরে আলসে কাটায় বেলা।
আকাশের নীলে মেঘের মর্জ্জি গর্জ্জি গর্জ্জি উঠে,
পহরে পহরে সূয্যিমামার আবেশ যেতেছে টুটে।
ধূমল মেঘের গলায় বিজলী নব কিশোরীর সাজে,
চৌদিকে বাজে ঢেউ-করতাল তূর্য্য বাজায় বাজে।
আকাশ কোণায় সবুজের বনে বৃষ্টির কানাকানি,
(যেন) দুষ্ট শিশুর দস্যির মত হাত দিয়ে হানাহানি।

আকাশের নীচে চাষীর চালার উঠেছে নাভিশ্বাস,
"বেতের বাঁধন ছিঁড়িওনা বঁধু হারায়োনা বিশ্বাস।
চিরদিন মোরা ঝড়ের শোষণ সহিয়াছি নত মুখে,
বন্যার ফনা জড়ায়ে জড়ায়ে খুঁটিরে গ্রাসিছে রুখে।
অত্যাচারীর মাতলামি আর ময়দানবের খেলা,
মোদের দেহের বাঁধন ভেঙেছে জীবনেরে করি হেলা।

মৃত্যু-ভেলায় জীবন বাঁধিয়া মোরা জমায়েছি পাড়ি,
দুঃখরে ছিঁড়ি নখের আঁচড়ে শাসনেরে লব কাড়ি।
দুর্দ্দিনে আর দুখের জোয়ারে ভাসিয়া পানার মত,
চলিয়াছি মোরা অবিরাম স্রোতে লাঞ্ছিত অবনত।
মেজাজী মেঘের ধমকানি শুনি মোরা নাহি করি ডর"
নাস্তানাবুদ কহিছে চাষীব ভগ্ন চালার ঘর।

সবুজ ধানের খেয়ালী মেযেবা পাতিয়া আঁচল সবে,
কাটায দিবস হেলিযা দুলিযা নাচি মধু-উৎসবে।
মাটির মাথায় এলাইযা পড়ে স্নেহ কুড়াইযা লয়,
শিরায় শিরায় চঞ্চল-স্নেহ তড়িতে ছুটিযা বয়।
বাতাসের বেণু বাজায রাগিণী সোহাগীরা উঠে দুলে,
পাতায পাতায কোলাকুলি করি আবেশে পড়িছে ঢুলে।
সহসা জীবন কাঁপাইযা হাঁকে বান-দৈত্যের চেলা,
নিমেষে আবেশ বিলীন হইল, ভাঙ্গিল সুখের মেলা।
গাঁয়ের ওধারে জেলেদের ডিঙি হিজল গাছের তলে,
শিশুটির মত বাঁধা পড়িযাছে লোহার শিকল গলে।
চমকি ক্ষণিকে কৌতুকে চায মাতাল ঢেউযের পানে,
বন্দী ডিঙিব শৃঙ্খল বাজে মরণের ভীরু তানে।
স্পর্দ্ধিত ঢেউ গর্ব্বিত মনে তুলিযা শীর্ষ 'পরে,
দোলায ডিঙিরে নাগর দোলায় গবজে ক্রুদ্ধস্বরে।
আহত ডিঙিব মৌন বেদনা উছল হইয়া চলে,
ঢেউযেব যাত্রা ভাঙ্গিয়া দুকূল কে জানে কোথায় চলে।
ওরে ক্ষ্যাপা ঢেউ তোর কিরে কোন কূলের ঠিকানা নাই?
কালের ঘরের কুলুপ ভাঙ্গিয়া ছুটিস্ কেবলই তাই।
তোর চলা যদি শেষ না হইবে ঠাঁই না মিলিবে তোর।
তবে কেন তুই বহিয়া বহিয়া রজনী করিস্ ভোর?
কাহার লাগিয়া কাঁদিয়া মরিস্ কোথায় কে তাহা শোনে?
কাহার লাগিয়া নিদ্ নাহি তোর নীল নয়নের কোণে?
মহা যাত্রার তালে তালে তোর ধ্বংসের ধ্বনি শুনি,
সৃষ্টি কি তোর মথনে হবে না, বলত বন্ধু শুনি?

রকেট ভ্রমণ

শ্রীসতীভূষণ সেন

বছর দুই পূর্ব্বে সাগর দ্বীপে রকেট সাহায্যে ডাক পাঠাইবার পরীক্ষা হইয়াছিল। খবরের কাগজে তাহার বর্ণনা পড়িয়া নূতনত্বের মোহে উৎসাহিত হইয়া কত কল্পনাই না করিয়াছি। ভাবিয়াছি দুই এক মাসের মাঝেই কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের ডাক রকেট সাহায্যে চলিতে দেখিব। বিলাতী ডাক করাচী হইতে রকেটে চড়িয়া কলিকাতা আসিবে। এবং সে শুভদিনও আগতপ্রায় যেদিন রকেটে শুধু ডাক চড়িবে না ডাকের পাশে আমাদের দুই একজনেরও স্থান হইবে। কিন্তু হায়! রকেট ডাক সেই যে রকেটের মত হঠাৎ একদিন দেখা দিয়া কোথায় মিলাইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

রকেট সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। রকেট একরকম হাউই। হাউই কি ভাবে আকাশে ওঠে তাহা আপনি জানেন। বারুদ বোঝাই একটা বাঁশের চোঙা—তাহার নীচে একটা ফিতায় আগুন দিলে আগুন ক্রমশঃ বারুদে পৌঁছায় এবং বারুদের Explosionএর জোরে ঐ চোঙা শূন্যে ছুটিয়া যায়। মরিচ বাজির মুখে আগুন ধরাইয়া ছেলেরা যখন তাহা ছাড়িয়া দেয় তখন ঐ বারুদের জোরেই সে সম্মুখ দিকে ছুটিয়া অসতর্ক পথিককে বিব্রত করে। কিন্তু বারুদ পুড়িয়া মরিচটাকে কেন ছুটাইয়া লইয়া চলে, কেন মরিচটী একস্থানে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হয় না, তাহার কারণ বুঝিতে হইলে আমাদের অপর একটী অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিতে হইবে।

বন্দুক ছুঁড়িলে পিছন দিকে যে ধাক্কা লাগে তাহার নাম kick। যে কারণে Explosion এর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটীতে kick লাগে, ঠিক সেই কারণে হাউইএর নীচে আগুন দিলে তাহা উপর দিকে ছুটিয়া যায়। কথাটা আরও বিস্তারিত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বরফের মত পালিস একটী টেবিলের উপর বন্দুকটী শোয়াইয়া আওয়াজ করা হইল। ধাক্কার চোটে বন্দুকটী পিছনদিকে লাফ দিবে, টেবিল পার হইয়া নীচেও পড়িতে পারে। যদি টেবিলটী এক মাইল লম্বা হয় এবং বন্দুকটী বারম্বার অটোমেটিক বন্দুকের মত আওয়াজ হইতে থাকে তবে ধাক্কা খাইতে খাইতে তাহা পিছন দিকে একমাইল পার হইয়া যাইবে ইহা কল্পনা করা কঠিন নহে।

বন্দুকটী যদি যথেষ্ট হালকা হয় তবে আওয়াজের ফলে তাহা শূন্যের মধ্যে ছুটিতে থাকিবে এবং তখন তাহাকে বলিব রকেট। জাহাজের চাকা বা propellor জলকে পিছন দিকে ঠেলে—জাহাজ সম্মুখ দিকে চলিতে থাকে। এরোপ্লেনের পাখা বা propellor বাতাসকে পিছনের দিকে ঠেলে এবং এরোপ্লেন সম্মুখ দিকে ছুটিয়া যায়। হাওয়া যতই ভারি হয় এরোপ্লেনের বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রকেটের সহিত বায়ুর সম্পর্ক কিন্তু ঠিক বিপরীত। বায়ু যতই পাতলা হয়

রকেটের Explosion তত জোরে রকেটের গায়ে ধাক্কা দেয়। একটা তুলনা দিলে ব্যাপারটা সহজ হইবে।

Dynamite দিয়া পাথর ভাঙ্গিতে দেখিয়াছেন ? পাথরে ছোট একটা গর্ত্ত করিয়া তাহাতে একটা Dynamite রাখিয়া মাটি দিয়া সেই গর্ত্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। Explosion হওয়া মাত্র মাটীটুকু ফুৎকারে উড়িয়া যায় এবং সেই বিশাল পাথর চৌচির হইয়া ফাটিয়া পড়ে। Explosion সব চাইতে বেশী আঘাত করে তাহাকেই যে তাহাকে সব চাইতে বেশী বাধা দেয়। বায়ুহীন স্থানে রকেটের Explosion শূন্যে শক্তি ক্ষয় করিবে না—রকেটের উপরেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে। এবং বায়ু যতই ঘন হয় Explosionএর তত বেশী শক্তি বায়ুর পিছনে নষ্ট হয়।

আজকাল জার্ম্মান Opel মোটর গাড়ীর খুব চল। দশ বৎসর পূর্ব্বে Opel সাহেব রকেট দিয়া প্রথম মোটর গাড়ী চালিত করেন। তাহার গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও উপরে উঠিয়া ছিল। তাহার কিছু পর জার্ম্মানীতে প্রথম রকেট চালিত Glider (এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন) এর পরীক্ষা হয়। রকেট চালিত রেলগাড়ীর গতি ঘণ্টায় দেড়শত মাইল পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। ইহার পর স্বর্গীয় Maxvallier বরফের উপর দিয়া রকেট চালিত sledge লইয়া পরীক্ষা করেন। তাহার গতি ছিল ঘণ্টায় আড়াইশত মাইল। রকেট চালিত মোটর গাড়ীর পরীক্ষা করিবার সময় তিনি দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই হইতে জলে-স্থলে রকেটযানের পরীক্ষা বন্ধ হয়।

তাঁরার পরীক্ষার ফলে দুইটী অসুবিধার কথা সকলের নজরে পড়িল। বারুদের রকেট চালনা যানবাহন হিসাবে যে কত বিপদজনক তাহা অনুভব করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা রকেটের জন্য নূতন ধরণের তরল fuel আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন এবং petrol ও liquid oxygen মিশাইয়া চলনসই মত একটা তরল বিস্ফোরক fuel আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয় অসুবিধাটাই হইল মারাত্মক। পণ্ডিতেরা মাথা নাড়িয়া বলিলেন কেহ যদি ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইলের কম গতিতে ভ্রমণ করিতে চাহেন তাঁহার পক্ষে রকেট চড়ার সৌখিনতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কম speed বা গতির জন্য propellor চালিত যানই সুবিধাজনক এবং পঁচিশ হাজার মাইল speedএ জল-স্থল বা নিকট আকাশপথে ভ্রমণের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। তবে কি এত পরীক্ষা, অর্থব্যয় ও আত্মদানের পরে রকেট জিনিষটা বিজ্ঞানের পুঁথির পাতাতেই রহিয়া যাইবে ? মোটেই তাহা নহে—রকেটের ভবিষ্যত অতিশয় গৌরবমণ্ডিত। ভাবীযুগের 'ফোর্ড' রকেট তৈয়ারী করিবেন গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ভ্রমণের জন্য !

গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে! ব্যাপারটা Romantic নহে কি ? আজ চন্দ্রলোক কাল মঙ্গলগ্রহ এই সব স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—মনে করিলে আসন্ন বিপ্লবের Romanceও তুচ্ছ মনে হয়। রকেট চড়িয়া পৃথিবী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে না পারিলে জীবনই বৃথা। চন্দ্র আমাদের বাড়ীর এত কাছে অন্ততঃ একবার চন্দ্রলোকের সেই সূতাকাটা বুড়ীর সঠিক পরিচয় লইতেই হইবে।

প্রথমে দরকার একখানি রকেট। তাহা প্রস্তুতের অর্ডার দিবার সময় অনেক জিনিষ

হিসাব করিতে হইবে। রকেট চলিবে কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তি তাহার গতিপথে বাধা জন্মাইবে—তাহার পথে কোথায় কোন্ শত্রু লুকাইয়া আছে সবই আমাদের জানা দরকার। রকেটের প্রথম বাধা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণেব আলিঙ্গন। ইহা কাটাইয়া কি ভাবে শূন্যে ওঠা যায়? পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাবা আঁক কষিয়া বুঝাইয়া দিলেন—একটি কামানের গোলা যদি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিতে নিক্ষিপ্ত হয় তবে তাহা পৃথিবীর আলিঙ্গন ছাডাইয়া যাইতে পারিবে। তাহার কম গতিতে চলিবে না। তাহা হইলে বিশাল এক কামান তৈযার করাইয়া তাহার ভিতরে রকেটটীকে পুরিয়া আওয়াজ কবাইতে হয়। কিন্তু ভাবিযা দেখুন সেই অবস্থায় রকেটের মধ্যে থাকা কি নিরাপদ? প্রথমতঃ উহার যে acceleration হইবে তাহাতে মানুষ বাঁচিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উহার গতিবেগে বাযুর পেষণে রকেটটী জ্বলিযা আগুনের গোলায় পরিণত হইবে। এ অবস্থায সুস্থদেহে চন্দ্রলোকে পৌঁছান যাইবে কিনা সন্দেহ। অতএব কামানের সাহায্যে পৃথিবী পরিত্যাগের কল্পনা ছাডিযা অন্য কোদ নিবাপদ পন্থার সন্ধান করা যাউক।

ধরণীর বাঁধন কাটাইবাব শক্তি রকেটের নিজেরই সঞ্চয করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কোন fuel আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা নিজের শক্তিতে কেবল মাত্র নিজের দেহকে (বা ওজনকে) পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে। অথচ এমন fuel আমাদের চাই যাহা শুধু নিজেকে নহে আস্ত একটী রকেট এবং পূর্ণ একটী মানুষকে ঠেলিয়া পৃথিবীব বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম। বিজ্ঞানের পুঁথিতে এমন fuelএর সন্ধান পাওয়া না গেলেও মিঃ ক্লিযেটর দাবী করিতেছেন তাঁহার Laboratory তে সেরূপ fuel আছে। তিনি একটী রকেট জাহাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন যাহা চারিজন নাবিক সহ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে ও এখানে পুনবায় ফিরিযা আসিতে পারিবে। রকেটটীর নিজের ওজন মাত্র ২০ টন কিন্তু fuel ও fuel পাত্রসহ প্রথম ছাডিবার সময় তাহার ওজন হইবে ৪১ হাজার টন। ইহার খরচ পড়িবে ২ কোটী পাউণ্ড। খরচের কথা শুনিয়া বর্ত্তমানে গ্রহগ্রহান্তরে ভ্রমণের কল্পনা স্থগিত রাখিতে হইতেছে। কিন্তু আশা এই—ভাবীকালে আরও শক্তিশালী fuel আবিষ্কার হইবে, তখন খরচও কম পডিবে।

মনে করুন, পঞ্চাশ বছর পরে যেরূপ fuel আবিষ্কৃত হইল, এবং আপনি পৃথিবী ছাডিযা রওনা হইলেন। একবার পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে যাইতে পারিলে তখন আর fuel এর প্রযোজন হইবে না। সেখানে আকর্ষণ নাই, friction নাই, বাধা নাই, তাই অবাধে পূর্ণগতিতে (অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে, যে গতিতে আপনি পৃথিবীর atmosphere ছাডিয়াছেন) আপনি চলিতে থাকিবেন।

২৫ হাজার মাইল গতিতে মানুষ বাঁচিতে পারে কিনা সন্দেহ। পণ্ডিতেরা বলেন, হঠাৎ একলাফে ২৫ হাজার মাইল গতিতে না উঠিয়া ধীরে ধীরে গতি বাড়াইয়া ৮ মিনিট সময়ে, স্থিতি হইতে ২৫ হাজার মাইল গতিতে উঠিলে মানবের কোন অসুবিধা হইবে না। উহার ভাল ভাল প্রমাণ আছে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়াও আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। নতুবা গ্রহ ভ্রমণ

ঔপন্যাসিকের কল্পনাই থাকিয়া যাইবে। বিশেষত এখনই কিছু আর রকেট চড়িতেছি না। চড়িবার পূর্ব্বে প্রমাণগুলি ভাল করিয়া দেখিলেই চলিবে।

বাধা দেওয়া যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা এক আপত্তি তুলিবেন। তাঁহারা বলিবেন সূর্য্যদেবকে পৃথিবীতে বসিযা যেমন দেখ তিনি ঠিক তাহাই নহেন। তাঁহার অনেক রহস্যপূর্ণ রশ্মি আছে। তোমার রকেট জাহাজ সেই সব রশ্মির সংস্পর্শে আসিলে মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইবে। পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাহিরে stratosphereএর উপরে সূর্য্যদেবের বিভিন্ন প্রকারের Electric rays বিচরণ করে সত্য কিন্তু তাহার স্পর্শে রকেট যে ধ্বংস হইবে তাহার প্রমাণ কি? অপর পক্ষ বলিবেন, ধ্বংস যে হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর Electric raysএর কথা ছাড়িযা দিলেও সূর্য্যের উত্তাপ বায়ুহীনস্থানে কিরূপ প্রখর হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিযাছ কি? তুমি ও তোমার রকেট সেখানে গেলে ভাজিয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। উত্তাপ সেখানে খুবই বেশী। রকেটের যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকিবে তাহা হইবে খুবই উত্তপ্ত এবং বিপরীত দিক হইবে খুবই শীতল। কিন্তু এই বিপদ হইতে উদ্ধারেরও উপায় আছে। Thermoflaskএর মত double walled রকেট হইলে ভিতরের উত্তাপও শৈত্য প্রয়োজনানুরূপ রাখা সম্ভব। stıastosphereএ যে ব্যক্তি প্রথম ওঠেন, তাঁহাকেও এই জাতীয় বহু অমূল্য পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি stratosphereএ উঠিযাছিলেন এবং অক্ষতদেহে ফিরিয়াও আসিয়াছিলেন। সংশয়বাদীর দল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সাহসীদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আজ যাঁহারা গ্রহান্তর ভ্রমণ সম্পর্কে আপনাকে নিরুৎসাহ করিতেছেন তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা কলম্বসকে পাগল বলিয়া উড়াইযা দিয়াছিলেন। এবং দুঃখ করিযা বলিয়াছিলেন যে বেচারী পশ্চিমদিকে যাইতে যাইতে পৃথিবীর পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া জাহাজ সুদ্ধ গড়াইয়া নরকে গিয়া পৌঁছিবে।

আপত্তি উঠিবে—শূন্য উল্কাময। শূন্যে উড়িবার সময় কোন একটী উল্কাপিণ্ডের সহিত রকেটটীর ধাক্কা লাগিলে কি অবস্থা হইবে কল্পনা করুন। উল্কাপিণ্ড ছোট হইলে রকেটখানি এপার ওপার ছিদ্র হইযা যাইবে এবং বড হইলে রকেট চূর্ণ হইযা যাইবে। ভয়ের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে আবার বিশেষ ভয়ের কথা বলিয়া মনে হয় না। কালীপূজার রাত্রে যখন সবাই বাজি পুড়াইতে থাকে তখন দুইটি হাউইএর মাঝে টক্কর লাগিতে দেখিয়াছেন কখন? এই ক্ষুদ্রায়তন আকাশে হাউই হাউয়ে যদি টক্কর না লাগে তবে অসীম শূন্যে দূর দুরান্তরে যে সব উল্কাপিণ্ড ছুটিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের কাহারও সহিত আমাদের রকেটের ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা সুদূর পবাহত।

অতএব যাওয়া আমাদের স্থির। কিন্তু যাওয়ার এখনো দুই চারি বৎসর বিলম্ব আছে। সেই অবসরে রকেট চড়িতে কেমন লাগিবে সে বিষয়ে কল্পনা করিয়া সময় কাটান যাউক। যখন রকেটের গতিবেগ বাড়িতেছে তখন মনে হইবে আপনি অনেক ভারি হইয়া পড়িয়াছেন। অস্বস্তির

কারণ অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিবেন আপনার ওজন কমিতে কমিতে একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। তখন বুঝিবেন পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে গিয়াছেন তাই আপনার ওজন নাই। পৃথিবী যে শক্তিতে কোন জিনিষ আকর্ষণ করে তাহাই উক্ত জিনিষের ওজন। এক এক গ্রহের আকর্ষণী শক্তি এক এক রকম। আমাদের পৃথিবীতে যে জিনিষের ওজন ৬ সের চন্দ্রে তাহার ওজন মাত্র ১ সের এবং শুক্রগ্রহে ৫ সের।

কথাটী কেবল মাত্র তুচ্ছ বৈজ্ঞানিক সত্য নহে—ইহাতে আপনার বিশেষ প্রয়োজন। রকেট চালনার খরচার হিসাবে ইহা কাজে আসিবে। পৃথিবী হইতে রকেট ছাড়িতে যত শক্তি বা fuel ক্ষয় হইবে চন্দ্র হইতে তাহা ছয় ভাগের একভাগ energy দিয়া শূন্যে ওঠা যাইবে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাইতে যদি ছয় টাকা ভাড়া হয় চন্দ্র হইতে পৃথিবী আসিতে ভাড়া লাগিবে মাত্র এক টাকা।

হিসাব ফেলিয়া রাখিয়া পুনরায় কল্পলোকে যাওয়া যাউক। রকেট জাহাজ শূন্যে ছুটিতেছে এমন সময় যদি আপনি জানালা দিয়া বাহিরে যান আপনি নীচে পড়িয়া যাইবেন না। কারণ শূন্যে নীচও নাই উপরও নাই। রকেটের বাহিরে যাওয়া মাত্র আপনি রকেটের মত একই গতিতে একই দিকে ছুটিতে থাকিবেন। আপনার গতি বৃদ্ধি করিবার বা ব্যাহত করিবার কোন শক্তি শূন্যে নাই। দেহের ওজন না থাকায় হাত পা উঠাইতে নামাইতে কোন শক্তি ক্ষয় হইবে না। গলা জলে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়া যেমন সহজ অনেকটা তেমনি। একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবেন, কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। সারাদিন দাঁড়াইয়া থাকা বা হাঁটিয়া বেড়ান, সারাদিন শুইয়া শুইয়া পা নাড়ার মতই আরামপ্রদ হইবে।

রকেট ভ্রমণ ক্রমশঃ অধিকতর লোভনীয় মনে হইতেছে? কিন্তু একটী বিষয়ে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে। যদি আপনার রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তখন কি ভীষণ বিপদ অনুমান করুন। আপনি মঙ্গলগ্রহ লক্ষ্য করিয়া পৃথিবী হইতে যাত্রা করিলেন—কিন্তু অতি সামান্য একটু দিক্ ভুলে রকেট মঙ্গলের কয়েকশত মাইল দূর দিয়া ছুটিয়া পিছনে চলিয়া গেল। তখন আপনি ২৫ হাজার মাইল গতিতে শূন্যে ছুটিতে থাকিবেন ও কোথাও পৌছিতে পারিবেন না! হয়ত কোটী কোটী বৎসর পরে আপনার জাহাজ কোন এক অজানা গ্রহের আকর্ষণে পড়িয়া তাহার চন্দ্র হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। কিম্বা হয়ত নূতন কোন সূর্য্যের আকর্ষণে বহ্নিআকৃষ্ট পতঙ্গের মত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। অথবা কোন গ্রহের সহিত ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

অতএব রকেট start দেওয়ার পূর্ব্বে সঠিক গতিপথ স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন গ্রহের সংস্থান ও গতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই অবগত আছি। একটু সাবধানে হিসাব করিলে পথ হারাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মনে করুন আপনি শুক্রগ্রহে যাইবেন। এখান হইতে শুক্রগ্রহে যাইতে যতদিন লাগিবে ততদিন পরে শুক্র কোথায় থাকিবেন তাহা হিসাব করিয়া সেই

দিকে রকেট ছাড়িলেই হইল। মুখে ইহা যত সোজা কাজে তত নহে। যে সব আঁক কষিয়া ইহা বাহির করিতে হইবে—এই প্রবন্ধে তাহার আভাষ দিলে, আপনাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িবার উৎসাহ একেবারে লুপ্ত হইবে। চাইকি গ্রহান্তর ভ্রমণের মধুর কল্পনাও ম্লান হইয়া যাইতে পারে।

পৃথিবী হইতে প্রথমেই চন্দ্রে যাওয়া সুবিধাজনক কারণ সে সবচাইতে নিকটে এবং পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে বলিয়া তাহার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার গতিবেগ পৃথিবীর উক্ত গতিবেগের সমান। যে কোন দিন চন্দ্রে যাওয়া চলিবে এবং দিক্‌নির্ণয়ের আঁকও বিশেষ কঠিন হইবে না। কিন্তু মনে করুন আপনি মঙ্গলে যাইতে চান। মঙ্গলের ও পৃথিবীর গতি বিভিন্ন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন মঙ্গল ও পৃথিবী সূর্য্যের একদিকে একলাইনে আসিবে তখনই মঙ্গলে পৌঁছান সবচাইতে সহজসাধ্য।

মঙ্গল ও পৃথিবী যখন সূর্য্যের দুইদিকে তখন তাহাদের দূরত্ব ২৩½ কোটী মাইল—কিন্তু যখন পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্য্যের একদিকে তখন তাহাদের দূরত্ব মাত্র ৫ কোটী মাইল। এই ৫ কোটী মাইল যাইতে রকেটের প্রায় ১০০ দিন লাগিবে। এই ১০০ দিন পূর্ব্বে start দিলে তবে মঙ্গলকে ঠিক ঐ স্থানে ধরা যাইবে। পৃথিবী, মঙ্গল ও সূর্য্য ঠিক ২২½ মাস পরে এইরূপ একদিকে একলাইনে আসে। অর্থাৎ প্রায় দুইবছর পরে পরে মঙ্গলে যাত্রার শুভদিন আসিবে। এবং মঙ্গলে গিয়া বেশী বিলম্ব করিলে আবার দুইবছরের মধ্যে ফিরিবার দিন পাওয়া যাইবে না।

এখন গ্রহান্তরে অবতীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করা যাউক। মঙ্গলে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হইলে সূর্য্যের চারিদিকে মঙ্গলের যে গতিবেগ (ঘণ্টায় ৫৪ হাজার মাইল) আপনার রকেটেরও সেইরূপ গতিবেগ attain করার প্রয়োজন হইবে। গতিবেগ স্থির করার জন্য ঘড়ির দরকার। কিন্তু শূন্যে পৃথিবীর ঘড়ি চলিবে না। তবে পৃথিবী হইতে wirelessএ electric signal দিয়া সময় জানান যাইতে পারে। সেই signal সাহায্যে রকেটেরও ঘণ্টায় ৫৪ হাজার মাইল গতিবেগ করিলেন এবং ক্রমশঃ মঙ্গলের আওতায় (sphere of influence) প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার আকর্ষণে কি আপনার রকেটকে টানিয়া তাহার সহিত সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে না? পৃথিবীর যেরূপ atmosphere তাহাতে Parachute দিয়া গতিবেগ কমান যায়। কিন্তু মঙ্গলের atmosphere অতিশয় হালকা বা Rarified। সেখানে Parachute ভাসিবে না। সেখানে পিছনের দিকে motor চালাইয়া রকেটের গতিবেগ কমাইতে হইবে। তাহাও খানিকটা fuel অপব্যয় হইবে।

fuel অপব্যয় শুনিতে যত সহজ ব্যাপার তাহা অপেক্ষা অনেক ঘোড়ালো। fuel যত বেশী লাগিবে, রকেটে তত বেশী fuel store করিতে হইবে এবং রকেট তত বেশী ভারি হইবে। এবং রকেট ভারি হইলে তাহা চালাইতে, উঠাইতে, নামাইতে আবার বেশী fuel দরকার। fuelএর প্রশ্ন vicious circleএর মত আমাদের বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই fuel এর প্রয়োজন আমাদের রকেটকে শূন্যে চালিত করিবার জন্য নহে। তাহার প্রয়োজন পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিবার

জন্য এবং নামিবার সময় মঙ্গলের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য। যদি কোন উপায়ে পৃথিবীর আকর্ষণকে বাতিল করিয়া দেওয়া যায় তবে fuelএর চিন্তায় মাথা ঘামাইতে হইবে না। এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা rotationএর শক্তিতে রকেট আপনিই শূন্যে উড়িয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই—তাঁহারা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষা যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে রকেটখানিকে এভাবে Electrify করা সম্ভব হইবে যে ইহার উপরে পৃথিবীর কোন আকর্ষণই খাটিবে না। তখন রকেট আপনিই ছুটিয়া শূন্যে উঠিবে এবং বিনা খরচে অন্য গ্রহে গিয়া পৌঁছিবে। সেই শুভদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে গত আগস্ট মাসে, কিন্তু যাকে দস্তুরমত যুদ্ধ বলা চলে এমন কিছুই আজ পর্য্যন্ত হয় নি। পশ্চিম মোহড়ায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘাঁটি আগলে বসে আছে। চড়াও আক্রমণের প্রথম দায়িত্ব এখন পর্য্যন্ত কেউ নিতে চাইছে না। এর একটা কারণ, গত যুদ্ধের পর ফরাসীরা তাদের সীমান্তে বহু খরচ পত্র ক'রে শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছে, যাকে ম্যাজিনো লাইন বলে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মানরা দেখতে দেখতে ফরাসীর এলাকার মধ্যে এসে পড়েছিল, এমন কি প্যারিস থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে কামান দাগবার সুবিধা তারা পেয়েছিল। মিত্রশক্তি পাল্টা মোহড়া দেবার পর যদিও তারা কিঞ্চিৎ পিছু হঠতে বাধ্য হয় তবু তারপর গোটা চার বছর ধরে যুদ্ধটা প্রধানতঃ ফরাসীর এলাকার মধ্যেই হয়েছে এবং এর ফলে ফরাসীর পূর্ব অঞ্চল এমন শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে তার ধাক্কা সামলে উঠতে ওদের প্রায় এক যুগ লেগে গেছে। সে যুদ্ধ থেমে যাবার পরই ওরা স্থির করে যে এমন কাণ্ড আর ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না এবং তখন থেকেই ম্যাজিনো লাইন বানাতে সুরু করে। বর্ত্তমানে এই লাইন নাকি অত্যন্ত দৃঢ়, এমন কি প্রায় দুর্ভেদ্য। দেখাদেখি জার্ম্মানরাও তাদের সীমান্তে বানিয়েছে সীগফ্রীড লাইন। সেটাও ওরা বলে খুবই দুর্ভেদ্য। দুর্ভেদ্য হোক্ আর না হোক, এটা নিশ্চিত যে এ দুটাই দস্তুরমত শক্ত ঘাঁটি, এবং যে পক্ষ আগে এসে চড়াও আক্রমণ করবে তার সামরিক শক্তির প্রচুর অপচয় হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বর্ত্তমানের রাজনীতি ছিল 'হাতে না মেরে ভাতে মারা'—অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে সবারই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে শত্রুপক্ষ কাবু হবেই। মিত্রশক্তি জার্ম্মানির বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধই করে রেখেছে বললে হয়, জার্ম্মানিও পাল্টা শোধ নিচ্ছে এ পক্ষের জাহাজ ডুবিয়ে। আহারাদি সংগ্রহের ব্যাপারে দুই পক্ষেরই যে ঘোরতর অসুবিধা হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহ। এভাবে অনির্দ্দিষ্ট কাল চলতে পারে না। কাজেই গত পাঁচ মাসের অনুসৃত

রণনীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়েছে। আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথমেই পশ্চিম মোহড়ায় ঘোরতর আক্রমণ সুরু হবে। ফরাসী থেকে বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে যে জার্ম্মানরা আক্রমণ করুক বা না করুক মিত্রশক্তি আর অপেক্ষা করবে না।

এ রকম মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে লড়াইয়ের একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলার তাগিদ জার্ম্মানিরও নিতান্ত কম নেই। মুখে সে যতই আস্ফালন করুক না কেন রসদের সঞ্চয় মিত্রশক্তির চেয়ে তার নিশ্চয় কম। সুতরাং অর্থনৈতিক সংগ্রাম অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সে একটা সঙ্কটে পড়েছে রাশিয়াকে নিয়ে। রাশিয়া উত্তরে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে, সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে। আবার দক্ষিণে রুমানিয়ার কাছ থেকে বেসারাবিয়া অঞ্চল নেওয়ার জন্য আর একটা যুদ্ধেও নামতে পারে এমন গুজব শোনা যাচ্ছে। এ রকম ক্ষেত্রে জার্ম্মানি কি নীতি অবলম্বন করবে সেই এক সমস্যা। নিছক লড়াইয়ের দিক্ থেকে দেখতে গেলে রাশিয়ার এই সব ব্যাপার জার্ম্মানির পক্ষে সুবিধারই কথা। কারণ প্রথমতঃ ফিন্‌ল্যাণ্ডে এবং বলকানে যদি রাশিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে তবে জার্ম্মানির পূর্ব্ব সীমান্ত নিয়ে আপাততঃ আর মাথা ঘামানর প্রয়োজন থাকবে না, ওই সব অঞ্চল পাহারা দেবার জন্য তার তেমন কোন সামরিক শক্তি ওখানে নিযুক্ত রাখবার দরকার হবে না। সমস্তখানি শক্তিই সে পশ্চিম সীমান্তে ব্যবহার করতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ, ফিনল্যাণ্ড ও বলকানে সাহায্য পাঠাবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীকে ম্যাজিনো লাইন থেকে অনেক কিছু সামরিক শক্তি সরাতে হবে, সেটা জার্ম্মানির একটা মস্ত লাভ। তৃতীয়তঃ, বাল্টিক ও বলকানে যুদ্ধ যদি চলতে থাকে তবে সেটা আর দেশবিশেষের ঘরোয়া যুদ্ধ থাকবে না, শেষপর্য্যন্ত একটা মহাযুদ্ধ দাঁড়িয়ে যাবেই। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া আর জার্ম্মানির সম্বন্ধে এখনকার মত নিরপেক্ষ থাকতে পাবে না, তাকে সামরিক সাহায্যও দিতে বাধ্য হবে। সুতরাং এ সব দিক থেকে দেখলে রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ যত ছড়িয়ে পড়ে ততই জার্ম্মানির লাভ।

কিন্তু এই লাভের দিকে জার্ম্মানি যে পুরোপুরি ঝুঁকতে পারছে তা ঠিক নয। সম্ভবতঃ তার সন্দেহ আছে যে এ পথে শেষ পর্য্যন্ত অবিমিশ্র লাভ না হতেও পারে। তার চাল-চলতি থেকে একটা দোমনা ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ফিনল্যাণ্ডের গোলমালটাকে পেকে উঠতে দিতে তার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। উত্তর ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি যে সব দেশ ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করছে তাদেরকে সে রীতিমত শাসাচ্ছে যে যদি তারা এ রকম করে চলে তবে জার্ম্মানি তাদেরকে নিরপেক্ষ বলে আর গণ্য করবে না। এদিকে রুমানিয়া অঞ্চলে ইটালি ও হাঙ্গারির স্বার্থ আছে। হাঙ্গারির সঙ্গে ট্রান্সিলভানিয়া প্রদেশটি নিয়ে রুমানিয়ার সঙ্গে গত কিছুদিন যাবৎ খুব গোলমাল চলছিল। রুমানিয়া এক সময়ে চটে গিয়ে স্থির করেছিল যে রাশিয়া যদি তাকে তার সীমান্ত রক্ষার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় তবে সে বেসারাবিয়া রাশিয়াকে ছেড়ে দেবে। দিলে তার বিশেষ কিছুই ক্ষতি নেই, কারণ বেসারাবিয়া বরাবরই রাশিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। কিন্তু রাশিয়া যদি বলকানে একবার ঢুকতে পায় তবে শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে

গড়াবে তার কিছুই স্থিরতা নেই। কাজেই ইটালি হাঙ্গারিকে পরামর্শ দিয়েছে রুমানিয়ার সঙ্গে ঝগড়া যে কোন রকমে হোক্ মিটমাট করে ফেলতে। এ পরামর্শে খুব কাজ হয়েছে, রুমানিয়ার রাজা কেবল খুশী হয়ে ঘোষণা করেছেন যে বেসারাবিয়া রাশিয়াকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। অধিকন্তু বলকান রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী যাতে দৃঢ়তর হয় তার জন্য উক্ত রাষ্ট্রগুলির নায়কদের এক বৈঠক হবে ফেব্রুয়ারী মাসে। ঠিক এই সময়ে হর হিটলার মুসোলিনীকে লিখে পাঠিয়েছেন যে রাশিয়া যদি বলকান অঞ্চলে ইটালি ও হাঙ্গারীর স্বার্থের কোন ক্ষতি করে তবে তিনি কখনই তা নীরবে সহ্য করবেন না। জার্ম্মানির এই চালের অর্থ হচ্ছে রাশিয়াকে বলকানে যেয়ে এখন একটা গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করতে প্রকারান্তরে নিরুৎসাহিত করা। কারণ, জার্ম্মানি রাশিয়ার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য কতটা আশা করেছিল এবং এখনও করে সেটা অনেকখানি আজো অনিশ্চিত। যেটা পাকাপাকিভাবে ঠিক ছিল সে হচ্ছে নানারকম জিনিষপত্রের যোগান, তার মধ্যে প্রধান তেল ও লোহা। খাদ্যবস্তু এবং ওই দুটা জিনিষ না হলে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। জার্ম্মানির এ সব জিনেষের সঞ্চয় অফুরন্ত নয়। অথচ মিত্রশক্তি সমুদ্রে ঘাঁটি আগলে বসে থাকার দরুন জার্ম্মানি বিদেশ থেকে যে পরিমাণ জিনিষ আমদানি করত ইতিমধ্যেই তার শতকরা ৪৫ ভাগ কমে গেছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই এমন অবস্থা আসার সম্ভাবনা যখন তাকে ওসবের জন্য রাশিয়ার ওপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে। কিন্তু সেই বিপুল জিনিষপত্র রাশিয়া থেকে জার্ম্মানিতে আমদানি করতে হলে রেল লাইন প্রভৃতি চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক করতে রাশিয়ার অনেক সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞদের মতে সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা করতে রাশিয়া খুব কমপক্ষেও অন্ততঃ ১৯৪১ সালের আগে পেরে উঠবে না। ইতিমধ্যে রাশিয়া নিজেই যদি দস্তুর মত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে এই সব কাজে সময় তার আরো বেশী লাগবে। ততদিনে জার্ম্মানির উপায় কি? তা ছাড়া যুদ্ধে নামলে তেলের প্রয়োজন রাশিয়ার নিজেরই অত্যন্ত বেড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও সে জার্ম্মানিকে তেল যোগাতে পারবে না। এ সঙ্কট ইতিমধ্যেই অনেকখানি ঘনিয়ে উঠেছে, রুমানিয়া থেকে লোভো (Lovow) হয়ে রেলপথে জার্ম্মানির জন্য যে তেল আসছিল তার অন্ততঃ দু-দুটো চালান রাশিয়া মাঝপথে নিয়ে নিয়েছে এবং ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে ব্যবহার করেছে। আরো মুস্কিল এই যে রুমানিয়া থেকেও তেলটা অন্ততঃ যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনাও ক্রমশঃ কমে আসছে। রুমানিয়ার তেলওয়ালা সম্প্রতি তাদের ব্যবসাকে বেশ সুশৃঙ্খল করে তোলবার সঙ্কল্প করেছে, এর জন্য তারা ইংলণ্ড থেকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চায়। রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট মিত্রশক্তিকে জানিয়েছে যে রুমানিয়া বরাবর জার্ম্মানিকে যে পরিমাণ তেল সরবরাহ করে এসেছে এখনও তার চেয়ে আর বাড়াবে না। —সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাশিয়াকে অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে বিপর্য্যস্ত হতে দেওয়াটা জার্ম্মানির স্বার্থের প্রতিকূল।

অবশ্য তার জন্য লড়াইটা ছড়িয়ে পড়িতে বিশেষ বাধা হবে না, যদি লড়ুইয়েরা ঠিক থাকে। আপাততঃ সে দিকে কোন ক্রুটি আছে বলে মনে হচ্ছে না। ইটালি যদিও নিরপেক্ষ, তার নিরপেক্ষতা ভাণ মাত্র। তার লক্ষ্য রয়েছে ভূমধ্যসাগরের দিকে, ওখানটায় সে পুরোপুরি কর্তৃত্ব চায়। যখন এবং যার সঙ্গে মিলে লড়াই করলে তার মতলব হাসিল হয় তা সে করবে। আপাততঃ সে শুধু বলকান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটা ভালরকম খাতির করবার চেষ্টায় আছে। ইংরাজ ও ফরাসী এ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। তারা তুর্কীর সঙ্গে একটা ত্রিশক্তি চুক্তি করে ফেলেছে। তুর্কী অবশ্য সোজা বলে দিয়েছে যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যাপারে সে নেই, অন্যসব ক্ষেত্রে সে মিত্র শক্তিকে সাহায্য করবে। অধিকন্তু প্যালেষ্টাইন, সিরীয়া ও ইজিপ্টের সমস্ত সৈন্যদলকে প্রস্তুত থাকবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তি এবং এই প্রস্তুতি ভূমধ্যসাগরের ওপর সম্ভাবিত কোন যুদ্ধকে লক্ষ্য করেই, এরকম আন্দাজ করবার কারণ আছে।

যুদ্ধ ব্যাপক না হওয়ার জন্য ইটালিকে পাহারা দিলেই যে গোল মিটছে তা নয়। রাশিয়ার ভাব গতিকও ভাল নয়। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ মিত্রশক্তিও চায় না। এখনই যদি রাশিয়া যুদ্ধে নেমে পড়ে তবে সেটা জার্ম্মানির অনুকূলেই যাবে। পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে লড়াই যে রাশিয়ার একটা সুযোগ এটা সে কোন দিনই ভোলে নি। বর্ত্তমানে তাই তার দক্ষিণদিকের প্রতিবেশীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ইরান এবং আফগানিস্থানের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি চায় যে ইরাক্, ইরান, তুর্কী ও আফগানিস্থান এই চতুঃশক্তির মধ্যে সাআদাবাদ বৈঠকের পর যে অনাক্রমণাত্মক চুক্তি হয়েছিল সেটাকে আর একটু বাড়িয়ে নিয়ে একটা সামরিক মৈত্রিতে পরিবর্ত্তিত করা হোক্, যার জোরে রাশিয়া আফগানিস্থান বা ইরান আক্রমণ করলে এই চতুঃশক্তি মিলে রাশিয়াকে রুখতে পারে। এ রকম প্রস্তাবে মিত্রশক্তির সহানুভূতি আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সম্ভবতঃ শেষপর্য্যন্ত তুর্কীকে নিয়ে গোল বাধতে পারে। সে রাশিয়াকে কোনদিনই ঘাটাতে চায় না। কাজেই এ রকম কোন চুক্তি কার্য্যতঃ হওয়া সম্ভব না হতে পারে।

মিত্রশক্তির, বিশেষতঃ ইংরাজের সমরসজ্জার গোড়ায় আর এক রকমের বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে। বৃটিশ উপনিবেশগুলি হতে এ যুদ্ধে কতটা সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল হার্টজগ ও ম্যালানের দলের লোকেরা বরাবরই এ যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলছেন বৃটেনের স্বার্থের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকা এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

জার্ম্মানির উপনিবেশ হস্তগত করার অভিসন্ধি সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলা হয়েছে। এখন তাঁরা যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলতে চান। সেখানকার পার্লামেণ্টএ হার্টজগের দল যদিও ৮১—৫৯ ভোটে হেরে গেছেন। ইহাতে বিরোধী দলের শক্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যানাডার অবস্থা আর একটু ঘোরালো। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকেনজী কিং চেয়েছিলেন ক্যানাডার সমস্ত সামরিক শক্তি বর্ত্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে নিয়োজিত করতে। কিন্তু দেশে এতে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে সুরু হয়েছে। একদল লোক—সংখ্যায় তারা কত তা এখনও জানতে পারার সময় হয়

নি—এ যুদ্ধ যে চায় না, এটা এখন আর গোপন নেই। তাদের মতটাও যে তুচ্ছ নয় তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ওখানকার বড়লাট লর্ড টুইড্‌সমুইর পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করেছেন। মার্চ্চ মাসের আগেই এ নির্ব্বাচন হয়ে যাবে, এই নির্ব্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে ক্যানাডা লড়াই করবে কি না। না করবার কারণও ওদের প্রচুর রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্যানাডার সন্ধি আছে, তার সূত্র অনুসারে ক্যানাডা কখনও আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে ক্যানাডা যোগ দেওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করে নি। এতে নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের একদল বলতে সুরু করেছে যে ক্যানাডার সঙ্গে সন্ধি আর রাখার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে ক্যানাডার সম্বন্ধ ইংলণ্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতর। ইংলণ্ডের ওপর প্রীতি দেখাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব যদি খোয়াতে হয় সেটা সুবিধার হবে না। যুদ্ধবিরোধী দলের যুক্তি হচ্ছে এই। কোন্ দল প্রবল হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মার্চ্চ মাসে বড় রকম যুদ্ধ সুরু হবে এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের এখানে ওখানে এই যে সমস্ত গোলমাল দেখা দিয়েছে এ গুলোকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না নিয়ে বৃটেনের উপায় নেই। কারণ উপনিবেশগুলার উপর তাকে এবারও বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হ'চ্ছে।

মহাত্মা গান্ধী। (ইংরাজী)। সর্ব্বপালি রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত।

শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার।

মহাত্মাজীর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যদেশের জ্ঞানী, গুণী, মনীষীরা তাঁকে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে স্বীকার ক'রে আর একবার তাঁদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাঠিয়েছেন। তাঁদের সেই সব লেখা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের দ্বারা এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের বিশেষত্ব এই যে তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তাঁরা অন্যের মতামতে প্রভাবিত হন কদাচিৎ। সুতরাং বর্ত্তমান পৃথিবীর এই সব সর্ব্বজন স্বীকৃত প্রতিভার দৃষ্টিতে মহাত্মাজী কি কি'রূপে প্রতিভাত হয়েছেন সেটি এই সঙ্কলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক সাধারণের ঔৎসুক্য অত্যন্তই কম। এবং তার কারণও আছে। গান্ধিজী ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এ দেশের রাজনৈতিক জীবনের এক চরম সঙ্কটের দিনে। ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্রে তখন তরঙ্গ দেখা দিয়েছে। তার গর্জ্জন তখনও অস্পষ্ট, কিন্তু নবলব্ধ আত্মশক্তির অসংশযিত চেতনায় গভীর। সেই জনসমুদ্র ভেদ ক'রে তার বিসর্পিল তরঙ্গশীর্ষে উঠে দাঁড়ালেন গান্ধিজী,—সেই বিপুল তরঙ্গগর্জ্জনের বাণীমূর্ত্তি।..তারপর প্রায় দুই যুগ কেটে গেছে। তাঁর নেতৃত্বের অধিকার এখনও অস্বীকৃত হয় নি, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের আজো অক্ষুণ্ণ আছে। তবু একথা মানতেই হবে যে ও দুইটিরই মূল্য বিচাব করেছি আমবা আমাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে। গান্ধিজীর নামকে কেন্দ্র ক'রে জনসাধারণের কল্পনায় যে একটি ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচিত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অতিবিক্ত কোন মূল্য তাব থাকতে পারে কিনা তা যাচাই করে দেখবার তাগিদ্ আমরা সচরাচর বোধ করি নে,এবং কখন কেউ করলেও তাকে অবাস্তব বলে চেপে দেওয়াটা আমরা অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছি। অবস্থার দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায যে এটা না হওযাই অস্বাভাবিক ছিল। সুতরাং এব বিরুদ্ধে কারো নালিশ থাকার কথা নয়। কিন্তু আরো একটা দিক্ আছে। ভারতবর্ষের বাইরেও বহুচিন্তাশীল মনীষী আছেন, ভাবতের স্বাধীনতা তাঁদের কাছে জীবন-মরণের সমস্যা নয়, যদিও তাঁদের অনেকেই ভারতেব হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বেব মূল্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপযোগিতার কষ্টিপাথবে ফেলে স্থির করা তাঁরা প্রযোজনীয বোধ করেন নি। দেশবিশেষের প্রযোজনে বাঁধা পড়ে না যাওয়ায় তাঁদের দৃষ্টি একটি সার্ব্বভৌমিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া পেয়ে গেছে। সে দৃষ্টির স্বচ্ছতায় আমরা সন্দেহ করতে পারি, এমনকি দৃষ্টি-কোণের নির্ব্বাচনটাই আমাদের কাছে আপত্তিজন মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁদের সত্যনিষ্ঠায সন্দেহ করাটা উচিত হবে না, এবং—তাঁদের মতকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেবার বাধ্যবাধকতা যখন নেই—এটাও স্বীকাব করা দোষেব কিছু নয যে তাঁদেব দৃষ্টিভঙ্গীও একটা ভঙ্গী, এবং চরম সত্য কি ও কোথায় তা নিশ্চয় ক'রে যখন বলতে পাবিনে, সেটা রোলাঁ (R Rolland) প্রমুখ ভাববাদীদের দৃষ্টি-সীমান্তে যে রূপ নেযনি এ কথাও তেমনি জোর করে ঘোষণা করাটা যুক্তিসহ না হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তাই, বিশ্বাস করি বা না করি, বিস্মিত নিশ্চয়ই হই যখন দেখি গান্ধিজীর সত্তব বছর' বয়সে যখন তাঁর জীবন অস্তপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং তিনি ভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর দীর্ঘ, দুরূহ তপশ্চর্য্যার ব্যর্থতার কথা বার বার স্মরণ করছেন তখনও খৃষ্টান ধর্ম্মগুরুরা এসে বলছেন,—খৃষ্ট ধর্ম্মেব সার কথা কি তুমি আমাদের শিখিয়ে দাও; ইউরোপ, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকেরা বলে পাঠাচ্ছেন—আমরা একেবাকে দেউলিযা হয়ে গেছি, তুমি আমাদের বাঁচবার মন্ত্র বলে দাও।.. গান্ধীজী মন্ত্র বলে দিচ্ছেন,—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ There is no limit to the possibilities of renunciation. আর মন্ত্র বলছেন,—God is mere love. Infinite love is infinite suffering......

বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নেই। দুহাজার বছর আগে যিশুখৃষ্ট ক্রুসে প্রাণ দিয়েছেন। এই দুহাজার বছরে মানুষ নিঃসংশয়ে জেনেছে যে ঐ সব প্রেমের কাহিনী নিতান্তই অবাস্তব। তবু সংশয়ীর শ্রদ্ধাহীন হাসির আঘাতে গান্ধিজী বিচলিত হচ্ছেন না। এবং আরো বিস্ময়ের কথা এই যে, যাঁরা শুনতে এসেছিলেন তাঁরা শুনে খুশী হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

গান্ধীবাদ সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসু মনোভাব ভাবতে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না—এ নিয়ে লেখকদের মধ্যে দুই একজন একটু আক্ষেপ করেছেন। আগেই বলেছি গান্ধীবাদের অন্য কোন দিক্ আমরা দেখতে পাইনি। পাশ্চাত্যের লোকে কেন এত উৎসুক হয়ে উঠেছে তারও কারণ আছে। তারা আজ ক্লান্ত। প্রেম এবং বৈরাগ্যের বাস্তববিমুখ আদর্শবাদের অত্যাচারে আমরা ক্লান্ত। ওদের ক্লান্তি এর ঠিক বিপরীত কারণে। সুতরাং অধ্যাত্মবাদে আমাদের শ্রদ্ধা যে পরিমাণে কমেছে, ওদের শ্রদ্ধা প্রায় সেই পরিমাণেই বাড়ছে। খুব ভাসা-ভাসা ভাবে দেখলে ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাশীলদের গান্ধীস্তুতির এইটিই কারণ বলে মনে হয়। কিন্তু এর চেয়ে গভীরতর কারণও আছে।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে পাশ্চাত্যের লোকে চিন্তা করে নি তা নয়। কিন্তু সেটা আয়ত্তগম্য করার পথ কিছুতেই সহজ হচ্ছে না। বিজ্ঞানের চেষ্টায় আজ ভোগ্য বস্তুর অভাব আর হওয়ার কথা নয়। উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন। ছোট-বড় নানা পরিধির মধ্যে নানারূপ বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তনও করে দেখা হয়েছে, অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায় নি। অবশেষে রাশিয়ার পরীক্ষা সুরু হয়েছে কঠোরতম নিয়মের অনুশাসনে বেঁধে মানুষকে পূর্ণতম নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না। সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই মানুষ অবিরাম নিয়মের দাসত্ব করে আসছে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ মানুষ মাঝে মাঝে পেয়েছে—কল্পনায়। বিমুখ বাস্তবের কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন বার বার টুটে গেছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাধনা ও তার বহুল সিদ্ধির ফলে মানুষের আশা ক'রবার, কল্পনা ক'রবার সাহস বেড়ে গেছে দুর্দ্ধর্ষ রকম। সর্ব্ববিধ শাসনমুক্ত মানুষের নৈরাজ্যের পথে বিচরণ আজ দিবাস্বপ্ন নয়, সে চিত্র ইতিমধ্যেই অনেক পরিমাণে দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়ে এসেছে। কিন্তু মনোজগতে মানুষ এরই মধ্যে যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে তার একটা নিজস্ব ঔদ্ধত্যও আছে। শুধু বাইরের বিধিব্যবস্থার জোরে মানুষের মনকে ইচ্ছামত চালান যাবে—একথা বিশ্বাস করতে ভাববাদীদের মনে যেন বাধছে।—অর্থাৎ নৈরাজ্য চাই, কিন্তু সেটা বল্‌শেভিক পদ্ধতিতে হবে না।

এ যুগের বহু কবি ও দার্শনিকরা এইখানে গান্ধীবাদের ওপর বিশ্বাস ক'রে যেন বেঁচে যেতে চান। দার্শনিক দিক্ থেকে গান্ধিজীর আদর্শও নৈরাজ্যের আদর্শ। তবে সেটা আধ্যাত্মিক, Spiritual anarchism. "অহিংসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধি। মানব জাতির আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্ভব হতে পারে শুধু অহিংসার পথে।" এই আধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্রেই নৈরাজ্য। তবে সেখানে পৌঁছতে হবে আত্মিক শক্তির দ্বারা। "Hold thou thy cross and follow me"...

যখন বাস্তববাদী আদর্শ পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে সেই সময় বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ওপর মনের এতখানি প্রভুত্বের সম্ভাবনার কথা অধ্যাত্মবাদীদের সহজেই খুব প্রীতিকর হয়েছে। এই দার্শনিক মতবাদ আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে কি না সে তত্ত্ব আপাততঃ আলোচ্য নয়। আজকার দিনের চিন্তানায়কদের মনে এই মতবাদ যে প্রভাব বিস্তার করেছে তারই কথা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পাওয়া গেল।

ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়া

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধের সত্য সংবাদ পাওয়া এক মুস্কিলের ব্যাপার। যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সংবাদগুলি ভারতে আসে তা যেমন অনেক সময় পরস্পরবিরোধী তেমনি রহস্যপূর্ণ। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য দ্বারা বিশ্বের জনমতকে গ'ড়ে তোলাও সংগ্রামের এক প্রধান অঙ্গ। এই পরস্পর বিরোধী সংবাদগুলির উদ্দেশ্যও তাই।

কখনো শুনি রাশিয়া এমন দারুণভাবে ফিনল্যাণ্ডে পরাজিত হচ্ছে যেন লজ্জায় অধোবদন হয়ে ঘরে ফিরতে তার আর বড় বেশী বিলম্ব নেই। আবার দেখি অত্যাচারী রাশিয়া বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে, বুঝি ফিনল্যাণ্ড গেলো শেষ হ'য়ে।

হঠাৎ দেখি স্ট্যালিন ফিনল্যাণ্ডের গণ-গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী মঃ কুইসিনেনের কাছে বাণী পাঠিয়েছেন, "ফিনিশ জনসাধারণের পীড়কগণের বিরুদ্ধে—ম্যানরহাইম ট্যানার দলের বিরুদ্ধে ফিনিশ জনসাধারণ ও গণ-গভর্ণমেণ্ট অচিরে সম্পূর্ণ জয়লাভ করুক ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। এই ক্ষুদ্রবাণীটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্ব্বেই শুনেছিলাম ফিনল্যাণ্ডে দুটী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে তবে কি ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ এই দুটী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ? পরে রয়টারের সংবাদগুলি এমন সঙ্কুচিত ও ঘোরালো এবং রঙ মাখানো যে সত্যমিথ্যার জালে আচ্ছন্ন হয়ে আসার দরুণ কিছুই আর পরিষ্কার ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধারম্ভে প্রথমেই দেখি সংবাদগুলি সামঞ্জস্যবিহীন। শোনাগেল, রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে ফিনল্যাণ্ডে চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছে। অথচ সোভিয়েট যে দাবী ফিনল্যাণ্ডের নিকট পাঠিয়েছিল তা যখন দেখি তখন কোথাও তো সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ পাই না। প্রথমে রাশিয়া অন্যান্য বলটিক রাজ্যগুলির সঙ্গে যেরূপ পারস্পরিক চুক্তি করেছে সেরকম চুক্তির প্রস্তাব ফিনল্যাণ্ডে পাঠায়। ফিনল্যাণ্ড তাতে আপত্তি জানায়। তখন পুনরায় রাশিয়া তার আপন নিরাপত্তার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের দাবী জানিয়ে চুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করল। এই প্রস্তাবে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে উত্তরদিকে প্রবেশপথের কোনো স্থলে নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য রাশিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইজারা নিতে চেয়েছিল। তার বিনিময়ে সে উপযুক্ত অর্থ এবং আপন রাজ্যাংশও ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। এই প্রস্তাবের মূলে ছিল রাশিয়ার আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। ঐ সীমানা রক্ষা না করতে পারলে রাশিয়াকে আক্রমণ ক'রে তাকে ঘায়েল করবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ও সহজ পন্থা শত্রুপক্ষ পাবে। এই ভাবে আক্রান্ত হবার যে দুর্ব্বল স্থান ও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তার থেকে নিজেকে রক্ষা করবার

নিরাপত্তা বজায় রাখবার অধিকার সকলেরই আছে। রাশিযাও শুধু এই উদ্দেশ্যেই চুক্তির প্রস্তাবনা করেছিল—ফিনল্যাণ্ডকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ কবা বা আপন শাসনাধীনে শৃঙ্খলিত কববার উদ্দেশ্যে সে চুক্তি করতে চায় নি। এই সম্মত না হওযাব কারণ হচ্ছে ফিনল্যাণ্ডে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ ও প্ররোচনা। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অনেকেবই এখানে স্বার্থ বয়েছে। তাছাডা রাশিযাব নিবাপত্তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি কাবোই কাম্য নয। তাই বিদেশী স্বার্থেব প্ররোচনা চলতে লাগলো ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবাব জন্য উত্তেজিত কবতে। ফিনল্যাণ্ডেব দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যুদ্ধে সে একা থাকবে না। সে যুদ্ধে নামলে অন্যান্য শক্তিব সাহায্য পাবে।—এমন কি লণ্ডনের "ইকনমিষ্ট" সংবাদ পত্র ৪ঠা নভেম্বব তারিখে ঘোষণা কবল "ফিনল্যাণ্ড যদি রাশিযার সঙ্গে অন্যান্য বলটিক রাজ্যেব মত পাবস্পবিক চুক্তি কবে তবে তাব নিরপেক্ষতা বিপন্ন হ'তে পাবে।" এইভাবে উদ্বুদ্ধ হ'যে ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। এখানে আত্মবক্ষা ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণেব স্পৃহা বাশিযার চুক্তিব প্রস্তাবনায কোথাও তো দেখা যায না—বরং চুক্তি করতে অসম্মত হয়ে যুদ্ধে নামার মূলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশেষে সংবাদ এলো ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সোজাসুজি ফিনল্যাণ্ডকে অস্ত্র ও সমব সম্ভাব দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য কব'ব। কাবণ দেখানো হয়েছে—দুর্ব্বলজাতিব উপর নিপীডনেব প্রতিরোধ কল্পে তাবা সাহায্য কবছে। এই প্রতিবোধস্পৃহা তো দেখা যায নি যখন প্রবল ও অত্যাচাবী ইটালিযান ফ্যাসিষ্টশক্তি আবিসিনিযা ও স্পেনে বর্ব্বব আক্রমণ চালিয়েছিল, সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপান যখন নিবীহ চাযনাব উপব নির্ম্মম অভিযান চালিয়েছে, যখন চেকোশ্লোভাকিযা জার্ম্মানীব যূপকাষ্ঠে বলি গেল? তখন কোথায ছিল দুর্ব্বলেব প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা, অন্যায অত্যাচাবেব প্রতিবোধ স্পৃহা?

আজ যেখানে আত্মবক্ষাব জন্য পারস্পবিক চুক্তিব আয়োজন চলছিল যে সামবিক চুক্তি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ন্যাযসঙ্গতভাবে চলে এসেছে পবস্পবকে শক্তিশালী ও দৃঢ় কববার জন্য—সে চুক্তিতে নিজেদেব স্বার্থহানি ঘটবাব আশঙ্কায আতঙ্কিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সাম্যবাদী-শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী বলে প্রচার ক'বে হীন প্রতিপন্ন কববার চেষ্টা কবছে।

বোম্বাইয়ে লর্ড লিনলিথগোর বক্তৃতা

বড়লাট বোম্বাইযে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে ভাবতেব বাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে পুনরায আলোচনা করেছেন। সেই শিবের গীতি, সেই বঙ ফলিযে ফাঁকা আওযাজ। এতে কংগ্রেসের প্রশ্নেব উত্তরে দুই একটা আবেদনেব সঙ্গে বড বড কথাব মাবপ্যাঁচ আছে—কিন্তু বিশেষ অনুধাবন ক'রেও নতুন কিছুই পাওযা যায না। গান্ধীজী প্রশ্ন কবেছিলেন ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টাব আইন অনুসারে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস অবিলম্বে ভারতে প্রবর্ত্তন কবা হবে কিনা। বহু দিন ধ'বে বহু কথা কপ্‌চিয়ে আজ জানা গেলো, তাই বৃটিশ নীতির লক্ষ্য। কিন্তু সঙ্গে প্যাঁচ কষা আছে উত্তমরূপে,

সেখানে ফাঁক নেই একতিলও। যে দুটি দুস্তর সাগর ভারতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় সে দুটী পার হতে পারলে তবে তো মিলবে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্। একটী মাইনরিটি সমস্যা, অপরটি ঐক্যবদ্ধ দাবী। তিনি বলেছেন, প্রধান দুটী মাইনরিটি সম্প্রদায়ের প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব রয়েছে। একটি মুসলমান, অপরটি তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়। এই মাইনরিটি সমস্যা ভারতের ঘরোয়া সমস্যা এবং দুনিয়ার সবদেশেই এ সমস্যা বর্ত্তমান, তার জন্য রাজনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ থাকে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে বঞ্চিত থাকে এমন অদ্ভুত বার্ত্তা ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও শোনা যায় না। তা ভিন্ন এই মাইনরিটি সমস্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। গান্ধীজি বলেছেন, ভারতে বৃটিশ বাসস্থ থাকতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটতে পারে না। এমন কি সেদিনও বড়লাট আলোচনা করবার জন্য সকল দল, উপদল, নেতা, উপনেতা, সম্প্রদায়, ব্যাক্তিবিশেষ সকলের সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করলেন যে, মনে হয়েছিল এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে কংগ্রেস সকল দলের প্রতিনিধি প্রতিপন্ন না হয়ে যেন শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মুসলিমলীগ মুসলমানদের। এই ভাবে বহু দিন পূর্ব্ব থেকেই, সেই মর্লিমিণ্টো শাসনের সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে এই সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ মাইনরিটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কংগ্রেসের দাবী ছিল অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র ব'লে ঘোষণা করতে হবে। উত্তরে বড়লাট সাহেব শুধু পূর্ব্ব কথার পুনরুল্লেখ ক'রে বলেছেন, যুদ্ধাবসানের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের দাবী ছিল ভারতের মুখপাত্রস্বরূপ কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা করতে হবে। উত্তরে লর্ড লিনলিথ্‌গো জানিয়েছেন, মাইনরিটির অনুমতি সহ দাবী না গঠিত হলে চলবে না। এইভাবে মাইনরিটির সমস্যা কোনো দিনও শেষ হতে পারে না।

এতগুলি মামুলীগীতির একঘেয়ে সুরের পরে অবশেষে তিনি মধুর ভাষায় জানিয়েছেন যে, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রবর্ত্তনের সময়ের ব্যবধানটা যথা সম্ভব কম করতে তিনি ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খুবই চেষ্টা করবেন। তার প্রমাণ স্বরূপ কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতীয় নেতাদের তাতে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। কংগ্রেস চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। কোন্ অনির্দ্দিষ্ট-কালে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস আসবে সেই প্রত্যাশায় কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে সে আশা অমূলক। জওহরলালজী বলেছেন "যতক্ষণ ভারতের স্বাধীনতা সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হবে ততক্ষণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষের অথবা কংগ্রেসীদল মন্ত্রিত্বে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।" পণ্ডিতজী আরও বলেছেন, ভালো হোক মন্দ হোক ভারত তার নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করবে এবং তা ভারতের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা গঠিত গণপরিষদের সাহায্যেই সম্ভব। শুধু পণ্ডিত জওহরলাল নন, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলও এই ধরণের কথাই বলেছেন। গুজরাটে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের যে দাবী উল্লেখ করা হয়েছে যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তা পূর্ণ না করেন এবং যদি সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয়

আয়োজন ও আবহাওয়া বর্ত্তমান থাকে তবে কংগ্রেস নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধের পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করবে না এবং সেই সংগ্রামের জন্য সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করবে। অতএব বড়লাট যে আশা করেছেন যে, শীঘ্রই এই অচল অবস্থার অবসান হয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী পুনরায় স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হবেন সে আশা সফল হবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হ'ল বৃটিশের সাম্রাজ্যনীতি। এর পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রীদের গদিতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা সুদূর।

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্পবাক্য

২২ শে ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একটী প্রস্তাব ও আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য নতুন একটী সঙ্কল্পবাক্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবটী ভারতের সাম্প্রদায়িক অবস্থাকে পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে যে, বৈদেশিক শাসন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে বাধ্য। কংগ্রেস আপন জাতীয়তার আদর্শ পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছে। এবং ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস যে, বৈদেশিক শাসন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হলেই এই মৈত্রী স্থায়ী হওয়া সম্ভব। ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে অনিচ্ছা হেতুই যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বাজে অজুহাত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তুলেছে একথাও ওয়ার্কিং কমিটি জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য নতুন একটী সঙ্কল্পবাক্যও রচনা করা হয়েছে—তার প্রথম দিকটা স্পষ্ট ও দৃঢ়। অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতেরও স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ অধিকার আছে। বলা হয়েছে "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর স্বাধীনতা লোপ করেই শুধু ক্ষান্ত হ'ন নাই, শোষণ নীতিকে ভিত্তি ক'রে তাঁরা ভারতের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতকে বৃটিশ সংস্রব ছিন্ন ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।" এই ছোট্ট সঙ্কল্প বাক্যটীর মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা ভারতবাসীর অন্তরের কথা এবং ঐকান্তিক কামনা।

কিন্তু সঙ্কল্পবাক্যটীর শেষদিকে যে চরকা ও খাদি অংশটী গঠনমূলক কাজের জন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা আমরা সমর্থন করি না। চরকা ও খাদির যে গুণ ও প্রয়োজনীয়তাই থাক, রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা আমরা বুঝি না। এই দুটী সামাজিক সংগঠনমূলক কাজ হ'তে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা সঙ্কল্পে অহেতুক ও অনাবশ্যকভাবে এই দুটী জিনিষ প্রবেশ করিয়ে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বাধীনতা সকল কংগ্রেসসেবীই চায় এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করবার অধিকার প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসসেবীরই আছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই দুটি অরাজনৈতিক বিষয় অকারণে টেনে এনে সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। কারণ, চরকা ও খদ্দরের উপর যাঁদের আস্থা নেই তাঁরা কপট না হয়ে এই সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করতে পারেন না। স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য এমন হওয়া উচিত যাতে সমস্ত

স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসসেবী অকপটে দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে পারে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে এই নতুন সঙ্কল্পবাক্যে চরকা ও খদ্দরের অংশটুকু অবাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয় কংগ্রেস নির্ব্বাচনী কমিটি নিয়োগ

কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা দেখেছিলাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলভুক্ত লোক নিয়ে যে প্রাদেশিক ইলেকসন ট্রাইবুনাল গঠন করেছিলেন তা ওয়ার্কিং কমিটি অবৈধভাবে গঠিত বলে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এবং বি, পি, সি, সি কে বৈধ ও ন্যায় সঙ্গত ভাবে নতুন একটি ইলেকসন ট্রাইবুনাল গঠন করতে বলা সত্ত্বেও তাঁরা অযথা বিলম্ব করছিলেন। ইলেকসন ট্রাইবুনাল গঠন করবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ পার হয়ে গেল এবং ট্রাইবুনালের অভাবে কংগ্রেসের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তখন ওয়ার্কিং কমিটি বাধ্য হয়ে নিজেই একটী নতুন ইলেকসন ট্রাইবুনাল গঠন ক'রে দিলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ঠিকমত ট্রাইবুনাল গঠন করতে না পারলে ওয়ার্কিং কমিটির সেটা গঠন ক'রে দেবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে। কিন্তু দেখা গেল অবৈধভাবে গঠিত ট্রাইবুনাল বাতিল ক'রে দেওয়াতে আহত বি, পি, সি, সি এই নতুন ট্রাইবুনালকে সুনজরে দেখলেন না। এমন কি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি এই ট্রাইবুনালের প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ওয়ার্কিং কমিটিকে অমান্য করলেন। তারপর থেকে ইলেকসন ট্রাইবুনালের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতাও করেন নাই, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও দাখিল করেন নাই। রাজসাহী কংগ্রেস কমিটির বিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বি, পি, সি, সির এই অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে ট্রাইবুনাল বিচার বিবেচনা ক'রে একরকমের রায় দিলেন, আর বি, পি, সি, সির সেক্রেটারী তার বিরুদ্ধে দিলেন অন্যরকমের রায়,—যদিও কংগ্রেসের আইন কানুন অনুসারে তাঁর সে অধিকার ছিল না। বি, পি, সি, সি এ ভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করাতে ট্রাইবুনালের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হওয়ায় সদস্যগণ পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। ফলে ওয়ার্কিং কমিটি ট্রাইবুনালের সঙ্গে সহযোগিতা এবং নির্দ্দেশাদি দেওয়ার অধিকার ও ক্ষমতা দিয়ে একটী বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন, তার নাম এড হক্ কমিটি, বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্ব্বাচন কমিটি। এই কমিটির উপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয় নাই, এই কমিটি কেবলমাত্র ইলেকসনসংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দ্দেশ দেবার এবং ইলেকসন ট্রাইবুনালকে সাহায্য করবার ক্ষমতা পেয়েছেন। কিন্তু তার পরে দেখি বি, পি সি, সি তে এই এড্ হক্ কমিটির প্রতি অনাস্থাপ্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে জেলা কংগ্রেস ও অন্যান্য কংগ্রেসকমিটীগুলিকে সহযোগিতা না করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন বৎসরের ইলেকসন তাহলে কেমন করে করা হবে তার কোনো নির্দ্দেশও বি, পি, সি, সি দেন নাই। বরং তারা এই বলেছেন যে আগামী বৎসরের জন্য নতুন ইলেকসনের প্রয়োজন নাই, পুরাতন সদস্যগণই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন এবং কাজ করে যাবেন। এই নির্দ্দেশের দুটী অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ

মনে হয় নতুন ইলেকসনে পুরাতন সদস্যদের পরাজিত হবার আশঙ্কা আছে, তাই অন্যায় ভাবে নতুন ইলেকসন এড়াতে চান। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে ওযার্কিং কমিটি সমগ্র ভারতে যে নতুন নির্ব্বাচনেব আদেশ দিয়েছেন তাকে অমান্য করতে প্রবৃত্ত হযেছেন। এই অমান্য কবার অর্থ এই হয় যে, যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ অমান্য ক'বে নির্ব্বাচনে যোগ দিবেন না তাঁরা আপনা আপনি নিখিল ভারত কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হ'যে একটী নতুন স্বতন্ত্র কংগ্রেসে পরিণত হবেন—এবং আরেকটী বঙ্গীয় কংগ্রেস গঠিত হবে তাঁদের নিয়ে যাঁবা ওযার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ পালন ক'রে নির্ব্বাচিত হবেন এবং নিখিল ভাবত কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রাখবেন। এইভাবে ওযার্কিং কমিটিকে অমান্য ক'রে বাঙলার কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত করতে যে অন্যায প্রবোচনা বর্ত্তমান বি, পি, সি, সি দিচ্ছেন তা অদূরদর্শিতাব পরিচাযক। বর্ত্তমানে সমগ্র ভাবতব্যাপী যে দুর্দ্দিন, যে সঙ্কট উপস্থিত হযেছে তাতে প্রযোজন সমস্ত ভাবতের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় শক্তি ও সঙ্কল্প। কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার প্রভাব, ক্ষমতা ও সংঘশক্তি সর্ব্ব ভারতে প্রসারিত ও পবিব্যাপ্ত এবং কংগ্রেসই শুধু সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে মত ব্যক্ত করতে ও দেশব্যাপী আন্দোলন পবিচালনা করতে সক্ষম। কোনো একটী মাত্র প্রদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মত পাগলামী আব নেই। এই সঙ্কটকালে জাতীয় সংগ্রামেব মুখে বাঙলা দেশ যদি দ্বিধা বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হযে ভিন্ন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করে তাতে একা একা নিজে সে কৃতকার্য্য তো হবেই না ববং সমগ্র ভাবতেব পক্ষে ডেকে আনবে সে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয। বাঙলা দেশ কি শুধু বাঙলার স্বাধীনতা ও সংগ্রাম চায অথবা অখণ্ড ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা দেশও শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকেব ন্যায এক হ'যে দাঁড়িযে শক্তি ও প্রাণ দিযে আপন অংশ গ্রহণ কববে এবং দাযিত্ব পালন ক'বে যাবে? আমাদর লক্ষ্য সমগ্র ভাবতের পূর্ণ স্বাধীনতা। বিচ্ছিন্ন হ'যে প্রাদেশিক সংগ্রাম, সঙ্কীর্ণ খণ্ড সংগ্রাম এনে দেবে যে ভাঙ্গন, যে বিপর্য্যয, তাতে সমগ্র ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্ব্বল ও পর্য্যুদস্ত ক'রে দেবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হিসাব রক্ষা

বাঙলা কংগ্রেসেব তহবিল সম্বন্ধে চারিদিক থেকে কতকগুলি নালিশ পেযে বি, পি, সি, সিব হিসাব পত্র দেখবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বাটলিবয এণ্ড কোম্পানীকে অডিটর নিযুক্ত করেন। এই অডিটরগণ হিসাবপত্রের যেরূপ অবস্থা দেখেছেন তাব একটী বিপোর্ট দিয়েছেন। এই বিপোর্টের পরে ওয়ার্কিং কমিটি বাঙলাব হিসাব সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গ্রহণ কবেছেন।

এই প্রস্তাবে বলা হযেছে যে, বাঙলা কংগ্রেসের হিসাবপত্রেব অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ও আপত্তিকর। হিসাবের জন্য প্রযোজনীয কাগজপত্র ও ভাউচার নিযমিত রক্ষা করা হয নাই, ব্যাঙ্ক একাউণ্টও রাখা হয নাই। এবং যেভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেসের হিসাব আছে দেখা গেছে তাতে অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয় পাওযা যায। এতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নিয়মাবলীকে ভঙ্গ ক'রে গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করেছেন।

১৯৩৮ সনের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৩৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত হিসাবের কাগজপত্র অসম্পূর্ণ। ৯ই ডিসেম্বর অডিটারদের কাছে যে হিসাব ও ক্যাশবই দেওয়া হয় তাতে ১৯৩৯ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের হিসাব লেখা ছিল। ঐ হিসাবে দেখা যায় ১৭৭১৮৷৷১ পাই উদ্বৃত্ত রয়েছে—সম্পাদকের স্বাক্ষরও এখানে আছে। কিন্তু নভেম্বর মাসের ও ডিসেম্বরের হিসাব দাখিলের দিন পর্য্যন্ত কোনো হিসাব লেখা ছিল না। এ সময়ের কোন ক্যাশবই ও অডিটারদের নিকট দেওয়া হয় নাই। তারপর ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারী মহাশয় অডিটারদের অফিসে গিয়ে বলেন যে দুই দফায় মোট ৮৮০৲ টাকা অসতর্কতার জন্য ক্যাশবুকে লেখা হয় নাই এবং অডিটারদের নিকট হিসাব দিবার তাড়াহুড়াতে ঐ টাকা জমা দিতে ভুল হয়ে গেছে।

বি, পি, সি, সির পক্ষ থেকে যে হিসাবপত্র দাখিল করা হয় তাতে দেখা যায় যে ১৮৫৯৮৷৷৫ উদ্বৃত্ত তহবিল আছে। কিন্তু বি, পি, সি, সির নামে ঐ টাকা কোনো ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয় নাই অথবা অডিটারদের নিকট নগদভাবে বা অন্যপ্রকারে ঐ টাকা উপস্থিত করা হয় নাই। তখন সেক্রেটারী উদ্বৃত্ত তহবিলের নিম্নলিখিত একটী সার্টিফিকেট অডিটারদের দেন—

"আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার করছি যে, ১৯৩৯ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কার্য্যশেষে বি, পি, সি, সির তহবিলে ১৮৫৯৮৷৷৫ পাই উদ্বৃত্ত হয় এবং ঐ টাকা ঐ তারিখে আমার নিকট মজুত থাকে।"

১৯৩৯ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বি, পি, সি, সির কোনোও ব্যাঙ্কে হিসাব ছিল না।

১৯৩৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর শেষ উদ্বৃত্ত ছিল ১২৩৮৯৷৷/০

বি, পি, সি, সি নিয়মাবলীতে আছে যে তহবিল কোষাধ্যক্ষের নিকট থাকিবে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সব টাকা তাঁর মারফতে ব্যাঙ্কে জমা হবে এবং চলতি খরচের জন্য সেক্রেটারী হাতে একশত টাকা পর্য্যন্ত মাত্র রাখতে পারবেন।

কিন্তু যে ভাবে তাঁরা এই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজের নামে কংগ্রেসের টাকা জমা রেখেছেন তা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। জনসাধারণের টাকা বঙ্গীয় কংগ্রেস এরূপ আইন বিরুদ্ধ ভাবে হিসাব রক্ষার জন্য নিন্দার্হ হয়েছেন ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ আর না ঘটে সেজন্য ওয়ার্কিং কমিটি সতর্ক করে দিয়েছেন এবং নিয়মাবলী অনুযায়ী কাজ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

———

৩২নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

= সূচী =

ঢেউ তোলা টিন (করগেট) দ্বারা

গৃহ নির্ম্মাণ করুন

নিবাপত্তা ও পিঞ্জবেব মত দৃঢ়তা লাভ কবিবাব জন্য ঢেউ টিন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইস্পাতেব শক্তি সঞ্চয় কবিযা পবিকল্পিত হইযাছে। ঢেউ টিন আপনাকে ছাদ ধসিযা পড়া, আগুন ও বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবে।

টাটা

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

THE LARGEST INDIVIDUAL EMPLOYERS OF LABOUR IN THIS COUNTRY

3

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষাণ্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
,, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
,, সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
,, ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

প্রিয়জনকে উপহাব দিতে জহরতের ও গিনি সোনাব অলঙ্কারই শ্রেষ্ঠ। ফ্যাসানের
আধুনিকতায় নিত্য নূতন ডিজাইন না হইলে কাহারও মনোমত হয় না
অথচ স্থায়িত্বের দিকেও নজর রাখিতে হইলে
—একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান—
হেড্ অফিস—Cal. 594.
ব্রাঞ্চ—South 1361
(স্থাপিত ১৮৮২)
বিনোদবিহারী দত্ত
ডায়মণ্ড মার্চ্চেন্ট এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার
হেড্ অফিস :—১এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট।
দক্ষিণ কলিকাতাবাসীর জন্য
নূতন ব্রাঞ্চ :—৮৪ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর।
ইহা ব্যতীত অন্যত্র ব্রাঞ্চ নাই।

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে

প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা বাৎসরিক বোনাস্	আজীবন বীমায়	১৬৲
	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ | ১১শ সংখ্যা

সমর শঙ্কা

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল।

নাগরিক আতঙ্কিত সমরের দ্রুত আয়োজনে,
ঊর্ধ্বচারী বিমানের শূন্য পথে ত্রস্ত আনাগোনা,
বার্তালোভী জনতার লুব্ধ আঁখি 'দৈনিকের' পাতে,
মুহুর্মুহুঃ 'হকারের' উত্তেজিত কণ্ঠ যায় শোনা।

নিত্যনব ইস্তাহারে 'কাগজের' স্তম্ভ কলুষিত,
উচ্চকিত জনমনে প্রত্যাসন্ন মরণের ভীতি,
বাষ্প, বিষ, হত্যা, মৃত্যু মানুষের মুখে মুখে ফিরে,
শাসিতের তুষ্টি লাগি শাসকের ছদ্মবেশী প্রীতি।

স্বার্থকামী পণ্যজীবী সুযোগের প্রতীক্ষা-কাতর,
যুদ্ধের দোহাই তোলে অগ্নিমূল্যে করে বেচাকেনা।
মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা আতঙ্কিত বণিকের লোভে,
দীর্ঘস্থায়ী এ সংগ্রামে জানে ধ্রুব তারা বাঁচিবেনা।

———

মেয়েদের কথা

শ্রীমতী রেণুকা মণ্ডল

বহু পুরাতন ইতিহাস ও ভূগোল খুঁজলে দেখা যায় যে, বহু আবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে এখনকার অবস্থায় পৌছেছে তাব এক অভিনব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। মানুষ একদিন কোন এক ওপরওয়ালার তৈযারী পদার্থ যে নয় ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয়। ৩।৪০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক প্রকাব জীব ছিল মাত্র, মানুষ বলে তখন কিছুই ছিল না। এই সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে সেই জীবেব বহু প্রকাব রূপান্তর দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেই কোন এক স্তরে মানুষের উৎপত্তি, আব জীব জগতের প্রথম হতেই স্ত্রী-পুরুষ দুইটী শ্রেণী ছিল, সুতবাং মানুষের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হ'যছে। জীব যখন বন্য বানর ইত্যাদি শ্রেণীতে ছিল তখনও তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের জীবন যাত্রাব পথে ভেদ ছিল না, পরে যখন অসভ্য মানুষের স্তরে সেই জীব এল, তখনও স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকাব পেত আব সমান ভাবেই থাকত। মানুষেব ক্রমবিকাশের পথে বহু স্তর দেখা গেল কিন্তু স্ত্রীদের পরাধীনতা ও বশ্যতার দিন আরম্ভ হল Iron Ageএ বা লৌহযুগে, যখন পুরুষ মেযেদেব শারীরিক দুর্ব্বলতাব সুযোগ নিল। আমাদের মনে হয, সেই লৌহযুগই মেযেদের কতক পরিমাণে পুরুষেব অধীনে রাখতে চেষ্টা কবে, কিন্তু মধ্যযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রী জাতি একেবারে বশ্যতা স্বীকার কবে নি মধ্যযুগ হতেই স্ত্রী জাতি সখেব জিনিষ হযে দাঁড়াল। এই যুগে স্ত্রী জাতি পুরুষের ক্রীতদাসেব ন্যায ছিল। যন্ত্রযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রী জাতি অশেষ দুঃখ-কষ্ট নির্য্যাতন সহ্য করে এসেছে, কিন্তু যন্ত্রযুগ জগতে এক বিপ্লব এনেছে—সে বিপ্লবে পৃথিবীর পুরাতন প্রথা ধ্বংস হযে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেযেবাও আশার আলোক দেখতে পেল। সংক্ষেপে বলতে গেলে যন্ত্র মানুষকে দেখালো যে, সমাজেব প্রত্যেকেরই উপকারিতা আছে, আর প্রত্যেককেই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়—যাহা অসম্ভব ছিল মধ্যযুগে বা তার পূর্ব্বে, যন্ত্রযুগ মানুষকে সেই নূতন সভ্যতার স্তরে টেনে আনলে। কিন্তু দুঃখেব বিষয় সেই যন্ত্রেব উপকারিতা ইউরোপের মধ্যেই কিছু দিনের জন্য সীমাবদ্ধ রইল, ইউবোপের মেয়েরাই কতক পরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেল। এখন দেখা যায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই যন্ত্রশিল্প ও সভ্যতা এসে পড়েছে, তা হলেও স্ত্রীজাতি এখনও পরাধীন ও অত্যাচারিত ও কতক পরিমাণে বিলাসের জিনিষ হযে দাঁড়িয়েছে—ইহার মূল অবশ্য বৈষম্য-মূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও শোষণকারী দেশের স্বার্থ। আর এক গভীর কারণ আছে, সেইটা এই—মানুষ যখন প্রথম ঈশ্বর ও ধর্ম্ম তৈয়ারী করে তখন হতেই মেয়েদের কতক পরিমাণে ধার্ম্মিক করবার চেষ্টা পুরুষের তরফ থেকে হচ্ছিল ও মধ্যযুগে মেয়েরা যখন অকর্ম্মণ্য হয়ে গৃহের জিনিষ হয়ে দাঁড়াল তখন তাহারা

ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে বেশী করে ভক্তি করতে আরম্ভ করল। সেই জন্যই মেয়েরা মিথ্যা ধার্ম্মিক ভা· এখনও কাটাতে পারছে না, যে যত ধার্ম্মিক হবে তাহার মনও তত পরাধীন ও দাস ভাবাপন্ন হবে—ইহাই সত্যদ্রষ্টা মনীষীদিগের শিক্ষা। তবে বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারে দিকে দিকে স্ত্রীজাতি নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে ও প্রত্যেক জায়গাতেই পুরুষের সমান সুযোগ পাওয়ার দাবী জানাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি হতে বাধ্য, কারণ বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অসারতাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার ক'রে সত্য ঘটনা দেখায়। বিশ্বের শোষিত ও পরাধীন জাতির স্বাধীনতার স্পৃহার সহিত স্ত্রীজাতির আন্দোলন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গত মহাযুদ্ধের পর রুশবিপ্লবের সময় দেখা গিয়েছে যে সেখানকার স্ত্রীজাতি কিরকম ভাবে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, তারা তখন আশার বাণী শুনেছিল লেলিনের এই কথায় "নারীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন রুশগণতন্ত্র গঠন করা অসম্ভব।" আজ রুশিয়ার প্রত্যেক নারী স্বাধীন—প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কা নারী আত্মনির্ভরশীল। প্রত্যেক নারী পুরুষের সমান সুযোগ পায়, সুতরাং রুশ স্বাধীনতা এক নবযুগের সূচনা করল ও বিশেষ করে দুনিয়ার নারীদের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ হয়ে দাঁড়াল।

আমরা এর আগে দেখেছি যে কেমন ক'রে শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে ও পৃথিবীতে নারীজাগরণে অশেষ সাহায্য করেছিল। নারীরা যে কেবল ভোগের সামগ্রী নয় সে ধারণা রেনেস্যাঁসের (Renaissance) সময় হতেই দানা বেঁধেছিল। কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে রুশিয়া ছাড়া সকল দেশেই এমন কি আমেরিকাতেও নারীরা একটা নির্দ্ধারিত সম্পত্তির মালিক বা 'উপযুক্ত' স্বামীর স্ত্রী না হ'লে অধিকাংশ স্থানে ভোটাধিকার হ'তেও বঞ্চিত। ফ্রান্সে আবার কোন নারীর ভোটাধিকার নেই। তা হ'লেও—ইউরোপ এবং ইউরোপপন্থী দেশে প্রবল নারী আন্দোলন আছে। তার ফলে, সেখানে নারীরা অন্ততঃ সামাজিক ব্যাপারে প্রায় পুরুষের সমান স্বাধীন। আমাদের কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে রুশিয়া ব্যতীত সকল দেশই ধনতান্ত্রিক। পুঁজিবাদ (Capitalism) সকল নারী ও পুরুষকে ভোটাধিকার দিতে পারে না। তা দিলে ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদেরই পতনের গোড়া পত্তন করা হয়।

শিল্প-বিপ্লবের পরই পৃথিবীতে বিশেষ ক'রে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার হয়। ফলে গতানুগতিকের মোহ অনেক পরিমাণে কেটে যায়। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ইউরোপে উঠে যাবার পর যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে অন্যভাবে সমাজ গঠন করতে শিক্ষা দিয়েছে। সেইজন্যই সেখানে নারীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কগণ দেখেছেন যে নারীরাও পুরুষের মতই সকল বিষয়ে উপযোগী। কিন্তু চীন, ভারত, মিশর, আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা, আরব প্রভৃতি দেশে, যেখানে ইউরোপের মত শিল্প-বিপ্লব হয়নি ও যেখানে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা এখন বর্ত্তমান, সেখানে তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপরোক্ত দেশে যাতে যন্ত্র সভ্যতা প্রবেশ না করে তার ব্যবস্থা সতর্কভাবে করেছেন। কারণ ঐ সকল দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যন্ত্র-শিল্পের

উৎপাদিত মালের বাজার হিসাবে ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশরের অবস্থা দেখান যাক,—১৯৩৬ সালের এপ্রিল সংখ্যার Strand Magazine এ P C Wren লিখেছেন—"Just like the Nile which is the life blood of Egypt, the Stream of life in Egypt has changed but little since Biblical times. Its inhabitants work, dress, think and talk much as they did two thousand year ago" এটা ইংরাজের গুণগ্রাহী পত্রিকা ও লেখক একজন পাকা বৃটিশনীতির সমর্থক।

সকল সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক দেশের প্রায় ঐরকম অবস্থা। উপরোক্ত দেশের সাধারণ উন্নতির পথে বিদেশী শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদ এক ভয়ানক বাধাস্বরূপ। ঐ সকল কারণেই ভারত আজও রাম-রাজত্ব বা মুসলমানী বাদশাহী-রাজত্বের স্বপ্নে বিভোর। পুরাণো ধারণা যাতে ভারতে বজায় থাকে তার চেষ্টা ভাল ভাবেই হয়ে থাকে। রেলে, টেলিগ্রাফে ও কত জিনিষের ভিতর দিয়ে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই শ্রেণীর লোকদের বোঝাবার কোন ত্রুটী হয় না। ইউরোপের মত শিল্প বিপ্লব আমাদের দেশে হয় নি ব'লেই আমাদের সমাজে এখনও ধর্ম্মান্ধতা। এই সব কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও পৃথিবীতে "অসূর্য্যম্পশ্যা" হয়ে নারীত্বের মহিমা প্রচার করছে, হিন্দুদের ও মুসলমানদের ধার্ম্মিক অনুশাসন অবশ্য কতক পরিমাণে এজন্য দায়ী। শুচিতা, সততা ও চরিত্রের নামে হিন্দুগণ স্ত্রীলোকের ওপর যে রকম বিধান দেয় তা অদ্বিতীয়। বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় ভারতে প্রথম সামাজিক পঙ্কিলতা দূর করবার চেষ্টা করেন ও ঠিক ভাবে বলতে গেলে রামমোহন রায়ই ভারতের রেনেস্‌াঁস আন্দোলনের জন্মদাতা। পৌত্তলিকতা আবার সকল স্বাধীনতা বিশেষ নারী স্বাধীনতার চরম বাধা, কারণ পৌত্তলিকতা স্বাধীন চিন্তা করতে দেয় না। মুসলমানদের পর্দ্দার ওপর জিদও অতি নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর।

এখন শিল্প-বিপ্লব ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করণীয় কাজ হওয়ায় আবার অন্য বিপদ এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনে চরম বাধা গান্ধীবাদ, কারণ গান্ধীবাদ যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে এক যায়গায় লিখেছেন যে, মহাত্মা গান্ধী যে মনে করেন নারীরা শুধু সন্তান প্রসবের যন্ত্র মাত্র তাহা তিনি কখনও মেনে নিতে পারেন না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিন্দু—"রামরাজ" স্থাপন করতে যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা প্রকৃত দেশের আমূল পরিবর্ত্তনের বিরোধী ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাধা স্বরূপ। সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রীর স্বপ্ন এই বিংশ শতাব্দীতে দেখার অর্থ সমগ্র মানব সমাজের যুগ যুগ ব্যাপী শ্রমের তৈরী বর্ত্তমান উন্নতিকে অস্বীকার করা।

আমাদের কর্ত্তব্যও কিন্তু একটা আছে, আমরা শুধু পুরুষের ওপর দোষ চাপিয়ে যেন ক্ষান্ত না হই। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতে যত দ্রুত যন্ত্র-সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রচার হবে ততই নারীগণ স্বাধীনতা পাবে। সঙ্গে আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। আবার তার জন্য সক্রিয়ও হ'তে হবে। কেন আমরা মানুষ হয়ে যন্ত্রের মত পর্দ্দার

আড়ালে বিধবা হয়ে সমাজের উৎপীড়ন সহ্য ক'রে জীবন কাটাব? স্ত্রী মানেই রান্নাঘর বা আলমারীর জিনিষ নয়। সেটা সকলকে বুঝতে হ'বে। বেদ, পুরাণ, কোরাণ, গীতা কোনটাই বর্ত্তমান যুগের নয়। এগুলো বহু আগের সামন্ততান্ত্রিক আধাসভ্য ও অসভ্য সমাজের জন্য লেখা—সেদিন এখন নেই। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, এটা সকল মেয়েকে বুঝতে হবে। ডাক্তার দেশমুখের Divorce Bill হয়ত সাম্রাজ্যবাদীর চেষ্টায় বিফল হতে পারে। কিন্তু divorce, বিধবা বিবাহ ও স্ব-ইচ্ছায় বিয়েতে আমাদের যে জন্মগত অধিকার সেটা যেন না ভুলি। যদিও প্রগতিশীল নারী আন্দোলন মানেই স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ তা হলেও ভারতের স্বাধীনতা না হ'লে নারীদের কখনও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে না। কারণ পরাধীন ভারতে পুরুষ বা নারী "স্বাধীন" বলে কিছু হতে পারে না। ভারতীয় নারীদের ধর্ম্মান্ধতা ও শোচনীয় অদৃষ্টবাদ দেখে হতাশ হবার কিছুই নেই। কারণ রুশ বিপ্লব আমাদের শিক্ষা দেয় যে বিপ্লবী-স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হলে সমাজ সম্পূর্ণ বদলে যাবে। বিপ্লবের আগে রুশের মেয়েরাও প্রায় ভারতের মেয়েদের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শতকরা নব্বইজন মেয়ে ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেনা।—রুশিয়ার সকল নারী স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে ও সকলেই সেখানে সমান অধিকার পায় (পুরুষ ও স্ত্রী)। সবশেষে এই বলতে চাই যে, মেয়েরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে ও অপর দেশের সকল আন্দোলন সম্বন্ধে সজাগ হয়। নারী পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টাই ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবে।

চীনা লালফৌজের লৌহ-মানব 'চু-টে'

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

চীন জাপান যুদ্ধারম্ভের পর লালফৌজের অধিনায়ক 'চু-টে'র খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এই অসম সাহসী জীবনেতিহাস জান্‌তে স্বতঃই সাধারণের মনে জাগে অনুসন্ধিৎসা। সত্যই এমন বৈচিত্র্যময় বীরজীবন পৃথিবীর ইতিহাসে আর খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না।

'চু-টে'র নামটিও বৈশিষ্ট্য বহন করে। যদিও তাঁর পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ গণনা ক'রে নামাকরণ করেন নি; কিন্তু পরকালে তাঁর নাম ও কাজের এমন সুন্দর সামঞ্জস্য হ'ল যা' সত্যই প্রণিধানযোগ্য। 'চু-টে' শব্দের অর্থ "লাল ধর্ম্মী"। যদি তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁদের সন্তানের নামের রাজনৈতিক অর্থ এমন হ'তে পারে বলে জান্‌তেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তা পরিবর্ত্তন করে রাখ্‌তেন। 'চু-টে' যখন জন্মেছিলেন, তখন চীনে লালফৌজের নামও কেউ জানত না।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত 'china at Bay' নামক পুস্তকে চু-টে'র জীবনী সম্বন্ধে যে বিবরণ আমরা পাই তাঁর সত্যিকার জীবনী সে বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতে বর্ণিত হ'য়েছে যে চু-টের জীবনের বহু বৎসর মজুরের মত কঠোর পরিশ্রম করে কেটেছে এবং তিক্ত জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'য়ে নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা হ'তে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন।

চু-টের জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থে আলোচনা করা হ'য়েছে তন্মধ্যে Edger Snow কৃত Red Star Over China নামক গ্রন্থই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। তাই আমি উক্ত গ্রন্থের ছায়াবলম্বনেই তাঁর জীবনী অঙ্কিত করতে চেষ্টা করলাম।

সি-চু-যান প্রদেশের অন্তর্গত নিলাং নামক স্থানে কোনও এক জমিদার বংশে চু-টে জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব তিনি বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হন। যৌবনে চু-টে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও সাহসী ছিলেন। যে কোনও দুঃসাহসের কাজ তাঁর অতি প্রিয় ছিল। ক্রমে তাঁর দুরন্তপনা তাঁকে যোদ্ধৃজীবনের দিকে আকর্ষণ করল। তিনি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর পারিবারিক প্রতিপত্তি ইউ-নান-ফুর সামরিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করল। ইউ নান ফুর সামরিক বিদ্যালয় তৎকালে সকলের জন্য মুক্ত ছিল না। যাই হোক তিনি শিক্ষার্থী হিসাবে আধুনিক রণনীতিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলেন এবং "বিদেশী সৈন্যের" লেফটেনান্ট রূপে তাঁর সামরিক জীবন আরম্ভ হল। তাঁর সৈন্যদল পাশ্চাত্য রণনীতির অনুসরণ করত এবং পাশ্চাত্য বর্শা, রাইফেল, বেয়নেট প্রভৃতি ব্যবহার করত বলে তাদের নাম ছিল 'বিদেশী সৈন্য'।

চু-টের ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল সুপ্রসন্ন। নিজের কাজে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি ইউ-নান-ফুর

নিরাপত্তা সমিতির পরিচালকপদে উন্নীত হন। তারপর তিনি অর্থ বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। ইউনান ও সিচুয়ান প্রদেশের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের মত চু-টেও আফিম্ আসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ছিলেন। যে দেশে আফিম্ চাযের মত ব্যবহৃত হয় এবং যেখানে পিতামাতারা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শান্ত প্রকৃতির গড়ে তোলার জন্য আখের মধ্যে আফিম্ ছড়িয়ে রাখে—সেখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে পাকা আফিম্ খোর হয়ে দাঁড়াবে তা' আর বিচিত্র কি? তৎকালে চীনে যে উপায়ে অধিকাংশ কর্ম্মচারীরা নিজেদের ও নিজ পরিবারবর্গের জন্য অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয় করত, চু-টেও সেইরূপ অসদুপায়ে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করলেন।

চু-টের একটি হারেম ছিল। তাঁর নয়জন স্ত্রী ও যথেষ্ট উপপত্নী ছিল। তাদের প্রত্যেকের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি ইউনানের রাজধানীতে প্রাসাদোপম অনেকগুলি বাড়ী তৈরী করেন। একটা মানুষের কল্পনায় যত রকম সুখের স্বপ্ন সম্ভব—চু-টে ছিলেন তার প্রত্যেকটার অধিকারী। ধন, দৌলত, ক্ষমতা, প্রেম, পুত্র, রঙ্গিন স্বপন সব কিছুই তিনি পেয়েছিলেন, তা ছাড়া তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তখনো সম্মুখে প্রসারিত। কিন্তু একটি বদ অভ্যাস তাঁর ভবিষ্যৎ সুখের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তিনি বই খুব বেশী পড়তেন।

আজ পর্য্যন্ত যদিও তিনি সম্পূর্ণ বাস্তববাদী, কিন্তু আদর্শবাদের দিকেও তাঁর কিছুটা ঝোঁক ছিল এবং বিশেষ করে তাঁর মধ্যে বিপ্লববাদের একটু ছোঁয়াচ ছিল। কিছুটা পুঁথিগত বিদ্যা হ'তে এবং কিছুটা বিদেশ প্রত্যাগত ছাত্রদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'যে তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌লেন যে ১৯১১ সালের চীন বিপ্লব সাধারণ স্বার্থের আদৌ অনুকূল নয়। শাসন-ক্ষমতা একজনের হাত হ'তে অন্যের হাতে যাওয়া এইমাত্র, অর্থাৎ এক-নায়কত্বের হাত বদল। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইউ-নান-ফুর চল্লিশহাজার ছেলেমেয়ের জন্য তাঁর মনের উপর শোকের একটা গভীর রেখাপাত হ'ল। পাশ্চাত্য বীরদের মত নিজেকে স্বনামধন্য করে তুল্‌তে এবং চীনকে আধুনিকতার, আলোকে নিয়ে যেতে তাঁর অন্তর আগ্রহান্বিত হ'যে উঠল। যতই তিনি বই পড়তে লাগলেন ততই তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'তে লাগল যে চীন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক অশিক্ষিত এবং অনেক পেছনে। তিনি আরও বই পড়তে লাগলেন এবং দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা তাঁর অন্তরে প্রবল হ'যে উঠল।

১৯২২ সালে চু-টে তাঁর সমস্ত স্ত্রী ও উপপত্নীকে বৃত্তি দিয়ে বিদায় করে দিলেন। যাঁরা চীনের সংরক্ষণশীলতার কথা জানেন তাঁদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা একটু শক্ত হ'বে। যাই হোক চু-টের এ ধরণের কাজ দৃঢ় সঙ্কল্প ও মুক্তি-প্রীতির দ্যোতক সন্দেহ নাই। তিনি ইউনান্ ছেড়ে সাংহাই গেলেন। সেখানে কুয়োমিন্টাংএর বিরুদ্ধবাদী বহু যুবকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদের দলে যোগ দিলেন। সাংহাইতে তিনি বামপন্থী র‍্যাডিকেল দলের সংস্পর্শেও যান। তারা কিন্তু চু-টেকে পুরাতনপন্থী একজন যোদ্ধার বেশী কিছুই ভাব্‌তে পারলনা। তারা ভাবতে পারল না যে শতশত দাস অধ্যুষিত ইউনানের একজন ভ্রষ্ট চরিত্র, বহু-পত্নীক, আফিম্ খোর রাজকর্ম্মচারী কখনও বিপ্লবপন্থী হতে পারে।

বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে চু-টে সংকল্প করল, আফিম্ তাকে ছাড়তেই হ'বে। কিন্তু আবাল অভ্যস্থ আফিম্ ছাড়া মুখে বলা যত সহজ, কাজে ততটা সহজ নয়। চু-টের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ছিল প্রচুর। যাই হোক্ আফিম্ ছাড়তে গিয়ে চু-টে প্রায় সপ্তাহ কাল অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী হ'যে কাটালেন। তাতে তাঁর ভয় হল—হয়ত স্বাস্থ্যহানি হ'তে পারে। তিনি সোজা হঙ্কোর এক টিকিট কিনে 'যাঙ্গী' নদীতে এবং বৃটিশ ষ্টীমারে চেপে বস্‌লেন। জাহাজে আফিম্ কেনা বেচা হয় না সুতরাং প্রবল ইচ্ছা হ'লেও সেখানে আফিম্ পাওয়া যাবে না। তিনি কোন বন্দরেও উঠ্‌লেন না, জাহাজের পাটাতনের মুক্ত বায়ুতে বদ্‌নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন। এইরূপে কয়েকবার হঙ্কো সাংহাই যাতাযাত ক'রে তিনি মাসখানেক পরে রণজয়ী হ'যে আবার বন্ধুদের নিকট ফিরে এলেন। তাঁর চাহনিতে বা চলায় ছিলনা জড়তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন, উপরন্তু পীতাভ গণ্ডে ফুটে উঠেছিল গোলাপী আভা। সে দিন হ'তে তিনি নূতন জীবনের পথে পা দিলেন।

চু-টের বয়স তখন যদিও প্রায় চল্লিশ, কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল তাঁর নিটোল। তাঁর অন্তর ছিল নূতন জ্ঞানানুসন্ধানে সদা উন্মুখ। কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তিনি জার্ম্মানী যাত্রা করলেন এবং হ্যানেভারে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে অনেক সাম্যবাদীর দেখা হ'ল। মার্কস্ পন্থা পড়তে পড়তে তাঁর অন্তর সামাজিক বিপ্লববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। মার্কস্ পন্থা পড়ার সময় তাঁর ছেলের বয়সী চীনা ছাত্রেরা তাঁর শিক্ষকতা করেছিল, কারণ জার্ম্মান ভাষা তিনি সামান্য কিছু জানলেও ফ্রান্স বা অন্যান্য বিদেশীয় ভাষায় তাঁর আদৌ ব্যুৎপত্তি ছিল না।

এইরূপে মহাসমরের কয়খানা বইও তিনি পড়লেন, তাতে পাশ্চাত্য রাজনীতির কিছুটা আভাস পেলেন। "ষ্টেট ও রিভলিউসন্" নামক একখানি বই হাতে নিয়ে একজন ছাত্র তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসে। তিনি সেই বইখানি তার কাছ হ'তে নিয়ে পড়লেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চু-টে মার্কস্ পন্থায় রাশীয় বিপ্লববাদে আস্থাবান হ'য়ে পড়লেন। তিনি 'বুখারিণে'র 'কমিউনিজমের এ-বি-সি', 'বস্তুতান্ত্রিক বিতর্ক' ও লেনিনের কয়খানা বই পড়লেন। জার্ম্মানীর তদানীন্তন বৈপ্লবিক আন্দোলন তাঁকে ও বহু চীনাছাত্রকে আকর্ষণ করল। চীনা সাম্যবাদ সমিতির জার্ম্মানশাখায় তিনি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

চু-টে একজন অভিজ্ঞ নিয়মতান্ত্রিক, বাস্তববাদী ও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি সমালোচনা ভালবাসতেন এবং সমালোচনায় তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। জার্ম্মানীতে তিনি সাধারণ সৈনিকের মত জীবনযাপন করতেন। সাম্যবাদের উপর তাঁর প্রথম ঝোঁক আসে গরীবের উপর সহানুভূতি হ'তে, তাঁর এ সহানুভূতিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্যই তিনি কুয়োমিন্টাংদলে যোগ দিয়াছিলেন। কুয়োমিন্টাংএ যোগ দেওয়ার পরে তিনি কিছুদিন সান-ইয়াৎ-সেনের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। কেননা সান-ইয়াৎ-সেনের মতে চাষীরাই ছিল জমির যোগ্য অধিকারী এবং বিত্তসঞ্চয়ের সীমা নির্দ্দেশের যুক্তি তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু যেদিন হ'তে মার্কস্ পন্থা তিনি বুঝতে আরম্ভ করলেন, সেদিন হ'তেই সান-ইয়াৎ-সেনের কার্য্যসূচীর বহুবিধ গলদ তাঁর চোখে ধরা পড়ল।

চু-টে কিছুদিন প্যারিসেও বাস করেছিলেন। ‘উ-জে হুই’ কর্ত্তৃক চীনা ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন পড়েন। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে তিনি নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে তাঁর শিক্ষকদের পায়ের কাছে বসে তাঁদের উপদেশ শুনতেন এবং যে বিষয় ভাল বুঝতে না পারতেন, তা' বুঝবার জন্য প্রশ্ন ও তর্ক করতেন। বিপ্লবের বিশদ অর্থ বুঝতে ও নিজেকে আধুনিকতার আলোকে নিয়ে যেতে তরুণ শিক্ষকেরা তাঁকে রাশিয়া যেতে উপদেশ দিলেন। তাঁরা তাঁকে আরও বললেন যে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি সেখানেই পাবেন। তিনি তাঁদের উপদেশানুযায়ী রাশিয়ায় গেলেন এবং ‘ইষ্টার্ন্ টয়লার্স’ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক চীনা অধ্যাপকের নিকট মার্কস্‌বাদ পড়েন। তিনি রাশিয়া হ'তে ১৯২৫ সালে আবার সাংহাইতে ফিরে এলেন এবং সাম্যবাদী সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন।

চু-টে আবার তাঁর পূর্ব্ব প্রভু ‘চু-পেই টের’ নিকট ফিরে গেলেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিতে ‘চিয়াং-কাই-সেকে’র পরেই ছিল ‘চু-পেই-টে’। ১৯২৭ সালে ‘চু-পেই-টে’ যাঙ্গী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী কয়টি প্রদেশ অধিকার করলেন এবং চু-টেকে কিয়াংসির রাজধানী নানচাংএর সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করলেন। এখানে তিনি সমর শিক্ষার্থী সৈন্যদলের অধিনায়কত্বও পেলেন। তিনি কিয়াংসির সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কুয়োমিণ্টাংএর নবম সৈন্যদলের সংস্পর্শে আসেন। নবম সৈন্যদলের কয়টি উপদল ইউনানে তাঁরই অধীনে ছিল। তিনি তাদের মধ্যে গোপনে সাম্যমন্ত্র প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। এইরূপে সেখানে আগষ্ট মাসের নানচাং বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরী হ'ল। প্রকৃতপক্ষে নানচাং বিদ্রোহই কুয়োমিণ্টাংএর বিরুদ্ধে লালফৌজের প্রথম প্রকাশ্য অভিযান।

১৯২৭ সালের ১লা আগষ্ট চু-টের একটা প্রধান সমস্যা সমাধানের দিন ছিল। চু-পেই-টের তরফ হ'তে তাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের আদেশ এল। সেদিন হয় তাঁকে ‘চু-পেই-টের’ আদেশানুযায়ী বিদ্রোহ দমন করতে হবে নতুবা তাঁকে খোলাখুলি বিপ্লবীদলে যোগ দিতে হবে। বলা বাহুল্য তিনি দ্বিতীয়টাই স্থির করলেন। নানকিং সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে লালফৌজ পরাস্ত হ'ল। লালফৌজের অধিনায়ক ‘হো-লাং’এর সঙ্গে চু-টেও নানচাং নগরী হ'তে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। চু-টের সঙ্গে শিক্ষারত সৈন্যদল ও কতক সান্ত্রী-সৈন্য লালফৌজের সঙ্গে গেল। চু-টের পশ্চাতে নানচাংএর নগর তোরণ তাঁর জন্য চিরতরে বন্ধ হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যৌবনের স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে গেল। তিনি এগিয়ে চললেন ভবিষ্যতের অন্তহীন সংগ্রামের পঙ্কিল পথে।

চু-টে ও হো-লাং এর সম্মিলিত সৈন্যদল ‘স্যাটো’ অধিকার করল। কিন্তু সে স্থান হ'তেও তাঁরা বিতাড়িত হ'য়ে কিয়াংসি ও হুনানের দিকে অগ্রসর হ'লেন। তৎকালে চু-টের লেফটেন্যাণ্টদের মধ্যে ‘ওয়াম্পায়' শিক্ষাপ্রাপ্ত ‘ওয়া-এর ছো’, ‘চিন্-ঈ’ ও ‘লিন-পাও’ প্রধান ছিল। পূর্ব্বোক্ত দু'জন পরে যুদ্ধে নিহত হন এবং ‘লিন পাও’ পরবর্ত্তী কালে লালফৌজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত হন। উপর্য্যুপরি দুর্ভাগ্য ও পরাজয়ে চু-টের সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে গেল। সামান্য

কিছু গোলা বারুদ সহ পাঁচশত রাইফেল্ ও একটি মাত্র 'মেসিন গান' নিয়ে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল নয়শত।

ঠিক সেই সময় দক্ষিণ হুনানে অবস্থিত ইউনানের 'জেনারেল' 'ফন্-সি-সেং' এর সহিত সম্মিলিত হওযার আহ্বান এল। 'ফন্-সি-সেং' এর এ আমন্ত্রণ চু-টে প্রত্যাখান করতে পারলেন না 'ফন-সি-সেং' ঠিক সাম্যবাদী ছিলেন না, একমাত্র রাজনীতিতে চিয়াং-কাই-সেকের বিরুদ্ধাচরণের ইচ্ছায়ই সে সাম্যবাদীদের সমর্থন করত। এখানে চু-টেব সৈন্যদল ১৪০ সংখ্যক দল নামে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তিনি নিজে ষোডশ সৈন্য দলেব পরামর্শদাতা নিযুক্ত হ'লেন। এই স্থানে চু-টের জীবনে উপর দিযে এক ভয়াবহ ঝঞ্ঝা বযে গেল।

'ফন্-সি-সেং' এর সৈন্যদলের মধ্যে সাম্যবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল এবং নানকিং গভর্ণমেন্টের সহযোগিতায় সাম্যবাদেব বিরুদ্ধবাদী একটি দলও গডে উঠল। তারা চু-টেকে বন্দী কবার ষডযন্ত্র কবল। এক রাত্রে চু-টে তাঁব চল্লিশজন সহচব নিযে এক সরাইখানায অবস্থান কবছিলেন, তখন হু-চি-লাং' এর অধিনাযকত্বে একদল সৈন্য সরাইখানা আক্রমণ করলো। সৈন্যেবা যখন তাঁব শির লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে ধরল, তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন, "আমি একজন সাধাবণ পাচক মাত্র—রান্না কবা আমার বৃত্তি। আমি এদের জন্য যেমন রান্না করি তোমাদের জন্যও তেমন পাবি। আমাকে হত্যা করোনা।" সৈন্যেবা তাদেব পেটে হাত দিযে একটু দ্বিধা কবল এবং তাঁকে একপাশে পর্য্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত কবে তারা চু-টের সন্ধানে অন্য কক্ষে প্রবেশ করল। 'হু-চি-লাং' এব জ্ঞাতি ভাই তাঁকে চিন্‌তে পাবল এবং সৈন্যদের ডেকে বলল—"চু-টে এইখানে, একে হত্যা কর।" চু-টে তাঁর গোপন অস্ত্র বের করে তাঁব কণ্টককে চির দিনের মত স্তব্ধ করে নৈশ অন্ধকারে মিলিযে গেলেন। জীবিত মাত্র পাঁচজন অনুচর তাঁর সঙ্গে যেতে সক্ষম হ'যেছিল।

এইজন্য আজও লালফৌজে চু-টেকে 'পাচকের সর্দ্দার' নামে অভিহিত করা হয। যাই হোক চু-টে স্বীয সৈন্য দলে আবাব ফিরে এল। এদিকে 'ফন্' নান্‌কিং গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পুরস্কারে বশীভূত হল এবং সে চিযাং-কাই-সেকের আমন্ত্রণে নানকিং যাত্রা করল। সম্ভবতঃ সাম্যবাদীদেব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভেব জন্যই ফন্‌কে আমন্ত্রণ করা হল, কাবণ সৈন্যদল ও সেনানীদেব উপব যথেষ্ট প্রতিপত্তিসম্পন্ন মুক্ত করবালধারী সাম্যবাদীদের আর তারা উপেক্ষণীয বলে ভাবল না। কিন্তু এত অর্থ ব্যয ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল, সৈন্যদল চু-টেও তার সেনানীদেরই. অনুগত রইল। সঙ্ঘের কাজ তখন বড় এলোমেলো চলছিল, কোনও নির্দ্দিষ্ট 'লাইন' তাদের ছিলনা এবং যুদ্ধ পন্থা তখনও স্থিরীকৃত হযনি। চু-টের সৈন্যদের তখনও নানকিং গভর্ণমেণ্টের পোষাকই পরা ছিল। তাদের অনেকের পাযে জুতা ছিল না। কখনো অনাহারে কখনো বা অর্দ্ধাহারে তাদের দিন কাটতে লাগল, যাতে অনেকেই সৈন্য বিভাগ ছেডে দিতে বাধ্য হল।

ইতি মধ্যে 'ক্যাণ্টন্' সাম্যবাদীদলের একটি সংবাদে আবার আশার আলো দেখা দিল। তাতে আর কিছু থাক আর না থাক ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর একটা আভাস ছিল। চু-টে তাঁর সৈন্য

দল পুনঃ সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। সৈন্যদলকে তিনটি উপদলে বিভক্ত করে চু-টে তাদের নাম দিলেন—"পেজান্টস্ কলাম্ আরমি"। তারা হুনান-কিয়াংসি-কোয়াংটাং সীমান্তের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল এবং জনৈক র‍্যাডিক্যাল ছাত্রের তৈরী একটা সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল। এখানে সমগ্র বাহিনী ধনীদেব সম্পত্তি বাজেযাপ্ত, জমির পুনর্বিভাগ ও খাজনা-লাঘব কার্য্যে মনোযোগ দিল। রক্ত পিচ্ছিল সমরে জুই-চাং-সিযেন এদের পদানত হ'ল এবং সেখানে তাবা সুদৃঢ ঘাঁটি করে খেলা-ধূলা, রাজনৈতিক ও রণনৈতিক সমালোচনায শীতকাল কাটিযে দিল।

ইত্যবসরে মাও-সি-টাংএর চাষী সৈন্যবাহিনী সগৌরবে হুনান প্রদেশের মধ্য দিযে এসে কিযাংসি-হুনানের দক্ষিণ সীমান্তবর্ত্তী 'চিং-কান্-সান্'এ প্রধান ঘাঁটি স্থাপন কবল। বিপ্লবী নাযক 'ওযাং-সো' ও 'ইযেন-ওযেন-সাই'র সাহচর্য্যে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা দু'টি অধিকার ক'বে পর্ব্বতোপরি আর একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তৈরী কবা হ'ল। চু-টে তখন চাষী সৈন্যবাহিনী হ'তে খুব দূবে ছিলেন না। মাও-সি-টাং তাঁব ভাইকে প্রতিনিধি স্বরূপ চু-টেব কাছে পাঠালেন। তিনি উভয বাহিনীকে মিলিত করা, ভবিষ্যৎ যুদ্ধনীতি, ভূমিব সমবিভাগ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট কর্ম্মপন্থাব নির্দ্দেশ নিয়ে এলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উভয সৈন্য দল চিং-কান-সান্ এ মিলিত হ'ল। তখন তাঁদেব আধিপত্য ছিল পাঁচটি জিলাব উপব ও তাঁদেব অনুচব সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ সহস্র। তন্মধ্যে বাইফেলধাবী সৈন্য চাব হাজাব, দশ হাজাব তবোযাল, বর্শাধারী এবং অবশিষ্ট সঙ্ঘেব কর্ম্মী, সৈন্যদের পবিবারবর্গ ও বহু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে ছিল।

এই রূপে 'চু' 'মাও' মিলনে দক্ষিণ চীনেব ইতিহাসকে রূপান্তবিত কবল। ১৯৩১ সালের প্রথম সাম্যবাদী কংগ্রেসে চু-টে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত হ'লেন। মাত্র দুই বৎসবের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র আগ্নেযাস্ত্র ও শত শত কলেব কামানধারী চারটি সৈন্যদল গঠিত হ'ল। এই সমস্ত আগ্নেযাস্ত্রের অধিকাংশই শত্রুসৈন্যেব নিকট হ'তে অধিকৃত। দক্ষিণ কিয়াংসির বিস্তীর্ণ ভূভাগ, হুনান ও ফুকিনেব একটা বিশেষ অংশ তখন সাম্যবাদীদের শাসনাধীনে ছিল। সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সকল স্থানেই রাজনৈতিক শিক্ষা, অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ, সামাজিক, অর্থ নৈতিক সমাধান প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কার ও সংগঠনমূলক কাজ আবম্ভ হ'ল। আবও দু'বৎসবেব চেষ্টায সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রায দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

এই কয় বৎসরে চু-টেকে শতশত খণ্ড যুদ্ধ ও কযটি রীতিমত যুদ্ধে নামতে হ'য়েছিল। চারিটি ভীষণ যুদ্ধ শেষ ক'রে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত 'নানকিং' বাহিনীর সম্মুখীন হ'লেন। তাঁর বিপক্ষ দল সৈন্য সংখ্যায তাঁর সৈন্যদলেব প্রায ৮।৯ গুণ বেশী ছিল, তারচেযেও বেশী ছিল তাদের রণসম্ভার। যাই হোক রণদক্ষতা ও বিচক্ষণতায স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের অন্যান্য সেনাপতিদের মধ্যে চু-টের আসন শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হ'ল এবং লালফৌজ যে নানকিং সৈন্য হ'তে দক্ষ তা'ও প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু সৈন্যচালনা ব্যাপারে মাত্র একটি ভুলের জন্য সব পণ্ড হ'যে গেল। তবে সুখের বিষয় এই যে, সে ভুল চু-টের নয়, কেন্দ্রীয় পরিষদের। এতবড় ভুল সত্ত্বেও লালফৌজ

যদি নানকিং সৈন্যদলের সম্মুখীন হ'ত, তাতে নানকিং সৈন্যদলের পরাজয়ই হ'ত এবং সে পরাজয় রোধ করার ক্ষমতা নাজী উপদেষ্টাদের খুব কমই ছিল।

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দ্দেশানুসারে লালফৌজ পশ্চাদপসরণ করতে আদিষ্ট হ'ল। এই পশ্চাদপসরণের নাম চীনের ইতিহাসে 'লঙ্গ-মার্চ্চ' রূপে প্রসিদ্ধ। বিশাল বাহিনী ও সোভিয়েট বাসিন্দাদের নিয়ে শত্রুর অবরোধ এড়িয়ে সুশৃঙ্খলার সহিত সৈন্যচালনা চু-টের অধিনায়ক জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। চু-টের উপর সৈন্যদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত শ্রদ্ধা তিব্বতের তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে বিপদকে আলিঙ্গন করতে সাহস জুগিয়েছিল। নানকিং পক্ষের যে কোনও সেনাপতির পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে সৈন্যচালনা এ হেন বিপদের মধ্যে একরূপ অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া 'লঙ্গ-মার্চ্চে'র মত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'যে আবার শত্রুর বহুযত্ন রক্ষিত সৈন্যশ্রেণীকে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করা তাদের সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ছিল।

চীনের উপকথায় চু-টেকে ঐন্দ্রজালিক নামে আখ্যায়িত করা হয়। চীনারা বলে তিনি নাকি চতুর্দ্দিকে একশত 'লী' পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পান, পাখীর মত উড়তে পারেন, শত্রু সৈন্যের পুরোভাগে ধূলি-মেঘ সৃষ্টি করতে পারেন এবং শত্রুর দিকে ঝঞ্ঝার গতি পরিবর্ত্তিত করতে পারেন। প্রাচীনপন্থী চীনারা বলে যে শত সহস্র গোলাগুলিও নাকি চু-টের মৃত্যু আন্‌তে পারে না। আবার কেউ কেউ বলে যে তিনি নাকি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের অসীম ক্ষমতা রাখেন। কারণ নানকিং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হ'তে তাঁকে বহুবার মৃত বলে প্রচার করা হ'য়েছিল, এমন কি তাঁর মৃত্যুর বহু উত্তেজনাকর অলীক কাহিনী তারা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিল—তা সত্ত্বেও তিনি আজও পর্য্যন্ত জীবিত। সম্ভব, এই কারণেই চীনাদের উক্তরূপ ধারণা। চীনের লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট "লাল-ধর্ম্মী" নাম আজ বিশেষ পরিচিত। তবে কারো কাছে তিনি ভবিষ্যের আশার উজ্জ্বল তারকার মত আর কারো কাছে বা কালান্তক যম।

তা সত্ত্বেও প্রত্যেকের কাছেই তাঁর শান্ত, বিনয়ী মৃদুভাষা, অনমনীয় দেহ ও আয়ত নয়নের প্রশংসা শোনা যায়। চু-টের দয়ালু দৃষ্টি তাঁর চেহারার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছে। তিনি একটু ঠাট্টাপ্রিয় লোক। বর্ত্তমান বিয়ের পর হ'তে তিনি তাঁর বয়স গণনা ছেড়ে দিয়েছেন।

চু-টে তাঁর দলের লোকদের খুব ভালবাসেন। এতবড় একজন সেনাপতি হ'য়েও তিনি সাধারণ একজন সৈনিকের মত বেশভূষা করেন এবং যে কোনও কষ্টকর কাজে তিনি সবার সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করেন। শীতের প্রত্যূষে অনেক দিন তাঁকে খালি পায়ে দেখা গেছে; কখনও বা অল্পাহারে ও অনাহারে দিনাতিপাত করেছেন। কিন্তু কোনও দিন কেউ তাঁর মুখে একটি অভিযোগের ভাষা শোনে নি। অসুখ তাঁর অল্পই হয়। তিনি সৈন্যদের শিবিরে শিবিরে তাদের সঙ্গে গল্প করে, খেলা করে ও হৈহল্লা করে কাটাতে খুব ভালবাসেন। তিনি বাস্কেট্ বল ও টেবিল-টেনিস্ খেলায়

খুব দক্ষ। সৈন্যগণ তাদের অভাব অভিযোগ চু-টেকে যে কোন সময় জানাতে পারত, অবশ্য তাদের অভিযোগ করার মত বিশেষ কিছু ছিলও না। চু-টে যখন তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তিনি তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলে তাদের সম্মান প্রদর্শন করেন। চু-টে তাঁর সৈন্যদের উপর বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন। 'লঙ্গ-মার্চ্চে'র সময় এক নগণ্য শ্রান্ত সৈনিককে নিজের ঘোড়া দিয়ে তিনি খালি পায়ে তুষারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। এধরণের সহানুভূতির বহু দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে পাওয়া যায়।

তাঁর চরিত্রের এত মহৎগুণ থাকা সত্ত্বেও লালফৌজের শত্রুরা তাঁকে মানব দেহে দানবের মত দেখে। তাঁর অত্যাচারের বহু ভয়াবহ গল্প তাঁর শত্রুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু চীনের সর্ব্বদল সমন্বয়ের পর সে সব কাহিনী আর কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনা। ইহা খুব সরল সত্য যে চু-টে কখনও নরহত্যাকে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। প্রচারকার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সমস্ত অনুরাগ সর্ব্বহারাবাদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে যতটুকু দয়ালু ও বিনয়ী হওয়া উচিত তিনি ততটুকুই হ'য়েছিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'বে যে তিনি বিনা কারণে কারো জীবনান্ত ঘটাতে পারেননা, ততক্ষণ চু-টে আমাদের চোখে রক্তলিপ্সু দানব ছাড়া মানব নয়। তবে এই বিশ্বাস কতকটা নির্ভর করে আমাদের সংস্কার, দর্শন, ধর্ম্ম ও তাঁর প্রতি সহানুভূতির উপর যে তাঁর রক্তলিপ্ত হস্ত ঘাতকের না অস্ত্রচিকিৎসকের। যাই হোক যদিও চু-টে সিদ্ধপুরুষ নন, তা সত্ত্বেও তাঁর সৈন্যেরা এবং চীনের অধিকাংশ দরিদ্র জানে যে তাঁর বীর হৃদয় তাদের জন্য কত দয়ালু। যতদিন পৃথিবীর বুকে চীনা লালফৌজের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তিনি তাদের অন্তরে অমর হ'য়ে থাকবেন।

যা দিতে হয়
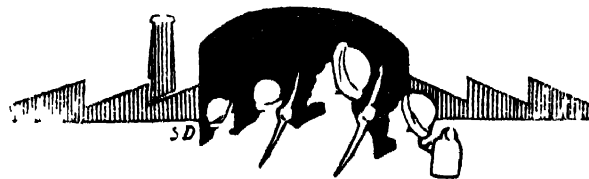
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি—

একদিন রাত প্রায় বারটায় ফুটপাথে একটি যুবকের সঙ্গে—হ্যাঁ, সে-ই হইবে। গরমের রাত, খামোখা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সিগারেটে টান পড়ায় একপাশে গাড়ী রাখিয়া নামিয়া পড়িলাম। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ হইয়া গেছে, মাঝে মাঝে এক-একটা পান-সিগারেটের দোকান তখনও রাতের খদ্দের ধরিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে। সিগারেট লইয়া পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি ঠিক পিছনেই নারীকণ্ঠ শুনিয়া থামিলাম। এই বরফ হ্যায়? একটু সরিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, পাশে একটি যুবক, দেখিলেই মনে হয় দু-জনেই কলেজে পড়ে। বরফের শুভ্র টুকরা হইতে এক কামড়ে কিছুটা ভাঙ্গিয়া নিয়া মেয়েটি বলিল, শিগ্‌গির মন্টুবাবু উঃ কি ঠাণ্ডা…খান আপনি। আত্মীয় নয় তবে; দু-জনে সহজভাবে আগাইয়া চলিল—একটু আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলাম না। কিন্তু তরুণ তরুণীর অধিক রাত্রের এই অবাধ গতিবিধির মধ্যে আর যাই থাক সরস কৌতুক করিবার মত কিছু ছিল না, ঐটুকু সময়ের ভিতর সেটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাই সপ্রশ্ন স্মরণীয় ঘটনা হইয়া বিষয়টা মনের মধ্যে রহিয়া গেছে।

আজও সঙ্গে আছে একটি যুবক, কিন্তু সে-রাতে যাকে দেখিয়াছিলাম সে নয়। সুগঠিত সুন্দর দেহের উপর বেশ লম্বা, মাথার চুল উস্কাখুস্কা, সার্ট ও কাপড় বেশ ময়লা বলা চলে, খালি পা, হাতে একটা বর্ষাতী—যার চেহারায় ও চাকচিক্যে মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগায়। মেয়েটিকেও খাট বলা যায় না। শ্যামবর্ণ চোখেমুখে সুস্পষ্ট একটি বুদ্ধির ছাপ, ছেলেমানুষী ধরণে দু-পাশ দিয়া ঝুলাইয়া দিয়াছে লম্বা দুটা বিনুনী—এ বয়সের মেয়েদের মধ্যে বড় একটা চলতি নাই, চোখে সাদা সরু ফ্রেমের চসমা, খুবই সাধারণ একটি শাড়ীর সঙ্গে হালকা একজোড়া স্লিপার—সব মিলিয়া মন্দ দেখাইতেছিল না।

একে একে খানদুই টেবিল পার হইয়া তারা আগাইয়া আসিল। বোধ হয় পাখার নীচে বলিয়া আমার পাশের টেবিলটা বাছিয়া লইল।

ভাল চা তৈরীর জন্য দক্ষিণাঞ্চলে এ 'টি-টাইম' রেসটুরান্ট-এর নাম আছে। মস্ত একটা হলঘরে ছোট ছোট টেবিলের চারপাশে চারখানা করিয়া চেয়ার; কাঠের খুপটির মুখে পরদা ঝুলাইয়া মহিলাদের সুব্যবস্থার বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা ইহারা করে নাই। সকালে সন্ধ্যায় বিস্তর লোক 'টি-টাইম' এ আসে চা খাইতে; চা-এর নেশাটা সময় অসময়ে প্রবল হইয়া দেখা দেয় বলিয়া আমাকেও দিনের ভিতর দু-একবার আসিতে হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মেয়ে বা মহিলার

আবির্ভাব কখনও দেখি নাই। বাঙালী মেয়ের রেসটুরান্ট-এ যাওয়া অদ্যাবধি একটা আয়োজন ও বিলাসের ব্যাপার, শুধু তাই নয় সেটা স্থান-কাল নির্ব্বাচন সাপেক্ষ। বেলা এগারটায় স্লিপার ঘষিতে ঘষিতে গা'ছাড়া ভাবে রেসটুরান্ট-এ ঢুকিয়া একদঙ্গল পুরুষের মাঝে বসিয়া এক কাপ চা খাইয়া নেওয়া বাঙ্গালী তরুণীর পক্ষে আজও এতটা অস্বাভাবিক যে অসময়ে যেকয়টি লোক উপস্থিত ছিল একবার চোখ তুলিয়া লক্ষ্য করিল। কেহ মৃদু হাসিল, কাহারও চোখ কৌতুকে চকচক করিয়া উঠিল। দু-দিনই দুটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে দেখিয়া মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, সে মনোবৃত্তিকে যৎসামান্য তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে চা-এর পেয়ালা সামনে লইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলাম। যুবকটি দোকানের ছোকরাকে ডাকিয়া দু-বাটি চা'র কথা বলিল।

ছোকরা চলিয়া গেলে মেয়েটি বলিল, আমার চা-এর দরকার নেই, আপনি বরং দুটা বিসকিট নিন।

বলিল খুবই আস্তে, হাতদুই মাত্র ব্যবধানে উৎকর্ণ হইয়া আছি বলিয়াই শুনিতে পাইলাম।
—দুটো বিসকিটে আর কি এগুবে, তা ছাড়া খালিখালি বসেই বা থাকবেন কি করে। যুবক উত্তর দিল।

কি ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কথা শুনিয়া মনে হয় এর চা হয় তো ওর বিসকিট হয় না—কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল।

মেয়েটি কহিল, আমি তো যা হ'ক কিছু খেয়ে বেরিয়েছি, আপনার কি হবে, চট্ করে মেস থেকে একবার ঘুরে আসুন না।
—মেসে মিল বন্ধ, উপোস করে অভ্যাস আছে, আমার জন্যে ভাববেন না।

পাশে বসিয়া শুনিতেছিলাম। সভ্য জগতে উপকার করিবার এবং তা গ্রহণ করিবারও একটা রীতি আছে, শুধু ইচ্ছাটাই সব নয়।

মেয়েটি বলিল, আপনারা কেমন · দুটো টাকা যোগাড় করতে পারেন না?

পিছন ফিরিয়া আছি, যুবকটির মুখের ভাব দেখা গেল না। উত্তর হইল, য়্যাদ্দিন ধরে তো শুধু যোগাড় করেই আসছি, আপনি না চিনলেও জানাশোনা সবাই যোগাড়ে লোক বলে চিনে নিয়েছে ···সেটাই হয়েছে বিপদ।
—কি সর্ব্বনাশই করেছেন! আমার হাত খালি করে হ'লো তার সুরু, কান খালি করে হলো শেষ··· ·· উঃ কি বকুনিটাই খেয়েছিলাম বাড়ীতে, টিকেয়ে রাখবার আন্দাজ চাঁদাটা পর্য্যন্ত উঠলো না ·· তার মধ্যে আবার কতই না দলাদলি। যাক, আজকের উপায়টা হবে কি, এ সাত-আট মাইল পথ হাঁটতে হবে? বাব্বাঃ ভাবতেও গা-হাত-পা অবশ করে।
—তা ছাড়া উপায় কি। দেড়টার আগেই পৌঁছা দরকার, দু হাজার লোক কারখানার বাইরে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। এ কারখানাটা যোগ দিলে ষ্ট্রাইকারের সংখ্যা আরও পাঁচ শ'শো বেড়ে যাবে।

এতক্ষণে এদের সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করিবাব মত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। অধুনা যে শ্রমিক আন্দোলন চলিযাছে তাব সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। মতবাদের দিক দিযা বিচার করিলে আমি এদেব বন্ধুর পর্য্যায পড়ি না, ওদের অভিযান আমাদেরই বিরুদ্ধে। কৌতূহলের বিষযবস্তুতে পরিবর্ত্তন ঘটিল।

যুবকটি বলিতেছিল, আপনাব কালকের বক্তৃতা এমনিতে খুবই ভাল হয়েছিল, কিন্তু অ ঃটা একসাইটিং কথা বলবেন না, তাতে মব ক্ষেপে যেতে পারে।

তাই কি। আমার ত তেমন মনে হয নি। হলেই বা ক্ষতি কি—যে শান্ত এরা, একটু ক্ষেপিযে দিলেই বা কি!

—সেটা ঠিক নয়, তাতে কাজ করবাব পক্ষে অসুবিধা হবে।

ভাবিতেছিলাম, কার মেয়ে, কতদুব পড়িযাছে, এই অবাধ চলাফেবার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিবার কেহ আছে কি না, আজিকাব লম্বা পথটা শ্লিপাবে ভর কবিযাই পাব হইবে, না, অন্য কিছু একটা উপায করিবে। ইচ্ছা হইল বলি, মজুবদের কাছ হইতে কিছু কিছু মজুবী নিলেইতো আর এতটা কষ্টে পড়িতে হযনা। একটু আলাপ করিবাব আগ্রহ না হইল এমনও নয। অসহযোগীদেব সহযোগী হইয়া বহুদিন পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্বদেশী করা গিযাছিল তারপরই ওজনে এত ভারী হইযা পড়িলাম যে কোন আন্দলনের ঢেউ আব স্থৈর্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পাবিল না। বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলনটা স্বার্থবিরুদ্ধ বলিযা, পুরাপুরি বিরুদ্ধ মত পোষণ না করা সত্বেও, নিতান্ত সখেব ব্যাপাব হিসাবেও বাবার জন্য তার সঙ্গে কোন রকম যোগ রাখা সম্ভব হয নাই। বিলেতে বসিযা এবার দু চার রকমের নিষিদ্ধ কর্ম্মের সঙ্গে এ কাজটাও যৎকিঞ্চিত করিযা আসিয়াছি। নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত না কবিলে এ জাতীয হৈ-চৈ আজকাল মন্দ লাগে না। যদিও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন খবরই বড একটা রাখি না, তবু বাবার গত রাত্রের কথা বার্ত্তায এটুকু আভাস পাইয়াছি যে এবার তিনি এমন ব্যবস্থা কবিযাছেন যাতে আমাদের কাবখানা নিযা দুর্ভাবনায পড়িবার মত কোন কারণ না ঘটে।'

চিন্তায বাধা পড়িল, চা শেষ করিযা উভযে উঠিযা পড়িযাছে। অনেকটা খেযাল বশতঃই আমিও সঙ্গে সঙ্গে বাহিবে আসিয়া দাঁড়াইলাম, মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধার পর আগাইয়া গিযা যুবকটিকে কহিলাম, দেখুন...

দু-জনেই ঘুবিযা দাঁড়াইল। বলিলাম, কিছু মনে করবেন না, আপনারা তো ষ্ট্রাইকারস্‌দের মিটিং-এ যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে? শুধু এ বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা, তা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ওদের মধ্যে একবার চোখোচোখি হইল। যুবকটি বলিল, আমরা যাচ্ছি হেঁটে। আমার পরিচ্ছদ ও চেহারার দিকে ভাল করিয়া একবার নজব করিয়া কহিল, প্রায আট মাইল রাস্তা, পারেন তো চলুন, আপত্তি কি?

বলিলাম, আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে, হাঁটতে হবে না কারুরই।

মেয়েটি কথায় যোগ দিল, বলিল, তা হ'লে বলুন আমাদের আপনার সঙ্গে যেতে বলছেন। তা বেশ, এতটা পথ যে হাঁটতে হবে না সেই রক্ষে। সৌখীন লোকদের এসব সখ হ'লে তো আমরা বেঁচে যাই। এক সঙ্গে যাচ্ছি, কথা বলতে হলেই নামের দরকার, আমার নাম মীনাক্ষী, ওঁর নাম তেজেন, আপনার—

—রজত। ভাবিলাম শ্রমিক নেতা হইবার উপযুক্ত বটে।

গাড়ীর কাছে আসিয়া মীনাক্ষী বলিল, বাঃ, এটাই আপনার গাড়ী! ঢুকবার সময় চকচকে বিরাট গাড়ীখানার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম মালিকটি কে, ভাগ্যি দেখুন, বেরুবার সময় মালিক আর গাড়ী দু'এর সঙ্গেই পরিচয় হয়ে গেল। আমি সামনের সিটে বসবো, বলিয়া আমার পাশের সিটে আসিয়া বসিল।

তেজেন বসিল পেছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর মীনাক্ষী বলিল, কান পেতে আমাদের সব কথাই তো শুনেছেন, ঐ লোকটির যে খাওয়া হয়নি তাও জানেন নিশ্চয়—অভুক্তকে খাওয়াবার সখও তো থাকা উচিত।

—নিশ্চয়।

—আর একেবারে চৌরঙ্গীতে গিয়ে থামবেন, এদিকে রেসটুরেণ্টগুলা অতি বাজে।

আমার চোখের দিকে একবার তাকাইল, ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি—অনুরোধের সঙ্গে অভিব্যক্তিটি ভাল লাগিল না। হালকা, গম্ভীর যা-ই হ'ক, সময় কাটাইবার গতানুগতিকতার হাত এড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছি, নিরাশ না হইলেই হইল। উভয়কে নিয়া বেশ বড় একটা রেসটুরাণ্টেই ঢুকিলাম। তিনি জনেই বসিয়াছি, মীনাক্ষী তেজেনের কানের কাছে মুখ নিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি যেন বলিল। আমি আপত্তি জানাইয়া কহিলাম, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওরকম কানে কানে কথা বলা অন্যায়।

—তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত বলেইতো কানে-কানে বলতে হলো।

বেশ সহজভাবে মীনাক্ষী জবাব দিল। বুঝা গেল অতসব এটিকেটের ধার সে ধারে না। 'বয়' আসিলে আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মীনাক্ষী মেনু সামনে রাখিয়া নিজের পছন্দমত দু-জনের আন্দাজ খাবার অর্ডার দিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দুটো করে অর্ডার দিচ্ছেন কেন?

—আমি বাদ, খেয়ে বেরিয়েছি।

—সেতো 'যা হ'ক কিছু'।

—একটি কথাও কান এড়ায় নি দেখছি· ·সেই 'যা হ'ক কিছুতেই চলে যাবে।

—তা হয় না।

বলিয়া পুনরায় 'বয়'কে ডাকিবার উদ্যোগ করিতে তেজেন গম্ভীর মুখে কহিল, ওকে পেড়াপিড়ি করে কোন ফল হবে না, অনর্থক।

ওঁরই বাড়ীতে যেন আমরা খাইতে বসিয়াছি, অনেকটা সেই রকম ভাব লইয়া মীনাক্ষী আমাদের খাওয়াব তদবির করিল। আহারান্তে তিনজন মিলিয়া রওনা হইয়া পড়িলাম। পথে মীনাক্ষী বলিল, মোটা চাঁদা আদায় করা যায় এমন কোন লোক জুটলো এত দিনে।

—মাপ করবেন, ও সখটি নেই।

—আচ্ছা রজতবাবু, এ আপনার নেহাৎই কি সখ,...এ কাজের ওপর সত্যিকারের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস একটুও নেই?

—পরিচয় যখন হয়েছে ও আলোচনা অন্য সময় করা যাবে,··ডাইনে?

—হ্যাঁ।

মীনাক্ষীই রাস্তা বলিয়া দিতেছিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া এদিকে আসা হইয়া ওঠে নাই, পূর্ব্বে এ রাস্তা ধবিয়া দু-একবার আমাদের ফ্যাক্টরীতে গিয়াছি মনে পড়ে। এক মাইলের ভিতর একটা জুটমিল, তিনটা ফ্যাক্টরী; মিল-এ ধর্ম্মঘট হইয়াছে শুনিয়াছি, এখন কোনটার উপর হানা দেওয়া হইবে জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না, একটু পরেই তো জানা যাইবে।

বহু দূবে থাকিতেই হাজার হাজার লোকের মিলিত কোলাহল ফিকা হইয়া কানে আসিযা পৌঁছিল। মীনাক্ষী নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইযা বসিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিযা কহিল, বলুন তো রজতবাবু, কি হবে দু-চার টাকা বেতন বৃদ্ধি, দু-এক ঘণ্টা শ্রম বাঁচানোর আবেদন নিয়ে এত মাতামাতি ক'রে···এতেকরে কারুর চাহিদা মেটে।

গলার স্বর ঠিক স্বাভাবিক মনে হইল না। গাড়ী চালানর ফাঁকে ভাল করিয়া একবার তার মুখের দিকে তাকাইলাম। ববাবর সামনের দিকে চাহিযা বসিয়া আছে, জোর হাওয়ায় মুখের উপব চঞ্চলভাবে উড়িতেছে সম্মুখের অসংলগ্ন চুলের গুচ্ছ, চোখে মুখে নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার দীপ্তি—যা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও ছিল না। মেয়েটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ এবং অতি সহজেই উত্তেজিত হয় বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, এমনি ক'রে' ধীরে ধীরেই দাবীর মাত্রা বাড়িয়ে চলতে হবে।

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই · ওরা ··অর্থাৎ আমরা, পাইনি কিছুই, পাবও না ..এ বঞ্চনার যাতে একদিন শেষ আসে, আমাদের শেষ হ'তে হবে শুধু তারই চেষ্টায়। ঐ মজুরদের মাঝে গিয়ে যখন দাঁড়াই, ইনিযে বিনিয়ে বক্তৃতা দিয়ে শক্তিশালী হাতুড়গুলোকে যুক্তিশালী কলম বানিযে তুলবার প্রবৃত্তি আমার থাকে না—

অজস্র কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি, মিনাক্ষী থামিল—অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু একি, আমাদের গ্লাস ফ্যাক্টরীর সামনেই যে সকলেই ভীড় করিয়া আছে। যতটা জানি তাতে বিচলিত হইবার মত কারণ নাই বলিয়াই আমার ধারণা, তবু এই কর্ম্মীদের সঙ্গে বহন করিয়া এখানে উপস্থিত হওয়াটাই কর্ত্তৃপক্ষ মস্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে। অবশ্যি একদিক দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া

যাইতে পারে, উপস্থিত কর্ম্মীদের নিকট আমি পবিচিত না হইবারই কথা। কারণ ব্যবসার সঙ্গে আমি মোটেই সংশ্লিষ্ট নহি, তা ছাডা বহুদিন বিদেশে কাটাইয়া সবে মাত্র দেশে ফিরিয়াছি। তবু কিছুটা দূরে গাড়ী দাঁড করাইলাম। খোলা ময়দানে এখানে ওখানে ভীড করিয়া আছে শত শত লোক, থাকিযা থাকিয়া তাদের মিলিত কণ্ঠে ভর কবিযা চতুর্দ্দিকে ছডাইযা পডিতেছে বিবিধ রকম দাবীর হুঙ্কার।

গাড়ী থামিতেই বহুলোক আসিযা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনচার জন যারা আগাইযা আসিল বোধ হয় মাতব্বর। তেজেন ও মীনাক্ষী তাদের নিযা একটু তফাতে গিয়া কি যেন কথাবার্ত্তা বলিল, তারপর সকলকে সঙ্গে করিয়া তেজেন গেল ভীড়ের দিকে আগাইযা, মীনাক্ষী ফিরিয়া আসিল আমার কাছে। হাজার হাজার শ্রমিকের চঞ্চল গতিবিধির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিযা মীনাক্ষী বলিল, রজতবাবু আমরা জিতেছি। এ কারখানায সবাই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছে।

খবর শুনিযা আশ্চর্য্য হইলাম। এই জয় পরোক্ষে আমাকেও আঘাত করিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কারবার হইতে অজস্র টাকা আয হইতেছে তার শ্রমিকদের সুখ সুবিধার জন্য দু-হাজার টাকা ব্যয বাড়াইযা দিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ আমি খুঁজিযা পাই না—আছে নিশ্চযই, গদিতে বসিলে হযতো তার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যাইবে। নানা কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষীকে লক্ষ্য করিযা দেখিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম তার মুখ-চোখের সার্থকতার উজ্জ্বলতা। চলতি গাড়ীর হাওযার অত্যাচারে অনেক চুল তার আলগা হইয়া উষ্কাখুষ্কা হইযা গেছে, তারই কযেকটা আসিযা পড়িযাছে মুখ-চোখে ও গালের উপর; মোটরের একপাশে হেলান দিযা সে দাঁড়াইযাছিল, সে-দিকে চোখ রাখিয়া কহিলাম, আপনাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।

কথাটা বলিযা ফেলিযা সঙ্কোচ বোধ করিলাম; হযতো সঙ্গত হইল না।

মীনাক্ষী কিন্তু আমার চোখের দিকে চোখ রাখিযা মৃদু হাসিযা জবাব দিল, তাই নাকি!

দু-তিন হাজার লোক জমাযেত হইযাছে সামনের মযদানে, সেখানেই সভা বসিবে। তেজেন আসিযা মীনাক্ষীকে কহিল, চলুন, আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্য ওরা অস্থির হযে আছে। দেখবেন, একটু রেখে-ঢেকে বলবেন, ক্ষেপিযে দেবেন না · বলতে দাঁড়ালে আপনার আবার খেযাল থাকে না। লুটতরাজ বা মালিকদের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বেধে গেলে ভযানক ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে।

না, ঝঞ্ঝাট আমি বাধাব না, ওতে আমার কাজের বরং অন্তরায ঘটাবে।

এই বাইশ কি তেইশ বছরের মেযেটিকে ঘনঘন জযধ্বনীর মধ্য দিযা সভাস্থলে একটা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া জনতা স্তব্ধ হইল তার মুখের কথা শুনিবার জন্য। অপরিমেয শ্রদ্ধার ছোঁয়াচে মানুষ যেন আপনা হইতেই শ্রদ্ধেয হইয়া ওঠে; অপরিচ্ছন্ন রুক্ষ জনতার একান্তে উত্তোলিত সুকোমল নারী দেহের ঐ তেজদীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকাইয়া আমার মনেও কৌতূহলের পাশে যা জাগিয়া উঠিল তাকে সম্ভ্রম ছাড়া আর কি বলিতে পারি।

বাঁধাধরা সম্বোধনের সঙ্গে বক্তৃতা যেমন করিয়া সুরু হয় তেমনি সুরু হইল। সম্মুখে তার বঞ্চিত নব-নারীর এক বিরাট সমষ্টি। এ মেয়েটির মুখ হইতে তারা শুনিতে চায়, কি তাদের নাই, কি তাদের পাওয়া উচিত, কেমন করিয়া তা পাওয়া যাইবে। অশিক্ষা, অভাব, অপরিচ্ছন্নতার পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মীনাক্ষী তখন বলিতেছিল,—

......ক্ষুধা শুধু যে তোমাদেরই তা নয়, এ ক্ষুধার জ্বালা, এ দারিদ্র্য আজ ভদ্র-অভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের ·সকলের গায়ে দারিদ্র্যের এই কুৎসিত ঘা · ভদ্রশ্রেণী তার ওপর পটি জড়িয়ে গোপন করে, তোমাদেরটা পড়ে থাকে অনাবৃত—খোলা, তাই কুৎসিত; ভিক্ষুকদের মধ্যে ধরেছে পচন, তাই জঘন্য...

ওছব ছুনতে চাইনে, মাইনে বাড়বে কিনা তাই বলো।

যে পাশটাতে মাঝে-মাঝে গণ্ডগোল হইতেছিল কথাটা সেখান হইতেই উঠিল।—চপ্ হারামজাদ, সালাকে বেবকরে দাও,· খানিক হল্লার পর গোলমাল থামিল। তেজেন আসিয়া দাঁড়াইল আমার কাছে, সভার দিকে চোখ রাখিযাই বলিতে লাগিল, আমার এসে থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল·· এখন তো বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, এ কারখানার লোকগুলো মালিকের কাছ থেকে টাকা খেযেছে। গত বারের ষ্ট্রাইক নিয়ে এটার মালিকদের মীনাক্ষীর ওপর রাগ রয়ে গেছে, · সব দাবী মেনে নিয়ে মিল চালু করতে হয়েছিল, তাই একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে কিন্তু মজুরগুলো কি বেইমান।

এবার গতরাত্রির আলোচনার সঙ্গে ধর্ম্মঘটের সাফল্যের যোগাযোগ কোথায় বুঝিতে পারিলাম।

মীনাক্ষী অমন বেআদপ শ্রোতার কথার সূত্র ধরিযাই হযতো বলিতেছিল,—

···মাইনে বাড়ানো তো দূরের কথা, কোন সুখ সুবিধাই কবুল আমি করছি না। তোমরা পাবে না, কিছুই তোমরা ··

—কিছু মিলবে না বাছ, বাছ বন্ধ ছোন · নাচনেওযালী নাচ দেখাও ..

মারো সালাকো, চপরাও বদমাস—অশ্রাব্য গালাগাল ও গোলমাল, তারপর হাতাহাতি। দেখিতে দেখিতে দুটা পক্ষ হইযা গেল। অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া তেজেন গিয়া দাঁড়াইল মীনাক্ষীর টেবিল ঘেরিয়া। মীনাক্ষী তখন সোজা নিঃশব্দভাবে দাঁড়াইয়া আছে তার উঁচু স্থানটিতে, গালাগালি, হৈ-চৈ, মারপিট, কোনকিছুতেই যেন সে বিচলিত নয়। বঙ্গনারীর রেশমী কাপড়ের মত হালকা ইজ্জৎকে খাঁকির মত শক্ত ও সহনশীল করিয়া তবে সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিযাছে।

মারপিট ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিযা তেজেন ও মাতব্বরদের দু-একজন মীনাক্ষীকে অনুরোধ করিল সভা ছাড়িয়া সরিয়া আসিতে। মীনাক্ষী বলিল, ওদের ভাল ঘরদোর তৈরী করে দেওযান থেকে মাইনে বাড়ান ··আরও অনেক কিছু···সবতো আমিই আদায় ক'রে দিয়েছি, ওরাই আজ·

কথা শেষ হইল না, কে যেন একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল মীনাক্ষীর মাথা লক্ষ্য করিয়া।

মীনাক্ষী কাত হইয়া পড়িতেই তেজেন তাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে জনতা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কে কাহার পক্ষ বুঝিবার জো নাই, চারদিকে মারামারি আর হল্লা।

—শিগ্‌গির গাড়ীতে যান। বলিয়া তেজেন মীনাক্ষীকে বহন করিয়া গাড়ীর দিকে ছুটিল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে ভাবিতে পারি নাই। যন্ত্রচালিতের মত চিন্তাহীনভাবে ঝাপাইয়া গাড়ীতে ঢুকিয়া স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিলাম। ঝড়ের বেগে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, জ্ঞান আছে?

—না, ভয়ানক রক্ত পড়ছে আর একটু জোরে চালানো যায় না?

কলেজ হাসপাতালে মীনাক্ষীকে নামাইয়া লওয়া হইল। তখন তার জ্ঞান ফিরিয়াছে। আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল না, দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত মুখখানা টকটকে তাজা রক্তে লাল হইয়া গেছে, রক্তে ভিজিয়া চোখের পাতা ভারী হইয়াছিল, অতিকষ্টে টানিয়া ধীরে ধীরে সে চোখ খুলিল। নার্সে ডাক্তারে চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, আমার দিকে চোখ পড়িতেই ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি দেখা দিল, ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে কহিল, এখন কেমন দেখাচ্ছে

এটা বোধহয় আমার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের রূপচর্চ্চার উত্তর। এমন অবস্থায় দুঃখের ম্লান হাসি ছাড়া এ কথার জবাব আর কি থাকিতে পারে। এ হীন আক্রমণের সঙ্গে নিজের স্বার্থ ও সম্পর্কগত যোগসূত্রের জন্য অপরাধের বোঝা আমার মনের উপর চাপিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

তেজেন গেল মীনাক্ষীর বাবা-মাকে খবর দিতে, সামান্য সুস্থতার খবর পাওয়ামাত্র কাহারও জন্য অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি মীনাক্ষীর সঙ্গে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার পুরা পরিচয় অবগত হইলে মীনাক্ষী ও তেজেন দু-জনেই ধরিয়া লইবে, এ তামাসা দেখাই ছিল আমার আজিকার আকস্মিক সখের একমাত্র কারণ।

বাড়ী ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময় পেছনের সিটে চোখ পড়াতে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলাম—দামী গদি ও কুশানের গায় চাপ চাপ মীনাক্ষীর গায়ের রক্ত—

বাড়ীর সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, মা আসিয়া প্রশ্ন করিল, সারাদিন ছিলি কোথায়? বলিলাম, অতগুলো টাকা দাম দিয়েছ, জিনিষটা বুঝে আনতে গিয়েছিলাম।

আশ্চর্য্য হইয়া মা প্রশ্ন করিল, কি জিনিষ কোথায়? বলিলাম, দেখগে যাও গাড়ীতে আছে।

বজ্র

কুমার শ্রীনিখিলেশ রুদ্র নারায়ণ সিংহ

আমার তামসী রাতে কে গাহিছে পূর্ণিমার গান
হর্ষ সমারোহে ?
কে রচিছে কোরকাঞ্জলি সপ্রগল্‌ভ যৌবনের দান
প্রলুব্ধ আগ্রহে ?
আমার আকাশে হেথা অমানিশা মেলিয়াছে পাখা
চন্দ্র-তারা হীন,
ঝঞ্ঝার নিষ্ঠুর পরী করিছে কামনা তরু-শাখা
পত্র-পুষ্প হীন।
আমার আলোক নাহি, সব গীত সব সমারোহ
মূর্ছিত দারিদ্র্য-দাহে, কে খুঁজিছো বিলোল বিমোহ ?
আনন্দ উৎসবে তব নিমন্ত্রণ করোনি আমারে
আমি হর্ষ-হীন,
শুনায়ে উৎসব রব পরিহাস করো বেদনারে
কেনো অনুদিন ?
তোমাদের আছে সুখ, আছে শান্তি, রয়েছে বিলাস
মোর কিছু নাই।
কুঞ্জে মোর বিঘোষিছে, অবসান আশা, অভিলাষ—
মৃত্যুর সানাই।
তাহারি তরঙ্গ ভাঙে ধীরে ধীরে জীবনের কূল,
নির্মম, নিরনুভূতি ;—শুনি তার উচ্ছ্বাস বিপুল।
তাই আমি গাই নাকো তোমার উৎসবের গান
তোমাদের সুরে,
উৎসবের অবকাশ হেথা কই—মৃত্যুশংকাম্লান
মুমূর্ষুর পুরে ?

আমার কণ্ঠের মাঝে ভাঙনের বাজে কলরোল
মৃত্যু অভিশাপ,
তাই আমি গেয়ে চলি, ক্ষয়-পাণ্ডু ব্যথা-উতরোল
সঙ্গীত-বিলাপ।

যৌবনেব নাহি তাপ, কণ্ঠে মোর দাবানল জ্বালা,
ধ্বংসের প্রশস্তি গাঁথে ;-কোথা পাবো উৎসবের মালা ?

হে নির্ম্ম ! গাহিও না দীন মোর কুটিবের পাশে
উল্লাসের গান
কে জানে বিনাশ কবে ঘনাইযা আসে কার শ্বাসে
বজ্রের সমান।

আমার তমিস্রা-লোকে মৃত্যু-নাগ উগাবিছে বিষ
ধ্বংস-বহ্নি শিখা
অসন্তোষ মেঘলোক রচিতেছে বিনাশ কুলিশ
মৃত্যুদণ্ড লিখা।

তোমার উৎসব যজ্ঞে—বেদনারে পরিহাস-গীতে,
হয তো কখন রুষি' শাসিবে নির্ম্ম আচম্বিতে।

অনুনয় নহে মোর, সবিনয নহে নিবেদন।
উদ্যত হ'তেছে বজ্র ,—সাবধানী করিনু ঘোষণ।

বিপত্তি

(মাইকেল জোশচেঙ্কো)

অনুবাদক—শ্রীশ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ

বৃদ্ধ অলস অবসাদে ঘুমিযে পডলো। আমাদের পাডাবই লোক। দু' একবছর আগে রাতকানা হযে গিছলো। পবে তাব দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। আবাব তাকে ব্যাবাকের সাধাবণ পাক ঘবেব আড্ডায দেখা গেল। অন্যান্য ভাডাটিযাদের সঙ্গে সে তুলতো তুমুল তর্ক সভ্যতা ও সংস্কৃতিব সমস্যা নিয়ে।

তাবপব হঠাৎ একদিন সে অচেতনে ঘুমিযে পড়লো।

এ হপ্তা কযেক পূর্ব্বেব কথা। একদিন প্রভাতে পরিবারেব লোকেরা শয্যা ত্যাগ কবে দেখলো বৃদ্ধ পডে আছে নিস্পন্দ নিঃসাডে। জীবনের চিহ্ন যেন আদতেই নেই। নাডী স্তব্ধ, বুকেব ওঠা পডা বন্ধ। মুখের ওপব আযনা ধরে দেখা গেল ভাপ লাগলো না একটুও।

অগত্যা সকলেই স্থির কবলে মৃত্যু ঘটেছে ঘুমেব ঘোরে। অন্ত্যেষ্টিক্রিযার ব্যবস্থাব জন্যে ছুটতে হলো।

ব্যবস্থা কববাব তাডা ছিল, কাবণ তাবা থাকতো একটি মাত্র ছোট ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে। বাকি ঘরগুলো ভর্ত্তি ছিল অন্য অন্য পবিবাবেব অসংখ্য পরিজনে। কৌটাভরা সাডিন মাছের মত গাদাগাদি কবে বাস কবতো তাবা।

মৃতদেহ রাখবার স্থানাভাব বলেই ত্বরার এত প্রযোজন।

বৃদ্ধের পরিবাবে কন্যা, জামাতা, তাদের একটি শিশু ও আয়া। আযা রাখতে হয়েছে বাধ্য হযে কাবণ স্বামী স্ত্রী উভয়কে কাজে যেতে হয। আযা কিন্তু নিজেই ছেলে মানুষ। বযস মাত্র ষোল।

অভাবনীয দুর্ঘটনায সকলেই হতবুদ্ধি হযে গেল। ছোট ঘরের মধ্যে মৃতদেহের চেযে অনাবশ্যক উপদ্রব আব কি হতে পারে?

দিব্বি পডে আছে ঝরা ফুলের মত তাজা। নির্ব্বাক হযেও দাবি জানাচ্ছে তার একটা কোন ব্যবস্থা করা দবকার। দেরী চোলবেনা, একেবারে যে ঘরের মাঝখানটিতে। যেখানে নড়বাব চডবার স্থানাভাব সেখানে এই ব্যাপার,—অস্বস্তিকব। তাডা থাকবে বৈকী। বাচ্চা-শিশু চীৎকার জুড়ে দিল তারস্ববে। আতঙ্কে অভিভূত আয়া কম্পিতকণ্ঠে বল্লে, মডার সঙ্গে একঘবে কখনই সে থাকবে না। সে বেচারা এত নির্ব্বোধ যে মরণ ব্যাপারটাকে আদতেই বরদাস্ত করতে পারে না। জীবনের শেষ আছে তা তাঁর ধারণার অতীত।

সংসারের কর্ত্তা, অর্থাৎ বৃদ্ধের জামাতা ছুটলো সরকারী মুদ্দাফরাশের সন্ধানে। ফিরে এসে বল্লে, "সব ব্যবস্থাই এক রকম ঠিক—গাড়ীও প্রস্তুত, তবে ঘোড়া পেতে হপ্তার শেষ পর্য্যন্ত দেরী হবে—"

স্ত্রী ঝাঁজি দিয়ে বলে উঠলো—"যা ভেবেছি তাই—বাবা বেঁচে থাকতে অহরহ ঝগড়া করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে আর এখন যে কোন উপকারে আসবেনা সে কথা জানাই ছিল। সামান্য ঘোড়া যোগাড়, তারও মুরদ নেই —"

কর্ত্তা জবাব দিল—"চুলোয়ে যাক্ গে—আমি কি ঘোড-সওয়ার যে দরকার হলেই টুপির ভেতর থেকে ঘোড়া বেরিয়ে আসবে। মড়া নিয়ে থাকতে আমার কোন আনন্দ আছে? না তোমার বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে পেট ভরবে?

ভদ্র পরিবারে যত প্রকার কলহ কেলেঙ্কারি সম্ভব তা হলো। বাচ্চা ছেলেটির মৃতদেহ দেখা অভ্যাস নাই—সে চিল-চীৎকারে ঘরের ছাদ ফাটিয়ে ফেল্লো প্রায়। আয়া পুনরায় নোটিশ দিল মড়া-রাখা পরিবারে কাজ করবে না সে কখনও।

গণ্ডগোলে অতিষ্ঠ হয়ে গৃহিণী নিজেই গেল মুদ্দাফরাশের সন্ধানে কিন্তু ফিরে এলো মুখ ফ্যাকাসে ক'রে। বল্লে, "আসছে হপ্তার আগে ঘোড়া পাওয়া যাবার কোন স্থিরতা নেই; তবে এই জ্যান্ত আহম্মকটা যদি বুদ্ধি করে আগে থাকতে নাম লিখিয়ে রাখতো তা হলে এত দেরী হতো না—গাড়ী অবিশ্যি এখুনি পাওয়া যেতে পারে—"

আর বেশী বাক্য ব্যয় না করে ক্ষিপ্র হস্তে শিশুর অঙ্গ সজ্জা করিয়ে রোরুদ্যমান আয়ার হাত ধরে সে বেরিয়ে পড়লো। চল্লো গ্রামে কোন আত্মীয়ের বাড়ী। যাবার সময় বল্লে, "আমাকে ছেলের কথা ত' ভাবতে হবে। এ বেচারাকে এই করুণ দৃশ্যের মাঝে ফেলে রাখবার অধিকার আমাদের নেই। তুমি যা খুশী করগে যাও।"

স্বামী শুনিয়ে দিল—"আমি কখ্খনও থাকবো না, তুমি যাই বল না কেন। ওতো আমার বাপ নয়। জ্যান্ত অবস্থাতেই দেখতে পারতাম না আর এখন একটা ঘর ভাগাভাগি করে থাকা অসম্ভব, অসহ্য। হয় বাইরের বারান্দায় বার করে দেব, না হ'লে উঠবো গিয়ে ভায়ের বাড়ী। বুড়ো তার ঘোড়ার জন্যে নিজেই অপেক্ষা করুক গে যাক।"

তারা গেল চলে দুজনে দুদিকে কিন্তু কর্ত্তাকে ফিরতে হলো। ভায়ের পরিবারে সকলেই ডিপথিরিয়াতে শয্যাশায়ী—বেচারাকে ঢুকতেই দিল না।

সে ফিরে এসে বৃদ্ধকে পাক ঘরের সরু টেবিলের ওপর ফেলে, ঠেলে দিল বাইরে। তারপর খিল বন্ধ করে বসে রইলো ঘরে। হাজার হাঁক ডাকে দ্বার খুললো না দু'দিন।

এদিকে এই ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোলের অবধি রইলো না। পাঁচজনের বাড়ী, কাজেই হলো তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। সকলেই আতঙ্কে ক্রোধে চেঁচামেচি সুরু করে দিল।

দেহটি পড়ে আছে পায়খানা যাবার পথ জুড়ে। মেয়েরা ও শিশুরা প্রাতঃক্রিয়া দিল বন্ধ ক'রে ভয়ের চোটে

জনকয়েক পুরুষ টেবিল সমেত বৃদ্ধকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে গেল বারান্দায়। তাইতে বিপত্তি কমা দূরে থাক, বেড়ে গেল। ফলে বাসিন্দাদের অভ্যাগত বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভীতি ও আড়ষ্টতা গেল ছড়িয়ে।

সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর আপত্তি জানালে জনৈক সমবায় বিপণির ম্যানেজার। শাসিয়ে রাখলে যে তার গৃহাগত মহিলা আগন্তুকদের মধ্যে মানসিক বিকার উপস্থিত হলে দায়ী হবে না সে।

হাউস্ কমিটীর জরুরী সভা বসলো কিন্তু সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হলো না। কোন কোন সভ্য প্রস্তাব করলেন শবটীকে উঠানে স্থানান্তরিত করবার কথা। সভাপতি বুঝিয়ে দিলেন যে তাহলে জীবিত ভাড়াটিয়াদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং ফলে ভাড়া আদায়ের হার আরও কমে যাওয়া অনিবার্য্য।

অগত্যা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাড়াটিয়াবৃন্দ এক জোট হয়ে দেহটির বর্ত্তমান মালিকের উদ্দেশে জোরালো ভাষা প্রয়োগ করতে লাগলো।

সে কিন্তু নির্ব্বিকার ভাবে অর্গলবদ্ধ কপাটের ওপর পিঠ রেখে মৃতের আবর্জ্জনাময় দ্রব্য সামগ্রীগুলি ভস্ম করায় ব্যস্ত ছিল।

অবশেষে সকলে স্থির করলো দরজা ভেঙে ব্যাপারটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবে। টেবিল নিয়ে চল্লো টানাটানি, অনেক হাতের নাড়া পেয়ে একটি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহটি নড়ে উঠলো।

ভীতি ও বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সকলে ছুটলো বদ্ধ দ্বারের প্রতি। কিন্তু হাজার আশ্বাসবাণী ও করাঘাতেও অর্গল মুক্ত হলোনা। এক ঘণ্টার পর ভিতর হতে ধীর কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা গেল "আমি হলে ওসব চালাকি পরিত্যাগ করতাম অনেক আগে—আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ঠকাতে পারবে না।"

অনেক বাদ প্রতিবাদের পর সে বল্লে যে বৃদ্ধ যদি নিজের কণ্ঠে জানায় যে ব্যাপারটি প্রতারণা নয় তবে সে বেরোবে।

বৃদ্ধের কল্পনাশক্তির বালাই ছিলনা। কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো "হো, হো। তার জামাতা এ কণ্ঠস্বর চিনতেই পারলে না। আরও বাক্‌বিতণ্ডার পর সে চাবীর গর্ত্তের ভিতর হতে চাক্ষুষ পরখ করতে রাজী হলো এবং টেবিলটিকে কাছাকাছি টেনে আনা হলো। কিন্তু এ প্রমাণও গ্রাহ্য হলো না। ভাবলে আশ-পাশের লোকগুলি মৃতের হাত পা দিচ্ছে নাড়িয়ে। যত সব প্রতারণা।

অবশেষে একান্ত অধৈর্য্য হয়ে বৃদ্ধ তার স্বাভাবিক উগ্রতার সঙ্গে দিল গলা ছুটিয়ে। এতাদৃশ উৎকট বিস্ফোটনের পর আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

বৃদ্ধ গৃহ প্রবেশ করলো পূর্ণমাত্রায় জলজ্যান্তভাবে। তাব নালিশ আর তর্ক স্তম্ভিত হলো যখন তার নজরে পডলো যে গচ্ছিত দ্রব্য সামগ্রীর অনেক কিছু স্থান ভ্রষ্ট ও ভস্মীভূত। মায় ক্যাম্প খাটটি পর্য্যন্ত অন্তর্দ্ধান করেছে।

তার বয়সের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তখন সে চডে বসলো মেযে-জামাইর পালঙ্কে। দাবী করলো আহার্য্য ও পানীয়। খেতে খেতে আস্ফালন করে বল্লে, "মকদ্দমা করে দেখিয়ে দেবো জিনিষ নষ্ট কাকে বলে। জামাই বলে বেযাৎ করবো না।"

কন্যা সংবাদ পেযে ছুটে এলো। পিতাকে জীবিত দেখে ভয ও আনন্দে চীৎকার করে চেঁচিযে উঠলো। শিশুটি প্রাণিবিদ্যাতে ব্যুৎপত্তির অভাবে পিতামহের পুনরুজ্জীবন মেনে নিল নির্ব্বিবাদে। মানলো না কেবল আযা। সে বার বার শাসিযে নিলে যে যে-সংসারে লোকেরা মরার পর যখন তখন বেঁচে ওঠে সেখানে সে কাজ করবে না কখনই।

এতসব গণ্ডগোলের পর ন দিনের দিন হঠাৎ শব বহনের গাডী এসে উপস্থিত। দুধারে দুটি মশাল। কালো ঘোডার দু চোখে দুটি ঠুলি।

বৃদ্ধের জামাতা জানালার ধারে বসেছিল। সেই প্রথম দেখলো। বল্লে, "ঐ যে বাবা তোমার গাডী উপস্থিত।"

বৃদ্ধ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে বল্লে, "আমি এক পাও নডছি না, চুলোয যাক গাডী।" জানালা খুলে রাজপথের ওপর সশব্দে থু থু ফেলে ড্রাইভারকে বল্লে—"বেরো, পালা বলছি এক্ষুনি।" আরও বল্লে যে, পথচারীদের সামনে তার আর তার গাডীর ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি খাডা করে মানসিক পীডা দেবার কোন অধিকার নেই।

চালক সাদা কোটের ওপর হলুদ রঙের উঁচু হ্যাট পরে এসেছিল। দাঁডিযে দাঁডিয়ে ক্লান্ত হযে ওপরে উঠে এসে গালিগালাজ করতে সুরু করে দিল। বল্লে, "যা নিতে এসেছি তাই নিযে যাব, ঠাণ্ডায দাঁডিযে থাকতে পারবো না।"

অবশেষে ভাডাটিযা সকলে এক জোট হযে বৃদ্ধকে রক্ষা করতে এল। বেচারা ড্রাইভার ধাক্কার চোটে তার হলুদ রঙা টুপি সমেত গডিযে এসে পডলো পথের ওপর কিন্তু গেল না। অনেকক্ষণ ধরনা দিযে বল্লে, অন্ততঃ কিছু দক্ষিণা সে নেবেই আর তাছাডা তার রসিদ সই করিয়ে নিতে হবে। বৃদ্ধ যখন মরিয়া হযে গবাক্ষ পথে হাত পা ছুঁডে তর্জ্জন গর্জ্জন করতে লাগলো তখন সে গেল।

দিন কযেকের মত ব্যারাকটি অপেক্ষাকৃত নিঝুম হযে রইলো। তারপর প্রায একপক্ষকাল পরে বৃদ্ধের সত্য সত্যই মৃত্যু ঘটলো। সেবারে জানালার ধারে বসায হিম লেগেছিল।

অবশ্য প্রথমে কেহ বিশ্বাস করেনি। ভাবলে বুঝি পূর্ব্বের মত ধাপ্পাবাজী। কিন্তু এবার একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করে বল্লে, "হাঁ মৃত্যু নিঃসন্দেহ, ছলনা নয।"

প্রথমে হলো প্রবল বিশৃঙ্খলা ও ভীতির সূচনা। অনেকে ঘর বন্ধ করে বসে রইলো, বাকি সকলে যে যেখানে পারলে সরে পড়লো।

বৃদ্ধের কন্যা এবার আতঙ্কে এতখানি অভিভূত হয়ে গেল যে গাড়ীর কথা উত্থাপন পর্য্যন্ত করলে না। আযা ছেলেকে নিয়ে গেল গ্রামে চলে।

বেচাবি স্বামী, পরিবারের এই অসহায় কর্ত্তাটি, ভাবলো কোন রেষ্ট হাউসে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করবে।

এবার যদিচ গাড়ী এলো দ্বিতীয় দিনেই, অভাবিত তৎপরতার সঙ্গে, তথাপি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াব কিছুমাত্র বিপত্তি ঘটেনি।

আমরা কাজ সুরু করিয়াছি

শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়

ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটি হইতে ডাক আসিযাছে, কাজেই কযেকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইযা একদিন কমিটিব দপ্তবে হাজিব হইলাম। জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট—লালাজীর সহিত পরিচয পূর্ব্ব হইতেই ছিল। লালাজী হাসিযা আমাদের অভ্যর্থনা কবিলেন ও আমাদের নাকি ক্রমেই কিছু না করিযা চর্ব্বি স্ফীতি ঘটিতেছে এইরূপ মন্তব্য কবিযা বসিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—লালাজী এতদিন পরে আবাব ডাক কেন? লালাজী বিনা ভূমিকায কহিলেন—সব্জী মণ্ডীতে ছু'ছুটা কাপডেব কল, গোটা কযেক হোসিযাবী ও অন্যান্য ছোটখাটো ২।৪ টা কারখানাও তৈযারী হইয়াছে সম্প্রতি; বহু মজুরের বাস সব্জীমণ্ডীতে— অথচ সব্জীমণ্ডী ওযার্ড কংগ্রেস কমিটি নাম মাত্রই খাড়া আছে। ত্রিবর্ণ 'পতাকা সেই যে প্রতিষ্ঠার সময কেনা হইয়াছিল তাহাও নাকি এতাবৎ বদলানো হয় নাই। কাজেই সব্জীমণ্ডীতে মজুবদের সংঘবদ্ধ করিতে হইবে ও সব্জীমণ্ডী কংগ্রেস কমিটিকে নূতন করিযা গডিযা তুলিতে হইবে। লালাজী কিছু উপদেশও দিলেন ও প্রতিদিনকার কার্য্য কলাপের সহিত ডিষ্ট্রিক্ট অফিসের যোগাযোগ বাখিতে বলিযা সব্জীমণ্ডী ওযার্ড কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটাবীর নামে একখানি পত্র দিযা দিলেন।

কাজেই তল্পীতল্পা লইযা আমরা তিন জন বন্ধু সব্জীমণ্ডীতে আসিয়া আস্তানা লইলাম শেঠজীর ধর্ম্মশালায। সেই রাত্রেই পুলিস আসিযা খোঁজখবর লইযা গেল। ধর্ম্মশালার মুন্সী সেই রাত্রেই জানাইয়া দিল যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ম্মশালা ছাডিতে হইবে, কারণ পুলিসের ঠিক হুকুম না হইলেও একটা ঐরূপ ইঙ্গিত আছে।

ইয়াসীন বলিল, রাত্রিটা ত ঘুমিয়ে কাটা, সকালে যা হয় করা যাবে।

বাচ্চিরাম খাবার যোগাডে বাহির হইযা গেল। আমি ইযাসীনকে কহিলাম, ঘুমাবে ত তারি বন্দোবস্ত করি এসো। চার্‌-পাই কোথায়? হাক ডাকে মুন্সী আসিল—এক আনা ভাড়ায়

চার-পাই পাওয়া গেল। বাচ্চিরাম খাবার লইযা আসিল। আহারান্তে বিছানায শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম, মনের মধ্যে লালাজীর উপদেশগুলি ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।

* * * * * *

পান বিড়ির দোকানে কালীচরণের সহিত আলাপ হইল। সিগারেট কিনিতেছিলাম, সে জিজ্ঞাসা করিল, সহর থেকে এসেছেন বুঝি? হুঁ বলিলাম।

বাড়ী পেয়ে গেছেন বোধ হয়, সে আবার প্রশ্ন করিল। বলিলাম—হ্যাঁ। কোন ভাবনা নেই, ওরা আর আপনাদের নোটিশ দেবে না- কালীচরণ হাসিযা বলিল।

আমরা তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলাম। লোকটা আমাদের সম্বন্ধে এত খবর রাখে কেন?

* * * * * *

লালাজীর পত্র লইযা ওযার্ড কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম, ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলগাল নধর শরীর। চামড়ার চালানী কারবার করেন—নিজের মোটরকার আছে। সখ করিযা কংগ্রেসে নাম লিখাইযাছেন। ওযার্ডের পরিধি কতটা জিজ্ঞাসা করায হাঁ করিযা তাকাইযা রহিলেন। সব্জীমণ্ডীতে কত মজুরের বাস, মজুরদের সহিত ওযার্ড কংগ্রেসের যোগাযোগ কিরূপ, মজুর ইউনিযন আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নেরও ভাসাভাসা জবাব দিলেন। লালাজীর পত্রে যা ফল হইল তাহা সে রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। আমাদের তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিবেন সে প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

সব্জীমণ্ডী বাজার, মিল এরিযা, ভদ্রপল্লী সবটাই ঘোরাফেরা করিযা দেখিযা লইলাম। পূর্ব্বেও যে দেখি নাই তা নয। তবে এবার এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইযা আসিযাছি বলিযা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইযা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের তিনজনের ভদ্রচেহারা, পরিচ্ছন্ন পোষাক অনেকেই তাকাইযা দেখিতে লাগিল। হাতুড়ী কাস্তে আঁকা লাল পতাকা ও উর্দ্দু সাইন বোর্ডওলা (ইযাসীন পড়িযা বলিল—কাপড়া শ্রমজীবী সংঘ) বাড়ীর উপর তলায উঠিলাম। দরজা বন্ধ ছিল, হাঁক ডাকে একজন দরজা খুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি চাই? প্রযোজন বলিলাম। যে লোকের সন্ধানে আসিযাছি, শুনিলাম তাহাকে পাওযা মুস্কিল। ক্বচিৎ কখনও সে এখানে আসে। ভাবে বুঝিলাম—অফিসই আছে, লাল পতাকাই আছে—আর বিশেষ কিছুই নাই।

লালাজীকে পর পর কযটি পত্র দিযাছি—কাজ যে কিছু আগাইযাছে তাহা লিখিতে পারি নাই। ওয়ার্ড কংগ্রেসে বা শ্রমজীবী সংঘে কোন পাত্তাই পাই নাই। মজুর দেখিয়া, ভীড় দেখিযা, লোকদের সহিত কথা কহিবার, মিশিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কেন জানি তাহারা আমাদের এড়াইয়া গিয়াছে। মার্কস, লেনিন-এর দেওযা বিদ্যার বহর বহিয়াই শুধু বেড়াইয়াছি—লোকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া আমাদের চিনিল না।

কালীচরণের পান বিড়ির দোকানে দাঁড়াইয়া আমি, ইয়াসীন ও বাচ্চিরাম এই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছিলাম। কালীচরণ গায়ে পড়িয়া আবার আলাপ জুড়িল। বলিল—এইবার আপনারা চলে যাবেন নাকি?

ওর মুখের দিকে চাহিলাম। দেখি কৌতুকে ওর চোখ ছোট হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—কেন?

কালীচরণ কহিল—দেখলাম ত আপনারা ক'দিন ধরে ঘোরাফেরা করছেন অথচ কিছুই করে উঠতে পারছেন না—এসব কাজ আপনাদের মত ভদ্রলোকের ছেলেদের নয়—তাই বলছিলাম।

কালীচরণের কথা কেন জানি ভাল লাগিল না।

একদিন লালাজীর সহিত দেখা করিতে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসে পৌঁছিলাম। লালাজী সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। তারপর প্রতিটি খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের ব্যর্থতায় খুব একচোট হাসিয়া লইলেন। তারপর আমাদের গলদ কোথায় তা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। সেদিন লালাজীর সহিত বহুক্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়া আবার সব্জীমণ্ডী রওনা হইলাম।

এবার আমাদের ভোল কিছু বদলাইয়াছে। মজুর বস্তীতে ২ টাকায় একখানি ঘর ভাড়া লইয়াছি। সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছি। রিষ্ট ওয়াচ, সোনার চশমা, ফাউনটেন পেন বাক্স বন্দী করিতে হইয়াছে। শিখেদের হোটেলে সস্তার খানা খাওয়া সুরু করিয়াছি। বেশভূষা বা শরীরের রুক্ষতা এরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে আয়নায় নিজেদের চেনা যায় না। কালীচরণ অধিকাংশ সময়ই দোকান বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে ঘোরে। সে আর আপনি আজ্ঞে করিয়া কথা বলে না।

কিছুদিন পর লালাজীকে নিম্নরূপ রিপোর্ট পাঠাইতেছি:

লালাজী,

গত মাসে আপনাকে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছি সম্ভবতঃ তা আপনার ফাইলে আছে। আমাদের চতুর্থ মাসের রিপোর্টে আমরা কতদূর আগাইয়াছি এ পত্রে তাহাই সংক্ষেপে জানাইব। গত মাসে আমরা পাঁচটি সাধারণ সভা ও একটি কর্ম্মী সভার উদ্যোগ করিয়াছিলাম। ইয়াসীনের লেখা উর্দ্দু ও বাচ্চিরামের লেখা হিন্দী হ্যাণ্ডবিলে প্রচুর ফল পাইয়াছি। হ্যাণ্ডবিলগুলি তিনবার বিলি করার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। প্রথম কবে সভা হইবে--দ্বিতীয় কি বিষয়ে আলোচনা হইবে ও তৃতীয় মজুরদের মধ্যে যদি কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছুক ত সে যেন তৈরী হইয়া আসে এই বিষয়গুলি লিখিয়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়াছিলাম। হ্যাণ্ডবিল বিলির পরও লাউড্ স্পীকারের চোঙা মারফৎ সব্জীমণ্ডীর সমস্ত কোণে কোণে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলাম ইহাতে ফল হইয়াছে প্রচুর। প্রতি সভায় আমরা যথেষ্ট শ্রোতা পাইয়াছি। সভায় সাধারণ মজুরদের কয়েকজন বক্তৃতা দেওয়ায় মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

কর্ম্মীদের সভা করিযাছিলাম কংগ্রেস অফিসেই। পনের জনেরও অধিক কর্ম্মী আমাদের যোগাড হইয়াছে। চার আনা এককালীন চাঁদা থাকার জন্য ও মিলমালিকদের দলের লোকগুলি ওযার্ড কংগ্রেসের কার্য্যকবী সমিতির সভ্য থাকার জন্য কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা বাড়ানো মুস্কিলের ব্যাপার হইয়াছে। অথচ কাপডা-শ্রমজীবী সংঘে সভ্য সংখ্যা গত মাসে বহু বাডিয়াছে। কাপড়া শ্রমজীবী সংঘে আমরা মাসিক এক আনা চাঁদাব বন্দোবস্ত কবিযাছি।

একটা কথা ভাবিতেছি, হোসিযাবী মিলেব মজুবরা সকলেই কাপডা-শ্রমজীবী সংঘে যোগ দিয়াছে। আপনি জানেন এখানে কাপডের কল ও হোসিযারী কল ছাডাও অন্যান্য কারখানাব বহু মজুব বা মজুব শ্রেণীব লোক আছে। তাহাদেব সংঘবদ্ধ কবিযা আলাদা একটি শ্রমিক ইউনিযন গঠন কবিবার কথা আমাদেব গত কর্ম্মী সংঘে আলোচিত হইয়াছে। এ বিষযে ট্রে৬ ইউনিযন কংগ্রেসে পত্র দিযাছি। আপনি আপনাব মতামত জানাইবেন।

পুলিসের যাতাযাত আজকাল একটু বাডিযাছে। গত মঙ্গলবাব আমাদেব সংঘ অফিস সার্চ্চ হইযা গিযাছে। কযেককপি—'ন্যাশানাল ফ্রন্ট', 'কীর্ত্তিলেহাব', 'কযেদী' লইযা গিয়াছে। আর কিছু নয়—আমাদেব নিজের অবস্থার কথা আপনাকে কিছু জানাইব।

বাচ্চিরামেব ১১ পাউণ্ড ওজন কমিযা যাওযায সে পালাই পালাই করিতেছে। ইযাসীন কিছুদিন হইল বক্ত আমাশায ভুগিতেছে। তাহাব বাডী হইতে আত্মীযস্বজন আসিয়াছিল তাহাকে লইযা যাইবার জন্য। ইযাসীন যায নাই—সে তাব সখেব দামী বিষ্টওযাচটি ফিরত পাঠাইযাছে। আমাব ওজন কমিযাছে তাহাতে দুঃখ নাই তবে 'মঞ্জু' আসিযা মত প্রকাশ করিযা গিয়াছে যে আমাব নাকি গায়ের বং যথেষ্ট মযলা হইযা গিযাছে। আব মা, 'মঞ্জু'ব মুখে শুনিলাম, আমি বিগডাইযা গিযাছি ভাবিযা মেযে দেখা সুরু কবিযাছেন।

মোটেব উপর ভালই আছি।

পথের কাঁটা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

"শুভ্রেন্দুর ডায়রী"

বিয়ে করে এসেছি। কেমন করে যে কি হোল, এখনও আমি মাথা ঠিক করে ভাবতে পারছিনে! বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের প্রায় সব অঙ্গ শেষ করে এসেছি। এক এক করে সব আমার চোখের উপরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, অথচ তার কোন কিছুর সঙ্গেই আমার মনের কিছুমাত্র যোগ ছিল না। সব কিছু এতই অবাস্তব, অনাবশ্যক, অপ্রীতিকর মনে হয়েছে যে কোন অনুষ্ঠানের সামান্য অংশও যখন আমাকে করতে হয়েছে, মনে মনে আমি প্রায় ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠেছি। তবু বাইরে কোন বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেইনি—একে একে সবই শেষ করে এসেছি নির্ব্বিবাদে।

অথচ এমন যে হবে, দুদিন পূর্ব্বে একথা কে বিশ্বাস করতে পারতো? এযে একান্ত অসম্ভব—এর কল্পনাও যে নিতান্ত হাস্যকর পাগলামী,—একথা প্রচার করতে আমার কণ্ঠই হয়তো সবার কণ্ঠ ছাড়িয়ে উপরে উঠতো। যারা আমায় জানে—আমার মতামতের খবর রাখে, তারা কি আজও একথা সহজে বিশ্বাস করতে পারবে? কতদিন আমি দম্ভ করে বলেছি ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচার করেছি যে—"বিয়ে সকলের জন্যে নয়। সংসারে সবাই যদি বিয়ে ক'রে এক একটা গাধাবোটের সঙ্গে নিজেকে শক্ত ক'রে বেঁধে নেয়, তবে সংসারে চলার পথ বাধা-সঙ্কুল হয়ে পড়বে—গতি রুদ্ধ হবে—উন্নতি কথার কথা মাত্র হয়ে থাকবে। সমাজের হিতের জন্য যাঁরা উচ্চতর কর্ত্তব্যকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছে, বিয়ে তাঁদের জন্য নয়। বিয়ে করা মানেই তাঁদের ব্রতচ্যুত হয়ে যাওয়া। সাধারণ লোক যেমন কোন উচ্চ চিন্তার ধার ধারে না—কোন রকমে দিন আনে দিন খায় ও আপন আপন ক্ষুদ্র সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আমরা সবাই যদি তেমনি এক একটি গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের সঙ্গে আপনাদিগকে বেঁধে রাখি তবে সংসারের বড় কাজ করবে কে? সংসারে অধিকাংশ লোকই বিয়ে-থা ক'রে সংসার করবে বটে, কিন্তু এমন লোকও থাকা চাই যারা আপনাদিগকে বিলিয়ে দেবে দেশের কাজে—যাদের প্রত্যেক চিন্তা ও কর্ম্মের মূল লক্ষ্য হবে দেশের কল্যাণ। বিশেষতঃ আজকালকার দুর্দ্দিনে যখন জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে দেশে স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই—পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, তখন দেশের কল্যাণের জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে এক একদল লোকের বিশেষ বিশেষ কাজের উপযুক্ত করে জীবনটাকে গড়ে তোলা চাই। যেমন আমরা করছি। আমাদের মত বিপ্লবী দেশের মুক্তিকামী লোকদের বিয়ে ক'রে ঘর সংসার করাতো দূরের কথা, যে কোন ত্যাগের জন্যেই প্রস্তুত হতে হবে। মনে রাখতে হবে—যে ব্রতের যে কথা।"

এমনিতর কথা আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে না শুনেছে আমার মুখ থেকে অসংখ্যবার। বিশেষতঃ যারা আমার জীবনপথের সঙ্গী—যাদের সঙ্গে এক নায়ে জায়গা নিয়েছি দুনিয়ার কর্ম্মসাগরে একসঙ্গে পাড়ি জমাবার আশায়, তাদের কাছে যে এসব কথা কতদিন কত রকম ক'রে কত উদ্দীপনার সঙ্গে বলেছি তা মনে করলেও আজ নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। চিরদিনের তরে আমার মাথা হেট হ'য়ে গেল সবার কাছে!

সত্যই অদৃষ্ট এবারে আমায় খুব এক পটকান দিয়েছে বটে। তা বলে অদৃষ্টের অন্ধশক্তির কাছে আমি হার মানব? তার চক্রান্তে পড়ে আমায় খানিকটা হাবুডুবু খেতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু আমায় অতলে ডুবিয়ে দেবে এমন শক্তি তার নেই। কে আমায় সংসারে বেঁধে রাখবে আমার জীবনের কাজ, কর্ম্ম, আদর্শ ভুলিয়ে? কে সে? চৌদ্দ-হাত-ঘোমটা-টানা, প্যান্‌-প্যান্‌-করে-নাকে কাঁদা, দশ-জনে-মিলে-ধরেবেঁধে-জোরকরে-গলায় গেঁথে-দেওয়া ছোট্ট একটা অবুঝ বাঙ্গালীমেয়ে? এ মেয়েটা কেমন, আমি অবিশ্যি তা দেখিনি। যখনি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে কোনো আচার অনুষ্ঠানের জন্যে, আমার গা গিন্‌ গিন্‌ করে উঠেছে—বিতৃষ্ণায় মন ভরে গিয়েছে। তাই চেয়ে দেখা তো দূরের কথা, এক একটা অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র আমি বাইরে চলে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচতুম। কিন্তু সে মেয়ে দেখতে যতই অপরূপ হোক না কেন, তার চোখে কতখানি মোহ আছে—মুখে কতখানি মধু আছে - দু'খানা সরু হাতে কতখানি বল আছে যে আমায় বেঁধে রাখবে, তা আমি দেখতে চাই।

আমি জানি যে এ বিয়ে আমায় বাঁধবে না—আমায় ঠেকাতে পারবে না। বিয়ে হয়েছে নাম মাত্র—মুহূর্ত্তের তরেও এ বিয়েকে আমি বিয়ে বলে গ্রহণ করিনি। এ কাজের কোনো দায়িত্ব, কোনো গুরুত্ব আমার মনের কোণেও স্থান পায়নি কখনও। আমার অমতে ও শত নিষেধ সত্ত্বেও যে বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে জুলুমের বোঝা বইবার আমার কোনো দায় নেই—কোনো গরজ নেই। দুই কুলের সবাই একথা জানে—সবাইকে এ কথা আমি স্পষ্ট করেই বলেছি আগে থেকেই।

কিন্তু আমার যারা সহযাত্রী, সতীর্থ তাদের আমি বোঝাবো কেমন করে? বিয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যাই ক'রে থাকি না কেন, আমার ব্রত যে অটুট, অব্যাহত, অমলিন আছে ও থাকবে, একথা আজ যদি তারা মানতে না চায়, তবে আমার কি বলবার থাকতে পারে? যা এতদিন স্বতঃসিদ্ধ ছিল, তা আজ আমায় প্রমাণ করে দেখাতে হবে—অথচ এ প্রমাণ তো একদিনে, দুদিনে, দু'বছরে, পাঁচবছরেও হবার নয়—দুনিয়া থেকে যখন বিদায়ের দিন আসবে, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তো এর প্রমাণ পূর্ণ হবে না। বহু-বাধা-বিপদ-সঙ্কুল দুরধিগম্য কর্ম্মক্ষেত্রে, যেখানে আদর্শ দেখিয়ে অন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়, সেখানে আমার কাজের পরিসর যে অনেকখানি ক্ষুদ্র হয়ে গেল, তা আমি কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবো?

তারপরে যে অবস্থায় পড়ে, যে ভাবে বিয়ে হয়েছে, তাও যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এই বিংশ শতাব্দীতে একথা কেউ কখনো শুনেছে,—না শুনে বিশ্বাস করতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা একটা ছেলেকে তার অমতে আগে থেকে কিছুমাত্র না বলে কয়ে, বিয়ের সময়ে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে? অথচ একথা সত্য—অতি সত্য। অবিশ্বাস করে কোন ফল নেই। সময়ে অসম্ভবও সম্ভব হয়—এমনি এ দুনিয়ার দুর্ভেদ্য রহস্য। অহঙ্কার ক'রে আমরা কত কথাই না বলি—কত বড়াই না করি! কিন্তু এবারে আমার যে বিষম শিক্ষা হয়েছে, তার গভীর দাগ সারা জীবনেও আর মুছবে না।

তপেনদার বিয়েতে গিয়েছি বরযাত্র হয়ে। তপেনদা আমার বড় জ্যেঠার বড় ছেলে। কনের বাপের বাড়ী থেকে প্রায় একমাইল দূরে আমাদের নৌকো এসে লেগেছে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে। এই মাইলখানেক পথ বর যাবে পাল্কীতে বাদ্য, বাজনার সঙ্গে, আর আমরা তার অনুগামী হব পায়ে হেটে, এই ছিল কথা।

নৌকো থেকে এসে দেখি, পাল্কী এসেছে দু'খানা। এক খানাতে তপেনদা' মাথায় শোলার টোপর পরে বসে আছে ও অন্যখানা খালি—শুধু আর একখানা শোলার টোপর সে খানা আগলে রয়েছে, যেন কার অপেক্ষায়। এমন সময়ে আমার বড়দাদা সামনে এসে বললেন—"খোকন তুই এই পাল্কীটাতে ওঠ, তোরও আজ বিয়ে—বাবা ঠিক ক'রে রেখেছিলেন আগে থেকে।" আমি চেয়ে দেখি, বাবাও দাঁড়িয়েছেন এসে একটু খানিক দূরে এবং আর যারা সঙ্গে এসেছে, সবাই এসে প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম। এমনটা যে কখনো সম্ভব হতে পারে, তা আমার সুদূর কল্পনারও অতীত। আমার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল "তার মানে?"

দাদা বললেন, "মানে আর কি? তুই এখন ওঠ তো পাল্কীতে, কাজ হয়ে যাক, সময় ত আর বেশী নেই, গোধূলি লগ্নেই শুভক্ষণ, তার পরে সব বুঝিয়ে বলব এখন।"

—"কি রকম? পেয়েছ কি তোমরা? না, আমাকে দিয়ে এসব চলবে না, কিছুতেই না।" এই বলে আমি রাগে ফুলতে ফুলতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফের নৌকোর ভিতরে ঢুকলুম।

তারপরে, চললো সাধাসাধি, অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশের পালা। বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেল, তবু আমায় কেউ রাগ মানাতে পারলে না। শুভকার্য্যে একটা মহা বিপর্য্যয় কাণ্ড বেধে গেল।

আমাকে বুঝাবার পালা চলতেই লাগলো। দুপুর রাতের পূর্ব্বে আর এক লগ্ন আছে তখন যাতে বিয়ে হয়, সেই জন্য সকলের পীড়াপীড়ি। কত লোকই যে এলো আর কত কথাই যে বলতে লাগলো, তার সীমা নেই। তারপরে এলেন মেয়ের মায়ের বাবা। তিনি ছিলেন এ বিয়ের ঘটক এবং কর্ম্মকর্ত্তাও বটে। তিনি বলতে লাগলেন,—

"বাবাজী! এত সাধাসাধি তবু তোমার মন টলেনা, মান ভাঙ্গেনা। এর পরে আবার যে পায়ে তেল দেবার কাব্য লিখবে—তাও আমি জানি। আমি বলছি, বিয়েটা একবার করেই দেখনা—পছন্দ যদি নাই হয়, তুমি তালাক দিও, আমিই না হয় তখন নিকে করে নেব। হা-হা-হা! বলবো কি তোমায় 'বাবাজী! রূপে গুণে এমন চমৎকার মেয়ে যে আমারই বিয়ে

ক'রে ঘরে রেখে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বড বেশী বুড়ো হয়ে গেছি কিনা—ও বেটি আমায় পছন্দ করে না। বলে "তুমি চুল-পাকা, দাঁত-নড়া কচি শিশুটি—তোমার মত অবোধ শিশুর অত আব্দার আমার সইবে না, বাপু।"—এমন গম্ভীর হয়ে বলে তুমি যদি দেখতে বাবাজী!—আমি তো হেসেই খুন।"

বুড়োর এই রহস্যালাপ আমার নেহাৎ অশোভন ও কুৎসিত বলে মনে হতে লাগলো। তাই আমি তাঁর একটা কথারও জবাব দিলুম না। কিন্তু তাঁর মুখে কথার স্রোত বয়েই চললো। কিছুক্ষণ পরে বুড়োর বোধ হয় হুঁস হল যে, কথার পালা এক তরফাই চলছে। তাই একটু খানি থেমে আবার বললেন—

"তুমি তো বাবাজী কিছুই বলছোনা—আমি একাই বকে বকে মরছি। তোমায় আগে থেকে জিজ্ঞেস করা হয়নি বলে তোমার রাগ হয়েছে। আচ্ছা, বেশ। সে রাগও তো তুমি দেখিয়েছ কম নয়। এক লগন পেরিয়ে গেছে—সব ব্যবস্থা উল্‌টে পাল্‌টে গিয়ে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়েছে। আর কি চাই? এইবারে উঠে এসো—কাজটা শেষ হয়ে যাক। তারপরে জিজ্ঞেস করারই বা কি আছে? কনের রূপগুণ—যা কিছু মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে, সব এ মেয়ের আছে। কোন বিষয়ে তার খুঁৎ ধরবার জো নেই—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। তোমার বাবা দেখে শুনে অত্যন্ত খুসি হয়ে নিজেই পছন্দ করেছেন। তোমার একমাত্র কথা হতে পারে এখন বিয়ে না ক'রে, আর দুদিন পরে পড়া শেষ ক'রে করবে। তাই যদি তোমার মনের কথা হয়, যতদিন খুসি থাকনা মেয়ে আমাদের এখানে। পরে যখন বিয়ের বয়স হয়েছে বলে তোমার মনে হবে, তখন না হয় নূতন ক'রে আবার একটা বিয়ের সমারোহ-ই করা যাবে। ইতিমধ্যে তুমি মনে করলেই পারবে যে তোমার বিয়ে হয়নি। আমরাও মনে করবো, ঘরের মেয়ে ঘরেই না হয় রইলো আরো কয়েক দিন।"

আমি হঠাৎ বলে উঠলুম—"কয়েক দিন নয়, চিরদিন।"

কথাটা শুনে বুড়ো যেন কেমন একটু খানিক থ' খেয়ে গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বললে—"তার মানে এতই রাগ হয়েছে যে এ মেয়েকে নিয়ে যে কখনো ঘর-সংসার করতে পারবে, এমন মনে হয় না, কিম্বা তা করতে তুমি কিছুতেই রাজী নও, এই তো? কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যতদূর আমরা জানি, তাতে তোমার মতো ছেলে যে এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করতে পারে, এতো আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

এই বলে বুড়ো ক্ষণেকের তরে কি ভাবলে। তারপরে সে অতিশয় গম্ভীর ভাবে ও প্রত্যেক কথাটার উপরে জোর দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—"বেশ তাই-ই হবে। আবশ্যক হয় মেয়ে চিরদিনই আমাদের এখানেই থেকে যাবে। তার অদৃষ্টে যদি তাই-ই থাকে, তবে তা খণ্ডাবার সাধ্য কারো নেই। তবু কুল-ইজ্জৎ রক্ষা হোক—মান-সম্মান বজায় থাক। ব্যাপার যতদূর গড়িয়েছে, তাতে এখন যদি এ বিয়ে না হয়, মেয়ের বাপের বংশেরও কলঙ্কের সীমা

থকেবে না—তোমাব বাবাও কোথাও মুখ দেখাতে পারবেন না। সমূহ তো বক্ষা হোক এখন, পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।”

এই বলে বুড়ো বাবাকে ডাকলে। বাবা নিকটেই ছিলেন। তিনিও অমনি নৌকোব ভিতবে এলেন। তাঁর সামনে আমি আব কোন কথা বলতে পারলুম না। যেমন ছিলুম, তেমনি চুপ করেই বসে বইলুম। বুড়ো বাবাকে বললেন—“এ বলছে, বিয়ে হলে মেয়েকে চিরকাল এখানেই রাখতে হবে। বেশ, আমি তাতেই স্বীকার। আবশ্যক হয তো তাই হবে। তবু বিয়ে এখন না হয়ে উপায় নেই। সময়ও আর বেশী নেই। আপনারা একটু তাড়াতাড়ি রওনা হবাব ব্যবস্থা করুন। আমি এখন চললুম—ওদিকে যাতে একটুও দেরী না হয়, তাব ব্যবস্থা ক’রে বাখিগে।”

বুড়ো তখুনি বেরিয়ে চলে গেলেন। বাবাও ডাক হাঁক করে সবাইকে সচল করে তুললেন। বুড়োব ফন্দি দেখে আমাব খুব বাগ হল। আমি যা বলেছি, কখনো বিয়ে করাব সর্ত্ত হিসাবে সে কথা বলিনি। কিন্তু সে সেই কথাটাই পেয়ে বসেছে। তারপরে তাব কথা শুনে স্পষ্টই মনে হ’ল যে বুড়ো ভেবেছে,—“বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ে দেখে ও আপনিই ভুলবে—কিছু ভাবনা করতে হবেনা”। আমারও যেন জিদ চেপে গেল। মনে মনে ভাবলুম—“আচ্ছা! হোক দেখি বিয়ে। মেয়েব রূপ নিয়ে বুড়োর এই বড়াই যদি না ভাঙ্গাতে পারি, তাব আমার নামই মিথ্যে। এদের যেমন অসৎ কর্ম্ম তেমনি তার বিপরীত ফল হওয়া চাই”।

এই হল বিয়েব ইতিহাস। কিন্তু রাগের বশে কি যে করে এসেছি—কোথাকাব জল যে কোথায় গিয়ে গড়াবে কিছুই ভাল ক’রে ভেবে উঠতে পাবছিনে।

(২)

“শোভার ডায়েরী”

“ভগবান! একি আমাব কপালে লিখেছিলে। এমন কেন হোলো! চিরকাল কত আদরে আহ্লাদে লালিত পালিত হয়েছি! পৃথিবী যেন স্নেহ-ভালবাসায়, আমোদে-আহ্লাদে পরিপূর্ণ ছিল। সেই আনন্দেব ভবা যখন আমাব পূর্ণ হতে চলেছে, তখন একি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

বিয়ে যে একটা কত বড় বিরাট বিপুল ব্যাপাব মেয়েদেব জীবনে, তা এইবাবে বুঝেছি। যখন থেকে শুনেছি যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখেরও বড় বেশী দেরী নাই, কি যে একটা অজানা আকাঙ্ক্ষা ও অপরিসীম ভয়ে প্রাণ সর্ব্বদা দুরু দুরু করত, তা আর বলতে পারিনে। অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা রহস্যের বিপুল আকর্ষণও তীব্র ভাবে জেগে থাকতো প্রাণের ভিতরে সব সময়ে। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরে এমন একটা ভীষণ কাঁপুনি উঠতো যে তখন আর কোনো কাজ করতে পারতুম না। কতদিন তো

খেতে বসে কিছুতেই খাবার গলা দিয়ে তল করতে না পেরে, উঠে যেতে বাধ্য হয়েছি, পায়খানায় যাবার অজুহাতে। অথচ কেউ যাতে কিছু না বুঝতে পারে, সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টার সীমা ছিলনা। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সব সময়েই মনে হোতো, সবাই বুঝি টের পেয়েছে এবং মনে মনে কত না জানি হাসছে। কি যে একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলতো দিন রাত মনের মধ্যে তা লিখতে পারলে সত্যই বুঝি একটা মহাভারত হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, পুলক-ত্রাস—যত রকমের বিরুদ্ধ ভাব অনুভাব মানুষের থাকতে পারে সব ভিড় করে দেখা দিত এই একটুখানি বুকের ভিতরে। যদিও তার ভিতরে একটা অনাস্বাদিত অমৃতের আভাস ও তার উন্মাদনা—পেয়েছি অথচ পাই নাই এমন একটা কি জানি কিসের অতি সুখকর মোহময় স্পর্শ না থাকতো তা হোলে হয়তো পাগল হয়েই যেতুম।

তারপরে এলো বিয়ের দিন। মনটা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। কেমন হয়ে গেলুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না। যে যা বলছে, তাই করে যাচ্ছি। কিন্তু আমার যেন কোন চেতনাই নাই, অথচ অজ্ঞান হইনি। চারিদিকে ধুমধাম—বাদ্য-বাজনা, কিন্তু আমার চেতনায় যেন কিছুই স্থান পায়না। মনটা এমন বিকল হয়ে গেছে, সে যেন কিছুই অনুভব করতে পারছে না। এ যেন সুখদুঃখের অতীত, এক নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থা আর কি।

সর্পস্পৃষ্টবৎ হঠাৎ জেগে উঠলুম তখন, যখন এই কথাটা কানে গেল—কে যেন বললে—"লগন তো প্রায় পেরিয়ে গেল—কি উপায় হবে এখন?" আমি চেয়ে দেখি, চারিদিকে সবারই মুখ বিষণ্ণ—একটা উদ্বেগ ও উত্তেজনার আভাস সকলেরই চোখে চোখে ফুটে রয়েছে। কে একজন জবাব দিলে—"তোর তা নিয়ে মাথা ব্যথা কি? চুপ কর না! বড় যাঁরা আছে তাঁরাই যা হয় ব্যবস্থা করছে। পরের লগ্নে বিয়ে হবে।" তারপরে সবাই চুপচাপ—কারো মুখে কোন কথা নাই। আমার বুকের ভিতরে আলোড়নের আর সীমা নাই। কিছু জানিনে—জানবার উপায়ও নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারছিনে, অথচ কেউ কিছু বলছেও না। আমি যে মানুষ—গাছ পাথর নই—আমারও অনুভব করবার শক্তি আছে এবং আর সকলের চাইতে আমারই যে জানবার দরকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—একথা তো কেউ ভেবে দেখেনা। কিন্তু কি আর করা। চুপ করে থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। কিন্তু সমস্ত মন নিরুদ্ধ ক'রে আমি তাঁকে কানের কাছে বসিয়ে রাখলুম যাতে একটা কথাও ফাঁক না যায়। তখন আর নূতন কিছু শুনতে পেলুম না। বুঝলুম একটা কিছু অনর্থ হয়েছে। তবে ভাবলুম যে লক্ষ কথা পূর্ণ না হলে তো বিয়ে হয় না। ঝগড়াঝাটি—অমনতর একটা কিছু হয়েই থাকে সব বিয়েতেই। এখানেও তেমনি কিছু একটা হয়ে থাকবে হয় তো।

তারপরে বিয়ে হোলো। পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়ে গেলেন। মাঝে মাঝে তিনি বলেছেন—"বলুন, আমি যা বলি।" উত্তরে শুধু দু'একটা হাঁ—হু শুনেছি। একবার শুধু বলতে শুনলুম—"আপনি পড়ে যান—আমার জোরে জোরে পড়বার দরকার নেই।" বলার ভঙ্গী ও গলার স্বর এতই

তীব্র ও রুক্ষ যে প্রত্যেক কথাটা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাকা হয়ে আমার বুকে বিঁধতে লাগলো। যখন শুভদৃষ্টির সময় এলো, আমি কত আগ্রহভবে তাকিয়ে রইলুম, কিন্তু সেদিক থেকে কোনো সাড়া পেলুম না—মাথা নীচু, চোখ নত হয়ে রইলো—একবার চেয়েও দেখলে না। আমার দেখে মনে হোলো, ও যেন আগুনের দীপ্তি, ছুঁলেই পুড়ে যাবো—ও সুধু দূর থেকে দেখবার, মুগ্ধ হবার—ছোঁবার নয়।

বিয়ের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানই এক এক করে শেষ হল বটে, কিন্তু সবই যেন নিতান্ত প্রাণহীন, যতটুকু নেহাৎ না হ'লে নয়, ঠিক ততটুকুতেই সব গিয়ে ঠেকল। কোথাও একটু হাসি নেই—একটা পরিহাস নেই—এতটুকু উচ্চ কণ্ঠ নেই। সবাই যেন হঠাৎ ওজন ক'রে কথা কইতে শিখেছে—সংযত সভ্যতার মাপকাঠিটা হাতে পেয়ে গেছে—গ্রাম্য রসিকতার সব কিছু বৈশিষ্ট্য টুক করে আপনা হ'তে খসে পড়েছে। যার তরে এতোদিন ধরে এতো আয়োজন, তার মুখে শব্দটী নেই—শরীরে মনে সাড়া নেই—জীবনের সমস্ত চাঞ্চল্য যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। সবকিছুই এমন অশোভন, অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো যে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। কি এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রাণের ভিতরে যে কেমন করতে লাগলো তা আর বলতে পারিনে।

তারপরে এলুম নূতন জায়গায় নূতন লোকের মাঝে। এখানকার এই বাড়ীই আমার সত্যিকারের আপন বাড়ী এবং এখানকার এই নূতন লোকেরাই আমার সবচেয়ে আপন জন—অন্ততঃ তাইতো হওয়া উচিত। সকলেরই নাকি তাই হয়—আমারই বা হবেনা কেন? বিশেষতঃ এখানকার সকলের কাছ থেকেই যথেষ্ট আদর যত্ন পেয়েছি—কারো বিরুদ্ধেই আমার কোনো নালিশ নেই। তা ছাড়া আমার ছোট ননদ লীলা প্রথম দিন থেকেই আমাকে যে কি চোখে দেখেছে, তা সে-ই জানে। যে কয়দিন সেখানে ছিলুম, বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে দিনরাত সে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। নূতন জায়গায় এসে পাছে আমার কোন অসুবিধা হয়, এই জন্য সে সর্ব্বদা আমায় আগলে থাকতো। আমার জন্য কি সে করবে তাই ভেবে যেন দিশা পেতো না—এমনি ভাবখানা নিয়ে সর্ব্বদা অস্থির হয়ে ফিরতো। আমার জন্যে সামান্য একটা কিছু করতে পেলেও সে খুসীতে গদোগদো হয়ে যেত। সত্যি সত্যিই তার সঙ্গে আমার একটা প্রগাঢ় ভাব জমে উঠেছিল।

কাজেই সে বাড়ী আমার সত্যি সত্যিই আপন বাড়ী হয়ে উঠতে কিছুই বাধা নেই। কেবল একটা কথা। যাঁর জন্যে সে বাড়ীতে আমার যা কিছু অধিকার, যাঁর সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আমার সকল সম্পর্ক সত্য হয়ে উঠবে, সে যদি আমার সঙ্গেই সকল সম্পর্কের বালাই ঘুচিয়ে দেয় তবে আমি কোন মুখে সেখানে গিয়ে দাঁড়াব? কোন জোরে আমি সেখানে গিয়ে আমার আপন জায়গাটি দখল করে বসব? যে আশ্রয় আমার সত্যিকারের আশ্রয় তা হারিয়ে ফেললে, সে বাড়ীর এতো দালান কোঠা আমায় কতটুকু আশ্রয়—কতখানি শান্তি দিতে পারবে?

আমি সে বাড়ীতে যাওয়ার পরে কয়দিন ধরে ধুমধাম খুবই হয়েছে। কিন্তু যাঁর জন্যে এতোসব, দ্বিতীয় দিনেই তাঁর আর দেখা নেই। সে বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছে। যে দু'দিন ছিল, তার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি একটি নিমেষের তরেও। প্রতি রাত কেঁদে কাটিয়েছি সবার অগোচরে। লীলা আমার পাশেই অঘোর নিদ্রায় অচেতন হয়ে থাকতো, আর আমি অঝোর নয়নে কেঁদে বুক ভাসাতুম।

আমি যখন সেখান থেকে চলে আসি, লীলা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—"বৌদি ভাই! তুমি আবার কবে আসবে। তুমি চলে গেলে বাড়ীটাই আমার খালি খালি লাগবে। সত্যিই আমার বড় কষ্ট হবে। তোমার আমাদের জন্য মায়া হয় না, ভাই?" তারপরে আবার বললে—"তোমায় একটা কথা বলি ভাই। কিছু মনে কোরোনা। দাদা যে এমনধারা সবাইকে দুঃখ দিবে, তা আমরা কেউ-ই ভাবতে পারিনি। দাদার স্বভাব চরিত্র, লেখাপড়া কোন দিক দিয়ে কোন খুঁৎ নেই। তবে জানো, ভাই? দাদা এখন বিয়ে করতে চায়নি—বিয়ের কথা তোমাদের ওখানে যাওয়ার আগে কেউ তাকে বলেও নি। আমরাও তো কিছুই জানতুম না। তাই দাদার রাগ হয়েছে। কিন্তু কদিন থাকবে রাগ।" লীলা হঠাৎ আমার মুখখানা দুই হাতে ধরে বললে—"এমন মুখখানা দেখলে রাগ থাকতে পারে? তুমি কিচ্ছু ভেবনা, ভাই। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এখন এখানে এসে লীলার সেই কথাটা মনে ক'রে, কবে তাঁর সেই দুদিন ফুরোবে, সেই প্রতীক্ষায় বসে আছি।

(৩)

"শুভ্রেন্দুর ডায়েরী"

যাক, বাঁচা গেল। যারা আমার জীবন-পথের সহযাত্রী—এক ব্রতে ব্রতী, বিয়ের পরে এই একটা বছরে. তারা সবাই বুঝেছে যে বিয়ে আমার জীবনে কোন বেখাপাত করতে পারে নি—আমি যেমন ছিলুম, তেমনি-ই আছি। আমাদের যিনি সবার বড়, সেই সমরদা-ও আজ সেই কথাই বললেন। শুনে আমার এত দিনের একটা মস্ত বড় বুকের বোঝা নেমে গেল। আর আমার কোন ভাবনা নেই। আমার এই একবৎসরের প্রাণপণ চেষ্টা, সত্যিই সার্থক হয়েছে এতোদিনে।

এই একটা বছর যে আমার কি করে কেটেছে, তা আর বলবার নয়। সব সময়ে মনে হোতো লোকে বুঝি আমায় কৃপার চক্ষে দেখছে, ভাবছে—"দু'দিন বড় বড় কথার চমক দেখিয়ে; লোকটা কেমন করে যে হঠাৎ নিভে গেল, ভাবলে দুঃখ হয়"। বন্ধুদের মধ্যে দুজনও পৃথকভাবে নিরিবিলি কথা বললে, মনে হোতো তারা বুঝি আমার কথাই আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে বড় রাগ হোতো। কিন্তু কার উপরে রাগ করবো? কখনো মনে হয়েছে বাবারই দোষ, কখনো ও পক্ষের সেই বুড়োকেই সব অনর্থের মূল মনে করে তার মুণ্ডপাত করেছি।

তারপরেই আবার ভেবেছি যে,—"আমিই বা কেন মরতে রাজী হ'য়ে গেলুম ওকাজ করতে! অন্যের উপরে ঝাল ঝাড়তে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকেই কেন এমন ক'রে কণ্টকসঙ্কুল করে তুললুম"? এই সব কথা ভেবে ভেবে এমন অস্থির হয়ে পড়তুম যে তখন নিজের মাংসই নিজে কামড়ে খেতে ইচ্ছা হোতো।

সময় সময় বন্ধুদের উপরেও মনটা খাপ্পা হয়ে যেত। ভাবতুম—"কেন তারা আমায় অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করবে? কেন? কি হয়েছে আমার? কোন্ কাজটা আমার অসাধ্য? এমন কোন্ বিপদ আছে, যার সম্মুখীন হওয়া তাদের পক্ষেই সহজ, তারা বিয়ে করেনি বলে, আর আমার পক্ষে নয়? হোক দেখি পরীক্ষা"? কিন্তু আমার এ বৃথা আস্ফালন—শুধু হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ছাড়া এর কোন অর্থ নেই। আমার কথার জবাব দিতে তো কেউ নেই। শুধু নিজের মনে প্রশ্ন করে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করাই সার। নিজের মনের গোপন জ্বালা কাউকে বলবার নয় বলেই তা এমন তীব্র হয়ে বুকে বাজতো।

বন্ধুদের মনে আমার প্রতি হয়তো কোন অবিশ্বাসই ছিল না। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করতে আমি মনে ভরসা পেতুম না। ভাবতুম—"তা-ও কি সম্ভব? আমিই তো কত সময় বলেছি যে এদেশে বিয়ের সময় সবাই খুব পিতৃভক্ত—একান্ত সুবোধ ছেলে। দু'দিন পরেই আবার যেই সিঙ্গি সেই সিঙ্গি"। এখন তো এই কথাটা আমাকেই আবার ফিরিয়ে বলতে পারে সবাই এবং কেনই বা বলবে না? তারা বলতে পারে—"তোমার মতো অমন মুখেন মারিতং জগৎ সবাই করে—তারপরে আবার ঠেলায় পড়ে সবাই ঠাণ্ডা হয়। সবাই যা করে তুমিও তাই করেছ। আমরা যদি বেশী কিছু আশা করে থাকি, আমাদেরই সেটা ভুল।" এর জবাবে আমার কি বলার আছে?

এমনিতর চিন্তা সব সময়ে আমার মনের পেছনে ভূতের মতো লেগে থাকত। আর এই ভয় হয়েছিল যে পাছে আমার সতীর্থেরা আমায় অযোগ্য মনে ক'রে অধিকতর দায়িত্বের ভার আমার উপরে না দেয়—পাছে আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের পথে এই নামমাত্র বিয়েটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মনে এই দ্বিধা ও অস্বস্তির ফলে সংঘের কাজে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফলে আমার উপরে কাজের চাপও ক্রমে বেড়ে যেতে লাগলো। কাজ আপনা থেকে যে ঘাড় পেতে নেয়; তার ঘাড়েই বেশী করে চাপে। এইটেই সংসারের নিয়ম। আমার বেলাতেও সে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হল না। আমি নিজেও সেইটেই চেয়েছিলাম। ক্রমে সংঘের কাজে আমার বুদ্ধি, পরামর্শ ও পরিশ্রম সবারই বিবেচনায় প্রায় অপরিহার্য্য হয়ে উঠলো এবং আমিও আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে মনের প্রত্যয় ও আস্থা ফিরিয়ে পেতে লাগলুম। আজ আমি একেবারে নিঃসংশয় হয়েছি। নিজের মনেও আর কোনো দ্বিধা নেই—বাইরেও কোনো বাধা নেই।

এতদিনে অন্যেরাও বুঝে নিয়েছে যে আমার যে কথা, সেই কাজ। বুড়ো ভেবেছিল, তাদের মেয়ের রূপ দেখেই আমি ভুলে যাবো। ভেবেছিল, আর দশজনে যা করে, আমিও তাই করবো। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যার সঙ্গে একবার জড়িয়ে গেছি, তাকে নিয়েই মজে থাকবো।

এইবার বুড়ো বেশ করেই বুঝেছে যে আর দশজনের সঙ্গে আমার তুলনা নয়—একটুখানি অসাধারণত্ব আছে আমার ভিতরে, যার ফলে আমার জীবনের গতিটাই একটুখানিক পৃথক হয়েছে আর সকলের চাইতে। এই একটুখানি অনন্যসাধারণত্বে বিশ্বাস আমার চিরকালই আছে এবং সেই বিশ্বাসই নানা বিপদ-বাধা-বিপত্তির মাঝে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে।

কিন্তু বুড়ো তার সংসারের অভিজ্ঞতার অহঙ্কারে বড় বড়াই করতে এসেছিল। কেমন, এখন হোলো তো, বুড়ো! —ভাঙলো তো বড়াই? করবে না এখন নিকা? হা হা-হা!

যাক গে, বেশী হাসা ভাল নয়। তাদের পরে আমার আর রাগ পোষণ করাও উচিত নয়। কেন না, বেশী দূর গেলে, তার ফলে আবার হঠাৎ একদিন উল্‌টো উৎপত্তিও হ'তে পারে। বুড়ো যা মনে করেই যা করুক না কেন, আমার তো কোন ক্ষতি করতে পারে নি—যা আমার পথের কাঁটা হতে পারতো, তাকে এক মুহূর্ত্তও পথে দাঁড়াতে দেইনি। তবে আর কি? বরং আমি এখন তাদের সঙ্গে সহানুভূতি করতেও পারি। সত্যি, আমি যতই হাসি না কেন, তাদের একটা খুবই দুঃখের দিক আছে। আমি যখন হাসছি, সেই সময় হয়তো আর একজন অন্য কিছু করছে—যা ঠিক হাসি নয় বরং তার উল্‌টোটাই।—দূর ছাই! এ আবার আমি কি ভাবছি! সহানুভূতি করতে হবে বলে, এতটাও আবার ভালো নয়। মরুকগে, তাদের ব্যাপার তারা বুঝবে,—আমার কি?

(৪)

"শোভার ডায়েরী"

লীলার দু'দিন কি আর ফুরোবে না? আমি আশায় বুক বেঁধে আকাশের পানে চেয়ে আছি, কবে সে দু'দিনের মেয়াদ কেটে গিয়ে দিগন্তের কোণে নূতন দিনের আলোর আভাস ফুটে উঠবে। কিন্তু যতই চেয়ে দেখি, আকাশ আমায় শুধু তার নীল বুকের বিরাট অন্ধকারের পানেই ইঙ্গিত করে। তার সে ইঙ্গিত আমার প্রাণে বেসুরা বাজে—চোখ ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে। আমি সভয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে মনের কোনে আলোর সন্ধানে নিমগ্ন হই। কিন্তু সেখানেও কালো কালো জমাট-বাঁধা অন্ধকার এমন ভিড় করে আছে যে তা ঠেলে পথের ঠিকানা খুঁজে পাইনে। তবু এ কথা ভুলতে পারিনে মুহূর্ত্তের তরেও যে, সবে মাত্র জীবন সুরু করেছি—দুনিয়ার রূপ-রসের দূর থেকে আভাস পেয়েছি মাত্র—এখনো তার স্বাদ কেমন জানিনে। তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সবাই তো আকণ্ঠ পান করছে—শুধু আমারি কি তাতে কোন অধিকার নেই? আমার এই কচি বুকে যে বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গ তুলছে, তার কি কোন অর্থ নেই?

তাই এখনো আশায় বুক বেঁধে আছি। কিন্তু লীলার দু'দিনের মেয়াদ যে ক্রমেই দীর্ঘ—দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। এমন করে যে আর দিন কাটে না। আমি যেখানে যাই, একটা বিষাদিগন্ধী বিষাক্ত হাওয়া সেখানকার আকাশ বাতাস কলুষিত ক'রে তোলে। মা বাবার মনে শান্তি নেই—

ঠাকুর্দ্দার সকৌতুক হাসি ও অকারণ দুরন্তপনার ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে তারা সহজভাবে মিশবার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। আমার শৈশবের লীলা-নিকেতন গাঁয়েব বাড়ীতে যখন ফিবে আসি, কারো সঙ্গে মিশতে পাবিনে। ভয় হয পাছে কেউ সহানুভূতি বশে এমন কোনো প্রশ্ন কবে বসে, যার জবাব দিতে যাওয়া মৃত্যুব চেযেও কষ্টকর। শৈশবের যারা খেলার সাথী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাদের কাছে যেতেও সাহস হয না, পাছে তারা আমাব মনের গভীর গোপন সঞ্চিত দুঃখের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে এসে অনভিপ্রাযে আমার অপমানেব ভরা আবো বোঝাই কবে তোলে। ফলে আমি আপনাকে নিযে পালিযে পালিযে ফিবি আব ছাপা লেখাব বিরাট সমুদ্রেব মাঝে আমার আমিত্বের ভাবী বোঝাটাকে হারিযে ফেলতে পাবি কিনা তার চেষ্টা দেখি।

এখন বই-ই আমাব একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু বইব শুক্‌নো পাতার ভিতরে যে এমন এক বহু-বিচিত্র অপূর্ব্ব জগৎ প্রসাবিত, তা কে জানতো? সম্বল-হীন জীবনের শূন্যতার মাঝে অকস্মাৎ এই জগতেব সন্ধান পেযে আমাব আব বিস্ময়েব সীমা নেই। এই জগতের অগণিত লোক অকৃপণ হয়ে আমায় অযাচিত অফুরন্ত সঙ্গ দান করে—তাদের সুখদুঃখ, স্নেহ-ভালোবাসা, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভক্তি বিশ্বাসের অসংখ্য কাহিনী কত বকম ক'বে বিনিযে বিনিযে বলে' আমায সান্ত্বনা দেয—আমাব জীবনের প্রবাহ সচল সবল বাখে। সত্যই এব ভিতবে যে এমন এক অদ্ভুত অমৃত-বস আছে, যা শূন্য শুষ্ক জীবনে অনেকখানি সবসতা এনে দিতে পাবে, তাতে আব কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে আমাদের সমাজে মেযে হযে জন্মাবার ফলে এমন শিক্ষা আমি পাইনি, যাতেকবে এই জগতেব মণিবত্ন আহবণ করে নিজেব শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কবে নিতে পাবি। তাই পুঁথিব জগতেব এই অপবিমেয অজস্র দান সহজ কবে বইবাব শক্তি আমাব নেই। তা নিযে সমযটা কোন রকমে কেটে যায বটে। কিন্তু জীবনে যে মস্তবড শূন্যতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তা ভবিযে তুলতে পারিনে। এক একসময় আসে, যখনই এরা আমায় কোনো সঙ্গই দিতে পাবে না—দারুণ একাকীত্বের বোঝা আমায় পিষে ফেলবাব আযোজন করে। মন তখন আকাশ-কুসুম নিযে হাব গাঁথতে বসে কিম্বা' অবুঝ হযে আলেযাব পিছনে ছোটে।

আজ এমনি কবে আমার দিন কাটে বাল্যের সেই লীলা-নিকেতনে, শৈশবের সুখ-স্বর্গে। জীবনের প্রভাতবেলায কত রঙীন আশা এই কচি বুকের পরতে পরতে কত সোণার স্বপন যে ফুটিযে তুলতো, তার সীমা ছিল না। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই সে স্বপনের নেশা ছুটে গেছে। এই তো বয়স—এখনো অবোধ বালিকা—সংসাবের কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই। অথচ সামনে এখনো সুদীর্ঘ জীবন পড়ে রযেছে—একথা ভাবতে বুক আমার শুকিয়ে ওঠে। এখন যে জীবন চলছে এই যদি এর সত্য স্বরূপ হয, তবে এ আমি আর দুদিনের তরেও চাইনে। এখনো আশার ছলনায় মন ভুলতে চায়—স্বপন ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না। এ সবই হয়তো বয়সের ধর্ম্ম শুধু, কিন্তু তাইতেই এখনো বেঁচে আছি।

লীলাকে লিখেছি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে। বহুদিন এখানে এসেছি। কিন্তু আমাকে

প্রয়োজন কারোরই নেই—তাই আমার ডাক পড়ে না কোনোদিন। তবু আমার একক জীবনের দিনগুলি সেখানেই কাটে ভালো। সেখানকার বৃহৎ সংসারে কাজের অন্ত নেই। প্রত্যহ দিনের সবগুলি নিমেষ তা দিয়ে শক্ত করে ঠেসে ভরে দিয়েও আরো উপচে পড়ে। দিনের পর দিন এই খেলা নিয়েই আমার কাটে এবং তাতেই মেলে আমার প্রতিদিনের মুক্তি এই দুর্ব্বহ জীবনের রাক্ষুসে কবল থেকে। আর আছে সেখানে লীলা - যে আমার জীবনে একমাত্র সুধা-নির্ঝরিণী। এই রক্ত-মাংসের দেহটার একটা বিশ্বগ্রাসী বিপুল স্নেহের বুভুক্ষা আছে। তার তীব্র জ্বালা এই ক্ষুদ্র বুকখানার ভিতরে অনির্ব্বাণ হয়ে জ্বলছে। তবুও যে পুড়ে এখনো ছাই হয়ে যায়নি, তা লীলা তার আপন প্রাণের সরসতা দিয়ে খানিকটা সবুজ সেখানে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে'। তার বিভোল দৃষ্টি, প্রাণ জুড়ানো ভাষা ও মোহময় স্পর্শ এখনো আমার প্রাণে জাগিয়ে রেখেছে এই দৃশ্যমান জগতের বিপুল আবেদনের বাস্তবতার অনুভূতি। তাই আমার এ বিশ্বাস এখনো অটুট আছে যে যা কিছু দেখছি, সব স্বপ্ন নয়—মায়া নয়—কল্পনা নয়। আমিও এ বিশ্বে দশজনের একজন। আমারও এখানে দাবী আছে—অধিকার আছে—দেবার আছে—নেবার আছে। আমার আমিত্বেরও একটা সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা আছে।

কিন্তু মনের মাঝে মন আমার গুমরে মরছে এই দেখে যে, মন যতই সজাগ হয়ে উঠছে জীবনের সার্থকতার পথে বাধাবিঘ্ন ততই নিবিড় হয়ে আসছে। দিনে দিনে কিম্ভূতকিমাকার কত নূতন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এসে দেখা দিচ্ছে, দেখে অবাক হয়ে যাই। এতোদিন এরা কোথায় লুকিয়েছিল, কে জানে। কিম্বা এখন যেমন দেখছি, চিরদিনই এরা এম্‌নিই ছিল—আমিই শুধু এতোদিন দেখতে পাইনি, আনন্দময় নবীন প্রাণের সুতীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল বলে'। আজ যবে আমার সে ধাঁধাঁ আপনি কেটে গেছে, তখন তারা স্ব স্বরূপে ভেসে উঠেছে আমার চোখে এবং চারিদিক থেকে ঘিরে ভয় দেখাচ্ছে চোখ রাঙিয়ে। তারা তাদের দিন পেয়েছে। কিন্তু আমি যে বড় অসহায়। আর একজনের সাহচর্য্য না পেলে এই দুর্গম সংসারে একলা চলার মূলধন আমার কই? এর যে কোনো প্রয়োজন আছে, তা না জানতুম নিজে, না কেউ বলেছে কোনদিন। গতানুগতিকতার অন্ধতার ভিতর দিয়ে কেটে গেছে জীবনের সেই নবীন দিনগুলি, যখন এর কোনো একটা ব্যবস্থা হলেও হ'তে পারতো। আজ তা নিয়ে পরিতাপ করে' বা নালিশ জানিয়ে কোনো লাভ নেই জানি। শুধু এই ভাবি যে আমাদের এই দেশে কেন এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা—কেন নারী এমন অসহায়। দুনিয়ার আর কোথাও কি জীবনের ধারা এমনি ক'রে বয়? কে জানে।

— — —

আগ্নেয়গিরি

শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

আগ্নেয়গিরির বুকে অনেক কালের ষড়যন্ত্র ছিলো বিস্ফোরণের,
মুক্তির প্রথম মুহূর্তে দেখলে খোলা আকাশ আর
প্রশান্ত ক্ষমা : সীমা নেই,—
সূর্যের তীক্ষ্ণতায় সুন্দর ও সত্যের ইংগিত,
আগ্নেয়গিরি আনন্দে অশান্ত হলো।

প্রথম বিদ্রোহের অন্তরালে এত যে অনেক
অনেক চাপাকান্নার করুণ ক্লান্তি এবং
শ্বাসরোধী দিনের পর দিনের ইতিহাস
আগ্নেয়গিরি প্রায় ভুলে গেলো,
আগ্নেয়গিরি অশান্ত হলো।

সেই আগ্নেয়গিরি, তুমি কি ঘুমিয়ে এখন?
ঘুমোলে কেন তুমি আগ্নেয়গিরি?
তবু তো তুমি কোনো কালের সভ্যতার স্বপ্ন দেখেচো :
দেখেচো, সার বেঁধে রাজপথে কতো ঘোড়সওয়ার চলেছিল
আর শীতের শাদা তুষারে তুরংগ ক্লান্ত হলো।

আগ্নেয়গিরি, তুমি শুনবে?
আজকের এক চাঁদের আকাশে অনেক তারা
মাটির মসৃণ জলে তারাদের ঝিকিমিকি বাসর,
স্বপ্নসর্বস্ব মানুষের দেহে মনে মৌতাত :
তুমি বিদ্রোহ করো আগ্নেয়গিরি।

রাশিয়ায় পারিবারিক জীবন

শ্রীমতী মায়া ঘোষ

আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা রাশিয়াতে পারিবারিক জীবন (family life), বলে কিছুই নেই। এই family lifeএর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ সব দেশের লোকেরই আছে, আমাদের দেশের ত কথাই নেই। স্ত্রী-পুত্র পরিজন পরিবৃত এই জীবনটীর মূল্য আমাদের দেশের লোকের কাছে অনেকখানি, নিজে পেট ভরে খেতে পায় না যে লোক, সেও ব্যাকুল হয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করবার জন্য। কাজেই রাশিয়াতে পারিবারিক জীবন বলে' কিছুই নেই, ছেলেমেয়েরা ছোট থেকে মায়ের কাছে থাক্‌তে পায় না, স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা চালায় ইত্যাদি কল্পনা করে' আমাদের দেশের অনেকেই রাশিয়ার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন।

রাশিয়া আজ জগতের সামনে নূতন ছবি তুলে ধরছে। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে সব কিছুকেই নূতনভাবে গড়ে তুলছে। মানুষের পারিবারিক জীবনও সামাজিক জীবনের অন্তর্গত। সেইজন্য নূতন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরাতন পারিবারিক জীবনধারণ প্রণালীরও খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু তাতে তাদের কাছে পারিবারিক জীবনের মূল্য একতিলও কমে নি, বরঞ্চ বিপ্লবের আগে তাদের যে পারিবারিক জীবন নানা প্রকার দুঃখকষ্টে শুধু অশান্তিময় ছিল, আজ সমাজে, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নূতন বিধিব্যবস্থা অনুসার তাদের সে পারিবারিক জীবন চিরশান্তিময় হয়ে উঠেছে।

বিবাহ প্রথা সেখানে আছে। সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে ঘর-সংসার করে থাকে, আর মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বাইরের কাজে যেমন যোগ দেয়, তেমনি গৃহ-কর্ম্মেও তারা উদাসীন নয়। বিশেষ ক'রে সু-সন্তানের জননী হয়ে তাদের মাতৃত্বকে গৌরবময় ক'রে তোলাকেই তাদের নারীজীবনের চরম কর্ত্তব্য বলে মনে করে। হাজার হাজার সোভিয়েট মেয়ে আজ যেমন বাইরের কাজে দক্ষতা দেখিয়ে locomotive engineers, tractor drivers, industrial managers প্রভৃতির পদে নিযুক্ত হচ্ছে, ভিতরেও তেমনি সন্তান-পালন বিষয়ে তারা অপটু নয়, উদাসীন ত নয়ই। এ সম্পর্কে Valetina Grizodubova বলে মেয়েটীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাইরে তার পরিচয় একজন Pilot, ভিতরে সে স্নেহময়ী মা, সুসন্তানের জননী। সেখানকার মেয়েরা সন্তান-পালন বিষয়ে stateএর কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়ে থাকে। State জানে—children of to-day are the citizens of to-morrow, তারাই দেশের আশা-ভরসা, তাদের উপরই নির্ভর করছে তাদের দেশের ভালমন্দ, তাই এদের উপরেই stateএর নজর বেশী। এদের শিক্ষার জন্য kindergartens, nursery প্রভৃতি স্থাপন করেছে, যতরকমে এদের সুশিক্ষিত করা যায় তার ব্যবস্থা অবলম্বন

করেছে। শুধু এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেই state ক্ষান্ত নয়, এদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য, সঙ্গে সঙ্গে এদের মায়েদের প্রতিও stateএর সতর্ক দৃষ্টি। মা এবং ছেলেমেয়েদের জন্য state প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই ব্যয়ের পরিমাণও বেড়ে চলেছে national income বাড়ার সঙ্গে, গত ১৯২৯ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ যা ছিল ১৯৩৭ সালে প্রায় তার ৩ গুণ বেড়েছে। গত ৩ বছরের মধ্যে এই ব্যয়ের পরিমাণ ৩,০০০ লক্ষ Rubles.

পূর্ব্বে রাশিয়াতে শিশু মৃত্যু খুব বেশী ছিল, কিন্তু এখন state এ বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ভ্রূণহত্যা দমনের জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেছে। শিশু-চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে, maternity homes স্থাপন ক'রে, শিশু-মৃত্যু বন্ধ করেছে। রাশিয়ার জন্মহার সমস্ত দেশের চেয়ে এখন বেশী। প্রতিবছরেই লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু তাতে অন্ন-সমস্যা বেড়ে চলেনি। তার কারণ unequal distribution of wealth আর নেই। আর এই equal distribution of wealthএর দরুন বেকার সমস্যা, অন্ন-সমস্যার অবসান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া-পরার ভাবনাও মানুষের ঘুচে গেছে। তাই ব'লে অলসভাবে কেউ দিন কাটায় না। সকলেই কাজ করে, সকলেই খেতে পায়, আর কাজ করবার শক্তি না থাক্‌লে, নিজের অসামর্থ্যতার জন্য কারুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। তাকে প্রতিপালন করবার ভার stateএর।

রেনাসান্স

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

ইতিহাস ধারাবাহিক, ইহাকে অংশে অংশে বিভাগ করা স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য যুগপরম্পরার পার্থক্য নিরূপণ। সুতরাং রেনাসান্স যুগের স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে কনষ্টানটিনোপলের ভস্মরাশি খুঁজিয়া দেখিতে হইবে কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে রেনাসান্স যুগের একটা বিশাল পট-ভূমিকা আছে। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে আরিষ্টটলের অসাধারণ মনীষার দীপ্তি বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের উপর আলোকপাত করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্য প্লেটো দেখাইলেন যে বিজ্ঞান শক্তির ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন তথ্য আনিয়া দেয় বটে কিন্তু শক্তিই একমাত্র বস্তু নয়। শক্তির উপরেও চৈতন্য বলিয়া একটা বস্তু আছে। আমাদের মধ্যে যে খণ্ড-চৈতন্য আছে তাহার সহিত অসীম বিশ্ব-চৈতন্য ধারায় যোগ সাধন করিতে পারিলে চিত্তে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি হয়। এই আনন্দ বিকাশ লাভ করে সৌন্দর্য্য, প্রেম, বীর্য্য ও ত্যাগের মধ্যে। অসীমের, বৃহতের সাধনা ও তাহার উপলব্ধি মানুষের একমাত্র কাম্য।

আরিষ্টটল ও প্লেটোর জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা ক্ষণকালের জন্য পরিমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠে কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ইযোরোপ ও পশ্চিম এসিযার রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইযাছিল তাহার আবহাওযার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সতেজ লতাটি শীর্ণ হইযা গিযাছিল। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা সেমাইট্ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পশ্চিম এসিযায ও মিশরে আরব সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিল। অর্দ্ধ ইযোরোপ এবং সমগ্র পশ্চিম এসিযায মোগল আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কিন্তু দ্বাদশ শতকে আর্য্যসভ্যতা-সূর্য্য মেঘজাল ছিন্ন করিযা পুনবায় উদিত হইল। প্যারিস্ অক্সফোর্ড ও বোলোনার বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হইল। দর্শনচর্চ্চা হইতে লাগিল। তখনও আরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার একমাত্র বস্তু হইযাছিল। মধ্যযুগে পণ্ডিতেরা ধর্ম্মনীতির চুলচিরা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে ধারণ করিযা সেই অন্ধকার যুগের উষর ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। বিশ্বসংস্কৃতির যে ধারা আরিষ্টটলের প্রতিভা উৎস হইতে বহির্গত হইযাছিল, তাহাই বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে অনাগত কালের দিকে প্রবাহিত হইতেছিল। কলমুখরা নিঝরিণী কখনও বা লতাগুল্মঢাকা বনভূমির নিরালা অন্ধকারের মধ্য দিযা, কখনও বা কৃপণ মরুদেশের প্রান্ত চুম্বন করিযা, কখনও বা সমতল ভূমির সবুজ আস্তরণ ভেদ করিযা বহিযা চলে, বুদ্ধিমান মানুষের সন্ধানী চক্ষু তাহার বিপুলতায় বা শীর্ণতায প্রতারিত হয় না।

একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রযোদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পিটার আবিলার্ড, আলবার্টস্, ম্যাগনাস্, এবং টমাস একুইনাস্ ক্যাথলিক ধর্ম্মকে বিচার বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে ডনস্ স্কোটস্ এবং ওকাম আভিরোসের তর্কশাস্ত্র দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে সীমারেখা টানিযা দিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্য উচ্চতর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করিযা দিলেন। রোজার বেকন (ত্রযোদশ শতাব্দী) আজীবন উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা আপন সার্থকতায বঞ্চিত হইযাছিল। তিনি তাঁহার সময়ের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। সেই যুগের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সেই সময়ের লোকেরা রুদ্ধগৃহে আরাম কেদারায় বসিয়া আরিষ্টটলের পুস্তকের নীরস লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া জ্ঞানী সাজিত। দুঃখের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি আরিষ্টটলের সমস্ত পুস্তক পুড়াইয়া দিতাম। ঐ সকল পুস্তক পাঠে সময়ের অপব্যবহার হইতেছে, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইকালের লোকেরা আরিষ্টটলের পুস্তক পাঠ করিত না, তাঁহাকে পূজা করিত। রোজার বেকন উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, নিয়মের দাসত্ব ত্যাগ কর, ধর্ম্মের প্রভুত্ব মানিও না। জগতের দিকে তাকাও, সত্য দর্শন কর। তিনি বলিতেন, অজ্ঞানতার কারণ চারিটী, শক্তির পূজা, নিয়মের দাসত্ব, জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং শিক্ষা গ্রহণে মানসিক কাঠিন্য, এই চারিটী বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে মানুষ বিশ্বশক্তি রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবে।

ওকাস ও বোজার বেকন সত্য সাধনাব পথ উন্মুক্ত করিযাছিলেন। তাঁহারা নিয়ম ও আচারের বন্ধন মোচন করিবার মুক্তিব দূত স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইউরোপের অন্তরে বিজ্ঞান সাধনার বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে বস্তু লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অধিগত হইতেছিল, কিন্তু বিষয়ানুগ খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত হয় নাই।

আরবেরাই খণ্ডভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা ও ব্যক্তিগত নির্জ্জন গবেষণাও বৈদগ্ধ্যের ধারা ইয়োরোপে বাহিয়া আনিবার দূত ছিল, যাহারা বাস্তবতার দান স্বরূপ মাটী-পাথরকে সোনায় পরিণত করিবার দুরাশা হৃদযে পোষণ করিত, তাহাদেব নাম "আলকেমিষ্ট"। তাহারা প্রকৃতির অজানা রহস্যের সন্ধানে আত্মসমাহিত থাকিত, কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি সত্ত্বগুণাশ্রিত ছিল না। তাহারা বৈষয়িকবুদ্ধিব প্ররোচনায় শক্তিব উপাসনা করিত। তুচ্ছ বস্তুকে কি শক্তি প্রভাবে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা যায় এবং ক্ষণস্থায়ী নশ্বর মানবজীবনকে কোন মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রযোগে জরা মরণের অতীত অবস্থায লইযা যাইতে পারা যায, তাহারা এই স্বপ্নে বিভোর থাকিত। কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ রঞ্জন বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি অতি প্রযোজনীয নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাদের এইরূপ আলোচনা হইতে কাঁচের ব্যবহার, চক্ষুবিদ্যা সম্বন্ধীয যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উদ্দেশ্যবিহীন জ্ঞানচর্চ্চায মনেব প্রসারতা, হৃদযেব উদারতা আসে কিন্তু বিষয়বুদ্ধি প্রণোদিত হইলে তাহাতে একটা সাময়িক প্রযোজন সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞান সরস্বতীর রত্নবেদী রচিত হয না।

আলকেমিষ্টদের মত জ্যোতিব্বিদেরাও বস্তুতন্ত্রবাদী ছিল। তাহারা মানুষের ভাগ্যগণনার উদ্দেশ্যে নক্ষত্রবিদ্যার আলোচনা করিযাছিল। তাহাদেব জ্ঞানেব পরিধি স্বল্পপরিসব ছিল। যে উদারদৃষ্টি ও গভীব বিশ্বাস মানুষকে সত্যানুসন্ধান করিতে পরিচালিত করে, তাহার চিন্তাকে বহুমুখী করিয়া দেয়, তাহার প্রতিভাকে নূতন সৃষ্টিব আনন্দে পুলকিত করে—যে অনুসন্ধিৎসা তাহাকে বৈদগ্ধ্য রসিক করে, যাহার তাড়নায় সে জ্ঞানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার করে, অজানার পথে অগ্রসর হয়, সে উদারতা, সে আবেগ,—বেদনা ও চিন্তা সেকালের মানুষের মন আলোড়িত করে নাই।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান আমাদের বাহিরের পরিবেশকে অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় খাদ্যের ন্যায় একটী অপরিহার্য্য বস্তু। আমরা এক্ষণে যে বিজ্ঞানের বায়ুমণ্ডলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, আমাদের বাণিজ্য কৃষি শিল্প প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম, সেই বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছিল এই মধ্যযুগেব ধর্ম্মান্ধতার আলোবাতাসহীন পরিবেষ্টনের ভিতর। কিন্তু সেই যুগের দুর্য্যোগাচ্ছন্ন জন সমাজ এই বিজ্ঞান শিশুর ভবিষ্যত শক্তিমত্তায় অনভিজ্ঞ ছিল। একমাত্র চার্চ্চ বুঝিয়াছিল ইহার শক্তিসম্প্রসারণের সম্ভাবনা, ইহার ক্রমবর্দ্ধমান মানবত্বের উদ্বোধনী শক্তি। তাই সে চাহিয়াছিল কংসের ন্যায় বিজ্ঞানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নিরাপদে অজ্ঞানতার রাজ্যে একচ্ছত্রী সম্রাট্‌ হইয়া দণ্ডমুণ্ডের

বিধাতার স্থান গ্রহণ করিতে। চার্চ্চের পাণ্ডারা ধরিয়া লইয়াছিল যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পোপ এই আধিব্যাধি পীড়িত জীবজগতের ভগবৎনির্দ্দিষ্ট শাসনকর্ত্তা, সুতরাং শান্তিপরায়ণ মানুষের সুস্থ জীবনের শান্ত চিন্তাসমুদ্রে বিপরীত শিক্ষার বৈপ্লবিক উর্ম্মি উত্তোলন করা সমীচীন ও নিরাপদ নহে। গ্যালিলিও যখন স্বীকার করিয়া লইলেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে না, তখন চার্চ্চ সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু তাঁহার স্বীকারোক্তির মধ্যে পৃথিবীর গতিশীলতা প্রমাণিত হইয়া গেল।

পশ্চিম ইয়োরোপে জনমন জাগরণের ফলে একদিকে যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। দ্বিতীয় ফেডারিকের নেতৃত্বে ইতালীয় ভাষায় সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। ট্রুবেডরগণ প্রোভেন্স ও উত্তর ফ্রান্সের কবিতা, গান ও ছড়ায় কাব্য সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের উপায় বটে কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সাহিত্য স্রষ্টা সমাজের চিন্তাস্রোত, ভাবস্রোত ও প্রাণস্রোতের উৎস। সমাজ আবেষ্টনের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে বিভিন্ন সমাজে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই লোক-সাহিত্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

১২৬৫ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে দান্তে আলিঘিরির জন্ম হয়। রাজনৈতিক কারণে তিনি নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসন কালে তিনি ইতালির ভাষায় ডিভাইনা কমিডিয়া নামক এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই বিপুলায়তন মহাকাব্যে নরক প্রায়শ্চিত্তের স্থান ও স্বর্গের অভিজ্ঞতা কবি প্রাণবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের আওতায় বসিয়া তিনি কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গে পথপ্রদর্শক প্রথমে কিছুদূর পর্য্যন্ত অখৃষ্টান ভর্জ্জিল, কিন্তু শেষে সঙ্গিনী হইলেন বিয়েট্রিস্ নামক একজন খৃষ্টান রমণী। সাময়িকতার বন্ধন ও উগ্র ধর্ম্মভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। এইজন্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তাঁহার মহাকাব্যের মূল্য উচ্চ নয়। কিন্তু ডি মনার্কিয়া নামক পুস্তকে রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। টমাস্ একুইনাস্ বলিয়াছিলেন, পার্থিব বা রাষ্ট্রীক্ ব্যাপারে ভগবৎ শক্তি জনসাধারণের মধ্যে অভিব্যক্ত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার একমাত্র প্রতিনিধি পোপ। কিন্তু এই দুই শক্তির বিরোধের সময় পোপের বাণী বা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। দান্তের মতে জাগতিক ব্যাপারে পোপের কর্ত্তৃত্ব নাই, রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা। দান্তে বলিয়াছেন সাহসের প্রধান ও প্রয়োজনীয় বস্তু শান্তি, শান্তি জ্ঞানীর উচ্চতম চিন্তার অনুকূল। বিপদ ও যুদ্ধ দূর করিবার একমাত্র উপায় বিশ্বরাষ্ট্রগঠন, আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র ও সর্ব্বভৌম রাজশক্তির ধারণা প্রথমে তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। পেট্রার্কের (১৩০৪—১৩৭৪) চতুর্দ্দশপদী কবিতা এবং গীতি কবিতা ভাষার কমণীয়তায় ও ধ্বনি মাধুর্য্যে আদর্শ স্থানীয়। বাই আর্জো ও আরিষ্টো ইতালির কাব্যকুঞ্জে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডেও সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। জিওফ্রি চসার এই সাহিত্যিক অভীপ্সার পুরোধা ছিলেন। ইতালির আদর্শে সহজবোধ্য ভাষায় ছন্দোবন্ধে তিনি

সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চসার এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য প্রাচুর্য্যের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি স্বয়ং খাঁটী ইংরাজ ছিলেন এবং তিনি খাঁটী ইংরাজী ভাষার প্রথম কবি ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের নাড়ির গতি যথাযথ অনুভব করিয়াছিলেন এবং সুন্দর রসাল ভাষায় তৎকালীন সমাজের কাহিনী চিত্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন ছিল। তাঁহার কাব্যে ইংরাজ জীবনের প্রাণহীন ছবি ছিল না। তাঁহার চরিত্রগুলি যেন রক্তমাংসের মানুষ ছিল। লেখনীর একটী সামান্য আঁচড়ে তিনি মনুষ্য চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু মানুষের অন্তর্জ্জীবনে তাঁহার দৃষ্টি সুগভীর ছিল না। এইজন্য তাঁহার সাহিত্যিক রূপায়ন নিত্যকালের বস্তু হইয়া উঠে নাই।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টানটিনোপলের পতনের সময় ইয়োরোপে মানুষের মনে যে বেদনা ও অস্থিরতা এবং রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলতা ও ভাঙ্গাগড়া চলিতেছিল, তাহার মধ্যেই রেনাসান্স কুসুমটী বিকশিত হইয়া উঠিল। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ওলট-পালটের গভীর অন্ধকার হইতে ইয়োরোপের প্রাণশক্তি ও মননশক্তি মহান্ ছন্দে জাগিয়া উঠিল। কবিতার ঝঙ্কারে, দার্শনিক চিন্তায়, চিত্রকলার সৌন্দর্য্যে, নাটকের জীবন্ত আলেখ্যে, বিজ্ঞানের উন্মেষণী প্রতিভায়, এক কথায়, তাহার মনোজগতের সুবৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সর্ব্বভৌমিক, তাহা ভৌগলিক গণ্ডির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না স্বাধিকার প্রমত্ত হয় না।

ইতালির উদ্যানে জন্মলাভ করিলেও রেনাসান্সের মূলটী ছিল শত শত যুগ পূর্ব্বের গ্রীসের মৃত্তিকায়। ইহা গ্রীস্ হইতে সৌন্দর্য্যানুরাগ গ্রহণ করিল বটে কিন্তু গ্রীসের বর্হিমুখী রূপ কল্পনায় এমন একটী দিব্যভাবের আভাস পাওয়া যায় যাহা ইয়োরোপের রাজনীতির মধ্যে, সাহিত্যে ও শিল্পে সম্পূর্ণ নূতন। রেনাসান্স নগরের শিক্ষিত সমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা কৃষকের বাগিচায়, গ্রাম্য পথের প্রান্তে অযত্ন সম্ভূত বনফুলের ন্যায় আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে নাই—ইহা ছিল নগরের পরিশীলিত ব্যক্তির সযত্নবর্দ্ধিত উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুম। রেনাসান্স উত্তর ইতালির নগর সমূহের বিশেষতঃ ফ্লোরেন্সে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

ফ্লোরেন্স ছিল মধ্যযুগের ইয়োরোপের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বহু বিত্তশালী ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। এই নগরের শাসন প্রণালী প্রজাতান্ত্রিক ছিল, ইহার চঞ্চলচিত্ত নাগরিকগণ উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান ছিল বটে কিন্তু তাহারা অকারণে তাহদের গুণিব্যক্তি-গণের উপর অত্যাচার করিত। কুসীদজীবি, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিকব্যক্তিগণের লীলাস্থান এই ফ্লোরেন্স নগরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে বিখ্যাত কবি দান্তে, পেট্রার্ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ফ্লোরেন্স নগরই পঞ্চদশ শতকের শেষার্দ্ধে তিনটী মনীষীর জন্ম দিয়াছিল। লিওনার্ডো ডা ভিন্‌চি, মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফিল, এই তিনজনেই প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। লিওনার্ডো (১৪৫২—১৫১৯) একটী প্রথম শ্রেণীর অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দেহতত্ত্ববিৎ ও যন্ত্ররাজ ছিলেন। দার্শনিকের তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে তিনি দৃশ্য বস্তুর অন্তরনিহিত সত্য উদ্ঘাটন করিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণী শক্তি সাহায্যে

তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন মানুষের শিক্ষার জন্যই দয়াশীলা প্রকৃতি বাহ্যবস্তুর আবরণে আপনার মহিমা ঢাকিযা রাখেন। দেহের শিরা দিযা রক্ত সঞ্চালিত হয়, এই সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। মানুষের দেহ গঠনের সৌন্দর্য্যে তিনি মোহিত হইতেন। তিনি বলিতেন, যে সকল মানুষের অভ্যাস কদর্য্য ও বুদ্ধি অল্প, তাহাদের পক্ষে এইরূপ জটিল সূক্ষ্মবস্তুর সমবাযে গঠিত সুন্দর দেহযন্ত্রের অধিকারী হওয়া উচিত নয। তাহাদের দেহ খাদ্য গ্রহণ ও বাহির করিবার একটা চামড়ার নল ছাড়া কিছুই নয—তাহাদের দেহ খাদ্য গ্রহণ ও নির্গমনের একটা বৃহৎ থলি মাত্র, তিনি নিরামিষাশী ছিলেন ও প্রাণীদিগকে ভালবাসিতেন। বাজার হইতে খাঁচায আবদ্ধ পাখী কিনিয়া আনিযা তাহাকে ছাড়িযা দিযা আনন্দ পাইতেন। ডানার সাহায্যে পাখী আকাশে উড়ে, ইহা দেখিযা তিনি আবিষ্কার করিলেন, মানুষও আকাশে উড়িতে পারিবে। এই বিষয়ে তিনি অনেকটা সফলও হইযাছিলেন। তাঁহার এই চিন্তাও পরীক্ষাকে কার্য্যকরী করিযা তুলিতে আর কেহ চেষ্টা করিলে অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষ অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করিতে পারিত। অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। পরীক্ষাদ্বারা জিজ্ঞাসার উত্তর স্থির করিতে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। এই জন্য অনেকে বলিত, তাঁহার জীবন ছিল প্রকৃতির সহিত একটা একটানা সংলাপ।

র‍্যাফিল একজন অদ্বিতীয চিত্রকর ছিলেন, মাইকেল প্রতিভাবান ভাস্করও ছিলেন। প্রকাণ্ড নিরেট পাথর কুঁদিযা তিনি বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। স্থাপত্যেও তাঁহার মনীষা প্রথম শ্রেণীর ছিল। রোমের সেণ্ট পিটার্সবার্গ নামক বৃহৎ ও বিখ্যাত গির্জ্জা নির্ম্মাণে তাহার দান অল্প ছিল না। নব্বই বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল অন্তরের দিকে, বাহিরের দিকে নয়। তিনি বলিতেন, শিল্পীর হাত আঁকে না, আঁকে তার মগজ।

ক্রমশঃ

বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার অভিমুখে

শ্রীমানবেন্দ্র নাথ রায়

তিন

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বনিয়াদ হ'লো মজুরি-প্রথা। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে চাষী জমি থেকে ছাড়া পেল। বিশেষ কোন কোন স্থলে,—যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফ্রান্স অথবা বছর কুড়ি আগের রাশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ রাতারাতি হয় নি, সর্ব্বত্রই ক্রমে ক্রমে হয়েছে। বর্ত্তমান সভ্যতাও তাই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। নতুন রকমের যে সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে উঠলো তাতে চাষী আর জমীদারের জমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে বাধ্য রইল না। সে পেল 'স্বাধীনতা'—দিন-মজুরী করার স্বাধীনতা। এখন সে তার শ্রমশক্তি বাজারে বিক্রী করতে পারে। সামন্তপ্রথা যেখানেই বিপ্লবের সাহায্যে উচ্ছেদিত হয়নি সেখানেই চাষীর এই স্বাধীনতা ধীরে ধীরে এসেছে। ভূমিদাস প্রথা আইনতঃ হয়ত রহিত হতে পারে। কিন্তু নিছক আইনের দ্বারা কোণ বদ্ধমূল বিধিব্যবস্থা কদাচিৎ উচ্ছেদ করা যায়। ভূমিদাসকে রায়তের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায়, রায়ত শেষে ইচ্ছা করলে জমি ছেড়েও দিতে পারে। কিন্তু এই ছেড়ে দেওয়ার কাজটা আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধ্যতার ব্যাপার। কারণ যতদিন সে রায়ত থাকে ততদিন আইনসম্মত শোষণ তার ওপর চলতেই থাকে। বেআইনী আদায়ও নেহাৎ কম চলে না। ফলে ভূমিদাসের মতই তাকেও উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই জমীদারকে দিতে হয়। ভারতবর্ষে চাষীর অবস্থা আজো পর্য্যন্ত প্রধানতঃ এই। আমাদের দেশে এখনও জমিই হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান উপায়। জাতির আয়ের অধিকাংশই এখনও জমি থেকেই আসে। কিন্তু কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত সামান্য। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক রয়েছে। চাষী যদিও জমি ছেড়ে যেতে পারে, তবুও কার্য্যতঃ যাওয়া তারপক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ অন্যত্র তার শ্রমশক্তির বিশেষ কোন চাহিদা নেই। কৃষিজাত বস্তুর উদ্বৃত্ত অংশের প্রায় সবটাই জমীদার নিয়ে নেয়, অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যের বকেয়া শোধ করতে চলে যায়। ফলে জাতির আয়ের অতি সামান্য অংশই আধুনিক যুগোপযোগী কোন শিল্পাদিতে লাগান সম্ভব হয়। এই কারণে সভ্যতার বর্ত্তমান স্তরে ভারতবর্ষ চলেছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। আইনতঃ সামন্তপ্রথা ভারতবর্ষে বিশেষ কোথাও নেই। কিন্তু কার্য্যতঃ ভারতবর্ষীয় চাষীর অর্দ্ধেকই এখনও ভূমিদাসের অবস্থায়ই রয়ে গেছে। বাকী অর্দ্ধেকও—যারা রায়তোয়ারী ব্যবস্থার মধ্যে আছে—বিশেষ ভাল ভাবে নেই। সেখানে সরকারই জমীদার হওয়াতে খাজনা আর ট্যাক্স্ এক হয়ে গেছে। টাকাকড়ির দিক থেকে এতে কিছু পার্থক্য হয় নি—উদ্বৃত্ত উৎপন্নের প্রায় সবটাই যায় সরকারের তহ্‌বিলে। এই নিরন্ন কৃষিশ্রেণীর উপর বনিয়াদ ক'রে কোন বড় সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না, যদিও

এই চাষীরা ভূমিদাস নয়। অথচ এরাই সমাজের অধিকাংশ। যন্ত্রযুগের আগেও তাই ছিল। কার্য্যতঃ ভূমিদাসেরাই সমাজের বড অংশ হওয়াতে আমাদের দেশে এখনও বহুল পবিমাণে মধ্যযুগই রয়ে গেছে।

চাষী জমি থেকে সরে বাজারে তার শ্রমশক্তি বিক্রী করার স্বাধীনতা পাওয়াতে যন্ত্রশিল্পের খুব সুবিধা হোলো। যন্ত্রের মালিকেব পক্ষে ন্যূনতম মূল্যে শ্রম ক্রয় করা সম্ভব হোলো। যন্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতির আর একটা কারণ হোলো ব্যবসায়ী শ্রেণী, যারা কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ থেকে লাভ করে করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে রেখেছিল। সামন্ত ভূস্বামীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেই অবশ্য এ অর্থের উৎপত্তি। কিন্তু বণিকদেব এই সঞ্চিত অর্থ এই সময় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কাজে খাটান সম্ভব হোলো, এবং ক্রমশঃ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন সম্ভব হয়ে উঠলো। যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমেব উৎপাদক শক্তি বেড়ে গেল। শ্রমিকের ক্রমবিবর্দ্ধমান শ্রমশক্তি থেকে যে আয় হতে লাগল তার খুব সামান্য একটা অংশ ব্যয় কবেই শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদন ও বংশবক্ষার ব্যবস্থা কবা সম্ভব হয। বাকী সমস্ত অংশ যন্ত্রেব মালিকেব হাতে জমতে থাকে। যন্ত্রেব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্বৃত্তেব হারও বেড়ে চলে।

মূলধন

ধন ও মূলধন এক নয। ধন যখন উৎপাদনেব কাজে খাটান হয এমন ভাবে যে তার থেকে মুনফা আসে তখনই তাকে মূলধন বলে। প্রত্যেক ধনী লোকই পুঁজিদার নয। অপুঁজিদার ধনী লোক পরগাছার মত। অন্যের শ্রমার্জ্জিত ধনে বিলাসী জীবন যাপন করে, সামাজিক সম্পদে বা সমাজেব কল্যাণে তার কোনই দান নেই। পুঁজিদার প্রথমদিকে সমাজের একটি প্রযোজনীয অঙ্গ। এমনকি প্রথম প্রথম পুঁজিদাব নিজে ধনীলোক নাও হতে পারে, যদিও তার হাতে প্রভূত ধন সম্পত্তি সব সময মজুদ থাকতে পাবে। শ্রমিকেব উৎপাদিত ধনেব একটা অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করেই ক্রমে মূলধন বেড়ে যায। একজন মিস্ত্রী যখন দুই একজন শিক্ষানবিশ খাটিযে কাজ করে তখনও সে পুঁজিদার নয। পুঁজিদার হতে সুরু করেছে মাত্র। যখন সে এত বেশী সংখ্যায় মজুর খাটাচ্ছে যে তার নিজেব শ্রম সে সরিযে নিতে পাবে, তখনই সে দস্তুরমত পুঁজিদার। তখনও সে কিছুদিন সমাজেব পক্ষে প্রযোজনীয থাকতে পারে, যদি সে তত্ত্বাবধানের কাজ ইত্যাদি করে। ক্রমে একাজও মাইনে করা লোক দিযে করিযে নেওযা হয। আজকার দিনে পুঁজিদার সমাজে সর্ব্বময় কর্ত্তা, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে তার প্রযোজন ফুবিযে গেছে।

যে হেতু শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদন ও বংশবৃদ্ধির জন্য ছাড়া উদ্বৃত্ত সমস্ত অংশই মূলধনে জমা হয়, শ্রমের মূল্য যত কমে মূলধন বৃদ্ধিব হার তত বাড়ে। মজুরি হচ্ছে শ্রমের মূল্য। শ্রম যখন অন্য অন্য পণ্য বস্তুর মত বাজারে বিক্রী হতে আসে তখন অন্য অন্য পণ্যের মত এরও চাহিদা অনুসারে দাম হয়। পণ্যেব যোগান যদি বেশী হয় এবং চাহিদা কম হয় তবে তার দাম কমতে বাধ্য। এই জন্য পুঁজিদারেরা সামন্ত ভূস্বামীর কবল থেকে ভূমিদাসকে মুক্ত করতে সব সময ব্যগ্র। শ্রমের

যোগান বেড়ে যায়, কম দামে শ্রম কেনা যায়। ন্যূনতম মূল্যের শ্রম, যা মূলধনকে ফাঁপিয়ে তোলে, হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

শ্রম

প্রথম প্রথম মানুষ প্রকৃতিজাত বস্তুকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের কাজে লাগাবার জন্য শ্রম নিয়োগ করত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব শ্রমের এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে পরিবর্ত্তিত করেছে। শ্রমই কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি। কেউ নিজে যে জিনিষ তৈয়ার করে জিনিষটা তারই—এ খুব সোজা কথা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ তার নিজের পরিশ্রম দিয়ে কোন জিনিষ তৈয়ার করতে পারে, জিনিষের সেই মালিক। ক্রমে যন্ত্রের উদ্ভব হতে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে একজন মানুষ তার নিজের ব্যবহারের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত অনেক কিছু তৈয়ার করতে পারে। ঠিক সেই সব জিনিষ হয়ত অন্যেরা তৈয়ার করতে পারছে না, অন্ততঃ অনেকে পারছে না। অথচ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সে সব জিনিষ মানুষের প্রয়োজনে লাগে। তাদের চাহিদা আছে। শিল্পী সেই চাহিদা মেটায়, প্রথমে সোজাসুজি ভাবে সে এই সব জিনিষ বদল করে তার নিজের প্রয়োজনীয় অন্য সব জিনিষের পরিবর্ত্তে, পরে কোন নির্দ্দিষ্ট জিনিষ-এর বদলে, যা জিনিষ পত্র বদলের সর্ব্বসম্মত সূত্র হিসাবে ধরা হোতো। এই নির্দ্দিষ্ট জিনিষটিও প্রথমে ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্যই ছিল। কালক্রমে এটা একটা নিছক চিহ্নমাত্র হয়ে উঠলো, একটা সর্ব্ববাদীসম্মত মূল্য এর উপর আরোপ করা হোলো। শেষকালে এই জিনিষটিই হোলো টাকা, সাধারণের সম্মতিক্রমে যার একটা কাল্পনিক মূল্য আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এই মাত্র।

পণ্য

পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমজাত দ্রব্য পণ্য হয়ে উঠলো, পণ্যের বদলে কলের মালিক মুনফা করতে পারে, এই মুনফার একটা অংশ যায় বণ্টনের কাজে যারা আছে তাদের হাতে। উৎপাদন প্রায় তার আদিম অভিপ্রায় হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি উৎপাদকের লাভের জন্যও উৎপাদন হয় না। সমাজের প্রায় গোটা অংশের সমস্ত শ্রমশক্তি খাটিয়ে যে উৎপাদন হচ্ছে তার একমাত্র অভিপ্রায় মুষ্টিমেয় লোকের মুনফা যোগান, যদিও এরা উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আছে। পুঁজিতন্ত্রের এই হচ্ছে চরম পরিণতি। কিন্তু নিজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিতন্ত্র সমস্ত সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যায়, অর্থনৈতিক দিক থেকেই শুধু নয়, সংস্কৃতির দিক থেকেও। সভ্যতা পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে এক নয়, কিন্তু এক সঙ্গে চলেছে। বর্ত্তমান যন্ত্রশিল্পের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার নতুন অভিযান সুরু হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার পথে উন্নয়নের মস্তবড় সহায়ক, কারণ যন্ত্র মানুষের মুক্তিদাতা। কিন্তু পুঁজিতন্ত্র উন্নততর সমাজের মাত্র বনিয়াদ পত্তন করেছে। মানুষ যন্ত্র তৈয়ার করেছে, কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের আমলে মানুষ নিজে দাস হয়ে রয়েছে, যন্ত্রের নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার ফলে। মানুষ যখন তার সৃষ্ট যন্ত্রের প্রভু হবে তখনই সমাজ সভ্যতা উন্নততর স্তরে উন্নীত হবে। তখন সম্বন্ধ বদলে যাবে, মানুষ যন্ত্রের প্রভু, আবার যন্ত্রও মানুষের স্বাধীনতাকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে দিচ্ছে, এই ভাবে ক্রমে মানুষের অগ্রগতির একটা সীমাহীন প্রেক্ষা চখের সমুখে খুলে যাবে—শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি নয়, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিকও।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

শ্রীহেমন্ত কুমার তরফদার

গণতন্ত্রের স্বরূপ

গণতন্ত্রের জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধ, এ কথা গত কয় মাস ধরে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। মিত্রশক্তির অধীনস্থ দেশ ও উপনিবেশগুলার অনেকেই উত্তরে বলেছে যে, যদি সেই কথাই সত্য হয় তবে তাদের নিজ নিজ দেশে এখনই ত মিত্রশক্তি গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পাবে। আমেরিকা বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ, কিন্তু সেখানকার সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিরা ভারতবর্ষ প্রভৃতির এই দাবী একবাক্যে সমর্থন করেছে। এতে অধীন দেশ ও উপনিবেশদের মোটা রকম কিছু লাভ যে হয়েছে তা অবশ্য নয়, কিন্তু মোটের ওপর সর্ব্বসাধারণের কিঞ্চিৎ লাভ হয়েছে। লড়াই সুরু হয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বিবৃতিগুলি সম্বন্ধে লোকের মনে জাগতে সুরু করে। যথেষ্ট কড়াকড়ি সত্ত্বেও লোকের এই মনোভাব চেপে রাখা যাচ্ছে না, তাই গত কিছুদিন থেকে উক্ত বিবৃতিগুলির ভাষার চমৎকার একটু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। বর্ত্তমানে বলা হচ্ছে যে ইউরোপের রাষ্ট্রজীবনে decency অর্থাৎ শালীনতার পুনরুদ্ধার করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এবারে আশা করা যায় যে সমালোচকেরা নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হবেন। যতদিন গণতন্ত্রের কথা চলছিল ততদিন তাঁদের সমালোচনার সুযোগ ছিল, কারণ গণতন্ত্র যে রকমই হোক্ না কেন, তার একটা নিজস্ব রূপ আছে, একটা কাঠামো আছে যা চোখ চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়, আছে কি নেই তার প্রমাণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হয় না। কিন্তু 'ডিসেন্সী' হচ্ছে abstract নিরবয়ব সত্তা, নিরাকার ভগবানের মতই তার ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত রুচি ও সুবিধা অনুসারে করা যেতে পারে। অতএব যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ত্তমানের ঘোষণা অনিন্দনীয়। কিন্তু একদল সমালোচক আছে, তারা এতেও দম্‌ছে না। যুদ্ধের পর যে একটা সুবর্ণযুগ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার একটা মোটামুটি খসড়া তারা এখনই করে ফেলতে চায়। যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা বলছেন যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে জয়লাভ করা, পরের কথা পরে হলেও চলবে। সমালোচকরা বলছেন যে তা চলবে না, কারণ জয়লাভ যদিও করতেই হবে তবুও একথা ঠিক যে জয় পরাজয়ের এই সমস্যা মিত্রশক্তির স্বকীয় সৃষ্টি। জার্ম্মানি তাদের বিরুদ্ধে আগে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তারাই আগে জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেন করেছে, এ কথাটা চাপা রাখলে লোকে শুনবে না।

কিন্তু কার্য্যতঃ লোককে শুনতেই হচ্ছে। কারণ মনে যাই থাক্, প্রকাশ্যে সমালোচনা করার অধিকার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেও লোকের বিশেষ নেই। লড়াই সুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ফ্রান্সে সংবাদপত্রগুলির উপর অত্যন্ত কঠোর আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। বহু বড় বড় কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য এমন ভাবে কেটে দেওয়া হয় যে সম্পাদকীয় স্তম্ভ সময় সময় ফাঁকাই থেকে যায়; মাঝে মাঝে

অল্প কয়েকছত্র যা রেখে দেওয়া হয় তা প্রায় কিছু না রাখারই সামিল। ইংলণ্ডের অবস্থাও প্রায় তাই। সেখানে বর্ত্তমানে যুদ্ধ সম্বন্ধে গল্পগুজব করাটাও আইনের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। কাগজের ওপর কড়াকড়ি কি রকম চলছে, মাত্র একটা ঘটনা থেকেই তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে হোর-বেলিশার লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে প্রায় ৪৪ ছত্র কেটে প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হয়েছে। হোর-বেলিশা অল্পদিন পূর্ব্বেও সামরিক মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। তাঁর লেখার যদি এই অবস্থা হয় তবে সাধারণ সাংবাদিকদের অবস্থা কি হতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়।

এ রকম কড়াকড়ির স্বপক্ষে অবশ্য যুক্তি আছে। যুদ্ধ যখন হচ্ছেই, তখন যুদ্ধে জিততেই হবে, হার মানেই সর্ব্বনাশ। সেক্ষেত্রে সামরিক শক্তি কোন প্রকারেই এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখাই রণনীতি। অসতর্ক গল্পগুজব বা সংবাদপত্রের লেখায় জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'তে পারে বা যুদ্ধ-সজ্জার গোপন খবর শত্রুর কাণে যেতে পারে—তাই সাবধানতার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা হলে এটাও স্বীকার করতে হয় যে গণতন্ত্র বস্তুটাই আসলে একটা নিছক ধাপ্পা। যখনই সঙ্কট কাল উপস্থিত হবে তখনই যদি জনসাধারণের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তা হলে বুঝতে হবে যে নাগরিক অধিকার বলে কোন জিনিষই নেই। শাসকশ্রেণীই হচ্ছে জাতির ভাগ্যবিধাতা, সে বিধান প্রস্তুত করার ভার একজনের ওপর কি কয়েকজনের ওপর সে প্রশ্ন অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে শ্রেণীগত হুকুমতন্ত্র—এইখানে ফ্যাসিজম্ নাজিজম্ এবং পশ্চিম ইউরোপেরগণতন্ত্রের আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই মিলের কথা গণতান্ত্রিক দেশের শাসনকর্ত্তারা ভালরকমই জানেন। এতদিন এটাকে লুকাবার যথেষ্ট চেষ্টাও তাঁরা করে এসেছেন। কিন্তু এখন আর লুকান সম্ভব নয়।

দুনিয়াতে এখন রাজনৈতিক মতবাদের এমন চুলচেরা আলোচনা হচ্ছে—বিশেষ ক'রে যেভাবে তিন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রথার তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে-তাতে আজকাল এসব বিষয়ে লুকোচুরি সম্ভব নয়। এই যুদ্ধে লিপ্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠন নিয়ে ও তাদের বিশ্ব-সহানুভূতির দাবী নিয়ে এসব কথা আরও পরিষ্কার হয়েছে।

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ ওই দুই দেশের ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে আর থাকবে বলে মনে হয় না। ফিন্‌রা বিপন্ন হয়ে বার বার সাহায্য প্রার্থনা করছে, এবং জার্ম্মানি ছাড়া আর সবাই তাদের যথাশক্তি সাহায্য ইতিমধ্যেই পাঠাতে সুরু করেছে। ইংলণ্ড আইন করেছে যে, সাতাশ বছরের বেশী বয়স্ক যে কেউ ইচ্ছা করলে ফিনল্যাণ্ডে যেয়ে যুদ্ধ করতে পারে। ইটালি ও ফরাসী থেকে যে সামরিক সাহায্য ফিনল্যাণ্ডে যাচ্ছে তা নিতান্ত সামান্য নয়। এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হবে তা এখনও কিছুই বলা যায় না, কিন্তু ইতিমধ্যেই রাশিয়াকে নৈতিকক্ষেত্রে একটা বড় রকম পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিদেশের সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারীরা ধনিক শ্রেণীর

ইচ্ছাদ্বারাই বিশেষভাবে চালিত হয়। এইসব কাগজ গোড়াথেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন সব খবর প্রকাশ করছে এবং দিনের পর দিন করে চলেছে যে জনসাধারণের সহানুভূতি রাশিয়ার ওপর থেকে ক্রমেই চলে যাচ্ছে। এর ফলে হচ্ছে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী রাশিয়ার প্রতি ক্রমে বিমুখ হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন হয় তবে শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে তেমন বাধা হয়ত আসবে না। যদি ফিনরা ক্রমাগতই হটে যেতে থাকে তবে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতেই হবে হয়ত। আপাততঃ এই সব শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে নরওয়ে ও সুইডেনকে দিয়ে রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যহত করা। উত্তর ইউরোপের সমস্ত রাজ্যগুলি যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে ফিনল্যাণ্ড শেষ পর্য্যন্ত জিতুক না জিতুক অন্ততঃ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে অনেক দিন, ততদিনে যদি জার্ম্মানির সঙ্গে যুদ্ধের একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তবে ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়াকে বড় রকম মহড়া দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। আপাততঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার বিপদ অনেক বেশী, একই সময়ে রুমানিয়া, টার্কি, ইরাক্, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ—এতগুলি মোহাড়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে। প্রায় কুড়ি লক্ষ জার্ম্মান সমস্ত রকম মারাত্মক যন্ত্রপাতি নিয়ে যতদিন হানাদিয়ে বসে আছে ততদিন এতগুলা যায়গায় লড়তে যাওয়াটা মিত্রশক্তির পক্ষে সমীচীন হবে না।

শান্তির প্রস্তাব

এই কুড়িলক্ষ জার্ম্মান আর কতদিন যুদ্ধ চালাতে পারবে এই বিষয়ে আপাততঃ জল্পনা কল্পনা চলছে সর্ব্বত্র। সম্প্রতি মার্শাল গোয়েরিং ছয়দফাওয়ালা এক শান্তির সর্ত্ত উপস্থিত করেছেন। দফাগুলির মোট অর্থ এই যে জার্ম্মানি এপর্য্যন্ত যে যে জায়গা দখল করেছে তার অধিকাংশই তার অধিকারে থাকবে। বাকী অংশগুলির জন্যও ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মানি মিলিতভাবে আলোচ্য স্থানগুলির জনসাধারণের ভোট নিয়ে স্থির করবে। ইংলণ্ডের খবরের কাগজওয়ালারা এই সব সর্ত্তগ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইউরোপে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন। ইউরোপের পরিস্থিতি জানবার জন্য তিনি সামনার ওয়েলস্ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ইউরোপে পাঠিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা ফলবতী হবে এমন আশা ইউরোপে বিশেষ কেউই করে না। তবু মনে মনে সবাই চায় যে রুজভেল্টের চেষ্টা সফল হোক্। ধনিকশ্রেণী শাসিত দেশগুলির কেউই চায় না যে যুদ্ধ বেশীদিন চলে। যতদিন যাবে, ততই জনসাধারণের অসন্তোষ বেড়ে উঠবে। দেশে গণ-বিপ্লবের ভয় সব গবর্ণমেন্টেরই রয়েছে। এই অবস্থায় একটা সম্মানজনক আপোষের সূত্র যদি কেউ বলে দিতে পারে তবে আপোষ হতে বিশেষ দেরী হবে না। তবে মিত্রশক্তির আপাততঃ লক্ষ্য হচ্ছে জার্ম্মানিকে এমন ভাবে পরাজিত করা যাতে তাদের সুবিধামত সন্ধির সর্ত্ত জার্ম্মানি মেনে নিতে বাধ্য হয়। যতদিন সে রকম ভাবে হারানোর আশা থাকবে ততদিন

আপোষ নাও হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটা জিনিষ ভাববার আছে। জার্ম্মানির পরাজয় বলতে বৃটেন ও ফ্রান্স বোঝে নাজীদলের পরাজয়। অর্থাৎ এমন একটা অবস্থা যদি সৃষ্টি করা যায় যে হিটলা'রর কর্ত্তৃত্ব লোপ পায় এবং এমন গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যারা মিত্রশক্তির কথামত কাজ করতে রাজী হবে তবেই মিত্রশক্তির আশা পূর্ণ হয়। জার্ম্মানিতে সমাজবিপ্লব হোক এটা মিত্রশক্তিও চায় না। সেইজন্য বর্ত্তমান যুদ্ধ এমন ভাবে চালানো হচ্ছে যাতে নাজীদল ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের কাছে অপদস্থ হয়ে ওঠে। সমুদ্রে ঘাঁটি আগলে বসে থাকার ফলে জার্ম্মানিতে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি রাশিয়া থেকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য জার্ম্মানিতে না পৌঁছয় তবে নাজীগবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যে উপস্থিত হবে এটা নিশ্চয়। সে বিক্ষোভ মিত্রশক্তির স্বার্থের পরিপন্থী কোন পথে চলতে পারে এমন আশঙ্কাও আছে। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে জার্ম্মানিকে বাদ দিয়ে শুধু নাজীদলকে পরাজিত করা। কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা অত্যন্ত শক্ত, প্রায় অসম্ভব। সুতরাং মিত্রশক্তির আপাততঃ চেষ্টা হচ্ছে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে নাজীরা যুদ্ধ চালাতে না পেরে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। জার্ম্মানিকে এইরকম বাধ্যতামূলক অবস্থায় আনতে পারবার সম্ভাবনা কতখানি আছে প্রধানতঃ তার উপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের বর্ত্তমান আপোষ প্রচেষ্টা সফল হবে কি না।

রাশিয়ার সাহায্য

মিত্রশক্তির সমরবিশারদদের মতে জার্ম্মানি এ যুদ্ধ বেশীদিন চালাতে পারবে না। পেট্রলের অভাবেই তাকে শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হবে। বর্ত্তমান কালে পেট্রল ছাড়া যুদ্ধ করা যায় না। অথচ এ যুদ্ধ চালাতে গেলে যে পরিমাণ তেল লাগবে তা জার্ম্মানির নেই। জার্ম্মানিতে বছরে গড়পড়তা পাঁচলক্ষ টন পেট্রল পাওয়া যায়। কিন্তু শান্তির সময়ও জার্ম্মানিতে পেট্রল খরচ হয় প্রায় ষাট লক্ষ টন। বরাবর বিদেশ থেকে এনে তাকে কাজ চালাতে হয়। এখন রাশিয়া আর রুমানিয়া অঞ্চল ছাড়া তার আর কোন জায়গা বিশেষ নেই যেখান থেকে পেট্রল পাওয়া যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে রাশিয়া তাকে কি পরিমাণ পেট্রল যোগাতে পারবে? তেল অবশ্য রাশিয়ায় পাওয়া যায় প্রচুর। গত সেপ্টেম্বারের রুষো-জার্ম্মান সীমান্ত চুক্তির ফলে গ্যালিসিয়ার তেলের খনিগুলি রাশিয়ার অধিকারে এসেছে। তা ছাড়া রাশিয়ার নিজস্ব যে সব খনি বাকু, এসনি, এম্বা, ইশিমবায়েভো, উফা, পার্ম প্রভৃতি স্থানে আছে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। আন্দাজ করা যায় যে রাশিয়ার খনিগুলিতে মোট ৬৩৭ কোটি টন তেল আছে,—অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যত আছে তার প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী। এ ছাড়াও আরো নতুন নতুন খনির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বর্ত্তমানে রাশিয়ার পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৩০০ লক্ষ টন। এই তেলের বদলে রাশিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে বৃহৎ শিল্পের

জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনে। তবে জার্ম্মানিকে ইচ্ছা করলে এর থেকে ৭০ লক্ষ টন তেল দিতে পারে। কিন্তু এই পরিমাণ তেল রাশিয়া সত্যই দেবে কিনা তা বলা যায় না। দেবার ইচ্ছা থাকলেও যানবাহনাদির ভাল বন্দোবস্তের অভাবে পাঠাতে বাধা হতে পারে। তা ছাড়া সবটা যদি রাশিয়া দেয়ও তা হলেও তা জার্ম্মানির প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হবে না।

রুমানিয়া—

বাকী যা পেট্রল লাগে তার জন্য সুতরাং তাকে রুমানিয়ার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু রুমানিয়ার তেলের খনিগুলি অধিকাংশই বৈদেশিক। বিশেষতঃ বৃটিশ মূলধনের ওপর চলছে। এই তেল যাতে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হতে পাবে সে দিকে তাদের চোখ আছে। অবশ্য রুমানিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির যে বাণিজ্য চুক্তি আছে তার ফলে কিছু পরিমাণ তেল জার্ম্মানি পাবেই। কিন্তু যতটা পাওয়ার কথা ছিল তা যে সে পাচ্ছে না, এ অভিযোগ ইতিমধ্যেই সে করতে সুরু করেছে। এবং যতদূর আন্দাজ করা যায় এ অভিযোগ মিথ্যা হবার কোন কারণ নেই। আগে জিনিষপত্র চালান দেওয়ার অসুবিধা ছিল। এখন গ্যালিসিয়ার রেলপথ জার্ম্মানির কর্তৃত্বাধীনে এসে যাওয়ায় সে অসুবিধাও নেই। সুতরাং জার্ম্মানি এখন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তেল রুমানিয়ার কাছে দাবী করতে পারে। যুদ্ধ চালাতে হলে সে দাবী করতেও হবে। বিশেষজ্ঞদের কারো কারো মতে এই নিয়ে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ বেধে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানি রুমানিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ দিচ্ছে। এতে যদি কাজ না হয় তবে সে বল প্রয়োগ করবে। ক্র্যাকো থেকে কারপেথিয়ান লাইন বরাবর জার্ম্মানির ১২ ডিভিশনে প্রায় দেড়লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজন হলে এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এদিকে রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইংরাজ প্রতিশ্রুত। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থ আছে, ইটালিরও আছে। অবশ্য এ দুটি স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু জার্ম্মানি বলকান আক্রমণ করলে ইটালি বা রাশিয়া কেউই চুপ করে থাকবে না। অতএব অবস্থাটা এই যে যুদ্ধ চালাবার মাল মশলা সংগ্রহ করতেই জার্ম্মানিকে যুদ্ধ ব্যাপকতর করে তুলতে হবে। সে অবস্থা যে এখনই হতে চলেছে তা নয়, তবে হতে পারে।

গান্ধীজী ও বড়লাট

ভারতের বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আবারও সাক্ষাৎ হয়েছিল—ফল অন্যান্য বার যা হয় এবারও তাই হয়েছে। গান্ধীজী গিয়েছেন আশায়—ফিরে এসেছেন নিরাশায়,—তিনি চেয়েছেন ভারতের আত্মকর্তৃত্ব স্বীকৃত হোক, ইংরাজ চায় কথার মার-প্যাঁচে সেটা এড়িয়ে যেতে, গান্ধীজী চান ভারতকে স্বাধীনরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিতে, বড়লাট চান মুসলমান প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠদের ও দেশীয় করদ রাজাদের দোহাই দিয়ে, ইংরাজের শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেওয়াতে। দুজনের চিন্তা ও ভাবধারার মধ্যে এমনি রকমের সব পার্থক্য আছে—কাজেই এ মোলাকৎ থেকে কোন সুফল আশা করাই অন্যায়।

গান্ধীজী শান্তিকামী—তিনি মানুষের মৌলিক উদারতায় বিশ্বাসবান, তাই তিনি আশা করেন —সবাই তার মনোবৃত্তির অনুরূপ যুক্তি-বিচার দ্বারা চালিত হবে। বোম্বাইতে লর্ড লিংলিথগো যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি সসম্মানে আপোষের অঙ্কুর দেখতে পেলেন। বড়লাট বলেছিলেন—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিধান মত স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রাধিকার Dominion Status of Westminster Statute variety) ভারতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েই আছে।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিধানের যুক্তি ও বিচারসহ পরিণতিতে যে অবস্থা মহাত্মাজীর মনে আসে, তাকে তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতার সমতুল্য মনে করেন। তাই তিনি ভেবে নিলেন ভারতের দাবী মেনে নিতে ইংরাজের আর আপত্তি হবে না। ইংরাজ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিধানে দেওয়া হয়েছে। অতএব গান্ধীজী বিচার করলেন—যদি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারই পাওয়া যায়, তবে নিজেদের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়বার অধিকার ত অবশ্যই আসে। ইহা যুক্তির কথা এবং সঙ্গতও বটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এত সহজ যুক্তিতে চলে না, তা চলে এঁকে বেঁকে অসরল পথে। কাজেই রিক্ত হস্তে, নিরাশ মনে গান্ধীজী ফিরে এলেন।

প্রত্যাখ্যানের পরিণতি

এমনি ক'রে বারে বারে লাট সাহেবের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন আর ফিরে আসছেন। আজ ওদের গরজ পড়েছে—তাই ঘুরে ঘুরে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার তাগিদ বোধ করছে। কয় বছর আগে গান্ধীজী একবার সাক্ষাতের জন্য বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। অথচ যে বড়লাট উইলিংডন, গান্ধীজীকে বার বার প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজেদের সাম্রাজ্যিক সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার নামে একটি আঁচড়ও থাকবে না—আর মোহন দাস করমচাঁদ

ীর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে থাকবে। সক্রেটিস, খৃষ্ট বা জোয়ানের (Socrates, Christ, Joan of Arc) নাম বক্ষে ধারণ ক'রে ইতিহাস আজও গরবী—কিন্তু পন্টিয়াস পাইলট (Pontius Pilate) আজ এক প্রকৃতির মানুষের নমুনা হিসাবে ধিকৃত।

যাক্ সেকথা। কিন্তু সেদিনও প্রত্যাখ্যানের অপমান যেমন জাতিকে ব্যথা দিয়েছে, আজও এই বৃদ্ধ মান্য লোকটিকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের টানা হেঁচড়ার খেলায় বিব্রত হতে দেখে, জাতির বুকে সেই অপমানের ব্যথাই বাজে। সাম্রাজ্যবাদের ছলাকলা যে জানে না, তার সঙ্গে সে খেলা খেললে শোভনও হয় না, মানবিকও হয় না। কিন্তু মন্দেরও ভাল আছে। তাদের মন্থন প্রয়াস গান্ধীজীর মনের যে স্তরে আলোড়ন তোলে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে গরল—যা স্বাভাবিক অবস্থায় বেরুত না। লিংলিথগোর সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসে, তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা সে মন্থনউদ্ভূত গরলেই গড়া। এপারের দেবতারা যখন হার মানল, তখন লর্ড জেটল্যাণ্ড হতে গেলেন নীলকণ্ঠ। কিন্তু সখ হলেই ত সব সম্ভব হয় না। গান্ধীজীর জবাবে তিনি যা বললেন, তাতে ধরা পড়ল, তার ও তার সমগোত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের নীচতা ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা। গান্ধীজী তার জবাবে বললেন, আমার ধারণা ছিল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিধানের স্বায়ত্ত শাসন পূর্ণ স্বাধীনতার সমতুল্য, কিন্তু জেটল্যাণ্ডের কথায় সে ভুল ভেঙ্গে গেল। সত্যই যদি গান্ধীজীর সে ভুল ভেঙ্গে থাকে, তবে জাতির পক্ষে তা মহা কল্যাণের—ভারতীয় রাজনীতির অনেক গোলমালের মূলেই হল মহাত্মাজীর ঐ ভুল। আমরা জানি ইংরাজের সাম্রাজ্যের বিধানে এমন কোন স্বায়ত্ত শাসনই আমাদের পাওয়া সম্ভব নয়, যা স্বাধীনতার সমতুল্য—এমনকি সমশ্রেণীরও হতে পারে। এই দৃষ্টির পার্থক্য থেকে ভারতীয় রাজনীতির অনেক গোলমালের উদ্ভব। এ পার্থক্য থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের বিরোধ।

গান্ধীজীর বিবৃতি

তাঁর সঙ্গে আমাদের বিরোধ আমরা কখনও লুকিয়ে রাখি না। কিন্তু তবুও আজ একথা বলতে বাধ্য যে ইদানীং তিনি যে সব বিবৃতি দিচ্ছেন, তা কেবল গান্ধীজীর লেখনী ও মনন হ'তেই সম্ভব। লাট-সাক্ষাতের পর যে বিবৃতি তিনি দিয়েছেন—তাতে একটি বাক্যেই সব কথার গোড়ার কথা বলেছেন—ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সম্মানজনক আপোষ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই—যদি না উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য দূর ক'রে ইংল্যাণ্ড মেনে নেয়, যে এখন তার নিজের রাষ্ট্র-গঠন ও পদ নির্ণয় করবার ক্ষমতা ভারতের হাতে দেবার সময় হয়েছে। ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরোধ মীমাংসার একটিই মাত্র পথ আছে।

তাঁর দ্বিতীয় বিবৃতিতেও মাত্র একটি বাক্যেই তিনি ভারতের দাবীকে মূর্ত্ত করে তুলেছেন—"সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত দেশ সমূহের অন্যতম হয়ে থাকা ভারতের পক্ষে সম্ভব না—অর্থাৎ পৃথিবীর অ-ইউরোপীয় জাতি সমূহের শোষণের ভাগীদার হতে আমরা চাই না।" এবং এ সম্ভাবনা ও অপমান থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই ভারতের স্বাধীনসত্তা থাকা দরকার। তাই লর্ড জেটল্যাণ্ডের জবাবে

তিনি জানিয়ে দিলেন—তার ভুল ভেঙ্গেছে, ইংরাজ এখনও চায় ভারতের আত্মকর্তৃত্ব না হ'ক তার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পদ নির্ণয় করার ক্ষমতা ভারতের হাতে না এসে ইংল্যাণ্ডর হাতেই থাক। লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেছেন—ভারতীয় নেতারা বাস্তবতা ছেড়ে কেবল আদর্শের পিছনেই ঘুরছেন। গান্ধীজী জবাব দিয়েছেন—থুড়ি, আদর্শবাদের অপবাদ তাঁকে দিতে পারি না—কিন্তু তিনিও অবাস্তবের পিছনেই ঘুরছেন এবং বাস্তবকে অস্বীকার করেছেন।

প্রায় ছয়মাস হ'ল যুদ্ধ সুরু হয়েছে—এর মধ্যে বহুবার বড়লাট ও গান্ধীজীর মধ্যে আপোষের জন্য দেখা সাক্ষাত হয়েছে কিন্তু তার শেষ পরিণতি উপরে, যা দেখলাম। কিন্তু অগ্রণী জাতি ঐ রুদ্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ে মরবে না সে তাঁর পথ খুঁজে নিবে—যাতে তাঁর মঙ্গল স্থায়ী হবে, ক্ষিপ্র হবে, দূর প্রসারী হ'বে।

প্যাটেলজীর ভুল

গান্ধীজী যখন সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের দাবীকে বিশ্বের সমক্ষে মানবতার উচ্চ আদর্শের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করছেন, তখন অপর কারুর পক্ষে সে দাবীকে খর্ব্বকরার চেষ্টা অন্যায় ও দেশের অনিষ্টকর। বিশেষ ক'রে যদি গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ গণ্ডি থেকে কেউ এমনি ভাবে জাতীয় দাবীকে খাটো করেন, তবে সেটা বিশেষ ভাবেই দূষ্য। সর্দ্দার বল্লবভাই পেটেল রাষ্ট্রগঠন পরিষদের দাবীকে খর্ব্ব ক'রে নাকি বলেছেন—বর্ত্তমান প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদসমূহের দ্বারা ঐ পরিষদের কাজ চালানো যায়, তখন একদিকে তিনি জাতীয় দাবীকে খর্ব্ব করেছেন এবং অপর দিকে গান্ধীজীর দাবীর পিছনে যে কংগ্রেসের সম্মিলিত শক্তি নেই, তার প্রমাণ দিয়েছেন। বিপক্ষের সঙ্গে যখন দরকষাকষী চলছে, তখন এই প্রকার অসাবধান উক্তিতে দাবীর গুরুত্ব কমে যায়।

রাষ্ট্র-গঠন পরিষদ সম্বন্ধে যে দাবী করা হয়েছে, তার মূল কথা হল—(১) জাতির আত্মকর্তৃত্ব ও জাতির সার্ব্বভৌম অধিকার (nation's rights of self-determination & sovereignty of the nation) স্বীকার করিয়ে নেওয়া এবং (২) জাতির জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—নির্ব্বাচন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে তাদের বুঝতে দেওয়া—তাদের রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক বা ভাগ্যবিধানের ভার তাদের-ই উপর। আমাদের কাছে প্রথমটার চেয়েও দ্বিতীয়টার দাম বেশী। জাতির জনসাধারণ যদি নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তবে সে অধিকার পাওয়ার-ও কোন অর্থ হয় না তাই বর্ত্তমান অবস্থার অপরিহার্য্য গণ্ডি ও ত্রুটি জেনেও, আমরা রাষ্ট্রগঠন পরিষদ প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেছিলাম। পেটেলজীর প্রস্তাবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একদম-ই বিফল হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিঃ আগা খাঁন পেটেলজীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন তখন দুঃখিত হই না কারণ মিঃ আগা খাঁন যে কোন সমস্যা সম্বন্ধেই কথা বলেন, তিনি তা', ভারতের চেয়ে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব বেশী ক'রে মনে রেখেঃ বলেন। আমরা মিঃ আগা খাঁর উক্তিতে ব্রিটেনের মনোভাবের

ছায়া দেখতে পাই। কিন্তু পেটেল মহাশয যখন কথা বলেন, তখন ভারতের তথা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবেই ব'লেন। তাই আমাদের আপত্তি।

বাংলার কংগ্রেস

বাংলার কংগ্রেসের গলদ ক্রমেই তার পূতিগন্ধ চারিদিকে ছডিযে দিচ্ছে। আজ বাংলা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয—জাতীয় মহা প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এক তথা কথিত বামপন্থী ইস্তাহারে সেদিন দেখলাম—শ্রীযুক্ত বসুর নেতৃত্বে অধিকাংশ বামপন্থী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাও বড বিপদ বলে মনে করছেন। এই হল এদের বামপন্থীর নিদর্শন। দলগত ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বজায রাখার জন্য কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করতেও এরা কুণ্ঠিত না। মিঃ জিন্নার অনুকরণে এরা ১১ই ফেরুযাবী এক মুক্তিদিবসের অভিনয করেছে। সেদিন সভায পডবার জন্য ঠিক জিন্না সাহেবের ঢংএ একটি বিবৃতি পাঠ কবার জন্য প্রচারিত হয়েছিল। এই ইস্তাহারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এত মিথ্যা কথার সমাবেশ করা হয়েছিল, যা মিঃ জিন্নার পক্ষেও হয়ত কঠিন হ'ত।

কংগ্রেস একটি জাতীয প্রতিষ্ঠান, বহু লোকেব সম্মিলিত মত ও সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা চালিত হয। সে মতের সঙ্গে অনেকের বনি-বনা না হতে পারে। সমষ্টির মত সেখানে ব্যষ্টিব উপর প্রবল হ'বে—নতুবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সমবেত প্রচেষ্টা চলতে পাবে না।

নিজের মতানুবর্ত্তী লোকেব সংখ্যা বাডাবার প্রতিষ্ঠানিক বিধি অনুযাযী চলবাব রাস্তা ত্যাগ ক'রে, এরা প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গবাব দিকেই মন দিযেছে বেশী ক'বে। অর্থাৎ নিজেব মতের উপর এদেব এতটা আস্থা নেই যে এরা যুক্তি বা বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পাবে। ১৯২০ সনে কংগ্রেস প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠানে পবিণত হবার পথ নিল, তখন থেকেই বাংলার একদল কংগ্রেসদ্রোহী কখনও কংগ্রেসেব আবরণে এবং কখনও বামপন্থীব অজুহাতে, কখনও গোপন অর্থের মোহে, কখনও প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং কখনও বা আন্তর্জ্জাতিকতাব দোহাই দিযে—কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আসছে। বাংলার কংগ্রেসেব এই ঝগডা সর্ব্ব ভাবতীয় কংগ্রেসী মহলে ঠাট্টা ও ধিক্কারের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। এরা কোন দিনই কংগ্রেসের কোন আন্দোলনে আন্তরিকতার সহিত যোগ দেয় নি—কংগ্রেসের অনুসৃত কোন কর্ম্ম-পন্থা বা সংগ্রামে এরা কোন লাঞ্ছনা বরণ করে নি। ২০ বছর ধরে এরা যে চেষ্টা করছে, সুভাষচন্দ্রের হটকারিতায আজ তা সফল হ'তে চলছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে সুভাষচন্দ্র এদের স্বরূপ ও প্রকৃতি জানেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রাধান্যের মোহে নিজের ও বাংলার ক্ষতি করছেন। আজ বা কাল বাংলাদেশ তার ভুল বুঝে, এদের চক্রান্তের জাল কেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বাংলা যখন নিজের ভুল শুধরে নেবে, তখন সুভাষবসুর পক্ষে হয়ত সেটা তত সহজ হ'বে না। আজও তিনি ভেবে দেখুন—কোথায় এর পরিণতি।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

রামগড কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন শেষ হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন—মৌলানা সাহেব পেয়েছেন ১৮৬৪ ভোট শ্রীযুক্ত রায পেয়েছেন ১৮৩ ভোট। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার আশা শ্রীযুক্ত রায করেন নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন রাজনীতির মৌলিক এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি হিসাবে, নির্ব্বাচনে নিজের কথা বলবার জন্য। প্রায় রেওয়াজ হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবে। শ্রীযুক্ত রায এই রেওযাজের বিরুদ্ধে। রাজনীতি হিসাবে এমনি রেওয়াজ প্রচলিত না হওযাই উচিত। এই নির্ব্বাচনে দাঁড়াবার পক্ষে শ্রীযুক্ত রায়ের ইহা অন্যতম কারণ। এদিক থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু রাজনীতির অন্যদিক থেকে, তাঁর দাঁড়াবার বিপক্ষেও যুক্তি আছে। এই যুদ্ধ সুরু হবার পর, ভারতে যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে ভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এই সংস্থিতির ব্যবস্থা করছে—এবং বিশেষ করে' এর যে ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক পরিণতির সম্ভাবনা রয়েছে—তাতে এই সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুকূল অবস্থা ছিল না। তারপর গত বছরকার ত্রিপুরী অভিনয়ের পর, ভারতের বাক্‌সর্ব্বস্ব তথাকথিত বামপন্থীদের উপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ ও শ্রীযুক্ত যোশী পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, শ্রীযুক্ত রায়কে তাঁরা সমর্থন করবেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক মতভেদ আছে। তারপর, ফরওয়ার্ড ব্লককে আমরা কোনদিনই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখি না, এর কোন রাজনীতি আজও আমরা খুঁজে পাই নি। ব্লকের কর্ত্তৃপক্ষ অনেকবার বলেছেন, যে কোনো বামপন্থী প্রার্থীকেই তাঁরা সমর্থন করবেন। তারপর তাঁদের এই নিরপেক্ষতা শ্রীযুক্ত রায়ের কাছে intriguing বা রহস্যজনক মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের কাছে ফরওয়ার্ডব্লকশ্রেণীর বামপন্থীদের এই আচরণ অপ্রত্যাশিত হবে, এ আশা আমরা করি নাই। তাছাড়া সব বামপন্থীই একই কর্ম্মপন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব সমস্যা দেখবে, এ আশা করা বৃথা। কাজেই এই নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত বামপন্থী চুনে বের করা যাবে, এ দাবীও যুক্তিসহ নয়।

যাক, নির্ব্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। মৌলানা আজাদকে আমরা তাঁর এই জয়ের জন্য আমাদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি। পুরাতন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে গান্ধীজীর পরই, মৌলানা সাহেব জনপ্রিয়। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্যের জন্য মৌলানা সাহেবকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যখন অনেকেই একে একে কংগ্রেস ছেড়ে সাম্প্রদায়িক সচ্ছলতায় লুব্ধ হয়েছেন, তখন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রিয়তা ও তজ্জনিত অর্থহানি অগ্রাহ্য ক'রেও কংগ্রেসের সঙ্গেই আছেন। আজ সাম্প্রদায়িক বিষে জাতীয় জীবন জর্জ্জরিত—আশা করি তাঁর নির্ব্বাচন জাতীয় জীবনকে সুস্থ করার পক্ষে সাহায্য করবে।

বাংলার বাজেট—

বাংলার আগামী বছরের বাজেট সরকার প্রকাশ করেছেন। আগামী বছরে আয় হবে ১৩৯৭০০০০০৲ এবং ব্যয় হবে ১৪৫৪০০০০০৲ অর্থাৎ ৫৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়বে। বাংলা দেশে এখন প্রায় ৫৫০০০০০০ লোকের বাস—এর জন্য মাত্র ১৪ কোটি টাকা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। অন্যান্য দেশের তুলনা ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চেয়েও তুলনায় বাংলার আয় কম। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হবার আগে (অর্থাৎ ৩ বছর আগে) নেইমেয়ের ব্যবস্থায় (Niemeyer Award) বাংলার রাজস্বের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল—অর্থাৎ ২ কোটি টাকার মত আয় বেড়েছিল। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের শ্বেতহস্তি পুষতে গিয়ে ব্যয়ও ক্রমেই বেড়ে চলছে। অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপকগণের বাবদ খরচ অনেক কম হয়, কিন্তু বাংলা দেশে এই দুই বাবদে খরচ অনেক বেশী হয়। তারপর বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনের মধ্যেই এমন সব ব্যবস্থা আছে, যাতে মন্ত্রীরা ইচ্ছানুযায়ী খরচ কমাতে পারে না। এমন খরচ আছে, যার উপর তাঁদের কোন এক্তিয়ার নেই। অথচ জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, মন্ত্রীরা নির্ব্বাচকদের তুষ্টির জন্য অন্তত লোক দেখানো জনহিতকর কিছু কাজ ও খরচ করতে বাধ্য হয়। প্রধানত অর্থের অভাবে কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থা নিয়ে জনহিতকর কাজে হাত দেওয়া চলে না—কাজেই ও জন্য যে অর্থ খরচ হয়, তা প্রায়ই আশানুরূপ ফল দেয় না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা উচিত, তা বর্ত্তমান মন্ত্রীদের আর্থিক সাধ্যের বাইরে। এদের সে জন্য যথেষ্ট ইচ্ছা ও আগ্রহ আছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও, সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বাংলার কৃষক ও পল্লীবাসীদের দুর্গতির কোন লাঘব—সত্যিকার লাঘব—সাধনের কোন চেষ্টাই এই বাজেটের মধ্যে নেই—হয়ত সম্ভবও না।

যে মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার কৃষকও পল্লীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে না পারবে—সেটা যে জন্যই হ'ক—তাদের মন্ত্রিত্ব করার নৈতিক অধিকার সম্বন্ধে দেশবাসীর সন্দেহ আছে। তার নিজেদের ও ব্যবস্থাপকদের খরচ আরও অনেক কমিয়ে,দেশের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে একটা যোগ ও সমতা রাখা উচিত ছিল। নিজেদের জন্য অতিরিক্ত খরচ ক'রে, দরিদ্র দেশবাসীর উপর আবার নূতন কর এঁদের বসাতে হ'বে। গণ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রীদের পক্ষে ইহা অন্যায়। আয় ব্যয়ের এই ঘাটতি দূর করবার জন্য নূতন কর বসাতেই হ'বে—এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সে করভার গিয়ে পড়বে দরিদ্রের উপরই। মুষ্টিমেয় যারা ধনী তাদের ভাগের চেয়ে দরিদ্র বহুলের ভাগেই চাপ পড়বে বেশী।

বাংলায় ধর-পাকড়—

যুদ্ধ সুরু হবার পরই অর্ডিনেন্সের ধারাগুলি বাংলাদেশে প্রযোজ্য ব'লে ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস-নীতি অনুসৃত হ'ত—তাই পাঞ্জাব ও বাংলা ভিন্ন আর কোথাও সে ঘোষণা করা হয় নি। এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা গদি ছেড়ে দিয়েছেন—খাস লাট সাহেবের তাঁবেতে সরকারী কর্মচারীরা ঐ সব প্রদেশে কার্য্য চালাচ্ছে। কিন্তু এখনও ঐসব প্রদেশ অর্ডিনেন্সের সব ধারাগুলি

প্রযোজ্য হয় নি। তার ফলে অন্যান্য প্রদেশে সভা-সমিতি ও অন্যান্য পৌর-অধিকার অনেকটা অব্যাহত আছে, কিন্তু বাংলায় তা নেই। এখানে অবশ্য, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সভাসমিতি করলে তারা আপত্তি করছে না; কিন্তু জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের বাণী প্রচার করা বা কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় দাবীর কথা বলা, তারা সহ্য করতে রাজী নয়। তার ফলে, নানা স্থানে অল্প সল্প ধর-পাকড় সুরু হয়েছে।

গভর্ণমেণ্ট জানে যে কংগ্রেস এখনই দেশে কোন ব্যাপক সংগ্রাম সুরু করার পক্ষে নয় এবং কংগ্রেসের অনুমোদন ও সমর্থন ভিন্ন কোন সত্যিকার সংগ্রাম করা, কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জানা সত্বেও তারা যে কেন অর্ডিনেন্সের ধারাগুলি (বর্ত্তমানে যা স্থায়ী আইনে পরিণত হয়েছে), বলবৎ রেখেছেন - বিশেষ ক'রে সভা-সমিতি সম্বন্ধে—বুঝি না। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে উঠেছে। এই প্রয়োজনেই কি এই ধারাগুলি এখানে বলবৎ রাখা হয়েছে? যে সব প্রদেশে খাস সরকারী ঝুনো কর্ম্মচারীরা শাসনকার্য্য চালাচ্ছেন, সেখানেও যখন ঐসব ধারা কাজে না লাগিয়ে পারছে, তখন বাংলারই তার বিশেষ কি দরকার ছিল!

বাংলার রাজনীতি আজ এমনভাবে জড়িয়ে আছে, যে এর কোন ধারাকে-ই একক ভাবে বিচার করা চলে না। সরকারের সব কাজেরই বিভিন্নমুখী মূল আছে। কোন মূল দিয়ে কোন রস আহরণ ক'রে যে তা পুষ্ট হচ্ছে, তা বাইরের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। যা-ই হ'ক মন্ত্রীদের নিজেদের সুনামের দিকে দৃষ্টি রেখেও, তাঁদের ভেবে দেখা উচিত—অন্যান্য প্রদেশ থেকে ও ঝুনো ঘাগী সরকারী কর্ম্মচারীদের থেকে, বেশী রাজভক্ত হওয়া গণ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রীদের পক্ষে শোভনও নয়, আত্ম-সম্মানজনকও নয়। পৌর ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর তাঁরা যদি এই ভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন, তার পরিণতি একদিন অনিবার্য্য পথে হ'তে বাধ্য। পৌর ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা কংগ্রেসের বৃহত্তর সংগ্রাম-নীতির অপেক্ষায়, বহুকাল চেপে রাখা সম্ভব হবে না।

৩২নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক্যাষ্টরল

চুলেব কান্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধিব
উপাদান, ভাইটামিন এফ্ সংযুক্ত
বিশুদ্ধ এবং সুগন্ধযুক্ত ক্যাষ্টর
অয়েল, চুল ঘন হযে বাড়ে
এবং কেশপতন রোধ করে।
নারীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কবে।

—আজই—
এক শিশি ব্যবহার করুণ।

MONEY
MAKES MONEY

Investment in Stocks and Shares on Marginal Deposit System may double and trible your Capital.

Particulars to

BENGAL SHARE
Dealers Syndicate

3, 4, Hare Street - Calcutta

সেণ্ট্রাল কালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট

ফোন : কলিঃ ২১২৫ ও ৬৪৮৩

কলিকাতা শাখা	মফঃস্বল শাখা
শ্যামবাজার	বেনারস
৮০।৮১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	গোধুলিয়া বেনারস্
সাউথ ক্যালকাটা	সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২১।১, রসা রোড	দিনাজপুর ও নৈহাটী

সুদের হার

কারেণ্ট একাউণ্ট		১½%
সেভিংস ব্যাঙ্ক		৩%

চেক্দ্বারা টাকা তোলা যায় ও হোম সেভিং বক্সের সুবিধা আছে।

স্থায়ী আমানত	১ বৎসরের জন্য	৫%
	২ বৎসরের ,,	'৫½%
	৩ বৎসরের ,,	৬%

আমাদের ক্যাস্ সার্টিফিকেট কিনিয়া লাভবান হউন ও প্রভিডেণ্ট ডিপোজিটের নিয়মাবলীর জন্য আবেদন করুন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

= সূচী =

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হতে আরম্ভ।

২। ইহা প্রত্যেক বাংলা মাসের ১লা তারিখে বের হয়।

৩। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার দাম চার আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে তিন টাকা, ষান্মাষিক এক টাকা বার আনা। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করতে হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লিখবার সময় গ্রাহক নম্বর জানাবেন। যথোচিত সময়ের মধ্যে কাগজ না পেলে ডাক ঘরের রিপোর্ট সহ নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে পত্র লিখতে হবে।

লেখকদের প্রতি—

'মন্দিরায়' প্রকাশের জন্য রচনা এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। যথাসম্ভব নতুন বাংলা বানান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।

কোন প্রকার মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—২০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲
" সিকি পৃষ্ঠা—৬৲
" ⅛ পৃষ্ঠা—৩৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকনায় পাঠাবেন :

ম্যানেজার—**মন্দিরা**
৩২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
ফোন নং : বি, বি, ২৬৬০

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড
রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

ভারতের বীমা জগতে
প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

হাজার করা বাৎসরিক বোনাস্	আজীবন বীমায়	১৬৲
	মেয়াদী বীমায়	১৪৲

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত

হেড্ আফিস্ ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৬ | ১২শ সংখ্যা

জয়তু দীপ্তিময়

শ্রীক্ষিতীশ রায়

রুদ্র তোমার দক্ষিণ মুখে বীর্যের বরাভয়
শঙ্কার পরাজয়,
তোমার সাধনা লজ্জাজড়িত ভীরু চিত্তের নয়
ভৈরব নির্ভয়!
অন্তবিহীন সুদুর্গমের পথে
একেলা পথিক একচক্রের রথে,
রাত্রি তোমারে রুধিবেনা কোনোমতে
জয়তু দীপ্তিময়!

অমারজনীর গহন গভীর তমসা
অগ্নিসায়কে হানিলে তাহারে সহসা।
তোমার পূজায় ভক্তহৃদয় মম
বিকশিত হোক রক্ত কমল সম,
বিদূরিত করো কুণ্ঠা কঠিনতম
জয়তু দীপ্তিময়।

———

লেনিন ক্লাব

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

লেনিন ক্লাব সোভিয়েট চীন সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বতোমুখী গঠনমূলক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক সৈন্যদলে এ ধরনের এক একটি ক্লাব আছে। সৈন্যদের নৈতিক, ব্যবহারিক ও সামরিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি। বলা বাহুল্য যে বলশেভিজমের অগ্নি-ঋষি লেনিনের উপর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যই এই ক্লাবের নাম লেনিন ক্লাব দেওয়া হয়েছে।

চীনের চাষী পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। সোভিয়েট-চীন বাহিনীর অধিকাংশই চাষী শ্রেণী হতে গৃহীত বলে তারা সর্ব্ববিধ কষ্ট সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। শয্যার জন্য মাত্র দুখানা সূতী কম্বল ছাড়া তাদের বিশেষ কিছু ছিল না, বাসের জন্য ছিল স্যাঁৎসেঁতে মেটে ঘর। তা সত্বেও তারা ক্লাবের ঘরটি লুণ্ঠিত আসবাব পত্রে এবং নিজেদের চারুশিল্পের সাহায্যে যতটুকু পরিপাটি ও সুদৃশ্য করা সম্ভব তার কিছু মাত্র কার্পণ্য করত না। সৈন্যাবাসের সবচেয়ে বড ঘরটি ক্লাব গৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট হত।

ক্লাব গৃহে প্রবেশ করতেই প্রথমে চোখে পড়ে লেনিন ও মার্কস্‌এর প্রতিকৃতির দিকে। শিল্পী সৈন্যেরা তাদের প্রাণ ঢালা শিল্প প্রচেষ্টা দিয়ে উল্লিখিত ছবি দুখানি এঁকেছিল। ছবির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য তাঁদের চোখগুলির অঙ্কন ভঙ্গী। দৃষ্টিতে ফুটে উঠছিল প্রতিভার ছাপ; দর্শকের দিকে তাঁরা যেন তাকিয়ে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রাচুর্য্য নিয়ে। মার্কসের চীনা নাম 'মা-কে-ঝু'; কিন্তু লাল ফৌজ তাঁকে 'মা-ট-হু-ঝু' বা দাড়ীওয়ালা 'মা' নামে অভিহিত করত। এই নামটি সম্ভবতঃ মুসলমান সৈন্যেরাই রেখেছিল। কারণ দাড়ীবিন্যাসে সুঅভ্যস্ত মুসলমান সৈন্যদের মার্কসের দাড়ীর উপর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। মোটের উপর সমগ্র সোভিয়েট বাহিনী মার্কস্ ও লেনিনকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় করত।

তারপর দেখা যায় লাল ফৌজের সম্মান পতাকা। সামরিক কৃতিত্ব, খেলাধুলা, রাজনৈতিক জ্ঞান, সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য সোভিয়েট বাহিনীকে ছোট ছোট পতাকা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তারা তাদের সম্মানের নিদর্শনগুলি ক্লাবেই ঝুলিয়ে রাখে। যে কোনও দর্শক ক্লাবের এই অংশটি দেখলে অনায়াসেই বুঝতে পারে যে এ সম্মান লাভের জন্য তারা বিশেষ ব্যগ্র এবং তার জন্য তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতাও আছে। প্রত্যেক পতাকার নীচে তাদের কৃতিত্বের কথা ও কৃতী ব্যক্তির নাম লেখা ছিল।

ক্লাবের অপরাংশে পুতুলদ্বারা রণনীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আনন্দের মধ্য দিয়ে এত সহজে রণনীতি শিক্ষাদনের আর কোথাও ব্যবস্থা আছে কিনা জানিনা; কিন্তু এই শিক্ষা পদ্ধতি আমার মনে হয় সবচেয়ে অধিক কার্য্যকরী। চীনারা পুতুল তৈরীতে সুঅভ্যস্ত। উৎকৃষ্ট

সৈন্য শিল্পীদের প্রচেষ্টায় নগর, সহর, হ্রদ, নদী, পাহাড়, সেতু, দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করে রাখা হয়েছিল। যথেষ্ট পুতুল-সৈন্য তৈরী থাকে, তাদের দিয়ে নকল যুদ্ধ করিয়ে লালফৌজকে আধুনিক রণনীতি শিক্ষা দেওয়া হত। অধিকাংশ সময়ই চীন যেখানে জাপানের নিকট পরাস্ত হয়েছে সে সমস্ত যুদ্ধের পুনরভিনয় করান হত। তাতে তাদের বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হত, কোন্ দৌর্ব্বল্যের দরুন তারা সেখানে পরাস্ত হয়েছে। তা ছাড়া ভবিষ্যৎ আক্রমণপন্থা ও শত্রুর ভৌগলিক সংস্থান বুঝিয়ে দেওয়াব জন্য নকল হ্রদ, নদী, পাহাড সহব প্রভৃতির যোজনা করে লালফৌজের অবস্থিত স্থানেব একটা চিত্র তাদের সম্মুখে ধরত,যা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক সৈন্যই সমভাবে বুঝত।

তার পাশেই ছিল হাসপাতাল বিভাগ। মানব দেহেব বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য বহু মৃন্ময় শরীরাংশ এখানে রাখা হয়েছিল। শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি এই সব প্রতিকৃতির সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হত। রোগ সংক্রামণ ও আকস্মিক অপঘাতেব পরিচর্য্যা প্রত্যেক সৈনিকের অবশ্য শিক্ষনীয় ছিল।

এই ক্লাবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এর পাঠাগার। এখানে সৈনিকেরা বসে চরিত্র পাঠ করত। প্রত্যেক সৈনিকের নোট বুক এখানে ঝুলান থাকত। সৈন্যদের মধ্যে তিনটি বিভাগ ছিল। যারা একশতের কম চরিত্র পড়েছে তারা প্রথম শ্রেণীর ; যারা একশতের বেশী তিনশতের কম চরিত্র পড়েছে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর , আর তৃতীয় শ্রেণীর তারা, যারা তিনশতেরও বেশী পড়েছে।

লেনিন ক্লাবের উদ্দেশ্য খুব সহজ—প্রত্যেকটি সৈনিকের জীবন ও কার্য্যধারাকে সংস্কৃতি ও ও কর্ত্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা। এর শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সরল, সহজ ও বোধগম্য। এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া, যাতে সৈনিকের কঠোব কর্ত্তব্যের পরও তাদের কাছে তা নিরস বা বিরক্তিকর বলে মনে হত না।

ক্লাবের দেওয়ালে বিবিধ সংবাদপত্র ঝুলিয়ে রাখা হত। সৈন্যদেরই দ্বারা গঠিত একটা সমিতির উপর দৈনন্দিন সংবাদপত্র সংগ্রহের কাজ ন্যস্ত ছিল। সংবাদপত্র সংগ্রহে তাদের একদেশদর্শীতা ছিল না। সোভিয়েট বা অ-সোভিয়েট উভয় রাষ্ট্রেরই প্রগতিশীল মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র সংগৃহীত হত। তবে 'রেড-চায়না-ডেইলি-নিউজ', 'ষ্ট্রাগল্', 'পার্টি ওযার্ক' প্রভৃতি সোভিয়েট-চীনের নিজস্ব সংবাদপত্র পাঠে তারা অত্যধিক উৎসাহী ছিল।

সোভিয়েট চীনের সংবাদপত্রগুলি তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি। নীচে তাদের একখানা সংবাদপত্রের বিবরণ দিলাম,—যাতে প্রত্যেকেই তাদের উন্নতির সম্বন্ধে একটা আভাস পেতে পারেন। ১৯৩৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'ওয়াং পাওতে' এই সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হ'য়েছিল। তাতে ছিল কমুনিষ্ট যুবসঙ্ঘ ও কমুনিষ্ট পার্টির দৈনিক ও সপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি, সোভিয়েট সাহিত্যিকদের লিখিত সংস্কৃতি ও প্রগতিমূলক গল্প ও প্রবন্ধ, দক্ষিণ কানসু প্রদেশের রণজয় সম্বন্ধীয় বেতার বিজ্ঞপ্তি, অবশ্য শিক্ষনীয় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কয়খানা গান ও চীনের অ-সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংবাদাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লাল ও কালো নামক দু'টি স্তম্ভ।

লালস্তম্ভে সৈন্যদের ব্যক্তিগত বা দলগত সাহস, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি প্রশংসাসূচক সংবাদ প্রকাশিত হয় আর কালস্তম্ভে থাকে তাদের দোষ ক্রটীর খবর যথা—রাইফেল অপরিষ্কৃত রাখা, পড়ায় অমনোযোগ, হাত বোমা বা 'বেয়নেট' হারান, ডিউটিতে ধূমপান, রাজনৈতিক পশ্চাৎবর্ত্তিতা ইত্যাদি কালস্তম্ভে মাঝে মাঝে হাস্যকর অনেক খবরও প্রকাশিত হয়। একবার অর্দ্ধপক্ক আহার্য্য সরবরাহের জন্য পাচককে আক্রমণ করে লেখা হ'য়েছিল ; অন্য একটিতে এক পাচক অভিযোগ করেছিল যে তার দলের লোকেরা খাবার সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করে। মোটের উপর লাল এবং কাল স্তম্ভ দু'টি সৈনিকদের প্রশংসা ও নিন্দা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাতে সৈনিকরা যতদূর সম্ভব ভাল হ'তে চেষ্টা ক'রে, কারণ কালস্তম্ভে নাম উঠলে তাদের পক্ষে অপমানের অবধি থাকেনা।

লালফৌজ টেবিলটেনিস্ খেলা খুব ভালবাসে। প্রত্যেক ক্লাবের মাঝখানে পাতা থাকে একটা বড় টেবিল। অবশ্য এই টেবিলে তাদের আহার ও খেলা দুই হত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। আবার কোনও কোনও ক্লাবে গ্রামোফোনও দেখা যায়। অবশ্য সেগুলি তারা অ-সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেনাপতিদের ও ধনীদের নিকট হ'তে লুঠ করে এনেছিল।

লালফৌজ অনেক খেলাতেই অভ্যস্ত ছিল। আরও নূতন কিছু আবিষ্কারে তারা ছিল সদা সচেষ্ট। অনেকটা পোকার খেলার মত সিজু-পাই নামক একপ্রকার তাস খেলা তাদেরই উদ্ভাবিত। আমাদের যেমন টেক্কা, সাহেব, বিবি প্রভৃতি, তাদেরও তেমনি বড় তাসের নাম 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'ধনিক সম্প্রদায় লোপ হোক' ইত্যাদি। ছোট তাসে আমাদের বন্দেমাতরম্ বা ইনক্লাব জিন্দাবাদের মত জাতীয় ধ্বনি লেখা ছিল। দলবদ্ধ হ'য়ে খেলবার মত তাদের মধ্যে অনেক খেলাই প্রচলিত ছিল। কমুনিষ্ট যুবসঙ্ঘ প্রত্যেক লেনিন ক্লাবের আনন্দ তালিকা হ'তে কর্ম্মসূচী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করত। এই তালিকায় গানের জন্য বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় বা আফিম্ ব্যবহার সৈন্যদের মধ্যে কড়াকড়ি ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ধূমপানের যদিও কোনও বিধি নিষেধ ছিলনা ; কিন্তু ধূমপান নিরোধের জন্য সর্ব্বদা প্রচার কার্য্য চালান হত। তবে সৈন্যেরা কখনো ডিউটির সময় ধূমপান করতে পেত না।

এখানে লেনিন ক্লাবের যে বিবরণ দেওয়া হ'ল তা কমপক্ষেও অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের। ইতিমধ্যে চীনের সর্ব্বদল সমন্বয়ের ফলে লেনিন ক্লাব আরও অনেক উন্নত হ'য়েছে।

আবর্ত্তন

শ্রীপরেশ নাথ সান্যাল

শতাব্দীর চক্রপথে সভ্যতার দ্রুত নিষ্ক্রমণ
যুধিষ্ঠির বনবাসে জয়মাল্য পেলো দুর্য্যোধন।
ইষ্টকের কারাগারে মুক্তবেণী দ্রৌপদী ঘুমায়
দুঃশাসন অট্টহাসে—হৃতবাজ্যে পাণ্ডব কোথায় ?
মেদস্ফীত ধনিকের কামকক্ষে নারী অসম্বৃতা
দাশরথি সত্যসেবী, রাবণের অঙ্কে কাঁদে সীতা।
দুর্ব্বলের অন্ন নাই রুক্ষ দেহ ধূসর ধূলায়
দারিদ্রের নারায়ণ বণিকের চামর ঢুলায়।
কংশেরা নিশ্চিহ্ন আজি তাই বলে মরেনি দানব
বিজ্ঞানের যড়যন্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন মানুষের শব।
যান্ত্রিকের দাম্ভিকতা বিষবাষ্পে নিত্য বিচ্ছুরিত
জার্ম্মানীর রাষ্ট্রপতি ডিক্টেটারী অহঙ্কারে স্ফীত।
বাল্মিকীর কাব্যগত—ছন্দবাহী স্তব্ধ বৈতালিক
সাহিত্যের মুক্তিদাতা নগরের ধূর্ত্ত সাংবাদিক।
শূন্যমনা শকুন্তলা সৌধনীড়ে মুক্তি-প্রতীক্ষায
সভ্যতার চক্রতলে সত্য ত্রেতা চূর্ণ হয়ে যায়।
ফ্রয়েডীয় দৃষ্টি দিয়ে বৈষ্ণবীয় প্রেম বিশ্লেষণ !
বাস্তবের ঘূর্ণীপথে সভ্যতার রূঢ় চক্রমণ।

পেট-কাটা উপেন

শ্রীহেমেন রায়

চুনীদার সঙ্গে বহুদিন পরে হঠাৎ দেখা। তিনি মজলিসী মানুষ। বললাম,—চুনীদা, তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দু'একটা কথা বল। চুনীদা আরম্ভ করলেন :—ছেলেবেলার কথা ঠিক নয়, নেহাৎ বুড়ো বেলারও নয়। তবে, হাঁ, অনেকদিন হয়ে গেছে। কোম্পানীর বাগানে ছেলেরা খেলাধূলো করতে আসে। বয়স্করা কেউ বেড়ান, কেউ কেউবা বসে নানা প্রসঙ্গ আলাপ করেন। পাদ্রী সাহেবরা "একটি দুষ্ট বালকের ভাল হওয়নে"র কথা প্রচার করেন। একদিন সে কি কাণ্ড! দেখে শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কতকগুলি ছেলে এক কোণে জটলা করছে, আর এক কোণে অপর এক দল উত্তেজিতভাবে কি আলোচনা করছে। তাদের মধ্যে একজনের অস্বাভাবিক হাত মুখ নাড়া ও দেহের ভঙ্গী দেখে এগিয়ে এলাম—ব্যাপারটা কি বুঝতে হবে। মনে হল এরা স্কুলের ছাত্র। একজন ইংরেজী ক'রে তখন বলছে—ওয়ান ব্রিক অন দি হেড্, ফার্ষ্ট ব্যাট্‌ল্ হাফ্ ডান।

মন্ত্রশক্তি কি মন-মাতান শক্তি বলতে পারি না। নিমেষের মধ্যে জঙ্গলটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্ত্ত পরে মৌমাছির ঝাঁকের মত কি সব মাথার ওর দিয়ে সোঁ সোঁ করে উড়ে আসতে লাগল। তারপর—ওরে বাপরে—দৌড়, দৌড়। যেদিকে বেশী জনতা ছিল সেদিকটা একদম সাফ এবং আর একটা যে ছেলেদের দল দেখা গিয়েছিল তারা সব উধাও। দুটো একটা ইট পাথরের টুকরো আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

কেন অকালে এ ক্ষুদ্র প্রলয় বুঝতে না পেরে ভাবতে ভাবতে বাগানের নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ অপর দিকটায় যাচ্ছি, মন কৌতূহলে ভরা, এমন সময় আমাদের পাড়ার একটী ছেলেকে দেখলাম বাগানের সীমানার রেলিংয়ের ওধারের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল ওকেও যেন "মাথায় এক ইট আর যুদ্ধে অর্দ্ধেক জিতে"র ঝাঁকে দেখেছিলাম। আশ্বস্ত হলাম। ভিতরের খবরটা জানা যেতে পারে। তবু তখনই কেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধটা নিণাত হচ্ছে না বলে মনে একটা খোঁচা বোধ করছিলাম। সত্যই ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই আকস্মিক বিপৎপাতে কেই বা সুখী হতে পারে? কর্ম্ম জীবনের কষ্ট-দুঃখের খাটুনীর অবসানে মন ও দেহকে একটু হাল্‌কা করার জন্য যে নিয়মিত দু'চার পা চলে পায়ের অস্তিত্বে সন্দেহ দূরের সুযোগ পাই সেটার এমনতর বেঁয়াড়া ব্যাঘাত হওয়ায় আস্তে আস্তে গঙ্গার তীরের দিকে এগুলাম। আর এ পাজী জায়গায় আসা হবে না। চিত্ত বিনোদনের এইটুকু স্থানও কালের মালিকানি স্বত্ব আমার নাই ভেবে মনটা একটু যে তত্ত্বদর্শীতার দিকে ঝোঁকেনি তা হলফ্ করে বলতে পারি না। ব্যক্তিগত এতটুকু অধিকার সাতশ' বার চাইব। হয়ত বা মনের অবচেতন তলে গুমরে উঠেছিল,—"গঙ্গে গতি দায়িনী।" নৈলে আমি বৈদিক মানুষ

হয়ে—যার এদিক ওদিক নাই— গঙ্গার দিকে মনের অজ্ঞাতসারে কেন চলেছিলাম ? যাকে "গঙ্গা—পানে পা" বলে সেই পরের কাঁধে চড়ে চলে যাওয়ার চরম অবস্থা কিন্তু হয় নাই। হয়ত সুপ্ত মরমে জেগেছিল সেই পরম সত্য, যাতেকরে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তগুলিই মানব জীবনের চরম চরিতার্থতার হেতু ও সেতু কায়েম বা সাব্যস্ত হয়। মানব জীবন একটা একটানা স্রোত, কিন্তু কিসের ? মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত সাজিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু কি সার আছে ? দুঃখের মুহূর্ত্ত ও সুখের মুহূর্ত্ত স্মৃতি হযে থাকে। তারাই দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্নের খুঁটি বা ভিত্তি। এই যে ছেলেটি এত লোকের সুখ শান্তি ভঙ্গ করলে তার এতে সুখ হ'ল, না দুঃখ হ'ল জানতে বেজায় ইচ্ছা হ'ল। কেন হ'ল ? কারণ ইচ্ছার উপর কোন টেক্স নাই।

এখন থেকে গঙ্গার ধারে বেড়াই। এ বেড়ানটা উপলক্ষ্য হযে একটা পরাৎপর, সারাৎসার জ্ঞান দান করল। চৈতন্যের উদয় হ'ল। ওখানে দেখি পাটের কল, পাটের গুদাম, তিল-তিসি-সরষের আড়ত, ও তৎসংক্রান্ত বিষয় কর্ম্মের লোক আর মোক্ষকামী, পাপ-ক্ষয়াভিলাষী স্নানার্থীরা বেশ মিলে মিশে চলা ফেরা করছে। জলজ্যান্ত পরকাল ও ইহকাল, কল্পনা ও বাস্তবের এমন সুন্দর সমন্বয় কোন মহামানব করে যেতে পারেন নাই। কথায় বলে যাবত বাঁচি তাবৎ শিখি। শিক্ষার আর অন্ত নেই। তবে শিক্ষা ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ দান লোকে এইখানেই পাচ্ছে। এরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে, অবশ্য প্রেমে পাগল হয়ে শেখাচ্ছে যে হরিনাম যতটা হ'ক, তার চাইতে বেশী নগদ টাকাই সত্য। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।

একদিন বেড়াচ্ছি, নিঃসঙ্গ একাকীই, এমন সময় দূর থেকে দেখি একটা অঘাটায় কয়েকটা লোক বসে জমাটি করে আছে। কাছাকাছি গেছি, তখন কাণে এল কে একজন বলছে 'অসার খলু সংসারে সারৈব সরোজাননা— অর্থাৎ এ সংসার অসার, একমাত্র হরিপাদ-পদ্মই সার।' চমকে উঠলাম। এ আবার কোন্ পণ্ডিত এখানে টোল খুলে বসলো! উৎকর্ণ হযে আছি, আর কি কাণে আসে। নয়ন ত নিরীক্ষণ করছিলই, অনাহত নাদ বাধা বিঘ্ন মানে না বটে, তবু একটু সাহায্য করে দিলে সটান্ মর্ম্মস্পর্শ করতে পারে। তাতে বেশী পুণ্য সঞ্চয় সম্ভব। জল নিজের সম উচ্চতা বা লেভেল খুঁজে নেয়। তবু একটা নালা কেটে দিলে জমা জল শীঘ্র নেমে যায়। ইঞ্জিনিয়ারের কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা। ডান দিকে চেয়ে আছি, বাঁ চোখের নৈঋ‌র্ত কোণে কার ছায়া পড়ল। সচকিতে চেয়ে দেখি আমাদের পাড়ার সেই ছেলেটি এগিয়ে বলল—'বামাচরণ, কি করছিস্ ?' উত্তর এল—সব তাঁর ইচ্ছে। মানুষে কিছু করতে পারে না। সন্ত (পাড়ার ছেলেটির নাম) আবারও বলল—তবু ? ফের উত্তর হ'ল—মাঝিদের কাছে ধর্ম্মের সত্যার্থ প্রচার হচ্ছে।

তবে তোর দেরী আছে। আমি এগুই, বলে সন্ত হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল। আমিও পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে ডাকলাম—সন্ত ও সন্ত।

সন্ত মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখে প্রথমটা একটু হতভম্বের মত হ'ল। তারপর নিজেকে

সামলে নিয়ে বলল—কি বলছেন? আমি তার হাত ধরে কাছে একটা যে খালি জেটি ছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে কোম্পানীর বাগান থেকে আজ পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবারণ করতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলাম।

সন্তু বলল—ও হচ্ছে বামাচরণ। চাষাভূষো, মাঝিমল্লা, কলের কুলী, মায় ইস্কুলের ওপর ক্লাশের ছেলেদের ধরে পেট-কাটা উপেনের দল গড়ে দিচ্ছে।

সর্ব্বনাশ! এ ছোকরা বলে কি? পেট-কাটা উপেন! পেট কেটে গেলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তা সন্তু, ও কি কথা বলছ? পেট-কাটা মানুষ কি বাঁচতে পারে? সে অতি বা অমানুষ জাতীয় একটা কিছু হবে, শুধু মানুষ কিছুতেই নয় ভেবে প্রশ্ন করলাম—সে কে বল দেখি? কেন এ নাম হ'ল তার? আর দল গড়ছেই বা কেন।

সন্তু যা উত্তর করল, তার অর্থ হচ্ছে এই যে, উপেন অতি বা অ—পতঙ্গ, মাতঙ্গ, পশু, পক্ষী, বা ভূত প্রেত কিছুই নয়। স্রেফ্ মানুষ, ভাল ঘরের ভাল ছেলে। মাথার ঘি বোধ হয় একটু টগবগে রকমের। অবশ্য ঝড়ু মাঝি বলে, আপনারা যাকে বলেন বড় মাথা, আমরা গরীবরা তাকেই বলি বাইয়ের ব্যামো। আসতে উপেন হচ্ছে নানা রকম খেয়ালের খেয়ালী, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, বড় ধাঁচের দল একটা চাই-ই চাই। সবাই তাকে মানবে এমনি ভাবে সে চলা ফেরা করে। বামাচরণ অনেক রকম খেলা ধুলা কসরৎ, ব্যায়াম, ম্যাজিক ট্যাজিক জানে। দুর্দ্দান্ত সাহসী, তার সঙ্গে ছোটলোক ভদ্রলোক অনেক জোটে। একদিন সে হাতের সাফাই দেখাবার জন্য একটা ছোরা হাতে ক'রে বলল কেউ একজন পেটের চামড়ার উপর পাকা কলা রাখুক, আমি ছোরা দিয়ে শুধু কলাটিকে কাটব, পেটের কিছু হবে না। দর্শকদের মধ্যে কেউ সাহস ক'রে পেটের কাপড় খুলে শুতে চাইল না। উপেন রেগে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—যত বেটা ভীরু কাপুরুষ! খেলা দেখা হবে না, ছাই হবে?

মর্য্যাদায় আহত দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠল,—বেশত, তুমি ত সাহসী বীর আছ। তুমি পেট খুলে শুয়ে পড় না বাপু।

সবাই জোর জার সুরু করে দিল। অগত্যা উপেন সাহসভরে পেটের কাপড় সরিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে বলতে লাগল—পরেশ, আমার পেটে একটু তেল লাগিয়ে দাও দেখি। না হলে আমার চামড়ার দোষে বামাচরণের নির্দ্দোষ ছোরার বদনাম হয়ে যাবে। আচ্ছা বামাচরণ, তোমার ছোরার ধার কি রকম?

বামাচরণ রসিকতা আরম্ভ করেছিল। বলল—প্রবল তীক্ষ্ণ, জল কাটা, শেওলা কাটা ত যায়ই। খোলা ছাড়িয়ে দিলে পাকা রম্ভাও কেটে যাবে।

একজন উপেনের পেটে তেল লাগিয়ে দিল। উপেন একদম বেপরোয়া নির্ভীক। সাবাস উপেন! এরই নাম ত বীরাচার। বামাচরণ সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বলল—এই ছোরার ধার পরীক্ষা করুন। একটু ঠেকিয়ে দিলে লোহা দু'টুক্‌রো হয়ে যাবে। বিশ্বাস না হয় হাত দিয়ে

দখুন, দেখতে গিয়ে আঙ্গুল যদি কেটে রক্তারক্তি হযে যায তাহলে আমি কিন্তু দায়ী নই। তিন গাত দূর থেকে লাফিযে এসে আমি ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে এক কোপে কলা দু ফাঁক করে দেব। বামাচরণের বলাও যা—করাও তা। তিন হাত পেছিযে গিয়ে এক লম্ফে উপেনের ধারে এসে পড়ল। উপেন নির্নিমেষ, ডোণ্টো কেয়ার। তারপর বামাচবণ উপেনের দিকে চেয়ে ছোরাটা ঘোরাতে লাগল। দর্শকগণ আশঙ্কা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায শিউরে উঠে মৃদু কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগল—যদি বামাচরণের তাগ ফস্কে যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয তাহলে কি হবে? উপেনের গ্রাহ্য নাই। চারিদিক থেকে হাততালি পডতে লাগল। আলবাৎ বীর বটে। এইবার শেষ ঘোরান। উপেন আস্তে আস্তে কলা ঝেডে নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে উঠল—বামাচবণ, কাজটা কি ভাই ভাল হবে? যাঁহা বলা তাঁহা উঠে পডা। সেই থেকে ওর নাম হযে গেছে পেট-কাটা উপেন। ঐ নামেই ও বিখ্যাত।

আমি বললাম তা যেন হ'ল। কিন্তু দল গডছে কেন?

সন্তু বলল—পেট-কাটার গুরুস্থানীয কে নাকি বলেছে যে ওর কুষ্ঠিতে সেনাপতি যোগ আছে।

আমি বললাম—তাতে কি হ'ল।

সন্তু উত্তর করল—বামাচবণ ঐ কথা শুনে বলেছে—দেশ পবাধীন, তাতে কোন দুঃখু নেই। আমি দুটো পথ জানি, তার একটা না একটা লাগিযে তোকে সেনাপতি বানিযে দেব।

আমি কৌতুক বোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—আশ্চর্য্য! কি কি দুটা পথ?

সন্তু বলল—বামাচরণ বলে, একটা হচ্ছে জয়যুক্ত সেনাপতিত্বের, আর একটা হচ্ছে উদ্দাম গর্ব্বের সেনাপতিত্বের। প্রথমটা করতে একটু দেরী আছে বলে দ্বিতীয়টা আগে আরম্ভ করেছে।

ভারী অদ্ভুত লাগল। মনে যেন কণ্ডুয়ন অনুভব করলাম। জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না—সেকি রকম সন্তু? সন্তু জবাব দিল—বামাচরণের কথা তা হলে শুনবেন? উপেন তার কাছ থেকে শুনে এসে কথায় কথায বলে, জগৎটা একটা বিরাট রঙ্গমঞ্চ। এখানে একটা শুভঙ্কর না করে যেতে পারলে কি আর করলাম? যে যার পার্ট ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক'রে যেতে না পারলে সেখানে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেব? মাবিত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার।

বামাচরণ শুনে বলল, নিশ্চয়ই তুই একটা কেষ্ট বিষ্টু হতে জন্মেছিস্। কিন্তু একটা বিষয় সাবধান ক'রে দিই। যে রকম তোর বুদ্ধি ঝাঁঝাল, নাকে কাণে তুলো গুঁজে থাকিস্। ভয় হয় পাছে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি উবে যায়। তাহলে অভাগা দেশের গতি কি হবে? উপেন তখন তার ভাবী জীবনের কথা বলে আর নিজেকে বড করা সম্বন্ধে দৃঢ সংকল্প জানায়। এবং জিজ্ঞেস করে বামাচরণ তাকে কি সাহায্য করতে পারে।

বামাচরণ কাজের মানুষ, সে ফট্ করে বলে বসল, সম্প্রতি তোকে সেনাপতি বানিয়ে দিচ্ছি। স্বাধীন দেশ হলে সৈন্যবিভাগে চলে যেতে বলতুম, তা যখন নয়, এখন সেনাপতি যোগ মানে দারোগা, ডাকাত, কাটা ফাঁড়ার ডাক্তার অথবা মাংসের দোকানওয়ালা হওয়া। তা নৈলে ত মেলে না।

উপেন শুনে মুষড়ে পড়ল। তাই তাকে চাঙ্গা করার জন্য বামাচরণ আবার বলল- বেশ, তুই না হয় দেশ সেবায় ঢুকে যা, ঐ পথটা আজকাল বেশ খোলা। আর যখন নাই কোন গতি, হয়ে যাও একটা দলপতি, বুঝলি? এটা মক্স করতে করতে তোকে সর্ব্বসিদ্ধ সেনাপতি বানাব। এখন কোন রকমে সেনাপতি যোগটাত মিলিয়ে ফেল, কি বলিস?

উপেন উল্লাসভরে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই বামাচরণ বলল—সে কিছু মুস্কিল হবে না। ঐ টাইটেলটা পেলে দেখবি একদিন তোকে বীরবেশে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে আতসবাজী পোড়াতে পোড়াতে রোসনাই বাদ্য বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে যাব এক রাজার পুরীতে, একদম খাঁটী যুদ্ধক্ষেত্র হবে সেইটে। সেখানে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ করতে খালি বীরবেশকে নটবর বরবেশে পরিবর্ত্তিত করে ফেললেই হয়ে যাবে। পত্নীর পতিত্ব ত সব পতিত্বের সেরা, কথাটা বলে বামাচরণ ভঙ্গীটা করল যেন একটু গর্ব্ব অনুভব করছে। গঙ্গাবক্ষের স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শে নিদ্রালুতার আবেশে চোখ ভারী হয়ে আসছিল। তার ওপর যেন স্বপনপুরীর রূপকথা আকুল করে তুলল। বললাম আজ আর থাক। আর একদিন বাকিটুকু শুনব'খন।

ভাবতে ভাবতে ফিরলাম যে সৃষ্টির গোজামিল চালিয়ে দেওয়ার কি অদ্ভুত শক্তি।

পুরুষের প্রতি

[কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি, এল]

আমাদের শুনি সব তাতে দোষ—তোমরা নিছক ভাল,
তাইত নিতুই নানা অছিলায় তোমরা যে বিষ ঢাল।
আমরা বেড়াই সাজিয়া গুজিয়া হিল উঁচু জুতো পায়,
নানা ধরনের রঙ্গীন সাড়ী জড়ায়ে মোদের গায়।
পথে যেতে যেতে আমরা হাসিয়া ঢলে পড়ে নাকি থাকি,
কলেজের পথে শুনেছি আমরা—কিছুই রাখিনা বাকী।
লেকে ডুবে মরি বিষ খাই আর কত কিছু করি দোষ,
তাইত কেহ বা গালি দেয়—কেহ করে থাকে আপশোষ।
তোমরা সাজিয়া চল নাক' পথে? দেখিও চক্ষু খুলে,
মেয়েদের দেখে পায়ে পায়ে কেন এসে থাক ছুলে ছুলে।

কত ঢং কর মেয়েলি ধরণে—হেসে কর লুটোপুটি,
ভেবে দেখ কত বেয়াদপি কর—কলেজ হইলে ছুটি।
তোমরাও লেকে ডুবিয়া মরেছ—বিষ করিয়াছ পান,
কাগজে দেখেছি—তবু তোমাদের গাহিয়াছে জয় গান।

জানি আমাদের পতন হয়েছে—মাথাটি হ'য়েছে নীচু,
তা'তে কি শুধুই মেয়ে অপরাধী—তোমাদের নাহি কিছু?
বিবাহের কথা উঠিলে তোমরা—হাজার হাজার হাঁক
কি করে মেয়ের বাবা দেবে টাকা—সে খোঁজ কভু কি রাখ
মাসের প্রথমে মাহিনা আনিয়া মাস চলে কোন মতে,
কত জ্বালা কত বেদনায় পিতা ভাসে যে ব্যাথার স্রোতে।
দিন চলে নাক'—তাতে যদি বে'তে হাজার ঢালিতে হয়,
ভেবে দেখ আজ সমাজের স্রোত কোন দিকে দ্রুত বয়।
ব্রহ্মচারিণী করনি মোদের—'শিক্ষা' দাওনি কভু
নিজে লম্পট হইয়া আজিকে—সাজিছ সাধু ও প্রভু!
তোমাদের হাতে প্রচারের ভার অবাধে মোদের দোষ,
কলঙ্ক কথা—রটায়ে মিটাও জীবনের আপশোষ।
দোষী সমাজের নেতারা সবাই—মোদের একারই নয়,
মোরা চিরদিন চির অপরাধী—তোমাদের হক্ জয়!

প্রতিযোগিতা

অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ

জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিযোগিতার প্রভাব অনুভব করিয়া থাকি এব নিজেব উপর না হইলে প্রতিযোগিতার সুফল পাওয়া যায় বলিযা মনে করি। তবে যদি নিজে প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হই তাহা হইলে এইরূপ অন্যায় ও গলাকাটা (cut throat) প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অনল উদ্‌গীরণ করি।

বাপ মায়েব স্নেহ কে অধিক পাইবে এই লইযা জন্মগ্রহণ করার পর হইতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু মাতৃস্নেহের একচেটিয়া অধিকাব পাইযা বঞ্চিত হইতে থাকে নতুবা তাহার বাঁচিযা থাকিবার কোন উপায থাকিত না। জীবনে যে প্রতিযোগিতাব সংগ্রাম আবস্ত হয গোড়াতেই তাহা মনোপলির ভিত্তিতে গডিযা উঠে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয তাহা নিন্দার্হ নহে বলিযা বিবেচিত হয়। ছাত্রগণ ক্লাসে নানাভাবে অধ্যাপকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিযা প্রত্যেকেই কোন না কোন অধ্যাপকের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করে। অনেকেই আবার অধ্যাপকদের বাড়ীতে যাইয়া অধ্যাপক পত্নীর সঙ্গে মাসীমা সম্পর্ক পাতাইয়া থাকে। ছাত্রমহলে জনপ্রিযতাব জন্য অধ্যাপকদের মধ্যেও বেশ প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়। প্রাযই শুনা যায় এক অধ্যাপকেব প্রিয ছাত্র অন্য অধ্যাপক কর্ত্তৃক বিডম্বনা ভোগ করিযাছে। পাড়ার মধ্যে কোনও শিক্ষিত যুবক বিশেষ করিযা উপার্জ্জনক্ষম থাকিলে বীমা কোম্পানীর দালাল ও মাসীমাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয এবং তাহাকে নিমন্ত্রণ করিযা চা জলখাবার ও জ্যেষ্ঠা অনূঢ়া কন্যার সঙ্গীতে আপ্যাযন করিবার জন্য কন্যাজননীদেব মধ্যে দস্তুরমত tug of war আরম্ভ হয়। তাহাতে আপত্তিকর কিছুই নাই। কিন্তু কন্যারা নিজেরা যদি প্রতিযোগিতা চালায তাহা হইলে সমাজে গুঞ্জন আরম্ভ হয। এক সময়ে বন্যা দুর্ভিক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনই একমাত্র সেবা প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, সংকটত্রান, জমিযৎ উলিমা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুর্দ্দশা কি পরিমাণ কমিয়াছে তাহা বলা শক্ত। প্রতিযোগিতার চাপে দেশী অন্ধ আতুর ভিক্ষুকরা মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী ভিক্ষুদের নিকট হটিযা যাইতেছে, স্থানীয ঘটকরা সহরের প্রজাপতি অফিসের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইতেছে। আমাদের আই, এ, ও বি, এ কলেজগুলির সঙ্গে প্রবলভাবে পাল্লা দিতেছে হোমিওপ্যাথী কলেজ, tailoring কলেজ, মোক্তারশীপ কলেজ প্রভৃতিরা। টকীর যন্ত্রণায় দেশী যাত্রা থিয়েটার টিকিতে পারিতেছে না, রেডিও কর্ত্তৃক গ্রামোফোন কাবু হইতেছে, ইলেকট্রিসিটি গ্যাসকে, মোটর রেলকে এবং বাস ট্রামকে বিপন্ন করিতেছে।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আহির গ্রামে একটা স্কুল হইলে জাহির গ্রামে দুইটা হয়। শনিবাবের চিঠির সঙ্গে পাল্লা দিতে রবিবারের লাঠি বাহির হয়। খেয়ালীতে কপালীতে, দীপালীতে ভোজালীতে প্রতিযোগিতার শেষ নাই। পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গাল ও পশ্চিম বঙ্গের ঘটী, আসামী ও বাঙ্গালী, মাবাঠী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতিব প্রতিযোগিতা স্থানে স্থানে হাস্যরসের সৃষ্টি কবিলেও হিন্দু মুসলমানের ও ইংবাজ জার্ম্মাণিব প্রতিযোগিতা হাস্য বস ছাড়িয়া ভীষণ আকার গ্রহণ কবিতেছে।

প্রতিযোগিতার ফল ভাল কি মন্দ বলা শক্ত, আমাব কোন অনিষ্ট না হইলে প্রতিযোগিতা ভাল কিন্তু আমার অনিষ্ট হইলে প্রতিযোগিতা অন্যায় ও অসঙ্গত। ট্রাম বাসে প্রতিযোগিতার ফলে যখন নাম মাত্র মূল্যে ভ্রমণ কবিতে পাবি তখন প্রতিযোগিতাব গুণগান করি কিন্তু পাঞ্জাবী বাসওয়ালাদের প্রতিযোগিতায আমার বাস ব্যবসায নষ্ট হইলে তাবস্বরে এইরূপ গলাকাটা প্রতি-যোগিতাব নিন্দা করি। প্রতিযোগিতায জাপান যখন বৃটিশ পণ্য হটাইযা দেয এবং ক্রেতা হিসাবে আমবা অল্প মূল্যে পণ্য ক্রয কবি তখন আনন্দই হয কিন্তু জাপানেব প্রতিযোগিতায যখন আমার বস্ত্র ব্যবসাযের ক্ষতি হয তখন ভিন্ন মত পোষণ করিতে আরম্ভ করি। নূতন উকীল প্রতিযোগিতায় কাবু হইয়া যখন গৃহশিক্ষকতা করিযা আয বৃদ্ধিব চেষ্টা কবে তখন তিনি ওকালতিতে প্রতিযোগিতার বিষময় ফল দেখিতে পান কিন্তু এটর্ণী সলিসিটবগণ প্রতিযোগিতা বন্ধ করিযা যখন মোটা টাকা লাভ কবেন তখন আমবা সলিসিটবদেব মনোপলি ভাঙ্গিযা দিতে বদ্ধপরিকর হই।

অন্য ক্ষেত্রেব প্রতিযোগিতাব কথা ছাড়িযা ব্যবসাযে প্রতিযোগিতাব কথা আলোচনা করা যাউক। কোন জিনিষের বাজাব দবে বিক্রয করিবাব ক্ষমতা সকলেব থাকিলে ঐ জিনিষ বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা আছে বলিতে হইবে। কিন্তু আইনতঃ, বা কার্য্যতঃ যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেহ ঐ জিনিষ বিক্রয করিতে না পাবে তাহা হইলে ঐ জিনিষে প্রতিযেগিতা নাই। ইহা ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেব একচেটিযা কাববাব বা মনোপলি। সচবাচর ক্রেতাদর মধ্যে মনোপলি হয না, বিক্রেতাদের মধ্যেই হয। যেমন ধরা যাউক কযলা। যদি ভারতেব সকল কযলার মালিক একই প্রতিষ্ঠান হয এবং বিদেশ হইতে কয়লার আমদানির সুবিধা না থাকে তাহা হইলে ঐ কযলাবিক্রেতা যে কোন দামে কযলা বিক্রয় করিতে পারে। অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দামে কযলা বিক্রয় করিতে পারিতেছে না বলিয়া কয়লা বিক্রেতাকে মনোপলিষ্ট বলিব। কিন্তু ধরা যাউক ভারতের কয়লা ক্রেতা একটি প্রতিষ্ঠান (ভারতীয় রেলকোম্পানীসমূহ) এবং বিদেশে কয়লা রপ্তানি হওয়ার সুবিধা নাই। তখন কয়লক্রেতা অল্পমূল্যে কযলা ক্রয করিবে। অন্য ক্রেতা নাই বলয়া কয়লাক্রেতাকে মনোপলিষ্ট বলিব। কিন্তু সচরাচর এইরূপ বড হয় না। সেজন্য মনোপলির ক্ষেত্র সাধারণতঃ জিনিষ-বিক্রয়েই সীমাবদ্ধ।

অনেক সময় বৈধ ও অবৈধ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে অবৈধ প্রতিযোগিতা বলিয়া কিছু নাই। প্রতিযোগিতার অর্থই হইল সমকর্ম্মীদের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া নিজের ব্যবসায় চালু করা। কোন সমব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ করিলেই প্রতিযোগিতা অবৈধ হয় না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নাম মাত্র মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিয়া সমব্যবসায়ীদিগকে হারাইয়া দিতেছে এবং প্রতিদন্দ্বীদের বিলোপ করিয়া অধিক মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতেছে এবং এই ভাবে পূর্ব্ব ক্ষতি সুদে আসলে আদায় করিতেছে। বিদেশী ব্যবসায় জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে আসল খরচ (cost price) হইতেও কমমূল্যে বিদেশে বিক্রয় করাকে ডাম্পিং (dumping) কহে। জাপান প্রায়ই এইরূপ করিয়া থাকে। সকল অবস্থায় ডাম্পিং অনিষ্টজনক নহে এবং অবৈধও নহে। কিন্তু দেশের পক্ষে অনিষ্টজনক হইলে সকল রাষ্ট্রই ডামপিং বিরোধী উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু সস্তায় বিদেশী জিনিষ দেশে আসিলেই তাহাকে অবৈধ গলাকাটা প্রতিযোগিতা বলা চলে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় ও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার অধিকারের উপর প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই অধিকার আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা এই অধিকার সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই আমরা অল্পমূল্যে বিক্রয় ও অধিক মূল্যে ক্রয় করি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অনেক বিষয়ে আইন করিয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয়। প্রতিযোগিতা থাকিলে পোষ্টকার্ডের দাম বা টেলিগ্রাফ করিবার খরচ হয়ত আরও কম হইত কিন্তু শাসন সংক্রান্ত সুবিধার জন্য অন্য কাহারও ডাক বহন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় না। প্রতিযোগিতা করিয়া হারাইতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদি আমরা আরও অল্পমূল্যে পাইতাম। কিন্তু আপাততঃ সুবিধা হইলেও এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা না থাকাই ভাল। গ্রন্থকার নিজের বই অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয় এবং আমরা ক্রেতা হিসাবে লাভবান হই না সত্য, কিন্তু গ্রন্থকারকে এইভাবে লাভের সুযোগ না দিলে গ্রন্থাদি প্রণয়নে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশের উন্নতি হইবে না। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কপি রাইট ও পেটেণ্ট রাইট দিয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয়।

রেল লাইন, ট্রাম, ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতির ব্যবসায়ে সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হয় না। পাশাপাশি দুইটি ট্রাম কোম্পানী থাকিলে প্রত্যেককে হয়ত মূল্য কমাইতে হইত কিন্তু দ্বিগুন লাইন ও কর্ম্মচারীর খরচ বেশী হইত এবং শেষ পর্য্যন্ত অধিবাসীদের লোকসানই হইত। সহরে কয়েকটি বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান থাকিয়া প্রতিযোগিতা করা অপেক্ষা একটা বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠানকে একচোটিয়া অধিকার দেওয়াই লাভ। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শাসন থাকা দরকার। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের ইহাও একটি কারণ।

আইনের বাধা না থাকিলেও কার্য্যতঃ প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া আমরা অনেকস্থানে অল্পমূল্যে বিক্রয় ও অধিক মূল্যে ক্রয় করি। ধান পাট প্রভৃতির জনকয়েক বড় বড় ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে অথচ বিক্রেতা কৃষকগণ বিক্রয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। ফলে কৃষকগণ অল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতেছে। মজুররা নিজেদের শ্রম বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা করে কিন্তু মিলওয়ালা নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিযোগিতা বন্ধ করিযাছে। মজুরের চাহিদা বৃদ্ধি হইলে মিলওয়ালারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে না। করিলে মজুরী বৃদ্ধি পাইত। দরকষাকষি করিবার জন্য বুদ্ধি বা ক্ষমতা একজন সাধারণ মজুরের নাই, ফলে তাহারা কমমূল্যে শ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য অনেক রাষ্ট্র আইন করিয়া শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই সব দেশে একজন শ্রমিক নিজের ইচ্ছামত মজুরী গ্রহণ করিতে পারে না। এই অর্থে শ্রমিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব হইযাছে বটে কিন্তু ইহাতে শ্রমিকগণ লাভবান হইযাছে। কারণ দল বাঁধিয়া দরকষাকষি করিতে পারে বলিযা তাহারা অধিক পারিশ্রমিক পায়।

কলিকাতায় মৎস্য ব্যবসায় কতিপয় জেলে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নূতন কেহ এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে মৎস্য ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ। কলিকাতার ইউরোপীয়ান ও অনেক দেশীয ব্যক্তি চৌরঙ্গী অঞ্চলের বিলাতী দোকান হইতে জিনিষ ক্রয় করেন। একই জিনিষ তাহারা অধিকমূল্যে কযেকটি বিশিষ্ট দোকান হইতে ক্রয় করেন। অন্য বিক্রেতারা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিযা পারে না। সিমেণ্ট বিক্রয়ে কাহারও একচেটিয়া আইন-সঙ্গত অধিকার নাই। কিন্তু কযেকটি বিরাট সিমেণ্ট প্রতিষ্ঠান এমনভাবে এক কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে যে অন্য কোন নূতন ব্যক্তি সিমেণ্ট বিক্রয় করিতে পারিবে না। কোন ব্যবসাযে প্রতিযোগিতা আছে কিনা জানিতে হইলে বুঝিতে হইবে ঐ ব্যবসায়ে অধিক লাভ হইলে অন্যান্য ব্যবসায় হইতে মূলধনাদি আনিয়া ঐ ব্যবসায়ে নিযোজিত করিবার উপায় আছে কি না। হয়ত সমুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণে বা এরোপ্লেন নির্ম্মাণে আমাদের দেশে কোন আইনসঙ্গত বাধা নাই। ঐ সকল ব্যবসায় লাভজনক হইলেও কার্য্যতঃ অন্য কেহ এই সকল ব্যবসায়ে আসিতে পারে না। সুতরাং লাভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল ব্যবসায়ীর ঐ ব্যবসায়ে নামিবার সম্ভাবনা থাকা চাই। অনেক সময় ইহাও দেখা যায় যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কোনও জিনিষ উৎপাদন করিতেছে কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে অথবা দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেছে। ইহাও একপ্রকার মনোপলি। প্রতিযোগিতা কার্য্যকরীভাবে থাকিতে হইলে অনেকগুলি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাকা চাই এবং কেহই পৃথকভাবে অথবা মিলিতভাবে সমগ্রদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারিলে চলিবে না। দ্রব্যের মূল্যের তারতম্যানুসারে উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্য হইবে কিন্তু দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না। কার্য্যতঃ কিন্তু আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য বহু জিনিষ এইপ্রকার একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা

বাজারে চলিতেছে। ফলে জুতার রাজা বাটা, সিমেন্ট রাজা ডালমিয়া, সেফটি র‍্যাজর রাজা গিলেট প্রভৃতি বহু রাজা ও রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ একচেটিয়া কারবার মাত্রই যে খারাপ তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহারা সস্তায় ভাল জিনিষ বিক্রয় করিতেছে। ইহারা চাহিদা অনুসারে উৎপাদন করে বলিয়া অপচয় হয় না এবং এক সঙ্গে বহুপরিমাণ উৎপাদন করে ও প্রতিযোগিতামূলক প্রচারের (combative advertisement) ব্যয় করিতে হয় না বলিয়া খরচ কম হয়। ফলে সস্তায় ভাল জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে।

বিগত শতাব্দীতে প্রতিযোগিতার প্রভাব খুব বেশী ছিল। অধ্যাপক মার্সেল মনে করিতেন যে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিযোগিতা বলিলে অসঙ্গত হইবে, কারণ এই কথাটিতে হিংসার ভাব আছে ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ভাব নাই। তিনি সেজন্য প্রতিযোগিতাব স্থলে "ব্যবসায়ে স্বাধীনতা" ব্যবহার করিযাছেন, কার্য্যতঃ দুইটি কথার একই অর্থ দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান যুগে অবাধ প্রতিযোগিতা হইতে একচেটিযা ব্যবসায়ের (combination) সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে প্রতিযোগিতা যত কমিতেছে সমাজতান্ত্রিকতা (Socialism) তত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মনে হয় এমন এক সময় আসিবে যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

ভাঙ্গা নদীর চর

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত।

চারিদিকে সকাল বেলাকার ঝকঝকে রদ্দুর। ষ্টীমারের থার্ড ক্লাসের ডেকে বসে অজিত পদ্মার শোভা দেখছিল। আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট দল নানা রকম আবশ্যক অনাবশ্যক কথায় সময়টা কাটিয়ে দিতে ব্যস্ত। নিজের অন্য-মনস্কতায় সে একটা অর্থহীন কোলাহল ছাড়া আব কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, হঠাৎ কাণে গেল কে যেন কাকে তার নিজের দেশের ভাষায় ডেকে বলছে,

"আরে শুনছনি, দীঘির-পার বলে পদ্মায় ভাইঙ্গা নিছে।"

দীঘির-পার বিক্রমপুরের একটা বন্দর গ্রাম ছিল। কীর্ত্তিনাশা পদ্মার আর একটা অপকীর্ত্তি বাড়লো, এ অঞ্চলের লোকদের কাছে ব্যাপারটা তেমন নতুন নয়। অজিতের কাছে দুর্ঘটনাটার গুরুত্ব হঠাৎ অনেক বেশী বলে মনে হল। জায়গাটা যে সে চিনত তা নয়, কিন্তু চিন্তা-চক্ষে সে পরিষ্কার ছবি এঁকে নিতে পারছিল; বিরাট একটা গণ্ডগ্রাম, কত যুগ ধরে চাষী তার জমি চাষ কোরে চলেছে, বুকভরা আশা নিয়ে বছরের পর বছর নতুন লোক এসেছে সেখানে বাস করতে। গ্রামের লোকের গর্ব্বের সঙ্গে গড়ে উঠলো বিরাট এক বন্দর। তারপর কোথাও কিছু নেই, একদিন দুঃস্বপ্নের

মত দেখা দিল জমির বুকে সরু একটা ফাটল, সমস্ত গ্রাম-খানাকে রাক্ষুসী পদ্মা অবিলম্বে গ্রাস করবার জন্য চিহ্নিত কোরে রেখেছে। বাসিন্দারা সভয়ে বুঝলো অলক্ষ্যে মাটীর তলা থেকে জলের স্রোতে গ্রামের ভিত্তি শিথিল কোরে নিচ্ছে। যে যা নিয়ে পারল পালাল। তারপর সুরু হল সেই প্রলয়ঙ্কর ভাঙ্গন। ধূলা আর জলের কণার অন্ধকারে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সমেত সব কিছু অতলে তলিয়ে গেল। নদী শান্ত হলে দেখা গেল চারদিকে কেবল জল থৈ থৈ করছে। চিন্তা করতে তার সমস্ত অন্তরাত্মা কতকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর আবার কখন সে নিজের অজান্তেই মীণার কথাই চিন্তা কবতে সুরু কোরেছে।

সেবারেও সে বহুকাল পবে ঢাকায ফিরেছিল। পুবাণো বন্ধুত্বেব সূত্রগুলির খেই খুঁজতে খুঁজতে সে সুবোধকে আবিষ্কার কোরেছিল একটা অন্ধকার কানাগলির অন্ধকারতম বাড়ীর মধ্যে। সুবোধের বাইরে এবং ভেতরে অনেক পরিবর্ত্তন হযেছে। মা ওর ছিলেন না অনেক দিনই, বন্দী অবস্থায়ই বাপের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেযেছিল। আগেকাব দিনের চরম বিদ্রোহী সুবোধ এখন পুরোপুরি-ভাবে পোষমানা সংসারী মানুষ। কোন কাজের কথা বললেই উত্তর দেয, "আমাব কিছুর সময় নেই ভাই, Bread problem solve করছি।" অজিত অনেক কোরে তাকে পথে আনতে চেষ্টা করলো, Domesticated Animal নাম দিযে বিদ্রূপ কোরতেও কম চেষ্টা কবেনি, কিন্তু উত্তরে সুবোধ কেবল একটু উচ্চাঙ্গের মৃদু হাসি হাসে। তবু অজিত যখন একটা পাঠ-চক্র বসাবার জন্য ওদের বাইরেকার বড় অকেজো ঘরটা চেযে নিল সুবোধ তখন আপত্তি করতে পারল না।

খবরটা যদিও দাদার কাছ থেকে আগেই শোনা ছিল, পাঠ-চক্র মানে যে এমন তুমুল কাণ্ড মীণা তা প্রথমে আন্দাজ করতে পারেনি। বৌদি অনিতাব সঙ্গে বিকেল বেলা রান্না ঘরে চা খাচ্ছিল এমন সময় ভয়ানক একটা হট্টগোল দ্বারা আকৃষ্ট হযে সে বাইরের ঘরেব দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল। না, বিশেষ কিছু নয শুধু তর্ক। অজিত কি একটা প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে সুন্দর ভাবে কতকগুলি যুক্তিতর্ক খাড়া কোরছে, আর বাকী সকলে মিলে তার প্রতিবাদে ব্যস্ত। মীণা বি-এ তে যদিও অর্থনীতির বিশেষ ছাত্রী ছিল, অজিতের বক্তব্যের বেশীর ভাগই সে বুঝতে পারলো না, মনে মনে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য কথা স্মরণ রাখতে চেষ্টা কোরলো পরে সুবোধের কাছে জিজ্ঞেস কোরে নেবার জন্য। তারপর ওর আর অনিতার দরজার আড়াল থেকে তর্ক শোনাটা একটা নেশার মত হযে দাঁড়াল। দেখল শুধু অর্থনীতি নয়, পৃথিবীর প্রায় সব নীতি নিয়েই এরা আলোচনা করে। এত তর্ক বিতর্ক শুনতে শুনতে মীণাও এসব বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলো। সুবোধ ওদের পাঠ-চক্রে প্রাযই হাজির থাকতে পারত না, কোর্টের ওকালতী সেরে বাড়ী ফিরতেই ওর অনেক দেরী হয। মীণার যা প্রশ্ন থাকত সুবোধই তা জিজ্ঞেস কোরে রাখত অজিতের কাছ থেকে। মীণার অবশ্য বিশেষ ইচ্ছে হত সরাসবি অজিতের সঙ্গে আলাপ কোরবার, কিন্তু অনেকদিন কোন সুযোগ হয়নি। অতএব সকালকার চায়ের আসরে, সুবোধ অনিতা আর মীণা এই তিনজনের স্বতন্ত্র এবং আড়ম্বরহীন একটা পাঠ-চক্রের অধিবেশন হোত।

অজিত মাঝে মাঝে পাঠ-চক্র হয়ে গেলেও সুবোধের সঙ্গে নানান রকম আলোচনা কোরবার জন্য কতক্ষণ থেকে যেত, একদিন তার কি খেয়াল হওয়াতে হঠাৎ জিজ্ঞেস কোরলো,

"আরে সুবোধ, তুমি না বিয়ে কোরেছ ?"

সুবোধ মুখের ভাবখানাকে যথাসম্ভব অপরাধীর মত কোরে জবাব দিল।

"অপরাধটা ত ভাই অনেকদিন আগেই কোবে ফেলেছি, এখন আর উপায় কি বল ?"

"আমি সে কথা বলছি না। তা, বৌ কই ?"

"আছেত এখানেই, তবে তুমি ভাই বিয়ের ওপর যা চটা তাই সাহস কোরে এ্যাদ্দিন দেখাতে পারিনি।"

"আমাকে এতটা বর্ব্বর মনে কোরবার কোন কারণ নেই। অবিলম্বে নিয়ে এস।"

অনিতা এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস কোরলো, "আপনি বুঝি বিয়ে না হওয়া মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে ভয় পান ?"

"ভয়! ভয় পাব কেন ?"

"তা না হলে শুধু আমাকেই ডেকে পাঠালেন, আমার ঠাকুরঝিও এখানে থাকেন তাকে ডাকলেন না।"

সুতরাং অজিতের সঙ্গে মীণার আলাপ হোল। প্রথম দিনই মীণা বহুদিনকার জমা করা অনেকগুলি প্রশ্ন নিয়ে অজিতের সঙ্গে বেশ ভাল কোরে আলোচনা কোরলো। অজিত মীণার লুকিয়ে বক্তৃতা শোনার খবর রাখত না, সে এত কথা জানে দেখে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হল এবং তর্কের ভেতর দিয়ে যে মানসিক উৎকর্ষের আভা বিকশিত দেখতে পেল, তাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হল।

অন্যান্য সংসারী মানুষের মত সুবোধের চিন্তাধারা একই খাদে প্রবাহিত হয়, মীণার সঙ্গে অজিতের প্রীতি স্থাপিত হওয়াতে সে বিশেষ আনন্দিতই হয়েছিল। অজিত মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার, এবং ছেলে হিসেবে খুবই ভাল। বিয়েতে যদিও তার একান্ত অমত, সুবোধ এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিত না। তার আর অনিতার দুজনেরই ধারণা ছিল, ওরকম আজকাল সবাই বলে, এবং মীণার মত মেয়ের সঙ্গে দুচারদিন মিশলে ও মত আপনিই বদলে যাবে। অজিত অবশ্য সত্যি সত্যিই মীণার মত মেয়ে আর একটাও দেখেনি এবং অবিলম্বে সেও বুঝতে পারল যে তার সেই প্রথম দিনকার অল্প ভাল লাগাটা আস্তে আস্তে নিবিড়তম ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। তাকে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়, কোন একজায়গায় স্থির হয়ে বসে প্রাকটিস্ করতে পারে না বলে আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়, বিয়ে কথাটাকে সে বোঝা এবং বন্ধন বলে মনে করত, এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে একবার কোন একটা মত গ্রহণ করলে কিছুতেই তা বদলাতে চাইত না। সুতরাং মীণার সম্বন্ধে তার দুর্ব্বলতা কেউ যাতে বিন্দুমাত্রও বুঝতে না পারে সেজন্য সে যথেষ্ট সচেষ্ট থাকত। কিন্তু অজিতের প্রতি মীণার মনের অবস্থা এক অজিত ছাড়া আর কারো কাছেই অজানা ছিল না।

সুবোধ যদিও অনিতাকেই ভার দিয়েছিল, কথাটা বলি বলি কোরেও অনিতা অনেক দিন বলতে পারেনি। একদিন মীণার অবর্ত্তমানে অজিতের সঙ্গে অনিতা ও সুবোধের কথা হচ্ছিল, কি একটা কথার পিঠে অজিত বলেছিল,

"মীণার ভেতরে parts আছে,traning পেলে ও একজন ভাল কর্ম্মী হতে পারত।"

সুযোগটা অনিতা লুফে নিল।

"ওকে কর্ম্মী করবার ভার আপনিই নিন না কেন ?"

"তার অসুবিধে আছে ... "

"অসুবিধেটা যাতে না থাকে, তার ব্যবস্থাটাও না হয় আগেই কোরে নিলেন।"

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট, অজিত একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল,

"ল্যাজকাটা শেয়ালদেব দেয়া ল্যাজ কাটবার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়, তাছাড়া আমার নিজস্ব মত হচ্ছে, বিয়ে কবলে কর্ম্মীদের পক্ষে কাজের বাধা হয়।"

উত্তরে সুবোধ বোধ হয এ বিষয়ে ছোটখাট একটা উকীলি বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ কোবছিল, অজিত কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য তাডাতাড়ি বিদায় নিল।

আরেকদিনেব ঘটনা তার মনেব মধ্যে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। অজিতের ঢাকা থেকে চলে যাবার মাত্র একদিন আগের কথা। ইতিমধ্যে মীণার মোটামুটী ভাল একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এ দুটো বিষয় উপলক্ষ্য কোরেই অনিতা তাকে চায়ের নেমন্তন্ন কোরল। কি কথার মাঝখানে অনিতাই জিজ্ঞেস কোরল।

"ঠাকুরপো কি কোন দিনই বিয়ে কোরবেন না ?"

"না"

মীণা সাধারণতঃ অতি সংযত স্বভাবের মেযে, সেদিন তার কি যে হল, হঠাৎ যেন মুখ থেকে বেরিযে গেল,

"বিয়ে ঠিকই কোরবেন তবে কিনা "

কথাটা শেষ করতে পাবল না, মীণা আত্ম-বিস্মৃত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে অনিতা তাডাতাড়ি সাবধান কোরে দিল, "ঠাকুরঝি !"

মীণা নিদারুণ লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু কোরলো, এবং এর পরে সে অজিতের সঙ্গে আর একটী কথাও বলতে পাবেনি। ঢাকা ছাড়ার কয়েকদিন পরেই অজিত মীণার নেমন্তন্ন চিঠি পেয়েছিল।

ঢাকায় ওর এক ভাইয়ের বাসাতেই অজিত প্রত্যেক বার ওঠে। বিছানাটা খুলতে খুলতে ভাইপো অমিয়কে জিজ্ঞেস কোরলো,

"হ্যাঁরে সুবোধদের বাসায় সব কেমন আছে বলতে পারিস্ ?"

"ভালই ত আছে সব, মীণা পিসীরা ত কালকেও আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল।"

তাহলে মীণা এখন সুবোধের কাছেই আছে, সুবোধের সঙ্গে দেখা কোরতে গেলে মীণার সঙ্গেও অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা হয়ে যাবে। পুরো দুবছর আগের কথা, তবু মীণার সাথে দেখা হবার সম্ভাবনায় অজিতের হৃৎপিণ্ডের গতিটা কি রকম অসম্ভব রকম দ্রুত হয়ে ওঠে!

বিকেলের চা খাওয়ার পর অজিত বাসা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সুবোধদের বাসায় চললো। একটা আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে ওর অভ্যর্থনা হল। শুধু মীণার কপালে একটা সিঁদুর বিন্দু, আর সব কিছু দৃশ্যতঃ ঠিক আগের মতই আছে, কিন্তু অজিত স্পষ্টতঃ অনুভব কোরতে পারল এই সদা উৎফুল্ল পরিবারটির মাঝখান থেকে কি যেন হারিয়ে গেছে।

রাত্রে বাসায় ফিরে সব কথা বিস্তারিত শুনলো। বিয়ের পর মীণার জীবন সুখের হয়নি। দেনা পাওনা নিয়ে কি একটা গণ্ডগোল হওয়াতে বিয়ের কয়েকদিন পরেই মীনাকে ওরা সুবোধের কাছে রেখে গেছে এবং ছেলেকে আবার বিয়ে দিয়েছে। এটা অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু এরকম হৃদয়-হীনতার সঙ্গে অজিতের এর আগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। মনে মনে ভাবল, যে দেশে বিয়ের ব্যাপারটা প্রধানতঃ একটা লেন দেনেরই সম্পর্ক সে দেশে হৃদয়ের কথাটাই যে অবান্তর! স্বভাবতঃ বহুদিন একত্র বসবাসের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সৌহার্দ্যের বন্ধন স্থাপিত হতে পারে, কিন্তু এই অর্থলিপ্সু জান্তব প্রথার মাঝখানে সভ্যতাগন্ধী ভালবাসার কথাটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

মীণার ভাল একটা বিয়ে হয়েছে এ কথাটা অজিতের পক্ষে এতদিন মস্ত একটা সান্ত্বনার বিষয় ছিল। কিন্তু এখন অজিত বুঝতে পারে সে কতটা গুরুতর ক্ষতি মীণার কোরেছে। সকলে যত মীণার জন্য দুঃখ আর সহানুভূতি প্রকাশ করে, অজিতের মর্ম্মভেদী অনুশোচনা ততই তাকে নীরবে দহন করতে থাকে।

এ রকমভাবে ঘা খেয়ে তার বিবাহ-বিদ্বেষটাও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল। ভাবলো সত্যিই ত কর্ম্মীদের পক্ষে বিয়ে না করাও অনেক সময় একটা অপরাধ। অনেক সময় তারা মেয়েদেরকে একটা অনাবশ্যক বোঝা মনে করে, এবং সেজন্য একটা গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিতে ভয় পায়। লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মীণা যে তার কাজের সহায় ছাড়া অ-সহায় হত না এখন সে তা বুঝতে পারে। কিন্তু কেবল অনুশোচনায় কৃত-কর্ম্মের ফল ভেদ হবে না; অজিত একটা স্থির-সংকল্প কোরে ফেললো।

সুবোধকে বল্ল, "জানো, আমি কর্ম্মীদের বিয়ে না করার সম্বন্ধে মত বদলেছি, পশ্চিম ভারতে দেখ, ইউরোপে দেখ, লেনিন কিংবা ষ্টালিনের ব্যক্তিগত ইতিহাস পড় সব জায়গাতেই দেখতে পাবে বিয়ে করাতে কারুর কাজের কোন ক্ষতি হয় নি।"

"বারে, তুমি এমন ভাবে কথাগুলি বলছ যেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধী। তা এতদিন পরে এ বিজ্ঞতা তোমার এল কোত্থেকে?" সুবোধ শুধু একটু ম্লান হাসি হাসতে পারে।

অজিত ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"দশটা দেখা শোনার পর বিজ্ঞতা যে আপনিই আসে ভাই।"

সুবোধ একটু জোর করে রসিকতা করতে চেষ্টা করে।

"তাহলে আমরা ভাল দেখে একটী মেয়ে টেয়ে দেখি, কি বল?"

"না, আমি মীণাকেই আবার বিয়ে করব।"

এ রকম একটা অত্যদ্ভুত প্রস্তাবের জন্য সুবোধের পক্ষে প্রস্তুত থাকার কথা নয়। সে একান্ত হতভম্ব হয়ে তাব মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"তোমার কি মাথা খাবাপ হয়েছে অজিত?"

কারো কারো মনে যে এরকম একটা সম্ভাবনাব কথা উঠতে পারে অজিত তা আগে থেকেই আন্দাজ কোরে রেখেছিল, তাই সে একান্ত শান্ত স্বরে জবাব দিল,

"ঠিক তার উল্টো। দু বছর আগে যে আমার সত্যিই মাথা খারাপ ছিল সে কথা স্বীকার করতে আমার একটুও দ্বিধা নেই, প্রস্তাবটা এখন আমি অতি সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়েই করছি। এবং এদেশে যদি হিন্দুনাবীর বিবাহ-বিচ্ছেদেব কোন আইন থাকতো তাহলে এ সন্দেহ তুমি কখনই করতে পারতে না।"

"কিন্তু সে রকম কোন আইন যখন এদেশে নেই ..."

"থাক, অযথা আব বাগ্মীতা খবচ কবতে হবে না, কাবণ তুমি যা যা বলবে আমি মুখস্ত বলতে পারি, তুমি বলবে আইন নেই, তুমি বলবে সংস্কাবে বাধবে, তুমি বলবে লোকে কি বলবে, সমাজে আমাদের ঠাঁই হবে না,—এই ত?"

"বাঃ তা ছাড়া আর ·......

"হ্যাঁ তা ছাড়া আব কি বাধা আছে, এই ত? কিন্তু এগুলো আমার কাছে একটাও বাধা মনে হচ্ছে না, জবাবগুলি আমি অপর দিক থেকে আরম্ভ কোবছি, প্রথম কথা সমাজে ঠাঁই না দেওযার হুমকীটা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা কর্ত্তাদেব একমাত্র অস্ত্র এবং ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু এ ব্রহ্মাস্ত্র অশবীবী প্রেতেব মত, ভয পেযে না মাবা গেলে আব কিছু কববার ক্ষমতা এর নেই। সেমিজ জিনিষটা মেযেদের শালীনতার দিক দিযে আজকাল সকলেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, কিন্তু জানতো বামমোহন রাযেব আমলে প্রথম যাঁরা সেমিজ ব্যবহার করে-ছিলেন তাদের হাতের ছোঁয়া জল কেউ খেত না। বিলেতে যে লোকটী প্রথম ছাতা ব্যবহার কোরেছিল, ঢিলের চোটে তার প্রাণান্ত হবার জোগাড হযেছিল। তাবপর দেখ বিদ্যাসাগরের কথা, অমন একটা প্রাতঃস্মরণীয় লোককে বিধবা বিয়ে প্রচলন করতে গিয়ে সমাজের হাতে কি কম অপদস্থ হতে হযেছে? বিপ্লবকামী লোকেরা প্রচার এবং কৃতকার্য্যের দ্বারা সমাজের মতকে উল্টে দেয়, তারা মতামতের কাছে নির্ব্বিচারে মাথা পেতে দিযে পিষ্ট হয় না।

"তারপর লোকে কি বলবে, এ একটা অজুহাতই নয়, কারণ লোকে আজকে যা দেখে প্রশংসায় আত্মহারা হয়, চোখে আঙুল দিয়ে ত্রুটী দেখিয়ে দিতে পারলে তা দেখেই আবার ছি ছি করে থাকে, ঐ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নির্ব্বিচার সংস্কার একটা কুৎসিত রকমের মানসিক

ব্যাখি, মানব-ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে, আদিম সমাজে বিয়ে বলে কোন রেওয়াজই ছিলনা। বিয়ে যারা প্রথম প্রবর্ত্তন কোরেছিল তারাও যে কম বাধা পেয়েছিল, তা মনে হয় না। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের স্তরে এই সংস্কারকেই প্রথম আঘাত পেতে হয়। নয়ত কোন পরিবর্ত্তনই হতে পারে না। তোমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা মনে হবে আইন, কারণ তুমি আইনজীবী। কিন্তু সত্যি কথা বল ত দেখি, তোমাদের পুঁথিতে কি এমন কোন কানুন নেই যা-দ্বারা প্রকারান্তরে বিবাহ-বিচ্ছেদ সিদ্ধ হতে পারে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি অন্য সব কিছু বাধা কাটিয়ে উঠতে পার, আইন বিষয়ে কি করা যেতে পারে না হয় পরে দেখা যাবে।"

উঠবার সময় সুবোধ বার বার তাকে অনুরোধ করলো, তার যে এ বিষয়ে কিছুমাত্র মত আছে লোকে যেন তা মনে করতে না পারে। মুখে সে বিরুদ্ধ-বাদী দলের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু তার গোপন সহানুভূতি রইল অজিতের দিকে, কারণ তাদের দুজনকেই সে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। আন্তরিক কামনা রইল অজিত যেন জেতে।

এই ম্রিয়মান হিন্দুসমাজটা এখনও যে কতটা দংশন-ক্ষম অজিত তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলো। তার প্রস্তাবটা অবিলম্বে রঞ্জিত ও বিকৃত হল, মুখে মুখে তার নামে অকথ্য ইতিহাস প্রচারিত হতে লাগল। এক পয়সার কুৎসা রটনাকারী কাগজগুলিতে সপ্তাহে সপ্তাহে নানারকম ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতা বের হয়ে হিন্দু সমাজের ধ্বজাধারীদের মুখ-রোচনা করতে লাগল। রাস্তার লোকে তাকে পেছন থেকে চাপা গলায় টিট্‌কারী দেয়। বাড়ীতে লোকেরা ত কান্নাকাটী সুরু কোরে দিল। এমন যে অনিতা সেও অধুনা অজিতের সঙ্গে কথা বন্ধ কোরে দিয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধে হল আসল ব্যক্তি মীণাকে নিয়ে, সে কেবল কাঁদে আর বলে, "আমি সত্তাহীন খেলার পুতুল, যখন ইচ্ছে লোকে আদর দেখাবে, যখন ইচ্ছে পায়ের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে চলে যাবে, ও এ সহর থেকে চলে যাক, আমি চাইনা ওকে।"

অজিত শুধু সুবোধকেই অনুরোধ করেছিল, মীণাকে এতদিন সামনা সামনি কিছু বলেনি, সেদিন ওদের অনুমতি নিয়ে রান্নাঘরে চলল মীণার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখে অনিতা মুখখানা ঘুরিয়ে অন্যত্র চলে গেল। মীণার চোখ-মুখ ফুলে লাল হয়েছে, শরীর হয়েছে কৃশ, অজিতের কুৎসার সঙ্গে মীণাকে অবশ্যম্ভাবী রূপে জড়িয়ে এমন সব কথা রটনা করা হয়েছে যা সহ্য করা কোন মেয়ের পক্ষেই সোজা নয়। রান্নাঘরের ওই কালিমাকে আশ্রয় করে একটু আগেও বোধ হয় সে কাঁদছিল, অজিত কোন ভূমিকা করল না।

"মীণা তুমি হ্যাঁ বল।"

"না, না।"

মীণা আবার কাঁদতে সুরু করলো।

"দেখ একদিন তোমাকে শত ভালবাসা সত্ত্বেও আমি তোমাকে চাইনি। তুমি ভাল

ঘরে পড়ে সুখী হবে এই ভবসায়, আমার কাজের ক্ষতি করবে এই ভয়ে। আজকে আমার সে ভুল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গেছে। তুমি আমাকে একদিন বলতে যাচ্ছিলে যে তোমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও বিয়ে একদিন ঠিকই কোরব। সেদিন আমি অবিচার কোরেছিলাম, আজকে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। সেদিন তোমাকে বিয়ে করা কত সহজ-সাধ্য ছিল, তোমার মত না নিয়েও করতে পারতাম, কিন্তু আজকে আমি সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরেছি, শুধু তোমার মতামতের ওপর আমার হারজিৎ নির্ভর কোরছে, এ যুদ্ধ কেবল মাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে সমস্ত নারীর প্রতি নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, এই ন্যায় যুদ্ধে একজন প্রকৃত সহকর্ম্মীর মত আমাকে সাহায্য কর এই আমার ভিক্ষা।"

বোধ হয় এইটুকুরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল, মনুষ্যত্বের এই সমান অধিকার, এই সামনাসামনি এসে বলা, আমি তোমাকে চিরকালই ভালবাসতাম। যে ভুল আমি করেছি তুমি আজ তা নিজের হাতে শুধরে দাও, আমায় সাহায্য কর। অন্তর যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাইরের আপত্তি সেখানে বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। মীণাকে রাজি হতে হল।

বিদায়ের পথে গোয়ালন্দ-গামী ষ্টীমারে বসে দুজনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এত ঝড়-ঝাপটার পর শান্ত নীল আকাশ আব প্রশস্ত নদীর দৃশ্যে তাদেব মনের সমস্ত গ্লানি আর অবসাদ দূর হয়ে গেল। সমস্ত রাস্তাটা দুজনে কেবল কারণে অকারণে হাসতেই লাগল। তারা যে জাহাজে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে এসব বোধ হয় তারা ভুলেই গিয়েছিল, রাত্রি আটটা নাগাদ সময়ে কিসে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ষ্টীমারটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চারিদিকে খালাসীরা দৌড়াদৌড়ি সুরু করে দিল, যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচামেচি কবতে লাগল।

"জাহাজ চরায় ঠেকছে, কাইল কইলকাতায় পৌঁছাইতে যে কত দেরী হইব কে জানে, কি কুক্ষণেই যাত্রা করছিলাম?"

জাহাজ চরায় ঠেকেছে? এ সংবাদে অজিতের মোটেই নিরাশা এল না, উত্তেজনায় চোখ দুটো তার অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "জানো মীণা, নদীতে চবা পড়ার সঙ্গে আর তোমার ও আমার জীবনের সঙ্গে একটা অলক্ষ্য সম্পর্ক আছে। যাবার সময় শুনে গিয়েছিলাম যে দীঘির-পার জায়গাটা নদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে, তখন চারদিকে কেবল হতাশা ছাড়া আব কিছুই দেখতে পাইনি, ভাঙ্গা নদীতে যে আবার চরা জাগতে পারে এ কথাটা আমার মনেই ছিল না। তোমার মত দুঃখময় জীবনের দৃষ্টান্ত গোটা ভারতবর্ষে অভাব নেই, কিন্তু তারা জানে আব সকলেও জানে নির্ম্মম সমাজ-স্রোতে তাবা অবহেলার অতল তলে তলিয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার আছে বলেও কেউ মনে করে না। ওঃ ভাঙ্গা নদীতে আবার চরা পড়তে পারে সকলেই যদি তা জানত!"

শ্রমিক-বিষয়ক সংখ্যা ও তাহার সঙ্কলন

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

"The scientific study of the human problems of industry has scarcely begun in India, and the loss which has arisen from the neglect is evident."

কথাগুলি শ্রমিক তদন্তের রিপোর্টে রয়্যাল কমিশন প্রায় দশ বৎসর আগে লিখিয়া থাকিলেও ইহার সত্যতার আজও কোন ব্যত্যয় হয় নাই। শিল্প ও শ্রম-শক্তির উন্নতি করিতে হইলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান (standard of living) বিশ্লেষণ করা ও উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকদের জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যার অভাবে এদিকে বুদ্ধি বিবেচনার সহিত কোন কাজ করা সহজ হয় না। এ প্রকার কোন গঠন বা প্রয়াস করিবার পূর্বে একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপকভাবে সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। ভারতবর্ষে দ্রুত শিল্পায়নের এবং শ্রমিক চাঞ্চল্যের ফলে কর্তৃপক্ষের কাছেও এ কাজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যকে মোটামুটি কতগুলি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। বেতন (wages)—মান-নির্ধারণ (standardisation) এবং আইন সঙ্গত স্বল্পতম হার (statutory minimum)

ক। জরিমানা ও অন্য প্রকার বেতন-সংক্ষেপ (deductions)

খ। বোনাস এবং লভ্যাংশ দানের ব্যবস্থা

২। বাসগৃহ এবং ঘর ভাড়া (housing and rent)

৩। স্বাস্থ্য—ক। খাদ্য (dietatics) ও পরিপুষ্টি (nutrition)

খ। জন্ম ও মৃত্যুর হার (birth and death rates)

গ। মিল-রোগের মাত্রা (incidence of industrial disease)

ঘ। রোগ-বীমা

ঙ। প্রসূতি-মঙ্গল (maternity benifits)

৪। ঋণ (indebtedness)—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং সমবায়-ঋণদান ব্যবস্থা (co-operative credit)

৫। কাজের সময় (hours of work), বন্ধের দিন (holidays) ও ছুটি (leave)।

৬। বেকারত্ব—বেকার বীমা। নিয়োগের কাল (periodicity of employment) গর-হাজিরির মাত্রা (absenteesm)

৭। শিক্ষা (literacy)

৮। দুর্ঘটনা—বীমা। ক্ষতিপূরণ

৯। পারিবারিক আয়-ব্যয় (family budget)—জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয়-জ্ঞাপক সংখ্যা (cost of living indices)

১০। নারী ও বালক শ্রমিক (woman and child labour)

১১। হিত-প্রচেষ্টা (welfare work),—বিনোদন (recreation), বার্ধক্যের বীমা (old age insurance), বিবিধ

১২। বিজ্ঞানায়ন (rationalisation) ও যন্ত্রবল (industrial efficiency)

১৩। ট্রেড্-ইউনিয়ন আন্দোলন

১৪। শ্রমিক-মালিক বিবাদ (industrial disputes)। মিটমাট ও সালিসী

১৫। সমবায় সমাজ (co-operative society)

এই বিষয়-তালিকার মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটীর উপর সরকারী তদারকে তদন্ত হয় এবং সে সম্বন্ধীয় সংখ্যা সাধারণে সরবরাহ হয়। ভারতীয় ও প্রাদেশিক সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশিত শ্রমিক সম্বন্ধীয় সংখ্যিক উপকরণগুলি নীচে তালিকার আকারে দেওয়া গেল।

বোম্বাই—(ক) পারিবারিক আয় ব্যয়, (খ) বেতন এবং (গ) নিয়োগের সর্ত (conditions of employment), (ঘ) বেকারত্ব, (ঙ) জরিমানা এবং অন্য প্রকার বেতন-সংক্ষেপ। লেবার অফিস হইতে এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন শিল্পোন্নত সহরের উপর রিপোর্ট বাহির হয়। আমেদাবাদ, বোম্বে ও শোলাপুরের শ্রমিকদের জীবিকা-নির্বাহের ব্যয় (cost of living) সম্বন্ধে রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।

লেবার অফিস হইতে প্রতি মাসে লেবার গেজেট বাহির হয়। ইহাতে থাকে (ক) শ্রমিক মালিক বিবাদ, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা এবং লোকসানের পরিমাণ (অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও), (খ) পাইকারী ও খুচরা দর-জ্ঞাপক সংখ্যা (price index numbers), ও (গ) বিভিন্ন সহরে

মাদ্রাজ—১৯৩১ সালে মাদ্রাজ সহরে শ্রমিকদের পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে রিপোর্ট বাহির হয়। এই রিপোর্টের উপর ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিয়া জীবিকা-নির্বাহের ব্যয়-জ্ঞাপক সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

সমস্ত প্রদেশে কতগুলি বিষয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হয়।

১। ফ্যাক্টরী আইনের কার্যনির্বাহ। ইহাতে থাকে (ক) বিভিন্ন প্রকারের আকস্মিক দুর্ঘটনা, (খ) বিভিন্ন শিল্পে দিন প্রতি গড়ে কত মজুর খাটে, (গ) বিরাম (interval), বন্ধের দিন (holidays), এবং

২। বেতন আইন (Wages Act) এর কার্যনির্বাহ। ইহাতে থাকে (ক) বিভিন্ন শিল্পে জরিমানা ও অন্য জাতীয় বেতন সংক্ষেপ সহিত গড় বেতন, (খ) কত টাকার দাবী পেশ হইয়াছে এবং তার মধ্যে কত মঞ্জুর হইয়াছে, (গ) ১৯২৩ সালের আইন অনুসারে শ্রমিকদিগকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ এবং

ট্রেড-ইউনিয়ন য্যাক্ট (১৯২৬) এর প্রয়োগ ও (ঘ) শ্রমিক মালিক বিবাদ (কোন্ কোন্ প্রদেশে)।

ভারত সরকার হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হয়।

১। ফ্যাক্টরী আইনের উপর প্রাদেশিক রিপোর্টগুলির সার-সঙ্কলন।

২। খনি আইন।

৩। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act) এবং ট্রেড-ইউনিযন আইনের উপর প্রাদেশিক রিপোর্টগুলির সার-সঙ্কলন।

৪। শ্রমিক-মালিক বিবাদ।

৫। চা-বাগান প্রবাসী শ্রমিক আইন (Tea Districts Emigrant Labour Act, 1932) এর কার্যনির্বাহ।

প্রযোজনীয় তথ্যের অনুপাতে এই সমস্ত রিপোর্ট নাম মাত্র। ইহাদের বিবরণের মধ্যেও অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে। প্রাকৃতিক শক্তি-চালিত যন্ত্র (power driven machinery) ব্যবহার করে এবং অন্তত কুড়িজন শ্রমিক খাটায়, এরূপ মিলগুলি ছাড়া অন্যান্য ছোটখাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি (non-regulated industries) ফ্যাক্টরী আইনে পড়ে না, কাজেই ফ্যাক্টরী ও বেতন আইনের রিপোর্টে তাদের কথা থাকে না। দেশীয রাজ্যগুলি ফ্যাক্টরী আইনের আওতার বাইরে এবং তাদের কথাও ফ্যাক্টরী রিপোর্টে থাকে না। ফ্যাক্টরী আইনের এবং খনি আইনের রিপোর্টে শ্রমিকদের যে দৈনিক গড-পড়তা সংখ্যা দেওয়া হয তাহা হইতে বৎসরে মিলে কত মজুর খাটিল তা জানা যায না। কারণ এই সংখ্যা দৈনিক গডপডতা হাজিরা হইতে সংগ্রহ করা হয। হাজিরার বেনিয়ম (irregularity) শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সহরে ও গ্রামে শ্রমিকদের ক্রমাগত বাস পরিবর্ত্তন এই সমস্ত কারণে মোট শ্রমিক-সংখ্যার চেযে দৈনিক হাজিরির সংখ্যা অনেক কম হয়। অনেক মিলে গরহাজিরদের জায়গায় খাটিবার জন্য অতিরিক্ত (reserve) মজুর রাখা হয় এবং অনেক মিলে কাজের চাপ পডিলে যাহাতে আইনসম্মত কাজের সময়ের মধ্যে উৎপাদন বাডানো যায সে জন্য বদলী (relief) মজুর থাকে। ডকে, জাহাজে, ট্রাম-বাসে, ডাকবিভাগে এবং উন্নয়নবিভাগে (Public Works Department) কত লোক খাটে আদমসুমারির দশবার্ষিক এবং অনির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া তার কোন হিসাব নাই।

পৃথিবীর যে কোন শিল্পপ্রধান দেশে এমন আইন আছে যাহাতে মালিকদিগকে শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানারকম খবরাখবর সংখ্যার আকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। রয়াল কমিশনের তদন্তের সময় এ প্রকার কোন আইন ভারতবর্ষে ছিল না এবং উহার রিপোর্টে এরূপ আইন প্রবর্ত্তনের জন্য খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই পরামর্শের ফলে ফ্যাক্টরী আইন ও বেতন আইন পাশ হয় এবং মালিকদের রক্ষিত সংখ্যা হইতে পূর্বোক্ত রিপোর্টগুলি বাহির হয়। কিন্তু এই সংখ্যা যে প্রযোজনের অনুপাতে কত সামান্য ও ত্রুটীবহুল তা আমরা দেখিয়াছি। যে সমস্ত সংখ্যা সামান্য

খরচে ও বিনা হাঙ্গামায় মালিকরা রাখিতে পারিত সে সব জিনিষ সরকারী ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক খরচ ও পরিশ্রম করিয়া জোগাড করিতে হয়। *

আশার কথা যে কংগ্রেসের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাবে এবং শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাতথ্যের অপরিহার্যতা হেতু এদিকে সরকার পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সম্প্রতি নয়া-দিল্লীতে শ্রমিক-সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারপক্ষের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইয়া গেল। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে একটী সংখ্যা আইন (Statistics Act) এর প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী আইনের অন্তর্ভুক্ত মালিকরা তথ্য রাখিতে এবং দিতে বাধ্য থাকিবে, তথ্য সংগ্রহে যাহাতে কোন গাফিলতি বা জুয়াচুরী না চলে তার ব্যবস্থা হইবে, সংগৃহীত তথ্য অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হইতে পারিবে না, প্রাদেশিক সরকারগুলি এ কাজে সহযোগিতা করিবে। কিন্তু আরম্ভে সকল মিলের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে না, শুধু প্রধান ও সংগঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি লইযাই প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে সংখ্যা আইন বাধ্যতামূলক না হইলে কার্যকরী হইবে না এবং এই বাধ্যতার নীতি মালিক-সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে এই বিরোধিতার আশঙ্কা সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। * প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে মালিকদের বিরোধিতা সম্ভবত টিকিত না। কিন্তু আশঙ্কার কথা সংখ্যা-সংগ্রহে শ্রমিকদের কাছ হইতেও অনেক বাধা আসে। পুরুষানুক্রমিক দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের ফলে তাদের ঘরোয়া খবর সঠিকভাবে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয। কাজকর্মের হালচাল সম্বন্ধে যথার্থ খবরাখবর দিতে গেলে অনেক সময় তা'দিগকে মালিকদের কুদৃষ্টিতেও পড়িতে হয। মালিকদের স্বার্থ যাহাতে শ্রমিকদের ভীতি ও কুসংস্কারের সহিত এক অদ্ভুত সন্ধি পাতাইয়া সংখ্যা আইন পণ্ড করিতে না পারে আইনের মধ্যেই সে রক্ষা-কবচ বিহিত করিয়া রাখা দরকার।

এ সব খবরাখবর ও সাংখ্যিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে তবে সেই মালমসলা লইযা শ্রমিক-সংগঠনের রাষ্ট্র-পরিকল্পনা সম্ভব হইবে। শ্রমিকদের সম্বন্ধে যত প্রকার তদন্ত হয তার মধ্যে পারিবারিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত অনুসন্ধান সবচেয়ে প্রধান এবং প্রয়োজনীয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, শোলাপুর ও রেঙ্গুন সহরে এইরূপ অনুসন্ধান সম্পন্ন হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশে এবং কানপুর ও ইন্দোরেও এরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় জিনিষপত্রের মূল্যের সঙ্গে কি হারে বাড়ে বা কমে তা এই তদন্ত হইতে জানা যায়। এগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাহাতে জীবনযাত্রার মানও (standard of living) আবিষ্কার করা যায়। এ তদন্তগুলির মধ্য দিয়া বাসস্থান, শিক্ষা, ঋণ ইত্যাদি সম্বন্ধে

---

* মাদ্রাজে বিগত সংখ্যা-সম্মেলনে লেখক এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা করেন।

* এ, পি,—অমৃতবাজার পত্রিকা জানুয়ারী ২৩, ১৯৪০।

বিস্তৃত বিবরণ সহজেই লওয়া সম্ভব এবং এ সমস্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াই জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ হয়। জীবনযাত্রার মান স্থির করিতে হইলে সমাবস্থা (norm) ও ন্যূনতম হার (national minima) এর কথা আসিয়া পড়ে। এগুলি ধার্য হইলে তার উপর আন্তর্প্রাদেশিক তুলনামূলক গবেষণা চলিতে পারে এবং মান উন্নয়নের ও আন্তর্প্রাদেশিক সমতা (inter-provincial parity) রক্ষণের প্রয়াস করা যাইতে পারে।

সংখ্যাবিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের আসন স্বীকৃত। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে উপাদান নাই। উপাদান সংগ্রহে কালক্ষেপ করিয়া বৈজ্ঞানিকের বহু সময় অপচয় হইতেছে। গবেষণার ফলাফলও বহুল পরিমাণে লাইব্রেরীর কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। এ দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সরকারী, শ্রমিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তৎপর হওয়া উচিত।

অচল টাকা

শ্রীমতী বীণা দাস

4 A বাসগুলোয় যে কি সাংঘাতিক ভীড়!

১০টা থেকে ১০৷৷০ টার মধ্যে ওই পথে যাওয়া একটা ছোট খাটো যুদ্ধ বিশেষ। বাস্‌গুলো দাঁড়াতেই চায় না—"জ্যায়গা নেই" "জ্যায়গা নেই"—।। অনেক কষ্টে বাস্‌এর ঠিক সামনে গিয়ে একেবারে জীবন পণ করে দাঁড়িয়ে, Conductorকে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে তবে বাস্‌এ উঠতে পাই। একবার উঠতে পেলে অবশ্য বসবার অসুবিধা হয়না, Ladies Seat অনেকেই ছেড়ে দেয়। তবে মুখগুলো প্রত্যেকেরই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। আমারও বসতে দারুণ সঙ্কোচ হয়। কিন্তু কি করি!

বাসএ কত ধরণের লোক! বেশীর ভাগই আফিসে যাচ্ছে,—বেশীর ভাগই কেরাণীর কাজ করে বোধ হয়। দু একজন বড় officerও রয়েছেন, অন্ততঃ পরিচ্ছদ দেখে তো তাই মনে হয়। বাংলাদেশের কেরাণীদের কথা কে না জানে? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মেরুদণ্ডহীন, সবচেয়ে নিস্তেজ, সবচেয়ে দুর্ব্বল জাত তো এরাই। চারপাশে ওরা যখন আমায় ঘিরে বসে থাকে আমার ভিতরটা শুকিয়ে উঠতে চায়। মনে হয় ওদের নিঃশ্বাসে, ওদের দৃষ্টিতে কি যেন রয়েছে—মনটাকে পিষে ফেলছে—বিষাক্ত করে তুলছে। বছর দশেক আগে এরা হয়তো ছিল কলেজের ছেলে! তখন এরা কিরকম দেখতে ছিল? তখন এরা হাসতে জানতো নিশ্চয়ই—তখনও এদের দৃষ্টি এমন নিরুৎসুক হয়ে পড়েনি নিশ্চয়ই!

কলেজ জীবনে এরা কত Strike করেছে, কত বিপ্লবের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে—জেলেও কেউ কেউ ঘুরে এসেছে হয়তো। আজ আবার তারাই—British Governmentএর সবচেয়ে বড়

'Piller'। কিন্তু ওই রুগ্ন শীর্ণ জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় দেহগুলিকে আশ্রয় করে অতবড় সাম্রাজ্য ইংরাজ দাঁড় করিয়ে রেখেছে কি করে? বাহাদুরী বটে।

হঠাৎ একদিন আমাদের এই কেরাণীসঙ্কুল নিস্তরঙ্গ Busএর মধ্যেও কিন্তু এক তুমুল ব্যাপার। আমার সামনে অনেকগুলি যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁদের পিছন থেকেই গোলমালটা আসছিল। কি ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না,—Conductorদের সঙ্গে প্যাসেঞ্জারদের গণ্ডগোল লেগেছে মনে হ'ল। শেষে দেখি ভীড় ঠেলে নামবার জায়গার কাছে এগিয়ে এলেন একটি ভদ্রলোক। চেনা মুখ, প্রায়ই বাসএ দেখি তাঁকে। কিন্তু কি ব্যাপার? এত উত্তেজিত হয়েছেন কেন? চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছেন, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দিয়েছে—পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নিতান্ত বেচারী গোছের লোক। বুঝলাম তাঁকে কেন্দ্র করেই এই গোলমাল। শিখ Conductorএর মেজাজও সপ্তমে চড়া। তবু আমাদের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রোষান্বিত বাক্যধূমের সামনে তাকেও একটু পাণ্ডুর লাগছিল। জিজ্ঞাসা করলাম একজনকে—"কি ব্যাপার বলুন তো?" যিনি আজকের আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক তিনিই এগিয়ে এসে বল্লেন, "দেখুনতো আপনিই দেখুন তো এই টাকা নাকি চলে না? ওই গরীব বেচারাকে কিরকম করছে। ওটাকা ওদের নিতেই হ'বে, চালাকী নাকি। এই রাখো, রাখো বাস্—রাখো বলছি।" ততক্ষণে আমরা লালবাজার থানার সামনে এসে পড়েছি। পুলিস্ ডাকবে ওরা, Conductorকে এমনি ছাড়বে না, ভালো টাকা নেবে না চালাকী নাকি। থানার সামনেই পুলিস দাঁড়িয়ে। তখনো গলার স্বর তেমনিই উঁচু রেখে আমাদের সেই Champion এগিয়ে গিয়ে বল্লেন—"দেখো তো এই রূপেয়া ইয়ে কি চলতা নেই—এতো ঠিক হ্যায়, জরুর ঠিক হ্যায়, দেখো তোম্।" Conductor দুটিও সঙ্গে সঙ্গে কি কি বলে চীৎকার করতে লাগল। পুলিস টাকাটা বাজিয়ে দেখল—কি বুঝল সেই জানে; দুই সমরোন্মুখ পক্ষের সামনে নিজের মতামত দিতে সেও দেখি নারাজ। পিছন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একজন sergeant। পুলিস তো হাতে স্বর্গ পেল—"সাহেব দেখিয়ে তো এ ঠিক হ্যায় কি নেই।" সাহেব গম্ভীরভাবে হাতে টাকাটা নিলো, বাজানও দরকার মনে করল না, একবার দেখেই সে বুঝতে পারল টাকাটা অচল। সাহেবদের চোখও বোধ হয় আলাদা। আমি চট করে একবার তাকিয়ে দেখলাম আমাদের সেই ভদ্রলোকটির দিকে—মুখখানা তাঁর একমুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, বাতি যেমন হাওয়ার সামনে দপ করে নিভে যায় তেমনি। গলার স্বরও এখন মোলায়েম, অতি মোলায়েম—"Sir, but sir, all of us sir"—সাহেব উত্তরে শুধু একটি কথা বল্লেন অতি ধীরে ধীরে—তাও বেশীবার নয় দুবার শুধু—"But what have you got to do with it?"—"Sir, I sir" কথা আর ভদ্রলোকের শেষ হ'লনা, ভীড়ের পিছনে আস্তে আস্তে তিনি মিলিয়ে যেতে লাগলেন বুদ্বুদের মত—মরীচিকার মত—স্বপ্নের মত—বায়োস্কোপের ছবির মত। ভীড় একটু একটু করে ভেঙ্গে গেল। আমাদের বাসও এগিয়ে চল্ল।

কিছুদূর গিয়ে দেখি আবার কিসের চীৎকার, ছেলেরা Procession করে চলেছে, anti-

repression day বুঝি আজ? কিন্তু ওদের অমন বাছা বাছা war cry গুলোও আজ আমার কাণে বেসুরো শোনাতে লাগল, ভাবলাম ওদের অত চীৎকার অত আস্ফালন সত্বেও ওদের ভিতরও ইংরাজ ভীতি ঠিক সমান ভাবেই সুপ্ত হয়ে নেই কি? কে জানে!

বংশপরম্পরায় পিতৃ-পিতামহদের কাছে পাওয়া—প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে মিশিয়ে-থাকা আমাদের এই কাপুরুষতা। একি সহজে যাবার?

মনে পড়ছিল 'পথের দাবীর' সেই কথাটা, "রাজত্ব করবার লোভে সমস্ত দেশে মানুষ বলতে একটি প্রাণীও যারা অবশিষ্ট রাখেনি তাদেব তুই .. ।"

রেনাসান্স

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আকাশ পথে গতিবেগ ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন, এই দুইটি তথ্য পোলাণ্ডবাসী কোপরনিকস্ প্রথম প্রমাণ করাইয়া দেখাইলেন। ডেনমার্কের টাইকোব্রাইর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সম্বন্ধে আলোচনা জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক কেপলারের মনীষায চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল, গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪১) গতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের জন্মদাতা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে লোকে বিশ্বাস করিত, যে বস্তু যত ভারী তাহা তত অল্প সময়েব মধ্যে শূন্য হইতে পতিত হয়। গ্যালিলিও ইহা অস্বীকার করিলেন। দশ পাউণ্ড ও এক পাউণ্ড ওজনের দুইটি লৌহ গোলক লইয়া তিনি পিসা নগরের মানমন্দিরের চূড়ায় উঠিলেন এবং দুইটি গোলককে একসময়ে নীচে ফেলিয়া দিলেন, গুরুত্বের তারতম্য সত্বেও দুইটি গোলক প্রায় এক সময়েই ভূমিতে পতিত হইল। বহুকালের ভ্রম ঘুচিযা গেল। গ্যালিলিও কোপরনিকসের জ্যোতিষ্কি মত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে, এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য চার্চ্চের বিচারে তাঁহাব কারাদণ্ড হয়। 'পোপের রক্ত চক্ষু তাঁহার উপর পড়িয়াছিল, তিনি প্রকাশ্যভাবে এই মত প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

যে বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় সেই বৎসর নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জ্ঞান রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়া দিলেন। কলচেষ্টারের ডাঃ গিলবার্ট রোজার বেকনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, চুম্বক সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ফ্রান্সিস্ বেকনেব বিজ্ঞান বোধ উদ্রেক করিয়াছিল। বেকন পরীক্ষামূলক দর্শনশাস্ত্রের জনক। তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, 'নিউ আটলান্টিস্' নামক গ্রন্থে তিনি যে বিজ্ঞান

মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে "রয়েল সোসাইটি"র জন্ম হয়। এত-কাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল কিন্তু এই বিজ্ঞান-পরিষদ্ স্থাপনের পর বৈজ্ঞানিকগণ পরস্পর চিন্তার আদান প্রদান করিবার সুবিধা পাইলেন। বিজ্ঞান সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিল। জনসমাজে ইহা বিস্তৃতিলাভ করিল ও এক পরিমার্জ্জিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিল। হারভি জীবদেহে রক্তসঞ্চালনের সত্যতা প্রমাণ করিলেন। নিউওয়েনহোক্ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জীবননাট্যের অপরিজ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞানতার যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিলেন।

জার্ম্মানী ও হল্যাণ্ডে মানসিক জাগরণ ধর্ম্মান্দোলন হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। ইহা রাজনীতির উত্তাপে ও ধর্ম্মনীতির উত্তেজনায় পূর্ণ, সুতরাং ভাবপরিকল্পনায় এবং সাহিত্যিক সার্ব্বভৌমিকতায় ইহা নিঃস্ব ছিল, জার্ম্মানীর লুথারের ন্যায় হল্যাণ্ডের ইরাস্‌মাস এই নব জাগরণের প্রতিনিধি ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের টমাস মোর হিউম্যানিষ্ট লেখকদের অন্যতম, তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত গুণী নিতান্ত দুর্লভ ছিল, ইউটোপিয়া নামক এক কল্পিত রাজ্যের বর্ণনা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান রচনা। ইহার প্রভাব ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বহু অনুকরণের মধ্যেই প্রকাশ। এমন কি উনবিংশ শতকে উইলিয়ম মরিস্ প্রভৃতি অনেকে এই গ্রন্থের নিকট প্রভূত ঋণী। এখনও এক জাতীয় সোস্যালিজ্‌মে মোরের চিন্তাধারার ছাপ সহজেই উপলব্ধি হয়, মোর আন্তর্জ্জাতিক শক্তির পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি হাউস অফ কমন্সের সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং এই সভায় স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার তিনিই প্রথম নির্ভীক ভাবে দাবী করেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্ম্মমতের জন্য উচ্চ রাজপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেক বিরোধী শপথ গ্রহণের আদেশ নিতান্ত অন্যায় জ্ঞান করিয়া তিনি সেচ্ছা মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। ইওটোপিয়ায় তিনি কল্পনার রাজ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। শুধু বিচার বুদ্ধি দিয়া মানুষ যদি এত সুন্দর সমাজ গঠন করিবার কথা ভাবিতে পারে তবে প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কত উন্নত হওয়া উচিত, অথচ সমসাময়িক ইয়োরোপের কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, এই কথাই তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তর আমেরিকার নবাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ জনবিরল ভূখণ্ডে উপনিবেশ গঠনের সংকল্পে মোরের উৎসাহ ছিল। জার্ম্মান ঐতিহাসিক অনকেন তাঁহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-পথ-প্রদর্শক বলিয়াছিল কিন্তু জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা খৃষ্টীয় ইয়োরোপের ঐক্যের আদর্শই তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল।

চসারের অন্তঃহৃদয়ে যে কবিতা কুসুমটী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা গৃহ-কলহ, গোলাপের যুদ্ধ, মহামারী ও ধর্ম্মের বাদ প্রতিবাদের প্রখরতাপে ম্লান হইয়া গেল কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্বের পর তাহা আবার সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। বসন্ত যখন দেখা দেয় তখন গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাগে হিল্লোল-নাচন, কুঞ্জে কুঞ্জে দেখা দেয় অসংখ্য পাখীর আনন্দ শিহরণ। বর্ষায় নবীন মেঘ অজস্র বারি বর্ষণ করিয়া ভাসাইয়া দেয় পল্লী প্রান্তর। নদ নদী স্ফীত হইয়া বেগে বহিয়া চলে সাগর সঙ্গমে। ইংল্যাণ্ডের

জাতীয় ও সাহিত্যিক জীবনে যে জাগরণ আসিযাছিল, তাহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্ম্মী ও শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিযাছিল। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পের বহুল প্রচার হইয়াছিল। লাতিন, গ্রীক্ ও ইটালীর সাহিত্যেব অনুবাদে ইংরাজী সাহিত্যের উর্ব্বর ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

স্পেনসারের "ফেয়ারি কুইন" সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠবে মনোজ্ঞ কিন্তু দ্ব্যর্থসূচক নীতিমূলক অতিকায় কাব্য সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু এইরূপ কাব্য এলিজাবেথের যুগের বিশেষত্ব নয়, এই যুগের বিশেষত্ব নাটক। মার্লো, বেন্ জনসন, চ্যাপম্যান, ডেকার, ম্যাসিঙ্গার প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক রূপস্রষ্টার পরিমণ্ডলে সেক্সপিযর (১৫৬৪-১৬১৬) তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি এলিজাবেথের কাব্যকুঞ্জে মধুপ্রার্থী পিকবর। যে জটিল বৃহৎ সত্য ভাষায প্রকাশাতীত, তাহাকে মানব মনের গ্রহণযোগ্য করিয়া, জডবাক্যে শক্তিযোজনা করিয়া লোক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ছিলেন আত্মগুপ্ত কবি। চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিযা উঠিতে অবসর দেন নাই। স্বরচিত চরিত্রের সহিত তিনি কল্পনায একাত্ম। ফ্লবেযার বলিযাছেন, বিশ্বে যেমন বিধাতা, কাব্যেও তেমনি কবি, সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ অপ্রত্যক্ষ। যে চিত্র যখন তাঁহার মানস মুকুরে প্রতিফলিত হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাই তিনি অনবদ্য ভাষায় রূপদান করিতেন। নাটকীয় আত্মবিলোপে তাঁহার আত্মহত্যা ঘটে নাই। অন্তরের গূঢ়তম প্রকোষ্ঠে যে ইচ্ছা, সংকল্প, আগ্রহ, আশা, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, আবেগব্যঞ্জনা সুপ্ত থাকিত, তাহা তাঁহার অনুপম ভাষায পরিমূর্ত্ত হইযা উঠিয়াছে। এইরূপ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রাচুর্য্য অন্যত্র দুর্ল্লভ। এইজন্য সেক্সপীয়র বিশ্বকবির দরবারে মহারাজাধীরাজ। প্রাচীনকালে একমাত্র হোমর এবং আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন কবিই মানব জীবনের অখণ্ড সমগ্রতাব শিল্পী হিসাবে সেক্সপীযরের সমকক্ষ নহেন। জীবনের বিস্তৃতিবোধে হোমরের ক্ষমতা ও সেক্সপীযরের সমশ্রেণী এবং নিছক্ সৌন্দর্য্যানুভূতির মহিমায় রবীন্দ্রনাথেব অন্তর্দৃষ্টি সেক্সপীয়র অপেক্ষা গূঢ়তর হইলেও জটিলতা বোধে সেক্সপীয়রের দৃষ্টি গভীরতর। সেক্সপীয়রেব নাটকাবলী নৈর্ব্যক্তিক লিপিকুশলতার চরম নিদর্শন। তাঁহার অনাসক্ত কল্পনা, তাঁহার বিশাল প্রতিভা, তাঁহার রহস্যময় কবিপ্রকৃতি, সৃষ্টি প্রতিভা ও প্রকাশসামর্থ্য একদিকে যেমন তাঁহার জ্ঞানও অপরিমেয শক্তিব পরিচয দেয অন্যদিকে তাঁহার স্বচ্ছ আনন্দ প্রবণতা—তাঁহার "শুভ্র সংযত হাস্য" তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির উচ্চ আসন দান করিযাছে।

এই যুগের মিল্টনের (১৬০৮-১৬৭৪) মহাকাব্য সমুদ্রতীবে আলোকস্তম্ভের ন্যায় মস্তক উত্তোলন কবিযা দাঁডাইযাছিল। ছান্দসিক প্রতিভায়, গাম্ভীর্য্যে, কল্পনার বিশালতায়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাসৌষ্ঠবে মিল্টনের মনীষা অতুলনীয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যে, লালিত্যে, বৈচিত্র্যে ও মানবতায় তিনি ছিলেন সেক্সপীয়বের বিপরীতধর্ম্মী।

ইয়োরোপে এই জাগরণের সুফল স্বরূপ পর্তুগ্যালে কমিয়স্ লুডিযাড্ নামে এক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ন্যায় স্পেন একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। সারভে নটিসের (১৫৪৭-১৬১৬) ডন্ কুইক্সোট্ মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ

নূতন ও পরিবর্তিত সমাজে বাস করিয়া যে ব্যক্তি প্রাচীন পন্থানুযায়ী নিজ জীবন চালিত করে, সে একজন স্বপ্নবিলাসী সন্দেহ নাই। এই সংঘর্ষের ফলে যে হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা আমরা ডনকুইক্সোটের চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। সেক্সপীয়রের ফলষ্টাফ্, চসারের বাথের রমনি, র‍্যাবেলের গ্যারাগানবুয়ার ন্যায় ডনকুইক্সোট্ বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, হাস্যরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। সাহিত্যিক রসস্রষ্টাগণের প্রাণখোলা হাস্যরসের মুক্তধারায় নিবাত নিষ্কম্প বিজ্ঞান অন্তঃপুরের গাম্ভীর্য্য ও গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

ইয়োরোপের সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এক সুবৃহৎ মানসিকতা জন্মলাভ করিয়াছিল, এই জাগরণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছিল ইহার কাহিনী প্রধানতঃ সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কাহিনী ইহা মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্র পল্লবিত হইবার কাহিনী, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ স্পর্শে ফ্রান্স ইতালি ও ইংল্যাণ্ডের মন পুলকিত ও আমোদিত হইয়াছিল, রেনাসান্সের সৌন্দর্য্যানুরাগ ও রিফরমেশনের কল্যানুরাগ ক্লাসিসিজমে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

একদিকে যেমন রোজার বেকন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের সন্ধানপরতা বিদগ্ধমণ্ডলীর অসূর্য্যম্পশ্য প্রকোষ্ঠের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছিল অন্যদিকে সেইরূপ নবযুগের চিত্রশিল্পী ও ভাস্করগণ মধ্যযুগীয় শিল্পের ধাম্মিকতা ও সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধের গণ্ডিভেদ করিয়া নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল। রেনাসান্সের মর্ম্মবাণী অতীত প্রীতি নয়। ইহার গূঢ়তত্ত্ব মুক্তি, চিত্তের অবন্ধন। উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত গথিক শিল্পাদর্শ অথবা দক্ষিণাচল হইতে আগত মোস্‌লেম প্রভাব ইতালির শিল্প জীবন স্পর্শ করে নাই, পঞ্চদশ শতকে ভিট্রিভিয়সের স্থাপত্য বিষয়ক লাতিন ভাষায় লিখিত পুস্তক আবিষ্কৃত হইল, সাহিত্যে ক্লাসিক প্রভাব ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ইতালির শিল্প এই দুই প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া এক নবতর শিল্পসৃষ্টির সূচনা করিয়াছিল। সার্লেমেনের যুগ হইতে চিত্রশিল্পে বস্তুতান্ত্রিক অনুকরণ স্পৃহা অনুভূত হইতেছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্ম্মেনিতে চিত্রবিদ্যা দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, কাষ্ঠের উপর বস্তু বিশেষের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইতেছিল। ইতালিতে গৃহের দেওয়াল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রসার লাভ করিতেছিল, জার্ম্মেনির কোলন নগরে এক শিল্পিমণ্ডলী আবির্ভূত হইয়াছিল, হল্যাণ্ডে হিউবার্ট ও জানভ্যান্ হক্ নামে শিল্পীদ্বয়ের চিত্রে সৌন্দর্য্য ও বাস্তব প্রাণময়তার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল, ত্রয়োদশ শতকে ইতালির সিমাবিউএর চিত্র-শিল্প বিখ্যাত, তিনি গিওটোর শিক্ষক ছিলেন। শিল্পোদ্ধারের প্রথম অবস্থায় তাঁহার দান অপরিসীম। এই পর্য্যায়ের শেষ শিল্পির নাম ফ্রা এঞ্জোলিক দা ফিসোলি, (১৩৮৭—১৪৫৫)

ইহার পর ফ্লোরেন্সে চিত্র শিল্পের এক গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইল, এই যুগের শিল্পে বস্তুতান্ত্রিক চিত্রনের বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নিছক সৌন্দর্য্যপরিকল্পনার পরিবর্ত্তে বাস্তবতার বা বিষয় বস্তুর অন্বেষণ ও অঙ্কন প্রধান বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। সেবাসন শিল্প মনুষ্যদেহ অঙ্কন প্রণালী বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, বাইজানটাইনের শিল্পে তাহা কঠিনতা লাভ করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা, পুনরায় দেওয়াল ও প্রস্তরের উপর আত্মপ্রকাশ করিল। চিত্রশিল্পে প্রাণ সঞ্চার হইল। অনুভূতির

সবল প্রকাশ ও গভীরতার দিকে শিল্পীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শরীরবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে লাগিল। ক্ষুদ্রবস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাবেশে চিত্রশিল্প গৌরবময় হইয়া উঠিল, ইতালি, জার্ম্মানি, হল্যাণ্ড ফ্লোরেন্স, অমব্রিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু চিত্রশিল্পীর অভ্যুদয় হইল। ফ্লোরেন্সে ফিলিপো শিল্পী বটেসেলি, ঘিরল্যাণ্ডিজো এবং আম্বিয়ায় সিগনোরেলি, পেরুগিলো, মণ্টেগনা প্রভৃতি প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পির আবির্ভাব হইল। টাইটিয়ানের শিল্প প্রতিভায় ভেনিসের চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শীর্ষস্থান আবিষ্কার করিল। বস্তুতন্ত্রতার সহিত জীবন ও শিল্পের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। টাইটিয়ানের "পবিত্র ও অপবিত্র প্রেম" নামক চিত্র মাইকেল এঞ্জেলোর "আদর্শের সৃষ্টি" নামক চিত্র চিত্রাঙ্কন বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। হ্যানস্ হোলবেন (১৪৯৭-১৫৪৩ একজন জার্ম্মান ইংলণ্ডে চিত্রশিল্প আমদানি করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড তখন গৃহকলহে লিপ্ত। উচ্চধরনের সাহিত্য ও সঙ্গীতের জন্য এলিজাবেথের যুগ প্রসিদ্ধ কিন্তু এই যুগেও ইংলণ্ডের চিত্রাঙ্কন বা স্থাপত্য ইতালি ও ফ্রান্সের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য জার্ম্মানী সুকুমার শিল্পে পশ্চাৎপদ হইলেও রুবেনস্ ও র‍্যামব্রাণ্ট ফ্লেমিসভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে ইতালির চিত্রশিল্পে ভাঁটা পড়িয়াছিল। মনুষ্যদেহ অঙ্কনের অভিনবত্ব ও ইচ্ছা অন্তর্হিত হইল। পাপ, শিল্প, পুণ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বস্তুগুলিকে রমণীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত কবিবার প্রবৃত্তি প্রতিভাবান শিল্পীর মন আকৃষ্ট করিতে পারিল না। জার্ম্মেনি, ফ্রান্স ও উত্তর ইতালির চিত্রশিল্পী ক্লাসিক শিল্প উদ্বর্তনের স্রোতে মন্দীভূত হইযা গেল। মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প প্রতিভায় এই নূতনভাব যে রূপ গ্রহণ করিযাছে, তাহার সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব রহস্যময় ও অনবদ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্য্যে অবসাদ ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইযোরোপে বিভিন্ন দেশে বহু সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিসেনজা নগরে পাল্লাভিত্তর নির্ম্মাণ প্রতিভায় বহু নিদর্শন পাওযা যায়। আধুনিক যুগেব স্থাপত্য শিল্প রেনেসান্স যুগের স্থাপত্য শিল্পের ক্রমঃ বিকাশের ফল। স্পেনে চিত্রবিদ্যা স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করে নাই। স্পেনের শিল্পিগণ ইতালিতে গিযা চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা স্বদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে স্পেনের চিত্রশিল্প ভিলাজকোয়েজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মঞ্জুরিত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, চিত্রশিল্পে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অভিনব রূপে আকারিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের র‍্যামব্রাণ্ট ও স্পেনের ভিলাজ-কোয়েজ যে নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা উনবিংশ শতকের শিল্পাদর্শে সঞ্জীবিত স্ফুরিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

পথের কাঁটা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৫)

"শোভার চিঠি শুভ্রেন্দুকে"

.অনেক ভেবে—মনের ভিতরে দিনের পর দিন অনেক তোলাপাড়া করে আজ তোমায় একখানা চিঠি লিখতে বসেছি। মুখের ভাষায় যেখানে সরাসরি কথা কইবার পথ রুদ্ধ, সেখানে চিঠির দৌত্য ছাড়া উপায় কি? কিন্তু আমার এ অক্ষম দূত হৃদয়ের গভীরে যে অগণ্য অকথিত গোপন কথা ভিড় করে জমে আছে, তার কতটুকু আভাস তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে, জানিনে। তবে এতদিন অপেক্ষার প'র যে আজ এই চিঠিখানা লিখতে বসেছি—এতেই বুঝবে, আমার মনের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু একথায় তুমি যদি বুঝে নেও যে আমি ধৈর্য্যের সীমা হারিয়েছি তাহলে সত্যিই ভুল হবে। এতদিনে আমার জানতে বাকী নেই যে এ জগতে বেঁচে থাকতে হলে, ধৈর্য্যই আমার একমাত্র সম্বল। এ সম্বল যেদিন ফুরোবে, সে দিন চিঠির ভাষা খুঁজবার দায় থেকেও মুক্তি আসবে। কিন্তু আমি ভাবি, শুধু খানিকটা ধৈর্য্য আমায় কোথায় নিয়ে পৌঁছে দেবে। মাথার উপরে দীর্ঘ দিন—সমুখে গভীর গহন সংসার-অরণ্য—আমি একলা পথিক। কোথায় পথ, কোথায় নয়, আমি জানিনে। তা আমার জানবারও কথা নয়—সে শিক্ষা তো আমায় কেউ-ই দেয়নি কোনো দিন। আর একজন এসে পথ দেখিয়ে দেবে, তবেই পথ চলবো—এই কথাই তো চিরদিন শুনে আসছি। আজ যদি শুধু নিজের পরে ভরসা রেখে পথের ঠিকানা খুঁজে না পাই, তবে যাদের এমন দশা হবার কথা নয়, তারা আমায় কৃপার চক্ষে দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসতে পারে। কিন্তু তাতে করে আমার মত অসহায়ের জীবন-সমস্যা মেটে না।' অথচ কি হোলে যে মেটে, তাও জানিনে এবং একা একা পথ খুঁজেও পাইনে। তাই আজ আমার এই চিঠি লেখা। কিন্তু লিখতে বসে বার বার এই চিন্তাটা ঘুরে ফিরে মনে আসে—কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না যে, আমার কথা নিয়ে তোমার কাছে যাওয়ার সোজা পথটা খোলা রইল না কেন? আমার কথা রয়েছে আমার বুকে—আর তুমি আছ আপন মনে—চিরদিন এত দূরে যে তার নাগাল পাওয়া যায় কিনা, তাও জানিনে। কিন্তু কেন? দুনিয়ার আর দশজন যা না চাইতে পায়, আমার তাতে কোন অধিকার নেই কেন? আমার যদি এমন কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, যার ক্ষমা নেই, তবে আমার তা জানতেও কি নেই? আর তা যদি না হয়, তবে অপরের দোষে আমার এ এত বড় সাজা.

কেন? এর জবাব আমায় কে দেবে? তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি কিনা, তা-ও জানিনে। মনে কথা জাগে বারে বারে--না লিখে পারিনে--তাই লিখলাম।

আমি শুনেছি, তুমি চাওনি--না বলে কয়ে সবাই মিলে আমার জীবনের সঙ্গে তোমায় জড়াবার ব্যবস্থা করেছে। ধর্ম্মকে তুমি বড় করে পেয়েছ সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে। তাই হয়তো তুমি আমাকে পথের কাঁটা মনে করে' এড়িয়ে চলতে চেয়েছ। তোমার মনের গতি কোন দিকে, তার খোঁজ না নিয়ে, কিম্বা তার খোঁজ পেয়েছে বলেই যারা ফন্দি এটেছিল সে গতির মুখ ফেরাতে, তুমি কোনো দিন ধরা দাওনি তাদের সে ফন্দির জালে—চিরদিন তার বাইরে থেকে তুমি নিজের মনে নিজের পথ কেটে এগিয়ে চলেছ। আজো আমি আবার নূতন করে জাল পেতে তোমায় সোনার কিম্বা লোহার কোনো শৃঙ্খলে বাঁধতেই আসি নি। ধর্ম্ম যদি তোমায় পথ দেখায় এবং সে পথ যদি আমা থেকে দূরে—বহু দূরেও নিয়ে যায়, তবে তা নিয়ে আমার কোনো নালিশ নেই। যাত্রা-পথে তোমার চলা সহজ হোক—বাধাহীন, ক্লেশহীন হোক—দিনে রেতে এ ছাড়া আমার অন্য কোনো কামনা নেই।

আমার একমাত্র কথা এই যে, যে আলোর বর্ত্তিকা তুমি হাতে পেয়েছ, তা কি আমায়ও পথ দেখাতে পারে না? চারদিকে বিরাট অন্ধকার আমায় ঘিরে রয়েছে—একলা আমি পথ খুজে মরছি। তোমার হাতের আলোটি একটুখানি উঁচিয়ে ধরলে, যদি আমি জীবনের পথ দেখতে পেয়ে বেঁচে যাই, তবে সেটুকুও কি আশা করা অন্যায়? তোমার তাতে কোনো লাভও নেই, ক্ষতিও নেই—লাভক্ষতির কথা এর ভিতরে ওঠেই না। এক একলা পথের পথহারা, দিশেহারা পথিক পথ পেয়ে যাবে—এইটেই তো বড় কথা।

একখানা চিঠি—আর কিছু নয়, যা প্রথম ও শেষবারের মত তোমার পথের বার্ত্তা আমায় এনে পৌঁছে দেবে। সব আশা—সব আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে কোথাও আমি সান্ত্বনা খুঁজছি, সেইটে তোমায় আরো স্পষ্ট করে বলি। তোমার পথের আমিও পথিক—এই একমাত্র সত্য সান্ত্বনা আমি চাই—তুমি তা থেকেও যেন আমায় বঞ্চিত করো না।

(৬)

"শুভ্রেন্দুর ডায়েরী"

এক মুহূর্ত্ত অবসর নেই। দিনরাত ছুটে চলেছি। জীবনটা যেন শুধুই গতি। যতই ছুটি—ততই বেগ বাড়ে, আকাঙ্ক্ষা যেন তাকেও ছাড়িয়ে আগে আগে চলে। এর ভিতরে এমনই এক অন্ধ মাদকতা আছে যে গতির আনন্দ প্রাণপুরে পান করেও, আশ মেটে না। বেগের আবেগ বুক ছাপিয়ে উপচে পড়ে—তাকে সামলে রাখা যায় না। দিন রাত চাই গতির উত্তেজনা—চাই কাজের ভিড। কাজ! কাজ! কাজ! দিনগুলি যেন কাজের জাল দিয়ে ঠাস বুনোট হয়ে

আছে। কাজ নিয়ে চিরচঞ্চল হাওয়ার মত উদ্দাম হয়ে লুটোপুটি খাওয়ার ভিতরে এক রস আছে, যে তার স্বাদ না পেয়েছে, তাকে বোঝানো যায় না। কেন কাজ করি—ও কাজ না করে কেন এ কাজ করি—যে কাজ করি, সে কাজ আমায় কোন লক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে, এ সব প্রশ্নের একটা বুঝ এর ভিতরে আছেই। তবু নিছক কাজের একটা বিপুল উন্মাদনা আছে—একটা পরম আকর্ষণ আছে। দেহের অবিশ্রাম গতি, মনটাকেও সচল সবল রাখে—মনের কোণে কোণে জমে ওঠা যত কিছু আবর্জ্জনা—ক্লেদ দু হাতে ঠেলে ফেলে সে এগিয়ে চলে।

এই যে কাজের হট্টগোলের ভিতরে দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছি, এতে আমার আলিস্যি নেই—অতিরিক্ত শ্রমে শরীরটা কখনো নেতিয়ে পড়লেও, মনের উৎসাহ ও উন্মাদনার অন্ত নেই। এক এক সময়ে মনে হয় যেন ভূতে পেয়েছে—আপন কর্ম্মের ভূত ঘাড়ে চেপে দিনরাত ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে। শুধু যে শরীরটার উপরেই ভর করেছে, তা নয়—মনটার গোড়াতেও যেন সে-ই বসে নিত্য নূতন কর্ম্মের প্রেরণা জোগাচ্ছে। তাই দাঁড়িয়েছে কর্ম্মই আমার রাত্রি দিনের ধ্যান জ্ঞান--কর্ম্মেই আমার মুক্তির আনন্দ। কর্ম্ম করতে পেলে আমি মুক্ত হাওয়ার মাঝে ছাড়া পাই—শরীরে মনে গতির সঙ্গে মুক্তির জোয়ার বইতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মহীনতার রুদ্ধ গৃহের পঙ্গুতা ও ক্ষুদ্রতার মাঝে আমি অল্পেই যেন হাঁপিয়ে উঠি। কর্ম্মই আমার ধর্ম্ম—কর্ম্মই আমার সব। জীবনটা যেন, স্রেফ্ কর্ম্মের মাল-মসল্লা দিয়েই তৈয়েরী হয়ে উঠেছে। শরীরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে—বুক, পেট, মগজের সব ফাঁক জুড়ে যেন কর্ম্মের দানা গিজ্ গিজ্ করছে। মনের কানায় কানায় ভরপুর অফুরন্ত কর্ম্মের প্রেরণা যেন বে-সামাল হয়ে উপচে পড়ছে।

কিন্তু কর্ম্মের যে শেষ নেই, তা-ও আমি জেনেছি। যতই কর্ম্ম করি, কর্ম্মের জের বেড়েই চলে। এক কর্ম্ম আরো শত কর্ম্মের সৃষ্টি করে তোলে—কার্ম্মের অনন্ত প্রবাহ অফুরান বইতে থাকে। কর্ম্ম-প্রবাহের আমি উপ-প্রবাহ—দিনে রাতে আমার অর্ঘ্য তাকে নিবেদন করে যাচ্ছি। এমনি আরো কত উপ-প্রবাহের বারিরাশি নিয়ে তার কলেবর পুষ্ট ও গতি অব্যাহত, অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং এমনি থেকে যাবে চিরদিন। এক দিন আসবে, যেদিন প্রাণের পুঁজি যাবে ফুরিয়ে—ক্রমে অস্তিত্বের হবে অবসান। তার পরে, আবার আর এক দিন নূতনের হবে সমাগম—এক, দুই, দশ—শত শত! তাদের দানে কর্ম্ম-প্রবাহ হয়তো আরো প্রবল, আরো বিস্তৃত, আরো উত্তাল হয়ে উঠবে। আমি যেখানে 'ইতি' দিয়ে চলে গেছি, সেইখানটাতেই হয়তো বহু প্রবাহ মিলে বিরাট দরিয়া বনে' যাবে এবং কত আঁক-বাঁক সৃষ্টি করে নূতন নূতন দেশ-গাঁর ভিতর দিয়ে বয়ে চলবে। কিন্তু প্রবাহের শেষ নেই—গতির বিরাম নেই। কর্ম্মের আদি নেই, অন্ত নেই—চিরকাল চঞ্চল হয়ে জেগে রয়েছে মানুষের সাথের সাথী হয়ে। কর্ম্মহারা হয়ে কেউ থাকে না—থাকতে পারে না। কর্ম্মের রাজত্ব অক্ষয়, অলঙ্ঘ্য, অপরিসীম। কর্ম্মের শেষে কি আছে, তা খুঁজতে যেয়ো না। বাস্তব সত্যের কঠিন আঘাতে শুধু ব্যথার সৃষ্টি হবে। আর তাতে করে কেবল অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতাই অকুণ্ঠ পরিচয়ের প্রকাশ হবে। এই কথাই সার কথা যে কর্ম্মেই কর্ম্মের স্বার্থকতা।

পুলিশ পেছনে লেগেছে। বড়ই উত্যক্ত করে তুলেছে। যেখানেই যাই, পেছনে ভূত লাগার মত অদৃশ্য থেকে পায়ে পায়ে অনুসরণের চেষ্টা করছে। সে হয়তো সত্যিই ভাবছে যে তার বিশিষ্ট কাজের গরজে সে এমন এক দিব্য দেহের অধিকারী হয়েছে, যার কায়া নেই—ছায়া নেই—মানুষের পাপ চোখে দেখবার উপায় নেই। কাজে কিন্তু সে শ্রীমুখ খুঁজে পেতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা দেরী হয় না। একদিন যেতে যেতে তাকে খুঁজে পেলুম অপর ফুটপাথে। নূতন লোক—নূতন বেশ,তবু সে মূর্ত্তি চিনে নিতে দেরী হোলো না। হঠাৎ মনে কেমন একটু খটকা বাধলো। ভাবলাম পরীক্ষা করতে হবে। একখানা বাস আমার পেছনটাতে এসেই থেমে গিয়ে যেইমাত্র চলতে সুরু করেছে, আমি টক্ করে উঠে পড়লাম লাফিয়ে সেই চলন্ত বাসের 'পরে। অমনি অপর ফুটপাথ থেকে কে একজনা ছুটতে সুরু করে দিলে। "বাসওয়ালা! বাঙ্কো"—"বাসওয়ালা বাঙ্কো" বলতে বলতে লোকটা অনেক দূর দৌড়ে এসে গাড়ীতে উঠলো। দেখে আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে আমার অনুমান ভুল হয়নি। আমি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীর সামনের দিকটাতে বসে পড়লাম। আর লোকটা পেছনের দিকে গার্ডএর কাছটাতে দাঁড়িয়ে রইলো। গার্ড নিকটে পেয়ে তার কাছেই প্রথম টিকেট চাইলে। দেখলাম লোকটা পয়সা দিয়ে টিকেট কিনলে। তারপরে গার্ড যখন আমার কাছে এলো আমি মান্থ্লি টিকেট দেখিয়ে দিলাম। গার্ড বললে—"এ গাড়ীতে তো এ টিকেট চলবে না।" আমি বললাম "তাই নাকি—তবে তো বড় ভুল হয়ে গেছে। গাড়ীটা থামিয়ে দিন—নেমে যাই।" গাড়ী থেকে যখন নেমে এলাম, দেখলাম, সে শ্রীমানও আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। কিন্তু পুরোপুরি থামবার আগেই আমি চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তাই তাকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে সামনে নামতে হয়েছে। নেমেই বিক্রীর জন্যে ফুটপাথের একপাশে এলোমেলো ছড়ানো বইয়ের রাশির ভিতরে সে এমন অভিনিবিষ্ট হয়ে গেল, দেখে মনে হয়, যেন পৃথিবী ভেঙ্গে চুরে সব একাকার হয়ে গেলেও তার পড়ার ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু আসলে সে বক-ধার্ম্মিক—ধ্যানের ভান করে বসে ছিল, যেমনি আমি সেখানটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছি, অমনি শিকার পালিয়ে যাচ্ছে দেখে, পেছনে পেছনে চলতে সুরু করে দিলে। চলার ভঙ্গী কি?—ব্যস্ততাহীন মন্থর পদক্ষেপ, দূর-নিক্ষিপ্ত অন্যমনস্ক দৃষ্টি, বুদ্ধ প্রায় সুখ-দুঃখ-হীন নির্ব্বিকার মুখভাব—শুধু মাঝে মাঝে নিমেষের তরে হঠাৎ এক একবার আড়চোখে আমার পানে চাওয়া। পরীক্ষা হয়ে গেল—যা বুঝবার, তা-ই বুঝলাম। এমনি আরো কত ফন্দি আছে, এদের পাকড়াও করবার। সব ফন্দি বাতলিয়ে আর কি হবে। একটাতেই "ইতি" দেওয়া ভালো।

কিন্তু এদের উৎপাতে কাজের বড় ব্যাঘাত হচ্ছে। তাই, আমার কাজের ধারাটা একটু বদলাতে হয়েছে। বিকেল বেলাটা আজ আর বেরোইনি—রাত্রের অস্পষ্টতার আবরণে বেরোনো যাবে গা-ঢাকা দিয়ে। তাই এই ফাঁকে ডাইরীর খাতাখানা খুলে বসেছি ভাষা লেখার বিলাস নিয়ে আরাম করতে। মনের চিন্তাগুলিকে তুলিয়ে দিয়ে তাইরে-নাইরে করে আপন মনে দোল খাওয়া ও কল্পনার সুতো পাকিয়ে পাকিয়ে কালির আঁচড়ে খাতার পাতায় জাল বোনা—এতে কর্ম্মহীন

আলস্যের সময়টা কেটে যায় বেশ একটা নেশার আবেশের ভিতর দিয়ে। এর ভিতরে খুব একটা মজা আছে। অন্তরের অন্দর মহলে যে সব অস্ফুট, অসংলগ্ন চিন্তার কুঁড়ি ঘুমিয়ে আছে, তারা এক একটি করে ফুটে উঠে সবাই মিলে যখন কথার মালা হয়ে শোভা পায়, তখন দেখে দেখে আমি নিজেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। এত কথা যে এক একটা খণ্ড চিন্তার অন্তরে লুকিয়েছিল, তা কে জানতো। যখন তারা বেরিয়ে এসে এই খাতার পাতায় জমা হয়, মনে হয় যেন এ এক নূতন সৃষ্টি। এ সৃষ্টি হয়তো দুনিয়ার কোনো কাজেই আসবে না। কিন্তু এই কর্ম্মহীন দিনের অনর্থক সৃষ্টির ভিতরেও যে আনন্দের স্বাদ পাই, তা-ই বা কম কথা কি? তাই মনের আনন্দে ডাইরী লেখার জন্যেই ডায়রী লিখি। সব দিন অবশ্যি লেখা হয় না। এই যেমন, অনেক দিন পরে আজ লিখতে বসেছি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে বসিনি যে রোজই লিখতে হবে, কিম্বা ক্লাশের পড়ার মত আমি এ কাজটাকে একটা অনিচ্ছুকের বোঝা করেও তুলতে চাইনে। যা অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি, মানুষের তৈয়েরী নিয়মের নিগড় ও তার ঝনঝনা তার বুকের রক্ত শুষে নিয়ে সৃষ্টিটাকেই ব্যর্থ করে দেয়। তাই যখন অবসর মেলে ও বুকে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখনি লিখি,—নইলে ডাইরীর খাতার অখণ্ড ধ্যানের পালা দিনের পর দিন।

এম, এ-টা কোন রকমে পাশ করেছি। খুব খেটেছি কয়েকটা মাস পরীক্ষার আগে। ভাবলাম, পড়ছি যখন কলেজে, পাশ করতেই হবে। পরীক্ষায় ফেল করে, একটা অকৃতকার্য্যতার বোঝা বুকে নিয়ে জীবন সুরু করা, ভাল কথা নয়। তাই উঠে পড়ে লাগতে হয়েছিল পরীক্ষাটার জন্যে। অবশেষে আমার পরিশ্রম যে সার্থক হয়েছে, তাতে সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু এখন যে আইনের ক্লাশে নাম লিখিয়ে রেখেছি, ওটা শুধু চাকুরীর হাঁড়ি-কাঠে নিজেকে বলি না দিয়ে বিনা কাজে কলকাতায় থাকার একটা অজুহাত খাড়া করে রাখবার জন্যে। কাজেই আইনের পরীক্ষা দেওয়া ও তাতে পাশ করা, না করার কোনো কথাই উঠতে পারে না এর মধ্যে। উকিলের সামলা পরে যাত্রার দলের জুড়ি সাজার ইচ্ছা আমার কোনো কালেই ছিল না—এখনও নেই। তাই পড়িও না আইনের কোনো বই। এখন আমার বহু কাজ—তাই সময় পাইনে বলেই যে পড়িনে, তাও নয়। বরং পড়বোনা বলেই, যে ও পড়ার পেছনে সময় দেবার গরজ নেই, এই কথাই আসল কথা। অনন্যমনা হয়ে আজ যে প্রতিদিনের প্রত্যেকটি নিমেষ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে লাগাতে পারছি, এতেই আমার আনন্দের সীমা নেই। আজ আমার প্রত্যেক কাজের এক অর্থ, এক লক্ষ্য, একই সার্থকতা। এমন কি আমার খাওয়া-পরা নিদ্রা পর্য্যন্ত সেই একই অখণ্ড দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি।

কিন্তু আইনের ক্লাশে নাম লিখিয়ে আত্মীয় মহলে ফাঁকির অজুহাত কার্য্যকরী হোলেও, পুলিশের চোখে ধূলি দেওয়া আর চললো না। অবশ্য এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই—বরং এমনটা না হওয়াই অস্বাভাবিক। যারা কোনো কাজের মধ্যে না গিয়ে, শুধু অবসর সময়ে বড় বড় কথা ও উচ্চ চিন্তার বিলাস নিয়ে থাকে, তাদের অবশ্যি কোন বালাই-ই নেই। কাজ করতে গেলে, তা যে

কিছুমাত্র কেউ জানবে না—এমনটা হতেই পারে না। জানবার যাদের গরজ ও প্রয়োজন রয়েছে—সে কাজের ভাল-মন্দর সঙ্গে যাদের স্বার্থ-জড়িত, যথোচিত চেষ্টার ফলে, ব্যাপার কিছুটা অন্ততঃ তাদের কাছে ধরা পড়বেই। হাঁ, এমন হোতে পারে বটে যে ঘটনার দেশ-কাল-পাত্র সব কিছু সময় মত টের পেলে না—অনেক সময়ে হয়েও থাকে তাই। তবে তা যে কখনই জানতে পারবে না—এমন মনে করাই ভুল।

কিন্তু এই জানার ফলে, আমার এত দিনের জীবন-যাত্রার ধারা—সবটাই পাল্‌টে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পুরানো কায়দায় চালানো আর অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। এইবার পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস ছাড়া উপায় নেই—তা বৃহন্নলার বেশেই হোক, কি কঙ্ক সেজেই হোক।

(৭)

"শোভার ডায়েরী"

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—কেন আমি মরতে চিঠি লিখতে গিয়েছিলাম? কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—এ পোড়ার মুখ আমি আর কেমন করে লোকের সামনে বার করবো? এর আগে কেন আমার মরণ হোলো না? এত বড় অপমানের বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে কেন আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো না?—কেন বাজ আমায় গুঁড়িয়ে দিলে না? হা ভগবান! একি বিচার তোমার! আমি তো মুখ বুজে অনেক সয়েছি—আরো তো কত সইতে প্রস্তুত ছিলাম সারা জীবন ধরে? তার উপরেও আবার এত বড় অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল। এ যে আমার সইবার সীমা ছাড়িয়ে গেল—আর যে পারিনে।

কত আগ্রহ ভরে চিঠিখানা লিখেছি! জীবনে এই একখানা চিঠি। তাও ফিরে এসেছে অক্ষত—অপঠিত—যেমন গিয়েছিল্‌ ঠিক তেমনি। এসেছে বাবার নামে, আর একখানা লেপাফার আবরণের ভিতরে। কিন্তু আবরণের ভিতর থেকে যা বেরিয়ে এলো, তা সবাই দেখেছে—ব্যাপারটা সবাই বুঝে নিয়েছে। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—এ লজ্জা, এ অপমান, এ দুঃখ, আমি কোথায় রাখবো? কেমন করে সইবো? ভগবান ভগবান! এই ব্যর্থ কলঙ্কিত জীবন থেকে কেড়ে নিয়ে তুমি আমায় বাঁচাও। আমি আর কার পানে চাইবো—কার কাছে হাত বাড়াবো? হে মা মাটি! না হয় তুমি আমায় তোমার বুকে স্থান দাও। সীতার পুণ্য আমার নেই,—কিন্তু চেয়ে দেখ মা ধরিত্রী! আমার এ লজ্জা, এ দুঃখ তার চেয়ে এক বিন্দুও কম নয়।

কিন্তু কেন?—কেন আমার এ অপমান? কি অপরাধ করেছি আমি? দশ জনে ধরে বেঁধেই যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকে, তবে সে অপরাধ কি আমার? অন্যের দোষে আমার এ মরণাধিক শাস্তি কেন? এ দেশের এই সমাজে দশ জনের এক জন হয়ে বাস করে এবং সমাজের

সমস্ত রীতি নীতি জেনে শুনেই যে আর একজনের জীবনটাকে নিজের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে, সেই আর একজনের প্রতি কি তার কোনো কর্ত্তব্যই নেই? একখানা চিঠি লিখেও তার খবর নিতে নেই, কিংবা তার চিঠিরও একটা জবাব দিতে নেই?' না হয়, না-ই লিখলে চিঠি—না-ই দিলে জবাব! চিঠিখানা পড়ে, কিম্বা না-ই পড়ে, কুটি কুটি করে ছিঁড়ে—ডলে মুচড়ে চিঠির চিঠিত্বের সব শেষ করে দিয়ে দূর ভাগাড়ে ফেলে দিতেও তো পারতো। তা জেনে—তার নিষ্ঠুরতার কষাঘাত যতই তীব্র হয়ে বুকে বাজুক না, আর দশজনের সামনে আজকের এই যে দারুণ লাঞ্ছনা, এ থেকে তো রেহাই পেতুম।

শুনেছি সে নাকি খুব ধর্ম্মপ্রাণ এবং সেই জন্যেই নাকি বিয়ে করতে চায়নি তার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত হবে বলে। কিন্তু আর একটা লোকের ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ,—এমন কি জীবন মরণ পর্য্যন্ত একান্তভাবে যার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে,—তা সে তাকে যতই বোঝা মনে করুক না কেন এবং সে বোঝা যতই অনিচ্ছা সত্ত্বে তার ঘাঁড়ে চাপুক না কেন,—তার সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব—কোন কর্ত্তব্য স্বীকার না করাটাই কি ধর্ম্ম? আজ আমার চোখে সব অন্ধকার—কোথাও কোনো আলোর আভাসও দেখতে পাইনে। বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সমান অন্ধকার প্রগাঢ়, প্রচণ্ড, অনপনীয়। এ দুঃখ যে কি মর্ম্মান্তিক, তা এই বুকখানা ছেয়ে আছে বলে যেমন করে বুঝতে পারছি, তেমন করে বলবার ভাষা আমার নেই। অথচ আমায় এত বড় দুঃখ দেওয়া—বিনা দোষে এই যে এমন মর্ম্মান্তিক শাস্তি, এ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে জানিনে সে কেমন ধর্ম্ম?

কিন্তু আমার তরে সত্যিই যদি তার কোনো দায়িত্বের বালাই না থাকে, তবে আমার কেন চার দিক বন্ধ? তাকে না জিজ্ঞেস করে, তার মত না নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে বলেই যদি সে এমন করে সব দায় ঠেলতে পারে, তবে আমায়ও তো কিছুই জিজ্ঞেস করেনি—কোন কথা বলেনি বিয়ের আগে? এ কথা মানি যে আমি নারী, আর সে পুরুষ—উভয়ে এক নয়—সব রকমে তুল্য মূল্য নয়। কিন্তু আমি নারী বলে কি আমার সম্বন্ধে যা খুসী, তা ই করা চলে? যে লোক আমায় চায় না—কোনো দিন চায়নি এবং আমিও যার সম্বন্ধে কিছুই জানিনে—কোনো দিন দেখিনি, তার সঙ্গে কেন আমার জীবনটাকে এমন করে বেঁধে দেওয়া, যাতে সে গাঁট আর খুলবার উপায় নেই! তা ছাড়া, এমন ব্যবস্থাইবা কেন যে পুরুষ যেমন খুসী, চালাবে—যা খুসী, করবে অথচ নারীর কোনো অধিকার নেই—মুখ ফুটে কথাটি বলবার যো নেই? পুরুষের যত অত্যাচার, সবই তাকে নীরবে সয়ে যেতে হবে কেন? কেন তাকে এমন করে পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে জীবন গোঁয়াতে হবে? পুরুষ ছাড়া তার জীবনের কোনো মূল্য নেই—সার্থকতার কোন উপায় নেই—এ কেন? আজ আমার বুকে যে আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তার তীব্র শিখা এই দারুণ প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছে যে নারীর এ অসহায় দুর্দ্দশা—নারীর এ দুঃখ, লজ্জা ও লাঞ্ছনা—এর কি কোনো প্রতিকার নেই? এ বিধি কার?—কে এনেছে এ দেশে? এ যদি ধর্ম্মের বিধান হয়, তবে সে ধর্ম্মকে কি নূতন ক'রে গড়া যায় না? এ যদি মানুষের সৃষ্টি হয়, তবে

তাকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে, তার ধ্বংস-স্তূপের উপরে নূতন সৃষ্টিকে রূপ দেওয়া যায় না? এ যদি পুরুষের খাম-খেয়ালি হয়, তবে তার প্রতিকারের জন্যে পুরুষ-নিরপেক্ষ নারীর স্বতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?

(৮)

"শোভার চিঠি লীলাকে"

বাবার নামে তোমার বড়দা যে চিঠি দিয়েছেন, তা দেখলাম। তিনি লিখেছেন, তোমার দাদা কয়েকদিন ধরে নিরুদ্দেশ। তিনি কেন নিরুদ্দেশ হয়েছেন, জানিনে। তবে হয়তো তা খানিকটা অনুমান করতে পারি। তোমার কাছে শুনেছি, তিনি নাকি ধার্ম্মিক। আমি হয়তো তার ধর্ম্মের পথে অন্তরায়। তাই হয়তো তিনি এমনি করে না বলে কয়ে সরে পড়েছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি অনেক ভেবে চিন্তে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সেইখানাই তার কাছে আমার প্রথম চিঠি এবং সেইখানাই শেষ। যদিও সে চিঠি যেমন গিয়েছে, তেমনি ফিরে এসেছে—কেউ তা খোলেনি। তবু আমার মনে হয়, তা-ই হয়তো তার নিরুদ্দেশের সমূহ কারণ। চিঠির উপরে মেয়েলী ছাঁদের লেখা ও আমাদের এখানকার ডাক-ঘরের সিল-মোহর দেখেই হয়তো তিনি আর সে চিঠি খোলেন নি। তারপরে ভেবেছেন—চিঠি আসা তো সুরু হোলো—ক্রমে কোন দিন মানুষটাই এসে হাজির হবে কিম্বা আরও কত কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। তাই হয়তো তিনি সব ল্যাঠা চুকোতে চেয়েছেন এই ভাবে। এতে তার সব ল্যাঠা চুকবে কিনা জানিনে। কিন্তু এটা জানি যে আমি তা করতে পারি নিজের হাতে অতি সহজে এবং তারই ব্যবস্থা আমি করছি।

যখন এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছাবে, তখনি তুমি সে খবর পাবে। আমি চলে গেলে, তার পথের কাঁটা সরে যাবে। তখন তোমরা তাকে খুঁজেপেতে আবার নিয়ে এসো। তখন তার যখন খুশী বাড়ী আসতেও আর কোনো বাধা থাকবে না। আমি এখানে এলে, তোমরা যে কেন আমাকে আর নিয়ে যাবার জন্যে গরজ করতে না, তা আমার বুঝতে বাকী ছিল না। পূজোর সময়ে কেন যে তোমরা আমায় এখানে পাঠিয়ে দিতে বাবার নাম করে প্রতিবার, তা-ও আমি খুবই বুঝতাম। এর ভিতরে যে একটা কারসাজি ও ঢাকাঢাকির ব্যাপার ছিল, তা কবেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু বুঝেও কিছুই বলতাম না। এখন আর তোমাদের কোনো কারসাজিরই প্রয়োজন হবে না।

তুমি আমার জন্যে দুঃখ করো না। এই অর্থহীন, সান্ত্বনাহীন, দুঃখের জীবনটাকে আর বইতে পারিনে। সেদিন তোমার দাদার কাছ থেকে আমার যে চিঠিখানা ফেরত এসেছে, তা সবাই দেখেছে—সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে লজ্জা ও অপমানের বোঝা যে কোথায় রাখব, তার জায়গা খুঁজে পাইনি। তখন থেকেই আমার এ জীবনের সমস্ত রস বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাইরে

থেকে দেখতে যেমনি হোক, এ কয়দিন আমি মরমে মরেই ছিলাম। এ জীবনের অবসান এখন সব দিক থেকেই কাম্য। নিবু নিবু দীপকে নিবিয়ে দেওয়াই ভালো—নইলে আলোর অভাবে সে শুধু ধোঁয়া ও দুর্গন্ধই ছড়াবে চতুর্দ্দিকে। মরা টেনে নিয়ে বেড়ালে, তাতে শুধু অনর্থের সৃষ্টি হবে। তাই সতীর মরা দেহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে শিবকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। আমারও এখন আপনি মরে যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তুমি ও বাড়ীতে আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলে। যে গৃহ আমার সত্যিকারের আপন গৃহ হওয়া উচিত ছিল, সেখানে আমি অনাহূত গিয়েছিলাম—অপ্রয়োজনের বোঝা হয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। সেখানে তোমার বুকই আমার একমাত্র জুড়াবার ঠাঁই ছিল। তাই তোমাকে উদ্দেশ করেই আমার জীবনের এই শেষ কথাগুলি নিবেদন করে গেলাম।

কিন্তু কেন আমায় আজ এভাবে যেতে হোলো, তা-ই ভাবি। নারী হ'য়ে এ দুনিয়ায় এসেছিলাম বলেই কি? এ কথার জবাব আমি জানিনে। প্রশ্নটা এই কয়দিন সব সময়ে আমার বুক ছাপিয়ে মুখের গোড়ায় এসে ঠেকেছে, কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। তার সময়ও আর আমার নেই। মন আমার সামনে কি আছে, দেখবার জন্যে এত দূর এগিয়ে গেছে যে এখন আর তাকে ফেরান সম্ভব নয়। তাই আজ যাবার দিনেও এ প্রশ্ন আমার মনেই রয়ে গেল অকথিত অমীমাংসিত। কালের পরিবর্ত্তনে পুরুষের মত মেয়েরাও যখন উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে, তখন হয়তো তোমরাই এ প্রশ্নের জবাব পাবে এবং তার প্রতিকারও তোমাদেরই হাতে এসে যাবে। যদি তা-ই হয়—যদি তোমরা সত্যই এ প্রশ্নের জবাব পাও, এ অভাগিনীকে একবার স্মরণ কোরো সেদিন। যদি এ দুনিয়ার বাইরে আর কোথাও তখনও বেঁচে থাকি, তবে তাতেই হয়তো আমার এ অশান্ত মনের শান্তি মিলবে। ইতি

পুঃ—এখন অনেক রাত। এ জীবন পেরিয়ে যাবার পথে এর মধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছি। শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করছে—মনটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। ঘুম পাচ্ছে—ঘুম—বড় ঘুম।

সমাপ্ত

অঙ্কুরের স্বপ্ন

শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য

মৃত্তিকার রুদ্ধ ভ্রূণে অঙ্কুরের যন্ত্রণা অপার,
অঙ্কুরের স্বপ্নে আছে ছায়াচ্ছন্ন বিশাল কামনা।
জন্মদেবে পাদপের,—এ মন্ত্রণা দিল কারা তারে ?
অঙ্কুরের আশা আছে চক্ষুহীন—আঁধারী পাতালে,
সে আশা জড়ায়ে গেছে সবিতার আলোর রেখায়
আকাশের নীল মেখলায়।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে মাটীতে কী অজস্র ফাটল
মাটীর রুধির বুঝি বিগলিত হলো অন্ধকারে ঃ
অঙ্কুরের স্বপ্নে আছে উষ্ণ হয়ে বিশাল কামনা।
বর্ষা গেল ধারা সারে ধরণীর কোষ সিক্ত করি',
সজল মাটীর গন্ধে অঙ্কুর আচ্ছন্ন হলো কতো ঃ
এধারে ওধারে তার গায়ে লাগি' জন্মালো শিকড়।

শরতের কাশতৃণে সমারোহ দিল যারা তারা
সেই সব গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণমূল অন্ধকারে আরো,
মাটীতে ডুবিল কিছু ডগার ফুটন্ত ফুলভারে।
পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বুঝি হেমন্তে দিনের বিড়ম্বনা,
শারদ-উৎসব শেষ ঃ সম্মুখেতে আশা কোথা আর ঃ
প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় কান্না আর হাসির মিশ্রণ।

শীতের তুষার-স্রোতে মরণের শৈত্যের ইংগিত ;
অঙ্কুরের আশা তবু সবিতার উষ্ণতা জড়ায় ঃ
কুন্তীর মতন তার ভালোবাসা সন্তানেরে চায়।
বসন্তে মাটীর নিচে চমকায় শিকড়-শিশুরা—
শীতের দারুণ রাতে যাহারা মরিয়া গেল,—গেছে ;
যারা আছে, প্রশ্ন করে ঃ আমরা ফুটাবো কভু ফুল ?

এ চৈত্রের এ বর্ষের শেষ হলো অঙ্কুরের ভ্রষ্ট কামনায়
নতুন সূর্যের পানে অঙ্কুরের আশা তবু মিনতি জানায়' ঃ
বিষুব-সংক্রান্তি শুনো, যবনিকা ফেলে দাও ব্যর্থতার ভালে ;
ফসলের ঘ্রাণে যদি আচ্ছন্ন হলোনা দিন, লুকাও তাহারে ;
শেষ রজনীর কালো কফিনেতে ঢাকা থাক বন্ধ্যা ইতিহাস ঃ
নতুন বৎসরে যেন পূর্ণ হয় অঙ্কুরের আশ।

পথকষ্ট ?

শ্রীশান্তিকুমার দাসগুপ্ত

(ছোট গল্প)

যুদ্ধের বাজার। কোথাও যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে, কোথাও বা লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশেও একটা দমকা হাওয়া বহিয়া গেল।

সকাল সাতটা হইতেই ছাত্র পড়াইতে যাই। পড়াইব কি ছাই—ক্লাস সিক্সের ছাত্রও রাজনীতির কথা বলে। হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া বলে, জার্ম্মানী ডানজিগ্ চেয়েছিলো কেন জানেন ? সমুদ্রের সুবিধে-তার চাই কিনা। তারপরই হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা করিডর কি ? বারান্দা ?

মনে মনে ভাবি, বারান্দাই বটে ! যেমন তোমার বারান্দা আমি। তোমার মনের মধ্যে আলো বাতাস প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় আমাকেই। চুলায় যাউক। কিছু উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। না হইলে ক্লাস সিক্সে পড়িবার সময় ডানজিগ কেন জার্ম্মানীর কথা শুনিয়াছিলাম কিনা তাহাই মনে পড়ে না। যুদ্ধ নহেত,' যেন রাজনৈতিক চেতনাগার।

আলেকজাণ্ডার আর পুরু পড়াইতে বসিলাম, কিন্তু ছাত্র শুনিবে কেন ? আলেকজাণ্ডার কি আর এমন যুদ্ধ করিত। এখনকার হিট্‌লার, মুসোলীনি ত' মুসল উচাইয়াই আছে। পড়ান হইল না।

ছাত্রের সঙ্গে যুদ্ধের কথা বলিয়াই ফিরিতেছিলাম। একটু অন্যমনস্কই ছিলাম। একে বাজার মন্দ তাহাতে যুদ্ধের জন্য যদি মাষ্টারীটা যায় ত' মহা বিপদ। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই পথ চলিতেছিলাম। একমণ চাউল কিনিতে গেলেই মাষ্টারীর সব কয়টা টাকা চলিয়া যাইবে—সর্ব্বনাশ আর কাহাকে বলে ? হঠাৎ পিছন হইতে কে কাঁধের উপর হাত রাখিল। একটু চম্‌কাইয়াই গেলাম। জার্ম্মান সৈন্য নহেত ? পিছনে চাহিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম—হিট্‌লারী যুবক নহে, আমারই মত খাঁটী বাঙ্গালী ঘরের ছাপোষা কেরাণী বন্ধু সন্তোষ।

বন্ধু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলে, কিরকম তোড়জোড় হ'চ্ছে দেখেছ ত ? চারদিকে সৈন্যদলে লোক নেবার হিড়িক পড়েছে। ব্যাপার সাংঘাতিক।

তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলি, সাংঘাতিক সত্যিই কিন্তু ভরসা এই যে আর যাই হ'ক তোমার আমার সৈন্য হবার দায় নেই।

সন্তোষ কিন্তু সন্তুষ্ট না হইয়া বলে, আরে সৈন্য না হ'লেই কি বড় বেঁচে গেলুম নাকি ? ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তাতে খাব কি ক'রে সেটাই ত' বড় সমস্যা। তুমি না হয় একা মানুষ, অল্পেই চলে। কিন্তু আমার ? গৃহিনী খোঁচাবেন আর ছেলেমেয়েগুলো চেঁচাবে—আর আমি বেচারা অন্ধকার দেখব।

কথাটা একটু ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলি, ওসব ছেড়ে দাও, কখন কি হয় কিছুই বলা যায়

না। এই ধর না আমাদের কুমুদের কথা। কি কুক্ষণে বছর দুই আগে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিল। বিয়ে করেছিস্, মেয়েও একটা আছে—এখন যা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে।

সতোষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলে, এ্যাঃ, বন্দুক ঘাড়ে নিতে হবে নাকি? কালীপূজোর পট্‌কার আওয়াজ শুনলেই কেমন চ'মকে উঠি, তায় আবার—ওরে বাস্‌রে। তারপর ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলে, তোমাকেও যেতে হবে ত'?

চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলি, কেন?

সে উত্তর দেয়, যা চেহারা করেছ—লড়াই করার মতই। এমন চেহারা পেয়েও কি সৈন্য না ক'রে ছাড়বে নাকি?

তাইত! দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যুদ্ধ হইতে পারে জানিলে ব্যায়াম করিতাম না কোন দিন। বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজের মনের শান্তিই নষ্ট হইয়া যায়।

বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলি, যাচ্ছ কোথায় তুমি?

তাহার মুখ বিষাদে ভরিয়া যায়, বলে' মেয়েটার অসুখ—ইঞ্জেক্‌স্‌নের জন্য দু'টো ওসুধ আনতে যাচ্ছি, শুনলুম ডবল দাম হয়েছে, কি করি বলত?

সে নিজের কাজে চলিয়া যায়। আমিও ধীরে ধীরে আগাইয়া চলি। মনটা তখনও খারাপ হইয়াই থাকে।

চলিতে চলিতে শুনি, একটী বিড়িওয়ালা পাশের চায়ের দোকানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, যুদ্ধ বেধেছে, আমাদের আর কি রাজারই মুস্কিল। একটা বোমা পড়লেই বাড়ীটা গেল, কত লোকসান বল দেখি!—

চায়ের দোকানদার সেকথা স্বীকার করিতে নারাজ, বলে, আরে রাজার কি বাড়ীর ভাবনা, বিপদ ত আমাদেরই—খাবারের দর বেড়ে যাবে আর আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। বিড়িওয়ালা হাসিয়া বলে, ছাই, মরলেই হ'ল আর কি, আর দু'দশ জন লোক মরলেই বা কি, অমন বাড়ী ত আর ফিরবে না।

কথাগুলি শুনিবার জন্য জুতার ফিতা বাঁধিবার ছল করিয়া অপেক্ষা করি, কিন্তু কতক্ষণ আর ওইরূপ করিয়া থাকা যায়? আবার পথ চলি।

কে একটা বছর চৌদ্দর ছেলে পাশ দিয়া যাইতে যাইতে আর একটী ছোট ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বলে, জানিস্, একরকম উড়োজাহাজ আছে যেগুলো জলের ভেতর দিযে যায়। জাহাজগুলোকে কি রকম টপাটপ্ ফুটো করে ডুবিয়ে দেয় তা কি বলব!

ছোট ছেলেটা একবার মাত্র বলে, বাবা!

আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া দুইটী প্রৌঢ়ের দিকে নজর যায়, একজন আর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কি আলো! পঞ্চাশ ষাট মাইল পুড়ে যায়। অপর জন বলে, একেবারে পুড়ে যায় না কি?

প্রথম জন উত্তর করে, পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, ছাই। উঃ, ভগবান।

চারিদিকেই যুদ্ধের কথা। কে একটী বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে আসিতে বলে, কি রে বাপু, যুদ্ধ না করলেই কি হতনা? এক হয়েছে দেশ, কি যে হবে দেশ নিয়ে। যে যার দেশ দেশ ক'রেই ত যুদ্ধ বাধিয়ে বসল।

সেই কথাটাই ভাবি যুদ্ধ না কবিলেই কি হইত না? দেশের পর দেশ জয় করিবার এ আকাঙ্ক্ষা কেন? ইহাই কি দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি? যুদ্ধের জন্যই পৃথিবী না পৃথিবীর জন্যই যুদ্ধ?

সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডা বসে। নানা আলোচনার মধ্যেও যুদ্ধের কথাই বার বার আসিয়া পড়ে। সকলেই একমত হইযা স্বীকার কবি যে রাজনীতিতে দযা নাই।

অতি ব্যস্ত হইয়া বন্ধুবর বিশ্বনাথ আসিযা বলে, ব্যবসা উঠ্‌ল দেখ্‌ছি। লোহার বাজার একেবারে আগুন।

হরিহর সাদাসিধা মানুষ, বাজনীতি দূরের কথা—কোন কিছু একটু ঘুরাইয়া বলিলেও বুঝিতে পারে না, মাথা নাড়িয়া বলে, তোদেরই ত লাভ। বাতারাতি বডলোক হয়ে যাবি।

বিশ্বনাথের মনটা একটু খারাপ হইযাই ছিল, সে বিরক্ত হইয়া বলে, এসব কি বুঝিস্ তুই। যারা মাল গুদাম ভবে রেখেছে লাভ ত তাদেব, আমাদের কি? আমরা শুধু যোগান দি। বলি ব্যবসাটাই উঠল আর উনি বলছেন কিনা বডলোক। জার্ম্মান ফার্ম্ম সব বন্ধ। মিস্তিররা এবার খুব পিট্‌বে একচোট—গুদামে যা রেখেছে তাতেই লাখটাকা!

পরের লাখ টাকাব কথা শুনিয়া পেট ভবে না। অল্পক্ষণ পূবেব সন্ধ্যা হইয়াছিল। একটা এরোপ্লেনের সব্দ শুনা যাইতেছে—হযত টহল মারিয়া বেডাইতেছে।

কি মনে হওয়ায় উঠিযা পডি। গঙ্গার ধারে যাইব বলিয়া বাহির হই। বন্ধুরা উত্তেজিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্য কবে নাই। অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। হঠাৎ এবোপ্লেনটা জোরে শব্দ করিয়া অনেক নীচু দিযা উডিযা আসে। মুহূর্ত্তের জন্য সেইদিকে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লই। আমার অতি নিকটেই একটী বছর পাঁচকের মেযে তাহার বছর দশেকের দিদির কাপড়ের আঁচলটা চাপিয়া ধারিয়া বলে, ওরে দিদি পালিযে আয়, বোমা দেবে।

গঙ্গার ধারে যাওয়া আর হয না। ইহাদের দিকে চাহিযা থাকিযা কোথায় চলিয়াছিলাম তাহাই ভুলিয়া যাই। এতটুকু মেয়েও বোমার কথা বুঝিয়াছে। বোমায় কি হয় তাহা সে জানে না কিন্তু যাহাই হউক না কেন তাহা যে ভাল নহে তাহা জানিতেও তাহার আর বাকী নাই।

আস্তে আস্তে নিজের অন্ধকাব ঘরের দিকে ফিরিয়া চলি। সমস্ত জগতই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।

প্রবাল বাগিচায় আধ ঘণ্টা

শ্রীসতীভূষণ সেন

বাঙ্গলার ছেলেমেয়ে জলকে ভয় করে না। মাছ ও কচ্ছপ তাহার শৈশবের সাথী, শুশুক ও কুমীর তাহার শৈশবের সহচর। কথাটী অবশ্য সহরের ছেলেমেয়েদের বেলায় খাটে না। তা না খাটিলেও ছেলে বেলায় দীঘির পাড়ে বসিয়া কৌতুহলের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছদের খেলা দেখেন নাই এমন লোক এদেশে বিরল।

কিন্তু আজ তাহাদের কথা আপনার মনে পড়ে কি? অবশ্য রান্নাঘরের সম্পর্কে ছাড়া পদ্মার উপর দিয়া ষ্টীমারে যাইবার সময় কখনো কি মনে হয়—দেখি কি রকমের মাছ এই খোলা জলের আড়ালে খেলা করিতেছে? তাহারা যে বাড়ী ঘর বাঁধিয়াছে সেখানকার গাছপালা লতাপাতা যে কেমন তাহা জানিবার ইচ্ছা কি কখনো হইযাছে?

পদ্মার দুই পাড়েব ভাঙ্গিয়া পড পড় ঘর বাড়ী জেলেদের রঙ্গীন পাল তোলা নৌকার শ্রেণী, স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ছাঁদি নৌকা চড়িয়া দুলিতে দুলিতে আসিয়া জাহাজে ওঠা প্রভৃতি বহুবাব দৃষ্ট পরিচিত দৃশ্যাবলী আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে—জলেব নীচের দেশের জন্য কোন কৌতূহল জাগ্রত হইবার অবকাশ পায না।

বিশাল জগৎ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাব কতটুই বা আমবা দেখি? ভোর বেলা নীড় ছাডিযা বাহির হই তণ্ডুলের সন্ধানে—সন্ধ্যায নীড়ে ফিবিযা আসি। পথে কতশত গোলাপ ফুটিয়া আছে—সেদিকে ফিরিয়াও চাহি না। প্রয়োজন নাই—তাই অভ্যাসও হয নাই।

আপনি হযতো প্রতিবাদ করিবেন—বলিবেন—আই, জি, এস, এন কোম্পানীর জাহাজ যদি সাবমেরিনের মত জলের নীচে ডুবিতে পারিত এবং আমরা যদি কলিকাতা যাইবার পথে পদ্মাব নীচে লুকান গাছপালা ও মাছদেব ঘরকন্না দেখিতে দেখিতে যাইতে পারিতাম, তবে নিশ্চয় ভাসিয়া যাইতে চাহিতাম না। কি জানি—তবে সাবমেবিনেব নাবিকরাও যে মাছদের রাজ্যের কোন খবর রাখে তাহা মনে হয না। আপনার বাড়ীর পাশের যে মুসলমান খালাসী চীন, জাপান ও বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন সে কি দেখিয়াছে। উত্তর পাইবেন, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়াছে। চাকরীর বাহিরে কোন কাজ করে নাই।

যখন জাহাজ বন্দরে পৌছিয়াছে—কাজ না থাকিলে ছুটী পাইয়াছে। তখন রঙ্গীন লুঙ্গি পরিয়া, গলায় রঙ্গীন রেশমী রুমাল জড়াইয়া, চোখের কোনে সুর্ম্মা ও গোঁফের কোনে আতর মাখিযা বাজাবে বেড়াইতে বাহির হইযাছে। প্রাণিজগতের অপর একটী প্রয়োজনে। চোখ মেলিয়া পৃথিবী দেখিবার উদ্দেশ্যে নহে।

তণ্ডুলের প্রয়োজন আধঘণ্টার জন্য ভুলিয়া আজ আমরা মাছদের জগতের সবচাইতে সুন্দর য স্থান সেই প্রবালের বাগিচায় বেড়াইতে যাইব। প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে যেখানে লাল, নীল, সোনালী, বেগুনী, নানা রংএর প্রবালের ফুল ফুটিয়া আছে সেইখানে।

জলের নীচে নামিবার কথায় প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে সেখানে কি গভীর অরণ্য আছে? দার্জ্জিলিং যাইবার পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে ঘন জঙ্গল দেখা যায় তেমনি? অরণ্যের প্রাণীরা কি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির মত ভয়াবহ?

হাঁ, কিন্তু আমরা সেখানে যাইব না। আমরা যেখানে যাইব তাহাকে ইডেন গার্ডেনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সেখানে সিংহব্যাঘ্রদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। ছোট ছোট পোকা-মাকড়, কয়েক রকমের পাখী, বড় জোর দুই একটা কুকুর বিড়াল জাতীয় প্রাণীর সহিত দেখা হইতে পারে।

অতএব নির্ভয়ে একটা ডুবুরির পোষাক পরিয়া লউন। একটা হাঁড়ির মত টুপী দিয়া আপনার গলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়া হইল। চোখের সামনে টুপী কাটিয়া কাঁচের জানালা বসান। গায়ে ভারী শক্ত একটা ঢিলা রবারের সুট—পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত রবারের বুট। সুটের আস্তিন বাহুর সহিত এমনভাবে বাঁধা যেন জল প্রবেশ করিতে না পারে। বেল্টের সহিত একটা দড়ি বাঁধিয়া আপনাকে জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। পোষাকের ভারে আপনি তলাইতে আরম্ভ করিলেন। উপর হইতে একটা রবারের নল আসিয়া টুপীর ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। পাম্প করিয়া তাহার মধ্যে বায়ু পুরিয়া দেওয়া হইতেছে। পাম্পের অবিশ্রান্ত চপ্ চপ্ শব্দ আপনার কানে আসিতেছে এবং উষ্ণ ন্যক্কারজনক বায়ু আপনার নিশ্বাস যোগাইতেছে। মনে হইতেছে যে আপনি একটা ফুটবলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীচে নামিতেছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বায়ু একটা valve দিয়া বাহির হইয়া বুদ্বুদের শৃঙ্খল বানাইতে বানাইতে উপরে উঠিয়া যাইতেছে।

যতই নীচে নামিতেছেন পায়ের কাছে সুটটা যেন বেশী চাপিয়া ধরিতেছে—নূতন পশমী মোজা যেভাবে চাপিয়া ধরে সেইভাবে। আপনার মনে পড়িল বইতে পড়িয়াছেন—জলের যত নীচে যাওয়া যায় চাপ ততই বাড়িতে থাকে।

মাথা নীচু করিয়া নীচের দিকে তাকান সম্ভব নহে। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নামিয়াছেন। এখন টুপীর নীচের air-valveটী টিপিয়া দিন যেন আপনার পোষাকের বায়ু আপনাকে ঐস্থানে ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। তখন জোয়ারের স্রোতের সহিত হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন। স্রোতের সহিত হাঁটা সহজ কিন্তু যদি কোন কিছু দেখিবার জন্য স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে চান তখন দেখিবেন তাহা কত কঠিন।

আপনাকে একটী প্রবালদ্বীপের কাছে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সেখানেই রত্নাকরের Beauty spot। রকম রকমের মাছ দলে দলে আপনাকে ঘিরিয়া ছুটিতেছে। এক এক যায়গায় এক এক জাতীয় মাছ। কোন কোন মাছ মাছির মত ছোট; আর কি সব অদ্ভুত রং ও ডিজাইনের

সমাবেশ। মনে হয় কোন আধুনিক শিল্পীর হাতে কাজ ছিল না—তিনি বসিয়া বসিয়া রং লইয়া খেলা করিয়াছেন।

আপনি যে সব মাছের সহিত পরিচিত তাহাদের আকৃতি একই রূপ। পেটের কাছটা মোটা—মাথার দিক ও লেজের দিকে সরু হইয়া গিয়াছে। তাহাদের স্রোতের জলে ছুটাছুটী করিতে হয় তাই আকৃতিও ঐরূপ। আপনি যেখানে আসিয়াছেন সেখানকার মাছদের সকলকে ছুটাছুটি করিতে হয় না। যত রকম অদ্ভুত চেহারা হইতে পারে সব রকম চেহারার মাছই সেখানে দেখিবেন। কেউ গোল, কেউ চেপ্টা, কেউ তাবার মত. কেহবা আবার দেশালাইয়ের বাক্সের মত চৌকানো।

মাছগুলি আপনাকে দেখিয়া মোটেই ভয় পাইতেছে না। মনে হয় যেন তাহাদের রংএর গৌরব নানা দিক ও কোণ হইতে প্রচার করাই তাহাদের কাজ। এত সুন্দর এত চঞ্চল এবং এত সাহসী। তাহাদের ধরিয়া উপরে লইয়া আসিতে চান সকলকে দেখাইবার জন্য? ধরিতে পারিবেন কিন্তু উপরে আনিতে পারিবেন না। উপরে আসিতে আসিতে তাহাদের সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যাইবে।

সমুদ্রের তীরে বেড়াইবার সময় ভিজা বালির গর্ত্তে লাল কাঁকড়া দেখিয়াছেন? জোয়ার নামিয়া যাওয়া মাত্র লাল রেশমী বলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাদের একটীকে ধরিয়া বাড়ী আনিবার চেষ্টা করিবেন। দেখিবেন অল্পক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক বায়ুতে তাহার রং ম্লান হইতে হইতে ছাই হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সেটী মরিয়া যাইবে—তখন ডিমের খোলার মত যাহা পড়িয়া থাকিবে তাহাকে আর সেই উজ্জ্বল রেশমী কাঁকড়া বলিয়া চিনিবার উপায় থাকিবে না।

প্রবালের পাহাড়ের গা বাহিয়া উজ্জ্বল সবুজ উদ্ভিদ। কোথাও লম্বা সরু সরু ডাল কিন্তু পত্রহীন। কোথাও চেপ্টা চেপ্টা পুরু পাতার ঝোপ—আনারস ঝোপের মত। সব চাইতে চোখে পড়ে কতকগুলি বড় বড় পাখা, খাড়া হইয়া মাটীতে দাঁড়াইয়া আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ না বলিয়া প্রাণী বলাও চলে। শৈশবে তাহারা সাঁতরাইয়া বেড়াইত। এখন বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গে একজায়গায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদের ছেলে পিলেরা এখনও ঘুরিয়া বেড়ায়।

এখানে ওখানে নানারকমের স্পঞ্জ—দেখিয়া কিন্তু বাথরুমের স্পঞ্জ বলিয়া চেনা যায় না। মনে হয় জেলির বল—মাটীতে পড়িয়া আছে। তাহারা যে প্রাণী জাতীয় তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। নড়ে না, চড়ে না, জীবনের কোন লক্ষণই নাই। খুব মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল শুষিয়া লইতেছে ও বড় বড় ছিদ্র দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিতেছে। জীবনের এই সামান্য লক্ষণ কোন কোন উদ্ভিদেও আছে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে উদ্ভিদ যে ভাবে বাড়ে প্রাণীর বৃদ্ধি সেই ভাবে হয় না। তাহা হইতেই স্পঞ্জকে ঠিকমত সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

শিশু স্পঞ্জ জননীর গা হইতে বাহির হইয়া প্রথমতঃ ভাসিয়া বেড়ায় ও একটী নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইয়া settle করে। মানব শিশু যেমন ভাল একটী চাকরী খুঁজিয়া লইয়া settle করে তেমনি। তারপর সে ক্রমশঃ জল পান করিতে থাকে ও তাহাতে যে ধাতু ও লবণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহার সাহায্যে দেহের পুষ্টি সাধন করে। যখন সে স্পঞ্জ লীলা সঙ্গে করে—তাহার

দেহের জেলিগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। দেহেব যে অস্থিময় কাঠামো পড়িয়া থাকে তাহা ছাঁটিয়া কাটিয়া গোল করিয়া আমরা স্নানের সময় গা মাজিবার জন্য ব্যবহার করি।

সাবধান! আপনাব নিঃশ্বাস লইবার রবারের নল ঐ বিশাল ব্যাংএর ছাতার কোণে আটকাইয়া গিযাছে। নলটী জড়াইয়া চেপ্টা হইয়া গেলে বায়ুব অভাবে মারা পড়িবেন। তখন এক উপায় আছে—উপর হইতে কোমবের দড়ি ধবিযা আপনাকে টানিযা তোলা। কিন্তু যদি রবাবের নল ও দড়ি সবসুদ্ধ ঐ ঝুলিযা পড়া পাথরেব সহিত জড়াইযা যায—তখন? প্রবালের রাজ্যে প্রবাল বিছাইয়া শেষ শযন যতই কবিত্বপূর্ণ হউক—কবিত্বহীন এই ধবণীতে বাঁচিযা থাকার মত আনন্দ আব কিছুতেই নাই।

সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সহস্রধারা যাইবাব পথে আপনাব ভয হইতেছিল—পাথরেব চাপ ধ্বসিয়া পড়িযা বুঝি চেপ্টাই হইযা যান। তখন সন্তর্পনে সে স্থান পাব হওযা ছাড়া উপায় ছিল না। এখানে এই বিপদ সঙ্কুল পথে ভয়ে ভয়ে যাইবার প্রযোজন নাই। বায়ু নিষ্ক্রমণেব valve বা ছিদ্রটী বন্ধ কবিযা দিন—পোষাক ফুলিযা উঠিয়া আপনাকে ভাসাইযা তুলিবে। ঐ ঝুলিযা পড়া পাহাড় ও ঐ বিশাল ব্যাংএর ছাতার মত কি জানি কি জিনিষটীর পাশ কাটাইযা উপবে উঠিযা পড়ুন। কিন্তু একটু সাবধানে উঠিবেন। কাঁচা প্রবালের ধারাল গাযে ঘসা লাগিযা যদি হাত কাটিযা যায—তাহা সহজে সারিবে না।

পাহাড়ের কোথাও কোথাও বড় বড় ফাটল। ভিতরটা গুহার মত অন্ধকার। সমুখ দিযা যাইতে ভয় হয়—কি জানি কোন জানোযাব ভিতবে বাস করিতেছে। জাযগাটা পার হইয়া গেলে আরামের নিঃশ্বাস পড়ে।

ঐ দেখুন একটা সামুদ্রিক সাপ। দেখিতে অনেকটা ডাঙার সাপের মত। কিন্তু লেজটা বেঁটে ও চেপ্টা সাঁতারের সুবিধার জন্য। ঐ সাপ খুবই বিষাক্ত কিন্তু উহাকে ভয না করিলেও চলে। আপনার হাত দুটী বগলের নীচে চাপিযা ধরুন। হাতদুটী ছাড়া আপনার আর সবই রবারের পোষাকে ঢাকা। সাপের বিষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এখন পা দিযা সাপটীকে চাপিয়া ধরিয়া রগড়াইয়া দিন—তারপর ছাড়িযা দিয়া মজা দেখুন। সাপটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইযা উপরের দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহার সঞ্চিত বায়ু আপনি প্রায় সবটুকু চাপিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন। পুনরায় বায়ু সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত সে অসহায়।

প্রবাল এক রংএর নহে। লাল হইতে বেগুনী পর্য্যন্ত সব রংএরই প্রবাল আছে। যে সব রং আপনার চোখে পড়িতেছে তাহার সবগুলিই প্রবাল নহে। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের যাহারা প্রবালের গাযে বাসা বাঁধিয়াছে তাহারাও রঙ্গীন। প্রবালের রংএর সহিত গায়ের রং মিলাইয়া এমন ভাবে তাহারা থাকে যেন শত্রু বুঝিতে না পারে কোনটী প্রবাল, কোনটী প্রবাল নহে।

প্রবালের যাহারা শত্রু অর্থাৎ প্রবাল সংগ্রহ যাহাদের ব্যবসা—তাহাদের এজন্য অনেক

অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পেশাদার ডুবুরিদের চোখকে এমন ভাবে অভ্যস্ত করিতে হয় যেন উদ্ভিদ ও জীবের নীচে কোথায় খাঁটি প্রবাল লুকান আছে তাহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারেন।

কিন্তু অভ্যস্ত ডুবুরির চোখও কত বার ঠকে। কত মুক্তা জননী ডুবুরির চোখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত যদি সে হাঁ করিয়া ডুবুরিকে ভয় দেখাইতে না যাইত। যে সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে তাহারা মুখ খুলিলে অর্দ্ধচন্দ্রকৃতি ফাঁক হয়। ঐরূপ হাঁ ওয়ালা ঝিনুক দেখিলেই ডুবুরি তাহা থলিতে বোঝাই করে। ঐ যে বড় কচ্ছপটী—সেটী আপনার চোখেও পড়িত না যদি সে না নড়িত। ঐ যে মস্ত কড়িটি—ওটীকে কড়ি বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল কি—যদি সে না নড়িত।

পাশে যে মহাকায় shell কড়ি দেখিতেছেন উহার গায়ে দুপাটী দাঁত লুকান আছে। যদি অন্যমনস্ক ভাবে উহার কাছে গিয়া পড়েন—করাতের মত দুপাটী দাঁত দিয়া সে আপনার পা চাপিয়া ধরিবে। তখন আপনি কলে আটকান ইঁদুরের মত অসহায় ভাবে ছটফট করিতে পারিবেন মাত্র।

উপরে মেঘের মত কিসের ছায়া পড়িয়াছে? মেঘ নহে—যদিও মেঘের ছায়াও এখান হইতে বুঝা যায়। একটা বিরাট হাঙ্গর স্থির হইয়া ভাসিতেছে। সে আপনাকে লক্ষ্য করে নাই। তাহার মুখের হাঁর উপরে কয়েকটী ছোট ছোট খড়খড়ি ধীরে ধীরে খুলিতেছে ও বন্ধ করিতেছে। মাছের গন্ধ কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহাই স্থির করিবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত।

যদি সে আপনার দিকেই আসিতে থাকে—হঠাৎ কতকগুলি বুদ্বুদ ছাড়িয়া দিন। জামার অস্তিন একটু ফাঁক করিলেই চলিবে। মৎস্যরাজ ঐ অপরিচিত অস্ত্রের ভয়ে দূরে পলাইয়া যাইবে। অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার অস্পষ্ট ছায়ার গতি লক্ষ্য করিয়া তবে আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু ভয় না করিলেও পারিতেন। ডুবুরির পোষাকে রবারের এমন বিকট গন্ধ বাহির হয় যে কোন জলজীব তাহাকে আহার্য্য বলিয়া ভ্রম করে না।

আপনি যেখানে আসিয়াছেন তাহা প্রায় দেড় শত ফুট নীচে। আপনার এই পোষাকে তিনশত ফুট পর্য্যন্ত নামা যায়। তাহার বেশী নীচে যাইতে হইলে ইস্পাতের পোষাক পরিতে হইবে। ইস্পাতের পোষাকেও পাঁচশত ফুটের বেশী নামা যায় না। দুইশত পঁচাত্তর ফুটের বেশী নীচে জলের চাপ এত বেশী যে ইস্পাতের পোষাক পরিয়াও বেশীক্ষণ সেখানে থাকা যায় না। আর সেখান হইতে তুলিবার সময় ডুবুরিকে যদি খুব ধীরে ধীরে উঠান না হয় তবে হঠাৎ চাপ কমার ফলে তাহার ধমনীর রক্ত বুদ্বুদে ভরিয়া যাইবে এবং সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এ অবস্থায় পাঁচশত ফুটের নীচে যাওয়ার আশা কেহ করিতেন না। রত্নাকরের রহস্য ভেদের চেষ্টা এতদিন ঐখানেই থামিয়াছিল। বছর নয় পূর্ব্বে Dr. William Bebe একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন, আরো নীচে যাইবার জন্য। যন্ত্রটী আর কিছু নয়, সোয়া ইঞ্চি পুরু শক্ত ইস্পাতের পাত নির্ম্মিত একটী বল—ব্যাস প্রায় পাঁচ ফুট। চৌদ্দ ইঞ্চি মাপের একটী দরজা দিয়া কোনরূপে ঠেলিয়া নিজেকে ভিতরে প্রবেশ করাইতে হয়। দরজার বিপরীত দিকে বলের গায় দুইটি গোল

জানালা—তিন ইঞ্চি পুরু স্ফটিক পাথর (Quartz) দিয়া ঢাকা। Quartz অপেক্ষা কঠিকতব স্বচ্ছ দ্রব্য আর নাই। একটী জানালা বাহিরের জিনিষ দেখিবার জন্য—অন্যটী সেই জিনিষকে সার্চ্চলাইট দিয়া আলোকিত করিবার জন্য।

বলের ভিতরে হাওয়া যোগাইবে কে ? উপর হইতে পাম্প করিয়া বায়ু পাঠান সম্ভব নহে। অত নীচে রবারের নলের তো কথাই নাই—ইস্পাতের নলও টিকিবে না। বলের ভিতরেই অক্সিজেন প্রস্তুতের যন্ত্র আছে—এবং প্রশ্বাসে যে কারবন-ডাই-অক্সাইড বাহিব হয তাহা নষ্ট করিবার জন্য রাসয়নিক দ্রব্য আছে। টেলিফোনেব তার আছে, উপবের সহিত কথাবার্ত্তা বলা চলে। কতখানি শিকল ছাড়া হইযাছে তাহা দেখিয়া বলটী কত নীচে নামিল তাহা জানান হয এবং সেই স্থানে কি দেখা যাইতেছে তাহা উপরের লোকেরা শ্রবণ করে এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জুন বেলা একটাব সময ডাঃ বিব ও তাঁহার সহকারী ঐ বলে করিযা নীছে নামেন। প্রথমে বলেব ভিতবটা আরামদায়ক সবুজ আলোতে ভরিযা গেল। যখন উপর হইতে জানান হইল যে একশত ফুট শিকল ডুবিযা গিযাছে তখন শুধু এইটুকু পার্থক্য অনুভূত হইল যে আলো মন্দীভূত হইযাছে। যেন সন্ধ্যা নামিযা আসিল। ক্রমে আলোব সবুজ রং পরিবর্ত্তিত হইয়া নীল হইতে লাগিল। একটা অস্পষ্ট নীল—যাহা কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে দেখা যায় না। অদ্ভুত আকৃতির বিশালকায আলোক বিচ্ছুরিত দেহ জলদানব জানালাব সম্মুখে ভাসিযা আসিতেছিল ও দূরে মিলাইয়া যাইতেছিল। যাহাদেব জগৎ চিরঅন্ধকার, পথ দেখিবাব জন্য তাহারা নিজেব দেহে আলো সৃষ্টি করিতে পারে।

বলটী যতই নীচে নামিতেছিল সেই অস্পষ্ট নীল আলোর উজ্জ্বলতা ততই কমিতেছিল। অবশেষে ধীরে, অতি ধীরে চাবিদিক একেবারে অন্ধকার হইযা গেল। একেবারে গভীব অন্ধকার।

প্রথমবারে খুব বেশী নীচে নামা সম্ভব হয় নাই। 'তিনশ' ফুট পার হইবার পব ধবা পডিল যে বলটী চুযাইতেছে। তাই মাত্র আটশত ফুট নামিযাই তাঁহারা ফিরিতে বাধ্য হন। পরে অন্যবারে আধমাইল পর্য্যন্ত নামা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার বেশী নীচে গেলে ইস্পাতের বলটীও ভাঙ্গিয়া চেপ্টা হইযা যাইবার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানেব যাহা কিছু আবিষ্কাব আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহাতে সাগর তলে আধ মাইলের বেশী সাহস করিয়া নামা যায় না।

কিন্তু, আপনার সহকারী উপর হইতে ইসারা করিতেছেন। এখন উপরে ওঠা উচিত। আপনিও দড়িতে একটা টান দিযা জানাইয়া দিন যে আপনি উঠিবাব জন্য প্রস্তুত। তারপর valve বন্ধ করিয়া দিন। দেখিতে দেখিতে এই শব্দহীন স্বল্পালোকিত রত্নোদ্যান ছাডিয়া আপনার পরিচিত পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন।

তারপর আবার তণ্ডুল অন্বেষণ আরম্ভ হইবে।

জনমত গঠনে সংবাদপত্রের প্রভাব

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী

সমগ্র শিক্ষিত সমাজে, সংবাদপত্রের স্থান অন্যতম শীর্ষে। এই সংবাদপত্র জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত প্রযোজনীয ও আকর্ষণীয় বস্তু। কেননা সংবাদপত্রের বিস্তৃত প্রচার, ও তার লেখনী উৎসের দৃপ্ত প্রভাব জাতিকে নব নব চিন্তায় উন্মেষিত করে জাতির চিন্তার ধাবা মতামত পবিকল্পনাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে গঠন করতে পারে। এবং সহায়তাকারী স্বরূপ, একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথ জাতির সুমুখে নির্দ্দিষ্ট কবতে সমর্থ হয়।

তবে চল্‌তি ভষায় বলে—"many men many minds" সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের সমস্যা বহুল প্রাঙ্গণেব হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদি, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী ও বিভিন্ন সামাজিক রীতিবিশিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামতগুলি অর্থাৎ যাকে বলে জনমত, সেই পঁয়ত্রিশ কোটী জনগণের জনমতকে ঠিকমত বুঝতে চেষ্টা করে তাদের সেই বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী মতামতগুলিব উপযুক্ত সমালোচনা দ্বারা একটী যুক্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উদার, প্রসারিত মতে পরিণত করে, বিভিন্নমুখী মতগুলিকে ও চিন্তাধারাকে এক পথে পরিচালিত করা যেমন কঠিন ও দায়ীত্বপূর্ণ সেইরূপ শ্রমবহুল, প্রগাঢ় চিন্তা ও জটিলতর সমস্যার বিষয।

তবে এ সমস্যা যতই জটিল ও কঠিন হোক্‌না কেন, দেশের জনগণের সংবাদপত্র পবিচালনার পরে একটা সুদৃঢ় প্রতীতি, ও সুগভীর শ্রদ্ধাই পারবে এর সমাধান অত্যন্ত সরল ভাবে কবতে এবং সব মীমাংসার পন্থা হবে, খুবই সহজ এবং অনাড়ম্বর।

এর জন্য সত্যাশ্রযতা, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ পরিচালনার ওপর সংবাদপত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে, অপ্রিয রুক্ষ ও কর্কশও যদি সত্য হয় তবু বলতে হবে—তবেই সমগ্র জাতি আপুনি, সংবাদপত্রেব এক আকর্ষণীয় শক্তিতে সেই পরিবেশিত সংবাদের প্রতি সুদৃঢ় প্রতীতি বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেই প্রচারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্থন করবে।

এবং সেই সংবাদই সর্ব্বদল ও সর্ব্বজাতির প্রাণে প্রভাবান্বিত ছায়া বিস্তার করে জনমত গঠন কার্য্যে কৃত সঙ্কল্প হয়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে পারবে।

কেননা সর্ব্বদল ও সর্ব্বজাতি সংবাদপত্রের কাছে বিশ্বরাষ্ট্রের দোষ ও গুণের নিরপেক্ষ সমালোচনা ও নির্ভীক উক্তি, সত্য বিচার প্রত্যাশা করে।

সুতরাং সংবাদপত্রের পরিবেশিত সংবাদ যদি মূর্ত্তিমান সত্যের প্রতীক না হয়, তবে সে প্রচারিত বাণী দেশবাসীর মর্ম্মে গভীরতম বিশ্বাসের মূল উদ্রেক করতে পারবেনা, জাতি সে লেখনী উৎসকে সমর্থন করবেনা, এবং সে সংবাদ জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার কবে

জনমত গঠন কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করতে পারবেনা। 'সুতরাং সংবাদপত্রকে জাতীয়তার নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, জীবন্ত প্রতীকের প্রতিমূর্ত্তির মতই একান্ত সত্য সংবাদ প্রচার করে দেশবাসীকে নব নব চিন্তার উন্মেষে জাগ্রত ও চকিত করতে হবে এবং সেই দৃপ্ত অথচ ন্যায় ও যুক্তিপুর্ণ সংবাদে দেশের জনগণ হতে পারবে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি গভীরতম প্রেরণাপূর্ণ, সমগ্র জাতির একমুখী চিন্তা ধারার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অন্যায়ের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হতে পারবে, সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়ে জাতির দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার করতে পারবে, ন্যায়ের সুন্দর সমাধানে সবাই মুগ্ধ হবে।

বর্ত্তমানে এই যে কৃষক শ্রমিক আন্দোলন দেশময় সাড়া তুলেছে, দিকে দিকে কংগ্রেসের আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে, কংগ্রেস প্রীতিতে দেশবাসী আকৃষ্ট হয়েছে, দেশের শিল্প সমস্যা ক্রমঃ উন্নতি লাভ করছে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ যে একান্ত প্রয়োজন,—একথা জনসাধারণ যে উপলব্ধি করতে পেরেছে—এর মূলে সংবাদ পত্রের লেখনী উৎসই যে মুখ্যতম একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

চীনের বুকে জাপানের নৃশংস নৃত্যলীলায় ও পাশ্চাত্যে হিট্‌লার মুসোলিনী প্রভৃতির পৈশাচিক বৃত্তিতে জনগণ যে ক্ষুব্ধ ব্যথিত বিদ্রোহী হতে পেরেছে সে একমাত্র সংবাদপত্রের সহায়তায় এবং সংবাদপত্রের কল্যাণেই।

তাহলেই বোঝা যায় জনগণের মনে সংবাদপত্র কি প্রগাঢ় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, সুতরাং জনমত গঠন কার্য্যে সংবাদপত্রের প্রভাব যে প্রথম সোপান স্বরূপ একথা সহজেই অনুমেয়।

অতএব সংবাদপত্রের দায়িত্ব পালনে কঠিন কর্ত্তব্য সেইখানেই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হবে, যেখানে সংবাদপত্র পরিচালনার মুখ্যতম উদ্দেশ্য হবে জনপ্রিয়তা লাভের আশা, নিছক ব্যবসাদারী মনোবৃত্তিতে একপক্ষকেই সমর্থন না করা এবং নিগূঢ় স্বার্থসিদ্ধি সাধনে জাতির সমুখে মুখোরোচক নিন্দা ও পরচর্চার উত্তেজনামূলক অমূলক সংবাদ পরিবেশন না করা। এই সংকল্পই সব জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করতে পারবে।

তবে এর জন্য চাই বিরাট স্বার্থত্যাগ, উদার মনোবৃত্তি, যার প্রভাব সাম্প্রদায়িকতার বিষ, প্রদেশিকতার সঙ্কীর্ণতমমনের পরিচয় দেশময় যে গ্লানি ও অশান্তির সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিবিধান করতে পারবে, এবং দেশের বুকে অপরিমেয় এক শান্তির প্রতিষ্ঠা করে সর্ব্বভারতীয় জাতি গঠন কার্য্যে সহায়তা করিতে সমর্থ হবে। নির্ভীক, অকুণ্ঠিত, সত্য প্রণবন্ত নিরপেক্ষ আলোচনায় স্বাধীন মত প্রকাশ এবং সেই পরিবেশিত সংবাদ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করে সমগ্র দেশবাসীর চিন্তাধারা ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে এক পথে পরিচালনা করেই সংবাদপত্র জনসেবার কঠিন দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে এবং জনমত গঠন কার্য্যে তার প্রভাব বিস্তার করে বিরাট সার্থকতা লাভ করবে।

স্বর্গীয়া আভা দে

নির্ভীক কর্ম্মী আভা দে অকালে হঠাৎ পরলোক গমন করেছেন। অকস্মাৎ বজ্রপাতেব মতোই এ দুঃসংবাদ আমাদের বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় কবে দিযেছে।

দেশকে ভালোবাসার পুবস্কার স্বরূপ অনেক লাঞ্ছনা তিনি বরণ কবে নিযেছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সনে দুবার তাঁর কারাদণ্ড হয। দ্বিতীয়বার কারাগার থেকে ফিরে আসার পরও বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ য়োগ এবং তাঁদের কাজের সঙ্গে নিবিড ভাবে জডিত আছেন এই সন্দেহে তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার কবে সি, আই, ডি, আফিসে নিয়ে যায।

তাঁব মতো এমন দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মী, কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রাণ, এমন অসমযের বন্ধু কমই দেখা যায। তাঁব স্বভাবেব মধ্যে বিপ্লবী সুলভ এমন একটী অদ্ভুত চাঞ্চল্য ছিল, এমন অসাধাবণ তেজ ও সাহস ছিল যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারতো না। কোনো দুঃসাহসিক প্রযোজনে, বিপদের মুখে এমন নির্ভীক এমন দৃঢ পদক্ষেপ বড দুর্লভ। যেখানেই যে কাজেরই তিনি ভাব নিতেন এমন প্রাণ দিযে নিষ্ঠাব সঙ্গে তার মর্য্যাদা রাখতেন যে তাঁর ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভব কবা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা নিবাপদ। এমন একটী কর্ম্মী ও বন্ধুর অকাল বিযোগে ক্ষতির অন্ত নেই।

তিনি যে শুধু অসময়ের বন্ধু, দুর্দ্দিনের অসম সাহসী সাথী ছিলেন তাই নয, তাঁর প্রাণ মাতানো হাসি, তাঁর স্নেহ ও সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করত। বিষাদখিন্ন মনকে হাসির তুফান তুলে কোথায যে বিষাদ-মেঘ উড়িয়ে দিতেন দিশা পাওযা যায় নি। জেলে দেখেছি যেখানে আভা দে থাকতেন তাঁর চতুঃসীমানায একটা হাসির কলরোল জাগিয়ে বাখতেন। তিনি বড় কৌতুকপ্রিয পবিহাস প্রিয ও সুরসিকা ছিলেন। তাঁর মনমাতানো হাসি দিযে কৌতুক ও স্ফূর্ত্তির ঢেউ তুলে এমন একটা আবহাওযা চারদিকে সৃষ্টি ক'রে রাখতেন যে তাঁর কাছে যেতে প্রলুব্ধ হ'তেই হত।

সর্ব্বোপরি ছিল তাঁর লোহায় গডা স্বাস্থ্য। বাঙ্গালী মেয়েদের অমন স্বাস্থ্য তো বড় দেখা যায় না। অমন স্বাস্থ্যের সম্পদ ছিল বলেই গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, লাঠি খেলা, সাইকেল চালানো, কোনোটাতেই তিনি পরাজিত হ'তেন না। কিন্তু এমন অটুট স্বাস্থ্য যাঁর তাঁকে অকালে বেরিবেবি বোগে ভুগে কয়েকদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হ'ল—এ বিয়োগ বড় নিষ্ঠুর, বড মর্ম্মান্তিক—এ ক্ষতি অপূরণীয়।

বাঙলায় গান্ধীজী

ঢাকা জেলায় মালিকান্দা গ্রামে এ বছরের নিখিল ভারত গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের অধিবেশন হয়। গান্ধীজী আমন্ত্রিত হয়ে এলেন বাঙলায়। পথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরণ ক'রে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের নিভৃত কুঞ্জে,—ভারতের গৌরব, বিশ্ববরেণ্য এই দুই মহামনীষীর অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হ'ল। কবি গান্ধীজীকে বিশ্বমানবের স্বজন ব'লে শ্রদ্ধায় সৌজন্যে আপ্লুত ক'রে দিলেন —গান্ধীজী কবির স্নেহে ও আশীর্ব্বাদে অভিভূত হ'য়ে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ ক'রে নিলেন। বাঙলায় সেদিন আনন্দের দিন।

সেখান থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী সেবা-সঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য মালিকান্দায় গিয়েছিলেন। এবারকার অধিবেশনে এক নতুন পন্থা অবলম্বিত হলো। অধিবেশনে স্থির হয় যে এই সঙ্ঘের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যাঁরা সঙ্ঘের সদস্য থাকবেন তাঁরা রাজনীতিতে যোগদান করতে পারবেন না। গান্ধীজী মনে করেন রাজনীতির কলঙ্ক ও ত্রুটীগুলি এই সঙ্ঘের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। তাই তাকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। গঠনমূলক কাজই শুধু এই সঙ্ঘ করে যাবে, এবং সত্য ও অহিংসার সেবা করাই হবে এর মূল উদ্দেশ্য। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে যে নতুন সভ্যতা গান্ধীজী স্থাপন করতে উৎসুক, এইভাবে তিনি তার অঙ্কুর বপন ক'রে যেতে চান। এই সঙ্ঘকে কংগ্রেসের থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে একদিকে দেশের পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে। চর্‌কা খদ্দর প্রভৃতি সামাজিক গঠনমূলক কাজগুলি যদি এভাবে আস্তে আস্তে কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে পৃথক ক'রে রাখা যায়, সংগ্রামের অঙ্গ থেকে সরিয়ে রাখা যায়—তবে তাতে সুফল হবে বলেই আশা করি।

মালিকান্দা অধিবেশন সমাধা হ'লে গান্ধীজী যখন পাটনা চলে গেলেন—পথিমধ্যে তাঁকে পাদুকা নিক্ষেপ ক'রে যে অপমান করা হয়েছে তাতে গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবকে স্পর্শ করে নাই— সে অপমান, সে কলঙ্ক বাঙ্‌লা দেশকেই অধোবদন করেছে। গান্ধীজীর বাঙলায় আগমন এবং যে কয়দিন তিনি এখানে অবস্থান করেছেন সে কয়দিন এমন ভাবে সভাসমিতি ও বক্তৃতা করা হয়েছিল যে সেই প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পরিণতি ঘটে এইজন্য দায়ী শুধু প্ররোচনা ও উস্কানিমূলক প্রচার কার্য্য। বাঙলার এই কলঙ্ক ও লজ্জা প্রকাশ করবার কোনো ভাষা নাই।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বিরুদ্ধে রাজরোষ

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকাকে সরকার জানিয়েছেন যে ভারত রক্ষা আইনের বিধি অনুসারে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো যে তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সরকারকে দেখিয়ে অর্থাৎ 'censored and passed করিয়ে ছাপাতে হবে। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান থাকতে এরূপ কাজ

কোন সম্পাদকই করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে এই কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সবকারের এই হুমকী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাব উপর এই অন্যা হস্তক্ষেপ যে, কোন্ নীতির পূর্ব্বগামী ছাযা তা বুঝতে দেরী হয না। ভাবতরক্ষা আই যেমন ব্যাপক তেমনি অস্পষ্ট।—কোন্ কথা কোন্ লেখায় যে এই ধারা প্রযোগ কবা যা তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। বাঙলায নানাভাবে সবকার দমন নীতি চালাতে সুরু কবেছেন- সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ তাবই অংশ। স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিমাত্রই এব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রকাশ কবছেন।

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

একদিকে সরকাব এ ভাবে সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা হবণ কবেছেন, আবাব অন্যদিে যখন দেখি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রও পবমত অসহিষ্ণু হ'যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ-ঘোষণা ক'ে বয়কট চালাতে বলছেন তখন তার প্রতিবাদেব আর ভাষা থাকে না। 'যুগান্তব' বর্জ্জন ক'ে সুরু কবা হোক্ এই হুম্‌কী দিলেন সুভাষচন্দ্র। যে পত্রিকাগুলি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্ববিষে একমত না হ'তে পেরে তার সমালোচনা কবেন, বা সুভাষচন্দ্রেব দৃষ্টিভঙ্গী নিযে জাতী আন্দোলনকে না দেখতে পাবেন, ডিক্টেটবী ভঙ্গীতে তাদের ধ্বংসসাধনেব প্রচেষ্টাকে আম মুসোলিনী হিটলারীয ফ্যাসিষ্ট মনোভাব ব'লেই মনে কবি—ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্রেব বিরো বলেই গণ্য করি।

যে কোনো নেতাব কার্য্যকলাপ বা নীতিকে স্বাধীন দৃষ্টি দিযে সমালোচনা কববা অধিকার সকলেরই আছে।

এই পত্রিকাগুলি হযতো সুভাষচন্দ্রের দ্বাবা পবিচালিত বি, পি, সি, সি,ব কায্যাবল অনুমোদন করতে পারেন নাই।

বাঙলা কংগ্রেসকে যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ক'বে তিনি দুর্ব্বল করতে দিযেছে যে সমযে কংগ্রেসেব সংহত শক্তি, ঐক্য, দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলার একান্ত প্রযোজন তখন সুভাসচ প্যাবালাল কংগ্রেস সৃষ্টি ক'রে অর্থাৎ দুইটী কংগ্রেসে পরিণত ক'রে দিয়ে যে ক্ষতি করেছেন তা তুলনা হয না। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব যে সূচনা তিনি করেছেন এর পরিণতি শোচনীয- সৃষ্টিকর্ত্তাকেও যে এর ফল ভোগ করতে হ'তে পারে, আবেগের মুখে, আহত অভিমানের আচ্ছ মোহে, আজ তিনি তা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই দর্শিত পথে, সঙ্ঘেব বিরু বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁরও সঙ্ঘকে একদিন আত্মকলহে, অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতে পাবে- সে দিনের সে পরিণতির জন্য আজিকার সুভাষচন্দ্র নিজে পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, সেই কংগ্রেস, সেই প্রতিষ্ঠানে

ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দুর্ব্বল করতে চেষ্টা ক'রে যে অন্যায় যে অনিষ্ট সুভাষচন্দ্র করেছেন সে কথা বলতে গেলে তিনিও সরকারের মতোই স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত। কোথায় গেল তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নীতি! কোথায় গেল তাঁর High handendess এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি!

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও গান্ধীজী

বাঙলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলাফল নিজ চোখে দেখে গান্ধীজী আর নীরব থাকতে পারেন নাই। 'হরিজনে' এ সম্বন্ধে তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটী অক্ষর দুর্ভাগ্য বাঙালা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। গান্ধীজীই শুধু এখানে এসে আজ উপলব্ধি করেছেন। তিনি দেখে গেছেন এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের মঙ্গলের জন্য নয়, ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ় করবার জন্য। বৃটিশ ব্যতীত ভারতের কোন দলই এই সিদ্ধান্তে লাভবান হয় নাই। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে ততদিন স্বরাজ আসতে পারে না। এর প্রতীকার কি ভাবে সম্ভব সে কথা বলতে গিয়ে এক কথায় তিনি বলেছেন যে, পারস্পরিক চুক্তি দ্বারাও তা সম্ভব। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদেরও সেই চুক্তিতে সম্মত করতে হবে। এই সম্মত হওয়ার অর্থ স্বার্থত্যাগ করা—এরূপ স্বার্থত্যাগ স্বীকারের কথা রাজনৈতিক ইতিহাসে অজ্ঞাত। অতএব সে চুক্তি অসম্ভব। গান্ধীজী যেখানে নিজেই জানেন যে আপন স্বার্থের খাতিরে এই বাঁটোয়ারার সৃষ্টি এবং এরূপ স্বার্থত্যাগ রাজনীতিতে অজ্ঞাত তখন বৃটিশ বণিকের ভারতের এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ও স্বার্থ কেমন করে হৃদয় পরিবর্ত্তন দ্বারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাক্ত হবে—এ আশা তিনি কেমন ক'রে পোষণ করেন তাও আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহস্য।

ভারতে ইংরাজ শাসন দিগ্বিজয়ীর সখের শাসন নয়—এটা স্বার্থের শাসন, বণিকের শোষণ—এখানে প্রত্যেকটী ব্যবস্থা প্রত্যেকটী মন্ত্রণা গুণে গুণে মেপে মেপে শুধু স্বার্থের মাপকাঠি টেনে সাম্রাজ্যবাদী কূট চালে প্রণোদিত হয়ে চলে। গান্ধীজী বলেছেন, রাজনীতিতে স্বার্থত্যাগ অজ্ঞাত। তবে সেখানে তাঁর হৃদয় পরিবর্ত্তনের নীতি কি তেমনি অসম্ভব নয়? কোনো দিনই কি তারা স্বেচ্ছায় স্বার্থবলি দিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে পারে? সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে তারা যেমন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রক্ষা প্রয়োজন বোধ করেছে তেমনি ভারতের রাজনৈতিক অধীনতাও তারই অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। দুয়ের বেলায়ই স্বার্থত্যাগের কথা অজ্ঞাত। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত যেমন বাতিল হবে না—রাজনৈতিক স্বাধীনতাও তেমনি আসবে না। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে স্বার্থত্যাগ করাতে বাধ্য করা। এ ক্ষুধা কোনো দিনই আপনা থেকে দয়া করে নিবৃত্তি হয় না—এই দীবাগ্নির স্বভাবই শুধু বেড়ে চলা—এ আগুন কাবু হয় কেবল অপরের ক্ষমতার প্রবল চাপের মধ্যে পড়লে

এবং বাধ্য হ'লে—তার পূর্ব্বে নয়? তাই প্রয়োজন সুসংহত শক্তি ও সংগ্রাম—হৃদয়ের পরিবর্ত্তন নয়।

পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক পাটনায় হ'য়ে গেল, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধারম্ভে কংগ্রেস জানতে চেয়েছিল যে, যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশ জাতি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, ভারতেও তাহা প্রয়োগ করা হবে কিনা। এবং সে সঙ্গে কংগ্রেস ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীন জাতি বলে স্বীকার করবার দাবীও জানায়। বহু আলোচনা, গবেষণা ও মোলাকাতের পরেও, অনেক ধৈর্য্য ধারণ ক'রেও, ব্রিটিশ নীতির কোনও পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না। সেই দেশীয়রাজ্য, সাম্প্রদায়িক বা মাইনরিটি সমস্যা ইত্যাদির অজুহাতে পুনরায় একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাস্তব কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না।

গান্ধীজী কিছুদিন পূর্ব্বেও আশার আলোক পেয়েছিলেন কিন্তু এখন কথাবার্ত্তার বিনিময়ের পর বুঝেছেন দুই পক্ষের দৃষ্টিই দুই পৃথক পথে আসছে। ব্রিটিশ চায় তারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে—কংগ্রেস চায় ভারত আপন ভাগ্য আপনি নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার কম অন্য কিছু ভারতের কাম্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী গণ্ডির মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ ভারতের কাম্য নয়—তাতে ভারতকে, তার ভাগ্যকে নানা প্রকারে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আওতায় থাকতে হবে—যে অবস্থা ভারত কামনা করে না। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যে গণপরিষদ গঠিত হবে সেই গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করবে, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হবে ভারতের এই দাবী যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট না মেনে নেন, কংগ্রেস বলছেন তবে সংগ্রাম অনিবার্য্য। কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব ত্যাগ তারি সূচনা—এবং এই ব্যবস্থার পর স্বভাবতঃই আইন অমান্য আন্দোলন আসবে। সঙ্কট অপরিহার্য্য হলেই বিনা দ্বিধায় আইন অমান্য সংগ্রাম সুরু হবে।

এক কথায় বলতে গেলে পাটনায় যে প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করেছে তা আপোষ বিরোধী। এ প্রস্তাবে সংগ্রামেরই সূচনা করছে আপোষের নয়। মন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের দুইটি স্তর।

আপোষ-বিরোধী সম্মিলন

রামগড়ে এবার ঐ একটি মাত্র প্রস্তাবই গৃহীত হবে। এই প্রস্তাবটী আপনিই আপো বিরোধী। এতে আপোষের গন্ধ কোথায় যে আছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবু একদল লোক আর একটি আপোষ-বিরোধী সম্মিলন করছেন ঐ একই যায়গায়—রামগড়ে। যেখানে জাতী

কংগ্রেস এক আপোষ-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করছে সেখানেই আর একটি আপোষ-বিরোধী সম্মিলন আহ্বান যেমন হাস্যকর তেমনই উদ্ভট। এই সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ এতদিন বলেছেন কংগ্রেস আপোষ চায় এবং সংগ্রাম করবে না, অতএব ভিন্ন কন্‌ফারেন্সের আয়োজন। কিন্তু যখন দেখা গেল কংগ্রেস আপোষ চাইছে না, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্‌ও চাইছে না এবং সংগ্রাম আসন্ন করে তুলছে তখন ভিন্ন সম্মিলন করে একই কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উচ্চারণ করলেই কি শুধু সংগ্রাম আস্‌বে? যাঁরা শুধু সংগ্রামের কথা বলেন অথচ সংগ্রামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন না, জাতীয় শক্তিকে সংহত করেন না, কর্ম্মপন্থা দেননা এবং গান্ধীজীকেই সংগ্রাম সুরু করবার ভার দিয়ে ভাবেন এটাই সংগ্রাম, আবার গান্ধীজী আপোষ বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করলে পৃথক সম্মিলন ক'রে দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করেন,—তাঁদের সংগ্রাম সংগ্রাম বলে চীৎকার করায় কোনও গুরুত্ব নাই, অর্থ নাই। এরা মুখে বলছেন সংগ্রাম চাই—কাজে আনছেন আত্ম-কলহ, বিচ্ছেদ ও দুর্ব্বলতা—পারছেন না শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসংহত হ'য়ে সংগ্রাম করতে বা আসন্ন সংগ্রামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না ক'রে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে শুধু বাক্যচাতুর্য্যে সংগ্রামও আসন্ন হয় না,—আলাদা ক'রে আর একটি আপোষ-বিরোধী নাম দিয়ে সম্মিলন করলে তাকে গুরুত্ব দিয়ে কেউ সংগ্রাম হচ্ছে বলে মনেও করে না।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী

পাটনার প্রস্তাব বৃটিশের মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। তাদের মুখপত্র ষ্টেটস্‌ম্যান হঠাৎ কেমন ক'রে একেবারে সুর বদলে চড়া মেজাজ হ'য়ে উঠেছেন। যতদিন গান্ধীজী আপোষের স্বপ্ন দেখছিলেন, আশার আলোক পাচ্ছিলেন, ততদিন কত মর্য্যাদাই না গান্ধীজীকে তাঁরা দিচ্ছিলেন। কিন্তু পাটনার প্রস্তাবে হঠাৎ যেন একেবারে মূলে গিয়ে ঘা পড়েছে। ভারতে বৃটিশ রাজনীতির মুখপত্র, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আর স্থির থাকতে পারলেন না। এরা বলে কি? বৃটিশের আওতায় সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস পর্য্যন্ত এরা ভোগ করতে চায় না! কোথায় ভারতীয় সৈন্য ও অর্থাদি দিয়ে বিপদের দিনে সাহায্য করে তাদের স্নেহচ্ছায়ায় নিরাপদ নীড়ে শান্ত হয়ে ধৈর্য্য ধরে আরেকটা গোলটেবিলে কিছু পাওয়া যায় কিনা তারই প্রতীক্ষা করতে থাকবে, কোথায় যুদ্ধের সুযোগে একটু ব্যবসার প্রসার ক'রে নেবে, তা নয়, বলে কিনা যুদ্ধে সাহায্য তো করবেই না, আবার ইংলণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের কাম্য। এ যে একেবারে 'আত্মহত্যা'।

শুধু ভারতে বৃটিশ মুখপত্র ঝাল ঝেড়ে ক্ষান্ত হ'ন নাই। সাগরপারের লণ্ডন থেকে গান্ধীজীকে প্রশ্ন ক'রে পাঠানো হয়েছে যে, কংগ্রেস আলোচনাও মীমাংসার পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে কিনা। গান্ধীজী স্বল্প কথায় দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের উত্তর দিয়েছেন। কংগ্রেস দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেন নি—লর্ড জেটল্যাণ্ডই দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। যে সর্ত্ত তিনি দিয়েছেন সে ভিত্তিতে আপোষ

মীমাংসা অসম্ভব। ভারত তার নিজের শোষণ কার্য্যেও বৈদেশিক অধীনতার সহায়হীন অংশীদার হবে না এবং যতদিন না বৃটেনের মতো বা তার চেয়েও বেশী স্বাধীন হবে তত দিন সে বিশ্রাম করবে না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন তারা বর্ত্তমান যুদ্ধ চালাচ্ছে তখন কংগ্রেস বৃটেনকে নৈতিক শক্তিতে সমর্থন করতে পারে না। অসহায় ভাবে অধীন থাকা অপেক্ষা পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে কারাবরণ করা গান্ধীজী শ্রেয় মনে করেন এবং বলেছে ভারত আর একবার কারাগৃহে পরিণত হবে কি না সে বিচার বৃটেনের—ভারতের নয়। আসন্ন সংগ্রামের যে সুপরিস্ফুট আভাস, যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, যে সতর্ক সঙ্কেত বৃটিশ জাতির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী দিয়েছেন তাতে বৃটিশ ও ভারতের মধ্যে একটা দুর্য্যোগ পর্ব্বের সম্ভাবনার সূচনা করে।

আসন্ন সংগ্রাম ও গান্ধীজী

গান্ধীজী আসন্ন সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত ক'রে নিতে চাইছেন। তিনি অহিংস ও সত্যের সাধক। তাঁর গঠনমূলক কার্য্যাবলীতে তাঁর আপন মত ও পথ মিলিয়ে এমন একটা কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের মতো বাস্তব জগতের মানুষের বুদ্ধিতে তার প্রয়োজন ও অর্থ বোধগম্য হয় না। তাঁর গঠনমূলক কাজ; দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁর যে দাবী তাতে আমরা রাজনীতি বা সংগ্রামের অংশ বিশেষ খুঁজে পাই না। অথচ এ নইলে তিনি সংগ্রামও করতে পারবেন না। সূতাকাটা ও খদ্দর বিক্রয়ের প্রতি ঔদাসীন্যকে তিনি অবিশ্বাসের কাজ বলে মনে করেন—এই শক্তি নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করতে তিনি রাজী নন। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত এমন বহু লোক থাকা সত্ত্বেও সূতা না কাটলে বা খদ্দর প্রচার না করলে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী অগ্রসর হতে পারবেন না, তাঁর এ দাবী অযৌক্তিক ও সমর্থনের অযোগ্য।

৩২নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং অপার সার্কুলার রোড হইতে তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত।

সুষমা
সুগন্ধি কেশ তৈল
কলিকাতা